CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতী

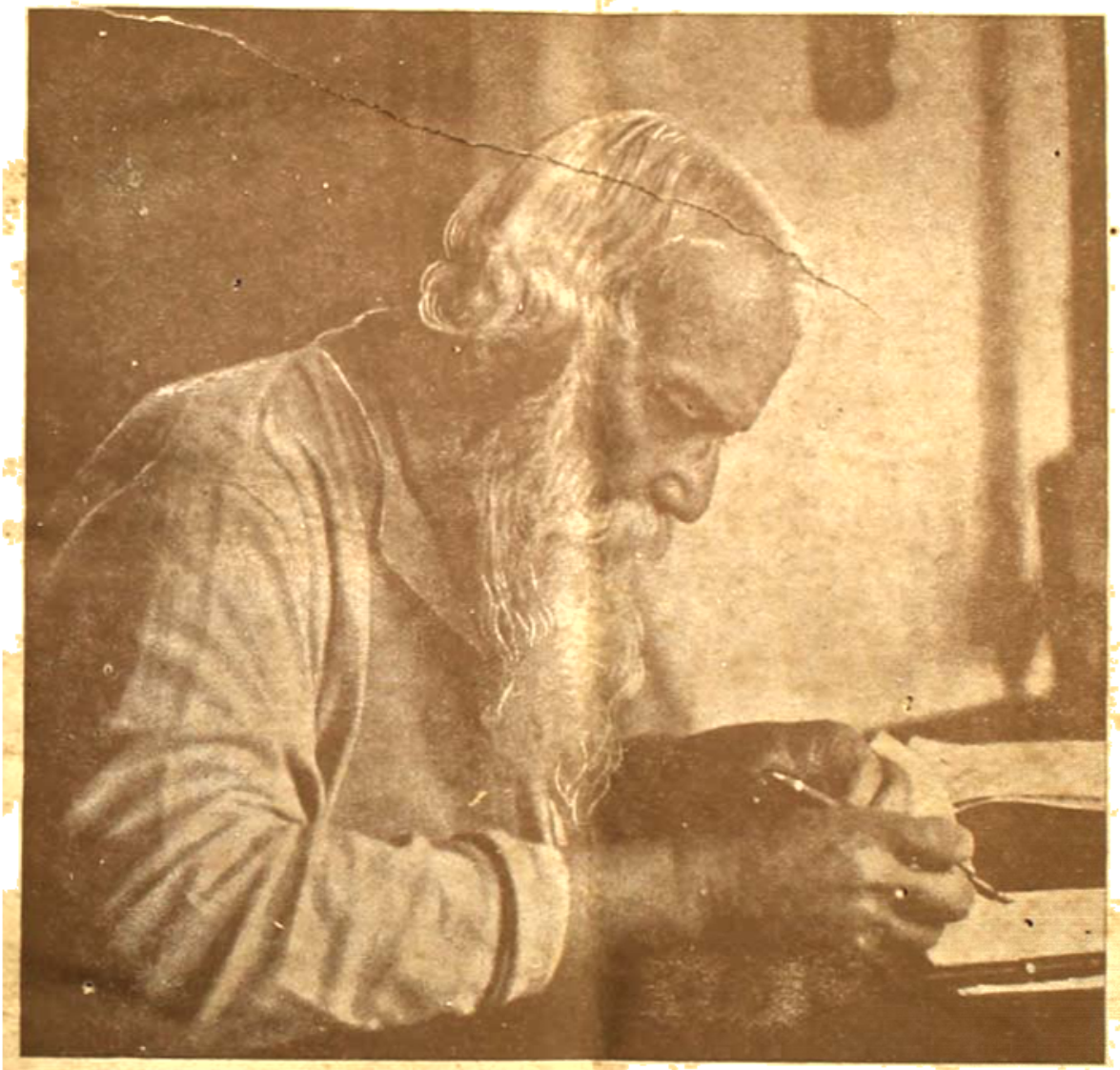

রবীন্দ্র সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৬৫

ত্রয়োবিংশতিবর্ষ । প্রথম সংখ্যা

সম্পাদিকা লীলা রায়

৫২৯৫৪৪

সূচীপত্র

জয়শ্রী। বৈশাখ। ১৩৬৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
মহাকবি		১
একটী রবীন্দ্র জন্মোৎসব (সংলাপীরচনা)	মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী	৩
চক্ষুদান (প্রবন্ধ)	রথীন্দ্রনাথ রায়	৬
১৩২১-এর তিনটি প্রবন্ধ		
রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা (প্রবন্ধ)	ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র	১৭

সূচীপত্র

জয়শ্রী। বৈশাখ। ১৩৬৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্র স্মৃতী তর্পণ (কবিতা)	কামাখ্যাপ্রসাদ রায়	২২
রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যে ত্রয়ী (প্রবন্ধ)	মীরা[illegible]	২৪
রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	প্রফুল্লকুমার দত্ত	২৭
কবিগুরুর শেষের কবিতা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপিকা সুনন্দা দাশগুপ্ত	২৮
অন্তরা (গল্প)	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩২
শহরতলির স্বপ্ন (নাটিকা)	কুমারলাল দাশগুপ্ত	৩৭
উত্তরঙ্গ (উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৪৬
যখন জেনেছি (কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	৫৩
বর্তমান প্রসঙ্গ		৫৪

বর্ষ সূচী

অগ্রণী : বর্ষ সূচী : ১৩৬৫

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
অমল কুমার মিত্র	এই ও সব (কবিতা)	৯৭
অমলেন্দু মিত্র	তাঁবেদার অধিকার (গল্প)	২০৭
অমরেন্দ্র সান্যাল	অবক্ষয় (গল্প)	২১২
	ধোবা সাইমন (গল্প)	৩৭৪
	শীতের প্রার্থনা (গল্প)	৫৯০, ৬০৭
অনীন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত	রূপকার (কবিতা)	২৮২
অতুল গুপ্ত	সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)	২৮৯
অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত	রাত জাগী (কবিতা)	৩০৯
অমলকান্তি ঘোষ	এ শুধু বালক বেলা (কবিতা)	৩৭৯
অনিল বরণ গঙ্গোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী (কবিতা)	৩৯০
ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু	আষাঢ়ের খাদ্য সমস্যা (প্রবন্ধ)	৩৯৫
অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী	পৃথিবীকে (কবিতা)	৪০৮
অধীর মল্লিক	নাট্যকার গলসী ও আধুনিক আমেরিকা (প্রবন্ধ)	৪০২
অন্নদাশঙ্কর রায়	একেশ্বরবাদ (প্রবন্ধ)	৪২৫
অনিলাশ রায়	অন্তরঙ্গ (কবিতা)	৭৩৮
আশিস সান্যাল	সে গেছে এ পথ ধরে (কবিতা)	১৮৯
উমা দেবী	দিল্লী চল (কবিতা)	৬৭১
কমল মুখোপাধ্যায়	চিঠি (কবিতা)	২৮১
কাব্যাখ্যা প্রসাদ রায়	রবীন্দ্র স্মৃতিতর্পণ (কবিতা)	৫২
কুমারলাল দাশগুপ্ত	শরৎচন্দ্রের স্বর (নাটিকা)	৩৭
	হারমিত (রম্য-রচনা)	৪৫৮
[illegible] সেনগুপ্ত	আপন প্রিয় (কবিতা)	৬৮৬
গোপাল [illegible]	আষাঢ় (কবিতা)	১৩৩
	বীকারোক্তি (কবিতা)	৩৩১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
গৌরীশংকর দে	অপরাজিতা (কবিতা)	১৫৫
	আলেখ্য (কবিতা)	৫৫৭
	যদি গন্ধ দিতে পারো (কবিতা)	৮১
জয়দেব রায়	উচ্চাঙ্গের বাংলা গান (প্রবন্ধ)	৭৩৯
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	দুর্যোধন (গল্প)	৩২১
অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী	মহাভারতের কর্ণ (চরিত্র চিত্র)	২৯৭
অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও বাংলা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	৩৮০
দীপ্তি সান্যাল	এ্যাবমিজের ডিনার (গল্প)	৭৭
	ভালোলোক প্রফেসর ঘোষ (গল্প)	১৯২
	বেয়ার মাউন্টেনে পিক্‌নিক্ (গল্প)	৩৩৯
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	দেশান্তর (কবিতা)	৩৬৪
দেবব্রত বিশ্বাস	মনো অভিসার (কবিতা)	৮১০
দিলীপকুমার রায়	চিরন্তনের তীর্থযাত্রী (সুভাষ তর্পণ)	৬২৯
রচিকেতা ভরদ্বাজ	যখন জেনেছি (কবিতা)	৫৩
	দাবদাগ (কবিতা)	
	যে নদী সমুদ্রে গেল (কবিতা)	৩৮৪
	পৌত্তলিক (কবিতা)	৭৬৬
নরেন্দ্র দেব	প্রশ্ন (কবিতা)	৩২৭
নবনীতা দেব	বেলা শেষ (কবিতা)	৩২৫
নলিনী কান্ত গুপ্ত	জগদীশচন্দ্র	৪০৭
নারায়ণ চৌধুরী	বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও সমাজ পরিস্থিতি (প্রবন্ধ)	৪২৯
অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু	গান্ধী ও বিপিনচন্দ্র	৪৫৩
	নেতাজী স্মরণে (স্মৃতিচারণ)	৬৩৮
অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য	ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)	৭১৩
নীলিমা রাশগুপ্ত	উত্তরাধিকার (উপন্যাস) ৪৬, ৮৫, ১৪১, ১৯৯, ২৫১, ৪৮৯, ৫৩১, ৫৯১, ৬৬১, ৭৩৮, ৭৮৯	
	তন্দ্রালি (গল্প)	৪১৬
নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	দায় রাত (কবিতা)	১১৫

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
পঙ্কজ দত্ত	জীবন মানের বৈষম্য সৃষ্টিতে চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)	৪৪০
প্রফুল্লকুমার দত্ত	রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	২৭
	তোমাকে হারাই (কবিতা)	৭১০
প্রমথনাথ বিশী	নিচ্ছনের নির্বাসন (কবিকা)	২৯৫
প্রভাকর মাচবে	একটি ব্যর্থ কাহিনী (কবিতা)	৫০২
প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়	গণতন্ত্রের বাধা ও ক্ল্যাসিসিজমের মোহ (প্রবন্ধ)	৫৭৭
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	জলছবি (কবিতা)	৭৫২
প্রীতি ভূষণ চাকী	পাখিটা (কবিতা)	১১২
	পট (কবিতা)	৪০৮
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	এক বসন্তের পর (কবিতা)	৭৭২
মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী	একটী রবীন্দ্র-জয়োৎসব (সংলাপী রচনা)	৩
অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ	মানসিক রোগ ও তাহার চিকিৎসা	৭৩
বিজয় কুমার ঘোষ	শ্মশান বন্ধু (কবিতা)	১০৪
বিষ্ণু দে	অনেক্য ১৩ (কবিতা)	৩০০
বিভা সরকার	মুম্বাই না বোম্বে ? (প্রবন্ধ)	৪৪৮
বিমলেন্দু মিত্র	আচার্য জগদীশচন্দ্র	৫১১
মঞ্জুর দাশগুপ্ত	হাসপাতাল (কবিতা)	১৩৪
	মৃত মুকুর (কবিতা)	৭১৮
মলয় শংকর দাশগুপ্ত	কোন এক মৃত্যুর পরমুহূর্তে (কবিতা)	৪০২
	ফেচ (কবিতা)	৭৮৮
মানিক মুখোপাধ্যায়	উপলব্ধি (কবিতা)	৪৭১
	বরণা (কবিতা)	৫৯০
মুলক আচী	অসমাপ্ত (কবিতা)	৫৮০
মীরা দত্ত	রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্যে ত্রয়ী (প্রবন্ধ)	৭৪
	জীবন ও জীবিকা (প্রবন্ধ)	১০০
	ব্যবধান (গল্প), শিল্পকলায় রুচি (প্রবন্ধ)	২৬৩, ৪১৩
	অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের রজত জয়ন্তী প্রদর্শনী (সমালোচনা)	৬৮২
মীরা সান্যাল	সেই সেই (গল্প), না (গল্প)	১৫৩, ৪১৭

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
মীরা সান্যাল	বীতংস (কবিতা), প্রজাপতি (কবিতা)	৪৩৪, ৭৪৪
ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী	কর্ণাটক রাসকুট কবি পুরন্দরের উপদেশামৃত (প্রবন্ধ)	৪১০
যোগেশচন্দ্র বাগল	ডক্টর মেঘনাদ সাহা	১০৫
	কৃপাটক রামনাথ বিশ্বাস (স্মৃতি চিত্র)	৩৬৭
	আমার দেখা কয়েকজন (স্মৃতি চারণ)	৩১২, ৩৭৫, ৭১১
		৭৭৩
যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অনেক ঘুরে গিয়ে (কবিতা)	৭৭৬
রবীন্দ্রনাথ রায়	চতুরঙ্গ (প্রবন্ধ)	৫
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য	অবচেতন (রস-রচনা)	১০৩
রবীন্দ্রনাথ বসু	সাহিত্য প্রীতি (কবিতা)	২০৬
হুষেন্দ্রলাল রায়	২৩শে ফাল্গুনী (কবিতা)	৩৬৬
অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী	বাংলার সাম্প্রতিক শিক্ষাসঙ্কট	৩০৩
লীলা রায়	ভবানীপুর উপ নির্ব্বাচন (প্রবন্ধ)	২৩২
শকুন্তলা চক্রবর্তী	পশু মানব (কবিতা)	৪০৩
ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত	দেশ ও দেবী	৩১৪
শক্তিপদ রাজগুরু	একটুকু বাসা (গল্প)	৪৮১
শচীন্দ্রনাথ বসু	পরিবারের সন্ধ্যায় (বড় গল্প)	৩৫৮, ৭৩০, ৮০৪
শান্তি সেন	অর্থোপার্জ্জনে কলকাতার মেয়েরা (প্রবন্ধ)	৩৪৮
শিবদাস চক্রবর্তী	সোনালী সকাল (কবিতা)	৩৬৬
শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায়	পাশ্চাত্যের চোখে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা	৬০৪
শোভনা শৌরি	যে মৃত্যু, করো না গর্ব (কবিতা)	২৬২
শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	মৃত এক আত্মীয়ের মত আজ তুমি (কবিতা)	১৯১
সুধীর গুহ	ছাত্রেষ্টীর রক্তাক্ত শপথ (প্রবন্ধ)	১২৫
	এলুমিনিয়ম পরমাণু (প্রবন্ধ)	১৯০
ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ সেন	কলিকাতার বেকার সমস্যা (প্রবন্ধ)	১১৫
	বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যা ও স্বর্ণ ঋণ (প্রবন্ধ)	৩০১
সমরেশ বসু	কলকা গেরো (গল্প)	৫০০
সনাতন বসাক	চিঠি (গল্প)	৬০১
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	হে ঈশ্বর (কবিতা).	৩৫৬

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সুরোজ আচার্য	পশ্চিম এশিয়ার ঘটনা তরঙ্গ (প্রবন্ধ)	১৮২
ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়	বড় ঘরের মেয়ে (অনুবাদ গল্প)	৩৭২
শরিৎ বর্মা	বহুমাতা (গল্প)	১০২
সত্যব্রত বসু	ভক্টরেট্টি (আলোচনা)	১৯৬, ২৪৩, ৩৬১, ৫৬৩, ৬১১, ৬৮০, ৭৪৫
	ডাঃ বিভাগুলো (উপন্যাস)	৭৬৬, ৭৭৩
সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	সর্বার্থ সাধনা (কবিতা)	৩২৯
	মহাপ্রকাশ (কবিতা)	৬২৮
সাধনা সোম	যে বিচারিণী কলিকাতা (সমাজ চিত্র)	৪২৯
অধ্যাপিকা সুনন্দা দাশগুপ্ত	কবিগুরুর শেষের কবিতা (প্রবন্ধ)	২৮
	সারদা মঙ্গলের কবি বিহারীলাল (প্রবন্ধ)	৪৪৩
	বিস্মৃতি (কবিতা)	২৪০
	বসন্ত বন্যা (কবিতা)	৭০৪
ডাঃ সুকুমার রক্ষিত	"ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা" (প্রবন্ধ)	৬১
সুব্রতেশ ঘোষ	সোভিয়েৎ রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শ্রম (প্রবন্ধ)	৮১
	ধর্মঘট প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	৩৫৩
	পুনরাবৃত্তি (গল্প)	৪৮৪
	পেছিয়ে পড়া দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা (প্রবন্ধ)	৭৪১
সুমিত্রা সেন	সুপুর (গল্প)	১৪৫
সুশান্ত ঘোষ	স্মৃতির সোনালী (কবিতা)	৬৮০
	চিত্রপট (কবিতা)	৫৩০
সুনীল রায়	মল্লিকা (গল্প)	৩৩৩
সুনন্দা ঘোষ	অষ্ট্রেলিয়ার চিঠি (রম্যরচনা)	৩৬১
সুনীল গুহ	কেমন করে যে ভুলি (কবিতা)	৪৫০
	পরিবর্তন (গল্প)	৭৩০
সুবোধ মুখোপাধ্যায়	বর্ণালী বুদ্বুদ (কবিতা)	
সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	বিবর্তন (কবিতা)	
	শিল্পিত (কবিতা)	
	আমার শীত ও বসন্ত (কবিতা)	

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
সৈয়দ হোসেন হালিম	কেয়াবী সময় (কবিতা)	৮৮২
ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র	১৩২১ তিনটি প্রবন্ধ ও রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা (প্রবন্ধ)	১৭
	দুরসৎ (সংলাপী রচনা)	৩৫৬
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	অভয়া (গল্প)	৩৭
	অহল্যা (গল্প)	৩৮৭
হরেন্দ্র সিংহ	দুঃখের বেদনা (কবিতা)	৪২৩
সম্পাদকীয়	মহাকবি	১
	শারদীয়া	২৮৭
	২৩শে জানুয়ারী	৬২৭
বিবিধ	বর্তমান প্রসঙ্গ	৪৫, ৬১, ১১৭, ১৬৭, ২২৭, ৪৪৭, ৫১৫, ৫৬৭, ৬৬৩, ৬৯৫, ৭৪৭
	বিশ্ববার্ত	১১৩, ১৬৫, ৫০৪, ৬৬৪, ৭৫৩, ৮১১
	পুস্তক পরিচয়	৬২৫, ৮১৫

সূচীপত্র

জয়শ্রী। জ্যৈষ্ঠ। ১৩৬৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বর্তমান প্রসঙ্গ		৬১
"ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা" (প্রবন্ধ)	ডাঃ সুকুমার দত্ত	৬৯
মানসিক রোগ ও তাহার চিকিৎসা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক বিমলরঞ্জন গুহ	৭৩
বিবর্তন (কবিতা)	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	৭৬

সূচীপত্র

জয়শ্রী। জ্যৈষ্ঠ। ১৩৬৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
এ্যাসমিডের ডিলার (গল্প)	দীপ্তি সান্যাল	৭৭
সোভিয়েৎ রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শ্রম (প্রবন্ধ)	সুব্রতেশ ঘোষ	৮১
উত্তররঙ্গ (উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৮৫
এই ত সব (কবিতা)	অমলকুমার মিত্র	৯৭
জীবন ও জীবিকা (প্রবন্ধ)	মীরা দত্ত	১০০
অবচেতন (রস রচনা)	রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য	১০৩
মাঝরাত (কবিতা)	নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৪
বহুমাত্রা (গল্প)	সরিৎ শর্ম্মা	১০৫
অসীম বন্ধু (কবিতা)	বিমলকুমার ঘোষ	১০৯
পাখিটা	শ্রীভূষণ চাকী	১১২
বিশ্বাবর্ত		১১৩

বি, এ, ও বি, কম্ ছাত্র যাঁহারা বাংলায় অর্থ বিদ্যা পড়িতে চান তাঁদের জন্য

অর্থ বিদ্যার গোড়ার কথা

(General Economics)

শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘোষ

একটী অপরিহার্য বই। মূল্য—৮৷৷০

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, (দোতলায় ২৭নং ঘর) কলিকাতা-৬।

সূচীপত্র

শ্রুতশ্রী । আষাঢ় । ১৩৮৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বর্তমান প্রসঙ্গ		১১৭
বাঙ্ময়ীর রক্তাক্ত শপথ (প্রবন্ধ)	দময়ন্তী	১২৫
আষাঢ় (কবিতা)	গোপাল ভৌমিক	১৩৩
বালপাতাল (কবিতা)	মহুয়া দাশ গুপ্ত	১৩৪

সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ডক্টর মেঘনাদ সাহা	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১৩৫
উত্তর রঙ্গ (উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	১৪৯
পেইং গেষ্ট (গল্প)	মীরা সান্যাল	১৫৩
অপরাজিতা (কবিতা	গৌরীশঙ্কর দে	১৫৫
দুপুর (গল্প)	সুমিতা সেন	১৬৫
বিশ্বাবর্ত		

আমাদের তৈরী

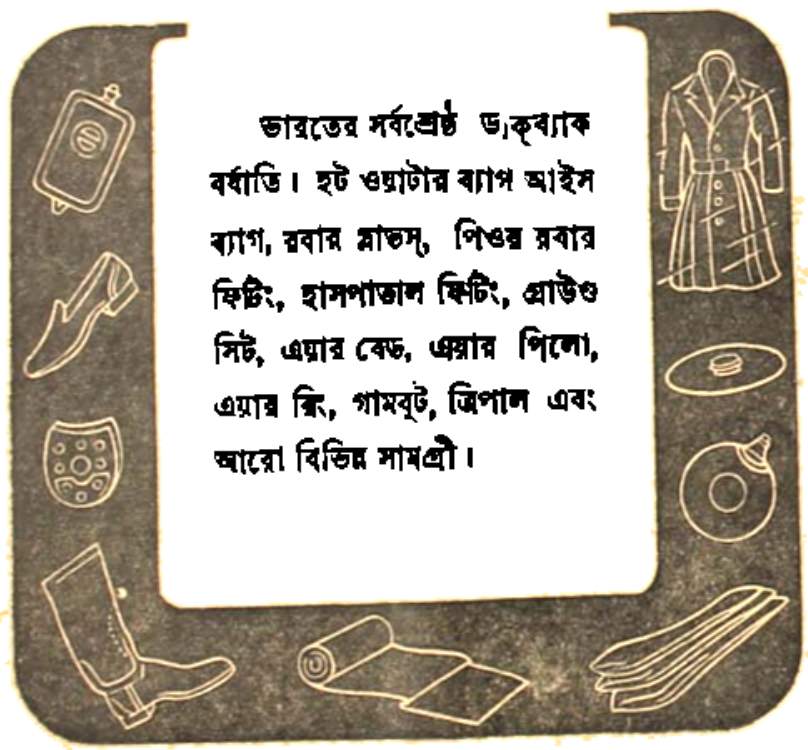

হেডঅফিস :—বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ লিঃ (১৯৪০)

৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৬।

শোরুম :—১২, চৌরঙ্গী, ৮৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

অগ্রহায়ণ । ১৩৮৫

CALCUTTA UNIVERSITY CENTENARY

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বর্তমান প্রসঙ্গ			১৩৭
কলিকাতার বেকার সমস্যা	(প্রবন্ধ)	ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন	১৪
চিঠি	(কবিতা)	কমল মুখোপাধ্যায়	১৮১
পশ্চিম এশিয়ার ঘটনা তরঙ্গ	(প্রবন্ধ)	দরোজ আচার্য্য	১৮৪
সে নেছে এ পথ ধরে	(কবিতা)	আশিস পাকাল	১৮৯
প্রলয়ঙ্কর পরমাণু	(প্রবন্ধ)	সমর গুহ	১৯০

সূচীপত্র

জয়শ্রী। শ্রাবণ। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম
মৃত্যু [illegible]		
[illegible]		শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
অতিলৌকিক প্রেমের যোগ	(গল্প)	দীপ্তি সান্যাল
[illegible]	(চরিত্র আলোচনা)	সত্যব্রত বসু
উত্তর রঙ্গ	(উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত
সাহিত্য-প্রীতি	(কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ বসু
ভাবনার অধিকার	(গল্প)	অমলেন্দু মিত্র

আমাদের তৈরী

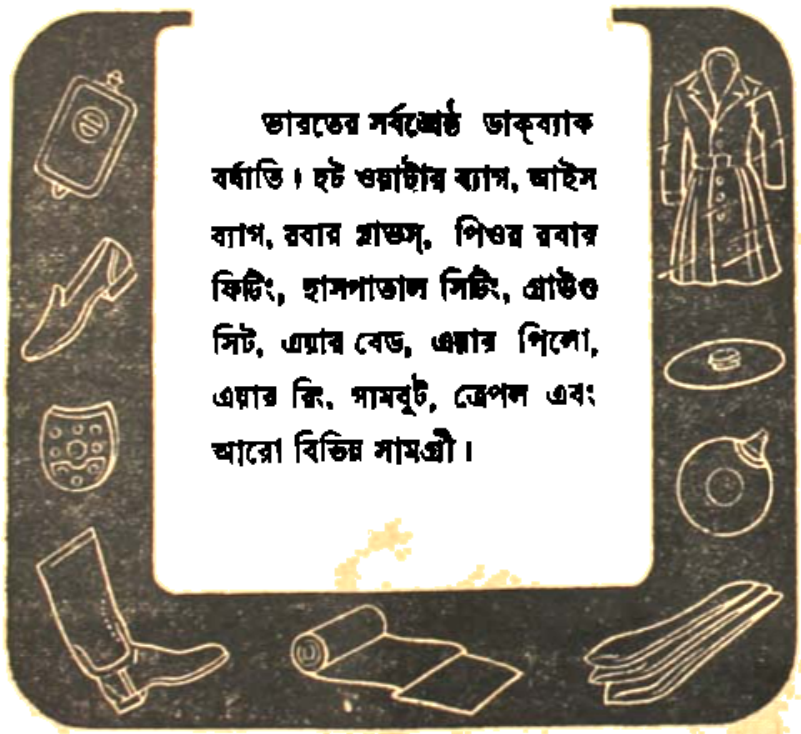

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্‌ব্যাক বর্ষাতি। হট ওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, রবার গ্লাভস্, পিওর রবার ফিটিং, হাসপাতাল সিটিং, গ্রাউণ্ড সিট, এয়ার বেড, এয়ার পিলো, এয়ার রিং, গামবুট, ত্রেপল এবং আরো বিভিন্ন সামগ্রী।

হেডঅফিস :—বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ

ওয়ার্কস্ (১৯৪০) লিঃ

৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৬।

শোরুম :—১২, চৌরঙ্গী, ৮৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

জয়শ্রী। ভাদ্র। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বর্তমান প্রসঙ্গ			২২৭
ভবানীপুর উপ-নির্বাচন	(প্রবন্ধ)	লীলা রায়	২৩২
বিস্মৃতি	(কবিতা)	সুনন্দা গুপ্ত	২৪০
ডাস্টবেড্‌ঢি	(চিত্র আলোচনা)	সত্যব্রত বসু	২৪৩

সূচীপত্র

ছাত্রশ্রী। ভাদ্র। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
উত্তর বঙ্গ	(উপন্যাস)	নীলিমা রায়গুপ্ত	২৫১
হে মৃত্যু, তবো না গর্ব	(কবিতা)	শোভন সোম	২৬২
অবরোধন	(গল্প)	মীরা দত্ত	২৬৩
পায়ভাগ	(কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	২৭১
অজগর	(গল্প)	অনরেন্দ্র সান্যাল	২৭২
পুস্তক পরিচয়			২৭৬
রূপকার	(কবিতা)	অলীমরুক্ষ দত্ত	২৮২

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬৲	বাংলার ঋষি	৩৲
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৪৷৹	বাংলার মনীষী	৷৷৹
ভারত-আত্মার বাণী	৫৲	বাংলার বিদুষী	২৷৹
বুদ্ধবাণী	৷৹	বীরত্বে বাঙালী	১৷৹
কর্মবাণী	১৷৹	ব্যায়ামে বাঙালী	
		বিজ্ঞানে বাঙালী	২৷৹
মণি বাগচির		রাজর্ষি রামমোহন	১৷৹
বিদ্যাসাগর	৭৲	রবীন্দ্রনাথ	১৷৹
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫৲	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১৷৹
নিবেদিতা	৪৲	আচার্য জগদীশচন্দ্র	১৷৹
গৌতম বুদ্ধ	৪৲	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১৷৹

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

শ্রীশ্রী। আশ্বিন। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
সূচীপত্র			৬৭
সংস্কৃতি		অতুল গুপ্ত	২৬৯
নিচ্চধনের নির্ব্বাসন	(কবিতা)	প্রমথনাথ বিশী	২৯৫
মহাভারতের কর্ণ	(চরিত্র চিত্র)	অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী	২৯৭
আলেখ্য ১৬	(কবিতা)	বিষ্ণু দে	৩০০
রাজসাক্ষী	(কবিতা)	আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	৩০১
বাংলার সাম্প্রতিক শিক্ষা-সঙ্কট		অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	৩০২
বৈদেশিক মুদ্রাসমস্যা ও স্বর্ণঋণ		ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন	
দেশ ও দেবী		ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত	
এ শুধু বালুকবেলা	(কবিতা)	অমলকান্তি ঘোষ	
পথের পাঁচালী	(কবিতা)	অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	
হুর্যোধ	(গল্প)	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী	
প্রশ্ন	(কবিতা)	নরেন্দ্র দেব	
সর্ব্বার্থ সাধনা	(কবিতা)	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
স্বীকারোক্তি	(কবিতা)	গোপাল ভৌমিক	
মল্লিকা	(গল্প)	সুশীল রায়	

সূচীপত্র

জয়শ্রী আশ্বিন ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বোম্বাই মাউন্টেনে পিকনিক	(গল্প)	দীপ্তি সান্যাল	৩৫৯
অর্ধোপার্জনে কলকাতায় মেয়েরা	(প্রবন্ধ)	শান্তি সেন	৩৬৮
কলকাতা প্রসঙ্গে	(প্রবন্ধ)	সুব্রতেশ বোষ	৩৭৩
সুস্বাদু	(সংলাপী রচনা)	ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র	৩৭৬
অষ্ট্রেলিয়ার চিঠি	(কথা রচনা)	সুনন্দা ঘোষ	৩৮১
বেদান্তর	(কবিতা)	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৪
সোনালী সকাল	(কবিতা)	শিবদাস চক্রবর্তী	৩৮৬
কৃষ্ণচন্দ্র রামনাথ বিশ্বাস	(স্মৃতিচিত্র)	যোগেশচন্দ্র বাগল	৩৮৭
ফোরা সাইমন	(গল্প)	অমরেন্দ্র সান্যাল	৩৯৫
ঈশ্বরপ্রসন্ন সেন ও বাঙলা সাহিত্য	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	৩৯৯
যে নদী সমুদ্রে সেদ	(কবিতা)	মচিকেতা ভট্টাচার্য	৩৮৪

সূচীপত্র

জয়শ্রী। আশ্বিন। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
আপন প্রিয়	(কবিতা)	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৩৮৩
অনুত্তমা	(গল্প)	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৮৭
শিল্পিত	(কবিতা)	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	৩৯৪
আমাদের খাদ্য সমস্যা	(প্রবন্ধ)	ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু	৩৯৫
ফস্‌ফোরেসেন্স	(গল্প)	সমরেশ বসু	৪০০
পৃথিবীকে	(কবিতা)	অমিরুদ্ধ রায়চৌধুরী	৪০৮
কোন এক মৃত্যুর পরমুহূর্তে	(কবিতা)	মনঃশঙ্কর দাশগুপ্ত	৪০৯
কর্ণাটক রাসকুট কবিপুরন্দরের উপদেশামৃত	(প্রবন্ধ)	ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৪১০
শিল্পকলায় সুরুচি	(প্রবন্ধ)	মীরা দত্ত	৪১৩

আমাদের তৈরী

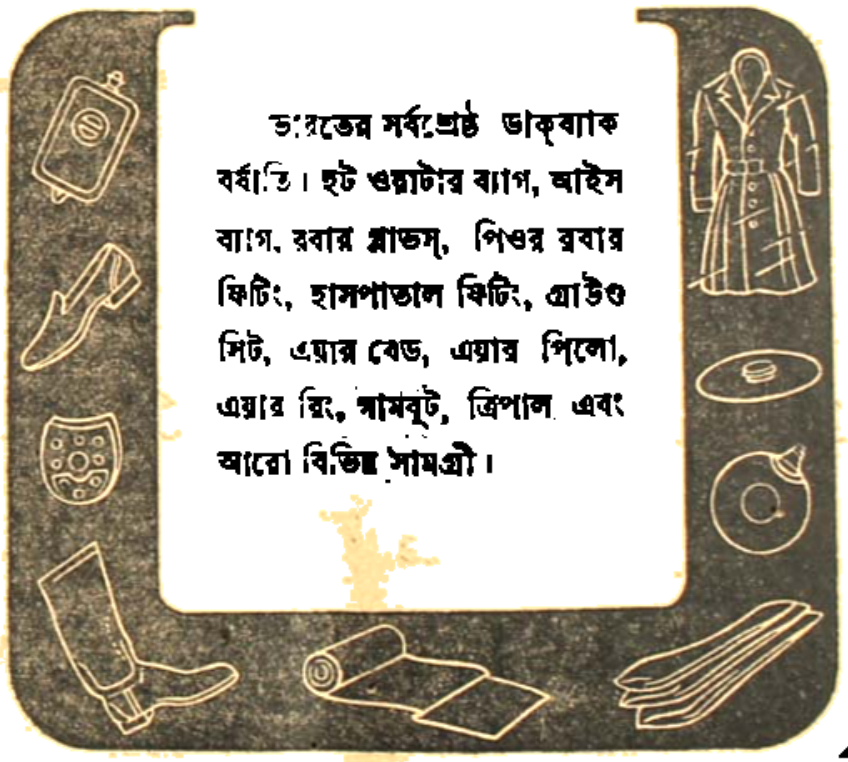

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্ লিঃ (১৯৪০)

হেড অফিস :—৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৩।

শোরুম :—১২, চৌরঙ্গী, ৮৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

বোম্বে ব্রাঞ্চ অফিস ও শোরুম :—৩৭৭, দাদাভাই নৌরজী রোড, বোম্বে।

সূচীপত্র

জয়শ্রী। আশ্বিন। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
শুভদৃষ্টি	(গল্প)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৪১৬
বেলা শেষ	(কবিতা)	নবনীতা দেব	৪২২
সুখের বেদনা	(কবিতা)	হরেন্দ্র সিংহ	৪২৩
বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও সমাজ পরিস্থিতি	(প্রবন্ধ)	নারায়ণ চৌধুরী	৪২৪
কে বিচারিণী কলিকাতা	(সমাজ চিত্র)	সাধনা সোম	৪২৯
প্রতীক্ষা	(কবিতা)	মীরা সান্যাল	৪৩৪
প্রত্যর্পিত	(রস রচনা)	কুমারলাল দাশগুপ্ত	৪৩৫
জীবন যানের বৈষম্য সৃষ্টিতে চলচ্চিত্র	(প্রবন্ধ)	পঙ্কজ দত্ত	৪৪০
সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল	(প্রবন্ধ)	সুনন্দা দাশগুপ্ত	৪৪৩
মূল্যই না বোঝে ?	(প্রবন্ধ)	বিভা সরকার	৪৪৮
কেমন করে যে তুমি	(কবিতা)	সুনীল গুহ	৪৫০

Space donated by

Calcutta Industrial Chemicals & Minerals Co.

Private Limited

43, DHARAMTALLA STREET, CALCUTTA-13.

Phone : 24-1004 & 24-1005.

সূচীপত্র

জয়শ্রী। কার্তিক। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
গান্ধী ও বিপিনচন্দ্র		নির্মলকুমার বসু	৪৫৩
বর্তমান প্রসঙ্গ			৪৫৭
ডস্টয়েভ্স্কী	(আলোচনা)	সত্যব্রত বসু	৪৬৭
অনেক দূরে গিয়ে	(কবিতা)	যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৬
না	(গল্প)	মীরা সান্যাল	৪৭৭
উপলব্ধি	(কবিতা)	মাণিক মুখোপাধ্যায়	৪৭৯
স্মৃতির মোনাকি	(কবিতা)	সুপ্রান্ত ঘোষ	৪৮০
এতটুকু বাসা	(গল্প)	শক্তিপদ রাজগুরু	৪৮১

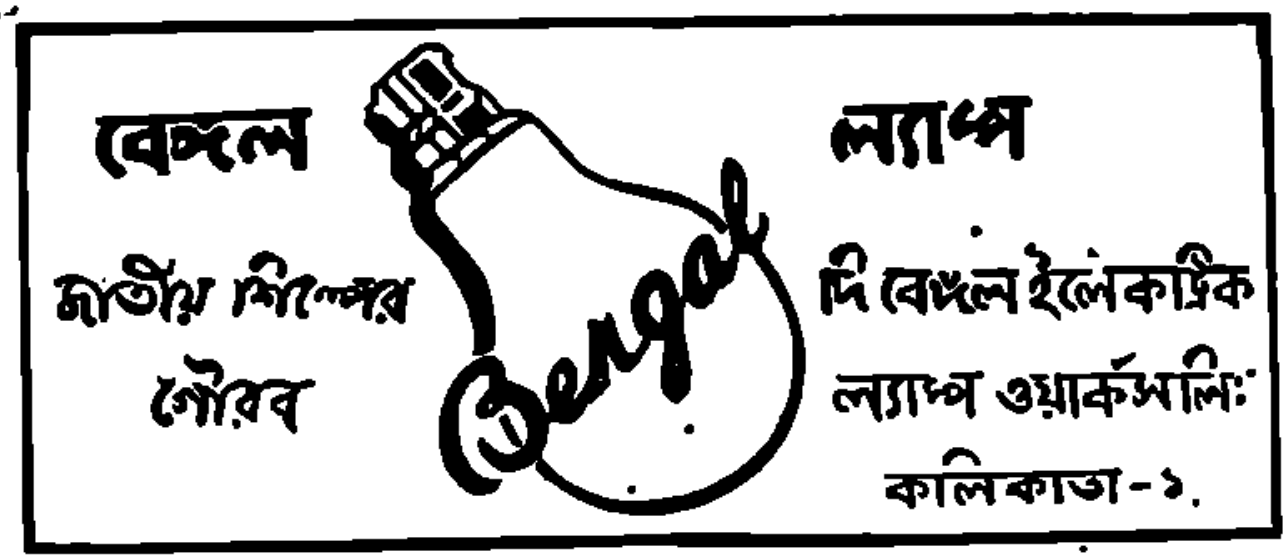

সূচীপত্র

জয়শ্রী। কার্তিক। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
পট	(কবিতা)	শ্রীতিভূষণ চাকী	৪৮৮
উত্তরণ	(উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৪৮৯
বর্ণালী বুদ্বুদ	(কবিতা)	সুধীর মুখোপাধ্যায়	৪৯৪
নাট্যকার ওনীল ও আধুনিক আমেরিকা	(প্রবন্ধ)	অধীর মল্লিক	৪৯৭
একটি ব্যর্থ কাহিনী	(কবিতা)	প্রভাকর মাঝি	৫০২
বিশ্বাবর্ত			৫০৪

সূচীপত্র

জয়শ্রী। অগ্রহায়ণ। ১৩৬৫

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
জগদীশচন্দ্র	নলিনীকান্ত গুপ্ত	৫০৭
আচার্য জগদীশচন্দ্র	বিমলেন্দু মিত্র	৫১১
বর্তমান প্রসঙ্গ		৫১৫
ভারত ও গণতন্ত্র একেশ্বরবাদ	অন্নদাশঙ্কর রায়	

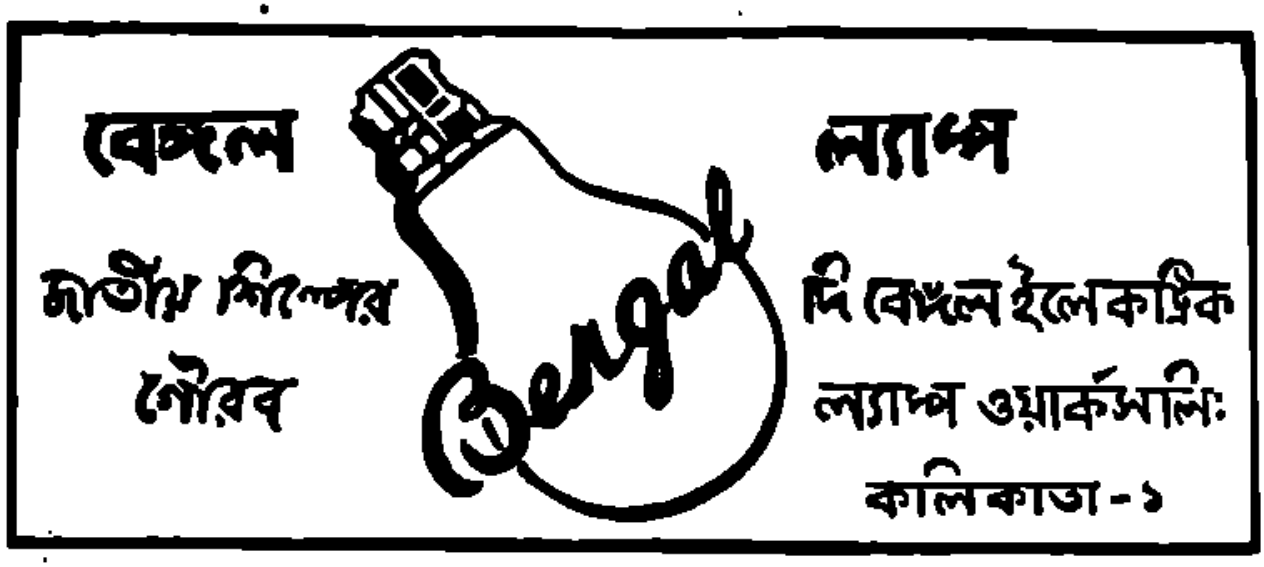

অনিল রায় প্রণীত **নেতাজীর জীবনবাদ** দাম—১।০

অনবদ্য ভাষায় নেতাজীর জীবনদর্শনের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ।

প্রাপ্তিস্থান—জয়শ্রী অফিস ৭৭এ রাসবিহারী এভিন্যু কলিঃ—২৬

এজেন্ট চাই

ভারতবর্ষের বিশেষ বাঙলার সর্বত্র জয়শ্রীর স্থায়ী গ্রাহক ও মাসিক বিক্রয়ের জন্য মাহিনা ও কমিশনের ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলা এজেন্ট প্রয়োজন। শিক্ষা, বয়স, পূর্ব অভিজ্ঞতা, সিকিউরিটি দিতে সক্ষম কিনা ইত্যাদি সকল তথ্য ও স্থানীয় দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ সহ, নিম্নতম বেতন উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করুন।

প্রচার-অধ্যক্ষ : জয়শ্রী ; ৭৭এ, রাসবিহারী এভিন্যু, কলিঃ-২৬।

সূচীপত্র

জয়শ্রী। অগ্রহায়ণ। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
চিত্রপট	(কবিতা)	সুনান্ত ঘোষ	৫৩০
উত্তররঙ্গ	(উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৫৩১
শীতের প্রার্থনা	(গল্প)	অমরেন্দ্র সান্যাল	৫৪০
আলেখ্য	(কবিতা)	গৌরীশঙ্কর দে	৫৫০
আমার দেখা কয়েকজন		শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৫৫১
ভল্টচেঙ্গী		সত্যব্রত বসু	

সূচীপত্র

জয়শ্রী। পৌষ। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বর্তমান প্রসঙ্গ			৫৬৭
গণতন্ত্রের বাধা ও ক্লাসিজমের মোহ	(প্রবন্ধ)	প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়	৫৭১
অসমাপ্ত	(কবিতা)	পুলক আঢ্য	৫৮০
পুনরাবৃত্তি	(গল্প)	সুব্রতেশ ঘোষ	৫৮৪
যন্ত্রণা	(কবিতা)	মাণিক মুখোপাধ্যায়	৫৯০
উত্তরায়ণ	(ধারাবাহিক উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৫৯১
আষাঢ়ের শীত ও বসন্ত	(কবিতা)	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	৬০৮

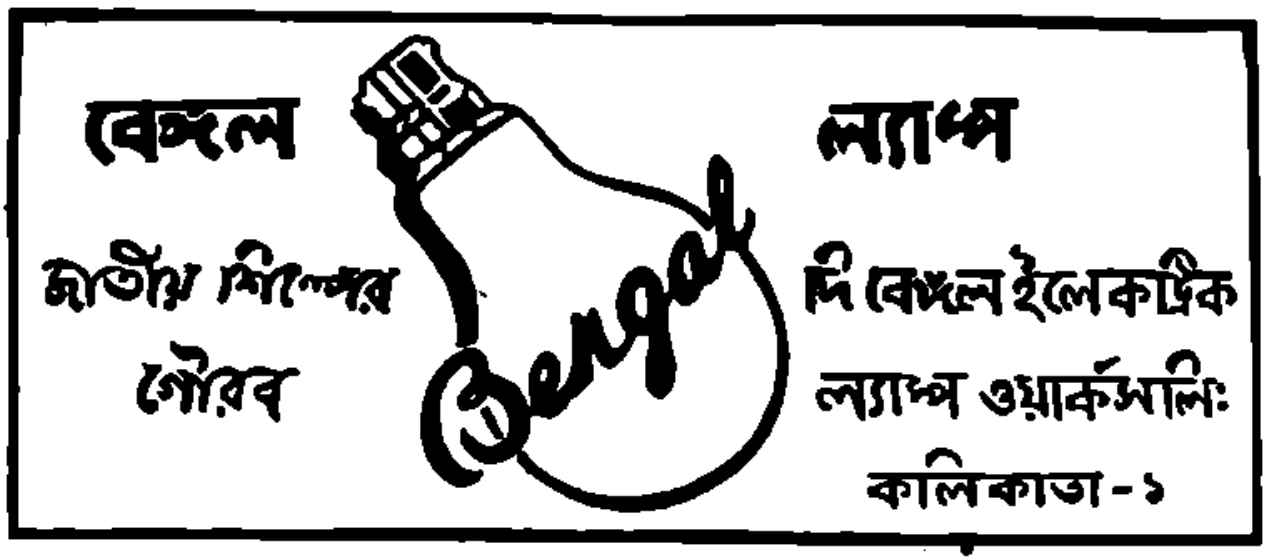

অনিল রায় প্রণীত নেতাজীর জীবনবাদ দাম—১।০

অনবদ্য ভাষায় নেতাজীর জীবনদর্শনের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ।

প্রাপ্তিস্থান—জয়শ্রী অফিস ৬১এ রাসবিহারী এভিন্যু কলিঃ—২৬

এজেন্ট চাই

ভারতবর্ষের বিশেষ বাঙলার সর্বত্র জয়শ্রীর স্থায়ী গ্রাহক ও মাসিক বিক্রয়ের জন্য মাহিনা ও কমিশনের ভিত্তিতে পুরুষ ও মহিলা এজেন্ট প্রয়োজন। শিক্ষা, বয়স, পূর্ব অভিজ্ঞতা, সিকিউরিটি দিতে সক্ষম কিনা ইত্যাদি সকল তথ্য ও স্থানীয় দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ সহ, নিম্নতম বেতন উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করুন।

প্রচার-অধ্যক্ষ : জয়শ্রী ; ৬১এ, রাসবিহারী এভিন্যু, কলিঃ-২৬।

সূচীপত্র

জয়শ্রী। পৌষ। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
চিঠি	(গল্প)	সনাতন মণ্ডল	৬০১
পশু মানব	(কবিতা)	শকুন্তলা চক্রবর্তী	৬০৩
পাশ্চাত্যের চোখে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা	(প্রবন্ধ)	শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়	৬০৪
হে ঈশ্বর	(কবিতা)	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	৬০৬
শীতের প্রার্থনা	(ভুল সংশোধন)	অমরেন্দ্র সান্যাল	৬০৭
ভল্টারেস্কী		সত্যব্রত বসু	৬১১
আমার দেখা কয়েক জন		যোগেশচন্দ্র বাগল	৬১৯
পুস্তক পরিচয়			৬২৫

সূচীপত্র

জয়শ্রী। মাঘ। ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
আমার দেখা কয়েকজন	(স্মৃতিচারণ)	যোগেশচন্দ্র বাগল	৬৪৫
পেছিয়ে পড়া দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা	(প্রবন্ধ)	সুব্রতেশ ঘোষ	৬৫১
শনিবারের সন্ধ্যায়	(বড় গল্প)	শচীন্দ্রনাথ বসু	৬৫৮
১৩শে জানুয়ারী	(কবিতা)	হেমেন্দ্রলাল রায়	৬৬৬
উত্তরঙ্গ	(উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৬৬৭
বড় ঘরের মেয়ে	(অনুবাদ গল্প)	ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়	৬৭২
ভল্টারেন্ড ফি		সত্যব্রত বসু	৬৮০
অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের রজত জয়ন্তী-প্রদর্শনী	(আলোচনা)	মীরা দত্ত	৬৮২
বিশ্বাবর্ত			৬৮৫
বর্তমান প্রসঙ্গ			৬৮৯

Aristotle had once described his pupil, Alexander the Great, as many in one : man of action, man of logic, romantic dreamer, believer in magic and so on. Like Alexander, we too have become many in one. At birth, we were christened Textile Machinery Corporation Limited, or makers of textile machinery, and over the years we have made many such machines. But we did not stop here. The 4,500 strong Texmaco, today manufactures a wide range of engineering products—cotton and jute textile machinery, industrial and locomotive boilers, pressure vessels, steel structurals, railway rolling stock, paper mill machinery, steel castings and so on. With the implementation of our new projects, now under way, we would become yet many more in one. Whatever Alexander did, he was inspired by the thought of adding fresh glory to the name of Macedon. Whatever we might do, there is a single aim that drives our activities—the proper utilisation of all our resources, to manufacture quality machinery—machinery to help India industrialise and bring prosperity to her teeming millions.

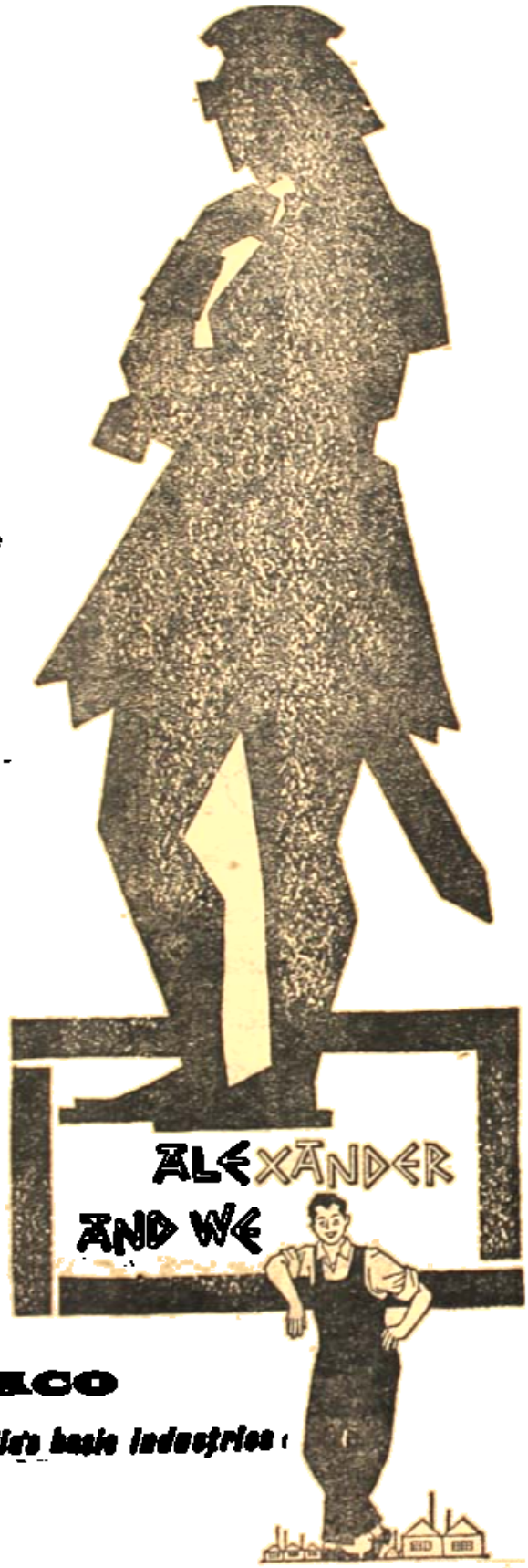

TEXMACO

serves India's basic industries

সূচীপত্র

জয়শ্রী। ফাল্গুন ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বর্তমান প্রসঙ্গ		সম্পাদকীয়	৬১৫
বসন্তবন্যা	(কবিতা)	সুনন্দা দাশগুপ্ত	৭০৪
ডাঃ কিতাগো	(উপন্যাস)	অনুবাদক : সত্যব্রত বসু	৭০৬
তোমাকে হারাই	(-কবিতা)	প্রফুল্ল কুমার দত্ত	৭১০
আমার দেখা কয়েকজন	(স্মৃতিচারণ)	যোগেশচন্দ্র বাগল	৭১১

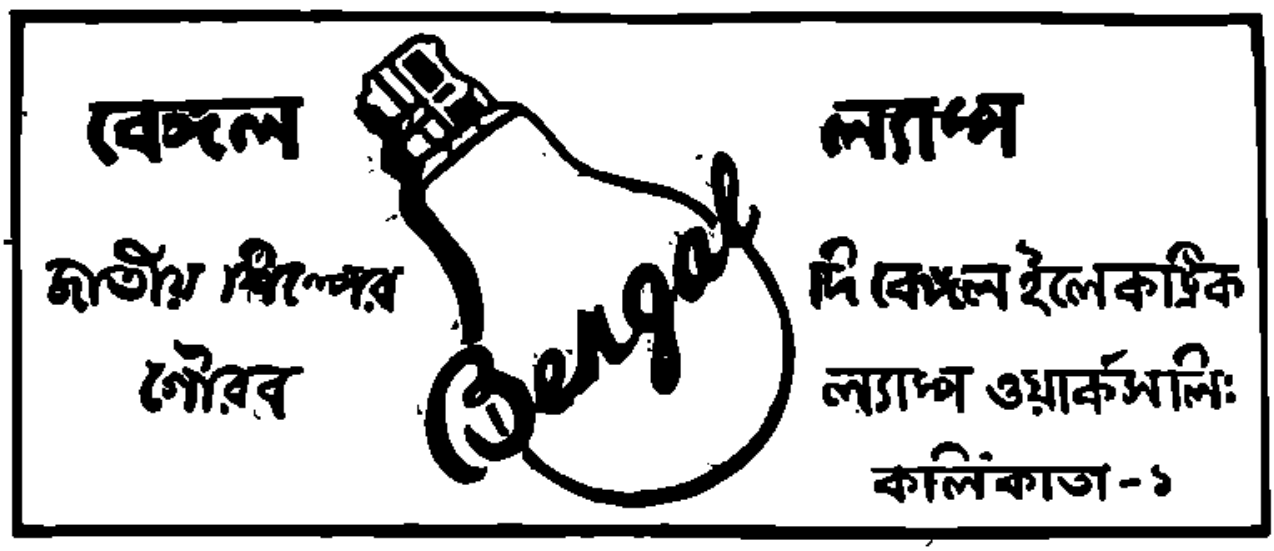

অনিল রায় প্রণীত নেতাজীর জীবনবাদ দাম—১।০

অনবদ্য ভাষায় নেতাজীর জীবনদর্শনের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ।

প্রাপ্তিস্থান—জয়শ্রী অফিস ৬১৫ রাসবিহারী এভিন্যু কলিঃ—২৬

সূচীপত্র

জয়শ্রী। ফাল্গুন ১৩৮৫

শুক শুকুর	(কবিতা)	মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	৭১৮
শনিবারের সন্ধ্যায়	(বড় গল্প)	শচীন্দ্রনাথ বসু	৭১৯
পরিত্রাণ	(গল্প)	সুনীল গুহ	৭৩০
প্রজাপতি	(কবিতা)	মীরা সান্যাল	৭৩৪
উত্তরণ	(উপন্যাস)	নীলিমদাশগুপ্ত	৭৩৫
অনুসর	(কবিতা)	অবিনাশ রায়	৭৩৮
উচ্চাঙ্গের বাংলা গান	(প্রবন্ধ)	অমদেব রায়	৭৩৯
ডন্টরেন্ড্রি		সত্যব্রত বসু	৭৪৫
জলছবি	(কবিতা)	প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৪৯
বিশ্বাবর্ত্ত			৭৫৩

সূচীপত্র

জয়শ্রী। চৈত্র ১৩৬৫

বিষয়		লেখকের নাম
বর্তমান প্রসঙ্গ		সম্পাদকীয়
পৌত্তলিক	(কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ
ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য
এক বসন্তের পর	(কবিতা)	বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
তা: কিস্তাগো	(উপন্যাস)	অনুবাদ : সত্যব্রত বসু

অনিল রায় প্রণীত নেতাজী জীবনবাদ দাম—১।০

অনবদ্য ভাষায় নেতাজীর জীবনদর্শনের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ।

প্রাপ্তিস্থান—জয়শ্রী অফিস ৪৭এ রাসবিহারী এভিন্যু কলিঃ—২৬

সূচীপত্র

জয়শ্রী। চৈত্র ১৩৬৫

আমার দেখা কয়েকজন	(স্মৃতিচারণ)	যোগেশচন্দ্র বাগল	৭৭৯
ফেরে	(কবিতা)	মলয়শংকর দাশগুপ্ত	৭৮৮
উত্তররঙ্গ	(উপন্যাস)	নীলিমা দাশগুপ্ত	৭৮৯
ফেরারী সময়	(কবিতা)	সৈয়দ হোসেন হালিম, (সাহিত্য-রত্ন)	৮০২
শনিবারের সন্ধ্যায়	(বড় গল্প)	শচীন্দ্রনাথ বসু	৮০৪
যদি গড়ে দিতে পার	(কবিতা)	গৌরীশঙ্কর দে	৮০৯
মনো অভিলাষ	(কবিতা)	দেবব্রত বিশ্বাস	৮১০
বিশ্বাবর্ত		বিদ্যুৎ	৮১১
পুস্তক পরিচয়			৮১৫

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়ন্তী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩৬৫

মহাকবি

মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মহাকাব্যের অবদানে জীবন-মূল্যের যে সুরধুনী উৎসারিত, যুগযুগ ধরে তারই প্রাণধারায় সিঞ্চিত হয়েছে ভারতের জীবন-ধর্ম। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পরে রবীন্দ্রনাথই সেই মহাকবি যিনি ভারতের চিরন্তনী মূল্যবোধকে নতুন যুগের, নতুন আঙ্গিকে, নতুন করে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

সাহিত্যের প্রচলিত সংজ্ঞায় রবীন্দ্র রচনা মহাকাব্য নয়। রবীন্দ্র কাব্যের প্রধান প্রকাশ ভাব-তরঙ্গে ; এবং সেই ভাবতরঙ্গের সুর ও ব্যঞ্জনা খণ্ড হয়েও অখণ্ড, বিচ্ছিন্ন হয়েও অবিচ্ছিন্ন, বিচিত্র হয়েও অনন্ত। বিচিত্র ভাব তরঙ্গের মধ্যে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণ প্রবাহ অনন্ত তারই অবদানে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের কবি হয়েও এক অখণ্ড-ভাব সত্তার মহাকবি।

বাল্মীকি ও বেদব্যাসের যুগে ভারতের জীবনধর্ম ছিল সবল। প্রাণের আবেগে জীবন সেযুগে প্রবল হয়ে উঠেছে। বহু ও বিচিত্র রসে জীবনের অনুভূতি নন্দিত হয়ে উঠেছে, শক্তি ও সৌন্দর্যে এনেছে প্রাণের প্রাচুর্য। এই প্রাচুর্য জীবনে এনেছে জটিল সমস্যা, আনন্দের সঙ্গে সৃষ্টি করেছে বেদনার প্রতিধ্বনি, সুখের সঙ্গে দুঃখের ছায়া। কিন্তু তবু সেযুগের জীবনধর্ম প্রাণের আবেদনকে অস্বীকার করে নেতিবাদী পথ বেছে নেয়নি। প্রাণের ধর্মকে প্রবাহিত করেছে আত্মার ধর্মে। প্রাণ প্রবল হয়েও আত্মার অমৃতরসের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়নি।

মধ্যযুগে ভারত—প্রাণ ও আত্মার এই সমন্বয় ধর্মকে বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছিল। যদিও ভারতে কাব্যপ্রবাহের ধারা কোনো দিনই বিশুষ্ক হয়নি। যুগে যুগে কত কবি মনের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে কত অজানা ভাবতরঙ্গের অপরূপ প্রকাশে রসগ্রাহী মনকে বিচিত্র অনুভূতিতে নন্দিত করেছে। কিন্তু মধ্যযুগের কাব্য-প্রবাহ বাল্মীকি ও ব্যাসযুগের জীবনধর্ম, তার সমন্বয়ী আবেদন বহুলাংশে বিস্মৃত হয়েছিল। মধ্যযুগের কাব্য ধর্মে কখনও নেতিবাদী সুর হয়েছে প্রবল, কখনও ভোগবাদী আবেদন হয়েছে অত্যুগ্র। প্রাণধর্মকে অস্বীকার করে মধ্যযুগে কাব্য প্রতিভা কখনও নেতিবাদী পথে চেয়েছে অমৃতের সন্ধান। আবার প্রাণধর্মের প্রবলতায় কখনও প্রাণকেই করেছে জীবনসর্বস্ব। কাব্য হয়েছে তাই ভোগধর্মী।

ভারতের চিরন্তনী জীবন মূল্যের আবেদন, এযুগের নূতন আঙ্গিকে, নূতন জীবন-সঙ্গীত শোনার জন্য ভারত যেন বহুকাল ধরে উৎকর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর ভুবন ভোলানো বীণাখানি নিয়ে। এ

বীণায় ঝংকৃত হল অপূর্ব সুর—প্রাণের রসে প্রবল, অমৃতের আমন্ত্রণে সুস্নিগ্ধ। সে কী বিচিত্র কাব্য সম্ভার, কী সূক্ষ্ম তার অভিব্যক্তি, ভাব পরিক্রমার বিস্তৃতি কী বিশাল। মানব মনের অনন্ত অনুভূতি যে কী বিচিত্র রসবোধে এমন প্রাণস্পন্দী আবেদন সৃষ্টি করতে পারে, প্রকৃতির অতি সামান্য প্রকাশ যে কী অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, অতি পরিচিতও যে কত অজানা অনুভূতির সন্ধানে চিত্তকে চমকিত করতে পারে—জীবন ও প্রকৃতির অনন্ত সম্ভাবনা ও অনন্ত প্রকাশে জীবনে যে কী অনন্ত মাধুর্য্যের রসধারা নিরন্তর প্রবাহিত হতে পারে, রবীন্দ্রকাব্য যেন তারই নৈবেদ্য সাজিয়ে জীবন-দেবতার পূজার উপাচার প্রস্তুত করেছে সকলের জন্য।

রবীন্দ্র-কাব্য প্রাণকে অস্বীকার করেনি—অমৃতের সন্ধানে প্রাণের সহজ প্রবাহকে নেতিবাদের মরুচারণে নির্বাসিত করেনি। আবার প্রাণের উল্লাসে জীবনকে স্থূল ভোগবাদের পঙ্কে আবিল করেও দেয়নি। যে বিচিত্র ভাবতরঙ্গ অবিরাম মনের সমুদ্রে ওঠে পড়ে, জীবনের সহস্র অনুভূতি যে সুরে কত সুমধুর অনুরাগে, কত বিচিত্র আনন্দ-বেদনায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে—রবীন্দ্রনাথ সেই বিচিত্ররূপিনীকে অস্বীকার করেননি। রাত্রির মহাকাশে বিচিত্র রূপ-সজ্জায় প্রতিটি জ্যোতিষ্ক যেমন আপন আপন প্রকাশে স্বতন্ত্র, তেমনি রবীন্দ্র কাব্য-কুঞ্জের প্রতিটি কাব্যকুসুম আপন আপন মাধুর্য্যে বিশিষ্ট। রাত্রির আকাশের আপাত-বৈচিত্র্য যেমন একটি অনন্ত সুরচ্ছন্দের বন্ধনে অবিচ্ছিন্ন, রবীন্দ্রকাব্যের বিচ্ছিন্ন ও বিচিত্র ভাব-তরঙ্গও তেমনি একটি মহাভাব প্রবাহের জাহ্নবী ধারায় অখণ্ড। রবীন্দ্র কাব্যের, রবীন্দ্র জীবনদর্শনের এই অখণ্ড পূর্ণ-রূপ-দর্শন ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। কবি, ঔপন্যাসিক, সুরকার, কলাবিদ, শিল্পী, দার্শনিক—প্রতিটি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভা অনন্য ও অপূর্ব। কিন্তু এরূপ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে রবীন্দ্র প্রতিভার, রবীন্দ্র মহাকাব্যের পরিচয় পূর্ণ নয়; রবীন্দ্র কাব্যের আন্তঃসলিলা ভাবধারার অখণ্ড সত্তায় রবীন্দ্রজীবনদর্শনের যে অনুভূতি, তার রসমাধুর্য্যে রবীন্দ্র কাব্যসুধার আস্বাদনে যে অমৃতের স্পর্শ মেলে তাই রবীন্দ্রমহাকাব্যের যুগোত্তর মহাবাণী।

রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন একটি অখণ্ড কবিতা—অগণিত রসস্নিগ্ধ বাক্যের একটি বিচিত্র ভাব সমন্বয়। সঙ্গীতের বিচ্ছিন্ন লয়ে, খণ্ডিত স্বরগ্রামে যে ভাবপ্রবাহের অখণ্ড অভিব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মও তেমনি প্রাণ ও আত্মার ধর্মের সমন্বয়ে এক অবচ্ছিন্ন অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্ম নেতিবাদী নয়, আবার ভোগবাদীও নয়—প্রাণ ও আত্মার সমন্বয়ে যোগবাদী। এই যোগবাদের অনুভূতিতে অমৃতের আস্বাদন—বেগ ও প্রাবল্যের আমন্ত্রণে চির প্রবহমান হয়েও অনন্তের সন্ধানে জীবনধর্মের আবেদন—রবীন্দ্রমহাকাব্যের এই যুগধর্মী বাণী। ভারত যদি রবীন্দ্র-কাব্যের এই প্রাণ ও আত্মার যোগরূপকে অনুধাবন করে বলিষ্ঠ জাতীয় জীবন-ধর্ম রচনা করতে পারে তবেই ভারতের মাটিতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সার্থক হয়ে উঠবে।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫।

মূল্যবান সংখ্যা

একটী রবীন্দ্র জন্মোৎসব

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী

গুরুদেব যেমন সকলের আনন্দের জন্য,—ব্যক্তিবিশেষের মতে—কবিতা লিখিতে পারিতেন তেমনি সকলের সঙ্গে মিলিতেও পারিতেন। আমরাও সেই সুবিধা অনেক গ্রহণ করিয়াছি। সময়ে সময়ে আমাদের বিচিত্র আলোচনার কথা ভাবিয়া মনে মনে হাসিয়াছি। অন্যের সম্বন্ধে যেখানে আমরা মন্তব্য করিয়াছি ইহা একটা খেয়াল, তাঁহার মত লোক সম্বন্ধে আমাদিগকে সেখানে বলিতে হয় 'ইহা তাঁহার লীলা'। গাছের উপরে কয়েকদিন বাস করিবেন, আমাদের মত কোন লোক কি কল্পনাও করিতে পারে গুরুদেবের পক্ষে ইহাও একদিন সম্ভব হইয়াছিল। সে সময় শ্রীনিকেতনে একটি জাপানী ছুতার মিস্ত্রী ছিলেন। ছুতার মিস্ত্রী ছিলেন বেশ ভাল। গুরুদেবের ইচ্ছা হইল তিনি কয়েকদিন গাছের উপরেই থাকিবেন, স্নান, আহার, ভোজন প্রভৃতি সমস্তই তিনি ঐ গাছেই করিবেন—ওখান হইতে তিনি নামিবেন না। যাহাতে এইরূপ একটি পাখীর মত বাসা তিনি পাইতে পারেন—সেই জাপানী মিস্ত্রী তাহা করিয়া দিবে। গুরুদেব মহা খুসী। তিনি আসিয়া সেই বাসা গ্রহণ করিলেন। দিন দুই তিনি সেখানেই ছিলেন। গুরুদেবের মনের মধ্যে যখন যাহা হইত তাহা প্রকাশ পাইত তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণের সংসর্গে। যেমন নন্দলালবাবু, সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের সান্নিধ্যে, কলাবিষয়ের নানা সৃষ্টিতে, আমিও কখন কখনও এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পড়িতাম। এইসব সময়ে আলোচনায় আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকিতাম গুরুদেবের জন্মতিথিতে আমরা উৎসব করিতাম। সেই উৎসবের প্রকৃতি লইয়া কত আলোচনা চলিত কোন কোন সময়ে প্রাচীন আদর্শে ইহা করিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি এবং আমাদের আর সকল বন্ধু সানন্দে অনুমোদন করিতেন। উহাদের একটি হইতেছে পঞ্চবটী রোপণ। বলা বাহুল্য ইহার এবার উদ্যোগের ভার আমাকেই লইতে হইয়াছিল। ঐ উৎসবে আমি যেরূপ যাহা নির্দেশ করিয়াছিলাম তাহাই গুরুদেবের অনুমোদনে সকলকে অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। যেমন আমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম—সেদিন কেহই জামাজোড়া গায়ে না দিয়া উপযুক্ত বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া উৎসবে সমবেত হইবেন। এবং গুরুদেবকেও আমি এক গৈরিক পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় মাত্র ধারণ করাইয়াছিলাম। গুরুদেব তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই, বরং আনন্দিত

হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে গুরুদেব কখনই এইরূপ জামাজোড়া ছাড়া পোষাক করেন নাই, আমি বলিতে পারি উৎসবের মধ্যে এই আদেশ প্রবর্তন করার জন্য আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ং গুরুদেব তাহা স্বীকার করিয়া লওয়ায় মুখ ফুটিয়া কেহ কোন আপত্তি করিতে পারেন নাই। গুরুদেব এই শুভ্র গৈরিক বসনযুগল ধারণ করিয়া চন্দন চর্চ্চিত দেহে উৎসব সভায় উপবিষ্ট হইলে তাঁহার যে কী অপূর্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের চক্ষুই বুঝিতে পারিয়াছিল। এখন আসল উৎসব ছিল পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা। ইহা একটি পুণ্যকার্য্য যাঁহারা হিন্দুধর্ম, হিন্দু সমাজের নানা ধর্ম অনুষ্ঠানের প্রাচীন আদর্শের খবর রাখেন তাঁহারা ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের বিশ্বকোষস্বরূপ 'চতুর্বর্গ চিন্তামনি' নামক (ইহা ছাপা হইয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে) গ্রন্থখানি পড়িলে জানিতে পারিবেন। পাঠকেরা উহাতেই জানিতে পারিবেন সমাজে বৃক্ষে কী উপকারিতা আছে এবং কিরূপে তাহা সম্পাদন করিতে পারাযায়। পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা ঐ সমস্ত বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার একটি। কিন্তু এখানে পঞ্চবটী বলিতে পাঁচটি বটগাছ নয়। পাঁচটি বিভিন্ন বৃক্ষ। যথা—বট, অশ্বত্থ, ধাত্রী (আমলকী), বিল্ব ও অশোক। এই পাঁচটি বৃক্ষকে পারিভাষিক ভাবে পঞ্চবটী বলা হইয়া থাকে।

উৎসবের দিন পঁচিশে বৈশাখ বড় প্রাতে সস্ত্রীক আমি উত্তরায়ণে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গুরুদেব চেয়ারে বসিয়া আছেন, বৌমা শ্রীমতী প্রতিমাদেবী তাঁহাকে চন্দন পরাইয়া দিয়াছেন। গুরুদেব আমাকে বলিলেন—'কেমন হইয়াছে তো?' আমি কোথায় কী হওয়া উচিত ছিল ও ছিল না বলিলাম, গুরুদেব বৌমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'বৌমা শাস্ত্রী মশায় বলছেন কিছু ত্রুটি আছে, এগুলো সংশোধন করা চাই।' বৌমা আসিয়া সে সব ঠিক ঠাক করিয়া দিলেন।

স্থান হইতে উৎসব সভার কাজ পর্যবেক্ষণ করিয়া শঙ্খধ্বনির দ্বারা উৎসবের সূচনা করিলাম। সেদিন আমাদিগকে কী প্রয়োজন পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করিয়াছিল তাহা একটু বলা মন্দ নহে। যাঁহারা শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন তাঁহারা যে স্থানে গুরুদেবের বাড়ীটি (উত্তরায়ণ) সে স্থানে দাঁড়াইয়া উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিয়া, যদি ভাবিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিবেন দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোন পথিকের বিশ্রামের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান অথবা বৈশাখ-মধ্যাহ্নে দুই একটা গাই গরুর একটু ছায়ার প্রয়োজন কতখানি! পক্ষীদের কথা আর নাই বলিলাম। এই সবভাবিয়া বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার দ্বারা গুরুদেবের জন্মোৎসব পালন করিবার ইচ্ছা করি।

সভায় উপস্থিত সহস্রজনকে যথাযথভাবে উপবেশন করিবার অনুরোধ করিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যকে—যাঁহাদের অনুষ্ঠান কর্য্যে কিছু কিছু অংশ নিবার প্রয়োজন গুরুদেবের

বসাইলাম। অনুষ্ঠানটী সংক্ষেপে এইরূপ যে কার্য্য করিতে যাওয়া হইতেছে তাহার পরিণাম যে [illegible] তাহার সময় নির্বাচন যে উপযুক্ত হইয়াছে এবং সেই কার্য্যের সঙ্কল্প যে দৃঢ় সদস্যগণকে দিয়া তাহা প্রকাশ করান হইল। ইহার পরে বৃক্ষকয়টিকে স্থাপন করা হইল। গুরুদেবকে দিয়া যে কার্য্যটি করান হইল সেই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি ওখানে পড়িয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

পাম্বানাংচ পশুনাঞ্চ পক্ষীনাঞ্চ হিতেচ্ছয়া
এষা পঞ্চবটী রম্যা রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা।

এই শ্লোকটি একখানি শ্বেতশিলা ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া ঐ স্থানে স্থাপিত হইবে ইহাও উৎসব সভায় ঘোষণা করা হইয়াছিল। আমার দুর্ভাগ্য গুরুদেব জীবিত থাকিতে এই অতি সামান্য কার্য্যটুকু করা হয় নাই। শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ আমার প্রিয় ছাত্র। সে অতি সহজ সাধ্য এই কার্যটুকু করিলে আমাকে এক অপূর্ব আনন্দ দিতে পারিত। হতাশ হইয়া আমি ভাবিতেছিলাম—কে এখন ইহা করিবে। রথীন্দ্রনাথ দূরে। মনে হইতেছিল কল্যাণীয়া বৌমাকে (শ্রীমতী প্রতিমাদেবী) অথবা শ্রীমতী মীরাদেবী অথবা শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে (ভাইসচ্যান্সেলর) এ বিষয়ে লিখিব অথবা অনতি-বিলম্বে আমি নিজেই ঐ শ্লোকটি উৎকীর্ণ করাইয়া শান্তিনিকেতনে পঞ্চবটীতে স্থাপনের জন্য পাঠাইব।

কলিকাতা, এপ্রিল ১৯৪৮

"বিজ্ঞানে সত্যসাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন ক'রে মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধিলাভ করেছে সন্দেহ নাই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পশ্চিম-দেশ-বাসীরা নিজের অধ্যবসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করেছেন তাঁরা কেবল নিজেদের নয় সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ শক্তিদান করেছেন।

ভারতের যে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট হয়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটী বিশেষ দায়িত্ব ভারত-বাসীর আছে। যে সাধনার ধারা ভারতের চিত্ত-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহ বশতঃ লুপ্ত হোতে দিই, তা হোলে আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্যকে বঞ্চিত করব।"

শান্তিনিকেতন পৌষ ১৩৩০

প্রবন্ধ

চ. তু র ঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ রায়

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের সর্বোত্তম সৃষ্টি এ কথা বলা চলে না; কিন্তু রূপ-রীতি ও কলাকৃতির দিক থেকে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সবুজপত্রের প্রথম বর্ষের (১৩২১) অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত পরপর চারমাসে অ্যাঠারখানা, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস—এই চারটি অংশ যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই পর্বটিকে পট-পরিবর্তনের পর্ব বলা যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে 'বলাকা' ও 'পলাতকা', নাটকের ক্ষেত্রে 'ফাল্গুনী' এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'চতুরঙ্গ' ও ঘরে 'বাইরে'—এই পট পরিবর্তনের গূঢ় লীলাকেই প্রকাশ করেছে। অবশ্য আঙ্গিকের দিক থেকে 'ফাল্গুনী' খুব আকস্মিক নয়—কবির নাটকের ক্ষেত্রে অনেক আগেই কবি সঙ্কেত-লীলার অভিনব রহস্য লোকের সন্ধান দিয়েছেন। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের সঙ্গে 'বলাকা' কাব্যের ভাবগত ও রূপগত পার্থক্য অনেক। কিন্তু 'গোরা' রচনার দু'বছর পরে 'চতুরঙ্গ' রচিত হলেও কবি যেন এখানে উপন্যাসের ক্ষেত্রে নূতন পথ-প্রবর্তন করেছেন। ভাবগত ও রূপগত পরিবর্তনের দিক থেকে চতুরঙ্গের সঙ্গে পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির কোন গভীর সংযোগ নেই। চতুরঙ্গে কবি এক অনাবিষ্কৃত ও অনিশ্চিত ক্ষেত্রে পদক্ষেপ ক'রেছেন।

চতুরঙ্গের শ্রেণী-নির্ণয় সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। 'চতুরঙ্গ'কে উপন্যাস বলা যায় কিনা, এ বিষয় শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে "রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের উপন্যাস সমূহের মধ্যে 'চতুরঙ্গ' সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary), ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ভাব গভীরতার পরিবর্তে লঘু ও দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। সাধারণ উপন্যাসিক যেরূপ গভীর দায়িত্ববোধ ও সর্বতোমুখী সতর্কতার সহিত তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের পরস্পর সম্পর্ক ও প্রকৃতির পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করেন, এখানে তদ্রূপ কিছুই নাই" (১) এই মন্তব্যটির সপক্ষে প্রধান যুক্তি হ'ল চতুরঙ্গের অপূর্ণতা ও আংশিকতা। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক এই অভিমতটিকে স্বীকার করেন নি :—

"There are many striking characters, and they have been portrayed deeply too, but the impression is nevertheless produced that we get only glimpses of them and do not witness the gradual unfolding of their whole personality. Every character is sharply individualized; yet he or she is less an individual than the symbol of an idea. And all the characters and all the incidents seem to be intended to project aspects of an idea which is the bond uniting the broken ties; the novel or the symbolist prose-poem portrays the quest of the human soul for truth." (২)

চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত মন্তব্য দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত পথী

১। কথাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (দ্বিতীয় খণ্ড) : পৃঃ ১৪৪

২। The Great sentinel S. C. Sengupta. Page 212-13

[illegible] ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ উপন্যাসের [illegible] ক'রে 'চতুরঙ্গের' অসম্পূর্ণতা দেখিয়েছেন। 'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের যে প্রকৃতি অবলম্বন করেছেন, তাকে মোটামুটি ভাবে উপন্যাস রচনার স্বীকৃতপদ্ধতি বলা যায়—উপন্যাসের সমগ্রতা, ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও চরিত্রের পরিবর্তনগুলির কার্যকারণ সম্পর্ক গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকের এই দীর্ঘকাল স্বীকৃত ভূমিকাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এক নূতন পথ ধরেছেন। এখানে চরিত্রগুলির দ্রুত পরিবর্তনশীলতাকে দীর্ঘ বিশ্লেষণের সাহায্যে সুস্পষ্ট ক'রে তোলা হয়নি, সঙ্কেতলীলার কথব্যঞ্জনায় চকিতে আলোকিত ক'রে তোলা হ'য়েছে মাত্র। নর-নারীর চরিত্রগুলিও রক্তমাংসের বাস্তবভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেন এক একটি বিশিষ্ট ভাবরূপের প্রতীক হ'য়ে উঠেছে। 'গোরার' পরবর্তীকাল থেকেই কাহিনীর কাছ থেকে কবি বিদায় নিয়েছেন—[illegible] গল্পরস প্রত্যাশা করাও সম্ভব নয়। এই পর্যায়ের উপন্যাসে কাহিনীর চেয়ে বক্তব্য বড় হ'য়ে উঠেছে, সেইজন্য কাহিনীর পূর্ণতাও অনুপস্থিত। সুতরাং বাস্তব-প্রধান উপন্যাসের সাধারণ সমালোচনার দিক থেকে 'চতুরঙ্গ'কে 'অপূর্ণও আংশিকতা দুষ্ট" বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু 'চতুরঙ্গ' প্রসঙ্গে আর একটি দিকও বিচার্য। রবীন্দ্র মানসের ক্রম-বিবর্তিত স্বরূপ অনুসন্ধান করলে সম্ভবত এর সদুত্তর মিলবে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার মধ্যে ভাব-প্রধান 'আইডিয়া'র প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই আইডিয়াগুলি ওঁর সাহিত্য জীবনের শেষার্ধের প্রধান অবলম্বন হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য কবি ওঁর পরিণত মানসের সমুন্নতর শিল্পপ্রজ্ঞা ও সুবিস্তারী কল্পনা-প্রসারতা দিয়ে তাকে শিল্পরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পর্বের প্রথম উপন্যাস। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর 'বলাকা'-পর্ব এর খুব বেশী আগের কথা নয়—সম্ভবত এই যুগের আবেশ 'চতুরঙ্গ' রচনাকালেও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। আবার অন্যদিকে 'বলাকা' পর্বের অন্তরঙ্গ প্রতীক রূপধর্মী কাব্যকলার সঘন অনুশীলনের পর্বে 'চতুরঙ্গে'র সৃষ্টি। এ দিক থেকেও এই রচনাটির শ্রেণী-নির্ণয় চলতে পারে। সার্থক উপন্যাস হিসেবে সাধারণ বিচারে এর ঔপন্যাসিক গুণের অপূর্ণতা সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু বিশেষ 'আইডিয়া' বা তত্ত্বের রসমূর্তি হিসেবে এই উপন্যাসটির একটি স্বতন্ত্র ও অখণ্ড রসাস্বাদন সম্ভব।

এইখানে আর একটি প্রশ্ন জেগে ওঠা স্বাভাবিক। সেটি হ'ল, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তত্ত্ব বা বক্তব্যের প্রবেশাধিকার নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের উপন্যাস বা গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির সংস্কার নিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস ও গল্পগুলিকে ঠিক 'নিটোল ও বিশুদ্ধ গল্প' বলা যায় কিনা সন্দেহ। তার কারণ গল্পরস ও গঠনরচনার বৈচিত্র্য এখানে একেবারেই গৌণ—কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্ত সূত্র-সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টকায়। কবির বক্তব্যটিই যেন এ সব ক্ষেত্রে বড় হ'য়ে উঠেছে। এর চূড়ান্ত নিদর্শন 'মালঞ্চ'—বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য যতটুকু কাহিনীর প্রয়োজন, কবি ততটুকুই ব'লেছেন। কথাসাহিত্যে বক্তব্য প্রাধান্যের প্রথম পদক্ষেপ প্রকৃত পক্ষে 'চতুরঙ্গ' থেকেই। তবু 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মূলরস সাধারণ উপন্যাসের রস থেকে স্বতন্ত্র্য। সত্য-সন্ধানী শচীশের বিচিত্র পথ-পরিক্রমার মধ্যেই রবীন্দ্র-মানসের অন্তর্লীন নিহিত। রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের উপন্যাসগুলিতে কল্পনা-প্রসারতা ঘটনাগুলি যতই থাকুক না কেন, মনস্তত্ত্ব ও নর-নারীর জীবন-নাট্যের বাস্তব-লীলায় তা জীবন-রস-সমৃদ্ধ। 'চতুরঙ্গে' সবটুকু রূপ নয়, অনেকখানি তার রূপকও

বটে। জীবনরস এখানে পূর্বাপরই আছে, কিন্তু কোথাও স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ, আবার কোথাও বা রূপক সঙ্কেতের গূঢ়লীলায় চিত্রিত ছায়াবৃত। চতুরঙ্গের আর্ট আলো-ছায়ার লীলা-রহস্যে সমুজ্জ্বল। শচীনের আঙ্গিক গল্পটিকে সহজ এই জাতীয় নিরলঙ্কার ছাড়া রূপায়িত করে তোলাও সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পর্বে বিচিত্র-রীতির আঙ্গিক উদ্ভাবনের মধ্যেও 'চতুরঙ্গ' একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। কারণ ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অনেকদূর এগিয়ে গেলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পুরানো পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। 'চতুরঙ্গ'ই উপন্যাস ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতির প্রথম প্রচেষ্টা।

॥ ২ ॥

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের অতি-সংক্ষিপ্ত একটি কৈফিয়ৎ আছে: "এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। "জ্যাঠামশায়" "শচীশ" "দামিনী" ও "শ্রীবিলাস" ইহার চারি অংশ।' এই কৈফিয়ৎটি উপন্যাসের চারটি অংশের বহিরাশ্রয়ী বিভাগ সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কোন গভীরাশ্রয়ী ভাবের দিক থেকে প্রযোজ্য নয়। কারণ জ্যাঠামশায়, শচীশ ও দামিনীর ভূমিকা-কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাবরূপ কোটাতে যেমন কার্যকরী শ্রীবিলাসের ভূমিকাটি তেমন নয়। শ্রীবিলাস একজন নিরাসক্ত দ্রষ্টামাত্র—সে শচীশের বন্ধু ও দামিনীর দ্বিতীয় স্বামী। তা'ছাড়া এই কৈফিয়ৎটির অন্তরালে মূলতঃ আর একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও বিদ্যমান। কাহিনীর চারটি অধ্যায়ের ক্ষেত্রগত ঐক্যের কথাও যেন এখানে বলা হ'য়েছে।

'চতুরঙ্গের' চতুরঙ্গ সমন্বয় কতদূর সার্থক হ'য়েছে, এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'জ্যাঠামশায়' অংশটি কাহিনীর ভূমিকা-পর্ব বলা যায়। জ্যাঠামশায় জগমোহনের আকস্মিক মৃত্যুতে এই পর্ব পরিসমাপ্ত হ'য়েছে। এইখানে কাহিনীর দিক থেকেও একটি বিরতি লক্ষ্য করা যায়—[illegible] মৃত্যুর পর দুবছর শচীশের আর [illegible] নি। মূলকাহিনীর সঙ্গে 'ভূমিকা' অংশের সংযোগটি আপাতদৃষ্টিতে খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় না। লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে শচীশের সম্পর্ক জ্যাঠামশায়ের জীবনাদর্শ থেকে এতই বিপরীত-ধর্মী যে আপাতদৃষ্টিতে সংযোগহীন বলে মনে হয়। যুক্তিবাদী জ্যাঠামশায়ের শিষ্যকে লীলানন্দ স্বামীর পদসেবা করতে দেখে শ্রীবিলাস তার স্বতোবিরোধী কার্যকলাপের হেতু সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শচীশ যে উত্তর দিয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য:

"সে বলিল, বিপ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায় মৃত্যুর পরে আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো তোমরা করিয়াছি, এখন রাত্তের বেলাকার এ মুক্তিই বা [illegible] কেন? এ ছুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।'

শচীশের এই উক্তির মধ্যেই কবির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের দুই বিপরীত কোটির অভিজ্ঞতার মধ্যে শচীশ এক অখণ্ড সত্যকে আবিষ্কার করেছে—একটি হল 'খেলার আঙিনা' আর একটি হ'ল 'রসের সমুদ্র'। এখানেও সাধারণ উপন্যাসের কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয়নি, একটি বিশিষ্ট ভাব-সূত্রকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কারণ শচীশের পরিবর্তন কোন নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত নয়—অন্তত রবীন্দ্রনাথ তার কোনো বিস্তৃত ছবি আঁকেন নি। শচীশ চরিত্রের একাধিক পরিবর্তনের মধ্যে একটি অখণ্ড ভাব সূত্রকেই ধরার চেষ্টা করা হ'য়েছে। বাস্তবজীবনের দিক থেকে এই পরিবর্তনগুলিকে আকস্মিক বলেই মনে হবে।

চতুরঙ্গের প্রথম পর্বটি যেমন মূলকাহিনীর ভূমিকা, তেমনি 'শ্রীবিলাস' নামক শেষ পর্বটিকেও কাহিনীর [illegible] কাহিনী-প্রবাহ ও ঘটনা-বিন্যাসের দিক থেকে [illegible]নেও একটু শিথিলতা আছে। তৃতীয় পর্ব ও চতুর্থ পর্বের মধ্যে সামান্য একটু 'পরিশিষ্ট' অংশ সংযুক্ত করে কবি যেন তাই প্রমাণিত করেছেন। মনে হয় মূলকাহিনীটি তৃতীয় পর্বের সঙ্গেই শেষ হ'য়েছে। 'পরিশিষ্ট' অংশটীতে প্রয়োজনীয় কাহিনীর সংযোগ-সূত্রটিকে বিবৃত ক'রেছেন মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের মধ্যে ঘটনার যেটুকু ফাঁক ছিল, তাও পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং গঠন-বিন্যাসের দিক থেকে চতুরঙ্গের একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এর প্রথম ও চতুর্থ পর্ব মূল কাহিনী থেকে যেন একটু সরে এসেছে। আসল কাহিনী হ'ল দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ 'শচীশ' ও 'দামিনী' অংশ দুটি। এই দুটি অংশ যেন মূল কাহিনীর একটি অখণ্ড বৃত্ত রচনা ক'রেছে—'অ্যাঠামশায়' তার পূর্বাভাস ও 'শ্রীবিলাস' তার পরিণাম। এইজন্যই চতুরঙ্গের কাহিনীগত শিথিলতার অভিযোগ করা সঙ্গত নয়—গঠন রীতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আপাতদৃষ্টিতে শিথিল ব'লে মনে হয়। কাহিনীর গতিবেগের দিকেও একটি নাটকীয়তা আছে। 'অ্যাঠামশায়' অংশটি প্রস্তাবনা—দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব গতির চূড়ান্ত শীর্ষ; সর্বশেষ পর্বটিতে কাহিনী ক্রমশঃ গতির তীব্রতা হারিয়ে নিষ্ক্রান্তিমুখী হ'য়েছে।

পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির চেয়ে এখানকার টেকনিকও স্বতন্ত্র। 'গোরা' পর্যন্ত উপন্যাসগুলিতে লেখক সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ—সেখানে সব চরিত্রই প্রথমপুরুষের। চতুরঙ্গের লেখক শ্রীবিলাস—শ্রীবিলাসের মুখেই গোটা গল্পটি শোনা। তবে শ্রীবিলাস মোপাসাঁর গল্পগুলির মত নৈর্ব্যক্তিক 'আমি' নয়। যদিও উপন্যাসের মোড় পরিবর্তনের জন্য তার দায়িত্ব কিছু নেই অথবা কোথাওও তার প্রভাব তেমন পরিস্ফুট নয় তথাপি এই চরিত্রটির একটি ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া এই চরিত্রে কোথাওও প্রতীকের ছাপ পড়ে নি। তাই শ্রীবিলাস চরিত্রে বাস্তবসম্মত মানবীয় আবেদন বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। শ্রীবিলাস এই চরিত্রটি ছাড়া আর কারও কথক হওয়ার যোগ্যতা ছিল না।

॥ ৩ ॥

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শচীশ। শচীশকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের মূলপ্রবাহ আবর্তিত হ'য়েছে। তাই শচীশ চরিত্রের ক্রম-বিবর্তিত রূপান্তরগুলি কবির বক্তব্যকেও পরিস্ফুট করেছে। শচীশ চরিত্রের প্রথম বর্ণনাটিই বিস্ময়ের সঞ্চার করে—তার জীবনের সত্য জিজ্ঞাসা শুধু মনে নয় দেহেও ফুটে উঠেছে—তার বর্ণনাটি সাধারণ বর্ণনা মাত্র নয়, চরিত্রদ্যোতক :

"শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা। তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম আমি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম" :

শচীশ তার নাস্তিক অ্যাঠামশায়ের চেলা। অ্যাঠামশায় জগমোহন ছিলেন 'তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক।' তিনি ছিলেন তার্কিক ও যুক্তিবাদী। জগমোহন ছিলেন ইংরেজি ভাষার অসামান্য ওস্তাদ—পাশ্চাত্য চিন্তাধারা তাঁর মনকে সজীব ও বলিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই তিনি অন্ধসংস্কার, অলৌকিকতা ও দেবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না—কিন্তু মানবসত্যের ওপর তাঁর ছিল গভীরশ্রদ্ধা—তিনি ছিলেন 'পজেটিভিস্ট'। "প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে" ই তিনি জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। পাড়ার চাষাভূষো আড়তের মুসলমান ব্যাপারী ও চামারদের তিনি নিজের বাড়ীতে ভোজ দিতেন—তার প্রধান সহচর ছিল শচীশ। দাদা হরিমোহনের প্রতিবাদের উত্তরে জগমোহন

তাঁর এই কাজের সপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা থেকেই তাঁর জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

"ঈশ্বরকে নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা ঈশ্বরকে মানো তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সঙ্গীতকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।"

ননীবালার কাহিনী থেকে অ্যাঠামশায় ও শচীশ দুজনের চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ননীবালার দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হয়ে শচীশই তাকে অ্যাঠামশায়ের আশ্রয়ে নিয়ে আসে। শচীশ যেদিন ননীবালাকে বিবাহ করে তার পাপকে ঢেকে দিতে চেয়েছে সেদিন জগমোহন উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে বুকে চেপে ধরেছিলেন। ননীবালার আত্মহত্যা জগমোহনের জীবনদর্শনের আংশিকতার বিরুদ্ধে যেন একটি তীব্র প্রতিবাদ। অ্যাঠামশায় স্যাগধাম ও বেন্থামের মতশিষ্য—পরোপকার তাঁর একটি স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। কেন যে তিনি পরোপকার করবেন, এ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন যুক্তি ছিল না। আসলে তাঁর জনহিতকর কাজের পিছনে যুক্তির চেয়ে বেশী ছিল আবেগ। ননীবালার সমস্যাকেও তিনি নিজের স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ দিয়েই বুঝতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ননীবালারও যে একটি নিজস্ব ভালো-মন্দ থাকতে পারে এ ধারণা তাঁর কোনদিনই মনে আসে নি। ননীবালার আত্মহত্যা জগমোহনের জীবন-দর্শনের অপূর্ণতাকেই যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ননীবালা জগমোহন ও শচীশের ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে মেলাতে পারে নি। যে তার সর্বস্ব হরণ ক'রে কলঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে ননীবালা তাকে কোনদিনই ভুলতে পারে নি। ননীবালার কাহিনীটি অ্যাঠামশায়ের জীবনদর্শনের একটি সমালোচনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। জগমোহনের মতবাদের মধ্যে এমন একটি প্রবলতা ছিল যা যুক্তির চেয়ে আবেগ, তার সঙ্গে আর কোনো [illegible] কোনো সম্ভাবনা ছিল না। [illegible] মানসিকতার খুব সুন্দর একটি ব্যাখ্যা আছে :

"যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "প্রকৃতিমনোরমের প্রকৃততম সুখসাধনে" আপনার গরজটা কী?—তিনি বলিতেন, "কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় গরজ।" তিনি শচীশকে বলিতেন, "দেখ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিরহঙ্কার নির্বল হইতে হইবে। আমরা কিছুকেই মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।"

অ্যাঠামশায়ের পর থেকে শচীশের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত। লীলানন্দ স্বামীর চ্যালাগিরি ক'রে শচীশ রস-সমুদ্রে অবগাহন করছে। গুরুসেবা, গুরুর তামাক সাজা এমন কি পা-টিপে ঘেন্না পর্যন্ত সবরকম কাজে শচীশ নিজেকে উৎসর্গ ক'রেছে। অ্যাঠামশায়ের মনস্তিত্বের পক্ষে নির্বাধ ভক্তির উচ্ছ্বাসে গা ভাসিয়া দেওয়া বিশ্বাস আকস্মিক মনে হয়। কিন্তু অ্যাঠামশায়ের প্রচণ্ড কর্মপ্রেরণার মধ্যে যে অপূর্ণতা ও আংশিকতা ছিল, তাও শচীশের দৃষ্টি এড়ায়নি—তাই অ্যাঠামশায়ের কর্মজীবনের প্রতিক্রিয়াকে লীলানন্দ স্বামীর ভাবোচ্ছ্বাসময় রস দিয়ে তাকে ঢেকে দিতে চেয়েছিল। এতকাল কর্মের উত্তীপনা স্থির হ'য়ে বসতে দেয় নি—আজ রস-সমুদ্রের গভীরতার মধ্যে দিয়ে শচীশ স্থিতির সন্ধান পেয়েছে। শচীশের কাছে এখন আইডিয়াই বড় হ'য়ে উঠেছে—এই আইডিয়ার দ্বিতীয়তায় শচীশের মতভা কতদূর পৌঁছেছিল তার একটি তুলনা দেওয়া যাক : "বুঝিলাম, শচীশ এখন একটি জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলন-মাঝে যে-আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি "সর্বভূত"—সে আমি একটি আইডিয়া।"

শচীনের "আইডিয়া"—উপাসনা নীলানন্দ স্বামীর সাহচর্যেই যে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে একথা বলা [illegible] অ্যাঠামশায়ের চ্যালা হিসাবেও এই আইডিয়ার সন্ধান সে পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, এই দুটি পন্থার মধ্যে বিরোধ থাকলেও এক জায়গায় দুয়ের মধ্যে মিল আছে। শচীনের ডায়রির মধ্যে যে অংশে দামিনী ও ননীবালার তুলনামূলক আলোচনা আছে সেখানে শুধু দামিনীর ভেতরেই নয়, ননীবালার মধ্যেও সে একটি আইডিয়া আবিষ্কার করেছে। উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষ নারীর চেয়ে নারীর বিশ্বরূপই বড় হয়ে উঠেছে। শচীন আসলে আইডিয়াকেই নানারূপে ও নানাভাবে আস্বাদন করতে চেয়েছে। তবে অ্যাঠামশায়ের আইডিয়া ও নীলানন্দ স্বামীর আইডিয়া রূপের দিক থেকে স্বতন্ত্র। পজেটিভিস্ট অ্যাঠামশায় জনকল্যাণও মানবহিতের বাস্তব কর্মনিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তাঁর আইডিয়াকে সার্থক করতে চেয়েছেন, আর নীলানন্দ স্বামী উদ্ভাসিত রূপের সমুদ্রে উজান বেয়ে আইডিয়াকে ধরতে চেয়েছেন। সুতরাং শচীনের আইডিয়া নিয়ে মতভাকে অপ্রাসঙ্গিক ও আকস্মিক বলা যায় না।

॥ ৪ ॥

এ পর্যন্ত শচীনের সত্য-সন্ধানের পথে তেমন গুরুতর বাধা আসেনি। অ্যাঠামশায়ের জীবিতকালে পিতা হরিমোহন ও দাদা পুরন্দরের বিরোধিতা শচীনের মনকে কোনমতেই স্পর্শ করতে পারেনি। বিশেষত সে সময় অ্যাঠামশায় জীবিত ছিলেন—তাই বাস্তবের আঘাতও শচীনকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু দামিনী সম্পর্কে ঠিক সে কথা বলা যায় না—"সে নারী, মৃন্ময় কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিকা বসন্তের পুষ্পবনের মতো নাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি অরূপ হইয়া উঠিতেছে; [illegible] কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তরে হাওয়াকে শিমি-পয়সা খাবনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।" দামিনীর রূপ শচীনের রস-সাধনার একটি তীব্র প্রতিবাদ রূপে উপস্থিত হ'য়েছিল। বাঙ্গ-বিদ্রূপ করা ও নীলানন্দ স্বামীর মতবলকে সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়াই ছিল তার কাজ। যাহোক যে অর্ঘোদ্যমনা তাকে গুরুদেবের কাছে চিরদিনের মতো বিকিয়ে দিয়ে গিয়েছে তার প্রতি দামিনীর একটি বিদ্রূপ ও ঘৃণ অস্বীকৃতির ভাবই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার বুভুক্ষিত মন প্রেমের নীরব মাধুর্যের ও'রে উঠেছে, আত্মনিবেদনের অদ্ভুত পিপাসা তার চরিত্রের উগ্রতাকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলেছে। আচারে আচরণে নানাভাবে সে শচীনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ক'রেছে।

কিন্তু আইডিয়া-সাধক শচীন দামিনীর নারীত্বের চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারে নি, কারণ দামিনী, তার কাছে সেবা-সৌন্দর্য ও মাধুর্যের একটি আইডিয়া মাত্র। কবি বলেছেন: "এমনি করিয়াই দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীন তাহার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীন কেবল শোভাই দেখিল দামিনীকে দেখিল না।" দামিনীর হৃদয়ে প্রেমানুভূতির যে আদিম অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল, শচীন তা দেখে মনে মনে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছে। পর্বত-গুহার অভিজ্ঞতাটি দামিনীর অবরুদ্ধ কামনার একটি চূড়ান্ত রূপ। শচীন পদাঘাতে সেই 'আদিম অন্ধ'টিকে দূর ক'রে দেওয়ার চেষ্টা ক'রেছে। ওহা থেকে বেরোর পর দামিনীর অবরুদ্ধ-প্রেমাকাঙ্ক্ষা তার আচার আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হ'য়েছে—শচীন সম্পর্কে কথা-বার্তায় সে নীরব হ'য়ে নীবিলাসকে আশ্রয় করার চেষ্টা ক'রেছে।

দামিনীর এ অবস্থায় শচীনের মধ্যেও কম আলোড়নের সৃষ্টি হয় নি। নিজের হৃদয় দৌর্বল্য দূর করার জন্যই সে

যেন বিগুণ উৎসাহে গুরুর পা-টেপা, তামাক-সাজা, কীর্তন করা প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ ক'রেছে। কিন্তু তার মধ্যে শচীশের দুর্বলতাই যেন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে: "জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই কিন্তু চোখ মেলিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তাহার পা টলিতেছে।" নিজের হৃদয়ের দ্বিধার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে সমুদ্রতীরে যাত্রা ক'রেছে। শচীশের সমুদ্রতীরে যাত্রায় দামিনী ও শচীশ দু'জনারই ভাব পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শচীশের এই আকস্মিক অন্তর্ধান দামিনীরও মনের ওপর দীর্ঘছায়া বিস্তার ক'রেছে। আলাপ-পরিহাস, হাস্য-কৌতুক, শ্রীবিলাসের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক, সমস্ত কিছুর ওপরেই আকস্মিকভাবে একটি যবনিকা পড়েছে। দামিনীর কাছে শচীশ যে কতখানি তা এই প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নারীর আকস্মিক ভাবান্তরের মধ্যে গভীর-ভাবে পরিস্ফুট হ'য়েছে। অন্যদিকে শচীশও সমুদ্রতীরের নির্জন অবকাশে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে দামিনী সম্পর্কে ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণ ক'রেছে। শচীশ এবার বুঝতে পেরেছে যে দামিনীকে দূরে সরিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই, বরং তাতে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। তাই সে কাতর কণ্ঠে দামিনীকে বলেছে: "আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিয়ো না।" দামিনী স্বীকৃত হ'ল, তার "যে অনন্ত দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না।" কিন্তু নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার ব্যাপারটি দামিনীর অন্তরের আপোষ-বিরোধী বিদ্রোহিনী সত্তাকে বহিষ্কার ক'রে তুলেছে—এবার সে প্রত্যাকর্ষিত রস-সাধনার বিরুদ্ধে স্পষ্টই প্রতিবাদ ক'রেছে: "তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে কুলমান। তার ঘরা নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, সরম নাই। এই নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?" দামিনী শচীশকে গুরুর [illegible] ক'রেছে।

এর পরবর্তী অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। দামিনীর সেবা পর্যন্ত শচীশের কাছে বিষবৎ বলে মনে হ'ল। আত্মিক সংঘাত জর্জরিত হ'য়ে শচীশ শেষপর্যন্ত দামিনীকে চিরদিনের জন্য প্রত্যাখ্যান ক'রেছে। এই প্রত্যাখ্যানের পরে দামিনীর পক্ষে শ্রীবিলাস ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না—সে শ্রীবিলাসকেই পতিত্বে বরণ ক'রেছে। বিবাহ হ'য়েছে শচীশের উপস্থিতিতে। হয় তো দামিনী এই বিবাহের ভেতর দিয়ে তার প্রেমের স্বপ্ন পূর্ণরূপে চরিতার্থ করতে পারত, কিন্তু তার আগেই দামিনীর মৃত্যু হল।

শচীশের মনোজীবনের বিচিত্র পরিবর্তনের তালে তালে উপন্যাসটি আবর্তিত হ'য়েছে। কিন্তু শচীশের এই সত্য সন্ধানের কোনো পরিণতি আছে কিনা, এই প্রশ্নটিই সর্বাধিক বিবেচ্য। অ্যাঠামশায় ও লীলানন্দ স্বামী—এঁরা দু'জন শচীশের জীবনের দুই বিপরীত প্রান্ত।—এই দু' প্রান্তের সাধনাতে শচীশ সার্থক হ'তে পারে নি। দুয়েরই অপূর্ণতা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে: "সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিষটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি সহজে কিছুতে সাহস পাই না।" অ্যাঠামশায়ের নাস্তিকতা ও যুক্তিবাদ লীলানন্দস্বামীর প্রেম-ভক্তিময় উজ্জীবিত রস-সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েও শচীশের অশান্ত সত্য-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয় নি। দামিনীর আবির্ভাব তার দ্বন্দ্বকে জটিলতর করে তুলেছে মাত্র। শচীশের পরবর্তী উপলব্ধি তার একটি কথা থেকে

: শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন বলিয়া রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের দুঃখ" সম্ভবত উপন্যাসের মধ্যে এইটিই শচীশের চরম উপলব্ধি। অ্যাঠামশায়ের কাছেও শচীশ এই মুক্তির দীক্ষাই নিয়েছিল, কিন্তু সেখানে ছিল এক অপূর্ণতা। তারপর রসের বন্ধনও তাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে নি। এবার এলো নূতন মুক্তি—যার ভেতর বস্তু নেই, দাহ নেই—আছে এক পূর্ণানন্দময় উপলব্ধি। কিন্তু শচীশের সত্যসন্ধানের চূড়ান্ত স্তরটিকে কবি যেন অনেকখানি অস্পষ্ট রেখেছেন—বিস্তৃত বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনার ধূম্র-সঙ্কেতে তার আভাস দিয়েছেন মাত্র। শচীশের সঙ্কট আধ্যাত্মিক স্তরীয়—তাই সম্ভবত কেউ কেউ 'চতুরঙ্গকে' রূপক বলতে চেয়েছেন। কিন্তু 'চতুরঙ্গ'কে রূপক আখ্যা দিলে কাহিনীটির প্রকৃতিধর্ম অনির্দিষ্টই থাকবে।

॥ ৫ ॥

শচীশ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। তার আধ্যাত্মিক সঙ্কট উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তু। কিন্তু উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দামিনী চরিত্র ও তার জীবন-সমস্যা ক্রমশঃ প্রধান স্থান অধিকার ক'রেছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মধ্যে দামিনী চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। শচীশ যতই আইডিয়ার পূজারী হোক না কেন; দামিনীর রক্ত-মাংসের মানবী সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। দামিনী চরিত্রের পরিবর্তন-শীলতার কার্য কারণ সম্পর্কগুলিকে কবি নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। দামিনী স্বামী-প্রণয়-বঞ্চিতা নারী। দামিনী যৌবন-দীপ্তিতে যখন জীবনরসের রসিক হয়ে উঠেছে তখন, তার স্বামী শিবতোষ 'জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায়' কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করার দুশ্চর ব্রত গ্রহণ ক'রেছে। দামিনীর বিদ্রোহী মন স্বামীর এই ধর্মোন্মাদনা কোনো দিন স্বীকার করে নিতে পারে নি। মৃত্যুর সময় স্বামী বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে স্ত্রীকেও ওকর হাতে সমর্পণ ক'রেছে। দামিনীর ঘৃণান্বিত অসন্তোষ ও নির্মম উপেক্ষা শচীশের প্রেমের আস্বাদনের মধ্যে স্নিগ্ধতায় ও সেবা-মাধুর্যে অপরূপ হ'য়ে ওঠে, : "বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।"

কিন্তু শচীশ তাকে রক্তমাংসের নারী হিসেবে না দেখে সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ ক'রেছে। এই কারণেই দামিনীর অবরুদ্ধ কামনা নানা আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হ'য়েছে। পর্বত-গুহায় যে "আদিম জন্তুটির পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে তা'কবিত্বসম্পদে ও ব্যঞ্জনায় নিগূঢ় অর্থবহতায় অপূর্ব হ'য়ে উঠেছে। এই বর্ণনাটি দামিনীর চিত্তগুহার পুঞ্জীভূত কামনাকে রূপায়িত ক'রেছে। দামিনীর সেই 'আদিম জন্তু'টি পদাহত হ'য়ে ফিরে এসেছে। প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার ব্যর্থতা দামিনীকে নূতন পথে ফিরিয়ে এনেছে। প্রতিদিনের গৃহিণীপনায় ও পশুপাখীর প্রতি বাৎসল্যে সে তার প্রেমকে নূতন পথে আবর্তিত করার চেষ্টা ক'রেছে। শচীশ প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন ক'রে বিলাসের সঙ্গে নানা খুঁটি-নাটি আলোচনায় মুখর হয়ে ও ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে কোনোমতে পূরণ করতে চেয়েছে। কিন্তু বিলাসের উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য শচীশ।

এ কথা বুঝতেও অসুবিধা হয় না। কারণ শচীশ সমুদ্রতীরে যাত্রা করার পর যামিনীর সহজ জীবনপ্রেম ও কর্মোদ্দীপনা যেন তরঙ্গিত হয়েছে। সমুদ্রতীর থেকে ফেরার পর শচীশ যামিনীকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছে। সর্বশেষে আত্ম-সংগ্রাম জর্জরিত শচীশ যামিনীকে চির-বিদায় দিল।

যামিনী নারী—সে আশ্রয় চায়। শচীশের প্রত্যাখানের পর শ্রীবিলাসকেই তার প্রয়োজন হ'ল। এ সম্পর্কে শ্রীবিলাসই ব'লেছে: "আমার সঙ্গে যামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।" কিন্তু শ্রীবিলাস ও যামিনীর একবছরের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কোন ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গজনিত হতাশার কোনো স্থান ছিল না—নূতন জীবনকে তারা যেন সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছিল। যামিনীর আকস্মিক মৃত্যু না ঘটলে হয়তো তাদের দাম্পত্য জীবন সার্থক হ'ত। যামিনীর মৃত্যু বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় সে শচীশকে না পেয়েও নূতন জীবনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সে মানিয়ে নিয়েছিল। তাই মৃত্যুপথযাত্রিণী জীবনরসিকা নারীর অন্তরের দীর্ঘশ্বাস উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে এক বেদনার ছায়া ফেলেছে: "যেদিন রাত্রের পূর্ণিমা কাননে-পর্বতে, জোয়ারের ওরা অজস্র বেদনায় সমস্ত সমুদ্র দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন যামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

পর্বত-গুহায় শচীশের অভিজ্ঞতার বর্ণনাটি রূপক-সঙ্কেতের অনবদ্য শিল্প। হয়তো আইডিয়া সাধক শচীশের দৃষ্টিতে যামিনী একটি পুঞ্জীভূত কুয়াশা, তবু 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের যামিনীকে প্রতীক আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যামিনী নারী—রক্ত মাংসের নারী—জীবন্ত নারী। শচীশের ডায়রিতে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দুইনারী সম্বন্ধে বর্ণনা আছে:

"ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। যামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিরূপ দেখিয়াছি, সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো সাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সায় খাজানা দিতে নারাজ।"

শচীশ নারীর মধ্যে যে দুটি বিরূপ দেখেছে—তা প্রকারান্তরে রবীন্দ্র সাহিত্যের দুটি প্রধানতত্ত্ব। ননীবালা বর্ষাকালু, আর যামিনী ফলপুষ্প সমাচ্ছন্ন বসন্ত ('দুই বোন' উপন্যাসের উপমা)। যামিনী মূলত প্রিয়া, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে 'গৃহিণী' ও 'সচীব' ক'রে তোলার চেষ্টা ক'রেছেন। ননীবালা তার চরম দুষ্কৃতকারীকে শেষ পর্যন্ত ভুলতে পারে নি—সে আস্বাদনের মধ্য দিয়েই 'জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর' ক'রে তুলেছে। ব্যথার ভেতর দিয়েই তার প্রেমসাধনার সিদ্ধি। কিন্তু যামিনী বাঁচতে চায়—জীবনাসক্তির পানপাত্র নিঃশেষ ক'রে সে চুমুক মেটাতে চায়। সে যেন বলতে পারে:

"আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে ঝলমল ওঠে অট্ট হাসি
দেখে মোর সাধ।"

শচীশ তাকে প্রতীক বলেই ধরে নিয়েছে। কিন্তু যামিনীতো প্রতীক নয়—সে নারী—সেবাপরায়ণা, গৃহকর্ম-নিপুণা, কামনা-বাসনাময়ী—প্রেয়সী ও গৃহিণী দুই-ই। যামিনীর আকস্মিক মৃত্যুই তার যথার্থ পরিসমাপ্তি—তার দাম্পত্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকা কবির উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যামিনী চরিত্রকে 'আংশিক' অথবা 'রূপক'

বলা সঙ্গত হবে না। দামিনী প্রেয়সী নারীর যৌবন-বিহ্বল [illegible]—অভিসার, মনিরোজ্জ্বল ও পুষ্প-সুরভি রতি-বিলাস।

॥ ৬ ॥

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কথক শ্রীবিলাস। ঔপন্যাসিক কাহিনীটিকে নিজে বলেননি, শ্রীবিলাসের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন। মাঝে মাঝে শ্রীবিলাস শচীশের ডায়রি থেকে কোনো কোনো অংশ উদ্ধার ক'রেছে। শ্রীবিলাসকে শুধু দ্রষ্টা বা কথক বললেও সবটুকু বলা হবে না, সে ব্যাখ্যাতাও বটে। শচীশ ও দামিনীর সম্পর্ক পরিবর্তনের ক্রমকারী গতিকে সে অনেক সময় ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে তুলে ধরেছে। শ্রীবিলাস সাধারণ মানুষ, আইডিয়ার ঘূর্ণাচক্রে সে আবর্তিত হয় না—দামিনীকেও সে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে নি। সে বলেছে: "আমি ও গৃহী হইবার সময় পাইলাম না, আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই: সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, যে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।" শ্রীবিলাসের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথায়ও আতিশয্য নেই, তাই দামিনীকেও সে সহজভাবেই গ্রহণ ক'রেছিল। সাধারণ মানুষের মতই ঘর-সংসার ও অর্থোপার্জন নিয়েই তার দিন কেটে যেত হয়তো—কিন্তু দামিনীর মৃত্যু তাকে গৃহী হ'তে দেয় নি। কিন্তু দামিনীকে গ্রহণ ক'রেও সে শচীশের ওপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারায় নি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনের ইতিহাসে 'চতুরঙ্গ' একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। 'চতুরঙ্গ' তাঁর সাধুভাষায় রচিত শেষ উপন্যাস। 'চতুরঙ্গ' পরে 'ঘরেবাইরে' থেকেই কবি উপন্যাসের ক্ষেত্রে চলতি ভাষার প্রয়োগ ক'রেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝাযাবে যে, 'চতুরঙ্গের' বহিরঙ্গ সাধু ভাষার হ'লেও এর অন্তরঙ্গ মেজাজ চলতি ভাষার। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' প্রায় সমসাময়িক। 'চতুরঙ্গ' লেখার সময়ই চলতিভাষার রূপ ও রস কবির মনে গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে—তাই সাধুভাষার আবরণের অন্তরালে চলতিভাষার তনু দেহের লাবণ্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। 'চতুরঙ্গের' ভাষার ক্রিয়াপদগুলি সাধুভাষা হ'লেও চলতিভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এ ভাষায় এসে পড়েছে। চলতি ভাষার সঙ্গেই যেন এর আত্মিক সম্পর্ক। ক্রিয়াপদকে মাঝে মাঝে বাদ দিলে গদ্যের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। 'চতুরঙ্গে' কবি এই রীতিকে ব্যবহার ক'রে ভাষার মধ্যে গতিশক্তি সঞ্চারিত ক'রেছেন। তা ছাড়া সর্বনামের চলতি রূপের প্রাচুর্যও এ ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ যেন দেখিয়ে দিলেন যে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততা ছাড়াও চলতিভাষার কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে—যা সাধুভাষার ক্রিয়াপদযুক্ত বাক্যের মধ্যেও রক্ষা করা সম্ভব।

তথাপি 'চতুরঙ্গে'র ভাষাকে খুব স্বাভাবিক ভাষা ব'লে মনে হয় না। সাধুভাষা ও চলতিভাষার দ্বৈত আকর্ষণে এ ভাষা যেন আকস্মিক—খুব বেশী যেন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল নয়। তা ছাড়া সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস থেকে যেন এ ভাষা উদ্ভূত হয়নি। স্বরক্ত কলাপ্রয়াস ও সচেতন প্রচেষ্টার ছাপ এ ভাষার সর্বত্র বিস্তৃত। মনে হয় এক উচ্ছল স্বর্ণাধারকে যেন বাঁধন দিয়ে কোনক্রমে সংবৃত ক'রে রাখা হ'য়েছে।—বাধভাঙার বই পরবর্তী উপন্যাস 'ঘরে বাইরে।' 'চতুরঙ্গের' গদ্যরীতিতে কঠিন সংযম ও সুস্থিতির নির্মম শাসন। মনে হয় হিম-স্তম্ভিত জমাট তুষার। 'ঘরে বাইরে' তে এসে এই তুষারস্তূপ প্রখর সূর্যালোকে বিগলিত হ'য়ে ফেনিলাবিনী-নদীতে পরিণত হ'য়েছে। 'চতুরঙ্গের' সংযত গদ্যরীতির মধ্যে একটি কাঠিন্য ও শুষ্কতা আছে—সাধুভাষার রূপ-মন্থরতাকে বর্জন ক'রে কবি যেন তার [illegible] শুধু নিয়েছেন—সেইসঙ্গে চলতি ভাষার উচ্ছলতাকে [illegible]

করার মধ্যেও একটা কুণ্ঠা আছে। ভাষা সৃষ্টির অভিনব প্রয়াসের জন্যই 'চতুরঙ্গে'র ভাষার একটি নূতন রূপ চোখে পড়ে। বাংলাসাহিত্যের ভাষাচর্চার ইতিহাসে 'চতুরঙ্গের' দান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কবি-কল্পনার দীপ্তি বিস্ময়কর। উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনা, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার আলো-ছায়া সঞ্চার, প্রকৃতি বর্ণনায় অর্থগূঢ় সাঙ্কেতিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য উপন্যাসটিকে এক রমণীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত ক'রেছে। শচীশ ও দামিনীর সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের একটি প্রধান অংশকেই এইরূপ অর্থ-গৌরবে ভরে তোলা হ'য়েছে—দু'টি নর-নারীর হৃদয়-বেদনাকে বিশ্বব্যাপক রাগিণীতে পরিণত করা হয়েছে: "সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ঘাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন ঝরিল হাওয়ায় দূর-সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।" কাহিনীর শেষদিকে এই জাতীয় সাঙ্কেতিক বর্ণনার প্রাধান্য। বৃদ্ধ বালুচরের নীরস শুষ্ক বর্ণনাটি কবিকল্পনায় অপূর্ব হ'য়ে উঠেছে: "যেন একটি মরার মাথার প্রকাণ্ড শুষ্কহীন হাসি, যেন দয়াহীন শূন্য আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।" ঝড় বাদলের অন্ধকার রাত্রির ভীষণ-রমণীয় প্রেত-চিত্রণ বর্ণনাটি শচীশের উন্মাদনা ও দামিনীর চিরসঞ্চিত বাধিত কামনাকে রূপায়িত ক'রেছে: "বাদবাদলের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের ভিতরে ভাঙ্গলোলতার কপাকপ শব্দ, ঘুরে ঘুরে মাঝে মাঝে নদীর পাড় ভাঙিয়া হুড়মুড় হুড়হুড় করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়ীটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা অন্তর ফাটানো সুর করিয়া চীৎকার করিতেছে।" 'শ্রীবিলাস' পর্বের প্রথমেই নীলকুঠির [illegible] মধ্যে যে রিক্ততা দীর্ঘশ্বাস সঞ্চারিত হ'য়েছে দামিনী-হারা শ্রীবিলাসের বেদনা-বিধুর মনের সঙ্গে তার একটি নিগূঢ় সঙ্গতি আছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের 'শচীশ' পর্বটির দশম পরিচ্ছেদ নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। এরমধ্যে শচীশের অভিজ্ঞতা এক অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনার সুরে উঠেছে। দামিনীর আদিম কামনা, প্রেম পিচ্ছিল পরিপক্ব-পক্ক কবিত্ব ও মনস্তত্ত্বের অপরূপ সংমিশ্রণে চিত্রিত হয়েছে। কামনাময়ী নারীর আদিম আকাঙ্ক্ষা এখানে অপরূপ কলাসংস্থানের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কবিত্ব ও রূপকের বর্ণময় আবরণটি সরিয়ে ফেললেই এর নগ্নরূপ প্রকাশিত হত। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেও এ বর্ণনাটি দুর্লভ-দোসর:

"সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো—তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু। তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটি ক্ষুধা আছে;—সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই,—সে কিছুই জানে না, কেবল তার ক্ষুধা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।" ব্যঞ্জনা ও মনস্তত্ত্বের গূঢ়সঞ্চারী ভিন্নিক বর্ণনায় শুধু দামিনীর নয়, চিরন্তনী নারীর শাশ্বত কামনার ইতিহাস উদ্ঘাটিত হ'য়েছে।

'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রসাহিত্যে অনন্য। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কথা-সাহিত্যের সঙ্গে এর কোনো গভীরাশ্রয়ী মিল নেই—যেটুকু মিল তা বহিরঙ্গের। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এর একটি মৌলিক ত্রুটি চোখে পড়ে। শচীশের সত্যসন্ধান দিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত, কিন্তু উপন্যাসের পরিণতিতে দামিনী সমস্যার প্রাধান্য। শচীশের পরিবর্তনগুলিও প্রধানত আধ্যাত্মিক জাতীয়, কিন্তু, দামিনীর সমস্যা বাস্তবের নারীর। লৌকিক ও আধ্যাত্মিকের এই দ্বন্দ্বে উপন্যাসটির মূলকেন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত। কবির জীবনে কোনটি ব্যর্থ নয়—তাই চতুরঙ্গ উপন্যাস রূপ ও রূপকের মানব-সত্য ও ভাব-সত্যের অপরূপ লীলা-তীর্থ।

প্রবন্ধ

১৩২১-এর তিনটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা ॥

ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কয়েক বছর পরে, ১৯১০ থেকে ১৯১৪-১৫ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লেখাতে আমাদের তৎকালীন জাতীয় অবসাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য দেখা গিয়েছিল। তখন একদিকে আমাদের অভ্যস্ত আচারের যান্ত্রিকতা, অন্যদিকে কর্মভূমিষ্ঠ পশ্চিম-পৃথিবীর বিবসন ব্যস্ততা, এই দুই বিপরীত প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও তৎসূত্রে আমাদের স্বীকার্য কর্মাদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ সচিন্তা তাঁর গদ্য-পদ্য উভয় শ্রেণীর লেখার মধ্যেই বার-বার আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯০৫-এর উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার অল্পকাল পরেই একদল প্রবীণের মধ্যে একটু-বেশি পরিমাণে অতীতের প্রতি অন্ধ আত্মগত্য লক্ষ্য করে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন—

"সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল, সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধিবোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না।"(১)

যারা কাজের মধ্যে নিজেদের নিরন্তর ডুবিয়ে রাখতে ভালোবাসে—ঐতিহ্যগত পথে, কর্মজীবনেই যাদের বিশেষ আসক্তি বা প্রবণতা, সেই দুই ধাতের মানুষের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করে তিনি প্রাণশক্তির তারতম্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মানুষের বাইরের আচরণের মূলে প্রাণধর্মের এই-যে প্রকৃতিভেদ, তারই ব্যাখ্যাসূত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে এক জায়গায় তিনি তাঁর এই বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন "সেদিন একটি কুহুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু খড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুহুর শাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।" সেই ঘটনা থেকে তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে, "দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং ভাগ্নির দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতেছে।"

যুক্তিতর্কময় প্রবন্ধের পাত্রেও যোগ্য সাদৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত পরিবেশন করতে তাঁর কোনোদিন কার্পণ্য ছিল না। প্রাণের প্রসঙ্গ তুলে তাই তিনি প্রাচীন ও আধুনিক মিশরের দুই বিপরীত ছবির কথা ভেবেছিলেন। পুরোনো মিশরের 'মমি' একদিকে,—আধুনিক মিশরের নীল-নদীর পলিমাটি খুঁড়ে চাষ-করা কৃষক অন্যদিকে—এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে দ্বিতীয়টিতেই যথার্থ সনাতন প্রাণধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন—"যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ

(১) বিচ্ছেদ ও অভিষেক, 'ভাণ্ডার' গ্রন্থ।

ক্ষুব্ধ ভারতের প্রভু একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে, তাহার মর্মে লাগে নাই, ক্ষতির কোনো উত্তম নাই, এই জন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই।" সনাতন সত্যের প্রতি-প্রীতি আসক্তিবশে যারা রক্তপ্রকৃতির বাড়াবাড়ি করছিলেন তাঁদের উদ্দেশে তিনি পশ্চিমের দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। আমাদের স্বদেশেও যে তাদেরই মতন 'জয় লক্ষ্মীছাড়া'-র অভাব নেই সে তথ্যও তিনি বেশ জোর গলায় প্রকাশ করেছিলেন এবং আমাদের প্রাণস্বভাবের উপর সমাজের রক্ষণশীল সনাতনীদের শাসন প্রয়োগের অস্বাভাবিকতার কথাটি তিনি এই উপমা দিয়ে বিদ্রূপ-ভাবে বুঝিয়েছিলেন—"ইহারা কুণ্ডীস্থিত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের ঘরে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অন্তঃক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উদ্বেগ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিক্ষু কিন্তু এদেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন—এইজন্য যাহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইহারা আর কিছু চান না।" ১৯২১ সালে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তাই বলা হয়েছিল—"চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক। কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না,—মানুষকে বলিব তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনই চিরদিন চলিবে না।" এসব ভাবনার সঙ্গে তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রঘটনার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। ঐ লেখাটির মাস তিনেক পরে প্রকাশিত তাঁর আর-একটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক পার্থক্যের মূল আভিমুখ্য সম্বন্ধে দেশের তথাকথিত হিতার্থীদের অবহিত হবার পরামর্শ দিয়ে নিকট-অতীতের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রসঙ্গই তিনি পুনরায় উত্থাপন করেছিলেন—"বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্তরঙ্গে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত এবং ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিমিত ছিল। বাঙালার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।" (২) সে প্রবন্ধের প্রথমদিকেই তাঁর সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছিল—"আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোক-সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।" এই উক্তির পরের বাক্যেই অতীতাধিক স্পষ্টভাবে তিনি জানিয়েছিলেন "—হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অসম্মান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়।" বঙ্গবিচ্ছেদের তুমুল উত্তেজনার মধ্যেও যথার্থ প্রীতির বলে 'অমলোকের ভারতবর্ষ' যে জনসাধারণের ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়নি, রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই জানিয়েছিলেন। ১৯০৫-এর প্রায় ন'বছর পরে আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে তাই তিনি বলেছিলেন—"যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলা দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুভদ্রসমাজ এই শ্রেণীগুলিকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।"

২। লোকহিত—ঐ

বিশ শতকের প্রথম দু'দশকের মধ্যে 'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ' এবং জনসাধারণের ভারতবর্ষ, এই দুই অনতি-প্রশস্ত বিভাগে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিভেদের বৃত্তান্তটি তাঁর নানা রচনার মধ্যে আলোচিত হয়েছে। মানব সমাজের বৃহত্তর পটভূমির মধ্যে আমাদের এখানকার এই স্থানীয় ঘটনার সমবেশ ও তার যাথার্থ্য বোঝবার চেষ্টা করে বিশ্বভাবনাশীল রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের অতিক্রান্ত অধ্যায়ের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন। লোকহিতের বুলি-তোলা, অভিমানসর্বস্ব রাষ্ট্রনায়কদের কথাসূত্রে তিনি য়ুরোপের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনা করেছিলেন। সেই বিশ্লেষণও এখানে স্মরণ করা অবান্তর হবে না। তিনি বলেছিলেন—

"একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত সুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে।"

অথচ য়ুরোপের রাষ্ট্র ক্ষেত্রে আসেকার রেওয়াজ বদলে তখন নতুন আমল দেখা দিয়েছে। অন্তত কিছু পরিমাণে একাদশ-দ্বাদশ শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মসংগ্রাম ছিল য়ুরোপের দেশব্যাপী খ্রীষ্টান সংহতিবোধেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং প্রেরণা, দুইয়েরই সূচক। সেই সঙ্গে মধ্যযুগের সামন্ত রাজন্যবর্গের পারস্পরিক সংঘর্ষের কথাও স্মরণীয়। সে সব পুরা কথার ইশারা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"য়ুরোপে যাহারা একদিন বিলিট-সাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলই মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন—দুঃসাহসিকের দল চারিদিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত—কোথাও শান্তি ছিল না।"

য়ুরোপের মধ্যযুগের সেই 'ক্ষত্রিয়দল' যে প্রাধান্য পেয়েছিল, সেটা স্বাভাবিক। "দুর্বল লোক-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্তা এবং শাসন কর্তা। লোক-সাধারণ তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত।" মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের মধ্যযুগের 'নাইট'দের শৌর্য-বীর্যের আদর্শ মনে রেখে 'ক্ষত্রিয়দল' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গটি প্রামাণ্য ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। সকলেই জানেন, যে পশ্চিম ভূমধ্যপ্রদেশে, বিশেষত স্পেনে তৃতীয় আব্বা রহমানের (খ্রীস্টীয় ৯২৯-৯৬১ অব্দ) লোকান্তর প্রাপ্তির পরে খ্রীষ্টানরা যখন ইসলাম শক্তির প্রতিরোধকল্পে সংঘবদ্ধ হন তখন থেকেই আলোচ্য 'ধর্মসংগ্রামের' সূত্রপাত ঘটে। অবিশ্যি পূর্বাঞ্চলে সে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আরো কিছুকাল আগে। দুর্বল বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের বিশেষ ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিল সেলজুক তুর্কীদের অভ্যুদয়। এদিকে কাইরোতে সুন্নী সম্প্রদায়ের তুর্কীদের সঙ্গে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত খলীফাদের কলহের ফলে ইসলামের ঐক্যে ভাঙন ধরেছিল। সে সময়ে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা শিয়া আরব ও তুর্কীদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছেন বলে রব তুলে দেওয়া হয়। ফলে, খ্রীষ্টান সমস্তরাজশক্তি এই বুলি ধরে বিধর্মীদের কবল থেকে জেরুজালেম উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেন। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আর্বান এই ধর্মযুদ্ধ সঙ্কল্পের নেতৃত্ব নিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বিশেষভাবে এই কটি বিষয়ের ওপর জোর দেন—

১। খ্রীষ্টানদের ওপর তুর্কীদের অত্যাচার; ২। সিরিয়া

এবং সেকথাটাকে খ্রীষ্টানশক্তির অধিকারভুক্ত করবার আবশ্যিকতা; ৩। এই প্রস্তাবে খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধিবিস্তারের সম্ভাবনা; ৪। এই নতুন সংকল্পের ফলে গৃহযুদ্ধের উপরতা হবার সম্ভাবনা। তিনি একথাও বলেছিলেন যে 'নাইট'রা খ্রীষ্টানদের একজন হয়ে নিজেদের এলাকায় যেসব রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভবের ছড়িয়ে রেখেছেন, তা থেকে নিষ্কৃতি হওয়া দরকার। ঐতিহাসিক সে বক্তৃতার বিবরণ উদ্ধার করেছেন—"If, forsooth, you wish to be mindful of your souls, either lay down the girdle of such knighthood or advance boldly, as knights of Christ, and rush as quickly as you can to the defence of the Eastern Church."

মধ্যযুগের এই ধর্মসংগ্রামের মূলে যে প্রেরণা কাজ করেছে একটু তলিয়ে দেখলেই তার সত্যিকার 'অধার্মিকতা' চোখে পড়বে। ব্যাপক প্রচারের ফলে, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামী শক্তির দুষ্টতরাজ ও অন্যান্য অত্যাচারের কাহিনী খুবই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। 'নাইট'দের শৌর্য-বীর্যের দোহাই দিয়ে আরব ও তুর্কী বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তাঁদের উত্তেজিত করা হয়। (৮—৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত য়ুরোপের এই ধর্মসংগ্রামের প্রসারকাল।) এই সময়ের মধ্যে য়ুরোপের 'নাইট' সম্প্রদায়ের যে রাষ্ট্রশক্তি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তার মূলে খৃষ্টান ধর্মের সংরক্ষণ ও বিধর্মীর দমন যে একটি প্রধান অভিপ্রায় হিসেবে কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সেকথা মেনে নিলে তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকাতের দল' কথাটিতেও আপত্তি ওঠবার কথা নয়।

অতঃপর য়ুরোপের নানা পরিবর্তনের ধারায় ক্রমশঃ সেই ক্ষত্রিয় সমাজের নিষ্ক্রমণ ঘটেছে; "রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে;"—রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধের মধ্যেই লিখে গেছেন—"শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোক-সাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের মূল বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের ইন্ধন উৎপন্ন করে।"

সেই বৈশ্য-শক্তির প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন—

"এখন বৈশ্য-মহাজনের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ধার্মিক কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা ফাঁকা মানুষের আর সমস্তই ওঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।"

ক্ষত্রিয়-শাসনে মানবসমাজে মানবসম্বন্ধ বজায় ছিল; বৈশ্য-শাসনে সে-জায়গায় ধনোৎপাদন ও ধনোৎপাদক, এই দুটি মাত্র কর্ম ও কর্তার প্রাধান্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সংকীর্ণতার ব্যাখ্যাসূত্রে লিখেছিলেন—

"ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলা-সৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের সম্বন্ধে দারিদ্র্য-ভীরু হইয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর মন সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপজ্জনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।" (৩)।

এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি পশ্চিমদেশের তৎকালীন ধনবৈষম্যের তৎকালীন প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত তুলে বলেছিলেন যে আমরা আমাদের দেশে ঠিক সেই পশ্চিমী বাদ-প্রতিবাদের নকল করতে চাইলে সে আচরণ সঙ্গত হবে না।

৩। লোকহিত—ঐ

P29680

"আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না।" তিনি খুবই স্পষ্ট করে বলেছিলেন—"তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত।'

সুতরাং অন্যক্ষেত্রে তিনি যদিও ঐতিহ্যবাদী, অধ্যাত্ম-বিশ্বাসী শান্তি-অনুরাগী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয়ে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সত্যিকার বাস্তব সান্নিধ্য বা ঘনিষ্ঠতাহীন কবি হিসেবে কোনো-কোনো হঠকারী সমালোচকের দ্বারা নিন্দিত হতে পারেন, কিন্তু সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যে ভবিষ্যদর্শী অগ্রগামীদেরই অগ্রগণ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐতিহ্যে তাঁর শ্রদ্ধাও যেমন আন্তরিক, প্রগতিতে তাঁর বিশ্বাসও তেমনি অকৃত্রিম। 'লোকহিত' প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি বলেছিলেন—

"আমাদের তন্ত্রসমাজ আরামে আছে কেন না আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিকে গুঁতিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে, নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার যো নাই। আমরা বড়ো জোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্তব্য করো, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিও না—এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন ঠেকাইব। চাদুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও—সে হয় না।"

এই কঠোর সমালোচনার মধ্যেই 'অধ্যাত্মযোগ' এর চেয়ে 'কুৎসিত লৌকিক যোগ' এর আবশ্যিকতার কথা তাঁর মনে এসেছিল। 'জ্ঞান শিক্ষা' নয়,—'উচ্চ শিক্ষা' নয়,—আমাদের লোক-সাধারণের জন্যে, ১৩২১ সালের এই প্রবন্ধে তিনি চেয়েছিলেন "কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা।" কারণ, "মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো।" লিখতে পড়তে শিখে মানুষ অন্তত নিজের নিজের কথা লিখবে, এবং পরের লেখা পড়বে, এই সম্ভাবনাটুকু অনিবার্য, এবং সেটুকু ঘটলে পরবর্তী বিস্তার যা বাকি ও অবশ্যম্ভাবী, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

এসব চিন্তা কেবলমাত্র একটি দুটি প্রবন্ধের মধ্যেই যে সম্পূর্ণভাবে তিনি বলে ফেলেছিলেন, তা নয়। নানান লেখার মধ্যে তাঁর এই লোকশক্তি-বন্দনার ভাবটি ধরা পড়েছিল। দেশকে যথার্থ শক্তিমান করে তুলতে হলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সমভাবে শক্তি-সঞ্চারের আনুকূল্য করা দরকার। য়ুরোপের কথাপ্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছিলেন, 'য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির ভারে পাড়িয়াছে।' আর আমাদের নিজেদের লোকাচার সম্বন্ধে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে "স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে—তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি অনেক বেশি।"

১৩২১-এর 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' এবং 'লোকহিত' প্রবন্ধ দুটির সঙ্গে এইসূত্রে তাঁর তৎকালীন 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধটিও স্মরণীয়। তাতে ঐ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত সম্পাদকীয় রচনার জের ধরে রবীন্দ্রনাথের নিজের দৃষ্টিতে য়ুরোপের চতুর্বর্গের দুরবস্থার বিশ্লেষণ দেখা যায়। মধ্যযুগের লোপের প্রভাব তখন অতীতের কথা। 'নাইটদের প্রভুত্বও কল্পকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে ;· ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের তো এবিষয়ে দুর্দশা! বৈশ্যই তখন সব চেয়ে প্রধান! তার নিজের কথায়—ক্ষত্রিয়বল তখন "শেঠজির মালখানার দ্বারে দারোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র।" কিন্তু আমাদের শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের কথাটাই যদিও সে প্রবন্ধের আপাতপ্রধান কথা তবু তারই মধ্যে ভবিষ্যতের গূঢ়তর সংকেত ছিল। পুরাকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে, রাজার সঙ্গে প্রীস্টসঙ্ঘের তথা লোপের বিরোধে দেখা গেছে প্রভুত্বের প্রতি দুঃশাসনের আগ্রহ। দেশের অন্যান্য স্তরে সে-বিরোধের বিষ খুব বেশি ছড়াতে পারেনি। কিন্তু বৈশ্যরাজক যুগে দেখা গেল "বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।" য়ুরোপের বণিকরাজের "সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।" তাঁর এই তৃতীয় প্রবন্ধটি আয়তনে প্রথম দুটির চেয়ে ছোটো, প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি জার্মানির অসামান্য মনোভাবের কথা তুলেছিলেন এবং তাতে জার্মানির শক্তি মহত্তার নিশ্চাই প্রাধান্য পেয়েছিল। সে সব কথা কতকটা প্রাসঙ্গিক মাত্র। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ সেই ১৩২১ সালে জানিয়েছিলেন—

"ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মন্বন্তর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।" ৪

৪। 'লড়াইয়ের মূল'—ঐ

রবীন্দ্র-স্মৃতি তর্পণ

কামাখ্যাপ্রসাদ রায়

হে কবি—

জীবন মরণের হাত ধরাধরি করি'
অখণ্ড জীবনেরে ঘেরিয়া ঘেরিয়া
কত না করেছ খেলা
এই ধরণীর বুকে ;—
কণ্ঠে কত সংগীত তান
উঠিয়াছে নিশিদিন
শুনাইতে মানবেরে
জুড়াইতে তাপিত পরাণ।

তোমার যে সংগীত ধ্বনি
জগতেরে সঁপিয়াছে
অমৃতের বাণী,
শংকিত হৃদয় তরে
নির্ভয় সে বাণী তব
মাভৈঃ, মা ভৈঃ রবে
বিতরিছে বরাভয়
অভয়ার—মানবের প্রাণে
কালের নিঃশেষ ভাণ্ডে
যে অমৃত রাখিয়া গেলে আজি
যুগে যুগে সেই রসপাত্র হতে
অনিঃশেষ জীবনেতে প্রবাহিবে ধারা ;
তৃষিত মানব যত—ওই সুধারাশি
আকণ্ঠ করিয়া পান—
মৃত্যুহীন কবি
তোমারি করিবে জয়গান।
ঊর্দ্ধমুখীন দেবতার সুখস্বর্গ স্মরি'
বহিবে না দীর্ঘশ্বাস আর
মানব-হৃদয় বিদারি'
এই 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' রচিবার
অক্ষয় কীর্তিরে তব করিয়া সফল
মানবের গৃহ মাঝে হে কবি
চিরকাল প্রচারিবে মাহিমা তোমার :
জীবনের বেদীতলে
আপন সাধনমন্ত্রে
মৃত্যুর আঁধার নাশি'
অমৃতের যে খুলিলে দুয়ার ॥

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যে ত্রয়ী

মীরা দত্ত

বিচিত্র রবীন্দ্রকাব্যে সুরের বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। তবু সমগ্রভাবে বিচার করলে খণ্ডের বৈচিত্র্যের শেষে একটি অখণ্ড উপলব্ধি পাওয়া যাবে। আমাদের এই খণ্ডজীবন তার সকল অসম্পূর্ণতা নিয়ে যে একটি অখণ্ড মহাজীবনের সঙ্গে যুক্ত এই উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের সায়াহ্নে এসে এই বোধ কবির মনে আরো গভীর হয়েছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য তার পূর্বজীবনের কাব্যসাধনারই পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি কাব্যগ্রন্থ, 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' ও 'শেষ লেখা' এদিক দিয়ে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। এই তিনটি কাব্যে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তা পরিণতিরই সুর। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবির যে উপলব্ধি হয়েছে তা তাঁর পূর্বজীবনের উপলব্ধি হতে মূলতঃ বিভিন্ন নয়। পার্থক্য শুধু এইখানে যে পূর্বজীবনের উপলব্ধি তখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে গিয়েছে। কবিকণ্ঠে যে বাণী নির্গত হয়েছে তা তাঁর মর্মোৎসারিত বাণী। রচনারীতিতেও এই পার্থক্যের আভাস পাওয়া যায়। কবির পূর্বজীবনের রচনার সঙ্গে তুলনায় দেখা যাবে যে উপরোক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থের বিশেষ করে 'রোগশয্যায়' ও 'শেষ লেখা'র রচনারীতি বিশেষ ভাবে নিরলঙ্কার অথচ ভাবসমৃদ্ধ। দু' একটি কবিতায় ভাবের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে রচনারীতির সাবলীল এমন চমৎকার সংযোজন ঘটেছে যে কবিতাগুলিকে উপনিষদের মন্ত্রের মতো মনে হয়।

কবিচিত্ত উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে এ পৃথিবী সুন্দর। প্রথম যৌবনে তাই কবি গেয়ে উঠেছিলেন—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—। জীবনের শেষে এসেও তিনি বলেছেন—

আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী—
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও,"

(রোগ শয্যায়)

আবার—"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি"—

(আরোগ্য)

আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চিত্রা-সোনারতরীর যুগের কবিকে, যে কবি বৃহৎ ধরণীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন; যিনি চেয়েছিলেন—

"সৈবালে শাবলে ফুলে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন রসে;"

(বসুন্ধরা—সোনারতরী।)

কিন্তু কবির কাছে দ্যুলোক ভূলোক মধুময় প্রতিভাত হয়েছে সে তো দুঃখকষ্ট মৃত্যুকে অস্বীকার করে নয়। জগতের আপাতমধুরতাকে অতিক্রম করেই কবির "এই উপলব্ধি ঘটেছে। তাই 'শেষ লেখায়' কবি বলেছেন—

"রূপ নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়—
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—"

এবং 'রোগশয্যায়'—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
কবির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনেদিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।"

আরো বলেছেন—

"তাই এই মরবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে
ভব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে—

• • • • •

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে
সত্যের আনন্দরূপ এধূলিতে নিয়েছে মূরতি।"

(আরোগ্য)

সত্যের এই আনন্দরূপ যার কাছে প্রতিভাত হয়েছে দুঃখের রাত্রি তাঁর কাছে তখু "কষ্টের বিকৃত ভান।" এই দুঃখকে অস্বীকার করলেই দুঃখের কাছে, মৃত্যুর কাছে মানব চিত্তের পরাজয়—

"বহুবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
তবুবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়—"

(শেষ লেখা)

প্রথম যৌবনে যে কবি প্রশ্ন করেছিলেন—'মৃত্যু কী ভবিষ্যা সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি?' সেই কবিরই জীবনের শেষ লগ্নে এসে উপলব্ধি ঘটল—

"ধূলির গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ-বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা;
চিনিলাম তখনি তাহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বক্ষের চরম দান মরণের বধূ;
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।"

(রোগশয্যায়)

মৃত্যু সম্বন্ধে এর চেয়ে গভীরতর উপলব্ধি আর কী হতে পারে?

মৃত্যুকে স্বীকার করেছেন বলেই খণ্ড জীবনের সঙ্গে অখণ্ড জীবনের যোগসূত্র আবিষ্কার করা কবির পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আর সেজন্যই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাণুত্বের বদলে একটি চলমান ভাবকেই দেখতে পেয়েছেন তিনি। "বলাকায়" কবি বলেছিলেন—

মনে আছে পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
গলিয়া গলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।"

'রোগশয্যায়' ও তিনি বলেছেন—

"অস্তিত্বের যে হৈর্য শতছিদ্র ঘটতলে ভরা—
অনুদান লাভ তার অনুদান ক্ষতিপথে করা;

• • • •
• • • •

চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।"

তাই—

"অনিঃশেষ প্রাণ—
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান।"

(রোগশয্যায়)

উদ্ধৃতি বহু করা যেতে পারে। আধিক্যের ভয়ে বিরত হলাম। বস্তুত, আলোচ্য তিনটি কাব্যগ্রন্থ কবির পূর্ব-জীবন ও উত্তর-জীবন, উভয়েরই পরিণতি স্বরূপ। কবির সারাজীবনের প্রশ্নগুলির উত্তর যেন তিনি পেয়ে গিয়েছেন 'সহজ বিশ্বাসে'। কিন্তু আলোচ্য কবিতাগুলি পড়লেই বোঝা যাবে যে এই 'সহজবিশ্বাসের' পথ আবেগের পথ

নয় প্রজ্ঞার পথ। কবির আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তা এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে যে উচ্চ চূড়ায় পৌঁচেছে। কাব্য-কলার দিক দিয়ে তাতে ভালো হয়েছে কী মন্দ তার বিচার ভবিষ্যতের সমালোচকরাই করবেন। তবে দার্শনিক তত্ত্বটুকু বাদ দিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থ তিনটির বহু কবিতাই কাব্যকলার দিক দিয়ে তাঁর পূর্বজীবনের বিখ্যাত বহু কবিতার সমকক্ষ। অথচ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থগুলিতে পূর্বজীবনের কাব্যের ছন্দ ও আঙ্গিকের মাধুর্য, চিত্রকল্পের মনোহারিতা বা অন্যান্য অলংকরণ কিছুই প্রায় নেই। তবু ভাবসম্পদে এরা অতুলনীয়—কারণ যে ভাব বিধৃত হয়েছে তা কবির উপলব্ধিজাত। তাই 'শেষ লেখার' কবিতায় অলংকার ভূষণ না হয়ে বন্ধন হয়ে দাঁড়াতো।

যে কবি মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও লিখতে পেরেছেন—

"মরীর মতন মৃত্যু
মুছে ফেলে ছায়া
পারেনা করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
অক্ষয় কবলে
একথা নিশ্চিত মনে জানি।"[১]

(শেষ লেখা)

তাঁর শেষ জীবনের কাব্য নিয়ে আশানুরূপ আলোচনা হয় নি এটা দুঃখের কথা। কিন্তু সে আলোচনা কালে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্রকাব্য একটি অখণ্ড প্রবাহ বিচ্ছিন্ন কলাশয় নয়। আর নদীর মোহানার রূপ তো উৎসের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই 'শেষ লেখা'কে বুঝতে হলে আমাদের 'প্রভাত সংগীত' হতেই সুরু করতে হবে।

॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

প্রফুল্ল কুমার দত্ত

পৃথিবীর মানুষের ব্যথাপ্লুত প্রাণের গভীরে
যত ব্যথা, সবি যেন তোমার কবিতা-কুঞ্জ ঘিরে
গুঞ্জরিত—এবিচার সেদিনের। অথচ আবার
এ মাটিতে ফিরে এলে দেখো, সে কুঞ্জের চারিধার,
আমাদেরি চাষ-করা আজে বাজে আগাছা-জংগলে
পরিপূর্ণ। তবু দেখো, গর্বকরি আমরা সকলে :
রবীন্দ্রনাথের কাল এত দিনে নিঃশেষে ফুরালো,
বাল্মীকির মহাকাব্য এযুগে কোথায় চলে ভালো ?

তাইতো তোমার সেই কাব্য-কুঞ্জ ছেড়ে ভয়ে ভয়ে
পালিয়েছে বীণাপাণি। অ-সুরে-ই বেতালে বে-লয়ে
ভূতের কান্নার মত তোমার কবিতা আর গান
বছরে দু'বার করে উচ্চারিত। যথেষ্ট সম্মান
এর মাঝে দেওয়া হয়, যেহেতু আমরা অনেকেই
এমন কবিতা লিখি যা তোমার সারা কাব্যে নেই।।

প্রবন্ধ

কবিগুরুর শেষের কবিতা

অধ্যাপিকা সুনন্দা দাশগুপ্ত

'শেষের কবিতা' উপন্যাসটিকে অন্যান্য সাধারণ উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। সাধারণ উপন্যাসের মানদণ্ডে ইহার বিচার করিলে 'শেষের কবিতা'র প্রকৃত রসোপলব্ধি ঘটে না। শেষের কবিতা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গ্রন্থের নামকরণই ইহার প্রমাণ। অনুভূত ভাবকে আবেদনশীল এবং ঘনীভূত করার জন্য গ্রন্থে প্রায়ই কবিতার ব্যবহার হইয়াছে। গ্রন্থের যাহা বক্তব্য, তাহার সারাংশটুকু কেন্দ্রবস্তুটুকু কবিতার মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে।

শেষের কবিতার নায়ক অমিত রায়। ইংরাজ বন্ধু ও বান্ধবীদের মুখের উচ্চারণে তাহার পদবীর শ্রী গেল ঘুচিয়া, সংখ্যা হইল বৃদ্ধি। সংক্ষেপে তাহার নাম দাঁড়াইল 'অমিট্রায়ে'। বিলিতি আবহাওয়া এবং দিশী সংস্কৃতি—উভয়েরই প্রভাব পড়িয়াছে তাহার চরিত্রে। নিজস্ব মতামতের দ্বারা অমিত একটি অসাধারণ বিশিষ্টতার পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারিয়াছে—তাহার নেশা আছে টাইলে। "কেবল সাহিত্যবাজাই কাজে নয়—বেশভূষার ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে—পাঁচজনের মধ্যে ও যেকোন একজনমাত্র নয়—ও হল একেবারে পঞ্চম।" "অমিতের দুর্লভ দুরকম নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসাবী, উচ্ছৃঙ্খল, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না"। কিন্তু সর্বোপরি সত্য হইয়া আছে একটি কথা—"অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে, তবু কিছুতেই ধরা দেবেনা।" এ হেন অমিত রায় শেষের কবিতার নায়ক। অমিত চরিত্রটিকে ঠিক বাস্তব উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। সাধারণতঃ উপন্যাসের নায়কের মধ্যে আমরা দেখি অবিমিশ্র বাস্তবতা এবং তাহার অন্তর্লোকের মধ্যে বীজাকারে সুপ্ত এক বিরাট সম্ভাবনার অঙ্কুর, যাহা পরবর্তী ঘটনাসমূহের বিচিত্র উত্থানপতন ও ঘাতপ্রতিঘাতের বিবর্তনে এক সুবিশাল মহীরুহের রূপ ধারণ করে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলাল অথবা 'চোখের বালির' মহেন্দ্র চরিত্র ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গোবিন্দলালের অন্তরে সুপ্ত ছিল অতৃপ্ত রূপাকাঙ্ক্ষা আর মহেন্দ্রের অন্তরের বাসনাকে আশার মৃদুমধুর কৈশোরমাধুর্য পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না। পরবর্তীকালের অবশ্যম্ভাবী ঘটনার কারণ ইহাই।

কিন্তু শেষেরকবিতার অমিতের মধ্যে ঠিক এই ঔপন্যাসিক নিয়মতান্ত্রিকতা কোথাও প্রভাববিস্তার করে নাই। সে একেবারেই স্বতন্ত্র। অমিতের একটি জীবন-দর্শন আছে বটে কিন্তু তাহার দৃষ্টিভঙ্গী নিছক ঔপন্যাসিক চরিত্রের অনুযায়ী নহে। অমিত ব্যক্তিসর্বস্ব—একান্তরূপে কবিধর্মের প্রতীক। অমিত তাহার অন্তরের শিল্পী মানুষটির কথাই প্রকাশ করিয়াছে, বহির্জগতের বাস্তব তাহার কাছে তুচ্ছ। অমিতের এই সৌন্দর্যবোধের প্রাবল্যেই সে শুধু সমাজ কেন, সমস্ত প্রচলিত বিধিকেই উপেক্ষা করিয়াছে—এবং উপহাস করিয়াছে। এখানে মনে হইতে পারে, অমিত যখন সমাজকেই উপেক্ষা করিয়াছে, তখন সে তো 'শেষপ্রশ্নের' কমলের সমগোত্রীয়।

কিন্তু শেষের কবিতায় কোন প্রশ্নই বড় হয় নাই। এখানে সমার্থ সমস্তারূপে দেখা দেয় নাই। শেষের কবিতায় "একটি বাধায় পুরুষ একটি বিরাট শিল্পীজীবনের আইডিয়া বা প্রত্যয়ের প্রতিভূস্বরূপ আপনাকে নবনবভাবে, বিচিত্রতর উপায়ে" প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। শেষপ্রশ্নের নায়ক-নায়িকা মর্ত্যের মাটির মানুষ আর শেষের কবিতার নায়ক আর্টিস্ট—সে আপনাতে আপনিই বিকশিত—কেবল তাহার অন্তরের উদ্বেল ভাবরাশিকে যথাযথরূপে প্রকাশ করার অনুকূল পরিবেশ রচনার কাজেই প্রয়োজন হয় লাবণ্যকে। সেজন্যেই লাবণ্যের অন্তরের নির্লিপ্ত শান্তি এতটুকুও ব্যাহত হয় না—লাবণ্যের নিঃসীম প্রশান্তির মধ্যে এতটুকুও রাগ নাই, ক্ষোভ নাই, অভিমান নাই—

"তোমার হয়নি কোন ক্ষতি।
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা—
পূজার সে খেলা
আঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের প্রাণস্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত আবেগবেগে
যেই নাহি হবে তার কোন ভুল নৈবেদ্যের থালে,
তোমার মল্লসভোগে সযত্নে সাজালে
সে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।"

লাবণ্যের মধ্যেকার প্রেরণা অমিতের জীবনপ্রবাহকে উজ্জীবিত করে, তাহাকে নবনব রূপে প্রকাশিত করে। এখানে লাবণ্য তাহার নিজত্বের জন্য অমিতের কাছে সার্থক হয় নাই—সার্থক হইয়াছে এই প্রেরণা যোগাইবার জন্য। লাবণ্যের মধ্যে অমিত যে অনন্যসাধারণতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা তাহার নিজেরই আবিষ্কার, আপন প্রয়োজনেই অমিত লাবণ্যের অসাধারণত্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। "যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা করে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন।" শেষের কবিতায় তাই দেখি অমিতের স্বরূপের প্রকাশ—

'আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন
তার তার না রহিবে—না রহিবে দায়।'

অমিতের এই মানসবৃত্তিই লাবণ্যের সহিত বিচ্ছেদে কোন ক্ষোভের সৃষ্টি করে নাই। শেষকালে সে লাবণ্য ও কেতকীর মধ্যে আপন মনোধর্মিতা দ্বারাই একটা সন্ধি (compromise) করিয়া নিয়াছে। অমিতের জীবনদর্শনে চলাটাই মুখ্য—গতিটাই সব। এইজন্যই বিবর্তনেরও প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়,—শেষের কবিতা রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে বোধহয় 'বলাকা'র দুই নারীর ভাবই নিহিত ছিল—

"একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য অগ্নিরসে কামনের সুধাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি।
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়।"

একজনের আকর্ষণীশক্তি সীমাহীন আকাশের মত। কাছে টানে কিন্তু সেখানে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়া যায় না—আর একজন ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ নীড়—অসীম আকাশের উদারতার ঐশ্বর্য তাহার নাই—কিন্তু আশ্বাসের মাধুর্য আছে। এ দুইটিই অপরিহার্য—শুধুমাত্র আর্টের ক্ষেত্রে নহে—জীবনের ক্ষেত্রেও। জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতায় প্রয়োজনের সীমাবদ্ধ গণ্ডী এবং অপ্রয়োজনের উন্মুক্ততা এ দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। অসীম ও সীমার মিলনেই জীবন হয় সুন্দর—অন্যথায় তাহা তো একটা ক্ষণিকের বিরাট ফাঁকি মাত্র। আমাদের জীবনে সন্ধীর্ণের পরিচয় মেলে সুনির্দিষ্ট জীবন-যাপন প্রণালীতে এবং সেই প্রাত্যহিক অনুবর্তনের মধ্যেই অবচেতনা উর্বশীর মত আমাদের অপ্রয়োজনের আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করে। অমিত রায়ের মধ্যে এই উর্বশীই প্রবল। তাই সে কোন বন্ধনেই আবদ্ধ হইতে চায় না। লাবণ্যকে অমিতের প্রয়োজন কেবল বাক্যের নির্ঝরিণীকে উন্মুক্ত করার জন্য—"যে সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার তার বোধ করে, কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে," জমাটবুদ্ধিকে প্রকাশের মুক্তি দিবার জন্যই লাবণ্যের প্রয়োজন—লাবণ্যের স্বকীয়তার জন্য নহে।

নারী কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপথে এই ধরণের মনোভাবের অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য্যে কখনও আপনাকে পরিপূর্ণ মনে করে না। নারীর সহজাত প্রবণতা গৃহরচনার অনুকূলে। তাই লাবণ্য একবা বুঝিয়াছিল যে, "অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাত্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প সুরু করে; তারপর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায়, গল্পের গাঁথন ছিন্ন—পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকী," "যেটা পাবে, সেটা যে আবার রাখতে হবে, এটা অমিতের ধাতের সঙ্গে মেলেনা"। এই অমিতের জন্যই কিন্তু শোভনলাল লাবণ্যের কাছে মহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই শোভনলালকে লইয়াই লাবণ্যের গৃহরচনার আকাঙ্খা সফল হইতে পারিবে।

শেষের কবিতায় 'নীড় ও আকাশের' রূপকে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে আমরা ঠিক বাস্তবজীবনের পটভূমিকায় মানিয়া লইতে পারি না। অমিত একস্থানে বলিয়াছে—"যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে যেন মরু, যে ভালোবাসা বিশেষ-ভাবে প্রতিদিনের সবকিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে যেন আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।" ভালোবাসার এই ব্যাখ্যা অভিনব—কিন্তু তাহা বাস্তবতার পর্য্যায়ে পড়ে না। বাস্তবক্ষেত্রে অমিত ও লাবণ্য কি এত সহজে পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিত? অমিত বলিয়াছে 'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করবো—আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" বাস্তবজগতে ভালবাসা ভাগবাটোয়ারার দাবী মানেনা, সেখানে এই দ্বৈতবুদ্ধিতেই আসে দ্বন্দ্ব। অমিত অতি সহজেই তাহার আদর্শ বা আইডিয়ালিজমের উল্লেখ করিয়া এই দ্বন্দ্বের নিরসন করিয়াছে। তাই কেতকীর সহিত সুদীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনের পথে কোথাও বাধা পড়ে নাই। লাবণ্যের ইতিকাহিনীও তাহার সহিত একসুরে ধ্বনিত হইয়াছে। অমিতের এই আর্টিষ্ট সত্তাটির জন্যই কেতকীর সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন—"মেয়েরা দুইজাতের ● ● ● ● একজাত প্রধানতঃ মা, অপরজাত প্রিয়া।" একজন মায়া সৃষ্টি করে, অপরজন স্নেহ ও ভালবাসা অজস্রধারে বর্ষণ করিয়া আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দাবী করে।

কিন্তু কেবলমাত্র ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া কেহ জীবন-যাত্রাপথের মতামতের সৃষ্টি করেনা অথবা সেই অনুযায়ী একটা বাঁধাধরা অনুলিপির সৃষ্টি করিয়া নেয় না। অমিতের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপই ঘটিয়াছে—তাই বাস্তবজগতে যাহা প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিত, সেখানে বর্তমান ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই ওঠে নাই। লাবণ্য অনায়াসে কেতকীকে তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে কারণ লাবণ্য জানে—

"মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই—
শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই।
• • • • • •
• • • • • •
তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
দেখা মোর তিলে তিলে দান
করুণ মুহূর্তগুলি গভীর ভরিয়া করে পান
হৃদয় অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান।
তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত গণী তত করেছ আমায়।"

সেই কারণেই লাবণ্য কোন সমস্যাকেই না মানিয়া "হে বন্ধু বিদায়' বলিয়া অতি সহজে বিচ্ছেদ রেখাটি টানিয়া দিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাস্তবজগতে সত্যই কি কোন নারী কেবলমাত্র প্রেরণা যোগাইবার ব্যাপারেই অপ্রত্যু প্রেমের পরম সার্থকতা অনুভব করে?

শেষের কবিতা একান্তভাবেই কাব্যধর্মী। তাই যেখানে সমস্যার উদয় হইয়া একটা জটিল আলোড়নের সৃষ্টি হইতে পারিত, সেখানে লাবণ্য বলিতে পারিয়াছে—

"নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির তালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

বাস্তবজীবনের কোটি অমিত লাবণ্য শোভনলাল কখনও এতবড় বিসর্জনের পর পূর্বকার ঘটনাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে পারিত না। প্রেমের নিবিড়তার মাঝেও "ফুলের অন্তর সম, ক্ষুদ্রদৃষ্টি অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম" কোন কাঁটা বিঁধিতে থাকিত। কিন্তু শেষের কবিতায় অমিত একটা দিওয়ালী গড়িয়া লইয়াছে এবং লাবণ্যের বিদায় ব্যাপারেও কোন অসন্তোষ রেখাপাত করিতে পারে নাই। শেষের কবিতা ঠিক বাস্তব উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত নয় বলিয়াই ইহার উপসংহার কোন জিজ্ঞাসার চিহ্নকে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরে না।

আর একটি কথা বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তাই তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে কবিজনসুলভ রোমান্টিসিজমের নিবিড়তা বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন করিয়া এক বিচিত্র রস-বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবতাপ্রয়াসী সমালোচকের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য শেষের কবিতার সৃষ্টি হয় নাই—মনে রাখিতে হইবে ইহা সাধারণ কাহিনী নহে—ইহা একান্তই "শেষের কবিতা।"

গল্প

অন্তরা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে। অবনীর মনে হ'ল ধরণী আর একবার দ্বিধা হোক। সীতার মতন গ্রাস করুক তাকে।

একহাতে আড়াই সের ইলিশ। গন্ধেছবা। অন্য হাতে রুমাল বেঁধে ঝোলানো ঝোড়া ঝুলকপি। ওজন অবহেলার নয়। শুধু তাই নয়। মাছ কেনার ব্যাপারে ধস্তাধস্তির চিহ্ন অবনীর সর্বাঙ্গে। বুকে কামার ছাপ, চুণ্ডপদচিহ্ন নয়, প্রতিযোগী ক্রেতাদের হাতের দাগ। আধ-ময়লা ধুতি হাঁটুর ওপর ওঠানো। কাদিসের ছুতোজোড়ার অবস্থা মধ্যবিত্তেরও অধম। ওপরে হালকা চাকচিক্য। তলা বয়ে চামড়ার চিহ্ন নেই। নবরত্নর মতন এক পায়ের কড়ে আঙুলটা চামড়ার আবরণভেদ করে উঁকি দিচ্ছে।

একেবারে পাশে যার হাজারী বুইক। আইভরি ঝকঝকে ষ্টিয়ারিং। ষ্টিয়ারিং ধরে যিনি, তিনি আরো ঝকঝকে। পরণে হালকা সিল্ক। ধি কোয়ার্টার ব্লাউজ। দু গালে রক্তের ছোপ। দু চোখে মুনিজনবিভ্রমকারী কটাক্ষ। অধরে মৃদু হাস্য।

—আরে অবনীবাবু না? চিনতে পারছেন?

চিনতে অবনী ঠিকই পেরেছিল। চেহারা একটুও বদলায় নি, শুধু প্রসাধনের প্রভাবে একটু উগ্র হয়েছে।

দু'হাত জোড় করে নমস্কার করবে অবনীর এমন অবস্থা নয়। ওরই মধ্যে ঘাড় নেড়ে নিষ্ফল রক্ষা করল। মুখে বলল, বারে আপনাকে চিনতে পারব না?

—তা সত্যি, আমার জিজ্ঞাসা করাই ভুল হয়েছে। আপনিই তো লিখেছিলেন জন্মজন্মান্তরেও ভুলবেন না আমাকে। ঠিক চিনতে পারবেন, তাই না?

অবনী সৌরাঙ্গ নয়। সারা মুখে কালির পোঁচ লাগল।

বছর দশেক আগের ব্যাপার। অবনী তখন জোয়ান ছোকরা। আই এর আগল পেরিয়ে সবে বি, এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, সেই সময় বাইরের কোন কলেজ থেকে এল রীণা রায়। এক ঝলক দক্ষিণের বাতাসের মতন। সারা ক্লাসে কচি পাতার কাঁপন লাগল।

সকলের মুখেই রীণা রায়ের নাম। মেয়েরা-তার চলন, বলন, পনিটেল খোঁপার মোলন নকল করতে লাগল। আর ছেলেরা পারলে বুঝি রীণারায়ের নাম ছাপানো নামাবলীই গায়ে দেয়।

শুধু ক্লাসে নয়, ডিবেটিং ক্লাবে, অলসাহ, অভিনয়ে সব জায়গায় রীণার একাধিপত্য। তাকে ঘিরেই জনতা। তাবকদের সেই মিছিলে অবনীও ছিল, তবে পুরোভাগে নয়।

লেখাপড়ায় অবনী তেমন সরেস ছিল না বটে কিন্তু ফুটবলের মাঠে সে ডেকি খেলাত। প্রতিপক্ষ সন্দেহ করত অবনী বলাকের পায়ে নিশ্চয় আঠা লাগানো আছে, নয়তো বলটা এমনভাবে ওর পায়ে আটকে থাকেই বা কি করে? পেনাল্টী-সীমানার মধ্যে বল পেলে, বল আর আটকা পড়বেই। গোল-কীপারের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নেই তার গতিরোধ করে।

এক ফাইনাল খেলায় রীণার সঙ্গে অবনীর আলাপ। এর আগে অবনী অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু দিকে

ছেড়ে নি। চক্রব্যূহ ভেদ করে রীণার নাগাল পায় নি।

প্রতিপক্ষের গোলের দিকে অবনী তীরবেগে ছুটছিল। দু পায়ের ফাঁকে বল, হঠাৎ নারীকণ্ঠের চিৎকারে মাঠ মুখরিত। বাক আপ বসাকণা ভোল্টমিস ইট।

ইদানীং কিছু কিছু সহপাঠিনীরা খেলার মাঠে যমা হয় বটে, কিন্তু তারা টু শব্দটি করে না, খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা। এ কণ্ঠ অবনীর অচেনা নয় আর এ সাহস একজনেরই থাকা সম্ভব।

মুখ ঘুরিয়ে রীণাকে দেখতে গিয়ে অবনী ভুল করল। ও পক্ষের ডিফেন্স ব্যাক বলটা নিজেদের বিপদজনক সীমানা পার করে দিল।

কিন্তু অবনী দমল না। চোখ ঘুরিয়ে পলকের জন্য যে দৃশ্য সে দেখেছে, তাতে মন বাড়ল। চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে রীণা রায় গোলাপী রুমাল ওড়াচ্ছে। সেই মুহূর্তে অবনীর মনে হ'ল ওই রঙীন রুমালকে পতাকা করে সে বিশ্ববিজয় করতে পারে, প্রতিপক্ষের গোল তো ছার।

খেলার শেষে রীণা রায় ছুটে এল সব চেয়ে আগে। অবনীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, congratulations. আপনি কলেজের মান বাঁচিয়েছেন।

অবনীর অবস্থা কাহিল। শেষ গোলটা দেবার সময় পায়ে একটু চোট লেগেছিল, কিন্তু এবার চোট লাগল বুকে। সমস্ত শরীর ঝিন ঝিন করে উঠল। অবনী বাড়ী ফিরল হাতে রুমাল জড়িয়ে। বোনের প্রশ্নের উত্তরে বলল, কব্জি ভেঙেছে। বোন উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করল, একটু চুন-হলুদ গরম করে দিই দাদা? গলায় দার্শনিক নির্লিপ্ততা মাখিয়ে বলল, না দরকার নেই। মনে মনে ভাবল, শুধু হাতে হলুদ দেওয়ার ব্যাপার তো নয়, সারা গায়ে হলুদ লেপতে হবে তারই উপক্রমণিকা।

তারপরের কথাও অবনীর মনে পড়ছে। পড়ার বই দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। কাছে রেখেও লাভ নেই। পাতা খুললেই লাইনগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে রীণার মুখের আদল তৈরী করে। দেবদিমোনা আর রীণা রায় মিশে একাকার।

কিন্তু রীণা রায় আর আমল দিল না। খেলার মাঠেই খেলা শেষ।

হঠাৎ সুযোগ ছুটে গেল। সেট বাঁচাবার জন্য অবনী কোনাকুনি রান পাচ্ছিল, মুখোমুখি দেখা রীণা রায়ের সঙ্গে।

অবনী থমকে দাঁড়াল। একদৃষ্টে রীণার দিকে চেয়ে রইল। রীণার পায়ের কাছে চীনাবাদামের খোসার স্তূপ, কিন্তু অবনীর মনে হল পুষ্পস্তবক।

—কি দেখছেন? রীণা মুচকি হাসল।

সে হাসিতে অবনী ত্রিভুবন ভুলল। নিজেকেও। যা জীবনে করেনি, তাই করে ফেলল। এক হাত বুকে রেখে মধ্যযুগীয় নাইটের ভঙ্গীতে বলল,

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস।
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

—বা, মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে রীণা হেসে উঠল, বা, আপনি দেখছি সব্যসাচী। দুটবলও খেলেন, কবিতাও বলেন।

সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরে অবনী চিঠিটা লিখেছিল। অনেক কসরত করে, ভাল ভাল কথার বুকনি দিয়ে আড়াই পাতা চিঠি। কিন্তু একটা হৃদয়ের বিস্তারের পক্ষে আড়াই পাতা আর কতটুকু। দিন দুয়েক চিঠিটা অবনীর কাছেই ছিল, দেওয়ার সুযোগ হয় নি। তিনদিনের দিন লাইব্রেরি ঘরে রীণাকে একলা পেয়ে অবনী চিঠিটা তার সামনে ফেলে দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। দু দিন আর কলেজে আসে নি।

বরাত অবনীর। কলেজে এসেই ক্লাসের চৌকাঠে বরাবর রীণার মুখে দেখা। পাশে ছোকরা প্রফেসর তপেশ লাহিড়ী। অবনী পাশ কাটাতে যেতেই তপেশ বাধা দিল, কি খবর অবনীবাবু, দু'দিন কামাই যে?

—শরীর ভাল যাচ্ছিল না। অবনী আমতা আমতা করল।

রীণা উচ্ছসিত হেসে উঠল, মন ঠিক ছিল তো?

মুখের আগলটাক নেই মেয়েটার। স্থান কাল পাত্র জ্ঞান নেই। অবনী পালিয়ে মান বাঁচাল।

—আসুন, উঠে আসুন।

আচমকা রীণার গলার আওয়াজে অবনীর চিন্তার জাল ছিঁড়ে কুটিকুটি।

—আমাকে বলছেন?

—তা ছাড়া আর কাকে এমন করে আহ্বান জানাব। রীণার হাসি অম্লান।

অবনী আড়চোখে একবার নিজের সাজপোষাকের দিকে আর একবার হাতের বোঝার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, থাক এই সব জিনিসপত্র নিয়ে উঠব, দাগ টাগ লেগে যাবে।

রীণা হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল, কি আশ্চর্য, আমাদের জিনিসপত্রও তো গাড়ীতেই আসে। যদি একটু দাগ লাগেই, সেটা আশা করি ভুলে ফেলাও যাবে। জীবনে মুছবে না এমন দাগের কথা যদি বলেন, সে অবশ্য আলাদা কথা।

অবনী আর একটি কথাও না বলে গাড়ীতে উঠে পড়ল।

—আপনি থাকেন কোথায়? গিয়ার পাল্টাতে পাল্টাতে রীণা রায় জিজ্ঞাসা করল।

—তুলসী কর্মকার লেন। একদিকে কাত হ'য়ে অবনী ছোয়াচ বাঁচাল। রীণা রায়ের পাশে বসতে পারলে এক-দিন অবনী বর্তে যেত, কিন্তু আজ আর সে দিন নেই, বোধ হয় সে মনও নয়।

—কাজ করছেন কোথায়? শিডোমিটারের কাঁটা ত্রিশ চল্লিশের ঘরে। অবনী মাছ আর কপি গায়দাতে ব্যস্ত। তার মধ্যেই উত্তর দিল, রেলে কাজ করি। শেয়ালদায়।

—কলকাতাতেই আছেন বরাবর, মানে কলেজ ছাড়ার পর।

—হাঁ।

—আশ্চর্য, আমিও তো আছি, অথচ দেখা হয় নি।

আক্ষেপ তো অবনীরও সেইখানে। রোজই যে সে এমনি অবস্থায় ঘোরাফেরা করে এমন নয়। মাঝে মাঝে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ও পরে। আজকের বোঝার বদলে হাতে লাইব্রেরির বই কিংবা খবরের কাগজও থাকে। তেমন দিনে রীণা রায়ের মোটর তো অনায়াসেই ব্রেক কষে পাশে এসে দাঁড়তে পারতো তা হ'লে আজকের মতন এমন অপ্রস্তুত হ'তে হতো না নিজেকে। এমন অপদস্থও নয়।

—কলেজের দিনগুলো বেশ কেটেছে, তাই না, অবনী-বাবু? ক্ষিপ্রহাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রীণা এক পথচারীকে পরমাণু ভিক্ষা দিল।

অবনী কোন উত্তর দিল না। কেবল আড়চোখে রীণা রায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। মনে ভাবল, দিনগুলো এখনই বা তোমার কি এমন মন্দ কাটছে।

পোশাক পরিচ্ছদে তেমনি চালাও বিলাসিতা। দামী গাড়ীর চালনচক্র তোমায় করায়ত্ত। গলার অড়োয়া হারটা অবনীর সারা বছরের বাজার খরচ চলার পক্ষে যথেষ্ট।

বরং কলেজের দিনগুলো অবনীর ভাল কেটেছিল। বাপের হোটেলের বিনাপয়সার বোর্ডার। চিন্তা ভাবনার বালাই নেই। এক একটা দিন প্রজাপতির পাখার মত। তেমনি চঞ্চল, তেমনি বিচিত্র।

মোটর বাঁ দিকে মোড় নিতেই অবনী চেঁচিয়ে উঠল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? সোজা যেতে হবে আরো অনেকটা।

গেটের মধ্যে মোটর ঢোকাতে ঢোকাতে রীণা হাসল, সোজা পথ আর আমার ভাগ্যে জুটল কোথায় অবনীবাবু। কেবল বাঁকের পর বাঁক।

গাড়ীবারান্দায় মোটর থামতেই দরোয়ান দরজা খুলে সেলাম করে সরে দাঁড়াল।

—নামুন অবনীবাবু। এতদিন পরে দেখা, বাড়ীতে একটু চা খেয়ে যাবেন।

মোটরের ড্যাশবোর্ডে মাথা ঠুকতে ইচ্ছা হ'ল অবনীর। ভিড় এড়াবার জন্য গলি খুঁজি ছেড়ে বড় রাস্তা ধরার আচ্ছা শাস্তি হয়েছে। কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে কে জানে। তার ওপর পোশাকের হাল দেখে দরওয়ানটাও যেন মুচকি হাসছে।

না নেমে উপায় নেই। দেরী করলে রীণা রায় হয় তো হাত ধরে টেনে নামিয়ে আরো কেলেঙ্কারী বাড়াবে। তার অসাধ্য কিছু নেই।

কুপি আর ইলিশ গুছিয়ে অবনী নামতেই রীণা বাধা দিল, ওগুলো মোটরেই থাক অবনীবাবু। আমি কথা দিচ্ছি, কেউ ও জিনিস ছোঁবে না। নজরও দেবে না। আপনি আসুন।

অপ্রস্তুত অবনী তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো রেখেই নেমে পড়ল।

কার্পেটপাতা সিঁড়ি। শুধু গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে ওঠার অবনী অনেক কসরত করল, কিন্তু পারল না। কিছু ঘামার ছাপ লাগলই। জামার আস্তিন দিয়ে কপালে জমে ওঠা ঘামের ফোঁটা মুছে নিল।

পর্দা সরিয়ে রীণা কাকে উদ্দেশ করে বলল, Hallo, কখন ফিরলে? এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার কলেজমেট অবনী বসাক। নামকরা স্পোর্টসম্যান। আর ইনি মিষ্টার অরুণ বসু। কথা শেষ করে রীণা দু'জনকে ডাকলো। আকর্ণ হেসে বলল, এঁর বাকি পরিচয়টা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

অবনী কিছু বুঝতে পারে নি। বুঝতে চেষ্টা করলেও পারত কিনা সন্দেহ। কারণ আচমকা ঠোক্কর লেগে জুতোর চামড়ার অনেকখানি খুলে গেছে। পায়ের আঙ্গুল রাখা আর বুঝি কোনমতেই সম্ভব নয়।

মিষ্টার বাসু বিচক্ষণ লোক। অবস্থাটা বুঝলেন। প্রসারিত হাতটা গুটিয়ে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার।

রীণার নির্দেশে চেয়ারে বসতে গিয়ে অবনী বিব্রত হ'ল। মিষ্টার বাসু স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, এঁকে বরং তোমার ঘরে নিয়ে বসাও রীণা। আমি তো এখনি বেরিয়ে যাব।

এক মুহূর্তের জন্য রীণার দুষ্টু চোখে বিদ্যুতের দাহ। আরো আরক্তিম হ'ল দু'টি গাল। রক্তের ছোঁয়া ছাড়াই।

—চলুন আমরা ওদিকে গিয়ে বসি।

গাঁদা আর ক্রোটন গাছের মেলা। ফাঁকে ফাঁকে বেতের চেয়ার। অবনী বসল, রীণাও। চা এল, সঙ্গে দেশী বিদেশী খাবার। অবনী প্রথমে আপত্তি জানাল, অসময়ে খাওয়া অভ্যাস নেই। কিন্তু একটি টুকরোও ফেলল না। এক শ্রু বিয়ালী টাকা মাইনের এ সব জিনিস নিজের বাড়ীতে খাওয়া সম্ভব নয়।

রীণা শুধু একগ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিল।

—উনি কি করেন? স্যাণ্ডউইচ কামড়াতে কামড়াতে অবনী জিজ্ঞাসা করল।

চোখে মুখে রীণা একটা কপট বিস্ময়ের ভাব ফোটাল, সেকি ব্যারিষ্টার অরুণ বাসুর নাম শোনেন নি? আজ-কালকার উঠতি ব্যারিষ্টারদের মধ্যে উনিই অগ্রগণ্য।

দুর্গতি-হরণ, অপরাধীর পরাহরণ, সবই অবশ্য বিনের বিনিময়ে।

কথা বলতে বলতেই রীণা থেমে গেল। আবার দু চোখে বিদ্যুতের জ্বালা। সিঁড়িতে ভারি জুতোর শব্দ। মিটার বাস নেমে গেলেন।

দু এক মিনিট উসখুস করে অবনী বলেই ফেলল, আমি এবারে উঠি। বলেতো আসিনি। বাড়ীতে আমার ভাববে।

রীণা খিল খিল করে হেসে উঠল। ওই দেখুন, আপনার যে বাড়ীতে ভাববার লোক রয়েছে, সে কথা আমার মনেই নেই। সত্যি, আপনাকে আর আটকাব না। বাবাদুরকে বলছি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

দুজনে উঠে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নামল পাশাপাশি।

খুব মৃদু গলায় রীণা বলল, আমার অবশ্য ভাবনা চিন্তার বালাই নেই। মাঝরাতে স্বামীদেবতা যখন টলতে টলতে আসেন, দরজা খুলে দেবার জন্য গোটা চারেক ঝি চাকর রয়েছে। আমায় জেগে বসে থাকতে হয় না, আরাম করে ঘুমোই।

—আশ্চর্য, লঘু সুরে আরম্ভ করলেও শেষ দিকে রীণার গলাটা বেশ ভারি হয়ে উঠল। চমকে অবনী চোখ ফিরিয়েই দেখল জল টলটল দুটি চোখ।

সব কিছু ভুলে পকেট থেকে রুমাল বের করতে গিয়েই অবনীর খেয়াল হ'ল। রুমাল দিয়ে কফি বাঁধা হয়েছে। হাতেও বেশ আঁসটে গন্ধ। জিনিসগুলো মোটরে পড়ে রয়েছে।

ইলিশ আর ফুলকপি টাটকা না খেলে স্বাদই পাওয়া যায় না।

মাছ আর কপির সাইজ দেখে কমলার দুটো চোখে যে বিস্ময় আর আনন্দ ফুটে উঠবে তা কল্পনা করে অবনী কাছের একজোড়া চোখের কথা বেমালুম বিস্মৃত হ'ল। খুশী মনে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। রীণা রাস্তাকে অনেক পিছনে ফেলে।

[নাটিকা]

শহরতলির স্বপ্ন

কুমার লাল দাশগুপ্ত

[শহরতলীর একটা ছোট বাড়ী, দেয়াল ইটের, কিন্তু চাল টিনের। একখানা ছোট্ট ঘর, সামনে ছোট্ট বারান্দার কোনে একটা মাদুর, একটা জীর্ণ ছাতা দাঁড় করানো, দেয়ালে টানানো ছোট আয়না, দড়িতে ঝুলছে ময়লা শাড়ী, দরজার সামনে একজোড়া ছেঁড়া জুতো। বারান্দার একপাশে একটা ছোট জানালা, রাস্তা দেখতে পাওয়া যায় সেখান দিয়ে। উঠোনের এক অংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

চৌদ্দ বছরের একটি ময়লা শাড়ী পরা মেয়ে উঠোনে খালি বালতি রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, পেছনে আসে সাত বছরের ছোট ভাই।]

ভাই— ওদিদি, বসলে যে, এখনও দুবালতি বাকি আছে।

মেয়ে— বাকি নেই, বার বালতি আনা হয়ে গেছে।

ভাই— না গো না, বার বালতি আননি, দশ বালতি এনেছো, আমি গুনেছি।

মেয়ে— আর আমি পারি নে।

ভাই— মা বকবে।

মেয়ে— (হাত দুটি মুঠো করে) হাত ব্যথা তোর আক্কেল নেই, কাজে পাঠিয়ে তোর আশায় বসে

ভাই— চলো, আমি তোমার সঙ্গে হাতল ধরছি।

মেয়ে— যা, বালতি নিয়ে কলতলায় বসিয়ে দেগে, আমি যাচ্ছি

(ভাই বালতি নিয়ে যায়, মেয়েও ব্যস্ত দুই হাত দুখানা ঝেড়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে চলে যায়। একটু পরে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ান ছেলেমেয়েদের বাবা, গা খালি, রোগা চেহারা, মাথার কাঁচাপাকা চুল, হাতে একটি বিড়ি)।

বাবা— কৈরে লতি, লতি। এই তো কথা শুনলুম, কোথায় গেল আবার।

ঘরের ভিতর থেকে মায়ের গলা—কল তুলতে গেছে।

বাবা— তাই গেছে। দেশলাইটা কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছিনে।

মায়ের গলা—উনুন ধরাতে নিয়ে গেছে বুঝি।

বাবা— তাই নিয়েছে (আবার ঘরে গিয়ে ঢোকেন)

(জল ভরা বালতি নিয়ে লতি আসে, ভাই আসে পিছনে। বালতি উঠোনে নামিয়ে রেখে লতি তাড়াতাড়ি দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়)

লতি— আমাকে ডাকছিলে বাবা।

বাবার গলা—হ্যাঁরে, দেশলাইটা দে তো।

(লতি ছুটে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়, একটু পরে ছুটে এসে ঘরে ঢোকে)

ভাই— দিদি, বালতি ঘরে নাও।

লতি— (ঘর থেকে বেরিয়ে এসে) নিচ্ছি, দাঁড়া।

(বালতি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়)

মায়ের গলা—উনুন ধরেছে লতি?

লতি— (ছুটে এসে) ধরেছে মা।

মায়ের গলা—চায়ের জল চাপিয়ে দে

লতি – দিচ্ছি মা (ছুটে চলে যায়)

(একটু পরে ঘরথেকে বেরিয়ে আসেন মা, রোগা লম্বা চেহারা, শীর্ণ হাতে ছুচারগাছা কাঁচের চুড়ি)

মা— টুলু, টুলু কোথায়? [illegible] চলতে [illegible]

চলতে আসেন, দরজা খুলে দেবার জন্য সোটা চারেক রাখ[illegible]র দে তো।

লতির গলা—আসছি মা। ([illegible] বইটা নিয়ে বিছিয়ে দেয়)

টুলু— আমার খিদে পেয়েছে, আমি পড়ব না।

মা— রুটিওয়ালা এলে বিস্কুট কিনে দেব।

লতি— রুটিওয়ালার আটআনা বাকি পড়েছে সে পয়সা না দিলে আজ ধারে বিস্কুট দেবে না।

মা— তাই বলেছে নাকি? ওগো, শুনছো, রুটিওয়ালাকে আটআনা পয়সা দিতে হবে, তা না হলে আর বিস্কুট দেবে না।

বাবার গলা—আমার কাছে একটা পয়সাও নাই। আজ আর বিসকুট খেয়ে কাজ নেই—শুধু চা খাওয়া হবে।

মা— যা না লতি দৌড়ে একবার চাঁদের মার কাছে, একটা টাকা চেয়ে নিয়ে আয়, বলবি আজ বিকেলেই ফেরত দেব।

(লতি ছুটে চলে যায়, মা রান্নাঘরের দিকে চলে যান, টুলু প্রথমভাগ খুলে বসে)

টুলু— (পড়ে) পাঠের সময় গোল করিও না। কাহারো গায়ে হাত তুলিও না।

কখনো মিছা কথা কহিও না। কাহারও কিছু চুরি করিও না। কাহাকেও গালি দিওনা।

(চায়ের পেয়ালা হাতে করে মা আসেন)

মা— লতি এখনও আসেনি বুঝি ?

টুলু— না।

মা— (রাগকরে) মেয়েটার আক্কেল নেই, যাবে আর চলে আসবে। তা না, সেখানে গিয়ে বসে আছে।

টুলু— দিদি নিশ্চয় রেডিও শুনছে।

মা— আসুক আগে, ওর রেডিও শোনা আজ বার কোরবো।

(মা চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢোকেন, একটু পরে লতি ছুটে আসে)

টুলু— এত দেরী করলে কেন দিদি ?

লতি— দেরি কোথায় করলুম ।

মা— (বাইরে এসে) দিয়েছে টাকা ?

লতি— না—বল্লেন হাতে টাকা নেই।

মা— এতবড় ধাড়ি মেয়ে হয়েছিস্, এইটুকু তোর আক্কেল নেই, কাজে পাঠিয়ে তোর আশায় বসে আছি, আর তুই সেখানে বসে রেডিও শুনছিল্ ?

লতি— (আশ্চার্য হয়ে) ওমা, কে বল্লে আমি রেডিও শুনছিলুম !

মা— আবার মিছে কথা বলা হচ্ছে। তবে এত দেরি করলি কেন ?

লতি— চাঁদের মা চাঁদের বাবার সঙ্গে কথা কইছিলেন, আমি তখন কেমন করে টাকা চাইব ? আমি তাই দাঁড়িয়ে ছিলুম।

টুলু— (উঠে, দৌড়ে জানালার ধারে গিয়ে) ঐ যে রুটিওয়ালা আসছে।

মা— (চাপা গলায়) রুটিওয়ালাকে বল বাবু বাড়ী নেই, কালকে পয়সা দেব।

(লতি জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়) রুটিওয়ালার গলা—আজ রুটি নেবে, না, বিস্কুট নেবে ?

লতি— দু আনার বিস্কুট দাও।

রুটিওয়ার গলা—আগের বাকি পয়সা আজ দেবার কথা আছে, আট আনা আর দু আনা দশ আনা হোলো।

লতি— বাবা যে বাড়ী নেই গো, আজকে তুমি দু আনার বিস্কুট দাও, কাল সব পয়সা মিটিয়ে দেব!

টুলু— ও রুটিওয়ালা, ঐ লাল বিসকুট দাও।

রুটিওয়ালার গলা—ও বিসকুট পয়সায় একখানা।

লতি— না গো না, তুমি ঐ ছোট বিসকুট দাও, পয়সায় দুখানা করে, আট পয়সায় ষোলখানা।

রুটিওয়ালার গলা—এই নাও। কাল আমার সব বাকি পয়সা মিটিয়ে দিও।

লতি— হ্যাঁ গো কাল তোমাকে সব পয়সা দিয়ে দেব।

মা— চারখানা বিসকুট টুলুকে দে, আর চারখানা তুই রাখ। (বাকি বিসকুট কখানা লতির কাছ থেকে নিয়ে মা ঘরে ঢোকেন)

টুলু— দিদি, তোমার গুলো বড়।

লতি— সব সমান, এই দেখ।

টুলু— ঐটে বড়, ঐটে আমাকে দাও।

লতি— তোকে তো চারখানা দিয়েছি।

টুলু— আর একখানা দাও।

মায়ের গলা—লতি, রান্নাঘরে তোর চা রয়েছে।

লতি— যাচ্ছি মা (টুলুকে একখানা বিসকুট দিয়ে ছুটে চলে যায়)

টুলু— (বিসকুট খাওয়া শেষ করে আবার পড়তে সুরু করে) ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না। লেখাপড়ায় অলস হইও না। পিতামাতার কথা শুনিবে। ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিবে।

(বাবা বেরিয়ে আসেন, বাইরে যাবার জন্ত কাপড়জামা পরা, সঙ্গে আসেন মা। জুতোজোড়া পায় দিয়ে দেয়ালে টানান আয়নায় একবার মুখ দেখেন)

মা— উল্টোডাঙ্গা যাবে নাকি?

বাবা— সেখানে যাব বলেই তো সকাল সকাল বেরুলাম। ফিরতে আমার দেরি হবে।

মা— চেষ্টা করে দেখো যদি বিয়েটা হয়ে যায়।

বাবা— চেষ্টা তো করছি।

মা— ছেলের নাম কি, কি কাজ করে গো?

বাবা— ছেলের নাম রমেশ, ব্যানভাসারের কাজ করে, চিত্তহরণ তেলের ব্যানভাসার- বেশ নামকরা তেল। ছাতাটা কোথায়—দে তো টুলু ছাতাটা।

(টুলু ছাতা এনে দেয়, বাবা চলে যান। মা দাঁড়িয়ে কি ভাবেন, তারপরে তিনিও চলে যান)

টুলু— দিদি আঁক কষবো, শিগ্‌গির এসো।

লতির গলা— আসচি রে (একটু পরে ছুটে আসে)।

টুলু— (শ্লেট এগিয়ে দিয়ে) একটা আঁক দাও, কষবো।

লতি— (শ্লেটে আঁক লিখে) এই নে, যোগ কর।

(টুলু আঁক কষে, লতি ঘরে ঢুকে সূচসুতো নিয়ে আসে, তারপরে মাদুরের একপ্রান্তে বসে আঁচলের ছেঁড়া একটা অংশ সেলাই করে)

মায়ের গলা— লতি, ওরে লতি।

(লতি কোন সাড়া দেয়না)

মায়ের গলা— লতি, লতি।

(লতি কোন সাড়া দেয় না, দ্রুতপদে মা আসেন)

মা— কানে কি তুলো গুঁজে বসেছিস, এত যে চেঁচাচ্ছি শুনতে পাচ্ছিস নে? ও কি হচ্ছে?

লতি— (তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে) কিছু না মা।

মা— (এগিয়ে এসে) কিছু না। কি সেলাই করছিস্। ছিঁড়েছিস্ বুঝি নতুন শাড়ীখানা।

লতি— (ভয়ে ভয়ে) একটু ছিঁড়ে গেছে। রান্নাঘরের দেয়ালে একটা পেরেকে।

মা— দেখি, (আঁচলখানা তুলে ধরে) এর নাম একটুখানি। ছ' মাসও হয়নি শাড়ীখানা, এরই মধ্যে একে ছিঁড়ে শেষ করে ফেলি। এতবড় মেয়ে এতটুকু আক্কেল নেই। ইচ্ছে করে এক চড়ে মুখ ভেঙ্গে দি।

(মা চড় তুলে লতির মুখের কাছে নিয়ে যান, লতি ভয়ে মুখখানা একটু সরিয়ে নেয়, চড় পড়ে না। মা গজ গজ করতে করতে ঘরে ঢুকে যান, তার পরে একটা বোতল নিয়ে আবার বেরিয়ে আসেন)

মা— কি করছিস টুলু।

টুলু— আঁক কষছি মা।

মা— যা তো দৌড়ে, হরির দোকান থেকে এক ছটাক তেল নিয়ে আয়। বলবি মাসকাবারে হিসেব হবে।

টুলু— (শ্লেট ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে) যাও।

(টুলু দোকানে চলে যায়, মা চলে যান রান্নাঘরে, লতি গিয়ে দাঁড়ায় জানালার ধারে)

লতি— রাণীদি, কোথায় যাচ্ছ ?

রাণীদির গলা—বউবাজার যাচ্ছি মাসিমার বাড়ী বেড়াতে।

লতি— কি সুন্দর শাড়ীখানা তোমার রাণীদি, বেশ মানিয়েছে।

রাণীদির গলা—দামও তেমনি।

লতি— তুমি রোজ শাড়ী বদলাও, না রাণীদি ? তোমাকে এক এক দিন এক এক শাড়ী পরতে দেখি।

রাণীদির গলা—হ্যাঁরে, দুদিনের বেশী এক শাড়ী পরে রাস্তায় বেরুতে আমার ভারি লজ্জা করে। আমি তা পারিনে।

লতি— (জানালার উপর ঝুঁকে পড়ে) রাণীদি, ক্যানভাসার মানে কি ?

রাণীদির গলা—ঐতো, ক্যানভাসার দেখিস নি। ক্যানভাসার হচ্ছে তারা যারা দোকানদারের জিনিষ বেঁচে দেবার ব্যবস্থা করে। যেমন চায়ের ক্যানভাসার।

লতি— যেমন তেলের ক্যানভাসার, চিত্তহরণ তেল। খুব ভাল তেল, না রাণীদি ?

রাণীদির গলা—কতরকমই তেল বেরিয়েছে আজকাল।

লতি— আচ্ছা রাণীদি, কত মাইনে পায় ওরা, ঐ ক্যানভাসারেরা ?

রাণীদির গলা—মাইনে টাইনে পায় না ওরা।

লতি— (ভয় পেয়ে) বলো কি রাণীদি, মাইনে পায় না ?

রাণীদির গলা—যেমন জিনিষ বেচবে তেমন কমিশন পাবে। অনেকে মোটা টাকা কামাই করে।

লতি— (খুশী হয়ে) তাই নাকি রাণীদি, মোটা টাকা।

রাণীদির গলা—হ্যাঁরে। আমার এক মাসতুতো ভাই ক্যানভাসার, মোটর কিনেছে।

লতি— (চোখ দুটি বিস্ফারিত করে) তাই নাকি ?

রাণীদির গলা—হ্যাঁ। চলি আমি, আর দাঁড়াব না। বাড়ীথেকে বেরুতে দেরি করে ফেলেছি।

(লতি জানালার পাশ থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, হাতদিয়ে কপালের উপর থেকে এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দেয়। খানিক পরে মাদুরের উপর এসে বসে, শ্লেটখানা টেনে নেয়, দাগ কাটে, লেখে ক, খ, গ, তারপরে লেখে রমেশ।)

মায়ের গলা—লতি, ওরে লতি।

লতি— আসচি মা। (লতি তাড়াতাড়ি শ্লেটের লেখা মুছে ফেলে, তারপরে ছুটে চলে যায়)

উত্তরণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

। নীলিমা দাশগুপ্ত ।

চা পর্ব শেষ। মল্লিকা তাদের মানে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বসে অলসহাতে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছিলো। কাগজ যে খুব একটা মন দিয়ে পড়ছিলো তা নয় বা দেখার আগেই দেখা হ'য়ে গেছে। তবু এই কাগজের নাম করেই গল্পের আসর থেকে উঠে এসেছেও। মাঝে মাঝেই ওর এরকম হয়। ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলেই ও ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকে —ছুতো করে, মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে আসে নিরিবিলি আস্তানায়। হঠাৎ সন্ধ্যা পড়ি কি মরি করে সেই ঘরে ঢুকে পফ্ দিয়ে দু পোচ কেল্ পাউডার মুখে বুলিয়ে নিয়ে আবার সেইভাবে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, হঠাৎ ওদের তিন বোনের হলো কি? সকাল থেকে পাল্লা দিয়ে পাউডার মেখে যাচ্ছে। সন্ধ্যা বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু ওই যেন সাজগোজ ব্যাপারে বেশি সচেতন। মল্লিকা একটু অবাক হ'য়ে ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো নীচে, আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের আপ্যায়নের গুঞ্জনও কানে এলো মল্লিকার। মল্লিকা খাট থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। একজন সাহেবেবেশী দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক মোটর গাড়ি থেকে নামলেন। মাথা থেকে ফেল্ট হ্যাট নামিয়ে সামান্য নুঁকে সকলকে এক সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে সকলের সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। সমস্ত ঘটনা মল্লিকার একেবারে পুরোভাগে ছিল সন্ধ্যা। সবাই চলে গেলেন। শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন নরনারায়ণবাবু। এখানে আসার পর থেকেই লক্ষ্য করেছে মল্লিকা বড়মামার মনে যেন সুখ নাই। প্রথমে মনে হয়েছিলো মল্লিকার, মেয়ে চলে যাচ্ছে—পর হ'য়ে যাচ্ছে, তাই বুঝি মামার এই দুঃখ বোধ। কিন্তু সেটাই যেন সব নয়, একথা পরে মল্লিকার বার বার মনে হয়েছে। আজ ওপর থেকে ভাল করে নজর করে মামার চেহারা দেখে সে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো। নিজের মনে মল্লিকা চিন্তা করলে একটু। মামীমা, ভোলাদা, নীলুদা, গোপাদি সকলেই তা খু-উব ভাল, তবে কেন এই দুঃখবোধ? ছন্দা ঘরে ঢুকলো, আয়নার সামনে এসে চুলের সামনেটা একটু আঁচড়ালো, মুখে পাউডার বোলালো একটু তারপর যত-দূর সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে পেছনদিকটা দেখবার চেষ্টা করে, —হাল ছেড়ে দিয়ে মল্লিকাকে জিগ্যেস করলে "মাল্লিকা পেছনের সাড়িটা কি উঠে গেছে?"

"না তো ঠিক আছে।"

"আর মুখের পাউডার কী বোঝা যাচ্ছে?" ওমা! বলে কি ছন্দাদি! মুখ আর কোথায়? পাউডারইতো সব। তবু যে ঐ ঘন প্রলেপের মধ্য দিয়ে নাক-চোখ দেখা যাচ্ছে —এই ঢের। কি বলবে ঠিক করতে না পেরে মুখে শুধু বললো, 'না, তেমন কী—।" ছন্দা যাওয়ার একটু পরেই সন্ধ্যা আবার এলো, এবার একটু বেশি সময় দিয়ে মুখে পাউডার মাখলো। টানাটানি করে আয়নার দেরাজ খুলে সুরমাদানি বার করে চোখে সুরমা টানলো, ঠোঁটেও কি যেন একটা লাগালো। "কোথাও যাবে নাকি তোমরা?" জিজ্ঞেস করলে মল্লিকা। "বাপরে এত রোদে যাব কোথায়"? উত্তর দিয়েই

সন্ধ্যা ঘর থেকে চলে গেলো আর সন্ধ্যা যাওয়ার পরই মল্লিকার মনে পড়লো, নিচে কে একজন নোতুন লোক এসেছেন। বড়মামার পুরাতন ভৃত্য ভুবন ঘর দিয়ে চলে যাচ্ছিলো তাকে শুধালো মল্লিকা, "ভুবন। নীচে কে এসেছেন?" "আজ্ঞে, ছোট বাবীমার দেবর।" ও, তাইতো। আজকেই তো বিমানবাবুর আসার কথা ছিলো।

"ছোট মেসমশায় আসেননি ভুবন? তাঁরও তো আসার কথা ছিলো।" মল্লিকা জিগ্যেস করলে। "না আজ্ঞে, তিনি ছুটি পাননি শোনলাম" বিনীত হাত করে চলে গেলো ভুবন। এই বিমানবাবুর জন্যই কি ছন্দাদিদের অত সাজের ঘটা নাকি? কী কাণ্ড। তক্ষুনি বৌদির কথাটা ভেসে এলো মল্লিকার মনের মধ্যে—বিয়েবাড়িতে কুমারী মেয়েরাই বেশি সাজে—যদি কারো চোখে লেগে যায়। "ছিঃ ছিঃ"—নিজেকেই শত ছি-ছি দিতে লাগলো মল্লিকা। হঠাৎ বাবার উপদেশ মনে পড়ায় মল্লিকা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। বর্তমানের যে মাধুর্য্য ও মনে মনে কল্পনা করে এসেছিলো তা যেন কোনদিক থেকেই গ্রহণ করতে পারছেনা। যে রঙীন স্বপ্ন ও রেখে এসেছে সাতবছর ধরে—সে যেন অলীক স্বপ্নবিলাস। বর্তমানের কোন মোহ, কোন আকর্ষণই অনুভব করছেনা অন্তরে। কেন? বর্তমান কি বদলেছে? না, ওই বদলে গেছে? নিজেরই পরিবর্তন হয়েছে কিনা, তা নিয়ে নিজে নিজেই ভাবলো একটু। সঠিক সমাধান হলোনা।... বাবার ঐ বড় ফটোখানা নিয়ে গেলেই বর্তমান আর ওকে পিছু টানবেনা, কেন যে বাবা নিতে চায়না, মার নাকি ওতে বেশী কষ্ট হবে। কী জীবন্ত ফটোখানা বাবার। মনে হয় ওদের দিকে তাকিয়ে যেন ডেকে ডেকে কথা বলছেন। ওটা কাছে থাকলে, বাবা পাশে আছেন বলেই মনে হয় মল্লিকার। মুহূর্তে চিন্তাস্রোত কিছুটা দিক পরিবর্তন করলো। বাবা নিশ্চয় ওপর থেকে দিদিকে সবসময় দেখতে পাচ্ছেন। বাবা! দিদির সঙ্গে মিলিয়ে দাও আমাদের। কত দীর্ঘদিন, কত বছর ধরে দিদিকে দেখিনা—। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-আঘাত থেকে দিদিকে আড়াল করে রেখো তুমি—। সেই মুহূর্তে মার কথাও মনে এলো মল্লিকার। মা'র মনে কিন্তু সুখের শান্তি নেমেছে। সারাদিনরাত নিজেকে মিশিয়ে রেখেছেন দাদা-বৌদির কাজের মধ্যে—।

হাসির কড় ব'য়ে নিয়ে ছন্দারা ঘরে ঢুকলো, হা-হা-হি-হি, হু-হু-সকলের উচ্চরোলে মিশ্রিত হাস্যধ্বনি। মল্লিকা দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনলো। চোখ দুটি জল্-জলে করে সকলের পেছনে লিলিদেবী, ঢুকলেন। মল্লিকাকে দেখেই লিলিদেবীর হাঁস হলো।

চোখ কপালে তুলে বললেন, "মল্লিকা তুমি এখানে রয়েছো, নিচে কেন যাওনি?" সন্ধ্যা কোনমতে হাসির বেগ, একটু কমে বললে, "ইশ্, শ্। মল্লিকা কী মিস্টাই করলে—। কী অপূর্ব কথা বলেন ভদ্রলোক।—নীলুদাকে কীভাবে ঠেসে ধরেছিলেন, হি-হি-হি-হি, বলেছেন, নীলুদার কাব্যি রোগ সারিয়ে দিয়ে তবে যাবেন, হি-হি-হি—"

"নীলুদা কী বললে—?" মল্লিকার প্রশ্ন। "নীলুদা আবার বলবে কী। একেবারে চুপ।" খসিত আঁচলটা কাঁধে তুলতে তুলতে উত্তর দিল সন্ধ্যা। লিলিদেবী খাটের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে বললেন, "সত্যিই আমাদেরই ভুল হ'য়ে গেছে, মল্লিকাকে ডেকে নেওয়া উচিৎ ছিলো—" আর তা শুনে মল্লিকার রাগ এতই চড়চড় করে উঠলো যে তারপরদিন সকালে ও চায়ের আসরেও গেলো না।

ভুবনকে পাঠিয়ে দিয়ে বড়মামাদের চা পরিবেশন করতে লাগলো। নরনারায়ণবাবু আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু মল্লিকা জেদ ছাড়েনি, "না বড়মামা, আজকে তোমাদের সঙ্গে চা খেতে ইচ্ছে করছে আমার।" আর কিছু বলেননি নরনারায়ণবাবু। একটু বাদেই ভুবনকে আবার তোয়ালে কাঁধে ঘরে ঢুকতে দেখা গেলো। "আজ্ঞে

দিদিমণি, আপনাকে সবাই ডাকতেছেন। বড়দাদাবাবুর বিশেষ করে বলে দিলেন।" নরনারায়ণবাবুও এদিক থেকে জোর দিলেন, "সে কি মা! এই বুড়োদের মধ্যে বসে তুমি চা খাবে কি? যাও মা যাও।" অগত্যা মল্লিকাকে উঠে আসতেই হলো। খাবার ঘরে ঢোকার আগেই নীলুর জোরালো কণ্ঠস্বর শুনতে পায় মল্লিকা। বেশ কিছুটা উত্তেজিত মনে হচ্ছে নীলুদাকে, যা নীলুদার স্বভাবধর্মের একেবারে বাইরে বলেই মল্লিকার বিশ্বাস। ঘরে ঢুকেই মল্লিকা শুনতে পেলো নীলুদা বলছেন "কবিদের গুণগান আপনারা কখনই করবেন না, তা না করলেন। কিন্তু মোহাই আপনাদের তাঁদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে—তাঁদের লেখা কিছু একটু পড়ে নিন।" হেসে হেসে পরিহাসতরলকণ্ঠে উত্তর দিলেন বিমান, "আপনি কি ভাবছেন কবিতা-টবিতা আমি পড়িনি? না কবি আমি খাঁটিনি, ও রোগী এবং রোগ ভালভাবে জানা আছে বলেই তো ডায়গোনিসিস্ করতে আমার বিলম্ব হয় না। আজকে বিকেলেই আপনাকে একটা ট্রু ডোজে ডোলাপ দেব—" অনেকেই হাততালি দাওয়ার মতো সমাজের হেসে বিমানকে বাহবা জানালো। নীলু ক্ষুব্ধ হয় না সহজে। একথার পর ও যেন ক্ষেপে গেলো। মুখ লাল করে বলতে যাচ্ছিলো—মল্লিকা ঘরে ঢোকায় বাধা পড়লো। "মিলি! কী ছেলো যে আজ তোর? আমাদের এক রাউণ্ড চা হয়ে গেলো ইতিমধ্যে; আর তোকে বিমান বাবুর সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়েদি।.....ইনি বিমান গুহ। এঁর অশেষ গুণাবলীর পরিচয় তুই আগেই নীলুদাসীর কাছ থেকে পেয়েছিস্। আর বিমানবাবু। এ আমার দিদিভুতো বোন মল্লিকা, যার কথা একটু আগেই নীলুমাসি আপনাকে বলছিলেন।" পরিচয় করিয়ে দিলো ভোলা। পরস্পর নমস্কার বিনিময়ের পর মল্লিকা চেয়ার টেনে ধীরে ধীরে বসলো। সোপা ওদিক থেকে জলখাবারের ডিস এগিয়ে দিচ্ছিলো। হাতবাড়িয়ে সেটা সামনে টেনে নিয়ে নীলুদার দিকে তাকালো। দেখলো, নীলু আয়ত্তমুখে খাবারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, খেতে পারছে না। মল্লিকা চায়ের কাপ তুলে দু তিন চুমুক দিলো তারপর নীলুর দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললো, "নীলুদা। তোমার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও, তারপর আরো অস্ফুটে নীলুর মুখের উপর চোখ রেখে গুনগুনিয়ে বললো,

.....আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে।
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে নীলু মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো। মল্লিকা বলে চলেছে,

"তোরে হেথায় করবে সবাই মানা
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, একি বিষম কাণ্ডখানা।"

নীলুর মুখের লাল আভা কেটে গেলো, মুখে ক্ষীণ হাসিও ফুটে উঠলো। মল্লিকা নীলুদার মুখের ভাবদেখে নিয়ে আবার বললো,

"আপদ আছে, বালি, আঘাত আছে—
...আয়রে আমার কাঁচা।"

বলবার ভঙ্গি মল্লিকার এত সুন্দর, সকলের মনেই কম বেশি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, ওর কাব্যপ্রীতির পরিচয় কারো জানার কথা নয় কিন্তু মলিনা পর্যন্ত জানে না। সকলের সঙ্গে সেও অবাক চোখে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে রইলো। সমবেত চাহনির ধাক্কায় লজ্জিত হয়ে মল্লিকা তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করে জলযোগে মনোযোগ দিল। খাওয়া শুরু করলে খুব উৎসাহের সঙ্গে যেন খুব খিদে পেয়েছে ওর। বিমান একটু নড়েচড়ে চেয়ার থেকে পিঠ আলগা করে সোজা হয়ে কৌতুক কণ্ঠে বললেন, "মল্লিকাদেবী! এ কি

সেই যাকে বলে কিকে মেয়ে বউকে শাসন করা হলো। যা যদি আমাকে দিতে চান তো সোজাসুজিই দিন, তারা নীলুবাবুকে দিয়ে কেন?" মল্লিকা মাথা তুললো। নরম গলায় বললো, "কী ই বে বলেন, আমি আবার একটা মানুষ, আমি নাকি পারি আপনাকে যা দিতে। কত কিছু জানেন আপনি। কত পাণ্ডিত্য আপনার।" আবার মুখ নিচু ক'রে খাওয়ায় মন দিল মল্লিকা। মল্লিকার এভাবে এড়িয়ে যাওয়া বিমানের মোটেই মনঃপূত হলো না। এ যেন পরোক্ষে আরো বেশী করে অপমানিত করা। মুখের ভাব সহজ রেখে চেষ্টা করে হাসি ফুটিয়ে বিমান বললো, "না মল্লিকা দেবী: এ ভাবে এড়িয়ে যেতে আপনাকে দেবনা। আপনি কি সত্যি সত্যি ভাবছেন, আমি একেবারে ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস। জানেন আমি দিল্লীর টেগোর কালচারাল সোসাইটির একজন কাউণ্ডার মেম্বার। এই সেদিন পশ্চিমে বৈশাখ 'চিত্রাঙ্গদা' ড্রামা হ'য়ে গেলো—" তারা বোধহয় দশআনা ইনষ্ট্রাকশনই দিয়িছি আমি—।" বিমানের কথা শুনে কৌতুক বোধ করলো মল্লিকা। সেই মুহূর্তে বিমানবাবুকে খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হলো ওর, যেন একজন আট দশ বছরের বালক উত্তেজিত হ'য়ে ওলট পালট কথা বলছে। উত্তরে বললে, "সত্যি —?" সরল ভাসর চোখ তুলে হেসে ফেললো মল্লিকা। মল্লিকার হাসি এবার আলা ধরিয়ে দিল বিমানকে। দু হাতদিয়ে হাঁটু দুটো সবলে চেপে ধরে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলে বিমান, প্রাণপণে মুখের সহজভাব বজায় রেখে একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বললেন, "মল্লিকাদেবী। কবিতা আওড়াতে না পারলেই যে কবিতা পড়িনি—এর প্রমাণ হয় না।" "নিশ্চয়ই না।" এরপরও মল্লিকা মৌনই রইল। লিলি দেবী খুকখুক করে কেশে উঠলেন। তাড়াতাড়ি রাহাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট চাপালিলেন। মল্লিকা তাকালো। সকলেই তাকালো। ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় লিলিদেবী উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে উঠেছেন। তাঁর অমন মেয়ে। যার ডিগ্রি বহু এবং যিনি তিনবার ফরেন ফেরৎ, যার আউট লুকের দুর্বাস্ত এবং যিনি চমৎকার কথা বলতে পারেন—তাকে চ্যালেঞ্জ করে কিনা একটা আনওয়ার গ্রাজুয়েট মেয়ে তাও আবার বাংলাদেশের।

এদিকে বিমানের অবস্থা কিন্তু একেবারে অন্যরকম। কি ক'রে কোন যাদুমন্ত্রে যে তাঁর মনের সমস্ত উত্তাপ, সমস্ত উষ্ণতা নিমেষে দূর হ'য়ে গেছে—তার খবর বোধ করি নিজেও সঠিক রাখলেন না। শরীর এবং মন—দুই-ই হাল্কা হাল্কা মনে হ'তে লাগলো বিমানের। সমস্ত কিছুই পরম রমণীয়ও। চেয়ারে শরীর ছেড়ে আবার হেলান দিয়েবসলেন। চোখ মুখ উজ্জ্বল ক'রে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আমি সানন্দে হার মানলাম এবং সেই সঙ্গে অনাধিকার চর্চ্চার জন্য মার্জনা ভিক্ষাও চাইছি।"

মল্লিকা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বারংবার মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলো, "না, না বিমানবাবু, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। চায়ের আসরকে আমি একেবারে মাছের বাজার করে তুলেছি। এবার অন্য কিছু হ'ক। আপনি বিদেশের গল্প বলুন—শুনি।" বিমান হাসিমুখে বললেন, গল্প কালকে আপনাদের শোনাব। আজ আপনাকে একটা অনুরোধ জানাতে চাই।" মল্লিকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো বিমানের দিকে। স্মিত মুখে বিমান বললেন "আপনি যদি রবীন্দ্রনাথের একটা আবৃত্তি করে শোনান—" ঐ একফোঁটা মল্লিকার সঙ্গে বিমানের অমন বিনীত ভঙ্গির কথা শুনে নীলুমাসির সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বালা করতে লাগলো। যেন শিরঃপীড়াও যেন অনুভব করতে লাগলেন তিনি। আর অমন শিরঃপীড়ার কারণগুলো—রম্ভা ও সন্ধ্যা। রম্ভা বোকা-সোকা ভালমানুষ। মাথা নেই তার আবার মাথা ব্যাথা-সেই গোছের মেয়ে সে। মা, দিদি এমন কি ছোট বোনের কথাও সবসময় বিনা প্রতিবাদে মেনে চলে।

ওদের কথার শেষে ও বেশ খুশি হ'য়ে—উৎসুক চোখে আবৃত্তি শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। সব চেয়ে খুশি হো'ল তোলা। ক'দিন থেকে কীই যে সব গরম তর্ক আরম্ভ হ'য়েছিলো—কবিতা, কবিতা ক'রে - আজ বোধহয় এর নিষ্পত্তি হলো। আনন্দের চোটে তোলা উঠে গিয়ে ভুবনকে আর একদফা চা পরিবেশনের আদেশ দিয়ে এলো।

মল্লিকা একটু ইতস্তত: করে বলে "আপনি শুনতে চাইছেন?" "কেন—? ভূতের মুখে রামনাম বলে মনে হচ্ছে বুঝি মল্লিকাদেবী?" সহাস্যে উত্তর দিল বিমান। মল্লিকা অপ্রস্তুত হলো একটু। বললো, "না, না, তা বলছিনে, বলতে চাইছিলাম—ডাক্তারদের যদি কাব্য ভাল লাগে, তবে রোগীদের সব হবে কী?" বিমান হো-হো করে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠ্‌লো। "যা বলেছেন। ভাবনার কথা সন্দেহ নেই। আপাততঃ আর একবার অনুরোধ জানাচ্ছি কবিতা আবৃত্তির।" লীলুমাসি এবং সন্ধ্যা দুইজনেই হঠাৎ একটু পুলকিত হয়ে উঠলো নিশ্চয়ই কোন কবিতা ঠিক মতো মুখস্ত নেই মল্লিকার, তাই এড়িয়ে যাচ্ছে অমন করে। বিব্রত মল্লিকা কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে ভেবে দেখলো আর না করা উচিত হবে না কিছুতেই। এতদিনকার লুকোনো কাব্যপ্রীতি ও কী ছাই ছেলেমানুষি করে প্রকাশ করে ফেল্লো সবার কাছে। কিন্তু কোন উপায় নেই এখন।

একটু স্থির হয়ে নিয়ে, দৃষ্টি নত করে ধীরে ধীরে আবৃত্তি শুরু করলো—

তোমার পথ ধুলোয় প'ড়ে,
কেমন করে সইব

দেব সকল শক্তি, সব
অন্য তব পথ।"

আবেগ দিয়ে দীর্ঘ কবিতাখানি এতই চমৎকার আবৃত্তি করলো মল্লিকা, তখনকার মত সকলের মন থেকে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব দূর করে দিয়ে গেলো।

মাধাদেবী—বেশ রাগই করলেন। "তোর কী সবই অনাছিষ্টি—মিলি? সবাই মিলে একসঙ্গে বেড়াতে গেলো, কত সাধাসাধি করলো তোকে—ঘরের কোণে একাএকা থাকার কী কারণ হলো? মল্লিকা মার গলা জড়িয়ে ধরে একটু আদুরে সুরে বললে, "মা, আজকাল আর তোমার দেখাই পাই না, সারাক্ষণ কোথায় যে থাকো—।' মেয়ের কথায় মাতা ভুললেন না, আগের কথার রেশ টেনে বললেন। "ফিরে গেলিনা কেন? বিমান পর্যন্ত কত করে বললে—"

"বাঃ রে, তোমার আদেশই তো পালন করেছি। তুমি তো বাইরের—কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভাল বাসনা।" "বাইরের পুরুষ আবার কে? বিমান নাকি? ওতো আমাদের লিলির দেয়র।" মল্লিকা হেসে ফেললো, "বেশ, কাল থেকে তা হলে যাবো বেড়াতে। আর যে সব জায়গা ওরা নোতুন বলে দেখতে গেছে—সে সব আমার কাছে অতি পুরাতন, কুরুলায়র, কার্জনগেট, বর্দ্ধমানের রাজবাড়ি আর চিড়িয়াখানা।" মাধাদেবী তবুও অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "দেখা জিনিষ বুঝি আবার দেখা যায় না? সকলের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার একটা আনন্দও তো আছে?" একটু নীরব থেকে সেই আগের সুরেই বললেন, "তুই গেলি না বলে গোপাটাকে যেতে হলো। বৌদির ইচ্ছে ছিলো না গোপা যায়—একটু সর্দি গর্মির মতো হয়েছে গোপার—।" "কেন? আমার না যাওয়ার সঙ্গে গোপাদির কী? গোপাদি না গেলেই পারতো?" "বউমা না হলে কিছুতেই যেতে রাজি হলো না—।" মল্লিকা

মা'র মুখের ওপর শান্ত চোখ তুলে বললে, "ভালই হ'য়েছে মা সোপানির দিয়ে। দেখো, বাইরের বাতাস লেগে সোপানির সর্দি সেরে যাবে—" মেয়ের ভঙ্গিতে মায়া দেবী এবার হেসে ফেললেন, "বললেন তোর একা একা থাকতে এত ভাল লাগে মিলি" "একা-একা কোথায়? ঐ দেখনা মা কত সব বন্ধু। ভাগিস আজ যাইনি মা বেড়াতে, তাই তো পেলুম এত সম্পদের সন্ধান। আজ মীলুদার কাছ থেকে তার ছোটবেলার চাবিটা চেয়ে নেবোছিলাম—"

মায়াদেবী মেয়ের ইঙ্গিত মতো চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, মলিনা ও মল্লিকা যে খাটে শোয়, সেই খাটে স্তূপীকৃত বই ছড়িয়ে আছে। বইয়ের নেশা মায়াদেবীরও আছে যথেষ্ট। একটু আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলেন। চোখে পড়লো ওদের কয়েকখানা বইয়ের নাম—নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, সংবর্ত, বনলতা সেন, সমর সেনের কবিতা, বন্দীর বন্দনা, পারাপার, পাতালকন্যা—নতুনরাধা—হাত বাড়িয়ে মায়াদেবী পর পর কয়েকখানা বই তুলে দেখলেন, বললেন গল্পের বই নয় সবই তো দেখছি কবিতার বই। এত কবি বাঙলা দেশে আছেন জানতাম না তো?" "তবেই দেখো মা—" চোখ উজ্জ্বল করে মল্লিকা বললো "আমরা কোথায় কোন অন্ধকারে আছি। বাঙলার কবি এঁরা এত অপূর্ব সম্পদ রয়েছে এঁদের বইতে অথচ আমরা বাঙলারই মেয়ে হয়ে তাঁদের নামটুকু পর্যন্ত জানিনা।"

মায়াদেবী মেয়ের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন "তোরও দেখছি ওঁর মতো কবিতার বাই হয়েছে।" "যাগো"—মুহূর্তে করুণ হ'য়ে উঠলো মল্লিকার মুখ, "মা, আর যে যাই বলুক তুমি একথা আর কোনদিন বলোনা মা। কত ওপরতা হ'য়ে তোমার মতো মা পেয়েছি আমরা। কেন যে বাবা সময় পেলেই কবিতা পড়তেন এখন যেন একটু একটু তা বুঝতে পারছি। কবিতা হলো সাধনার ধন, কবিতা যেমন চেতনা আনায় একদিকে, অন্যদিকে তেমনি শান্তি আনে। এত নীরবে এমন দান করে কাব্য—কারো সঙ্গে এর যেন তুলনাই হয় না। মা জানো! শুধু রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়েই যে কেউ একজন বিরাট প্রজ্ঞাবান হতে পারে।" মায়াদেবী হাসিমুখে বললেন, 'আচ্ছা, তোকে যেখান এইসব বই মাসে মাসে কিনে।" বলেই মায়াদেবী যেতে উদ্যত হ'লেন। মল্লিকা মাকে আটকে ধরে বললো, "মা বসো না একটু, তোমাকে একটা কবিতা প'ড়ে শোনাই।" "না রে পাগ্‌লি! বসবার যো নেই। আজকের দিনটা চালিয়ে দি—কাল থেকে সমস্ত ব্যবস্থা নাজিরবাবুর ওপর।" যেতে যেতে মায়াদেবীর মুখ দিয়ে অর্ধস্বগতোক্তির মতো বার হলো—অমন সন্তানস্নেহময় বাবার কী যে হ'য়েছে কিছুই বুঝতে পারছিনে—। তক্ষুণি মল্লিকার মনে বড়মামার মুখের বিষাদের চেহারা স্পষ্ট ফুটে উঠলো। কিছুক্ষণ কবিতা বইগুলোর দিকে চুপকরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মল্লিকা। কী মনে হলো কে জানে? তাড়াতাড়ি বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে পাজাকরে বুকের কাছে তুলে ধরে ছোটঘরের উদ্দেশে রওনা হলো।

"বড়মামা! আসবো?"

নরনারায়ণবাবু তাঁর শোবার ঘরে ইজিচেয়ারে চোখবুজে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তাড়াতাড়ি চোখখুলে সস্নেহে তাকালেন, "আয় মিলি, ভেতরে আয়। তুই আমার কাছে আসবি তার জন্য অনুমতি। পাগল হলি নাকি তুই?" মল্লিকা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বড়মামার মাথার কাছে দাঁড়ালো।

"বড় মামা।" "কেন রে?"

"তোমার বোধ হয় মাথা ধরেছে।"

নরনারায়ণবাবু মৃদু হেসে বললেন, "তোর বড়মামার যখন মাথাধরে, তখন বোধহয় ধরে না—ছাড়াবড় ধরে। বাড়ি শুদ্ধ লোক টের পায় তখন।" মল্লিকা আর কিছু বললো

না। দু হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে বড়মামার মাথায় আঙুল চালনা করতে লাগলো। নয়নারায়ণবাবুও আর কিছু বললেন না, চোখ বুজলেন। মিনিট পাঁচেক কাটলো এইভাবে। মল্লিকা অনেক ইতস্তত করে নিজের মনে মনে অনেক প্রশ্ন-উত্তরের পর খুব আবছা গলায় জিজ্ঞেস করে বসলো," "বড়মামা। তোমার কিসের কষ্ট?" নয়নারায়ণবাবু কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন। চোখবুজেই উত্তর দিলেন, "কৈ? আমার তো কোন কষ্ট নেই মা—। ভগবানের দয়ায় আমি একরকম সুখেই আছি।" মল্লিকা তেমনি অস্ফুটেই বললো। "না বড়মামা, বাড়ির কারোর জন্য কষ্টের কথা বলছি না। নিজের কেউ অকারণ অনর্থক দুঃখের সৃষ্টি করেছে তারজন্য দুঃখবোধ করছো—তাও নয় তোমার একবারে নিজস্ব কোন কষ্ট আছে বলে মনে হচ্ছে আমার।" "মেয়েটা বলে কী—? কেউ জানে না যে কথা, যে খবর কাউকে বলিনি, তার ইঙ্গিত ও পেলি কি করে?" "মিলি! সামনে আয়—" নয়নারায়ণবাবু সোজা হয়ে বসে চক্ষু বিস্ফারিত করলেন। মল্লিকা তখুনি পেছন থেকে হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো। মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর একটি মুখও দেখতে পেলেন নয়নারায়ণবাবু। ঠিক একইরকম, ঠিক এই রকম সুষমা দিয়ে ঘেরা সে মুখখানি। কিন্তু কোথায় যেন একটু অমিল—আছে বলে মনে হচ্ছে। চোখে—? মল্লিকা মামার দিকে সরল চোখ তুলে বললো "বড়মামা! কী দেখছো? —আমি ঠিক ধরেছি না?" কথা শেষ করে ছেলে মানুষি হাসি হাসলো মল্লিকা। "হ্যাঁ মা ঠিক ধরেছিস। ঐ টুলটা টেনে নিয়ে সামনে এসে বস্ দেখি।" মল্লিকা হুইদিয়ে ঘরের কোন থেকে টুল নিয়ে এসে বড়মামার সামনে বসলো। মামার মুখের উপর চোখরেখে বললো "বড়মামা। তোমার সেই কষ্টটা তাহলে বলো।" তাহির কাছে নয়নারায়ণবাবু ক্ষীণ করুণ হাসি হাসলেন, "তুই শুনে কি করবি মা? যে শুনবে তারি খারাপ লাগবে—" "তা হোক্ বড়মামা তুমি বলো—" মল্লিকা উৎসুক চোখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ইজিচেয়ারের হাতলে কনুই ভরদিয়ে হাতের চেটোয় মুখ রাখলো। নয়নারায়ণবাবু আবার চোখ বুজলেন. মনে হলো উনি তার তাল পাকানো ভাবনা গুছিয়ে এক করবার চেষ্টা করলেন। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি একজনকে মেরে ফেলেছি মা—" "তুমি মেরে ফেলেছো একজনকে! মোটর চাপাদিয়ে নাকি?" "না মা, গাড়ি চাপা দিয়ে নয়, রাগ দিয়ে"—মল্লিকার এক মুহূর্ত বুঝতে দেরী হলো। তার পরই মনে পড়লো বড়মামা ডিক্লিষ্ট এ্যাক্ট সেশন জজ—কাউকে নিশ্চই ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন।

"তার ফাঁসি কি হয়ে গেছে?" প্রশ্ন করলো মল্লিকা "হ্যাঁ হয়ে গেছে।—মাত্র দশদিন হলো। তার শেষ কথা আমি কিছুতেই যেন বিস্মৃত হতে পারছিনা মা," ধীরে ধীরে সেই হতভাগ্যের কাহিনী বলে গেলেন নয়নারায়ণবাবু।—হতভাগ্যের নাম বৃন্দাবন দাস। একজন গরীব চাষী। অন্যের জমিতে চাষ করে বৎসরে পায় মাত্র দুশ টাকা। পাঁচটি সন্তান। তাদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন ও দিয়ে হবে কি করে? স্ত্রীকেও সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করতে হয় খাটতে হয় মোরে মোরে। কারো বাড়িতে গিয়ে পাড় দেয় চেঁকিতে. কারো বাড়িতে গিয়ে বড়ি-চিড়ে ভাজে, কারো উঠোন-দাওয়া গোবর দিয়ে লেপে দেয়—।

কিন্তু বৃন্দাবন বাড়িফিরে স্ত্রীকে ঘরে না দেখলেই প্রচণ্ড অমানুষিক মার মোর করে, এমন কি ছেলেমেয়েদেরও সে রেহাই দেয়না ঠ্যাঙায়। একদিন স্ত্রীকে না দেখতে পেয়ে ছেলেমেয়েদের বেদম ঠ্যাঙাচ্ছে ছোট ছেলেটা বুঝি বাবা বাবা করে এগিয়ে এসেছিলো—দিয়েছে ছুঁড়ে এক আছাড়। ছেলেটা মাথা ঘুরে অচেতন হয়ে চিৎ হ'য়ে পড়ে গেলো ঠিক এমন সময় তার স্ত্রী ঢুকলো ঘরে। সেদিন কোন

বাড়িতে ফিরে বাড়ির বাসন মেজে মত এক কাসি ভাত-ডাল নানান রকম তরকারি আনতে পেরেছিলো। অনেকদিন পর ছেলেমেয়েদের ভাল তরকারি দিয়ে ভাত দিতে পারবে বলে খুব প্রফুল্ল মনে হাসতে হাসতে বাড়ি ঢুকেছে। ঢুকেই দেখে এই ব্যাপার। ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর তার নাকদিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বার হচ্ছে। কাঁসি নামিয়ে ছুটে গিয়ে জল এনে নাকে মুখে ঝাপটা দিতে দিতে অকথ্য ভাষায় স্বামীকে গালি দিতে শুরু করলো। বৃন্দাবনের সেদিন কী যে হলো, সামনের ঘরে চালে গোঁজা ছিলো একখানা ধারালো দা, সেটা নামিয়ে নিয়েই স্ত্রীর মাথায় এক কোপ্। মাথা একেবারে ফাঁক। তখুনি ওর স্ত্রীর মারা গেলো। মল্লিকা যেন মনের চোখে বৃন্দাবনের স্ত্রীর দ্বিখা বিভক্ত রক্তে ভেসে যাওয়া মাথা দেখতে পেলো। কেঁপে উঠলো ভেতরে ভেতরে। "এমন একটা খুনের জন্ত তুমি দুঃখ করছো কেন বড়মামা?" নরনারায়ণবাবু আবার উত্তেজনা। অন্তমনস্ক হয়ে কি যেন আবার হাতড়াচ্ছেন। তারপর চোখবুজে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন কি জানো মা, বুড়ো হয়ে গেছিকিনা—দেনা-পাওনা সব প্রায় চুকে গেছে পৃথিবীর সঙ্গে, অন্তরের কাছুনের সঙ্গে এখন কেতাবী কাছুনের কোন মিল খুঁজে পাইনে। কেবল মনে হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রাণ দিতে পারিনে প্রাণ নিলাম একটা মানুষের। এই অনুশোচনা এই মনস্তাপ আমার আদরের রুচি হরণ করেছে, কেড়ে নিয়েছে রাত্রির ঘুম।" মল্লিকা চুপ করে চিন্তা করতে লাগলো কিছু বললেনা। "তাছাড়া মরবার সময় কী যে কাণ্ড ও করেছে মা—এমন আছাড়ি-বিছাড়ি, এমন কাকুতি মিনতি, বার বার অদৃশ্যবার ছেলেমেয়েদের দেখতে চেয়েছে, ওর মাতৃহীনা নাবালক ছেলেমেয়েদের-কে দেখবে সকলের চোখে তাকিয়ে আবাদ খুঁজছে। একেবারে শেষ সময় চোখমুখ ঢেকে দিয়েছে যখন, দুহাত নেড়ে প্রাণপণ চিৎকার করে উঠলো,—খামো খামো—। শুধু আমার একটা কথা শোন—" চোখ খুলে দিলো, করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন- "কী চাও?" "আমার ছেলেমেয়েদের একটিবার দেখব—।" "তাদের কে তো এইমাত্র দেখান হলো—।" "ওঃ, হ্যাঁ দেখেছি, দেখেছি, আমার ভাইকে একবার দেখবো।"

—তাকে ও তো এখুনি দেখলে, ওঃ। চুপ করে গেলো বৃন্দাবন।

আবার যখন চেকে দিলো চোখ, শেষ মুহূর্তে বৃন্দাবন আর্তনাদ করে উঠলো। বুকচিরে নাকি সে আর্তনাদ বেরিয়ে ছিল - খামো, খামো, খামো। শুধু আর একটি বার আমার চোখ খুলে দাও।

আবার ও চোখ খুলে দিলো, ও নাকি চোখ বড় করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চারিদিকে তাকাতে লাগলো—দাঁড়াও। আর একটুকুন দেখেনি দুনিয়াটাকে, শেষবারের মত দেখেনি আর একটুকুন বিহ্বল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে শেষ কালে বিড় বিড় করে কি যেন বলছিল বৃন্দাবন। বোধকরি ভগবানকে তার অন্তিম বাসনা নিবেদন করেছিলো—তারপরই অন্ধের মতো ওকে চোখ বুজিয়ে দাওয়া হয়েছে।.....এ দশদিন আঁখি ঘুমুতে পারিনি মা। চোখ বুজলেই ওর শেষ আর্তনাদ যেন শুনতে পাই—দাঁড়াও। আর একটুকুন দেখেনি দুনিয়াটাকে শেষবারের মতন দেখেনি—। হতভাগ্যের জন্ত মল্লিকার অন্তরও কেঁদে উঠলো; আহা! বেচারা, অনেকক্ষণ মামাভাগ্নি দুজনে বোবা হ'য়ে বসে রইলো। কথা নেই। কথা যেন সব ফুরিয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর মল্লিকাই কথা আরম্ভ করলো, ভিজে ভিজে অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো, "বড়মামা! ঐ বৃন্দাবন তো মহাকষ্টে ছিলো এখানে। নিশিদিন কত তীব্র গভীর যন্ত্রণা ও ভোগ করছে যার, অর্ধ চন্দ্রালের মতন ঠ্যাঙাতে পেরেছে নিজের

সন্তানদের। অথচ দারিদ্র্য জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে ওকে, তাই ও পেরেছে শিশুপুত্রকে তুলে আছাড় দিতে, যা দিয়ে কেটে টুকরো করতে নিজের হাতে নিজের স্ত্রীকে—। ওর জন্য দুঃখ করো না বড়মামা। মুক্তিদাতা ওকে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" দীর্ঘশ্বাস চাপলেন নরনারায়ণবাবু। বললেন, "তা বটে মা—" মল্লিকা নীরবে আবার ভাবতে লাগলো। মনে পড়ে গেলো পিতার কথা। অম্বিকাবাবু পুত্রকন্যাদের সঙ্গীতে খুব বেশীরকম উৎসাহ দিতেন। মায়াদেবী একদিন বিরক্ত হ'য়ে রাগ করছিলেন, "দিনরাত কেবল গান আর গান। সব সময় এত চেঁচামেচি ভালো লাগে না বাপু। যা শিখেছে ওরা —যথেষ্ট হয়েছে।" দুঃখ পেয়েছিলেন সেদিন অম্বিকাচরণ। কিন্তু মনোভাব চেপে রেখে হেসে হেসেই বলেছিলেন, "মায়া! সঙ্গীতে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে হতে হবে প্রকৃত সাধক। তার জন্য চাই প্রচুর সাধনা, প্রগাঢ় নিষ্ঠা, আর অপার ধৈর্য্য। কিন্তু সুর সাধনায় সিদ্ধিলাভ যদি করতে পারো একবার, তাহলে তোমার আর ভাবনা নেই কোনো—। শোননি সঙ্গীতের ক্ষমতা?—সে পারে না কী?—মত্ত হাতীকে থামাতে, শুকনো মরা গাছে অসময়ে ফোটাতে ফুল, খরমধ্যাহ্নে করে বাদল বরিষণ—আর যখন পৃথিবীর কোন কিছুই তোমার বিক্ষুব্ধ মনকে শান্তি দিতে পারছে না, তখন শান্তি দিতে পারে একমাত্র সঙ্গীত। দেবতার নির্মাল্যের মতো তোমার সর্বাঙ্গে ও শান্তি বারি ছিটিয়ে দেবে। মনের কালো—বাইরের কালো সব দূর হ'য়ে গিয়ে, তোমার সামনে দেখা দেবে নির্মল স্নিগ্ধ আলো। সঙ্গীতের বিরোধিতা তুমি আর কোনদিন করোনা, মায়া—।"

না বিরোধিতা মায়াদেবী আর কখনও করেননি। অন্ততঃ বহিঃপ্রকাশে তো নয়ই। নিয়ম করে সঙ্গীতের সামনে বোস এসে বসেছেন। তারপর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সঙ্গীতচর্চার জন্য একঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন বিকেলে। এর অন্যথা সহজে হতো না। পাছে বর্দ্ধমানে এসেও মায়াদেবী সে নিয়ম চালু রাখেন, সেজন্য আসার সময় ট্রেনে উঠেই যার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলো মল্লিকা, মা যেন গান গাইতে না বলেন বর্দ্ধমানে। মায়াদেবী আপত্তি তুলেছিলেন, "নিয়ম ক'রে রোজ না গাইলি, বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিস—দু চারটে গান গাইলি না, তাও কি হয় নাকি?" "খু-ব হয়। তুমি কিন্তু কিছুতেই আমাকে গান গাইতে বলবেনা মা—"। মেয়ের জিদে অগত্যা রাজি হ'তে হয়েছিলো মাকে। কিন্তু তখন মল্লিকা ভেবে স্থির করলে গান গেয়ে মামার মনে কিছুটা শান্তি দিতে পারে কিনা যাবার কথামতো ও একবার চেষ্টা করে দেখবে। মন স্থির করে নিয়ে মল্লিকা মামার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, "বড় মামা! গান শুনবে?" নরনারায়ণবাবু ভাগ্নির মনের ভাব বুঝলেন। ক্ষীণ হেসে বললেন, "তুইও বুঝি চামেলির মত গান গাইতে পারিস, না?" সাত বৎসর পরে বাড়ির কারোর কাছে এই প্রথম দিদির নামের উল্লেখ শুনলে মল্লিকা, মামার কথার উত্তর দেবে কি! দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেছে ওর, কণ্ঠস্বরও যেন রুদ্ধ। যথাসাধ্য চেষ্টা করে সংবরণ করলে নিজেকে। বললে, "না বড় মামা। দিদির মতো পারি না, সামান্য একটু একটু পারি। চুল ঠেলে উঠে দাঁড়ালো মল্লিকা। মামার পেছনে গিয়ে বললো—"আমি তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে গান গাইছি বড়মামা, তুমি চোখ বন্ধ করে শোন—।"

মিলির ছেলেমানুষিতে কৌতুক বোধ করলেন নরনারায়ণবাবু। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। মল্লিকা পেছনে গিয়ে ইজি চেয়ারের বাহু দুটো ধরে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। চোখ বুজে ভাবলো একটু, কোন গানটা গাইবে —তারপর ওর সুরেলা কণ্ঠের সুরলহরী ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। সুরের নেশায় তারপর ওরা ডুবে গেলো

দুজনেই। যে গাইলো সে ও, যে শুনলো সে-ও। মল্লিকা একই গান গেয়ে চলেছে বার বার, একবার—দুইবার—তিনবার—চারবার—

"সম্মুখে শান্তি পারাবার—
ভাসাও তরণী এ কর্ণধার।
... — "

চতুর্থবার যখন গাইছে

"মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হ'বে চির পাথের চির যাত্রার।
..."

তখন অনেকের মিলিত অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি এবং পদধ্বনি মল্লিকার কানে এলো। চোখ খুলেই মল্লিকা হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলো। বাড়ির যেন কেউ আর বাকী নেই, সকলেই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের চোখেই বিস্ময় দৃষ্টি। কখন যে ওঁরা সবাই বেড়িয়ে ফিরলেন আর কতক্ষণ থেকেই বা ওঁরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কে জানে? নরনারায়ণবাবু ও গানের সুরে এমনি হারিয়ে গিয়েছিলেন যে উনি ও বিন্দুবাবু টের পান নি। গান থেমে যেতে ওঁর হুস হোল। চোখ মেলে সুমুখে অমনি ভিড় দেখে হাসলেন। বললেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে কেন সব। ভেতরে এলো। বিমান। এলো—এলো ভেতরে এসে বসো। বিমান এলো। বন্ধুটিও পেছন পেছন চলে এলো। খাটের এক প্রান্তে বসে বিমান বন্ধুকে হাসিমুখে, নরনারায়ণবাবুকে উদ্দেশ করেই বললে, "দেখুন কাণ্ডখানা। ঘরে ঢুকেছে এমন আনন্দ, আর আমরা কিনা আনন্দের খোঁজে রাজ্যের গলি খুঁজি ঘুরলাম, একরাশ ধূলা খেলাম আর মেখে এলাম। ছাড় ঝির ঝিরে কতগুলো রুক্ষ জীবজন্তু।" মল্লিকা ওঁদের দেখে কিরকম বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো, চোখও শুকনো ছিলোনা—কাপসা। মল্লিকার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বিমান কিসের আভাস পেলেন কে জানে, নিজে অনুরোধ জানাতে সাহস পেলেন না। তোলার দিকে তাকিয়ে বললেন তোলাবাবু আপনার বোনকে আর একখানা গান গাইতে বলুন না। তাহলে আমাদের দুঃখটা ধরে পওয়ানের কষ্টটা দূর হ'য়ে যেতো। তোলা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালো মল্লিকার দিকে। সকলের দিকে একটু পাশ করে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলো মল্লিকা। ঐ ভাবে দাঁড়িয়েই উত্তর দিলো, "কালকে আপনাদের নিশ্চয় গান শোনাব বিমানবাবু এখন আর পারছিনা—"ধরা গলার কথা ক'টা বলে, ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলো মল্লিকা।

[ক্রমশঃ]

॥ যখন জেনেছি ॥

নচিকেতা ভরদ্বাজ

আর কিছু বলব না। যখন জেনেছি আমি তুমিও করুণ
কান্নার জলে ধুয়ে হারিয়ে ফেলেছ সেই পলির মনন;
ধূসর নক্ষত্র ছুঁয়ে নীল হয়ে গেছ তুমি, গভীর গড়ন
হঠাৎ তোমাকে দেখে—তোমাকে পাবার সাধ সাধ্যও অধুনা
প্রায় অবসিত জেনে—কেন তুমি লিখে গেলে চোখের জলের
স্বাদ দিয়ে জীবনের গূঢ় কথা—, আমি তো তা জানতে চাইনি।

তুমি ঢের সুখী ছিলে—জেনে বুকে ছিল যে যন্ত্রণা
সে বরং ভালো ছিল।—কেন তুলে দিলে প্রতিমা-মুখের
বিচিত্র বর্ণের লেখা—, সেই সব আভিজাত্য-ধনীর গৃহিণী
আলোর অন্নপূর্ণা!
অশ্বত্থের ডালে ডাখো হাওয়া উন্মনা,
তুমি তবে সুখী নও? কেন, কেন? আমি তো যাইনি আর কাছে,
ডাকিনি তোমাকে আর। জেনেছি এ জীবনের ভার
আমার বহন যোগ্য ক্ষীণ দেহে কোনোদিন হবে না হবে না।

কালের তূণীর থেকে যে তীর খসিয়া গেছে—
কোথাও সে আছে
কোথাও আকাশ এসে মুছে দিয়ে গেছে চেতনার
সমস্ত ক্লান্তির দাগ—তুমি কেন শান্তিতে রবে না।
আমি তো কবেই মেনে নিয়েছি এ হৃদয়ের দেনা,
দুহাতে দিয়েছি তুলে সব ট্রফি—চলে গেছে সময়ের সেনা।

তোমার দুচোখে তবে নামুক সে নিটোল পূর্ণিমা,
না, না, তুমি সুখী বলো, তুমি কেন কান্নার পুতুল
গড়বে দুহাতে বলো,—বুক পেতে জীবনের সব দাহ, হল
আমিই নিয়েছি সখি, আমার একার থাক দুঃখের মহিমা॥

আপনার টিকিট ?

ট্রেনে টিকিট চেয়ে টিকিট-পরীক্ষক
তাঁর কর্তব্য কাজই করেন—
এ'জন্য তাঁর ওপর হামলা করবেন না।
এদেশে বিনা-টিকিটে
যাত্রীর তো অভাব নেই—
সেইজন্যই টিকিট পরীক্ষার প্রয়োজন।
আপনার হয়তো টিকিট আছে,
তবুও, টিকিট দেখতে চাইলে
আপনার তা' দেখানো কর্তব্য।
নমুনা-পরীক্ষার মতো মাঝে মাঝে
দু' একজনের টিকিট দেখা তাঁর কাজ নয়,
আর, মুখ দেখে আপনার মনের
কথা জেনে নেবার ক্ষমতাও তাঁর নেই।
সুতরাং টিকিট পরীক্ষার সময় আপনাকে
তিনি বাদ দেবেন কেমন ক'রে ?
হয়তো ঘুমোচ্ছেন, বা, বিশ্রাম করছেন—
কিন্তু আপনার সুবিধামতো সময়ের জন্য
অপেক্ষা করতে হ'লে তাঁর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে
দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই,
আপনার কাছে টিকিট চাইলে চ'টে উঠবেন না।
অপেক্ষা করার মতো সময় কোথায় তাঁর ?

পূর্ব রেলওয়ে

বর্তমান প্রসঙ্গ

জয়শ্রী

জয়শ্রীর জন্ম বৈশাখে। সাতাশ বছর আগে জন্ম হয়েছিল জয়শ্রীর। কিন্তু জয়শ্রী পরাধীন ভারতের সরকারী নির্যাতনে কয়েকবার কয়েক বছর ধরে নীরব থাকিতে বাধ্য হয়েছিল। তাই প্রকাশের হিসাবে জয়শ্রী এবারে পদার্পণ করলো তেইশ বছরে।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে একদল অগ্নিহোত্রীর প্রবল আদর্শবাদের আমন্ত্রণে জন্ম হয়েছিল জয়শ্রীর। কত আশা-আনন্দ, কত দুঃখ-বেদনায় অগণিত আদর্শবাদীরা তাদের সংকল্পের ইন্ধনে জালিয়ে রেখেছিল জয়শ্রীর প্রাণ-শিখা। আজকের জাতীয় পরিবেশে সেই আদর্শবাদের আমন্ত্রণ নেই, নতুন কল্পনার আশা-আকাঙ্খায় বিপ্লবীমনের সেই স্তীক্ষ্ণ অনুভূতি আজ ম্রিয়মান। আজিকার হতমান পরিবেশেও প্রভাতী ভাস্করের মত জয়শ্রীর প্রাণকেন্দ্রে জেগে রয়েছে সেই তপঃসিদ্ধ আদর্শবাদীদের প্রাণের জ্যোতি। জয়শ্রী অতীত দিনের সেই পুণ্য ঐতিহ্যকে বহন করে এগিয়ে চলেছে নতুন দিনের নতুন সম্ভাবনার আশায়।

সাহিত্যকলের পরিবেশনেই জয়শ্রীর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের চিরন্তনী সমন্বয়ধর্মের, যুগসঙ্গত আঙ্গিকে ভারতের জীবনপ্রবাহ প্রবল প্রাণধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক, নতুন সমাজে নতুন মানুষের আমন্ত্রণে ভারতের জাতীয় জীবন প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক—জয়শ্রী সাহিত্যসেবার মাধ্যমে এই আশা ও আদর্শ বহন করে চলছে।

আমাদের পাঠকপাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও অগণিত সহানুধ্যায়ী—যাঁরা জয়শ্রীকে আন্তরিক সহানুভূতি দিয়ে জয়শ্রীর প্রকাশ ও বিকাশ সম্ভব করে তুলেছেন তাঁদেরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই। আশাকরি সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় জয়শ্রী এগিয়ে চলতে সক্ষম হবে নূতন বছরে।

অনুরূপা দেবীর লোকান্তর

পরিণত বয়সে বাংলার সুলেখিকা অনুরূপা দেবী লোকান্তরিত হয়েছেন। নিজেদের রচনাবলী দ্বারা বাংলার যে কয়জন মহিলা সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, অনুরূপা দেবীকে তাঁদের মধ্যে শুধু অন্যতম নয় অগ্রণীও বলা চলে; বাংলা দেশের এক নব জাগরণের যুগে—যে যুগে বাংলার মহিলা সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে পর্দার-আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছিলেন—অনুরূপা দেবী তাঁদের অগ্রগণ্যা। কিন্তু সে যুগে বাংলার নবজাগরণ পক্ষে উঠেছিল এক নতুন আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে, ভারতের প্রাচীন জীবনের আদর্শমুখী দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সে যুগের উদ্দেশ্য। সে যুগের সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে তাই রসানুভূতির অপেক্ষা আদর্শানুভূতির আমন্ত্রণ ছিল প্রবল। আদর্শবাদের এই প্রাবাঢ় পরিবেশে ব্যক্তির সুখদুঃখ ছিল গৌণ। বাংলা সাহিত্যে সেযুগেও যে আদর্শানুভূতির সঙ্গে রসানুভূতির সমন্বয় ঘটেনি তা নয়—কিন্তু সে যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান সুর ছিল সমষ্টিগত আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ছিলেন এই আদর্শকেন্দ্রিক সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তিনি নিজের সমস্ত চিন্তা ও রচনার মাধ্যমে আদর্শকেই সাহিত্যের প্রধান সুর করে তোলার আগ্রহে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের প্রতিভাকে নিযুক্ত করেছেন।

অনুরূপা দেবীর রচিত 'মা', 'মন্বন্তর', 'মহানিশা' এবং আরও অনেক রচনাবলী যেমন সাহিত্যিক মূল্যে সমৃদ্ধ, তেমনি আদর্শবাদী সাহিত্য হিসাবেও সুপরিচিত, অনুরূপা দেবী অনেক উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যের কান্তি ও কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। কয়েকটি উপন্যাস কালোত্তীর্ণ হয়ে বাংলা সাহিত্যে অমরীয় হয়ে থাকবে। অনুরূপা দেবী সাহিত্য-সেবার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ সেবায়ও অগ্রণী অংশ গ্রহণ করেছেন এবং এই সেবাব্রতের মূলমানেও ছিল সেযুগের আদর্শবাদী জীবনধর্মের আস্বাদন। বাংলার এই সর্বজন শ্রদ্ধেয়া অগ্রজা সাহিত্যিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করি।

শ্রীনেহেরুর বৈরাগ্য ও প্রত্যাবর্তন

নেহেরু-চরিত্রের বিপরীত ধর্ম চিন্তা ও কাজ ভারতবাসীর অশ্রদ্ধা নয় বলেই তাঁর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বীতরাগ শ্রীনেহেরুর রাজনৈতিক বিভ্রান্তির অপর একটী দৃষ্টান্ত বলেই ধরা হয়েছে। নেহেরু-চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা চিন্তা ও কর্মের অসামঞ্জস্যে।

নেহেরু রাজনীতি-বিমুখ হননি, কর্মে নিরাসক্ত হননি, নেহেরু দুর্বল হননি। তিনি ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয়-নৈতিকতার-মান ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি, কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের 'জনসেবার' আদর্শের পরিবর্তে ক্ষমতালোলুপতা ও স্বার্থবোধের প্রাবল্য দেখে ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হয়েছেন। তাই কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ব থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের বাহকদের একটি 'শক' দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং কেন দেশ ও কংগ্রেস এরূপ বিচ্যুতির পথে এগিয়ে চলেছে তার কারণ সন্ধানের জন্য কিছুকাল প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের এবং আন্তর্জাতীয় রাষ্ট্রনায়কদের অনুরোধে নিজের ইচ্ছাকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

শ্রীনেহেরুর সাময়িক বিদায়ে কংগ্রেসীদের মানসিকতার কোন রূপান্তর ঘটেছে বলে মনে করার কোন যুক্তি-যুক্ত কারণ নেই। শ্রীনেহেরুর সাময়িক বিদায় সাময়িক ছুটির পর্যায়ে গণ্য হত। আত্মসন্তান কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের সংশোধন যদি শ্রীনেহেরুর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সরকারের প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে অধিষ্ঠিত থেকেও শ্রীনেহেরু তা' করতে পারেন। জনসেবার আদর্শ থেকে কেন দেশবাসী বিচ্যুত হচ্ছে,—জাতীয় উন্নয়নের প্রচেষ্টায় কেন দেশবাসী উদ্যমহীন,—নেতিবাদী সমালোচনায় কেন দেশবাসীর মন বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত,—দুর্নীতি, অসদাচরণ ও স্বার্থবোধের প্রাবল্যে কেন জনসাধারণের নৈতিক মান মারাত্মক ভাবে নিম্নগামী—তার কারণ সন্ধান করা দুরূহ নয় বলেই আমরা মনে করি।

পরাধীনতার যুগে জাতীয় জীবন গড়ায় ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ জনসেবার যে আদর্শ ও ঐতিহ্যে ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হয়েছিল আজ কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সরকারী নেতৃবর্গের আচরণে তার খুব কমই অবশিষ্ট রয়েছে। আজও কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সরকারী পদাধিকারীরা পুরোণো আদর্শের বাণী খুব জাঁকজমকের সঙ্গে ব্যাপকভাবে প্রচার করে থাকেন কিন্তু তাঁদের বিজ্ঞাপিত আদর্শের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আচরণের অসামঞ্জস্য এবং বৈপরীত্য এত বেশি, যে সেসব আদর্শের কথা এখন কতগুলি প্রতিধ্বনির বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের আদর্শ ও আচরণের অসঙ্গতিই আজ দেশের, রাজনৈতিক দলগুলির—বিশেষ করে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের অবনতি ও নীতিহীনতার কারণ।

দেশবাসীর নৈতিক মানের নিম্নগতি তথা আদর্শহীনতার প্রধান কারণ কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শহীনতা ও সুবিধাবাদ তথা স্বার্থবাদের ব্যাপক প্রসার এবং কংগ্রেসের অবনতির কারণ কংগ্রেস সরকারের আদর্শহীনতা। কংগ্রেস সরকারের এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কংগ্রেস নেতৃবর্গ এবং প্রধানতঃ শ্রীনেহেরু। আজ পার্লামেন্টারী রাজনীতি সমস্ত রাজনৈতিক

আদর্শ ও সংগঠনের মর্মকেন্দ্র। বিশেষজ্ঞের নামে কংগ্রেস আজ এমন সমস্ত লোককে বেছে বেছে সরকারী দায়িত্বে স্থাপন করছে যারা জনসেবার উক্ত আদর্শের দ্বারা কোন সময়েই উদ্বুদ্ধ হয়নি। ব্যক্তিবাদ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় careerism—সেই ক্যারিয়ারিজম ছাড়া কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের দায়িত্বশীল পদাধিকারীদের মধ্যে আর কোন মহত্তর ভাব আজ খুব কমই অবশিষ্ট আছে। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী স্বার্থবাদের দ্বারা আজ কংগ্রেস সরকারের ঐতিহ্য রচিত হয়েছে সেই ঐতিহ্যই প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে গ্রাস করেছে, এবং সেই আবিল দৃষ্টি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশবাসীর মনও কলুষিত হয়েছে।

দেশবাসীর যে আস্থা ও শ্রদ্ধা কংগ্রেস লাভ করেছিল এবং সমগ্র দেশবাসী যে ত্যাগ ও জনসেবার আদর্শে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে কোনো জাতির ইতিহাসে তা দুর্লভ। শ্রীনেহেরু দল ও দেশবাসীর যে সমর্থন লাভ করেছেন কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নেতার পক্ষে তা' অকল্পনীয়। তবুও শ্রীনেহেরু ও কংগ্রেস সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতায় কংগ্রেসও ব্যর্থ হয়েছে এবং দেশবাসীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে হতাশা ও স্বার্থপরতার পরিবেশ।

শ্রীনেহেরু যদি যথার্থ অবস্থার পরিবর্তন চান তবে তাঁকে আদর্শ ও আচরণের সমন্বয় বিধান করতে হবে। ত্যাগী ও জনসেবীর হাতে দেশশাসনের দায়িত্ব দিতে হবে, সরকারী ব্যবস্থায় কৃচ্ছ্রব্রতের প্রয়োগ করতে হবে—এই মূলনীতি গ্রহণ করে দুর্নীতি ও স্বার্থবাদের মূলোচ্ছেদ করতে হবে এবং এই নীতি প্রয়োগে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চিন্তায় প্রবল শ্রীনেহেরু যদি কর্মেও সাহস ও প্রবলতা দেখাতে পারেন একমাত্র তবেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

পতিতা-বৃত্তি নিরোধ আইন

সকল মানুষই সমান মর্যাদার অধিকারী—এই আদর্শকে পূর্ণ করে তোলাই মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের প্রয়াসকেই বলা হয় মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের এই মূল্যমানে পতিতাবৃত্তি শুধু মানবতা-বিরোধী নয়—মানব-সভ্যতার এক চরম কলঙ্ক বলে আমরা মনে করি। অসংযমীদের পাশবিকতা বৃত্তি চরিতার্থ করার উপায় স্বরূপ প্রয়োজনীয় অসামাজিক যারা পতিতাবৃত্তির সমর্থন করে তাদের মতকে আমরা মানবমর্যাদা পরিপন্থী বলে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করি।

পতিতাবৃত্তি নিরোধের সরকারী উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য; কিন্তু যে ভাবে সরকার এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন তাতে পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদ হবে না, বলেই আমাদের আশঙ্কা। পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদের সঙ্গে পতিতাদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। তাদের মানসিক পুনর্বাসন অতি যত্ন ও সহানুভূতির সহিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পতিতাদের জীবিকার্জন তথা গ্রাসাচ্ছাদনের যদি বিকল্প ব্যবস্থা করা না হয় তবে প্রচ্ছন্ন পতিতাবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে সমাজ-জীবনে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হবে।

কলকাতার পতিতালয় উচ্ছেদের সঙ্গে পতিতাদের জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই নারীদের সর্বপ্রথম শ্রেণী ভাগ করা প্রয়োজন। পতিতাদের মধ্যে দেখা যায় তিন শ্রেণীর নারী। এক শ্রেণীর নারীহীন প্রকৃতির ব্যক্তিদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে গৃহত্যাগ করার পরে নিরুপায় হয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছে, দ্বিতীয় আরেক শ্রেণী দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে জীবনরক্ষার জন্য জীবিকা রূপে পতিতা জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং তৃতীয় আরেক শ্রেণী নিতান্ত রুচি-বিকৃতির জন্য পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা কম। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই বেশি—ভারত বিভাগের ফলে এই সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে আরও বেশি হয়েছে।

এই তিন শ্রেণীর নারীদের পুনর্বাসনের জন্য তিন রকম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিচিতা সমাজসেবিকাদের সহায়তায় পতিতাদের পুনর্বাসনের অগ্রিম পরিকল্পনা না করে পতিতাবৃত্তি নিরোধের নামে শুধু পতিতাদের উচ্ছেদ করে সমস্যাকে আরও জটিল করা হবে এবং সমাজ জীবনে নতুন ব্যাধির অনুপ্রবেশের পথ করে দেওয়া হবে বলে আমরা গুরুতর আশঙ্কা করি।

রাজনীতিতে দলত্যাগ

আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মতান্তরের জন্য দলত্যাগ করা এবং অন্যদলে যোগদান করা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অসঙ্গত নয়। কিন্তু সম্প্রতি উড়িষ্যার শ্রীঅনুপ সিংহ এবং বাংলার শ্রীচারু পাণ্ড্যাল যেভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তা শুধু নীতিহীনতার পরিচায়কই নয়—সুবিধাবাদের এক লজ্জাকর নিদর্শন বলে আমরা মনে করি। শ্রীঅনুপ সিংহ রাতারাতি কংগ্রেসে যোগদান করে যে সুবিধাবাদের পরিচয় দিয়েছেন এবং শ্রীচারু পাণ্ড্যাল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের লোভে যে ভাবে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তা গণতান্ত্রিক রাজনীতির মানদণ্ডে গর্হিত আচরণ রূপে বিবেচিত হবে বলে আমরা মনে করি। সম্প্রতি লোকসেবক সঙ্ঘের যে চারজন এম. এল. এ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাদের আচরণও সম ভাবে নিন্দনীয়।

একটির টিকিটে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া অথবা স্বতন্ত্র বা একদলের নামে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে নির্বাচনের পূর্বাহ্নে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার লোভে অন্য দলে যোগ দেওয়ার অর্থ জনমতকে অপমানও অস্বীকার করা এবং গণতন্ত্রের মূলনীতি-বিরোধী কাজ করা। দলত্যাগ করার পূর্বে আইন সভার সভ্যপদ ত্যাগ করা উচিত এবং নূতন দলের নূতন নীতির ভিত্তিতে জনমতের সমর্থন চাওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীঅনুপ সিংহ, শ্রীচারুপাণ্ড্যাল এবং লোকসেবক সংঘের এম. এল. এ গণ যে নীতির পরিচয় দিয়েছেন তা' সুবিধাবাদের এক নীচ নিদর্শন। বাংলাদেশে মন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি তা আনন্দের কথা।

কলকাতায় কলেরা

ভারত ও এশিয়ার প্রধান সহর কলকাতায় কলেরা মহামারীর এরূপ অপ্রতিহত দাপট শুধু কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের নয়, বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগেরও অযোগ্যতা ও কর্তব্য বিচ্যুতির এক শোচনীয় নিদর্শন। কলকাতা বস্তি-বহুল নগর—এই অপরাধে কলকাতায় বহুরকম ব্যাধি-বিভূতির অজুহাত সন্ধান করা হয় বটে কিন্তু কলেরা মহামারীর কারণ বের করা হয় না। কলেরার সংক্রমণ হয় প্রধানত জল ও খাদ্যের মাধ্যমে। কলকাতার বহু জায়গায় মাটির তলায় জলের নল ফেটে কলের জলধারা ড্রেনের ময়লা ও বিষাক্ত জলধারার সঙ্গে মিশে যায় বলে বহুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এরূপ ভাঙা নলের সংস্কার প্রায়ই তাড়াতাড়ি করা হয় না এবং তারফলে প্রতি বছরই চৈত্র-বৈশাখ মাসে কলকাতায় কলেরা মহামারী দেখা দেয়। এই কলেরার বীজ আবার বাজারের খোলা খাবার, কাটা ফলের মাধ্যমে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা, জলের নলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, বাজারে খোলা খাবার রাখা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী ইত্যাদি কয়েকটি সোজার ব্যবস্থা অবলম্বনে কলকাতায় কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। অনেক ক্ষেত্রে কলেরার টিকা দেওয়ার পরেও কলেরা হয়েছে

বলে শোনা গেছে। এর কারণ অবিলম্বে বাংলা সরকার ও কন্ট্রোলেশনের সন্ধান করা উচিত।

কেরলায় খাদ্য-বিষবিক্রিয়া

খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য কেরলায় প্রায় আশীজনের প্রাণহানি হয়েছে আরও বহুলোক আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে। ঘটনাটি ভয়াবহ ও অত্যন্ত চিন্তার কারণ। খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য এরূপ ব্যাপক ও শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনা আর শোনা যায়নি। আটা, ময়দা বা চালে বিষ-মিশ্রণের ফলে যে এরূপ বিষক্রিয়া ঘটেছে সে সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। কিন্তু ইঁদুরের হাত থেকে গমরক্ষার জন্য যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় তার মিশ্রণের ফলে এরূপ বিষক্রিয়া ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ রাসায়নিকের প্রক্রিয়া খুব প্রবল নয়। দ্বিতীয়ত অ-ভাপ্য সময়ের মধ্যে রাসায়নিকের অবিক্রিয়ার মিশ্রণ সম্ভব নয়। কি কারণে এরূপ বিষক্রিয়া ঘটল তার পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান হওয়া উচিত। এ জন্য অবিলম্বে বিশিষ্ট রাসায়নিকদের দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

খাদ্যসঙ্কট

দুর্ভিক্ষের ক্রত পদধ্বনি পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চকিত হয়ে উঠেছে। এমনও আশঙ্কা রয়েছে যে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি আসন্নপ্রায়। সবে বৈশাখের প্রান্ত-সীমা অতিক্রম হয় নাই, ইতিমধ্যেই অল্পবিত্তে বাস্ত হয়ে সন্তান ও স্ত্রী বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া গেছে। অনাহারে মৃত্যু, অপুষ্টিতে মৃত্যু এ-সংবাদও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পরিবেশিত হয়েছে।

এই সংবাদগুলির ঘটনাস্থল পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহকুমা। এ-ছাড়া চালের দর ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা নিম্নমুখী প্রায়- তার প্রমাণ মফস্বলে সংশোধিত রেশনের দোকানে ক্রয়ক্ষমতার অভাবে যেসব অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে,—বেকারের সংখ্যার ক্রতবৃদ্ধি, চুরি-ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি—অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের আকর বহন করে আনে যে অবস্থা, তার সকল চিহ্নই পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলায় নিঃসংশয়ে বর্তমান। পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশপরগনা ও মালদহ আজ দুর্ভিক্ষ অথবা প্রায়-দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকা বলে গণ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে! বৈশাখের শেষে সঙ্কটের তীব্রতা যদি এতো বেশী হয়ে থাকে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কি ভয়াবহ পরিণতির জন্য বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে, তা সহজেই অনুমেয়।

অথচ পশ্চিম বঙ্গ ও ভারত সরকার অঙ্কের হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, অবস্থা তাঁদের করায়ত্ত। পশ্চিম বাংলায় যে আট লক্ষ টন খাদ্যে ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে—তা মেটাবার জন্য ভারতসরকার ছয় লক্ষ টন গম ও একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন চাল দেবেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাল-কল থেকে তাদের সংগৃহীত চালের সতেরো পার্সেন্ট ভাগ লেভি করে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার টন সংগ্রহ করেছেন এবং আরও বিশহাজার টন করবার আশা রাখেন। আর ভারত সরকার দেড়কোটি টাকা কৃষিঋণ দিয়ে চাষীদের সাহায্য করবেন।

ব্যর্থ সরকারী খাদ্যনীতির ফলে বার বার সঙ্কটের বেড়াজাল বিস্তার করে বাংলার চাষী ও মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়কে এক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যে খাদ্যনীতির ফলে বাড়তি অঞ্চলে জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে, যে খাদ্যনীতি পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের আর্থিক বিন্যাসকে অধিকতাবে টেষ্ট রিলিফ ও খয়রাতী সাহায্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর-শীল করে ফেলে, যে খাদ্যনীতি মূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে অব্যাহত রেখে মজুতদার ও মিলমালিকদের পোষকতা করে,—পশ্চিম

বঙ্গ সরকার সেই নীতি অনুসরণ করে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। ব্যাপ্তির জটিলতা বৃদ্ধি করে নিরাময়ের বিধান দানের মধ্যে যে খাতক-মনোবৃত্তি নিহিত আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতি তারই প্রতিচ্ছবি।

আততায়ীর হাতে ডাঃ খান সাহেবের মৃত্যু

গত ৯ই মে তারিখে লাহোরে, তাঁর পুত্রের গৃহে অবস্থান কালে ডাঃ খানসাহেব আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। আতা মহম্মদ নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক আততায়ী ধরা পড়ে। আতা মহম্মদ নাকি পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তিতে বলেছে—দুই বৎসর পূর্বে তাকে সরকারি কাজ থেকে দুর্নীতির অপরাধে কর্মচ্যুত করা হয়—ডাঃ খানসাহেবের নিকট পুনর্নিয়োগের আবেদন নিয়ে সে উপস্থিত হয়, কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হবার দরুণ হতাশা থেকে ডাঃ খানসাহেবকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ আছে কিনা এখনও তা পরিষ্কার হয়নি। যথাকালে তা প্রকাশ পাবে। কিন্তু ৭৬ বৎসরের একটী মহান জীবন, যা পাকভারত উপ-মহাদেশের মুক্তি আন্দোলনে অগ্রগামীদের মধ্যে এক অন্যতম ছিলো—মর্মান্তিক ভাবে তার উপর যবনিকাপাত হোল।

ডাঃ খানসাহেব লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যার পড়ার সময় পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়। এবং ১৯২০ সনে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নাগপুর কংগ্রেস অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ও মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদেন। তিনি ও তাঁর ছোট ভাই আব্দুল গফুর খান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে 'জাতীয় মুক্তি বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। অবিলম্বে তাঁকে আটক করে জেলে প্রেরণ করা হয়। এই 'জাতীয় স্কুলের' শিক্ষক ও ছাত্রেরাই বিখ্যাত খুদাই খিদমৎগার দলের ভিত্তিস্থাপন করে। বার বার মহাত্মাগান্ধীর আহ্বানে তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ করে কারাবরণ করেন এবং কংগ্রেস যখন শাসনভার গ্রহণ করে তখন তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। দেশবিভাগের পর মিঃ জিন্না তাঁকে পদচ্যুত করেন। এবং পুনরায় তাঁর ভাগ্যে দীর্ঘ ৬ বৎসরের জন্য কারাবাস ঘটে। তারপর ১৯৪৮ সনে মুক্ত হয়ে তিনি অল্পদিনের জন্য পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। পরে ১৯৫৪ সনে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সনে পশ্চিমপাকিস্থানে পার্লামেন্টারী শাসন বাতিল হবার পর তিনি রিপাব্লিকান দল গঠন করেন। তাঁর মৃত্যুতে এই উপ-মহাদেশের এক আত্মত্যাগী মহৎ নেতার জীবনই শুধু অবসান হোল না, ভারত পাকিস্থানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের আশার এক সুদৃঢ় সেতুও অপসারিত হোলো।

১০।৫।৫৯

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

২০৯, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট স্থিত সোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪৭-৫, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অক্ষরশ্রী

সূচীপত্র—১৩৬৪ (বৈশাখ-চৈত্র)

অজিত দত্ত
রবীন্দ্র কাব্যের আলোচনা (প্রবন্ধ) ১৬

অতীন্দ্রনাথ বসু
মহাপথিক রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) ১৮
অন্নপূর্ণা গোস্বামী (জীবন আলেখ্য) ১১১
১৮৫৭ ও ১৯৫৭ (প্রবন্ধ) ২৫১
আমরা কোথায় চলিয়াছি ? ৬৬৩

অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী
রবীন্দ্রনাথ কি মিষ্টিক ? (প্রবন্ধ)

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শেষটা জানা (গল্প) ৬৩

অতুল চক্রবর্ত্তী
দৃষ্টি) ২২৬
উত্তর " ৪৭৯

অমলকান্তি ঘোষ
আত্ম গত (কবিতা) ৩০৬
এই মনঃ উদাসীনদের নায়িকা ১১৭
অরে ৬৪৯

অন্নপূর্ণা গোস্বামী
নির্বাসন (কবিতা) ১৬৮

অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য
মৃত মনকে (কবিতা)

অমলেন্দু মিত্র
বাৎসল্য (গল্প)

অনিলচন্দ্র রায়
নেতাজীর প্রগতিতত্ত্ব (প্রবন্ধ) ৫১৬

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
মেরেটি (কবিতা)

মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা লিপি ও উচ্চারণ (প্রবন্ধ) ৬৫০

আশাপূর্ণা দেবী
জটিল অঙ্ক (গল্প)

আশিস স্যান্যাল
চোখ মেলে (কবিতা)

এলায়নী শ্যাম
কেম্ব্রিজে একদিন (ভ্রমণ)

কামাক্ষাপ্রসাদ রায়
বন্ধ্যা প্রকৃতি (কবিতা)

কালিদাস রায়
পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা)

কুয়ালাল দাশগুপ্ত
প্রোমক (নাটিকা)
সোনার তরী (রূপরচনা)

শ্রীকিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত
অবহিত্থ (কবিতা) ৩২৭

কাশিকান্ত মৈত্র
নেতাজীর জীবন দর্শনের গণতান্ত্রিক ভিত্তি

গোপাল ভৌমিক
খতিয়ান (কবিতা)
জীবন মৃত্যু

গৌরীশঙ্কর দে
আকাশে যেদিন (কবিতা)

গৌরাঙ্গ ভৌমিক
পাচিল ৪২৮

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
সনেট— (কবিতা)

জয়দেব রায়
বাংলা হাসির গান (প্রবন্ধ) ৫৪০
আসরী গান ও মনসা গীতি " ২৯৯

জয়ন্তী রায়
প্রেম (কবিতা)

জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ
বাংলার ছেলে নেতাজী সুভাষ ৫৯৩

জ্যোতিরেন্দ্রনাথ লস্কী
সগোত্র (গল্প) ৩৮৭

ঝিপুরা শঙ্কর সেন
রবীন্দ্র মদিরা (প্রবন্ধ) ৫৮
জিজ্ঞাস্য রমেন্দ্র সুন্দর ১১৯
বাঙালী কোন পথে ৩২৮

তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
স্বয়ম্ভাষা (কবিতা) ৩৪৩

প্রীতারক সেন
আমার ভুল (গান) ৬১৯

দেবব্রত চক্রবর্তী
মেঘের পরে মেঘ (গল্প) ১০৬

দিলীপ রায় (অনুবাদ) অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
নেতাজীর প্রতি (কবিতা) ৫৬৫

দিলীপকুমার সেন
মৃত্যুর মহাপ্রস্থানের (কবিতা)

দুর্গাদাস সরকার
দুটি সর (কবিতা) ৪৪৪

ধর্মসেন ভিক্ষু
হত্যা ১৯৯ (কাহিনী)

নীলিমা দাশগুপ্ত
উত্তরবঙ্গ (ধারাবাহিক উপন্যাস) ৩৩, ৯৯, ১৫৬, ২০৭, ২৯১, ৪০৭, ৪৬১, ৫২৬, ৬২৭
গল্প ৬৯৬

নারায়ণ চৌধুরী
সমাজ ও ব্যক্তি (প্রবন্ধ) ৩৫৩

নির্মলকুমার বসু
আদিমবাসী সমস্যা (প্রবন্ধ) ২৬৪

নৃপেন্দ্র ঘোষ
কবি কায়কোবাদের (প্রবন্ধ) ২৮৮

পবিত্র মুখোপাধ্যায়
দুপুরের মায়া (কবিতা)

পুলক আঢ্য
অদৃষ্ট (কবিতা)

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
ভারতের ভাষা সমস্যা (প্রবন্ধ)

প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়
ধলভূম (প্রবন্ধ) ১৪৭, ২১৭

প্রভাকর মাঝি
ছায়া (কবিতা) ৩৩৫

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
একটি জলমগ্ন মৃত্যু (কবিতা)

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শীত কন্যা (কবিতা) ৩৩৭
সারাদিনের কবিতা (কবিতা) ৪৭৮
কানপুরের দেহাতি গ্রামে (কবিতা) ১০৫

বিজন কুমার ঘোষ
বেলা (গল্প)
রায় সাহেবের মেয়ে (গল্প)

সূচীপত্র—১৩৬৪ (বৈশাখ-চৈত্র)

বীরেন্দ্রনাথ গুহ
ভূবন কোন পথে ? (প্রবন্ধ) ৪২৯
বিভা সরকার
মহারাষ্ট্রের পথে (ভ্রমণ) ৩০৩
বিজয় দাশ
সাহিত্য বিচারে বিড়ম্বনা (প্রবন্ধ) ৪৭৩
বিভূতি ভট্টাচার্য্য
রূপকথ (কবিতা) ৬৩৮
[illegible]ব চৌধুরী
[illegible]পুরীর স্বর্ণভূমিকা (প্রবন্ধ)
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত
আশ্চর্য্য সন্ধ্যা (কবিতা)
মৃণাল দেব
পিসিদিকা (অনুবাদ) সামারসেট মম্ ১৭১
অগ্রাধিকার (গল্প) ৪০৬
সময় নিষ্ঠা (গল্প) ৬৪২
পরিবর্ত্তন (গল্প) ৩৭৪
মানিক চৌধুরী
কলঙ্কিনতা (কবিতা) ১২৮
মীরা সান্যাল
প্রয়োজনে (কবিতা) ৪১৮
মীরা দত্ত
ঝরা পাতার গান (গল্প) ৫২১
ব্রাত্য ৭১৩
যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী
মোড়বদল (প্রবন্ধ) ৩১৯
রথীন্দ্রনাথ রায়
রবীন্দ্র উপন্যাসের ভূমিকা (প্রবন্ধ) ৬, ৮৪, ১৩৯
বৌঠাকুরাণীর হাট ২৬৫
রমেন্দ্রনাথ রায়
নেতাজী (কবিতা)
রবীন্দ্রনাথ দত্ত
চিঠি (কবিতা)
কামনা
লীলা রায়
রূপান্তর (প্রবন্ধ)
ভাষাপ্রসঙ্গে
গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ
ডাঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত
মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্ত (প্রবন্ধ)
ভারতের ভাষা সমস্যা
শকুন্তলা চক্রবর্তী
গদ্য কবিতা (কবিতা) ৬৭৭
শিবশঙ্কর দত্ত
আরো কাগজ চাই (প্রবন্ধ)
শান্তি সেন
কাশ্মীর যাত্রীর ডায়রী (ভ্রমণ)
শিবদাস চক্রবর্তী
ইতিহাস (কবিতা)
শেফালী সোম
ক্রিসমাস
সমর গুহ
ভূবনের বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ (প্রবন্ধ) ৮৮
সামসুল হক
আত্মিয়র (কবিতা)
দুই দৃশ্য
সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
২৩শে জানুয়ারী (কবিতা)
চির পথিক
শচিন দত্ত
উত্তর প্রার্থনা (কবিতা)
সর্বমঙ্গলা দেবী
এলো নর্ত্তকী বর্ষা ২৩৩

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন
বর্তমান বৎসরের বাজেট ২০২
বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার (প্রবন্ধ) ৩১৬
কেন্দ্রীয় বাজেট ৩২০
খাদ্য সংকট ২৪৭
সুরেন্দ্রীর বসু ঠাকুর
প্রার্থনা (কবিতা) ১২৩
সুশীলাবালা
পশ্চিম বঙ্গের বাজেটের দু'এক কথা (প্রবন্ধ)
সুনীল রায়
গৃহবধূ (গল্প) ৩২১
সুশান্ত ঘোষ
তোমার (কবিতা) ১৭১
৬২৪
উপায় হবে (কবিতা) ৫৩
বধূ সরণি (গল্প) ২৩৪
৪২৮
চৌধুরী
সুভাষচন্দ্র বসু
আমাদের ভারত (প্রবন্ধ) ৪৪৫
একটি ঐতিহাসিক পত্র ৫৬০
ভারতনীতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ৫৫৭
মানব মহান ৫৬৬
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত
কবিতাবলী (কবিতা) ২৫৬
কিন্নাত ৫৭
ছন্দিত ২৪৪
শান্তির সুন্দর কথা ৪৫৩
প্রবাসের দিবির দিন ৫১৩
হিতৈষী ৭১২
স্বপ্নের বুড়ো
দুটি বুক বিষয়ক
স্বদেশরঞ্জন দত্ত
প্রত্যাবর্তন (কবিতা) ৩৮
স্মৃতিবিনা দাসগুপ্তা
ফিরে (গল্প) ৪২৩
সুব্রতেশ ঘোষ
ভগ্নসেতু (গল্প) ৬৪৪
লোকায়ত সংস্থার স্বরূপ শাসনের সমস্যা ৬৮৭
সমরেশ বসু
ঘর (গল্প) ৩৩৬
ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র (প্রবন্ধ) ৬৩৫
প্রতি হিংসা
গোল দীঘির গোল
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
স্বল্প স্বাক্ষর ৪২২
সত্যসাধন রায়
আমার গ্রামের লোক (কবিতা) ৪০২
সত্যব্রত বসু
পত্রিকা সাহিত্য (আলোচনা) ২৭৪
সুভাষ : বন্ধুদের দৃষ্টিতে ৫৯৩
সাহিত্যিক অরবিন্দ (প্রবন্ধ) ৩৪১
হরেন্দ্র সিংহ
স্মৃতি রেখা (সনেট) ৩০২
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমামুখোপাধ্যায়
আচার্য্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৫৪, ৪৯৪
উনবিংশ শতকের বাংলার সমন্বয় সাধনা ৫১৯
হরপ্রসাদ মিত্র
রবীন্দ্রনাথের গাথা কাব্যের প্রথম পর্ব (প্রবন্ধ)
হেনা হালদার
যোগেন ভিলা (কবিতা) ২৮৭
পুস্তক পরিচয়— ৪৪৭, ৬৬০, ৭২৭, ৩৭৪,
বর্তমান প্রসঙ্গ— ৩, ৭৭, ১৩১, ১৯১, ৩৮৩, ৪৩৭, ৪৯৭, ৬১১, ৬৭১, ৮০৭
বিবাবর্ত— ১২৯, ১৮৬, ২৪৫, ৩৩৩ ৫৯৩, ৫৪৭, ৭২১

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

বর্তমান প্রসঙ্গ

আচার্য যদুনাথ

গত ১৯শে মে তারিখে বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও শিল্পব্রতী আচার্য যদুনাথ ৮৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে প্রতিভা-দীপ্ত যুগ বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল আচার্য যদুনাথ সে যুগের অন্যতম জ্যোতিষ্ক। আচার্য যদুনাথের তিরোধানে সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর শেষ রশ্মিটি অস্তমিত হোলো।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে আচার্য যদুনাথ ছিলেন অন্যতম। তাঁরই অনুপ্রেরণায় অসংখ্য ভারতীয় ছাত্র ইতিহাস-গবেষকরূপে পরবর্তী-কালে খ্যাতিমান হয়েছেন। এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপনায় আচার্য যদুনাথের ইতিহাস-সাধনা সঞ্চারিত করেছেন। মোগল-যুগ ও মারাঠা যুগের ইতিহাসের উদ্ঘাটন ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাদের স্থান-নির্ণয়ে আচার্য যদুনাথের যে সাধনা ও তপস্যা রয়েছে তা চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর এই সাধনার গভীরতা তিনি নিজের ভাষায় লিখে রেখে গেছেন—। "কোন একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে প্রথম দশ বৎসর ধরে যে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে সেগুলি সাজিয়ে সংশোধন করে, আলোচনা করে, তথ্যের মধ্যে হজম করে দশ বৎসর পরে ঐ পুস্তকের লেখা আরম্ভ করি, তার আগে নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক কিনতে ও পার্শী হস্তলিপির নকল নিতে বোধ হয় আমার উদ্বৃত্ত আয়ের অর্দ্ধেক খরচ হয়েছে। মারাঠা দেশে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর এবং আগ্রা, দিল্লী, মালব, রাজপুতনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে বারো-তেরো বৎসর বেড়িয়েছি। এ-ছাড়া ঐ উপকরণ বুঝবার জন্য আমাকে পার্শী, মারাঠী ও পর্তুগীজ প্রভৃতি নূতন ভাষা শিখতে হয়।" এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই বোঝা যায় কি দুস্তর সাধনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধির সীমায় তাঁর উত্তরণ হয়েছিল।

শুধু ইতিহাস-বিজ্ঞানী হিসাবেই নয়, জ্ঞান সাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা সাহিত্য, অর্থনীতি শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে এই মনীষিপর মনীষী যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন দেশবাসী চিরকাল তা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করবে।

এই মনীষীর সাধনার উৎসস্থল কোথায় 'আমার জীবনের তত্ত্ব' (১৯৪৮) নামক প্রবন্ধে নিজের ভাষায় তিনি তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলছেন, "তাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার; আজ ৩৪ বৎসর হল তিনি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। ধনী জমিদার সন্তান এবং ইংরেজী শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও সুখভোগ বা আড়ম্বর চান নাই। চিরদিন সরল, সংযত জীবনযাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল আমাদের রাজসাহী জেলার সব রকম লোকহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। বাঙলার প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষার সমস্ত সুফলই তিনি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর চিত্ত শান্তি পেত, বল পেত, বৈষ্ণব ধর্মের এক সরল উদার রূপ হৃদয়ে মেনে নিয়ে……।"

আচার্য যদুনাথও অনাড়ম্বর কর্মময় জীবনকে তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করে তাঁর সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বাঙালীর জীবনে আচার্য যদুনাথের অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রা, একাগ্র মনীষা ও অনন্যচিত্ত সাধনার মানসিকতা সঞ্চারিত করুক, এই কামনা জানিয়ে আচার্যের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি।

শশীভূষণ দে

প্রখ্যাত সমাজসেবী ও দানবীর শশীভূষণ দে ৯১ বৎসর বয়সে ২৯শে মে কলকাতায় লোকান্তরিত হন। এই প্রচারের যুগে লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করে শশিভূষণ দে সমাজসেবা ও লোকহিতকর কাজে যেভাবে অকুণ্ঠ অর্থব্যয় করে গেছেন, তার শতাংশ সম্পন্ন করেও প্রচারের জোরে আরও বেশী সুলভ খ্যাতি তিনি আয়ত্ত করতে পারতেন। কিন্তু শশিভূষণ সে ধাতের লোক ছিলেন না বলেই কার্সিয়াং-এ টি, বি, হাসপাতাল, কলকাতার ছেলে-মেয়েদের স্কুল ও অন্যান্য বহুবিধ প্রতিষ্ঠানে দান করেও বাঙালীসমাজে শশিভূষণ তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পান নাই বলে মনে হয়। আমরা এই সমাজসেবী ও দানবীরের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর আত্মীয়বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

প্রজা সোশ্যালিষ্ট সম্মেলন

শুধু বাইরের দিক থেকেই নয় সাংগঠনিক দিক দিয়েও এবারের প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টির চতুর্থ-বার্ষিক পুণা সম্মেলন এক বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গকে ঘিরে যে শোভাযাত্রা বের করা হয় সেরূপ বিরাট শোভাযাত্রা খুব কমই দেখা যায়। অগণিত তোরণ পুষ্পোভিত পুণা সহরটি যেন এক নতুন রূপ লাভ করে এবং প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টির এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্য পুণা সহরের সমস্ত নরনারী যেন রাস্তায় ভেঙ্গে পড়ে। একথা ঠিক যে প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টির পুণা অধিবেশনে বিপুল জনসমাবেশ ও জনসমর্থনের পিছনে, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের অনেকখানি প্রভাব রয়েছে। কিন্তু সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র যে প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি এবং পার্টির মৌলিক আদর্শের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করেই যে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে পুণার স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশ ও সহযোগীতায় সে বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন, সম্মেলনের মণ্ডপ সজ্জা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিকের মধ্যেও এবারের প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি বাইরের দৃষ্টিতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে এবারের পুণা অধিবেশনে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এক সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আচার্য নরেন দেবের মৃত্যু এবং প্রজা সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের পথে সোস্যালিষ্ট পার্টির সৃষ্টি—এই ঘটনা দুইটির প্রতিক্রিয়ায় প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির গয়া সম্মেলন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় অনেকখানি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। শ্রীজয় প্রকাশ নারায়ণের দল ত্যাগের ফলে এই অনিশ্চয়তা ও নিরাশার মনোভাবে বাংগালোর সম্মেলন দলের অভ্যন্তরে একটি অসহায় মনোভাব, নেতা ও কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বহুল পরিমাণে শিথিল করে দিয়েছিল। এ ছাড়া দলের নীতি সম্বন্ধেও নেতা ও কর্মীদের মনে ছিল অনৈক্য। আভ্যন্তরীণ সংকট থেকে মুক্তিলাভ করে প্রজাসোস্যালিষ্ট যে দলীয় আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেয়েছে পুণা সম্মেলনের আলোচনা ও বিতর্কে এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় জাতীয় কর্ম পরিষদের নির্বাচনে সেকথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুরন্ত সংকট সত্ত্বেও গত সাধারণ নির্বাচনে প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টি সাংগঠনিক দুর্বলতার অনুপাতে আশাতীতভাবে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং নির্বাচনের পরে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের যে একটি নিজস্ব প্রাণশক্তি রয়েছে এবং প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টিই যে এই শক্তির ধারক শুধু প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মীদের মনেই নয়, সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রসারিত হতে আরম্ভ করেছে। প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তার পরিবেশ রচিত হয়েছিল তার প্রভাব সমাজবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নিষ্ক্রিয় ও দ্বিধাপূর্ণ করে তুলেছিল। এবারের পুণা সম্মেলনে আচার্য কৃপালনী পটলু বাদু পিল্লাই ও কবীর আনসারী অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেন নি—তা' ছাড়া দলের সমস্ত নেতৃবর্গ এবারে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছেন সম্মেলনে। সম্মেলনের বিতর্ক ও আলোচনার মানও অন্যান্য বারের তুলনায় উন্নত হয়েছে। নেতা ও প্রতিনিধিদের ভাষণে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে একনতুন আশা এবারের পুণা সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে একথাটি সম্বন্ধে প্রায় সর্বসম্মত সুর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান শক্তি হ্রাসের ফলে ভারত দ্রুত একটি রাজনৈতিক শূন্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের ঐতিহাসিক দায়িত্ব প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির। সাংগঠনিক শক্তি ও গণসংযোগের পথে অবিলম্বে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টিকে সুসংহত করে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হতে হবে। কংগ্রেসের বিকল্প প্রতিষ্ঠানরূপে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টিকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথে এগিয়ে যেতে হবে—এই নীতি এবারের পুণা সম্মেলনে পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। অমৃতসহরে গৃহীত কম্যুনিষ্ট পার্টির গণতান্ত্রিক নীতিকে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি একটি কূটনৈতিক চালের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে রাজী হয়নি। উড়িষ্যা ও কেরলায় আপাত দৃষ্টিতে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির যে নীতি-বৈপরিত্য দেখা দিয়েছে বলে কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট বর্জনের মূলনীতির পুনঃসমর্থন জানিয়ে বলা হয়েছে যে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাময়িক ও স্থানীয় প্রয়োজন বোধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন দলের

সঙ্গে যুক্ত প্রয়াসে অগ্রসর হওয়া কর্মকৌশল ও জনস্বার্থের দিক দিয়ে অবাঞ্ছনীয় নয়।

যারা গণতন্ত্র ও সমাজবাদে বিশ্বাসী তারা যে প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির শক্তি ও প্রগতি কামনা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি এক রহস্যময় কারণে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির সংবাদ পরিবেশনে অত্যন্ত বিমুখ। এবারের পুণা সম্মেলন সবদিক দিয়ে সফল ও উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির সংবাদ যথাযোগ্যভাবে পরিবেশন করা হয়নি এটা নিঃসন্দেহ বিস্ময়কর।

সর্বোদয় সম্মেলন

ভারতের ভূদান আন্দোলনে সর্বোদয় যে এক ব্যাপক ও স্থায়ী আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবারের পন্ডারপুর সম্মেলনের ব্যাপক জনসমাবেশেও সেকথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লক্ষাধিক দর্শক ছাড়াও সারা-ভারত থেকে প্রায় আঠার হাজার প্রতিনিধি সর্বোদয় সম্মেলনে যোগ দেয়। কিন্তু দর্শক ও প্রতিনিধি সমা-বেশের তুলনায় অন্যান্য বারের মত এবারের সম্মেলনের ব্যবস্থা সুসংগত হয়নি। তারপরে সম্মেলনের আলোচনা ও তাহাতে প্রতিনিধি ও আগ্রহী দর্শকদের পক্ষে মনো-সংযোগ করা সম্ভব হয়নি। সর্বোদয়ের উদ্যোক্তারা যদি ভবিষ্যতে সম্মেলনের আয়োজন এবং প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করেন তবে ভবিষ্যতে সর্বোদয় সম্মেলন একটি ধর্ম মেলায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সর্বোদয় আন্দোলনের বর্তমান প্রগতির স্বরূপ ভূদান আন্দোলনে, ভূদান আন্দোলন ৫০ লক্ষ একরে ভূমি সংগ্রহের পথে ক্রমশ গ্রামদান আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমশ প্রায় ৩০০০ গ্রাম দানরূপে পাওয়া যায়। ভূদান আন্দোলনে ভূমি সংগ্রহের চেয়েও ভূমিবণ্টন সমস্যা অধিক গুরুত্ব অর্জন করে। তেমনি গ্রামদানী আন্দোলনে গ্রাম সংগ্রহের চেয়ে গ্রাম সংগঠন ও গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার কাজ অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে গ্রামদান আন্দোলনের বড় সমস্যা গ্রাম সংগঠনের কাজকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা। তিন হাজার গ্রামদানী গ্রামকে সংগঠিত করার জন্য কর্মীর ব্যাপক প্রয়োজন। গান্ধীস্মারক নিধির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার পরে সর্বক্ষণের কর্মী পোষণ করা সর্বোদয় আন্দোলনের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। উপরন্তু গ্রামদানী গ্রামের উন্নতির জন্য যে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রয়োজন সম্পত্তি-দান আন্দোলন দ্বারা তার অভাব পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বোদয় আন্দোলন ও কম্যুনিটি প্রোজেক্ট পরিকল্পনার মধ্যে সহ-যোগীতার নীতি গৃহীত হয়েছে। অবশ্য সরকারী সহযোগীতার নীতি গ্রহণের ফলে সর্বোদয় আন্দোলন মূল আদর্শ নৈতিক আবেদন থেকে বিচ্যুত হতে পারে—এরূপ আশঙ্কা কোন কোন সর্বোদয়ী এবং সর্বকর্মের মনে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।

সর্বোদয় আন্দোলনে আরেকটি নূতন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে শান্তি সেনা গঠনের। সর্বোদয়ের প্রচারের জন্য এবং গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করার জন্য বিশেষভাবে এই শান্তি সেনা গঠনের আহ্বান জানান হয়েছে। এবারের সম্মেলনে বিনোবাজী শান্তি সেনা গঠনের কাজে অধিক জোর দিয়েছেন।

সংবাদ পত্রের প্রতি দুঃখিত হয়ে বিনোবাজী সংবাদ পত্র পাঠ বন্ধ করে দেওয়ার সংকল্প করেছেন। তাঁর মতে মন্ত্রী ও সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিরা সংবাদ পত্রে

এত বেশি মাত্রায় প্রচার লাভ করে যে সর্বোদয়ের মত একটি ব্যাপক জাতীয় আন্দোলনকে পর্যন্ত সংবাদ পত্রে তার যোগ্যস্থান দেওয়া হয় না। পরিকল্পনা সম্বন্ধেও বিনোবাজী এবারের সম্মেলনে কঠোর মন্তব্য করে বলেন যে সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা অবাস্তব এবং গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা সহরে থেকে করা সম্ভব নয়।

যে তিন হাজার গ্রামকে দানরূপে পাওয়া গেছে সেই গ্রামগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টি-গত মালিকানা তথা সর্বোদয়ের ভাষায় সাম্যযোগের ভিত্তিতে কিভাবে গড়ে তোলা যায়—তাই এখন সর্বোদয়ের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা উত্তীর্ণ হয়ে যদি তিন হাজার সাম্যযোগী প্রাণবন্ত গ্রামসমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয় তা' হলে সর্বোদয় ভারতের ভূদান-আন্দোলনের সামনে এক নতুন দিগদর্শন তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

সীমান্ত-সংঘর্ষের সংকেত

পাকিস্তান সম্বন্ধে, যিনি অটল ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সেই শ্রীনেহেরু পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাক সীমান্তের গুলিবাজীতে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন এবং পাকিস্তানের এই 'শয়তান'কে বর্বরতা ও পাশবিকতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্যি পাকিস্তানের এই দুর্বুদ্ধি, শ্রীনেহেরুর কঠোর মন্তব্যে হ্রাস পাবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়কেরা জানে যে শ্রীনেহেরুর উক্তি উক্তির বাণেই শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ফলে সীমান্ত-নির্দেশের যে ত্রুটি রয়েছে বা সীমান্ত প্রবাহিত নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তার মীমাংসা করা তেমন দুরূহ কাজ নয়। এ সম্বন্ধে অজস্র আন্তর্জাতীয় নিদর্শন রয়েছে এবং মীমাংসারও আন্তর্জাতীয় বিধান রয়েছে। কিন্তু এই সহজ উপায়টিকে গোলাবারুদের গর্জনে দুরূহ করে তোলার পশ্চাতে এবং যেখানে সীমান্ত সমস্যা নেই সেখানেও সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াসের মধ্যে পাক রাজনীতিবিদদের যে একটি গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে সেকথা বোঝা কঠিন নয়। পাকিস্তানের আর্থিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে পাক-জনমনকে বাইরের দিকে নিবদ্ধ করে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের তীব্রতা হ্রাস করার একটি কূটনৈতিক উদ্দেশ্য যে এই সীমান্ত সংঘাতের পেছনে রয়েছে নিঃসন্দেহে সেকথা বলা যায়। কিন্তু আভ্যন্তরীন সংকটকে বাইরের সংকটে পরিণত করার চির পরিচিত কূটনীতি ছাড়াও সীমান্ত সংঘর্ষের পিছনে আরও গুরুতর সংকেত রয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বৃটিশ আমলের একজন বুরোক্র্যাট ও সরহদ-রাজনীতি-বিদদের অন্যতম চৌধুরী মহম্মদ আলী যে কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে উগ্র উক্তি করতে আরম্ভ করেছেন এবং পাক-ভারত যুদ্ধ অনিবার্য বলে ঘোষণা করতে সুরু করেছেন—তাকে নিতান্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্য বলে তুচ্ছ করা সঙ্গত হবে বলে আমরা মনে করি না। একমাত্র জাতীয় আওয়ামী লীগ ছাড়া পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিসহ একটি সংযুক্ত কাশ্মীর কমিটি গঠন করা হয়েছে। বস্তুত, কাশ্মীর ও খালের জলের সমস্যা সম্বন্ধে পাকিস্তানের সমস্ত নেতাদের উক্তি একই রকম উগ্র ও হুমকিপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীর মুসলীম সম্মেলনের 'শান্তিপূর্ণ' কাশ্মীর অভিযানের আওয়াজও তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিবেশে আসাম সীমান্তে পাকসৈন্যের অবিরাম গোলাবর্ষণ এবং পশ্চিম সীমান্তে সাত জন সীমান্ত পুলিশকে হত্যা ও কয়েকজন পুলিশের অপহরণ—ঘটনার আপাত মূল্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীনেহরু ও শ্রীমতী মেনন অবশ্যি জানিয়েছেন যে দিল্লী ঘুমিয়ে নেই। কিন্তু ১৯৪৮ সালের কাশ্মীর

অভিযুক্ত এবং ১৯৫০ এ পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক সংখ্যালঘু হত্যার পরেও দিল্লী কতখানি অগ্রসর ছিল সেকথা ভারতবাসীর অজানা নয়। শুধু কড়া কড়া 'বাক্য' নয় সীমান্তের দৌরাত্ম বন্ধের জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্থ ভারতবাসীদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কি কার্যকরী ব্যবস্থা নেবেন সরকার গ্রহণ করেছেন ভারতবাসী তা জানতে চায়।

লজ্জাকর অজুহাত চর্চা

খবরের কাগজে দেখলাম কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইনের আওতায় যারা এসেছে তাদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে তিনি ও ডাঃ রায় স্থির করেছেন যে ১লা মে থেকে যে আইন ভারতবর্ষের অন্যত্র প্রয়োগ হোয়েছে তা এখানে প্রয়োগ হবেনা এবং খুব দম্ভভরে শ্রীঅশোক সেন বলেছেন তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তিনি এটার বাধা দেবেন। তিনি নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি আদায় করেছেন এই ব্যাপারে। এই কাজের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে সমস্যাকণ্টকিত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা তিনি আর বাড়াতে চান না। বাঙ্গালাদেশের পক্ষে শ্রীঅশোক সেন এত লজ্জাকর উক্তি করতে কি ভাবে সাহস পেলেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই হতভাগ্য নারীদের প্রানিকর জীবন অব্যাহত রাখতে হবে যেহেতু বাংলাদেশের সমস্যা আর বাড়ানো যুক্তিযুক্ত নয়! অথচ বাঙ্গলা থেকে এর কোনো একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত হোলোনা। আমরা পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই।—

(১) এই আইন প্রবর্তনের পরে বাংলাদেশে তার প্রয়োগস্থল রাখা যেমন অনিষ্টকর তেমনি লজ্জাকর।

(২) শ্রীঅশোক সেন বাংলার জনমতের প্রতীক নন্। বিশেষতঃ আইন প্রণয়নের পর ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশী মত বাংলাকে তার প্রয়োগের বাইরে রাখার কোনো অধিকার তাঁর অথবা অন্য কোনো মন্ত্রীর নেই।

(৩) আফ্রিকায় দাস প্রথা রোধের সময় অনেক দাস অনিশ্চিত ও অনাস্বাদিত ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে আশঙ্কিত হয়ে দাস প্রথারোধে বিরোধিতা করেছিল ঠিক সেই একই কারণে পাশবিকতার যুপকাষ্ঠে বলীস্বরূপ এই নারীদের পক্ষে এর বিরোধীতা করা অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু সন্তানসহ আত্মহত্যা করবার অধিকার কি কোথাও স্বীকার করে নিয়েছে?

(৪) বাংলাদেশে এই আইন চালু না হলে অন্যান্য প্রদেশ থেকে এই নারীরা অথবা এই নারী—ব্যবসায়ীরা বাংলায় এসে ভীড় করবে সে সম্বন্ধে এঁরা কি ব্যবস্থা করবেন?

মন্ত্রীদের এই ধরণের কাজ জাতীয় পরিবেশকে কি স্থায়ী করে না?

যেখানে আন্তরিকতা, দৃঢ়তা ও মানবিকতার সহিত তৎপরতাবে এদের সমাজে পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করা উচিত সেখানে এই আইনকেই বানচাল করবার এ অপচেষ্টায় আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং সমাজের যথার্থ মঙ্গলকামীদের এই জঘন্য চেষ্টার বিরোধীতা করতে আহ্বান করি।

জাতীয় মহিলা সংহতির পঞ্চবার্ষিকী সম্মেলন

গত ১৭ই ও ১৮ই মে জাতীয় মহিলা সংহতির পঞ্চবার্ষিক সম্মেলন সফলতার সহিত দক্ষিণ কলিকাতা অ্যাসাদল স্কুল হলে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী বাণী রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীমতী শৈল সেন সভানেত্রীত্ব করেন।

পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, দৈহিক ও মানসিক রোগ থেকে শিশুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে শিশুরক্ষা আইন প্রণয়ন, বেকার সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভাবে সমবায় প্রথায় গৃহ ও ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষা, উৎপাদন ও বিক্রীর ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা, প্রাইভেট পরীক্ষা

দেবার সুযোগ অনুগ্রহত রাখা আইনদ্বারা পণ প্রথা উচ্ছেদ ও সঙ্কটজনক খাদ্য সমস্যার সমাধান দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার পর বহু শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীরা সকলতার সহিত 'শাড়ীর আবেদন' অভিনয় করে।

বেতিয়ার গুলি

গত ১৩ই মে পুলিশের অতর্কিত গুলি চলনার ফলে পাঁচজন উদ্বাস্তু যুবক সুদূর বেতিয়ায় নির্মম মৃত্যু বরণ করেছে এবং আরও পাঁচজন যুবক গুরুতররূপে আহত হয়েছে। পুলিশের এই হিংস্র আচরণে বেতিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরে যে অসহায় উত্তেজনা ও শঙ্কিত হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, এই ছিন্নমূল নরনারীদের বিড়ম্বনাময় জীবনেও বোধ হয় এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা কখনও সঞ্চিত হয় নাই। ঘটনার বিবরণ এরূপ।

গত ১৩ই মে তারিখে সকাল ৯টা পর্যন্ত উদ্বাস্তু শিবিরে আসন্ন হিংস্র মৃত্যুর কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। ত্রিদফা দাবী নিয়ে বিহারের বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্প ও কলোনিগুলির উদ্বাস্তুরা এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে আন্দোলন করে আসছিল। তাছাড়াও গত বছর শতকরা ১৫ টাকা হারে ক্যাশডোলে বৃদ্ধির যে প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে কলকাতা থেকে বেতিয়ার উদ্বাস্তুরা বেতিয়ায় ফিরে এসেছিল, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবী নিয়েও উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। এই দাবীর মীমাংসার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৩ই মে ১টায় বেতিয়া থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত সরকারী গেষ্ট হাউসে ৭জন উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনার জন্য ডেকে নিয়ে যান। এই আলোচনা শান্ত পরিবেশে সুরু হয়েছিল এবং যতদূর জানা যায় আলোচনার প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের কলকাতা শাখার একজন পদস্থ কর্মচারীর উপস্থিতিতে মীমাংসার সূত্রও আলোচিত হয়। আলোচনার এই মীমাংসা-সুষ্ঠীন অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ পদস্থ কর্মচারীটি নির্দিষ্টসময়ে কলকাতা রওনা হবার অব্যবহিত পরেই অতর্কিতে কোন অজ্ঞাত কারণে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ৭জন উদ্বাস্তু প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করেন। যুদ্ধের সময় শত্রুর সঙ্গেও প্রতিপক্ষ যে ব্যবহার করে না উদ্বাস্তু প্রতিনিধি-দের প্রতি অকস্মাৎ সেই ব্যবহার বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। অতঃপর পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করলে পুলিশ-উদ্বাস্তু সংঘাতের সূচনায় গুলির আঘাতে উপরোক্ত শোচনীয় পরিণতি ঘটে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে এই ঘটনার জন্য দায়ী কে? বিহার সরকার পুলিশের দায়িত্ব মেনে কোনো রকম তদন্ত করতে অস্বীকার করেছেন। ইংরেজ আমলে বাংলা দেশে বন্দীশিবিরে গুলি করে রাজবন্দীদের হত্যার নজীর আছে। কিন্তু বিনা প্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গ্রেপ্তার ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে অসহায় নিরস্ত্র উদ্বাস্তুদের অতর্কিতে গুলি করে হত্যার এই নির্মম নজীর আর কোথাও নেই।

গত ৪ঠা জুন বিহারের পুনর্বাসন মন্ত্রী মহাশয় উর্দীর মুনেশী বেতিয়ার বাস্তুহারাদের এক সভায় বলেছেন যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং আইন শৃঙ্খলা পুন প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মুক্তির প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে—তিনি সোজার কথা বলেননি অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ৫জনকে নিহত করা অনিবার্য ছিল কিনা এবং এই দুর্ভাগা মানুষেরা বার বার তথাকথিত "আইন শৃঙ্খলা" ভাঙতে বাধ্য হয় কেন? সেই সামুলী কথা "সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য "ব্যস্ত" শুনিয়ে এবং মৃত ব্যক্তিদের পরিবারদের জন্য ৫০০৲ করে দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। কিন্তু আমরা জানতে চাই বিহার সরকার এ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়

থাকতে চাইলেও ভারত সরকারের সমযোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এই হত্যার ভয়ঙ্কর দায়িত্ব নেবেন কিনা? এবং যারা এই নিরপরাধী উদ্বাস্তুদের হত্যারক বলে তদন্তে সাব্যস্ত হবে তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করবার ব্যবস্থা হবে কিনা?

ষ্ট্যাম্পের মূল্যবৃদ্ধি

সরকারী অসাধুতা যদি আইনের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়, বে-সরকারী অসাধুতা সেখানে অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। সম্প্রতি দশমিক মুদ্রা প্রবর্তনের ফলে এই দুই ধরণের অসাধুতার চাপে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন যে কি পরিমাণ পিষ্ট হয়েছে ডাকঘরে ও ট্রামে বাসে দশমিক মুদ্রা প্রবর্তনের অভিজ্ঞতা থেকে তা আমাদের অজানা নেই। দুই আনার খামের দাম যদি তের নয়াপয়সা সরকার আদায় করতে পারে, ট্রাম বাসে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চার পয়সার পরিবর্তে সাত নয়াপয়সা আদায় না করার কি যুক্তি থাকতে পারে? সরকারী ক্ষেত্রে অসাধু বিসাব অস্ত্র প্রেরণা যোগাবে বৈ কি! লোকসভায় ভারতীয় ষ্ট্যাম্প (সংশোধন) বিলের উত্থাপন ও গ্রহণ এমনি আর একটি সরকারী অসাধুতার দৃষ্টান্ত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করে বলেন যে দশমিক মুদ্রা প্রবর্তন সম্পূর্ণ করার জন্য চার পয়সার ষ্ট্যাম্পের দাম নয়াপয়সার মূল্য ধার্য করা হল। দশমিক মুদ্রার দোহাই দিয়ে কার্যত ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর এই বিলের সাহায্যে ধার্য করা হোলো। এই সহজ সত্য কথাটি বলবার সংসাহস না থাকায় অসাধু-পন্থা অনুসরণ করে বিড়কীর দরজা দিয়ে কার্য হাসিল করার এ একটি চমকপ্রদ লজ্জাকর দৃষ্টান্ত।

শিক্ষক বিভীষ

বন্য শিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৩১শে আগষ্টের মধ্যে যাঁরা শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত নন এমন ম্যাট্রিক এবং ডি এম শিক্ষার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকদের বিদায় দিতে হবে। এই দুই শ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে প্রায় চারশত। অকস্মাৎ এই দুর্দিনে চারশত শিক্ষকের উপর বিতাড়নের খড়্গ উদ্যত হওয়ার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু নয়, নিম্ন মধ্যবিত্তের বেকারীর ক্ষেত্রে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষকদের অনশন ধর্মঘট মীমাংসার সময় মুখ্যমন্ত্রী এই আশ্বাস দিয়ে ছিলেন যে এই দুই শ্রেণীর শিক্ষকদের এতদিন চাকুরী করার পর পরিণত বয়সে তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে পনের থেকে বিশ বছর চাকুরী করার পর শিক্ষকরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, তাকে জাতীয় সম্পদ রূপে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বন্য শিক্ষা পর্ষদ তাকে আবর্জনা জ্ঞান করে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার উপক্রম করেছেন। এগার শ্রেণীর তাগিদে যদি পর্ষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তো সেখানেও বলতে হবে যে পাইকারী হারে শিক্ষক বিতাড়নের পূর্বে তাদের যত অধিকতর যোগ্য হবার সুযোগ দিতে হবে, তা নয় তো তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া, পশ্চিম বাংলার সব স্কুলই রাতারাতি এগার শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে না। ষোল-শত স্কুলের মধ্যে এখনও তিনশত স্কুলও এগার শ্রেণীর কৌলীন্যের অধিকারী হতে পারে নাই। এ-বিষয়ে পর্ষদ ও সরকারের অক্ষমতা এতো স্পষ্ট যে কি কারণে সে-অবস্থার বারশত প্রধান-শিক্ষক শিক্ষিকা তাঁদের চেয়ারগুলি ছাড়তে রাজী হবেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য—যদি না শান্তিমূলক মনোভাব দ্বারা পর্ষদ এ-কার্যে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করে থাকেন।

(শেষাংশ ১১০ পৃষ্ঠায়)

প্রবন্ধ

"ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা"

ডাঃ সুকুমার দত্ত

একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যিক লুইস্ ষ্টীভেন্‌সন "কুমারী ও কুমারদের জন্য", এই নাম দিয়া তাঁহার একখানা প্রবন্ধ-সংগ্রহ বাহির করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় পড়িয়াছিলাম। বৃদ্ধ বয়সে এখনও ষ্টীভেন্‌সনের একটি কথা মনে পড়ে।

জীবনপথে মানুষের অগ্রগতির সহিত তিনি সৈন্যের অভিযানের তুলনা করিয়াছেন। সৈন্য-দল ঘাঁটি বাঁধিতে বাঁধিতে সামনে চলে। কিন্তু অভিযান যতদূরই অগ্রসর হউক প্রথম ঘাঁটির সঙ্গে সম্পর্ক হারায় না। রসদ যোগাড় হয় ঐখান হইতে,—হুকুম আসে, সাহায্যকারী সৈন্যদল আসে।

জীবনের প্রথম ঘাঁটি বাল্যবয়স। সেইখানের সহিত যে সম্পর্ক হারাইয়া ফেলে, তাহার কাছে জীবনের অগ্রপথ হয় দুর্গম বিপথ। বালক বয়সকে এ গৌরব ইংরাজ সাহিত্যিকদের মধ্যে শুধু ষ্টীভেন্‌সনই দেন নাই। কবি ওর্ডাসওয়ার্থও ত বলিয়াছেন যে জীবনের আরম্ভের সহিত যদি আমার পরবর্তী দিনগুলির পারম্পরিক সম্বন্ধ না থাকে, তবে মৃত্যুই ত শ্রেয়।

এই প্রস্তাবনাটি মনে আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে।

তাঁহার রচনাবলী বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। এবং সেই কারণেই আবার পণ্ডিত-সমালোচকদের হাতে ইহার এত টানা-ছেঁড়া চলিতেছে যে ভয় হয় এ মহামূল্য কিংখাব শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া ন্যাকড়ায় পরিণত না হয়। পণ্ডিত দার্শনিক তাৎপর্য্যের সূত্র ধরিয়া ইহার সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বয়নকে টানিতে আরম্ভ করেন; উপরের সবুজটুকু খুঁড়িয়া ফেলিয়া ভিতরে কোন্ গুহাশায়ী তত্ত্ব আছে দেখিবার জন্য আতস্-কাঁচ বাগাইয়া ধরেন। সমালোচনার এই ঘনঘটায় শঙ্কিত মন কবিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে চায়—"ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি"।

অনেক বৎসর আগেকার কথা। তখন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি কিছুকাল হয় বাহির হইয়াছে। দার্শনিকেরা কবিতাটির অর্থনির্ণয়ে লাগিয়া গেলেন। নানাবিধ অর্থ বাহির হইতে লাগিল ও বাংলা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাগুলি প্রচুরভাবে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সাধারণ পাঠকেরা

অতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত দাবী করিলেন যে তাঁহারা কবির নিজের কাছ হইতে এই কবিতাটির অর্থ শুনিবেন। কবি সে দাবী মিটাইয়াছিলেন। সমালোচকদের সমশ্রেণীতে নামিয়া তাঁহার একটি স্বকীয় ব্যাখ্যাও দিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানচ্যুত কবি শেষ পর্যন্ত দার্শনিক পদবীর মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। ব্যাখ্যার শেষে 'নেতি নেতি' করিয়া তাহার পরিসমাপ্তি করিলেন; তরা ঘট দিলেন. উল্টাইয়া। কবি বলিয়াছিলেন শেষে এই কথা—ধর, কবিতাটির কোনও গভীরতর তাৎপর্য্য নাই। একটি মেঘলা দিন, গ্রাম্য পরিবেশ, সামনে খরস্রোতা ছোট নদী, ধানের তরা লইয়া একটি নৌকা চলিয়াছে, নদীর এক তট হইতে পার হইবার জন্ত কে মাঝিকে ডাকিয়া অনুরোধ জানাইতেছে। নৌকা কিন্তু থামিল না, ভাসিয়া গেল নদীর স্রোতে।—কবিতাটি যদি এইটুকু মাত্রই বলে, তবেই বা মন্দ কি?

কবি বিনয়বশে বলিয়াছিলেন—মন্দ কি? প্রকৃত সমঝদার বলিবেন, শুধু 'মন্দ কি?' নয়, —ঐটুকুতেই কবিতাটির সম্পূর্ণ সার্থকতা।

আসল কথা এই যে জীবনে যতই আমরা অগ্রসর হই ও বয়সে বাড়িয়া চলি, মনও থাকে অগ্রসর হইতে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে। বাল্যকালে চাই ছবি দেখিতে, ছড়া শুনিতে, গল্প ও কাহিনীতে মনযোগ দিতে; পরে আসে বিচার-বিতর্ক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব আহরণ; পরে দার্শনিক মন, তত্ত্ব অনুধাবন ও ভূয়োদর্শন; পরে অধ্যাত্ম চিন্তা। মনোবৃদ্ধির এই নানা ধাপে নানা রকমের বিষয়বস্তু আসিয়া জোটে, কিন্তু প্রথম ধাঁটি হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সে কোথায়ও মনের সরস সজীবতা পায় না। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথায় তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এইযে মানুষের জীবন একটি চিরন্তন বাল্যকাল আঁকড়াইয়া আছে, জীবনের যেখানে আরম্ভ হল, ঠিক সেইখানে রসদ জোগায় বলিয়াই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-তত্ত্বচিন্তা হইতে কবিতা শ্রেয়-তর হউক বা না হউক সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রেয়তর। কবিতার বিশেষত্ব এই যে তাহা আবাল-বৃদ্ধের জীবনের সারা গতিপথে ছবি দেখাইয়া, গল্প শুনাইয়া, কাহিনী বর্ণনা করিয়া, ছন্দের দোলায় মনকে দোলাইয়া, বাল্যকালকে অক্ষয় করিয়া রাখে। 'সোনার তরী' যে ছবিখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরে, কবির তাহাতেই,—তত্ত্ব যদি কিছু থাকে তাহা ছবিখানির বর্ণনী মাত্র।

কথা ও কাহিনীতে সকল দেশে কবিতার আরম্ভ হইয়াছে—বালকের তাহাতে আসক্তি। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে যে মানুষের বয়োবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই চলে, তাহাকে যাঁহারা পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া, গজাইয়া ওঠেন, নিরেট পণ্ডিত, একান্ত দার্শনিক, সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া, তাঁহারা হয়ত শ্রদ্ধার পাত্র হন, কিন্তু সঙ্গ দিয়া কাহারও জীবন সরস করিতে পারেন না। সে সরসতা দিবার ক্ষমতা একমাত্র কবির যিনি কথা ও কাহিনীতে, ছবি ও গানে, আমাদের অন্তর্মুখ বালকটিকে জীয়াইয়া রাখেন।

"ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা"

বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের সমস্ত কবিতাগুলি বারবার পড়িয়াও, যে কবিতাটি আমার অন্য সকলগুলির চাইতে ভাল লাগে, তাহা রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতাটি।

"তোরা কি জানিস্ কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ ?"

—এই আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেখানে "স্নেহময় নিল তারে কোলে তুলে", গঙ্গানদীর হিমালয় হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত দীর্ঘ প্রবাহ জীবন্ত হইয়া আমার মনকে বাল্যকালে নানাদেশের নানা অঞ্চলের ছবি দেখাইতে দেখাইতে ভাসাইয়া লইয়া চলিত। ঐ কবিতাটির সমস্তটা তখন আমার মুখস্থ ছিল। বাল্য হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ় বয়সে, প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্দ্ধক্যে পৌঁছিয়া একদিন হাতে অন্য কাজকর্ম না থাকায় ঐ বাল্যকালের অতি-প্রিয় কবিতাটি আবার পড়িতে বসিলাম। কৈ, আমার মনের উপর কবিতাটির প্রভাব ত একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তেমনি আমার মন চলিল নানা ছবি দেখিতে দেখিতে দূর সাগরের দিকে ভাসিয়া। এই ভাবিয়া সুখী হইলাম যে বাল্যকাল আমি হারাইয়া যাই নাই।

কবিতা যে দর্শন নয়, তত্ত্ব কথা নয়, সে কথা ভুলিয়া যে পণ্ডিত সমালোচকেরা রবীন্দ্র নাথকে 'দার্শনিক কবি' কি 'মিষ্টিক কবি' বলিয়া সমালোচনায় পরিবেশন করেন, আমি সে সব 'কাঁঠালের আমসত্ত্বে' কোনও স্বাদ পাই না। কবিকে দার্শনিক প্রভৃতি অন্যান্য পর্য্যায়ের লোক হইতে পৃথক বলিয়াই জানি। আমার বাল্যকে তিনি চিরন্তন করিয়া রাখিবেন জীবনে, যখন আমার বহিরিন্দ্রিয়গুলি ছিল অনুভূতিতে সতেজ, যখন শুধু দেখা, শুধু শোনা, শুধু আঘ্রাণ-দর্শনে ছিল আমার পরম সুখ। এই সুখ দিয়াই কবিতা হয় সার্থক। তাই ইংরাজী কবিতায় কীট্‌স স্থান পাইয়াছেন—তাই পরম গম্ভীরবেদী কবি মিল্‌টনকেও বলিতে হইয়াছে—ঈষৎ কবিতা হওয়া উচিত সরল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখদায়ী (simple and sensuous)।

রবীন্দ্র-সমালোচনা আমি পড়িতে চাই না, কারণ তাহা আমার মুগ্ধ মনে ঘুমন্তের গায় মশক দংশনের মত লাগে। তত্ত্ব-কথাটি যেখানে গূঢ় আছে, সেখানেই গূঢ় হইয়া থাকুক, ছন্দে ও ছবিতে তাহার যে প্রকাশ হইয়াছে আমি সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট। হয়ত অনেক তত্ত্ব-কথা, অনেক নৈতিক ও দার্শনিক সমস্যা, অনেক আধ্যাত্মিক ভাব, রবীন্দ্রনাথ কবিতায় রূপ দিয়াছেন, কিন্তু রূপটিই কবিতা,—অন্য সব তাহার বাহন মাত্র। সেই জন্য আমি কবিগুরুকে দেখিতে চাই হোমার-সেক্‌স-পিয়ার-কালিদাসের সম-পর্য্যায়ে, যাঁহারা রূপের নেশা লাগান চক্ষে, ছন্দের কল-রোল তোলেন কানে, যাঁহারা বস্তুর স্পর্শ দিয়া যান ও মনের মাধ্যমে আমার সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি অনুভূতিতে সজাগ

সতেজ করিয়া তোলেন; সংক্ষেপতঃ যাঁহাদের সঙ্গ আমাকে জানাইয়া দেয় যে আমি এখনও বালকই রহিয়াছি, আমার পঞ্চেন্দ্রিয় এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই. আমার বর্ণ-গন্ধ-ঘ্রাণ-শ্রবণ-আস্বাদনের ক্ষমতা এখনও নির্জীব হইয়া পড়ে নাই। তত্ত্ব ও দর্শন থাকুক আপন আপন কোঠায়,—থাকুক যৌবনের সন্ধান, প্রৌঢ়ের সঙ্গী, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন হইয়া। আমি কবির সঙ্গে আমার বাল্যে আবার স্থায়ী হইতে চাই।

ভাবে ভঙ্গীতে কথায় কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নানা রকমে জানাইয়া দেয় মানুষের অন্তর্নিহিত এই বাল-ধর্ম্ম। দুর্দ্দমভাবে প্রচার করে: "ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা —আধ-মরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।"

অসীম যাঁহার কবি প্রতিভা, অফুরন্ত যাঁহার কবিতা, তাঁহার কাব্যের সমালোচনা নানা দৃষ্টি ভঙ্গীতে নানা দিক্ দিয়াই হইতে পারে। কিন্তু রবির আলো আমি পাইতে চাই সিধাসিধি আমার সমস্ত দেহ-মনে, সমালোচনার কুহেলি-জালের আড়াল দিয়া নয়। সে রবি রশ্মিতে যাহা জাগে তাহা দর্শন-বিজ্ঞান-তত্ত্বকথা নয়, তাহা আমার ও প্রত্যেকের নিজস্ব বালধর্ম্ম, যাহাতে প্রকৃতির এই পরিচিত রূপ অপরূপ হইয়া ওঠে, বস্তুর জগত হয় একমাত্র সত্য, মন চলে ঘটনার রাজ্য ছাড়াইয়া নানা অঘটনের অজানা দেশে।

ইহাকে 'রোমান্‌টিসিজম' (romanticism) বলিতে চান বলিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার নানা সুরের মধ্যে এই সুরের ঝঙ্কারই বাজিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,—মনকে টানিয়া নেয় বাল্যের অতি-লোভনীয় অতি-আকাংক্ষিত, অতি-ঈপ্সিত, অজ্ঞাত অবাস্তবের মায়িক জগতে।*

* এই লেখাটি ঐমৈত্র-লাভা বৈশাখের জয়শ্রীর জন্য লিখিত। সেইজন্য হয়তো ইহার ধরণ সে সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গত হয়নি। ঃ সঃ

প্রবন্ধ

মানসিক রোগ ও তাহার চিকিৎসা

অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ

একদিন ছিল যখন মানুষ মানসিক ব্যাধিকে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখত। তখন মানুষ বিশ্বাস করত কোন অশুভ অ-প্রাকৃত শক্তির প্রভাবেই এ রকম রোগ হয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আজ জেনেছে—দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধির মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। দেহের ব্যাধির কারণগুলি জানা গেলে যেমন তার চিকিৎসা সহজ হয়; তেমনি মনের ব্যাধির চিকিৎসার সাফল্যও নির্ভর করে তার কারণগুলি আবিষ্কার করতে পারলে। মনস্তত্ত্বে ও মনোবিশ্লেষণে অভিজ্ঞ ডাক্তাররা ক্রমশই মনের অস্বাস্থ্যের কারণগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলেছেন। তাই এই ব্যাধিগুলি সম্বন্ধে তাদের আগের সেই ভীতি দূর হয়ে গেছে। তাঁরা আজ মনে করেন যে অধিকাংশ মানসিক রোগ চিকিৎসা-যোগ্য। বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেছে—মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যারা হাসপাতালে যান তাদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন হয় নিরাময় হয়ে ফিরে আসেন অথবা তাঁদের রোগের উল্লেখযোগ্য উপশম ঘটে। তবে এ চিকিৎসা প্রায়ই ধৈর্য্য ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ডাক্তারেরা আজকাল আশা করেন যে উপযুক্ত চিকিৎসায় মানসিক রোগে আরোগ্যের আশা অন্য দৈহিক রোগের তুলনায় অধিক হওয়া সম্ভব।

মানসিক ব্যাধিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—সাইকোনিউরোসিস্ (psycho-neurosis) ও সাইকোসিস্ (psychosis)। সাইকো-নিউরোটিক্‌সদের আবেগ ও অনুভূতির জীবন সুসংবদ্ধ নয়। তাদের বিভিন্ন আবেগের মধ্যে মিল হয়নি তাই তারা অশান্ত ও অসুখী। তবে তাদের আন্তরিক সংঘাত তাদের ব্যক্তিত্বকে এতটা বিপর্যস্ত করেনি যে তাদের হাসপাতালে বা উন্মাদাগারে আবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন।

সাইকোটিকদের মানসিক বিপর্যয় গুরুতর রকমের। তাদের অবচেতন মনের বিষম সংঘাতের ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রের একতা বিপর্যস্ত। তার ফলে সাধারণ সমাজ-জীবনে তারা নিজেদের খাপিয়ে চলতে পারে না। একাধিক ব্যক্তি যেন বিভিন্ন সময়ে একই দেহ আশ্রয় ক'রে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করতে থাকে। এদের হাসপাতালে বা উন্মাদাগারে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন।

এই গুরুতর মানসিক রোগীদের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক্। নানাধরণের সাইকোসিস্ আছে।

(১) সিজোফ্রেনিয়া schizophrenia—এ জাতীয় রোগীরা নিজেদের কল্পনাদ্বারা সৃষ্ট অদ্ভুত এক অবাস্তব জগতে বাস করে। বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ যুক্তিসঙ্গত চিন্তায় এরা অসমর্থ। কাজেই সমাজ-জীবন যাপন এদের পক্ষে অসম্ভব।

(২) ইন্‌ভল্যুশন্যাল্ মেলানকোলিয়া (involutional melancholia)—এ রোগীদের মনের মধ্যে অতিরিক্ত ক্লান্তি, বিষণ্ণতা ও নিজ জীবনের মূল্যহীনতা সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ভাব থাকে। এদের রোগীদের কোন উচ্চাকাঙ্খা থাকে না। মানুষের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছা, নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা, সমস্ত বিষয়ে নিরুৎসাহতা বা নিরাসক্তি এ বিকারের লক্ষণ।

(৩) ম্যানিক্ ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্ (manic depressive psychosis)—এই মানসিক বিকারে রোগী কখনও ভয়ানক উত্তেজিত (manic) আবার কখনও বা নিতান্ত অবসন্ন (depressive)। উত্তেজিত অবস্থায় রোগী খুব চীৎকার করে গালাগালি করে। অনবরত নাচে বা হাত পা নাড়ে। অস্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশ করে—যেই যেই করে নাচে উচ্চৈঃস্বরে গান গায় ইত্যাদি। অবসন্ন অবস্থায় রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অনুতপ্ত হয়। কিছু খেতে চায় না, কাজ করতে চায় না—কখনো বা আত্মহত্যা করতে চায়। কখনো কখনো এদের জোর করে টিউবদিয়ে খাইয়ে দিতে হয়। এ অবস্থায় এদের চোখে চোখে রাখা দরকার।

(৪) প্যারানোয়িয়া (paranoid schizophoenia)—এসব রোগীরা নিজেদের সৃষ্ট ভ্রান্তির জগতে বাস করে। কেউ ভাবছে সে লক্ষ টাকার মালিক (delusions of grandeur) কেউ ভাবছে তাকে সবাই বিষ দিতে চেষ্টা করছে, (dilusions of persecution)। কেউ ভাবছে সবাই তার কথাই বলাবলি করছে (delusions of reference)। কেউ ভাবছে তার দেহে কোন রক্ত নেই বা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি রবার দিয়ে তৈরী। ভ্রান্তির বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে হয়তো তারা স্বাভাবিক মানুষের মতই ব্যবহার করে।

চিকিৎসা : সাধারণতঃ চারটি প্রধান উপায়ে এ রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। (১) ঔষধ প্রয়োগ (২) ইলেক্‌ট্রিক্ সক্ (Shock) প্রয়োগ (৩). অস্ত্র-চিকিৎসা ও মনোবিকলন পদ্ধতির ব্যবহার (Psycho-therapy)

(১) ইনস্যুলিন্ মেট্রোজোল্ ইত্যাদি ঔষধ মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইন্‌স্যুলিন একটি জীবদেহনিঃসৃত গ্রন্থির করণ। অল্প পরিমাণেও রক্তস্রোতের উপর এর যথেষ্ট প্রভাব আছে। ইন্‌স্যুলিন রক্তে শর্করা সঞ্চয় নিবারণ করে। তাই বহু মূত্র রোগে এর ব্যবহার সুপরিচিত। মস্তিষ্কে ও দেহাভ্যন্তরস্থ আবেগের কেন্দ্রগুলি ইন্‌স্যুলিন্ ব্যবহারে প্রবলভাবে থাকা যায় এবং বাল্যকালের কোন তীব্র রুদ্ধ আবেগের মুক্তির পথ সহজ করে রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে। মেট্রোজোল একটি কৃত্রিম রাসায়নিক ভেষজ। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ইনস্যুলিনেরই মত। বর্ত্তমানে একটি ভারতীয়ওষধের (Rawoolphia Serpentina) শিকড় হতে প্রস্তুত ঔষধ প্রয়োগ করেও অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে এ ঔষধ কঠিন জ্বর রোগে বা সর্পাঘাত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হোত। কিছুদিন যাবৎ রক্তের উচ্চচাপ রোগে এবং মানসিক রোগ চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর যতগুণ রয়েছে এ ঔষধ মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রের উপর সোজাসুজি কাজ করে। রুদ্ধ আবেগের কেন্দ্রগুলিকে শান্ত করে, দুশ্চিন্তা কমিয়ে দেয়। এ ঔষধে রোগীকে শান্ত করে এবং অন্যদিকে তার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে অন্য চিকিৎসা সম্বন্ধে আনুকূল্য করে। এ ঔষধ নিয়ে এখন অনেক গবেষণা হচ্ছে।

(২) কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অসুস্থ কেন্দ্রগুলিকে বৈদ্যুত-শক্তিদ্বারা সোজাসুজি সক্রিয় করে তোলা হয়। এখানেও চেষ্টা হল বৈদ্যুতশক্তির ধাক্কা দিয়ে রুদ্ধ

আবেগ বা অনুভূতির পথ মুক্ত করে দেওয়া। তাই এই চিকিৎসার নাম electric shock therapy। মানসিক রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এ চিকিৎসায় অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

(৩) মানসিক রোগ চিকিৎসায় অস্ত্রচিকিৎসার স্থান সংকীর্ণ। যে স্নায়ুশিরা তন্তুগুলির দ্বারা মস্তিষ্কে আবেগ ও অনুভূতির কেন্দ্রের যোগ তা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে চিকিৎসক রোগীর চেতন অনুভূতির উপর অবচেতন মনের চাপ কমিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করেন। এ চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন এবং অতি গুরুতর মানসিক রোগের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র চিকিৎসা করা হয়।

(৪) পূর্বের চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি সবই বাহ্য। কিন্তু ফ্রয়েডের পর থেকে, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে অবচেতন মনের চিকিৎসা ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করেছে। অবচেতনবাদীদের মতে সমস্ত মানসিক রোগের মূলে আছে, অবচেতন ও চেতন মনের সংঘাত। শিশুকালে কোন গুরুতর আবেগ সহজপ্রকাশের পথ না পেলে, তা অবচেতন মনের গভীরে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং চেতনার স্রোত থেকে সে অন্ধ আদিম জৈবশক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব একটি জটিল জগৎ সৃষ্টি করে (dissociation)। আবেগের সহজ প্রকাশ রুদ্ধ হয় কেন? তার কারণ, এই আদিম আবেগশক্তির প্রকাশ সমাজজীবনের কৃত্রিম বিধিনিষেধের বিরোধী। শিশুর মনের সহজ আবেগ ও অনুভূতি বয়স্কদের সামাজিক নিয়মকানুন ভদ্রতার কাছে বাধা পায়। সংসারের জটিল পরিবেশে শিশু অকুণ্ঠ চিত্তে লোভ করতে পারে না, রাগে ফেটে পড়তে পারে না, ইচ্ছামত কেড়ে-নিতে পারে না—প্রাণখুলে ভালবাসতে বা ঘৃণা করতেও পারে না। বড়দের জগৎ শুধুই তার অসংযত সহজ অনুভূতিগুলির দিকে শাসনের তর্জনীতুলে বলে 'না, না, না''। শিশুকে বড়দের জগতে, বড়দের নিয়ম মেনে চলতে হয়। না হলে তাকে শাস্তি পেতে হয় দুঃখ পেতে হয়। তাই তাকে শিখতে হয় তার প্রবল অনুভূতিগুলিকে গোপন করতে, শাসন করতে—সমাজের রোষ-রাজধানীর থেকে দূরে রাখতে। এরা অ-ভদ্র কিন্তু এরা প্রবল। এ কালো দৈত্যদের তাই শৃংখলাবদ্ধ করে বন্দী করে রাখতে হয় অবচেতন মনের গভীর অন্ধকারে। এমনি করেই সুরু হয় চেতন ও অবচেতন মনের মধ্যে সংঘাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দুয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায় তাই গুরুতর ক্ষতি হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বনিবনাও হয় না। তার ফলেই ঘটে মানসিক চাঞ্চল্য, অশান্তি এবং গুরুতর ক্ষেত্রে মানসিক বিকার। অবচেতনবাদীরা বলেন, এই অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগগুলিকে সহজ প্রকাশের পথ করে দিতে পারলে তবেই রক্ষা। এরই একটি পদ্ধতি হচ্ছে মনোবিকলনের মুক্ত-অনুষঙ্গ প্রণালী। চিকিৎসক রোগীর বিশ্বাস উৎপাদন করে সহজ পরিবেশে তার সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। রোগীকে বলা হয় তার মনে যে কথা, যে চিন্তা আসে, তাই যেন সে বলে যায়। তাতে দেখা যায় কোন কোন জায়গায় সে থেমে যাচ্ছে—সংকোচ বা দ্বিধা বোধ করছে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বুঝতে পারেন সেখানেই হয়তো অবচেতন মনের কোন বাধা সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ক্রমে ক্রমে সে সহজ হয়ে আসে চিন্তার এ মুক্ত-অনুষঙ্গের (free association)। টানে তার অতীত বাল্যজীবনের এমন অনেক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা সে বলে যায় যার স্মৃতি তার চেতন মনে ছিল না। এমনি করে তার অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ মুক্তি পায় এবং রোগী নিজেই বুঝতে পারে তার রোগের মূল কোথায়। তখন তার চেতন ও অবচেতন মনে একটা বোঝাপড়া ও মিলমিশ হয়ে যায়—তখন তার মন শান্ত

হয় তার মানসিক রোগ দূর হয়। বাস্তবিক পক্ষে রোগীই এখানে নিজের চিকিৎসক। সে যখন সচেতন ভাবে বুঝতে পারে তার জীবনে সংঘাতের মূল কোথায় এবং তার স্বরূপ কি, তখনই তার অবচেতন মনের গ্রন্থিমোচন হয় তখনই সে নিজ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে, নিজ জীবন-তরণীর কর্ণধার হতে পারে। এ চিকিৎসা সহজ নয় এবং অভিজ্ঞ মানসিক রোগ বিশারদ ভিন্ন এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব নয়। তবে আশার কথা ও আনন্দের কথা এই যে এ সব পদ্ধতির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে খুব ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

বিবর্তন

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

শাপভ্রষ্ট দেবশিশু, আনাগোনা শ্বাপদ-সমাজে
ইদানীং সারসভ্য ; সভ্যতার শিখর-চূড়ায়—
আবরণে গাত্র ঢাকা, চোখে হিংস্র ক্ষুধার আগুন
কী করুণ এই রাত্রি, কত দূরে এখন সকাল ?

কসাইখানায় ভিড়, ষড়যন্ত্রে ধূমল আকাশ
জেব্রাক্রিয় দীপ হাতে মদমত্ত উন্মার্গ শকুন
জ্বালায় নগর দেশ, বিবদীর্ণ রাত্রির বাতাস ;
সভ্যতার মধ্যমনি অন্ধকারে কি-শিকার খোঁজে ?

অরণ্যে শিকার নয়, অদ্ভুত অরণ্য তার মনে
সৌজন্যের ছদ্মবেশে বুকে ঢাকা শত নখ থাবা
কূটবিদ্যা চমৎকার অতর্কিত পিঠে ছুরি মেরে
তখনি মধুর হেসে, হাতে হাত দেবে সে মিলিয়ে।
ক্ষুরধার বুদ্ধি তার কোটি মৃত্যু এখন হুংকারে
প্রগতির পরাকাষ্ঠা-সভ্যতার নাভিশ্বাস ওঠে।

গল্প

এ্যাসমিতের ডিনার

দীপ্তি সান্যাল

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে "ভারতীয় মহিলা সমিতি" একটি ছোট্ট গল্প প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করে প্রথম পুরস্কার একশত টাকা ঘোষণা করেন। শ্রীমতি শর্মা লিখিত "বন্দুকা চা" গল্পটি সমিতির এই গল্পটি মূল ভাষে প্রথম পুরস্কার পায়। এ সংখ্যায় অন্য গল্পটিও একটি ছোট্ট।" ঃ সঃ

পঙ্কজের ডায়েরী না কোথায় যেন পড়েছিলাম হাসির তার বেশী মোচড়ালে কান্নার টঙ্কারে পরিণত হয়। বাস্তবিক হাসি কান্নার মধ্যে পার্থক্য শুধু স্তরের। একই পরমক্ষণে তৈরী চা খেয়ে আমরা হাসি আবার তাই পুড়িয়ে ছাতা ধরাতে পারে। অতএব কার্য্যকারণই প্রধান। গত কয়েক বছর ধরে দেখছি বিদেশ ভ্রমণের নানা গুণাগুণে সবাই মুখর। অবশ্য সেই সঙ্গে আপনার গুণ কীর্তনও চলে বলে দুদিক থেকেই ব্যাপারটা মধুময় হয়ে ওঠে। 'জাপান মুলুকে' বা 'চল, চল চীন চল' এ জাতীয় রচনার প্রধান প্রতিপাদ্য 'দেখ দেখ আমি কি মহৎ' দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য "উক্ত দেশগুলি মহান দেশ।" এগুলির নাম অনায়াসে হওয়া উচিত ছিল 'আমি ও চীন' বা 'আমি ও জাপান'। মোটের উপর এগুলি পাঠে যে কোন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির হাসি ও কান্না পরপর এসে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তটির সত্যতা প্রমাণ করে—যে হাসির তারই বেশী মুচড়িয়ে কান্নার সৃষ্টি হয়। হাসির কারণ লেখকের অজ্ঞতা কিন্তু তাই যখন বক্তব্যের অসত্যতায় পৌঁছোয় তখন তা কান্নার কারণ হয়ে ওঠে। এজন্য পাশ্চাত্য ভ্রমণের পরেও ভ্রমণ কাহিনী লিখতে মন সরেনি। বিদেশ ভ্রমণের ভাল দিক নিশ্চয় আছে কিন্তু আছে তার উল্টো দিকও। অর্থাৎ সংস্কৃতির আদান প্রদান সহজ নয়। অপর সংস্কৃতির অনেক বস্তু আমাদের ভাল লাগে না—অনেক বস্তু আমাদের পীড়া দায়ক লাগে—লাগে বিরক্তিকর, কিছু কিছু রীতিমতো রীতিহীন, আবার কোনটা কোনটার সামনে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় বোধ করি। মোটের উপর একটি সংস্কৃতিকে তিন সপ্তাহে বা তিন মাসে বা তিন বছরে বোঝা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবনেও আমরা বুঝি নে।

যাইহোক একটা উদাহরণ দিই। ১৯৫০ সালে এমনি এক নেমন্তন্নে হাজির হয়েছি পেনসিলভিনিয়া কলেজে। সেখানে আরো পঁচিশ জন জাপানী ছাত্রছাত্রী এসেছিলেন —ছিলেন ইতালীর ভিন্সুচি, ফ্রান্সের এ্যারিয়ন, পোলাণ্ডের সিজনার ইত্যাদি ইত্যাদি সারাদিন ক্লাস হয়, বিকেলে এর ওর তার বাড়ী নেমন্তন্ন। এমনি করে কাটল প্রায় তিন সপ্তাহ। প্রায় ফেরবার পালা এসে গেছে। অধ্যাপকরা ইচ্ছেমতো প্রিয় (১) ছাত্র ছাত্রীদের ডাকছেন, কখনো চা, কখনো লাঞ্চ, কখনো ডিনার খেতে। জাপানী ছাত্রী ষোড়শী চৈতুসার নেমন্তন্ন সবচেয়ে বেশী—পোল্যাণ্ডের মোটা এলসার নেমন্তন্ন সবচেয়ে কম। আমার আর বাসুদেবের নেমন্তন্ন হয়ই না। শেষ পর্যন্ত রীতিমতো কমপ্লেক্স তৈরী হয়ে গেল আমাদের মনে, বাসুদেব আর আমি ভারতীয় বলেই সম্ভবতঃ খাতির যত্ন পাচ্ছি না।

আমাদের যাবার দিন টিক হবার দু দিন আগে প্রফেসর এ্যাসমীড হঠাৎ লাইব্রেরী যাবার মুখে ডেকে বললেন,—

"তোমরা কি আজ আমার সঙ্গে ডিনার খেতে পার?"

বলাবাহুল্য আমাদের অবস্থা তখন "হুজুর আমার

নাচেরে আমিকে মহুরের মত নাচেরে"। তখনি বললাম "ধন্যবাদ, তা হেতে পারি।"

বলেই বুঝলাম এ্যাসমীত কথাটা ভেবে চিন্তে বলেন নি। স্যালভেশন আর্মি স্টাইল এবং ওয়াই, এম, সিঙ হাওসেকের মত নেমন্তন্নটা করেছেন অনর্থক। আশা ছিল আমরা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব। কারণ ঘরে-বাইরে এত আকর্ষণ—সিনেমা ও সুন্দরী নারীর সঙ্গ ছেড়ে অধ্যাপকের বাড়ী যাবার মতি হবে না কোন মতেই। কিন্তু নেমন্তন্ন গ্রহণ করে যে ওঁকে বিপাকে ফেলেছি তা তখনি প্রতীয়মান হোল যখনি তিনি বারম্বার বলতে লাগলেন—"এখনি 'হ্যাঁ' বোল না—ভেবে চিন্তে বল, কোন লজ্জা নেই" ইত্যাদি।

আমরা যতই বলি—"আমাদের দিক থেকে কোন অসুবিধে নেই।" ততই তিনি মাথা নাড়েন। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হোল দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার সময় পাকা কথা হবে। বাসুদেবকে বললুম,—"লাঞ্চের সময় আমি কিন্তু নেমন্তন্ন প্রত্যাখ্যান করব।" "কেন?" বাসুদেবের বিস্ময়।

নেমন্তন্ন না পাওয়ায় বেচারী মরমে মরে ছিল। বিশেষ করে পাকিস্তানী বন্ধু মহম্মদ মির্জার কাছে ও যেন মুখ দেখাতে পারছিল না। সেই সাধের নেমন্তন্ন প্রত্যাখ্যান করবে এতখানি বৈরাগ্য তার ছিল না। বাসুদেবের একান্ত আগ্রহে লাঞ্চের সময়ও যখন আমরা "হ্যাঁ" বললুম তখন অধ্যাপক এ্যাসমীতকে দেখে আমার কল্পনা হোল; তিনি প্রথমটা মুষড়ে পড়লেন। তারপর সুদৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"তাহলে ঠিক সাড়ে ছটায় আমার বাড়ী আসবে। এক মিনিটও দেরী করবে না। ঐ পথের শেষেই আমার বাড়ী।" প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে অনর্গল "দেরী করবে না" কথাটি বলবার পর দ্রুত প্রস্থান করলেন। বেচারীর সাধের লঞ্চটি টেবিলেই পড়ে থাকল। বাসুদেবের দিকে কটমট করে তাকালাম। কিন্তু ও পরমপুরুষ গোছে দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝলুম ডিনারে ও যাবেই কসম খেয়েও।

সাড়ে ছটা বাজার আগেই তাড়াহুড়া করে হাজির হলাম এ্যাসমীতের বাড়ী। কিন্তু বেল টিপতে সাহস হোল না। আগে কেন এসেছ বলে যদি দরজা বন্ধ করে দেয়? অগত্যা বাসুদেব ও আমি পায়চারি করতে লাগলুম পপলারের তলে তলে। ঘিরে শান্তিরে নিবে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটায় বেল টিপলাম।

সাড়া শব্দ নেই।

আবার টিপলাম।

নিঃশব্দ।

ইশারায় বাসুদেবকে বললুম "চল ফিরে যাই।"

হঠাৎ দরজা খুলল—"Come in"।

তাকিয়ে দেখি এ্যাসমীত সাহেব।

"Good evening" বলে ঢুকলাম। ওভারকোট প্রভৃতি যথাস্থানে রেখে বসবার ঘরে প্রবেশ করা গেল। এ্যাসমীত সাহেব বার করে আনলেন মদ ও পাত্র। বাসুদেব গান্ধীবাদী—আমিও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অতএব সবিনয়ে এ্যাপিটাইজার প্রত্যাখ্যান করলুম। এ্যাসমীত একটু বিস্মিত তথা অপ্রসন্ন হলেন—"What? not even Sherry?" "No, Thanks"

এ্যাসমীত একাই পান করলেন। বোঝা গেল মুরুতেই তাল কেটেছে আর জমবে না।

সাহেব সেরী শেষ করে লাল টকটকে মুখে আনালেন তাঁর ঠাকুর্দা জাপানে গিয়েছিলেন। অপূর্ব্ব সেই দেশ। দেরাজ খুলে কয়েকটি অতি ছোট্ট ধরণের জাপানী পুতুল বার করলেন। সুন্দর চিত্র।

বাসুদেব ও আমি উভয়েই বললাম—"How interesting।" একটু পরে সাহেব জাপানের কীর্ত্তন ছেড়ে উঠে গেলেন কি যেন করতে। প্রবেশ করলেন একটি সুন্দরী,

তরুণী। বাসুদেব হর্ষবান হলো। আমেরিকান কায়দায় নিজেকেই পরিচিত করার ভার নিজের। তিনি বললেন তাঁর নাম সুলান হোবার এ্যাসমীডের তালিকা তিনি—এবার গ্রাজুয়েট হয়েছেন। বাসুদেব শুধাল,—

"এবার কি করবেন? ডক্টরেট?"

"Oh dear no" নাসিকা কুঞ্চিত করলেন সুন্দরী।

"তবে কি চাকরী?"

"Certainly not. I am going to marry." গর্বিত কণ্ঠ ধ্বনিত হোল মিস হোবারের।

"Oh really?" বাসুদেবের কণ্ঠ নিরুত্তেজ। বোধহয় মনে মনে এই ভাবছিল তবে আর ভারতীয় ও মার্কিন তরুণীর তফাৎ কি। হালাপে বিঘ্ন ঘটিয়ে প্রবেশ করলেন প্রফেসর ও তস্য জায়া। সহযাত্রেই বুঝলুম মহিলা পূর্ণ-গর্ভা। আর তখুনি হৃদয়ঙ্গম হোল এ্যাসমীডের ইতস্তত করবার কারণ। কিন্তু আর তো উপায় নেই। মিসেস এ্যাসমীডকে বসতে সাহায্য করা গেল। ভারতবর্ষের কথা উঠতেই ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন "ইকুয়েটর তাঁর কোনখান দিয়ে গেছে?"

হতভম্ব হলুম।

পরে বুঝেছি ভারতবর্ষ তাঁর মতে ভদ্রব্যক্তির আবাসস্থল নয়। তাঁর দু একটি প্রশ্ন থেকেই তা বোধগম্য হবে। যথা,—

ভারতবর্ষে সাপ কতবড়?

Naked ফকিররা কি করে?

মহারাজারা কোথায় থাকেন?

সেখানে নাকি অবশ্য কি ও চাকর পাওয়া যায়? অবশ্য তিনি কখনই তাঁর বাচ্চাদের ভারতীয় কি চাকরের হাতে রেখে না, মরে গেলেও না যদি তিনি কখনো তথায় যান। ইত্যাদি।

আলোচনার পূর্বে আগে কথা যা বলায় বলেছি। মধ্যখেকে অন্ত পর্যন্ত চুপ করে থাকাই বিধেয় মনে করলাম। বাসুদেব শুধু অদম্য উৎসাহে সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভারতবর্ষের রূপ বর্ণনা করতে লাগল।

তারপর ডিনার পর্ব। বাসুদেব কানে কানে বলল যদ দিয়ে যে ডিনারের সুরু তার অন্তে রাজকীয় উপকরণ নিশ্চয় আছে। বিশেষতঃ গৃহিনী যেমন উল্লাসিক। খেতে বসে প্রথমেই পেলুম ঠাণ্ডা মুসুরির ডালের সুপ। তারপর একটা মস্ত বড় কুমড়োর চপ। আমরা পাচজন খেতে বসেছি—চপ ছিল ছয়টি। শেষ চপটা এ্যাসমীড বাসুদেব ও আমাকে একবার করে offer করলেন। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলুম। রাজকীয় ডিনারে কুমড়োর চপ দিয়ে পেট ভরাতে আমরা মোটেই চাইলুম না। কিন্তু তারপরে এল রাইস পুডিং, অনেকটা আমাদের খুব চেনা জানা।

খাওয়া শেষ।

তামাম শোধ।

বাসুদেবের চোখ তখনও জলে ভরে উঠেছে।

বেচারী খাদ্যরসিক, যদিও পেটুক নয়। কিন্তু এমন সাত্ত্বিক নিরামিষ ব্রাহ্মণ বিধবার আহার যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে এসে জুটবে তা বোধহয় কল্পনাতেও ভাবে নি। মাছ নয়, মাংস নয়, আলু নয়, এমন কি ডিনার অন্তে একটু গরম কফি পর্যন্ত নয়।

বাসুদেবের অদম্য উৎসাহ পর্যন্ত দমিত। কানে কানে বলল "চল, ক্যাফেটারিয়ায় যাওয়া যাক।" আমি শুধু বললুম,—"আজ রবিবার।"

অর্থাৎ পাচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সব দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে।

ডিনারের পর এ্যাসমীডের নববৌবন যেন উথলে উঠলো। একটার পর একটা রেকর্ড গ্রামোফোনে বাজাতে লাগলেন। বিভিন্ন জাত মিউজিক। আর মিসেস এ্যাসমীড একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে ঘরটা অন্ধকার করে

দিলেন। হুঁসান পর্যন্ত নেই। ডিনারের পরেই সে একসকিউজ মেখিয়ে চলে গেছে মিসেস এ্যাসমীডের বাচ্চাকে সামলাতে।

এক সময়ে ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল রাত্রি সাড়ে আটটা। "এবার উঠি।"

"না না বোস আর একটু রেকর্ড শোনো।

অগত্যা বলতেই হোল ভারতবর্ষের আর অফিসিয়াল এ্যামবেসেডার আমরা! শোনা যায় যে কোন কোন আমেরিকান নাকি সমগ্র জীবনে একটি ভারতীয়কেই দেখেন। তাকে দেখেই অনুমান করে নেন ভারতবর্ষকে। অতএব সেই একটি ভারতীয়ই সমগ্র ভারতের প্রতীক সন্তান। তার সম্মান রাখতে হবে তো।

গ্রামোফোন থামল রাত্রি বারটায়।

তারপর মিসেস এ্যাসমীড আমাদের জমাদারের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় চোরের মত বার করলেন। ভেতরের সিঁড়ির সামনেই নাকি ওঁর বাচ্চার ঘর এবং সে নাকি ব্ল্যাকি লোক রীতিমতো hate করে। সাইকোলজিস্টরাও তো বলেন বাচ্চাদের মনে কোন আঘাত দেওয়া উচিত নয়। অতএব "Would you people mind to use the spiral stair"?

এরপর? হ্যাঁ, এরপরও আমরা Thank you for your excellent dinner, Thank you for the charming evening হাজার বার বলে মুখে হাসি ফুটিয়ে বিদায় নিলুম। আমরা যে ভারতবর্ষের আনঅফিসিয়াল এ্যাম্বেসেডার।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা, আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রানী ব্রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটী থাকে তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটী সংশোধন করবো।

আরতি কটন্ মিলস্ লিমিটেড

বাসনগর, হাওড়া।

প্রবন্ধ

সোভিয়েৎ রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শ্রম

সুব্রতেশ ঘোষ

বাধ্যতামূলক শ্রম নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন মহলে রীতিমত বিতর্ক চলছে বহুদিন থেকেই। বিশেষ করে সোভিয়েৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধেই এ বিতর্কের তীব্রতা বেশী। সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের যারা অন্ধ ভক্ত তাদের অনেকেই সরাসরি এ প্রথার অস্তিত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করেন। আর তেমনি যারা সোভিয়েতের নাম শুনলেই জীব-বিশেষের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তাদের কারো কারো মতে মস্কোর মত বড় বড় শহরের এদিক সেদিকে কিছু কিছু এলাকা বাদ দিয়ে সারা দেশটাই নাকি বসন্ত-রোগের গুটির মত অসংখ্য বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবিরে (ওদের ভাষায় দাস-শ্রমিক শিবির) ছেয়ে গেছে। বক্তৃতার আস্ফালন ও চিৎকারের আধিক্য দু'তরফেই বেশ কিছু বেশী। সুতরাং যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ব্যাপারটিকে বিচার করে দেখতে চান, সমস্যাটা তাদের পক্ষেই ঘোরাল। কারণ উভয় পক্ষের অত্যুক্তির জলে থৈ থৈ সরোবরের মধ্যে সত্যের ছুঁচ বিন্দু খুঁজে বের করাটা একান্তই দুঃসাধ্য। তবে সৌভাগ্যক্রমে কয়েক-বছর আগে ইউ, এন, ও U. N. O. এবং আই, এল, ও যুক্তভাবে বিষয়টি সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য যে কমিটি করেছিলেন তাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরে প্রসঙ্গটির নিরপেক্ষ বিচার এখন আর অসম্ভব নয়। ইউ, এন, ও এবং আই, এল, ও'র এ্যাড্‌হক কমিটির রিপোর্টের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সকলে একমত হবেন এমন আশা করা যায় না। যদিও রিপোর্টটিতে আপাগোড়া কমিটি যতদূর সম্ভব তথ্য নির্ভর এবং অ-পক্ষপাত বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। তবুও তাদের রায়ই যে শেষকথা এমন মনে করাটা অনেকের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য নাও হ'তে পারে। কিন্তু সোভিয়েৎ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক শ্রম সম্বন্ধে যে অভিযোগ এসেছিল এবং সোভিয়েৎ রাষ্ট্র সমেত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং অসংখ্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অভিযোগগুলি সম্বন্ধে-যা মতামত প্রকাশ করেছেন, তার সম্পূর্ণ অংশই রিপোর্টের পরিশিষ্ট হিসাবে উদ্ধৃত হওয়ায় প্রসঙ্গটির পক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু বলার থাকতে পারে তা মোটামুটি প্রায় সবই এখন জানা যায়। সুতরাং এই সব তথ্যের ওপর নির্ভর করে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এখন সত্যিই অনেক সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে।

এখানে উল্লেখ থাকা ভাল যে বাধ্যতামূলক শ্রম বলতে আমরা শ্রমিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন কাজে লিপ্ত রাখাকেই বুঝি। বাধ্যতামূলক শ্রম পছন্দমত কাজ করার অধিকার এবং কর্ম স্থল বেছে নেবার অধিকারের পরিপন্থী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা যুগ ছিল যখন বাধ্যতামূলক শ্রমকে একান্তই স্বাভাবিক ভাবা হ'ত। তাকে অ-নৈতিক বলে ভাবার কোন প্রশ্নই তখন ছিল না কিন্তু বহুশত বছরের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে মানবসভ্যতা আজ এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছেছে যখন মানুষের মর্যাদাবোধ অন্ততঃ নীতিগতভাবে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে হলেও বিশ শতাব্দী এটুকু সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে যে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজে তাকে আবদ্ধ রাখা শুধু যে তাকে অসম্মান করাই তাই নয়, তার কর্মশক্তিরও সুষ্ঠু বিকাশের পরিপন্থী। যে-কয়টি জিনিষ-কে আমাদের যুগ বিবেক একান্তভাবে ঘৃণা করে, দাস-প্রথা তার অন্যতম।

দাস প্রথার সঙ্গে ঐতিহাসিক ভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার একটা সম্বন্ধ জড়িয়ে আছে। বাধ্যতামূলক

শ্রমের একটা রূপ হলেও" বাধ্যতামূলক শ্রম আর দাস প্রথা কিন্তু সমার্থবোধক নয়। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত অনেক বেশী প্রবল। প্রচারের দিক দিয়ে সুবিধার জন্য সব-রকমের বাধ্যতামূলক শ্রমকেই অনেক সময়ে দাস-শ্রমিক প্রথার পর্য্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ-দুটোকে এক না করাই ভাল। রাষ্ট্রের অপ্রতিহত কর্তৃত্বের সুযোগে মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান অবশ্যই নিন্দার্হ, কিন্তু এ ধরণের বাধ্যতামূলক-শ্রম দাস-শ্রমিক প্রথা থেকে ভিন্ন। কারণ দাস-শ্রমিক প্রথায় দাস কুকুর, ঘোড়া, গোরু কিম্বা টেবিল চেয়ার ইত্যাদির মত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে যায়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাধ্যতামূলক শ্রম এ ধরণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলে না।

উপরের অর্থে সোভিয়েৎ রাষ্ট্রে দাস-শ্রমিক প্রথা নেই, কিন্তু বাধ্যতামূলক শ্রম আছে। রাষ্ট্রের বন্দীদের দিয়ে সেখানে খাল কাটা, রাস্তা তৈরী, খনির কাজ, জঙ্গল কাটা প্রভৃতি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের বন্দী শিবিরগুলো সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত এবং যে ধরণের কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে এই সব বন্দীদের লাগান হয়ে থাকে, জায়গাগুলির অবস্থানের জন্য সে সব কাজে স্বাধীন শ্রমিকদের যোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন। ১৯৩১এ মস্কো ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস অব সোভিয়েটস উপলক্ষে মলোটভ বলেছিলেন যে হোয়াইট সী এবং বলটিক উপসাগরের মধ্যে খাল খননের কাজে বন্দীদের লাগান হচ্ছে। তাঁর এই বক্তৃতা ১১ই মার্চ, ১৯৩১ এর প্রাভদায় প্রকাশিত হয়েছিল (Report of the Ad Hoc committee on forced labour, p507)। ইউনাইটেড নেশনস-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে পোলাণ্ডের রেপ্রিজেণ্টেটিভ স্বীকার করেছেন যে It was no secret that corrective Labour Camps existed in U. S. S, R." (United Nations, ECOSOC 8th Session. 244th meeting, official records.) এই "কারেকটিভ লেবারক্যাম্প" বা সংশোধনকারী শ্রম-শিবিরগুলি যে প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির তা-ও প্রমাণ করা চলে সোভিয়েৎ সূত্র থেকেই। মস্কো থেকে ১৯১৮ এ প্রকাশিত 'Criminal Law" নামে বইয়ের ৫০১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় যে ১৯৩০ পর্যন্ত সোভিয়েৎ আইনে forced labour বা বাধ্যতামূলক শ্রম কথাটিই প্রচলিত ছিল। corrective labour শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩৩ এর Collective Labour Code এ এবং ১৯৩৪ এর পরে তা সুপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

এখন দেখা যাক সোভিয়েৎ আইন অনুযায়ী এই "সংশোধনকারী শ্রম" বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কী? সোভিয়েৎ বিধিবিধি অনুযায়ী তিন ধরণের "সংশোধনকারী" শ্রম প্রচলিত আছে—স্বাধীনতা হানি না ঘটিয়ে সংশোধনী শ্রমের ব্যবস্থা, "সংশোধনী শ্রম সহ নির্বাসন এবং স্বাধীনতাহানি সহ "সংশোধনী" শ্রম। ১৯৩০ সালে প্রবর্তিত Collective Labour Code of the R. S. F, S. R এর ১০১নং ধারা অনুযায়ী স্বাধীনতাহানি সহ সংশোধনী শ্রম দু'রকমের হতে পারে—এক, সোভিয়েৎ ইউনিয়নের বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত সংশোধনী শ্রম শিবিরে পাঠিয়ে, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ বন্দীশালায় আবদ্ধ রেখে। সাধারণতঃ যারা তিন বছরের বেশী শাস্তি ভোগ করে তাদেরই শ্রম-শিবিরে পাঠান হয়। কারেকটিভ লেবার কোডের ১০১ নং ধারা অনুযায়ী "persons sentenced to exile combined with corrective labour shall perform such labour: (a) on hire in State, Co-operative and public undertakings and institutions on the basis of contracts between such undertakings and institutions and corrective labour institu-

tions, (b) in undertakings specially organised for this purpose by corrective Labour institutions; (c) on mass work organised under contracts between corrective labour institutions and the State and co-operative authorities; (d) in mass labour colonies" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, "সংশোধনী শ্রম-শিবিরের" বন্দীদের দিয়ে শিবিরের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তঅনুযায়ী যে কোন কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ করান যেতে পারে।

বাধ্যতামূলক শ্রম সম্বন্ধে অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ইউনাইটেড্ নেশনসের সোভিয়েট প্রতিনিধি উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁদের পদ্ধতি একটা নতুন বা অন্যায় কিছু নয়, কারণ পৃথিবীর আরও বহু দেশে বন্দীদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। ইউনাইটেড্ নেশনস্ কমিটি এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে অন্যান্য দেশে সাধারণ অপরাধীদের দিয়ে কাজ করান হয় প্রধানতঃ তারা যাতে ভবিষ্যৎ মুক্ত জীবনে ফিরে গিয়ে জেলে-শেখা কোন কাজের সাহায্যে স্বাভাবিক ভাবে অর্থ উপার্জন করতে শেখে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী যারা রাষ্ট্রের বিরোধীতা করার অপরাধে আবদ্ধ হয়েছেন এবং যাদের কিছুতেই চোর ডাকাত প্রভৃতি সাধারণ অপরাধীদের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, তাদের শ্রমসাধ্য কাজ করান বা শেখাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সাধারণ অপরাধীরা অনেকেই স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোন পথ না পেয়ে অপরাধী হয়। জেলের শিক্ষা তাই তাদের স্বভাব সংশোধন করতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ আদর্শগত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের মতের পার্থক্যের জন্যই তাঁরা রাষ্ট্রের চোখে "অপরাধজনক" কাজ করার ঝুঁকি নেন। কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ করিয়ে তাদের কাজ শেখানোর যুক্তিটা একারণেই হাস্যকর ঠেকে। কম্যুনিষ্ট নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী কিম্বা ব্যারিষ্টার সাধন গুপ্তকে কংগ্রেস সরকার যদি রাজনৈতিক কারণে জেলে পুরে তাঁহাদের দিয়ে কম্যুনিটি ডেভলপ্‌মেণ্ট প্রজেক্টে কোন খাল কাটার বা রাস্তা তৈরী করাবার কাজে লাগিয়ে দেন, তবে কী সে কাজ তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে অন্ন সংস্থানের এবং "স্বাভাবিক" জীবন যাপনের পক্ষে সুবিধাজনক হবে বলে সোভিয়েট সমর্থক কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা মানতে রাজী আছেন? অথচ "সংশোধনী" শ্রমের নাম করে সোভিয়েৎ ইউনিয়নে রাজনৈতিক বন্দীদের শুধু যে কঠোর পরিশ্রমের কাজই করান হয় তাই নয়, সবচেয়ে বেশী অসুবিধাজনক শ্রম-শিবিরেও তাদেরই পাঠান হয়। শ্রম-শিবিরের অভ্যন্তরেও তাদের অবস্থা অন্যদের চাইতে খারাপ। ইউনাইটেড্ নেশনস্ কমিটির রিপোর্টের ভাষায়, "Prisoners themselves are divided into various categories, the least privileged of which includes persons who are not members of the working people and persons convicted of counter-revolutionary crimes," বলা বাহুল্য যে সোভিয়েৎ রাশিয়ায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত চক্রের বিরোধী ব্যক্তি মাত্রকেই "counter revolutionary" বলে ছাপ দেওয়া হয়। লেনিনের পলিট ব্যুরোর অধিকাংশ সদস্যকেই—যাঁরা রুশ বিপ্লব সার্থক করে তুলতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন—ষ্ট্যালিন আমলে counter revolutionary বলে অপবাদ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

বন্দীদের দিয়ে বাধ্যতামূলক কাজ করানো ছাড়াও সোভিয়েৎ রাষ্ট্রে আরও কয়েকরকম বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। Labour Code of the R. S. F. S. R. অনুযায়ী, "In exceptional cases (fighting the elements, or in case of

a shortage of Labour for carrying out important State works) all citizens of the R. S. F. S. R. with the exceptions mentioned in articles 12-14 may be called up to work in the form of compulsory 'labour service ("trudovaya povinnost")। গর্ভবতী নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং প্রসবগৃহ প্রভৃতি যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ যাদের অব্যাহতি দেবেন তাদের অবশ্য এ ধরণের বাধ্যতামূলক শ্রমের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ইউনাইটেড্ নেশনের এত্‌দ্‌ক কমিটি অবশ্য এই ধারা অনুযায়ী সত্যিই কী রকম কাজ হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাননি। জাতীয় আর্থিক সংগঠনের জন্য বিশেষ বিশেষ জরুরী সময়ে এ ধরণের সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে বলেও অনেকে মনে করতে পারেন।

Compulsory labour service এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে কর্মক্ষেত্র বেছে নেবার মৌলিক অধিকার সঙ্কোচ করবার যে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা আছে তা' যে একান্তই আপত্তিকর একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত "Principles of the Soviet State and Law" নামে বইয়ে লেখা আছে যে "In the U. S. S. R. it is a crime ---for workers or employees..... to terminate their employment relation upon their own initiative।" ১৯৪০ সালের ২৬শে জুন একটি ডিক্রি দিয়ে শ্রমিক বা কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় এক কাজ ছেড়ে আর এক কাজ গ্রহণের অধিকার নিষিদ্ধ করা হয়। এই ডিক্রি এখনও রদ করা হয় নি।

সোভিয়েট অর্থনীতি-তে বাধ্যতামূলক শ্রমের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারী ধরণের যন্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে চমকপ্রদ উন্নতি দেখিয়েছে, তার মূলে বাধ্যতামূলক শ্রমের অবদান যথেষ্ট। সোভিয়েটের যন্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নতির একটি প্রধান কারণ সোভিয়েট এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত ও বিপুল ব্যবহার। ভিশিনস্কী 'Results of the White Sea Consturction Project" এ আছে, "The O. G. P. U. corrective labour camps are pioneers in the cultural intregation of our distant border lands. The work done by Ukhta camp is gradually transforming this eternally frozen waste into an industrial area. ১৯৩৪ সালে ভিশিনস্কী সম্পাদিত "From Prisons to Educational Establishments" বইয়ের ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে সংশোধনী শ্রম প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন শক্তি বাড়াবার, স্ব-নির্ভর হওয়ার এবং দেশের অর্থনীতির সঙ্গে সুসঙ্গত হবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। আগেই যেমন বলা হয়েছে সোভিয়েটের দুর্গম অঞ্চলগুলি থেকে যন্ত্রশিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করার জন্য স্বাধীন শ্রমিকদের পাওয়া কঠিন ছিল, এ রকম দুর্গমস্থলে স্বেচ্ছায় কাজ করতে আসার জন্য যেরকম উঁচু হারে মজুরী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেবার প্রয়োজন হত, বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবহার করার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র সেই টাকাটা বাঁচাতে পেরেছে। সাধারণ শিল্প উৎপাদনের কাজেও বন্দীদের লাগালে পড়তা খরচ অনেক কম পড়ে। কারণ একটি মানুষকে কেবল বাঁচিয়ে রাখার ও কর্ম-

(শেষাংশ ৯৯ পৃষ্ঠায়)

Article II of the Labour Code of R. S. F. S. R. Quoted in I. L. O.: Legislative Series 1936—Russ. 1.

উত্তরণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

। নীলিমা দাশগুপ্ত ।

সকালে চা খাওয়ার পরই নীলু রওনা হয়ে গেলো কলকাতায়—বরযাত্রীদের এগিয়ে আনতে। পাত্রপক্ষ এলাহাবাদের স্থায়ী বাসিন্দা। অকল্যাণ্ড রোডে থাকেন। পাত্র সোমেন বসু। এলাহাবাদের বড় চাকুরে। ওঁরা চার ভাই, সোমেন সেজো, বাবা নেই, বড়দাই একরকম গার্জেন। গতকাল এলাহাবাদ থেকে ওঁরা মোট পনেরো জন কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে উঠেছেন। আজই বর্দ্ধমানে আসবেন। নরনারায়ণ বাবু ওঁর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একটি মাঝারি আকারের বাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। ওঁরা এখানে দুদিন থেকে ভাইকে বিয়ে দিয়ে তারপর দিনই সোজা এলাহাবাদ চলে যাবেন।

শোবার ঘরে একা বসেছিলো মল্লিকা। নীলুদা যাওয়ার আগে তার কাছ থেকে ছোট ঘরের চাবিটা চাইতে গিয়ে ও একটা খবর শুনে এসেছে—চাবিটা আগে ছাড়ে অনেক অনুনয় করে বিমান বাবু চেয়ে নিয়েছেন এবং ঐ ঘরেই খিল দিয়ে কবিতা পড়ছেন, খবরটা শুনে মল্লিকা কৌতুক বোধ করলো খুব। একবার ওর মনে হলো ছোট ঘরের দরজা থাকে কয়েকখানা বই বার করে নিয়ে আসে "না থাকগে—" বলে মিচে নেমে ও একেবারে কম্পাউণ্ডে চলে এলো, দেখলো মামাবাবু নিড়ানি দিয়ে রজনী গন্ধার গোড়া নিড়িয়ে দিচ্ছেন, খুব ভাল লাগলো মল্লিকার, পাশেই একটা খুরপি ছিলো,ও তাই দিয়ে লেগে গেলো মামার সাহায্যে। হঠাৎ মামাকে নিড়ানি ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখে মল্লিকা চোখ তুললে,—অদূরে নাজিরবাবু, নরনারায়ণবাবুর সামনে এসেই, বিরাট ভুঁড়ি—বেল্টকীত নাজিরবাবু অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, কোঁচার খুঁট খুলে নিয়ে, গলবস্ত্রের মতো পেঁচিয়ে ডান হাত দিয়ে টেনে ঘরে চেয়ার হ'য়ে বসে পড়লেন, চেয়ার হয়ে মানে—বাঁ পাটা পুরো ভাজকরা, ডান পাটা অর্দ্ধেক। কোঁচার খুঁটটা প্রাণপণে টেনে রাখতে রাখতে বিনয়ে একেবারে অবনত হয়ে নাজিরবাবু তাঁর নিবেদন অজ সাহেবের কাছে ব্যক্ত করলেন। ওখানে উপস্থিত থাকা উচিত মনে করলেনা মল্লিকা, তাড়াতাড়ি খুরপি রেখে ও সামনের দিকে এগিয়ে চললো, যেতে যেতে নাজিরবাবুর বক্তব্যের কিছুটা কানে এলো। "আজ্ঞে সার, অপরাহ্নে বরপক্ষ এসে পৌঁছুচ্ছেন, তক্ষুনি তাঁদের কী খেতে দেওয়া বিবেচনা করেন—কোল্ড ড্রিঙ্ক না কফি ?....."

এত অদ্ভুত বিনয় প্রকাশ কেন ? এই নিয়ম নাকি। মাটি লেগে করসাকাপড়খানার একটা গন্ধা হয়ে গেলো ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। বিনয় ভাল সন্দেহ নেই—কিন্তু এ যেন বড়ই বাড়াবাড়ি। কোঁচার খুঁট কিছুতেই বেড় পাচ্ছে না। অথচ ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে টেনে ধরে রাখতেই হবে।

"মা-দের সঙ্গে গেলেই পারতাম—" কম্পাউণ্ডের সামনে হাঁটতে হাঁটতে মল্লিকার মনে হলো। মায়াদেবী এবং বেলাদেবী গোপা ও মলিনাকে নিয়ে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গেছেন। বেলাদেবী গোপাকে নিয়ে গেছেন। কিন্তু

আগে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়ে নিয়ে আসতে। মায়াদেবীও বউকে নিয়ে সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। মল্লিকাকে নিয়ে গেলেন। বউ তার শ্বশুর বাড়ির দেশের জাগ্রত দেবীমূর্তিকে একবার দেখবে না?—মল্লিকার যাওয়ার কথা জিজ্ঞেসই করেননি মায়াদেবী, পাছে দেবীমন্দিরে যেতে অস্বীকার করে পাপ কুড়োয়। মল্লিকা তার মায়ের দুর্বলতা বুঝে মনে মনে খুব চিপে হেসেছে। দাদুদার কাছ থেকে ছোট ঘরের চাবি আদায় করে কবিতা-রাজ্যে প্রবেশ করার নিভৃত বাসনা ছিলো। তাই যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেনি মল্লিকা।

"গেলেই হতো বা'দের সঙ্গে—। ওমা! তারা দিদিমা যে—। ওখানে ঐ গরুগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে কী কচ্ছেন—?" আরো একটু এগিয়ে হাসনুহেনার ঝড়ের সামনে এলে মল্লিকা দেখলে, তারা দিদিমা গরুর দুধ দোয়া দেখছেন—। "যা চোর গোয়ালারা, সামনে লোক থাকে, তবু নাকি ওরা কোদরে লুকোনো বোতল থেকে জল মেশায়। —তারা দিদিমা তো একটা মস্ত কাজেরই ভার নিয়েছেন তাহলে—। বাপরে! দিদিমা তো আচ্ছা সাবধানী মানুষ। কেমন করে গরুর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছেন—"

"চান করেছো কী মা লক্ষ্মী—?" তারা দেবীর মন্ত্র ধ্বনি প্রশ্নে মল্লিকা থতমত খেয়ে গেলো। বললো। "না তো দিদিমা, এইবার করবো—।

"তবে আর এগিয়োনা বাছা। ওইখানেই থাকো" বলেই অস্ফুট কণ্ঠে গদাস্তোত্র আওড়াতে লাগলেন। মল্লিকা দ্বিরুক্তি আর এগোলো না। থমকে দাঁড়িয়ে গেলো কিন্তু ওর মনের এবার আরো কিছু পড়লো। তারা দেবী ভিজে গায়ে সিক্তবস্ত্রে গরুর পেছনে ডান হাত পেতে বেঁকে দাঁড়িয়ে, টুপ্ টাপ ক'রে গায়ের জল, কাপড়ের জল ঝরে পড়ছে মাটিতে। দুধ এখন দোয়ানো হচ্ছে না। একটা গোয়ালা থেকে থেকে গরুর পেটে গুঁতো দিচ্ছে। একটু পরেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। গুঁতো খেয়ে গরু গোবর ত্যাগ করলে। ডান হাতে এক তাল গোবর নিয়ে তারাদেবী হৃষ্টচিত্তে তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। কণ্ঠ নিসৃত তাঁর একটা গানের কলিও শুনতে পেলো মল্লিকা।

"পতিত পাবনী গঙ্গে ... ... মা-আ-গো—"

ভুবনকে বালতি হাতে গরুর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। মল্লিকা জিজ্ঞেস করলে, "কী ব্যাপার ভুবন?" ভুবন বালতিটা নিচে নামিয়ে রেখে বিনীত ভঙ্গি সহকারে উত্তর দিলো। "আজ্ঞে দিদিমুণি। দিদিমার এই পুজোর ব্যাপার—আমি মুখু-সুখু মানুষ ঠিক বুঝিনে, বোধকরি ওঁর ঘরটুকে বাসাবাসি ধাম করে নিয়েছেন। "মল্লিকা হাসি চেপে বললো, "গোবর দিয়ে নাকি—?"

"আজ্ঞে তা বৈকি দিদিমণি; গোবরের মাদ্যাপি ত আর কম নয়?—তাও এ গোবর ভুঁড়িতে গড়তে পায় না, দিদিমা নাগাড়ে গরুর পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন—।" মল্লিকা সশব্দে হেসে ফেললো। হাসি চাপা যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠলো: "ভুবন! তুমি দিদিমার ঘরে ঢুকেছো কোন দিন—?"

"না আজ্ঞে। অত সাহস ভুবন শুদ্দুরের কোনদিন হবে না। আমরা কেউ দিদিমার ঘরের ত্রিসীমানা দিয়েও যাইনে আজ্ঞে,—তবে হ্যাঁ, বাস পাই বটে।"

"বাস—? কিসের বাস—?"

"আজ্ঞে দিদিমুণি" অত্যন্ত ভাল মানুষের মতো মুখ করে বললে ভুবন, "গোবরগোলার জন্য গোবরদিন ঐ গামলাখানা দিদিমার ঘরে দিয়ে এসেছিনু, তাতে আজ প্রায় দশএগারো দিন ধরে গোবর আছেন, গোবুন গোবরও বোধ তাতে আশ্রয় নিয়েছেন। তা, এর বাস আমরা দূর থেকেই

আয়াস করে মিছি আছে, এটা আর দিদিমা ঠেকাতে পাচ্ছেন্ না।"

কৃত্ত হাসির ঠেলায় মল্লিকার এবার দম বন্ধ হবার যোগাড় হলো। কোনমতে মুখে কাপড় গুঁজে, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে আপন মনে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলো।

বরযাত্রীদের জন্ত যে বাড়ীটা ঠিক করে রাখা হ'য়েছে, তার গোছানো ভদারক করে বেরিয়ে এলেন লিলি দেবী। পেছনে তাঁর অনুগত বোম্বিবাহিনী। লিলি দেবী আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন সন্ধ্যাকে সঙ্গে করে দিল্লী নিয়ে যাবেন। বড়দি হিরণ্ময়ী দেবীকে বলেছেন, "বড়দি, তোর এ মেয়েটাকে আমার কাছে দে। দেখিস্ আমি গড়ে-পিটে তেমন মানুষ করেদি। আরো একটু ছোট বেলায় নিলে ভাল হোতো অবেক। তা—তার জন্ত ভাবিসনে। সন্ধ্যার যখন ইংরিজি কথা ভালই আসে, আমি ম্যানেজ ক'রে নেব' খন।" হিরণ্ময়ী দেবী তো আহ্লাদে গদ গদ। এ যেন চাঁদ দেখতে গিয়ে, হাতের মুঠোয় একেবারে চাঁদ পাওয়া। মাসির কাছে থেকে সন্ধ্যা বি-এ পড়বে, শুধু কি সেই একটা সুবিধে—আরো কত কিছু সুযোগ ঘটতে পারে। কল্পনালোকে হিরণ্ময়ী দেবী তখুনি তা দেখে নিয়েছেন।

মুন্না বললো "মাজিরবাবু ভালই সাজিয়েছেন বাড়িটা। না লীলুমাসি। লীলু মাসি খোঁপার নেটটা আঙুল দিয়ে টেনে সটান করতে করতে বললেন "হ্যাঁ, মন্দ নয়। চলে যাবে এতে—। তবে দলঘরে যে দু'টো বড় বড় ছবি টাঙিয়েছেন, সে দুটো বড় সেকেলে—এ যুগে এসব ছবি অচল। সেদিন দিল্লী আর্ট একজিবিশনে যা সব আর্ট দেখলুম। তা দেখে এসে আর কোন ছবির দিকে চোখ তুলতে ইচ্ছা করে না।" সন্ধ্যা মুখ বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি সকলের আগে মন্তব্য করলো "হ্যাঁ লীলুমাসি, আমারও খালি তাই মনে হচ্ছিলো। দলঘরে ও ছবি দুটো বড্ডই বেমানান ঠেকছে।" যে দুখানা ছবির সেকেলেত্ব ও বেমানানত্ব নিয়ে মাসি-বোনঝি মাথা গরম কচ্ছিলো, সে ছবি দুখানা নরনারায়ণ সেন বহু চেষ্টা করে প্রচুর অর্থ দিয়ে কিনেছিলেন। কষ্টতায় দুষ্প্রাপ্য অরিজিনাল ছবি দুখানা। বোনঝির কথায় লিলিদেবী প্রীত হয়ে বললেন। "যার টেষ্ট আছে সেই বলবে একথা।" কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই লিলিদেবীর নজরে পড়লো, কিছুদূরে মল্লিকা একেবারে একলা দাঁড়িয়ে আপন মনে হি হি করে হেসে যাচ্ছে। চোখ কুঁচকে গম্ভীরভাবে এগিয়ে এলেন লিলিদেবী "মল্লিকা! তোমার কি তারি কোন অসুখ হয়েছিলো—এই হয়ো টাইফয়েড……। সাধারণতঃ টাইফয়েডেই কিছু না কিছু অঙ্গ হানি হয় কিনা—" কথা শেষ করে লিলিদেবী শুধু চোখই নয় ভুরু পর্য্যন্ত কোঁচকালেন। মল্লিকা অবাক হলো। তাড়াতাড়ি হাসি থামিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর দিলো "না তো লীলুমাসি। তারি-হাড়া কোন অসুখ আমার হয়নি—"। সন্ধ্যা বললে, "হয়তো খুব ছোট বেলায় হ'য়েছিলো, তুমি তা জানোনা, কিম্বা এখন হয়তে তোমার তা স্মরণ নেই।" মল্লিকা উত্তর দেবে কী তার আগে লীলুমাসিই জোর দিয়ে বললেন। "নিশ্চয়ই কোন শক্ত অসুখ হয়ে'ছিলো—যার জন্তে তোমার ব্রে কিছুটা এ্যাফেক্‌টেড……সাদ্ দু দুজ সাদ যোয়ার—যার জন্ত তোমার চালচলন, হাব ভাব বেশ এ্যাবনরম্যাল আমার তো মনে হয় আর দেরী না করে তোমা একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের আণ্ডারে থাকা উচিৎ……। চোখেমুখে নিখুঁত দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে লিলিদেবী বলল সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেলেন। আঘাত করা এমন একটা সুযোগ পেয়ে লিলিদেবী মহাখুশি, ওঁ সঙ্গে টেক্কা মেয়ে বাঙলা দেশের কলেজে পড়া ঐ একটে মেয়ে।

মল্লিকার নিশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হোল। বুক জোরে জোরে ওঠা নামা করছে। উত্তেজিত হয়ে পাছে আবার উৎকট ছেলেমানুষি কিছু করে বসে, সামলাবার চেষ্টায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে, দুহাত দিয়ে দুকান চেকে একছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সোজা কলঘরে চলে গেলো। অনেকক্ষণ ধরে জল ঢেলে ঢেলে স্নান করলো। মনে মনে বারংবার জপ করলো—"ক্রুদ্ধ হবোনা আমি। ক্রোধ হলো চণ্ডাল। ক্রোধকে আমি জয় করবো—করবো। আঘাত পেলেও ফিরবোনা আঘাত।" শান্ত হয়ে মল্লিকা বার হলো বাথরুম থেকে। দোর খুলেই দেখে মুখ কাঁচু-মাচু করে ঘরজার সামনে বৌদি দাঁড়িয়ে আছে। মল্লিকা আরো সামনে এসে শুধলো, "কী হয়েছে বৌদি?" মলিনা এদিক-ওদিক তাকিয়ে অস্ফুটে বললো, "পাতিল আর সর্তা কাকে বলে তাই মিলি ঠাকুরঝি?" মল্লিকা বিস্ময়ের সুরে বললো "পাতিল, সর্তা এসব নাম তো কখনও শুনিনি বৌদি, কী হবে ওসব দিয়ে—?"

"ছোট দিদিমা সেই কখন আমাকে এ দুটো জিনিস নিয়ে যেতে করমাস করেছেন, বলে দিলেন, ভাঁড়ার ঘরের ডানদিকে দেয়াল আলমারীর সামনেই আছে কিন্তু-আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনে।" "যাকে জিগ্যেস করোনা।"

"মা আর বড়মামী দুজনেই চানের ঘরে ঢুকেছেন—"

"তাহলে ছোটদিদিমাকেই আবার জিগ্যেস করে এসো—"।

"না ভাই, আমার লজ্জা করে—" মল্লিকা একটু ভেবে নিয়ে বললো, "আচ্ছা, চলোতো ভাঁড়ার ঘরের আলমারীটা আর একবার দেখে আসি। যার নাম আমাদের জানা—সে তো জানাই, যেগুলো অ-জানা সেগুলো নিয়ে যাবে—" কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের আলমারী খুলে, কোন অজানা নামের বস্তু ওরা দেখতে পেলেনা, সবই জানা ওদের।.....ডালের টিন, মসলার কৌটো কতগুলি উপুড় করা নোড়ুন মেটে হাঁড়ি, সুপুরী, জাঁতি, ঘড়ির টিন্—। "অত ভাবা ভাবিয়ে দরকার নেই, চলো ছোটদিদিমার কাছে যাই। পাতিলটা ঠিক ধরতে পারলাম না, সর্তা বোধ হয় সরষানী। মাখন রাখার যেমন থাকে মাখন-মানী। ছোট দিদিমা কবিরাজী ঔষধ দুধের সর দিয়ে খান কিনা—" মল্লিকা হাসতে হাসতে গেলো। মলিনা তার সামান্য একটু পেছনে। শ্যামাসুন্দরীর ঘরে ঢুকে মল্লিকা দেখতে পেলো, কোলের কাছে গামলা ক'রে একরাশ সুপুরি ভিজিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন শ্যামাসুন্দরী। মল্লিকা হাসিমুখে জিগ্যেস করলে, "ছোটদিদিমা! পাতিল আর সর্তা কাকে বলে? বৌদি সেই থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছে"—"আ আমার কপাল—।" জিভ তালুতে ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটা বিস্ময় ধ্বনি প্রকাশ করলেন শ্যামাসুন্দরী।

"—তোমরা কোন সাহেবডাঙ্গাধিকা আইছোলো মা লক্ষীরা—। পাতিল হইল হাঁড়ি আর সর্তা হইল জাঁতি। আমি ইদিকে বইসা বইসা ভাবতাছি বৌমার হইল কী? অখন সুপারী কাইটা মা খুইলে রাত্রে কী আর অত পান বানান যাইব।"

মল্লিকাই হাসতে হাসতে হাঁড়ি আর জাঁতি নিয়ে এলো। মলিনা লজ্জায় কিছুতেই আর সামনে এলোনা। "তোমাদের দেশের ভাষা কিন্তু ভারি অদ্ভুত ছোটদিদিমা যাই বলো—"হাঁড়ি আর জাঁতি নামিয়ে রেখে মল্লিকা বললো, শ্যামাসুন্দরী মাড়ি বার করে হেসে বললেন "আমাগো ভাষের মত অমন মিষ্টি ভাষা আর হয় না গো মাসলক্ষী; এক হাঁড়ি দই শুনতে মিষ্টি না এক পাতিল দই শুনতে মিষ্টি কও তো দেখি?" মল্লিকা হেসে ফেললো,

"কৈ বড়মামী তো এরকম কথা বলেন না?"

"হঃ! বেলী কইবো মাসের কথা—। ও অখন অজগিরি হইছে না?" মল্লিকা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন

করলো, "ছোটদিদিমা। টুকরীতে অত লেবু কেন? লেবুর আচার করবেন বুঝি?"

"না গো বালস্মী। ওগো যাদুতে যা কিন্তু খাইতে পারে না। লেবুর গন্ধ ওঁয়ার ভালি পসন্দ কিন্তু রস সইহ হয় না। তাই ওঁয়ার খাওনের সময় আমি পাশে বইসা লেবুগুলান টুকরা করতে থাকি—" হাসি গোপন ক'রে মল্লিকা সহজ গলায় বললে, "তাহলে দিদিমা রুটী করে লেবু রোজ লাগে—" "তা প্রায় বারোডা লাগে—" জাঁতির এক প্রান্ত ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ক্ষিপ্রহাতে সুপারি কুচোতে কুচোতে বললেন শ্যামসুন্দরী। মলিনা পা টিপে টিপে ছোটদিদিমার ঘরের দিকে আসছিলো। আঁচলে টান পড়লো। চমকে ঘাড় ফিরাতেই দেখে, ছোট্ট এ্যাটাচি হাতে হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে অরুণ। "এত চুপি চুপি কোথায় যাওয়া হচ্ছিল—?" আঁচল ছেড়ে দিয়ে অরুণ প্রশ্ন করলো মল্লিকা সে কথার কোন উত্তর দিলেনা। ঝক্-ঝকে চোখ করে বললো, "এ-কদিনেই তুমি কতখানি রোগা হয়ে গেছো—" অরুণ শ্রীর খুশিতে উপ্‌চে পড়া চোখে চোখ রেখে হাসতে হাসতে বললো," "আমি তো দেখছি, তুমি রুগী কাহিল হ'য়ে পড়েছো— রোজ একরাশ ক'রে খেয়ে আসিও…?" তারপর দুজনেই একসঙ্গে হেসে ফেললো।

বেলাদেবীর শেষের কথায় ব্যস্ততা ফুটে উঠলো এবং ঘরের সকলের মধ্যেই বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেলো। বেলাদেবী পাছড়িয়ে বসেছিলেন। নীলু মার কথার কোন উত্তর না দিয়ে এদিক ওদিক চট্ করে মিচু হ'য়ে মায়ের পদধূলি নিলো তারপর গোপার দিকে একপলক তাকিয়ে দিয়ে মুখে কপট দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে বললো "মা! শুধু তোমার আশীর্বাদের জোরে, তোমার নীলে আজ যম যাঁচির আসতে পেরেছে—উফ্!—।" সকলেই যখন বাগ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, নীলু তখন পকেট থেকে রুমাল বার করে ধীরে সুস্থে কপালের আর মুখের ঘাম মুছতে শুরু করলো। সকলে চুপ করে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু নীলু যখন মুখমোছা শেষ করে আবার ঘাড়ে হাত দিলো, তখন বেলাদেবী আর থাকতে পারলেন না, "ব্যাপারটা কী—খুলে বল?"

"মা! বরযাত্রীরা কী দুর্দান্ত সব সাহেব" মুখের ভাব চেষ্টা করে করুণ করলে, নীলু,—"মুখে শুধু ইংরেজি খই ফুটছে কী করে যে ইজ্জত বাঁচিয়ে এই রাস্তাটুকু আমি ওদের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছি—"

"ঠিক তোলাদা হয়েছেন" সন্ধ্যা বললে। "কী বলতে চাস্ বল নীলু শিগগির—আমরা বর দেখতে যাবো—" ছন্দা দাঁড়িয়ে উঠে তাগাদা দিলো। লিলিদেবী আধশোয়া ভাবে ছিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, "বাঙলাদেশের ট্রেনিং এর এই মস্ত দোষ, বি, এ, এম, এ পাশ করা সব ছেলেমেয়েরা—অথচ দুটো ইংরিজি কথা বলতে গেলে তোতলাতে আরম্ভ করবে। আমার ঐ একফোঁটা মুপ্রিয় যা তোড়ে ইংরিজি বলে, বাঙলাদেশের বহু গ্র্যাজুয়েট ও তা পারবে না—"একটুও দমলো না নীলু, "ঠিক বলেছো নীলুমাসি আজ যে মান বাঁচিয়ে এসেছি সেও একরকম মুপ্রিয়ের দৌলতেই ধরতে গেলে—। ডেকিনিট্‌লি, মর্যালি, একজ্যাক্‌টলি—এ তিনটে কথা বলে

বেলাদুপুর। ওপরের বড় হল ঘরে প্রায় সকলকেই দেখা যাচ্ছে। ওরে বসে কাজ ঘরে চিৎ হ'য়ে সবাই পাঁচ মিশেলি গল্প জুড়ে দিয়েছেন। দরজার কাছে জুতোর শব্দ শুনে সকলেই তাকালেন, হাসিমুখে উজ্জ্বল চোখে ঘরে ঢুকলো নীলু। "মা-আ! মা কোথায়—?"

"ওমা! এই তো তোর সামনে—হলো কীরে তোর…?" সহাস্যে উত্তর দিলেন বেলাদেবী। "বরযাত্রীরা এসে

বলে—তা এক একটা বক বোধহয় ন বার করে বলেছি—"তাহলে হিসেব করো, তিন সং সাতাশ বার বলে তবে এসে পৌঁছেছি বর্দ্ধমান। উফ্। রাস্তা যেন আর ফুরোয় না।" নীলুর বলার ভঙ্গিতে সকলেই হেসে উঠলো। বেলারেবী তালই জানেন নীলুর ইংরিজির তোড় কিছু কম আসে না, এ বেস্তুই খোপাকে চটানোর জন্ত বুকে নিয়ে মুখ টিপে হাসলেন। ছমা ও সন্ধ্যা এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো বর ও বরযাত্রী দেখতে। দম্বাও অনুসরণ করলো। লিলিদেবীরও অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছিলো ভন্তুনি বরুবোনকি-জামাইকে দেখার, কিন্তু যতই হক তিনি মাসি, অতটা চপলতা দেখানো তিনি সঙ্গত মনে করলেন না। সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে জানালাদিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। দিদির দিকে চোখ টিপে নীলু বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। অরুণ ছোট একটু ঘুম দেবার মতলবে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছিলো। ঘুমের আশা ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি নেমে গেলো নিচে। মলিনা সোপার কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বললে, "সোপাঠাকুরঝি। কেমন লাগছে? একটিবার চুপি চুপি বরকে দেখতে ইচ্ছে করছে—নয়?" সোপার মুখের রং বদলালো। সোপার মুখের লাজিমা দেখে, মলিনা আরো একটু ঠাট্টা করতে যাচ্ছিলো, নরম্মতের আগমনে থমকে থেমে গেলো। প্রকাশ তার নতুন বউ দেখাতে নিয়ে এসেছে মাসিমাকে। দশ বারোক হলো বিয়ে হয়েছে প্রকাশের। ও কলকাতায় যে কার্মে চাকরি করে তারই ম্যানেজারের মেয়ের সঙ্গে। মায়াদেবী কলকাতায় থাকতেই প্রকাশের বিয়ের খবর পেয়েছেন। প্রকাশের শ্বশুর যে বিয়েছেন খুবেছেন অনেক এবং বধূও যে খুব সুন্দরী হ'য়েছে—সে খবরও ওঁদের জানতে বাকী ছিলো না। প্রকাশের প্রবঞ্চনায় মায়াদেবী প্রথমটা এত ক্ষেপে গিয়েছিলেন যে তিন চার দিন উনি ওঁর স্বাভাবিক ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর অবশ্য সবই স'য়ে গেছে আস্তে আস্তে। কিন্তু মল্লিকা গয়নাদিয়ে প্রায় আপাদমস্তক মুড়িয়ে শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে হাসিমুখে প্রকাশকে ঢুকতে দেখে একটু ভীত হয়েই পড়লো, মা না জানি কী আবার কাণ্ড করে বসেন। কিন্তু মার কথা শুনে সে সংশয় নিমেষে দূর হয়ে গেলো। হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানালেন মায়াদেবী, "এসো প্রকাশ। এসো। এসো বউমা। এবো—আজকেই এলে বুঝি তোমরা?" প্রকাশ এবং বধূ মাধুরী নত হয়ে মায়াদেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলো। প্রকাশ উত্তর দিলো, "হ্যাঁ মাসিমা, আজকেই আমরা এসেছি। প্রায় প্রতি শনিবারই আমরা আসি বর্দ্ধমানে মাকে দেখতে। মা তো কিছুতেই আর কলকাতায় গেলেন না।"

মায়াদেবী ওদের দুজনকে বসতে বলে, বউ ও ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বউমা! আমার ট্রাঙ্কখুলে বাসিব্যাগটা নিয়ে এসো তো মা, আর মিলি, তুই মা তো মা চটকরে বরণডালা থেকে চারটি ধানদুর্বো নিয়ে আয়—" মিলি নামটা কানে যেতেই বউটির মুখ ভুললো মাধুরী। নিতান্তই সাধারণ এবং আটপৌরেই বলাচলে শাড়ি পরিহিতা মল্লিকাকে দেখে, বধূ মাধুরীর কিঞ্চিত যেন করুণারই উদ্রেক হলো—আহা। বিয়েবাড়িতে একখানা ভাল শাড়ি পরবারও অবস্থা এদের নেই। একে কমপিট্ করার জন্ত অত গয়না না পরলেও চলতো।

প্রথম বার দূর্বা মাথায় দিয়ে ওদের আশীর্ব্বাদ করলেন মায়াদেবী তারপর ওদের হাতের ছুঁড়ায় এক-খানি করে দশটাকার নোট দিলেন। মাধুরী টাকাটা ফেরত দিতে যাচ্ছিলো, প্রকাশের চোখের ইসারায় থেমে গেলো। মায়াদেবী বধূর চিবুকখানি তুলে ধরে সস্নেহে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। পরিতৃপ্ত গলায় বললেন, "বেশ হ'য়েছে—চমৎকার বউ হ'য়েছে"- প্রকাশকেই বলছেন মা

নিজেকেই নিজে বললেন কে আসে। লিলিদেবী মাধুরীর মাথার লোমার মুকুটের ওপর চোখ রেখে বেলাদেবীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "বৌদি! গোপাকে তো সবই দিয়েছো, মাধার কিন্তু টিপলি ছাড়া আর কিছু দাওনি—এরকম একটা মুকুট দিলে বেশ হোত—না?"

বেলাদেবী বলতে যাচ্ছিলেন, আজকাল মুকুটের একেবারে চল নেই কিন্তু সামলে গেলেন, যদি এ কথায় মোহনের বউ কিছু আঘাত পায়। শুধু নীরব হাস্যদ্বারা বৌনের কথার উত্তর শেষ করলেন। ছন্দা হড়-বড় করে এসে পড়লো, "মাসিমা! তোমার জামাই যা সুন্দর হয়েছে আর তেমনি স্মার্ট—ছন্দার গলা শোনা গেলো।"

সন্ধ্যা গোপার গা ঘেঁসে ধপ করে বসে চপল কণ্ঠে অস্ফুটে বললো, "গোপাদি! তুমি ভাই ভীষণ লাকি। আমি রীতিমতো খেলাপী ফিল করছি……"যেন সময় উপযোগি একটা বড় রসিকতা করতে পেরেছে মনে করে খুশির চোটে লীলুয়ানির মতন করে খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগলো সন্ধ্যা। প্রকাশ ধীরে ধীরে উঠে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলো, প্রকাশকে উঠতে দেখে মল্লিকা এবার তাকালো, প্রকাশও যেতে যেতে তাকিয়েছিলো মল্লিকার দিকে। মুহূর্তকাল দুজনে চোখাচোখি হলো।

মল্লিকা একইভাবে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো কিন্তু প্রকাশ দ্রুত চোখ সরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ওর অবস্থা এমন মারাত্মক ভাবে ভুল হয়ে গেলো? সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বারে বারে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো প্রকাশ। এমন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের ভেজ, এমন বুদ্ধির দীপ্তি মিলি চোখে। এতো লুকোবার নয়। এ তেজ, এ আভা ও যেখেনি কেন চোখেমেলে? ব্রিলিয়ান্ট ম্যাথেমেটিসিয়ান প্রকাশ চৌধুরি, যে, নির্ভুল অঙ্ক কষে কষে ধাপে ধাপে জীবনের উন্নতির শিখরে উঠেছে সে তার সব চেয়ে বড় প্রব্লেম গোঁজামিল দিয়ে সমাধান করে দিলো? এত ভ্রান্তি এতো ভ্রম। এমন প্রতিভাদীপ্ত চোখের বদলে ও একটি নিষ্প্রভ সরল বুদ্ধিহীনাকে নিজে বরণ করে নিয়ে এসেছে? ব্রিলিয়ান্ট ম্যাথেমেটিসিয়ান প্রকাশ চৌধুরি। ধিক্ তোমাকে! ওপরচটক্ সৌন্দর্য্যের ওপর সরলা ধিরে ভুলিয়ে বাইরের লোককে একটু কালের জন্য ও ভুলিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু নিজেকে ভোলাবে কি দিয়ে? বিয়ের আগে মাধুরীকেও তো মেহাৎ কম দেখোনি? এ মহাভুল ও করলো কি করে? নিজে গরজ করে মাধুরীর গান শুনেছিলো একদিন। মাধুরী, গেয়েছিলো "তার চেয়ে বুঝি সুন্দর নাই আমি যারে ভালোবাসি……"গান শেষ করে মুখ নামিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলো মাধুরী, তখন তো ওর বেশ ভালই লেগেছিলো মাধুরীকে, নাকি গানের ঐশ্বর্যগুলো ওকে সম্মোহিত করেছিলো…?

বাসর ঘরেও মাধুরী ঐ গান গাইলো তারপর বিয়ের ঝামেলা মিটলে পর মাধুরীকে একান্তে পেয়ে প্রকাশ বলেছিলো একদিন "মধু, একটা গান করো তুমি—মাধুরী একটুও ইতঃস্তত না করে একটুও গলা না খাটো করে শুধুনি গান ধরলো, "তারচেয়ে বুঝি সুন্দর নাই আমি যারে ভালোবাসি"—ভ্রান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো প্রকাশ,

"এই চুপ্ চুপ্ এ গান নয়। মা ওঘরে রয়েছেন অন্য গান করো একটু আস্তে—" গান বন্ধ করে মাধুরী বললো, "আর কোন গান আমি জানিনা। ঐ একটা গানই মার বন্ধুরা মেয়ে পেয়ে অনেক কষ্টে গানের মাষ্টার মৌরীদির কাছে শিখেছি।" "এঁ্যা—। মাস্তর এই একটা গান—" বাক্‌শক্তি প্রায় লোপ পেলো প্রকাশের। তার অল্প কিছুদিন পরে প্রকাশ-জননী যখন বধূমাতার আচরণে কাঁদতে কাঁদতে বর্ধমানে ফিরে এলেন, তখনই প্রকাশ মাধুরীর কাছ থেকে সবরকম মাধুর্য্যের আশা চিরতরে ত্যাগ করলো "মা কলকাতায় যেতে চান না—করি কী?" লোকের

কাছে গাইলে কি হবে, ওর অন্তরে গাইবে কে? কি দিয়ে বুঝ দেবে ওর নিজের বিবেককে? এমন বেহুদও তাহলে পৃথিবীতে আছে, পলাশ-ফুলের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হয়।

প্রকাশ যাওয়ার-সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দারা ঘিরে বসলো। মাধুরীকে, বড়রা কি প্রয়োজনে একে একে উঠে চলে গেলেন। গোপারও নীলুর কাছে যাওয়ার হঠাৎ একটা প্রবল ইচ্ছে হলো। বড়দের পেছন পেছন নীলুর সন্ধানে বেরিয়ে গেলো গোপা। ছন্দা, মন্দা, সন্ধ্যা তিনজনেই বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে মাধুরীর গহনা দেখতে লাগলো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো, তারপর প্রশ্নবর্ষণ শুরু হলো,

"ডিজাইনগুলির নাম কী……?"

"কতখানি করে সোনা আছে……?"

"কোন দোকান থেকে করিয়েছেন——?"

"কত মজুরী নিয়েছে——? ইত্যাদি—" মাধুরী তিনজনের প্রশ্নের উত্তর খুশিমুখে দিতে দিতে আড় চোখে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো মল্লিকার দিকে চোখ ফেলছিলো। এত দেমাক কিসের রে বাপু? ওর এমন সব গয়নাও আকর্ষণ করতে পারছে না মল্লিকাকে নিজেকে স্থির রাখা কঠিন হলো মাধুরীর। ডেকেই বসলো, "মল্লিকা। শোনো—" মল্লিকা আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে কথা কাটাকাটি করছিলো বৌদির সঙ্গে। বলিমা দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছে—আজ যদি মল্লিকা বেশ-বাস না বদলায় অর্থাৎ ভাল একটা সিল্কের শাড়ী না পরে এবং চুল-টুল ভাল ক'রে না আঁচড়ায়—তাহলে ও এক্ষুনি গিয়ে ওঁড়োর ঘরের কোণায় যে ছেঁড়া ময়লা ছাপা শাড়িখানা আছে—যেটা দিয়ে মায়াদেবী কলকাতা থেকে সোনাদুয়ডাল বেঁধে এনেছিলেন, সেটা ও পরে আসবে, কারুর বাবাই শুনবেনা।

মল্লিকা চিরকালই শাড়ী গহনা সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন। বহুদিন বকে-ঝকে মায়াদেবী এখন তার মেয়ে এসব বলা ছেড়েদিয়েছেন। "ওকে ভগবান ছেলে গড়তে গড়তে ভুলে মেয়ে গড়েছেন।" এ উক্তি মায়াদেবীর মুখ থেকে বহুবার অনেকে শুনেছেন।

মাধুরীর উচ্চ কণ্ঠে ডাক শুনে মল্লিকা বিস্মিত হ'য়ে মুখ ফেরালো, "আমাকে ডাকছেন?" হ্যাঁ। "তাই তোমাকেই—" মাথা দুলিয়ে কোলের ওপর ঘুমানো মোটা গোড়ের মালার মতো সোনার মফ্‌চেনটাকে টান করে নিচে ঝুলিয়ে দিতে দিতে উত্তর দিলে মাধুরী। মল্লিকা আরো অবাক হলো। শুধু ওর ডাকের ভঙ্গিতেই নয়, একজন অপরিচিতকে প্রথম দর্শনেই তুমি বলে কী করে—! কিন্তু কিছু বললো না। ধীরে ধীরে এসে মাধুরীর সামনে বসলো। বলিমাও ঠাকুরঝির সামনে বসলো এসে। বাঁহাতের অড়োয়া ব্রেসলেটের মস্ত বসানো ঘুরে নিচের দিকে চলেগিয়েছিলো, ডান হাত দিয়ে ঘুরিয়ে সেটা ঠিক করে, চোখে একটা বিশেষ ভঙ্গি এনে মাধুরী বললো "তোমার কথা ভাই···ক—ত শুনিছি——"

মল্লিকা আবছা হাসলো "কিরকম—?" "সে কথা ভাই তোমার আমার মধ্যেই থাক্—হাটে তাহলে কী চলে—বলো?"

"সে আবার কী?" মল্লিকা এবার চোখ বড় করে তাকালো, মল্লিকার চোখের আকাশ-থেকে পড়া চাউনি, আদৌ পছন্দ হলো না মাধুরীর। দ্রুতভঙ্গি করে বললো, "তুমি ভাই এমন ভাব দেখাচ্ছো যেন তাদা মাছটি উল্টে খেতে জানোনা—রাত দুপুরে ওঁর কাছে সেই যে পীরিত জানাতে গিয়েছিলে, সেই রাত একটার সময় গো—সেটা কী হাটের মাঝে জানানো ভালো—? বলো—?"

স্তম্ভিত মল্লিকা আস্তে আস্তে বললো, "কে বলেছে একথা? প্রকাশদা?"

"নিশ্চয়ই। উনি না বললে, আমি আর এ কথা—" মল্লিকা থামিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো, "প্রকাশদা বলেছেন, আমি পীরিত করতে গিয়েছিলাম—?" "যাঃ রে, নিশ্চয়ই বলেছেন? বিশ্বাস না হয় ডেকে পাঠাচ্ছি ওঁকে—" হস্তাদ্বয় চোখ টেপাটেপি করে হাসতে লাগলো মল্লিকার ওখানে বসে থাকতে গা ঘিনঘিন করতে লাগ্‌লো। "না ডাকতে হবে না—" উঠে দাঁড়িয়ে যেন কলঙ্ক মাথায় নিয়েই চলে গেলো মল্লিকা। মলিনার সব কিছু বিস্বাদ মনে হতে লাগলো, মৃদুকণ্ঠে বললে "প্রকাশবাবুর মস্ত ভুল হয়েছে। এ ভুল তাঁর একদিন ভাঙবেই—সেদিন আপনিও নিশ্চয়ই টের পাবেন, পীরিত জানাবার মত মেয়ে মিলিঠাকুরঝি নয়। ও বস্তু ভগবান ওর অন্তরে দিতে ভুলে গেছেন।" কথা শেষ করে মলিনাও ঘর ছেড়ে চলে গেলো তক্ষুনি। কিন্তু মলিনা তো জানেনা, প্রকাশের ভুল ভেঙে গেছে বহুদিন আগেই, তবুও কিছু বিলম্ব হ'য়েছিলো—তারই জের বোধহয় সারাজীবন ধরে টানতে হবে।

বিয়ের প্রথমদিকে—স্বামী বক্তা এবং স্ত্রী শ্রোতা—! এপ্রবাদবাক্য তো আর এমনি এমনি তৈয়ারী হয়নি, বিয়ের চতুর্থ রাত্রে, অর্থাৎ ফুলশয্যার রাত্রে আবেগ ঘন হ'য়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রকাশ নিজের ঘর চড়ানোর জন্যই হোক্ কিম্বা যে কারণেই হোক মল্লিকার সেই রাতের কাহিনী যথাসাধ্য রং চড়িয়ে বলেফেলেছিলো স্ত্রীর কাছে। একমুহূর্তের ভুলে কি বিষবৃক্ষ রোপণ করলো মাধুরীর মনে, তখন অবশ্য বোঝেনি প্রকাশ কিন্তু একমাসও বিলম্ব হয়নি তা বুঝতে। এমন বিশ্বাস সন্দেহে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে মাধুরীর মন, সর্বদা স্বামীকে চোখে চোখে রাখে, কোন তরুণী মেয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ তো দূরের কথা, তাদের সম্পর্কে কিছু বলে ফেললেই আর রক্ষে নেই প্রকাশের। চেঁচা-মেচি কান্না কাটি ক'রে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয় মাধুরী। আফিস থেকে প্রকাশদের বাড়ী পৌঁছাতে ট্রামে কুড়ি মিনিট লাগে। পাঁচটা মিস ছেড়ে একুশ মিনিট যদি হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে, তাহলে লাঞ্ছনার সীমা থাকেনা প্রকাশের। প্রথম প্রথম ঘরক দিতে গিয়ে প্রকাশ মাঝেমধ্যেই একলেট হ'য়েছে। এখন পিটকিরী দিয়ে টেনে কান্না শুরু করতো মাধুরী যে পাড়ার সমস্ত লোক জড়ো হয়ে উল্টে প্রকাশকে মারে আর কী। তাছাড়া তার সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে এই যে, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের মতো বিয়ে করে বসেছে বন্ধু-দুহিতাকে।

সন্ধ্যার সামান্য কিছু পরে নরনারায়ণবাবু বাড়ির সবাইকে তাড়াতাড়ি করে নিচের ড্রইংরুমে জড়ো করতে লাগলেন। বরপক্ষের সবাইকে সাদরে আহ্বান জানিয়ে আগেই নিয়ে এসে বসিয়েছেন। সকলকে ডেকে ডেকে উত্তম পক্ষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। মাজিরবাবুর খেল্ আরম্ভ হলো। তিনজন বোগদুরস্ত বয় নিঃশব্দে নিপুন হাতে চা ও চপ কাট-লেট সার্ভ করতে লাগলো। মাজিরবাবু বলেছিলেন, "দেখবেন সার, এমন ব্যবস্থা করবো বরপক্ষ মনে করবেন ফিরপোতে বসে চা খাচ্ছি।" তার চেয়েও যেন ভাল ব্যবস্থা মনে হচ্ছিলো সকলের। হঠাৎ অরুণের মনে হলো সবাইকেই তো দেখছি, কিন্তু ঘাটকে তো দেখছিনে—। অরুণ উঠে গেলো। চারি দিকে চোখ ফেলতে ফেলতে ওপরের বড় ঘরে গিয়ে স্ত্রীর দেখা মিললো। মল্লিকাও রয়েছে সেখানে। স্ত্রীর সাড় দেখে হেসে ফেললে অরুণ, "কী ব্যাপার! বড় দাদা বাবরুম পরিষ্কারের ভার তোমার ওপর দিয়েছেন নাকি?" মলিনা থতমতে মুখে দাঁড়িয়েছিলো। স্বামীর কথায় হেসে ফেলে তার প্রতিবাদ জানালো। অরুণও

শ্রীর সঙ্গে একমত "ঠিক হ'য়েছে। এবার মিলি বস। আমরা তো কিছুতেই পারলেমনা। দেখো তুমি চেষ্টা করে মিলির ঘাড়ের শাকচুন্নীটা যদি নামাতে পারো।…" মল্লিকা প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "দাদা, তুমিও একথা বলছো? দেখনা বৌদি আমার জন্ম বেনারসি শাড়ি বার করেছে। বেনারসি কি পরা যায় নাকি তাহ'লে—?" অরুণ না বোঝার ভান করে হাসিমুখে বললো, "বেনারসী শাড়ি যদি না পরা যায়, তাহলে ওগুলো দিয়ে হয় কী!" মল্লিকা অসহায় কণ্ঠে বললো, "দাদা তুমি বুঝছোনা—" মলিনা রাগ দেখিয়ে বললে, "দাদা খুব বুঝেছেন্। দাদা বুঝলে কোন লাভ নেই—। আর বেনারসি শাড়ি তো ভারি, একখানা প্লেন সাদা বেনারসি—" অরুণ এখন ওর উপস্থিতটা বাঞ্ছনীয় মনে করলো না। হাসি গোপন করে বললো, "তোমরা শিগ্‌গির নিচে চলে এসো। বড়দাদা অনেকক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছেন।" বলেই অরুণ চলে গেলো। মল্লিকার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো মলিনা, হঠাৎ তার চোখ ছাপিয়ে কয়েকবিন্দু অশ্রু টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়লো। মল্লিকার ভেজা, মল্লিকার স্নেহ উবে গেলো কোথায়। নিমেষে কাদা হ'য়ে গেলো ও। "ছিঃ ছিঃ, বৌদি আমার জন্ম তোমার চোখের জল ফেলতে হলো?—আমাকে মার তুমি। আর তোমার কথার অবাধ্য হবো না—।" দুহাত দিয়ে বৌদির গলা জড়িয়ে ধরলো মল্লিকা। মেঘ কেটে গিয়ে ঝিকমিকিয়ে রোদ দেখা দিলো। মলিনা গলা থেকে ননদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললো "যাও তাহলে মুখটা ভালো সাবান দিয়ে ধুয়ে এসো—" মল্লিকা আর আপত্তি না করে বাথ-রুমে ছুটে পড়লো। ব্যস্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকলো নীলু, "বৌদি, মিলি কোথায়? তোমাদের দুজনকে বাবা নিচে ডাকছেন—" মলিনা বললো, "তুমি যাও নীলুঠাকুরপো, কাপড়টা পাল্টে আমরা দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।" নীলু চলে যাচ্ছিলো মলিনা আবার ডাকলো, "নীলুঠাকুরপো শোন—!" নীলু ফিরে তাকালো। মলিনা বললো, "সাজিরবাবু একঝুড়ি বেল ফুলের মালা এনেছিলেন, সবই কী ছইরকম সাজাতে লেগে গেছে—?" "তাতো ঠিক বলতে পারিনে বৌদি, কেন? তোমার চাই?" স্মিতমুখে মলিনা বললে, "কয়েকগাছা পেলে ভাল হতো—" "আচ্ছা আমি দেখছি—" নীলু নিচে নেবে গেলো এবং তক্ষুনি ফিরে এলো কলা পাতায় মোড়া গুচ্ছের বেলী ফুলের মালা নিয়ে। একটু মিষ্টি হেসে বৌদির হাতে কলাপাতার মোড়কটা দিয়ে, তাড়াতাড়ি নীচে যাওয়ার জন্ম আর এক লম্ফ দিয়ে নীলু ব্যস্তভাবে চলে গেলো। মলিনা মোড়কটা একটু আড়ালে রাখলো। মাধুরীর কথা শোনার পর ওর কেমন জেদ চেপে গেছে, আজ মাধুরীকে দেখিয়ে দেবে ও মল্লিকার পায়ের কেড়ে আঙুলেরও যোগ্য নয়। মল্লিকা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বললো, "বৌদি! এঘরে নয়। চলো আমরা আমাদের ছোট ঘরে যাই।" মলিনার তাতে আপত্তি নেই। নাছোড়বান্দা বৌদির পাল্লায় প'ড়ে মল্লিকা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বৌদির হাতে ছেড়ে দিলো। তাছাড়া মল্লিকা এখন একটু বেশিরকম উন্মনা ছিলো, অন্যমনস্ক ছিলো। প্রকাশদা বলেছেন ও রাত দুপুরে পৌঁছিত জানাতে গিয়েছিলো প্রকাশদাকে, একথা শোনাবার পর ওর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্ছে। ব্যথলা রাত্রির অন্ধকার, ঘুম অজল, সমস্ত কিছু তুচ্ছ ক'রে ও, ঐ একফোঁটা বয়সে যার প্রাণ ভিক্ষে চাইতে ছুটে গিয়েছিলো—প্রকাশদার চেয়ে একথা আর কে বেশি জানে? অথচ প্রকাশদাই সেটার এমন বিকৃতরূপ দিয়েছেন। এসব ভাবনায় ও হারিয়ে গিয়েছিলো। মলিনা ইতিমধ্যে তার কাজ বেশ ভালভাবেই সমাধা করে নিয়েছে। কেবল মলিনার একটু ভয় মিলি

ঠাকুরঝি আয়নার সামনে গিয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু মল্লিকার অন্যমনস্কতাই বাঁচালো মলিনাকে। তারপর দুজনেই শাড়ি-ব্লাউজ পালটালো। খোঁপাটা খুলে মাথায় যখন বেলীফুলের মালা পরাতে গেলো, তখন হুঁশ হলো মল্লিকার। বললো মাথানেড়ে "উঁহু। ও কিছুতেই চলবেনা বৌদি," মুখে বিষণ্ণ ভাব এনে মলিনা বললো "আচ্ছা থাকুগে—চলো, খোঁপায় মালা দিতে আমার এত ভাললাগে—। কাজ নেই, চলো যাই।" সেপর্যন্ত খোঁপায় মালাও জড়ালো মল্লিকা। ওরা যখন নীচে নেমে এক-পাশে দুখানা চেয়ার দখল করে বসলো, তখন লিলিদেবী সিটার বাজাচ্ছেন। সেরুপ প্রথমটা ওদের দিকে করো নজর পড়েনি এক বিমান ছাড়া। নরনারায়ণ বাবু লিলি দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে আজকের গান বাজনার প্রোগ্রাম আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। ছাদের একদিকটা দুটো চৌকি জুড়ে একটা প্ল্যাটফর্মের মতো করা হয়েছে। তার ওপর পার্সিয়ান কার্পেট পেতে গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। লিলিদেবী খুব সুন্দর সিটার বাজালেন। বাজনা থামলে অনেকক্ষণ ধরে হাততালি দিলেন সকলে। তারপর ছন্দা ও সন্ধ্যা দুয়েট গাইলো, তারপর আলাদা আলাদা। নন্দার গলা বেশ মিষ্টি ভাবদিয়ে গায়—তবে তালজ্ঞানের দিকে নজর নেই বেশী। সন্ধ্যা পরপর দুখানা গাইলো। দুটো গানই সকলের বেশ ভাল লাগলো, প্রথম ভাটিয়ালি তারপর ক্ল্যাসিক। লিলিদেবীর প্রোগ্রাম শেষ। তারপর তোলা অরুণের কাছে এসে পিড়াপিড়ি করতে লাগলো। অরুণ রেহাই পাওয়ার জন্য চটকরে বোমের নামকরে ফেললো "তোলোদা এ বেয়েদের জলদায় আর আমাকে টেনো না—আজকাল আমার চর্চ্চাও নেই বিশেষ, তার-চেয়ে মিলিকে ধরো" "ও, হ্যাঁ, তাইতো"—তোলা চলে যাচ্ছিল, অরুণের কি মনে হোলে "তোলাদা—!" ডাকদিয়ে কিস কিস করে বললো, বড়মামাকে বলো মিলিকে গান করবার জন্য বলতে ও আবার একটু—""বুঝেছি—"তোলা তক্ষুনি গিয়ে বাপের কানে কানে কি বললো—। নরনারায়ণ বাবু নিজেই বিস্মিত হ'লেন—কাল অমন গান শুনলেন মিলির এতক্ষণ মিলির কথা তাঁর মনে হয়নি কেন? উঠে এলেন মল্লিকার কাছে। আর একজনের একেবারে প্রথম থেকেই মল্লিকার গানের কথা মনে হচ্ছিল—সে বিমান। কিন্তু সরাসরি নিজে গিয়ে অনুরোধ জানাতে ওর বিধা লেগেছে। নরনারায়ণ বাবু মল্লিকার কাছে এসে বল্লেন "মিলি! এবার পর পর কয়েকটা গান কর মা তুমি, বড় ভালবেসেছিলো তোমার কালকের গান।" বড় মামাকে দেখে মল্লিকা দাঁড়ালো, মন্দ্রকণ্ঠে বললো "আজ আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই বড়মামা, আজ গান থাক—"নরনারায়ণ বাবু ব্যস্ত হয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন "খুবই কি অসুখ বোধ করছো মা? অন্ততঃ যদি একটা—"বিমান কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন ওরা টের পায়নি। পেছন থেকেই বললেন "মল্লিকাদেবী! আপনি কিন্তু আজ আমাদের গান শোনাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন" —মল্লিকা মুখ ফিরিয়ে বিমানের দিকে ফিরে আর একটু হাসলো, বললো "তাই বুঝি—?" বিমান উত্তর দেবে কী? বিমানের চোখ আটকে গেছে মল্লিকার মুখের ওপর..... এই যদি মল্লিকা দেবী তবে এতদিন কাকে ও দেখলো? কিসের আবরণে এমন অপরূপ রূপ ঢেকে রেখেছিলেন .....? উত্তর না পেয়ে বিমানের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো মল্লিকা।—এ কেমন অদ্ভুত আশ্চর্য দৃষ্টি। ওর মনে হোলো বিমানের চোখের সবটুকু উৎকণ্ঠা ধীরে ধীরে ওর সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মাদানা শিহরণ অনুভব করলো মল্লিকা। যেন প্রচণ্ড কাকুনি দিয়ে ও নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিলো। বললো: একটু তির্যক হয়েই বললো—যাতে দুজনের কথারই

উত্তর দেওয়া যায়—"আচ্ছা, গান তা হলে করেই ফেলি তারপর যা হয় হবে—"মল্লিকা ধীরে ধীরে সেই পার্শিয়ান, কার্পেটের ওপর গিয়ে বসলো। সেখানে বাদ্যযন্ত্র ছিলো তিন রকম তানপুরা, সিটার ও হার্মোনিয়াম। সিটারের থলি খুলে সিটারটা বার করলে মল্লিকা। টুং-টাং করে একটু বেঁধতে লাগলো তারগুলো ঠিক বাঁধা আছে কি না। সিসিরেখা ভুরু কোঁচকালেন। ওঁর সামনে সিটারের কী দশা হবে, কে জানে? একেবারে সামনের রো-তে বসেছিলেন বর এবং বর যাত্রীরা। মল্লিকাকে দেখেই সোমেনের বন্ধুরা গলা বাড়িয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন "এই সোমেন! ইনি কে হয় রে তোর—?" কৌতুক কণ্ঠে সোমেন বললেন, "যার রে আমি জানবো কী করে? তোরা যেখানে আমিও সেখানে—"অদূরে বসেছিলো নীলু; সোমেন চোখদিয়ে ডাকলো। নীলু ব্যস্ত হয়ে উঠে এলো। মল্লিকাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে সোমেন জিগ্যেস করলো, "ইনি কে নীলুবাবু?" "আমার বোন মল্লিকা।" সোমেনের বন্ধু তাপস যে আবার পুনরাবৃত্তি করলেন"আপনার—বোন?" হাসিমুখিয়ে নীলু বললো"হ্যাঁ আমার বোন, পিসতুতো বোন," চুপচাপ রইলেন সকলে। কিন্তু নীলু সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাপস সোমেনের কাছের কাছে মুখ এনে ফুটে বললেন "যুকলি সোমেন।" অনেক পুণ্যি করলে এমন শ্যালিকা পাওয়া যায়।" আর —সোমেন চোখটিপে বন্ধুকে দিলে একটু ইশারা করে হেসে বললো "তোর পুণ্য সঞ্চয় যে আরো কিছু বেশী হ'য়েছে, তার প্রমাণের চেষ্টা করবো না কি রে তাপস।" তাপস হেসে ফেললেন, তারপরিয়ে বললেন "আপত্তি নেই।"

নতমুখে সিটারের তার বাঁধতে বাঁধতে ভাবছিলো মল্লিকা—কী গান ও গাইবে? বড়মামা পর পর কয়েকখানা গাইতে বলেছেন, ও ঠিক করে ফেললো —চণ্ডালিকার প্রথম দৃশ্যটা করবে। আরম্ভ হলো গান।

তারপর যেভাবটা যে কোথাদিয়ে অতীত হ'য়ে গেলো —তার খবর কেউ রাখলেন না। সমস্ত হলঘরটি একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। দামান্যতম ফিসফিসিয়েও কথা বলছে না কেউ। শুদ্ধ নিশ্বাসে ওর সঙ্গীত সবাই শুনে গেলেন। ওঁরা সত্যি সত্যি অনুভব করলেন, ওঁদের চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক চলে গেলো—ফুলওয়ালি, বইওয়ালি, চণ্ডালিকা ও তার ক্রূরমাতা এবং বুদ্ধমিশ্র আনন্দ। প্রত্যেকটি গানের বেলাই মনে হচ্ছিলো অবিকল সে নিজে যেন সামনে এসেছে। এই ফুলওয়ালি তার ডালাভারিয়ে নানা গন্ধবর্ণের ফুল দেখাচ্ছে, আবার এই তো দেখছি চুড়িওয়ালি সামনে.....বাঃ, বাঃ কী সুন্দর হরেক রকমের নানা রঙ বেরঙের চুড়িগুলো সোনালী ডালাভরিয়ে মোড়া চুড়িগুলো যেন ঝিকমিকিয়ে উঠলো। এইতো বিদায়ী সোয়ালিনী, তারি মধুর ঝিঁঝি ডাক শো—নই চাই গো—ও-ও .....। বই চাই। বই চা-য়া-ই-গো...তারপরই চণ্ডালিকার ক্রূরমাতার গঞ্জনা। আনমনা কন্যাকে বার বার ধিক্কারলেন। তারপর.....উনি কে? অমন অদ্ভুত করা কণ্ঠ। শুধু কণ্ঠস্বরেই সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। কে উনি? উনিই বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ। সবার চেয়ে মনের গভীরে দাগ কেটে বসলো চণ্ডালিকার, অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে—ধিক্কার ধিক্কার। চণ্ডালিকা অনুনয় করে, করুণকণ্ঠে ক্ষুধিতা মাতাকে ওকে জানাচ্ছে কাল নেই, কাল নেই মা, কাল নেই গো কান্নাকাটি—শেষমেশ বলে মায়াদেবী কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। এই ফাঁকে মিলি তার অন্তরের কথা কী শুনিয়ে দিচ্ছে যাকে? কিন্তু শেষের গানে প্রলেপ লাগিয়ে দিলো মিলি, দুঃখ শোক কিছু আর রইলোনা মায়াদেবীর মনে। সকলে বিমুগ্ধ

মনে কেবল ঝংকার দিচ্ছে—অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! আর গায়িকা—? যেরূপ পাওয়ার বালবের নিচে শ্বেতবসনা মল্লিকাকে আশ্চর্য্য এক স্বপ্নময় জগতের ভাস্কর প্রতিমা বলে মনে হচ্ছে। চক্ষু নিমীলিত, লাবণ্যের বন্যা মেখেছে সারা অঙ্গে..... সৌন্দর্য্যের যেন আর শেষ নেই। সুন্দর মসৃণ ললাটে অবাধ্য চূর্ণ কুন্তলের সমারোহ, শিথিল করবী থেকে বেলীফুলের মালা ঝুলে পড়েছে এদিক ওদিকে। মুখে অপরূপ সৌকুমার্য্যের সুষমা। এ রূপের যেন তুলনা হয় না। অরুণের পর্য্যন্ত মনে হলো ওর যে রোজ মিলিকে এতদিন দেখে এসেছে—এ সে নয়। মায়াদেবীর বুকের ভেতরটা আনন্দ-বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। সব একেবারে চুপ। শুধু হ'য়ে পলকহীন চোখে গান শুনছেন সকলে। বিমানের পাশের চেয়ারে বসেছিলো সন্ধ্যা। বিমানের তন্ময়ত ভাব লক্ষ্য করে সন্ধ্যার সরু সুর্মাটানা চোখ দুটো ক্রমশঃ কুটিল হয়ে উঠতে লাগলো। একটু ইতস্ততঃ করে বিমানের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে ফিস ফিস করে বললো, "জানেন বিমানবাবু! ওর দিদি এই গানে জন্য বেলেঙ্গারীর একদেশ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে—।" "আঃ! সন্ধ্যাদেবী! চুপ করুণ প্লিজ" উগ্র অসহিষ্ণু কণ্ঠে বিমানের। সন্ধ্যা নিতে গেলো আরপর। গান শেষ করে কোনদিকে না তাকিয়ে পাশের ঘরটা দিয়ে মল্লিকা ভেতরে চলে গেলো শ্রোতৃমণ্ডলী এতই মুগ্ধ যে করতালি দিতে পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন। যখন চমক ভাঙলো সকলের তখন সামনের আসন শূন্য। সোফেসের বড়দা এবং মেজদা সরলনারায়ণ বাবুর দুপাশে দুজন বসেছিলেন। বড়দা নৃপেন বহু অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, অপূর্ব্ব! এমনটি আর শুনিনি কোনদিন। মেজদা সৈলেন বসু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ওয়াণ্ডারফুল। গলার ওপর এমন অদ্ভুত কনট্রোল! লাখনউতে কথাকলি নৃত্যবিদ শম্ভু মহারাজের পায়ের ওপর কনট্রোল দেখে একবার অভিভূত হয়েছিলাম—আর হলাম আজ। নিজেই সিটার বাজিয়ে এমন গান করা—ভগবৎ দত্ত ক্ষমতা ছাড়া এমনটা সম্ভব হয় না।" সরলনারায়ণবাবু হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আনন্দে তাঁর মন পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কখন যে ওঁর বুকের সেই অসমল পাথরের ভারটা নেমে গেছে—তা উনি নিজেই টের পাননি। বহুদিন পর সরলনারায়ণবাবুর দেহ ও মন আশ্চর্য্য রকম হাল্কা মনে হতে লাগলো। (ক্রমশঃ)

এই ত সবুজ

অমলকুমার মিত্র

ঘুমিয়ে ছিলাম কুঁড়ির মাঝে
মুদিয়া নয়ন,
দেখেনি কেহ, তাই সে কথা
করেনি চয়ন।
ফুটিল কুঁড়ি, মেলিনু আঁখি
দেখিনু চাহি,

কতনা ভ্রমর ফিরিছে বনে
কি গান গাহি।
কহিনু মনে, 'আর কি আছে,
'এই ত সব'।
শুনিয়া বনে উঠিল ভারি হাসির রব।

মেলিয়া পাখা চাহিনু পুনঃ
দিগন্তরে,
আসিল কেহ, ডাকিল কেহ
নামটি ধরে।
কহিনু মনে, 'আর কি যা চাই,
'এই ত সব'।
শুনিয়া বনে উঠিল বড় হাসির রব।

ডাকিল আবার, 'খোল গো দুয়ার,
এনেছি ডালা'।
গাঁথি আপনার পরাইনু তার
বরণ মালা।
উঠিনু গাহি, 'যা কিছু চাহি
পেয়েছি সব'।
শুনিয়া বনে উঠিল ঘোর হাসির রব।

ফুরাল বেলা, আমিও গেলাম
ফুরায়ে ভাই।
যাবার বেলায় ডাকিয়া সবে
কহিনু, 'যাই'।
কহিনু আবার, 'আর কিছু নাই,
এইত সব'।
মুখর বনানী এবার দেখি হ'ল নীরব।

(৮২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী একজন অপরাধীর পেছনে খরচ করা দরকার করে না, সেদিক থেকে একজন সাধারণ শ্রমিকের চাইতে একজন বন্দীকে কাজে লাগালে রাষ্ট্রের পক্ষে অনেক বেশী "উদ্বৃত্ত" সঞ্চয় করা সম্ভব। সোভিয়েট অর্থনীতিতে পুঁজি-সংগঠনের (capital formation) যে দ্রুত হার গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, তার মূলে বাধ্যতামূলক শ্রমের অবদান সেদিক থেকে নিতান্ত অল্প নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করে এই আলোচনার পরিসমাপ্তি করা যাক।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক শ্রমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ প্রথা যে নিন্দনীয় তাও আমরা বলতে পারি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীতে কেবলমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলিই এই পাপ প্রথায় কলঙ্কিত নয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায় বাধ্যতামূলক শ্রমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইউনাইটেড নেশনস কমিটি নিশ্চিত হয়েছেন। এছাড়াও বেলজিয়ান কঙ্গো, বলিভিয়া এবং স্পেনে বিশেষ বিশেষ আইনের এমন ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে বাধ্যতামূলক শ্রম করতে মানুষকে বাধ্য করা যায়। আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের ভ্যাগ্রান্সি এ্যাক্ট, মালয়ের ইমার্জেন্সি রেগুলেশন এবং কেনিয়ার ডলাটারিলি আন্‌এমপ্লয়েড পার্সনস্ অর্ডিন্যান্সের ফলেও বাধ্যতামূলক শ্রম করতে মানুষকে বাধ্য করা চলে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাধ্যতা-মূলক শ্রম প্রথার নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিটি গণতন্ত্রপরায়ণ মানুষকে এই সমস্ত দেশেরও আইন বা প্রচলিত প্রথার সংশোধন দাবী করতে হবে। সেই সঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনভাবে নিজের প্রবনতা অনুযায়ী কাজ করার যে নীতির প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ বাধ্যতামূলক শ্রমের নিন্দা করা হয়, আইন ছাড়া অন্য আরও কতগুলি পরিস্থিতি সে নীতির হানি ঘটাতে পারে। দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পেরে বহু প্রতিভাশালী তরুণকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় এমন অনেক কাজে লেগে থাকতে হয় যা তার পক্ষে উপযুক্ত নয়। বেকারীর অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যও অনেক-কে বহু অনুপযুক্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। আইনের চোখে এ গুলি বাধ্যতামূলক শ্রম নয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না এ ধরণের সামাজিক গলদগুলি দূর হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর আরও বহু দেশে প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রচলিত আছে বলে ধরতে হবে।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

প্রবন্ধ

জীবন ও জীবিকা

মীরা দত্ত

'জীবিকা' কথাটি 'জীবন' থেকেই উদ্ভূত। জীবন-ধারণের জন্য কোন অর্থকরী বৃত্তি বা কাজকেই জীবিকা বলা হয়। অতএব শব্দগত অর্থের দিক দিয়ে দেখলে জীবন মুখ্য জীবিকাগৌণ।

জীবন বলতে সাধারণতঃ আমরা কী বুঝি? শুধু মাত্র দৈহিক দাবীগুলি পূরণ করে বংশ রক্ষা করে যাওয়া? কিন্তু তা যদি হোত তাহলে আমরা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বিশিষ্ট হলাম কী সে? বস্তুতঃ মানুষের বৈশিষ্ট্য হোলো যে জীবন ধারণের জন্য তার নিম্নতম চাহিদা শুধু মাত্র দৈহিক দাবীপূরণ ও বংশ রক্ষার ক্ষেত্রে আবদ্ধ নেই। আমাদের মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় আছে। তাই গুহা মানব কালক্রমে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। ভবিষ্যতে কতদূর যাবে বলা যায় না। বিবর্তনের গতি বড়ো বিচিত্র।

অর্থাৎ জীবন বলতে আমরা শুধু দৈহিক অর্থে জীবন ধারণ বুঝিনে, বুঝি এমন অনেক পার্থিব বস্তু জীবন ধারণের সঙ্গে যার সরাসরি সম্পর্ক নয়। তাছাড়াও বুঝি শিল্প, সংগীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন রাজনীতি। মোট কথা, জীবনধারণের জন্য শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদাগুলি মিটিয়ে আধুনিক মানব পরিতৃপ্ত নয়। তার চাহিদা ঐহিক পারত্রিক, সাংস্কৃতিক—এক কথায় সর্বব্যাপী।

তাই যদি হয় তবে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার ভূমিকা গৌণ হতে গৌণতর হওয়া উচিত। জীবিকার্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই—কিন্তু আমাদের জীবনটাকে আমরা অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কোঠা থেকে উর্ধে তুলতে পেরেছি বলেই না আমরা সভ্য। গুহামানবদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যথেষ্ট বিস্তৃত নয়। কিন্তু জীবিকার্জনের যে কয়েকটি পদ্ধতি ওদের জানা ছিল বলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি তার থেকে বোঝা যায় যে খাদ্য ও দেহাচ্ছাদন সংগ্রহ করতেই ওদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হোত। তা সত্ত্বেও অবশ্য গুহামানবরা অপূর্ব চিত্রকলার নিদর্শন রেখে গেছে। কিন্তু তবু ওদের জীবনযাত্রা বহুলাংশে জীবিকা-প্রধান ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তারপর ধীরে ধীরে মানবের ব্যবহারিক জ্ঞান বেড়েছে এবং খাদ্য ও বস্ত্র আহরণ করাটাও ক্রমশঃ কম সময় ও শ্রমসাপেক্ষ হয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ং-শাসিত মানব গোষ্ঠীর পরিবর্তে দেখা দিয়েছে নানা বিধিসংবলিত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা। ফলে একশ্রেণীর লোকের পক্ষে বিনা আয়াসেই জীবিকার্জন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবিস্মরণীয় সৃষ্টি রেখে গেছেন সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। প্রাচীন গ্রীক সমাজ-ব্যবস্থা দাসপ্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও সে সমাজের ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য বা দর্শনকে কী আমরা ভুলে যেতে পারবো কোনদিন?

কালক্রমে যন্ত্র আবিষ্কৃত হোল। দেখা গেল এতে শুধু মানবের শ্রম লাঘবই হবে না—ঐহিক সমৃদ্ধির চরম শিখরেও পৌঁছানো যাবে। কিন্তু যন্ত্রশক্তির সঙ্গে সঙ্গে এলো ধনিক সভ্যতা। ফলে এক শ্রেণীর লোকের

জীবিকার্জনেই জীবনের সবটুকু সময় ব্যয়িত হতে লাগলো। যদিও এর ফলে যারা বিনা আয়াসে জীবিকার্জন করতে পারতো তারা আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান সব কিছুকেই এগিয়ে নিয়ে চললো।

আজ অবশ্য খানিক সভ্যতার সেই অবিমিশ্র রূপটি আর দেখতে পাওয়া যায় না। তথাকথিত leisured class বর্তমানে যথেষ্টই সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। অধিকাংশ লোককেই আজ পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করতে হচ্ছে, কেউবা কায়িক শ্রম করছে, কেউবা মানসিক। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেছে সত্যি, কিন্তু আমাদের চাহিদাও এমনিভাবে বাড়িয়ে তুলেছে যে চাওয়া ও পাওয়ার ব্যবধান মেটাতে আমরা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছি। ফলে পুরুষ নারী সকলেই আজ জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে কঠিন প্রতিযোগীতায় নেমেছে।

একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে বর্তমানে আমাদের জীবনকে পিছনে ফেলে জীবিকা নিজে মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। অবশ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জীবিকা-সচেতন না হয়ে উপায় নেই—কেননা জীবিকার দ্বারাই সেখানে মানবের সামাজিক মূল্য (যার ওপর জীবনের মূল্যও অনেকটা নির্ভর করে) নির্ধারিত করা হয়। কিন্তু নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যেও আমরা যেন বহু পরিমাণে জীবিকা-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। জীবিকার প্রভাব আমাদের আচার আচরণে, চলনে বলনে সর্বত্র পরিস্ফুট। ফলে একজন শিক্ষক যদি দৈবক্রমে জন-কয়েক কেরানীর আড্ডায় গিয়ে পড়েন তবে কাইল আর বড়োসাহেবের কাহিনীর মধ্যে তাঁকে হাপিয়ে উঠতে হবে। আবার কোন কেরানীও নিশ্চয় কোন স্কুলের টিচার্স রুমে গেলে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না। আমাদের উৎসাহ, জ্ঞান, শিখবার ইচ্ছা সবকিছুই যেন জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আমাদের পেশাই শুধু আছে, নেশা নেই।

যদি আমাদের প্রত্যেকের জীবিকাই এমন হোত যে তাতে প্রত্যেকেরই আপন আপন বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি পূর্ণতা লাভ করতো, তাহলে হয়তো নিজ নিজ জীবিকার বাইরে চিত্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন হোত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই ভাগ্যে জোটে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজের অধিকাংশ কাজই এমন গতানুগতিক যে তাতে মানবচিত্তের সৃষ্টিধর্মী বৃত্তিগুলোর বিকাশ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ জীবনকে যদি সত্যিই জীবন হয়ে উঠতে হয় তবে আমাদের সৃষ্টিধর্মী বৃত্তিগুলোর বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয়—যাতে আমরা নিজে সৃষ্টি করতে না পারলেও অন্তত, অপরের সৃষ্টিকে উপভোগ করতে পারি। এখানে মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের বৈশিষ্ট্য যেসব বৃত্তিতে, সৃষ্টিধর্মী বৃত্তি তার অন্যতম। এ ছাড়াও বর্তমান সমাজের গতানুগতিক কাজে মানবচিত্তের কৌতূহল-বৃত্তি, জ্ঞান-পিপাসা এসব কিছুরই চরিতার্থ হবার সুযোগ নেই।

অনেকে হয়তো বলবেন যে এই সমাজব্যবস্থা বদলাতে হবে। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন শীঘ্র ঘটবে বলে মনে হয় না। পরিবর্তন যেটুকু হবে তা হবে শুধু যন্ত্রের অধিকতর ব্যবহারের দিকেই। মনে হয় জীবিকার্জনের জন্য আমাদের যে কাজ তা ক্রমশঃ আরো যান্ত্রিক আরো গতানুগতিক হতে থাকবে। কাজেই শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে এই সমস্যার সমাধান হবে না। বরঞ্চ তখন কিছুটা অবসর অনেকের ভাগ্যেই ঘটবে। তখন যদি আমরা শুধু নিজস্ব জীবিকার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকি তবে তো অচিরেই হাঁপিয়ে উঠবো। সময় কাটানোর সুস্থ পন্থা না পেলে হয়তো বিকৃতির দিকে ঝুঁকবো। এর ফল যে কী হতে পারে তার সূচনাতো এখনই দেখা যাচ্ছে।

এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে জীবিকার ক্ষেত্রের

বাইরে চির প্রশান্তি করা, পেশার বাইরে নেশা আবিষ্কার করা। এই নেশা কিন্তু শুধু তথাকথিত 'হবি' (hobby) নয়। 'হবি'র মতে আজকাল একটা চটকদার ভাব এসে পড়েছে। উঁচু হতে উঁচুতর 'হবি' হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ-বিজ্ঞাপনের মতো। কিন্তু এই নেশা শুধু 'নেশার জন্যই নেশা' নয়। জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্যই নেশা। এই পৃথিবীতে জানবার ও বোঝবার এতো অফুরন্ত বিষয় আছে, দেখবার মতো এতো জিনিষ আছে যে আমাদের অবসর মুহূর্তগুলো আনন্দে ভরিয়ে তুলতে কোনই কষ্ট হবে না। উপরন্তু সৃষ্টি করার প্রেরণাও ফুটবে এবং ফলে জীবনের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হবো। আর তা যদি আমরা হতে পারি তবে তো জীবনে ক্লান্তি বা boredom আসার কোন প্রশ্নই উঠবে না।

একটা উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটি। কবি সেখানে জলে স্থলে সর্বত্র বিচরণ করতে চেয়েছেন।—সকল প্রাণীর সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। এমনকি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—"বৈবাকে শাবলে ফুলে উঠি সরিষা।" কবির এই অনুভূতি আরো স্পষ্ট হয় J. B. S. "Haldane on Everything has a history পড়লে। বইটিতে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রাণীর উদ্ভব ও বিবর্তন আকাশের তারা নীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতির কথা এমন সহজ ও চমৎকার করে বলা হয়েছে যে বইটি পড়ে আকাশের তারা, থেকে শুরু করে মৌমাছি, পিপড়ে সব কিছুই এক নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। যেমন যেন আন্তরিকতা বোধ করে মানুষ সব-কিছুর সঙ্গে।

জীবিকা যদি আমাদের মনোযোগের সবটুকু কেড়ে না নেয়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে না রাখে, তবে জীবনের এই আনন্দ-গুলো হতে আমরা বঞ্চিত হবো না। কিন্তু তার আগে আমাদের জীবন ও জীবিকার সম্বন্ধটুকু বুঝে নিতে হবে—যেনে নিতে হবে যে জীবনের জন্যই জীবিকা। জীবিকার সঙ্গত অর্থও এই আদর্শকেই সূচিত করছে।

রস রচনা

অন্বেষণ

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য

হঠাৎ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই, দেখিলাম এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। মুখে দিব্য স্মিতহাস্য। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা। হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু।

বাবা হাসিয়া বলিলেন……বাছা বর চাই। আমি অগাধ জলে পড়িলাম। কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা চাই ভাবিয়া ঠিক করিলাম—না—আর এ দারিদ্র্য নয় …প্রাচুর্য্য চাই…

বলিলাম—প্রভু—

প্রভু বলিলেন—বল,

আমি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলাম—আর্থিক প্রাচুর্য্য……আর এ অর্থকষ্ট……

প্রভু কহিলেন…বল কি করিতে হইবে,

আমি অথৈ জলে পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম …… হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই মনে পড়িয়াছে——কাগজে দেখিয়াছিলাম উপরাষ্ট্রপতি পদটি খালি আছে।

হাত জোড় করিয়া কহিলাম—প্রভু, উ—উ—উ…প—প—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আমি একটু তোত্‌লা ছিলাম কখনও কখনও কথা জড়াইয়া যাইত।

প্রভুর মুখটি যেন কেমন ভারী ভারী মনে হইতে লাগিল। মন কেমন কেমন করিতে লাগিল। প্রভু ভুল বুঝিলেননা তো! "উপ" শব্দটি "উপপত্নি" শব্দের সহিত যুক্ত কিনা। প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নূতন করিয়া বর চাহিলাম।

হাত জোড় করিয়া কহিলাম, প্রভু, আমি অতি অভাজন, আমাকে…ম্যা…ম্যা…ম্যা…। দূর ছাই আবার কথা জড়াইয়া গেল। এবার প্রভুর যেন আরও মুখ ভার বলিয়া মনে হইল। আমি বলিতেছিলাম, "প্রভুহে আমাকে magnet করে দাও…।" কিন্তু কি দুর্বিপাক। কণ্ঠ জড়াইয়া গেল। ভাবিলাম প্রভু বোধ হয় ভুল বুঝিতে সুরু করিয়াছেন…তিনি বোধ হয় আমার অর্দ্ধস্ফুট ম্যা… ম্যা……উচ্চারণ হইতে মনে করিয়াছেন আমি কোন মহিলার প্রেমে পড়িয়া তাহার পাণিগ্রহণ……না, না, মহাপুরুষের ভুল শুধরাইতে হয়…এবার প্রবৃত্তিমূলক নয় নিবৃত্তিমূলক বর চাই। তাড়াতাড়ি কহিলাম—"প্রভু, আমাকে "মুক্তি" দিন।" এবার সব কটি কথা যেন ঝড়িং-বেগে বলিতে সক্ষম হইলাম।

কিছুদিন যাবৎ স্ত্রীর সহিত মন কষাকষি চলিতেছিল। আমি প্রেম করিয়া বিবাহ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম প্রেমের স্বর্গে বস্তু জগতের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু কিছুদিন যাইতে স্ত্রী যেরূপ সময়ে অসময়ে পাশের বাড়ীর গৃহিনীর বাড়ী, গাড়ী ও শাড়ীর সৌভাগ্যের কথা পাড়ে……

না—না…আর পারা যায় না। এরূপ স্ত্রী সর্বথা পরিত্যাজ্য। কিছুদিন যাবৎ কন্যা কিকির খুঁজিতেছিলাম। এরূপ অপূর্ব সুযোগ পাওয়ায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি হইলাম না।

আবার হাত জোড় করিয়া কহিলাম……

বাবা……মুক্তি।

বাবা একটু মুচকি হাসিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হঠাৎ কার কনুইয়ের ঠোক্কর খাইয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম আমি আমার স্ত্রীর কণ্ঠ গাঢ়তররূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি ……হাসফাস করিয়াও সে বাহুপাশ শিথিল করিতে পারিতেছেন না

স্বপ্নের বরের কথা মনে হইল…ছি। ছি। অবচেতন মনে এত ও…… ছগ্‌গা।—ছগ্‌গা।……

মাঝরাতে

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙিন-আশার টানে ছুটে ছুটে আপন খেয়ালে—
নারঙী-রোদের পিছে, কৃষকের হালের ফলায়,
গোরু-কেরা-ধুলো-ওড়া বাঁকাপথে ধূসর-বিকালে,
অবুঝ-দিবস-শিশু ক্লান্তদেহে নিশ্চিন্তে ঘুমায়
আঁধার-মায়ের কোলে। জোনাকিরা চারিপাশে ঘিরে
ঝিকমিক্ ক'রে জ্বলে মনে তার স্বপ্ন জাল বোনে।
স্তব্ধ-মৌন-মাঝ রাতে আকাশের নীল-আঁখি-নীরে
তারারা রূপালী রেখা আঁকে। বিছানার এককোণে
আছি বসে : ঘুম নেই : চিন্তার সমুদ্রে ওঠে ঝড় ;
অভাব-প্রেতের হাসি ভেঙে দেয় বুকের পাঁজর।

ঘড়ির কাঁটার মতো একটানা চলে ঝিঁ ঝিঁ ডেকে ;
ঘুমন্ত-প্রিয়ার মুখে নীল-স্বপ্ন-ছায়া খেলা করে।
সর্বব্যাপী-পেঁচা ডাকে আর্ত-কণ্ঠে কৃষ্ণ-গুহা থেকে ;
সময়ের ডিঙি বেয়ে চলে রাত প্রহরে প্রহরে।……

কস্তুরাভা

সরিৎ শর্মা

নতুন সংসার পেতেছে সদানন্দ। দুটি মানুষের সংসার, কিন্তু পোষ্য অনেক। একটা খোঁড়া ছাগল, একটা বাচ্চা কুকুর, ডানা ভাঙা একটা চন্দনা, মা মরা বেড়াল ছানা একটা, আর দুটো খরগোস। সদানন্দর বন্ধুতে শশিমুখী, আর বাকিগুলো সব শশিমুখীর।

পুষ্যিগুলোকে নিয়ে সে থাকে ভালো, তাই সদানন্দ ঘরটা পেয়েছে শশিকে তুলিয়ে রাখতে চেয়েছে তাই দিয়ে।

কিন্তু সদানন্দর অবাক হওয়ার পালা এলো। মেটে ঘরের চালে লতিয়ে ওঠা গাছটায় ফুমড়ো ফলেছিল একটা। সেটা নামাতে উঠেছিল সদানন্দ। ব্যস্ত হয়ে শশি ছুটে এসেছিল—আহা, করো কি, করো কি গায়েন। মায়ের কোল একেবারে খালি করতে আছে। আগে আর একটি যেটের কোলে আসুক।

কেমন থতমত খেয়ে অবাক চোখে শশির দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে নেমে এসেছিল সদানন্দ।

ব্যাপারটা এখানেই থামলো না। খোঁড়া ছাগলের পরিচর্যা হয়, বাচ্চা কুকুরটা শশির চোখের সামনে দুধের বাটি শেষ করে চুক চুক করে, চন্দনার ডানায় ওষুধ পড়ে বেড়াল ছানাটা ঘুমোয় শশির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, খরগোস দুটো শশির হাতের আদরে আরামে চোখ বোজে। উঠোনে ফুল ফোটে, কিন্তু নারায়ণের সেবায় লাগে না, তুলতে মানা। 'ওমা, সেকি কথা, এমন হাসিমাখা মুখ মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে আছে। ঠাকুরকে তো নয়, সাক্ষাৎ মা, সেই মায়ের কোল-আলো-করা ধন'—

—এ্যাই, এ্যাই দেখ গায়েন, চোখ এট্টু সরাবার জো নেই, মাচার লাউটা হালকা করেছিলে আর কি। পরের সন্তানে কি লোভ করতে আছে! সন্তান মানে সন্তান। বলতে বলতে চোখে জল আসে শশির।

জীবন মাছ আনলে বলে, জীব হিংসা করোনি গায়েন। জলের জীব জলে যাক্—পুকুরে ছেড়ে আসে মাছগুলো।

এমনি করে দুটো মানুষের সংসার চলে। সদানন্দ সবটা ঠিক বোঝে না, কিন্তু জানে শশির ব্যথাটা কোথায়। যেদিন সে তাকে ঘরে এনে তুলেছে। আর, মেনে নিয়েছে—'পশু পক্ষীর সেবা করতে হয়, ধরিত্রিদির সন্তান সব, গাছের ফল তুলোনি, গাছের ফল পেড়োনি—মা'রে ব্যথা পায়; জীব হিংসা কোরোনি।' লোকে শোনে না বলেই আকাশে মেঘ জমে, কান্না হয়ে ঝরে, ব্যথায় উথাল-পাথাল নদী, খাল, বিল, সুমুদ্দুর ভরে ওঠে, নৈলে এত জল কোথা থেকে আসে শুনি। সেত্যর না হয়—"

সদানন্দ সব মেনে নিয়েছে, শশি মানুষ চিনতে ভুল করেনি।

লোকে শশিকে বলেছে, কলংকিনী। সদানন্দ বলেছে, তাইতো, নইলে শশি আমার শশিমুখী হয় কি করে, ওই কলংকেরই কালি মেখে কালাচাঁদের বাহার খুলেছে চাঁদবদনি, তুই আমার রাধে!—শশি কিন্তু রাধে নয়। সদানন্দও জানে। সেই কথাই বলব।

শশিকে সদানন্দ জানতো অনেক আগে থেকে। বাগড়া-ঝোলের নিধু গায়েনের মা-মরা মেয়ে। এই শশি তখন

এতটুকু। সদানন্দও তখন একেবারে ছোকরা। গাওনা সুরু করেছে সবেমাত্র। দাশরথির পাচালিখানা নিয়ে ছুটো কথাবার্তা হচ্ছে নিধুর সঙ্গে। যাতায়াত ছিল—তাল-তাড়া থেকে খাসড়াঙোল। নিধু বলে যেত, একদিন শিশু গোপাল ধুলোমাটী অঙ্গে মেখে খেলা করছেন, করতে করতে একটা মাটির ঢেলা কেমন করে মুখে পুরে ফেলেছেন, যে-ই ঢেলা অমনি গলায় গেল আটকে—বলেই একটু থেমে দম নেয় নিধু। বিস্ফারিত চোখে সদানন্দ জিজ্ঞেস করে, তারপর।

—তারপর, হী হুঁ। করে ছুটে এলেন মা যশোদা, হাতের তর্জনী বাকিয়ে টেনে বের করে আনলেন ঢেলা গোপালের গলার ভেতর থেকে।

নিধু ব্যাখ্যা করেছিল, আহা, কি সোন্দর; হক ঠাকুর বলছেন—ছিস্টি কিরূপ! না—'বড়শী বিঁধেছে যেন চাঁদে'।

সেই প্রথম পাঠের যুগে শশিকে দেখেছিল সদানন্দ। শশি অবাক হয়ে তাকিয়ে সব শুনতো। সদা গায়েনের গলায় কি যেন ছিল, শশি বুঝত না।

তারপর কবে মরে গেছে নিধু গায়েন; গাছের ছিঁড়া কতবার মাটিতে নামলো, কতবার উঠলো মিত্তিকে ছেড়ে। গাঙের ঘাটে কত ঢেউ বয়ে গেল। শশিকে মনে পড়েনি সদানন্দর। পড়বে কি করে, শশি তো তখন এতটুকু।

কথাটা হাওয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। নইলে এতদূরে সদানন্দর কানে এসে পৌঁছতো না। সদানন্দ তখন তালডাঙার বাসা তুলে হাটখোলায় এসেছে। চেলার সংখ্যা বড় কম নয়, গাওনা বাজনা লেগেই আছে। নাম-ডাক খুব। এক ডাকে শালুকের মিত্তিরবাবুরা পর্যন্ত তিন দিনের "ব্যায়না" করেছিল। বনেও ফুল ফুটলে তার গন্ধ ছোটে, মানুষকে আকর্ষণ করে। ঠিক সেই সময় সদানন্দও কথাটা শুনলো।

যেদিন শুনলো, সেইদিন রাতেই শশি এলো তার হাটখোলার বাড়িতে। রাত তখন অনেক। আগর খুলে উঠোন পেরিয়ে একেবারে ভেতরে এসে হাজির। সদানন্দ দাওয়ায় বসেছিল; একটা উঁচু কিছুর ওপর লণ্ঠনটা জ্বালানো ছিল; সামনে ছোট্টো একটা জলচৌকির ওপর ছুঁচার খানা পুঁথি। দাশরথির পাচালিখানা খুলে বসেছিল সে। পরের দিন কোথাও পালা গাইতে যাবে।

—আমি এইটি গায়েন।

নির্জন রাত্রির মস্ত স্তব্ধতা কাঁচের মত খান খান হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। নিকষ কালো আকাশের বুকে নক্ষত্রগুলো দপ দপ করে উঠল রক্তের শিখার মত, বোবা হাওয়ায় ঝিঁঝির ঘরর ঘর সেল থেমে। কালো চুলের অরণ্যে আকাশ ঢেকে গেল, নিশ্বাসের নিবিড়তায় নিমেষে থেমে উঠলো সদানন্দ।

—কে?

—কলঙ্কিনী।

আর একবার শুধু চমকালো সদানন্দ।

শশিমুখী এত বড় হয়েছে! নদীতে জোয়ার এসেছে, উপচে পড়ছে তার কোলে কোলে। শশিমুখী কাঁদছে। চাপা কান্না।

সদানন্দর চোখের সামনে নিধু গায়েনের বাড়ির দাওয়ার ছবিটা ভেসে উঠলো। গায়েনের কাছে প্রথম পাঠ নিচ্ছে সদানন্দ, আর একটা ছোট্টো মেয়ে ছোট্টো ঘুরে শাড়িতে গাছ-কোমর বেঁধে ছোটাছুটি করত, কখনো পুতুল নিয়ে গোপাল-গোপাল খেলত। ঘাসের বনে পিপড়ের সার দেখলে গোটের কল্পনা করে গোপালকে বলত—'আমার পশুতি লাগে, না যাইও যেহুর আছে, পরাণের পরাণ

নালমণি'। বলে কাঁদত, তখন 'এই এতটুকু। তারপর কী আশ্চর্য পরিণত গাম্ভীর্য আর ধৈর্যে ধীরে ধীরে এসে বসে শুনত তাদের আলোচনা।

চকিতে আরো একটা কথা মনে হল সদানন্দর। সেই শশি এত বড়টা হল কবে সে সঠিক জানে না, কিন্তু এই শশিকে যেন সে দেখেছে, কতবার দেখেছে, বোধ হয় তার পালাগানের আসরে—আচ্ছা, দত্তবাড়ির আসরে সেবার এই মেয়েটাই কি যশোদার দুঃখে বুক ফাটিয়ে-ছিল—

—সবই তো শুনেচ গায়েন।

নৈঃশব্দ সমর্থন করল তার কথা।

—ওরা মেয়ে কেনতে চেয়েছে, আমি পালিয়ে এসেচি গায়েন!

—কাকে! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত প্রায় চিৎকার করে উঠল সদানন্দ।

তারপর মুখ তুলে চেয়ে দেখল, শশি শুধু একা নয় তার নিঃশ্বাসে যেন আরো একটি নিঃশ্বাস ঘনীভূত হয়ে আছে। স্থবিরের মত বসে রইল সদানন্দ। মনে পড়ল—শশির একটি কাহিনী আছে।

নিমু মারা যাওয়ার পর শশির আর কেউ ছিল না জিসংসারে। বাগড়াঘোলের দত্তবাবুদের বাগানে ছিল ওদের বাড়ি। শেষে দত্তবাবুই ও-বাড়ির ছেলে রাখার কাজে বহাল করেছিলেন শশিকে। ওখানেই শশি বড় হতে থাকে। কিন্তু ক্রমে ওখানে থাকা আর তার অসম্ভব হয়ে ওঠে। ছোটবাবুর ইতরামি যখন চরমে ওঠে ওঠে তখন একদিন সে সোজাসুজি কথাটা বলে দেয় দত্তবাবুকে। ফলে শশির আর উঠে গেল ও-বাড়ি থেকে। আর সেই রাতেই বাগানে এসে ছোট বাবু অতর্কিতে তার ঘরে ঢুকে পড়ে—

—গায়েন, আমার গান কোথায় বলো! সবাই যেন করে, ছিঁচা দাড়ায় না; আর ভিক্ষেও যেবে না বলেছে লোকে। এখন কি আমার একার—থেমে গেল শশি।

সদানন্দ কি উত্তর দেবে! এত শোক থাকতে শশি তার কাছেই বা এলো কেন! সে মুখ তুলে দেখল দুটি চোখের প্রশ্ন এক আকাশ নক্ষত্র হয়ে দপ্ দপ্ করছে অসহ্যের বুকে।

—দত্ত গিন্নী অনেকবার বলেচে, শশি, নষ্ট করে ফেল—ওষুধ দিচ্চি, নৈলে থাকতে দেব না বাগানে। দিন-মানে বেরুই না, যেতে ভিক্ষে করি, তাও 'দেবে না। পাখিনি, পাখিনি গায়েন, দত্তপুকুরে অথৈ জল, নামলাম, কিন্তুক পেটের মধ্যে নড়ে উঠল যে!

প্রায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল সদানন্দ। মুখোমুখি দাঁড়ালো শশিমুখীর। হাতখানা বাড়িয়ে দিতে গেল শশি-মুখীকে। পৃথিবী উন্মুখ, চাপা কান্নার গুমরে উঠল বাতাস, অন্ধকারে শিহরণ—চকিত তীব্রস্বরে ডেকে উঠল রাত-নিশানী পাখি।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সদানন্দ।

—বড় ভয় করে গায়েন, বড় ভয়! আরো নিবিড় হয়ে এলো শশি। সেই ঘনীভূত নিঃশ্বাস।

—বাবা বলত, সংসারে যে কটা মনিষ্যি আছে, সবা তাদেরই মধ্যে! তুমিও কি ঘেন্না পাচ্ছ গায়েন!

সদানন্দ শিউরে উঠল।

—বাবা বলত, মিত্তিকে তো মা! পশু-পক্ষি-মনিষ্যি—সব তার সন্তান! মৈলে ফুল নি কেন, ফল নি কেন, তাকে সেরাদ্দি করি কেন—

—শশি!

এই প্রথম কথা কইল সদানন্দ। তারপর চেয়ে চেয়ে দেখল—এপাশে ওপাশে ঘুমোচ্ছে মানুষ, ঘুমন্ত সংসার; কাল সকালে আবার জাগবে সব। তার আগে এই আলো আঁধারের কাকটুয়ুতে যদি কেউ কারো হাত ধরে

বেরিয়ে পড়ে—মাথার নিচে আকাশ, পায়ে পায়ে মাটি, তাহলে কি হয়, কি হতে পারে।

কিন্তু শশি তখন চলে গেছে।

আর একটি দিন।

ভরবাড়ির উঠোনে লোক গিজ গিজ করছে। ভিড় কি। উঠোন ছাড়িয়ে বারান্দা, বারান্দা ছাড়িয়ে দোতলার বারান্দা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। কেউ আর বাদ নেই। দোতলার ছাদ ছুঁয়ে প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। ধূপ, ধুনোর গন্ধে চারিদিক ভরপুর। হাজাক জ্বলছে এখানে-ওখানে। তার তীব্রতাটা নারকেল বাগানের মাথায় গিয়ে ছুলছে। ভিড়, কিন্তু নিঃশব্দ। একটা চাপা বেদনায় থমথম করছে চতুর্দিক। সদানন্দ গাইছে, বাল্যলীলা। বাবুদের ফরমাস, এবারেও গাইতে হবে সেই বাল্যলীলা।

আমার শপতি লাগে না যাইও বেহুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।—নীলমণি-ই-ই…

টান দিয়ে দিয়ে পাঁজরে গিয়ে বিঁধে দিচ্ছে মর্মান্তিক বেদনার শেল। বাৎসল্য রসের ধারায় স্নান করছে মানুষের মন, মানুষের কণ্ঠে মানুষী মায়ের বেদনা কি সকরুণ মিনতিতে ঝরে ঝরে পড়ছে—

শ্রীদাম সুদাম দাস বন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে
বন বড় অতিদূরে নব-তৃণ-সুকাতর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥

—কাঁটা যদি ফোটে, ওরে, তোদের পায়ে ছুটুক, গোপালকে মাঝে রেখে তোরা আগে পাছে যা, আমার গোপালের রাঙা পায়ে যেন কোটে না। কিন্তু মন প্রবোধ মানে কই।

হঠাৎ গোটা-আসরটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে একটা কান্নার রোল উঠল—ওগো, আমার ছেলে কোথায় গেল গো, এই যে এখানে ছিল…

আর শোনা গেল না। কান্না চিৎকার, হৈ-হৈ হল্লা, নিন্দা গালি আক্ষেপের একটা মিশ্র আবেগের অসাড় উৎকট লাপাঝাপিতে সমস্ত বাড়িখানা পাগল হয়ে উঠল। কার ছেলে চুরি গেছে। ছদিনে নাকি পরপর এ-ঘটনা ঘটে গেছে। দোতলার বারান্দা থেকে হাত পা আর নখতক মুখ নেড়ে ছোটোগিন্নী কি যেন চিৎকার করে বললেন তার কেশটুকু কানে এলো সদানন্দর—মুখপুড়ি, বেহায়া মাগীর.. চল দেখ, পেটেরটা খুইয়ে আবার এসেছেন…

গান অনেকক্ষণ থামিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সদানন্দ।

দোতালার বারান্দার পেছে ঘরের সঙ্গে লাগোয়া অন্ধকার ছাদের কোণে এক ভেলা ভিড় জমাট বেঁধে গেছে। দেখতে দেখতে দু-একটা হ্যারিকেন এসে পড়ল। তার অস্পষ্ট আলোয় সকলে দেখল শশি—মাটিতে বসে থরথর করে কাঁপছে, আর চোখের জলে উন্মাদের মত তাকিয়ে আছে সকলের দিকে। দুই হাতে আঁকড়ে বুকের কাছে চেপে ধরেছে একটি শিশুকে। শিশু নয়, একটি ফুটন্ত কলি। পলকে সন্তর্পিণী ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিলেন তার কোল থেকে।

—ওগো নিওনি, আমি এখুনি দিয়ে আসচি, আর একটু দাও—ধরা কর…সকলের পায়ে ধরতে থাকে সে।

—খুব হয়েচে, ছাকা মাগী, কাল ছুটো মা-কে এমনি করে কাঁদিয়েছিলি, মনে নেই। বেরো—বেরো, আপদ চুকলো কোথ্ দিয়ে। কলঙ্কিনী এখন গানখানা মাটি করে দিলে গা।

—শশি

যেন চাবুক খেলো সমস্ত ভিড়টা। আবছা আলোয় ছাদের ঘরদোর দাঁড়িয়ে আছে সদানন্দ। সদা গায়েন। সমস্ত চোখ একসঙ্গে গিয়ে পড়ল সদানন্দর ওপর। সদানন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে—কোন দুর্লভ বাৎসল্যের ভাবাবেশে শশি আজ লাজ-লজ্জাহীনা, ফোটায়

কৌটায় সেই অমৃতের শুভ্র বিন্দু ঝরছে সংসারের মলিন মাটিতে!

—উঠে আয়, শশি, ঘরে চল।

শশি একবার চেয়ে দেখল সদানন্দকে। তারপর কেমন কঠিন হয়ে নিল আস্তে আস্তে। তারপর কী আশ্চর্য স্বাভাবিক হয়ে উঠল একটি মুহূর্ত। একহাতে সদানন্দর বাড়িয়ে-দেওয়া হাতখানা ধরে, আর একহাতে মাটিতে ভর করে উঠে দাঁড়াল শশি।

আর এই চিরকালের আকাশ আর নক্ষত্র দেখল, ফুল ফুল কোলে নিয়ে ক্লান্তের পৃথিবী দেখল—এই দুটি নর নারী নিঃশব্দ পায়ে অন্ধ রাত্রি পার হয়ে এগিয়ে চল অন্ধ এক পাতালপুরীর আদরে, অন্ধ এক কথকতার ইতিক বধে, 'পশু-পক্ষি-মনিষ্যি'র নতুন সংসারে।

শ্মশানবন্ধু

বিজনকুমার ঘোষ

উত্তী নদীর কূলে
যাকে পুড়িয়ে এলাম
নদীর স্রোতে
ভাসিয়ে দিলাম।
হায়রে!
তার স্মৃতিটাকে এভাবে পুড়িয়ে পুড়িয়ে
মনের নদীতে
ভাসিয়ে দিতে পারি না।

দুপুর বেলায় নির্জন
সাঁওতাল পরগণার এই নির্জন পত্র মর্মরে
সে যেন উদাস হয়ে বলে:
আর ফিরবো না কোন দিন—
চিরদিন নদী বন পাহাড়ে
অজস্র পাখিরা জেগে উঠবে,
ডেকে ডেকে ক্লান্ত হবে, শ্রান্ত হবে,
তারপরে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়বে—

যেন ভুল করে পৃথিবীতে এসেছিল
ভুল ভেঙে ফিরে গেল।

(৬৮ পৃষ্ঠার পরোপর)

পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যত কম করা যায় তত্তই ভাল। এই অবস্থায় হারণত শিক্ষককে অবসরদান বেকার বাড়িয়ে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পর্ষদ কি মহৎব্রত উদ্‌যাপন করছেন সে তথ্য উদ্‌ঘাটন করা আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁদের এই অপ-সিদ্ধান্ত শিক্ষক্ষেত্রে আর এক সংকটের অধ্যায় যোজনা করে শিক্ষার মান অবনমিত করবে এবং নূতন করে বিক্ষোভের দাবানল জ্বালিয়ে সরকারের চরম অপদার্থতার চূড়ান্ত পরিচয় দেবে। আশাকরি বিলম্বে হলেও, শিক্ষক বিদায়ের সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে পর্ষদ সুবুদ্ধির পরিচয় দেবেন।

সিংহলে ভাষার লড়াই

সিংহলে তামিলভাষীদের সঙ্গে সিংহলী ভাষীদের দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিণত হয়েছে। সিংহলে তামিলভাষী নাগরিকের সংখ্যা নয় লক্ষের কিছু বেশী এবং সিংহলীভাষীদের সংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ! তাছাড়া সিংহলে প্রায় দশ লক্ষ ভারতীয়ের বাস। এদের বিতাড়নের জন্য সেনানায়ক সরকার থেকে শুরু করে বন্দরনায়ক সরকারপর্যন্ত কমবেশী একটানা চেষ্টা চলেছে। এই ভারতীয়রা অধিকাংশই তামিলভাষী। সিংহলী ভাষীদের এই মনোভাব, সিংহলের রাষ্ট্রভাষার পংক্তি থেকে তামিলভাষাকেই বিতাড়িত করে একমাত্র সিংহলী ভাষাকে সেই পংক্তিতে স্থান দিয়েছে। এই ভাষাগত বিদ্বেষ তামিলভাষীদের উপর পক্ষপুলভ নির্যাতনে প্ররোচিত করে হত্যা, লুঠতরাজ ও ব্যাপক মারা-মারামারি সৃষ্টি করেছে, যার ফলে এই সংঘাতে তামিলভাষীরা অধিকতর অত্যাচারিত হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তামিলভাষীরা অত্যাচার ও লাঞ্ছনার ভয়ে-প্রকাশ্যে তামিলভাষায় বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা মানুষকে যেভাবে বর্বর করে তুলেছিল, ভাষাগত বিদ্বেষও যে বিংশ শতাব্দীর মেরুদণ্ডে আবার সে-রকম বর্বর করে তুলতে পারে তা সিংহলের ঘটনায় সুস্পষ্ট হোল। অথচ, মজা এই যে সিংহলী ও তামিল ভাষা উভয়েরই—মূল সংস্কৃত এবং অনেকের মতে সিংহলী ভাষার উৎস তামিল ভাষা থেকে। ইতিমধ্যে কলম্বো ও আশপাশ থেকে তামিলভাষী ও সিংহলীভাষী মানুষের বিপর্যস্ত জনতাকে গাদী মালগাড়ীতে করে অতি গোপনতার সহিত স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রকাশ ২১০০ সিংহলী ও ১০০০০ তামিলভাষীদের এভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যথাক্রমে সিংহলী সংখ্যাগরিষ্ঠ ও তামিলী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে। রক্তের প্রাধান্যবোধ, সভ্যতার প্রাধান্যবোধ, অদেশের প্রাধান্যবোধ কিম্বা ভাষার প্রাধান্যবোধ বিজেতা মূলত ঔষধ বহন করে আনে এবং পরিণতিতে সর্বনাশা সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা জেকে আনে। সিংহলেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আশা করা গিয়েছিল বামপন্থী বন্দরনায়ক সরকার এই মানসিকতার ঊর্ধে উঠে ভারত-সিংহল সম্পর্কের মধ্যে উদারতর ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। সে-আশা নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ট্রাম ও বাসের ভাড়া বৃদ্ধি

ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধি কমিশনের রিপোর্টে ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। বাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমিশন বলেছেন যে ঘাটতি পূরণের জন্য ভাড়া বৃদ্ধি অনিবার্য। ঘাটতির কারণগুলি বিবৃত করতে গিয়ে কমিশনের অপচয়ের উল্লেখ না করে কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি কয়েকটি অযুহাতের কারণ উল্লেখ করে ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব সহনীয় ও গ্রহণীয় করবার চেষ্টা করেছেন। কমিশন বলেছেন "রাজ্য পরিবহনের কর্মচারীদের প্রাপ্য বেতন,

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অপরাপর সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের অনুপাতে কম বলিয়া এবং বর্তমানে ইহার মান সমপর্যায়ে উন্নীত করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে যে, রাজ্য পরিবহনের কর্মচারীদের স্বার্থে, অধিক হারে মাগ্‌গি ভাতা প্রদান, বেতনের নিয়মিত হার প্রবর্তন প্রভৃতির জন্য নূতন করেকটি খাতে ব্যয়বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। এ-বিষয়ে সকলেই একমত হইবেন যে কর্মীদের মনে অধিকতর সন্তুষ্টি সৃষ্টির জন্য রাজ্য পরিবহনের বহুসংখ্যক কর্মচারীর চাকুরিতে এই সব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। যাহার উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ নাই এরূপকতকগুলি কারণেও বেশ কিছুটা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, উদাহরণস্বরূপ জ্বালানী, অতিরিক্ত পার্টস প্রভৃতি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কথা বলা যায়। সুদখাতে ব্যয়বৃদ্ধির কারণ হইল (১) ভারত সরকারকে প্রদেয় কিস্তি এবং (২) পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে প্রদেয় অতিরিক্ত সুদ।" তাহাড়া স্থীতহারে ডিপ্রিসিয়েশনও অন্যতম কারণ। কমিশন কর্মচারীদের বেতন-বৃদ্ধির ব্যয়ের অঙ্ক সামনে তুলে ধরতে যতটা তৎপর হয়েছেন, ব্যয়ের মাত্রা বিশ্লেষণের দিকে সেরকম ঝোঁক দেখালে অনেক অপচয়ের রন্ধ্রপথ আবিষ্কার করে ঘাটতির ঘরে সূক্ষ্ম চেনে বাড়তির অঙ্ক বৃদ্ধি করতে পারতেন। সে-অবস্থায় পেট্রল, ডিজেল, বাড়তি পার্টস, টায়ার ও টিউবের খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও ডিপ্রিসিয়েশনের মাত্রা-বিধি সম্পর্কে কমিশনের উদার মনোভাব জনসাধারণের ঘাড়ে ভাড়া-বৃদ্ধি দুর্ভোগ চাপিয়ে দিতে সহায়তা করেছে। অপরপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিভাগে যে ঘাটতির অনুমান করা হয়েছে, সেই অনুমান তত্ত্ব-নির্ভর কিনা সে-সম্পর্কেও আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়।

ট্রাম সম্পর্কে কমিশনের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক দাশগুপ্ত যা বলেছেন ট্রামে ভাড়া-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এর চাইতে কোনো জোরালো যুক্তির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক দাশগুপ্ত বলেছেন "……কমিশন উল্লেখ করেন যে রিনিউয়াল ও রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভে প্রচুর টাকা পড়িয়া আছে—যাহা তাহারা কাজে লাগাইতে পারেন। উত্তরে কোম্পানী জানান যে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ তহবিল পাওয়া যাইতেছে না।……কোম্পানী নগদ তহবিলের অবস্থা যত খারাপ বলিয়া বুঝাইতে চাহিতেছেন উহা তত খারাপ বলিয়া আমরা মনে করি না। যাহা হউক তদন্তের ফলে আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি যে এই তহবিলের অধিকাংশই লণ্ডনে, এবং সেখানে আমানত করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ টাকাটা পাওয়া যায় নাই। এই তথ্যের দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে ট্রাম কোম্পানীর সম্পত্তি ও টাকাপয়সা যথাযথ ভাবের কণাবেক্ষণের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইলে এই তহবিলে অবশ্যি ৩৫১·৩২ পাউণ্ড (প্রায় অর্ধকোটি টাকা) কয়েক বৎসর পূর্বেই ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত ছিল। ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, এই তহবিলের একটা বড় অংশ আজও জমা রহিয়াছে অথচ ট্রামলাইন ও গাড়ীগুলি মেরামত না করিয়া শোচনীয় অবস্থায় রাখা হইয়াছে। এই অবস্থায় কোম্পানীর তরফে এই যুক্তি শোভা পায় না যে বৎসরে আরও ২৪ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা না হইলে তাহারা পুরাণো গাড়ী ও লাইন তাড়াতাড়ি বদল বা মেরামত করিতে পারিবে না……।"

অধ্যাপক দাশগুপ্তের ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উপর্যুক্ত তথ্য-ভিত্তিক তীব্র সমালোচনার পর আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৭।৩।৫৮

পাখিটা

প্রীতিভূষণ চাকী

নির্জন পুকুর ঘাট
জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে সেই বউ,
কখন আসিবে প্রবাসের পাখিটা—
বাঁশ ডালে দোল খাবে,
আর ডাকবে :
খো—কা হো—ক্।

বেলা গড়িয়ে আসে,
জলে বীজগুড়ি কাটে,
পচা পাতার লাফায় ছোট্ট ব্যাঙ :
পিটুলি গাছের গোড়ায় মাকড়সা জাল বোনে।

বাসন মাজা কখন শেষ হয়ে যায়,
আনমনে জল বুলায়
আর ভাবে সে—
আজ আর তবে পাখিটা এলো না।

বিশ্লেষণ

ক্যাসিজমের অভ্যুত্থান ?

চতুর্থ ফরাসী রিপাবলিকের পঞ্চবিংশতিতম মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। চতুর্থ রিপাবলিক পত্তন হবার বার বছরের মধ্যে আরও ২৫ বার মন্ত্রীসভার পতন হয়েছে। কিন্তু এবারকার মন্ত্রিসভা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদের গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল উৎসাদিত হোলো কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত যে যেরূপ বছর অতিক্রান্ত হয় তার মধ্যে করেকবার বিপ্লব হয়েছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চতুর্থ রিপাবলিকের পত্তন হয়। তৃতীয় রিপাব্লিক বেঁচে ছিল প্রায় ৬৭ বছর এবং এর মধ্যে প্রায় একশটি মন্ত্রিসভার পতন হয়। গণতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য স্থিতিশীল ভিত্তিভূমি, যার উপর দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র শক্তি সঞ্চয় করবে এবং জাতির মধ্যে সে-শক্তি সঞ্চারিত করে নবজাগরণের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। কিন্তু ফরাসীদেশে তা ঘটা সম্ভব হয় নি। কারণ, সেখানে গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি খুব সঙ্কীর্ণ. এক-একটি মন্ত্রিসভার আয়ুকাল অনধিক মাত্র ছয় মাস।

এই অবস্থায় গত বার বছর ধাবৎ ফ্রান্স রক্তাক্ত ঔপনিবেশিক সংগ্রামে নিজেকে রিক্ত করে ফেলেছে এবং কেবলমাত্র মার্কিণী সাহায্যের উপর ভর করে তার আর্থিক ও সামরিক বনিয়াদকে বজায় রেখেছে। এই ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বনিয়াদকে ভর করে বার বছরের অবিচ্ছিন্ন সামরিক সংঘাতের পরিণতিতে যা হওয়া উচিত তাই ঘটেছে, রাজনৈতিক দলগুলি যে পরিমাণে দুর্বল হয়েছে, সামরিক নেতারা সেই পরিমাণে শক্তিশালী হয়েছেন। ফ্রান্সের রাডিক্যাল প্রধানমন্ত্রী মেঁদে, ফ্রান্স-যিনি ইন্দোচীনের দিয়েন-বিয়েন-ফুতে ফরাসী বাহিনীকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন ইন্দো-চীনে শান্তি এনে এবং যিনি তিউনিসিয়াকে হোমরুল দিয়েছিলেন, সেই মেঁদে-ফ্রান্স এলজিরিয়ায় ব্যর্থ হন। শুধু যে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়; মেঁদে-ফ্রান্সের দেশপ্রেমকেও কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ফরাসী সৈন্যরা আরবদের উপর জঘন্যতম অত্যাচার করেও ঔপনিবেশিক বাদীদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে এবং খাস ফ্রান্সে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে যে-সব পত্র-পত্রিকা, তাদের জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আলজিরিয়াকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সে ক্যাসিজম-এর সূত্রপাত ধীরে ধীরে দেখা দেয়।

ফ্রান্সের চতুর্বিংশ প্রধানমন্ত্রী গেলার্ডের মন্ত্রীসভা পতনের পর ফরাসী রাজনীতিতে ঔপনিবেশবাদ চূড়ান্ত ভাবে জয়ী হয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিল। ইতিপূর্বে তিউনিসিয়ার সাকিয়েট গ্রামের উপর বোমা ফেলে ফ্রান্স অকল্পনীয় বর্বরতার পরিচয় দেয়। তিউনিসিয়ার সঙ্গে এই নূতন বিরোধ সৃষ্টি করে এবং আলজেরিয়ার চার-বৎসর ব্যাপী অত্যাচারের ফলে ফ্রান্স গোটা উত্তর-আফ্রিকাকে পশ্চিম-বিরোধী করে তোলে। আমেরিকা ও ব্রিটেনে এই অবস্থা উদ্বেগ সৃষ্টি করবে, এটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকায় মার্কিণ ঘাঁটির অবস্থান অসম্ভব হবে যদি উত্তর-আফ্রিকা ফ্রান্সের অনুদারতার ফলে পশ্চিমী-গোষ্ঠীর বিরোধী হয়ে পড়ে। গেলার্ড মন্ত্রীসভার আমলে উত্তর-আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক- সামরিক সংগ্রামের নীতি সংযত করতে মার্কিণী তাই হস্তক্ষেপ কিছুটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল।

ফ্রান্সের এই যুদ্ধবাজদের এবং উগ্রমান ক্যাসিস্টদের শক্তির উৎস কোথায়? ১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজিরিয়া দখল করলেও ১৮৭১-এর পূর্বে সেখানে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ভিত্তিভূমি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই। ১৮৭১-এর পর দলে দলে ফরাসীরা আলজিরিয়ায় বসবাস করতে আরম্ভ করে। এরাই আলজিরিয়ার কোলন'স। যাদের কথা আমরা সংবাদপত্রে পড়ে থাকি। এদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দশলক্ষ। আলজিরিয়াকে এরা মাতৃভূমি বলে মনে করে এবং আরবদের হাতে সে-দেশ ছেড়ে দিতে কিছুতেই এরা প্রস্তুত নয়। খাস ফ্রান্সের সহিত আলজিরিয়ার সংযুক্তি এদের দাবী। পূর্বাপর যে সব ফরাসী সরকার আলজিরিয়াতে উদারনীতি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছে, সেই চেষ্টা এই কোলনদের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে। গত বার বছর যাবৎ ক্রমাগত ঔপনিবেশিক যুদ্ধের ফলে এবং গত চার বৎসর যাবৎ আলজিরিয়াতে যুদ্ধের ফলে একদিকে ফ্রান্স সর্বস্বান্ত হয়েছে, আর একদিকে কোলনদের সঙ্গে সামরিক শক্তির জোট আলজিরিয়াতে দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে, যার ঢেউ খাস ফ্রান্সে পৌঁছে সেখানে ফ্যাসিজমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই পটভূমিকায় আলজিরিয়ার সমস্যার সমাধানে মেঁদে-ফ্রান্স ব্যর্থ হবেন ও তাঁর মন্ত্রীসভার পতন হবে, এমন কি গেলার্ডকেও বিদায় নিতে হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সামরিক অভ্যুত্থানের পশ্চাতে একটা বড় অর্থনৈতিক চাপও ঔপনিবেশবাদীদের সহায়তা করছে। ফ্রান্সের শিল্পজাত উৎপাদনের রপ্তানীর এক-তৃতীয়াংশ এই উপনিবেশগুলিতে যায়। এদের মধ্যে আবার বস্ত্রশিল্পের, খাদ্য-শিল্পের এবং খনিজ শিল্পের উৎপাদনের বহুলাংশ উপনিবেশগুলিতে রপ্তানি হয়। শর্করা-শিল্পের শতকরা ২১ ভাগ, বস্ত্রশিল্পের শতকরা ১৪ ভাগ এবং কৃষিজাতের ৩৪ ভাগের বাজার এই উপনিবেশগুলি। হিসাবে দেখা গেছে ফরাসী-দেশের শিল্পউৎপাদনের শতকরা ৬৬ ভাগ ও কৃষিজাত দ্রব্যের শতকরা ১৮ ভাগ উপনিবেশগুলিতে রপ্তানী হয়। আরও হিসাবে দেখা গেছে ফ্রান্সের পাঁচ লক্ষ অধিবাসী অর্থাৎ প্রতি ২৮টি পরিবারের একটি পরিবার ফ্রান্সের সঙ্গে তার উপনিবেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উপার্জন করে। সুতরাং, সামরিক শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক শক্তির ঔপনিবেশিক চাপ ফরাসী সরকারের ওপর দুর্বার হয়ে ওঠে ও একনায়কত্বের মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

সামরিক শক্তি ফরাসী দেশের রাজনীতিতে কত গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে সাকিয়েতে বোমা বর্ষণের পর ন্যাশন্যাল এসেম্বলির উত্তপ্ত আবহাওয়ার মেঁদে-ফ্রান্সের বক্তৃতায় তার আভাসও পাওয়া গেছে। ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়ে মেঁদে-ফ্রান্স সামরিক কর্তাদের ডেকে পাঠান। তারা প্রথম গেলেন দক্ষিণ-পন্থী ন্যানিয়েলের সঙ্গে পরামর্শ করতে মেঁদে ফ্রান্সকে কতটা বিশ্বাস করা যাবে সেই আলোচনার জন্য। প্যারী সহরের পুলিশের সঙ্গে বিচ্ছুকুলী, গেলান, সৌজদে প্রভৃতিদের গুণ্ডাদের যোগাসাজস রয়েছে এবং বামপন্থীদের সভা শোভাযাত্রা পুলিশের উপস্থিতিতেই এরা ভেঙে দেবার সাহস রাখে। এই অবস্থার মধ্যে সামরিক শক্তি গভর্নমেন্টকে উপেক্ষা করে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শের পর যদি সাকিয়েত এলাকায় বোমা নিক্ষেপ করে থাকে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুতরাং গেলার্ডের পতনের পর উগ্র দক্ষিণ-পন্থীদের পক্ষ থেকে যে গলকে ক্ষমতাসীন করার দাবী উঠবে, তা স্বাভাবিক। কোন কোন মহল থেকে আলজিরিয়ার যারা যুদ্ধ-বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে আলজিরিয়া ও ফ্রান্সের সংযুক্তির যারা পক্ষে তাদের সংগঠিত দাবী ওঠে। প্যারী সহরে ন্যাশনাল এসেম্বলীর সম্মুখে একসহস্র পুলিশ, বাহিনীর

প্রকাশ্যে ক্যাসিষ্ট সমর্থন এই সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সেলার্ডের পতনের পর মন্ত্রিসভা কে গঠন করবে তা নিয়ে কিছুটা সময় উত্তীর্ণ হবার পর ব্লিমলিনকে সরকার গঠনের ভার দেওয়া হোলো। ব্লিমলিন সরকার যেদিন ক্ষমতা হাতে নিলেন সেইদিনই অর্থাৎ ১৩ই মে আলজিরিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষরা বিদ্রোহী হয়ে প্যারী সরকারকে ঐ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার জন্য দাবী জানালো। ১৩ই মের বিদ্রোহ ঐ দলের সঙ্গে যোগসাজসে হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা চলে। আলজিরিয়াতে চরমপন্থী আলজিরিয়ান দল এফ. এল. এন কর্তৃক তিনটি ফরাসী বন্দীকে হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য কৌশলে ১৩ই মের সমাবেশের ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য এফ, এল, এন দল ফরাসী সরকারের হাতে এক আরব বন্দীর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য উপরোক্ত হত্যা অনুষ্ঠিত করে।

১৩ই মে থেকে ১লা জুন পর্যন্ত ফরাসী রাজনীতিতে এক দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো। ১৩ই মে আলজিরিয়াতে বিদ্রোহী সরকার গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই কর্সিকাতে তাদেরই সাহায্যে অপর এক বিদ্রোহী সরকার গঠিত হয়। ব্লিমলিন সরকার ১৩ই মে থেকেই আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি করলো আলজিরিয়া সরকারকে প্রায়-স্বীকৃতি দিয়ে, এবং আলজিরিয়াতে অধিকতর সৈন্য ও সমরাস্ত্র প্রেরণ করে। কর্সিকা সম্পর্কে তার নীতি হল সেখানে সৈন্য-প্রেরণ না করা কারণ কর্সিকার প্রেরণের জন্য প্যারীতেও উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্যের অভাব। একদিকে বিদ্রোহীদের প্রতি অনুমোদনসূচক মনোভাব প্রদর্শন, অপরদিকে ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষমতা গ্রহণ ও গৃহীত ক্ষমতার অ-ব্যবহার—স্বল্পস্থায়ী ব্লিমলিন সরকারের এই দুর্বল নীতি ঐ দলের পথ প্রশস্ত করে দিলো। ঐ দল পর পর দুইটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে আলজিরিয় বিদ্রোহীদের তারিফ করে বললেন ক্ষমতা নিতে তিনি প্রস্তুত কিন্তু পার্লামেন্ট থেকে "সর্ব সম্মত-অনুরোধ আসা চাই—কম্যুনিষ্ট দল ছাড়া। কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় ঘোষণায় বললেন পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে ক্ষমতা গ্রহণের তিনি সব কাজ সুরু করে দিয়েছেন। ঐ দলের ঘোষণায় প্যারীতে বামপন্থীদের বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা সুরু হ'ল; প্রথমদিকে ফরাসী পার্লামেন্ট সোজাসুজি, ঐ দলপন্থী এবং স্বতন্ত্রদের অধিকাংশ, বিদ্রোহীদের সমর্থন জানালেও এম, আর, এ দলের নেতা ব্লিমলিনের মন্ত্রিসভাকে অপর সকল দল সমর্থন জানায়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহের ভয়ে কম্যুনিষ্ট ও মেঁদে-ফ্রান্সের দল ছাড়া অন্য দলগুলি দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়লো। সোস্যালিষ্ট নেতা গী মোলের ভূমিকা এই দক্ষিণমুখিতায় সব চাইতে লোচনীয়। দুই বৎসর পূর্বে গী মোলে সরকার যখন গঠিত হয় তখন আশা করা গিয়েছিল যে আলজিরিয় প্রশ্নের মীমাংসা হবে। কিন্তু ক্ষমতা হাতে নেবার পর আলজিরিয় পরিবর্তন করতে গিয়ে 'কোলোন'দের হাতে তিনি অপদস্থ হয়ে এলেন। ফলেই মোলের আলজিরিয় নীতি হিংস্র হয়ে ওঠে এবং এই হিংস্রতাই তাকে শেষ পর্যন্ত মিশর আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে। গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা যত দ্রুত এগিয়ে এলো গী মোলেও তত দ্রুত দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে পড়ে ঐ দলকে সোপন বৈঠকে সমর্থন জানিয়ে এলেন। ঐ দলের সর্ত ছিল, পার্লামেন্ট মুলতুবী রেখে সকল ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিতে হবে এবং অল্পসময়ের মধ্যেই ফরাসী সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে গণভোটের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করতে হবে। ঐ দল কতকটা আমেরিকান সংবিধানের পক্ষপাতী।

কিন্তু গী মোলে সমর্থন দিলেও সোস্যালিষ্ট পার্টির সমর্থন আদায় করতে তাকে বেগ পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির সভ্যদের ভোটের স্বাধীনতা দেওয়া স্থির হয়। সোস্যালিষ্টদের এবং অন্যান্য বামপন্থীদের একাংশের

ও গলের দিকে ঝুঁকবার কারণ পপুলার ফ্রন্টের প্রতি তাদের বিরূপতা। পপুলার ফ্রন্টে কম্যুনিষ্টদের অংশীদার হয়ে কাজ করতে হবে এবং ও গলের বিরোধিতায় সি. জি. টি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। Observer পত্রিকায় ১৮ই মে সংকলনে বলা হয় "If the Army in France decided to follow the same line as in Algeria, and, backed General De Gaulle it is probable that the main source of strong organised reaction in defence of the regime would be from the communists and particulary communist-led trade unions of the C. G. T." সুতরাং পপুলার ফ্রন্টে কম্যুনিষ্টদের পরিচালিত C. G. T. র নেতৃত্বাধীন হ'তে হবে এই আশঙ্কায় সোস্যালিষ্টদের একাংশকে এবং অন্যান্য বামপন্থীদের অংশবিশেষকে ও গলের সমর্থনের দিকে ঠেলে দেয়।

এই অবস্থায়—একদিকে ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের প্রস্তুতি অপরদিকে গৃহযুদ্ধের ক্রমস্ফুট পদধ্বনি —১লা জুন ফরাসী জাতীয় পরিষদ ৩২৯-২২৪ ভোটে ও গলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করে নিলো। পনের মিনিটের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ছয়মাসের জন্য পার্লামেন্ট স্থগিত রাখবার ও এই সময় সকল ক্ষমতা গ্রহণের দাবী জানিয়ে সংবিধান সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও গল তাঁর কর্তব্য সমাধা করলেন। ৩রা জুন তারিখে জাতীয় পরিষদ ছয় মাসের জন্য ও গলকে সকল ক্ষমতা দিয়ে অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি নিলো।

১৯৩৩-এর মার্চ মাসে প্রায় অনুরূপ পরিবেশে জার্মান রাইখ এক আইন পাশ করে তদানীন্তন চ্যান্সেলার হিটলারের হাতে আইন রচনার ও সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা অর্পণ করেছিলো। তারপর জার্মান রাইখের মৃত্যু হয় এবং নূতন রাইখ গঠিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে ফ্যাসিজম উৎসাদনের পর। ও গলের ক্ষমতাসীন হবার পর ফরাসী দেশে অনুরূপ পরিণতি ঘটবে কিনা তা এখনই বলা যায় না। তবে একথা নিশ্চিত যে, যে সামরিকবাহিনী ও কোলনদের সমবেত শক্তিতে ও গল ক্ষমতা লাভ করেছেন, তারা ও গলের ওপর চাপ দিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে উৎপাটিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ৮।৬।৫৮

ভুল সংশোধন

পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত এবং বৈশাখের জয়শ্রীতে "একটী রবীন্দ্র জয়োৎসব" প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় রচিত নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটীতে শুদ্ধির ভুল থাকায় জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। এখানে সংশোধিত পাঠ দেয়া হইল।

"পায়ানাচ পশূনাঞ্চ পক্ষিণাচ হিতেচ্ছয়া
এষা পঞ্চবটী প্রীত্যারবীন্দ্রেণেহ রোপিতা।"

জঃ সঃ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়ন্তী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩৬৫

বর্তমান প্রসঙ্গ

ইমরে নাগীর নিধন

গণতান্ত্রিক দুনিয়া ইমরে নাগীর (নাজ) প্রাণহরণকে একবাক্যে আখ্যা দিয়েছে—রাজনৈতিক হত্যা। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক বর্বরতার বিরুদ্ধে এমন খড়্গ-হস্ত, আন্তরিক ও ব্যাপক ধিক্কার ওঠেনি যেমন উঠেছে নাগী নিধনের ক্ষেত্রে। ন্যায়, নীতি, রাজনীতি অথবা জাতীয় বা আন্তর্জাতীয় কোন মানদণ্ডেই নাগী নিধনের নৃসংশতাকে সমর্থন বা উপেক্ষা করা যায় না। একদিকে শান্তির বুলি, শিখর সম্মেলনের প্রস্তাব আর পরমাণবিক অস্ত্র নিরাকরণের আহ্বান, এবং আরেকদিকে রাজনৈতিক হত্যার নির্মম অভিযান—রাশিয়ার এরূপ প্রতি-মুখী নীতির সার-বত্তা বা বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে রাশিয়ার আন্তরিকতার আসল তাৎপর্য অনুধাবন করা নিরপেক্ষ দুনিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। ইমরে নাগী ও তার সহকর্মীদের হত্যা করে এবং এখনও হাঙ্গেরীতে রাজনৈতিক হত্যার অভিযান অপ্রতিহত রেখে রাশিয়া (কারণ, কাদার রাশিয়ার বশংবদ আজ্ঞাবাহী মাত্র) বিশ্বশান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয়তা ও মানবতার আদর্শকে চরমভাবে আঘাত করেছে।

অমৃতসহরে গণতন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কিরূপ গণতন্ত্রী হয়েছে, ইমরে নাগীর হত্যাকে নগ্ন ভাবে সমর্থন করে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি তার একটি সদ্য-পরীক্ষায় নিজস্ব স্বরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইমরে নাগীর হত্যার প্রতিবাদে সারা দুনিয়ায় যে প্রতিবাদের প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে—তা' মানবতা ও স্বাধীনতার চিরন্তনী চিত্তধর্মের এক অনিবার্য ও অবিনশ্বর প্রতিধ্বনি।

বর্মার সমাজবাদী অ-সংহতি

বর্মার সমাজবাদী সংহতি এশিয়ার সমাজবাদী আন্দোলনের আশা ও আস্থার এক কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বর্মার ক্যাপীরিবোধী দলের বিচ্ছেদ এবং ইউ নু ও উ বা সুয়ের বিরোধ বর্মা তথা বর্মার সমাজবাদী রাজনীতিকে এক শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছে। সমাজবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তার সাংগঠনিক অসংগতি। ভারতীয় সমাজবাদী আন্দোলন এই অসংগতির ফলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বর্মাও আজ সেই দুরাগ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। বর্মার

সমাজবাদী আন্দোলনের সংহতি রক্ষা করা আজ এশিয়ার সমাজবাদী আন্দোলনের পক্ষে এক অপরিহার্য প্রয়োজন। কারণ, এশিয়ার মধ্যে সমাজবাদীদের হাতে এক বর্মাতেই শাসন ক্ষমতা রয়েছে।

বর্মা-সমাজবাদীদের এই অন্তর্বিরোধ ও বিচ্ছেদের মধ্যেও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে ইউ নু ও উ বা সুয়ের অনুগামীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েও পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও আচরণে উভয় পক্ষই গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির গণ্ডী অতিক্রম না করার জন্য সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করেছে। ভারতের সমাজবাদীরা আশা করবে যে বর্মার সমাজবাদীরা নিজেদের আভ্যন্তরীন বিচ্ছেদ ও বিরোধ দূর করে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং এশিয়ার সমাজবাদী আন্দোলনে তাঁদের যথাযোগ্য গৌরবময় আসন আবার গ্রহণ করেন।

কেরলায় গৃহযুদ্ধের হুমকী

কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের গণতান্ত্রিক দীক্ষার অমৃতময়ী ঝঙ্কারগুলির উচ্চরোল বন্ধ হতে না হতেই কেরালার যুথান্ত্রী সরকারবিরোধী দলগুলিকে সতর্ক করে গৃহযুদ্ধের যে হুমকী দিয়েছেন তারফলে কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের গণতান্ত্রিক আদর্শাচরণের যথার্থ স্বরূপ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। 'প্রজাসোস্যালিষ্ট, আর, এস, পি, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীদলগুলিকে ধমক দিয়ে শ্রী নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন যে বিরোধী দলগুলি যদি কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরোধিতার নীতি পরিত্যাগ না করে তবে ভারতেও চীনের মত গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দিক থেকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রতিটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে একদলীয় শাসন বর্তমান এবং নয়াগণতন্ত্র বা জন-গণতন্ত্রের নামে চীনে বা পূর্ব ইয়োরোপে যে কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থা আছে তাতে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলকে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে এই সর্তে যে তারা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সরকারের মতবাদ অনুগামী রূপে সর্বদা কম্যুনিষ্ট পার্টির ও সরকারের জয়-কীর্তন করবে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার বিরোধী দল বলে কিছু নেই।

এরূপ রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আন্তর্জাতীয় কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা এত অভ্যস্ত যে নিছক সরকার বিরোধিতার জন্য গৃহযুদ্ধের হুমকী দেওয়ার অর্থ যে কি দাঁড়ায় শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সে কথা স্মরণ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অন্যান্যদল একযোগে বিধান সভার ভিতরে ও বাইরে উগ্রভাবে যে সরকারবিরোধী আন্দোলন করে যাচ্ছে তাও কি অ-গণতান্ত্রিক, বিরোধী দলরূপে যে অধিকার কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্য প্রদেশে ভোগ করছে, সেই অধিকার যদি বিরোধী দলগুলি কম্যুনিষ্ট-শাসিত প্রদেশে ভোগকরার চেষ্টা করে তা' হলে কোন্ যুক্তিতে তা' গৃহযুদ্ধের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় তার ব্যাখ্যা এখনও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলকথা সরকারী দল ও সরকার বিরোধীদলের আলোচনা, সমালোচনা ও বাক্-বিতণ্ডার মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থা ও তার নীতি পরিচালনা করা। এই মূল নীতির দিক থেকে কেরলার কংগ্রেস, প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি বা অন্যান্য বিরোধীদল গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ বিরোধী কোন কাজই করে নি। গৃহযুদ্ধের হুমকী দিয়ে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ কম্যুনিষ্ট রাজনীতির আসল উদ্দেশ্যটি ফাঁস করে দিয়েছেন মাত্র।

কর্পোরেশনের কেলেঙ্কারী

কলকাতা করপোরেশন—এশিয়ার বৃহত্তম নাগরিক প্রতিষ্ঠান—

আজ যে দুর্নীতি, অসদাচরণ ও অব্যবস্থার কোন্ রসাতলে গিয়ে পৌঁছেছে মেয়র ডাঃ জিতেন্দ্র সেনের 'নেপথ্য দর্শন' শিরোনামে সাম্প্রতিক পত্রে তার এক নগ্ন চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। মেয়র করপোরেশনের প্রধান অধিকর্তা। করপোরেশনের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য নাগরিক নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলারদের এবং সেই নীতিকে কার্যকরী করার বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য করপোরেশনের শাসন কর্তা তথা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের। কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এখন সম্পূর্ণরূপে স্ব-প্রধান একটি স্বাধীকারী সত্তায় পরিণত হয়েছে এবং করপোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলারগণ পর্যবসিত হয়েছে একটি নিষ্ক্রিয় উপদেষ্টা বিভাগে। পৌরসভা ও মেয়র যে সিদ্ধান্ত করেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন তা' গ্রাহ্য করে না। এই অদ্ভুত বিচিত্র অসঙ্গত অবস্থা যে কিভাবে চলতে পারে সেকথা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। মেয়র তাঁরই কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁরই কর্মচারীরা তাঁর বা পৌরসভার আদেশ মানে না।

এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে তিনি কতক গুলি গুরুতর অভিযোগ করেছেন। মেয়রের অভিযোগের মূলকথা :

(১) এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন করপোরেশনের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে না।

(২) পৌরসভা ও ট্যাক্সিং কমিটির কার্যবিবরণী কয়েক বৎসর যাবৎ ছাপা হয় না।

(৩) উন্নয়ন খাতের বাজেট-বরাদ্দ টাকা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের পাকিলতির জন্য ব্যয় হয় না।

(৪) রূপরূপে সংগৃহীত টাকা অব্যবহৃত পড়ে থাকে।

(৫) অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা অফিস-ফাইলের তলায় চাপা পড়ে আছে।

(৬) পৌরসভার হিসাবপত্র ঠিকমত রাখা হয় না।

(৭) চাকরীর ব্যাপারে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের নিয়ম মানা হয় না।

(৮) এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন যথেচ্ছভাবে কর নির্ধারণ করে এবং এ-সম্বন্ধে ট্যাক্সিং কমিটিকে রিপোর্ট দিতে পর্যন্ত এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রাজী নয়।

(৯) জল-কষ্ট পীড়িত কলকাতার জল-সরবরাহের পরিকল্পনা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ফাইলের তলায় চাপা পড়ে আছে।

(১০) নির্দেশ সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যাল গেজেটে রি-ভ্যালুয়েশন লিষ্ট ছাপান হয় না।

(১১) এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের আওতায় বে-আইনীভাবে বাড়ী তৈরী করা হচ্ছে এবং বে-আইনী ধাটাল চালু রয়েছে।

(১২) বিনা লাইসেন্সে মোটর গ্যারেজ তৈরী হচ্ছে।

(১৩) ভাড়াটে নির্যাতনে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের আওতায় বাড়িওয়ালাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

(১৪) নিম্ন-বেতন ও সাধারণ কর্মীদের জন্য বরাদ্দ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

এই অভিযোগগুলি এত প্রত্যক্ষ ও গুরুতর এবং এর অভিযোক্তা স্বয়ং মেয়র যে প্রকাশ্যে এই অভিযোগ উত্থাপনের পরে কি করে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে 'ইনকোয়ারী' না হয়ে পারে এবং কি করে যে বর্তমান এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার বহাল থাকতে পারে তা' ভেবে কলকাতার নাগরিকেরা শুধু বিস্মিত নয়, ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত না হয়ে পারে না। মেয়রের অভিযোগের প্রকৃতিটা দাঁড়িয়েছে এরূপ —যেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় অভিযোগ করে বলছেন যে চীফ-সেক্রেটারী তাঁর কথা শুনছেন না। অবশ্য বাস্তবে এরূপ ঘটনা ঘটলে বাংলা সরকারের চীফ-সেক্রেটারী সেদিনই বরখাস্ত হতেন, কিন্তু করপোরেশনের ক্ষেত্রে অবস্থাটি প্রায় একই হওয়া সত্ত্বেও চীফ

এ্যাডমিনিস্ট্রেটার হুমকাও হচ্ছেন না এবং যে মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী মেয়রের সে ক্ষমতা নেই। তবে সমগ্র পৌরসভার এক্তিয়ারে অনেকখানি ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সেয়ানা লোকেরা কর্পোরেশনের অনেকগুলি কাউন্সিলারকে প্রলোভনের জালে আটকিয়ে রেখে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের পথটি বন্ধ করে রেখেছে। কর্পোরেশনের কেলেঙ্কারী দূর করার জন্য মেয়রের উদ্যমকে বেতাবে কংগ্রেসের কাউন্সিলার এবং বড় বড় কর্তারা ব্যর্থ করে দিচ্ছেন তার চক্রান্ত ও দুর্নীতি আজ এক অসহনীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেয়র যে অভিযোগ করেছেন তার যথার্থতা অনুসন্ধান এবং এই অভিযোগের মূল গলদ দূর করার জন্য অবিলম্বে এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পরিশোধন হওয়া প্রয়োজন, বাংলা সরকার যদি এই প্রয়োজনের স্বীকৃতি দিতে আরও দেরী করেন তবে কলকাতার নাগরিকদের এজন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে।

কলকাতার জল

জল প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ হলেও মানুষের কার্পণ্য এই দাক্ষিণ্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে কার্পণ্য স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সে-কথা অবান্তর। মানুষের এই ব্যবহারের পরিণাম কি, তা দিয়েই তার বিচার হবে। কলকাতার জল সম্পর্কেও বিচারের এই কষ্টিপাথর দিয়ে নাগরিকদের অভিযোগ নির্ণিত হয়েছে। জলের মারাত্মক অপ্রতুলতা, এবং যে টুকু জল যা পাওয়া যেত গুণগত বিচারে তার আপেক্ষিক অপেয়তা, বর্তমানে কলকাতাবাসীদের চরম দুঃখ ডেকে এনেছে। সবকিছু মিলে জলের অপ্রতুলতা আর এক বিচিত্র কাহিনী। আপাতত কলকাতার জল নিয়েই আমাদের দুটি কথা নিবদ্ধ।

কলকাতা পৌরসভার মাথাপিছু দৈনিক পঁচিশ গ্যালন পরিস্রুত জল সরবরাহের দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় দৈনিক আট কোটি গ্যালনের অধিক জল সরবরাহ করা পৌরসভার পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও প্রয়োজনীয়তা বয়ে গেছে ১৫ কোটি গ্যালন জলের। এই আট কোটি গ্যালন জল ছাড়াও ছয় ইঞ্চি ব্যাসের বৃহদাকার টিউবওয়েলের সাহায্যে আরও এক কোটি গ্যালন জল দৈনিক সরবরাহ করা হয়।

সরবরাহ বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় পলতা থেকে টালা পর্যন্ত চৌদ্দ মাইল ব্যাপী পুরাতন আট ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ। এই পাইপ আরও বেশী জলের চাপ সহ্য করতে অক্ষম। পাইপটি ১৯২৬ সালে বসানো হয়েছিল ত্রিশ বছরের পরমায়ুর বেয়াদে। কিন্তু গত দুর্যাদ্রুতের পরই দেখা গেল পাইপটির একমাইল ব্যাপী জায়গা ফাঁকরা হয়ে গেছে। ১৯৫২ সালে কর্পোরেশনে এ-নিয়ে আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও জীর্ণ পাইপ পরিবর্তনের অন্য কোনো প্রস্তুতির লক্ষণ দেখা যায় নাই। অনেক সময়-ক্ষেপণের পর ১৯৫৬ সালে বাহাত্তর ইঞ্চি ব্যাসের একটি নূতন পাইপ বসাবার প্রস্তাব নেওয়ার পরও গড়িমসি করে পৌরসভা ১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত টাকাকড়ি মিটিয়ে দিতে কালহরণ করে। তারপর আরও এক বছর অতীত হয়ে যায়, পৌরসভা থেকে কাজ শুরু করার নির্দেশ যায় ঘড়ে। এ-বছর এপ্রিল মাসে সেই অর্ডার টিকাদার কোম্পানীর কাছে পৌঁছেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইস্পাতের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই পাইপটি তৈরী করতে সত্তর হাজার টন ইস্পাতের প্রয়োজন। পৌরসভার হাতে মাত্র সাড়ে চার হাজার টন ইস্পাত মজুত আছে। এবং তখন যেখানে মাসে হাজার টনের ইস্পাত প্রয়োজন, সেখানে ভারত সরকার এই বাবদ একবছরের মোট কোটা মঞ্জুর

করেছেন একহাজার পঞ্চাশ টন মাত্র। এই কোটারও আবার মাত্র চারশ টন টাটা কোম্পানী ১৯৫৯-৬০ সালের পূর্বে সরবরাহ করতে রাজী হয় নাই। সুতরাং পৌরসভা কর্তৃপক্ষের গড়িমসি ও বিলম্বের ফলে বর্তমানে কলকাতায় সরবরাহ বৃদ্ধির পথে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ভারত সরকারের মনোভাবও এ-সম্পর্কে লজ্জাজনক। কলকাতার মত সহরের জল সরবরাহের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় ইস্পাত কেন মঞ্জুর করবেন না এবং প্রয়োজন হলে বৈদেশিক মুদ্রাই বা কেন মঞ্জুর করবেন না, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। টাকা মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেও ভারত সরকারের মনোভাব লক্ষণীয়। বোম্বাই সহরাঞ্চলের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জলসরবরাহ পরিকল্পনার জন্য ভারত সরকার বাইশ কোটি টাকা মঞ্জুর করে থাকলেও কলকাতার জল সরবরাহ ব্যাপারে মাত্র সোয়া দুইকোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই বৈষম্যমূলক মনোভাব কেন, তার যথার্থ স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠবে।

কলকাতার জলের গুণগত অবনতিও সহরবাসীর মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কলকাতার জলে লবণের ভাগ ১৯৩৬ থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন থেকেই অনুমান করা হয়েছিল সমুদ্রের পরিমাণ ভাগীরথীতে বৃদ্ধি না করলে সমুদ্রের জলের লবণাক্ত ভাগ ভাগীরথীতে বৃদ্ধি পাবে। ফারাক্কা বাঁধের প্রয়োজনীয়তা তখন থেকে স্বীকৃত হলেও আজও তা উপেক্ষিত। অথচ এ-বছর জুন মাসে লবণাক্ত ভাগ জলে লবণাক্ততার যে নিরাপদ-পানীয়যোগ্যতার দিক থেকে—হরণত ভাগ তা অতিক্রান্ত হয়ে জলকে অপেয় করে তুলেছে। তাছাড়া কলকাতার জল এবার আরাম্বকভাবে দূষিত হয়েছিল, রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগারে জল পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল জলে জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে। অথচ ক্লোরিনের নিয়তম ভাগও জলে পাওয়া যায় নাই। এই পরীক্ষা হয়েছিল ২৬ এপ্রিল থেকে ১০ই মে এবং ১০ই মে ১৭ই মে। রাজ্য সরকার এ-সম্পর্কে পৌরসভার শাসকদের অবহিত করলেও তাদের অমার্জনীয় ঔদাসীন্য সহরবাসীর স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তুলেছিল।

পৌর আইনে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব পৌরসভার, প্রশাসনিক দায়িত্ব কমিশনার এবং তার অধীনস্থ অন্যান্য অফিসারদের। এই দ্বৈত-শাসন পৌরসভার সকল নীতির বিলম্বিত সম্পাদনা ও বিশৃঙ্খলার জন্য বহুলাংশে দায়ী। স্বয়ং মেয়রও এই মত পোষণ করেন। জলের পরিমাণগত ও গুণগত অবনতির জন্য এই দ্বৈত-শাসন এবং বিশেষ করে যারাত্মক প্রশাসনিক দায়িত্ব হীনতা নিঃসন্দেহে দায়ী। পৌরসভার প্রশাসনিক শিরোমণি আত্মরক্ষার জন্য পৌরসভার বিভিন্ন চক্রে রাজনীতির জটিল আবর্ত সৃষ্টি করছেন। প্রশাসনিক কাজে মনোযোগ দেবার সময় ও মানসিকতা এই দুইয়েরই তার অভাব। সুতরাং, জলের সমস্যার মত গুরুতর সমস্যাও নির্মম ঔদাসীন্যে অবহেলিত। কোন সভ্য সমাজ কিম্বা সভ্য দেশ এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে পারে না। এই জটিল চক্র ছিন্ন করে কলকাতায় প্রচুর পরিমাণে পেয় জল সরবরাহ অব্যাহত রাখবার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে অবশ্যই নিতে হবে। এ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

ফারাক্কা বাঁধ

ভাগীরথীর জলস্রোত ক্রমশঃ কমে আসছে এবং স্থানে স্থানে চর পড়ে ক্ষীণ প্রবাহী হয়ে উঠছে। ভাগীরথীর জলস্রোত হ্রাস পাওয়ার ফলে একদিকে পশ্চিম বাংলার কৃষি ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে কলকাতার বন্দরের গুরুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভাগীরথীর জলস্রোত যে ভাবে কমে যাচ্ছে তার পরিচয়

পাওয়া যাচ্ছে গঙ্গা থেকে সরবরাহিত কলকাতার পানীয় জলের লবণাক্ত ভাবে। ভাগীরথীর সাগরমুখী জলস্রোত যত কমে যাবে তত বৃদ্ধি পাবে কলকাতা অঞ্চলের ভাগীরথীর লবণাক্ত ভাব এবং গঙ্গার অববাহিকাগুলিও শুকিয়ে গিয়ে পশ্চিম বাংলার সেচ ব্যবস্থার ক্ষতি করবে। কলকাতার বন্দর, নাগরিকদের পানীয়জল এবং পশ্চিম বাংলার সেচ ও জলপথের সুব্যবস্থার জন্য ফারাক্কার বাঁধ নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই বাঁধের দাবী বারবার উত্থাপন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাঁধকে কোন স্থান দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি বিধান সভায়, সংবাদ পত্রে এবং পশ্চিম বঙ্গ প্রজা-সোস্যালিষ্ট-পার্টি ও কংগ্রেস সম্মেলনে এই বাঁধ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং কংগ্রেসী সম্মেলনে কেন্দ্র মন্ত্রী মোরারজী দেশাই ও এস, কে, পাতিলও এই প্রস্তাবের সারবত্তা স্বীকার করে গেছেন। দেখা যাক কলকাতাকে মৃত নগরীতে পরিণত না করার জন্য সরকারের আন্তরিকতা কতখানি।

অহিন্দুদের মন্দির প্রবেশ

সম্প্রতি ভারতের সামাজিক প্রগতির ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পাণ্ডারপুরে। পাণ্ডারপুরে মহারাষ্ট্র তথা মধ্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিচিত বিট্‌ঠলদেবের মন্দির। প্রতিবছর এই মন্দির দর্শনে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম হয়। সর্বোদয় সম্মেলনের সময় একজন মুসলমান ও একজন খৃষ্টান মহিলাসহ বিনোবাজী এই মন্দিরে প্রবেশ করেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতিক্রমেই বিনোবাজী মুসলমান অনুগামীসহ বিট্‌ঠলদেবের মন্দির দর্শন করেন। গান্ধীজীর বহু প্রয়াসের পরে হরিজনদের জন্য হিন্দু মন্দিরের দুয়ার উন্মুক্ত হয়। কিন্তু কোন যুগে কোন অবস্থায় হিন্দু মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এই অনুদারতার ফলে বহু ব্যক্তি হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করেছে এবং ধর্মপরিত্যাগীরা হিন্দু সমাজে ফিরে আসবার সুযোগ পায়নি, কোন অবস্থায়ই অন্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। তার ফলে অনুদারতা ও ধর্ম সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে হিন্দুসমাজ ক্রমাগত ক্ষয়ীষ্ণুতার পথে এগিয়ে গেছে। হরিজনদের মন্দির প্রবেশে অধিকার দান হিন্দু সমাজের প্রগতি যাত্রায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অহিন্দুদের হিন্দুমন্দিরে প্রবেশাধিকার দান এই প্রগতি যাত্রার আরেকটি অগ্রণী ঐতিহাসিক নিদর্শন। পুণ্যশ্লোক বিট্‌ঠলদেবের মন্দিরের অছিরা সারা ভারতের প্রগতিকামী সমাজের ধন্যবাদার্হ।

বিনোবাজীর সংবাদপত্র বয়কট

ভারতের সংবাদপত্রগুলি মন্ত্রী, উপমন্ত্রী তথা সরকারী লোকজনদের এবং সিনেমার মাত্রাধিক প্রচারের এক চকমারী বাহনে পরিণত হয়েছে এবং জুলাস ও প্রাঘ-ঘানের ন্যায় জননিরপেক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পর্যন্ত সংবাদপত্রে যথাযোগ্য স্থান পাচ্ছে না—এই অভিযোগ জানিয়ে বিনোবাজী সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রতিদিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করা ছিল বিনোবাজীর দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সত্যাগ্রহীর মনোভাব নিয়ে বিনোবাজী সংবাদপত্র পাঠে বিরত হয়ে ভারতীয় সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রকাশ করেছেন তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা আজ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার নানা প্রলোভন, ক্ষমতালাভ, ও অর্থ সাহায্যাদি বিতরণ করে ভারতের অধি-কাংশ সংবাদপত্রকে দলীয় ও সরকারী এবং উদ্বিরদারীদের এক মাত্রাহীন প্রচারযন্ত্রে পরিণত করার উপক্রম করেছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্র গণতন্ত্রের একটি

প্রধান ভিত্তি। কিন্তু ভারতের সংবাদপত্রগুলি যেভাবে পক্ষপাতী ও উস্কিয়ে দেবার মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে বিনোবাজীর এই নীরব সত্যাগ্রহে তার অনভিপ্রেত গতি রুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা ভারতীয় সংবাদিকেরা ভাববেন আশাকরি।

দুর্ভাগাদের রক্ত

সম্প্রতি বেতিয়ার উষাস্তদের উপরে এবং আমেদাবাদ ও বাঙ্গালোরে শ্রমিকদের উপরে গুলিচালনার ফলে প্রায় পনের জন হতভাগার জীবনান্ত হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশী গুলিতে জনসাধারণের প্রাণ নেওয়া শুধু অ-গণতান্ত্রিক নয়, অমানুষিক ও অসহনীয়ও বটে। স্বাধীনতার পরে স্বদেশী পুলিশ গুলির আঘাতে এত বেশি প্রাণ হরণ করেছে যে তাতে গণতন্ত্র-অনুরাগী মাত্রেই গভীরভাবে শঙ্কাবোধ না করে পারবে না। কেরলায় প্রজাসোস্যালিষ্ট শাসনকালে পুলিশী গুলির পরে সমাজবাদীদের পক্ষথেকে যে তুমুল আন্দোলন করা হয়েছিল তারফলে আশা হয়েছিল যে পুলিশী আচরণ সম্বন্ধে একটি নীতি নির্ধারিত হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা' করা হয় নি অথচ জন আন্দোলন দমনে নির্মমভাবে গুলিচালনায় পুলিশী উদ্যমে কোন ন্যূনতা দেখা যাচ্ছে না। অনবরত রক্তপাত দেখে দেখে মানুষের বিবেকও যেন কঠিন হয়ে গেছে জনমতের যেরূপ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল তা' দেখা যায়নি।

যাদুঘর স্থানান্তরিত

দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য সংগ্রহ সম্ভারে কলকাতার যাদুঘরটি এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ। শোনা যাচ্ছে নূতন আইন করে কেন্দ্রীয় সরকার যাদুঘরের সম্পূর্ণ পরিচালনা তার নিজেদের হাতে নেবেন এবং এখানকার সংগ্রহসমূহ দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত করবেন। এই সংবাদে কলকাতার শিক্ষিতগুলী স্বভাবতই অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রতিটী বড় শহরের নিজস্ব ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে দীর্ঘকালের পটভূমিকায়। সেই সব স্থানগুলির প্রকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গের এক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—সে শুধু বাহ্যিক নয়, রূঢ় হাতে যাকে আমূল বদল করার ফলে প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে যায়, তাতে কেবল স্থানীয় অধিবাসীরাই মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিকে দৈন্য অনুভব করে তাইনয় সমস্ত জাতিরও সুসমঞ্জস অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ভারতের রাজধানী বড় হবে, সকলদিকদিয়ে সমৃদ্ধ হবে, তাতে কারো আপত্তি থাকতে পারেনা। কিন্তু সে ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি অঙ্গের দৈন্য ঘটিয়ে কেন হবে? দিল্লী ভারতের প্রতীক হয়ে উঠুক প্রতি ভারতবাসীর পক্ষে তা গৌরবের কথা, কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইতিহাস যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন অঞ্চলকে স্ব স্ব পৃথক ঐশ্বর্য্যে বিশিষ্ট করে তোলে—তাকে ব্যাহত করা নিঃসন্দেহ সমস্ত জাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ না শিক্ষা নিরোধ

লক্ষ্য স্থির না করে পরিকল্পনা করার যা ফল হয় পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে তারই এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে। পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাকে একাদশ শ্রেণীর বহুমুখী শিক্ষায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তার সাথে পশ্চিম বঙ্গের ষোল শত স্কুলের মধ্যে মাত্র চার শত স্কুল মাল্টিপার্পাস স্কুলে রূপান্তরিত করা হবে এবং বাকী প্রায় ১২ শত স্কুলের ভাগ্যে কি ঘটবে সে কথা শিক্ষা বিভাগ জানে না। যে সব স্কুল মাল্টিপার্পাস হবে না তাদের ছাত্রদের বিদ্যা কি শুধু অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্তই থাকবে? আজ যারা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তারা কি জুনিয়ার স্কুলের শিক্ষকে পরিণত হবেন

আগামী দুই বছরের মধ্যে এ-সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষাজগতে এক চরম অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। বর্তমানে যে সমস্ত স্কুল ম্যাট্রিকুলেশন করা হয়েছে সেই সমস্ত স্কুলে, বিশেষ করে বিজ্ঞানে, উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন নির্দেশ দিয়েছে কোন কলেজে দেড় হাজারের বেশি ছাত্র ভর্তি করা চলবে না। তার ফলে এবার ছাত্রদের পক্ষে কলেজে ভর্তী হওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে। এবার প্রায় বাট হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনাল পাশ করছে। এরমধ্যে প্রায় দুই হাজার প্রথম বিভাগে এবং সতের হাজার দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে এবং প্রায় একচল্লিশ হাজার ছাত্র পাশ করেছে তৃতীয় বিভাগে। পশ্চিম বাংলায় যে সংখ্যার কলেজ আছে তাতে বড় জোর পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের শত করা পঞ্চাশ ভাগের স্থান হতে পারে। কিন্তু কলেজে ভর্তি ব্যাপারে প্রথম বিভাগে এবং দ্বিতীয় বিভাগে ছাড়া আর সবাইকে প্রায় নিরাশ হতে হচ্ছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্য কোন টেকনিক্যাল শিক্ষারও এমন সুযোগ নেই যাতে ছাত্রেরা অন্যত্র যেতে পারে।

ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হওয়ার অবস্থাও একই রকম। এবারে প্রায় কুড়ি হাজার ছাত্রছাত্রী ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। কিন্তু ডিগ্রী কলেজে স্থান হতে পারে মাত্র ছয় হাজার বিদ্যার্থীর। কিন্তু তার মধ্যেও কড়াকড়ির জন্য অনেক ছাত্রের পক্ষে ভর্তী হওয়া সম্ভব হবে না এবারে স্কুল ফাইনাল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় চল্লিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ এবং অন্যদিকে কোন কারিগরী বা বাণিজ্যিক শিক্ষারও উপায় নেই।

স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রের ভীড় কমানোর জন্যই বোধ হয় সরকার প্রায় পচাত্তর ভাগ স্কুলকে জুনিয়ার স্কুলে পর্যবসিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রসার তো নয়ই, শিক্ষা নিয়ন্ত্রণও নয়, কারিগরী বাণিজ্যিক বা অন্য ধরণের শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা না করে এবং কলেজ বাড়াবার জন্য উদ্যোগী না হয়ে সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে শিক্ষা-নিরোধের ব্যবস্থা করে বাঙালীকে এক অশিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা দেশ এক চরম শিক্ষা-সংকটের দিকে এগিয়ে যাবে।

প্রবন্ধ

হাঙ্গেরীর মুক্তাক্ষর স্বপ্নপ্রহর

সমর গুহ

ছোট্ট সংবাদ। সংবাদটি হাঙ্গেরীর, প্রচারিত হয়েছে মস্কো থেকে। হাঙ্গেরীয়ান গণ-বিপ্লবের নায়ক ইমরে নাগীর বিচার এবং বিচারান্তে প্রাণদণ্ড। নাগীর দেশরক্ষা সচিব জেনারেল পল মালাটার এবং আরও দুই জন সচিবের হয়েছে একই দণ্ড। দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনজন সহকর্মীসহ ইমরে নাগীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আরও জানান হয়েছে—বিচার হয়েছে গোপন-কোর্টে, আসামীদের আপীলের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

১৯৫৬-র ২২শে নভেম্বর নাগীকে রুশ সেনাবাহিনী ছিনিয়ে নিয়ে যায় যুগোস্লাভ দূতাবাসের সেট থেকে। তারপর থেকে ইমরে নাগীর অস্তিত্ব ছিল অজ্ঞাত। প্রায় দুই বছর পর নাগীর এই প্রথম ও শেষ সংবাদ—মৃত্যুদণ্ডের চরম বিজ্ঞপ্তিতে।

যুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরী

যে অঙ্কের উপর যবনিকা পাত হল ১৭ই জুন ১৯৫৮-সালে, তার সূত্রপাত ১৯৪৭ সালে ২৩শে অক্টোবর—হাঙ্গেরীয়ান গণ-বিপ্লবের বছ্যুৎসবে। এই বছ্যুৎসবের বারুদ সঞ্চিত হয় এই ১৯৪৪ সালে। এই সালেই ঘটল হিটলারের পতন, রুশ বাহিনী দখল করল পূর্ব ইয়োরোপ। হাঙ্গেরীর উপর বিস্তৃত হলো ষ্টালিনের আধিপত্য। মস্কোয় দীক্ষিত ও সুরক্ষিত হাঙ্গেরীয়ান কম্যুনিষ্ট নেতারা এলেন ষ্টালিন বাহিনীর পেছনে। ষ্টালিনী ব্যুরোনেটের পশ্চাতে গঠিত হল হাঙ্গেরীতে এক সর্বদলীয় সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হল প্রথম স্বাধীন নির্বাচন। ডিকটেটর ষ্টালিনের বিজয়ী রুশ বাহিনীর কবলে থেকেও কম্যুনিষ্ট-পার্টির দিকে মুখ ফেরাতে হাঙ্গেরীয়ান জনতা রাজী হল না। যুদ্ধের পূর্বে হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে অবস্থা ছিল যুদ্ধের পরেও তাই রইলো। মোট-প্রায় ৪০ লক্ষ ভোটের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি পেল মাত্র ৮ লক্ষ ভোট এবং আসন পেল ৭০টী আর 'স্মল হোল্ডার পার্টি' ভোট পেল প্রায় ২৭ লক্ষ, আসন পেল ২৪১, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিও ভোট পেল প্রায় সোয়া ৮ লক্ষ এবং আসন পেল ৬৯; কম্যুনিষ্টরা সংখ্যালঘু হয়েও দখল করে নিল প্রধান প্রধান সব কটি মন্ত্রীপদ।

ষ্টালিন তাতেও খুশি হলেন না। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া বা পূর্ব ইয়োরোপের আর সব দেশে যা হয়েছে হাঙ্গেরীতেও তাই ঘটল। রাতারাতি অ-কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীরা প্রায় সবই গ্রেপ্তার হলেন, রাষ্ট্রপতি হলেন আটক। সংখ্যাগুরু স্মল হোল্ডার ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এবং ন্যাশনাল পেজেন্ট পার্টিগুলি বে-আইনী ঘোষিত হোল। হাঙ্গেরীতে একটি মাত্র দল রইল—কম্যুনিষ্ট পার্টি। কম্যুনিষ্ট নেতা রাকোসী হলেন প্রধান মন্ত্রী। বাকী সচিবদের প্রত্যেকে হলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির লোক। রুশ ব্যুরোনেটের ছোঁয়াতে কম্যুনিজম কায়েম হল হাঙ্গেরীতে।

রুশ উপগ্রহের কক্ষ-রচনা

ষ্ট্যালিনী কতোয়া আর রুশ সেনাবাহিনীর যুক্ত ঝাপটে পূর্ব ইয়োরোপের আর সব রাষ্ট্রে—যা ঘটেছে হাঙ্গেরীতে তাই শুরু হল। হাঙ্গেরীকে রুশ উপগ্রহের লৌহ জ্যাকেট পরাবার উদ্দেশ্যে কাটাইটের ব্যবস্থা চলল। স্বাধীন জনমত কম্যুনিজমের প্রধান শত্রু। এই শত্রুকে সুরুতেই টুঁটি টিপে মারা চাই। পার্টির কর্মী ও নেতাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা চাই। এই উদ্দেশ্যে রাশিয়ার 'জি-পু'র অনুকরণে হাঙ্গেরীতেও গড়ে তোলা হল গুপ্ত পুলিশ বাহিনী—'এ,-ভি-এইচ'। কম্যুনিজমে মত-দীক্ষার ব্যবস্থা হোলো শিক্ষা ও সাহিত্যের উপরে পার্টির ব্যাপক খবরদারী প্রতিষ্ঠা করে। রুশ ভাষা অবশ্য পঠনীয় হল সব স্কুলে। সরকারী হুকুমে জন্ম নেল 'রাইটার্স কাউন্সিল', তথা লেখক সংঘ। সংঘের সম্পাদক ও সব কর্মকর্তা নির্বাচিত করার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার পেল কম্যুনিষ্ট পার্টি। জাতির মস্তিষ্কের উপর দিয়ে কম্যুনিজমের রাজপথ নির্বাধ গতি লাভ করলো।

মানস-শোধন—ব্রেইণ ওয়াশিং—এর ব্যবস্থা পূর্ণ হল। কৃষকরাও এর বাইরে রইলো না। তারা জমি হারিয়ে সরকারী কালেকটিভ ফার্মের মজুরে পরিণত হল। মজুর হারাল তাদের কর্ম-বিনিময়ের স্বাধীন অধিকার। আর হোলো হাঙ্গেরীর সঙ্গে রুশিয়ার আর্থিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি, ফলে আন্তর্জাতীয় বাজারে হাঙ্গেরীর কাঁচামালের জন্য যা' প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে অনেক কম মূল্য জুটল হাঙ্গেরীর ভাগ্যে।

কি মস্তিষ্কের, কি পেটের ক্ষুধা—দু'দিক দিয়েই হাঙ্গেরীর জনতা জ্বলতে লাগল। কিন্তু একদিকে গুপ্ত পুলিশ 'এ-ভি-এইচে'এর দৌরাত্ম্য, আরেক দিকে সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক সজ্জিত রুশ বাহিনীর রক্ত-চক্ষু। ফলে হাঙ্গেরীর জনতার কণ্ঠে প্রতিবাদ রইলো অনুচ্চারিত। ১৯৫৩ সালে আবার একটি শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। তাতেও কম্যুনিষ্ট পার্টি ভোট পেল মাত্র শতকরা ১৭; কিন্তু মাত্র সতের সত্ত্বেও রাষ্ট্র ক্ষমতায় কম্যুনিষ্ট পার্টিই হোলো বহাল।

বুদ্ধিজীবি বিস্ফোভ

বছর গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতীয় কম্যুনিজমের শক্তি কেন্দ্রে ঘটল দুর্যোগ। '৫৩ সালে ষ্ট্যালিনের মৃত্যু হল। তখন হাঙ্গেরীর রাকোসী শাসনের জন-অপ্রিয়তা প্রায় চূড়ান্ত। জন-বিক্ষোভের প্রথম বহ্নি ধূমায়িত হল বুদ্ধিজীবিদের প্রতিবাদে। শিক্ষা ও সাহিত্যে পার্টি লাইন ও পার্টি ব্যুরোক্রেসীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানালেন কম্যুনিষ্ট লেখক গিয়ুলাফাই এবং টিবর ডেরি। লেখক সংঘের কার্যকরী সমিতি থেকে অনেকে পদত্যাগও করলেন। ষ্ট্যালিন পুরস্কার প্রাপ্ত তাখাস আক্‌ভেল, 'বেকেএস্ সজাবাদসাগ' (শান্তি ও স্বাধীনতা) কাগজে রুষক বিক্ষোভের কথা জানালেন এক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। হাঙ্গেরীয়ান লেখক সংঘের মুখপত্র 'ইরোডালমি উজসাগে' (লিটারেরী গেজেট) হাঙ্গেরীয়ান লেখকদের রচনা সমালোচনা-মুখর হয়ে উঠল। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে কম্যুনিষ্ট পার্টি মনোনীত প্রার্থীকে ৩-১০০ ভোটে পরাজিত করে হাঙ্গেরীয়ান রাইটার্স ইউনিয়ন নির্বাচিত করল তাপলাল পেজেন্ট পার্টির একজন প্রার্থীকে। এই নির্বাচনে প্রকাশ পেল হাঙ্গেরীয়ান বুদ্ধিজীবিদের প্রথম নৈতিক বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল রাকোসী শাসনের প্রতি জনতার নৈতিক অনাস্থার জন্য। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে রাকোসী প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ হারায় এবং মালেনকভের ইচ্ছায় হাঙ্গেরীর জনপ্রিয় নেতা ইমরে নাগ প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ লাভ করেন। ইমরে নাগী অনেকটা উদার নীতির পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন কিন্তু মালেনকভের পতনের সঙ্গে

সঙ্গে হাঙ্গেরীর শাসনেও আবার রদবদল হল এবং রাকোসী বুদাপেস্তিনের দৌলতে আবার ক্ষমতায় গদীয়ান হল। জনতার মনের ক্ষুধে উঠবার জন্য রাকোসী এবারে একটি চাল দিলেন। রাকোসীর শাসনে রাকোসীরই নির্দেশে তার বৈদেশিক মন্ত্রী লাসলো রাজককে শক্তকর আখ্যা দিয়ে ১৯৪৮ সালে হত্যা করা হয়। এই হত্যার সাত বছর পরে রাকোসী বলেন যে কাজটি ভুল হয়েছিল এবং এজন্য দায়ী এ-ভি-এইচ গুপ্ত পুলিসের বড়কর্তার চক্রান্ত। আদালতে যাদের গুলি করে মারা হয় তারা তো গেছেই, বাকী যে প্রায় ৩০০ বন্দী ব্যারাকারে আটক ছিল তারা বেকসুর খালাস পেল। এই ঘটনায় রাকোসীর বিরুদ্ধে জন-বিক্ষোভ তো কমলই না, বরং আরও তীব্র হয়ে উঠলো।

পেটোফি ক্লাব

১৯৪৬ সালে হাঙ্গেরীয়ান বুদ্ধিজীবিদের বিক্ষোভ প্রকাশের এক নূতন মঞ্চ তৈরী হল। তরুণ লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, গীতকার—তথা কম্যুনিষ্ট যুব-সংঘের নেতৃত্বে 'পীপ্‌ল অব ওয়াকিং ইয়ুথ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। এই প্রতিষ্ঠানে বুদাপেস্তের বুদ্ধিজীবিরা এসে জড় হলেন। নানা বিষয় নিয়ে মজলিসের তর্ক-বিতর্কের মঞ্চে পরিণত হল প্রতিষ্ঠানটি। এই বিতর্ক শোনার জন্য কোন কোন সমাবেশে প্রায় পাঁচ ছ' হাজার লোকের সমাবেশ হতে লাগল। সমালোচনার এই সুযোগে পেটোফি ক্লাব সাহসী হয়ে উঠল। ক্লাব থেকে দাবী উঠল শহীদ রাজক-এর সহধর্মিনীর পুনর্বাসনের। আরও দাবী উঠল পদীচ্যুত এবং পার্টিচ্যুত ইমরে নাগীকে পার্টি ও সরকারে পুনর্বহালের।

রাকোসী-বিরোধী বিক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠায় রুশ উপ-প্রধান মন্ত্রী মাইকোয়ান এলেন বুদাপেস্তে। রাকোসী বরখাস্ত হল এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ পেল এরনো গিরো। প্রধান মন্ত্রীত্বের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সচিবও করা হল গিরোকে। রাকোসী বিদায়ের সঙ্গে আরেকটি দাবীর কাজ করা হল। ১৯৪৮ সালের বিচার প্রহসনে লাসলো রাজক এবং আরও কেবল পদস্থ ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তাদের রাজকীয় সম্মানে পুরানো কবর থেকে তুলে এনে আবার নতুন করে কবর দেওয়া হল। এই ঘটনায় হাঙ্গেরীয়ান জনতার মনে জাতীয়তার এক নতুন আবেগের বন্যা উত্তাল হয়ে উঠলো।

গিরো জন-অপ্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল কারকাসকে হটিয়ে দিলেন এবং গুপ্ত পুলিসের এক বড় কর্তা র‍্যাডিমিরকে গ্রেপ্তার করলেন। কিন্তু মন্ত্রীসভায় রাকোসীর কয়েক জন সহকর্মীকেও নিলেন। কিন্তু জনপ্রিয় ইমরে নাগীকে মন্ত্রীসভায় নেওয়া সম্বন্ধে নীরব রইলেন। ছাত্রেরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এই অক্টোবর ছাত্র-বিক্ষোভ আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন জানা গেল যে গিরো সরকার শহীদ রাজক-এর সহ-ধর্মিনীকে গ্রেপ্তার করে আবার আটক করেছে। এই সংবাদে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের মন আবার প্রবল ভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

পোলজাসের স্কুলিঙ্গ

রাকোসী-চক্রের বিরুদ্ধে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি জনতার বিক্ষোভ রাজক বা এ-ভি-এইচ গুপ্ত পুলিসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বটে কিন্তু সমগ্র বিক্ষোভের মূলে ছিল রুশ বাহিনীর অবস্থানকারী এবং হাঙ্গেরীর জাতীয় মুক্তির দাবী। হাঙ্গেরীর জাতীয়তাবোধ পোলিশদের মতই তীব্র। দশ বছরের রুশ তাঁবেদারী শাসনে হাঙ্গেরীর জাতীয় মর্য্যাদা বোধ চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই ক্ষিপ্ততাবোধ সবচেয়ে বেশি করে আহত করে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের মনকে।

জাতীয় মর্য্যাদার এই ভাবাবেগের ইন্ধনে আকস্মিক এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে পড়ল '৫৭ সালের জুন মাসে পোল্যাণ্ডের পোসনান থেকে। পোলিশদের আত্মীয় মুক্তির লড়াই এবং জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সংবাদে হাঙ্গেরীয়ান জনতা উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ছাত্রেরা আহ্বান করল এক অভিনব সভা। এই সভার কম্যুনিষ্ট ছাত্রনেতারা এগিয়ে এলো সবার আগে। হাঙ্গেরীর লেখক সংঘ বাহিনী পোলিশদের মুক্তি সংগ্রামে অভিবাদন জানাল পোলিশ বীর জেনারেল বেমের মর্মর মূর্তিতে মালা দিয়ে।

হাঙ্গেরীর মুক্তি সনদ

পোল্যাণ্ডের মুক্তির গান গর্জে উঠল হাঙ্গেরীয়ান যুব ছাত্র ও সাহিত্যিকদের কণ্ঠে। ২৩ শে অক্টোবর বুদাপেস্তে বিরাট জনসভার আয়োজন হল ছাত্র ও সাহিত্যিকেরা। তারা আওয়াজ তুলল হাঙ্গেরীর জাতীয় মুক্তির দাবীর।

হাঙ্গেরীর মাটি থেকে অবিলম্বে রুশ বাহিনীর অপসারণ চাই,

ইমরে নাগীর নেতৃত্বে হাঙ্গেরী সরকারের পুনর্গঠন চাই,

সমস্ত রাজনৈতিক দলের বৈধীকরণ এবং হাঙ্গেরীতে অবাধ গণ-নির্বাচন চাই।

সভা সমিতি ও সাহিত্যের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই;

কিষাণ ও মজুরের অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তন চাই।

হাঙ্গেরীয়ান মুক্তি সনদের মোট দাবী হল ষোলটি। এই দাবী নিয়ে ছাত্র ও লেখকেরা অভিযান সুরু করল পার্লামেন্টের দিকে। দানিয়ুব নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মজুর ও সৈনিকেরা এসে যোগ দিল এই পার্লামেন্ট অভিযানে। সন্ধ্যা ছ' টা নাগাদ জনতার সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় তিন লক্ষ। জনতার স্থির নেতা ইমরে নাগী গণজমায়েতের সামনে এসে দাবীর সমর্থনে এক ভাষণ দিলেন।

বিপ্লবের বিস্ফোরণ

২৪শে অক্টোবর ছাত্র বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠল। ছাত্রেরা দাবী করল বুদাপেস্ত রেডিও থেকে তাদের জাতীয় মুক্তির গণদাবী প্রচার করতে হবে। বিকেলের দিকে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে বিরাট জনতা যাত্রা করল রেডিও বিল্ডিংসের দিকে। রেডিও বিল্ডিংসের পাহারায় ছিল 'এ-ভি-এইচ' পুলিশ। সন্ধ্যা তখন ৯টা। মুক্তি পাগল ছাত্র অভিযানের উপরে প্রথমে ছোঁড়া হোলো কাঁদুনে গ্যাস, তারপরে চললো গুলি। হাঙ্গেরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মুক্তিব্রতী ছাত্রদের রক্তাক্ত দেহ।

সোভিয়েট বাহিনীর হস্তক্ষেপ

২৩শে ও ২৪শের গণ-বিক্ষোভে সমগ্র বুদাপেস্ত এক হয়ে গেল। সোভিয়েট পক্ষপুটে বসেও হাঙ্গেরীয়ান উপগ্রহী সরকারের বুক কেঁপে উঠল। এরনো জিরোয় সরকার পদত্যাগ করল। তার জায়গায় বসান হল জেনারেল কাদারকে। কিন্তু বিপ্লবী জনতা কাদারকে চায় না, তারা চায় গণ-নেতা ইমরে নাগীর সরকার। এই দাবীতে আবার অভিযান সুরু হল পার্লামেন্টের দিকে। ২৪শে অকটোবর লক্ষ জনতা যাত্রা করল পার্লামেন্ট ভবনে। দুপুর তখন বারটা। জনতা তুমুল গর্জনে ইমরে নাগীর আশায় অপেক্ষমাণ। এমনি সময় পার্লামেন্ট ভবনের গেট থেকে মুষলধারে বর্ষিত হল সোভিয়েট ট্যাংকের প্রচণ্ড গোলা। কাতারে কাতারে ছাত্রেরা, বুদ্ধিজীবিরা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রক্তের বন্যা বয়ে গেল। নিহত হল প্রায় ৮০০ নিরস্ত্র অভিযাত্রী। বারটি গরুর গাড়ী বোঝাই করে

সোভিয়েট সেনারা ফেলে দিয়ে এলো এই মুক্তি শহীদদের পবিত্র দেহ—যার মধ্যে রইল কত কিশোর কিশোরী কত তরুণ তরুণীর কাঁচা প্রাণের সবুজ বাহন।

রিভল্যুশনারী ও ওয়ার্কার্স কাউন্সিল

সোভিয়েট ট্যাংক বাহিনীর বর্বর আক্রমণে গণবিপ্লব ব্যাপক হয়ে উঠল। মজুররা সব ফ্যাক্টরী বন্ধ করে যোগ দিল বিপ্লব-বাহিনীর সঙ্গে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ছোট ছোট ইউনিটগুলি বন্দুক নিয়ে সামিল হল বিপ্লব অভিযানে। 'এ-ভি,-এইচ' পুলিসের কিছু লোক ছাড়া পুলিস বা সেনাবাহিনীর উপর কোন কর্তৃত্ব রইল না কাদার সরকারের। ছাত্র মজুর সৈনিকের সহায়তায় সর্বত্র রিভল্যুশনারী এ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স কাউন্সিল গড়ে উঠল। এই কাউন্সিলের নেতৃত্বে সুরু হল পাঁচ দিনের তুমুল সংগ্রাম। জনতা ষ্ট্যালিনের প্রতিমূর্তি ভেঙে চুরমার করে দিল, কম্যুনিষ্ট পার্টির দপ্তর জালিয়ে দিল। ভীত-সন্ত্রস্ত কাদার, এরণো জিরো, কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী আত্রাস হেজদাস,—জনতার হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করল।

জনতার জয়

২৬শে অক্টোবর সর্বত্র প্রায় নৈরাজ্য। ২৭শে অক্টোবর ইমরে নাগী—জনতার প্রিয় নেতা—গঠন করলেন জনপ্রিয় সরকার। তাঁর সরকার গঠিত হল কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট নেতাদের সমবায়ে। নাগী সরকার ৩০শে অকটোবর ঘোষণা করলেন ঃ

হাঙ্গেরীতে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান হল,—প্রাক-১৯৪৮ সালের ব্যবস্থা অনুযায়ী হাঙ্গেরীর শাসন হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী।

৩১শে অকটোবর দাবী করল নাগী সরকার ঃ

অবিলম্বে রুশ বাহিনীকে হাঙ্গেরীর মাটি ছেড়ে বিদায় নিতে হবে।

১লা নবেম্বর নাগী সরকার রুশ ওঁাবেদারীর ওয়ারশ চুক্তি বাতিল করে দিল—ঘোষণা করল নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদকে হাঙ্গেরীর বিষয় আলোচনার জন্য জানাল সনির্বন্ধ অনুরোধ।

রুশ আক্রমণ

হাঙ্গেরীয়ান জনতার বিদ্যুৎ গতি এবং ঐক্যবদ্ধ অভিযানে বোধ হয় রুশ সেনানায়কেরাও কিছুটা হক চকিয়ে গেল অথবা হয় তো সাময়িকভাবে সাময়িক কৌশলের আশ্রয় নিল। নাগী সরকারকে রুশ সেনা-নায়কেরা জানাল রুশবাহিনী অপসারণের প্রশ্নে আলাপ আলোচনা করার কথা। ইত্যবসরে রুশ বাহিনী বুদাপেস্ত ছেড়ে ছাওনীতে গিয়ে ঢুকল। ওরা নবেম্বর পর্যন্ত মনে হল রুশ বাহিনী যেন বুদাপেস্ত পরিত্যাগ করল এবং মেনে নিল গণবিপ্লব ও নাগী সরকারকে। ইমরে নাগী দেশরক্ষা সচিব জেনারেল বালাটারকে পাঠালেন রুশ সেনা-নায়কদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্যে।

কিন্তু ৪ঠা নবেম্বরই জানা গেল যে রুশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ পুনরাক্রমণের প্রস্তুতি মাত্র। ৪ঠা থেকে রুশ বাহিনী বুদাপেস্তের চারিপাশের সমস্ত বিমান-গ্রহ দখল করে নিল। রুমানিয়া এবং হাঙ্গেরীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে আরো হ'শ নতুন সেনাবাহিনী। অস্ত্রের হুকুমও এসে পৌঁছল। ২৪০০ ট্যাংক ও ১০০০ শাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে রুশ বাহিনী চড়াও করল বুদাপেস্ত। এই বিরাট রুশ বাহিনীর অভিযানের সংবাদ পেয়ে ইমরে নাগী হাঙ্গেরীয়ান পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে রুশ বাহিনীর প্রতিরোধ করতে নিষেধ করলেন। কারণ, এই প্রতিরোধের অর্থ শুধু নিষ্ফলে হওয়া। রুশ বাহিনী

বেসরোওয়াগুলি চালিয়ে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে অগণিত নর-নারীকে হত্যা করে দখল করল পার্লামেন্ট ভবন, রেডিও অফিস। জনতা মাঝে মাঝে ককটেল ছুঁড়ে রুশ বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে রুশ বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুধু বাড়ল মাত্র।

একটি মাত্র রেডিও কেন্দ্র তখনও ছিল নাগীর হাতে। বিকেল ৪টায় তিনি কাতর আবেদন জানালেন গণতন্ত্রী দুনিয়ার সাহায্য চেয়ে। আরেক রেডিও কেন্দ্র থেকে তখন রুশ বাহিনীর পাহারায় ঘোষিত হল জেনেস্ কাদারের সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ। ৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যায় রুশ বাহিনী বুদাপেস্তের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে নিল। নিরাশ, নিরুপায় ও ব্যর্থ হয়ে ইমরে নাগী এবং তাঁর সহকর্মীরা সন্ধ্যার পরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন যুগোস্লাভ দূতাবাসে। ওদিকে জেনারেল মালাটার রুশ সেনা নায়কের আমন্ত্রণে গিয়েছেন রুশ বাহিনী অপসারণের চুক্তির আলোচনায়। সেখানেই তাঁকে রুশ বাহিনী গ্রেপ্তার করল।

হাঙ্গেরীর জাতীয় উত্থান

রুশ সেনাবাহিনী ঘেরাও করে রাখল পার্লামেন্ট ভবন এবং তার মধ্যেই আশ্রয় পেল রুশ-তাঁবেদার কাদারের সরকার। কিন্তু হাঙ্গেরীতে তখন কার সরকার, কার শাসন! সমগ্র হাঙ্গেরীয়ান জনতা বিদ্রোহী। হাঙ্গেরীর সেনা, পুলিশ, সরকারী কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষাব্রতী, মজুর কিষাণ—কেউ কাদার সরকারের সমর্থক নয়। সমর্থক শুধু 'এ-ভি-এইচ' পুলিসের অল্প কিছু লোক, গুটি কয়েক সেনানায়ক আর কাদারের জনকয়েক পার্টি সহচর। সমগ্র জনতাই নয়—কম্যুনিষ্ট পার্টির সমগ্র নেতা ও কর্মীরা পর্যন্ত রুশবাহিনীর আক্রমণ ও কাদার সরকারের বিরুদ্ধে।

জনতা রুশ আক্রমণের প্রতিবাদ করল বিক্ষোভ সত্যাগ্রহ করে। দোকান পাট বন্ধ, স্কুল কলেজ বন্ধ, কোর্ট-কাচারী তালাবন্ধ। ফ্যাক্টরী জল বন্ধ—বুদাপেস্তের সমগ্র জনতা নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহী। এই সত্যাগ্রহ ভাঙবার জন্য রুশ বাহিনী যেখান সেখান থেকে হাজারে হাজারে নিরস্ত্র জনতাকে গ্রেপ্তার করতে লাগল, এবং হাজারে হাজারে পাঠাতে লাগল রাশিয়ায়। নবেম্বরের চরম শীতে খোলা গাড়িতে হাজার হাজার হাঙ্গেরীয়ানকে দেশান্তরিত করা হল রুশিয়ার দিকে। আত্মীয় স্বজনকে খবর দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পেল না হতভাগ্যের দল।

নাগী তখন যুগোস্লাভ দূতাবাসে। কাদার সরকার লিখিতভাবে যুগোস্লাভ দূতাবাসকে জানাল যে নাগী এবং তাঁর সহকর্মীদের নিরাপদে তাঁদের যেখানে খুশি সেখানে যেতে দেওয়া হবে। এই সরকারী আশ্বাসে ২৩শে নভেম্বর ইমরে নাগী ও তাঁর ১২ জন সহকর্মী সপরিবারে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এসে উঠলেন এক গাড়ীতে। দূতাবাসের দ্বার থেকে বেরুতেই লিখিত সর্ত লঙ্ঘিত হল,—রুশবাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল নাগী ও তাঁর দলবলকে। ছোট একটু সংবাদে প্রকাশিত হল যে নাগীকে রুমানিয়ায় পাঠান হয়েছে। তারপরে দুইবছর বাদে আবার একটু ছোট্ট সংবাদ সেই মস্কো থেকে প্রকাশিত হল—'সিক্রেট ট্রায়েলে'র পরে নাগীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে পাঠান হয়েছে অন্য পৃথিবীতে!

হাঙ্গেরিয়ান গণ-বিপ্লবের প্রকৃতি

মস্কো এবং হাঙ্গেরীর মস্কো-তাঁবেদার প্রধান মন্ত্রী কাদার, হাঙ্গেরীর এই গণবিপ্লবের নাম দিয়েছে 'হোরথি পন্থী-ফ্যাসিবাদী-হাঙ্গেরিয়ান-সামন্ততান্ত্রিক প্রতি বিপ্লব' (Horthyite-fascist-Hungarian capitalist-feudal-counter revolution) এবং এই প্রতি-বিপ্লবী

নায়ক ইমরে নাগী। অক্টোবর যুদ্ধে যে কয়টি বাক্যবান আছে তার সব কয়টি একত্র করে বিচার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে হাঙ্গেরিয়ান গণ-বিপ্লব ও তার নায়ককে।

কিন্তু কে এই ইমরে নাগী? প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হাঙ্গেরিতে কম্যুনিষ্ট উত্থান হয়েছিল যার নায়কত্বে সেই প্রখ্যাত বিপ্লবী বেলাকুনের সহকর্মী ইমরে নাগী: প্রথম যুদ্ধের পরে বেলাকুনের সঙ্গে নাগীও রাশিয়ার আশ্রয় নেন। ১৯৩৮ সালে ষ্ট্যালিন শত্রুচর আখ্যা দিয়ে বেলাকুনকে হত্যা করে। নাগী তখন পালিয়ে যান রাশিয়া থেকে। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাগী রাশিয়ায় যান এবং রুশ-নেতৃত্বে ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। প্রথম রাকোশী সরকারে নাগী হন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। নাগীর নেতৃত্বেই হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট শাসন কায়েম করার চেষ্টা করা হয়। মাদেনকত নাগীকেই হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী করেন। রাকোসী জিরো ও কাদারের আমলেও ইমরে নাগী—ছিলেন কম্যুনিষ্ট নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

২৩শে অকটোবরের হাঙ্গেরীয়ান গণ-বিপ্লবে সবচেয়ে অগ্রণী অংশ গ্রহণ করে কম্যুনিষ্ট তরুণ ও যুবক নেতারা এবং কম্যুনিষ্টপন্থী সাহিত্যিকেরা। সোস্যাল ডিমোক্র্যাট বা খাস হোঙ্গার পার্টি সে সময়ে হাঙ্গেরিতে প্রায় নিশ্চিহ্ন। হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লবে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা জমিদারীর পুনঃপ্রবর্তনের একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি। হাঙ্গেরিয়ানরা চেয়েছিল জাতীয় মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা—রুশবাহিনীর কবল থেকে মুক্তি—একদলীয় শাসনের অবসান—সমাজবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-সাহিত্য ও চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা আর যুগোস্লাভিয়ার ন্যায় নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি। হাঙ্গেরীর সমগ্র জাতি ছিল গণ-বিপ্লবের এই উদ্দেশ্যের পশ্চাতে।

নাগী-হত্যার তাৎপর্য

যখন ওয়াশিংটনে যখন শিখর সম্মেলনের আলাপ চলছে—পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্রগুলির যখন আপাত কোন বিক্ষোভ নেই—সেই আন্তর্জাতীয় পরিস্থিতিতে অযৌক্তিক ও অসময়ে দুই বছর বাদে নাগী হত্যার প্রহসন কি কারণে ঘটল?

ভাগ্য বিরূপ হলে কম্যুনিষ্ট নেতাদের একই সঙ্গে গদী ও গর্দান যায়—ষ্ট্যালিন এই রাজনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ক্রুশ্চেভ এই নীতির নিন্দাবাদ করে গদীচ্যুত করেও গর্দান রাখার নীতি প্রবর্তন করেছেন। আজও তাই মালেনকভ, মলোটভ, বুলগানিন, খ্রুশ্চভ রাজগদী থেকে বিচ্যুত হয়ে বহাল তবিয়তে অখ্যাত ফ্যাকটরীর গদীতে আসীন আছেন। নাগীকে হত্যা করে হাঙ্গো কি গদী ও গর্দান নীতি আবার চালু করল?

কিন্তু এ-নীতি আবার চালু হলেও নাগী হত্যা অস্বাভাবিক, বে-আইনী ও নৃশংস হতে পারে,—কিন্তু এ-হত্যার গুরুত্ব তার বেশি নয়। নৃশংসতার যে ইতিহাস ষ্ট্যালিন রচনা করেছেন হাঙ্গেরু বা চেঙ্গিস খানের বর্বরতাও তার কাছে ম্লান। ক্রুশ্চেভের উদ্ঘাটনের পরেও, যে লেখিকা স্তালিনকে সমর্থন করে একটা বই লিখে ফেলেছেন সেই আনা লুই ষ্ট্রং পর্য্যন্ত লিখেছেন যে ষ্টালিনের রাশিয়ায় "লক্ষ লক্ষ লোককে অতর্কিতে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে সুদূর সাইবেরিয়ার বন্দী শিবিরে পাঠান হয়েছিল—হাজার হাজার লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যে সংবাদ তাদের আত্মীয়দের কাছে পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি।"—১৯৩৪ সালে পার্টি কংগ্রেসের ১৯৬৬ সভ্যের মধ্যে ১১০ জনকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ কংগ্রেসের ১৩৪ জন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যের মধ্যে ৯৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৭০ জনকে গুলি করে মারা হয়।" এ-ছাড়া জিনোভিভ, কামানেভ, বুখারিন, রাইকভ

এর ভার রুশ বিপ্লবের অগণিত নেতা, তুকাচেভস্কীর ভায় অগণিত সেনানায়ক এবং কামারনিক ও টমস্কীর ভায় রাজনৈতিক ও পুলিসী বড় কর্তা—কতই না কতল হয়েছে ষ্টালিনের রাশিয়ায়। তারই ধুয়োতে পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্রগুলিতেও অগণিত প্রাণ গিয়েছে। তাই গদী ও গর্দান যাওয়া কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে এমন কোন বিশেষ কথা নয়। আজ-যে-রাজপাটে কাল-সে-ফাঁসীর কাঠে,—কম্যুনিজমের এই পরিচয় কোন নূতন কথা নয়।

ন্যাশনাল কম্যুনিজম

কিন্তু নাগী হত্যার তাৎপর্য অনেক গভীর। যুগোস্লাভ দূতাবাস থেকে যে-আইনীভাবে গ্রেপ্তার করে প্রত্যক্ষভাবে যুগোস্লাভিয়া এবং প্রচ্ছন্নভাবে গোলাতের গোবোলকার ন্যাশনাল কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এক রক্তাক্ষরা নোটিশ জারী করার জন্যই নাগীকে হত্যা করা হয়েছে।

মস্কোর কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু টিটো ও যুগোস্লাভিয়া। পূর্ব ইয়োরোপের আর সব দেশে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করেছে রুশবাহিনী এবং কম্যুনিজম রক্ষাও করছে রুশ বাহিনী। পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি মস্কোর ক্ষমতার কক্ষে আবর্তিত। কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা হয়েছে জাতীয় অভ্যুত্থান এবং জাতীয় প্রয়াসের ফলে। তাই যুগোস্লাভিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় কম্যুনিজমের নতুন কেন্দ্র। যুগোস্লাভিয়াই নৈতিক ইন্ধন যুগিয়েছে পোলস্থান উত্থান ও গোমোলকার জাতীয়তা বোধকে। হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লবের আদর্শ কেন্দ্রও যুগোস্লাভিয়া। পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া রুমানিয়া, বুলগেরিয়া—পূর্ব ইয়োরোপের প্রতিটি রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন। তাই এই রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্টরাও যে সুযোগ পেলেই মস্কো-কম্যুনিজমের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টায় ত্রুটি করবে না—সেই বিভীষিকায় মস্কো সদা সতর্ক।

কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ বলেছেন যে সোস্যালিজমের কোন বাঁধা ধরা পথ নেই—যে-যার-মত পন্থায় সোস্যালিজম অর্জন করতে পারে। কিন্তু একথাটি কার্যকরী ক্ষেত্রে বলা হয়েছে শুধু অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির জন্য। বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ব ইয়োরোপীয় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির জন্য একটি মাত্র পথই খোলা—যে-পথের লক্ষ্য মস্কো। মস্কোর কক্ষচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করলে তার ফল কি দাঁড়ায় সেকথাটা পূর্ব ইয়োরোপীয় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সামনে রক্তাক্ষরে লিখে রাখবার জন্যই নাগী-নিধন পর্ব।

রাশিয়ার ইম্পিরিয়েল কম্যুনিজম বনাম যুগোস্লাভিয়ার ন্যাশনাল কম্যুনিজমের যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে হাঙ্গেরিয়ান গণ-বিপ্লবের বীর নায়ক ইমরে নাগীকে হত্যা করে তাকে শেষ করা যাবে না—বরং এ-হত্যায় এক নূতন শংকেত গর্জে উঠবে পূর্ব ইয়োরোপের রুশ-পিষ্ট-জনমনের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে। হাঙ্গেরিয়ান গণবিপ্লব তাই বিশ্বের সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রূপে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামীদের কাছে চিরভাস্বর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে।

আষাঢ়

গোপাল ভৌমিক

পারদ যখন ফারেনহিটের
একশ দশের কোঠাও ছাড়িয়ে যায়
প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে,
পিঙ্গল আকাশের গায়
মেলে না এক ফোঁটা জলের আশ্বাস,
তখন যে সূর্য সৃষ্টি করে
তাও ভুলে যাই। যে কঠোর ভ্রূবিলাস
চারিদিকে অগ্নিপিণ্ড ছোঁড়ে,
পুড়ে দিতে চায় সারা দেশ,
কে তাকে আনত করে এনে মোহাবেশ ?

স্যাঁতসেঁতে ভিজে বায়ু,
মেঘলা প্রহর
তবু একদিন আসে
কুমারীর প্রেমের মতন ;
ছোঁয়া লেগে আনত নয়ন
প্রোজ্জ্বল সূর্যও দেখি খেলে লুকোচুরি
মেঘ কন্যার কুন্তলে মুখ ঢেকে।
যত করি উপভোগ সে চাতুরি
তার চেয়ে বেশি করে ভাবি বারবার
দাবদাহ নিবারক এসেছে আষাঢ়।

বিশ শতকের এই নাগরিক মনে
যন্ত্র আর কান্না তার
বিজড়িত যদিও স্বপনে
মিছে নয় তাপমানে পারদের ওঠানামা।
দেহে ফোটে কদম বাহার
প্রথম যখন ধারাসার
স্মরণ করিয়ে দেয়
আকাশের আরও রূপ আছে;
কান্না জড়ানো রূপ তার
ফেলনা যে মোটে নয় প্রমাণ আষাঢ়।

হাসপাতালে

মধুব বাগচী

পড়ন্ত রোদ্দুর কাঁপে ভয়ে ভয়ে জানালার ফাঁকে
একটা কুৎসিত কাকে কা'কে যেন বারবার ডাকে।
ট্রাম বাস লরী চলে-অবিরাম শব্দ তার শুনি
—তাদেরি চাকার তালে পল আর অনুপলগুনি;

চারটা পনেরো হোলো—একে একে আসে ভিজিটার
শত আঁখি খুশী খুশী—অবসান হয় প্রতীক্ষার।
তারপর অন্ধকার—এক দুই আলো পথে জ্বলে
ছয়টাও বেজে যায়—লঘুপদে তারা ঘরে চলে।

শুধু মোর আশা ব্যর্থ—সুচরিতা আজো তো আসেনি
আমার মাথার কাছে একগুচ্ছ গোলাপ রাখেনি।

স্মৃতি চিত্র

ডক্টর মেঘনাদ সাহা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ডক্টর মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান—দশ বৎসর। ব্যবধান অনেক হইলেও তাঁহার খ্যাতির কথা ছেলেবেলাতেই শুনিতে পাই। তাঁহার একটি রচনার কথা মনে গাঁথিয়া রহিয়াছে, কারণ তখন ইহা মনকে খুবই ধাক্কা দিয়াছিল। আমরা জানিতাম, গ্যারালাল বা সমান্তরাল লাইনগুলি কখন কোথাও মিলিয়া যায় না। ডক্টর সাহার এই প্রবন্ধ হইতে জানিলাম, ইহাও সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের একটি মতবাদ বুঝাইতে গিয়া তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয়, ১৩২১ সনে প্রবাসীর এক সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তখন আমরা-পল্লীগ্রামের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি।

তদবধি ডক্টর সাহার কথা আগ্রহ সহকারে শুনিতাম, পড়িতাম। ডক্টর সাহা কলিকাতায় প্রথম যুব-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ প্লাবনের সময় আর্ত্তত্রাণে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রেরণায় ডক্টর সাহা প্রমুখ ব্যক্তিগণ যেমন বিজ্ঞান সাধনায় তৎপর হন তেমনি সমাজ সেবায়ও মন দেন। ইহার পরে ডক্টর সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মগ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। সেখানে দীর্ঘদিন তিনি পদার্থ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের হাতার মধ্যে ছাত্রদের অধ্যাপনায় এবং পরীক্ষাগারে গবেষণাকার্য পরিচালনায়ই তাঁহার সবটুকু সময় কাটিত না। দেশের শিল্পোন্নতিতে বিজ্ঞানের মুষ্ঠু প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ক্রমে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। এলাহাবাদ অবস্থান কালেই তাঁহার সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়" শীর্ষক নিবন্ধে আমি অন্যত্র তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ডক্টর সাহা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে রাধানাথ শিকদার প্রবন্ধটি ইংরাজী করিয়া দিলে বাঙ্গালোরের "ম্যাগনেটিক্স জার্ণালে" অথবা লণ্ডনের 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন। বড় আনন্দের কথা। আমি অবিলম্বে ইংরেজীতে "রাধানাথ শিকদার" লিখিয়া ডক্টর সাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। মাসখানেকের মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াও উত্তর পাই নাই। তখন তিনি শিল্পকর্ম ব্যপদেশে এলাহাবাদের বাহিরে ছিলেন। এই সময় এলাহাবাদে অভিযান এবং বিমান যোগে এলাহাবাদে পরিক্রমার কথা হয়। সময়োপযোগী বলিয়া মডার্ণ রিভিউতে ছাপাইবার কথা তাঁকে জানাইলাম। পত্রের উত্তরে তিনি জানাইলেন যে আমি যেন মডার্ণ রিভিউতেই ইহা প্রকাশিত করি। বাস্তবিক পক্ষে "রাধানাথ শিকদার" শীর্ষক আমার রচনা সম্বন্ধে ডক্টর সাহার এইরূপ আগ্রহ আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিল, যেমন উৎসাহ পাইয়াছিলাম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে। তিনি আমার রচনা "কদম্বগী

ব্রাহ্মসমাজী" পাঠ করিয়া প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে বিশেষ সাধুবাদ করিয়াছিলেন। তখন সবেমাত্র গবেষণাকার্য্যে মন দিয়াছি। এই সময় ইঁহাদের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া অধিকতর আগ্রহে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ডক্টর সাহার সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলিত। হয়ত খুঁজিলে এখনও তাঁহার দুই-একখানি পত্র পাইব।

ডক্টর সাহার উৎসাহ হইতে আরও একটি বিষয় তখন লক্ষ্য করি স্বদেশীয় কীর্তিমান পুরুষদের বিস্মৃত বা প্রায়-বিস্মৃত গৌরব-গাথা উদ্ঘাটনে স্বদেশবাসীদের আন্তপ্রত্যয় বাড়িয়া যায়। এ কার্যে যাহারা ব্রতী, তাঁহারা প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক তাঁহার পত্রাদি হইতে এই মনোভাব জানিতে পারিলাম। ডক্টর সাহা নিজেও যে ছিলেন সত্যিকার স্বদেশ-ভক্ত বৈজ্ঞানিক। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। তিনি সাহিত্যসাধক দীনেশ চন্দ্র সেনের ইংরেজীতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংশোধন করিয়া দিতে-ছিলেন। একদিন নিবেদিতা দীনেশচন্দ্রকে বলেন "দীনেশবাবু আপনি জানেন না যে আপনি স্বদেশের কি উপকার করিয়া যাইতেছেন। আপনি সত্য সত্যই একজন প্যাট্রিয়ট।"

'রাধানাথ' প্রসঙ্গের পর ডক্টর সাহার সঙ্গে আমার পত্রালাপ বন্ধ হইল। আমাদের 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ'র সূত্রে ডক্টর সাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিশেষতঃ সম্পাদক রামানন্দবাবু তাঁহার বড়ই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সেবার প্রথম তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখনও তিনি 'প্রবাসী মডার্ণ-রিভিউ' এর কথা পাড়িলেন এবং একস্থানে বলিলেন, "I have great regard for that old man Ramānda Babu।" দূর হইতে ডক্টর সাহার স্বদেশ গঠনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত এসোসিয়েশন বা বিজ্ঞান সভাকে ব্যক্তি-বিশেষের কবল-মুক্ত করিবার যে প্রয়াস চলে তাহার মূলে ডক্টর সাহার বিশেষ হাত ছিল। পরবর্তী কালে এই সভাটিকে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগারে পরিণত করিতে কত যত্ন লইয়াছিলেন তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই অবগত আছেন। বৌবাজারের ছোট চত্বর হইতে যাদবপুরের বিরাট ভবনে লইয়া যাওয়ার সুযোগ দিয়াছিলেন তিনি। ভারত রাষ্ট্র সায়েন্স এসোসিয়েশনের সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নব-রূপায়ণের পর প্রথম ডিরেক্টর হইলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা।

ডক্টর সাহা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান-অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছেন। কবে আসিয়াছেন ঠিক খবর জানিতাম না। আমি তখন নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। "মুক্তির সন্ধানে ভারত" মুদ্রণ কালে প্রায়ই সায়েন্স কলেজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট যাইতাম। তিনি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেন। তখন ডক্টর সাহার সায়েন্স কলেজে যোগদানের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিব। অবশেষে একদিন পুস্তক বাহির হইবা মাত্র আচার্য্য রায়কে প্রথম কপি দিতে গেলাম। তখন তিনি ছিলেন নিদ্রিত। আমি সেখান হইতে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ডক্টর সাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। চিরকুট পাইবা মাত্র পরীক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমার পরিচয় দিলাম। তিনি যেন কত কালের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহাকে ঐ কপিখানি দিলাম। তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বইখানি দেখিলেন, এবং তখনই বলিলেন "আপনি ইহার ইংরাজী করুন না কেন" এত বড় বই, বাংলা দেশে অত বড় ইংরেজি বই কে ছাপিবে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ইংরেজী করুন, আমি ছাপাইবার ব্যবস্থা করিব।" তখন বা কয়েক বৎসর পরেও বুঝি নাই ডক্টর সাহার প্রস্তাবের গুরুত্ব কতখানি। একখানি সুমুদ্রিত তথ্যভিত্তিক স্বাধীনতা

আন্দোলনের ইতিহাস কোনও বঙ্গ সন্তান কর্তৃক ইংরেজীতে রচিত ও প্রচারিত হইলে বাংলার স্থানের কথা কার্যতঃ এমনভাবে অবজ্ঞাত ও উপহসিত হইত না। আমাদের অতিরিক্ত বাংলা-প্রীতি, আধিকার নূতন পরিবেশে যেন "গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।"

ইহার অল্পদিন পরে, বৈকালের দিকে আচার্য প্রফুল্ল রায়ের নিকট বসিয়া আছি এমন সময় ডক্টর সাহা ঘরে ঢুকিলেন। প্রফুল্ল চন্দ্র আমাকে দেখাইয়া বলিলেন "মেঘনাদ, এঁকে জান?" তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন, "এঁর নাম যোগেশ চন্দ্র বাগল।" নিজের কথা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। তথাপি বলি যে, আচার্য্য রায় আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। ডক্টর সাহার দৃষ্টিও যেন ঐ দিন হইতে আমার দিকে বেশী করিয়া পড়িল। তিনি মডার্ণ রিভিউতে "মুক্তির সন্ধানে ভারতের" সমালোচনা লিখিলেন;

ইহার পর ডক্টর সাহার সঙ্গে যোগাযোগ আর ছিন্ন হইতে দি' নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বহুপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যশোহর অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তখন মেঘনাদ ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে ডক্টর সাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য হইলেন। পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী, মধুসূদন রচনাবলী এবং আরও বহু গ্রন্থও কিনিয়া লইলেন। যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তখনই তিনি পরিষদ সম্পর্কে খোঁজখবর লইতেন। যুক্তিতর্ক বাদানুবাদ আতীয় প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' প্রতি তাঁহার কত দরদ। তাছাড়া কিছু কিছু বাংলা প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন মাত্র। কোনও বাংলা পুস্তকাদি তিনি লেখেন নাই বা প্রকাশিত করেন নাই। এ কারণ কোনও সাহিত্য সম্মেলনে পৌরোহিত্য করায় তাঁহার বিশেষ সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু এই সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তিনি বেশ পরিষ্কার প্রাঞ্জল বাংলায় তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে পারিতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

তখন দ্বিতীয় মহাসমর প্রায় শেষ হয়-হয়। প্রথম শ্রেণীর একদল ভারতীয় বিজ্ঞানী আহূত হইয়া বৃটেন ও আমেরিকার দেশ পুনর্গঠন ব্যাপার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গমন করেন। বলাবাহুল্য ডক্টর সাহাও এই দলে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া ডক্টর সাহা সায়ান্স কলেজে এবং মনে হয় অন্যত্রও টেনেসী ভ্যালির পুনর্জীবন লাভ সম্বন্ধে বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিতে লাগিলেন। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে লোক আসিলেন, কাঁথির সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি স্থির করিবার জন্য। এই প্রতিনিধিকে লইয়া ডক্টর সাহার নিকট গেলাম। সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি হইবার অনুরোধ জানাইতেই তিনি অতিমাত্রায় বিস্ময় বোধ করিলেন। এবং বাংলা সাহিত্যের সেবার তাঁহার মোটেই সময় হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া অনেক আপত্তি তুলিলেন। আমি বাধা দিয়া বলিলাম, টেনেসী ভ্যালীতে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন—মরুভূমি মানুষের অধ্যবসায়ে কিরূপে শস্য শ্যামল জনপদে পরিণত হইয়াছে তাহাই সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করিবেন—আর ইহাই হইবে আধিকার নূতন সাহিত্য। কথাটি ডক্টর সাহার মনে ধরিল। তিনি অসম্মতি জানাইলেন। যাতায়াতের সময় এবং লইয়া যাইবার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে প্রতিনিধি মহাশয় ভার লইলেন।

আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া মেদিনীপুর যাই। মূল সভাপতি ডক্টর মেঘনাদ সাহা; সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। ডক্টর সাহা আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ভবনে সম্মেলন ক্ষেত্র। লোক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিল ধারণের স্থান ছিলনা। সভাপতি রূপে ডক্টর সাহা টেনেসি

ভাষায় সম্পাদক মেক্সিকোর উপর বক্তৃতা দিলেন। তৃতীয় প্রতিনিধিও ব্যতীত কিছু বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম ভারতীয় বক্তৃতা সেখানের মনে নূতন ভাবনার সঞ্চার করিল। টেনেসি ভ্যালী একটি মরুভূমি; এখানে অভিনব ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে বাঁধ ও দীঘিকা খনন করা হয়, জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই শত শত মাইল ব্যাপী ভূখণ্ডকে প্রকৃত ভাম সবুজ গাছপালা ফুল শস্যাদিতে পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। অতি সরল অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় ভট্টর সাহা জনমণ্ডলীর নিকট বলিয়া চলিলেন। ভট্টর সাহার ইংরেজী বা বাংলা বক্তৃতা ইতিপূর্বে শুনি নাই। তাঁহাকে বাগ্মীর পর্যায়ে ফেলা যায় না বটে; তবে তাঁহার [illegible] ভাবণ শুনিয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইলাম। [illegible] করিয়াছি বিস্তর। সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিন দিবস [illegible] মেদিনীপুরে ছিলাম। নিকট হইতে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ এই সময় পাই। অত বড় বৈজ্ঞানিক কিন্তু আনাড়ম্বর, আলাপ-আলোচনায় ছিলেন [illegible], পোষাকে-পরিচ্ছদে এত সদাসিধা।

মহাসম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটিল। দিকে দিকে বিবিধ সমস্যা দেখা দিল। ইংলণ্ড বিজয়ী হইয়াও বিধ্বস্ত। সর্বাগ্রেই আত্মরক্ষা করিবার ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত। এদিকে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিলেও চলিবে না, তবে কি আকারে দেওয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। দ্বিধার কালেও ইংরেজ [illegible] কূটনীতির খেলা খেলিয়া গেল, যাহার ফলে ভারতবর্ষ বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি রাজ্যরাষ্ট্রে পরিণত হইল। [illegible] মেঘনাদ বিজ্ঞানের সাধনার সম্ভাবনাগুলিকে [illegible] কল্যাণীতে রূপায়িত করিতে অগ্রসর হন। [illegible] কলেজ নব-রূপায়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গেসঙ্গেই নব-রূপায়ন ত্বরান্বিত হইতে থাকে। বিজ্ঞান মহাসম্মেলন এ্যাটম বা পরমাণু শক্তিকে লইয়া ঘুরে। এমনকি যুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে ইহা কার্যকরী হইয়াছে। এই পরমাণু আজিকার মানবজাতির কল্যাণ কর্মেও তো পুরোপুরি লাগানো যায়। ধ্বংসাত্মক দিক্ বর্জন করিয়া পরমাণু শক্তির এই রচনাত্মক কল্যাণময় শক্তিকে দেখিবার জন্য বিশ্ববিজ্ঞানীগণ উদ্‌গ্রীব হইলেন। ভারতবর্ষেও এই নিমিত্ত প্রথম উদ্যোগী হইলেন ভট্টর মেঘনাদ সাহা। যুদ্ধের মধ্যেই তাঁহার নেতৃত্বে "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" পরীক্ষণের কাজ সুরু হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তৎপর হইলেন। কলিকাতা সায়েন্স কলেজে নূতন বহুমূল্য যন্ত্রাদি বসাইয়া এই বিভাগে পরীক্ষা কার্যের সূত্রপাত হইল। ভট্টর সাহা এই সকল কার্যে একেবারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

দেশ-বিভাগ-ভিত্তিক স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই পূর্ববঙ্গবাসীদের অবস্থা দুর্গতির শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। যাদাহাদামার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমে জটিল হইয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ নর-নারীশিশু পিতৃপিতামহের ভিটামাটি ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইল। অগণিত মানুষের এই দুর্গতির দিনে ভট্টর সাহা বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে আগত জনসমষ্টির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচারিত করিলেন। উদ্বাস্তু অগুণিত অঞ্চলসমূহ বার বার পরিক্রমা করিয়া তাহাদের অবস্থা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার আহ্বানে আগত পূর্ববঙ্গাগত অধিবাসীদের পরিসংখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিবৃহৎ বই লিখিবার জন্য। এই উদ্বাস্তু সমস্যা হইতেই বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ ক্রমে রাজনৈতিক মেঘনাদ হইয়া উঠিলেন। বহু বন্ধুর নিকট তাঁহার নিন্দা প্রশংসা শুনিয়াছি। হয়ত নিন্দাই শুনিয়াছি বেশী। মানব-দরদী মেঘনাদকে জানিলে হয়ত তাঁহারা এরূপ সমালোচনা

করিতে অগ্রসর হইতেন না। মেঘনাদ পার্লামেণ্টের সদস্য হইলেন, সুতরাং উহার সমস্যার সুরাহা করিবার নিমিত্ত। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার নিজের "ধর্ম" ভুলেন নাই। সরকারের বিভিন্ন বিজ্ঞান-ভিত্তিক কার্যে তিনি বরাবর সাহায্যই করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীতে পদ্মিমেণ্ট তাঁহার মৃত্যুই তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

ডঃ সাহা বিবিধ কাজকর্মে খুবই ব্যস্ত। কলিকাতা হইতে প্রায়ই দূরে থাকেন বলিয়া তেমন আর দেখা সাক্ষাৎ হইত না। তবে পরপর যে তিনটি ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয় তাহা এখন বলিতেছি। স্বাধীনতার পর ইণ্ডিয়ান্স-লাইব্রেরীর নামকরণ হয়—ভাপনাল লাইব্রেরী। এলগ্যানেক হইতে ইহা বেল-ভেডিয়ারে প্রকৃতির রমণীয় প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরীর উদ্বোধন হইল কিছুকাল পরে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইহা উদ্বোধন করেন। বিতলের সুদীর্ঘ হল ঘরে সভা হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর সাহাকে দেখিয়া কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "একটা কথা অনেক দিন ধরিয়া ভাবিতেছি। আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় অবস্থা কাটাইয়া আমরা পাশ্চাত্যের সংস্রবে আসি। ইহার এক-খানি ইতিহাস লিখিতে পারেন কি? আপনি হাত দিলে লিখিতেই পারিবেন।" কি জানি কেন, আমার সম্বন্ধে ডক্টর সাহার একটি ভাল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। ইহার প্রমাণ আরো পাইয়াছি।

তৃতীয় দিন ভূকৈলাসে। বিদিরপুর ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর উদ্যমশীল মানব-হিতৈষি জয়নারায়ণ ঘোষালের স্মৃতি সভা। ডক্টর মেঘনাদ সাহা সভাপতি। আমাকে উদ্যোক্তারা প্রধানঅতিথি করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সভাঘরে উঠিতেই সভাপতি ও প্রধান অতিথির মাঝখানে এক বৃদ্ধ ঘোষাল-পুরুষ বসিয়া পড়িয়াছেন এবং উভয়ের মধ্যে যাবধানতা রক্ষা করিয়াছেন। সভাস্থলের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের অপূর্ব মহিমময় কীর্তিসমূহের কথা বিবৃত করিলাম। ডক্টর সাহাও সময়োচিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সভা শেষে আমরা পাশাপাশি বসিলাম। কিছু জলযোগও করিলাম। ডক্টর সাহা বিশেষ কিছু গ্রহণ করিলেন না। তিনি কিন্তু পুরাতন কথা ভুলেন নাই। আবার সেই সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের কথা উত্থাপন করিলেন। বাংলাদেশে গত দুইশত বৎসরে সামাজিক অবস্থা-বিপর্যয় হইয়াছে আশ্চর্য রকমের। দুইশত বৎসরের পূর্বে কোন ব্যক্তি যদি এখন সশরীরে আবির্ভূত হইলে সমাজের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাঁহার লাগিয়া যাইবে। নিশ্চয়ই ভাবিবেন হয় স্বর্গে নয় নরকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কখনও অর্থনীতি, কখনও ধোপদস্ত বিদ্রোহ, বিপ্লব সামাজিক বিবর্তনের বাহন জোগায়। তথ্যাদির ভিত্তিতে এই সব ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলে তবে বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনা সার্থক হইতে পারে। ডক্টর সাহা অল্প সময়ের মধ্যে এত কথা বলেন নাই বটে, তবে তিনি এই সামাজিক ইতিহাস রচনার ভার আমাকে গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। বুঝিলাম আমার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা দৃঢ়মূল হইয়াছে।

তৃতীয় বিষয়টি লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সংস্রব। আর এই কথা স্মরণ করিয়া মনে আজ যুগপৎ দুঃখ ও সুখ অনুভব করিতেছি। ডক্টর কালিদাস নাগের অনুরোধক্রমে আমি জামসেদপুর লৌহ খনির আবিষ্কর্তা প্রমথনাথ বসুর জীবনী লেখার ভার গ্রহণ করি। প্রমথনাথ বৈজ্ঞানিক, এবং স্বদেশের হিতকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। আমার এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে যে উনবিংশশতাব্দির শেষ তৃতীয়াংশ এবং

বিংশ শতাব্দির প্রথম ত্রিশ বৎসর এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙালীর চিত্তোদ্যানে যে সব মনীষী প্রসূন ফুটাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বসুর স্থান অতি উচ্চে। বাস্তবিকই তিনি চিন্তাবিদ ছিলেন। ইহা তাঁহার জীবন ও কর্ম আলোচনা করিতে গিয়া বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিলাম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সৌহখনির আবিষ্কর্তা বলিয়া সাধারণের নিকট তাঁহার প্রসিদ্ধি। বৈজ্ঞানিকপ্রবর সমাজ-কল্যাণকামী মেঘনাদের চিত্তে প্রমথনাথ যে শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রমথনাথের জীবনী রচনা কালে তাঁহার যোদ্ধকন্যার আগ্রহ উৎসাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বস্তুত তাঁহারই চেষ্টা-উদ্যোগে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল। বই লেখা শেষ হইল। কিন্তু ভূমিকা কাহাকে দিয়া লিখাইব। প্রমথনাথ মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক, কাজেই কোনো বৈজ্ঞানিককে দিয়া ভূমিকা লিখাইলে ভাল হয়। ডক্টর সাহা তখন পার্লামেন্টে বিরোধী-দলভুক্ত। প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সুষমা সেন কংগ্রেস পক্ষে পার্লামেন্ট সদস্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি হইল না। আগে জানিতাম না ডক্টর সাহা প্রমথনাথের জীবনী প্রকাশে বিশেষ উৎসাহী। শ্রীযুক্তা সুষমা সেন তখন ডক্টর সাহার আগ্রহাতিশয্যের কথা আমাকে বলিলেন, আরও বলিলেন, "দেখুন, আপনি বাবার জীবনী লেখার ভার নিয়েছেন জেনে ডঃ সাহা বলেছিলেন, তবে এবার প্রমথনাথের জীবনী নিশ্চয়ই বার হবে।"

বই লেখা শেষ হইল। ডক্টর সাহা কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি সায়ান্স কলেজে পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি লইয়া গেলাম। পাণ্ডুলিপি তিনি আগ্রহের সঙ্গে দেখিলেন। তাঁহার 'Foreword' বা ভূমিকা কয়েকদিন পরে আমাকে দিলেন। এই দ্বিতীয় দিন তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে পার্লামেন্ট সদস্য, আর, এন, পিয়র সম্পাদক শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। "সাতসাগরের ঢেউ সতর মাস" লিখিয়া ত্রিদিববাবু বর্তমানে সাধারণ শিক্ষিতের নিকটও প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। অন্য টেবিলে—যেখানে আমি বসিয়া ছিলাম, আসিয়া তিনি ভূমিকাটি দিলেন। ভূমিকার শেষে তিনি আমার সম্বন্ধে বেশ দু-চার কথা লিখিয়া দেন। পুস্তক প্রকাশের পর তাঁহাকে নিজ হস্তে বইখানি দিতে যাই। কে জানে মরধামে এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। ডক্টর মেঘনাদ সাহার বাড়ীতে কখনও যাই নাই, আমাদের মনে হইত—সায়ান্স কলেজই তাঁহার ঘরবাড়ী।

আচার্য্য যদুনাথ সরকার—ডক্টর সাহার মানব কল্যাণকর কার্যের বিশেষ সমাদরকারী ছিলেন। অসুস্থতার কথা জানিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই। একদিন কাগজে পড়িলাম, তিনি ডক্টর সাহার স্মৃতি-সভায় পৌরহিত্য করিয়াছেন পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কথা প্রসঙ্গে ডক্টর সাহার স্মৃতি সভার কথা উঠিল। আচার্য্য যদুনাথ বলিলেন, "আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। সাধারণ সভা সমিতিতে যাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছি। তবে মেঘনাদের স্মৃতিসভায় না গিয়ে পারিনি। দ্বিতীয়তে যেদিন তার মৃত্যু হয় তার পূর্বদিনের পূর্বদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। তখন কি বলেছিল জান? স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে আমরা পূর্ববঙ্গ হারিয়েছি, এখন বাংলা-বিহার মার্জারের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বও ঘুরে যাবে। নিতান্ত কর্তব্য বোধেই মেঘনাদের স্মৃতি সভায় গিয়েছিলাম।" বিজ্ঞান—সাধক, মানবহিতব্রতী ডক্টর সাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইয়াছে।

উত্তরায়ণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

॥ নীলিমা দাশগুপ্ত ॥

পরদিন খুব ভোরে সানাই-এর সুরে সকলের ঘুম ভাঙলো। হবিষ্যদল খেতে বলে সকলে উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি। সকলের চোখমুখ আনন্দে আর উৎসাহে উজ্জ্বল। মায়াদেবী মেয়েকে মৃদু ঠেলে দিয়ে বললেন, "মিলি ওঠ। হবিষ্যদল খেতে যাবি—" "হুঁ" বলে মল্লিকা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুলো। "ওঠ্‌রে মিলি—আরম্ভ হয়ে গেছে হবিষ্যদল—" "মা, আমি ওসব খেতে-টেতে পারবো না।" এবার মল্লিকা জেগে চুপ করে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো মায়াদেবী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন "মাথাব্যথা ছাড়েনি এখনও?" মল্লিকা অস্ফুটে বললো "না—" মায়াদেবী বললেন, "কেন মিলি ছেলেমানুষি করছিস? আনন্দের দিনে সকলের এতে কষ্ট হয় না? তুই উপোস দিলি মাথাধরার নাম করে আর বউমা খেলেনা পেটব্যথার নাম করে—" "বৌদি কাল খায়নি—?" ধড়মড় করে উঠে বললো মল্লিকা, "বউমা তো পাতেই বসেনি, আর অরু পাতে দাদাবাবু বলে উঠে গেছে।" মল্লিকার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেলো কিন্তু যাকে সেটা বুঝতে দিলো না। ঠাণ্ডা গলায় বললো, "বৌদিরই তো সব দোষ। কেন আমাকে অমন করে সাজালে?" মায়াদেবী হাসি গোপন করে বললেন, "কেন বাড়ীতে কি আয়না ছিলো না? নিজে আগে দেখে ঠিক করে নিলেই পারতে?" "বৌদিটা কী কম শয়তান মনে করেছো? পরে পরে আমাকে আয়নার কাছে যেতেই দেয়নি—আমার আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য না খেয়ে বসে আছেন,—দেখাচ্ছি মজা!" কাপড় চোপড় ছড়িয়ে দিয়ে মল্লিকা তখুনি উঠে পড়লো।

মায়াদেবী নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন।

এদিকে কে এক বিপত্তি কাণ্ড করে বসে আছে। বেলাদেবী মেয়ের হবিষ্যদল সেরে ছেলে মানে জামাইএরটা সারতে যাচ্ছিলেন রোদেদের নিয়ে। বেলাদেবীর সামনের দাঁত দুটো বাঁধানো। রাত্রে শোবার সময় একটা চীনামাটির বাটিতে সেটা থাকে ভিজানো। ওঁর এ্যাটাচড্ বাথরুমের তাকের ওপর থাকে বাটিটা। মেয়ের বেলায় তাড়াহুড়ো করে ফোকলা দাঁতেই সারলেন কিন্তু জামাইএর বেলায় তো আর তা পারেন না। দাঁত পরতে গিয়ে দেখেন কে যেন বাটি সমেত দাঁত টুকরো টুকরো করে রেখে দিয়েছে। দাঁতের পরিণতি দেখে বেলাদেবী প্রায় কেঁদে ফেললেন। ডেকে পাঠালেন স্বামীকে দেখালেন আঙুল দিয়ে, এই দেখো কাণ্ড। "এক্ষুনি দাঁতের ব্যবস্থা কর একটা ফোকলা দাঁত নিয়ে আমি কোতুল জামাইএর সামনে যেতে পারবো না—"।

নরনারায়ণবাবু স্ত্রীর কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "কী করে এখন ব্যবস্থা করবো বলো? এতো কলকাতা নয়, আর কলকাতাতেও রোববার একবেলার মধ্যে দাঁত করে দিতে পারে না। তবু ডাবল চার্জ দিয়ে চেষ্টা করে দেখতাম একবার।" বোনেরা বললেন, "পাঁচমিনিটের ব্যাপার মুখবন্ধ করে নেরে আসবি চল্।" বেলাদেবী রাজি হলেন না কিছুতেই। অগত্যা হিরন্ময়ীদেবী লিডিং পার্ট নিয়ে বরণডালা হাতে করে চললেন। পেছনে পেছনে গেলেন আরো অনেকে—।

শুভবিবাহ নির্বিঘ্নে হ'য়ে গেলো। দাশিরবাবুর নিখুঁত পরিচালনায় খাওয়া-দাওয়া—আদর আপ্যায়ন—অতি

চমৎকার হলো। বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন। সকলেই খাওয়া দাওয়ার এবং ব্যবস্থাপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে গেলেন। প্রচুর উপহার পেলো খোপা, সবই ভাল। সকলেই খুশি।

আজ সকাল থেকে সানাইএর সুর অন্যরকম। বাড়ির সে কথাই নেই। বিষাদের সুর সর্বত্র। শীতল শিথিল অবসাদ নেমেছে সকলের শরীরে মনে। খোপা ভয়ানক চাপা মেয়ে। অনেকদিন থেকেই কাঁদছে চুপি চুপি। আজ তার বাঁধ ভেঙে গেছে—অবিরল অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে দু'গাল বেয়ে। ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে পর্যায়ক্রমে নারায়ণবাবু, ভোলা, নীলু তিনজনই কেঁদে ফেললে। ভোলা নিজেকে খুব শক্ত মনে করতো, কিন্তু বোনের কাছে এসে ও কোন কথাই বলতে পারলোনা কান্নাতে কণ্ঠরোধ হলো ওরই সবচেয়ে বেশী। ছুটে পালিয়ে গেলো বোনের চোখের সামনে থেকে। একমাত্র শক্ত রেখা গেলো বেলাদেবীকে। তিনি মুখের ভাব যথাসাধ্য স্বাভাবিক করে মেয়ের বাক্সপত্র গুছিয়ে দিচ্ছেন।

আর কাঁদছিলো সন্ধ্যা। বাথরুমের দোর বন্ধ করে ফুলে ফুলে কাঁদছিলো। আজকে দিদিরেবীরাও যাচ্ছেন। খোপা মাসিমাকে সারা রাস্তা সঙ্গে পাবে—সুবিধেই হবে। কিন্তু সন্ধ্যাকে নিয়ে যাচ্ছেন না, সেমুহূর্তে দিদিরেবী তাঁর প্রতিজ্ঞাটি ভঙ্গ করলেন। অবশ্য আষাঢ় তিনি দিয়ে রেখেছেন, গিয়েই লোক পাঠিয়ে সন্ধ্যাকে দিল্লী নেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। মিঃ গুহ অর্থাৎ তাঁর স্বামীকে আগে একবার জানানো দরকার। কিন্তু এ কাঁকা আষাঢ়ে ওরকম পাখার মতো হাল্কা মেয়ে সন্ধ্যা নয়। অন্তত এই মাসির অনোরঞ্জনের জন্য সন্ধ্যা কী করেছে আর না করেছে। দুইবেলা মাসির শাড়ি-ব্লাউজ, ড্রয়িংরুম সাজ-গ্যাজ সামনে ধরিয়ে দিয়েছে। নিজের আনন্দ বার্তা দিয়ে পায়ে পায়ে ঘুরেছে মাসির, এমনকি মাসির নেলপালিশ পর্যন্ত নিজের হাতে করে দিয়েছে—সব বৃথা গেলো। এর মূল কারণ বুঝে নিতে সন্ধ্যার বাকী ছিলো না। বিমানবাবু নিশ্চয়ই আপত্তি জানিয়েছেন। বিমানবাবুর মন যে খারাপ, তা সেদিন গানের আসরেই বুঝে নিয়েছে সন্ধ্যা। তবু ওর প্রচণ্ড ভরসা ছিলো, একবার দিল্লীতে গিয়ে পড়লে বিমানবাবুর এ মোহ কাটতে কতক্ষণ? কিন্তু……।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মল্লিকার ওপর। ক্ষমতা থাকলে ও যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে মল্লিকাকে। নিজের মনেই সন্ধ্যা বারে বারে দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠলো। যে এই দুর্ঘটনোর, এই মানসিক বেদনার হেতু, যার বিরুদ্ধে এত শাপ-শাপান্ত করে চলেছে সন্ধ্যা—সে ওদিকে প্রশান্ত মনে সন্তুষ্ট চিত্তে মাসীমার সাহায্য করছে। বলিষাও সহায়তা করছে বেলাদেবীর, টুকি টাকি জিনিষ এগিয়ে দিচ্ছে হাতে হাতে। একে একে বাক্স বিছানা সব গোছানো হয়ে গেলো। একটা বেতের ঝাড়নে কি সব ভরতে ভরতে বেলাদেবী মল্লিকাকে বল্লেন, "মিলি যা তো মা, ছোট খুড়িমার কাছ থেকে কলার থলিগুলো নিয়ে আয়—"মল্লিকা উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলো "কলার থলি দিয়ে কী হবে বড়মামী?" বেলা দেবী বললেন, "ছেলে যখন প্রথম শ্বশুর বাড়ি যায়, তখন সঙ্গে গোটা কলার রঙীন থলি করে দিয়ে দিতে হয় সঙ্গে।" মল্লিকা চলে গেলো থলি আনতে। মেয়র সুরেন সেন হন্তদন্ত হ'য়ে দ্রুত পদে এসে বললেন, "বৌদি! শিগগির এদিকে এসো। খড়দা আর খোপা গলা জড়াজড়ি ক'রে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। বেলাদেবীর মুখও সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্লান মেঘে ঢেকে গেলো। উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। কণ্ঠ হুলহুলিয়ে উঠলো, চোখেও এসে গেলো জল। নিজেকে সংযত করে, নিশ্চিহ্ন করে চোখের জল মুছে নিয়ে, তারপর উঠে গেলেন ওখান থেকে।

মল্লিকা পূর্বদিকের কোণার ঘরে ঢুকতেই শ্যামাসুন্দরী ওমা—"বলে কেঁপে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর হাত থেকে ছুটো ক্রীমক্রেকারের বিস্কুটের টিন ধ-প্ করে পড়ে গেলো নীচে। কাঁকি দেখে ছুটো টিনের চাকনাই ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়লো আর একটা থেকে কিছুটা সীতাভোগ এবং অন্যটা থেকে কিছুটা মিহিদানা পড়ে গেলো মেঝেতে। পারলে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতো মল্লিকা, কিন্তু সেটা আরো খারাপ দেখাবে বলে, হাসিমুখে উবু হ'য়ে টিনের চাকনা ছুটো কুড়িয়ে বিস্কুটের টিনছুটো ভালোক'রে এঁটে বন্ধ করে শ্যামাসুন্দরীর হাতে তুলে দিলো। তারপর মুখের ভাব খুব স্বাভাবিক করে আন্তরিকতার সুরে বললো, "ছোট দিদিমা! আপনারা তো পরশু যাচ্ছেন। চাকনাগুলো আলগাকরে একটু না রাখলে গন্ধ হ'য়ে যেতে পারে—" মুখ কাঁচুমাচু করে শ্যামাসুন্দরী বললেন, "কাওর কাছে কইস্‌না মা—তর দাদুতে না কিন্তু খাইতে পারে না। কইলেন, সীতাভোগ মিহিদানা খাইয়া ভাখসেন—ওটা নাকি সইহ্য হয়। তাই—" অপ্রস্তুত মল্লিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "কী কাণ্ড! আপনার তো তাহলে আরো অনেক বেশি ক'রে দেওয়া উচিৎ ছোটদিদিমা। রঙ্গমাসীকে বলুন না—বস্ত একটা হাড়ি ক'রে দিয়ে দেবেন' খন।" শ্যামাসুন্দরীকে উত্তর দেওয়ার কোন অবকাশ না দিয়েই মল্লিকা আবার বললো, "আমি কলসার বলিগুলো নিতে এসেছি।"

শ্যামাসুন্দরী আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন, "ঐ তো টিক্ কইরা রাইখ্যা দিছি ডালায় লইয়া যাও।"

ভোলা প্রায়ই তার তৈরী কিচেনগার্ডেনের উল্লেখ করতো। তার তৈরী মানে—মালিকে সবজি বাগানের জন্য একটু বিশেষরকম উৎসাহ দিয়েছে আর নানারকম সবজির চারা কিছু কিছু এনে দিয়েছিলো—এই আর কী। মালীমাকে বলি এনে দিয়ে হাতে আর কোন কাজ খুঁজে পেলো না মল্লিকা। সকলেরই ঘুমের বেলারা ঘরঘরে অন্ধকার। বাড়ির ভেতর ভাল লাগলো না। "ভোলাদার কিচেন গার্ডেনটা একবার ঘুরে আসি গে—"মল্লিকা নিচে নেমে গেলো। সবজি বাগানের একপাশে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। অজস্র কৃষ্ণচূড়া ফুটে আছে! "বাঃ এত চমৎকার ফুল এখানে—" গাছটা যেন অনাবৃত অবস্থায় একঘরে হয়ে পড়ে আছে—। মল্লিকা গাছের ডাল ছুইয়ে ধীরে ধীরে কোঁচড়ে একটা ছুটো করে ফুল তুলতে লাগলো। ওর মনে হলো, সকলের চোখের আড়ালে এমন ফুল অনাদরে ঝরে পড়ছে, ও যদি ফুলগুলি সাজিয়ে রাখে ছুইং রুমে তবু ফুল কিছুটা সার্থকতা লাভ করবে হয় তো। কী স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ কৃষ্ণচূড়ার। নাকের কাছে অত্যন্ত মমতার সঙ্গে কয়েকটা ফুলগুলিয়ে আঘ্রাণ করতে যাচ্ছিলো মল্লিকা, হঠাৎ দেখে ফেললো অদূরে তারাদেবী প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে কাপড় ছাড়তে দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার চোখমুখ টকটকে রাঙা হ'য়ে উঠলো। কান পর্যন্ত গরম হলো। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে—সম্মুখে মহাস্ত মুখে দণ্ডায়মান বিমান ভদ্র। মল্লিকা অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে হাতের মুঠি শিথিল করে ফেললো। ওর কোঁচড় আলগা হ'য়ে সমস্ত কৃষ্ণচূড়া নিজের পায়ের কাছে ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো পুষ্পবৃষ্টির মতো। মহা অপ্রস্তুত বিমান ক্ষিপ্র হাতে ফুল কুড়োতে লাগলেন। মল্লিকা বাধা দিলো। কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না বিমান। পাছে বিমান তারাদেবীকে দেখে ফেলে সেজন্য ফুল কুড়িয়ে সাহায্য করতে পারলো না মল্লিকা, কাঠ হয়ে বিমানকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলো। বিমান ওঁর পকেট থেকে রুমাল বার করে একটি একটি করে সমস্ত ফুল সন্তর্পণে কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন।

স্মিতমুখে বললেন "খুব রাগ করলেন তো আমার ওপর?" মল্লিকা আড় চোখে একবার দেখে নিলো তারাদেবী এখনও আছেন কি না। সেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসিমুখে বললো "বাবারে আপনার ওপর রাগ করবো কেন?"

"ফুল কেমন দিলেন"—

"ফুলতো কেললাম আমি নিজে, আপনি কেমনতর কিরকম?" সরল বিস্ময় মল্লিকার কণ্ঠে। মল্লিকার চোখে চোখ রাখলো বিমান। মরম গলায় বললো, "যখন রাগ যখন করেননি, তখন থাক ও কথা।" একটু সময় নিলেন বিমান। তারপর হেসে বললেন অস্ফুটে, "কালকেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মল্লিকাদেবী— "আমি কোথায় ছিলাম—"আবদ্ধ গলা মল্লিকার। সেইদিনকার সেই শিরশিরানি আবার যেন একটু একটু বোধ হচ্ছে মল্লিকা। "বাড়িতেই ছিলেন—।" বিমান বললেন। "তবে—?" ফুলদানীর ফুলেপড়া ডালটার দিকে তাকালো মল্লিকা। হয়তো ঠিক উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে বিমান রুমালে জড়ো করা ফুলগুলো মল্লিকাকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আরো এগিয়ে এলেন অনেক। একেবারে মল্লিকার মুখোমুখি। বললেন "এই নিন আপনার ফুল। চাবাগের হাতে এতক্ষণ ছেকে, তার গন্ধ মাধুর্য সবই উবে গেলো হয়তোবা," মল্লিকা কিছু বললোনা। শুধু কৌতুক চেপে নিল। বেশ সময় নিয়ে বিমান ফুলগুলো ঝাড়লেন, মল্লিকার মুখের চেহারা দেখে নিলেন এক পলক। তারপর মৃদু হেসে ছোট্ট গলায় বললেন, "আমার রুমালের ভাগ্য আমার চেয়ে ভাল অনেক"—"মানে—?"

"মানে? মানে কিছু নেই—" সহজের মেলে এগারও কথা বলা ছিলেন বিমান এবং মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেন ঠিক কথাই মুখে যোগাচ্ছে না বলে।

নিজেকে দুর্বল বোধ হ'তে লাগলো মল্লিকার। এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে গেলে ভাল হয় তাও বুঝলো। কিন্তু বিমান যে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তা আটকে—করে কী?

চুপচাপ দুজনে দাঁড়িয়ে রইলেন একটুকাল। বিমানই নীরবতা ভঙ্গ করলেন,

"আপনারা কাল যাচ্ছেন?" "হ্যাঁ কাল,"

"আজকে খেলে সবাই মিলে যেন একসঙ্গে হৈ চৈ করতে করতে যাওয়া যেতো—"

মল্লিকা চুপ করে রইলো, উত্তর দিলোনা।

"মল্লিকাদেবী।" চোখ তুললো মল্লিকা। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন বিমান। দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণের সুস্পষ্ট ইশারা। ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো মল্লিকা। আর একটা অজানা উত্তাপ ধীরে ধীরে ওর সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হচ্ছে। একটু দ্বিধা জেগেছিলো বিমানের গলায়, সেটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মল্লিকার চোখে চোখ রেখেই বললেন, "আমার সাদর আহ্বান, জানিয়ে রাখলাম মল্লিকাদেবী। গ্রহণ করার জন্য তাগিদ আমি দেবনা। আজ হোক, কাল হোক, একমাস পরে হোক দুবছর পরে হোক, যখন আপনার মন চাইবে, তখন ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠাইবেন আমার কাছে। কিছু লিখতেও হবেনা—শুধু আপনার নামটুকু, শুধু আক্ষরটুকু দেখলেই আমি দিল্লী থেকে ডুয়ার্স ফেলে আপনার কাছে চলে আসবো।" এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, "যত দেরী কেন হোক না—আমি ঐ চিরকুটের জন্য অপেক্ষা করে থাকবো মল্লিকাদেবী।" মল্লিকা চুপ। ওর চোখের সামনে থেকে বিমানের চেহারা ক্রমশঃ ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছে.....। হাসি মুখে এসে দাঁড়ালো রঞ্জন। বললো ওর দিকে তাকিয়ে.....এখনও কী রাগ আছে আমার ওপর। পেছন থেকেও রঞ্জনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে—এখনও কী রাগ আছে আমার ওপর?—পাশ থেকেও

তাই। মল্লিকা শুধু হ'য়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো। বিমানের কণ্ঠস্বর কানে এলো, আবার মিলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে: "মল্লিকাদেবী! কোনদিনই সে চিরকুট পাঠাতে আপনার মন চাইবেনা, এখনইকী আপনি সেটা আমিয়া দিতে চান?" মল্লিকা চোখ মিললো, "বিমান বাবু! আমাকে মাপ করবেন। আপনার কথার অর্থ আমি বুঝলাম না ঠিক্—" করুণ হাসি হাসলেন বিমান। "আচ্ছা তবে থাক্—" মুহূর্ত দুই চুপ করে থেকে আবার বললেন, "জানেন মিস মিত্র! আমি নীলুবাবুর কাছ থেকে আপনার কবিতার বই পড়ে ফেলেছি এবং শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কবিতা আমার রীতিমতো ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে।" মল্লিকা ছোট্ট করে হাসলো। বললো: "ভালো—তো—" চোখ উজ্জ্বল করে বিমান বললেন "কবিতার মাধুর্য গ্রহণ করবার মত আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে কিনা, তার একটু নমুনা শোনাতে চাই মল্লিকাদেবী।" "বেশ তো বলুন না"—স্মিতমুখে মল্লিকা বললো। খেয়াল করলে দেখতে পেত বিমানের চোখে যেন আলোছায়ার খেলা। হাসি হাসি মুখে আবেগের সঙ্গে বললেন বিমান,

"……ভালবাসার বর্ষরতা
মলিন করে তোমারি সম্মান
পৃথুল তার বিপুল পরিধান।
তাই তো বলি প্রিয়ে,
হাসিমুখে বিদায় করো যত কিছু দিয়ে;
……।"

এখনও কী না বোঝার ভান করবে মল্লিকা? কী করে করবে? কেমন করে করবে?—যে ভগবান। যে অন্তর্যামী আমাকে শক্তি দাও। সত্যিকার পথ দেখাও। মল্লিকার করুণ ললাটেবিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো। নিরুত্তর মল্লিকার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন বিমান তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,

"এবারও কী আমার কথা অস্পষ্ট মল্লিকাদেবী?" মল্লিকার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘামের কোঁটা বড় বড় মুক্তা আকারে দেখা দিলো। রুদ্ধকণ্ঠে তাড়াতাড়ি শুধু বললো মল্লিকা, "আমি কিছু বলতে পারছিনে বিমানবাবু এবারও আমাকে মাপ করুন আপনি।" বিমান আত্মসম্বরণ করে সহজ হয়ে বললেন, "আপনি সত্যিই পাষাণ। পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবো একদিন, এই আশা নিয়েই চললেম। আচ্ছা চলি—অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার—" —দু'পা গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন বিমান। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, "এত সুন্দর যে, সে কেন এত নির্মম?" অদ্ভুত এক করুণ হাসি হেসে ক্ষিপ্রপায়ে বিমান অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পেছনে মল্লিকা ভাসা ভাসা চোখে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। বড় বড় দুটো জলের কোঁটা টিক টিক করে দুলতে লাগলো মল্লিকার দুই চোখের দুই কোনে।

বাসি বিয়ের পরদিন সকালেই চলে এলো অরুণরা, ট্যাক্সি থেকে নেমে ভেতরে যেতে যেতে মায়াদেবী দেখলেন। তাঁদের সদর ঘরে কে একটি মেয়ে বসে আছে "বিলি দেখ্, তোর কোন বন্ধু এসেছে বুঝি—।" অরুণদের হলে মায়াদেবী হয়তো ঘরে ঢুকে মেয়েটির সঙ্গে দুচারটে কথা বলতেন, কিন্তু এখন একযাত্রা থেকে এসেছেন, রাস্তার কাপড়-চোপড়ে দাঁড়াতে আর ভালো লাগলো না, মলিনা মেয়েটিকে একবার দেখে নিয়ে মনে মনে তার অদৃষ্ট অদৃষ্টের প্রশংসা করতে করতে ঢুকে গেলো ভেতরে। মল্লিকা ততক্ষণে সদরে ঢুকে কথনার সঙ্গে অস্ফুটে কথা আরম্ভ করেছে। কেবল অরুণ মল্লিকাকে দেখে একটু চিন্তিত হয়ে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে ভিতরে চলে গেলো।

তোষলের জন্ত অপেক্ষা করছিলো বন্ধনা, মল্লিকাকে দেখে যতি বোধ করলো কিছুটা। বললো "তোষলদাকে আমার ভয়ানক দরকার—কিন্তু আর একটী সেকেণ্ডও অপেক্ষা করা যাচ্ছে না। তুমি, ভাই আমাকে একটু কাগজ আর পেনসিল এনে দাও।" মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো "কতক্ষণ ধরে বসে আছেন বন্ধনাদি?" হাত ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো বন্ধনা, "তা প্রায় মিনিট কুড়ি হবে—" বলেই ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, "দাঁড়ান, কাগজ পেনসিল নিয়ে আসি—"মল্লিকা চৌকাট পার হতেই বন্ধনা আবার ডাকলো. "মল্লিকা, শোনো—শোনো—!"

মল্লিকা ফিরলো, "আমার সময় কাগজে করে সামান্ত একটু সিন্দুর নিয়ে এসো।" একটু যেন অস্থিরতার সঙ্গে বললো বন্ধনা। মল্লিকা ছুটে গিয়ে রাইটিং প্যাড, পেনসিল আর সকলের অলক্ষ্যে মলিনার সিঁদুর কৌটাটা নিয়ে এলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বন্ধনা হুস্ হুস্ করে কয়েক-ছত্র কী লিখে, কাগজটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ভাঁজ করে মল্লিকার হাতে দিলো। মল্লিকা অস্ফুটে বললো, "প্যাডের ভেতর খাম আছে বন্ধনাদি—" "থাক্ দরকার নেই"। প্যাডের কোনা থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে সিঁদুর ঢালতে যাচ্ছিলো বন্ধনা, মল্লিকা বাধা দিলো, "বন্ধনাদি! আমি বলি কি—"একটু থেমে বন্ধনার চেহারা ভাল করে একবার দেখে নিয়ে "এখান থেকেই কেন সিঁদুর পরে যাননা, আমি দিচ্ছি পরিয়ে—রাস্তায় পরতে গেলে অসুবিধে হতে পারে।" বন্ধনা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে মল্লিকার মুখের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বেশ কিছুটা শঙ্কিত এবং আড়ষ্ট হয়েছিলো বন্ধনা। কিন্তু মল্লিকার মুখের চেহারায় কী দেখলে কি জানি আশ্বস্ত হয়ে বললে, "সেই ভাল, তুমিই তাহোলে পরিয়ে দাও।" বন্ধনা সীমন্তিনী হয়ে—তোষলদা আসলেই তক্ষুনি যেন চিঠিখানা পেয়ে—সে সময়ে আর একবার সচেতন করে অতিব্যস্ততার সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে চলে গেলো। হাতের ভাঁজকরা চিঠিখানা বারে বারে লোভ দেখাতে লাগলো মল্লিকাকে। একবার মুগ্ধ হয়েও ছিলো। ভাবলো খোলা চিঠি যখন, একবার পড়ে দেখিলে বন্ধনাদি আবার কী বিপদে পড়লেন। চিঠির ভাঁজ খুলেই, আবার মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে, তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল।

তোষল বাড়ি ফিরলো আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট পরে। নবম-ভাজে তখন খেতে বসেছে। মায়াদেবী চ[illegible] করতে গেছেন। তোষল ওদের দেখে, খোকার দিকে তাকিয়ে হাসলো, "বিয়েতে কেমন এনজয় করলি—?" "থু-উব" সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে মল্লিকা ভাবলে, ভেতে পুড়ে এসেছেন তোষলদা—চিঠিখানা এক্ষুনি দাওয়া বোধ হয় উচিত হবেনা। খাওয়া দাওয়া হ'ক্, দেবো তারপর। —কিন্তু, মা, সামান্ত একটু দেরীর জন্ত ওদের যদি মত পরিবর্তন হয়ে যায়, যে আশ্বাস ছুটুকটামি দেখলাম বন্ধনাদির—। গোগ্রাসে গিলে, বৌদিকে বলে মল্লিকা উঠে পড়লো। হাত মুখ ধুয়ে, আঁচলের গিঁট খুলে চিঠিখানা বার করে তোষলদার হাতে গিয়ে দিলো। তোষল ঘরে এসে তার ক্লান্ত শরীরটাকে তখন চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছে। চিঠি-খানা ডান হাতে, বাঁহাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে সদ্যরাখা পুরু লেন্সের চশমাটা নিয়ে ধীরে ধীরে আবার নাকে লাগালো। চিঠিখানা পড়েই লাফিয়ে উঠলো তোষল। দুর্বাধ একসঙ্গে কাঁধি দিয়ে, তখনি ওর সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে আবার প্রস্তুত ক'রে নিলো নোতুন যাত্রার। চিঠিখানা পকেটে রেখে তোষল বললো মল্লিকাকে, "মিলি, আমার ভাতটা ঢাকা দিয়ে রাখতে বলিস্। আমি এসে খাব।" মল্লিকা একছুটে রেকাবে করে বর্তমান থেকে আনা কিছুটা সীতাভোগ মিহিদানা ও এক'গ্লাস জল নিয়ে এলো। তোষল তখন ঘরময়

তালা দিচ্ছে। জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললো। এখন আর কিছু খেতে পারবো না রে মিলি, যে অলটা যে—" এক নিশ্বাসে সমস্ত অলটা চকচক করে খেয়ে, গ্লাসটা মল্লিকাকে ফেরৎ দিয়ে নিজেকে অনুস্থ করে গেলেন ভোজনদা।

ডাক্তারের আদেশে, একটা অক্সিজেনের সিলিণ্ডার আনতে বেরিয়েছিলো ডাক্তার। ডাঃ মুখার্জী বলেছেন, যা হয়েছে দয়াদেবীর আওয়ার্স আর দামবারও, তবু অক্সিজেন দেবার সঙ্গে শ্বাসের অসহ্য কষ্ট কমাবে কিছুটা—। পাঁচ মিনিটের জন্য বন্দনার ফ্ল্যাটে এসেছিলো সে সময়। অবরুদ্ধ ধরধরে গলায় বলেছিলো ডাক্তার, "বন্দনাদেবী! আর আপনাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন আমার কোনদিন হবে না। পিসিমার শ্বাস উঠেছে আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র তাঁর মেয়াদ। কথা বলার ক্ষমতা নেই। তবু তারই মধ্যে আপনার নামই করছেন। যদি আপনার অসুবিধে না হয়—" রুদ্ধ কণ্ঠে বিদায় নিয়েছিলো ডাক্তার। যেতে, যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরো বলেছিলো, "পিসিমা যদি আপনার জন্য অত অস্থির না হতেন, তা হোলে আরো কিছুদিন বাঁচতেন হয়তো…" বন্দনা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কথা বলেনি। ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে প্রথমে বন্দনার মনে হলো, এ ডাক্তার বাবুর নিতান্ত অন্যায় অভিমান কিন্তু তার পরই পাঁচমিনিটের মধ্যে ডাক্তারের বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিলো। পথে বেরিয়ে মনে মনে ভাবলো বন্দনা, ভোজনদাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। এমন অসময়ে অনেক লোকজনের দরকার।

বন্দনা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নয়ানীর মা সামনে এসে চোখ ঘুরিয়ে একরাশ মিঠে কড়া কথা শোনালো বন্দনাকে। "…এমন নির্দয় বউ যেন মানুষের না হয়—শুধু বউ বউ করে মা প্রাণটা দিলে—।"

ডাক্তার চোখ রাঙালো নয়ানীর মাকে। থেমে গিয়ে নয়ানীর মা গজর গজর করতে লাগলো।

কেমন যেন আবিষ্ট হ'য়ে গেলো বন্দনা। কোন কথা বলার বা শোনার মতো ক্ষমতা ওর তখন নেই। ডাক্তর অক্সিজেন ধরে দয়াদেবীর ডানদিকে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো। যেন খোদাই করা ডাক্তর মূর্তি একখানা, বন্দনা দ্রুত এগিয়ে দয়াদেবীর বাঁপাশে কাঁতর হ'য়ে বসলো। হাত-ঘড়িতে কালেলটা নিয়ে দয়াদেবীর মাথের সামনে ধরে রইলো ঠিকমতো। দুজনেই চুপ। একেবারে চুপ। মুহূর্ত গণনার সময় এসেছে এখন। কেবল মেয়াদ ঘড়ির পেণ্ডুলামটা টিক্ টিক্ করে ওদের আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হতে যেন নির্দেশ দিতে লাগলো। নীরবতা ভঙ্গ করলো নয়ানীর মা। ডাক্তরের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললো, "দাদাবাবু! এবার মা যোক্ চারটি মুখে যেয়ে চলো।" ডাক্তর ঘাড় নাড়লো। বন্দনা লজ্জিত হলো। এ ব্যাপারটা ওরই আরো আগে খেয়াল করা উচিত ছিলো। নয়ানীর মা সরে যেতে, বন্দনা অস্ফুটে বারবার ডাক্তরকে অনুরোধ জানালো সামান্য কিছু খেয়ে নিতে। ডাক্তর বেদনাঘন গলায় প্রত্যুত্তরে বললো "ঠিক আছে।" তারপর অসহ্য নিস্তব্ধতা। ধীরে-ধীরে বন্দনার সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এমন নিশ্চিন্ত মৃত্যুর এমন নিষ্ঠুর মৃত্যুযন্ত্রণার এত মুখোমুখি আর কখনও হয়নি বন্দনা। কান্নার অশান্ত ঢেউ বারে বারে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠছে কণ্ঠে। কিন্তু বিচলিত উদ্ভ্রান্ত ডাক্তর বন্দনার সামনে বসে কেমন যেন একটু উতলা বোধ করতে লাগলো। দরজার কাছে জুতোর শব্দ শুনে দুজনেই একসঙ্গে ঘাড় ফেরালো। ঘরে ঢুকলেন ভোজনদা। কপাটের বাইরে জুতো খুলে রেখে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ডাক্তরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দয়াদেবীর মুখের চেহারা দেখে নিয়ে ডাক্তরের কাঁধে সস্নেহে

হাত রাখলেন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "ভাত খেয়েছো?" ডাক্তর বোধহয় সামান্য একটু ঘাড় নেড়ে না জানালো। তোষলদা তেমনি স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, "আমি আসি, যাও তুমি খেয়ে এসো—" ডাক্তর কোন প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়ালো। তোষলদাকে বসতে একটা টুল এগিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তোষলদা বন্ধনার দিকে তাকালেন। বন্ধনার মুখ একেবারে যেন রক্তশূন্য ফ্যাকাসে। দয়াদেবীর অসহ্য শ্বাসকষ্ট ও যেন আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না, অনবরত দয়াদেবী মুখটাকে ডানদিক থেকে বাঁ দিকে আর বাঁদিক থেকে ডানদিকে করছেন। দাঁতহীন মাড়ির ফাঁকদিয়ে ঘাকে মাকে বেরিয়ে আসছে জিভ। বন্ধনার ফ্যাকাসে রক্তমুখ আর বিবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বহুদিন পরে তোষলদার আবার একটা কষ্ট বোধ হলো। উদ্গত একটা নিশ্বাসকে ধীরে-ধীরে চেপে মৃদুকণ্ঠে ডাক দিলেন, "বাছু!" কতদিন পরে কতদীর্ঘ কাল পরে তোষলদার মুখের সেই অতি প্রিয় ডাক। সেই আহ্বানে বন্ধনার হৃদয়ের সবগুলো তার একসঙ্গে যেন বেজে উঠলো। কেঁপে উঠলো বন্ধনা। তোষলদার চোখের উপর ধীরে ধীরে চোখ রাখলো। বন্ধনার কালো চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করছে। তোষলদা অত্যন্ত নরমগলায় বললেন, "খেয়েছিস্ তুই—?" চোখের জল উপচে পড়লো বন্ধনার। আত্মসোপন করার জন্য মুখ নত করে আস্তে গলায় কী যে বললো ঠিক বোঝা গেল না। তখুনি ফিরে এলো ডাক্তর। বোধকরি তোষলদার কথা রাখতে উঠে গিয়েছিলো, খুবসম্ভব কিছু না খেয়েই ফিরে এসেছে। নিজের মায়নায় নীরবে ফিরে বসলো। গলাদিয়ে অমানুষিক একটা শব্দ বারকয়ে দয়াদেবী হঠাৎ চোখ খুললেন। বন্ধনা ক্ষিপ্র-হাতে জলসেদটা ডাক্তরের হাতে দিয়ে মাথার দিকে নারায়ণের কাছ থেকে গঙ্গাজলের ঘটটা নিয়ে এলো। অতি সন্তর্পণে বিন্দু বিন্দু জল ঢালতে লাগলো দয়াদেবীর মুখে। কব বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো প্রথমে। তারপর একটু যেন গিললেন মনে হোলো। চোখ বিস্ফারিত করে তাকালেন। বোবা চোখে তাকিয়ে রইলেন বন্ধনার দিকে। আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট কমে আসলো অনেক। চোখের দৃষ্টিও অনেকটা স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক মনে হতে লাগলো। বন্ধনার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়েই আছেন। কিছু বলতে চাইলেন, ঠোঁট কাঁপছে থর-থর করে কিন্তু কণ্ঠস্বর নিষ্কেষ। কিছু বার হোলো না মুখ থেকে। চেষ্টা করছেন, প্রাণপণে চেষ্টা করছেন [illegible] শ্বাস আন্দোলন মনে হোলো। ভ্যাব ভ্যাবে হলো চোখ তারপর অদ্ভুত জড়ানো একটানস্বর বার হোলো দয়াদেবীর কণ্ঠ থেকে। "মা কমলা। এসি মা এতদিনে!" আর পারলোনা বন্ধনা। গঙ্গাজলের ঘটটা ঠক করে নামিয়ে রেখে দয়াদেবীর মাথার একপাশে মুখ গুঁজে কুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। দয়াদেবীর তোবড়ানো গালদিয়েও ঝরঝর অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মিনিট পাঁচেক কাটলো এই ভাবে। তোষলদার অস্পষ্ট তিরস্কৃত কণ্ঠ শোনাগেলো। "ছিঃ বন্ধনা। এই কি কাঁদার সময়? উনি শেষ সময় একটু শান্তি যাতে পেতে পারেন, নিয়ে-যেতে পারেন, তার চেষ্টা করো।" বন্ধনা কান্না গিলে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে করতে মুখ তুললো। দয়াদেবীর চোখের ঘোলাটে ভাব ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে আসছে। শ্বাস কষ্টের তীব্রতাও যেন অনেক কম। "বাবুল কৈ? বাবুল?" দয়াদেবীর গলায় ঘড়ঘড় করে শব্দ হচ্ছে।

ডাক্তর গিন্নিবার চোখের সামনে ঝুঁকলো আঁধার ডাক্তরের চোখে ঘনবর্ষণের আভাস, চেহারায় অনুশোচনার ছাপ। দয়াদেবী ডাক্তরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখদিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ডাক্তরকে। চোখ যেন বলতে লাগলো, "বাবুল কৈদোনা, ছি বাবুল

কেঁদোনা। আমার কষ্ট হচ্ছে—"। হাঁপানীর মতো টান উঠলো আবার। চোখ কীত থেকে কীততর হলো। ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন দয়াদেবী। বন্ধনার হাতে কানেলটা দিয়ে ডাক্তর পিসিমার বুকে হাত বুলোতে লাগলো। দুঃখে ও অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে ওর মন। একটা মস্ত বড় শ্বাস নিয়ে দয়াদেবী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। চোখের মণি আরো বড় হলো। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকাতে লাগলেন ডাক্তরের দিকে, বন্ধনার দিকে। "এইতো আমার সুমুখে হর-গৌরী—" হাঁপাতে হাঁপাতে বিড় বিড় করে বললেন, বলেই ডান হাত দিয়ে ডাক্তরের হাত চেপে ধরলেন বুকের ওপর। "মা কমলা—!" বন্ধ আটকানো গলায় বললেন দয়াদেবী। "তোমার হাত কৈ—? হাত দেখি মা তোমার—"বিভ্রান্ত বন্ধনা অসহায় ভাবে তোষলদার মুখের দিকে তাকালো। তোষলদার মুখের কোন রেখায় একফোঁটা বিচলিত ভাব নেই। ডাক্তরের পাশে দাঁড়িয়ে শক্ত চওড়া বুক দিয়ে বর্মের মতো যেন আড়াল করে আছেন ডাক্তরকে। ওষ্ঠের দৃঢ় চাপে তোষলের পাশের দুটো চোয়াল আরো কঠিন দেখাচ্ছে। তোষলদা চোখের ইশারায় জানালেন বন্ধনাকে হাত দেওয়ার জন্য। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বন্ধনা তোষলদার দিকে। একটা আশ্চর্য করুণ প্রার্থনা ভরা দৃষ্টিতে নিষেধ জানাচ্ছে বন্ধনা। "কমলা—। তোমার হাত কৈ? কৈ মা তোমার হাত——? রাখো রাখো আমার বুকে—" তোষলদা একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে চাপাস্বরে ধমকে উঠলেন, "আঃ বন্ধনা—।"

পার্টির দলপতির কথা শুনতে গোলো বন্ধনা। শুধু শিখলো নয় আদেশ। অবহেলা করবার আর যো নেই ওর। ত্রস্ত হ'য়ে আড়ষ্ট কম্পিত হাতখানা দয়াদেবীর বুকের ওপর রাখলো। ডাক্তরের হাত আকর্ষণ করে হাতড়াতে হাতড়াতে বন্ধনার হাত নিয়ে ডাক্তরের হাতের ওপর রাখলেন দয়াদেবী। ঐটুকুতেই প্রচণ্ড শ্রান্ত হ'য়ে হাপরের মতো শব্দ করে হাঁপাতে লাগলেন, "মা কমলা। আমার গৃহলক্ষ্মী, আর যাসনে মা—আর যাসনে। আমার হাবুলকে, আমার সোনামানিককে তোর হাতে দিয়ে গেলেম—ওকে ছেড়ে যাসনে মা, ক-ক-কো না, কক্ষ—নো—ও মা……।" দয়াদেবীর মুখ দিয়ে ফেন উঠতে লাগলো শেষ চেষ্টা করে কণ্ঠ দিয়ে শেষ কথা বার করলেন "খেয়াইকে—খেয়াইকে ব-লে এ-খা-নে—" মাথা চলে পড়লো দয়াদেবীর। কণ্ঠ নীরব হলো চিরদিনের মতো "পিসিমাগো—" অস্ফুট আর্তনাদ করে ডাক্তর সমস্ত শক্তি দিয়ে বন্ধনার হাত চেপে ধরলো তারপর পিসিমার বুকের ওপর বন্ধনার হাতের চেটোতে গুঁজে ফেললে মাথা। দয়ানীর মা দয়াদেবীর পা জড়িয়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়ে দিলো। বন্ধনা ভাবলেশহীন চোখে তোষলদার দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তোষলদা চেয়ে রইলেন বন্ধনার দিকে। বন্ধনার শিথিল ইন্দ্রিয় গুলির দিকে, বন্ধনার শীতল চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে তোষলদার চেতনা থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য পার্টির কর্তব্য অবলুপ্ত হ'য়ে গেলো। স্পষ্ট দেখতে পেলেন—ওঁর হৃৎপিণ্ড কে যেন নির্মম হাতে ওঁর চোখের সামনে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত ভালবাসে বাদুকে? এই মিথ্যে সত্য এত বিলম্বে প্রতিভাত হলো ওর মনে। দৃষ্টি নত করলেন তোষলদা। দেখলেন, সে একই ভাবে বন্ধনার হাত আশ্রয় করে মাথা গুঁজে পড়ে আছে ডাক্তর। এই প্রথম, তোষলদার নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হতে লাগলো। বুকের মধ্যে ধক্‌ ধক্‌ করে কে যেন বারবার জানাতে লাগলো—ওরও আশ্রয় চাই ওরও চাই আশ্রয়। ওদিকে আর চেয়ে থাকতে পারলেন না তোষলদা। চোখ সরিয়ে নিলেন। মুখের রক্ত ক্রমশঃ যেন সরে সরে যাচ্ছে। মনের ট্রেনিং ঘোরানোর জন্য

আলাপ চেষ্টা করতে করতে, নিজের ব্যাকারে মুখখানা বন্ধুদের চোখের সামনে থেকে লুকোবার জন্য চটকরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার ধারের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তোষলদা।

বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরলো তোষল। রাস্তায় মানুষের ভিড় তখন একেবারে পাতলা। দু একটা রিকশার টুং-টাং, দু চারটে ট্রামের ঘড়-ঘড় শব্দ ছাড়া আর বিশেষ কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যে থেকে মুষলধার ভাস্করের সঙ্গে আবার ওর বাড়ি যেতে হয়েছিলো। ভাস্করের মাসীমা কিছু বিলি ব্যবস্থা করে, বন্ধুকে অন্তত একটা রাত্রি সেখানে থাকতে রাজি করিয়ে তবে তোষল ফিরতে পেরেছে। আজকে ওর ওখানে থাকারই বড় প্রয়োজন ছিলো এবং নিজেও কিছুতেই আসতো না যদি না আবার আজকেই বৃহত্তম প্রয়োজনের সম্ভাবনা থাকতো। নিরুপায় হয়েই আসতে হয়েছে তোষলকে। মায়াদেবী সামনেই ছিলেন। তোষলের পরিচিত পায়ের শব্দ পেয়ে এগিয়ে এলেন। ভিজতার করতে গিয়ে চমকে গেলেন মুখের চেহারা দেখে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন "তোষল! কী হ'য়েছে তোর? অসুখ করেছে?" তোষলের তখন যেন আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কাকীমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরজার তালা খুলতে খুলতে বললেন। "না কাকীমা কিছু হয়নি। একটু ক্লান্ত হয়েছি বোধ হয়" "ক্লান্তি আবার আছে নাকি তোর?" একটু উষ্মা প্রকাশ করেই মায়াদেবী রান্নাঘরের কাছে এসে ঠাকুরকে তাড়া তাড়ারি গরম করতে আদেশ দিলেন।

মল্লিকাও উৎকর্ণ হয়ে ছিলো। তোষলদার সাড়া পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে গেলো, মায়াদেবীকে বললো, "মা, তুমি শোওগে যাও। আমি এখন আছি—।" মায়াদেবী বিস্মিত স্বরে বললেন "তুই যে এখনও বড় ঘুমাস্‌নি মিলি?" "একখানা খুব ভাল বই পড়ছিলাম মা, ঘুম-টুম পালিয়ে গেছ্‌লো।" "আচ্ছা এক বই-পাগলা মেয়ে হ'য়েছে—যা হোক—" মৃদু হেসে ওপরে উঠে গেলেন মায়াদেবী। মল্লিকা পর্দা সরিয়ে তোষলের ঘরে উঁকি মারলো। জুতো জামা পরেই তোষলদা কাত হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন। বদার ভঙ্গিটা অত্যন্ত ক্লান্ত। মল্লিকা রান্না ঘরে এসে ঠাকুরকে নির্দেশ দিলো। তোষলদার খাবারটা তাঁর শোবার ঘরের টেবিলেই দিয়ে আসতে। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করলো মল্লিকা। তারপর তোষলদার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একেবারে সামনে এসে মল্লিকা আস্তে ডাকলো। "তোষলদা—।" তোষলদা টেনে চোখ খুললেন, চোখে মুখে সর্বহারার চিহ্ন সুস্পষ্ট। মল্লিকা ভীতিগ্রস্ত, ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো। "কী হয়েছে তোষলদা?" "কিছু তো হয়নি।" নিস্তেজ কণ্ঠস্বর তোষলদার।

ঠাকুর এসে টেবিলে ভাত রেখে গেলো। জল রেখে গেলো ব্যাঙাচুর নিং। মল্লিকা মিন মিন করে বললো, "তোষলদা, আগে খেয়ে নাও, তারপর জামাকাপড় ছেড়ো।" আবার চোখ বুজে মনে মনে চিন্তার জাল বুনে চলেছেন তোষলদা। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললেন, "তুই শুতে যা মিলি। আমি একটু জিরিয়ে পরে খাবো'খন। "ভাত একেবারে হিম হ'য়ে যাবে যে—"মল্লিকার কণ্ঠস্বরে অভিমান ধ্বনিত হলো। আর সেই কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চেতনা হলো তোষলদার, "আরে! তুই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি? তুই কেন শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবি মিলি? তুই শুতে যা। আমি খেয়ে নিচ্ছি এক্ষুণি। "না—"আরো জোরালো কণ্ঠ মল্লিকার যেমের কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় তখনকার মত সব কিছু বিস্মৃত হলেন তোষলদা, মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বললেন। "আচ্ছা রে বাবা, তোর আর রাগ করতে হবে না, আমি এক্ষুণি খেয়ে নিচ্ছি—"

মল্লিকা খুশি মনে ভাত তরকারীর থালা বাটি শুদ্ধ টিপয়টা সাবধানের সঙ্গে তুলে এনে ভোম্বলদার সামনে রাখলো। তারপর কী মনে করে হঠাৎ উবু হ'য়ে বসে ভোম্বলদার জুতো খুলতে গেলো মল্লিকা। ভোম্বলদা লাফিয়ে উঠলেন "তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি রে মিলি?" "মাথা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা কিসে দেখলে? রাত দাদার জুতো খুলে দেওয়াটা কী নিয়মের ব্যতিক্রম?" ভ্রূভঙ্গি করে বললো মল্লিকা। ততক্ষণে এক এক টানে জুতো খুলে ফেলেছেন ভোম্বলদা আলনার একপাশে জুতা জোড়া রেখে স্মিত মুখে বললেন "আমার জুতোয় দুই হাত দিদি কিরে—? মুচি পর্যন্ত আর এখন সেলাই করতে চায় না—।" গ্লাস কাত করে হাত ধুয়ে তখনি খেতে শুরু করলেন ভোম্বলদা। জুতোর চেহারা দেখে মল্লিকার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেলো। ও জানে, ওর দাদা অরুণ এবং মা দুজনেই অনেক চেষ্টা করেছেন ভোম্বলদাকে আসা জুতো কিনে দেওয়ার জন্য কিন্তু ভোম্বলদা রাজি হন নি কিছুতেই। এক কথাই বলেছেন বার বার। "বড়দা হ'য়ে ছোট ভায়ের অন্ন ধ্বংস করছি, তার ওপর আর ঋণের বোঝা চাপালে অরুণ, অপঘাতে মৃত্যু হবে তাহলে আমার—।"

মল্লিকা চুপ চাপ করে ভাবতে লাগলো। কী ভাবে কোনদিক দিয়ে একটু সাহায্য করা যেতে পারে ভোম্বলদাকে, বোনের চিন্তিত মন খবে মুখের দিকে তাকিয়ে ভোম্বলদা আবছা হাসলেন। "কিরে মিলি! মুখখানা অমন হাড়িপানা ক'রে রইলি কেন? এ সবে তোদের ভোম্বলদার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না রে—"তারপর যেন অর্দ্ধ স্বগতোক্তির মতো অত্যন্ত অস্ফুটে বললেন "গীতাকারের কষ্ট যে কাকে বলে—তার রূপ যে কী করাল, কী ভয়ঙ্কর....."যেমে নিয়ে খাওয়াতে মনোযোগ দিলেন। মল্লিকা চুপ করে রইলো। ভোম্বলদাকে বড় বড় গ্রাসে খেতে দেখে মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো, "আজ সকালে তোমার বোধ করি খাওয়াই হয় নি—না,ভোম্বলদা? তোমার ভাত ঢাকা দেওয়া ছিলো। তুমি তো এলেই না। মা কত রাগ করলেন।" ভোম্বলদা অন্য মনস্ক হয়ে উত্তর দিলেন "হুঁ," মল্লিকা বললো, "হুঁ কী? আজ সকালে ভাত খেয়েছো?" "না—" ভোম্বলদা চিন্তিত মনে চোখ তুলে তাকালেন,। 'কী ভাবছো ভোম্বলদা—? মল্লিকার কণ্ঠে ব্যগ্রতা। ভোম্বলদা মুখ তুলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন,। বললেন, "কী-ভাবছিমে—তারই হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে এখন বোধহয় সহজ রে মিলি—" যে খবর জানবার জন্য এতরাত পর্য্যন্ত জেগে ছিল মল্লিকা, সে উৎকণ্ঠার জন্য অমন চমৎকার বইখানা সামনে খুলে রেখে একটি পাতাও পড়তে পারেনি, এতক্ষণ পর সে উদ্বেগ এমন চাড়া দিয়ে উঠলো মল্লিকা আর চাপতে পারলো না—কণ্ঠ করে জিজ্ঞেস করে বসলো, "ডাক্তারবাবুর পিসিমা কেমন আছেন ভোম্বলদা? ভোম্বলদা এত অবাক্ হলেন তাড়াতাড়ি ভাত গিলতে গিয়ে বিষম খেলেন একটা। এবং চোক জল খেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তুই ডাক্তারের পিসিমার কথা জানলি কি ক'রে?" মল্লিকা থতমত খেয়ে বলে ফেললো, "বন্দনাদি বলছেন।" "বন্দনা বলেছে—?' ভোম্বলদার কণ্ঠে এমন একটা বিস্ময় ধ্বনিত হলো, যেন কথাটা ঠিক্ বিশ্বেস করতে পারছেন না। "আর কী বলেছে বন্দনা?" ভোম্বলদার প্রশ্ন। মল্লিকার তখন আত্মগ্লানি আরম্ভ হয়েছে। তখবাসের নাম স্মরণ করে ফুলছে—কেন ঠাকুর বিশ্বাস আশ্রয় দিলেন? বন্দনাদির মতো মেয়ের সাথেও কলঙ্ক দিলেন আমি। কি করে বলি, আলমারীর পেছনে দাঁড়িয়ে সেদিন সব শুনে ফেলেছি। মল্লিকাকে নীরব দেখে ভোম্বলদা আবার প্রশ্ন করলেন, "আর কী বলা করেছে বন্দনা, বলিনি, না—?" মল্লিকা প্রায় কাঁদো

কাঁদো হয়ে বললো, "মা, ভোম্বলদা, বন্ধনাদি কিছু বলেন নি। আমি একদিন তোমাদের কথা শুনে ফেলেছি।" ভোম্বলদা সহজ নিশ্বেস ফেলে বাঁচলেন। বোনের মানিটা দূর করার জন্য জোড় ঘোরালেন কথার, "তুই ডাক্তারকে দেখেছিস্—?" "দেখেছি—!" কবুল করার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিকা আবার স্বাভাবিক। "কেমন দেখতে?" "বেশ সুন্দর—।" ভোম্বলদা মুহূর্ত দুই চিন্তা করে নিয়ে বললেন, ওর সঙ্গে বন্ধনার বিয়ে হলে কেমন হয়রে মিলি? "বন্ধনাদির—? সে কী—?" আশ্চর্য বিস্ময় মল্লিকার কণ্ঠে।

"কেন, সে কী কেন?" কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে বললেন ভোম্বলদা। মল্লিকা আর বলবে কী? যে ছেলে ঘুমোয়, তাকে তো আর জাগানো যায় না। মল্লিকা চুপ করে রইলো। ভোম্বলদা বোনের রকম-সকমে আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে সহজ ভাবেই বললেন, "দুজনেই দেখতে সুন্দর। চমৎকার ছেলে ডাক্তার, চমৎকার মেয়ে বন্ধনা। ডাক্তারের সঙ্গে বন্ধনার বিয়ে হ'লে সবদিক দিয়ে কী চমৎকার মানাবে বল দেখি?"

মল্লিকা জোর গলায় প্রতিবাদ করলো, "না না—।" "কী না?" "মানাবে না—।" "কেন, যাবার তুই এসব বলছিস কেন?" ভোম্বলদা নিজের বিস্ময় এবার আর চেপে রাখতে পারলেন না। মল্লিকা কিছু না ভেবেই বলে ফেললো, "বন্ধনাদিকে কেবলমাত্র তোমার পাশেই মানায় ভোম্বলদা, বন্ধনাদি যদি আমার বৌদি হন, কী ঞ্যাণ্ড যে হবে—"

"আঃ, মিলি—প্রচণ্ড ধমক দিতে গিয়ে গলা কেঁপে গেলো ভোম্বলদার। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছিলো। তাড়াতাড়ি উঠে মুখমুছতে কলঘরে চলে গেলেন। অপ্রস্তুত মল্লিকা পিছুপিছু এসে তোয়ালে এগিয়ে দিলো। বললো, ভোম্বলদা রাগ করলে? আর বলবো না ওকথা।" ভোম্বলদা শুকনো নিস্তেজ গলায় কী যেন বিড়বিড় বললেন। তাড়াতাড়ি আগের কথার জের টানলে মল্লিকা, "ডাক্তারবাবুর পিসিমা কেমন আছেন?" ভোম্বলদা অস্ফুটে বললেন, "আজই মারা গেছেন।" "মারা-গে-ছেন? তবে তো—" উদ্যত কথাটাকে তাড়াতাড়ি চেপে, দুমদুম করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলো, (মল্লিকা সিঁড়ির বাঁকপথ থেকে মল্লিকার অস্ফুট কণ্ঠ শোনা গেলো, মা ঘুম পেয়েছে বাবারে—

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

পেয়িং গেষ্ট

মীরা সান্যাল

সকাল বেলা বিছানার পাশেই প্রাত্যহিক গরম চায়ের পেয়ালাটা পেল অসিত কিন্তু পেল না তার সংগে নিত্য অভ্যর্থনার হাসিটুকু। মাধবীর মুখে রাজ্যের গাম্ভীর্যের কালোছায়া।

এমন মাঝে মাঝে হয়, নিশ্চয়ই টিকা টিটা আসেনি; শমিতারও হয়তো শরীর খারাপ তাই নিত্য কর্মপদ্ধতির পরিধিটা বেড়ে গেছে মাধবীর। মেজাজ খারাপের সেটাও একটা কারণ। অবশ্য সব সময় মাধবীর মেজাজ খারাপ হওয়ার কারণ থাকে না।

আজ তিন বছর এবাড়ীতে রয়েছে অসিত এমনই দেখে আসছে। একটু অলস নির্বিকার প্রকৃতির মানুষ অসিত। তিন বছর আগে খবরের কাগজে "পেয়িং গেষ্ট চাই" অংশের বিজ্ঞাপন দেখে এসে ঢুকেছিল এই বাড়ীতে। তারপর থেকে আছেই। ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ আর অধ্যাপনা তার কাজ। বন্ধু বান্ধবের বালাই নেই বেশী। আত্মীয় স্বজনও তেমন কেউ নেই। বিবাহ বা প্রেম কোনটার প্রয়োজনই এখনও উপলব্ধি করেনি। একটু আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেই ভালবাসে।

তবু মাঝে মাঝে এই আস্তানাটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়। ভাল লাগে না মাধবীর মুখভার। যেন মাধবী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় যে ওকে সে অনুগ্রহ করে। ওর অনেক সেবাযত্ন করে ফেলা আপাতিরিক্ত।

সন্ধ্যার মুখে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে—মাধবী ঘরে এসে ঢুকলো।

—শমিতার জ্বর, ডাক্তারকে খবর দিতে যাচ্ছি। টুলু যাবার থেকে এসে দয়া করে ওকে জলটা একটু দেখতে বলবেন। উনুনে ডাল বসিয়ে যাচ্ছি।

টুলু মাধবীর ভাই। এর পর কখন টুলু এসেছে খেয়াল করেনি অসিত। বাজার নামিয়ে রেখেই টুলু বেরিয়ে গেছে চুল ছাঁটতে। অনেক করে দিদিকে বলে আট আনা পয়সা পেয়েছে। তাই আজ চুল না কাটলেই নয়।

আধঘন্টা পরে ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে মাধবী দেখলে শমিতা জ্বরে বেহুঁস। টুলুর পাত্তা নেই। উনুনে ডাল পুড়ে ছাঁয়া হয়ে গেছে। মুখের অন্ধকার ঘনতর হয়ে উঠল। সামান্য মাইনের একটা চাকুরী। এরই ওপর নির্ভর করে দু'টি ভাইবোনকে কলেজে পড়ানো। ভদ্রভাবে ভদ্রপল্লীতে বাড়ীভাড়া নিয়ে থাকতে গেলে পেয়িং গেষ্ট একজন না রাখলে চলে না। তাই অসিতকে রেখেছিল। কিন্তু না, আর সাধ করে মেয়ে ওকে চলে যেতে। এত পরিশ্রম আর সহ্য হচ্ছে না মাধবীর। বাস্তবিক ওর মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই এ সংসারে।

রাত্রিবেলা ভাত বেড়ে ডাকলো অসিতকে। আজ মাধবী বেরুবে না। শমিতার সেবা করবে কে?

—আপনি একটা মেস টেস দেখুন অসিতবাবু, আমার অসুবিধা হচ্ছে। আমি আর পেরে উঠছিনে এতো খাটুনি। অসিত কোন জবাব দিল না। আরও দু'তিন মিনিট খাওয়ার ভান করে প্রায় অভুক্ত অবস্থায়ই উঠে গেল। মাধবী লক্ষ্য করল। যাকগে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকার মতো মাথার দিব্যি দিয়ে খাওয়াবার কোন প্রয়োজন নেই। এখান থেকে গেলেই বাঁচা যায়।

বাইরে বেরিয়ে অসিতের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। মাধবীর কাছ থেকে প্রচুর সেবাযত্ন পেয়েছে তিন বছরে। মাধবীর সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছে, হাতে দেখেছে লোহা, অথচ এসবের যিনি উপলক্ষ্য তাঁকে কোনদিন দেখে নি। মাধবীর অক্লান্ত সেবা আর কর্মিষ্ঠতার পট-ভূমিকায় তার অতীতটাকে যাচাই করতে চেয়েছে মনে মনে। কিছু বুঝতে পারেনি। কোন প্রশ্ন কোন দিন করেনি কৌতূহল অশোভন ভেবে। এই একটি কারণেই যেন মাধবী খানিকটা রহস্যাবৃত হয়ে উঠেছিল ওর চোখে। কখন অলক্ষ্যে যেন ওর সেবাযত্নের ওপর নিজের একটা দাবীরও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মাধবী গম্ভীর হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কারো সঙ্গেই প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। একরকম নির্লিপ্ত কঠোরতার প্রাচীর তুলে দেয় নিজের চারিদিকে। অনেক সময়েই অসিতের উদাসীন প্রকৃতির জন্য মাধবীর কিছু কিছু অসুবিধা হয়। সে সব অপরাধের গুরুত্বটা অসিতকে বেঝিয়ে দেওয়ার জন্যই মাধবী এরকম করে। তবে খোলাখুলিভাবে কোন দিন চলে যেতে বলেনি। আজ আর কলেজে গেলই না। ছোট কলেজ। তিন বছরে বিশেষ উন্নতি করেনি। বাইরে হাতকর ভাবে কম। অসিতের ভালো লাগে না। অধ্যাপনার গৌরববোধের কোঁকটুকু কেটে গেছে। এল বিনতও পাশকরা। তাই পরীক্ষা খুব কাছে হলেও ছাত্র-দের জন্য অসিতের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। আজ অসিত সহর তোলপাড় করে একটা আস্তানা যোগাড় করবে। মাধবীর অনুগ্রহ প্রয়োজন নেই। বেরিয়ে যেতে বলেই চেষ্টা করলে এই দুঃসময়ের দুদিনও থাকবার আস্তানা যোগাড় করা যায়।

সন্ধ্যাবেলা অসিত ফিরে এল। মাধবী খানিকক্ষণ চা আর দু'খানা টোষ্ট দিল। মুখের দিকে না তাকিয়ে পাত্র দুটো নামিয়ে রেখেই চলে যাচ্ছিল।

"—শমিতার মত কিরকম?" জিজ্ঞাসা করল অসিত। "মনে করে জিজ্ঞাসা করেছেন এতেই কৃতার্থ। শমিতা মেয়ে গেছে। এবেলা ভাত দেব ওকে। "বুঝলো—অসিত এটা কঠিন বিদ্রূপ। সকালে উপযাচক হয়ে তারই ডাক্তার ডাকতে যাওয়া উচিত ছিল। ভাল পুড়ে যাওয়ার খবরটা অবশ্য ওর অজানাই ছিল। এ ঔচিত্যের খেয়ালটা ওর সকালেই হওয়া উচিত ছিল। মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো খুব। একটু ভেবে চিন্তে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—"দেখুন আপনি যে সকালে বলেছিলেন সেই মতো ব্যবস্থা করে এসেছি। আমি চলে যাব, যদি বলেন তবে কাল সকালেই।"

এই কথা শুনেই মাধবীর চোখ দু'টো জ্বলে উঠল। মনে হল অসম্ভব ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ফেটে পড়বে। কিন্তু খুব শান্ত গলায় খুব আস্তে মাধবী বলল—"তাতাই করেছেন। আমার বলাবলির আর কি—আপনি যখন এসে ছিলেন তখন যেসব সর্ত ছিল আশা করি সেসব ভোলেন নি। আজ ইংরাজী মাসের মোটে পোনেরো তারিখ। কিন্তু আপনি কাল গেলেও আপনাকে এমাসের ভাড়াটা পুরো দিয়ে যেতে হবে। এটা অবশ্য মৌখিক সর্ত। তবু আশা করি পালন করবেন।"

অসিত অবাক হয়ে গেল। মাধবীর কাছ থেকে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির অবিচলিত প্রকাশ সে এই মুহূর্তে আশা করেনি। মনে পড়লো গতবছর ওর টাইফয়েডের সময়ে মাথার শিয়রে বসে থেকে কী রকম অক্লান্ত সেবা করেছে এই মাধবী। মনে পড়লো নিজে যখন ক্রমাগত ভুগেছিল, বিছানা ছেড়ে বেশী উঠতে পারতো না তখনও তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো এই মাধবী। মাধবীর কোন্ পরিচয়টা সত্য কে জানে? মাধবীর সম্বন্ধে নিজের মনটাকে লোহার মতো কঠিন করে ফেলতে

চেষ্টা করল অসিত। তাকে চলে যেতেই হবে। আত্ম-সম্মান সবচেয়ে বড়ো।

সকালের রৌদ্রটার রঙ যেন বড়ো বেশী। লঙ্কার ঝালের মতো তীব্র। মাঘে সাতটার সময়ে ক্লান্ত চোখের ঘুম কাটিয়ে উঠে বসে মনে হল মাধবীর। সারারাত্রি শশিতার শিয়রে জেগে থাকতে হয়েছে। পাঁচটায় ঘুমিয়ে পড়েছে আর সাড়ে সাতটা বেজে গেল। যাক্ আজ আর রান্নার তাড়া নেই। অসিত চলে যাবে আজই। বাড়ীতে এতো অসুখ—কিন্তু অসিতের কী? সে তো পেয়িং গেষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়।

বেরিয়ে এসে দেখল অসিতের ঘর খালি। জিনিষপত্র সব নিয়ে গেছে। টুনুর হাতে ওদের পাওনা টাকা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

অসিতকে বিদায় করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিল মাধবী, কিন্তু এখন কী জানি কেন দু' চোখ ভরে জল আসতে চাইল তার। ছুটে চলে গেল নিজের ঘরের মধ্যে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল নিজের সিঁথির সিঁদুর, দেখতে লাগলো হাতের লোহা। হিন্দু মতের বিবাহ, মৃত্যু পর্যন্ত সে বিবাহে ছেদ নেই। বন্ধনটাই তার সবচেয়ে বড়ো আর দৃঢ় সত্য। অজস্র অবিচার আর অত্যাচারের দুঃসহ বেদনার স্মৃতি নিয়ে এই বন্ধন চিহ্ন চিরকাল বিদ্রূপ করবে ওর জীবনকে।

অসিত চলে গেছে ভালোই হয়েছে। সমাজে মুখ দেখাতে হবে তো! নিজেকে চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না। অজস্র কলঙ্ক মোচন করতে গিয়ে চোখ দু'টো ঘষে ঘষে লাল হয়ে উঠল। টেবিলের সামনে বসে তুলে নিল কলমটা লিখতে আরম্ভ করল বিজ্ঞাপনের খসড়া—পেয়িংগেষ্ট চাই—অল্প টাকায় ভদ্র পরিবারে বাস করার জন্য হিন্দু ভদ্রলোক কিংবা ভদ্রমহিলা ইত্যাদি। পয়লা তারিখের মধ্যেই কাউকে আনা চাই—বাড়ীর ভাড়াটা যে অত্যন্ত বেশী।

ক
বি
তা

অপরাজিতা

গৌরীশংকর দে

আকাশের মত নীল সকালের অপরাজিতার
আজ আলো মুহূর্তের উদ্ভাসিত নীলকান্ত মণি,

নিস্তরঙ্গ মনে যেন প্রথম কলিটি কবিতার,
প্রণয়ের সুষমার টলোমলো মানুষের খনি।

এধারে ওধারে লতা আকাবাঁকা স্নিগ্ধ পটভূমি,
আসেনা অতিথি তবু, মনে হয় হবো প্রজাপতি
সে নীল মণির ঘরে যে আমার প্রাণের শাশ্বতী;
অপরাজিতা তো সেই চেয়ে দেখি অপরূপা তুমি।

গল্প

ছুঁচ-সুতো

সুমিতা সেন

শীতের শেষ রাত্রির কুয়াশায় স্নান করে একটা সব্‌জী-বোঝাই গাড়ী যখন গড়িয়ার মোড়ে এসে দাঁড়াল তখনো সারাদিনের ব্যস্ত কালো পিচ-ঢালা পথটায় শহরতলীর জীবনের কোন সাড়া জাগেনি। চারধারে ঝাপসা পাতলা সাদাসাদা কুয়াশার কণা-জমা অন্ধকার। দু পাশে দুতোর মিস্ত্রী, মুদির দোকান। ইট বের করা জীর্ণ দেয়ালে একটা ঝুলো মলিন পুরনো সাইন বোর্ড ঝুলছে। সব মিলে যেন একটা রাত্রির নির্জীব জগৎ।

গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো একটা চায়ের দোকানের সামনে। এই শীতের শেষ রাতে শুধু এই দোকানটা একটু খোলা আছে। ছোট্ট খাঁচের সামনে বসে আছে একটা লোক, কালো ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে। সামনে সাজানো মাটির খুরি, দুধের প্যান, বাঁশের কাঠির উনায় গরম জল ফুলবার টিনের কৌটো। কুয়াশা-ঢাকা সারা বাজারটায় মাত্র খানে দুই লোকটাই কেবল জেগে আছে। ও জানে, এই রাস্তে গাড়িবাহাটা মার্কেটের সকালের বাজার ধরবার জন্য সব্‌জী-ওয়ালারা যাবে এই রাস্তা ধরে। গরুর গলার ঘন্টা বাজবে টুং টুং করে, রাত্রির নির্জন সেতারের তারে যেন আঙুলের ছোঁয়া পড়বে কারো। ঘুমের ঘোরে-ভরা গড়িয়ার রাস্তায় ঐ দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালো সেই সব্‌জী-বোঝাই বলদ গাড়ীটা।

কার গাড়ী? মদনদার নাকি?

দোকানদার বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করল, রাত্রির কুয়াশা-ভেজা যাত্রীদের।

হ্যাঁ, আমার গাড়ী। রাত ভোর হয়নি। একটু চা লাগাও ভাই। খালার শীতে জমে গেলাম।

দোকানে এসে তোমরা বস, বিশু বলল। আমি এই চা করে দিলাম বলে।

সব্‌জী বোঝাই গাড়ীর উপরে ছেঁড়া চাদর ঢাকা দিয়ে বসেছিল শিউলী। ষোল সতের বছরের একটি রোগা কালো মেয়ে। আস্তে আস্তে সে নেমে এল গাড়ী থেকে। এ শীতের শেষ রাতে ওরও একটু চায়ের দরকার। ঠাণ্ডায় শরীরটা যেন বরফ হয়ে গেছে। শিউলী এসে বসলো দোকানের কাঠের ভাঙা বেঞ্চটার একধারে।

টিনের কৌটায় করে গরম জল নিয়ে চায়ের কাপে ঢালতে ঢালতে দোকানদার বিশু একবার তাকালো শিউলীর দিকে। হ্যাঁ, মেয়েটা কদিন আগে চা আর বিস্কুট খেয়ে গেছল আজও দাম দেয়নি। এতদিন আর দেখাই ছিল না, হতসব উবাস্তু এসে জুটছে।...

বিশুর চিন্তায় বাধা পড়লো

আমায় এক কাপ চা দাও দোকানদার আর আগেকার বাকী পয়সা নাও। এদিকে অনেকদিন আসিনি জ্বর হয়েছিল কিনা। ময়লা খাঁচলের কোণা থেকে একটি দুআনি বের করে শিউলী দোকানদারের কাঠের চৌকিটার উপর রাখল।

হঠাৎ বিশুর কঠিন মনটা একটু নরম হয়ে এল। না চাইতেই মেয়েটা পয়সা দিয়ে দিয়েছে। বাকী পয়সা। অথচ এমন বাকীর কত লোক মেরে যায়। মেয়ে পয়সা? ঐ ত ইটের ভাইতার মহেন্দ্র সিং, ও পাড়ার নাসের

বিশ্রী, আরো কত লোক। দিয়েছে বাকী পয়সা? বরং পয়সা চাইলেই শালারা গালি-গালাজ দেবে, যত সব কুত্তার দল।

কই আমাকে চা দিবেন না? মেয়েটা হাত বাড়াল, একটা কালো হাত, প্লাস্টিকের সরু দুটো চুড়ি কেবল হাতে।

হ্যাঁ, এই দিলাম বলে। জোর করে অপর খরিদ্দারের দিকে নজর রেখে বিশু বলল: তোমার আর কি দেব গো মদন দা?

আর এক কাপ চা দাও ভাই, আর একটা নিম্‌কি বিস্কুট, মদন বলল, গলায় ভাল করে সুতোর মাফলারটা জড়াতে জড়াতে। এক কাপ চা? ও শালা কিছু হোল না।

টিপ্‌টিপ্‌ করে কুয়ার কোঁটার মত কুয়াশা পড়ছে সামনে খেজুর গাছের পাতা থেকে। খালপাড়ের লোনামাটি ভিজে উঠেছে। একটু দূরে মাঠে পাকা ধানের হলুদে শিষ্‌গুলো মাটির কোলে ওয়ে ঘুমুচ্ছে!

বিশুর কানে শিউলীর কথাগুলো যেন মিষ্টি লাগলো। সে বুঝতে পারলো না, বাকী পয়সা আদায় পাবার জন্য, না শিউলীর এই নিটোল, যৌবনটাকে নিজের এলোমেলো চিন্তার সংগে এক চামচে চিনির মত মিশিয়ে ফেলার জন্য।

কিন্তু তবু ভাল লাগল। এই শীতের শেষ রাতে গড়িয়ার এই ঘুমে-ভরা বাজারটার এক কোণে এই ছোট চায়ের দোকানের সামনে আগুনের কাছে বসে, আরো একটি মেয়ের উপস্থিতির উত্তাপের একটু স্পর্শ ওর ভারি ভাল লাগল। মাটির এক ভাড় চা শিউলীর দিকে এগিয়ে দিল বিশু, বলল, আর কিছু? একটা নিম্‌কি বিস্কুট কি এক স্লাইস পাউরুটি দেব তোমাকে?

না, না, এখন বাজার যাচ্ছি। এক কাপ চা হলেই হবে। সেই রাত থেকে গরুর গাড়ীর উপরে বসে বসে এসেছি। হিম লেগে গলাটা ব্যথা করছে।

তুমি বোধ হয় খুব দূর থেকে আসা-যাওয়া কর? খুব অপর খরিদ্দারের জন্য চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে, কথাগুলো যেন শিউলীর দিকে আলগোছে ছুঁড়ে দিল।

না, এমন দূর কি। ঐ ত বড়াল পেরিয়ে আরও দুটো গ্রাম পেরিয়ে গেলে ঐ যে কুসুমপুর গ্রাম আছে না, ঐখানে আমার বাড়ী।

কুসুমপুর? জানি একবার গেছলাম। খুব কপি হয়, মুলো হয়, খেজুর রসও হয়। হাঁ, ও তল্লাটে আমার অনেক জানা-শোনা আছে। বহুদিনের দোকান আমার। কত লোক শেষরাতে এসে এখানে চা খায় গল্প করে। তুমি ত খুব বেশি আস না এদিক দিয়ে। সেই কবে শেষবার এসেছিলে, চা খেয়েছিলে।

হাঁ, পয়সাটা দিতে তোমার দেরিও হল, আর আসি নি কি না।

না, পয়সার কথা বলছি না। বিশু যেন আলোচনার নৌকাটাকে অন্য কথার ধাক্কা দিয়ে অপর পারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। বলল, আমি বলছিলাম কি, তোমাকে দেখিনি আসা যাওয়া করতে।

তা হলে দোকানদার বোধ হয় আমার আসা যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকত। অদ্ভুত ভাবে শিউলী কথাগুলো দোকানদারের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করল।

একটি সতেজ ডাঁটার মত শরীরটা হঠাৎ খুশির নাড়া খেয়ে যেন দুলে উঠল তার। হাঁ, শিউলী সুন্দরী নয় তবে সুশ্রী। কালো কালো চোখ, অজস্র চুল মাথায়। সাদা সুন্দর দাঁত, পাতলা নরম ধারালো মুখ।

গরুর গাড়ীর মালিক মদন উঠে দাঁড়ালো। এবার যেতে হবে। আর দেরি করলে গড়িয়াহাটা বাজারে পৌঁছতে ওদের দুপুর হয়ে যাবে।

যাবে না কি গো তোমরা?

মদন ডাক দিল সবাইকে।

যা যাচ্ছি। শিউলী উঠে দাঁড়াল। আগের মত মমতা আঁচলের খুঁট থেকে একটা আনি বের করে শিবুর হাতে দিতে গেল যে।

না, না, পয়সা থাক্ বিভু বলে উঠল। আলাপ পরিচয় হয় যখন তখন—

তখন আবার কি? শিউলী গর্জে উঠল।

মরলামাই বা দিলে।

কক্ষনো না, যে মিশিস্টীজী মেয়েরা পয়সা না দিয়ে চা খেয়ে বেড়ায় আমি তাদের মত না এই রইল তোমার পয়সা।

হঠাৎ শিউলী যেন কঠিন হয়ে উঠল। মনে হল দোকানদার বিভু যেন কোথায় একটু প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছে যেখানে তার কোন অধিকার নেই তার।

বিভু যেন একটা চড় খেয়ে থমকে গেল। মনে হল কি একটা পেতে গিয়ে সে হতাশ হয়ে পড়েছে। একটু পরে যখন রাস্তার দিকে সে তাকিয়ে দেখল, তখন সবজী বোঝাই গাড়ীটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে মোড় নিতে শুরু করেছে, পাঁচ নম্বর স্টেট-বাসগুলোর কাছে।

কিন্তু শিউলী মেয়েটা সত্যি কঠিন নয়। ওর চোখে, চুলে, মস্ত সরু আঙুলে, সুন্দর ছুটি নয় পায়ে যে সঙ্গীত ছড়ানো আছে, সে সঙ্গীত সে ছড়িয়ে দিতে চায় কারুর মনের উপকূলে, যেখানে কারুর পায়ের চিহ্ন পড়েনি। ও দিতে চায় সেই জগৎই সকল কথার ভেতরে সঙ্গোপনে ধরে। কিন্তু কাকে দেবে? সবজী বোঝাই গরুর গাড়ীর ওপরে বসে ভোর হয়ে যাওয়া ঘুম-ভাঙা আলোয় শিউলী যেন উদাস হয়ে উঠল। না, দোকানদারের সঙ্গে ব্যবহারটা তার ভাল হয়নি। অতটা কঠিন না হলেই হত। কি অন্যায় করেছে সে, বলেছিল পরিচয় হলে, তখন পয়সাটা নাইয়া দিলে।

পরিচয়? কথাটা শুনে কেমন মনে হ'ল শিউলীর। পরিচয় কাকে বলে? দু মিনিটের আলাপ। হাঁ, তা না হলে লোকটা তাকে পয়সা ধার দিয়েছিল কেন? কই তখন শিউলী ধার নিতে লজ্জা পায় নি?

ওর মনটা একটু নরম হয়ে এল। ওর মনে হল লোকটা হয়ত খারাপ নয়। কিন্তু লোকটা কি সুন্দর? মনের চোখ দিয়ে শিউলী দোকানদারকে দেখতে লাগল। না সুন্দরই। বুকটা চওড়া, মোটা দুটো হাতের কব্জি, কালো গায়ের রং। নাক চোখ মন্দ কি? আর নিজের চায়ের দোকান।

সারাটা সকাল শিউলীর মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। যেন মনে হল বর্ষাকালে ঘরের ধারে হাস্নাহানার ঝাড়গুলো যেমন নিঃশব্দ গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে মনটাকে ভরে রাখে, তেমনিভাবে কে যেন ওর মনে গন্ধ ছড়িয়ে গেছে।

কোন রকম করে বাড়ীর মূলো আর পালংশাকগুলো বিক্রী করে সে মায়ের জন্য কিছু পান, কাপড় কাঁচা সাবান, এটা ওটা কিনে নিয়ে মমতার কাছে এসে দাঁড়াল।

তোর এরি মধ্যে বেচাকেনা হয়ে গেল? শিউলীকে দাঁড়াতে দেখে মমতা প্রশ্ন করল। তখনো মমতার মূলো আর মূলকপির অর্ধেকও বিক্রী হয়নি।

আমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরে যাব। তাই গাড়ীতে আর যাব না। 'বাস'এ গিয়ে বাকীটা হেঁটেই চলে যাব। সে কথাই বলতে এলাম।

তাই যা, তাড়া আছে যখন। মমতা খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শিউলীকে বলল।

শিউলী তাদের সঙ্গ আজ ছেড়ে যেতে চাইছে। আজ তাড়াতাড়িও যাওয়ার দরকার। নতুন দোকানদার প্রতি দোকান বন্ধ করে চলে যায়।

গড়িয়ার মোড়ে বাস থেকে নেমে এগিয়ে চলল শিউলী দুধারে ছুতোর মিস্ত্রী, মুদির দোকান। সারা পথটায় নানান লোকের ভীড়। শিউলী দূর থেকে দেখল দোকানটা খোলা আছে। দোকানদার সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে কি

ভাবছে। খরিদ্দার নেই কেউ। সামনে চায়ের কেটলিতে অকারণে জলগুলো ফুটছে। আঁচটা কমছে সামনে। সেদিকে যেন দোকানদারের খেয়াল নাই।

শিউলী গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বলল, খরিদ্দার নেই বুঝি। জলগুলো ফুটে ফুটে সড়ে গেল যে।

দোকানদার বিশু শিউলীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। না, এখন খরিদ্দার কেউ নেই। বারটায় আসবে রাজমিস্ত্রীরা, তখন একটু ভীড় হবে।

আমায় এক কাপ চা দাও। শিউলী দোকানের ভিতর গিয়ে বেঞ্চটায় ভাল হয়ে বসল। বলল, পয়সাটা বাকী থাকবে কিন্তু। যা বিক্রী হয়েছিল সব বাজার করে ফেলেছি। বাঁর অসুখ তাই তাড়াতাড়ি 'বাস'এ করে ফিরে এলাম।

অকারণে শিউলী কথাগুলো বলে ফেলল।

বিশু চা করতে লাগল। কৌটায় করে জল নিয়ে স্টাকড়ার নতুন খানিকটা চা ঢেলে দিল।

তুমি খাবে না? শিউলী জিজ্ঞেস করল বিশুকে। চায়ের দোকানদার কি চা খায় না?

কেন খাবে না। আচ্ছা খাচ্ছি। বিশু নিজের জন্যও এক কাপ চা করে নিল।

হাঁ, তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার বাড়ী কোথা, কোথেকে এসেছি, সব পরিচয় নেওয়া হচ্ছিল। নিজের পরিচয় খবরও ত দিতে হয়। শিউলী দু চোখে খুশির আলো জেলে বিশুকে জিজ্ঞেস করল।

আমার পরিচয়? হাসল বিশু। পরিচয় চায়ের দোকানদার এইখানেই গ্রাম; মা, যা কিছু সব।

বাবা, মা কোথায়?

ঐখানে। খাল পারের শ্মশানটা বিশু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বলল, সব না খেতে পেয়ে মরেছে আকালের দিনে। সৎকারও হয়নি, শেয়াল কুকুরেই শেষ করে দিয়েছে। শুনেছি লোকের কাছেও।

তুমি, তুমি বেঁচে গেলে কি করে—শিউলী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

কপাল খারাপ ছিল বলে। বিশু যেন প্রসংগটা চাপা দিতে চায়।

তোমার বাবা মার কথা মনে হয় না—শিউলী আবার জিজ্ঞেস করল।

কেন মনে হবে, এই ত বেশ আছি বরং থাকলেই ঝামেলা বাড়ত। রোগে ভুগত, ঘাড়ে চেপে বসে থাকত। তার চেয়ে মরে গিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে।

বিশুর মাতৃপিতৃ-ভক্তির নমুনা দেখে শিউলী অবাক হয়ে গেল। বলল, আমি কিন্তু মাকে খুব ভালবাসি।

তাই নাকি? সে বোধ হয় আর কাউকে ভালবাস না বলে।

দোকানদার বিশুর কাছে ভালবাসার কথা শুনে শিউলী রাঙা হয়ে উঠল। বলল, যাক্ এসব। আসবে একদিন আমার বাড়ী? কুরুপুর গ্রামে ঢুকে একটু দূরে একটা খাল পাবে, তার একটু পশ্চিমে একটা বাঁশের পুল আছে, সেইখানেই আমরা বাড়ী করেছি।

কিন্তু তোমার সংগে কতদিনের আলাপ? তুমি খরিদ্দার, আর আমি দোকানদার—যেতে আসতে চা খেয়ে যাও।

হাঁ, যাবেও খেয়ে বই। শিউলী কথাটা যেন লুফে নিল। বলল আলাপ? দুদণ্ডের আলাপ, তাইবা কম কি?

বসন্ত আসবে এবার। পীচঢালা রাস্তার একপাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছটায় তাই বোধ হয় কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। সবুজে গাছটায় ফুল ভরে আসবে এবার, অজস্র লাল লাল কচি ফুল। খেজুর রস দিতে আর কেউ আসবে না পাশের গাছটায়। শীতের বেলা শেষ হতে হতে মাঠ থেকে পুরো

ধান উঠবার সংগে সংগে কোথায় মিলিয়ে যাবে। ধান-পাকের ফাঁকা প্রান্তর কেবল রোদে ভরে ঝিমুবে।

বিশু বলল, বললে ত যেতে কিন্তু করবে যাব তা বলবে না। ওর মনে হল ওর প্রায় তিরিশ বছরের যৌবনটাকে এমন করে কেউ আগলে রাখে নি, তাকে নি একটি ষোল সতের বছরের সুশ্রী কালো মেয়ে, যার চোখ দুটো সুন্দর, যার দাঁতগুলো সাদা সজনে ফুলের মত।

কেন যেদিন তুমি পারবে, শিউলী বলল। আজ বা কালও আসতে পার। আমি মাকে বলব, সন্ধ্যেবেলার দিকে এস, কেমন?

বসন্তও শেষ হতে চলল। শিউলী এপথে আরও কয়েকবার যাবার সময় বিশুর দোকানে চা খেয়ে গেছে, বসেছে, গল্প করেছে। একদিন বাড়ীর পালপার্বণ দিয়ে গেছে। বলেছে, আমার বাড়ী তোমাকে ডেকেছিলাম, তুমি একদিনও যাওনি। এবার না গেলে রাগ করব কিন্তু।

হালকা গলায় বিশু বলেছে—তোমার রাগ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। না হলে কেমন করে বুঝব আমাকে সত্যি সত্যি ডাকছ।

শিউলীর কথাটা খারাপ লাগল। ওর মনে হল বিশুটা একটা বোকা। নইলে ও বোঝেনা কেন যে শিউলীর এপথে আসতে ভাল লাগে, ভাল লাগে এই ছোট দোকানে যখন খদ্দের থাকে না, মাঠে মাঠে দুপুর বেলার উদাস দিনটা ঝেড়ে ফেলে থাকে, কুকুরগুলো পথের ধারে শুয়ে শুয়ে ঝিমোয়, তখন ওর দোকানে কাঠের বেঞ্চটায় বসে চা খেতে, ওর সংগে গল্প করতে। বিশুই বা আর গল্প নেয় না কেন? শিউলীর মনটা ব্যথা পেল। ও বলল আমি তোমাকে সত্যি ডাকি না? তবে যেও না।

বিশু দেখল কথাটা জটিল হয়ে উঠেছে। হাবা ভাবে তাই শিউলীর দিকে তাকিয়ে বলল—বোকা, তুমি সত্যি বোকা, ঠাট্টা করে বললাম, বোঝ না কেন?

শিউলীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

বিশু বলল,—কালই আমি যাব। তুমি রাগ করো না কিন্তু। আমি ঠিক যাব।

সত্যি সেদিন বিশু একটু সাবগোজ করে কুঞ্জপুরের পথে পা বাড়ালো। দুধারে ধানের মাঠ, ফুলকপি আর বাঁধা কপির ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে চলতে তার মনে হল, বৈশাখ আসার ঢের সময় এসে গেছে মাটিতে। ভাবতে লাগল শিউলী মেয়েটার সত্যি কি তাকে ভালবেসেছে, না এমনি কেবল তরলতা, না তাকে নিয়ে খেলা করছে কেবল। না, মেয়েটা বোধহয় খারাপ নয়। আর দেখতেও বেশ। বেশ? বেশ নয়ত কি? গড়িয়ার রাস্তায় ধারের চার পয়সার চা খেনেওয়ালার জন্য ত আর স্কুল কলেজে পড়া সুন্দরী মেয়েরা ভানা গজিয়ে বসে থাকবে না, এটা বিশুর নিজের জানা উচিত, বোঝা উচিত।

এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতে মাঠ থেকে রোদ নিতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশু কুঞ্জপুরের সেই বাঁশের পুলের কাছে এসে দাঁড়াল। ছোট একটা খাল। পাড়দুটো কিন্তু উঁচু। তার একপাশে বেগুনের ক্ষেত, একটা ছোট খড়ের ঘর। এটাই কি শিউলীর বাড়ী? ও একটু দাঁড়াল। কাউকে জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবল, তারপর মাটির পাচিলের ভিতর বাঁশের বেড়া দেওয়া উঠানে এসে দাঁড়াল।

ওমা তুমি, সত্যি এসেছ। শিউলী খুশি হয়ে বিশুকে জিজ্ঞেস করল। বলল, তুমি যে আসবে আমি ভাবিনি। মা, কে এসেছে দেখ। এই দোকানদার বিশুদার কথা তোমাকে বলেছিলাম।

শিউলীর মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, শিউলী তোমার কথা বলেছিল বাবা, ডেকেও এনেছিল। আমিই

বললাম সে কি আসবে রে মা? আজ পাকিস্তান হয়ে সব আমাদের গেল, জমাজমি, পুকুর, নারকেল সুপুরির গাছ।

আর তোমাকে বলতে হবে না মা, তুমি আবার সেই পুরনো কথা তুলে কান্নাকাটি শুরু করবে। একটা লোক বাড়ী এল।

হাঁ মা, ঠিক বলেছিস, একটু চা করে দে। আমি গরু দুটোকে গোয়ালে তুলে দিয়ে আসি।

আমি চা খাব না। বিশু শিউলীর দিকে তাকিয়ে বলল।

ঠিক খাবে। আসা যাওয়ার পথে কতবার তোমার তৈরী চা খেয়েছি। আজকে আমার তৈরী চা তোমাকে খাওয়াব।

বিশু আশ্চর্য হল, আজ সন্ধ্যায় শিউলীকে কি সুন্দর লাগছে। এ যেন সেই শেষ রাতে গরুর গাড়ীর ওপরে বসা সব্জীওয়ালী শিউলী নয়। এযেন এক রাজকন্যা, খোঁপায় একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়ার ফুল গোঁজা। শিউলীর মত কোন সুন্দর মেয়েকে বিশু যেন কখনো দেখেনি, খোপাউদ্ভার মাখা সেই সব রাস্তাঘাটের মেয়েগুলোর প্রতি ও যেন আজ প্রথম ঘৃণা করতে শিখল। মনে হল শিউলী সত্যি সুন্দর। সামনের বেগুনের ক্ষেত, মাটির পাঁচিল, আর উঁচু খালের পাড়ের ওপরে আম কাঁঠালের অস্পষ্ট বাগানের উপর যেখানে অন্ধকার গুলো ক্রমশঃ জড়ো হয়ে উঠেছে, সেখানে উপরের আকাশে যে তারাটি জ্বলছে সেটি যেন শিউলীর ছোট কুমুদের মত অত সুন্দর নয়।

একমুখ সুন্দর হাসি আর হাতে এক কাপ চা নিয়ে শিউলী ফিরে এল। ওর মা নিয়ে এল একটা প্লেটে করে দুটো মুড়ির মোয়া আর দুটো কলা' বলল, এটুকু খেয়ে নাও বাবা, বাড়ীর জিনিষ। শিউলী তোর চা কইরে?

আপনি চা খাবেন না মাসি মা? বিশু জিজ্ঞেস করল।

না বাবা চা আমরা খাইনে, আমরা পুরনো কালের লোক— বলে ভিতরে চলে গেল। শিউলী চায়ের কাপ নিয়ে পাটির একপাশে বসল। বলল, চা কেমন হয়েছে।

খুব ভাল।

তোমার চায়ের চেয়ে?

আমার চা খেয়ে কেউ ভাল বলে না। আমি চাষীর দোকানদার।

আমি কিন্তু ভাল বলেছিলাম অবশ্য মনে মনে, তাই ত ফিরে গেছলাম আবার খাবার জন্য। শিউলী রাত্রির মত অদ্ভুত মমতা ভরা চোখদুটো বিশুর মুখের উপর তুলে ধরল।

বিশু বলল, তা আর বুঝি না? তাই ত চা খেতে এলাম, তোমার হাতের তৈরী চা। কথায় কথায় রাত হল। বিশু বলল, আমায় এবার উঠতে হবে যে।

এই টুকুই ত পথ, শিউলী অভিযোগ করে বলল।

কিন্তু রাত হল যে।

কি হয়েছে তাতে আমি এগিয়ে দিয়ে আসব।

তোমার লাজে ভয় করে না?

করত আগে, এখন করে না। একানব্বার মাঠ-বন খাল পার সব চেনা হয়ে গেছে। শিউলী বিশুকে অভয় দিয়ে বলল। আরও খানিক পরে মাসিমাকে বলে, বিশু থালপার ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। পাশে চলেছে শিউলী। অন্ধকার ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে পূবদিকের গ্রাম-গুলো থেকে। চারদিকে প্রথম রাত্রির স্তব্ধতা। কেউ কোন কথা বলছে না। এমনি করে ওরা গ্রামের শেষ সীমায় এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ কি যেন ঘটল। বিশু অন্ধকারে শিউলীর হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমায় ভালবাস শিউলী? এক অদ্ভুত আবেগে বিশুর শরীরটা যেন কাঁপছে।

শিউলী উত্তর কঠিন হয়ে উঠল বলল, আমি ভালবাসার দোকান করি না লেখাপড়া-জানা শহুরে মেয়ের মত। হাত ছেড়ে দাও, আমি মুখ্যু গাঁয়ের মেয়ে। কে কবে মেনেছিল

নদীমার এ পারটাও পাকিস্তান হবে। তাই কত কষ্ট করে সংসার চালাই, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সবজীর ক্ষেত তৈরী করি। আদ্বি ভালবাসার কি বুঝি, বিত্তদা?

আমিও চায়ের দোকান করি। খেটে খাই। [illegible]? তা একটু করেছিলাম যখন সরকারী ক্যাম্পে ছিলাম। এখন রাত চারটে থেকে উঠে আঁচ জেলে বসে থাকি, শেষ রাতের খরিদ্দারের জন্য চা করতে হবে বলে। আমারও যে কেউ কোথাও নাই। তবু ভালবাসতে ইচ্ছে করে কাউকে।

উত্তপ্ত শিউলী নম্র হয়ে এল। তার মনে পড়ল সেই ছবি, শেষরাতে ঘুমন্ত গড়িয়ার একধারে বিত্ত সামনে আঁচ জেলে চুপ করে রাস্তার ও ধারের অন্ধকার গুলোর দিকে চেয়ে বসে আছে। একটু চুপ ক'রে থেকে শিউলী বলল, ভালবাসি, কিন্তু সে যে বলার কথা নয়। তুমি কি বুঝতে পার না? নয়ত ডেকে নিয়ে আসি কেন? কিন্তু তাই বলে ছুঁতে দেওয়া যায় না, নিতে হলে সব নিতে হবে, টুকরো টুকরো করে নয়, ফাঁকি দিয়েও নয়। তেমনি করে, ঠিক তেমনি করে নেবে আমাকে?

নোব, নোব। বিত্ত যেন বেঁচে গেল ফাঁসির হাত থেকে। ও বলল, জান দিয়ে নোব, সেই ছোট্ট ঘরে সংসার পাতব। একটা চায়ের দোকান তাতেই চলে যাবে, না চলে তুমি দোকানটা চালাবে, আমি কাছের কোন কারখানায় একটা কাজ দেখে নেব। তাতে চলবে না আমাদের?

হাঁ গো হাঁ, বেশ চলবে। আমিও ছোট্ট একটা সবজীর বাগান করে নেব। দুটো বেগুন গাছ, দুই গাছ করল।

কিন্তু এবার চলি অনেকটা পথ।

চল তোমায় আর একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

আস্তে আস্তে ওরা চ'লে এল সেই মাঠের ধারে যেখানে শুরু হয়েছে কালো পীচ-ঢালা পথটা গড়িয়ার দিকে।

আবার কবে আসবে? শিউলী বিত্তকে জিজ্ঞেস করল।

শীগ্‌গির। সেদিন এসে তোমাকে নিয়ে যাব। ও আবার শিউলীর হাত দুটো ধরে দাঁড়াল, তার মুখটা নিজের চোখের উপর তুলে ধরল অন্ধকারে। শিউলী বাধা দিল না। আশ্রয়ের আভাস ও পেয়েছে বিত্তর কাছে।

কী এক স্বপ্ন নিয়ে ওদের দুজনের দিনের শুরু হল। মনে হল ওদের যৌবন এতদিন পাতালপুরীতে ঘুমিয়েছিল। একটি রাত্রির নির্জন অন্ধকারের নিবিড় স্পর্শ ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

শিউলী সারারাত ভেবেছে, মানুষটার কথা। একটা জোয়ান পুরুষকে নির্জনে পেতে, তার কাছে নিজেকে দিতে এত ভাল লাগে, শিউলী আগে সে খবর জানত না। ওর সমগ্র চেতনা ঘিরে একটা কঠিন সুন্দর পুরুষ সত্তা যেন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

রাত চারটে থেকে বিত্ত আজ ওঠেনি। মরলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই ঘুম-না-আসা প্রহরগুলো সে শিউলীর চিন্তায় কাটিয়ে দিয়েছে। সেই পথের ধারের কালো অন্ধকার ছুপাশে ফাঁকা ধান-কেটে-নেওয়া ক্ষেত। সেইখানে একটি নারীর নিটোল যৌবনের অধিকার সুহাত ভরে সে পেয়েছিল। সেইটুকু স্পর্শ যেন তাকে পাগল করে তুলেছে, যেন তার সারা দেহে বিদ্রোহের আগুন জেলে দিয়ে গেছে।

স্নান সেরে এসে বিত্ত পাশের সেলুনওয়ালা মতিয়ার কাছে কথাটা বলেই ফেলল। পাশাপাশি আজ কয়েক বছর কাজ করেছে। তাই আজ মতিয়াই তার আত্মীয়। বলল, মতিয়া আমি বিয়ে করব।

বিয়ে করবি—সে কি রে শালা? কোথায়? মেয়ে তাহলে জুটল। আমরা বুড়ো হতে চললাম যে জুটল না, বাইরে বাইরে কি নেশা মেটে। কিন্তু তুই বলছিস্ বিয়ে করবি।

হাঁ করব, সেই কথাই ত বলছি।

তবে করে কেল জলদি জলদি। মতিয়া ঠিক প্রকৃতিস্থ নয় যেন। আবার ও বলল, আমরা আছি, সব ব্যবস্থা করে দেব, জান দিয়ে দেব তোর জন্ত। ছোট ঘরটা ছেড়ে দেব আমার। তোরা থাকবি। তা তোদের ঘরটার চেয়ে এইটে ভাল, আলো হাওয়া খেলে। মতিয়া বিয়ের আনন্দে এত-গুলো প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলল।

না, না ঘরের দরকার নেই। তুমি আমার দাদা হও। তোমাকে কথাটা বলাই দরকার। বিশু বলল।

হাঁ হাঁ, নিশ্চয় বলবি, একশ বার বলবি। আমার একটা ভাইটাই থাকলে বেটাকে ঘাড়ে ধরে বিয়ে দিতাম।

অবিবাহিত জীবনের অতৃপ্ত উত্তাপটা মতিয়ার কথায় কথায় বড় বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বিশু বলল,-আমি যে তোমার ছোট ভাইয়ের মত।

ঠিক হায়। করে ফেল। দেরি করিস না। হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

মতিয়া অকারণে ঘরটাকে ঝেটে ঘষতে আরম্ভ করল। বলল, বিয়ে যে করবি মেয়ে কোথায়?

আছে, সব বলব। বিশু উঠে এল সেলুন থেকে।

বিশুর কাছে সমস্ত পৃথিবী আজ যেন সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই মাঠ ঘাট, এই রাস্তার ধারে গাছ-ভর্তি পলাশ-ফুল, ওর সব ভাললেগেছে। আজ ওর ছুটি। সারাদিন ঘরে শুয়ে সে আজ শিউলীর তপস্যা করবে।

তোর কি আজ ঘুম ভাঙবে নারে, শিউলী। মা ডাকল মেয়েকে। কেন ভাঙবে না? এই উঠছি। শিউলী উঠল বিছানা থেকে। তোর গতরে হচ্ছে কি? আমি বুড়ো বয়সেও তোর থেকে খেটে মরব? কে তোমাকে খেটে মরতে বলেছে। শিউলী ঘমকে উঠল মাকে। বলল সকাল থেকে কি আরম্ভ করলে তুমি? কি আর আরম্ভ করব? পাড়ায় যে নিন্দে রটে গেল।

শিউলী যেন চমকে উঠল, বলল কি আবার নিন্দে?

কাল রাতে বিশুকে এগিয়ে দিতে গিয়ে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলি, ও পাড়ার গোবিন্দ তাই দেখে এসে পাড়ায় রটিয়ে বেড়াচ্ছে। এ সব কি ভাল?

কি ভাল আর না ভাল সে আমি বুঝব না। গোবিন্দর সঙ্গে গল্প করলে বুঝি ভাল হত, কতদিন ও পিছনে ঘুর-ঘুর করেছে, কুকুরের মত।

তুই ভদ্দর লোকের ছেলেকে কুকুর বললি?

—কেন বলব না? আমরা ভদ্দর লোক নই, তবে সে কেন আসে এখানে?

—তুই আর বাজার যাবি না, আর ও ছোঁড়াটাকে নিয়ে আসবি না, এই বলে দিলাম।

ও, বুঝেছি, সকালে এসে বোধ হয় গোবিন্দ আবার কিছু ঘুষের ব্যবস্থা করে গেছে।

শিউলী জবাব দিয়ে ঘাটে চলে গেল। সকাল থেকে তার মনটাকে যেন কে আঘাতে আঘাতে পিষে ফেলতে চাইছে।

ঘাট থেকে মাঠের শেষের পথটা দেখা যায়। ঐখানে ওরা কাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। বিশুর শক্ত বাহুর মধ্যে সে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। শিউলী সে-কথা ভাবতে লজ্জা পায়, অথচ গভীর আনন্দ পায়। সে যাবে, নিশ্চয়ই দোকানঘরের কাছে। কেন যাবে না? তার ভাল লেগেছে। বাপমা ছাড়া এই লোকটা সে রাতের অন্ধকারে সামনে খাঁচ ফেলে নির্জন রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে। রাত্রির আকাশ থেকে ঘোর উঠা ধূসর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়বে আস্তে আস্তে, তারপর মদনদা সবজীবোঝাই গাড়ীটা চলবে, গরুর গলার ঘণ্টাগুলো থেমে থেমে তাল রেখে বাজবে। শিউলীর দুচোখ কখন জলে ভরে এসেছে। সে নিঃসঙ্গ মানুষটার সারা জীবনটাকে ছোট একটা শিশুর মত ও যেন কখন কোলে তুলে নিয়েছে সে কথা সে নিজেও জানে না।

এখন গ্রীষ্মের উত্তাপ এসেছে রোদে। মাঠে, খালপারে আমকাঠালের বনে দুপুরের শূন্যতা যেন করে ভরে পড়ছে। ও ঘরে মা ঘুমিয়ে আছে।

শিউলী আস্তে আস্তে উঠে এল। আর না। বিত্তর জন্য মনটা কেমন করে উঠেছে। ওকে একবার দেখবার জন্য শিউলীর সারা দেহ কি এক অদ্ভুত ক্ষুধায় পাগল হয়ে উঠেছে।

বাঁশের পুলটা পেরিয়ে, গ্রামের পথ পার হয়ে, দুধারে কপি, বেগুন আর মূলো শাকের ক্ষেতকে কখন ডাইনে কখনও বাঁয়ে রেখে, শিউলী গড়িয়ার পথে এসে দাঁড়াল। বাকী পথটা 'বাসে'এ এসে সে মোড়ের কাছে নামল, যেখানে সরু পথটা বড়ালের ইটখোলার দিকে চলে গেছে।

কিন্তু দোকানটা বন্ধ কেন? শিউলী দূর থেকে ভাল করে দেখল। দেখে ওর মনে ভয় জেগে উঠল, তবে কি দোকানদার এখান থেকে চলে গেছে, না অসুখ বিসুখ করেছে।

ও আস্তে আস্তে বাজারের দিকে এগিয়ে এল। রাস্তায় লোকজন বিশেষ কেউ নাই। না বিত্ত যায় নি। কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে ঐ দেখা যাচ্ছে।

মাটিতে শুয়ে আছে বিত্ত ও চুপি চুপি ডাকল। কোন সাড়া নাই।

ও আবার ডাকল, কড়া নাড়ল আস্তে আস্তে।

বিত্ত চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। শিউলী? তাড়াতাড়ি কপাট খুলে দিল সে।

হাঁ আমি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দরজাটা বন্ধ করে দিল বিত্ত। বলল, এসময় এলে?

কেন আসতে নেই বুঝি?

আদবৎ আসবে।

আজ দোকান খোলনি কেন? শিউলী জিজ্ঞেস করল।

আজ শরীরটা ভাল নেই।

কি হল, কই দেখি? শিউলী বিত্তর কপালে হাত দিল।

আশ্চর্য, সেই সুন্দর মুহূর্তে বিত্ত তার শক্ত দুটো মোটা কব্জীওয়ালা হাত দিয়ে শিউলীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

শিউলী বিত্তর চওড়া বুকে মাথা রেখে চোখ বুজল। ওর মনে হল, এই রোদে-পোড়া সারাটা পথের কষ্ট বিত্ত এক মুহূর্তেই মুছে দিয়েছে।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা, আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"স্টার ব্রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটী থাকে তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটী সংশোধন করবো।

আরতি কটন্ মিলস্ লিমিটেড

দাসনগর, হাওড়া।

বিশ্লেষণ

লেবানন

মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট উত্তরণের শেষ নাই। পর পর সঙ্কটের আবির্ভাব মধ্যপ্রাচ্যকে সঙ্কটাকীর্ণ করে রেখেছে। লেবাননের সঙ্কট মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটতালিকায় সর্বশেষ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু সর্বশেষ স্থান দখল করে থাকলেও লেবানন-সঙ্কটের পটভূমিকা সর্বব্যাপক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বশেষ সংঘাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হোতে পারে, সে-সম্ভাবনা লেবাননের পরিস্থিতিতে নিহিত আছে।

লেবাননের বর্তমান সরকারের আড়ালে মধ্যপ্রাচ্যে অন্তর্হিত-প্রায় ইঙ্গ-মার্কিণ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রবল প্রচেষ্টা চলেছে। ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ প্রেসিডেন্ট চামুন ও প্রধানমন্ত্রী সামি সোলহ পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আত্ম-প্রকাশ করেছে। কামাল জাম্‌ব্লাৎ নামক উপজাতীয় সর্দার এই বিদ্রোহের অধিনায়কত্ব করেছেন। কামাল জাম্‌ব্লাৎ আটত্রিশ বছর প্যারিসে উচ্চশিক্ষিত যুবক এবং ভারতীয় দর্শনের একজন অন্তরঙ্গ ছাত্র। কামাল জাম্‌ব্লাতের অধিনায়কত্বে বিদ্রোহীরা পাল্টা সরকার গঠন করেছেন এবং এই সরকারকেই লেবাননের সার্বভৌমত্বের অধিকারী স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রকৃত সরকার বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, তারা প্রেসিডেন্ট চামুন ও সামি সোলহের সরকারকে স্বীকার করেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সিরিয়া স্বাধীনতা ফিরে পেলো কিন্তু ফ্রান্স তারই এক অংশ পৃথক করে নিয়ে লেবাননের জন্ম দিলো। লেবাননে সংখ্যালঘু ক্রিশ্চিয়ানরা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ওপর আধিপত্য পেলো। আরব সংহতি থেকে লেবাননকে বিচ্ছিন্ন রাখবার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার পটভূমিকায় লেবানন-সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। আরবজগতে নাসেরের অভ্যুত্থানের পর আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড সংঘাতের পরিণতিতে সুয়েজ-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সে সঙ্কটের আঘাতে মার্কিন সোভিয়েট জোট থেকে অস্ত্র ক্রয় করতে বাধ্য হন। লেবানন-সঙ্কট সেই সংঘাতেরই দ্বিতীয় স্তর। ইরাক ও সিরিয়ার মিলনের পর স্বভাবতই সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকের চাপ লেবাননের উপর দেখা দেবে। একদিকে এই সম্ভাবনাকে পরাস্ত করবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে, মার্কিনী অস্ত্রশস্ত্রবরাহ লেবাননে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক প্রস্তুতি লেবাননের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে, ভূমধ্যসাগর অবলম্বন করে। অপরদিকে, লেবাননের বিদ্রোহীরা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে আঘাত করবার জন্য সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের শস্ত্রসহায়তায় শক্তি বৃদ্ধি করেছে। বলা বাহুল্য, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের পশ্চাতে সোভিয়েট-গোষ্ঠীর শস্ত্র-সাহায্য রয়েছে।

'আইসেনহাওয়ার মূলনীতি' ও বাগদাদচুক্তির পরাজয় হয়ে ১৯৫৭ সাল থেকেই লেবাননে মার্কিণ প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন থেকেই ইঙ্গ-মার্কিণ ও সোভিয়েট শক্তি জোটের পট-ভূমিকায় লেবাননের রাজনীতি বিভক্ত হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক গঠিত হওয়ার ফলে সরাসরি আরবজাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত আত্মপ্রকাশ করেছে। লেবাননের প্রশ্নটি অতি পরিষদে আলোচিত হয়ে তারা লেবাননকার পর্যবেক্ষকদল বেইরুটে পাঠিয়েছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে প্রকাশ লেবাননের মাত্র অর্ধাংশ চামুন সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে আছে। অবশিষ্ট অর্ধাংশে বিদ্রোহীদের দখলে আছে। এই অবস্থায় লেবানন সরকারের পশ্চিমী হস্তক্ষেপমূলীন প্রবণতা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রবণতার বাস্তব রূপায়ন যে যে কোন মুহূর্তে সম্ভব, তার প্রমাণ লেবাননের উপকূল থেকে বার ঘণ্টার দূরত্বে তিন হাজার পশ্চিমী জাহাজের অবস্থিতি এবং পাঁচ ঘণ্টার দূরত্বে সত্তের'শ বৃটিশ ছত্রী বাহিনীর অবস্থিতি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক দল এবং স্বয়ং হ্যামারশীল্ড বেইরুটে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছেন যে লেবাননের সঙ্কট দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, বাহিরের হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ সেখানে নাই। লেখানকার আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের হওতো বা সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকবে। কিন্তু পরিস্থিতি এখন অবস্থায় এসে পৌছায় নাই, যেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ আছে। হ্যামারশীল্ড এ-বিষয়ে লেবাননের শাসনকর্তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যায় সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে লেবানন সরকার হয়তো বা পশ্চিমীদের সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য ডেকে আনতে পারে। সে পরিস্থিতি সত্যই বিপজ্জনক হবে এবং বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জের সংঘাত অনিবার্য করে তুলবে।

ভুল সংশোধন

জ্যৈষ্ঠের জয়শ্রীতে প্রকাশিত ৯৭ পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক উপন্যাস "উত্তরঙ্গে" "লাখনওতে কথাকলি নৃত্যবিদ্ শম্ভু মহারাজের" পরিবর্তে "লাখনওতে কমুক নৃত্যবিদ্ শম্ভু মহারাজের" হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখীত। অ: স:

২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা। শ্রাবণ, ১৩৬৫

বর্তমান প্রসঙ্গ

তৃতীয় মহাযুদ্ধের ছায়াপাত

লেবানন ও জর্ডনে মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যের অবতরণে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নেহেরু-আসেরের প্রয়াস এবং রুশিয়ার শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব আমেরিকা ও বৃটেন কর্তৃক গৃহীত হবার ফলে মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা অনেকখানি পশ্চাদপসারিত হয়েছিল। কিন্তু শীর্ষ সম্মেলনের স্থান, কাল এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে আমেরিকার তালবাহানা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আহূত মাও-সে-তুং ক্রুশ্চেভ বৈঠক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আবার উগ্র করে তুলেছে।

লেবাননে সৈন্য অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়া প্রত্যাঘাত করেনি বলে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিমত প্রকাশ করেন যে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আর নেই। সাম্প্রতিক রুশ-চীন বৈঠক এবং পিকিংয়ের যুক্ত ইস্তাহারকে অনেকে স্নায়ু-যুদ্ধের একটি কূটনৈতিক চাল রূপে আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু মাও-সে-তুং ও ক্রুশ্চেভের যুক্ত বিবৃতির গুরুত্ব স্নায়ুযুদ্ধের প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি।

এই বিবৃতিতে আমেরিকা ও বৃটেনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় বিশ্বের জনমতকে রুশ-চীন সোভিয়েত পক্ষপাতী করার জন্য এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জনতার কাছে আবেদন জানান হয়েছে। সেই সঙ্গে টিটোর যুগোস্লাভিয়াকেও রক্তচক্ষু দেখান হয়েছে। আমেরিকা ও বৃটেনকে আরও জানান হয়েছে যে চীন ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসহ রুশিয়া এক প্রবল জনশক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিন যুক্তোদ্যমের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত। বস্তুত যে ভাষায় ও যে দৃষ্টিতে রুশ-চীন যুক্ত ইস্তাহারটি রচনা করা হয়েছে তাকে তৃতীয় মহাযুদ্ধে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসোভিয়েতের সংযুক্ত ম্যানিফেস্টো নামে আখ্যা দেওয়া অসমীচীন মনে হবে না।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট কোরিয়া, ইন্দোচীন এমন কি বিশ্বের সমস্যার মত নয়। মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের সামরিক ও বাণিজ্যিক এমন কি রাজনৈতিক গুরুত্বও অনেক বেশি।

মধ্যপ্রাচ্যের তেল পশ্চিমী গোষ্ঠীর হাতছাড়া করা ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে অসম্ভব এবং ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার সংযোগস্থলে তীব্র ও ঐক্যবদ্ধ আরব জাতীয়তা-বাদের অভ্যুত্থানও পশ্চিমী গোষ্ঠীর পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু এই রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সঙ্কটের চেয়েও মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক সঙ্কটের গুরুত্ব আরও অনেক বেশি। রাশিয়ার নিকট থেকে এবং যুদ্ধের সূচনাতেই প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানার সব চেয়ে সুযোগ-ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্য। পূর্ব বা পশ্চিম কোনদিক থেকেই প্রথম আঘাত প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার মর্মকেন্দ্রে হানা সম্ভব নয়। কিন্তু মধ্য প্রাচ্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার মর্মকেন্দ্রে আঘাত হানা মার্কিনের পক্ষে সম্ভব, তাই তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঝুঁকি ও প্রস্তুতি সহ আমেরিকান বাহিনী লেবাননে অবতরণ করেছে। রাশিয়ার পক্ষে রণনীতির দিক থেকে, মার্কিনকে মধ্য প্রাচ্যে আর শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি তৈরী করতে দেওয়া সম্ভব নয়; বস্তুত, রণনীতির দিক থেকে বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্য সবচেয়ে কার্যকরী লক্ষ্যের। এই ক্ষেত্রটিকে ব্যাহত করাই রাশিয়ার প্রধান লক্ষ্য। তাই অবিলম্বে যদি শীর্ষ সম্মেলন না হয় এবং সেই সম্মেলনে লেবানন ও জর্ডান সম্বন্ধে মীমাংসা সম্ভব না হয় তা হলে রাশিয়ার পক্ষে কোন না কোন ক্ষেত্রে একটি নতুন সামরিক সংঘাত সৃষ্টি করা প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না তা নির্ণয় করা কঠিন। প্রেসিডেন্ট চোয়েবের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অনিচ্ছা আরেক দিক দিয়ে লেবানন সমস্যা সমাধানের একটি নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। চোয়েবের রাষ্ট্রপতিত্বে সরকার-পক্ষ ও বিদ্রোহীদলের পারস্পরিক অবরোধিতার সম্ভবত মধ্যবর্তী গঠিত হবে মার্কিন বাহিনী লেবানন ত্যাগে বাধ্য হবে এবং তার ফলে বৃটেনকেও জর্ডান ত্যাগ করতে হবে।

কেরলায় কম্যুনিষ্ট সরকারের ব্যর্থতা

কেরলা সংবাদ-জগতের সবচেয়ে উল্লেখনীয় প্রদেশ। কংগ্রেস-বিরোধী দলের মধ্যে কেরলায় সর্বপ্রথম প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টি সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু সংখ্যা-লঘু সরকার হওয়ার ফলে এবং কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেসের সম্মুক আঘাতের ফলে কেরলায় সোস্যালিষ্ট সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। সংখ্যাসরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট পার্টিই প্রথম ভারতের কেন্দ্রাবেল কাঠামে কংগ্রেস-বিরোধী সরকার গঠনে সক্ষম হয়েছে। কেরলায় কম্যুনিষ্ট সরকারই প্রথম কংগ্রেস-বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার। এই কারণটি ছাড়াও আরেকটি বিশেষ কারণে কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রতি সারা ভারতবর্ষের—এমন কি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

কম্যুনিজম গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী। পৃথিবীর কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে গণতন্ত্র নেই। পূর্ণ গণতন্ত্রের অর্থে কেরলা সরকারকে কম্যুনিষ্টদের গণতান্ত্রিক আদর্শ সমর্থনের একটি নিদর্শন বলা চলে না। কেরলা ভারতের কেন্দ্রীয় গণতন্ত্রের একটি কেন্দ্রাবেল মাত্র। তাই কেরলায় শাসন-যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণের জন্য গণতন্ত্রকে স্বীকার না করে কম্যুনিষ্ট সরকারের পক্ষে উপায় নেই। কেরলায় কম্যুনিষ্ট শাসনকে নীতির দিক দিয়ে সঙ্গত করার উদ্দেশ্যেই হয়তো কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যত্রসহরে গণতন্ত্রের আদর্শকে অন্তত প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্রের কাঠামে কম্যুনিষ্ট পার্টি কি ভাবে দেশ শাসন করে তা লক্ষ্য করার জন্যই কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকার সংবাদ-জগতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কেরলার দেড় বছরের কম্যুনিষ্ট শাসন বিক্ষোভ, সংঘাত ও সংগ্রামে কণ্টকিত। পশ্চিম বাংলাকে যে সন্ত্রাস-গ্রাসী প্রদেশ বলে আখ্যা দেওয়া হয়, কেরলা গত দেড় বছরে পশ্চিম বাংলার বিক্ষোভাত্মক রাজ-

নীতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকার এবং তার সমস্বরে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি কেরলার কংগ্রেস প্রজাসোস্যালিষ্ট, আর এস. পি ইত্যাদি পার্টির সমালোচনা করে বলছে যে কেরলার বিক্ষোভ ও আন্দোলন সরকার-বিরোধী দলগুলির সংঘবদ্ধ কারসাজী ছাড়া কিছু নয়। কংগ্রেসও অন্যান্য প্রদেশে ঠিক এই কথাই বলে। সরকার বিরোধী আন্দোলন দমনে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার, উপরে নিষেধাজ্ঞা আরী, গ্রেপ্তারী, লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার এমন কি গুলি চালনা পর্যন্ত, কংগ্রেস সরকার জন আন্দোলন দমনে যে যে অস্ত্র ব্যবহার করে কম্যুনিষ্ট সরকারও ঠিক সেই সেই যুক্তি ও অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে এবং সমভাবেই কেরলায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

কম্যুনিষ্ট সরকার-বিরোধী আন্দোলনগুলি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কারসাজী বলে কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। কম্যুনিষ্ট সরকারের শিক্ষানীতি, ভূমিনীতি এবং ছাত্রদের যানবাহনের উপর কর ধার্য নীতির বিরুদ্ধে যে তীব্র ও ব্যাপক আন্দোলন এবং সত্যাগ্রহ হয়েছে তাকে কোন-ভাবেই পার্টি পরিচালিত আন্দোলন বলা যায় না। প্রকৃত জনবিক্ষোভকে জন-আন্দোলনের পথে পরিচালিত করা প্রতিটি গণতান্ত্রিক দলের কর্তব্য। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিক ও তীব্র বিক্ষোভ না থাকলে ব্যাপক জন-আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেরলার যে কয়টি জন আন্দোলন কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব এবং জন-সমর্থন দেখে একথা সুনিশ্চিত-ভাবে বলা যায় যে কেরলার জন আন্দোলনের জন্য দায়ী কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকারের জন-স্বার্থ বিরোধী রাজনীতি।

কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকারের গুলি চালনাকে কেরলার ও কেরলার বাইরের কম্যুনিষ্ট পার্টি যে ভাবে সমর্থন করেছে তা' দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। প্রজাসোস্যালিষ্ট সরকারের সময় যে গুলি চলে তার বিরুদ্ধে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির ভিতরে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল—যার ফলে পট্টম থানু পিল্লাইয়ের সরকারকে চরম সমালোচনার পাত্র হতে হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে সোস্যালিষ্ট সরকারের পুলিসী নীতি কি হবে তা' স্থির করার জন্য পার্টির একটি সর্বভারতীয় বিশেষ অধিবেশন পর্যন্ত আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্বত্রই কেরলার গুলি চালনাকে সমর্থন করেছে।

কেরলা কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে নাম্বুদ্রীপাদ-সরকারের নীতির ফলে কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকার ও পার্টি সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম্যুনিষ্ট সরকার ও পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে—(১) কেরলার কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্বত্র একটি আধা সামরিক দলীয় বাহিনী গঠন করেছে। এই বাহিনী বিরোধী দল এবং জনতাকে সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে আইন শৃঙ্খলা বহলাংশে নিজের হাতে গ্রহণ করেছে। তার ফলে প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির তিনজন এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের কয়েকজন কর্মী প্রাণ হারিয়েছে এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে। (২) প্রশাসনের অভ্যন্তরে, কম্যুনিষ্ট পার্টির সেল কমিটিগুলি জোর জবরদস্তি করে বিচারের ভার নিজেরাই গ্রহণ করেছে। (৩) কম্যুনিষ্ট সরকার পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সন্ত্রাসবাদ পরিচালনার সুযোগ দিচ্ছে (৪) পার্টির জন্য কম্যুনিষ্ট সরকারের উদ্যোগে এবং সহায়তায় ব্যবসায়ী মহলকে নানা রকম সুযোগ ও সুবিধ বিতরণ করে এবং কম্যুনিষ্ট সমর্থকদের সরকারী বাণিজ্যে লাইসেন্স দিয়ে পার্টি ফণ্ডের জন্য ঘুষ ও উৎকোচ রূপে এরা মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে (৫) সরকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকে কম্যুনিজ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (৬) শ্রমিক আন্দোলনে

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। (৭) কিষাণ কর্তৃক জবর দখল করা জমিগুলিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থক কিষাণদের সুযোগ দিয়ে অন্য কিষাণদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এই সমস্ত অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং গণতন্ত্রের মূলনীতি বিরোধী, এই অভিযোগগুলি সম্বন্ধে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। কম্যুনিষ্ট পার্টি গত দেড় বছরে কেরলাতে যেভাবে শাসন পরিচালনা করেছে তাতে আশার চেয়ে ভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বেশি এবং সারা ভারতের কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনকে নানা ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে।

দামোদরের জল

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধীদলগুলির তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাধিক্যের জোরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের খালের জলের উপর বাধ্যতামূলক সেচকর ধার্য করার নিরঙ্কুশ অধিকার পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি আইন পাশ করে গ্রহণ করেছেন। এই আইনের অধিকারে, দামোদর ভ্যালি এলাকার যে কোন অঞ্চলে সেচের জল প্রবাহিত হবে এবং সেচের ফলে যে কোনো জমির ফলনে উপকার হবে কিম্বা উপকার হ'বার সম্ভাবনা থাকবে, সেই অঞ্চলের স্থায়ি শস্যের জন্য একর প্রতি অন্যূন সাড়ে বার টাকা এবং রবিশস্যের জন্য একর প্রতি অন্যূন পনের টাকা বাধ্যতামূলক কর ধার্য করা হবে। যদি কোনো বছর কোনো জমিতে আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণভাবে শস্যের উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে, কেবলমাত্র সেই বছর সেই জমিতে আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ জল কর মকুবের প্রশ্ন উঠবে।

দামোদরের জলে জল সেচ একর প্রতি খরিফ শস্য ও ভিন্ন জন্য একর রবিশস্যের জমিতে সেচকার্য সম্পন্ন হবে বলে দাবী করা হয়েছে। কাগজে-কলমে জলের পরিমাণ ও জমির পরিমাণ ধার্য হয়ে গেলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে দেখা গেছে প্রয়োজনের সময় ক্ষেতে জল পৌঁছায় না। এ বছরই জুলাই মাসের শেষে এবং আগষ্টের প্রথম দিকে বহু এলাকায় কৃষকেরা জলের জন্য চাতকের মত অপেক্ষা করেছে, কারণ আর কয়েকদিন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, অর্থাৎ আগষ্টের মাঝামাঝি পৌঁছে গেলে আমনের চারাগাছ রোয়া যাবে না। ফলে আমন ধানের ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের সর্বনাশ হবে।

বাধ্যতামূলক ভাবে সময়মত সেচের জল সরবরাহের ব্যবস্থার অবর্তমানে বাধ্যতামূলক কর ধার্যের অধিকার গ্রহণ করা সুনিশ্চিতভাবে শোষণমূলক। দামোদর ভ্যালির বাঁধে জলের যোগান থাকলেই যে সে-জল সেচের জন্য পাওয়া যাবে তা নয়। বাঁধ থেকে জমিতে জল পৌঁছে দেবার জন্য ছোট বড় নানা রকমের খাল খনন সম্পূর্ণ না হয়ে থাকলে বাঁধের জল বাঁধেই থেকে যাবে জমিতে আর গড়িয়ে পড়বে না। দ্বিতীয়তঃ, খাল তৈরী থাকলেও জল সরবরাহের অব্যবস্থার জন্য জমিতে সময়মত জল নাও পৌঁছাতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে জল সেচের উদ্দেশ্যে খালের সাহায্যে জমি পর্যন্ত প্রবাহিত হল, তার কিছু অংশ খালের জমিতে কিছু অংশ চাষের জমিতে চুইয়ে অপচিত হবে। চতুর্থতঃ জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে যে জল দেওয়া হল, সবটাই জমির সেচের জন্য ব্যবহৃত হবে কি না। আর্দ্র জমি কম জল ব্যবহার করবে, শুকনো জমি বেশী জল টানবে। পঞ্চমতঃ, জমির ঢালুদেশে যে জলের স্তর আছে, জমিতে সেচের জন্য ব্যবহৃত জলের পরিমাণের সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। জলের স্তরের উচ্চতা যেখানে কৃপ্তের নিকটবর্তী সেখানে অতিরিক্ত সেচের জল চাষের জমিকে জলাজমিতে পরিণত করে

চাষের সর্বনাশ সাধন করতে পারে। এ ছাড়া সেচের এলাকায় বালুময় জমি থাকলে, সে জমিতে জল দিলেও সেচ হবে না এবং চাষ ও হবে না। সুতরাং সেচের জন্য জলের আয়োজন থাকলেই যে তা কাজে আসবে বা ব্যবহৃত হবে এই অনুমান কি মারাত্মক রকম ভ্রান্ত তা বোঝা যাবে। আয়োজন এবং ব্যবহারের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সেই ব্যবধানের কারণগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন। এর মধ্যে যে কারণগুলির ভিত্তি প্রাকৃতিক তাদের দূর করা যাবে না। অন্যান্য যেগুলি অপসারণ করা সাধ্যায়ত্ত সেগুলি দূর করলে আয়োজন এবং ব্যবহারের মধ্যে দূরত্ব সঙ্কীর্ণতর হবে মাত্র। সুতরাং কোনো অবস্থায়ই বাধ্যতামূলক কর ধার্যের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না।

এ-ছাড়াও দামোদর ভ্যালির পরিকল্পনার গলদের মধ্যে আর একটি কারণ নিহিত আছে। মূলত বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য যে পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে প্রসঙ্গত তার সঙ্গে বিদ্যুৎ ও সেচ পরিকল্পনা সম্পর্কিত হয়ে সমস্ত পরিকল্পনাটিকে পূর্ণতা দান করেছে। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে অধিকতর উপার্জনশীল করবার জন্য জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন অগ্রাধিকার পেয়েছে। সেচের ব্যবস্থা তারপরের সারিতে স্থান পেয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পর্য যদি কোনো সময় বিঘ্নিত হয়, তাহলে সেচের জল সরবরাহে পরিষ্কারভাবে ঘির দেখা দিতে পারে। সেই সম্ভাবনার সামনে বাধ্যতামূলক কর আরোপের নীতি যে কত ভ্রান্ত তা বলা বাহুল্য।

সেচ-ব্যবস্থার সঙ্গে ফসলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সেচের জমিতে যদি একাধিক ফসল না ফলানো যায় কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য। পশ্চিম বাংলায় বেশীর ভাগ জমি এক ফসলা এবং আমন ধান এই ফসল। সুবৃষ্টি হলে এই ফসল সেচের উপর নির্ভরশীল নয়। অনাবৃষ্টির দিনেই এই ফসলের জন্য সেচের প্রয়োজন। কিন্তু, সেই দুর্দিনে সেচ-পরিকল্পনার জলাধার থেকে সময় মত ও প্রয়োজন মত জল সরবরাহ সম্ভব করে তোলা যায় নাই। যার ফলে সেচের আয়োজন থাকলেও অনাবৃষ্টির বছরে খাদ্যের ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী। যেমন এ বছর হয়েছে। সুবৃষ্টির বছরে যদি সেচের জলের সাহায্যে জমিতে আর একটি ফসল তোলা না যায়, কৃষকের পক্ষে সেচের ব্যয় বহন করে আর্থিক সঙ্গতি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। উপরন্তু, সেচের সদ্ব্যবহারের জন্য যে মূলধন লগ্নী করা প্রয়োজন, কৃষকের সে সঙ্গতি নেই।

এই অবস্থায় কৃষকের স্কন্ধে সাড়ে বার টাকা ও গনের টাকার ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরকার পীড়নের এক নূতন অধ্যায় যোজনা করলেন। সেচের জন্য কর ধার্য করা হবে না, এ-যুক্তি কেউ দেবেনা। কিন্তু করের মাত্রা কৃষকের বহনযোগ্য হবে, এবং নির্বিচার করধার্যের নীতি গ্রহণ করে কৃষকের সর্বনাশের পথ প্রশস্ততর করা হবে না, যারা সরকারের কাছে এই সুবিবেচনা আশা করেছিলেন তারা নিরাশ হয়েছেন। ডি, ভি, সি পরিকল্পনার সকল প্রকার খুচরো মাশুল বহন করবার জন্য সরকারী দৃষ্টিতে পশ্চিমবাংলার কৃষকই সকলের চাইতে সক্ষম—এই নীতিই আইন পাশ করে কালির আঁচড়ে বিধিবদ্ধ হল।

বীরেন সেন

বিপ্লবী বীরেন সেন মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গত ৫ই জুলাই অকস্মাৎ লোকান্তরিত হয়েছেন। সেদিন বেলা বারটা পর্যন্ত দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় অতিবাহিত করে যখন তিনি বাড়ী ফেরেন, তখন কেউ জানতো না যে সন্ধ্যাবেলা পাঁচমিনিটের সময় দিয়ে তাঁর লোকান্তরের

তাক আসবে। এই বহুজনপরিচিত ও বহুজনপ্রিয় কর্মব্যস্ত মানুষটি সকলের অজান্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

সাধারণের সমতলে আনাগোনা করেও যাঁরা তাঁদের প্রকৃতির ব্যঞ্জনায় জানিয়ে যেন সাধারণের ভীড়ের বাইরে তাঁদের স্থান, বীরেন সেন ছিলেন সেই জাতের।

ছাত্রজীবনেই তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাকে বৈপ্লবিক আদর্শের অনুরাগী করে তোলে। ঢাকা তখন বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মকেন্দ্র। পরলোকগত বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের নেতৃত্বে শ্রীসঙ্ঘ নামে যে শক্তিশালী বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, ঢাকার ছাত্র ও যুবশক্তির উপর অল্পসময়ে তার প্রভাব প্রবলভাবে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

বীরেন সেনও এই প্রভাবের আকর্ষণে শ্রীসঙ্ঘে যোগ দেন। ধীরে ধীরে 'দাদু', 'দাদু সেন' বা 'দাদুদা' নামে বীরেন সেন বিপ্লবী মহলে স্থায়ী আসন করে নিলেন। চরিত্র-মাধুর্যে, সহমর্মিতায় ও নিরলস কর্মের মধ্য দিয়ে দাদু সেন ঢাকার শঙ্খারিটোলা পাড়ায়—যেখানে তাঁর বাস ছিল,—যুবশক্তির অনায়াসলব্ধ নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, তা সে-সময়কার অনেকেরই মনে আছে।

১৯৩০-৩১ সালে বিপ্লবপ্রচেষ্টার বিপদসঙ্কুল দিনগুলিতে

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লা-জমিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জমিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা করবরে করে তোলে।

৬ ২১১-২১৩ BO

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রচার।

গুরুদায়িত্ব নেবার ডাক এলে বীরেন সেনও অগ্রবর্তী হয়ে আসেন। সংগঠনের নেতৃস্থানীয়েরা কারাভ্যন্তরে। অন্যান্যরা বাইরে আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের নিরাপত্তা, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও বৈপ্লবিক কর্মসূচীর রূপায়নের দায়ীত্ব নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে বীরেন সেনও এগিয়ে আসেন। এই সময় ঢাকা সহরে দিনের বেলায় ট্রেন থামিয়ে অর্থ সংগ্রহের সাফল্যজনক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও কিছুকাল পরে গোয়েন্দা পুলিশের অত্যাচারী বড়কর্তা গ্রাসবিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার প্রয়াসে বীরেন সেন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরই বীরেন সেন বিনা বিচারে আটক হন এবং কয়েক বছর বহরমপুর বন্দীশিবির ও অন্যান্য জেলে আবদ্ধ থাকেন।

কারাবাস থেকে মুক্তি পাবার পর সাংসারিক বিপর্যয়ে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে পারলেও কখনও বীরেন সেন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন নাই। এই পর্যায়ে ১৯৩৮ সালে বীরেন সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন। এখানেও তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও দৃঢ়তা তাকে কর্মচারীদের মধ্যে শুধু যে জনপ্রিয় করে তোলে তাই নয়, তাদের অন্যতম পুরোধারূপে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়। কর্মচারীদের সাহচর্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংগঠন, তাদের জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি গঠন ও তাদের অন্যান্য দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর শক্তিশালী মহলের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বীরেন সেন ও তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা রুখে দাঁড়াতেই কর্তৃপক্ষ প্রত্যাঘাত করেন ও অন্যায়ভাবে ও বিনা বিচারে তাঁকে কর্মচ্যুত করেন। কর্মচ্যুত করার পূর্বে বীরেন সেনকে দমনীয় করবার জন্য নানা প্রলোভন দেখানো হলেও বীরেন সেন কর্তব্যে অবিচল থাকেন। কর্মচ্যুত হয়ে একদিকে পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী বন্ধুদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাশাপাশি এই দুই সংগ্রামে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের আন্দোলনই বহুলাংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা তদন্ত করবার জন্য গভর্ণমেন্ট বি, এল, মিত্র তদন্ত কমিটির গঠন করেন। বীরেন সেনের কর্মতৎপরতা এই তদন্ত কমিটি গঠনের পশ্চাতে অপ্রত্যক্ষভাবে কতটা কাজ করেছে—ইতিহাস হয়ত একদিন তা উদ্ঘাটন করবে। শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্রস্থল যে বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানকার দুর্নীতি অপসারণে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টায় প্রতিহত হয়ে বীরেন সেন শিক্ষা-সংস্কার সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। কর্মচ্যুত হবার পর বীরেন সেন নূতন কর্মক্ষেত্রে জীবনবীমায় সহকর্মীদের সংগ্রামের শরীক হয়ে তাদের সাম্প্রতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

বীরেন সেনের প্রতিষ্ঠা ছিল না, জীবন-সংগ্রামে তাঁর স্থিতি ছিল না কিন্তু মহত্ত্বের ঐশ্বর্য তাঁকে মহীয়ান করে রেখে গেছে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই সরল অনাড়ম্বর মানুষটি মানবিক ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হন নাই। আমাদের বিপ্লবী সহকর্মী বীরেন সেনের স্মৃতির প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

ছাত্র-ধর্মঘট

ভারতের ছাত্রেরা দাবী-দাওয়ার আদায় থেকে কিছু কাল মুক্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কেরলায় ব্যাপক ছাত্র-ধর্মঘটের পরে পশ্চিমবঙ্গে আবার ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়েছে।

(শেষাংশ ২২৪ পৃষ্ঠায়)

প্রবন্ধ

কলিকাতার বেকার-সমস্যা

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় কলিকাতার বেকার-সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এই যে, কলিকাতার বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এই সমস্যার আশু সমাধান হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে যে এখানকার শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শতকরা অন্ততঃ ৬০ জন বাঙ্গালী নিয়োগ করতে বাধ্য করা হোক। প্রস্তাবটির ভালমন্দ ও সাধারণভাবে বেকার-সমস্যার সমাধানের উপায় আলোচনা করবার পূর্বে এই বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন।

বাংলার রাজধানী কলিকাতায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এই সহরের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশই অবাঙ্গালী। কেবল যদি কর্মক্ষম লোকদের কথা ধরা যায় তবে অবাঙ্গালীর সংখ্যা আরো কিছু বেশি হবে। কর্মক্ষম লোক বলতে সাধারণতঃ ১৫ থেকে ৬০ বৎসর বয়স্ক লোককে ধরা হয়। এই বয়সের লোকদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা ৩৬·৬ জন। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে বেকারদের মধ্যে শতকরা ৭৯ জনই বাঙ্গালী। কাজেই বাঙ্গালীদের মধ্যে তুলনায় বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি। অবশ্য এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। পাটনা সহরে খুব সম্ভব দেখা যাবে যে বাঙ্গালী অপেক্ষা বেহারীদের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা বেশি।

অন্য সহরের কথা যাই হোক, কলিকাতায় বেকার সমস্যা প্রধানতঃ শিক্ষিত বেকার সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে বেকারদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জন শিক্ষিত। অশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা মাত্র ৩·৪ জন। আর যারা লিটারেট বা যাদের মাত্র অক্ষর পরিচয় হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজন লোক বেকার বসে আছে। কিন্তু যারা স্কুলে অষ্টম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে সেই সব কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা শতকরা ১৮ জনেরও বেশি। ১৫ থেকে ৬০ বৎসর বয়স্ক লোকেদের মধ্যে যারা বড় জোর উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা পাশ করেছে তাদের শতকরা মাত্র ৩·৩ জন লোক

বেকার বসে আছে। আর যারা ম্যাট্রীকুলেশন বা তদূর্দ্ধ পরীক্ষা পাস করেছে তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা হচ্চে শতকরা দশ জনেরও বেশি। শতকরা ২।৩ জন লোক বেকার থাকা কিছুই অস্বাভাবিক নয় এবং এই পর্যন্ত লোক বেকার থাকা সত্ত্বেও দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বর্তমান আছে বলা হয়। সুতরাং অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যা নাই বললে দোষ হয় না। কিন্তু শতকরা ১০ পারসেণ্ট লোক বেকার থাকা চিন্তার বিষয়। সুতরাং কলিকাতার বেকার-সমস্যা সাধারণ বেকার-সমস্যা থেকে পৃথক। এখানকার বেকার-সমস্যা বলতে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা বুঝতে হবে।

কলিকাতার বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। ছেলেদের মধ্যে বেকার-সমস্যা যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মেয়েদের মধ্যেও এই সমস্যা বেশ গুরুতর ভাবেই দেখা দিয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক চাপে আজকাল বহু মেয়েই চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছেন এ আমরা সকলেই জানি। তাহলেও দেখা যাচ্ছে যে ১৫ থেকে ৬০ বৎসর বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শতকরা ১১ জনেরও কম মহিলা কাজের খোঁজ করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন বেকার বসে আছেন। ছেলেদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা শতকরা ৯ জনেরও কম। ২০ থেকে ২৪ বৎসর বয়সের ছেলেদের মধ্যে যারা কর্মপ্রার্থী তাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন বেকার। কিন্তু এই বয়সের মহিলা কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৯ জন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশি পরিমাণে বেড়ে যাওয়া খুবই চিন্তার বিষয়।

আর একটি চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে, শতকরা ৭০ জন বেকার লোক বলেছেন যে তাদের বিশেষ কোন কাজের দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা বা কোনরূপ শিল্প-কুশলতা নাই। কাজেই এদের জন্য হয় এমন সব কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে যেখানে কোন শিল্প-কুশলতার প্রয়োজন নাই, নচেৎ এদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের যান্ত্রিক বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্য অনেকেই বলেন যে শিক্ষিত বেকার সমস্যার মূল কারণ এদেশে যান্ত্রিক বিদ্যা বা বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ফলে অধিকাংশ লোকই সাধারণ শিক্ষার দিকে ঝোঁকে ও বেকারের সংখ্যা বর্ধন করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুইটি বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে যারা একাউণ্টেন্সি বা হিসাব পরীক্ষার কাজ শিখেছেন তাদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৭ জন লোক বেকার বসে আছে। যারা টাইপিস্ট বা স্টেনোগ্রাফার বা এই ধরণের অন্য বৃত্তিশিক্ষা করেছে তাদের মধ্যে একপঞ্চমাংশ লোক কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। এমনকি এত

যে প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয়ও যারা করেছেন তাদের মধ্যে যারা একটু নিম্নস্তরের—অর্থাৎ কেবল মাত্র ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পর্যন্ত পড়েছেন—এদের শতকরা ২৪ জন লোক বেকার বসে আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কলকাতার বেকার-সমস্যার তিনটি প্রধান দিক আছে। প্রথমতঃ এ সমস্যা বাঙ্গালী শিক্ষিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়তঃ, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এর গুরুত্ব আরো অধিক। তৃতীয়তঃ, বেকারদের অধিকাংশই সাধারণ কাজ অর্থাৎ কেরাণী বা এই ধরণের কলম পেশার কাজ ছাড়া অন্য কাজের অনুপযুক্ত। এই কয়টি দিকের কথা ভেবে বেকার-সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। অবাঙ্গালী অপেক্ষা বাঙ্গালীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশি হওয়ার তিনটি কারণ দেখা যায়। প্রথম বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমে ইংরাজ বা অন্য মালিকের হাত থেকে অবাঙ্গালী মালিকের হাতে চলে যাচ্ছে। সাহেবী আমলে অফিসারের আসনে সাদাচামড়ার একাধিপত্য ছিল। কালা আদমীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু সাহেব মালিক কেরাণীর চাকুরীতে বাঙ্গালীদেরই পছন্দ করতেন। অবাঙ্গালীর সংখ্যা তখন নিতান্তই নগণ্য ছিল। কিন্তু অবাঙ্গালী মালিক শুধু অফিসারের পদে নয়, সামান্য কেরাণীর কাজেও অবাঙ্গালী নিযুক্ত করতে সুরু করেছেন। কেরাণীর কাজে বাঙ্গালী ছেলের চিরাচরিত অধিকার। সেখানেও যখন অবাঙ্গালীর আক্রমণ হয়েছে তখন বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা যে গুরুতর আকার ধরবে এতে আর সন্দেহ কি? আগেকার যুগে বহু বাঙ্গালী কাজের সন্ধানে বাংলার বাইরে গেছেন এবং অন্য প্রদেশে নানা দিক থেকে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তখন বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার অন্য প্রদেশের লোকের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ফলে এইসব প্রদেশে কাজ সংগ্রহ করা বা বিভিন্ন বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। কিন্তু এই বহির্মুখী স্রোতে ভাঁটা পড়ে গেছে। অন্য প্রদেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ও বর্তমানে বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে সেখানে গিয়ে কাজ সংগ্রহ করা বা ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং কি শিক্ষকতায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করা কঠিন হয়ে উঠছে। কাজেই বাঙ্গালীর ছেলেকে কলকাতার বাজারেই কাজের সন্ধানে ঘুরতে হয়। বহির্মুখী স্রোত যখন এইভাবে অন্তর্মুখী হয়েছিল তখন এল পূর্ববঙ্গের জনস্রোত। যারা সাধারণভাবে পূর্ববঙ্গে নানাকাজে নিযুক্ত ছিল তারা ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে দেশ ছেড়ে পশ্চিম বাংলার কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। এই ভাবে দুইদিক থেকে কর্মপ্রার্থীর স্রোত যখন বেড়ে উঠল তখন আবার রাষ্ট্রপরিবর্তনের ফল হিসাবে এল সাদামালিকের

স্থানে অবাঙ্গালী মালিক। ফলে কর্মপ্রার্থীদের তুলনায় কাজের সংখ্যা দিনে দিনে পরিহ্রাসমান হোল।

বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রকৃতি না হয় জানা গেল কিন্তু এর সমাধান কিভাবে করা যায়? কলিকাতার সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বাঙ্গালী ছাঁটাই বন্ধ করে আরো বেশি সংখ্যায় বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগ করতে বাধ্য করা যেতে পারে। আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই ধরণের কোন আইন গ্রাহ্য হবে কিনা এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। ধরা যাক যে আইনটি অ-শাসনতান্ত্রিক নয়। কিন্তু তা'হলে কি এর ফলে কলিকাতার বেকার সমস্যার সমাধান মিলবে? মালিকেরা যদি ঠিকমত আইন মেনে চলে তবে সাময়িকভাবে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালীর কপালে কেরাণীর চাকুরী জুটতে পারে। কিন্তু যে কারণে মালিকের অবাঙ্গালী-নিয়োগ-প্রবণতা বেড়েছে সেই কারণ বর্তমান থাকলে তারা ক্রমে ক্রমে এ দেশে তাদের ব্যবসায়ের জাল গুটাতে চেষ্টা করবে। যারা নূতন ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা করছেন তারা নিতান্ত বাধ্য না হলে বাংলার বাইরে কারখানা খুলবেন। ফলে আজকার বেকার-সমস্যা যদিও বা কিছুটা কমে, কাল সে সমস্যা আবার গুরুতর আকার ধারণ করবে।

এই আইন যদি জোর করে বহাল রাখা যায় তবে বাঙ্গালীর নিয়োগ হয়ত কিছু বাড়তে পারে। কিন্তু তাহলে অবাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এই আইনের ফল হবে শুধু বেকার-সমস্যা অবাঙ্গালী সমাজে বা প্রদেশে চালান দেওয়া। অর্থাৎ আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ পাবে বটে, কিন্তু বেহারী মাদ্রাজী মাড়োয়ারী ছেলেরা বেকার হবে। শুধু কেবল বাঙ্গালীর স্বার্থের কথা চিন্তা করলে অবশ্য এই কাজের মধ্যে দোষের কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেটা ভারতবর্ষের কথাও অন্ততঃ মাঝে মাঝে আমাদের ভেবে দেখা উচিত। একদেশ থেকে অন্যদেশে বেকার-সমস্যা চালান নীতি (exporting unemployment) অনেকেই নিন্দনীয় মনে করেন। আর একই দেশের মধ্যে এক জাতি বা এক প্রদেশবাসীর পক্ষে তাদের নিজেদের বেকার-সমস্যা সেই দেশেরই অন্যজাতি বা প্রদেশবাসীর স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কতখানি উচিত হবে এ কথা ভেবে দেখা দরকার। একই দেশের এক অঞ্চলের লোক বা সরকার যদি অন্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সুরু করে তবে সে দেশের কল্যাণ হওয়াত দূরের কথা—স্বাধীনতাও বেশীদিন বহাল থাকবে কিনা সন্দেহ। অবাধ মেলামেশা ও ব্যবসায়বাণিজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলে একাত্মবোধ গঠনে বিঘ্ন জন্মাবে। এখন কথা উঠতে পারে যে বিহারে ও আসামে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে আমাদেরও বাংলাদেশে বাঙ্গালীর

স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে হবে।—অবাঙ্গালীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। কথাটা অনেকেই যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু এ দেশে জাতীয়তাবোধ গঠনের পথে এত বাধা আছে যে এই বাধার বোঝা আর বাড়ান উচিত হবে না। আর এই কাজে আমাদের প্রেসামের আইন চালু করার প্রতিযোগিতায় যোগ না দিলেই সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে। বিহার ও আসামের এই বাঙ্গালী বিদ্বেষ যে অত্যন্ত অন্যায় একথা সকলেই স্বীকার করেন। যে কাজ আমরা অন্যায় মনে করি নিজেদেরই আবার সেই অন্যায় করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? আর এই কাজ করা যদি প্রয়োজনও মনে হয় তবে বড় জোর এই কথা বলা যায় যে বাংলা দেশে বেহারী ও আসামীকে কাজ দেওয়া চলবে না। কিন্তু এর ফলে কলিকাতার বেকার-সমস্যার সমাধান হবে কতটুকু? শিক্ষিত বেকার বাঙ্গালী যে ধরণের কাজ চায় ক'জন বেহারী ও আসামী সেই কাজ করে? বিহার ও আসামের অন্যায়ের জন্য সমস্ত অবাঙ্গালীকেই কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? আর এ পথে সমস্যাটির আসল বা সাময়িক সমাধান মিলবে কিনা সন্দেহ। আমরা যদি আজ কলিকাতার শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অবাঙ্গালী নিয়োগ বন্ধ করি—তবে এর প্রতিবাদে অন্যান্য প্রদেশের সরকারও নিজ নিজ অঞ্চল থেকে বাঙ্গালী তাড়াতে সুরু করবে। এই সব গৃহহারা কর্মহারা বাঙ্গালীকে আবার কলিকাতায় ফিরে আসতে হবে। তাহলে বাঙ্গালী বেকার সমস্যা আবার হয়ত পূর্বের মতই গুরুতর হয়ে উঠবে। এ পথে সমস্যাটির সমাধান খুঁজতে যাওয়ার মত ভুল আর নাই। সাময়িক সংকটে পড়ে আমরা যেন চিরন্তনী সত্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ ও একজাতিত্ব হারিয়ে না ফেলি।

যদি মালিকের বাঙ্গালীনিয়োগবিমুখতা কলকাতার শিক্ষিত বেকার-সমস্যার একটি প্রধান কারণ মনে করা হয় তবে এর আসল সমাধান পাওয়া যাবে এই বিমুখতার কারণ দূর করে। এই বিমুখতার কারণ সাধারণতঃ মালিকের স্বজাতিপ্রীতি বা বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বলে বলা হয়। সবদেশেই সবজাতের মালিক কিছু কিছু নিজের আত্মীয়-বন্ধু পোষণ বা করতে বাধ্য হন। বাঙ্গালী মালিক যদি বিহারে ব্যবসায় খোলে তবে বড় বড় বা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের আত্মীয়-বন্ধু বা জানাশুনা বাঙ্গালী নিয়োগ করবে—এ খুবই স্বাভাবিক। মানব চরিত্র ও সমাজ-ব্যবস্থার কথা মনে করে কিছুটা পর্যন্ত এ জিনিষ স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু কোন মালিকই আত্মীয়-বন্ধু পালননীতি বেশিদূর পর্যন্ত মেনে চলবে না। মালিক আত্মীয় পোষণের জন্য ব্যবসায় করে না। অধিকাংশ সময়েই তার লক্ষ্য থাকে কি করে মুনাফার অঙ্ক ক্রমেই বাড়ান যায়। কাজেই কর্মচারী নিয়োগের সময় তাকে পদপ্রার্থীদের আপেক্ষিক যোগ্যতার কথা ভাবতে হয়। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে দুএকটি লোক নেওয়া চলে। কিন্তু অফিসের অধিকাংশ পদেই কম দক্ষ লোক নিয়োগ করলে তার ব্যবসায় চলবেনা—এ সে বেশ ভাল করেই জানে। বাঙ্গালী কর্মচারীর যোগ্যতা যদি বেশি হয় তবে হাজার বিদ্বেষ সত্ত্বেও মালিক তাকে

কাজ দিতে বাধ্য হবে। অবাঙ্গালী মালিক যদি ব্যাপকভাবে বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগ না করে, অ-বাঙ্গালী লোক দিয়ে অফিস ভর্তি করে তবে বুঝতে হবে যে হয় বাঙ্গালীর যোগ্যতা অবাঙ্গালী থেকে সাধারণভাবে কম অথবা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর যোগ্যতা সমান। যোগ্যতা সমান হলেই মালিক স্বজাতিপ্রীতি বা বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বেশি করে দেখাবার সুযোগ পাবে। যদি আমাদের ছেলে-মেয়েদের যোগ্যতা কম হয় তবে অবাঙ্গালী মালিককে দোষ না দিয়ে আমাদের দক্ষতা কি করে বাড়ে সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। আর উভয় পক্ষের যোগ্যতা যদি সমান হয় তবে মালিকের বাঙ্গালী বিদ্বেষের কারণ কি তা নির্ণয় করতে হবে। যোগ্যতা যদি সমান হয় তবে মালিক সাধারণতঃ বেশি সংখ্যায় বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগ করবে। কেরাণীগিরি বাঙ্গালীর বহুকালের পেশা ও এই কাজে সে বিশেষ দক্ষ বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। কাজেই কলিকাতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগই স্বাভাবিক। মালিক জানে যে বাঙ্গালী নিয়োগ করলে স্থানীয় লোকের ও সরকারের সহানুভূতি ও সহযোগ সে পাবে। কাজেই যে জিনিষটি স্বাভাবিক বা চিরাচরিত ও যা করলে হাঙ্গামা সব চেয়ে কম হবে সেই কাজ না করে মালিক কেন বেশি সংখ্যায় অবাঙ্গালী কর্মচারী নিয়োগ করবে? এর ফলে স্থানীয় লোকের ও সরকারের বিদ্বেষে মালিকের অসুবিধা ছাড়া সুবিধা হবে না। বাঙ্গালী কর্মচারী অবাঙ্গালী লোক অপেক্ষা কম দক্ষ এ কথা মনে করার কোন কারণ নাই। তবে দক্ষতা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে,—কাজের যোগ্যতা ও কাজের ইচ্ছা। বাঙ্গালী পদপ্রার্থীর কাজের যোগ্যতা অন্যের চেয়ে কম—এ কথা কোন মালিক ভাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কাজের ইচ্ছা দুপক্ষের সমান কিনা—একথা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। অধিকাংশ মালিক যদি মনে করে যে বাঙ্গালী কর্মচারীর কাজের ইচ্ছা কম তবে আইনের শরণাপন্ন না হয়ে এই বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে কিনা এবং থাকলে এর প্রতিকার কিভাবে করা যায়—সেই দিকে দৃষ্টি দিলেই বর্তমান সমস্যার সমাধান মিলবে।

কলিকাতার শিক্ষিত বেকার সমস্যা আজকের নূতন সমস্যা নয় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেশি সংখ্যায় বাঙ্গালী-কর্মচারী নিয়োগের ফতোয়া দিলেই এর সমাধান পাওয়া যাবে। যখন অফিসগুলিতে প্রায় সমস্ত কর্মচারীই বাঙ্গালী ছিল তখনও এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়েছে। ১৫ থেকে ২৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে কি মফস্বলের ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে—তাদের মধ্যেই সমস্যা সবচেয়ে গুরুতর। এবং সে সমস্যার সমাধান অন্য পথে খুঁজতে হবে।

চিঠি

কমল মুখোপাধ্যায়

স্মৃতির মুকুরে প্রতিচ্ছায়া সেই শ্রাবণের :
দিনের বেয়ারী মেঘছায়া তলে ঢাকা
অসীম আকাশ দেউলিয়া হল দানে,
তৃষিতা ধরণী গুনগুন প্রেম-রাকা।

প্রেয়সী ধরার স্তনভারে নত মহীয়ান,,
সুনীল অধর গৈরিকে আসে নেমে ;
রিক্ত পেয়ালা শরতের লালে স্বপ্নিল,
সুনীল আজিকে আরো-নীল ধরা-প্রেমে।

শারদ প্রভাতে মুঠা মুঠা গিনি করে
তাই-তো আজিকে ওই-কটি-কথা-চিঠি ;
অবুঝ তুমি তো বুঝলে না দুটি কথা,—
ধরার তাহার স্বাক্ষর দিঠিদিঠি—

দেউলে-মানেই আকাশের রক্তি-রূপ,
প্রেমের আখর এঁকে দেয় অমরতা॥

প্রবন্ধ

পশ্চিম এশিয়ার আন্তর্জাতিক

ইরাক-লেবানন-জর্ডন

সরোজ আচার্য

লেবানন, জর্ডন, ইরাক খুব বড়ো দেশ নয়। এদের দেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশিদিনের নয়, খুব গভীরও নয়। এদের সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার ফলে। তার মধ্যে একটি হল ইরাকের রাষ্ট্র-বিপ্লব। অন্যটি লেবাননে মার্কিন ফৌজের অবতরণ। কেবল এই দুটি দেশের সাম্প্রতিক ঘটনার উপরে নজর দিলে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি বোঝা যাবে না। জানা যাবে না কেন মরোক্কো থেকে পশ্চিম পাকিস্থান পর্যন্ত সমস্ত পশ্চিম এশিয়ার ভূখণ্ড আলোড়িত হচ্ছে নতুন প্রাণ-স্পন্দনে। যে কারণেই হোক আরবদেশ গুলি সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনোভাব এতদিন পর্যন্ত খুব শ্রদ্ধাশীল ছিল না, ধারণা ছিল এ সমস্ত দেশের জনসাধারণ ধর্মোন্মাদ মোল্লামৌলভীর ইঙ্গিতে চলে আর সবার উপরে এদের চালায় তেলের (পেট্রোলিয়ম) ইজারাদার কারবারী মহাজনদের সরকারী ও বেসরকারী বিদেশী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরা। পশ্চিম এশিয়ার আরব-জগৎ সম্বন্ধে আমাদের এই রকম ভাসা-ভাসা বিকৃত ধারণার মধ্যে কিছুটা হয়তো সত্য ছিল। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আরবদেশগুলিতেও জাতীয়তাবাদ এবং জনস্বাধীনতার শক্তিগুলি সক্রিয় হতে সুরু করেছিল। লেবাননে ইরাকে, জর্ডনে বিদ্রোহের প্রচণ্ডতা দেখে পাশ্চাত্যশক্তি সৈন্যের মুখপাত্র কেউ কেউ বলেছেন, এ হ'ল কম্যুনিষ্টদের নাশকতা, ক্রেমলিনের চাল কিম্বা প্রেসিডেন্ট নাসেরের "সাম্রাজ্যবাদী" অভিসন্ধির নিদর্শন। এ ধরণের উক্তির মধ্যে এইটুকু মাত্র সত্যতা রয়েছে যে পশ্চিম-এশিয়া থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব এবং আধিপত্য দূর হলে কম্যুনিষ্টরা খুশী হবে, বৃহৎশক্তি রূপে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুবিধা হবে। তা বলে পশ্চিম এশিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা ও পরিচালনা শক্তি কম্যুনিষ্টরা যোগায়নি, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেও আসেনি। আরব জাতীয়তাবাদী জাগরণের উৎস আরবদেশগুলিতেই; মিশরে, ইরাকে যা ঘটেছে, অন্য সব আরব দেশে যা ঘটবার সম্ভাবনা প্রবল হচ্ছে তাকে ভয় বা বিদ্বেষের বশে বিকৃতভাবে দেখলে কারোই মঙ্গল হবে না। আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তার বিদেশী আধিপত্য-বিরোধীসংঘের নতুন নয়, বাইরের কোনো শক্তির প্ররোচনায় আজ মরোক্কো থেকে পারস্য উপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েনি।

আরব দেশগুলির সমস্যা আমরা এতদিন খুব ভালো-ভাবে বুঝিনি, বুঝতে চেষ্টা করিনি তার একটি কারণ আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঝোঁক ছিল পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে—সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার উপর আমাদের নজর বেশি ছিল। পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম

জগতে কেবল মিশরের সঙ্গে আমাদের জাতীয়তাবাদী সংকল্পের কিছু ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মিশরের জগলুল পাশা ও ফ্রান্সের (মরক্কোর) আবদুল করিমের বীরত্বকাহিনী আমরা প্রত্যক্ষরে অনুসরণ করেছি। কিন্তু অন্য সব আরব দেশে কী অবস্থা তা ভালোভাবে জানা সম্ভব ছিল না। এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ—প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল মিশর থেকে এডেনের এক তখন আশ্রিত শেখদের রাজত্ব পর্যন্ত। কেবল আমাদের কেন, য়ুরোপীয়দের এমনই অবজ্ঞা ছিল এইসব দেশের আশ্রিত রাজা, বাদশাহ আমীরওমরাহ, পাশা, আগা, শেখ এবং এক্সেলীদের উপর যে পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যকে ধরে নেয়া হত পশ্চিমযুরোপের পাদপীঠ। অত্যুক্তি করা হচ্ছে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম য়ুরোপের যখন প্রায় মেউলিয়া অবস্থা, তখন পশ্চিমী-রাষ্ট্রনায়করা "ওয়েষ্ট য়ুরোপীয়ান কমিউনিটি" নামে একটা নতুন সংস্থা গড়বার সংকল্প করলেন; তাতে ধরে নেয়া হল মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা হবে পশ্চিম-য়ুরোপের সম্প্রসারিত এলাকা (extension), কাঁচামালের যোগানদার এবং সামরিক ঘাঁটি। এই হিসাবে বেশ কিছু ভুল ঘটেছিল তা ক্রমে ক্রমে এখন দেখা যাচ্ছে। কালচক্রের আবর্তন থেমে থাকেনি। বিদেশী আধিপত্য বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর দিয়ে বন্যার মতো বয়ে গিয়েছিল ১৯৪২—৪৮ সালে। তারপর সে বন্যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে মিশরে, মরক্কোয়, আলজেরিয়ায় ১৯৫০—৫৬ সালে। ইরানে ডাঃ মোসাদ্দেকের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ১৯৫২—৫৪ সালের ইরানের ঘটনাবলীও পশ্চিম এশিয়ায় বিদেশী আধিপত্য উচ্ছেদের সংকল্পে প্রেরণা যোগায়। এখন সবচেয়ে অনগ্রসর বলে গণ্য ছিল আরবভূমির যে সব দেশ এবং ছোটখাট রাজত্ব সে সব জায়গাতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে।

ইরাকের রাষ্ট্রবিপ্লব আকস্মিক ও নাটকীয় ভাবে ঘটেছে বটে। কিন্তু ঘটনাটি অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। মিশরের বিপ্লবে নাসেরের অভ্যুত্থানের পর থেকে সমস্ত আরব দেশেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে আরবজাতীয়তাবাদী বিদেশী-আধিপত্য-বিরোধী সংঘবদ্ধ শক্তি-শালী হচ্ছিল। পাশ্চাত্যশক্তি গোষ্ঠী আরবজাতীয়তাবাদকে স্বাভাবিক ধারায় অগ্রসর হতে দিলে সংকট এমন তীব্র হত না। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটীশ সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় তার সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমএশিয়ায় এগিয়ে এল। তারপর সেই অনেকী ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় আরব-দেশগুলিকে সামরিক গাঁঠ ছড়ায় বাঁধবার চেষ্টা সুরু হল। এদিকে কিন্তু আরবদেশগুলির আভ্যন্তরিক অবস্থায় নতুন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়েছে; আর ওদিকে পাশ্চাত্ত্য শক্তি গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েট ইউনিয়ন আরব দেশগুলির বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য নতুন ধরণের কূটনীতি প্রয়োগ করা আরম্ভ করেছে। মার্কিন-ব্রিটীশ-নীতির প্রথম ভুল হল বিদেশী-আধিপত্য বিরোধী নূতন আরব জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করা এবং ছলে বলে কৌশলে আরবদেশগুলিকে সামরিক জোটে আবদ্ধ করা। এই নীতি প্রয়োগের চেষ্টায় আরো একটি মারাত্মক ত্রুটি দেখা গেল—মার্কিন-ব্রিটীশ নেতারা যতেশে যতই গণতান্ত্রিক আদর্শ-বাদী হোন না কেন, পশ্চিমএশিয়ার তেল এবং যুদ্ধ ঘাঁটি আদায়ে তাঁরা কোনো আরবদেশেই গণতন্ত্রের উপর ভরসা স্থাপন করেন নি। ইরানে জাতীয়তাবাদী-জনপ্রিয় নেতা ডাঃ মোসাদ্দেককে তাড়ানোর কাজে তাঁরা একদা নাৎসীদের অনুচর জেনারেল জাহেদীকে লাগিয়ে-ছিলেন। জর্ডন, ইরাক ও সিরিয়া সর্বত্রই পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের সমর্থন পেয়েছে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী জনস্বার্থ

বিরোধী ফুসুবাজ শেখ-সইদ গোষ্ঠী। পেটোয়া লোকদের মারফৎ "মডেলরাষ্ট্র" শাসনের এই বন্দোবস্ত এতদিন নির্বিঘ্নে চলতে পেরেছিল—নির্বিবাদে তবে একেবারে নির্বিঘ্নে নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে মিশরে, ইরাকে, জর্ডানে অনেকবার বিপুল গণ বিক্ষোভ হয়েছে বিদেশী আধিপত্য অবসানের জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এ সব সহজেই ঠাণ্ডা করতে পারত। তখন পশ্চিম এশিয়াকে সামরিক আয়ত্তে রাখার ভার ছিল ভারতের ব্রিটিশ, বড়লাট, ব্রিটিশ সেনাপতি ও তাঁর অধীন সৈন্য সামন্তের উপর। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম এশিয়ায় ব্রিটীশ প্রভুত্ব বজায় রাখার একটি সুবিধা লোপ পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েট শক্তির আবির্ভাবে শক্তিদ্বন্দ্ব তীব্র হয়েছে বটে, তবে সেই সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির পরোক্ষ লাভ হয়েছে। মিশর কিম্বা ইরাক বিদেশী আধিপত্য উচ্ছেদের চেষ্টায় এখন যতদূর অগ্রসর হতে পারছে, পূর্বে তা পারেনি। বৃহৎশক্তিদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আরবজাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প সময়ে কল্পনা করাই সম্ভব ছিল না যে, ব্রিটীশ সৈন্য মিশর থেকে সরে যাবে, সুয়েজখাল মিশরের অধিকারে আসবে, ব্রিটীশ আশ্রিত শেখদের রাজত্বও বিদেশী ফুসলিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। পাশ্চাত্য শক্তি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরবরাষ্ট্রগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সোভিয়েট সমর্থন পাচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোভিয়েট ব্লক থেকে অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্যও পেয়েছে—এর সুদূর পরিণাম যাই হোক না কেন, এখন পর্যন্ত মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি আরবদেশগুলি পাশ্চাত্যশক্তিদের হুমকী এবং কূটনৈতিক চাপে মোটেই ভেঙে পড়ছে না। পশ্চিম এশিয়ায় আরবজাতীয়তাবাদী সংকল্প সমর্থন করার সোভিয়েটের নিজের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে—সে উদ্দেশ্য হল প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর সামরিক জোট দুর্বল করা। মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি অনেক আরব দেশও বিদেশী-শক্তি গোষ্ঠীর ভাবেরযুক্ত হতে রাজি নয়। প্রকারান্তরে তাই সামরিকজোট-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতার একটা সূত্র হয়েছে। আবার এই সহযোগিতার ফলেই পাশ্চাত্যশক্তিগোষ্ঠীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বেড়ে গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার সামরিকগুরুত্ব কম নয়—বিশেষ করে পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলির কাছে। তারপর আছে এই অঞ্চলের তেল-সম্পদ (বার্ষিক উৎপাদন ১০ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন)। কাজেই এই অঞ্চল হাত-ছাড়া হওয়া মানে পাশ্চাত্যশক্তিগোষ্ঠীর অর্থনাশ, প্রতিপত্তি নাশ এবং হয়তো সর্বনাশ। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই ভয়টাই আসল কারণ নয়। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী-শক্তি আরবদেশগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করলেও পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর বিপদ। এতকাল আরবদেশগুলির উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব করতে পেরেছিল তেলের ইজারাদার বিদেশী কোম্পানীগুলি এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রগোষ্ঠী। এই ব্যবস্থা প্রথম ধাক্কা খেল ইরানে ১৯৫২-৫৩ সালে। সেখানে ডাঃ মোসাদ্দেক সফল হতে পারেননি বটে, তবে তেলের ইজারাদার বিদেশী কোম্পানীগুলিকে কতকগুলি ক্ষমতা ও সুবিধা ছাড়তে হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় এখন যে বিরাট আলোড়ন চলেছে তার সূত্র হল মিশরের বিপ্লব।

মিশরে প্রথমে নাগিব ও পরে নাসেরের নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তা নিছক ঘরোয়া ব্যাপার নয়। নাসের পাশ্চাত্যশক্তিগোষ্ঠীর সামরিক প্রভুত্ব মানতে চান নি। এর ফলে মার্কিন ব্রিটীশ কূটনীতি আরবজগতে অনেকটা বেকায়দায় পড়ে। ১৯৫৫ সালে মার্কিনী ওস্কিয়ে বাগদাদ চুক্তি সংস্থা তৈরী হল বটে, কিন্তু এতে আরবজগৎ বিভক্ত হল, মিশরের সঙ্গে ইরাকের (নাসের

বনাম সুরীপাশা) মন কষাকষি সুরু হল এবং কার্যতঃ পশ্চিম এশিয়ার সবদেশেই আরবজনমত মিশরের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতির দিকে ঝুঁকল। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় পাশ্চাত্য শক্তিরা যতই বাঁধন শক্ত করতে চেষ্টা করেছে আরব জাতীয়তাবাদ ততই বেশি শক্তিশালী হয়েছে। ব্রিটেনের হাতে-গড়া রাজ্য জর্ডান থেকে মহাপরাক্রান্ত গ্লাব পাশাকে বিদায় নিতে হয়েছে। মরোক্কো, টিউনিসিয়া, আলজেরিয়াতে আরব স্বাধীনতা আন্দোলন জাতীয়তাবাদী মিশর থেকে প্রেরণা পেয়েছে।

এর পরের পর্বের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সূত্র হল—ব্রিটিশ-ফরাসী শক্তির শেষ চেষ্টা নাসেরকে নিশ্চিহ্ন কিম্বা শায়েস্তা করবার। সুয়েজখাল জাতীয়করণ থেকে সুয়েজ যুদ্ধের নাটকীয় সমাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাবলী সকলেরই মনে আছে। সুয়েজ দখল করবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পশ্চিম এশিয়ায় ব্রিটিশ-ফরাসী শক্তি চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হল। কাজেই পশ্চিম এশিয়ার অভিভাবকত্ব নিয়ে "শক্তিশূন্যতা" (vacuum) পূরণের জন্য মার্কিন রাষ্ট্র ঘোষণা করল "আইজেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন।" কিন্তু তাতে কী হবে। এবারও আগের মত হিসাবে ভুল হল। পশ্চিম এশিয়া "শক্তিশূন্য" হয় নি, আরব জাতীয়তাবাদের নতুন শক্তি বিধৃত হচ্ছে। এই শক্তিকে উপেক্ষা করলে, চাপা দিতে গেলে শক্তি-সংঘাত অনিবার্য। মার্কিনী নীতি পুরোনো ব্রিটিশ উপনিবেশকতা-বাদী কায়দার অনুকরণ করে পশ্চিম এশিয়ায় যে সংকট সৃষ্টি করেছে তারই প্রতিফল হল ইরাকের রাষ্ট্র বিপ্লব, লেবানন, জর্ডানে বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ।

প্রথমে ইরাকের কথা বলি। ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত টাইগ্রিস-য়ুফ্রেটিস নদী বিধৌত এই উপত্যকা ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীর বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ সংঘটনের কাজে অগ্রণী হন বিখ্যাত কর্নেল লরেন্স। লরেন্স আরবদের অনুরাগী এবং আরব-স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। প্রথমে ব্রিটীশ সরকারও চালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধ-শেষে আরবদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। অনেক ইলচাতুরীর পর ১৯২১ সালে আমীর ফয়জলকে রাজপদ দিয়ে ব্রিটীশ আশ্রিত ইরাক রাজ্য গঠিত হল। ১৯০২ সালে কাগজে পত্রে ইরাকের উপর ব্রিটীশ অভিভাবকত্ব শেষ হল বটে তবে বিশেষ কতকগুলি চুক্তি-বলে ইরাকের উপর খবরদারীর ভার ব্রিটীশেরই রইল। বিদেশী প্রভুত্ব-বিরোধী গণ-বিদ্রোহ ইরাকে নতুন নয়। ১৯২১ সালে টাইগ্রিস-য়ুফ্রেটিসের তীরে বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্রিটীশ সরকারকে ভারত থেকে ফৌজ নিয়ে যেতে হয়েছিল, বিদ্রোহ দমন করতে পুরো একবছর লেগেছিল। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রসিদ আলির নেতৃত্বে ইরাকী আরবেরা বিদ্রোহ করে। নাবালক রাজার খুড়ো এবং অভিভাবক আমীর আবদুলইল্লা এবং "শক্ত মানুষ" সুরী-পাশা জর্ডানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। জর্ডান থেকে গ্লাব পাশার ফৌজ এসে ইরাকে বিদ্রোহ দমন করে। সুরী-পাশাকে "শক্ত মানুষ" বলা হত বটে, কিন্তু তাঁর শক্তির পেছনে জনসমর্থন ছিল না কোনোদিনই, ছিল এক-তজন শেখ জমীদারের, তেল ইজারাদার বিদেশী কোম্পানীর এবং ব্রিটীশ বাহিনীর সমর্থন। ১৯৪৮ সালে মিঃ বেভিনের পোর্টসমাউথ চুক্তির প্রতিবাদে বাগদাদ, বসোরা ইত্যাদি ইরাকী সহরগুলিতে প্রচণ্ড জনবিক্ষোভ হয়। ফয়জল-আবদুল-ইল্লা-সুরীর শাসন মার্কিন-ব্রিটীশ মুরুব্বিদের মনের মত ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ইরাকীরা এই শাসনকে চরম ঘৃণা করতে সুরু করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে আরব জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। "শক্ত মানুষ" সুরী পাশা কাউকে রেহাই দেন নি—যারাই বাগদাদ চুক্তির সামান্যতম প্রতিবাদ করেছে তাদেরই জেলে পুরেছিলেন—পার্লামেন্টের স্পীকার, ভূতপূর্ব বিচার-

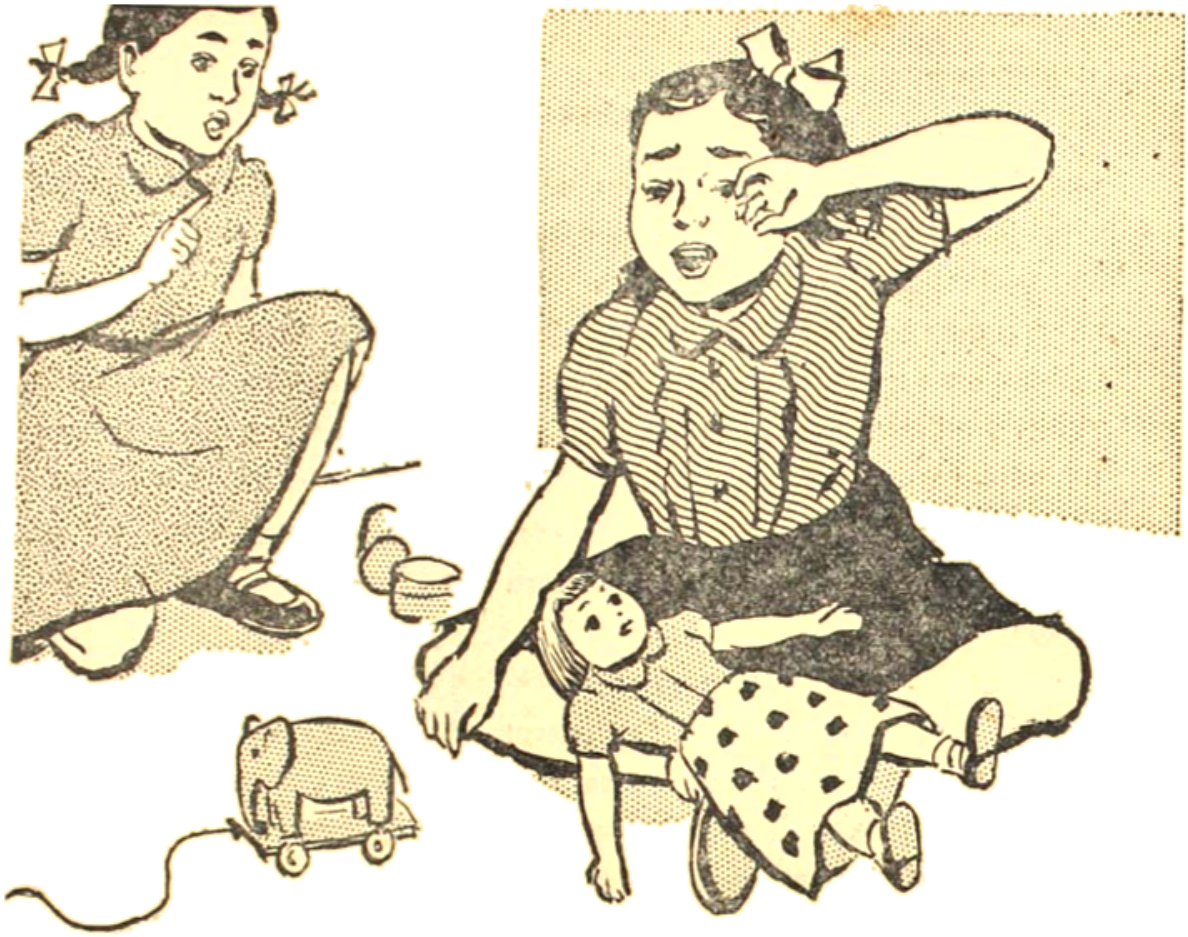

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি কোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু মোটা নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন জল পুতুলটির মুখে আলতার মেখানো গালে মশলার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে মশলা আঙুলের দাগ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর যেন কমে গেল—ঠিক যেমন 'এভাব, এভোর' শুনে শুভাদের সিটাকিরির বহর যেমে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দেখি এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের জল মশলা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা নিমুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুচকি, নিমুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম শুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোনে থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "জলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারণ আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির জন্যেও ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়াবোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, শার্ট, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টি জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

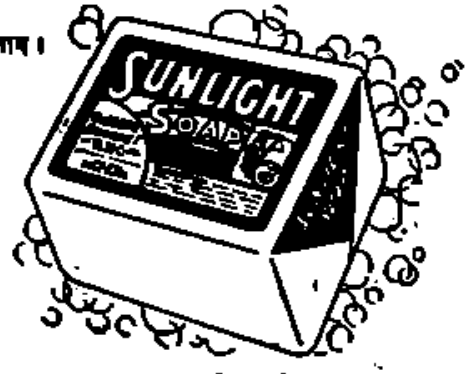

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

H. HIND-252 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বই নামেন

বন্ধী, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার কাউকে বাদ দেন নি। তাঁর জেলে কতজন রাজনৈতিক বন্ধী আছে এই প্রশ্নের উত্তরে নুরীপাশা বলেছিলেন, এক হাজার হতে পারে, দশ হাজারও হতে পারে। হিসেব নেই। একেই তালেস প্রশস্তি জানিয়ে বলেছিলেন, "নুরী পাশা আরব গণতন্ত্রের একটা প্রধান স্তম্ভ।"

সহজেই অনুমান করা যায় কেন এই স্তম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ করতে নাসেরের আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ ইরাকী সামরিক নেতারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কতকটা-নুরীপাশার ক্রমন-তন্ত্র আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর তাঁবেদার হয়েছিল, এইটাই ইরাকী বিপ্লবের একমাত্র কারণ নয়। নুরীপাশার ক্রমতন্ত্র অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করেছিল ইরাকের জনসাধারণের জীবনে। ইরাকের তেল-সম্পদ এবং কৃষিসম্পদ প্রচুর। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন জমিদারী প্রথা লোপ করলে এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ইরাকে বর্তমানে ৫৫ লক্ষের জায়গায় ২। কোটি লোক স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অর্থেরও অভাব নেই, তেল ইজারার বার্ষিক সেলামী বাবদ বেশ কয়েক শ কোটি টাকা পায় ইরাক সরকার। সে টাকার শতকরা ৯০ ভাগ এতকাল ভোগ করেছে নুরীপাশার অনুচর জনকুড়ি শেখ জমিদারের গোষ্ঠী। এরা আবার চাষযোগ্য জমিরও ষোলআনা মালিক। গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৭০-৮০জন লোক কর্মহীন সহায় সম্বল হীন অবস্থায় বাগদাদ-বাসোরা প্রভৃতি স্থানে এসে ভিড় করতে বাধ্য হয়েছে গত পাঁচ ছয় বৎসর। স্থায়ীবাসী বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শীরা ইরাকে নুরীপাশার রাজত্ব দেখে স্মরণ করেছেন রাশিয়ার জারের আমলের অন্তিম সময়ের কথা, বলেছেন টাকার অভাব নেই ইরাকে, কিন্তু অভাব আর সব কিছুর। কতকটা-নুরীপাশার মার্কিন-ব্রিটিশ মুরুব্বিরা গ্রাহ্য করেননি সে কথা, ধীরভাবে বিবেচনা করেননি যে, আরব জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে বাধা দিলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবেই। ইরাকী বিপ্লব অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়; মিশরের বিপ্লবের সঙ্গে এর আদর্শ এবং উদ্দেশ্য-গত যোগসূত্র সুস্পষ্ট: "Though social and economic development is clearly a priority in the Middle East, it is extremely difficult to implement without a revolution. That is why the Egyptian revolution is so basic and so significant for the whole area"—(The Middle East-Conflict in Priorities—John Badeau-Foreign Affairs Quarterly—January, 1959) বাগদাদ-চুক্তি, "আইজেনহাওয়ার নীতি" ইত্যাদির নজর পশ্চিম এশিয়ার জনসাধারণের উপরে পড়েনি, নজর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি এবং তেল-সম্পদের উপরে। এই বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জনজাগরণের যুগে সাধারণ মানুষের জাতীয় মুক্তি এবং আর্থিক-সামাজিক উন্নতির আকাংখাকে উপেক্ষা করে, দমন করে কেবল সামরিক ঘাঁটি ও তেলের মুনাফা হিসাবের নীতি অনুসরণ করলে সে নীতির চূড়ান্ত বিপর্যয় অনিবার্য। বাগদাদ চুক্তি থেকে তাই বাগদাদ বাদ পড়ল। জর্ডন, লেবানন, এবং ব্রিটিশ আশ্রিত আরব শেখদের রাজত্বেও পাশ্চাত্য শক্তির সামরিক খবরদারী এবং ঔপনিবেশিক মুনাফা শিকারী নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ-সংকল্প প্রবল হচ্ছে।

লেবাননে মার্কিন সৈন্য অবতরণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণই আন্তর্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল হ্যামারশীল্ডের অভিমত এবিষয়ে কোন সংশয়ের সুযোগ রাখেনি। লেবাননে বিদ্রোহ ঘটেছে প্রেসিডেন্ট নাসেরের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, এই অভিযোগের স্বপক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকরা কোনই প্রমাণ পাননি। তবু কেন মার্কিন সৈন্য পাঠান হল লেবাননের প্রেসিডেন্ট চমোনের

গদী বজায় রাখতে? তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে আবারও সেই বাগদাদ চুক্তি, আইসেনহাওয়ার-নীতি ইত্যাদির খবরদারী ব্যবস্থার কথা বলতে হয়। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছোট এই দেশটির গুরুত্বের কারণ হল, পশ্চিম এশিয়ার তেল সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তাপ্তি পাইপ লাইন মারফৎ লেবাননের শোধনাগার ও বন্দর দিয়ে বাইরে চালান যায়। অতএব নাসেরের নেতৃত্বে আরব জাতীয়তাবাদের শক্তি-জোট-বিরোধী সংকল্পের ঢেউয়ের থেকে লেবাননকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের; সেই দায়িত্ব পালনের জন্য লেবাননের গদিতে প্রেসিডেন্ট চামৌনকে রাখা দরকার এবং সেজন্য শেষ পর্যন্ত মার্কিন ফৌজও পাঠাতে হল। লেবাননে, জর্ডানে ফৌজ পাঠানো ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের তুলনায় এখন পর্যন্ত কম রক্তক্ষয়ী হলেও নীতিগত বিচারে সমান গর্হিত।

সে গেছে এ পথ ধরে

আশিস সান্যাল

সে গেছে এ-পথ ধরে সংগিনীকে নিয়ে
জ্যোতির্ময় চেতনার প্রদীপ্ত আশ্বাসে
অন্য এক নগরীর প্রণত বিভায়
মুখর শান্তির খোঁজে। সে তো জানে তার
এই-নীল অন্ধকার শহর কুটীরে
প্রণয়ীর মুখচ্ছবি আর কোনদিন
দেবে না আশ্বাসবাণী অমের সুধার
প্রভূত প্রণয়ে দীপ্ত সুখের আশ্বিন।

সে গেছে শান্তির খোঁজে আরেক সংগমে
হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবিলতা তার
মুছে নিয়ে পরিশুদ্ধ তার সে চোখের
প্রখর প্রেমের দীপ্ত কথার আবেগে
কান্নার আকাশ থেকে রঙের বিস্ময়ে
সে গেছে এ পথ ধরে সংগিনীকে নিয়ে।

প্রলয়ঙ্করী পরমাণু

সময় শুধু

মধ্য প্রাচ্যের আকাশে জেগে উঠেছে এক টুকরা আগুনে মেঘ। তাই দেখে সারা বিশ্বে আজ আতঙ্কের সীমা নেই। যদি এই আগুনে মেঘের তপ্ত স্পর্শে জ্বলে উঠে মহাযুদ্ধের দাবানল?

দাবানল তো আরও দু'বার জ্বলে উঠেছিল। ছোট খাটো অনল তো কোন মিনট নিঃশেষ হয়নি আমাদের পৃথিবীতে। এই অনলে ও দাবানলে কত প্রাণ গিয়েছে। তবু বেঁচে আছে মানুষের পৃথিবী। সেসো দাবানলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—নয়তো চাপা পড়েছে মাটির তলায় তিন কোটি নব্বুই লক্ষ মানুষ। তবু পৃথিবীর বুকে ভীড় করে আছে এখনও দু'শ তিপ্পান্ন কোটি জনতা। হাজারে সাতটি করে লোক মরেছে গত মহাযুদ্ধে। তাই বলে এখন আর্তনাদের কারণ কী?

এবারের আর্তনাদ মিলনের আশভায় নয়—প্রলয়ের বিভীষিকায়। যদি যুদ্ধ বাধে এবার সে যুদ্ধ হবে শুধু মহাযুদ্ধ নয়—মহাপ্রলয়। এই প্রলয়ের পিনাকী হবে প্রলয়ঙ্কর পরমাণু। এই প্রলয়ে কী যে ধ্বংস হবে তা বলাও দুঃসাধ্য। শুধু ধ্বংস নয়—পৃথিবীর বুক থেকে সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে প্রাণ ও প্রাণী। পৃথিবীটা হতে পারে নিছক নিরুদ্যম নিস্তব্ধ মরা গ্রহের একটা বিকট পিণ্ড।

তাই পরমাণবিক যুদ্ধের নামে মানুষের মনে এত ত্রাস, এত বিভীষিকা। এই চরম পরিণামের সাবধান বাণী শুনিয়েছেন সেই মহাবিজ্ঞানী যিনি প্রথম সন্ধান দিয়েছেন পরমাণুর আদি শক্তির—যাঁর উদ্যোগে প্রথম সৃষ্ট হয়েছে পরমাণবিক বিস্ফোরণের প্রোগ্রাম। তাঃ আইনষ্টাইন পৃথিবীর যুযুধু জাতিদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "আজকের সামরিক টেকনিকের দিনে সমর সম্ভার বাড়ানো অবেলার সুরক্ষা বিধানের প্রয়াস এক মারাত্মক বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। হাইড্রোজেন বোমা আজ একটা সত্য। তেজস্ক্রিয় দ্বারা বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করা এবং তার ফলে গোটা বিশ্বের প্রাণসংহার করা আজ কার্যকরী সম্ভাবনার অন্তর্ভুক্ত।" এই কথাটিই একেবারে ডিসেম্বর দিয়ে খোলিয়ে বলেছেন তাঃ লিও জিলার্ড। তাঃ জিলার্ড সেই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যিনি পরমাণু বোমার অন্যতম নির্মাতা। কতখানি তেজস্ক্রিয় পদার্থের মূল উপাদান হলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ চাঞ্চল্য চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেওয়া যায় তার মোট হিসাব দিয়ে তিনি বলেছেন, "পৃথিবীর সব কিছুকে মারার জন্য ১৪০০ মন নিউট্রন অথবা ১৪,০০০ মন তাপ্ত হাইড্রোজেনই যথেষ্ট।"

হিরোশীমার অশ্রুশোচনা

পরমাণু বোমা যে কী তার বাস্তব পরিচয় ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ প্রান্তে—যখন হিরোশিমার বুকে জ্বলে ওঠে প্রথম পরমাণু বোমা। মুহূর্তের মধ্যে চড়া ঘটে ৮০,০০০ অসহায় মানুষের। আরও প্রায় এক লক্ষ মানুষ চরমভাবে আহত হয়—তার মধ্যে নারী শিশুসহ বহু মানুষ চিরকালের জন্য হয়ে যায় বিকলাঙ্গ। বোমার আঘাতে গোটা এক মাইল ব্যাসার্ধের ভূভাগে প্রতি একশ জনের মধ্যে নব্বুই জনের ঘটে জীবনান্ত। একটি বোমার আঘাতেই হিরোশীমার প্রায় অর্ধেক এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

হিরোশীমার মর্মান্তিক কাহিনী যখন প্রকাশ হল সারা

(শেষাংশ ২২০ পৃষ্ঠায়)

মৃত এক আত্মীয়ের মত আজ তুমি

শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে আমার,
মৃত এক আত্মীয়ের মত মনে হয়।
যে-আত্মীয় একদিন বন্ধু ছিল, তারপর
প্রিয় হতে হতে
সহসা দাঁড়াল দূরে, তারপর মিশে গেল ঘন অন্ধকারে।
সে বন্ধুর মুখ তাই কোনোদিন প্রিয়ত্বের সম্মানে উজ্জ্বল
হয়নিকো। সে-মুখের রেখাগুলি রেখাতেই রয়ে গেছে, তাই তারা
বোবা চিরকাল।
তারপর প্রাচীন নিয়মে,
পাখীর বাসার কাঠ, কুটো আবর্জনা,—ডিম ফোটাবার জন্য
যা-সমস্ত লাগে,
একদিন উড়ে গেল এলোমেলো হিমেল বাতাসে
সম্ভাবনা ডিমে মরে যেতে।

তুমি তাই সে-আত্মীয়।
এত ভালোবেসে পরে দেখি আজ হঠাৎ আমিও,
তোমাকে ভুলেই গেছি, ভুলে গেছি ঝরা পাতাদের মত কতই সহজে,
রয়ে গেছে সুরভিত বিগত আত্মীয়-স্মৃতি, মানবীয় এ আমার
স্নায়ুর মগজে।

গল্প

ভালো লোক প্রফেসর বোস

দীপ্তি সান্যাল

রবিবারের সকাল। ছিল সপ্তাহ মেহেরবানির দিবস। রাসবিহারী-এভিনিউয়ের ওপরের বারান্দায় বসে মিষ্টার রায় রবিবারের চাউস খবরকাগজ ওল্টাচ্ছেন। মিসেস রায় তন্ময়ে ললিতা বেথি বেলিংয়ে ছুটা চাপিয়ে মধ্যসকালের চা নিয়ে স্বামীর পাশের টিপয়ে রাখলেন। আর একটা বেতের টিপয় টেনে নিয়ে খবর কাগজ পেতে পানের জন্য সুপুরি কুচোতে লাগলেন। স্বামী এখানে বদলী হবার পর মিসেস রায় এই নতুন নেশাটি ইদানীং রপ্ত করেছেন। মিষ্টার রায় কাগজে চোখ রেখেই চায়ের পেয়ালায় হাতটি বাড়িয়েছেন এমন সময় তাঁর মনে হোল ললিতা কিছু বললেন। কথাটি যেন এই রকম,—

"প্রফেসর বোসের মত ভালোলোক হয় না।"

সুধীন রায় একবার কাগজের হেডলাইনে দেখলেন মিটো নেহেরুকে তার করেছে, কাগজের মাঝখানে পড়লেন এশিয়ান অলিম্পিকে ইণ্ডিয়া আরো একটি রোঞ্জ পদক লাভ করেছে, তারপর অকস্মাৎ চোখ আটকে গেল Woman's Robe in World Affairs,—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত মেয়েদের ড্রিলিংয়ের ছবিতে। সাউথ এশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে এ কার ছবি? লেডী চৌধুরীর না? এক মুহূর্তের মধ্যে চোখে ভেসে উঠলো লেডী চৌধুরীর সপ্তদশী রূপ—কলেজের করিডর—উলুধ্বনি তরুণের দল। পর মুহূর্তে মিষ্টার রায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি কিছু বললে?" কাগজে দৃষ্টি তখনো নিবদ্ধ কিন্তু এবার তদ্ভাইক প্রসঙ্গে। "না গো কিছু বলছি না। তোমার কাজ তুমি পড়।" সুপুরি কুচো-তথো একটা হেজমীনের খালি শিশিতে ললিতা রায় ভরে ফেললেন। পানের শিরগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি কলাই করা দুধবরণ বাটিতে ফেলতে লাগলেন।

এবার কাগজটা কোলের ওপর রাখলেন সুধীন রায়। পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বললেন,—"কে ভালোলোক? বলই না তার কথা।"

"কি?" অন্যোষিতার মত ললিতা রায়ের চোখ।

"ও তুমি কথাটা শুনতে পেয়েছ বুঝি।" ললিতা রায় চুন মাখতে সুরু করলেন পানগুলোয়।

"বল না শুনেই রাখি শুভকীর্তনটা।" পাইপে আগুন দিতে দিতে সুধীন রায় মিষ্টি হাসলেন।

"আহা কি কথার ধরণ! আমি প্রফেসর শৈলেন বোসের কথা বলছি। ওঁদের বাড়ীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই আমাদের আলাপ কি না। আমি শুধু বলছিলাম কি যে ভাল মানুষ উনি।"

"নাকি?" খবর কাগজটা সুন্দর করে পাট করতে লাগলেন সুধীন রায়।

"সত্যি ওঁর স্ত্রীর কি সৌভাগ্য, এমন স্বামী পেয়েছেন" ললিতা রায়ের গলার স্বর মধুর, সঙ্গীতময়ী। পৃথিবীর মধ্যে এক সুধীন রায় ছাড়া আর কারুর বোঝবার শক্তি নেই এই প্রশংসা বাণীর পেছনে কি আছে। কিন্তু আজ

এহুর্তে তিনিও ঠিক বুঝে পাচ্ছেন না সম্প্রতি কালের মধ্যে কি দোষ করেছেন। দু একটি ছোট খাট বিষয় নিয়ে মতান্তর হচ্ছে অবশ্য। যেমন এবার বসবার ঘরের জন্য নীল পর্দা হবে না সবুজ পর্দা হবে কিংবা কফি সেটের (যেটা কেনা হবে) গায়ে ফুলের ছবি থাকবে না নক্সা কাটা থাকবে। কিন্তু তা নিয়ে কোন উত্তপ্ত কলহ হয় নি। এ রকম একটু আধটু ঠোকাঠুকি কোন সংসারেই বা না হয়? আর এটাই তো জীবনের রস। অতএব তিনি এমন একটা ধ্বনি কণ্ঠ থেকে উদ্গীর্ণ করলেন যা প্রশ্ন সূচকও বটে আবার সমর্থকও বটে।

ললিতা রায় বলে চললেন—"আমি শুধু ওঁদের সুখী পরিবারটির কথা ভাবছিলাম। কোন বিচ্ছুর সঙ্গে জড়িত করে নয় অবশ্য। হাজার হোক একজন নামজাদা অধ্যাপক। বিদেশেও তো ওঁকে বার বার ডেকে পাঠাচ্ছে। এরি মধ্যে আমেরিকা গেছেন তিনবার, রাশিয়া দু বার, জার্মানি....."

"তাই নাকি?" সুধীন রায়ের কণ্ঠে যেন একটু ক্ষোভ।

"নিশ্চয়, বিদ্বান ব্যক্তি! ওঁকে বাদ দিলে কোলকাতার শিক্ষা ব্যবস্থা অচল। অথচ কি ধরণী মানুষ। স্ত্রীর একদিন তরকারী কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে গেল, উনি কলেজে গেলেন না। তার ফলে ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেটের একটা ডাইবাভোদি পরীক্ষা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। কি? ভাল লোক নয়?"

"হুঁ। স্ত্রীর কি হয়েছিল আঙুলটা সত্যি কেটেছিল নাকি? রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না?" সুধীন রায়ের গলাটা যেন নরম নরম শোনা গেল। এ ঘটনাটাকে বিবেচনা করতে যেন তিনি রাজী আছেন। "না, না, তেমন কিছুই না। একটুখানি কেটেছিল মাত্র। আইডিন দিতেই রক্ত বন্ধ। সেই জন্যই তো বলছি কি ভালো লোক। শুধু তাই নয় স্ত্রীকে রাঁধতে দিলেন না এক সন্ধ্যা। নিজে রাঁধলেন। চাকরটা যেদিন গিয়েছিল কি না। কি? এবার বল আশ্চর্য নয়? এমন কেউ করত?"

সুধীন রায় বললেন—"তা তেমন অবস্থায় পড়লে যে কোন ভদ্র সন্তানেরই তাই করা উচিত।"

ললিতা দেবী মাথা নাড়ালেন—"না, না কেউ এমন করে না। অবশ্য প্রফেসর বোস যে এমন করেন তার একটা কারণ উনি বেজায় ভীতু। স্ত্রীর একটু পান থেকে চুন যেন না-খসে সেদিকে ওঁর সজাগ দৃষ্টি। এই যে উনি বছরে প্রায় ছয় মাস করে বিদেশেই থাকেন সে সময়টা যাতে মিসেস বোস কষ্ট না পান তার জন্য কত ব্যবস্থা। মুদীর দোকান, কয়লার দোকান, শাড়ীর দোকান, গহনার দোকান পর্যন্ত সব দোকানে উনি এ্যাকাউন্ট খুলে রেখেছেন মোটা টাকার যাতে কোন জিনিষ পেতে কষ্ট না হয়। সত্যি এমন কনসিডারেট স্বামী কজন পায়?"

সুধীন রায় এবার পাইপটা পরিষ্কারে মন দিলেন। ঠুকে ঠুকে তামাক তিন বার করতে লাগলেন—"সত্যি স্ত্রী ভাগ্য ভাল লোক"—তাঁর গলায় যেন একটা পরাজিত সুর।

মিসেস রায় এবার ফিলিঙসোতে লবঙ্গ গেঁথে ফেলতে লাগলেন। তারপর ভাঁজ ভাঁজ করে বড় বাটায় ভরছেন নিজের পান, সেগুলো ধোয়ান দিয়ে সাদা। ছোট বাটায় স্বামীর সেগুলো দারচিনি আর এলাচ দিয়ে তৈরী। সুধীন রায় ছুটির দিনে এই বিলাসিতাটুকু করেন। পানের বাটা দুটো এবার ঘরে গিয়ে স্বামীর কাছে রেখে এলেন বেবি বেলিংয়ের সুইচটা অফ করে দিলেন। টুটা হয়ে গেছে গন্ধেই আভাস। তারপর একটা বাংলা কাগজ নিয়ে স্বামীর পাশের ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। মোট এগারোটা এখন। ছুটির দিনে কি আর বারটার আগে কেউ খায়? পান টান তো কোন সকালে হয়ে গেছে কিছুটা যেন স্বগতই বললেন—"অবশ্য এরকম বাড়াবাড়ি

আজকালকার স্বামীরা করে না। স্ত্রীরাও এটা বরদাস্ত করে না।"

সুধীন রায় কি একটা বলতে চাইলেন—"আচ্ছা তবে শোন"—....

ললিতা রায় থামলেন না—"এটা কিন্তু এক পক্ষে ভালই। আজকালকার স্বামীরা ওরকম দিনরাত নিজেকে নাইট মনে করে স্ত্রীকে ড্যামসেল ইন ডিসট্রেস ভাবে না।"

"নিশ্চয়, অর্থই হয় না এসবের। স্ত্রীরা কি মানুষ নয়? ডেমোক্রেসীতে এ চলে না। সব ডিফিট ডিফিট।" সুধীন রায় উত্তর দেন।

ললিতা দেবী কিন্তু কি জানি কেন একমত হতে গিয়েও হতে পারেন না, একটা অদ্ভুত হাসি খেলা করে তাঁর চোখে—"কিন্তু তাতেই কি মেয়েরা বেশ মিষ্টি থাকে না। I mean, বন্ধাট থেকে মেয়েদের রক্ষা করাও তো পিতা, স্বামী, সন্তানের কর্তব্য। মিসেস বোস কিন্তু ভারী নরম প্রকৃতির, বোধ হয় এই জন্যই। একটু হয় তো প্রাচীন ধরণের মতন; কিন্তু তবু....."

ললিতা রায় চুপ করে যান। বাক্যটা যেন আস্তে আস্তে গলে যায়। সুধীন রায় অপেক্ষা করে থাকেন ততক্ষণ। উল্টো পাল্টা বাতাস বইলে স্ত্রীকে অধিকতর সতর্ক হতে হয়—সেই দৃষ্টি তাঁর চোখে। ললিতা রায়ই আবার সুরু করেন—এতটুকু বাধেনা কোনদিন পোষাতে হয় নি ভদ্রমহিলাকে। দুটি মেয়েই মানুষ হয়েছে শান্তিনিকেতনে। প্রফেসর বোস কিন্তু মিসেস বোসকেই আদর্শ পত্নী বলেন। উনি যদি কিছু চান কখনো 'না' বলেন না। প্রফেসরের মাইনা বেড়ে যাবেই লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর আসনই তো ঐশ্বর্যের উপরে।"

সুধীন রায় পাইপে তামাক পুরে আবার জ্বালালেন। টান দিতে দিতে দূর আকাশে মেঘের দিকে চেয়ে ভাবেন কি যেন কি একটা মিসেস রায় চেয়েছেন আর তিনি যেন দেন নি। তিনি চিন্তা করে যান গভীর ভাবে, মনের অলিগলি খুঁজে দেখেন এ ধার থেকে ও ধার। হ্যাঁ মনে পড়েছে হীরের ফুল। ভাইর বিয়ের স্ত্রীর কানে দেখেই ললিতা মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তিনি যেন দেন নি। কেন?... মনে পড়েছে ললিতার মুখের ডৌলে কোথায় যেন দক্ষিণ ভারতের স্পর্শ আছে। আর আজকাল তো সুতী থেকে সিল্ক পর্যন্ত দক্ষিণী শাড়ীর রাজত্ব। ঐ শাড়ী, ঐ মুখ তার ওপর ঐ হীরক খচিত কর্ণভূষণে ললিতাকে আর বাঙ্গালী বলে মনে হোত না এমনি একটা ভাবনাই তাঁকে ললিতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেয় নি। প্রশ্রয়ই যেন দেন নি তিনি ব্যাপারটার। কানে ফুল পরা যুবতী কোনদিনই তাঁর ভাল লাগে না। সত্যি বলতে কি কানে দাঁটা গহনা সবই তাঁর মতে অচল। কানপাশা, কান, হাফকান পরা মেয়েদের দেখলে কি জানি কেন তাঁর শূদ্রবতী বলে মনে হয়। কানের গহনা দুলবে কালো চুলের পাশ দিয়ে, সন্ধ্যা আলোয় সবুজ কি নীল আলো, 'যামিনী চমকে যামিনী আঁধারে' গোছের আর কি। ফুল পরতে পারে শুধু ছোট মেয়েরা।

হঠাৎ তিনি স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন—"মিসেস বোস কি খুব ছোট খাট মহিলা?"

"না, না তা কেন?" ললিতা রায় অবাক চোখে তাকান। "আমি তো মিসেস বোসের কথা বলছি না। বলছি প্রফেসর বোসের কথা। উনি স্ত্রীর জন্য".....

সুধীন রায় বলতে সুরু করেন "শোন তুমি যদি".....

"জান, একবার উনি সাউথে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজে সেবার সারাজ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। ফিরে এসেই তাঞ্জোরকে তাকতে পাঠালেন".....

"হীরের ফুল তৈরী করবার জন্য" সুধীন রায় কিন্তু আস্ত দি গ্যাপটা করলেন অধির ছেলের মত। কিন্তু

কথাটা শেষ করে ফেলেই একটা অনুতাপ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্ত্রীকে মর্মাহত চোখে তাকাতে দেখেই বোধ হয় থেমে যান তিনি।

"হীরের ফুল?" ললিতা রায় বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন। "না, না, তা নয়। একজোড়া মকর-মুখো বালা করতে দিলেন। উনি তো মিসেস বোসকে সাউথে সঙ্গে নিয়ে যান নি। সেই জন্য। সেইটেই তো বড় কথা।" ললিতা রায় কাটা কাটা ভাবে কথাগুলো বলে থেমে যান। শেষের দিকে স্বরটা শোনায় যেন কেমন ভার ভার। একটু থেমে থেমে বললেন,—

"তুমি কেন হীরের ফুলের কথা বললে? আমি হীরের ফুল পরি এটা তুমি চাও না তো?"

স্ত্রীর প্রখর চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুধীন রায় চোখ নামিয়ে নেন। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। কেমন যেন পুতুল চাওয়া চোখ ললিতার। হঠাৎ জোরে বলে ওঠেন—"আচ্ছা বেশ ফুলই বানাও, হীরের ফুলই order দাও। বোম্বাই তোমার ফুল বানিও না।"

সুধীন রায় কাগজটা টেনে নেন, এবার পরম নিশ্চিন্তে। ললিতা রায় বিজয়িনীর স্মিত হাসি হেসে বাংলা কাগজটা পাট করতে থাকেন। নাঃ তিনিও ফুল বানাতে চান না, মাদ্রাজী মাদ্রাজী চেহারা করে কি লাভ? তিনিও ফুল বানাতেই রাজি কিন্তু হীরের হলে……

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল.
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

ডস্‌টয়েভ্‌স্কি :

স্ত্রী ও মেয়ের দৃষ্টিতে

সত্যব্রত বসু

আমাদের দেশে রুশ সাহিত্যিক ডস্‌টয়েভ্‌স্কি অতি প্রিয় ও পরিচিত নাম। অনেক আগেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। গল্পগুলিরও তাঁর অধিকাংশ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তাঁর 'ক্রাইম এণ্ড্ পানিশমেণ্ট', 'দি ইডিয়ট', 'দি ব্রাদার্স্ কারামাজোভ' ইত্যাদি বইয়ের নাম কমবেশি সকলেই জানেন। ডস্‌টয়েভ্‌স্কির জীবনীও সংক্ষিপ্ত নয়। ডস্‌টয়েভ্‌স্কির তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ের লেখা দুখানি বইয়ে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ডস্‌টয়েভ্‌স্কির পারিবারিক চরিত্রের দুটি অপরিচিত দিক এই প্রবন্ধে পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে। আগামী বৈশাখ সংখ্যায় গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে অনুদিত প্রকাশিত হবে।

—সঃ

ডস্‌টয়েভ্‌স্কির চরিত্র এবং জীবন দুইই খুব অদ্ভুত। ঘটনা-কীর্ণ জীবন, এবং শেষ চৌদ্দবছর, তাঁর বিবাহিত জীবন বাদ দিলে সে-জীবন একেবারেই সুখী নয়। আর চরিত্রও তাঁর নিশ্চয়ই আঁকা বহু বইয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে যে কোনো অশান্ত এবং অপরিণামদর্শী এক চরিত্রের মতই অবাস্তব ও অসাধারণ। ডস্‌টয়েভ্‌স্কি মেয়েদেরও ভাল নয়: রোগা এবং ছোটো—হয় রাশী নাতাস্ রাশিক মূর্তি এবং ইপ্‌পুলিত। এবং অন্যদিকে এই ধাতুরই আমার অন্যতম গ্রন্থ। ধনী ভদ্রমহান অন্যান্যপরায়ণ বিবেকের তীব্র এবং স্নেহশীল। এই রকম জটিল একটি চরিত্রের মতই লোকের

মনে তাঁর সম্পর্কটি বোঝা যায় যে সহজ হয়নি। শত্রু এবং মিত্র সকলেই তাঁকে খুব ভুল বুঝেছেন। অমিত্রেরা ডস্‌টয়েভ্‌স্কিকে যা খুশি গালাগালি করেছেন। মাস্ লিখেছেন, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি ভীরু, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর। তাঁর মহানুভবতা জান, অসহ্য,—বিশ্বপ্রেম অবাস্তব, মানে নেই। এবং ডস্‌টয়েভ্‌স্কির মেয়েরই এক ব্যক্তি ডস্‌টয়েভ্‌স্কি সম্বন্ধে এমন কয়েকটা কথা লিখেছে,—যেমন চাকর বাকরদের উপর ডস্‌টয়েভ্‌স্কি খুব খারাপ এবং একটি ছোট মেয়েকে একবার কীরকম আক্রমণ করেন,—যে বিশ্বাস করা যায় না। এসব কথা অবশ্যই ভিত্তিহীন, এবং এ অপপ্রচারেরও কি কারণ ছিল বোঝা যায় না, কারণ এই লোকটি ডস্‌টয়েভ্‌স্কি এবং তাঁর পরিবারের অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বলেছে টলস্টয়ের কাছে, ডস্‌টয়েভ্‌স্কির মৃত্যুর বহু বছর পরে। সে যাই হোক, একটি কথা কিন্তু সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হয়েছে এবং হবে যে তিনি একজন ভয়ানক লেখক। এবং ডস্‌টয়েভ্‌স্কির ক্ষেত্রে,—যে কোনো প্রতিভাবান লেখক এবং শিল্পীর ক্ষেত্রেই,—সেইটিই একমাত্র কথা এবং বাকী সব অর্থহীন।

টুর্গেনিভ্, তাঁর সমসাময়িক লেখক আর প্রতিদ্বন্দ্বী, —অতএব তাঁদের মধ্যে কখনো সদ্ভাব হয়নি। টুর্গেনিভ্ অভিজাত। টুর্গেনিভ্ ধনী বিলাসী সংস্কৃতি ও সুদর্শন। চতুর এবং দূর্ত—একাধারেই বাস্তব ও বিষয়ী। কোনো প্রকাশক কোনোদিন একটি পয়সাও তাঁকে ফাঁকি দিতে

পারেনি,—এবং লেখক হিসাবে তাঁর পাওনা সমস্ত তাদের কাছ থেকে সম্ভবমত যত্নের সঙ্গে তিনি আদায় করে নিয়েছেন। এবং এসব নিশ্চয়ই খুব ভালো। কিন্তু ডস্‌টয়েভ্‌স্কি এ সব দিক দিয়েই তাঁর বিপরীত। এবং টুর্গেনিভের পক্ষে সবচেয়ে যা বড় সুযোগ,—অসহিষ্ণু তার মানুষ এবং সরল। কিন্তু টুর্গেনিভ্‌ ট্যালেনটেড,—ডস্‌টয়েভ্‌স্কি জিনিয়াস। অতএব টুর্গেনিভ্‌ তাঁর চরিত্রগত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে এমন উত্যক্ত এবং উদ্ভ্রান্ত করে গেছেন যে সেসব পড়তে রীতিমত বিশ্রী লাগে,—বিশ্রী, লজ্জাকর এবং অবমাননা। এবং কল্পনা করা যাক যে এই টুর্গেনিভের কাছেই হাত পেতে ডস্‌টয়েভ্‌স্কিকে টাকা নিতে হয়েছে। না নিলে সস্ত্রীক তাঁকে উপবাসী থাকতে হত,—না নিলে সম্মান থাকত না,—সর্বনাশ ঘটে যেত। এবং কী হিস্টিরিবিরোধী এসব।

কিন্তু ডস্‌টয়েভ্‌স্কির জীবনই এইরকম।

টাকা এলেই তিনি হাতে পাসলের মত খরচ করেছেন। যতক্ষণ টাকা থেকেছে পরিণাম চিন্তা করেননি। টাকা ফুরলেই আবার ধার,—এবং যতক্ষণ পাওনা গেছে,—তারপর জুয়া। জুয়া খেলতে খেলতে হাজার হাজার জিতেছেন, আবার সর্বস্ব হেরেছেন। বইয়ের জন্য আগাম টাকা নিয়েছেন,—সেই টাকায় আবার জুয়া,—এবং আবার ফতুর। হাজার হাজার রুবলের নোট যখন আসত, পাওনাদার যখন ছেলের মত দেখায়, তখন খুব প্রকাশ্যে তুচ্ছ দামে এবং সাংঘাতিক সর্তে ডস্‌টয়েভ্‌স্কিকে ঠকিয়ে তাঁর বইয়ের কপিরাইট কিনিয়ে নিয়েছে।

ডস্‌টয়েভ্‌স্কিকে অসাংসারিক বলা চলে, এমনকি আরো কঠিন কথা,—কিন্তু উপায় কী। এমন অনেকের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছেন যাদের প্রতি তাঁর কোনো দায়িত্ব ছিল না। তাদের জন্যই তাঁর ঋণ এবং সর্বস্বান্ত হওয়া যারা তাঁর কথা কোনোদিন চিন্তা করেনি,—বরং ঠকিয়ে, চাপ দিয়ে, পীড়ন করে, তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলে,—কারণ তিনি নার্ভাস—কী করে তাঁর কাছ থেকে আরো আদায় করা যায়, সর্বদা এই চেষ্টায় থেকেছে। ইচ্ছা করলেই এসব তিনি সরিয়ে দিতে পারতেন, এবং ইচ্ছা করলেই তাঁর লৌকিক সম্পত্তি থেকে তাঁর অংশে যে বাৎসরিক আয় তাই দিয়ে, লিখে, এবং চাকরীর টাকায় তিনি স্বচ্ছলভাবে কাটিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু সে ইচ্ছা হয় তাঁর কোনদিন হয়নি কিংবা সেটাকে কাজে লাগাবার মত বাস্তবিকই তাঁর চারিত্রিক সামর্থ্য ছিল না।

এইরকম একটা সাংঘাতিক সময়ে, চুক্তির বই শেষ করার তাগিদেই বন্ধুরা তাঁকে স্টেনোগ্রাফারের সাহায্য নিতে বলেন, এবং সেই সময়েই পর্ট্‌ফোলিওর ভাবী, এ্যানার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এ্যানা টাকার বিনিময়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আসেন এবং তারপর ডস্‌টয়েভ্‌স্কিকে ছেড়ে আর তাঁর পাওনা হন না। একমাসের আগেই চুক্তির বই শেষ হয়,—বইটার নাম, 'দি গ্যাম্‌ব্‌লার'—ডস্‌টয়েভ্‌স্কির মান সম্ভ্রম, মোটারকম অবিমানা এবং বইটার কপিরাইট বাঁচল এবং তার কয়েকমাস পরেই ডস্‌টয়েভ্‌স্কির সঙ্গে এ্যানার বিয়ে হয়ে গেল।

এসব কথা গল্পের মত সুখপাঠ্য এবং এ নিয়েও বেশ চমৎকার। এ্যানা বালিকা বয়সেই চলে,—বয়স একুশ,—আর ডস্‌টয়েভ্‌স্কি পঞ্চাশের কিছু নীচে। এসব কথা এ্যানা লিখেছেনও খুব ভাল। ডস্‌টয়েভ্‌স্কির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে সেদিন পর্যন্ত যত কথা,—যা তাঁর যখন মনে হয়েছে এবং ভাল লেগেছে, সব তাঁর ডায়রীতে তিনি লিখে রেখে গেছেন। শর্টহ্যাণ্ডের জন্য আগেই সুবিধা ছিল-যে অল্প সময়ে অল্প কথায় প্রচুর তিনি লিখে যেতে পেরেছেন। এই ডায়রীতেই তিনি একজায়গায় লিখেছেন যে লিখতে তাঁর কোনো বাধা ছিল না: 'আমি খুব ভীরু লিখে যেতে পারি কারণ আমি ছাড়া এ ত আর কেউ

বুঝবে না।' আর কেউ মানে ডস্টয়েভ্‌স্কি, তিনি শর্টহ্যাণ্ড জানতেন না। অতএব ডস্টয়েভ্‌স্কির সামনে বসেই ডস্টয়েভ্‌স্কি সম্বন্ধে যা খুশি তিনি লিখে যেতে পেরেছেন, এবং এসব সময়ে নিশ্চয়ই খুব কৌতুক বোধ করেছেন। এ্যানাই একজায়গায় লিখেছেন যে সন্ধ্যার পর ডস্টয়েভ্‌স্কি তাঁর লেখা নিয়ে বসতেন, তিনিও আলাদা একটা টেবিলে বসে শর্টহ্যাণ্ডে তাঁর ডায়রী লিখে যেতেন। ডস্টয়েভ্‌স্কি প্রায়ই বলতেন, 'কী লেখো তুমি তোমার ঐ অদ্ভুত আঁকানো বাঁকানো হরফে? নিশ্চয়ই তখানে বসে বসে খুব বদকানো হচ্ছে আমাকে।'

এ্যানা হেসে বলতেন, 'তোমাকে বদক না দিয়ে কারো পারবার যো আছে!'

এ্যানার এই ডায়রী মানে মোটামোটা তিরিশটি বই। তিনি মৃত্যুর আগে শেষ ক' বছর ধরে এই শর্টহ্যাণ্ডের ঘট ছাড়িয়ে লেখাগুলি যেছে বাছিয়ে প্রেসের জন্য তৈরী রেখে যান এবং তাঁর ইচ্ছানুসারেই এ বই তাঁর মৃত্যুর পরে ছাপা হয়।

ডস্টয়েভ্‌স্কির উপর মিত্র-অমিত্র আরো অনেকেরই লেখা আছে, এবং তাঁকে সম্পূর্ণ জানতে হলে দু দলের লেখাই পড়া উচিত কিন্তু স্ত্রীর লেখায় তাঁকে যেরকম স্পষ্ট সম্পূর্ণ এবং জীবন্ত মূর্তিতে পাওয়া যায় তা নিশ্চয় আর কারো লেখায় আশা করা চলবে না।

এ্যানার এ বইটার ইংরেজি নাম, 'ডস্টয়েভ্‌স্কি: পোর্ট্রেইট, বাই হিজ ওয়াইফ' এবং এ্যানার সম্পূর্ণ নাম, এ্যানা গ্রিগরিয়েভনা ডস্টয়েভ্‌স্কি—'ডস্টয়েভ্‌স্কি' বিয়ের অবদান।

২

এ্যানার এই 'গ্রিগোরিয়েভনা' ডস্টয়েভ্‌স্কির কিছুতেই মনে থাকত না। পরিচয়ের প্রথম দিনই নামের কথা উঠতে বলা মাত্রই ডস্টয়েভ্‌স্কি ভুলে গেলেন। এবং বিয়ের বেশ পরেও বার্থরেজিষ্ট্রি অফিস থেকে তাঁকে একবার খুব বেকুব হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। সেখানে পিতৃদেব কন্যার জন্ম রেজিষ্ট্রি করাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কাণ্ড, কন্যার মাতাঠাকুরাণীর নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না।

'ভাখো কী কাণ্ড! ওরা তোমার নাম জিজ্ঞাসা করল কিন্তু আমি কিছুতেই বলতে পারলুম না। মানে মনে পড়ল না।'

'বলো কী!'

আর কি বলা! বেজায় অপদস্থ খুব করে ডস্টয়েভ্‌স্কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

'আমার ত যতদূর মনে পড়ে, আমার নাম এ্যানা ডস্টয়েভ্‌স্কি।'

'হাঁ হাঁ ডস্টয়েভ্‌স্কি ত বটেই। নিশ্চয়। কিন্তু তোমার কুমারী নামটা কি ছিল!'

ডস্টয়েভ্‌স্কি অবশ্য প্রস্তাব করেছিলেন যে নামটা তিনি স্মরণ করতে করতে আবার যাবেন কিন্তু বুদ্ধিমতী এ্যানা একটুকরো কাগজে নামটা লিখে, তাঁর হাতেও না, একেবারে পকেটে গুঁজে দিলেন।

এবং ডস্টয়েভ্‌স্কিকে বুঝতে বুদ্ধিমতী এ্যানারও বেশ সময় লেগেছিল। এবং তারপর শক্ত হয়ে এই মেয়েটি সেদিন যদি তাঁর পাশে না দাঁড়াতেন তবে পৃথিবী কোনোদিন ডস্টয়েভ্‌স্কির নাম পর্যন্ত শুনতে পেতনা।

কিন্তু এ গল্প প্রথম থেকেই ভাল। এবং কিছুকাল অন্তত এ্যানার কলম থেকেই:

৩

ক্লাসে সেদিন আর কিছু আগে পৌঁচেছি। ক্লাস ঠিক বসেনি; আমি আমার জায়গায় বসে বই পত্র গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় আমাদের প্রফেসর, অলখিন, আমার

(শেষাংশ ২১৩ পৃষ্ঠায়)

উত্তরণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্ণপ্রকাশ

। নীলিমা দাশগুপ্ত ।

ঘুম কিন্তু সহজে আসলো না মল্লিকার, এলোমেলো অজস্র চিন্তা ঘুমের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কী করে আসবে ঘুম? ডাক্তারের পিসিমাকে ঘিরে ভাবনা শুরু হলো, শেষ হলো প্রকাশদাকে নিয়ে। আগা নেই, গোড়া নেই চিন্তার বল বেন ভিড় করে মল্লিকার ঘুমের চোখে ছায়াছবি হ'য়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো। ফেলেআসা শৈশব স্মৃতিও উঁকি মেরে গেলো দুচারবার। অনেক পরে সবে নেমেছে তন্দ্রা, তন্দ্রার ঘোরেও প্রকাশ আর মাধুরীকে দেখছে মল্লিকা। ঘুমের আমেজের মধ্যেও চোখে বেন একটু হাসির বিলিক খেলে গেলো।···গানের আসর থেকে উঠে এসেছে মল্লিকা। বড় হল ঘরের সামনের চেয়ারটায় বসা—সু'করে বসে ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে একটু। নিঃশব্দ পদক্ষেপে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রকাশ। মৃদুকণ্ঠে ঘরোয়া গলায় ডাকলেন, "মিলি—।" চমকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রকাশদাকে দেখে, মল্লিকার মুখের ভাব মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেলো। কিছু না বলে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকালো প্রকাশদার দিকে। প্রকাশ হাতদুটো আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রেখে পেছন থেকে সরে সামনে এসে দাঁড়ালেন, প্রায় মুখোমুখি। নরম গলায় বললেন, "মিলি সোম্—তোর কাছে আবার—" খলখল করে হেসে উঠলো মাধুরী। স্বামীর পেছন-পেছন পা টিপে টিপে উঠে এসেছে কখন। হাসি থামিয়ে চোখের মণিদুটো ঘুরিয়ে মাধুরী চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "মিলি! শোনসই, তোর কাছে আমার প্রাণের কথা কই!—বেলেল্লাপনার তো হদ্দ করে ছেড়েছো তোমরা। এখনও ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব গেলো না।" তারপর আহত অন্তর মতো বেন গর্জন করে উঠলো। "শীরিতির ঠেলায় বাঁচিনে—যায় কছি শীরিত—।" গলায় আড়ষ্ট হয়ে গেলেন প্রকাশ। তবু চেষ্টা করে প্রতিবাদ করলেন একবার। "বলছে কী মাধুরী? কাকে কী বলছো? আমি এসেছিলেম একটা প্রয়োজনীয় কথা বলতে—"আরো জোরে মাধুরী খল খল করে হেসে উঠলো। চোখ ঘুরিয়ে বললো, "আহা! ঘরে বাইরে—প্রাণের কথাটা যে বলা হোলো নারে—। যদি, সৈরাঙ্গিনী প্রতাপের অন্বেষিলো কেমন? কী দশা হয়েছিলো দেবদাস পার্বতীর? আমি বেন অল্প বয়সে শীরিতি করার গল্প পড়িনি কিছু-নয়? যাও-যাও বলছি। শিগগির এখান থেকে যাও—" স্বামীকে দরজার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলো মাধুরী। মল্লিকা নির্বাক হ'য়ে চেয়ে বসে রইলো। প্রকাশ বোবা চোখে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল, তারপর একপা একপা করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মাথায় কাঁকি দিয়ে চোখে মুখে বিশ্বের একটা ক্লান্তি ভর করে স্বামীর পেছন পেছন চললো মাধুরী। এখনও ফাঁক কাটেনি, নিচে অনেক অনেক তলায় যেরে আছে মল্লিকা ওদের প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে রইলো একটুকাল, তারপর হাসির দমকে দুলিয়ে পড়লো চেয়ারটার মধ্যে। চোখে উল্লাসাশ্রু আগে, এই হাসি নিয়ে মল্লিকা নিজের মনে মনে চিন্তা করছিলো একটু—অত পাগলের মত হাসি কেন ও হেসেছিলো সেদিন? ও কী তবে সুখী হয়েছিলো প্রকাশদার উৎকট দাম্পত্য জীবনের ছবি দেখে? সেদিনকার সেই নীতি ভ্রষ্ট, ঘৃণ্য প্রকাশদা ফিরে ফিরে সারাজীবনভোর মনে পুড়ে হয়েছে, এইরকম একজন অধঃপতিত-বোধশূন্য, বিকৃত রুচিসম্পন্ন, স্ত্রীর সামিধ্যে·····তাই কি ও খুশী এত। তন্দ্রার ঘোরে এক পুরনোবৃষ্টি

দেখছিলো মল্লিকা, দরজায় কে যেন নক্ করলো। ধীরে-ধীরে তিনবার। ঘুমের জড়তা তখনও বুঝি কিছু ছিলো মল্লিকার চোখে, চোখ বুজে বুজেই ভাবলে ও, প্রকাশদা আবার এলেন নাকি তাঁর অসমাপ্ত কথা শেষ করতে? তৃতীয় বারের শব্দে মল্লিকার তন্দ্রা গেলো টুটে, ধড়মড় করে চোখ কচলে উঠে দরজা খুলে দিলো। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন ভোম্বলদা। সিঁড়িটার আলো ভেংচা হয়ে ভোম্বলদার আধখানা মুখে এসে পড়েছে। সেই আবছা অস্পষ্ট আলোতেও ভোম্বলদার মুখের গাঢ় চিন্তার ছায়া মল্লিকার চোখে পড়লো। ব্যস্ত হ'য়ে কিছু জিগেস করবার আগেই ভোম্বলদা বললেন, "একটা বাড়তি বালিশ আছে রে মিলি—? হঠাৎ ঘাড়ে বড্ড ব্যথা হ'য়েছে—।" দু তিন সেকেণ্ড চোখ বড় বড় করে ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে রইলো মল্লিকা, তারপর ধীরেধীরে বললো, "শুধু বালিশ! আর কিছু লাগবে না?" "না, আর আবার লাগবে কী?" বোনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ভোম্বলদা কিছু অস্বোয়াস্তি বোধ করলেন। মল্লিকা আর কিছু বললো না। নিজের মাথার বালিশটা এনে ভোম্বলদার হাতে দিলো। অল্পদূরে তিন খাটে মায়াদেবী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। একটা পাশ বালিশ ছিলো মায়াদেবীর পাশে। মল্লিকা সন্তর্পণে পাশবালিশটা এনে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই উঠে বসলো, অদম্য কৌতূহল শুকে শুয়ে থাকতে দিলো না, ঠেলে তুলে পাঠিয়ে দিলো নিচে। কপাটে কান পেতেই বুঝলো যা ভেবেছে তাই, কেউ একজন এসেছেন ভোম্বলদার ঘরে। কথাও মাঝে মাঝে যেন শোনা যাচ্ছে, মল্লিকা তাড়াহুড়ো করে বুঝে নিলো, ভেতরে যিনি এসেছেন তিনি এবার বালিশ মাথায় দিয়ে শুতে রাজী হলেন আগে ভোম্বলদা বই মাথায় দিয়ে নিজের বালিশটা দিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তক্ক হ'য়েছিলো গোলমাল। পরক্ষণেই কণ্ঠ, "এখন শোনে একটা, ঘণ্টা দুয়েকের ওপর বেশ ঘুমিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ঘুম আসবে কিনা অন্তর্যামী জানেন। পেটে যে আস্তাঁস্ত দুঁচোয় ডন্ মারছে।" সকাল থেকে কিছুতেই সুযোগ পেলাম না চাট্টি খেয়ে নেওয়ার।" ভোম্বলদা ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, "সে কী? সকাল থেকেই কিছু খাস্‌নি…? এত লঙ্কাণ্ড তা'হলে কী ক'রে পাড়ি দিবি রাণা?—যে রাস্তায় যাবি, প্রায় গোটা একটা দিন, সে রাস্তায় কিছুই পাবি না।" "রাণা…? বড়দা এসেছেন তাহোলে…।" মল্লিকা চকিত হ'য়ে আরো উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো। বড়দা হাই তুলে ঘুমঘুম গলায় বললেন, "খাবো কিরে? খাওয়া তখন মাথায়। আমার সমস্ত পাড়াটা ঘিরেই মহাপ্রভুরা জাল ফেলেছিলেন…নেহাৎ ভোরে ওঠা অভ্যেস, তাই সার্চ শুরু হবার আগেই গা ঢাকা দিতে পেরেছি।" ভোম্বলদা বললেন, চপলকে আমাদের পার্টি থেকে বারকরে দেওয়ার জন্য কতবার ডেকে বলেছি, পরপর দুটো ডাকাতি করে বসলো—উইদ্‌আউট আওয়ার কনসেন্ট, আর ওর কুকর্মের ফল ভোগ ক'রে মরবো আমরা?" বড়দা শান্তকণ্ঠে বললেন, "কে কাকে বার করে? আমিতো মনে করি ওইবার করে দিয়েছে আমাদের। আমাদের নর্থ-ক্যালকাটার গ্রুপটাকে ও একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে সেটা তো তোর অজানা নেই নিশ্চয়ই।" ভোম্বলদা চুপকরে রইলেন, কিছু বললেন না। বড়দা আবার হাই-তুললেন। বোধকরি আগের কথার জের টেনেই বললেন, "অবশ্য চুরি ডাকাতি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। ঐ ম্যান মায়ার থাকলে তবে বিদেশ যাওয়ার টাকা সংগ্রহ করে ফেলতাম…।" ভোম্বলদা বাধা দিলেন, "থাক ওকথা এখন। তোর খাওয়ার একটু কী ব্যবস্থা করি—বুদ্ধি দেতো রাণা।" বড়দা হাসিমুখে বললেন, নিজের খাওয়ার জন্য অনর্থক বুদ্ধি খরচ করতে পারিনে। ওকথা থাক দে। আর এক গ্লাস জল দিয়ে তুই শুয়ে পড়।" জল দিয়ে আলো নিবিয়ে ভোম্বলদা ভারি মন নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ওদের কথার মাঝখানে মল্লিকা ব্যস্ত হয়ে চলে গিয়েছিলো অনেক মাথা ঘামিয়ে নিশ্চয়ই মার মাথার বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে ভাঁড়ার ঘর খুলে ও ঠাকুরের লুকোনো যায়গা থেকে রান্নাঘরের চাবি নিয়ে রান্নাঘর থেকে চটপট কিছু খাবার যোগাড় করে আনলো। ট্রেতে করে সাজিয়ে নিয়ে ডোমলদার ঘরজার কাছে এসে মৃদু টোকা দিলো, সে শব্দে শান্তিত দুজনেই চমকে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। বড়দা নিমেষে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কঠিন বস্তু দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে আলনার পেছনে সরে গেলেন, ডোমলদা আলো জেলে কপাট খুললেন। ট্রে হাতে মিলিকে দেখে প্রথমটা ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন ডোমলদা, তারপর সামলে নিয়ে হেসে ফেললেন। ট্রের ওপর খাদ্য বস্তু দেখেই সহসে হাসি বেরিয়ে এলো। আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "মিলি। তুই কী অন্তর্যামী?"

মল্লিকা নীরবে হেসে ট্রেটা এগিয়ে দিলো, কিছু বললো না, আর দাঁড়ালোও না, ক্ষিপ্র পায়ে চলে এলো ওপরে, বড়দা ততক্ষণে আলনার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে অট্টহাসি ছুড়ে দিয়েছেন, "ভগবান আছেন, বুঝলি ডোমল, ভগবান আছেন—" কথা শেষ করেই বড়দা যেন দু হাতে গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন। বড়দার খাওয়া দেখে ভারি কষ্ট হতে লাগলো ডোমলদার। মুখ ঘুরিয়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মল্লিকা অনেক চেষ্টা করে বুদ্ধি খাটিয়ে ইলেকট্রিক স্টোভে দুটো ডিমের ভাবল অমলেট ও একটা গোটা পাউরুটি আর কিছু সীতাভোগ মিহিদানা নিয়ে এসেছিলো। রুটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়—এতই ক্ষিপ্রহাতে কেটেছে রুটি যে সাধারণ হিসেবে বেশ মোটা আর এবড়ো খেবড়ো হ'য়ে গেছে। অমলেট আর রুটির আধখানা শেষে বড়দা সুস্থির হয়ে বসলেন, ডোমলদার কাছ থেকে একটা কাগজ নিয়ে বাকী রুটি এবং সীতাভোগ মিহিদানা বেশ করে পকেটে রাখতে গিয়ে কঠিন বস্তুটার সঙ্গে ধাক্কা খেলেন হাতে। মোলায়েম হাসি হাসলেন বড়দা। ডোমলদার প্রশ্নময় দৃষ্টির উত্তরে বললেন, "আমি কোথায় রিভলবার বাগিয়ে মহাপ্রভুদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, তার বদলে পুষ্প বৃষ্টির মতো খাদ্য এসে হাজির, কে দিয়ে গেলেন খাবার? তোর সেই বোন নাকি?" "হ্যাঁ, মল্লিকা।" কিছু একটা ভাবতে ভাবতে উত্তর দিলেন ডোমলদা। "এমন বোন কেন হয় না যে ঘরে ঘরে—?" ডোমলদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বললেন। "আমার এই বোন কিন্তু জোর গলায় ঘোষণা করেছে যে, আমরা ভুল পথে চলেছি।" বড়দা একটু যেন চমকালেন, "বললেন আমাদের পথের খবর কী করে পেলে তোর বোন?" ডোমলদা বললেন "কী জানি, সে রহস্য আমার এখনও অজ্ঞাত, তবে—" বলে ডোমলদা একটু থেমে কী ভাবলেন তারপর বললেন, "ইনফিরেক্টলি মিলি আমার এত সাহায্য করে, আমাদের পার্টিতে থেকেও বহু মেয়ের তা করে না।" বড়দা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, "হ্যাঁ তোর কাছে এঁর কথা যা শুনেছি, তাতে তাই মনে হয় বটে।" ডোমলদা বললেন "অসম্ভব ভীরু বুদ্ধি মিলির আমি এক এক সময় অবাক হয়ে যাই। যেই মাত্র আমি বললাম,—মাথার বালিশ একটা বাড়তি থাকে তো দে—আমার ঘাড় ব্যথা হয়েছে···। তক্ষুণি বোধ হয় বুঝে ফেললে কথাটা, চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞেস করলো,—আর কিছু লাগবে না? আমি তো ঠেট না বলে চলে আসলাম কিন্তু কথাটা যে ওর আদৌ বিশ্বেস হয়নি তা এখন বুঝতে পাচ্ছি, ও নিশ্চয় ভেবেছে এত রাত্রে যে লুকিয়ে আসে, যার জন্য চুপি চুপি বালিশের দরকার হয়—তার খাদ্যের প্রয়োজন আরো বেশী হতে পারে·····।" বড়দা শুধু "আশ্চর্য!" বলে ধীরে

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তোষলদা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন "যাগা! তোর বিজয়বাবুর টীপ এখনও আগের মতো আছে?" বড়দা হেসে বললেন, "কী করে বলি বল? সেকালের তো এর প্রমাণ আর দেখাতে পারিনে—। মুখর হবের অমি বেখার নাম করে যেন হাজিরে গ্রাকটীস, কেন বুঝিয়ে যে তুই অমিতলো সব হারালি——"। সঙ্গে সঙ্গে তোষলদার মুখের উপর দিনের একটা ছায়া যেন ভেসে গেলো। ম্লানমুখে বললেন "কেন যে হারলাম রাগা, আমাদের বাড়ী গিয়ে আমার মা-বোনদের মুখের দিকে তাকালে আর একথা বলতিস্নে……" তারপর কণ্ঠস্বরটা যেন আত্মগতভাবে আত্মস্থ কণ্ঠে বললেন, "অসহায় সন্তান আমি, পর পর দুই বোনের বিয়ে হলো, মাকে একটা আধলা দিয়েও সাহায্য করতে পারিনি"। একটুকাল চুপ, ঘরের হাওয়া ভারি, ভিজে ভিজে। বড়দা নীরবতা ভঙ্গ করলেন, 'তোষল! আবার যাওয়ার সময় প্রায় হ'য়ে এলো। আমার পোটলাটা দে, আমি বেশ আগ নিয়েছি।" তোষলদা হাত বাড়িয়ে খাটের পাশ থেকে পোটলাটা নিয়ে বড়দার হাতে দিলেন। পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে বড়দার মেজ আগ সারা। তোষলদার সামনে দশ ফটক-ফেরত আসন একজন উঁচু পাকা দক্ষ বিশ্লেষিত ক'রে উন্মুক্ত হয়ে আছে। কাঁকি দিয়ে ঠেঁড়া মুখ পোটলাটা বগলে তুলে নিয়ে বড়দা একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসলেন, "বারিবি তো বারিবি, ধরা দিবি কাই—?" দুজনেই হেসে উঠলেন এক সঙ্গে। তোষলদাও উঠে দাঁড়ালেন। আলনা থেকে চাদরটা নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বললেন, "চল্ রাগা তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—।" বড়দা মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালেন। "আরে, না, না, পাগল হলি নাকি তুই? সকাল থেকে এত বায়েলা গেলো তোর ওপর। ওই মধ্য রেল যাবে কম ট্রেন্ হয় নাকি? তুই যা এখন, আমি চলি।" তোষলদা বললেন, "না রে, কোন কিছুতে এখন আর আমার কষ্ট-কষ্ট হয় না। আরো কিছু পরামর্শের প্রয়োজন আছে তোর সঙ্গে—।" বড়দা অন্যদিকে মুখ করে বললেন, "না কিছু প্রয়োজন নেই, সব কিছু আগেই নির্দেশ দিয়েছি।……আজ থেকে ঠিক সাত দিন পর অর্থাৎ সামনের বুধবার মোনাতলার তাজা মল্লিকের পেছনে আমাকে পাবে তুমি। তখনই আমার ওই দশ হাজার টাকা চাই। টাকাটা চার পাঁচ দিনের মধ্যেই যখন তাকর দিতে পারবে বলেছে তখন অযৌক্তিক বিলম্ব করা সমীচীন মনে করিনে। তুমি নিজেই যেও টাকা নিয়ে—।" সিরিয়াস হয়েই দুই বন্ধু দুই ছেড়ে শুরু করে তুমি। তোষলদা বললেন, "ও কথা নয়। যেটা তুমি এড়িয়ে গেলে, তাকর-বন্ধনা সমস্যা, সেটাই তোমার সঙ্গে আরো একটু আলোচনা করতে চাই।" বড়দার কণ্ঠস্বরে উত্তাপ প্রকাশ পেলো, "আমার তো আর তোমার মতো মাথা খারাপ হয়নি যে বন্ধনাকে ছিকোয়েষ্ট করবো তাকরকে বিয়ে করার জন্য।——পার্টির সমস্ত মুরুব্বী হাসিমুখে সরে যাচ্ছে কার জন্য?" মুখের মত পাল্টালো তোষলদার। বড়দার চোখের সামনে থেকে মুখ ঘুরিয়ে যথাসাধ্য সহজ গলায় বললেন "থাক্ আর রাগ করতে হবেনা, অনর্থক দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। পার্টির ব্যাপারেই সম্প্রতি আমার কিছু ডিস্কাস করবার আছে।" বলেই তোষলদা তাকের ওপর থেকে ভাল্ব চাবিটা হাতে নিলেন, বন্ধুকে কিছুতেই আর নিরস্ত করা যাবে না বুঝে বড়দা চুপ করে গেলেন। তোষলদা দরজায় তালা দিচ্ছেন যখন, কৌতুক কণ্ঠে বড়দা বললেন, "আমাদের দুজনকে কেউ একসঙ্গে দেখে ফেললে ভাববে কী?" "কেন? ভাববে, বাড়ীর জন্য আমি একজন পাত্র মনোনীত করে নিয়ে যাচ্ছি", দুজন দিলে হাসলেন তোষলদা, বড়দাও হাসলেন।

সেটের বাইরে এলে, গেটটা টেনে বন্ধ করতে করতে ফিসফিসিয়ে বড়দা বললেন, "তোর বোনের দেখা পাওয়া এখন সহজ নয়। একটিবার দেখবার আমি ইচ্ছে হ'য়েছিলো। তোর যখন ছোটবোন, তখন সে আমারও স্নেহের পাত্রী। তার অন্তরের শুভকামনা আর আশিস জানিয়ে গেলাম—। সুখী হোক, সার্থক হোক ওর জীবন।

ওদিকে, মনকে চোখ রাঙিয়ে পরিত্রাণ বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো মল্লিকা। জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলো। কিন্তু ঘুম আর আসে না। কিছুতেই না। বড়দার কথা শোনার পর বড়দাকে একটিবার দেখার জন্য ভেতরে ভেতরে এত ব্যাকুলতা আরম্ভ হলো মল্লিকার, নিজেকে ধরে রাখা কঠিন হলো ওর পক্ষে। তবু জোর করেই ধরে রাখলে ও নিজেকে। অসহ্যবোধে এপাশ ওপাশ করে ঘুমের আশা একেবারে ছেড়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো মল্লিকা। দাঁড়িয়ে আরাম বোধ করলো। দূরে বড় তেতলা বাড়ীর মাথায় আধখানা চাঁদ। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় আকাশ ও পৃথিবী যেন হাসছে, স্বপ্ন দেখছে। পৃথিবী ও আকাশের এই নিখুঁত বিভাসি পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। এই ভাবে কয়েকটা আবিষ্ট মুহূর্ত কাটলো মল্লিকার। হঠাৎ নিচের দিকে চোখ পড়াতে চমকে শিউরে উঠলো ও। ওদের বাড়ির চারিপাশ পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। নিমেষে ওর সমস্ত শরীর পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলো। কণ্ঠও যেন শক্ত একটা আটকে স্তব্ধ করে দিলো কণ্ঠ। ঘটনার আকস্মিকতার গভীর শঙ্কায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো ওর মন। ভীতিবিহ্বল অন্তর দুরু দুরু করতে লাগলো। চিন্তাকরার ক্ষমতা সাময়িকের জন্য লোপ পেলো। ঘিয়িটি পাচেক আপ্রাণ চেষ্টা করে প্রায় নিজের মনে মুক্ত করে মল্লিকা সহজ হলো কিছুটা,—ওর এখন অনেক কাজ। প্রথমেই ঘড়ি দেখে নিয়ে অনেকটা স্বস্তিবোধ করলো।.....না, চাচাটো যাবে এখন, বড়দা নিশ্চয়ই চলে গেছেন। কিন্তু তোফলদাকেও তো এরোই করতে পারে। কত কী সব নিষিদ্ধ বই তোফলদার ঘরে আছে, ও দেখে নিয়েছে লুকিয়ে চুরিয়ে। আর—আর শেলফের বইর পেছনে যদি সেই কালো তোবা-আলা জিনিষটা থাকে—? সর্বনাশ! অবিলম্বে তোফলদাকে সাবধান করা দরকার। নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো মল্লিকা। আলো জ্বালানো চলবেনা। টর্চ হাতে করে নিঃশব্দে নেমে এলো নিচে। তোফলদার ঘরে তালা ঝুলোনো দেখে ও হতবুদ্ধি হ'য়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

কী করা—। এখন কী করা—। আড়াইভাব কাটিয়ে মনস্থির করতে আরো কিছুকাল লাগলো মল্লিকার। আবার সেই শব্দহীন পদক্ষেপে ওপরে উঠে এলো। দাদার বালিশের তলা থেকে অতি সন্তর্পণে খোলো চাবিটা নিয়ে সেইভাবে নেমে এলো নিচে। মল্লিকা জানতো এই ধরণের তালায় চাবি যার দিএ আছে। একটু চেষ্টা করেই তালা খুলে ফেললো। আন্দাজই ঠেকলো শেলফের বইএর পেছনে, ঠিকই রয়েছে সেটা। ট্রাউজের কথাদিয়ে পলিয়ে দিলো জিনিষটাকে। বইগুলো নিয়ে কী করা যায়? এক মুহূর্ত ভাবলো। অল্প কয়েকদিন আগে দাদার কাছে ও একটা খবর শুনেছিলো একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে কেলপ্রেমিক, তাদের বাড়ি সার্চ হলো। সমস্ত বাড়ি তছনছ করে গেলো, কেবল পুলিশ অফিসারের ঘরটা ছাড়া। এ মর্যাদাটুকুন দিয়েছিলো অফিসারটিকে। দাদার ঘরেই-সেই মুহূর্তে বইগুলো তাহলে রাখতে হবে—। বইগুলো পাতা করে নিয়ে এলো ওপরে। আবার যখন নিচে নামলো পাতলা পাতলা গুজের বই ওর বগলে দেখা যাচ্ছে। বইগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে দিলো টেবিলে, শেলফে। এঁটো কাপ দুরে জানলা দরজা বন্ধ রাখলো। গ্রেটাও রাখলো গুছিয়ে। তারপর নিজের

বালিশটা নিয়ে তালাবন্ধ করে ওপরে এসে তবে পড়লো আবার। চোখ বন্ধ করলে কি হবে? বুকে যেন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। আর বুকের মধ্যে সেই ছোট্টো আলা বস্তুটার হিম শীতল স্পর্শে ও ঠেলে উঠছে-বার বার।

ঘণ্টাখানেকের আগেই ঠাকুর আর বাহাদুর সিংএর চিল্লাচিল্লি শোনা গেলো, "দাদাবাবু! পোলিশ আয়ে হৈ—পোলিশ আয়ে হৈ...।" মায়াদেবী প্রতিদিন এর বহু আগে ওঠেন। বিয়েবাড়ির ঝামেলা শেষে শরীরের ওপর দিয়ে, ক্লান্ত শরীরে আজ উঠতে দেরী হয়েছে। ঠাকুর চাকরের সমবেত চিৎকারে সকলেই হড়মুড় করে নিচে নেমে গেলো, গেলো না এক মল্লিকা। সকলে নেমে যেতেই বই এর পাতা নিয়ে মল্লিকা দাদার ঘরে ঢুকলো ওয়ার্ডরোব খুলে একেবারে নিচে জামাকাপড়ের তলায় রেখে দিলো লুকিয়ে। দাদার উচ্চকণ্ঠে ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো একটু তারপর আঁচলে মুখটা ঘসে মুছে নিয়ে ক্ষিপ্রপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। ভোম্বলদার বন্ধ ঘরজার সামনে একজন বড় পুলিশ অফিসার কনেষ্টবল পরিবেষ্টিত মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অফিসারের গায়ে দাদার মতো ইউনিফর্ম দেখে মল্লিকা বুঝে নিলো—ইনিও একজন ডি-এস-পি। অরুণ বাগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলো "ভোম্বলদা কোথায় গেছেন আপিস নাকি মিলি—?" মল্লিকা সহজ গলায় বললো "হ্যাঁ জানি, আমার সামনে দিয়েই তো গেলেন—আশ্বস্ত হয়ে অরুণ বললো, "ও, তাই বল্। তোকে বলে গেছেন তাহলে—" পুলিশ অফিসারটি দুপা এগিয়ে এসে একটু মে-পরোয়া ভঙ্গির সঙ্গে বললেন, "একসকিউজ মী। কোথায় গেছেন বলতে পারেন...?" মল্লিকা সামান্য একটু ভুরু কোঁচকালো প্রায় না বোঝার মতো। নির্ভীক শান্ত চোখ তুলে বললো, "তাঁর বন্ধু ডাক্তারবাবুর মা মারা গেছেন—" কথার গুরুত্ব বোঝার জন্য পিসিমার বয়সে মার মৃত্যু বললে, কিন্তু বলেই ভাবলো পুলিশের কাছে ওলট-পালট কথা বললে, বিপদ হয় আরো বেশি—। আগের কথার জের টেনে বললো "মা মানে ঠিক নিজের মা নয়—পালিত মা, নিঃসন্তান পিসিমা ওঁকে মানুষ করেছেন। বাড়িতে আর কোন পুরুষ নেই কিনা, তাই সেখানে গেছেন" "আই-সী" পাইপ কামড়ে ভারি গলায় উত্তর দিলেন অফিসারটি।

"ডাক্তারবাবুর এ্যাড্রেস জানেন—?" পাইপ মুখে রেখেই ভারি গলায় আবার প্রশ্ন করলেন ডি-এস-পি। "এ্যাড্রেস তো বলতে পারবোনা, তবে যায়গাটা হলো কল্যা।" অফিসারটি এবার অরুণের দিকে তাকিয়ে একটু ঘোলাটে ভঙ্গি নিয়েই বললেন, "ওয়েল মিঃ মিত্র। আমি জানতেম না এটা আপনার বাড়ি, তাহলে আমি নিজে আসতেম না নিশ্চয়। আমি অত্যন্ত লজ্জিত, কিন্তু ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি যখন তখন আমাকে অন্ততঃ সমরবাবুর ঘরটা সার্চ করতেই হবে—।" অরুণ সহাস্যে উত্তর দিলো, "নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি মিথ্যে লজ্জিত হচ্ছেন মিঃ রক্ষিত। ডিউটি ইজ ডিউটি।" মিঃ রক্ষিত জিগ্যেস করলেন,—"এ তালার চাবি আপনাদের কাছে আছে?" অনুসন্ধান না করেই অরুণ উত্তর দিয়ে দিলো, "সরি, মিঃ রক্ষিত এতালার চাবি ভোম্বলদার কাছেই থাকে।" অতঃপর মিঃ রক্ষিত কনষ্টবলদের দরজা খোলার হুকুম দিলেন, তালা না ভেঙ্গে। কিসি চীজ সে খুলনেকা কোসিস করো।" তালা খুলবার সরঞ্জাম কনেষ্টবলেরা পকেটে করেই এনেছিলো। তাই দিয়ে খুলে ফেললো দরজা। মেয়েরা সবাই চলে এলেন ওপরে। মায়াদেবী জপে বসে গেলেন। কপাট খোলার পর মিঃ রক্ষিত অনুচরদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। অরুণও গেলো। ঠাকুর ও বাহাদুর সিং কম্পিতোরুর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে প্রায় জড়াজড়ি করে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। ঘরে ঢুকেই সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এক রাউণ্ড তাকিয়ে নিয়ে মিঃ রক্ষিত হেসে ফেললেন। "আপনার

ঘাঘাটিতো মশাই বেশ রসিক মানুষ দেখছি—ঘরময় স্পোর্টস এ্যাণ্ড পাসটাইম, গ্রীন আর শঙ্কর'স উইক্‌লির ছড়াছড়ি।" অরুণ নীরবে হেসে চুপ করে রইলো। তন্ন তন্ন করে সার্চ শেষ হলো। বে-আইনী কিছুই পাওয়া গেলো না। ঘরে আছে সামান্য আসবাব আর বই এর মধ্যে সবই উইক্‌লি আর মোটা মোটা খানকয়েক অভিধান। বেরিয়ে এলেন সবাই ঘর থেকে মিঃ রক্ষিতকে একটু চা খেয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো অরুণ। "না। থ্যাঙ্ক্‌।" দু কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বিশিষ্টি ধরণে শ্রাগ্‌ করে উত্তর দিলেন রক্ষিত। করিডোর দিয়ে যেতে যেতে তারিফি কণ্ঠে বললেন, "…গিয়েই আগে ইনফরমারটিকে চাবকাবো, তবে আমার গায়ের জ্বালা মিটবে। আরে মশাই, রাত দুটোর সময় আমাকে কাঁচা ঘুম থেকে তুলে বলে কিনা—ভাট ডেনজারস চাপ্‌—বড়মা নামেই তিনি পরিচিত, তিনি সেঁধিয়েছেন এই বাড়িতে। একেবারে হাতে নাতে ধরতে চান তো এই বেলা—।" কৌতূহলী হ'য়ে অরুণ প্রশ্ন করলো, "সেই বড়মার এগেনষ্টে চার্জ কী?"

"আরে মশায় চার্জ তো বহু, বলতে গেলে একেবারে মহাভারত। সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট এক পার্টি গঠন করেছেন—তাঁরই দলপতি তিনি। শুনতে পাই, সারা বাঙলা ছড়িয়ে এর শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছেন। যত ভাল ভাল ব্রেনআলা কাঁচা কাঁচা ছেলেমেয়েদের দলে ঢুকিয়ে মুণ্ডুগুলো খাচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি ওঁর নামে ছটা ডেকোয়ট কেসের চার্জ ওঁর মাথার ওপর ঝুলছে।" অরুণ চুপ করে মনোযোগ দিয়ে সব শুনলো, কোন মন্তব্য করলো না। মিঃ রক্ষিত গটগট করে জীপ গাড়িতে উঠে ষ্টীয়ারিং ধরলেন। অন্যচরবৃন্দ টপাটপ লাফ দিয়ে উঠে পড়ীতে গিয়ে বসলো। গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে মিঃ রক্ষিত সামান্য একটু মুখ বার করলেন। অরুণকে কটাক্ষ করে, বাঁ চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত করে অদ্ভুত একটা সরমাবৃতা হাসি হাসলেন বললেন, "মিঃ মিত্র! সরযূবাবু আপনার কাসিন ব্রাদার তো?" "হ্যাঁ, অ্যাঠতুতো ভাই।" বললে অরুণ। "আমার এ্যাডভাইস শোনেন তো জলদি তফাৎ করুন ওঁকে—। যা রিপোর্ট পেয়েছি ওঁর সম্বন্ধে—উনিও একটি গভীর জলের মাছ।" অরুণের নাকের সামনে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ভট্‌ ভট্‌ করে জীপটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। জীপের শব্দ মেলানোর সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা নিচে নেমে এসেছে, অরুণের থম থমে মুখের চেহারা দেখে মাধাদেবী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, "কিছু পাওয়া গেলো নাকি তোদলের ঘরে? "না, কিছু না," মাধাদেবী আশ্বস্ত হ'য়ে আরামের নিশ্বাস ফেললেন। "তবে, তোর মুখের চেহারা অমন কেন অরু? হয়েছে কী?" "কিছু হয়নি মা, রক্ষিত যাওয়ার সময় কতকগুলো ভয় দেখিয়ে গেলো—তাই ভাবছিলাম" মাধাদেবী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন ভয় দেখিয়ে গেল? কেন? কিসের জন্য?" "বললেন আপনার অ্যাঠতুতো-ভাইকে তফাৎ করুন, নাহলে বিপদ ঘটবে।" মাধাদেবী গম্ভীর হ'য়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর মত কী অরু?" "আমার…" হাসিমুখে উত্তর দিলো অরুণ "আমার মত তো, আলাদা করে জানাবার কোনদিন প্রয়োজন হয়নি মা, তোমার মতই আমার মত।" মাধাদেবী প্রীত হ'লেন কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। তোদলকে কী ভাবে রক্ষে করা যায় সেটাই চিন্তা করতে লাগলেন মনে মনে। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য-প্রীতি

রবীন্দ্রনাথ বসু

(এ) কি সাহিত্য প্রেমে দেখালে বিরহ তুমি
শুভ শঙ্খ চুমি।
প্রথম এ দিন
হে নবীন,
তুমি মোর সাথী
আলোর রাতি এ ঘরলা গাথি।

মনে হ'ল কোন ছন্দ নেই,
সভ্য কথা বলি ভাষা নেই
নেই সাথে প্রাণ
তুমি দেখালে কি নব যৌবনের গান।

লয়ে তারে আকাশে বাতাসে, ঐ যে আহ্বান আসে।
দূর করি অন্ধকার সাহস বাহিছে কোন ভাসে।
দানিবে নির্জীব মনে বিষাদের নূতন পরাণে,
নব মৈথিলীর গানে,
তেজ দীপ্ত বজ্র সুরে উচ্চ কণ্ঠে গাহি,
আসিবে যে বাহি
সাহিত্য প্রীতির আশ্বাস।

গল্প

ভালবাসার অধিকার

অমলেন্দু মিত্র

পিসীমার মেয়ে ইরা গল্প বলছিল ওর নিজের পিসীর মানে ননীর। এই সম্পর্কে কোন সমালোচনাই ভাইপো ভাইঝিদের মুখে সাজে না। তবু ওর সে অধিকার জন্মিয়েছিল। ননী বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়, তবু একই সময়ে তাদের বিয়ে হয়েছে—আর তাছাড়া যে ননীর সমালোচনা নিয়ে গাঁয়ের ছেলে, বুড়ো, মা-মেয়েরা মুখর হয়ে উঠেছিল সেই অতি কথিত আলোচনা করবার অধিকার বা অনধিকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যা সবাই জানে, তা নতুন করে রটনা হবার কোন আগ্রহই যখন নেই। ইরা বললে, "জানো বড়মা, তোমার দেওয়া সেই শাড়ীটা আজও তুলে রেখে দিয়েছে। বলে ভাইপোর স্মৃতি।"

"বলিস্ কি রে। আমি তো ভুলেই গেছি।"

"শুধু কি তাই—তোমার একখানা ছবি নিয়ে গিয়েছিল সেখানাও ট্রাঙ্কের ভিতর ভরে রেখেছে। মাগো মা, কী বিশ্রী হয়েছে তোমার সেই ফটোটা। হাড় বিরবিরে হাতের শিরাগুলো পর্যন্ত ফুটে উঠেছে।"

মনে পড়ল একটু একটু। অন্তর অবস্থায় তোলা একটা বিশ্রী ছবি ছিল, ননী সেটাকেই হাতড়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ইরা মিথ্যে কথা বলছে না নিশ্চয়ই। বিয়ে হয়ে বাঁচলে চাবীর গোছা ঝুলিয়ে বেশ ভারিক্কি হয়ে উঠেছে সে। কৌতুকের সম্পর্ক আমার সঙ্গে ওর নয়, তবু শ্বশুরবাড়ী হলেই মেয়েরা সব অধিকার হারিয়ে নিতে চায়। যাকে যা বলবার কইবার প্রয়োজন, আটকায় না মুখে। জানিনে ওরা কি ধারণা মনে পুষে রেখেছে। আমি এইটুকু, ননী আমাদের এখানে এসেছিল একবার পিসীমার সঙ্গে এবং সেই সময়ে ওর নাকি পছন্দ হয় এবাড়ীর আবহাওয়া। তাই সেইরকমই ঝোঁক ধরেছিল মেশে কিরে। প্রস্তাবও এসেছিল। আমি নাকচ করে দিয়েছিলাম। বোঝা বইবার মত সামর্থ আমার নেই। তার পাই সেকথা ভাবতে। এমনিতেই নিজে অসহায় বোধকরি তার উপর আর এক-জনের বোঝা চড়লে ঘাটিতে বসে পড়তে হবে।

ননীর রূপ ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, মন আর দেহ দুটোই ছিল বৈশাখী ঝড়ের মত উদ্দাম। মাত্র সাতটা দিন ছিল আমাদের বাড়ীতে। ওর মধ্যেই তাণ্ডব চিহ্ন রেখে গেছে। আমি নির্বিরোধী ঘরকুনো লোক। উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলাম কয়দিনে। ননীর উদ্দাম প্রকৃতি নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারিনি। অথচ ও নাকি নিয়েছিল। কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত। যে মেয়ে সারাদিন উঠানের কাঁঠাল গাছটার উঁচু ডালে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে গান করে পরের বাড়ীতে এসে, তার কুণ্ঠাহীন নির্লজ্জ আচরণ সহজ মনে গ্রহণ করা শক্ত।

বললে, "চলো পুকুরে স্নান করতে যাব।"

আমি সাহস পেলাম না। ননী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে জলে সাঁতার কাটতে ওস্তাদ। তা বলে একঘাট ভর্তি লোকের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জল ছোড়াছুঁড়ি মাতামাতি করবে তাই বা কি করে জানব। পুণ্যকামী বধূরা ওর গায়ের জলের ছিটা পেয়ে মুখিয়ে উঠেছিল "আহাহা। কাদের মেয়ে গো তুমি বাছা। ভদ্রলোকের মেয়ে অমনি বেহায়ার মত জলে ঝাপায়।"

উদ্দাম শুধু দেহ-মনেই নয়, কথার তোড়েও বর্ষার পাহাড়ী নদী যেন ননী। সাঁতার কাটা বন্ধ করে এক

কোমর জলে এসে দাঁড়াল। উর্ধাঙ্গের ভিজে সাড়ী জলে লুটোপুটি খাচ্ছে। সেদিকে খেয়াল নেই ওর। বলছে, "তুমি কাদের মেয়ে গো! বলি, পুকুর কি তোমার একার? বেশ করেছি জল ছিটিয়েছি!"

পাড়ে দাঁড়িয়ে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ছিঃ, ছিঃ, এ ননী করলে কি! আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা কি ও জানে না! কিছু বলবার আগেই কলহ বেধে গেল। ঘাটের সবাই ননীর বিরুদ্ধে একজোট বিষ উগার করতে লাগল। ননী হঠবার পাত্রী নয়। বেগতিক বুঝে আরও উদ্দাম হয়ে উঠল যেন। চক্ষের নিমেষে জলে নামিয়ে পড়ে উন্মত্ত লীলা সুরু করে দিলে। কারও গায়ে জল ছিটাতে বাকী রাখলে না। আমি কবি নই কোন কালেই। নইলে অমন পূর্ণ যৌবনা এক নারী, যার সিক্ত জলবরা দেহ থেকে ঝলমলে আলো ঠিকরে পড়ে গোটা ঘাটটাকেই রাঙিয়ে দিয়েছে, তার বর্ণনা দিই! নারী তো নয় প্রকৃতি। কিন্তু বিশ্রী কোলাহল আর কয়েক জোড়া নির্নিমেষ চোখ—এর মত নিছক অমিল পদার্থকেও তো অস্বীকার করতে পারিনে! পাড় থেকে আমাকে শান্ত করতে হ'ল ওদের। বললাম, "আপনারা কিছু মনে করবেন না, ও পাগল!"

"ও তাই বলেন বড়বাবু! তাই তো বলি! আপনাদের কেউ হয় বুঝি?"

"হ্যাঁ! ছোটপিসীর নন্দ!"

"ছোটপিসী! মানে আমাদের অঞ্চা?"

"হ্যাঁ!"

"তিনি কবে এসেছেন গো—খাবো দেখা করতে,—বলি "হ্যাঁ বড়বাবু! এই মেয়েটা কি পাগল জন্ম থেকেই!"

"হ্যাঁ বেনেবৌ, ও জন্ম থেকেই পাগল!"

ননী এতক্ষণ শুনতে পায়নি। হাত-পা ছুঁড়ে জল নিয়ে অনর্থক উল্লাসে মেতেছিল। বোধহয় খেয়াল হল তার দিকে মন দিচ্ছে না কেউ। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে। ভিজে এলো চুল, আর খসে পড়া শাড়ী শুধু মাত্র একটা পাতলা ব্লাউজে ঢাকা উদ্ধত বুকখানা দুলিয়ে ভৈরবীর মত দাঁড়াল আমার পানে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গের মত ভেসে এল আমার পানে তারপর ভেঙে পড়ল এবং ঘাটের আকাশ বাতাস চিরে চীৎকার করে উঠল: "আমি পাগল! আমাকে পাগল বলবার কে তুমি?"

ভয় হল। ননী বুঝি পাগলই হয়ে গেছে! কিন্তু আমাকে সময় দিলে না ভাববার, না কিছু বলবার। পলকপাতে শরীরটা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের ছোটো জলে ডুবিয়ে আমার গায়ে জল ছিটাতে লাগল। পালাতে পালাতে পাড়ে দাঁড়িয়েও অর্ধেকটা ভিজে গেলাম। ঘাটের মেয়ে পুরুষরা ননীকে ধিক্কার দিয়ে উঠল। কিন্তু ননী পরাস্ত হয়েছে! হয়ত ভেবেছিল, ওর হয়ে আমিও কলহ করব সবের সঙ্গে। আমার সখ মিটে গিয়েছিল তার। ঐ ভিজা জামা কাপড়েই ঊর্ধশ্বাসে ছুটল বাড়ীর পানে। দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা আগুনের শিখা ছুটে যাচ্ছে।

ঘাটের লোকজন সেদিন সত্যিই বিশ্বাস করেছিল, মেয়েটা পাগল।

বাড়ী ফিরে পিসীমার সঙ্গে একচোট কলহ বাধিয়ে দিয়েছে দেখলাম। পিসীমা বলছেন, "বাড়ী থেকে এক-পা বাইরে বাড়িয়েছো কি আমি সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কাটব!"

বাপ ভাইয়ের আওতা থেকে এসে এইটুকু স্বাধীনতা বৌদি মুহূর্তে নাকচ করে দিতে পারেন, তা ননী ভাল করেই জানে। সেখানে কড়া শাসন আর কুকঠোর অবরোধের মধ্যে গিয়ে পড়তে ননীর মত স্বাধীনচেতা মেয়ে একটুও পছন্দ করে না।

এবার সুরু হল অন্দরের উঠোনে সাইকেল নিয়ে কসরৎ। সদর আর অন্দরের উঠোনে সাইকেল চড়ার

সে কি অধ্যবসায়। দু' দুটো সাড়ী কালা কালা হয়ে ছিঁড়ে গেল সাইকেলের কল্যাণে। বাইরের আঙিনায় লোকজন আসে—মজা দেখে তারা হাসে হে · হে···হে··· করে। ননী মুহূর্তে কোমরে কাপড় জড়িয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে; "কোথাকার ভদ্রলোক আপনি মশাই।"

একথা শুনে ভদ্রলোক হলে তক্ষুণি সরে পড়ত। কিন্তু বেশীর ভাগ আসে ছেলেছোকরা, বন্ধু বান্ধবের দল। তাদের বয়সই এই। রূপসী মেয়ের সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেলেই বেঁচে যায়—তা সে গালাগালিই হোক, নিন্দা-বাদই হোক। ব্যাপারটি ক্রমেই ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। বাড়তে লাগল ছেলের সংখ্যা ক্রমশঃ।

আমার মত নির্বিরোধী লোককেও কি কম জ্বালাতন করত। টেবিলে বসে লেখাপড়া করছি। হঠাৎ ঝড়ের মত ঢুকে বন্ধ করে দিল বইটা। মুখ তুলে তাকাই। বলবে ননী। "গল্প কর।"

"বেশ। এক যে ছিল রাজা তার দুই রাণী।"

"ছাই। ছাই। ও গল্প শুনতে চাইনে—নাও ওঠো।" সোলখ বয়সের মেয়ে নিমেষোচে আমার হাত ধরে হেঁচকে টেনে তোলে; "চল, ছাদে গিয়ে গল্প করি।"

মাঝে মাঝে এত বিরক্ত লাগত, উঠে চলে যেতাম বাইরে। সদর দরজা খোলা সবসময়ই খোলা থাকে, ননী সেটাকে বন্ধ করে দিত সন্দেহে। যাতে আমি ফিরে আসতে না পারি। পিছনের পুকুর পাড় বেয়ে ঘাটের দরজা দিয়ে ঘুরে ঢুকতে হত আমাকে।

এই রকম দুর্জয় দুর্বার ননী যাবার দিন কী কান্নাটাই না কাঁদলো। পিসীমার সামনে ঝোঁক ধরলে ছোট মেয়ের মত, বিয়ে করবে সে।

অনেক মিরাকল দুনিয়ায় ঘটে সব বিশ্বাস করা যায় না। আজও বিশ্বাস হয় না। অবাক লাগে। অমন ঘোমটে মেয়ে আমার মত অপদার্থকে পছন্দ করেছিল কেন? তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার বা ছোটাছুটি করবার ক্ষমতা তো আমার ছিল না: অনেকে বলে, ওটা নাকি ননীর অভিনয়। হবে। সবই হওয়া সম্ভব। তবে ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ছিল যে মনে প্রাণে গ্রহণ করবার মত সুযোগও দেয়নি। রূপসী মেয়ে ননী। তার চোখের জল বা আকুতি এতটুকু টলাতে পারেনি আমাকে কেন, তা আজও জানিনে। হয়ত বিনা সাধনায় অযাচিত ভাবে যা আসে তার মূল্য আমরা কেউই দিই নে। হয়ত ওর হৃদয়াবেগের স্পন্দন নিজের মতো সঞ্চারিত করে নেবার যোগ্য অধিকারী আমি ছিলাম না। অনেক কিছুই আজ মনে হয় নিরপেক্ষ ভাবে দূর থেকে দাঁড়িয়ে। ননী ফেলে দিয়ে কখনো অবহেলা গ্রহণ করেনি। শুধু উঠোনের আমড়াতলায় বসে বসে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে আর প্রতীক্ষা করেছে তার পিছনের। প্রতীক্ষা করবার হেতু ছিল। ওর চিঠিগুলির কথা আমার সব স্মরণ নেই, মুখস্থও করিনি। যা জমেছিল সব পিসীমা পরবার এসে পুড়িয়ে দিয়ে গেছেন। ননী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলে কি হয়, যেটুকু লেখাপড়া শিখেছে তার জোরেই বিরাট প্রেমপত্র, ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে পাঠাতে লাগল। প্রত্যেক চিঠিতে একটি কথা থাকতই 'বুকে মধ্যে তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলছে।' আমি গুটি দুয়েক উত্তর লিখে তার ভ্রম নিরসনের প্রয়াস পেয়েছিলাম, কিন্তু কথা উল্টো উৎসৃঙ্খল রাবন-হুঙ্কার মনে আবেগের জোয়ার এমনি কল্লোলিত হয়ে উঠল যার উত্তর দেওয়ার সাধ্য আমার ছিল না। ব্যাপার দেখে শঙ্কিত হলাম। পিসীমা ওদিকে কড়া চিঠি লিখলেন, ননীকে আমি চিনিনে। ওর মত মেয়েকে যদি ঘরে নিই, সংসার জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। বয়সের আমি নাকি কলঙ্কবরণ। ননী ওখানে ফিরে গিয়ে যে কাণ্ড শুরু করেছে তাতে সমস্ত দোষ এসে পড়েছে আমারই ঘাড়ে। আমি তাকে কুমন্ত্রণা না দিলে এত সাহস পায় কি করে সে।

পিসীমার চিঠিরও জবাব দিইনি। কিন্তু মনটা ঘুরতে গিয়েছিল। কেন ছিলাম নির্ভাবনা। কোত্থেকে আসর বাধল। এ সমস্যার সমাধান যে কোন পথে হবে ভেবে আকুল হয়ে উঠলাম। ননীর চিঠির সুর সহসা বদলাল। লিখলে খুশি খুশি হয়ে। "এখানে ভারী মজার ব্যাপার চলছে। এলে সব শুনতে পাবে। তুমি একবার এসো না। দোষ কি। এত করে ডাকছি তোমাকে, সাড়া কি দেবে না।"

মজার ব্যাপারটি কি হতে পারে বুঝতে পারলাম না। আর এও বুঝতে পারলাম না, ননীর মত রূপ যৌবনভরা মেয়েমানুষের হাতছানি কেন আকর্ষণ করছে না আমাকে বিন্দুমাত্রও। আজ দশবছর পর নিরপেক্ষভাবে বিচার করেও দেখতে বুঝি না। দশ দশটা বছরের মধ্যে বহুবেগে পরিবেশের স্রোত বয়ে গেছে। কতজনের সঙ্গেই তো আলাপ হল। ননীর মত চেহারার মেয়ে একটির সঙ্গেও দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটেনি। অমন নিটোল যৌবনও পরিচিতাদের মধ্যে বড় একটা নেই। ননীর চেয়ে রূপে অনেকগুণে নিকষ, কালো, শীর্ণ মেয়ে চুম্বক কাঁটার মত মনকে আকর্ষণ করেছে সময় সময়। কিন্তু কেন? আশ্চর্য হয়ে আত্মচিন্তা করি।

মজার ব্যাপারটি টের পাওয়া গেল দু একদিনের মধ্যেই। পিসীমা মস্ত একটা চিঠি লিখেছেন। সে চিঠির সুর একেবারে উল্টো। আগের চিঠির সঙ্গে কোন মিলই নেই। প্রথমে আমায় ভর্ৎসনা, তারপর লিখেছেন, মতর নাকি আমার মত হীরের টুকরো ছেলেকে পেলে ধন্য হয়ে যাবেন সুতরাং ননীকে তোমার গৃহলক্ষ্মী করে নাও না কেন?"

যে মানুষ লিখলে, ননীকে ঘরে তুললে সংসার ছারখার হয়ে যাবে, সেই মানুষই আবার লিখছে, গৃহলক্ষ্মী করে নাও! আশ্চর্য মানুষের মন, ব্যবহার আর বিবেচনা। একটুও ভাল লাগল না। পিসীমার মতর মতবে আর আচারণে ছিলেন একটা অমানুষ। লোকে বলত ডাকাত। স্ত্রী পর্যন্ত অমন স্বামীর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছেন কবে। এমন লোকের ঘরে পিসীমা গিয়ে পড়েছিলেন বলে, সংসারে সবাই দুঃখ করে এসেছে চিরকাল। আবার নতুন সম্পর্ক। মনে পড়ছে বছর দুয়েক আগের কথা। পথ ভুলে গভীর রাতে গিয়ে পৌঁছাই পিসীমার বাড়ী। ঔর-মতর খড়কে থেকে উঠে-ছিলেন কোঠা থেকে, "জায়গা হবে না এখানে।" সেই শেষবারের মত পিসীমার বাড়ী যাওয়া। টনটনে আত্মমর্যাদা নিয়ে প্রকাণ্ড একটা জবাব দিয়ে ফেললাম।

কতদিন কেটেছে এ ঘটনার পর। দুনিয়ার কত ওলট পালট হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ফেটে ছিঁড়ে চেনাজানার বাইরে বহুদূরে ভেসে গেছি। ননীর বিয়ে হয়ে গেছে। পিসীমা মারা গেছেন, তাঁর মতরও। সব চুকে গেছে। জলের আলপনার মত মিলিয়ে গেছে, যদি কোন আঁক পড়ে থাকে মনের স্লেটে।

কিন্তু আজ সেই পিসীমার মেয়ে ঘোরতর শিল্পী সেজে এসে বলছে। "জানো বড়দা, ননী-পিসী তোমার দেওয়া শাড়ীখানা আজও তুলে রেখেছে। ফটোও আছে বাক্সে! বলে, 'তাই তোর সুতি।'"...খিলখিল করে হাসে ভরাভর্তি মন নিয়ে। হাসবার বয়স ওর, তাই হাসে। হাসবার বয়স আমার নয়, আমিও হাসি! সেই অসহ্য ডাকাবুকি চিত্র, যাকে ভেবেছিলাম জলের আলপনা, তা যে কত ভুল, প্রমাণ করে ঘড়ির কাঁটার মত স্পষ্ট হয়ে উঠল মনের কালো স্লেটখানায়।

ইরা বললে, "শুনবে বড়দা, ওর আসল কাহিনী শুনবে?"

"সোর জবে, মনে করো না ও তোমাকে ভালবেসেছে কোনদিন, সব বজাতি···।"

ননীর আচরণের প্রথম সূত্র দিয়েছে ওরা বজাতি।

হয়ত ঠিক। হয়ত ঠিক নয়। বললাম, "বছরখানেক আগে ননীর একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, জানিস্? লিখেছিল, তোমাদের বাড়ীর একখানা ঘর ভাড়া দাও। কয়েক মাস থাকব।"

"খবরদার, উত্তর দিবো না বলছি। ওর সব বজ্জাতি। কাউকে মানে না বাড়ীতে—শ্বশুর শাশুড়ী, কাউকে না। একলাই স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

"সত্যি!"

"শুধু কি তাই, তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে বকুল। তিনি ছেলের মা হয়েছেন। তবু মর্যাদিরি গেলনা এখনও। ছেলে মেয়েদের ফেলে চলে যায় কোলকাতা। একাই ট্রামে বাসে ঘুরে গোটা সহর চষে বেড়ায়।

বিস্ময়ের কথা। একবছর আগে আচমকা একটা চিঠিতে লিখেছিল আমাকে, 'আজ আমি তিন ছেলের মা। তোমার কাছে অপরাধী আমি? তবু বিশ্বাস করো আমার মন কাউকে দিইনি। সে তোমার জন্য তোলা আছে।'

ইরাকে একথা বললাম না মুখ ফুটে। বলে লাভই বা কি। ও বললে, 'তাহলে কাহিনীটা শুনবে না বকুল।'

"বল্ না, শুনতেই তো চাচ্ছি।"

"শোন তবে—

আমাদের গাঁ তো জান। ননীপিসীর কাণ্ডকারখানা যা মর্যাদিরি দেখে দাদু কাকারা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কারও কথা শুনবে না ও। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, বন-বাদাড়ে। নারকেল গাছের মাথায় উঠবে, সাঁতার কাটবে, রাতবিরাতকেও ভয় ভয় নেই। যখন তখন যেখানে খুশি চলে যাবে। ঠাকুরমা এক একসময় বেঁধে প্রহার দিতেন। সর্বাঙ্গে কালশিরে দাগ পড়ে যেত—তাতেও জব্দ হত না। কিন্তু তাতেও জব্দেশ নেই। দুটো দিন পর আবার যে কে সেই। কেউ সামলাতে পারলে না ওকে। পিসীকে নিয়ে বাড়ীতে যা অশান্তি হতে লাগল তা আর বলার নয়। বর্ধমানে মেজকাকু থাকেন, সেখানে পাঠানো হয়েছিল। মজা পেয়ে গেল আরও। দাদা বেরিয়ে গেলেই ও বাড়ী থেকে পালাত। দুদিনে সেখানেও কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়ল। মেজকাকু মানে মানে বাড়ীতে রেখে গেলেন। তারপর তোমাদের বাড়ী এসে সাত দিন ধরে কিরকম ঘাপিয়ে গেছে তা তো জানই। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, সেখানেই যায় ননীপিসী, সেখানেই একটা বর জোটে ওর। মা বলতেন, "ওর ইচ্ছে দুনিয়ার সব লোকই বুঝি ননীর বর হবে।" তুমি যে রাজী হওনি, তাতে যা খুশিই হয়েছিল খুব। বলেছিল, "দেখ এবার বুকে—সবাইকে মচকানো যায় না। ভেবেছো যাকে বলবে, সেই বুঝি নাচবে তোমার কথায়!" তোমাদের বাড়ী থেকে যাওয়ার পর দাপাদাপি ওর কমেছিল ক'দিন। তবু বসে বসে কাঁদত—চোখের জলে বোধ করি গোটা গাঁটাই ভেসে যেতে বাকী ছিল। ঠাকুর্দা উঠে পড়ে লাগলেন বিয়ের জন্য। কিন্তু কে বিয়ে করবে ওকে। যে শোনে সে-ই পিছিয়ে যায়। বিয়ে করে ঘরে হাড়ি রাখতে হবে তো! ডাকসাইটে মেয়ের হাতে প্রাণ দেবে কে? বৌ যদি বাড়ীর কথা না শোনে। উল্টে বৌয়ের কথা শুনে সবাইকে যদি চলতে হয়, তাহলে তার মত বিপদ গ্রামের বাড়ীতে আছে কি?"

—"ছোটকাকু খুব কড়া লোক। বললেন; "আমার কাছে নিয়ে যাব। দেখি কত বড় শয়তান ও।"

ছোটকাকু ছেলের বাবু। ব্যাঙ্গলে কোয়ার্টার পেয়েছেন নবী পিসীকে নিয়ে গেলেন তিনি। কয়টা দিন ভালই ছিল খবর পেয়েছিলাম, তারপর আবার যে কে সে-ই।

ননীপিসী ফাঁক পেলেই লুকিয়ে সিনেমা পালাতে লাগল কার সঙ্গে যেন। ছোটকাকু টের পেয়ে বেদম

প্রহার দিলেন একদিন। তারপর সবর হচ্ছোর তালা বন্ধ করে ডিউটিতে যেতে লাগলেন। কিন্তু যে দুষ্টু, তাকে সামলানো যায় না। যদ হয় মনে করলে, তাকে কি সামান্য তালার বন্ধনে আটকানো যায়। মস্ত মেয়ে ননী পিসী। প্রাচীর টপকে পালাতে লাগল সিনেমায়। জান বড়দা, রেল কোয়ার্টারের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ভাল হয় না। কেন হয় না জানিনে। তবে মনে রেখো কলোনী বা রেল কোয়ার্টার থেকে যেন কখনো বৌ এনো না। ননী পিসী যদি বা ভালো ছিল চরিত্রের দিক থেকে, বেশী কড়াকড়িতে এবার সেটা গেল ঐ রেল-কোয়ার্টারে গিয়ে। রুচির কথা কি বলব! ঘেন্নায় আর বাঁচিনে! করলে কি জানো? কোত্থেকে একটা ক্লাস এইট না নাইনের ছোকরা, নাম নৃপেন, তাকে জোটালে। বয়সে এর চেয়ে কত ছোট ঠিক নেই। সে ছেলেটি ঐ রেল কলোনীতেই থাকত। ননী পিসীর বাক্সে ওর ছবি দেখেছি। ভারী সুন্দর দেখতে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গোলগাল পুষ্ট চেহারা। কী নির্লজ্জ ননীপিসী! ওর সঙ্গে গলাগলাগলি করে ছুতিয়োতে গিয়ে ছবি তুলিয়েছে। সেই ছবি আবার বাক্সে রেখেছে। যাকে তাকে বের করে দেখায়।

তারপর শোন কি হ'ল—ঐ ছেলেটির সঙ্গে প্রাচীর টপ্‌কে পালাত ননী পিসী। কোথায় যেতো সে-ই জানে। কানা ঘুঁষোয় নিস্পে রটল। ছোটকাকুর কানেও উঠ্‌তে বাকী রইল না। তিনি একদিন ডিউটি দেবার অছিলায় বেরিয়ে গিয়ে আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। ধরা পড়তে দেরী হল না সেদিন। ছোটকাকুর প্রহারের তাড়নায় পিসী মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু ও মেয়ে বশ মানবার নয়। তালা বন্ধ করে ছোটকাকু সত্যকার ডিউটিতে বেরিয়ে যাবার পরই, নৃপেন এসে তালা ভাঙে। তারপর সোজা সবার গিয়ে নৌকা চড়ে কোথায় যে পালাল তার ঠিক ঠিকানা নেই। ছোটকাকু ভয়ে ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন। বাড়ীতে টেলিগ্রাম গেল। ঠাকুরদা বললেন, "ওর নাম মুখে আনিসনে কেউ। আমার বাড়ীর দরজা বন্ধ রইল ওর জন্য চিরদিনের মত।"

দিন পাঁচেক পর খালি গায়ে, খালি হাতে এসে হাজির। হাতে, কানে, গলায়, যেটুকু সোনা ছিল কিছু নেই। কাউকে গ্রাহ্য করলে না, কথা কইলে না—সোজা রান্নাঘরে এসে আসন পেতে বসে পড়ল। "ভাত দাও বৌদি, খিদে পেয়েছে।"

ঠাকুরদা হেঁকে উঠলেন, "বের করে দে! ওকে ঘাড় ধরে বের করে দে।"

পরমুহূর্তে তিনি একগাছা লাঠি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন, আমরা ভয়ে মরি। ঐ লাঠি গায়ে পিসীর মাথায় পড়লে খুনোখুনি হয়ে যাবে। ননী পিসীর সাহস বলিহারী। উনুন থেকে জলন্ত কাঠ তুলে বললে, "চলে এসো, দেখি তুমি কেমন বাপ!"

বাড়ীতে কাকুরা কেউ নেই। ঠাকুরদা রাতে অস্থির কয়দিন থেকে। তিনি যাবড়ে গেলেন একটু। তবু চীৎকার করে উঠলেন ঘুরে দাঁড়িয়ে, "বদ্ধু কোথায় পালিয়ে ছিলি!"

"যেখানে পালাই, তোমার কি। ইজ্জৎ হয় চেঁচাও না, গুরুক গাঁ শুদ্ধ লোক!"

কথাটা ভাববার মত। চেঁচামেচি শুনলে গাঁয়ের লোক জড়ো হবে। ঢি ঢি পড়ে যাবে চারিধারে। মুখ দেখানো যাবে না। কাকী আর মা বললেন ঠাকুরদাকে, "আপনি ঠাণ্ডা হোন বাবা! মার ধোর করে লাভ কি! যেমন করে পারেন, বিয়ে দিয়ে বিদেয় করুন!"

ঠাকুরদা কাকুদের টেলিগ্রাম করে দিলেন। ননী পিসীর কোন লাজ লজ্জা নেই। বেহায়ার মত মুখ তুলিয়ে ঘুরতে লাগল। কাকুরা হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়লেন। বসে গেল পরামর্শ সভা। ঠিক হল, ননীর সঙ্গে কেউ

কথা বলবে না। শুধু মেজকাকু প্রাণপণ চেষ্টা করলেন জানতে, ছেলেটির নাম, ধাম, ঠিকানা। ননী পিসী বাপের পুঁটির মত সটান রইলো। একটি কথাও তার মুখ থেকে বেরুলো না।

দুপুরে সবাই বিশ্রাম করছে। ননী পিসীর চিঠি লেখার দরকার হয়ে পড়ল। চুপি চুপি মেজকাকুর পকেট থেকে কলমটা উঠিয়ে নিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেছে। চিঠি লেখা শেষ করে খামটা লিখে ফেলেছে, এমন সময় মেজকাকু পিছনে এসে হাজির। পা টিপে টিপে। ঠিকানাটা পড়ে নিয়ে বললেন, "চিঠিটা দেখি ননী।" ননীপিসী চমকে উঠল—তারপর চট করে চিঠিখানা খাম থেকে বের করে চক্ষের নিমেষে টুকরা টুকরা করে জানালার বাইরে ফেলে দিলে। মেজকাকু অত কাছে থেকেও কান্নাটা করতে পারলেন না। তবু তিনি কি ছাড়বার পাত্র। জানালার নীচে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন টুকরোগুলো তারপর ঘণ্টাকয়েক পরিশ্রম করে সব মিলিয়ে জেনে ফেললেন ব্যাপারটা। সেই রেল কোয়ার্টারের বাড়ী থেকে পলাতক জীবনের মধুস্মৃতি রোমন্থন করে তাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রলুব্ধ করেছে নৃপেনকে। তারপর পিসীর কি অবস্থা হল বুঝতেই পারছ বড়দা। হাতে পায়ে তালা বন্ধ করে রাখা হল। খোঁজ, খোঁজ, পাত্র খোঁজ। শেষে পাওয়া গেল পুলিশের একজন লোক। আমাদের গাঁয়ের মাইল আটেক ঘুরে বাড়ী। তাঁরা জানতেন সবই। শুধু বর বললে, রাজী সে। ননী পিসীর বীরাঙ্গনা মূর্তি দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

ভেবেছিলাম, ননীপিসী অনর্থ বাধিয়ে দেবে। ওমা, দরজা খুলে খবরটা তাকে জানানো হলে সে অবাক করে দিলে। বললে, "তোমাদের মত পিশাচের কবল থেকে রেহাই পাব, সেই তো যথেষ্ট।"

কাকীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে ঘর করতে পারবে তো ঠাকুরঝি?"

"কেন পারব না। যে পিছনে লাগবে তাকে আগে খুন করব।"

"যাকেও খুন করবে? তাকে ভালবাসবে না?"

"করে গিয়েছে আমার।"

"তা নয় বুঝলুম, কিন্তু দেখো এসব ব্যাপার যেন টের না পায়।"

"পেলেই বা। আমার কাছে অত লুকোচুরি নেই। তোমরা বিয়ে দাওনি কেন সময়ে?"

কিছুদিনের মধ্যেই পিসীর বৌদিরা, মানে আমার মা-কাকীরা, মুখ কালি করলেন। ননীপিসীর যাকাবান শুনে নয়, পিসীর শরীরে পরিবর্তনের সূচনা দেখে। তখন অত কি ছাই বুঝি। আমরা ছেলেমানুষ বলে কিছুই জানতে দেওয়া হয় নি। আন্দাজে বুঝেছিলাম, পিসীর নাকি ছেলে হবে। নৃপেনকে তো উত্তম মধ্যম দেবার জন্য মেজকাকু হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ালেন গোটা দেশটা। কিন্তু কোন লাভ হল না। বিয়ের দিন এগিয়ে এল। সবাই বুঝছি, অনর্থ ঘটবে একটা। অথচ কী আশ্চর্যের কথা ভাবি বড়দা, কোন কিছুই ঘটল না। ঠিক বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের মাস ছয়েক পর ছেলে হল। কী পরিষ্কার দেখতে-কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। তারপর আরও দুটো হয়েছে কালো কুচ্ছিৎ। দেখতে বাপের মত। ননী-পিসী আর পিসেমশাই-এর সামনে কাকীরা বলেন; "এটা তো নৃপেনের ছেলে।"

"ননী-পিসীর বর একটা হাঁদারাম কিনা জানিনে। শুনে কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। আচ্ছা বশ করেছে যা হোক।"

"আশ্চর্য।"

"হ্যাঁ বড়দা, মনে হয়, খুব ভালবাসে পিসীকে। চমৎকার কপাল করেছিল পিসী। তিনি তো কোলকাতায়

চাকরী করেন আপনে মাঝে মাঝে ছুটিতে। পিসীর তো পোয়াবারো। সংসারের রাণী হয়ে বসে আছে। কোন কাজ করে না। হুকুমে হুকুমে সবাই আস্থির। অমন ডাক সাইটে মেয়ে নাকি ও অঞ্চলে একটিও নেই। বয়স পাতড়ী পর্যন্ত. ওরে ভটচ্য। যা খুশি তাই করে বেড়ায়। বল তো, ভিন ছেলের মা হয়ে এসব সাজে? ওর শ্বশুরের মত বাঘলাবাঘ দুর্ধর্ষ লোকের ছুড়ি নেই ওরে, কিন্তু বৌমার ভয়ে একেবারে কেঁচো। বড়মা, ভাগ্যে ও তোমার ঘাড়ে চড়েনি। তবে তোমার মেজা শাড়ীখানা কিন্তু আজও তুলে রেখে দিয়েছে…।"

ইরার গল্পটা শুধু শুনে রেখেছিলাম। ভাবিনি কোন দিন লিখতে বসব। লিখতে বসছি ননীর আবার একখানা চিঠি পেয়ে। এই চিঠিই গল্পের উপসংহার টেনে দেবে—।

"ইরার কাছে সবই শুনেছো। শুনেছো আমি ডাকাত, আমি দুর্গাদ, আমি বৈরিণী। যা শুনেছো অর্ধেক সত্যি। কিন্তু যা আসল কথা তা শোননি, শুনবার মত কানও নেই তোমার। দেখবার মত চোখ থাকলে তবে তো দেখবে। জানো, ননীর পাগলামির জন্য দায়ী কে? জানো কি, কোন্ জ্বালা ভুলবার জন্য সে বৈরিণী হয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকে দেখ্‌ছি একজন আসত, গল্প করত বৌদিদের সঙ্গে, লক্ষ্য করে দেখেছো কোনদিন, কত আগ্রহ ভরে ননী শুনত তার কথা। আজও ননী সে কথামালা মুখস্থ করে রেখেছে। বৌদি বাপের বাড়ীতে কোলে করে মানুষ করেছিল যাকে, তার কথা আর গল্প সকাল, দুপুর সন্ধ্যের মুহূর্তগুলি ননীকে আবিষ্ট করে তুলত। সে কে? কার সে কথা? আজ সে নীতিবাগীশ, ভালো ছেলে সেজে বসে আছে। কিন্তু সে হৃদয়হীন পাষাণ, একবারও ভাবে না, চিন্তা করে না, ননীর কত বড় ক্ষতি সে করেছে। উচিত তাকেই বৈরিণী বলে ভাববার অধিকার সে লোকটির আছে বৈকি। সে অধিকার তোমাকে আমি দিলুম।"

(১১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কাছে বেঞ্চিতে এসে বসলেন। বললেন, শর্ট্‌হ্যাণ্ডের কিছু কাজ ছিল, আমি কি নেব। আমি একটু অবাক হলুম, কারণ আমার শীত্‌ ছিল না এবং সেকথা বলতে অলখিন বললেন যে শীত্‌ অত দরকার নেই। এবং তাঁর বাসনা যে কাজটা আমাকে দিয়েই হবে।

আমি ভেবে দেখলাম যে নেওয়াই উচিত। সেই 'সিক্‌স্‌টিতে' [সেটা ১৮৬৬ সাল। স. ব.] মেয়েদের উপার্জন থাকবে, তারা স্বাধীন হবে, এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আমার মত মেয়েদের আর কিছু ছিল না। তাছাড়া কাজ এবং টাকার জন্যই ত ক্লাস—শর্ট্‌হ্যাণ্ড।

অলখিন বললেন, বিখ্যাত লেখক ডস্টয়েভ্‌স্কি খুব তাড়াতাড়ি নাকি একটা বই শেষ করতে চান, সেজন্য একজন স্টেনো দরকার। কত বড় বই, কত সময় লাগতে পারে, কী পারিশ্রমিক, ইত্যাদি যা ডস্টয়েভ্‌স্কি তাঁকে-জানিয়েছিলেন সব বলে অলখিন বললেন, 'কী ভাবছ। নেবে।'

বললুম, 'নেব।'

'খুব ভাল কথা।'

ভাঁজকরা একখানি কাগজে ডস্টয়েভ্‌স্কির ঠিকানা লেখা ছিল। কাগজখানি আমার হাতে দিয়ে অলখিন বললেন, কাল ঠিক সাড়ে এগারটায় তুমি এই ঠিকানায় গিয়ে ডস্টয়েভ্‌স্কির সঙ্গে দেখা করছ। ঠিক সাড়ে এগারটা, ভাল করে শুনে নাও, খোদ লেখকের ভাষা: আগেও না, পরেও না,—বুঝেছ ত। আমার কেবল ভয় যে তুমি আবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে না বন্ধুত্ব করে বসো। যা রুক্ষ এবং বিষণ্ণ-প্রকৃতির মানুষ ভদ্রলোক।'

অলখিনের কথায় আমার হাসি এসে গেল।

'বন্ধুত্ব আমার কী। আমি কাজ নিয়ে যাচ্ছি, দেখব যে কাজটা যেন ভাল হয়। তাছাড়া ডস্টয়েভ্‌স্কি,—বাবা, অতবড় লেখক। নাম শুনেই ত ভয় লাগে। এখন কি এখনই আমার কিরকম ভয় লেগে যাচ্ছে।'

যাক, সেদিন ত ক্লাস-টুলাস সব আমার মাথায় উঠে গেল। এমন কি সারারাত্রি চিন্তেজনায় আমি ঘুমতে পর্যন্ত পারলাম না। মনে পড়ল যে বাবা ডস্টয়েভ্‌স্কির লেখা কীরকম ভালবাসতেন। এবং এ বাড়িতে ডস্টয়েভ্‌স্কির নাম আমিও খুব ছোট থেকেই শুনে আসছি। তাঁর লেখার আমিও কী একজন কম ভক্ত! মনে পড়ল তাঁর 'মেমরাস্‌ ফ্রম্‌ দি ডেড্‌ হাউস' পড়ে কত কেঁদেছি। এবং সেই লেখক। সেই ডস্টয়েভ্‌স্কি।

এ হেন ডস্টয়েভ্‌স্কির সঙ্গে আবার শুধুমাত্র যৌথিক পরিচয়ই না, তাঁর সঙ্গে কাজ, ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর লেখার সাহায্য,—ওঃ! এত বড় সৌভাগ্য, এত সুখ, আমি যেন কল্পনা করতে পারলাম না।

ডস্টয়েভ্‌স্কিকে দেখিনি। কিন্তু যেহেতু তিনি আমার বাবার সমসাময়িক, আমি তাঁকে একজন প্রবীণ ভদ্রলোকের চেহারায় কল্পনা করতে লাগলাম। একবার মনে হল যে তিনি বেঁটে খুট। মাথায় টাক। কিন্তু সে চেহারাটা আমার পছন্দ হলনা। আমি দেখতে লাগলাম তিনি রোগা এবং লম্বা,—কিন্তু সবসময়ই বিষণ্ণ, ভীষণ রুক্ষ। ঠিক অলখিন যেরকম বর্ণনা করেছিলেন। তারপর কল্পনায় তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলতে লাগলাম। এবং তারপর কালকের কথা ভেবে আমার বাস্তবিকই ভয় হল। এত বড় লেখক, এত জ্ঞান,—সর্বনাশ—আমি ত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতেই পারব না। তারপর তাঁর চরিত্রদের নামও সব আমার মনে নেই, এবং সে সব কথা কি না উঠে পারবে।

সেসবদিনের কথা মনে করলে আজো আমার খুব কৌতুক লাগে ভাবতে যে আমার ঐ রেসপেক্টেবল্‌ বুড়ি সত্ত্বেও আমি তখন কী বোকা আর গ্রাম্যই ছিলুম। কিন্তু

আগে ত কোনো লেখককে দেখিনি, দেখার কথাও না,—সেইজন্যই মনে হত যে লেখকরা কখনই সাধারণ মানুষদের মত নন,—হতে পারেন না,—এবং সাধারণভাবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলা চলে না।

যাই হোক, সে রাত্রিটা ত কাটল এবং পরদিন বেশ একটু সময় থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়া গেল। অলখিনের মুখে ভস্‌টরেভ্‌স্কির কথাটা আমার মনে ছিল: আগেও না, পরেও না,—ঠিক সাড়ে এগারটা। ঘটেই ত। কত কাজ ওঁদের,—সময়ের কত দাম!

দোকান থেকে নূতন এক সেট পেনসিল কিনে সঙ্গে নিলাম, আর একটা পোর্টফোলিও। কারণ আমার যা বয়স এবং যেরকম সবুজ দেখায় আমাকে, মনে হল যে একটা পোর্টফোলিও সঙ্গে না থাকলে ঠিক কাজের লোক বলে ধরা দিবে না।

তারপর ভস্‌টরেভ্‌স্কির বাড়ি।

বাড়িটা প্রকাণ্ড এবং একেবারেই ভাল নয়। বিস্তর ফ্ল্যাট এবং নানারকম লোক, সব সাধারণ মিস্ত্রী এবং কারিগর শ্রেণীর মানুষ। এবং দেখেই আমার 'ক্রাইম এ্যাণ্ড্‌ পানিশ্‌মেণ্টের' বাড়িটার কথা মনে পড়ল, যে বাড়িটায় নায়ক থাকত। আর ঠিক সেই সময়েই নোংরা বিশ্রী সিঁড়িটা দিয়ে, সেটা দিয়ে চারতলায় ভস্‌টরেভ্‌স্কির ফ্ল্যাটে উঠতে হয়, দু তিন জন সন্দেহজনক চেহারার লোক নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করতে করতে নেমে গেল।

এবং ভস্‌টরেভ্‌স্কির দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার 'ক্রাইম এ্যাণ্ড্‌ পানিশ্‌মেণ্টের' সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমি যেন কিরকম হকচকিয়ে গেলাম। যে দাসী দরজা খুলল, তার গায়ে ক্রাইম এ্যাণ্ড্‌ পানিশ্‌মেণ্টের সেই সবুজ ছককাটা শাল, যেটার কথা আমি এই সেদিন পড়েছি, এবং বইটা এত অল্পদিন আগে পড়ার জন্যই সমস্ত আমার এত পরিষ্কার মনে ছিল যে চোখের সামনে সব ছিলে যেতে যেতে—আমি যেন কীরকম একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়তে লাগলাম।

৪

ভিতরে গিয়ে বসার আর কিছু পরেই ভস্‌টরেভ্‌স্কি দেখা দিলেন এবং আমাকে তাঁর স্টাডিতে গিয়ে বসতে বলে, নিজে অন্য একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পরে বুঝলুম যে চায়ের জন্য গিয়েছিলেন।

ভস্‌টরেভ্‌স্কির স্টাডিতে এসে বসলাম।

ঘর বেশ বড়ই,—দুটো জানালা, এবং সেদিন ঘরে বেশ আলো থাকলেও অন্যদিন কিন্তু ঘরটা কিরকম ঠাণ্ডা চুপচাপ এবং বিষণ্ণ মনে হত,—কিছুই না, তবুও ঘরের এই ভাবটা মনের ভিতর কেমন যেন বিশ্রী একটা অস্বস্তি জাগিয়ে দিত। ঘরের আসবাব পত্রও যা চোখলাম সবই সাধারণ। দুই জানালার মাঝখানে দেওয়ালে কালো ওয়ল্‌নাট ফ্রেমের বেশ বড় একটা আয়না, ওদিকে ঐ ফ্রেমেরই একটা ছবি—ছবিটা এক মহিলার, মহিলাটি আশ্চর্যরকম রোগা, এবং কালো পোষাক পরা। ছবির ঠিক নীচেই বেঞ্চনি ঢাকা পরানো পুরনো একটা কৌচ, তার সামনে লাল ঢাকনি লাগানো গোল একটি টেবিল, টেবিলে বাতি এবং কয়েকটা অ্যালবাম,—টেবিলটি ঘিরে ইজিচেয়ার এবং টুল। এই হল আসবাব এবং দেখেই বোঝা গেল যে এ ঘরে কেউ আসে না এবং যদিও আসে, তার রুচি বলে বালাই নেই। ঘরের ওপাশে পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে একটা লেখার টেবিল, এবং পরে ঘরময় ঐ টেবিলে বসেই আমি ভস্‌টরেভ্‌স্কির ডিক্টেশন্‌ নিয়েছি। ঘর ত দেখা হল, এখন কি করা যায়। সেই ভদ্রমহিলার ছবির দিকে চোখ গেল এবং ভাবলাম ইনি নিশ্চয় ভস্‌টরেভ্‌স্কির স্ত্রী। এবং আর কী! এবার বাজনের

আপনার ত্বকও

চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে

অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী সৌন্দর্য্যের জন্যে কি করেন শুনুন। "আমার ত্বক মসৃণ ও কোমল রাখার জন্যে," তিনি বলেন "আমি প্রতিদিন লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি।" স্নানে ও হাতমুখ ধুতে লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করা যতই আনন্দদায়ক—লাক্স সাবানই এত কোমল, এত সুগন্ধী। আপনিও আজ থেকেই লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিতে আরম্ভ করুন না কেন?

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স

টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

[illegible] BO

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

গলা শুনব, কিম্বা তারা হয়ত ধমাধম ডাম পিটবে এবং তারপর ছবির ঐ অসভ্য রোগা মহিলাটি দরজা খুলে আস্তে আস্তে আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন।

কিন্তু তিনি না, ভন্‌ টরেন্‌ডিই দরজা ঠেলে ভিতরে এসে বসলেন। তাঁর প্রথম কথা হল, শর্ট্‌হ্যাণ্ড আমি কতদিন শিখছি।

বললুম, 'ছ মাস।'

'তোমাদের মাস্টার অলধিনের ছাত্রছাত্রী কিরকম। প্রচুর।'

বললুম, 'না, প্রচুর না। তবে প্রথম এ্যাপ্লিকেশন পড়েছিল অনেক, প্রায় দেড়শ, তারপর কমতে কমতে এখন পঁচিশ দাঁড়িয়েছে।'

'বলো কী!'

'হ্যাঁ। ওরা বোধহয় ভাবেনি যে শর্ট্‌হ্যাণ্ড পরে এত কঠিন হবে।'

ভন্‌ টরেন্‌ডি বললেন, 'তাইই। এবং আমাদের সব নূতন কাজেই এই। প্রথমে দেখবে খুব উৎসাহ তারপর সব ঠাণ্ডা। এদের দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবার উপায় নেই।'

প্রথম দৃষ্টিতে অবশ্য তাঁকে বেশ প্রবীণই মনে হয় কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে চোখে পড়ে যে তাঁর বয়স বেশি নয়, খুব বেশি হয় ত সাঁইত্রিশ। আকার মাঝারি, কিন্তু খুব রুক্ষ। চুল বাদামি, কিম্বা সামান্য লাল, কিন্তু ভারি পরিপাটি। দুটি চোখের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই: একচোখের মনি কিছু বড় এবং সেজন্য দৃষ্টিটা কিরকম রহস্যময় মনে হয়। কিন্তু ভন্‌ টরেন্‌ডির মুখ আমার একেবারেই অপরিচিত লাগল না,—এর কারণ অবশ্য এই হতে পারে যে তাঁর ছবি আমি আগেই দেখেছিলাম। তাঁর গায়ে নীল পুরনো একটা জ্যাকেট, কিন্তু নীচের শার্ট বরফের মত শাদা। এবং সত্যি বলতে কি, প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে আমার একেবারেই ভাল লাগল না।

তারপর চা এল।

চা আমার ইচ্ছা করল না, গরমও, কিন্তু চোখে পড়বে এই ভয়ে কিছু না বলে চা' টা আমি খেয়ে ফেললাম। আমি দেওয়াল ঘেঁষে সেখার টেবিলটার কাছে বসেছিলাম, ভন্‌ টরেন্‌ডি ওদিকের অন্য টেবিলটায়। কিন্তু তিনি যেন অস্থির। একবার বসছেন, একবার উঠে হয়ত পায়চারি সুরু হল, কিন্তু মুখে সবসময়ই সিগারেট, কেবলই সেটি ফেলে দিয়ে নূতন আর একটা ধরিয়ে নিচ্ছেন। এক-সময় আমার আমাকে একটা অনুরোধ করে বসলেন। আমি 'না' বললাম।

'নিশ্চয় আমার সামনে বসে খেতে চাইছ না।'

বললুম, 'না। আমি খাই না। এবং মেয়েদের মুখে সিগারেট আমার ভাল লাগে না।'

নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চলতে লাগল এবং যত সময় গেল ততই ভন্‌ টরেন্‌ডিকে আমার অদ্ভুত লাগতে লাগল। ভদ্রলোক যে পীড়িত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার মনে হল অপরিসীম ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। হঠাৎ তিনি বললেন যে তিনি অসুস্থ,—তাঁর দুরী রোগ আছে। এবং কাজের কথায় খুব একটা তাগাদা উত্তর দিলেন: 'আচ্ছা দেখা যাবে,—যা হবে তখন,—চালিয়ে নেওয়া যাবে কোনোরকম করে—'

এবং আমি ত কিছুতেই ভেবে পেলুম না তা সম্ভব হবে কী করে। এমন কি আমার সন্দেহ হল যে ভন্‌ টরেন্‌ডি নিজেই এখনো কিছু ভেবে উঠতে পারেন নি। হয়ত এইভাবে তাঁর সুবিধা হবে না এবং এই ইচ্ছাটাই তিনি হয়ত বাতিল করে দেবেন। কথাটা সহজ করার জন্য তাই আমি বললাম, 'আসুন না, আমরা বরং একবার চেষ্টা করেই দেখি। যদি আপনি সুবিধা না পান, অবশ্যই আমার কিছু মনে করার থাকবে না।'

উত্তরে ডস্টয়েভ্‌স্কি বললেন, 'তোমার নাম কী।' নাম বললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ভুলে গেলেন। আবার বললাম। তারপর নানা কথাবার্তার সময় বেজে লাগল এবং অবশেষে একটা বই থেকে তিনি ডিক্টেশন দিলেন।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বললেন যে আমাকে বাধা দিতেই হল। বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি বললে হবে কী করে। সাধারণ কথা বলার মত বলুন।' তারপর বললেন লেখাটা লেখানেই নকল করে দিতে।

দিলুম, এবং বেশ তাড়াতাড়িই দিলুম কিন্তু তিনি সর্বক্ষণ পিছন থেকে তাড়া দিতে লাগলেন এবং আমি এত আস্তে লিখি দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। অদ্ভুত ত! আমি বললুম যে নকলের কাজ আমি ত বাড়িতে বসে করব, সুতরাং তাতে সময় লাগলে তাঁর কী। লেখাটার দিকে তাকিয়ে তিনি দুটো ভুল বার করে দিলেন,—একটা পূর্ণচ্ছেদ আর একটা উচ্চারণচিহ্ন বসেনি,—এবং সেসম্বন্ধে কড়া মন্তব্য করতেও কসুর করলেন না। অদ্ভুত লোক। অধৈর্য এবং অসহিষ্ণু ত বটেই, বেশ রুক্ষ এবং কটুভাষীও। মনে হল যে মনেমনে চিন্তাগুলো তিনি ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। কয়েকবারই এমন হল যে তিনি হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা করে উত্তর না শুনেই পায়চারি করতে সুরু করলেন এবং প্রশ্নটা ভুলে গেলেন। ওঁকে বিরক্ত করা হবে এই ভয়ে আমি একভাবেই কাঠ হয়ে বসে রইলাম। তারপর তাঁর মনে হল যে এখন আর ডিক্টেশন নেওয়া সম্ভব নয়, আমি যদি রাত্রি আটটার সময়ে আসতে পারি ত তখন নকলের কাজ সুরু হবে। আমার অবশ্যই অসুবিধা ছিল, কারণ অত রাত্রে বাড়ি ফেরা মুস্কিল হতে পারে, তবুও রাজী হলাম কারণ এ ভাবে কাজটা নষ্ট হয় আমার ইচ্ছা ছিল না।

যখন চলে আসছি, ডস্টয়েভ্‌স্কি বললেন, 'আপনি, তোমাদের অলখিন যখন বললেন যে তিনি একজন মেয়ে-স্টেনোগ্রাফার দেবেন, ছেলে নয়, আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম। তোমার বোধহয় আশ্চর্য লাগছে, মনে হচ্ছে, কেন!'

'কেন!' আমি বললাম।

'এই জন্যই যে একজন ছেলে মানেই তার একটু পান-দোষ থাকবে। কিন্তু তুমি,—আশা করি তোমার সম্বন্ধে সেরকম কোনো কথা ওঠে না।'

শুনে আমার এমন মজা লাগল যে আমি হাসি শব্দ করে হেসে উঠলাম। বললাম, 'না। নিশ্চয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

[ক্রমশঃ]

(১২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দুনিয়ায় দেখা দিল এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া। যে ভাগ্য ঘটল হিরোশীমার এবং তারপরে নাগাসাকীর সে ভাগ্য তো ঘটতে পারে লণ্ডনের, ওয়াশিংটনের, মস্কোরও। যে দুর্দৈবের উদয় হল পৃথিবীতে, যে ভৈরবের রুদ্র-শক্তি মূর্ত হয়ে এলো মানুষের হাতেই দুনিয়ার কি করবে তা নিয়ে পৃথিবীর মানুষ। বুঝি এই প্রশ্নের উত্তরে স্তব্ধ হয়ে যাবে মানুষের সমাজ। যদি এই যজ্ঞকে অবিলম্বে সংবরণ করা না যায় তা' হলে বুঝি এর নির্মম ক্ষুধা থেকে রেহাই পাবে না কেউ। একদিকে হিরোশীমা-নাগাসাকীর বুকফাটা আর্তনাদ, আরেকদিকে চরম সংহারের মহাত্রাস। বিশ্বের মানব সমাজে অনুশোচনার সঙ্গে উঠল আতঙ্কের ধ্বনি।

যুদ্ধের সময় স্বাধীন বিশ্বের সমস্ত পরমাণু বিজ্ঞানীরা গিয়ে জড় হয়েছিলেন আমেরিকায়—পরমাণু বোমার প্রস্তুতি পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য। হিরোশীমার তাণ্ডব দেখে পরমাণু বিজ্ঞানীরা সবাই আমেরিকার কাছে আবেদন করলেন—আর নয়। সুপার বোমার প্রোগ্রাম এখন বন্ধ কর। পরমাণু বোমার প্রস্তুতি পরিকল্পনার নেতা ডাঃ ওপেনহাইমার 'কেঁদে ফেললেন' প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সামনে এবং বললেন আন্তরিক কণ্ঠে, "বিজ্ঞানীদের হাতও আজ রক্ত মাখা।" বহু বিজ্ঞানী বললেন পরমাণু বোমার যদি কিছু পুঁজি বাকী থেকে থাকে তার সব এখনই ডুবিয়ে দাও প্রশান্ত মহাসাগরে। আর তুলে দাও পরমাণু বোমার সমস্ত কারখানা।

পরমাণুর প্রতিযোগিতা

আমেরিকার বিবেক যেন ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হল। প্রায় তিন বছর অনেকটা কাজ বইল আমেরিকার পরমাণু পরিকল্পনা। কিন্তু বিবেকের সব আবেদন মুহূর্তের মধ্যে ব্যর্থ হয়ে গেল একটি ঘটনায়। '৪৮ সালে সংবাদ এলো রাশিয়াও পরমাণু বোমা নির্মাণে সক্ষম। যেন কী মহাত্রাসে উন্মত্ত হয়ে উঠল মার্কিন রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবোধ। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সরকারী ফর্মান জারী করলেন—যত অর্থ, যত শক্তি সব প্রয়োগ করেও তৈরী করতে হবে অতি-পরমাণু বোমা। ডাঃ এডোয়ার্ড টেলারের মত সব সময়ই ছিল হাইড্রোজেন বোমার পক্ষে। অনেক বিজ্ঞানী বাধা দিলেন, পিছিয়ে রইলেন অতি-পরমাণু বোমার প্রোগ্রাম থেকে। কিন্তু ডাঃ টেলার সফল হলেন দু'তিন বছরের মধ্যেই। হাইড্রোজেন স্তূপে তিনি জালিয়ে দিলেন পরমাণু বোমা। প্রলয়ঙ্কর প্রতাপে বিস্ফোরিত হল হাইড্রোজেন পরমাণু। তৈরী হল প্রথম অতি-পরমাণু বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা।

আমেরিকা আরম্ভ হল। তখন পরমাণু অস্ত্রের উপরে অনেক বেশি আধিপত্য হল আমেরিকার। পরমাণু বোমা দিয়ে অতি-পরমাণু বোমার মুখামুখি সমতে যাওয়া পাবে না আর রাশিয়া। বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকার প্রভুত্ব থাকবে অক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এই আধিপত্য ও নিরাপত্তার আশাও ছাই পড়ল একবছরের মধ্যেই। রাশিয়াও সাইবেরিয়াতে বিরাট করল একটি হাইড্রোজেন বা অতি-পরমাণু বোমা। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মালেনকফ খবরটা জানিয়ে দিলেন দুনিয়াকে—রাশিয়াও হাইড্রোজেন বিস্ফোরণের কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু পরমাণু বোমা নয়, অতি-পরমাণু বোমার উপরেও, আমেরিকার একচাটিয়া সত্ত্বা শেষ হয়ে গেল। '৪৪ সালের পরে আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই হল পরমাণু অস্ত্রের সম-অধিকারী। বৃটেনও এখন পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সমান তালে এগিয়ে এসেছে। বস্তুত, পরমাণু অস্ত্রের প্রস্তুতি এখন কোন অতি-গোপনীয় রহস্য নয়। যে রাষ্ট্রের যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক কারিগর আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে

অপরিমিত অর্থবল সেই রাষ্ট্রের পক্ষেই এখন পরমাণু-অস্ত্র তৈরী করা সম্ভব। পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগীতার অর্থ হল এখন কোন্ রাষ্ট্র কত বেশি পরিমাণে পরমাণবিক বিস্ফোরকের পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে এবং পরমাণু বিস্ফোরণের কত নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া—এখন সবাই পরমাণু ও অতি-পরমাণু তথা হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ করতে পারে। শুধু সংখ্যায় একের পুঁজি অন্যের চেয়ে হতে পারে কম বেশি।

কী এই রুদ্র ভৈরব!

পরমাণু অস্ত্রের নামে বিশ্ব আজ সন্ত্রস্ত। বিশ্ব যুদ্ধের ধোঁয়া-ধুলা মেঘা মিলাই আহি আহি ডাক ওঠে সারা পৃথিবীতে। পরমাণু বোমার নামে কেন এত বিভীষিকার এই করাল ত্রাস? হিরোশীমার স্মৃতি মানুষের বুকে আতঙ্ক জাগায়। কিন্তু এ স্মৃতিও কিছু নয়। মহাপ্রলয়ের যে সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছে হাইড্রোজেন বোমার তার বিস্ফোরণ যদি রুদ্ধ হয় তা' হলে এই রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডব নৃত্য থেকে রেহাই নেই মানব সভ্যতার।

কী যে এই পরমাণুর প্রতাপ একটু সংকেত মেলা যাক এবার। অঙ্গার পুড়ে আগুন জ্বলে। তাই যে পদার্থে আছে অঙ্গার সেই পদার্থেই জ্বলে আগুন। যত তাড়াতাড়ি জ্বালান যায় অঙ্গার তত বাপট দে আগুনের। সাধারণ বোমা সাধারণ আগুনেরই কীর্তি। সাধারণ বোমা যখন ফাটে তখন বিস্ফোরক পদার্থের অঙ্গারের সঙ্গে সংযোগ ঘটে অক্সিজেনের। এরূপ সংযোগে পদার্থের পরমাণুরা একধরণের জোট বন্ধন ভেঙে আরেক-রকমের জোট-বাঁধে। পরমাণুর এই জোট বাঁধার ধরণের উপরেই নির্ভর করে আগুনের তেজ। সাধারণ আগুনের এমনি প্রক্রিয়া হল রাসায়নিক প্রক্রিয়া। সাধারণ আগুন তাই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল।

কিন্তু পরমাণবিক আগুন? পরমাণুর আগুনের জন্য অঙ্গারের প্রয়োজন নেই, অক্সিজেনেরও প্রয়োজন নেই। পরমাণুর আগুন জ্বলে পরমাণুর বিধ্বংসে। পরমাণু বোমার যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন পরমাণুর মূল পদার্থের একটা অংশ আদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই এমনি পরমাণবিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় অতি-রাসায়নিক প্রক্রিয়া। সাধারণ আগুন জ্বালার সময় পরমাণুরা যাকে সম্পূর্ণ অক্ষত। কিন্তু পরমাণুর আগুন জ্বলে পরমাণুর মূল পদার্থ ক্ষয় হয়ে যায়। সূর্যের কাছে উনুনের আগুন যেমন কিছু নয়, তেমনি কিছু নয় পরমাণুর আগুনের কাছে সাধারণ আগুন এক কথা কয়লা জ্বালিয়ে যদি মিলে ১০ হাজার আগুন তা' হলে সেই কয়লার পরমাণু কণাগুলিকেই বিদীর্ণ করে পরমাণুর আগুন পাওয়া যাবে ১১০০,০০০,০০০ হাজার। অর্থাৎ পরমাণুর আগুনের তেজ সাধারণ আগুনের চেয়ে এগার কোটি গুণ বেশি। এই শক্তিই হল পৃথিবীর আদি শক্তি। এই শক্তির লীলা চলছে এখনও নীহারিকায়, নক্ষত্রে। আমাদের সূর্যের বুকেও আগুন জ্বলে এমনি পরমাণুর আদি শক্তিতে। কেন পরমাণুর হাতে প্রলয় পিনাকীর আমন্ত্রণ তারই সংকেত পরমাণুর আগুনের এই অতি-তেজ।

কোন্ বিস্ফোরণের কত তেজ

গত মহাযুদ্ধে প্রচণ্ডতম যে বোমা ব্যবহার করা হয় তার নাম 'ব্লক বাষ্টার'। এই বোমায় থাকে ১৪০ মণ টি, এন, টি বিস্ফোরক। ডিনামাইটে ব্যবহার করা হয় টি, এন, টি বিস্ফোরক। গত মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতম বোমার তুলনায় প্রথম পরমাণু বোমা অর্থাৎ হিরোশীমা বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল কত? হিরোশীমা বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল ৫৫০,০০০ মণ টি, এন, টির সমান। হিরোশীমার পরে পরমাণুর বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা আরও পঁচিশ গুণ বাড়ান সম্ভব হয়েছে।

আর হাইড্রোজেন বোমা? প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটির বিস্ফোরণে যে কী তাণ্ডব ঘটেছে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে তার বিবরণ জানিয়েছে আমেরিকার পরমাণবিক কমিশন। বোমাটি ফাটান হয় এ্যালিওয়েটক দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে। রিপোর্টে জানা যায় প্রথম হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে—"যে দ্বীপটিতে বোমা বিস্ফোরণ করা হয় সেই দ্বীপটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সমুদ্রের তলায় এক মাইল লম্বা এবং ১৭৫ফিট গভীর একটি খাদ তৈরী হয়। বোমা বিস্ফোরণের চার সেকেণ্ডের মধ্যে সাড়ে তিন মাইল ব্যাসের একটি অগ্নি গোলক সৃষ্টি হয়। দশ মিনিট পরে দেখা যায় ২৫ মাইল উঁচু আর ১০০ মাইল লম্বা একটি মেঘের ছাতা তৈরী হয়েছে আকাশে। হিসাব করে দেখা যায় এই হাইড্রোজেন বোমাটির বিস্ফোরণ ক্ষমতা ৮২,০০০,০০০ মণ টি, এন, টির সমান অর্থাৎ গত মহাযুদ্ধে জার্মানী ও জাপানের উপর যতবোমা ফেলা হয়েছে এই একটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরক ক্ষমতা তার সমান"। এই হাইড্রোজেন বোমাটিও নাকি একটি শিশু অতি-পরমাণু বোমা মাত্র।

পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা

পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা উভয়েই মূলত অভিন্ন। পরমাণু বোমাকে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম অথবা 'ফিশন' বোমা বলা হয়। পরমাণু বোমার বিস্ফোরক পদার্থ হল ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের ন্যায় ভারী পরমাণু। বিস্ফোরণের সময় এই পরমাণুগুলি ভেঙে যায়। পরমাণু ভাঙার কাজটি করা হয় নিউট্রন বর্ষণ করে। এমনি ভারী পরমাণুগুলি ভাঙার সময় পরমাণুর কিছুটা পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হাইড্রোজেন বোমাকে অতি পরমাণু অথবা থার্মো-নিউক্লিয়ার বা 'ফিশন' বোমাও বলা হয়। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরক হাইড্রোজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণু বিস্ফোরণের সময় ভাঙে না, বরং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু জোড়া লেগে হিলিয়াম নামের ভারী পরমাণু তৈরী হয়। এমনি জোড়া লাগার জন্য প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন। এই তাপ এত প্রচণ্ড যে সূর্যের বুকেও এত প্রচণ্ড তাপ নেই। এই তাপ সৃষ্টি করা হয় হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে একটি পরমাণু বোমা ফাটিয়ে। বস্তুত, পরমাণু বোমাকে ব্যবহার করা হয় হাইড্রোজেন বোমার সলতে রূপে।

পরমাণু বোমা ইচ্ছেমত বড় করে তৈরী করা যায় না। পরমাণু বোমার বিস্ফোরক একটা বিশেষ আকারে জড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বতস্ফূর্তভাবে ফেটে যায়। তাই কোনক্রমেই পরমাণু বোমাকে একটা বিশেষ আকারের চেয়ে বড় করে তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার আকারে কোন সীমা পরিসীমা নেই। কারিগরী ক্ষমতার যোগ্যতা অনুযায়ী যত বড় করে ইচ্ছে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা যায়। হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরক পরমাণু বোমার বিস্ফোরকের চেয়ে কম ভারী। হাইড্রোজেন বোমা তাই এত মারাত্মক। বর্তমান কারিগরী ক্ষমতা অনুযায়ী ১২৫,০০০,০০০ মণ টি, এন, টি বিস্ফোরকের সমান ওজনে এক একটি হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা যায়।

তিন স্তরের রক্ত তাপট

গত মহাযুদ্ধের প্রথম দানব ব্লকবাষ্টার এবং শেষের দানব পরমাণু বোমা। এই পরমাণু বোমার তাপট হল চার হাজার ব্লকবাষ্টার বোমার সমান। গত চার বছরে যে আরেকটি দানবের জন্ম হয়েছে তাই হাইড্রোজেন বোমা। এই হাইড্রোজেন বোমা হল দুই হাজার দুই শ' পঞ্চাশটি পরমাণু বোমার সমান। আর ব্লক বাষ্টার—যা ছিল গত মহাযুদ্ধের সবচেয়ে

প্রচণ্ড কেমিকেল বোমা—সেই প্রচণ্ড বোমাটির তুলনায় একটি হাইড্রোজেন বোমার দাপট কত? নব্বই লক্ষ ব্লক ষাটার বোমা একত্র করে একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটালে তবে বিস্ফোরণ ঘটবে একটি হাইড্রোজেন বোমার। বিশেষজ্ঞেরা বলেন একটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটলে বিস্ফোরণ কেন্দ্রের পাঁচ থেকে দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই ধ্বংসের বিস্তৃতি ঘটবে ত্রিশ মাইল ব্যাসার্ধ পর্যন্ত। ওয়াশিংটন, লণ্ডন, মস্কো—মানব সভ্যতার এই গর্ব-চূড়াগুলি এক একটি হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে একেবারে ধূলায় লুটিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বিষ-নিশ্বাসন

বিস্ফোরণে বিধ্বংস ঘটে তাপ ও বাতাসে। সাধারণ, হাই বা অতি-পরমাণু সবরকম বোমার ধ্বংসের এই একই কারণ। পরমাণু-বোমার তাপ ও বাতাসের ক্ষমতা অকল্পনীয় মাত্রায় বেশি।

কিন্তু পরমাণু বোমার দ্বিতীয়িকার পিছনে রয়েছে আরও একটি মারাত্মক কারণ। ইউরেনিয়াম বা হাইড্রোজেন—যে কোন পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে তাপ ও বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্লাবন। বোমার খোল যদি কোবল্টের মত ধাতু দিয়ে তৈরী করা হয় তা' হলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড পরিমাণে। এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি মারাত্মক ভাবে বিষাক্ত। এই বিষক্রিয়া স্থায়ী থাকে বছরের পর বছর। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্রোতধারার সঙ্গে এই বিষ-রশ্মি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। যথেষ্ট পরিমাণে এই বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়ার ছড়িয়ে পড়ার অর্থ যেখানে এই তেজ বাষ্পের সঙ্গে জীবিত প্রাণীর ঘটবে সংস্পর্শ সেখানেই প্রাণ হবে নিশ্চিহ্ন। পরমাণু অস্ত্রের এই তেজ বাষ্পের কথা মনে করেই ডাঃ আইনষ্টাইন বিশ্বমানবতাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে পরমাণু অস্ত্র যদি নিরোধ করা না যায় তবে, "ধীরে ধীরে এক চরম বিনাশের দিকে এগিয়ে যাবে বিশ্বের মানব সমাজ।"

বাঁচবার পথ কি?

ডাঃ এনরিকো ফার্মিকে পরমাণু বোমার পিতা বলা যায়। তারই মৌলিক গবেষণার ফলে পরমাণুর আগুন জ্বালান সম্ভব হয়েছে। অতি পরমাণু বোমার প্রোগ্রামের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বের পরমাণবিক শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "অতি পরমাণবিক অস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাই এরূপ অস্ত্রের অস্তিত্ব এবং এরূপ অস্ত্র গঠনের জ্ঞান পর্যন্ত সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।"

কিন্তু হায়! পরমাণবিক শক্তি অর্জনের জ্ঞান বিস্মৃত হওয়া বিজ্ঞানের পক্ষে আজ আর সম্ভব নয়। তেমনি সম্ভব নয় পরমাণবিক পুঁজিকে বিসর্জন দেওয়া। পরমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করারও বিশেষ কোন কার্যকরী মূল্য নেই। পরমাণবিক "রি-এ্যাকটার" ও পরমাণবিক পাওয়ারের জন্যও পরমাণবিক জ্বালানীর প্রয়োজন। এবং পরমাণবিক জ্বালানী মজুদ থাকলে যে কোন সময় সেই জ্বালানী দিয়ে পরমাণবিক অস্ত্র তৈরী করাও সম্ভব। তাই পরমাণবিক শক্তির হাত থেকে মানব সমাজের আর রেহাই নেই। রেডারেও ইলিয়ট সত্যিই বলেছেন, "কোন চুক্তি, কোন ক্ষমতার ভারসাম্য, কোন আন্তর্জাতীয় নিরাপত্তা 'বিধানের ব্যবস্থা' আর আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। সমস্ত প্রশ্নটি আজ এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের বিবেকের কঠিন ভিত্তিতে।"

প্রকৃতির আদি শক্তিকে মানুষ জাগিয়ে তুলেছে। এই শক্তিকে সৃষ্টির পিঞ্জরে ঘুমপাড়ান আর সম্ভব নয়। এই শক্তি এবং শক্তির প্রক্রিয়া আজ এক বাস্তব সত্য। এই শক্তি শুধু নিরবচ্ছিন্ন সরল নয়,—এর ভাণ্ডারে অবশ্যও রয়েছে আশ্চিত পরিমাণে। পরমাণুর শক্তিকে নির্মাণের

কাজে লাগালে সারা বিশ্ব এগিয়ে যাবে এক নতুন সভ্যতায়। পরমাণুর শক্তি যে বিশ্বকে কোথায়, কোন্ প্রগতির চরম শীর্ষে নিয়ে যাবে সেকথা আজ ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে। পরমাণুর শক্তি আজকে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সুনিশ্চিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেই পথে যে ঘটবে পরমাণু-শক্তির অগ্রগতি তাই আজ প্রশ্ন। যদি কোন অকল্প-পূর্ব নৈতিক বিপ্লব ঘটে মানব সমাজের বিবেক-মনে, তবে হয়তো পরমাণুর প্রগতি হবে শান্তির পথে। নয়তো পরমাণু-শক্তির অনিবার্য যাত্রা রাজনীতির কুটিল আবর্তে ঘটাবে নির্মম রক্তপাতের এক দুর্দৈব প্লাবন। পরমাণুর প্রগতি আজ অনিরুদ্ধ। পরমাণবিক সভ্যতার আবির্ভাব ও অগ্রগমনসুনিশ্চিত। এই অবশ্যম্ভাবীকে শুভকল্যাণী আমন্ত্রণে প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র পথ ঐক্যবদ্ধ বিশ্বমানবের সাধ্যসাধনে প্রকৃতির এই আদি-শক্তিকে সর্ব-মঙ্গলের ধাত্রীতে বরণ করে নেওয়া।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.		শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
শ্রীগীতা	৬৲	বাংলার ঋষি	
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৪৷৷০	বাংলার মনীষী	১৷৷০
ভারত-আত্মার বাণী	৫৲	বাংলার বিদুষী	২৷৷০
বুদ্ধবাণী	৷৷০	বীরত্বে বাঙালী	১৷৷০
কর্মবাণী	১৷৷০	ব্যায়ামে বাঙালী	
		বিজ্ঞানে বাঙালী	২৷৷০
মণি বাগচির		রাজর্ষি রামমোহন	১৷৷০
বিদ্যাসাগর	৭৲	রবীন্দ্রনাথ	১৷৷০
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫৲	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১৷৷০
নিবেদিতা	৪৲	আচার্য জগদীশচন্দ্র	১৷৷০
গৌতম বুদ্ধ	৪৲	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১৷৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃ ঃ ১৫ কলেজ স্কোয়ার ঃ ঃ কলিকাতা—১২

(১৭৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকারের দমননীতি এবং উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের মারমুখী নীতির ফলে ছাত্র বিক্ষোভ ব্যাপক ও উগ্ররূপ ধারণ করে। কেরলায় অথবা অন্য প্রদেশে অধিকাংশ স্থানেই শেষ পর্যন্ত সরকার ছাত্রদের দাবীর সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করতে বাধ্য হন, কিন্তু এখানসময়ে এই কাজটি করার পক্ষে সরকারী মর্যাদাবোধ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কেরলাতেও এই মর্যাদাবোধের প্রশ্নেই সমস্যা উগ্র হয়ে ওঠে এবং ছাত্রেরা নির্মম সরকারী নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। সরকারের এই মর্যাদাবোধের উগ্রতার জন্য লখ্‌নৌতেও একটি ছাত্রের অমূল্য প্রাণ গিয়েছে। বিরোধী দলের প্রজাসোস্যালিষ্ট নেতা শ্রীত্রিলোকী সিংহের পরামর্শ শুনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হলে উত্তর প্রদেশের ছাত্র আন্দোলন হয়তো সূচনাতেই শান্ত হত। কিন্তু সরকার সে পরামর্শে কর্ণপাত করেন নি।

বর্ধিত বেতন হারের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলায় ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই যদি সুবিবেচনার পরিচয় না দেন তা' হলে পশ্চিম বঙ্গেও একটি অনভিপ্রেত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কর্পোরেশনের রাজনীতি

কলকাতা কর্পোরেশন যেন ক্রমশঃ বিধান সভা ও লোকসভার ভূমিকা নয়—এমন কি সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। যে সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কর্পোরেশনের একত্তিয়ারের বহির্ভূত যে সমস্ত সমস্যা সাড়ম্বরে কর্পোরেশনে বিতর্কিত হয় এবং বিতর্কের সরগরমে কর্পোরেশনের সভাগৃহে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে তার বাষ্পে বৃহত্তর নাগরিকেরা শ্বাস বোধ না করে পারে না।

বৃহত্তর রাজনীতির প্রশ্ন ছাড়াও কর্পোরেশনের একত্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি নিয়েও কর্পোরেশনের আলোচনা ও বাক বিতণ্ডা যেরূপ স্তরে এবং যেরূপ গোরগোল ও বাক্য বিন্যাসে পরিচালিত হয় তাতে পৌরসভার অভিপ্রেত সুস্থ ও শালীন নীতি যে কি ভাবে ব্যাহত হয় সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া পৌরসভার সভ্যদের একান্ত কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এশিয়ার বৃহত্তম নগরীর পৌরসভার মান যে স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে অ-পৌরুষের মাত্রা অত্যন্ত বেশিভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি বিষয় উল্লেখনীয়। কর্পোরেশনের অনেক দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতার জন্য কমিশনার বি, কে, সেনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। শ্রী বি, কে, সেনকে হাইকোর্টের মহাবতায় অপসারিত করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আশা করি এবার পৌরসভা সম্মিলিত ভাবে পৌরশাসনের উন্নতি ও বিশুদ্ধি সাধনে সক্ষম হবে।

সিনেমার 'বাঘা-যতীন'

প্রথম মহাযুদ্ধের যুগে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সর্বোত্তম তেজস্বী নেতা। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের সমস্ত বিপ্লবী দলগুলি যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং মহাযুদ্ধের সুযোগে জার্মানীর সহায়তায় বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করে ভারতে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবের আয়োজনে অগ্রণী হয়। বৈপ্লবিক চরিত্রে, তেজস্বীতায়, নির্ভীক দুঃসাহসে,. মহান ব্যক্তিত্বে এবং তেমনি আবার প্রবল হৃদয়বত্তায় যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অতুলনীয়। তাই এরূপ এক মহান নেতার জীবনকে চিত্রাকার দেওয়া শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, জাতীয় ভাবোদ্দীপনার জন্য প্রয়োজনীয়ও বটে। সেই দিক থেকে 'বাঘা যতীন' চিত্রটির উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ। যতীন্দ্রনাথের চরিত্র চিত্রণ

এবং বিশেষ করে শেষ সংগ্রাম চিত্রটি দর্শকদের মনে এক গভীর রেখাপাতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্রটি প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও এর ত্রুটিও অনেক। এমন মহান ব্যক্তির চিত্র ও চরিত্র অঙ্কনে চিত্র প্রযোজকদের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যতীন্দ্রনাথের অনেক উক্তি ও অভিব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করেছে। ট্যাগার্টের চরিত্রটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় যতীন্দ্রনাথের চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করেছে। প্রযোজক বৈপ্লবিক হত্যার ঘটনাগুলিকে, জার্মান ষড়যন্ত্রের ঘটনাটিকে, কাবুলের সংগ্রামকে এবং সৈনিক শিবিরের উত্থান প্রয়াসকে কোন কোন জায়গায় একেবারে ছেলেমানুষীতে পরিণত করেছেন। এরূপ এক একটি ঘটনার পিছনে যে কত আয়োজন, কত প্রয়াস ও কত পরিকল্পনা ও পরামর্শ ছিল তার কিছুই চিত্রে প্রতিফলিত হয় নি। কাবুলের উত্থান দেখাবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সেনা-বাহিনীর উত্থান এবং কয়েকদিন পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুরকে জাতীয় বিদ্রোহী বাহিনীর কবলভুক্ত রাখার বীরত্বপূর্ণ কাহিনীটিকে কেন চিত্র কাহিনীতে সংযুক্ত করা হয়নি তা' বোঝা গেল না। অরবিন্দ, তিলক ও বিপিন পালের পরামর্শ সভাটির চিত্র অত্যন্ত কাঁচা হয়েছে। আরো অনেক দিক দিয়ে সতর্ক হলে চিত্রটি সত্যিই প্রবল ভাবে ভাবোদ্দীপক হ'ত। তবুও যাযা-যতীনের প্রযোজকদের প্রয়াস বহুলাংশে সার্থক হয়েছে। এরূপ চিত্র আরও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মহাভারতে সমাজবাদী আদর্শ

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতে সমাজবাদী আদর্শের উপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতার বিষয়টি যেমন মৌলিক তেমনি সময়োপযোগী এবং এ সম্বন্ধে অধ্যাপক চক্রবর্তী এত সুন্দর এবং সাধারণের জ্ঞাতব্য এত তথ্য পরিবেশন করেছেন যে তাঁর ভাষণ শুনে অনেকেই বিস্ময় ঘোষ করেছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাভারত ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞ। আমরা আশাকরি তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়টিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে চিন্তাশীল জনসাধারণের হাতে পৌঁছাবার সুযোগ করে দেবেন।

সমাজবাদী আদর্শ যে একান্ত কোন বৈদেশিক আদর্শ নয়—ভারতের ধর্মবাণীতেই যে সমাজবাদের বেশক আছে—ভারতের জাতীয় জীবনে ও নিয়ত কর্মে সমাজ-বাদকে গড়ে তুলবার জন্য এরূপ আন্দোলনের সন্ধান দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৫।৮।৫৮

৮০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র-এম্‌ডোকেট (৪১-৪, বাদবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

ভারতী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। পঞ্চম সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩৬৫

বর্তমান প্রসঙ্গ

খাদ্য ও সরকার

ভারতের খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এক উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন খাদ্য উৎপাদনের গুরুত্ব সরকার এতকাল ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এগার বছরের স্বাধীনতা এবং দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা এবং দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে এরূপ উক্তি শুধু বিচিত্র ও বিস্ময়কর নয়—মারাত্মকও বটে। ভারতের সমস্ত সমস্যার মূল সমস্যা খাদ্য-সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় দ্রুত খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করা অথচ স্বাধীন ভারতের এগার বছরের প্রতি বছর বাইরে থেকে কোটি কোটি টাকার গম ও চাল কিনে আনার অপরিহার্যতার পরেও নাকি ভারতে খাদ্য-উৎপাদনের গুরুত্ব কংগ্রেস সরকার উপলব্ধি করতে পারেন নি।

ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এবং প্রধানমন্ত্রীর পার্টি খাদ্য-উৎপাদনের এই সমস্যাটির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং খাদ্য-উৎপাদনের পরিকল্পনার অভাবের অন্যতম কারণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন। আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি খাদ্য-সমস্যা সমাধানের আহ্বান। তিনি বারবার একথা বলেছেন যে, ভারত যদি অবিলম্বে খাদ্য-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে না পারে তা' হলে সম্ভাব্য কোন আন্তর্জাতীয় দুর্যোগের পরিস্থিতিতে ভারতে খাদ্যাভাবের এক চরম সঙ্কট দেখা দেবে। তার ফলে এক দিকে ঘটবে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু এবং অন্যদিকে দেখা দিবে গণ-বিক্ষোভের অরাজকতা।

নিয়ন্ত্রণের যুগে ভারত প্রায় ৯০০ কোটি টাকার খাদ্য-শস্য বিদেশ থেকে আমদানী করেছে। এখনও প্রতি বছর ৪৫ কোটি মণ চাল ও গম তথা প্রায় দু'শ থেকে তিন'শ কোটি টাকার খাদ্য-শস্য বিদেশ থেকে আমদানী

করে। এদিকে প্রতি দশ বছরে ভারতে প্রায় সাড়ে চার কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং খাদ্য-উৎপাদনে অবিলম্বে স্বাবলম্বী না হলে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য প্রতি বছর ভারতের কোটি কোটি টাকাই শুধু বিদেশে রপ্তানী হবে না ভারত সর্বদা একটি অনিশ্চিত এবং স্থায়ীত্বহীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের মূল উপায় তিনটি। প্রথমতঃ, ভারতের ভূমিসমস্যার দ্রুত সমাধান করে চাষের জমি চাষীদের হাতে বণ্টন করা, দ্বিতীয়তঃ, চাষের জমিতে জলসেচনের বিস্তৃত ব্যবস্থা করা এবং তৃতীয়তঃ, চাষের যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য চাষীকে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটিতেও এই বিষয় কয়টি যথার্থ গুরুত্ব পায়নি। ভূমিসমস্যার আজো সমাধান হয়নি তথা কৃষক-চাষের জমি পায়নি। কয়েকটি নদীউপত্যকা প্রোজেক্ট গঠিত হয়েছে বটে কিন্তু ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিস্তৃতভাবে চাষের জমিতে জল সরবরাহের দ্রুত ব্যবস্থা হয়নি এবং সমবায় ব্যাংকাদির মাধ্যমে যথাসময়ে কৃষি-ঋণ দানের ব্যবস্থাও অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত।

খাদ্যসমস্যা সমাধানের পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চীন পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার উপরে এক ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু ভারত-সরকার পরিবার পরিকল্পনার উপরে ক্রমশ গুরুত্ব আরোপ করলেও ব্যাপক, দ্রুতর ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিবার পরিকল্পনার কার্যক্রমকে জনসমাজের সাধারণ স্তরে পৌঁছে দেওয়ার বাস্তব উদ্যম গ্রহণ করতে পারেনি।

খাদ্যসমস্যাকে জলগত দৃষ্টিতে না দেখে জাতীয় সমস্যা-রূপে গ্রহণ করার জন্য শ্রীনেহেরু এক আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদন যথার্থ এবং মূলত গ্রহণযোগ্য। কিন্তু খাদ্যসমস্যা সমাধানের বাস্তব এবং কার্যকরী পন্থা গৃহীত না হলে শ্রীনেহেরুর জাতীয় আবেদন রাজনৈতিক ও জাতীয় স্তরে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ট্রাম-ধর্মঘট ও জনসাধারণের দুর্ভোগ

ট্রাম-ধর্মঘটের জন্য জনসাধারণের দুর্ভোগের অন্ত নেই। ট্রাম চলাচলের অভাবে বাসযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই মফস্বলের রুট থেকে অতিরিক্ত বাস আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু বাসযাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। তাই কলকাতাবাসীরা শুধু যাতায়াতের দুর্ভোগেরই সম্মুখীন হয়নি, কলকাতার রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ট্রামধর্মঘট সম্বন্ধে শ্রমিকদের দাবীদাওয়াকে ট্রামকর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক বলেনি, শুধু বলেছে যে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া স্বীকার করে নিতে হলে ট্রামকোম্পানীর যে ব্যয়বৃদ্ধি হবে সে ব্যয়ভার বহন করার মত আর্থিক সামর্থ ট্রামকোম্পানীর নেই। পক্ষান্তরে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে এবং বহু নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ একথা বলেছেন যে ট্রামকোম্পানীর ডিরেক্টার এবং উচ্চতন কর্মচারীদের জন্য এতভাবে এরূপ বিভিন্ন খাতে অর্থের অপচয় হচ্ছে যে ট্রামকোম্পানী কিছুটা মিতব্যয়িতার পন্থা গ্রহণ করলেই শ্রমিকদের ন্যায্যদাবী-দাওয়া স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব।

ট্রামকোম্পানী নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ এমন কি সরকারের পরামর্শ গ্রহণে রাজী নয়। ধর্মঘট অবসানের নাম করে ট্রাম-কোম্পানী এক নয়া পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেছে এবং এই প্রস্তাবকে একমাত্র ভারতীয় ডিরেক্টার শ্রীজ্ঞানদী লাল গোদারের মাধ্যমে ট্রাম কর্মচারী ও জন-সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। নয়া পয়সা প্রবর্তনের সঙ্গে ট্রাম কোম্পানী প্রতি একখানা টিকিটে এক নয়া

পয়সা এরই মধ্যে বৃদ্ধি করে চালু করেছে। এখন আবেক নয়া পয়সা ভাড়া পড় হিসেবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে, নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের মতে ট্রাম কোম্পানী প্রায় ৩৫ থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা লাভ করবে। বলা হয়েছে এই টাকা দিয়ে কোম্পানী শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া পূরণের ব্যবস্থা করবে। শুধু ধর্মঘটের সমাধানই নয় এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি করা না হলে হাওড়া ও বেহালার লাইন তুলে দিতে হবে বলেও ট্রামকোম্পানী হুমকী দিয়েছে।

ট্রাম ধর্মঘটের ফলে জনসাধারণের দুর্ভোগ এক চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু বিলেতে অবস্থিত ট্রামকোম্পানীর ডিরেকটারবর্গ এ সম্বন্ধে অচেতন ও উদাসীন এবং তাদের মনোভাব প্রতিক্রিয়াশীল। ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব অথবা ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্নের সঙ্গে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া মিটানোর প্রশ্নকে সরকার বা ট্রামকর্মচারীরা জড়িত করতে রাজী নয়। জনসাধারণও ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির তীব্র বিরোধী। বিলেতি কোম্পানী আজ জনসাধারণের অসুবিধার প্রতি উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের মনোভাব দেখিয়ে একমাত্র নিজেদের মুনাফা সম্বন্ধে অনমনীয় হয়ে বসে আছে। ট্রামকোম্পানীর এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ও জনসাধারণের স্বার্থের দিক থেকে বিবেচনা করে ট্রামকোম্পানীকে জাতীয়করণ করার বা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের হাতে ট্রামকোম্পানীর পরিচালন ভার অর্পণ করার প্রশ্নটি আজ এক অপরিহার্য গুরুত্ব অর্জন করেছে।

সীমান্ত সংঘাতের রাজনীতি

পাক-ভারত সীমান্ত সংঘাত সীমানার লড়াই এবং এই লড়াইয়ের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে র‍্যাডক্লীফ ও বাগে কমিশনের অস্পষ্ট সীমা রেখার নির্দেশে—এই ছিল এতদিন বিচক্ষণ মহলের ধারণা। কিন্তু শ্রীনেহেরুর সাম্প্রতিক ঘোষণায় সীমান্ত সংঘাতের ঘটনা এক নতুন গুরুত্ব অর্জন করেছে। শ্রীনেহেরু লোকসভায় ঘোষণা করেছেন যে নাগা বিদ্রোহের নেতা ফিজোর বর্তমান ঠিকানা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা সহর। এই একটি তথ্য উদ্‌ঘাটনের ফলে অনেক ঘটনার উপরে আজ নতুন আলোক সম্পাত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

হাজার মাইল পাক-ভারত সীমান্তের বিস্তৃতি সত্ত্বেও কেন প্রধানত পূর্বাঞ্চলে এবং নাগা অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছাকাছি সিলেট, শিলচর ও ত্রিপুরা এলাকায় পাকবাহিনী বারবার হামলা করছে এবং কেন পূর্বাঞ্চলে অতিরিক্ত সংখ্যায় পাকবাহিনী সমাবেশ করা হয়েছে ফিজোর পাকিস্তানে পলায়নের ঘটনা দ্বারা তার তাৎপর্য নতুনভাবে আজ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সীমান্তের সংঘাতের মূল কারণ যতখানি দুই রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ, তার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাজনৈতিক সংঘাত। পশ্চিমাঞ্চলের কাশ্মীর সংঘাত যদি কখনো শীতল লড়াইয়ের বদলে উষ্ণ লড়াইয়ে পরিণত হয় তবে পূর্বাঞ্চলেও যেন একটি সমর ক্ষেত্র খোলা যায় এবং সেই সম্ভাবনাকে কার্যকরী করার জন্য যাতে নাগা বিদ্রোহকে জিইয়ে রাখা যায় তার জন্যই যে সিলেট-কাছাড়-ত্রিপুরা অঞ্চলে অবিরাম পাকিস্তানের হানা চলছে একথা অস্বীকার করা বাস্তবনিষ্ঠার পরিপন্থী হবে বলে আমরা মনে করি।

সীমানার সমস্যা সমাধান করে সীমান্তের সংঘাত বন্ধ করার কোন উভয়পক্ষসম্মত পন্থা বের করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। যথার্থ কঠিন কাজ রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের অনুসন্ধান করে সীমান্ত সংঘাতের যথার্থ কারণ নির্ণয় করা। রাজনৈতিক কারণ সত্ত্বেও কেন পাক প্রধান মন্ত্রী নূন শ্রীনেহেরুর সঙ্গে বার্তালাপে রাজী হলেন তার কূটনৈতিক কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করা ভারত সরকারের একান্ত প্রয়োজন।

কেরলা ও পি, এস, পি

সম্প্রতি কেরলার কম্যুনিষ্ট সরকার সম্বন্ধে প্রজা-সোশ্যালিষ্ট পার্টির কার্যকরী পরিষদ এক মুলতবী প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কেরলার সমস্ত কম্যুনিষ্ট সরকারের পতন ঘটাবার প্রশ্নে নিহিত নয়—এই প্রশ্ন মূলতঃ রাজনৈতিক এবং আদর্শগত। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জ্ঞাপন করে বাস্তব ক্ষেত্রে অতি সীমাবদ্ধভাবে ক্ষমতা অর্জন করেও কিভাবে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব দ্বারা সরকার এবং দল পরিচালনে কম্যুনিষ্ট পার্টি অগ্রণী হয় কেরলা তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। কম্যুনিজমের স্বৈরতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও প্রথার প্রভাব কম্যুনিষ্ট কর্মী ও নেতাদের উপর যে কত প্রবল কেরলা তার একটি সাম্প্রতিক নিদর্শন। পি, এস, পি তাই কেরলা সরকারের পতন ঘটাবার প্রশ্নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে কেরলা সরকারের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে আদর্শনৈতিক স্তরে সংগ্রাম পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা প্রজাসোশ্যালিষ্ট পার্টির এই দৃষ্টিভঙ্গীকে যুক্তিযুক্ত এবং বিচক্ষণতা পূর্ণ বলে মনে করি।

ভারতের জাতীয় অধ্যাপক

ভারত সরকার অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং অধ্যাপক কৃষ্ণানকে জাতীয় অধ্যাপক পদে মনোনয়ন করেছেন। এতদিন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ডাঃ সি, ভি, রামনই একমাত্র এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। জাতীয় অধ্যাপকরা ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করতে পারবেন এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত মাসিক আড়াই হাজার টাকা করে পারিতোষিক পাবেন।

অধ্যাপক বসু ও কৃষ্ণানকে জাতীয় অধ্যাপকের পদ মর্যাদা দিয়ে ভারত সরকার এক বিশেষ প্রশংসার কাজ করেছেন। অধ্যাপক বসু ও কৃষ্ণান উভয়েই এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং এঁদের দুজনেরই স্থান কোন প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব বহনে নয়। এঁদের মনীষার স্থান উচ্চতর বিজ্ঞান চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে। অধ্যাপক বসুকে শান্তিনিকেতনের উপাচার্যপদের দায়িত্ব দেওয়ার সময়েই আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে অধ্যাপক বসুর ন্যায় বিশ্বের একজন প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিদকে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার বৈনিন্দন ও গতানুগতিক কাজে আবদ্ধ রেখে এক অতি উচ্চতর মনীষার অপচয় করা হচ্ছে মাত্র। আনন্দের কথা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আবার নিজের যথাযোগ্য স্থানে ফিরে এসেছেন। আমরা আশাকরি এবার তিনি নিবিঘ্নে নিজেকে উচ্চতর গবেষণার কাজে নিয়ত করার মত পরিবেশ খুঁজে পাবেন। জাতীয় অধ্যাপকের পদে ব্রতী হওয়ার জন্য আমরা অধ্যাপক বসু ও কৃষ্ণানকে সাদরে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অধ্যাপকদের বেতন ও ইউ, জি, সি

ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিশন অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধি এবং বেতনের হার বৃদ্ধির যে মূল প্রস্তাব করেছিলেন তাতে দেশের শিক্ষাব্রতী জনসাধারণ আশান্বিত হয়েছিল। কলেজের শতকরা পঁচানব্বই জন শিক্ষকের মূল বেতন গড়ে ১২৫-থেকে ১৫০। বেতনের এরূপ নিচু হারের ফলে যোগ্য শিক্ষকেরা অন্য পেশায় জীবিকার সন্ধান করে অথবা বিভিন্ন কলেজে 'পার্ট-টাইম' কাজ করে এবং একাধিক টুইশনি করে জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপকদের জীবিকাসংস্থানের এই দুরবস্থার জন্য কলেজী শিক্ষার মান ক্রমশ এক শোচনীয় স্তরে নেমে যাচ্ছে। এই দুরবস্থা দূর করার জন্য গ্র্যান্টস্ কমিশন কলেজী অধ্যাপকদের যে বেতনের হার নির্ধারিত করেছিলেন তাতে অবশ্যই কিছুটা

পরিবর্তন হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু এই বেতনের হার চালু করার ব্যাপারে গ্র্যাণ্টস্ কমিশন এমন গাটোয়ারী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন যে কমিশনের মূল উদ্দেশ্যই আজ ব্যর্থ হতে বসেছে।

কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে কলেজের অধ্যাপকদের নিম্নতম বেতন হবে ২০০ টাকা এবং বছরে ১৫ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হবে এবং এই বেতন উর্ধ্বে ৪০০ টাকা পর্যন্ত হবে। কিন্তু এই বেতনের হার চালু করার পক্ষে কমিশন অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। যে সমস্ত অধ্যাপক এখন ১৫০ টাকা পান তাদের বেতন গোড়া থেকে ২০০ টাকা করা হবে না, এক কলেজে কাজ করার বছর হিসেবে প্রতি তিন বছরে ১৫ টাকা করে প্রথম কিস্তিতে বেতন বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হবে। বিভিন্ন কলেজে কাজের সময় গ্রাহ্য হবে না। যে সমস্ত অধ্যাপক গ্র্যাণ্টস্ কমিশনের আর্থ অর্থ সাহায্য গ্রহণ করবেন তাঁরা সপ্তাহে ২৩ ঘণ্টা কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন, পার্ট টাইম অধ্যাপনা করতে পারবেন না এবং সপ্তাহে ৪ ঘণ্টার বেশি টুইশনি করতে পারবেন না। এ ছাড়াও আরো অনেক রকম প্রতিবন্ধকতা ও সর্ত আরোপ করা হচ্ছে কমিশনের অর্থ বিতরণের প্রশ্নে। আমাদের মতে এরূপ দরকষাকষি এবং সর্ত আরোপের ফলে শিক্ষকদের জীবিকার মান উন্নয়নের সুযোগ দিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের মূল প্রশ্নের মূলে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। বেতন বৃদ্ধি হলে স্বাভাবিক ভাবেই অধ্যাপকেরা ধীরে ধীরে একই কলেজে অধ্যাপনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন এবং যে সমস্ত সর্ত কমিশন গোড়াতে আরোপ করতে চাইছেন তা স্বাভাবিক-ভাবেই কার্যকরী হবে। আমাদের মতে অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নে গ্র্যাণ্টস্ কমিশনের উদার ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণ করা উচিত এবং আর দেরী না করে গ্র্যাণ্টস্ কমিশনের সুপারিশ চালু করা উচিত।

পরলোকে ডাঃ জোলিও কুরী ও ডাঃ লরেন্স

সম্প্রতি বিশ্বের দুইজন শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটেছে। তাঁদের একজন ফরাসী বিজ্ঞানী জোলিও-কুরী এবং অপরজন মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ লরেন্স। জোলিও কুরীর সহধর্মিনী ছিলেন মাডাম কুরীর কন্যা আইরিণ কুরী। তিনিও মায়ের মত তেজস্ক্রিয় বিজ্ঞানে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। ফ্রেডারিক জোলিও ও কুরী দুইজনে পরমাণু বিজ্ঞানে গবেষণা করে প্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। নিউট্রন সংঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াকে বিপুল শক্তি আহরণের সম্ভাবনায় কার্যকরী করার আংশিক তথ্য প্রকাশের উদ্যমে প্রধান বিজ্ঞান মনীষীদের মধ্যে ডাঃ জোলিও অন্যতম। রাজনৈতিক কারণে তিনি ফরাসী দেশের পরমাণবিক কমিশনের পদ থেকে বিচ্যুত হন। তিনি পরমাণু বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রনায়ক রূপে তো বটেই, শান্তি আন্দোলনের পরিপোষক রূপেই বিশ্বের সর্বত্র সম্মানী ছিলেন।

ডাঃ লরেন্স সাইক্লোট্রন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। তাঁরই প্রয়াসে ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণাগারে প্লুটোনিয়াম এবং আরও কয়েকটি কৃত্রিম মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। ডাঃ লরেন্সের প্রয়াসের ফলেই বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ও প্লুটনিয়াম সহ মহাযুদ্ধের সময় সংগ্রহ করা মার্কিন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়।

ডাঃ জোলিও এবং ডাঃ লরেন্স উভয়েরই জীবনাবসান ঘটেছে প্রায় সাতান্ন বছর বয়সে। তাই উভয়ের মৃত্যুকেই বলা যায় অকাল মৃত্যু। পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের অনেকের ভাগ্যেই তেজস্ক্রিয়ার সংক্রমণের পথে অকাল মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে বলে অনেকে আশঙ্কা করেন। আমরা বিশ্বের এই বিজ্ঞান মনীষীদ্বয়ের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

প্রবন্ধ

ভবানীপুর উপ-নির্বাচন

লীলা রায়

আপাতঃ দৃষ্টিতে এক একটি সাধারণ ঘটনা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে অসাধারণ হয়ে ওঠে। এর জন্য বিশেষ কোনো একটি কারণই দায়ী নয়। বহু ঘটনার সমাবেশ, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিশেষ পরিবেশ, এবং সর্বশেষ এই বহু বিচিত্র সমাবেশের কেন্দ্র যে ব্যক্তিটী তার বিশিষ্টতার উপর নির্ভর করে সুদূরপ্রসারী ফলাফল। যেমন আজও গবেষণা চলেছে ঐতিহাসিকের মনে গান্ধিজী যদি তাঁর নিজের বিশ্বাসানুযায়ী দেশবিভাগের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে মাউন্টব্যাটন পরিকল্পনাকে এ, আই, সি সিতে সমর্থন না জানাতেন তবে আজকের ভারতবর্ষের চেহারা কি হোতো—নেতৃত্বের কি রূপ হতো এবং বিশ্বের শক্তি সমাবেশে ভারতবর্ষের স্থান কোথায় হোত? অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বমানবের জীবন-মৃত্যুর দোলায় ভারতবর্ষ তার কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে কোন্ দিকে পাল্লা ভারী করতো। হয়তো এই কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল কত শত বৎসরের জন্য কে জানে—একটা বিশেষ ক্ষণে বিশেষ পরিবেশে কোন একটি মানুষের মনের তৎকালীন বিশেষ অবস্থা দিয়ে। যদিও সেই মানুষটির মনের সেটা প্রত্যাশিত স্বাভাবিক পরিণতি ছিল না। আজও প্রশ্ন ওঠে, যদি গান্ধিজী তাঁর মনের প্রবণতা ও বিশ্বাসকে স্বীকার করে রাজী না হতেন তবে? বর্তমান প্রসঙ্গের পটভূমিতে ইতিহাসের এই "যদির" ভূমিকা হয়তো কারো কারো নিকট একটু অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ বলে মনে হতে পারে কিন্তু মানব ইতিহাস কি ভবিষ্যতের ছক অঙ্কের মত নিখুঁত করে কখনো কি কষতে পেরেছে? পারেনি। কারণ সেখানে সব ছককে অতিক্রম করে মানুষের আবেগের বাইরে একটি বস্তু কাজ করে—সে হচ্ছে মানুষের মন।

ভবানীপুর নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

ভবানীপুরের আসন দীর্ঘদিন কংগ্রেসের আয়ত্বে ছিল। তার কারণ কতটা দলগত, কতটা নির্বাচক মণ্ডলীর অর্থ-নৈতিক ও জাতিগত স্তরবিন্যাসের উপর এবং কতটা পূর্বতন কংগ্রেস প্রার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ছিল তার অনুমানগত সংখ্যাঙ্কপাত ব্যতীত কোনো যথার্থ সংখ্যানির্ভর তথ্য নেই। মুস্কিল হচ্ছে যে তার দ্বারা হয়তো থাকে বলে "পপুলার" মতের পুনরাবৃত্তি করা চলে, কিন্তু কার্যকারণ বিশ্লেষণ নির্ভর করে যে নির্ভুল তথ্যের উপর সেরূপ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। যদি আমরা বলি যে গত সাধারণ নির্বাচনে ভবানীপুরে বামপন্থীর জয়লাভ সম্ভব হয়নি কয়েকটি বিশেষ আকস্মিক ঘটনার সমাবেশে তাকে চ্যালেঞ্জ করবার মত তথ্য কি কারো আছে? গত সাধারণ নির্বাচনে ভবানীপুরে যে তিনজন বামপন্থী প্রার্থী ছিলেন তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার দিক দিয়ে হয়তো বিশিষ্টতম ছিলেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কিন্তু কোনো উল্লেখযোগ্য সংগঠনের সমর্থন তাঁর পশ্চাতে ছিল না।

এবং গত সাধারণ নির্বাচনের সমকালীন আবহাওয়াতে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা কার্যকরী হবার মত কোনো সম্ভাবনাই ছিল না; কার্যকরী হবার সম্ভাবনা ছিল, যে দল অথবা দল-সমষ্টির সাংগঠনিক অবস্থা জনমতের বিচারে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে সমশক্তি সম্পন্ন ছিল। সেদিক দিয়ে গত সাধারণ নির্বাচনে পঞ্চবাম-পন্থী সমর্থিত প্রজাসমাজতন্ত্রী প্রার্থী শ্রীমতী শৈল সেনেরই একমাত্র যথার্থ নির্বাচন দ্বন্দ্ব হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে এবং শ্রীমতী সেনেই শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের পরে ২য় স্থান অধিকার করেছিলেন যদিও তিনি আশানুরূপ ভোট পাননি। এই ফলাফল বিশ্লেষণ করলে যে কয়েকটি কারণ দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম কারণ—যে কয়েকটি সিটে বাংলা-দেশে বামপন্থীদের মধ্যেই পারস্পরিক উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব হয়েছে তার মধ্যে ভবানীপুর অন্যতম; তাতে কেবলমাত্র কংগ্রেস-বিরোধী ভোট যে বিভক্ত হয়েছে তাই নয়—সেখানে বামপন্থী প্রার্থীর জয় সম্বন্ধে অনেকাংশে হতাশ হবার ফলে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধীরা কম সংখ্যায় ভোট দিতে উপস্থিত হয়েছেন; এবং যাদের জয়ের সম্ভাবনা নেই তাদের ভোট দিয়ে "ভোট নষ্ট" করার অত্যদ্ভুত যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েও অনেকে বামপন্থীদের ভোট যেননি তার নজিরও পাওয়া যাবে। তার ফলে শ্রীমতী সেনের পক্ষে সংগঠনের দুর্বলতা নিঃসন্দেহ অন্যতম কারণ। বামপন্থী ভোট বিশেষভাবে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল আত্মবিশ্লেষণ করলে নিশ্চয়ই এ মন্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করবেন। যদি নির্বাচনী সংগঠন উপযুক্ত হতো তবে শ্রীমতী সেন ও শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের মধ্যে ভোট সংখ্যার পার্থক্য নিঃসন্দেহ এত হোতো না, প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই এ বলা যায়। কাজেই যারা বলেন যে এই নির্বাচনে দীর্ঘকাল স্থায়ী কংগ্রেসী সিট অ-কংগ্রেসী প্রার্থীর আয়ত্বে এসেছে তাঁদের ঐ মন্তব্যের অন্তরালে যে ইঙ্গিত রয়েছে—অর্থাৎ কংগ্রেস সমর্থকেরা কংগ্রেস অ-সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন সে মন্তব্যও বিচারের অপেক্ষা রাখে। এবার নির্বাচক মণ্ডলীর শত-করা ৭১ জন ভোট দিয়েছেন, গত সাধারণ নির্বাচনে এই কেন্দ্রে মাত্র শতকরা ৩০টি ভোট দেওয়া হয়েছিল। কাজেই গতবার নির্বাচকমণ্ডলী যে সংখ্যক ভোট দিয়েছিলেন তার দ্বি-গুণেরও বেশী সংখ্যা এবার ভোট দিতে প্রবৃদ্ধ হয়েছিলেন। গতবার অনুরূপ প্রবৃদ্ধ হওয়ার কারণ অনুপস্থিত থাকায় বা পূর্বাহ্নেই বামপন্থীদের পক্ষে প্রতিকূল ফলের আশঙ্কা ফলাফলের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তাও বিশ্লেষণযোগ্য। বিশেষতঃ যারা কংগ্রেস প্রার্থীকে সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কত সংখ্যা এবারও কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন তার সংখ্যা জানতে পারলে সিদ্ধান্তে আসা যেতো কত কংগ্রেসী সমর্থক কংগ্রেস অ-সমর্থক হয়েছেন। এ নির্বাচনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, যে বিষয়টির উপর শ্রীসিদ্ধার্থ রায় পদত্যাগ ও দলত্যাগ করে পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হন সে বিষয় সম্বন্ধে জন-সাধারণের সুস্পষ্ট রায়। অর্থাৎ কংগ্রেসের দুর্নীতি—বিশেষ রাজনীতি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সম্বন্ধে সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে নির্বাচক মণ্ডলীর বিপুল অংশ একমত। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী শাসনের দুর্নীতি সম্বন্ধে বিশেষ রাজে দুর্নীতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ তাঁরা সম বিশ্বাসী। এ বিষয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণভাবে নির্বাচক মণ্ডলী তাঁদের চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করে তাঁদের নির্ভুল রায় দিয়েছেন।

গণতান্ত্রিক সচেতনতা

আমরা মনে করি এই নির্বাচনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল যেটি—সে হচ্ছে ভারতবর্ষের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কেন্দ্রের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা। কংগ্রেস এই সচেতনতাকে আচ্ছন্ন করবার

উদ্দেশ্যে নানা হাস্যকর পন্থা অবলম্বন করেছিল। যেমন নির্বাচনের প্রাক্কালে মুখোশ মল্লিক বোমাবের কংগ্রেসী জমায়েতে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে এনে তাঁদের সামনে রেখে শ্রীপ্রফুল্লসেন, জবানীপুরের নির্বাচক মণ্ডলীর নাড়ী টিপে তাদের মনোগত মতামত মুখে সদম্ভে ঘোষণা করলেন "কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত"। লাম্পট্যলীল ক্ষমতায় আসীন দলের কোনো মন্ত্রী এভাবে প্রলাপোক্তি করতে পারে না তবুও বিশ্বাস করা কঠিন। অন্ততঃ পক্ষে বাংলার কংগ্রেসী দল ও দলপতিদের ওর এতেই প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে ভালোভাবে। এই উপনির্বাচনে বিশেষভাবে বাংলা কংগ্রেসের ও সাধারণভাবে ভারতীয় কংগ্রেসের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের দিক্ দিয়ে সেটাই সবচেয়ে বড় লাভ। ভ্রান্ত ধারণা ও ততোধিক অনিষ্টকর অ-নির্ভরযোগ্য স্থানে নির্ভরশীলতা জাতিসত্তাকে ক্ষতিকর। কংগ্রেসের উপর ফলাফলোপেক্ষাকারী নির্ভরশীলতা দূর হয়ে যদি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে প্রতি নাগরিক ও নির্বাচকমণ্ডলী সচেতন হয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়বার দায়িত্ব গ্রহণ করে তবেই জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শক্ত বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠতে পারে। না হয় নড়বড়ে ভিত্তির উপর গড়ে উঠে সামান্য দুর্যোগেই তা ধূলিসাৎ হবার সম্ভাবনা। জবানীপুরের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল আড়ম্বর, অকল্পনীয় গালভরা প্রচার, মুখ, অ-মুখ্য নানা শ্রেণীর ও স্তরের মন্ত্রীদের এই অঞ্চলে নিত্য ভিড়, সর্বোপরি চেয়ারম্যানের নানা ফেল্ সত্ত্বেও নির্বাচকমণ্ডলী ছিল শান্ত, দৃঢ় ও বিচারশীল। উভয় পক্ষের মুখপত্র, পত্রিকা ও জনসভাতে সব বক্তব্য, শিক্ষা ও স্তরের লোক প্রতিদিন অধিক রাত পর্যন্ত জমায়েত হয়ে সকল পক্ষের বক্তব্য শুনেছে, বিচার বিশ্লেষণ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত কর্তব্য স্থির করে কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রায় দিয়ে সিদ্ধার্থ রায়কে জয়ী করেছে। নির্বাচক মণ্ডলীর এই বিচারশীল মানসিকতা ও উত্তেজনাহীন উৎসাহ নিঃসন্দেহে আমাদের নির্বাচকমণ্ডলীর মনোপ্রাপ্তির ও এযুগে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই সচেতনাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দিত করি। এই নির্বাচনের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য এই।

নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ভূমিকা

সিদ্ধার্থ রায় বামপন্থী সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এই নির্বাচনে। ব্যক্তিগতভাবে এতে নিঃসন্দেহ তিনি লাভবান হয়েছেন। কংগ্রেস পরিত্যাগ করে কোনো একটি দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি সমস্ত দলের—বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট ও প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শ ও পন্থায় বিশ্বাসী দুটি দলের—সমান সমর্থন পেতেন না এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কাজেই ব্যক্তিগত দিক দিয়ে তিনি সর্বাপেক্ষা সুফলপ্রসূ পন্থা বেছে নিয়েছেন স্বভাবতই। এই জন্য সিদ্ধার্থ রায় সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট দলভুক্তির, কংগ্রেসী প্রচার সত্ত্বেও কম্যুনিজমের প্রতি অনুকূল নয় এমন বহু ভোটারেরও সমর্থন তিনি পেয়েছেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস নানা অবান্তর ও মিথ্যা প্রচারের অবতারণা করেছিল নিঃসন্দেহ তবে আদর্শগতভাবে একটি মূল্যবান প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ—ভারতবর্ষে কেরলায় কম্যুনিষ্ট সরকারের স্বরূপ ও শাসনপ্রণালী এবং অল্পদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত ইন্দিরার নজের হত্যার পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের যথার্থ প্রকৃতি বিশ্লেষণ। যদি সিদ্ধার্থ রায়ের সমর্থনে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের মত কম্যুনিষ্ট মতবাদের ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের স্বৈরতন্ত্রী স্বেচ্ছাচারিতার তীব্রবিরোধী দল না থাকতো এবং কংগ্রেসী শাসনে অ-গণতান্ত্রিক পন্থা ও স্বৈরাচারী অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বিরলতর

হতো তবে হয়তো এই প্রচারের ফল অনেক বেশী কার্যকরী হোতো। কিন্তু একদিকে কম্যুনিজমের সম্পূর্ণ বিরোধী মতে বিশ্বাসী প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সমর্থন ও অন্যদিকে কংগ্রেসী শাসনের অপকৌশল ও কুকীর্তিগুলি সিদ্ধার্থ রায়ের পক্ষে কমিউনিষ্ট সমর্থনের উপরিলিখিত অন্তর্বিরোধজনক দিকগুলিকে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। একই কারণে কংগ্রেস দল তার প্রচারযন্ত্র দলগতভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু কমিউনিষ্ট দল সম্মিলিত বামপন্থী প্রচার সত্ত্বেও অতি চতুর কৌশলের সহিত দলীয় প্রচার করে চলে,—যথা, কংগ্রেসী দল কর্তৃক কৃষকদের প্রভাবান্বিত করবার উদ্দেশ্যে কাকদ্বীপ অঞ্চলে বহু অর্থব্যয়ে তথাকথিত চাষীমজুর কৃষক সমাবেশের নামে জনসাধারণকে কি ভাবে ভাওতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল সে কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'নিত্য জেলেমালার' সাড়ম্বর বর্ণনা দেয় প্রায় প্রতি জনসভায়। কংগ্রেস কর্তৃক সিদ্ধার্থ রায়কে কম্যুনিষ্ট আখ্যায়িত করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ রায় কম্যুনিষ্ট দলে কি উপায়ে তারা তাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসী দলে ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের দল পুষ্ট করতেন তার চমকপ্রদ বক্তৃতা দিয়েছে বহু সভায়। এ সবের একটা যায় পরোক্ষ উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট দলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রচারের ফলে কম্যুনিষ্ট ভীতি অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট দলই একমাত্র কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসের স্বীকৃতি দান, এই সূক্ষ্ম প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করা। এবারকার উপনির্বাচনে এ ধরণের ইঙ্গিতপূর্ণ বহুপ্রচারের—যা সম্মিলিত বামপন্থী নীতি বিরুদ্ধ—সুযোগ কম্যুনিষ্ট দল গ্রহণ করেছে। কিন্তু অন্যান্য দল, বিশেষভাবে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কম্যুনিষ্ট দলের সহিত তাঁদের পার্থক্যকে পরিস্ফুট করে তোলার কোনো সুযোগ পাননি। বরং প্রজা-সমাজতন্ত্রীদলের বহু কর্মীর কম্যুনিষ্টদলের সহিত সম্মিলিত-ভাবে কাজ করবার অনিচ্ছা ও নীতিগতভাবে আপত্তি থাকায় দলটা সংগঠিত শক্তি ও প্রভাবের সহিত এই নির্বাচনে দেশের কল্যাণের দিক দিয়ে কম্যুনিষ্ট প্রভাব অধিকতর প্রসারিত না করার জন্য গণতান্ত্রিক আদর্শ, ভূমিকা ও সম্ভাবনা পরিস্ফুট করা উচিত ছিল, যে কোনো কারণেই হউক এই দল সে ভূমিকা গ্রহণে বহুলাংশে উদাসীন ছিল। এই দল উপযুক্ত পরিমাণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি, যতটা তার করা উচিৎ ছিল, অথবা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যতটা তার নিকট আশা করেছিল। প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের এ বিষয়ে তীব্র আত্ম-বিশ্লেষণ করা উচিৎ।

ভবিষ্যৎ : আশা ও আশঙ্কা

গত এক বছরে ভারতবর্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচন হয়েছে। পরলোকগত মৌলানা আজাদের সিটে পাঞ্জাবে গুরগাঁওতে জনসঙ্ঘের জয়, উত্তর প্রদেশে মাওয়ার সিটে কংগ্রেসের গুরুবিশেষ চন্দ্রভান গুপ্তের প্রজাসোসিয়লিষ্ট প্রার্থীর নিকট পরাজয়, কেরালার দেবীকুলামে কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর নিকট কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় এবং সর্বশেষ ভবানীপুরে বামপন্থী-সমর্থিত স্বতন্ত্রপ্রার্থী সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়। এগুলি বহু দূর বিস্তৃত বিরাট দেশের তুলনায় স্থানীয় ঘটনা হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহ এদের ইঙ্গিত লঘু অথবা বিচ্ছিন্ন নয়। এ ঘটনাগুলি কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীর বিশেষ বিশেষ স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, অথবা 'কালারফুল পার্লেমেন্টারিটি'র উপর কি পরিমাণে নির্ভর ক'রে থাকতে পারে, তবে আঙ্কি হিসাবে তা যে খুব বেশী হবে না তা নিঃসন্দেহ ইতিপূর্বে বহুস্থানে বহু 'কালারফুল পার্লেমেন্টারিটি' কংগ্রেসে

অতি সাধারণ প্রার্থীর নিকট হেরে গেছেন, কংগ্রেসের মর্যাদা, তার উপর বিশ্বাস, সংগঠন, অর্থ ও জনবল সংগ্রহের ক্ষমতার জন্য। কিন্তু আজ সেদিন চিরকালের জন্য গত হয়েছে। যত শীঘ্র জনসাধারণ—বিশেষ ভারতের শিক্ষিত চিন্তাশীল নির্বাচকমণ্ডলী তা বোঝেন ততই মঙ্গল। ভাবালুতার বাষ্পীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি না করে নিজেদের ভাগ্য যত দ্রুত আমরা পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দেশের প্রতি দায়িত্ব বোধ থেকে নিজেদের হাতে তুলে নেবো ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল। কংগ্রেস সংশোধিত হবে কিনা, তার সম-শক্তির বিকল্প দল গড়ে উঠবে কিনা, এই সব ব্যর্থ আলোচনার সময় অতীত হয়েছে। এই বিরাট দেশের বিপুল জনতার ভাগ্যনিয়ন্তৃত্ব নূতন পথে সচেতন ভাবে করতে হবে, না হয় আমাদের নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার অবকাশে ইতিহাসের রথ অতিক্রান্ত আমাদের মতামতের অপেক্ষা না রেখে গড়িয়ে যাবে। হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে হয়তো আমরা দেখবো মোড়ঘুরে আমরা এসেছি, নূতন কাল শুরু হয়ে গেছে। তখন আর কিছু করবার থাকবে না নির্বাক, নিশ্চেষ্ট দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া। যোগাযন্ত্রমুহূর্ত-ভাষান্তরে "অপরচুন মোমেন্ট" জাতির জীবনে যখন খুসী আসেনা। নানা ঘটনার সমাবেশে বিশেষ বিশেষ সময়ে তা আসে। যারা সক্রিয় সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী তাদের কাজ সেই সব মুহূর্তগুলিকে কাজে লাগান।

উপরে উল্লিখিত গত কয়েকটি নির্বাচনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—এতদিনের সুদৃঢ় ইমারতে—সমস্ত জাতি ইট শুরকি যোগান দিয়ে যাকে গড়ে তুলেছিল—তার মধ্যে কালের অমোঘ নিয়মে জীর্ণতা ও ফাটল দেখা দিয়েছে। আজও হয়তো তা বিরাটাকার হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি—কিন্তু বিরাটাকার হোয়ে দেখা দেয়া কেবলমাত্র সময় সাপেক্ষ এতে সন্দেহ নেই। আগামী ১৯৬৭-র নির্বাচনে এই ফাটল অনেক বৃহদাকারে দেখা দেবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তখন হয়তো অন্যদিকে "নূতন জমানার" ভিত্তি পোক্ত হয়ে স্থাপিত হয়ে গেছে। আশার কথা যে "জীর্ণপুরাতন" নিঃশেষ হয়ে আসছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা আমাদের নয়—কিন্তু আশঙ্কার কথা, নূতন যে আসছে সে সম্বন্ধে অস্পষ্টতা। ভারতের অগণ্য জনতা, বিশেষ করে ভারতের শিক্ষিত বিচারশীলগোষ্ঠী কি বিচার করে দেখছেন কি তাঁরা চান? ভারতের সর্বব্যাপী ক্রোধান্ধ দারিদ্র্য, অশিক্ষার ভয়াবহ অসহায়ত্ব, দীর্ঘ অব্যবহারের অনভ্যাস-জনিত স্বাভাবিক দায়িত্বহীনতা এদের মিলিত শক্তিকে অতিক্রম করে দেশের ভবিষ্যৎকে কল্যাণ ও বহুযুগবাহী-ঐতিহ্যের স্বাভাবিক প্রবণতার ভিত্তিতে গড়ে তোলার দায়িত্ব সম্বন্ধে কি ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণ, বিশেষ শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী, এবং সর্বশেষে রাজনৈতিক দাতাদলগুলি অবহিত আছেন? কংগ্রেস সম্বন্ধে কথা ওঠেনা আমাদের দিক থেকে। কম্যুনিষ্টরা তার ভূমিকা সম্বন্ধে অতি সচেতন। এবং তার সচেতনতার যোগান দিচ্ছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম। তারা সুপরিকল্পিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কেরলার গদি রাখার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা, সংবিধানের প্রতি এত আনুগত্য, দেশীয় ধনিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আর্থিক সমর্থন লাভের জন্য শ্রমিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিড়লার সহিত চুক্তি, সর্বশেষে তারই জন্য অন্তরঙ্গসহরে গৃহীত গণতান্ত্রিক তোল। এসব কিছুরই মূলে, দেশের নরম মাটিতে আপাততঃ এ-কালের উপযোগী করে দলের প্রতিষ্ঠার পথ তৈরী করা। এবং প্রয়োজন বোধে তার জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে কম্যুনিজমের বিপরীত নীতি ও পন্থা গ্রহণ, এবং বামপন্থী ঐক্যের দৃষ্টান্ত উদার প্রোগান সময়ে অসময়ে উচ্চারিত করে দলের মূল উদ্দেশ্যের দিক থেকে জনতার

দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রেখে নানা অবাঞ্ছিত অ-নৈতিহাসিক যুক্তির অবতারণা করে আবহাওয়াকে ঘোলাটে ও পরিবেশকে নমনীয় রাখা, যতদিন পর্যন্ত না দল এদের আড়ালে তার লক্ষ্যে পৌঁছায়—অর্থাৎ সংগঠনের ও চিন্তার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভ না করে। দলীয় দিক থেকে কম্যুনিষ্ট দলের এই পদ্ধতির পরীক্ষা ও ফলাফল পৃথিবী জুড়ে আমরা দেখ্‌ছি। তারা এতে বিশ্বাসী কাজেই সে অনুযায়ী পদক্ষেপ করা ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করাতে তাদের দিক থেকে অন্যায়ের কিছু নেই। এমন কি বাস্তবিক পক্ষে এতে তার অন্যায়ের প্রশ্ন আসে না একথা স্বীকার করাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এবং সে প্রশ্ন আমাদের নিকট একমাত্র প্রশ্ন, ভারতের জনসাধারণ এই উদ্দেশ্যকে বুঝেছে তো? সেই উদ্দেশ্যের সহিত তারা কি সহ-মত? তারা কি বিশ্লেষণ করেছে ক্ষ্যাপ্রোচ্যের বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতির মুখে হঠাৎ ক্রুশ্চেভের পিকিং আগমন ও পরে মাওসেতুং ও ক্রুশ্চেভের যুক্ত বিবৃতির তাৎপর্য? বিশ্ব কম্যুনিজমের ক্ষেত্রে "রিভিশিনিজম্" সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক আভ্যন্তরীণ শত্রুরূপে টিটোইজমকে আখ্যায়িত করা এবং বিশ্ব কম্যুনিজমের আদর্শ ও আপ্তবাক্যের কেন্দ্র একাধিক হতে পারে না প্রচার করা, এবং তার জীতিপ্রদ স্মারক হিসাবে নাজহত্যা, এই ঘটনাপরম্পরাগুলির বিচার বিশ্লেষণ ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণ করেছে কি? এই পৃষ্ঠপটে তাঁরা কি বিশ্বাস করেন রুগোস্লাভিয়াতে ও হাঙ্গারিতে যা সম্ভব হতে দেওয়া হয়নি, ভারতের মাটিতে ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা তাই সম্ভব করে তুলবেন অর্থাৎ যথার্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও আদর্শে এদেশীয় ঐতিহ্যের বুনিয়াদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন? মাও সেতুংএর ঐতিহাসিক "হাজার গোলাপ ফুল ফুটুক ও সহস্র চিন্তা পরস্পর স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক" এই বুদ্ধি-বিভ্রমকারী থিসিসের পরিণামে—সহস্রচিন্তার ফুলগুলি সাহস পেয়ে উন্মুক্ত আকাশে ফুটে উঠবার আনন্দে দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখেছিল—তাদের সেই স্বল্পকালস্থায়ী মধুর উষাস্বপ্ন পরবর্তিকালে কি ভাবে গাঢ়রাত্রির দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল এবং তারই পরে "ব্রেইন ওয়াশিং"এর অভিযান সেই "স্বাধীন চিন্তার ফুলগুলিকে" কি নির্মম ভাবে দলিত করেছিল—এই সকল পরস্পর ঘনিষ্ট ব্যাপারগুলোর মর্মার্থ ও ইঙ্গিত সম্বন্ধে বিচার করে তার মূল্য নিরূপণ ও আমাদের দেশের জন্য অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁদের মতামত কি সে বিষয় আত্মবিশ্লেষণ করেছেন কি? রুশ ও চীনের অর্থনৈতিক ও যান্ত্রিক সংগঠনের উচ্চমান, আর্থিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির আকর্ষণ, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের মত ভয়াবহ দরিদ্র, অশিক্ষিত, স্বাস্থ্যহীন অসংগঠিত জনতার দ্রুত উন্নতির জন্য সে আকর্ষণ হয়তো আপাতঃ দুর্বার, কিন্তু মানুষের যথার্থ মনুষ্যত্ব বেঁচে থাকে যে আবহাওয়ায় অর্থাৎ তার মানবীয় ব্যক্তিত্বের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের যে স্বাধীনতার উপর, তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনের আবশ্যকতা, তার উপযোগী দুর্লভ আয়োজন ও পরিবেশ সৃষ্টির সুকঠিন দায়িত্বের কথা চিন্তা তাঁরা করেছেন কি? তাঁরা কি মনে করেন অনুন্নত দেশগুলিকে আর্থিক ও নানা দিক দিয়ে দ্রুত সংগঠিত করবার একটিই মাত্র উপায় মানুষের সভ্যতা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেছে, সে হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র ও কমিউনিজম, অতএব তার ত্রুটী বিচ্যুতি সহ তাকে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই ভারতবর্ষের? হয় বর্তমান আর্থিক ও সর্ববিষয়ে দুর্বিসহ অবস্থাকে সহ্য করা, নয় তো কমিউনিজমকে গ্রহণ করা এই তাঁদের বিচারের একমাত্র ইঙ্গিত একথা বিশ্বাস করার মতো এখনো প্রমাণ পাইনি; তবে ঘটনা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং কম্যুনিষ্টরা তার পরিকল্পিত পথে সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগুচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়

অন্যদল ও শক্তিগুলি তাদের লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অনুরূপ পরিমাণে সচেতন নয়। বিশেষতঃ তাদের নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পটভূমিতে আপাতঃফললাভের দিকেই প্রধানতঃ তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এবং আরো আশ্চর্যের বিষয় এই ব্যবস্থায় অনেকটা কম্যুনিষ্ট দলের প্রচার ও ব্যবহারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য ছোট ব্যবসায়ীদলের সহিত কম্যুনিষ্ট দল ও তথাকথিত ব্যবসায়ী ঐক্য সম্বন্ধে যে সকল নেতৃবৃন্দের মনোভাব নমনীয়, অতি কৌশল ও ছলনাশ্রিত ব্যবস্থায় সেই সকল নেতৃবৃন্দকে যে কোনো "সম্মিলিত" ব্যবস্থায় প্রচুরভাবে ব্যবহার করে থাকে তার প্রমাণ পেতে বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। দলগত সংগঠনের স্বাধীনতার এবং কর্মীদের লক্ষ্য ও পন্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবের সুযোগের ফলস্বরূপে কোনো সন্দেহের অবকাশ না দিয়েই কাজ হাসিল হয়ে যায়, অর্থাৎ সেই সকল নেতাদের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার সুযোগে জনতার ভিড় জোটানো সহজতর হয় এবং অতি কৌশলে দলীয় মর্যাদা ও প্রভাবের আলবিস্তার করা হয়। সম্মিলিত কথাটির অতিব্যবহার দ্বারা সম্বিতহা সৃষ্টির অবকাশ যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করা হয় সর্বতোভাবে। এতে জনতা নিজেদের বিপক্ষ সম্বন্ধে অন্ধ—অতএব আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকে। নেতারা ও দলগুলিও সন্তুষ্ট হয়। তাঁরা মনে করেন কম্যুনিষ্টদল যোগ্যস্থান ও মর্যাদা অতি উদার ও সুকৌশলভাবে সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিচ্ছে। কেবল মাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অতিসচেতন এবং তার বিচ্যুতি ঘটার পথে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় দায়িত্বশীল কর্মী ব্যতীত কারোরই অন্যথা হবার কোন কারণ ঘটেনা। আত্মরক্ষায় উদাসীন এই আত্মসন্তুষ্টিই সর্বাপেক্ষা আশঙ্কাজনক বিষয়—জনতার, দলগুলির ও নেতাদের দিক দিয়ে।

এ ব্যতীত বিচার প্রয়োজন সর্বদলীয় সম্মিলিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তাঁরা কি নির্বাচনীয় অথবা দলসমর্থনে দলনিরপেক্ষ কেন্দ্রমুখ প্রস্তুত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগত সাময়িক জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার ভিত্তিতে? সে সাময়িক জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা লাভ যতই যুক্তিপূর্ণ হউক না কেন—প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দায়িত্ব কার নিকট থাকবে?—কোন বিশেষ দলের নিকট যখন নয়, সম্মিলিত দলের নিকট দায়িত্ব থাকায় অর্থও বিশেষ কিছু দাঁড়ায় না বিশ্লেষণ করে। কারণ সম্মিলিত দলগুলির আদর্শ, লক্ষ্য ও পন্থা সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে অতি গভীর পার্থক্য, কাজেই দায়িত্বের ব্যাখ্যাও বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব এই সকল স্বতন্ত্র-প্রার্থীদের ভিত্তিকরে স্থায়ীভাবে কিছু গড়ে ওঠা সম্ভব কিনা, এবং তা যদি সাময়িক ভাবে সম্ভবও হয় তবে বর্তমান দলবহুলতা ও রাজনৈতিক অপেক্ষাকৃত নিম্নমান সচেতনতার পক্ষে দেশকে কোনো বিশেষ স্থায়ী উদ্দেশ্যে সংগঠিত করবার পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা এ বিচার করতে হবে। এ সম্পর্কে যদি আমাদের মতামত নেতিবাচক হয় তবে এ ধরণের সম্মিলিত সমর্থনে স্বতন্ত্রপ্রার্থীকে জয়ী করার নজীর বেশী সৃষ্টি করা কি ভাল? এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন যে হেতু কোনো একটী দল প্রয়োজনানুপাতিক ভাবে একক শক্তিশালী নয় অতএব বিভিন্ন আদর্শ, লক্ষ্য ও পন্থায় বিশ্বাসী বিভিন্ন স্তরের শক্তিশালী দলগুলির এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ কি?

এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাগুলি সাধারণতঃ দুনিয়ার সর্বত্র "পপুলার ফ্রন্টের" আওতায় কম্যুনিষ্ট দলগুলির প্রেরণায় গড়ে ওঠে। তবে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়, কেবল মাত্র সেই সব দেশ ও সময়েই গড়ে ওঠে যতদিন পর্যন্ত না কম্যুনিষ্টদল একক ভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা অদলনিরপেক্ষ শক্তি ও সংগঠন গড়ে তুলতে না পারে। এই 'পপুলারফ্রন্টে'র পক্ষপুটে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই কম্যুনিষ্টদলই তার দলপুষ্টি করে থাকে। আজকের দিনে এই রাজনৈতিক

টেকনিক এতই প্রচুর যে তার জন্য বেশী নজীরের প্রয়োজন করে না। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম যেখানে অন্য কোনো সমাজতান্ত্রিক দল অথবা মতকে নিজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক মনে করে থাকে যার জন্য মুসোলোভিনী ও হাদেরীকে অন্তত দুটি কম্যুনিষ্ট দেশ হওয়া সত্ত্বেও—ট্রিটস্কিনিজম ও কাউটস্কি-রিডল্যুউশানের আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে রক্তস্নানের পথকে মাড়িয়ে চলতে হয়। কারণ মস্কোর পদচিহ্ন লাঞ্ছিত পথকে চরম অনুসরণ করতে উক্ত দেশগুলি নিজনিজ দেশের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল মনে করেনি। এই পটভূমিকায় অমৃতসহরের বিভ্রান্তিকর 'লিবারেলাইজেশনের' আড়ালে সন্তানীয় দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ অতি স্পষ্টভাবেই উঁকি দিচ্ছে। সম্মিলিত জনের শ্লোগানের আড়ালে আত্মগোপনকারী সেই বিপদ সম্বন্ধে দেশকে অবহিত করবার দায়িত্ব কার? নিঃসন্দেহে কম্যুনিজম ব্যতীত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্যদলগুলির। এই সম্মিলিত শ্লোগানের মাধ্যমে আগামী লিগ্ বিধানসভা নির্বাচনে সফলতা ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকরে, বঞ্চিত জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সচকিত উল্লাসের উচ্চশিখরে তুলে, অল্পকালের মধ্যে কি গ্লানিকর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গভীরতর হতাশা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেশকে নিয়ে গিয়েছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদেরই প্রতিবেশী পূর্বপাকিস্তানের সাফল্য ও পরবর্তী ঘটনাবলির অসাফল্যে। আমরা কি কোনো আশ্চর্য মাদুলী অথবা স্বয়ম্ভূ রক্ষাকবচের উপর বিশ্বাস করে সেই পথেই যাবার জন্য রাস্তা তৈরী করতে উদ্যত হয়েছি, এই বিশ্বাসে যে ওদের দেশে "ধোঁয়া লাগলেও" আমাদের এই আশ্চর্যদেশে সবই অতি "সোজাসুজি" হয়ে যাবে। দুঃখের অথবা আশার বিষয় এদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো নিজেদের ঠিক অতটা আশ্চর্য বলে ভাবতে পারছে না এবং ভবানীপুর উপ-নির্বাচনে এ ভাবতে-না-পারার পরিচয়ের ইঙ্গিত পেয়ে একদিক দিয়ে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিকে অভিনন্দিত করেছি অপর দিকে অন্যদলগুলির এই ইঙ্গিত ও সচেতনার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করার নৈরাশ্যজনক অক্ষমতা একই সঙ্গে নিরাশার সৃষ্টি করেছে। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রশ্নটির উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করি অ-কম্যুনিষ্ট গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলিকে বিশেষ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এর একমাত্র বাহন—প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ও কর্মীদের—তাঁরা কি এর উত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বা হবার প্রয়াসে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন—ভবানীপুরের ইলেকশন কি ভারতের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত—সে ইঙ্গিতের মর্মবস্তুটী কী? কেবলমাত্র কংগ্রেসের ক্রমশঃ ক্ষমতা হতে অপসারণ এবং সেই শূন্যস্থানে 'সম্মিলিত' ভবিষ্যতের গোঁজামিল ও অবশ্যম্ভাবী বিড়ম্বনা, না গণতন্ত্রী সমাজবাদের ক্রমশঃ শক্তিশালী বুনিয়াদের উপর শান্তি ও প্রগতির পথিক অগণ্য স্বাধীন মানুষের স্বদেশে শক্তিশালী গণতন্ত্রী ভারতবর্ষ?

সর্বশেষ সিদ্ধার্থ রায়ের ব্যক্তিগত ভূমিকাকে এই নির্বাচনে মুখ্য বলে স্বীকার না করেও সানন্দে স্বীকার করবো আত্মপ্রত্যয় ও জনস্বার্থে বিসর্জন দিয়ে আত্ম-পরিশোধনের দিনে আগুনিক রাজনীতিতে ব্যক্তিগত মর্যাদা ও লোভকে মূল্যবোধে অগ্রাহ্য করে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, আদর্শ-নিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতি ক্ষমাহীন ঘৃণার পরিচয় এই তরুণ দিয়েছে তাতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের মান নিঃসন্দেহে উন্নত হয়েছে এবং প্রাদেশিকতাদুষ্ট হলেও বাঙলার এক তরুণ এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে আমরা গর্বানুভব করছি। এই বিপুল জয়লাভে নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর অভিনন্দনযোগ্য কাজের উপযুক্ত স্বীকৃতি ও ফল লাভ করেছেন বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রশ্ন এই ঘটনাকে অবলম্বন করে যে সম্ভাবনাগুলি জয়লাভ করবার জন্য অপেক্ষা

করে আছে, আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠা এবং লক্ষ্য পথে অগ্রসর হবার পথে সকল বাধাকে অতিক্রম করবার মত আত্মশক্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে সেই সম্ভাবনাগুলিকে মূর্ত করে তুলবার জন্য গণতন্ত্র ও সমাজবাদে বিশ্বাসীরা আজ নিয়োগ করবে কি না? গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী ভারতের লক্ষ লক্ষ নির্বাচক মণ্ডলী এবং সর্বভারতীয় দল হিসাবে তার একমাত্র বাহক প্রজা-সমাজতন্ত্রীদলের নিকট নিশ্চয়ই ভারতের ভবিষ্যৎ এর উত্তরের অপেক্ষা করবে। তারা কি প্রস্তুত?

বিস্মৃতি

সুনন্দা দাশগুপ্ত

হে মোর বিস্মৃতি!
তুমি মম চিত্তমাঝে এনে দাও সবভোলা গীতি!
তোমারে বরণ করি প্রাত্যহিক মূঢ়তার মাঝে,
তোমারে নমিতে চাই জীবনের যত মোর কাজে।
জীবনের ক্ষণপরিচয়—সীমিত বসন্ত উতরোল,
মুগ্ধ হিয়া মাঝে দেয় দোল—
তারপরে ঘেরে আসে মত্ত কালবৈশাখীর ঝড়!
হৃদয়নিকুঞ্জ থরথর।
শুষ্কপত্র সম ঝরে জীবনের রঙ ছিল যত
এ জীবনে গান ছিল কত।
অকস্মাৎ
রুদ্র বহ্নি এনে দিল জীবনের পরম আঘাত।
সেইদিন
ব্যর্থতার জ্বালাময় বীণ
ঝঙ্কারিল জীবনেরে দীর্ণ করা অভিশাপে যত
ম্লান হল স্ফটিকের কুসুমচয়ন কতশত।

বিস্মৃতি

দীপালী উৎসব থেকে জ্বলিল অনল
ব্যর্থ হল দীপ্তদাহে মুহূর্তের সোনালী ফসল।
রিক্ত হল বকুলের বীথি।

হে বিস্মৃতি।
সেইক্ষণে তোমারেই ডাকি—
তুমি আবরিত করো—জীবনে যেথায় ছিল ফাঁকি।
যেথা ছিল ছলনার গ্লানি,
সেথা পাব আশ্বাসের নির্ভরতাখানি।
সেথা তব সবভোলা সুর,
বিস্মৃতিমদিরা সুমধুর,
পরম সান্ত্বনা দেবে আনি।
সব লুপ্ত হয়ে যাক তবে,
শুধু জেগে রবে
সুপ্ত করা মন্ত্রজাল, অন্ধতম তমিস্রার মাঝে,
জীবনে রিক্ততা থাক, বিস্মৃতির রঙছুট সাজে।
হে বিস্মৃতি। তোমারেই বরিলাম আজ,
ভুলে যেতে দাও সব লাজ—
এ জনমে যত ঘনঘোর—
লুপ্ত কর সুপ্তিতলে—হে বিস্মৃতি মোর!
জীবনে যে একদিন বেজেছিল বসন্তের গীতি—
সব ভুলে যেতে দাও, হে মোর বিস্মৃতি।।।

আপনার ত্বকও

চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে

অভিনেত্রী সাধিনী চ্যাটার্জী সৌন্দর্যের প্রশ্নে কি বলেন শুনুন। "আমার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখার জন্যে," তিনি বলেন "আমি প্রতিদিন লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি।" স্নানে ও গাত্রমার্জনে লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করা যতিই আনন্দদায়ক—লাক্স সাবানটি এত কোমল, এত সুরভী। আপনিও আজ থেকেই লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিতে আরম্ভ করুন না কেন!

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স

টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 569-X52 BG

বিজ্ঞাপন লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

ডস্টয়েভ্স্কি :

স্ত্রী ও মেয়ের দৃষ্টিতে

সত্যব্রত বসু . [গতবারের পর]

৫

যেমন কথা ছিল, আনা রাত আটটায় আবার ডস্টয়েভ্স্কির বাড়ি এলেন। ডস্টয়েভ্স্কি তাঁকে সরাসরি নিজের টেবিলে বসিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওখানেই বোসো। অনেক সুবিধা পাবে।' এবং বলা বাহুল্য আনা তাতে খুব খুশি কারণ অত বড় একজন লেখকের টেবিল। আবার 'ক্রাইম এ্যাণ্ড্ পানিশমেণ্টের' মত বই, এইমাত্র সেদিন, এই টেবিলেই লেখা হয়েছে।

ডস্টয়েভ্স্কি সকালের চেয়ে এখন অনেক খুশি এবং সহজ। কিন্তু আনার নামটা তিনি ইতিমধ্যে ভুলে গেছেন। এবং এই নিয়ে তিনবার আনাকে সেটা বলতে হল। তারপর পারিবারিক নানা প্রশ্ন এবং কেন আনার শর্টহ্যাণ্ড্ শেখার শখ হল।

'শখ ঠিক নয়।' আনা বললেন। 'অবশ্য এমনো নয় যে আমি খেতে পাবনা। কিন্তু আমিও একালের মেয়েদের মত মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতাকে খুব সম্মানের চোখে দেখি। সেই জন্যই মেয়েদের কাজে নামতে হয়। এবং কাজ মানেই নিজের যোগ্যতার যাচাই। আপনি কী বলেন। ভাল না।'

আনা লিখছেন :

"ডস্টয়েভ্স্কির সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমি খুব সংক্ষেপে এবং সহজভাবে দিলাম। এমনকি খানিকটা হয়ত রূঢ়ভাবেই। ডস্টয়েভ্স্কিও পরে তাই আমাকে বলেছিলেন। আমি ঠিক করেই নিয়েছিলাম যে অফিসের বাইরে যদি কারো জন্য কখনো আমাকে কাজ করতে হয় তবে কখনই ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা নয়, যাতে কেউ অবান্তর বা অসঙ্গত কোনো কথা বলতে পারে। এবং আমি যে নিজের সম্মান বজায় রেখে সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারি এটাও ডস্টয়েভ্স্কিকে খুব মুগ্ধ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন আমিও হয়ত তখনকার নিহিলিস্ট্ মেয়েদের মত একজন ; তা নয় দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আমার মনে আছে যে সেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি একবারও হাসিনি।"

এরপর চা। কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কি, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ উঠে গিয়ে একটা কাগজের প্যাকেট থেকে দুটি পিয়ার ফল এনে একটি নিজে নিয়ে অপরটি আনাকে দিলেন। ভদ্রতার বহর দেখে আনা ত অবাক। 'এ আবার কী! চেনা নেই শোনা নেই, এরকম কেউ করে নাকি!' কিন্তু এ কার কথা শোনে। রাগ করতে গিয়ে আনা হেসে ফেললেন। ডস্টয়েভ্স্কি আনাকে পিয়ার নিয়ে নিজেও দিব্যি খেতে খেতে ঘরময় ঘুরে ঘুরে কথা বলতে লাগলেন। আনার কি হল না হল খেয়ালই করলেন না। 'কী করা যায়। এমন মানুষের উপর রাগ করা মানে শুধু শুধু সময় আর মেজাজ নষ্ট করা। অতএব বিলম্ব না করে আমিও হাত দিয়েই ফলটার সদ্গতি লাগিয়ে দিলুম।'

ডস্টয়েভ্স্কি সেইদিনই আনাকে তাঁর কর্মীজীবনের

গল্প শোনালেন: কী করে বিপ্লবীদের খাতায় তাঁর নাম উঠল, কী করে ধরা পড়লেন, তাঁর বিচার, প্রাণ-দণ্ড, তারপর ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে উন্মত্ত বন্দুকের গুলি থেকে কী করে মুক্তি এল এবং তারপর দূর সাইবেরিয়ায় তাঁর চার বছরের সশ্রম কারাবাস। এসব কথা শুনতে শুনতে আনা নিজের অজ্ঞাতেই কখন ডস্টয়েভ্‌স্কির অনেক কাছে এসে পড়েছিলেন। এবং বিস্মিতও। কারণ এত বড় একজন লেখক, হঠাৎ দেখলে কীরকম গম্ভীর এবং দূরের মানুষ মনে হয়,—অথচ কী সুন্দর, সহজ, সরল এবং সদালাপী। অবশ্য ডস্টয়েভ্‌স্কির জীবন তখন খুব নিঃসঙ্গ ছিল এবং মনের মত একজন মানুষের অভাবে মনে মনে তিনি উপবাসী ছিলেন। আনার মত শান্ত সুশ্রী ভদ্র এবং সুশীলা একটি মেয়েকে পেয়ে প্রথমদিনেই তাই যদি এত মুখর হয়ে উঠে থাকেন ত আশ্চর্যের কিছু নেই। 'কিন্তু সে যাই হোক', আনা লিখছেন, 'ডস্টয়েভ্‌স্কির পরিচয় পেয়ে প্রথমদিনই আমি অভিভূত হয়েছিলাম।'

এরপর ডিকটেশন নিতে গিয়ে প্রথমেই কিন্তু একটু গোল বেধে গেল:

'বরফের বড় বড় পা চালিয়ে তিনি আবার পায়চারি সুরু করলেন। বতবার কারারক্ষেসের কাছে আসেন প্রতিবারই সেখানে ছুটিবার চৌকা মারা চাই আর মুখে সিগারেট ত সমানে জ্বলছে, একমুহূর্ত কামাই নেই, মুখেরটা ফুরতে না ফুরতেই সেটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে নূতন একটা জ্বালিয়ে নিচ্ছেন। কতকটা লেখা হতে সেটা পড়ে শোনাতে বললেন। কিন্তু প্রথম লাইন ধরতে না ধরতেই সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিলেন:

' "কী পড়লে। ফ্রন্ কলোটিন্‌বার্গ্। আমি কি তাই বললুম?"

' "তাই ত বললেন।"

' "অসম্ভব।"

"অসম্ভব। আপনার নজেলে এই নামের একটা শহর নেই আপনি বলতে চান।"

' "তাই ত চাই। ঘটনাটা একটা শহরের ঠিকই কিন্তু ঐ নামটা শহরের নয়—ঐ শহরেরই একটা স্টেশনের।"

' "তা যদি হয় তাহলে ত এই নাম আপনিই বলেছেন। নাহলে আমি জানব কী করে! এই নামে যে একটা আভাস আছে তাই ত আমি প্রথম শুনলাম।"

' "তাই হবে। তোমার কথাই ঠিক। আমিই নিশ্চয় সব গুলিয়ে ফেলছি।" ডস্টয়েভ্‌স্কি বাধ্য হয়ে বললেন।'

'কিন্তু সে যাই হোক,' আনা লিখছেন, 'প্রথমেই এরকম একটা বাধা আসতে আমার মনটা কিরকম খারাপ হয়ে গেল। একেবারে সুরুতেই এমনি একটা ভুল। কিন্তু ভাল লাগল যে ডস্টয়েভ্‌স্কি তখুনিই সেটা সহজ করে নিলেন।'

প্রথমদিন এই পর্যন্ত। লেখাটা পরদিন নকল করে আনতে বলে ডস্টয়েভ্‌স্কি আনাকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

৬

কিন্তু মেয়াজের যা পরিচয় পাওয়া গেছে, আনা ভয়ে ভয়ে খুব ভাল করে লেখাটা নকল করে আনতে গিয়ে পরদিন প্রায় আধঘণ্টা মত দেরী করে ফেললেন।

'গিয়ে দেখি ডস্টয়েভ্‌স্কি দারুণ উত্তেজিত।

' "ওঃ, তুমি এসে গেছ! বাক বাঁচা গেল। আমি ত ভাবছিলাম তুমি আর এলেই না। হয়ত ভেবেছ যে আমার সঙ্গে কাজ করা শক্ত এবং করবে না। আমি আবার তোমার ঠিকানাটাও রাখিনি। এবং ভয় হচ্ছিল যে হয়ত কালকের লেখাটাও গেল।"

'দেরীর জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে বললাম যে সেরকম হলে আমি নিশ্চয় তাঁকে আগে থেকে জানাব এবং তাঁর লেখাও

ফিরিয়ে দেব।' তাছাড়া ছি ছি, আমার সম্বন্ধে তিনি এমন ভাববেনই বা কেন! কী লজ্জা!

কিন্তু রিকটেশন দেওয়া ডস্টয়েভ্‌স্কির পক্ষে একদিনেই সহজ হয়নি। অবশ্য অভ্যস্ত হতেও দু চারদিনের বেশি তাঁর সময় লাগেনি। এবং তারপর তাঁর বাকি বইগুলি, এমনকি সবশেষের বৃহদাকার শ্রেষ্ঠ বই 'ব্রাদার্স্ কারামাজোভ'ও ওই ভাবেই লেখা। পরে আবার এমন হয়েছিল যে আনা না হলে তাঁর লেখাই হয়ে উঠত না।

ক্রমশই ডস্টয়েভ্‌স্কি সহজ হয়ে উঠলেন এবং বই প্রতিদিন পাতার পর পাতায় ফুলে উঠতে লাগল। দুজনেই খুব খুশি। একে একে চরিত্রগুলি গড়ে উঠল এবং তাদের জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁরাও নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে লাগলেন। তারা আর বইয়ের মানুষ নয়,—প্রাণবন্ত ও সজীব,—যেন জগতেরই মানুষ। এদের নিয়ে তাঁদের মধ্যেও আবার পছন্দ অপছন্দের সমস্যা দেখা দিল। গল্পের ইংরেজ ভদ্রলোক মিস্টার অস্টলে'কে আনার খুব পছন্দ, আর ঐ বুড়ি দিদিমা, যে জুয়ায় তার সর্বস্ব বিকিয়ে দিল। কিন্তু পলিন! ওঃ, অসহ্য। আর ঐ নায়ক। অপদার্থ বলে বলে। না আছে চরিত্র, না আছে বোধ, না বুদ্ধি,—কী! মানুষ নাকি একটা! কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কির আবার এই লোকটির প্রতিই যত দরদ। বললেন যে এর জীবনের যে অনুভব ও অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিচয় আছে। এবং আসল মানুষটার সঙ্গে তার এইসব পিচ্ছিল বিচিত্র খেয়ালের কোনো সম্পর্ক নেই। একটা লোক হয়ত আর সমস্ত দিক দিয়ে খুব সুন্দর হতে পারে কিন্তু জুয়ার নেশায় সে হয়ত পাগল। সেখানে সে শিশুর মত অবুঝ এবং অসহায়। এসব নিয়ে তাই কোনো কথা চলে না।

লেখার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম গল্প হত তাঁদের মধ্যে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বলত ডস্টয়েভ্‌স্কি, আনা শ্রোতা।

'প্রায় প্রতিদিনই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের এক একটি দুঃখময় অধ্যায় তিনি আমার সামনে মেলে ধরতেন এবং নিজের অজ্ঞাতে কখন আমার সমস্ত মন তাঁর প্রতি গভীর মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। "বিখ্যাত লেখকের" ভয়টা আমার মন থেকে ক্রমশ কেটে গেল এবং আমিও খুব সহজ হয়ে উঠলুম। এমনভাবে কথা বলতুম তাঁর সঙ্গে যেন তিনি কতদিনের বন্ধু,—কিংবা যেমন আমার সঙ্গে বলেছি।

'আমি একদিন তাঁকে বললুম, আচ্ছা, আপনি সব-সময় আপনার দুঃখের কথা এত বলেন কেন। কখনই কি আপনি আনন্দ পাননি। কোনো সুখ সুন্দর আনন্দময় স্মৃতি নেই।

' "আনন্দ! না। সুখ যা আনন্দ তোমরা যাকে বলো তা আমি কোনোদিন পাইনি। চিরদিন আমি শুধু আশা করেই এলাম এবং এখনো করি। এই সেদিনই এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছি যে সারাজীবন আমার দুঃখে এবং মনকষ্টে কাটল কিন্তু আজো আমি আশাবাদী, আমি সুখের শান্তির স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন দেখি। মনে হয় জীবনটাকে নূতন করে আবার সাজাতে পারব।" '

'শুনে আমার খুবই কষ্ট লাগল যে এমন গুণী এবং শক্তিমান একজন মানুষের জীবনে কখনো সুখ ও শান্তি আসেনি। এবং প্রায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি এখনো সুখের স্বপ্ন দেখে চলেছেন।

' 'একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর বিবাহিত জীবনের গল্প উঠল। শুনলাম বছর দুই আগে ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। তাঁর ফোটোও দেখলাম কিন্তু আমার সেরকম ভাল লাগল না। রোগা; মনে হল বয়সও অনেক; মুখখানা প্রায় মরামানুষের মত। অবাক হলুম আরো যে এই কোটো নাকি মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে নেওয়া।

'এইরকম আলাপের সূত্রেই একদিন তাঁর মুখ থেকে

আনা করছিল ডুকভ্‌স্কির নাম শোনা গেল। এই মেয়েটিও তাঁকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কি তার সঙ্গে তাঁর নিজের চরিত্রের মিল হবেনা এই সন্দেহ পিছিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মেয়েটির প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধা দেখলাম। বললেন খুব নাকি গুণী এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে।

'একদিন আবার বললেন, তিনি মনে মনে তিনটে পন্থা ঠিক করে রেখেছেন: প্রাচ্যের দিকে যাবেন, কন্‌স্ট্যান্টিনোপল এবং জেরুসালেম,—সম্ভব হলে সেখানেই থেকে যাবেন; কিম্বা বিয়ে করবেন কাউকে,—না হলে বিদেশে গিয়ে জুয়া খেলবেন এবং জুয়া খেলে বড় লোক হবেন। এর মধ্যে কোনটা আমার পছন্দ জিজ্ঞাসা করতে আমি বললাম যে বিয়েটাই ভাল।

' "বিয়ে! তুমি কি আশা করো যে কোনো মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে।"

' "না হবার কী।"

' "কিন্তু কিরকম মেয়ে পছন্দ করা যায় বলো ত! খুব বুদ্ধিমতী, না সহৃদয়া।"

' "নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী।" আমি বললাম।

"না। আমাকে যদি বলতে বলো ত আমি সেরা জনকেই পছন্দ করব। সে আমাকে চিরদিন ভালবাসবে এবং শ্রদ্ধা করবে।"

'এরপর স্বভাবতই আমার বিয়ের কথা উঠল এবং আমি খোলাখুলিই বললাম যে দুটি যুবক আমার প্রতি আগ্রহশীল কিন্তু আমি রাজী হতে পারছিনা কারণ আমি জানি তাদের কারো প্রতিই আমার ভালবাসা নেই। ডস্টয়েভ্‌স্কি বললেন, "ঠিকই। ভালবাসা ছাড়া বিয়ে হওয়া উচিত নয়। তাতে জীবন সুখের হয়না। বিয়ের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাই একমাত্র কথা নয়।'

মাঝে মাঝে সমসাময়িক লেখকদের কথা উঠত এবং আমার এসব কথা শুনতে খুব ভাল লাগত। টুর্গেনিভ্‌ সম্বন্ধে একদিন বললেন যে খুব ভাল লেখেন, রীতিমত শক্তিশালী লেখক। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করলেন যে চিরকাল বাইরে বাইরে কাটানোর জন্য রাশিয়ার জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ নষ্ট হয়ে গেছে। আর বললেন তাঁর কবিবন্ধু মাইকভের কথা: খুব নাকি ভাল লেখেন এবং জ্ঞানী।'

আমার সঙ্গে একদিন মাইকভের পরিচয়ও হয়ে গেল।

'একদিন আমরা দুপুরে লিখছি, হঠাৎ মুখ তুলেই দেখি দরজার সামনে মাইকভ্‌। কখন এসেছেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আমরা কিছুই জানিনা। কারণ ডস্টয়েভ্‌স্কির ফ্ল্যাটের দরজা সবসময় খোলা থাকত এবং কেউ এসে যদি ফ্ল্যাটশুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে যেত ও কিছুই আশ্চর্যের ছিলনা। মাইকভ্‌ এসেছে ডস্টয়েভ্‌স্কির প্রতি দু একটা সহাস্য মন্তব্য করে ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধুকে পেয়ে ইনি ত দেখি খুব খুশি। আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এই যে মাইকভ, ইনি শ্রীমতী আনা গ্রিগরিয়েভনা স্নিটকিন। আমাকে লেখায় সাহায্য করছেন। খুব গুণী মেয়ে, এঁর সাহায্য না পেলে" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার খুব ভাল লাগল বইকি। শুধু প্রশংসার জন্যই নয়, যে রকম আগ্রহ এবং সম্মানের সঙ্গে তিনি মাইকভের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাইকভ্‌কে কবি হিসাবে আমি আগেই ভালবাসতাম, এখন ডস্টয়েভ্‌স্কির মুখে তাঁর গুণের কথা শুনে তা আরো গভীর হল।'

কিন্তু দিন ক্রমশই ফুরিয়ে আসছিল এবং আনা মনে মনে এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠছিলেন। ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে এখানে তাঁর সময়টা ভারি সুন্দর কাটত। এর পাশাপাশি তাঁর নিজের পরিবেশটা তিনি কল্পনা করতেন:

'কী বিশ্রী! কী সাধারণ! তুচ্ছ, বোবা এবং গতানুগতিক, কী কাঁকা এবং ফাঁপা। আমার পরিচিত ছেলেমেয়ে

এবং তাদের কথাবার্তার ধরন মনে পড়ল। অনার, অসাড়। ঔদ্ধত্যের ছায়া। ডস্টয়েভ্‌স্কির বক্তব্যকে বুদ্ধির দীপ্তিতে, কথার ফুলিঙ্গে আমার সমস্ত সত্তায় আনন্দের আভা ফুটে উঠত। প্রতিদিনই আমার চেতনা মনে হত নূতন নূতন আইডিয়ার আলোয় উদ্ভোচিত হয়ে উঠছে,—বাড়ি গিয়ে আবার পরদিন কতক্ষণে আসব এই প্রতীক্ষা করতাম এবং তা কত ভাল লাগত ভাবতে। এবং সেই মুহূর্তগুলি যে ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে এই কথা ভেবে মনে মনে আমি বিষণ্ণ হয়ে উঠলাম। এবং খুব ভাল লাগল যে একদিন ডস্টয়েভ্‌স্কি নিজেই একথা তুললেন।

'প্রায় দিন পাঁচেক বাকী থাকতে তিনি একদিন বললেন, "আন্যো আনা, এই ক'দিনে আমরা পরস্পরের কাছে বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। এবং এখন এই যে কাজ শেষ হয়ে যাবে তারপর আর হয়ত আমাদের দেখাই হবে না। আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগবে,—খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। তোমার সঙ্গে কি কোথাও দেখা হতে পারেনা।"

' "না পারার কি আছে।" আমি বললাম।

' "কিন্তু কোথায় ?"

' "কেন, কোনো সামাজিক নিমন্ত্রণে, পার্টিতে, থিয়েটারে সভায়, আসরে,"

' "কিন্তু তুমি ত জানো আমি সামাজিকতা পছন্দ করি না। থিয়েটারেও কত কম যাই। তাছাড়া সমাজে গিয়ে কী হবে যেখানে কেউ মন খুলে দুটো কথা বলতে পারে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক এসো, একদিন তোমাদের বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করো—সেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করে আসিগে।"

' "সত্যি, আসুন না, খুব খুশি হব। কিন্তু আমাদের বাড়ি গিয়ে কি আপনার ভাল লাগবে। সেখানে ত কেবল মা আর আমি। নিশ্চয়ই খুব বিশ্রী লাগবে আপনার।" '

' "ওকথা থাক। কবে আসতে পারি তাই বলো।"

"সে পরে তখন ঠিক করা যাবে। এখন ত বই শেষ হোক। আগে কাজ তারপর অন্যসব।" '

ঠিক। আনা ও আমার খাটি মেয়ে এবং খাটি মেয়েরা কাজ ছাড়া বোঝে কী! কিম্বা কাজই তাদের সকলের আগে।

বইটা শেষ হতে ডস্টয়েভ্‌স্কির প্রস্তাব ছিল যে হোটেলে একটা পার্টি দেবেন। সেখানে তাঁর কবি ও লেখকবন্ধুরা সব আসবেন, আনাকেও যেতে হবে। কিন্তু আনার ঐ 'না'। খাটি মেয়ে ত। 'আমি অবশ্য বললুম যে আচ্ছা আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখব কিন্তু আমি জানতুম যে যাব না। ওসব বাইরের আদবকায়দা আমি জানি না,—গিয়ে হয়ত বোবা মুখে বোকার মত বসে থাকব,—সমস্ত পার্টিটাই নষ্ট।'

পরদিন ৩০ অক্টোবর,—ডস্টয়েভ্‌স্কির জন্মদিন। লেখাও শেষ,—শেষ পরিচ্ছেদের বাকী অংশ নকল করে আনা পৌঁছে দিতে এসেছেন। সেইদিন কাজও শেষ।

'আমাকে দেখেই ডস্টয়েভ্‌স্কি দাঁড়িয়ে উঠলেন। লক্ষ্য করলুম যে তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমি সেদিন আমার সাধারণ কালো পোষাক ছেড়ে ভায়োলেট রঙের একটা ফ্রক পরে এসেছিলাম। ডস্টয়েভ্‌স্কি বললেন যে তাতে নাকি আমাকে অনেক সুন্দর ও দীর্ঘাঙ্গী দেখাচ্ছে। এবং তাঁর মুখে তা শুনে নিশ্চয়ই খুব খুশি হওয়া গেল।'

এই সময় এমিলি এলেন, ডস্টয়েভ্‌স্কির বিধবা ভ্রাতৃজায়া কিন্তু আনা ও সামান্য একজন স্টেনো, একজন কাজ করা মেয়ে—আর তিনি সম্ভ্রান্ত এক মহিলা, বিখ্যাত এক লেখকের আত্মীয়া,—অতএব আনাকে খুব স্পষ্টভাবে তিনি অগ্রাহ্য করলেন। ডস্টয়েভ্‌স্কি খুব অন্তর্মনস্ক প্রকৃতির মানুষ হলেও এটুকু লক্ষ্য করলেন। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত একখানা বই আনাকে উপহার দিয়ে এমিলিকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি কথা বলতে লাগলেন। আনার খুব

খারাপ লাগছিল কিন্তু সেই সময় মাইকেল আসাতে তিনি বেঁচে গেলেন।

মাইকেল্ মাথা নুঁইয়ে অভিবাদন জানালেন কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝলুম যে তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। ভন্টরেভ্স্কির দিকে ফিরে মাইকেল্ জিজ্ঞাসা করলেন, "নভেল কতদূর," কিন্তু ভন্টরেভ্স্কি এমিলির সঙ্গে কথা বলছিলেন, মাইকেলের প্রশ্ন তাঁর কানে গেলনা। সুতরাং তাঁর হয়ে আমিই জবাব দিলুম। বললুম যে বই কাল শেষ হয়েছে এবং শেষ অংশ আমি এই মাত্র কপি করে এনেছি।

'এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল এবং এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "মাফ করুন, চিনতে পারিনি। আমার চোখটা আবার একটু খারাপ। তাছাড়া আপনাকে বরাবর কালো পোষাকে দেখেছি, তাতে আপনাকে কিরকম ছোটো দেখাত।" যাক, বই নিয়ে তারপর আমরা কথা বলতে লাগলাম এবং আলোচনার মধ্যে কখন যে কুড়ি-মিনিট পার হয়ে গেছে আমরা লক্ষ্যই করিনি।

'আমার প্রতি মাইকেলের এই আগ্রহ এবং আন্তরিকতায় এমিলি দেখলাম খুব অবাক হয়েছেন। এমনকি খানিকটা আহতও। কিন্তু তাতে তাঁর গলার স্বরে কিছু পরিবর্তন হলনা। কারণ, আর যাই হোক, আমি ত একজন *স্টেনো-গ্রাফার*,—সামান্য এক কাজ করা মেয়ে।

'মাইকেল্ চলে গেলেন এবং আমিও উঠে আসছিলাম কিন্তু ভন্টরেভ্স্কি আমাকে আরো কিছুক্ষণ থেকে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ জানালেন। এমিলির ব্যবহারে তিনিও খুব দুঃখীত হয়েছিলেন এবং সেটা মুছে ফেলার জন্যই হল্ পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এসে আমার প্রতিশ্রুতির কথাটা আবার মনে পড়িয়ে দিলেন।

' "তুমি কিন্তু তোমাদের বাড়িতে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে বলেছিলে।"

' আমি বললুম, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

' "কবে তাহলে আসতে পারি বলো। কাল?"

'না, কাল না, কাল আমি বাড়ি থাকব না। কাল আমার দিদির বাড়িতে যাবার কথা আছে।'

' "আচ্ছা তবে পরশু।"

' "না, পরশুও না, পরশু আমার ক্লাস্।"

' "বেশ। তবে তার পরদিন বুধবার।'

' "বুধবার আমি থিয়েটারে যাচ্ছি।"

' "গড্। তোমার যে দেখছি সবদিনই কাজ! আমার কি মনে হচ্ছে জানো। মনে হচ্ছে এই সব তুমি বানিয়ে বলছ। মানে আমাকে আসতে দিতে চাও না। বলো ত ঠিক কিনা।"

' "বাঃ, তা কেন। আপনি ডিনারে আসুন না।"

' "মানে বৃহস্পতিবার।"

' "বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার পরে।"

' "বাবা, বৃহস্পতিবার। সে যে অনেক দেরী গো। অতদিন আমি থাকব কী করে।"

'এবং এই কথা আমার কানে এত মধুর শোনাল।'

৭

সেটা ছিল তিরিশ অক্টোবর। এর আটদিন পরেই তাঁরা প্রতিশ্রুত হলেন। এবং এ পরিচ্ছেদ সবটাই আমার কলম থেকে:

'তারিখটা আমার মনে আছে। নভেম্বর ৮, ১৮৬৬। আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। ঐ দিনই ভন্টরেভ্স্কি আমার কাছে প্রস্তাব করেন,—বলেন, আমাকে ছাড়া তাঁর চলবে না, আমাকে তাঁর স্ত্রী হতে হবে।

'সেদিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন,—মাঝে মাঝে রোদ। আমি তাঁর বাড়ি পর্যন্ত সেদিন হেঁটে এলাম এবং পৌঁছতে প্রায় আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। ভন্টরেভ্স্কি খুব অধৈর্য হয়ে

আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন,—আমার গলা শুনেই বাইরের ঘরে উঠে এলেন।'

এর মধ্যে অবশ্য দুদিন আরো তাঁদের দেখা হয়েছিল: প্রথমদিন আনার কথামত বৃহস্পতিবারে তাঁদের বাড়িতে, দ্বিতীয়দিন সেই রবিবারেই।

প্রথমদিনই ডস্টয়েভস্কি প্রস্তাব করেছিলেন যে তিনি ক্রাইম্ এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট, তৃতীয় পর্ব লেখা ঠিক করে ফেলেছেন এবং আনার সাহায্য চাই। আনা ঠিক তক্ষুনিই রাজী হতে পারেননি কারণ অলখিনকে না বলে ডস্টয়েভস্কির কাছে আবার নূতন কাজ নেওয়া ঠিক সমীচীন হয় না। কিন্তু ওটা আনারই আপত্তি মনে করে ডস্টয়েভস্কি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়দিন হঠাৎ, কোনো কিছু ঠিক না করেই।

আনার সেদিন তাঁর বর্ষীয়ার বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রণ ছিল। বেরুতে তখনো কিছু দেরী ছিল, সেই সময়টা কাটাতে আনা পিয়ানো খুলে বসেছিলেন। এমন সময়,

'আমার মনে হল যেন পাশের ঘরে কার পায়ের আওয়াজ পেলাম এবং ফিরেই দেখি, ডস্টয়েভস্কি। পিয়ানো ফেলে সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে এলাম।

'"ভাগ্যে আনা, আবার আমি এসে পড়েছি।" ডস্টয়েভস্কি বললেন। "না এসে কিছুতেই পারা গেল না। এই ক'টা দিন কি বিশ্রী যে আমার কেটেছে। আজ সকালে উঠে থেকে তাই কেবলই ভেবেছি যে কী করা যায়। এই সেদিন এসেছি, দুদিন না যেতেই আবার যদি আসি ত কী বিশ্রী। তোমার মা হয়ত কত কী মনে করবেন। তারপর ভাবতে ভাবতে ভাবো ঠিকই চলে এসেছি। খুব অন্যায় হয়ে গেল নিশ্চয়। কী বলো।"

তা ত হলই কিন্তু কি করা যায়। আনা লিখছেন,

'সেদিন কিন্তু কথাবার্তা তেমন জমল না। আমি কেবল তাঁর প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে গেলাম।' এমন কি আনা বিরক্ত হলেন যে এই লোকটি এমন অসময়ে এসে পড়াতে এখন তাঁর নিমন্ত্রণে যেতে বেশ দেরী হয়ে যাবে।

ডস্টয়েভ্‌স্কি প্রস্তাব করলেন যে ফেরার পথে আনাকে তিনি তাঁর গাড়িতে করে নিমন্ত্রণের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

'গাড়িটা যখন একটা বাঁক পার হবে, ডস্টয়েভস্কি টাল বাঁচাতে অজুহাত করে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। সিক্‌স্‌টির মেয়েদের মত আমিও তখন পুরুষদের এই সব সামাজিক আচরণগুলো—যেমন মেয়েদের হাতে চুমন করা কিম্বা তাদের কোমরে হাতের বেড় দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনা ইত্যাদি,—খুব আপত্তির চোখে দেখতাম। অতএব আমি বললুম, "ঠিক আছে, অত ব্যস্ত কী! আমি নিশ্চয় পড়ে মরব না।"

'সামান্য ব্যাপার, কিন্তু আমার ব্যবহারটা যেন একটু বেশিই রুক্ষ হয়ে গেল এবং বুঝলুম যে ডস্টয়েভস্কিও খুব লাগল। কিন্তু বললেন, "হ্যাঁ, পড়ো না, পড়ে মরো, আমি তাহলে খুব খুশি হব।"

'তাঁর এই জবাবে আমি খুব হাসলাম এবং হাসির ভিতর দিয়ে ওমটটা পরিষ্কার হল। এরপর সমস্ত রাস্তাটা আমরা সহজভাবে গল্প করতে করতে কাটিয়ে দিলাম। গাড়ি থেকে নামবার আগে ডস্টয়েভস্কি আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে আমি মঙ্গলবার আসব এবং ক্রাইম্ এ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে তাঁকে সাহায্য করব।'

এবং এই সেই মঙ্গলবার।

"যাক, তাহলে এসেছ!" ডস্টয়েভস্কি এগিয়ে এসে আমার কোট ও ফার খুলতে সাহায্য করলেন। তারপর একসঙ্গে আমরা তাঁর টাইপিতে এলাম। ঘরের ভিতরটা সেদিন বেশ

উজ্জ্বল এবং মনে হল ভল্টারেন্ড্‌ঝির মুখেও যেন তার আভা ফুটে উঠেছে। এবং মনে হল মনে মনে কিছু একটা নিয়ে তিনি খুব খুশিও।

"তোমাকে দেখে যা খুশি হলুম।" তিনি বললেন। "ভয় হচ্ছিল, হয়ত তোমার মনে নেই, ভুলে গেছ, হয়ত আসবে না।"

"কেন এমন ভাবলেন। কোন কথাটা আমি আপনার রাখিনি বলুন ত!"

"না না, তা ত ঠিকই। আমি ত জানিই যে আমরা খুব মজী মেয়ে। কিন্তু তুমি যে এসেছ এতে আমার এত ভাল লাগছে!"

"সে আমারও। বিশেষ আপনাকে এত খুশিতে দেখে। মনে হচ্ছে কিছু যেন সুখবর আছে!"

"তা আছে। আমি কাল রাত্রে খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

"বলেন কী। স্বপ্ন।" এবং বলেই আমি হেসে ফেললাম।

"শোনো,—দয়া করে হেসনা। স্বপ্ন মানে তুমি ভাবছ ত যে আজগুবি কিছু। কিন্তু তা নয়, স্বপ্ন আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। এবং দেখেছি আমার স্বপ্নগুলো সবই ফলে যায়। যখনই আমি স্বপ্নে মিশাকে দেখি,—মিশা আমার ভাই, মারা গেছে,—কিম্বা বিশেষ করে বাবা, আমি জানি যে কিছু একটা অঘটন ঘটছেই।"

"তাই নাকি।"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আপনার স্বপ্নটা শুনি ত।"

"আচ্ছা তাহলে শোনো। ঐ সোনার কাঠের বাক্সটা দেখছ ত। ওটা আমার এক বন্ধুর দেওয়া,—সেই সাইবেরিয়ার থাকতে। আমার কাছে ওটার অনেক দাম। আমার যত দরকারী কাগজপত্র, চিঠি, লেখা, সব আমি ঐখানেই রাখি। কাল স্বপ্নে দেখি, আমি ফেল বাক্সটা খুলে কি একটা জরুরী কাগজ খুঁজছি। একসময় সেটি কাগজপত্রের ভিতর থেকে কি একটা জিনিষ চক্‌চক্ করে উঠল: দেখি উজ্জ্বল ছোট্ট সুন্দর একটি তারা—আমি কাগজপত্রই দেখছি আর ঐ তারাটা একবার জ্বল জ্বল করে জ্বেগে ওঠে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। বেশ মজা ত। আমি তারপর আস্তে আস্তে কাগজগুলো সরিয়ে ফেলতে লাগলাম, এবং তারপর দেখি তার মধ্যে একটা হীরে। খুব সুন্দর, আর তেমনি জ্বলা।"

"ওটা নিয়ে কী করলেন তখন।"

"ঐ খানেই ঘুমিয়ে। স্বপ্নটা তারপর আর মনে নেই। আরো হিজিবিজি কি সব স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু ঐ হীরেটার যে কী হল কিছুই মনে নেই। কিন্তু স্বপ্নটা খুব ভাল।"

আমি বললুম, "লোকে কিন্তু স্বপ্নে যা দেখে তার উল্টোটাই ফলে।" এবং বলেই আমি অনুতপ্ত হলুম কারণ সঙ্গে সঙ্গেই ভল্টারেন্ড্‌ঝির মুখে ভাবান্তর ঘটল।

"তাই বুঝি।" তিনি ম্লানমুখে বললেন।

"তাই কিনা তা অবশ্য আমি জানি না তবে লোকে এইরকম বলে তাই শুনেছি। এবং তাদের কথাও আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না।"

কিন্তু তাঁর মুখের প্রফুল্ল ভাবটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল এবং এজন্য আমি নিজেকেই দায়ী করলুম। আমি আবার তাঁকে সহজ কথাবার্তার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করলুম। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি স্বপ্ন দেখি কি না এবং কী স্বপ্ন দেখি আমি সেই সুযোগটা কাজে লাগালুম।

"আমার বেশিরভাগ স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের হেডমিসট্রেসকে নিয়ে, স্বপ্নেও তিনি কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে কেবল লেকচারই দিয়ে যান। আর মাঝে মাঝে একটা হলুদ বেড়ালকে দেখি,—সেটা আবার একদিন

(পরবর্তী ২৮০ পৃষ্ঠায়)

উত্তরণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

। নীলিমা দাশগুপ্ত ।

ঘাটিস্ ঘোস দুহিতা রীতার আজ বিয়ে।

অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত ঘোসের সুবৃহৎ বাড়িখানা যেন পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্রপুরী ব'লে ভ্রম হয়। বাইরে ভেতরে অবিরাম জনতার স্রোত ব'য়ে চলেছে। আমন্ত্রিত সবাই কলহাস্যে মুখরিত। প্রাচীরের দুহাত অন্তর সুদৃশ্য দারু নির্মিত হাতী শুঁড়ের ছিদ্র পথ দিয়ে লাল, নীল, সবুজ আলো বিকীরণ করছে। মোসল আর্টের অনুকরণে হাতীগুলির গঠন সৌষ্ঠব। গঠনের অপরূপ নকসা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সহস্র সহস্র বৈদ্যুতিক আলোয় রাত্রি দিন হয়ে গেছে যেন।

গেটের মাথায় ওয়েলকামের আলোগুলো জ্বলছে একবার, একবার নিভছে। প্রধান দরজায় স্বাগতম জানাচ্ছেন, অনিমেষ বাবু-রীতার বড়দা। বাহার ইঞ্চি শান্তিপুরী ধুতি ও গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরে উনি কিছুটা আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছেন। বাঁ হাতে কোঁচা এবং ডান হাতে পাইপ ধরে অনিমেষ বাবু অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে এগোচ্ছেন-পেছাচ্ছেন। দ্বিতীয় দরজায় অর্থাৎ হলের সামনের দরজায় স্বাগতম জানাচ্ছেন মীনাদেবী—রীতার মিসি। উনি সকলকেই সমাদরে আহ্বান জানিয়ে হলঘরে ঢোকাচ্ছেন, তারপর ধীরে ধীরে হল একবার প্রদক্ষিণ করিয়ে সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের তলায় নিয়ে বসাচ্ছেন।

হলে ঢুকলেই মনে হবে, নিউমার্কেটে ঢুকলাম নাকি? যেন শত শত বিপণি বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে রেখেছে। বিপণিতে বিপণিতে মনোহর বর্ণাঢ্য দৃষ্টি আকর্ষণকারী বস্তুর সমাবেশ। অজস্র, অসংখ্য। সকলেই চোখ বিস্ফারিত করে মুখে সুন্দর মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে হাড়ু লাভ্লি!—সো চার্মিং, নাইসলি ডান্ বলতে বলতে হল প্রদক্ষিণ করে প্যাণ্ডেলে গিয়ে বসছেন। লাউড্ স্পীকার ঘোষণা করলো, এবার রীতাদেবী স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠান শেষ করে আসরে এসে বসলেন। রীতার বান্ধবী এবং অসংখ্য বর ফ্রেণ্ডরা ওর কাছে এসে গুঞ্জন তুললো। বিরাট প্যাণ্ডেলের একপাশে দুসারি লাল গদিমোড়া চেয়ার। তারই মাঝখানে এসে বসলো রীতা। গদিমোড়া সোফার হাত দুই পরেই ছোট ছোট টেবিল সাজানো। এক একটি টেবিলকে কেন্দ্র করে চারপাশে চারটি চেয়ার। সামনের টেবিলের একটাতে বসেছিলো মল্লিকা। ওর ভাল লাগছেনা। বৌদিকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন রীতাদেবীর মা। ও একা একা করে কী? কান পেতে রীতাদের কথা শোনবার চেষ্টা করতে লাগলো মল্লিকা। বান্ধবী এবং বর ফ্রেণ্ডদের নানাভাবে রীতাকে কনগ্র্যাচুলেট করা হ'য়ে গেছে। এখন ওদের কথার স্রোত বইছে সাধারণ খাতে। মাদ্রুকা অবাক হলো এই ভেবে যে ওর বয়সী মেয়েরা কত কিছু জানে, অথচ ও-তার বিন্দু বিসর্গও জানে না,—রীতাদির প্রত্যেকটি বান্ধবীই দেখছি ক্রিকেট ম্যাচ সম্বন্ধে মস্ত সমঝদার—মনে মনে বললো মল্লিকা। কোণা থেকে একটি মেয়ের অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠ কানে এলো, "এমন ব্যস্ত টাইমের ইন্‌ভুয়েজার ক্বলাম ক্রিকেট সিজনে মাঠে একদিন যেতেই পারলাম না—।"

"হুখিত—" রীতা মিহি হেসে সান্ত্বনা দিলো "আমার দুঃখ অত সহজে যাবে না রীটা, ক্লাবে পার্টিতে আজকাল যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি—।"

—"হোয়াই?" বু গাভার্ডিনের ফুটপয়া ছেলেটি বলে

উঠলেন পাশ থেকে। "কারেক্ট টপিক্সে মোদ দিতে পারবো না—খেয়ে যাও?" ছেলেটির অজস্তার কোণের মেয়েটি যেন ব্যঙ্গ করে উঠলো।

তাই বলাবাহুল্য রস পাচ্ছিলো—মল্লিকা এবার চোখ পাতলো প্যাণ্ডেলের শোভায়। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো কারুকার্য্য। নানারঙের ফুলের বর্ণ মিশিয়ে ঝড়ানো ঝাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুকাল। তারপর চোখ বুলালো নিওন লাইটের মালিতে, তারপর তার থেকে ঝোলানো শুভ্র ফুলের গুচ্ছে, তারপর একেবারে প্যাণ্ডেলের ওপরের চাঁদোয়ায় চোখ রাখলো কিছুক্ষণ। তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক সময় দিয়ে মিরর্থ রঙিন পতাকার মতো চাঁদোয়াটাকে দেখতে লাগলো।

"হাল্লো……চিত্রিতা? হোয়াই সো লেট ··?"

রীতাদির বিলাতীয় মিহিকণ্ঠ কানে যেতে চোখ নিচু করলো মল্লিকা। চিত্রিতাদেবী সত্যিই সার্থকনামা। গাল, নখ, ঠোঁট রাঙিয়েই ক্ষান্ত হন নি তিনি, ভুরু একেবারে কামিয়ে ফেলে, তুলি টেনে নিপুণ হাতে ভুরু এঁকেছেন। আবরণে এবং আভরণে বেশ কিছুটা মাখা ঘামানো হয়েছে বোঝা যায়। সময় কাটাবার মতো কিছু যেন একটা অবলম্বন পেয়ে গেলো মল্লিকা। "ভেজেনের কাণ্ড। কিছুতেই ছাড়বে না—" কৃত্রিম কৈফিয়তের সুরে বললেন চিত্রিতা। সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। "উদয়শঙ্করের 'রামলীলার' দুখানা টিকিট কেটে বসে আছে দশটাকা করে। যেতেই হবে আজকে—। বললাম—খেপেছো ভেজেন? কুড়িটাকা ফেলো-ফেলো। রামলীলা আজ না হোক কাল কিম্বা যে কোন একদিন দেখা চলবে কিন্তু রীতার বিয়েতো আর কোনো দিন আর দেখা চলবে না। শেষ পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে কষি হাউলে কষি খেয়ে তবে ছুটি পেলাম……। যদি বাজলে হবে কী ভেজেন একেবারে ছেলেমানুষ।" আবেগের চোটে মাথা দুলিয়ে কথা শেষ করলেন চিত্রিতা। "মিঃ আই মিন, ভেজেনবাবুকে তো ঠিক চিনলাম না—" কে যেন বলে উঠলো পেছন থেকে। সমর্থন করল অনেকেই। রীতা কৌতুকের সুরে বললে, "চিত্রিতার মেটেই বয়-ফ্রেণ্ড ও……বার্ডিলিতে আলাপ, বাট নট লাই।" হাসি দিয়ে কথা শেষ করল রীতা।

"নো চিয়ার নো—জোক্ট বি হার্টলেশ। যারা যাবে পুওর ভেজেন তাহলে—"

জিভ তালুতে লাগিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত চুক্ চুক্ শব্দ করে, ভেজেনের অসহায় ভাবটা বোঝাতে চেষ্টা করলেন চিত্রিতা। সকলে সমস্বরে হেসে উঠলেন।

"কনগ্র্যাচুলেশন রীটা ডার্লিং"—মুখ ফিরিয়ে দেখলেন সবাই, এক পাতা বই হাতে করে হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ রয় অর্থাৎ কল্যাণবাবু। হাতখানি দ্বারা আহ্বান জানালেন সকলে।

রীতা চুপ। চোখের মণিদুটো স্থির করে একাগ্রদৃষ্টিতে নাকের ডগার দিকে তাকিয়ে রইলো। কল্যাণ এগিয়ে এসে রীতার সামনে বইগুলো মেলে ধরলো। "দেখো তো এঁদের লেখা তোমার প্রিয় কি না?" রীতা একেবারে চুপ। আরো অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো নাকের ডগায়। সামনের টিপয়ে রীতার ভ্যানিটি ব্যাগের পাশে বই এর পাতা রাখলো কল্যাণ। সামনের সমস্ত গদি মোড়া চেয়ার অধিকৃত। ঘুরে মল্লিকার সামনে এসে একমুহূর্ত তাকালেন মল্লিকার দিকে। কল্যাণের চোখের সাতছায়া মল্লিকার স্নিগ্ধ চোখের ওপর পড়লো, "বসতে পারি এখানে মল্লিকাদেবী?" "বাঃ নিশ্চয়ই" রীতাদির অভদ্রতা ঢাকবার জন্য-ওর আরও কিছু বলতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু মুখে যোগালো না। রীতা ছোট্ট আয়নাটা মুখের সামনে ধরে আড়চোখে একবার দেখে নিলে মল্লিকাকে। কল্যাণ চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের দলে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। রীতার মুখের দিকে চেয়ে রইলো একটুকাল, তারপর

সকলের মুখের ওপর ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে হাল্কা ক'রে হাসলো একটু। সকলে জানালেন একসঙ্গে অনুযোগ "আমাদের মধ্যে আপনাকে আজকাল পাইনে কেন? কী হয়েছে আপনার···?

"কিছু না।" "তবে?" কারণ জানতে চাইলেন চিত্রিতা।

"নিওগের ঠাঁই কী ওষ্টার সভায় হয়? যার জন্য রীতাকে হারালাম—। এতকাল ধরে রীতার ডানপাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারলেম না—" অনেকের অনেক দিনের চাপা কৌতূহল ঐ এক কথায় নিরসন করবার চেষ্টা করলো কল্যাণ। কিন্তু কল্যাণের উজ্জ্বল চোখ আর হাসি হাসি মুখ রীতার সর্বাঙ্গে বিদ্যুতির জ্বালা ধরিয়ে দিলে। বয় কোল্ড ড্রিঙ্ক পরিবেশন করে ফিরে যাচ্ছিলো। রীতা অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকলো। "ব-য়!" "জী-"? "রামদাসকো বোলা দো—" "বহুৎ আচ্ছা জী।" সেলাম জানিয়ে চলে গেলো বয়। তক্ষুণি রামদাস এসে নম্রভঙ্গিতে সেলাম জানালো। "রামদাস—।"

"জী-ই-।" "ইয়ে সব কিতাব বক্সকমকে কিনারামে রোখ দে—" রামদাস কিছুটা থতমতো খেয়ে বললে "হা-জী-?" "কিউ·····? সমঝা নেই·····?" ধমকে উঠলো রীতা। ধমক খেয়ে রামদাস তাড়াতাড়ি বইএর গাদা তুলে নিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হলো। আজ মিস্ সাবের সেলাম চললে আর হুকুম নেই ওর। বড়লোকের সেলামের জোয়ার ভাটার খবর ওর মতো পচিশ টাকা বেতনের নোকরের রাখার কথা নয়। কোল্ড ড্রিঙ্কে এক চুমুক দিয়ে মুখে হাসি বজায় রেখেই বললো কল্যাণ, "আমি অবশ্য বকসলমের কোনায় যায়গা পাবার মতোই পাত্র, বইগুলো কিন্তু নিঃসন্দেহে হলঘরের প্রেসেন্টেশনের সঙ্গে যায়গা পাবার যোগ্যতা রাখে—।"

"থামো তোমার কথাবলার ঐ টেকনিক অতি পুরোনো হ'য়ে গেছে—" উষ্ণ কণ্ঠে ধমকালো রীতা এতক্ষণ পরে।

"কী হলো-? অন্তত বইগুলো একবার—" মলিনা এসে পড়ায় থেমে গেলো কল্যাণ। জানদীতে ভেলভেটের একটা বাক্স নিয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে ঢুকলো মলিনা, "রীতা! তোকে মা এখন এটা পরতে বলেছেন—" বাক্স খুলে সোকরাজ ও পান্নাখচিত অপূর্ব নেকলেসটা রীতার গলায় পরিয়ে দিলে মলিনা। "ছোড়দা, এই এলে বুঝি-?" কথা শেষ করে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই কল্যাণ ডাক্ দিলেন, "টুনটুয়া! মা'রা সব কোথায় রে-?"

"মা, বৌদি মিস্ সাজানোর ঘরে আছেন। বাবা, দাদা বোধহয় পেছনের টেনিস লনে, যেখানে বিয়ের যায়গা করা হয়েছে—"

"আর তুই-?" ঘাড়কাত করে আড়চোখে একবার একলা-বসা মল্লিকার দিকে তাকালো কল্যাণ। "আমি এই এলাম বলে—। হলঘরের পাহারায় আমাদের বসিয়ে রেখেছেন কাকীমা, এইবার তালা লাগিয়ে আমি আর নীনাদি চলে আসছি-।" দ্রুত চলে গেলো মলিনা। কল্যাণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "যাই ওদিকে কাকাবাবুর কিছু একটু সাহায্য করি গে—" "আই সে কল্যাণ—উপ, যেওনা ভেতরে—" দৃঢ় অসহিষ্ণু কণ্ঠ রীতার। কল্যাণ ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে গেলো, "ব্যাপার কী রীতা-?"

রীতা থামের দিকে চোখ রেখে বিদ্রূপের স্বরে বললো, "তোমার সিভিক সেন্স সম্বন্ধে আমরা আস্থাবান ছিলাম ব'লে? "গেলো কিসে-?" কল্যাণের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। রীতার আচরণের অস্বাভাবিকতা সকলের কাছেই অদ্ভুত ঠেকলো। রীতা বেপরোয়া, সোজাসুজি তাকিয়ে চোখদিয়ে এবার বিদ্ধ করতে চাইলো কল্যাণকে।

"বাড়ীতে আলাদা কাপ প্লাসের ব্যবস্থা রেখে এখানে

সকলের মেলানো গ্লাস হাত বাড়িয়ে নিলে কী হবে?' রীতার কণ্ঠে মমতার ছিঁটে ফোঁটা নেই।

কল্যাণের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তবু চেষ্টা করলো মুখের সপ্রতিভ ভাব বজায় রাখার। আস্তে জিগ্যেস করলো "কেন কী হয়েছে?" প্রশ্ন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিলোনা কল্যাণের তবু ওর মুখদিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেলো।

"কী হ'য়েছে···তুমি নিজেই কী আমার চেয়ে ভালো জানোনা, অমন সর্বনেশে রোগের কথা বিস্তৃত হলে কী করে?" বিব্রত কল্যাণের ঠোঁট উচ্চারণ করলো, "সামান্য দোষ যা হয়েছিলো তা সেরে গেছে থাকলে কী সকলের মধ্যে আসতাম-?"

"না আসলেই আমরা বাঁচতাম—" এক মুহূর্ত চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো রীতা। যেন রাইফেল থেকে একখানা বুলেট বেরিয়ে সোজা গিয়ে মর্মমূলে বিদ্ধ করলো। কল্যাণ ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। একটা বোবা ব্যাথা মোচড় দিয়ে উঠলো সর্বাঙ্গে। নিজেকে সামলে নিতে দেরী হোল একটু, তবে খুব বেশি নয়।

"থ্যাঙ্কস—! আমার চেতনা জাগানোর জন্য—মেনি মেনি থ্যাঙ্কস রীটা—" বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্বণা এগিয়ে আবার ফিরে এলো কল্যাণ। টেবিলের ওপর থেকে ওর সদ্য পানকরা কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে দূরের সারিবদ্ধ জার্দাইর একটা টব লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো তারপর আর কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে প্যাণ্ডেল ত্যাগ করে চলে গেলো। মল্লিকা কল্যাণের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলো। ওর চলার পথে নিওনলাইটের রশ্মি কেমন একরকম তেজহ'য়ে পড়েছে, যতই কল্যাণ এগোয় ততই ওর ছায়া দীর্ঘতর হয়।

আনমনে ছায়ার দিকে তাকিয়েছিলো মল্লিকা। মনে মনে ভগবানকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে বেয়া তরু, করলো: নারী সৃষ্টি করতে তুমি কী সময় দাওনি? না সম্পূর্ণ করোনি—?

স্পষ্ট গর্জন কানে এলো, ছায়া ভগবান মিলিয়ে গেলো। "থ্যাঙ্ক গড্! ঘরের সঙ্গে যে হাত মেলাইনি—"

"ব্যাপার কী মিস্ ঘোষ? আপনার এ্যাকটিভিটিস দারুণ রহস্যাবৃত বলে মনে হচ্ছে—" বর কেতনের উৎকণ্ঠার তলায় বান্ধবীদের কৌতূহল প্রথমে চাপা পড়ে গেলো। তারপর শুনলে মল্লিকা "···আমরা তো এতক্ষণ ভোর কাণ্ডকারখানা দেখে ভাবছিলাম, উৎকট অভিমানের ঠেলায় এসব করে যাচ্ছিস্—কিন্তু শেষের দিকটা ঠিক্—" "কল্যাণের টি-বি হয়েছে—" নির্লিপ্ত কণ্ঠে অপার গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এমন অদ্ভুত ভঙ্গি করে কথা তিনটে বললো রীতা, যেন একজন ডাক্তার টি-বি পেসেন্টের লাংস অপারেশন করতে যাওয়ার মুখে পরিচিত কারুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। সকলেই শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি মুখে রুমাল চাপা দিলো। মাত্র বেঁচে হাত ধুয়ে কল্যাণ বসেছিলেন, বাতাসে ছিঁটেফোঁটা কী আর রক্ষা-জীবাণু না রেখে গেছেন—। মুখে রুমাল চাপা দিয়েই চিত্রিতা বললেন, "ওকে ইনভাইট করা তাহলে ঠিক হয়নি রীতা—।" "ওকে ইনভাইট করেছে না হাতী—" রীতার স্বরে স্পষ্ট ঘৃণা, বন্ধু এবং বান্ধবীদের আহ্বান জানিয়ে রীতা উঠে পড়লো, "চল আমরা হলঘরে গিয়ে বসি—। রামদাসকে বলি ফ্রীট দিয়ে যাক এখানটা।" মল্লিকাকে নামেমাত্র আহ্বান জানিয়ে ওঁরা সদলবলে চলে গেলেন।

মল্লিকা উঠলো না, যেতে—উঠতে পারলোনা। চোখের সামনে যে অবিশ্বাস্য মর্মন্তুদ ঘটনাটা ঘটলো, তার আলোড়নে ও যেন পাথর বনে গেছে। অনেক পরে ওর ভেতর থেকে চুপি চুপি কে যেন বলে উঠলো: আচ্ছা কল্যাণবাবুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরে রীতাদি যদি টের পেতেন যে

কল্যাণ বাবুর টি-বি হয়েছে—তাহলে কী করতেন? তাহলে——? তাহলে……?

এর পরের ঘটনা মল্লিকার কাছে কিছু অস্পষ্ট, বড্ড মাথা ধরেছিলো অসহ্য। কিছু খেতে পারলো না। বৌদির ব্যবস্থায় ভ্যালিডল খেলো, কমলো না। দাদা বিধান দিলো চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে—রাত্রি নয়। অগত্যা বোনকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হলো অনন্তকে, মলিনার যুক্তিতে ও নিজে সঙ্গে যেতে পারলো না। এই ভাবে এখন না খেয়ে চলে গেলে নাকি অত্যন্ত অভদ্রতা হবে। শ্বশুরের বড় বুইক্ খানাতে মল্লিকাকে পাঠালো অনন্ত।

আর খাননি সেদিন সাধন রায় কল্যাণের দাদা। ভাইকে অসম্ভব ভালবাসেন সন্তানের মতো, তাই এসেছিলো অথচ না খেয়ে গেছে—এ কারণই সাধন রায়ের না খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, তার ওপর আরো কিছু ছিলো—

বন্ধুবর অনিমেষ ঘোষ, ওকে একবার একান্তে পেয়ে কণ্ঠে আন্তরিকতা ফুটিয়ে বললেন, "তারপর…কল্যাণের ব্যবস্থা কী করছো তোমরা?"

"কিসের ব্যবস্থা?" অনিমেষ ঘোষ সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললেন,

"প্রিন্টিং শিখতেই ওর গোপ দাঁড়ি পেকে যাবে—। তাছাড়া এখন ওর কোন কাজ না করাই তো উচিৎ। সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দাও না কিছু দিনের জন্যে।"

"কেন হঠাৎ সুইজারল্যাণ্ডে কেন…। আর প্রিন্টিং শিখতেই বা গোপ দাঁড়ি পাকার কী কারণ ঘটলো?"

"সেন, প্রেসের ম্যানেজার দুঃখ করছিলেন—আফিসে একদিন আসে তো তিন দিন আসে না, অসম্ভব কামাই করে আফিস, অথচ ম্যাঠামশায়ের খাতিরে কিছু বলতে পারেন না, আর—"

"মাথাধরা কিছু না করলেও দিন চলে যাবে—বলে দিও হরু গোপাল সেন কে,"—বিরক্তি মিশ্রিত রূঢ় কণ্ঠে বললেন সাধন রায়।

"ঐ তো তোমার দোষ সাধন। কথায় কথায় টেম্পার লুজ্ করো। স্মিত মুখে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন অনিমেষ ঘোষ।

"যেতে দাও ও কথা—সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাতে বলছো কেন?" সাধন রায় কণ্ঠে কিছুটা স্বাভাবিকতার সুর আনতে চেষ্টা করলেন।

ঘোষ বললেন, "তোমাদেরকে এখনও জানাইনি দেখছি—। বীতাকে অবশ্য ঠিক সময়েই জানিয়ে দিয়েছে। ওর বুকের দোষ হ'য়েছে। যাই হোক্—আই এ্যাডমায়ার হিজ বোল্ডনেস।"

"এ্যাবসার্ড—" প্রায় গর্জন করে উঠেই সেই যে থেমে গেলেন সাধন রায়, আর মুখ খোলেন্ নি। ঘোষ কাকা যে টুকু কাজের ভার ওঁকে দিয়েছিলেন সেইটুকু সেরে শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে আসেই নিজের টুসিটারে বাড়ি ফিরে এলেন।

কল্যাণ তখন রেণ্ডেজভাস রেষ্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছে। অন্তরঙ্গর বাবুর পুরোনো ড্রাইভার মোহন সিং রেণ্ডেজভাসের পাশ দিয়ে যেতে যেতে রেষ্টুরেন্টের সামনে কল্যাণের টুসিটার খানা দেখে বলে ফেললো, "ছোটাসাবের গাড়ি—" ঠিক সেই সময় রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো কল্যাণ। মল্লিকার আদেশে মোহন সিং গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিলো। এ সময় ওদের গাড়িতে মল্লিকাকে দেখে এবং একলা দেখে, কল্যাণ বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বললো, "আপনি—।" মল্লিকা কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে বললো, "বড্ড মাথা ধরেছে—" সহাস্যে বললে কল্যাণ, "পৃথিবীতে এমন কথা বোধ হয় আর লোকেই শুনেছে মল্লিকা দেবী যে মাথাধরার জন্য কেউ বিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়—একটা কি দুটো ট্যাবলেট খাওয়া মাত্রই যেখানে মাথাধরার নিরাময় হয়—"

মল্লিকা কথা খুঁজে পেলো না। কল্যাণের মুখের শান্ত চেহারা ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হচ্ছিলো, অনেক পরে শুধু বলতে পারলো "খেয়েছিলাম স্যারিডন, কমেনি।" কল্যাণ মোহন সিংকে গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলো। মল্লিকাকে বললো "আসুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি—।" মল্লিকা নেমে এলো, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলো মোহন সিং। নিজের ছুঁ সিটারের কাছে এসে হাতলে হাত দিয়েই বলে উঠলো "ঐ যাঃ, কফিটা খেতেই ভুলে গেছি। মল্লিকাদেবী মিনিটের জন্যে আসবেন আমার সঙ্গে—?" মল্লিকা একটু ইতস্তত করে বললো "আপনি খেয়ে আসুন আমি গাড়িতেই থাকি—"

কল্যাণ বললে "আসুন না, আপনিও এক কাপ খাবেন রেস্তোরেন্টে একলা বসে খাওয়া আর সিনেমা একা একা দেখার মতো দুঃখ খুব কমই আছে।" মল্লিকা আর আপত্তি করলো না। কল্যাণের পিছনে যেতে যেতে বললো, "কফি আমার তত কিছু ভাল লাগে না, কেমন যেন তাদাক তামাক গন্ধ—" "লাগবে, লাগবে, ভাল একদিন নিশ্চয়ই লাগবে—" এই সামান্য ব্যাপারে কল্যাণের উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা শুনে মল্লিকা হেসে ফেললে।

কোনার দিকের একটী টেবিল দখল করে, মল্লিকাকে বসিয়ে রেখে কল্যাণ ম্যানেজারের কাছে এলো। ম্যানেজারকে সামান্য কিছু নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলো নিজের জায়গায়। একটু চুপ থেকে পড়াশুনো সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলো কল্যাণ। "কি, এ পড়বেন নিশ্চয়ই, অনার্স নেবেন নাকি…? কোন গ্রুপেই নেবেন…? ইত্যাদি—।" বয় ইতিমধ্যে-খাদ্য পরিবেশন করে গেল। খাদ্য-বস্তুর তালিকা দেখে মল্লিকা প্রায় লাফিয়ে উঠলো, "এই বুঝি আপনার কফি খাওয়া কল্যাণবাবু? এসব আমার চলবে না—" কল্যাণ নিরীহের মতো মুখ করে বললো, "একটু আধটু চলবে বোধ হয়, দেখুন খেয়ে, খুব খারাপ একটা রাঁধে না এরা—"

"আমি সে চলার কথা বলছি না—"

"আমি কিন্তু সে চলার কথাই বলছি—"

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো সশব্দে।

"না দেখুন," মল্লিকা আবার বললো, "আমি কিছু খেতে পারবো না। আমার একেবারে খিদে নেই—" "তাহলে না খেলেন," বললে কল্যাণ, "অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলেই যে খেতে হবে এর মানে নেই কিন্তু…আমার আবার খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। একলা খেতে পারিনে বলে, কোনমতে এক কাপ চা গিলে চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আপনার দেখা পেয়ে ভাবলাম, দৈব বুঝি মিলিয়ে দিলো—তা, আপনি কষ্ট করে মিনিট তিনেক অপেক্ষা করুন, আমি খেয়ে নিচ্ছি…" ব্যস্ততার সঙ্গে ছুরি কাঁটা হাতে তুলে নিলে কল্যাণ। অপ্রস্তুত মল্লিকা তাড়াতাড়ি বলে ফেললো, "আচ্ছা আমি খাচ্ছি, আমি হাত দিয়ে খাব কিন্তু, কাঁটা চামচে আমার একেবারে অভ্যাস নেই—"। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ কাঁটা ছুরি নামিয়ে রেখে সহাস্যে বললো, "নিশ্চয়ই হাত দিয়ে খাবেন। কী কাণ্ড। এটা আবার একটা কথা নাকি?" মল্লিকার মনে হোলো বলে, আপনি কেন হাত দিয়ে খাবেন, কাঁটা চামচেই খান, কিন্তু কিছু বলতে পারলোনা, চুপ করে রইলো। একটু একটু করে ভেটকি মাছের ফ্রাই ভেঙে মুখে দিতে লাগলো। মল্লিকার মৌনমুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে কল্যাণ বললে, "আপনি রাঁধতে পারেন, মল্লিকাদেবী?" মল্লিকা মুখ তুলে হাসলো একটু। বললো, "যাকে রান্না বলে তা অবশ্য কিছুই জানিনে, তবে ঠাকুরের অসুখ হ'লে বাজারে গিয়ে কিনতে পাঠাবোনা, কোনমতে চালিয়ে নেব—এই আর কী—" সশব্দে হেসে উঠলো দুজনে।

"টুনটুন্ বেশ ভাল ভাল রান্না শিখেছে মাঐমার কাছ

থেকে—" কথা চালাবার জন্য বললো কল্যাণ। মল্লিকা কথা বন্ধ করে এদিক ওদিক কী ভাবলো কে জানে, অস্ফুটে বললো, "আমাদের বাড়ীতে এসে অনেক কিছু কষ্ট করলো বৌদি—" কল্যাণ অপ্রস্তুতের একশেষ। প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলো, "কী যে বলেন? ছিঃ ছিঃ! রান্নাবেলা আবার কষ্ট নাকি? তাছাড়া যাকে চাওয়া যায়, তাকে পেলে, কোন কষ্টই……"মল্লিকার কানের পাশ লাল হতে দেখে থেমে গেলো কল্যাণ। একটু চুপ, কল্যাণ একটু নড়ে চড়ে বসে বললে আবার, "বর্ষমানে কেমন আনন্দ করলেন?" সহজ হয়ে মল্লিকা বললো, "প্রচুর আনন্দ করে এসেছি—" একটু থেমে, "আর নোতুন ধরণের অভিজ্ঞতাও হোলো কিছু-কিছু—" "যথা—?" কবিরাজি কাটলেট্ ভেঙে মুখে দিতে দিতে বললে কল্যাণ। মল্লিকা চোখ তুলে ভাবলো একটু। কল্যাণের মাথার ওপর দিয়ে দেয়ালের দিকে একটু তাকালো, মুহূর্তে বর্ষমানের ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে এসে মিলিয়ে গেলো। সামান্য মুচকি হেসে চোখ নিচু করে আবার খাওয়ায় মন দিলো।

"অভিজ্ঞতার অংশটিতে চান্না—" মল্লিকাকে নিরুত্তর দেখে আবার প্রশ্ন করলো কল্যাণ। মল্লিকা স্মিতমুখে বললো, "না ঠিক্ তা নয়। নিজের মুখে নিজেদের জাতের নিন্দে কিম্বা প্রশংসা যাই হোক্—করাটা ঠিক্ নয়। তাছাড়াও-ভাল লাগেনা, বলতে ও।"

কল্যাণ সহাস্যে বললে, "বেশ তো, আমাদের জাতের-টাই বলুন। বিয়ে বাড়ি নরবর্জিত ছিলো, এতো আর হতে পারে না।"

"নিশ্চয়ই নয়—" মল্লিকা খিল্‌খিল্ করে ছেলে মানুষের মতো হেসে ফেললো। "ছেলেদের সম্বন্ধে ভত কিছু হয়নি—" হাসি থামিয়ে বললে মল্লিকা, "তবে একজন অ-কবিকে কাব্যের রস পরিবেশন করা হ'য়েছে।"

"বটে! কে তিনি?"

মল্লিকা কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে, "তিনি সোজা মানুষ নন। নাম বিমান গুহ, ধাম—দিল্লী, পেশা ডাক্তারী, তাছাড়া অতিরিক্ত গুণাবলী, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে—তিনি বহু ডিগ্রিধারী তিনবার ফাস্ট ক্লাস। তাঁর আউট-লুকের দুর্ধান্ত এবং তিনি চমৎকার কথাবলতে পারেন"—কথা শেষ করে মল্লিকা হেসে ফেললো, গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে পারলো না।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মল্লিকার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণ কী যেন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলো। বললো তারপর, "কাব্যসুধা পরিবেশন করলেন কে? আপনি…?"

"হ্যাঁ…না, আমি না। আমি কি জানি? নীলুদা—আমার মামাতো ভাই, অত্যন্ত কবিতার অনুরাগী। কবিতা সম্বন্ধে কত কিছু যে জানেন—। সময় পেলেই কবিতা পড়েন, লেখেন ও।"

"ও।" সংক্ষিপ্ত উত্তর কল্যাণের। সামি কাবাব কামড় দিয়ে দেখলো তা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে এবং বিস্বাদ। চপও তাই। মল্লিকার ডিস খালি। কিংশার বোলে আঙুল ডুবিয়ে তোয়ালে দিয়ে আঙুল মুছতে মুছতে কল্যাণ বললে, "চলুন এবার যাওয়া যাক্—। অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার।"

মল্লিকা বললে, "আপনি খেয়ে নিন। তাড়াতাড়ি করছেন কেন?" "আর চলবে না, অনেক খেয়েছি। আমার ডিসে অনেক বেশি দিয়েছিলো। তা—" বলেই উঠে দাঁড়ালো কল্যাণ। মল্লিকা বিস্মিত হোলো কিন্তু কিছু বললো না। আর একবার কল্যাণের ডিসের দিকে তাকিয়ে উঠে বেরিয়ে এলো।

কল্যাণ গাড়িতে উঠে সামনেই মল্লিকাকে ওঠার জন্য আহ্বান জানালো। মল্লিকা নিজে দরজা খুলে পেছনের সিটে উঠতে যাচ্ছিলো, কিন্তু স্টীয়ারিং হুইল যেখানে সেখানে বসা যাবে না, সামন এসে বললো। গাড়ি ষ্টার্ট নেওয়ার পর মল্লিকা বললে নরম গলায়,

"আপনি দিনরাত বই পড়েন—না?"

"না তো। আমার কোন গুণ টুন নেই।"

"সে কী? বৌদির কাছে শুনেছি আপনি বিরাট লাইব্রেরী করেছেন বাড়িতে—।" এক মুহূর্ত থেমে আবার বললো মল্লিকা, "পেছনের সিটের বইগুলো আপনার নয়?" "হ্যাঁ আমারই বটে। বই আমি কিনি, তবে পড়ি-টড়ি না।" স্টিয়ারিং এর উপর চোখরেখে বললো কল্যাণ।

"বই পড়েন না অথচ কেনেন…?" বিস্ময়ে প্রায় হাঁ হয়ে গেলো মল্লিকা। মল্লিকার উগ্র বিস্ময়ে কল্যাণ অপ্রতিভ হলো একটু। স্টিয়ারিং এর ওপর চোখ রেখেই হাসিমুখে বললো, "অনেকের তো হবি থাকে অনেক রকম, এটাও আমার একরকম হবি ছোট বেলাথেকে এত সুন্দর নানা রঙের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে সব বইয়ের মলাট, বইয়ের সামনে দিয়ে গেলে আর না কিনে পারি না—।"

মল্লিকা চোখ তুলে কল্যাণের মুখের ভাবটা একটু দেখবার চেষ্টা করে চুপ করে গেলো। মিনিট দুই তিন চুপ। "রমাদি খুব বই পড়েন, না?" হঠাৎ মল্লিকা প্রশ্ন করে বসলো।

'কোন রমা—?'

"বারে, আপনাদের বাড়ির পাশে যিনি থাকেন—আপনার কাছথেকে সব সময় বই নিয়ে পড়েন বলে শুনেছি—"

"ও। হ্যাঁ—। রমা…রমা সান্যাল। সে অনেক বই পড়ে ফেলেছে বটে। রমার বই পড়ার খুব ঝোঁক। তাছাড়া আমার……থেমে গেলো কল্যাণ। "রমাদির কী মজা—"স্নিগ্ধমুখে মল্লিকা বললো। "কেন? মজা কেন?"

"বাড়ীর পাশে এমন একটা লাইব্রেরী থাকলে মজা নয়? ক—ত বই পড়তে পারেন—।" কল্যাণ ছোটুকরে হাসলো। বললো, "বই পড়ার ইচ্ছে থাকলে কী আর দূরের জন্য আটকায় মল্লিকাদেবী? বই পড়তে আপনি কি ভালবাসেন নাকি? এই বইগুলো আজ রেখে যাবো 'খন তাহোলে আপনাদের বাড়ীতে—" মল্লিকা চোখ বড় করলো, "সব বই রেখে যাবেন—?" "তাতে কী। অন্তকে বই পড়ানোর একটা আনন্দ আছে—।"

"সব গুলোই ইংরিজি বই—?"

"হ্যাঁ। কেন, ইংরাজি বই আপনার ভাল লাগেনা?" মল্লিকা একটু ভেবে বললো, "ভাল অবশ্য খুবই লাগে, তবে ইংরিজি ভাল বুঝিনা বলে, এক একখানা বই শেষ করতে এত সময় লাগে……?" তারপর খানিকটা স্বগতোক্তির মতো অথচ দৃঢ়স্বরে বললো, "বই তো আমাকে পড়তেই হবে। অনেক—অনেক—।"

"কেন বলুন তো?" কল্যাণ প্রশ্ন করলো।

মল্লিকা গলাটনিয়ে বললো, "ভবিষ্যতে আমি একটা স্কুল খুলবো কিনা—নোতুন ধরনের স্কুল। শিক্ষা পদ্ধতি হবে নোতুন ধরনের। নিজে না জানলে, শেখাবো কী?" কল্যাণ মুখ ঘুরিয়ে এইবার মল্লিকার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো, বললো, "আপনার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু হঠাৎ এ ইচ্ছে হোল কেন?" মল্লিকা এইবার একটু ভাবলো। বললো, "এমনি কোন কারণ নেই—।" কল্যাণ চুপ করে গেলো। বাকী রাস্তাটুকু আর কোন কথা হয়নি। সমস্ত বইগুলো কল্যাণ একরকম জোর করেই নামিয়ে রেখে গেলো। "আচ্ছা"—বলে মল্লিকার কাছথেকে ছোট্ট বিদায় নিয়ে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো। মল্লিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর বাহাদুরকে বইগুলো ওপরে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়ে চলে গেলো ভেতরে। বাড়ির সামনে গাড়ী থামার শব্দ শুনে মাতৃদেবী নিচে নেমে এসেছিলেন। মল্লিকাকে একলা ঢুকতে দেখে বিস্মিত হলেন। বললেন, "তুই একলা যে মিলি—?"

"দাদা বৌদি একটু পরে আসবে। আমাকে কল্যাণ বাবু পৌঁছে দিয়ে গেলেন—"। কলঘরের দিকে যেতে যেতে বললো মল্লিকা। মায়াদেবী বললেন। "একসঙ্গে এলেই তো পারতিস্। রাত তো এমন কিছু হয়নি," "মাথা ধরেছিলো মা—" কলঘরের ভিতর থেকে মল্লিকার উত্তর শোনা গেলো। হাত-পা ধুয়ে বেরিয়ে এলো মল্লিকা। মায়াদেবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "খাবিনে কিছু—? ডিম খাওয়ানোর ব্যবস্থা শুনেছিলুম···।" "না, অসম্ভব খেয়েছি—।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো মল্লিকা। মায়াদেবী মেয়ের গাম্ভীর্যে কিছুটা আশ্চর্য্য বোধ করলেন। কাপড়-চোপড় বদলে মল্লিকা বইগুলো নিয়ে পড়ার ঘরের কোণে র‍্যাকের সাজালো। তারপর সামনের একখানা বই টেনে নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বইএর প্রথম পাতা ওল্টাতেই নামটা চোখে পড়লো—এ টিয়ার এ্যাণ্ড এ স্মাইল, খালিল জিব্রাণের লেখা। ভারি সুন্দর নামটাতো! লেখাটা নিশ্চই আরো ভালো হবে। রেখে যাক্—বইটা চোখের সামনে তুলে ধরলো মল্লিকা।·····কল্যাণবাবুর আচরণটা কেমন যেন অদ্ভুত মনেহোল আজকে। বললেন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, অথচ পাতে প'ড়ে রইলো সব। বললেন, কফি খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে, অথচ কফিই খেলেন না। আনন্দ আর উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইলেন বিদেশী বাড়ীর খবর। কিন্তু দু একটা খবর শুনেই উৎসুক্য নিবে গেলো, কেন...? ও কী পুরুষদের কথা বলতে গিয়ে অন্যায় কিছু বলে ফেলেছে নাকি? এত অল্পতে কথাই বা ও তখন বললো কেন, তাও এখন যেন ভেবে পাচ্ছেনা। বোধহয় স্যাম্পেন খাওয়ার ফল এটা। নিশ্চই তাই। এর আগে কালে ভদ্রে যখন মাথা ধরেছে এ্যাসপ্রো খেয়েছে মল্লিকা, স্যাম্পেন খায়নি। এই তথ্য আবিষ্কার করে মল্লিকা কিছুটা স্বস্তি পেলো। মন থেমে ছিলো একটু, আবার চলা শুরু করলো। আজ এই প্রথম মল্লিকা উপলব্ধি করলো রাত দিনের অবশ্য আনন্দের কিছু ঘাটতি হচ্ছে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কেন? রীতাদির বিয়েতে এতো আনন্দ হুড়োতে গিয়েছিলো, কিন্তু ফিরলো বিষণ্ণতা আর অচেনা ক্লান্তি নিয়ে। কেন···? একটা প্রকাণ্ড কথা এতক্ষণ পরে ওর মনে পড়লো যে, রীতাদি বলেছেন—কল্যাণবাবুর টি-বি হ'য়েছে। তারই সঙ্গে রেষ্টুরেণ্টে মুখোমুখি বসে খেলো আর একটা রাত্তা এলো পাশাপাশি বসে। ধ্যুৎ—বাজে কথা। বিশ্বেস করিনা। টি-বি পেসেণ্টের অমন প্রশান্ত মুখ আর বিস্তৃত বক্ষপট হতেই পারেনা। হাসি হাসি মুখ নিয়ে তলিয়ে গেলো মল্লিকা ঘুমের রাজ্যে। হাত থেকে পাতাখোলা অবস্থায় বইখানা পড়ে গেলো। নামটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—"এ টিয়ার এ্যাণ্ড এ স্মাইল।"

(ক্রমশঃ)

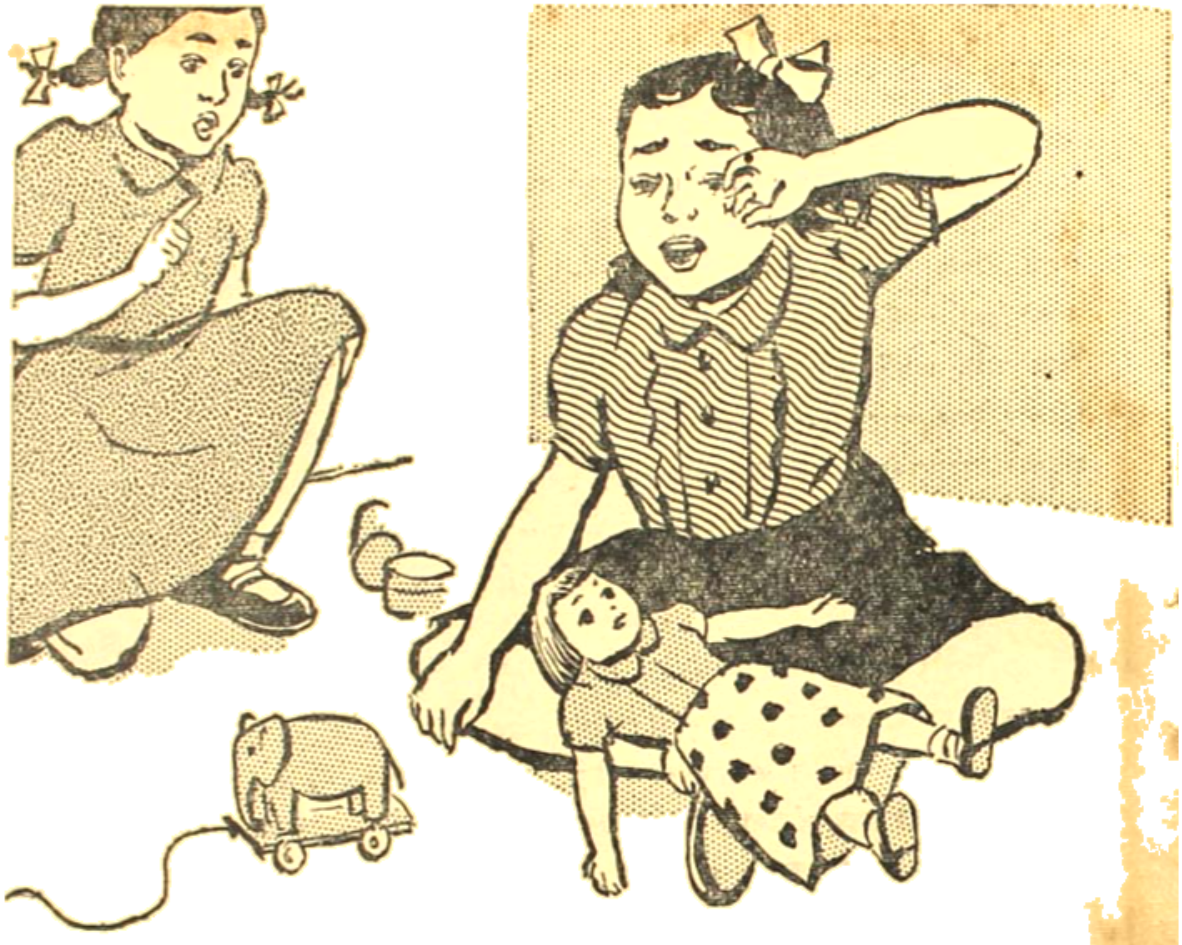

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি কোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের ভাষায় ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন জলপুতুলটির ছবে আলতার মেখানো গালে মশলার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে মশলা আচারের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিচে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এতোর, এতোর' শুনে তত্তাবধের মিটমিটির বরের মেজে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—জ্বরে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় ছোটে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষী মেয়েকে কে কেঁদেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, আমী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক মশলা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা বিল্টুকে শান্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, বিল্টুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "জলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোদ, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুকে চা খেয়ে বলল—"তার কারণ আমি ওটা কেচেছি লাক্সলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির জলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তবে কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক জায়গা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় জমা হয়েছে। আমার একবার শুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই লাক্সলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পাঞ্জাবী, সার্ট, ফ্রক আরও নানারকমের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি লাক্সলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় অনায়াসে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি লাক্সলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই লাক্সলাইটে প্রচুর ফেনা হয়—আর সে ফেনা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আয়াসেই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, লাক্সলাইটের গন্ধও ভাল—লাক্সলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগে। এর ফেনা গায়কে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

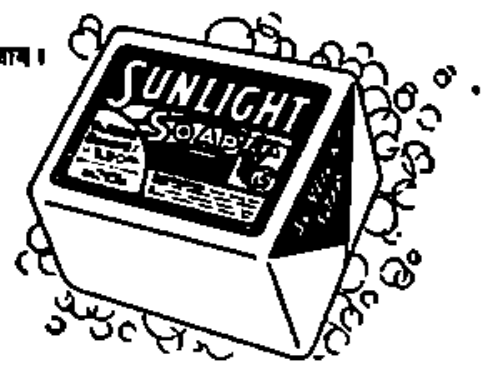

ইউনিলিভার লিমিটেড, বম্বে হাউস।

হে মৃত্যু, কোরোনা গর্ব

শোভন সোম

হে মৃত্যু, কোরোনা গর্ব, কেউ কেউ বলেছে যদিও
তুমিই পরম সত্য, বিভীষিকা—কিন্তু তা'তো নও।
যাদেরই ভেবেছ তুমি কুটিল হাতের স্পর্শে দেবে
মুছে, তারা মরেনা ; হে মৃত্যু, শোনো আমিও অমর—
তুমি বিশ্রামের কিংবা নিদ্রার অক্ষম নামান্তর,
কী স্বাদ মৃত্যুতে আছে, এই অপবর্গের প্রলেপে।
মহৎ সমস্ত প্রাণ কাড়ো, মানি, তুমি প্রাণ-বহ
আত্মার ঊর্ধ্বগ পথ নির্দেশন তোমার স্বকীয়।

কিন্তু, তুমি ক্রীড়নক ভাগ্যের অমোঘ হাতে দুঃসাহসীদের—
গরলে তোমার বাস, রণাঙ্গনে, নৃত্য করো অসুখের ঘরে—
আমরা ফুলের ঘুম-পাড়ানি গানের ভক্ত, তার গান শুনে
নিশ্চিন্তে ঘুমোই ; সেই পুষ্প শর নেই ওই তূণে
তোমার ; তোমার একটি কীর্তির কঠিন অক্ষরে
চিহ্নিত হবই, তবু বেঁচে থাকব বহমান অনন্ত কালের
চেতনার প্রাণপদ্মে ; সেখানে তোমার হাত পৌঁচবেনা জেনো
কোনোদিন,—
সেখানে স্বয়ং তুমি মৃত্যুর নিরন্ধ্র গর্ভে আকণ্ঠ বিলীন॥

অন্যপ্রাণ

মীরা দত্ত

—লাল রঙের অফিস বাড়ীটা পেছনে ফেলে ইডেন-গার্ডেনের দিকে পা বাড়িয়ে দিল সুবীর। আকাশে এক-রাশ কালো মেঘ। এক্ষুণি হয়তো অবিরল ধারায় ঝরে পড়বে। প্রথম বর্ষার চিহ্ন চারদিকে। অল্প ঠাণ্ডার আমেজ। একটু স্বস্তি বোধ করলো ও।

একটু আগেই যে বিশ্রী কাণ্ডটা হয়ে গেল তার কথাই ভাবছিল সুবীর। কিন্তু ঘোষ্টাতো সম্পূর্ণ তারই। অফিসে সে কাজ করতেই গিয়েছে। প্রৌঢ় ঘোষালবাবু ওঁর মেয়ের বয়সী লেডী ক্লার্ককে প্রেমনিবেদন করতে গেলেন কি না সেটা দেখার ওর কোন দরকার ছিল না। আর মিস্ মুখার্জীর পক্ষ নিয়ে ঘোষাল বাবুকে অপমান করারও বা কী প্রয়োজন ছিল ওর? অপমানিত ঘোষাল বাবু যে চতুর্গুণ করে অপমান ফিরিয়ে দেবেন এতে আর আশ্চর্য্য কী।

ঘোষাল বাবুর কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—"যাও যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গে ছোকরা। পরকে সামলাবার আগে ঘর সামলাও। তোমার বিধুবী বৌ এর কীর্তি কলাপ আমরা কিছু জানিনে মনে করেছ? তোমার তোয়াক্কাই বা সে কতটুকু করে সে খবরও আমার জানা আছে।"

হয়তো প্রচণ্ড রকমের ঝগড়া বাঁচাই একটা কিছু হয়ে যেতো। কিন্তু হরিণ বাবু এসে থামিয়ে দিলেন ঘোষালকে, সুবীরকে বল্লেন—"যাও ভাই একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো-গে। আমি সায়েবকে বলে দেব'খন।"

ইডেন গার্ডেনটা এখন নির্জন। শুধু এদিকে ওদিকে দুচারটি যুগল ছড়িয়ে আছে। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়লো সুবীর। চেষ্টা করলো চুপচাপ বসে থাকতে। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগছে না।

কিন্তু ভাববোনা মনে করলেই কী ভাবনার হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? গত ক' বছর ধরেই তো ও ভাবনাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। কিন্তু পেরেছে কী?

একটু দূরে বসা একটি যুগলের হাসির শব্দে ফিরে তাকালো সুবীর। অল্প বয়েস দুজনারই। পাশে বই খাতা জড়ো করে রাখা। নিশ্চয়ই কলেজ পালিয়ে এসেছে।

সুবীরের হঠাৎ মনে পড়ে গেল ও আর অনুপমাও এমনি বহুদিন কলেজ পালিয়েছে। ঠাণ্ডা মেজাজ দিনে কিছুতেই ক্লাস করতে চাইতো না অনুপমা। তাই পালিয়ে আসতে হোত ইডেন গার্ডেন, ময়দান বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। কোনদিন বা রেঁস্তোরার পর্দা ঢাকা কেবিনে।

হাসি গল্প গানে কী করে যে দিনগুলি কেটে গিয়েছিল ভাবলে আজ অবাক হয় সুবীর। বি, এ, ক্লাশের দুটি বছর যেন চোখের পলক ফেলতেই শেষ হয়ে গেল। বন্ধুরা বলতো—"বেশ আছিস ভাই তোরা।"

অমত ছিল না কারুরই। কাজেই অনুপমার বাবা এসে যখন যত্নের বিয়েটা হয়ে যাক্ তাড়াতাড়ি তখন অমত করেননি সুবীরের মা বাবা। শুধু বলেছিলেন পরীক্ষাটা দিয়েনিক ওরা।

পরীক্ষার পরই বিয়ে হয়েছিল ওদের। তারপর আরো একটা মাস কাটলো। দিনগুলির যেন কেবে কোথে মধু ভরা। সুবীর আর অনুপমা। অনুপমা আর সুবীর। উজ্জ্বল দিন আর মোহভরা রাত।

এর মধ্যে ছয় পড়ল ঘটালেন সুবীরের বাবা। ছেলেকে ডেকে বল্লেন—"পাড়ার চ্যাটার্জী সাহেবের কাছ থেকে শুনলাম ইমকামট্যাক্সে টেম্পোরারী লোক নিচ্ছে ক'জন। একটা দরখাস্ত দিয়ে দে'না। মাথার ছুটির পর ছুটে একটু সাহায্য করলি আমার।"

সুবীর রাজী হোল। সত্যিই ওদের অবস্থা এখন কিছু দয় যে ছেলে খেলে ছুটি কাটাতে পারে ও। চাকরী তো করতেই হবে। আজ না হয় কিছুদিন পর।

অনুপমা কিন্তু বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল—"দু মাসের জন্যে না হয় মোটা-রকম টিউশনীই করতে। চাকরীর জোয়াল কাঁধে নিতে গেলে কেন? একবার নিলে চাকরী সহজে ছাড়া যায় নাকি?"

একটু দূরে বসা ছেলে মেয়ে দুটি উঠে দাঁড়ালো। পায়ে চটিটা গলিয়ে চামড়ার ব্যাগের ষ্ট্র্যাপটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল মেয়েটি। ছেলেটি গুছিয়ে নিল বইখাতা। তারপর সুবীরের পাশ দিয়েই হেঁটে চলে গেল ওরা।

ওদের দু'এক টুকরো কথা সুবীরের কানে ভেসে আসে— "বাই বলো মা কেন বলুন, আমার বড়ো ভয় করছে। পাশ করবো কী না—"

আপন মনেই হাসে সুবীর। অনুপমাও কী একদিন এরকম বলেছিল? কে জানে? হয়তো বলেনি। ছেলে আসা দিনগুলিকে আর একবার মনে করতে চেষ্টা করে ও।

অমুন চাকরী আর অনুপমাকে নিয়ে দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল সুবীরের। খেয়ালই ছিল না ওর যে পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় হয়েছে। সেদিন চায়ের পর খবরটা শুনলো ওদের। রান্নাঘরে ডালের কড়া চাপিয়ে ছিলেন মা। রান্নাঘরে এক কোণে তরকারী কুটছিল অনুপমা। পাশে মোড়া পেতে বসেছিল সুবীর। খবর কাগজের রঙ্গীন খবরগুলি খুঁজে বার করে পড়ে শোনাচ্ছিল ওদের। এমন সময় ওদের ক্লাস ফ্রেন্ড বিভূতি এসে হাজির।

বিভূতি এসেই হৈ-হৈ করে উঠলো—"মাসীমা, কী খাওয়াবেন বলুন।"

"কেন কী হয়েছে?" ডালের কড়া নামিয়ে এসে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন সুবীরের মা।

"আপনার বৌমা ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে। ফার্ষ্ট-ক্লাস পেয়েছে।"

"সত্যি—?" লাফিয়ে উঠতে গিয়েই আবার 'উঃ' করে বসে পড়লো অনুপমা।

বঁটি দিয়ে পায়ের আঙুলটা অনেকখানি কেটে গেছে। রক্ত পড়তে লাগলো দরদর করে। সুবীরের যেন এতক্ষণে হুঁশ হোলো। চীৎকার করে বললো—"মা শীগগীর তুলো—আয়োডিন—"

আঙুলটা ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে অনুপমাকে শোবার ঘরে নিয়ে এলো সুবীর। অনেকটা রক্ত পড়েছে—মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সুবীর বললো—"তুমি একটু শুয়ে থাকো অনু, যন্ত্রণা করছে না তো?"

"ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে এমন কী আর যন্ত্রণার কথা মনে থাকবে?" একটু হেসে মন্তব্য করলো বিভূতি।

মাও ওদের পেছন পেছন উঠে এসেছিলেন। বিভূতির কথাটা শুনতে পেয়ে বল্লেন—"বৌ এর খবর তো বল্লে। বলি সুবীর কী করেছে?"

সত্যি, কথাটা এতক্ষণ যেন মনে ছিল না কারুরই। অনুপমা উৎসুক মুখ তাকালো বিভূতির দিকে।

আমতা আমতা করে বিভূতি জবাব দিল—"সুবীর, সে হ্যাঁ পাশ করেছে।"

"অনার্স?" ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলো অনুপমা।

"অনার্স পায়নি।" ক্ষীণকণ্ঠে বিন্দুমাত্র জবাব দিল।

হঠাৎ ঘরের সবাই চুপ করে গেল। একটু পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মা উঠে এলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সুবীরও গামছাটা টেনে নিয়ে চানের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

অনুপমার দিকে একবার তাকিয়েছিল সুবীর। কাঠ হয়ে বসে আছে ও। ক্যাকাশে মুখটা কঠিন হয়ে গেছে। ও কোঁচকানো। নীচের দিকে তাকিয়েছিল ও। তাই সুবীর দেখতে পেলোনা ওর কালো চোখে কী লেখা। বেদনা না বিরক্তি?

সেদিনটা সুবীর ভুলে যায়নি। আজকের মতো এমনি করে ইডেন গার্ডেনে বসেছিল। কিন্তু সেদিনের দুঃখটা আজ যেন ভালোকরে উপলব্ধি করতে পারে না ও। হয়তো দুঃখ তার তেমন হয়নি। পরীক্ষার ফল খুব ভালো হবে না, এতো জানতোই। অনুপমা ছিল যে! কী করে আর পড়তো সে।

তবু দিনের শেষে কেমন যেন একটা সান্ত্বনা পেয়ে গিয়েছিল মনে। নাই বা পেলো অনার্স,—অনুপমা তো আছে। হ্যাঁ, কলেজের বিখ্যাত ছাত্রী অনুপমা রায়, ওর একান্ত আপনার, শুধু ওর নিজেরই। অনুপমাকে পেয়েছে সুবীর, অনার্স কী তার কাছে তুচ্ছ নয়?

স্নান করে এসে অনুপমা গম্ভীর মুখে বললো—

"আমার কিছু ভালো লাগছে না।"

"কেন, আমি অনার্স পাইনি বলে?"

"কত সাধ ছিল দুজনে ইউনিভার্সিটিতে পড়বো।" অনুপমার গলাটা প্রায় বুঁজে এলো।

ওর বেদনাতুর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে সুবীরের মনে হোল ওর অনার্স না পাওয়াটাও বুঝি সার্থক হয়ে গেছে। দু হাতে ওকে কাছে টেনে বল— "তাতে কী হয়েছে? তোমার অনার্স পাওয়া কী—আমারও পাওয়া নয়? তুমি পড়ো এম, এ,।"

"আর তুমি?"

"আমি চাকরীটাতেই আপাততঃ থাকি। সংসারের দিকটাও তো দেখতে হবে। বাবা একা আর কত দেখবেন?" একটু থেমে সুবীর আবার বলে—"আর পাশ কোর্সে পাশ করে এম, এ, পড়াটা আমার ঠিক মনঃপুত নয়।"

অনুপমা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—"তুমি তো প্রাইভেটেও পড়তে পারো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই ভালো।" উৎসাহিত কণ্ঠে জবাব দেয় সুবীর।

"তুমি তো নোট তৈরী করবেই। কাজেই পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না।"

অনুপমা এম, এ, তে ভর্তি হোলো। আর চ্যাটার্জী সাহেবকে সুবীর গিয়ে বললো—"স্যার, আমি থেকে যাওয়াই মনস্থ করেছি।"

"বেশ, বেশ শুনে সুখী হলাম।" পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিঃ চ্যাটার্জী জবাব দিলেন।

চ্যাটার্জী ছিলেন কাঁচ পাকলা লোক। সবাই বলতো কাইলের বাইরের দুনিয়াটা ওঁর কাছে মেহাৎ একটা বাজে আপদ—যে সময়টুকু বাড়ীতে থাকতে হয় সেটুকু মেহাৎই বাজে খরচ। সুবীর স্থায়ীভাবে থাকতে চাইছে শুনে ওকে নিজের সেকশনে নিয়ে এলেন তিনি। ফলে, পাঁচটায় অফিস থেকে বেরুনো ওর কপালে ঘটতোই মা প্রায়। বাড়ী ফিরতে কোনদিন হোত সাতটা, কোনদিন আটটা।

অনুপমা মাঝে মাঝে রাগ করে বলতো—'কী যে ছাই অফিস হয়েছে তোমার।'

কিন্তু কিছুদিন পরই রাগ দুঃখ হয়ে গেল অনুপমার।

তখন থেকে ওর অভিযোগগুলিও কমে এলো ক্রমশঃ। উপরন্তু নতুন ক্লাসের বর্ণনা দিতে ওকে ভারী উৎসুক মনে হোত। । "জানো, পি, ডি, ওরেলকোর ইকনমিক্সটা এমন চমৎকার পড়াচ্ছেন। Fundamentals গুলো প্রায় জলের মতো বুঝিয়ে দিচ্ছেন।"

"পি, ডি,? তিনি কে?"

"বারে, পরিতোষ মল্লিকের নাম শোনোনি?"

হয়তো কখনো বলতো—"জানো, মিশির চৌধুরী এখন থেকেই নোট দিতে সুরু করেছে। আমারও সুরু করতে হবে।"

"মিশির চৌধুরী কে?"

"বাঃ ওই তো ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হোলো।"

কদিন বাদে হঠাৎ একদিন অনুপমা জিজ্ঞেস করলো "বারে, তুমি আরম্ভ করবে না?"

"কী?" চায়ের কাপ রেখে বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো সুবীর।

"কেন, পড়া? এম, এ, টাতো আর সহজ কথা নয়। তাও ইকনমিকসে। এখন থেকেই সুরু করে দেওয়া উচিত কিনুকু।"

"হাঁ, তাই ভাবছি।" চায়ের কাপটা নাড়তে নাড়তে উৎসাহহীন স্বরে জবাব দিল সুবীর।

আসলে কথাটা নিজেও ভেবেছে ক'দিন। কিনুকু উৎসাহ পাচ্ছে না কিছুতে। সাতটায় অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত লাগে। আজ ভাবে কাল আরম্ভ করবো। কাল-ভাবে পরশু। সকালে তো খবরের কাগজের পাতা শেষ করতে না করতেই অফিসের বেলা হয়ে যায়। ছুটির দিনে এক আধটা সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে।

কিনুকু অনুপমা ঠিক এসব কথা বুঝতে পারবে কী না কে জানে। তাই ওকে আশ্বাস দিয়ে বলতে হয়—"এইতো, সুরু করবো এবার।"

দিন কয়েক পর একদিন রাতে শুতে এসে সুবীর দেখল ওর বালিশের পাশে পড়ে রয়েছে কীন্‌সের ইকোনমিক্স থিওরী। হয়তো অনুপমা পড়ছিল। বইটা সরিয়ে রেখে শুল ও।

ঘরে পা দিয়েই কিনুকু অনুপমা গম্ভীর হয়ে গেল একটু কঠিনস্বরেই জিজ্ঞেস করলো—"শুয়ে পড়লে যে?"

"কেন, কী হয়েছে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো সুবীর। "পড়বে না? বই আমলার তোমার ঘরে লাইব্রেরী থেকে—"

অগত্যা বইটা টেনে নিল সুবীর। মোটামুটিরকম লাইন পড়তে না পড়তেই যেন রাজ্যের ঘুম ওর চোখে নেমে এলো। অনুপমার মুখে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করেও পাশ ফিরে চোখ বুজলো সুবীর।

পরদিন অফিস ফেরত এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে এলো ও। অনুপমার প্রিয় ফুল। শান্তির পতাকা।

রাতে ফুল পেয়ে খুসীই হোল অনুপমা। কাছে এসে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—'বড়ো খাটুনি পড়েছে তোমার, না?

"তা একটু পড়েছে। তাই তো পড়াটা আর শুরু করতে পারছি না।"

"কিনুকু শুরুতো করতেই হবে একদিন। কঠিন বলে পিছিয়ে এলে চলবে কেন? এনে দেব কোনোমিক্স থিওরীটা? শুরু করবে আজ?"

সুবীর ভাবলো অনুপমাকে বুঝিয়ে বলে সব কিছু। জানিয়ে দেয় পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর। দেহমন ক্লান্ত। আর এ পড়া তো সুধুই পড়া। পড়াকে আকর্ষণীয় করার জন্যে সেই বাধ্যী অধ্যাপক, বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রের দল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-চঞ্চল পরিবেশ। কিনুকু অনুপমা ঠিক বুঝতে পারবে কি না কে জানে। তাই বলে

বললো ও—"অফিস করে পড়া চালানো বড়ো কঠিন অনুপমা। তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারছো না।"

হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলে অনুপমা। ধীরস্বরে বলে—"কঠিন কাজকে তো তুমি আগে ভয় পেতে না। পড়তে ইচ্ছে করছে না, তাই বলো। ক'মাস কেরাণীগিরি করেই একেবারে কেরাণীর স্বভাব পেয়ে গেছ।"

ধপ্ করে জ্বলে উঠলো সুবীর। "কেরাণীগিরিকে এতটা হীন চক্ষে না হয় নাই দেখলে। ঘটনাচক্রেই কেরাণী হতে হয়েছে আমায়। কিন্তু আই, এ, এস, যখো এ কল্পনাও ছিল না কোনদিন। তোমার ছিল নাকি?"

অনুপমার মুখখানা কালো হয়ে গেল। সে দিকে চেয়ে একটু নরম সুরে সুবীর আবার বললো—"আর পড়বার সময় পেলে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা প্রথমে দিয়ে দেওয়া উচিত। চ্যাটার্জী সাহেবও তাই বলছেন। পাশ করতে পারলে বছর খানেকের মধ্যেই ইন্সপেক্টরের পোষ্টে চলে যেতে পারবো।"

"খুব হিসেবী হয়ে উঠেছ দেখি।" শান্ত গলায় কথা ক'টি বলে অনুপমা শুয়ে পড়লো।

এর পরও সুবীর পড়া আরম্ভকরার কথা দু'একবার মনে মনে নাড়াচাড়া করলো। কিন্তু অনুপমা একেবারে চুপ। পড়ার কথা একদিনও তুললো না। সুবীর বুঝলো ওর অভিমান হয়েছে। কিন্তু অভিমান ভাঙাবার জন্যে যে পরিমাণ উদ্যম দরকার তা নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিল না ও। তাছাড়া মনের কোণে একটু অভিমান ওর নিজের ও ছিল। কেন অনুপমা বুঝলো না ওর অসুবিধাটুকু? নাই বা পড়লো সুবীর এম, এ,। কী আসে যায় তাতে?

কিন্তু এরপর প্রায়ই সুবীর অফিস থেকে বাড়ী ফিরে দেখতে পেতো টেবল ল্যাম্প জ্বালিয়ে অনুপমা পড়তে বসেছে। সুবীর এলে উঠে গিয়ে চায়ের কাপ খাবারের ডিস এনে দিত বটে, কিন্তু দুজনের কথা আর জমতো না। দু চারটে কথা বলেই হয় তো অনুপমা বলতো—'যাই নোটটা শেষ করে আসিগে।"

সুবীরের মনে হোত অনুপমার নোট নেওয়া বুঝি অনন্ত কাল ধরে চলবে। রাগ হোত, অভিমান, হোত। কিন্তু অনুপমার শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওর আর অভিমান প্রকাশ করতে ইচ্ছে হোত না। কাজেই অফিসের পর যেতে লাগলো ও অফিসের হরিপদবাবু আর নদীবাবুর বাড়ী। কোনদিন বা ক্লাবে যেতো ব্রীজ খেলতে।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গেল। মাঝে মাঝে সুবীর অনুভব করতো দুজনে দুজনকার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। কিন্তু কেরার দরজাটা অনুপমা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল—আর তা খোলার উদ্যমও বুঝি ছিল না সুবীরের।

এক রোববারের বিকেলে বিভূতি এল। "কই হে সুবীর, তোর তো পাত্তাই পাওয়া যায় না। অফিস এতোই ভালো লাগে?"

"তোদের পাত্তাই বা কতটুকু পাচ্ছি, তুমি? ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে তোরা তো সব তারার হয়ে গেছিস্ বড়ো বড়ো।" একটু ব্যাঙ্গ মিশিয়েই সুবীর বললো। তার কতটুকু বিভূতিকে বলা আর কতটুকু পাশে দাঁড়ানো অনুপমাকে বলা তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারলো না ও।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে দুবন্ধুতে গল্প সুরু করল। ফুটবল সিনেমা থিয়েটার আর রাজনীতি। সঙ্গে সঙ্গে এল মামা সমস্যার কথা—জিনিষপত্রের দাম চড়েছে—বেকার সমস্যা বাড়ছে—ইত্যাদি।

"আমার মতে, বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে

চাই—" অনেকদিন আগেকার কলেজে পড়া একটা সমাধান আউড়ে গেল সুবীর।

"কক্ষনোই না।" টেবিল চাপড়ে জবাব দিল বিভূতি। "ওই মত আজকাল পুরোনো হয়ে গেছে। লেটেস্ট মত হচ্ছে—"

হঠাৎ-বিভূতিকে বাধা দিয়ে অনুপমা বলে উঠলো—"লেটেস্ট মত উনি জানবেন কী-করে বিভূতিবাবু, লেকী ওঁর পড়া আছে?"

চুপ করে গেল সুবীর। অনুপমা যে এভাবে আঘাত করবে ভাবতেও পারেনি সে। বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখ। মৃদুস্বরে ও বলে উঠলো—"তা ঠিক তবে পাট অনেকদিন চুকে গেছে।"

অপ্রস্তুতের মতো খানিকটা হেসে বললো বিভূতি—"তোরই তো দোষ সুবীর। প্রাইভেটে পরীক্ষাটা দিচ্ছিস না কেন? অনুপমা দেবী তো নোট তৈরী করছেনই।"

রাতে শোবার সময় সুবীর বলে—"বিভূতির সামনে এভাবে অপমান না করা ছাই করতে অনুপমা।"

অনুপমার চোখ জলে ওঠে। তীব্র কণ্ঠে বলে—"ইচ্ছে করেই করেছি। তবু যদি তোমার মনুষ্যত্ব জাগে! তবু যদি মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা হয়।"

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুবীর। মনে হয় বুকটা যেন ভেঙে যাবে এখুনি। একটু পরে মৃদুস্বরে বলে—"তাহলে কী তোমার মতে আমি মানুষ হতে পারিনি?"

আগের মতই তীব্রস্বরে অনুপমা বলে—"মনুষ্যত্বের পরিমাপ হয় মানুষের কীর্তি দিয়ে, তার জ্ঞান দিয়ে বিদ্যা দিয়ে। কী তোমার কীর্তি? কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছ তুমি, যা তার জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছ তুমি? অভিলাষী গ্র্যাজুয়েট কেরানী বাংলা দেশে ক'লক্ষ আছে তার হিসেব রাখো?"

কোন উত্তর দিতে পারেনি সুবীর। সত্যিই তো ও, বাংলা দেশের অগণিত গ্র্যাজুয়েট কেরানীর একজন মাত্র। অথচ অনুপমার স্বামী হিসেবে বিশিষ্ট হওয়াই উচিত ছিল ওর। না হলে কেন সহ্য করবে অনুপমা? সে তো সাধারণ নয়।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সুবীর। অন্ধকার রাত। আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। দূরের নারকেল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে প্রেতের মতো। সবই কেমন যেন নিষ্করুণ মনে হোল সুবীরের। অনুপমার শান্ত চোখের মতোই নিষ্করুণ।

সে রাত্রি কীভাবে কেটেছিল আজ আর সুবীরের মনে নেই। সব রাত্রিই তো শেষ হয়—যন্ত্রণাভরা অসহ্য রাত্রিও। আর রাত্রি শেষে দেখা দিয়েছিল শীতের বিবর্ণ প্রভাত।

আর সেই প্রভাতে অনুপমা আর সুবীর দুজনেই যেন জেনে গিয়েছিল যা ভেঙেছে তা আর জোড়া লাগবে না। দুজনে দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল এক মুহূর্ত। তারপর অনুপমা চলে গিয়েছিল ঘরের কাজে।

দিন তারপরও কাটলো। কাটলো মাস, বছর। এম, এ, র ফল বেরুতে দেখা গেল অনুপমা রেকর্ড মার্কস পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে।

সে কী অখণ্ড তন্ময় দিন কটি। ঘরে বাইরে সর্বত্র কনগ্র্যাচুলেশনস্। অফিসে সবাই সুবীরকে ধরলো খাওয়াতে হবে। ঘোষালবাবু বললেন—"মোগলাই পরোটা আর মাংস না খলে কিন্তু ছাড়ছি না।" চ্যাটার্জী সাহেব নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে বললেন—"তুমি তো খুব ভাগ্যবান হোকরা হে! এমন ডবী বৌ পেয়েছ। তা বৌমা যে এমন বিদুষী আগে বলতে হয়।"

মাথা নীচু করে শুনে গেল সুবীর। সবাই বলে

"বিষয়"। হরিশ বাবু বল্লেন—"ভালই তো, তোমাদের যতো চাক পেটানোর স্বভাব নেই।"

বাড়ীতে বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন সুবীরের মা। দু' চারজন আত্মীয় এলেন, বিভূতি এলো, আর এলো অনুপমার একঝাঁক বন্ধু ও বান্ধবী। হাসি গল্পে সবাই মেতে উঠলো। হালকা সবুজ রঙের শাড়ী পরে ছিল অনুপমা—খোঁপায় দিয়েছিল কয়েকটি স্বর্ণ চাঁপা। দূর থেকে তাকিয়েছিল সুবীর। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অনুপমা। ওর মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগেকার সেই হাসিখুশী অনুপমার কথা। সুবীর ভেবেছিল অনুপমা বুঝি বদলে গেছে। কিন্তু আজকের অনুপমাকে দেখে ওর ভুল ভাঙ্গলো। অনুপমা বদলায় নি। ওর কালো চোখ দুটি এখনো তেমনি চঞ্চল, উজ্জ্বল। শুধু সুবীরের কাছে এলেই ঐ চোখ দুটো যেন পাথর হয়ে যায়।

পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সুবীর। অনুপমার সাফল্য ওর প্রশংসা সব কিছুই কেন যেন তীরের মতো গায়ে এসে বিঁধছিল। মনে হোল ও আর সহ্য করতে পারবে না।

অনেক রাতে যখন শোবার ঘরে এলো সুবীর তখন ক্লান্ত অনুপমা চোখ বুজে শুয়ে আছে। ঘরের চারদিকে চাইল সুবীর। চমৎকার করে ঘরখানাকে সাজিয়েছে অনুপমা, জানালায় সবুজপুরের পর্দা, বিছানায় শান্তিনিকেতনের বেডকভার। টেবিলের ওপর বাঁশের ফুলদানিতে স্বর্ণাচাঁপা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। শ্বেত পাথরের ধূপদানীতে মাইসোরের ধূপ।

উৎসব? হ্যাঁ, অনুপমার কাছে তো এটা উৎসবের রাত্রিই বটে। কিন্তু সুবীর? ওর ইচ্ছে হোল রজনীগন্ধাগুলিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। ধূপের ধোঁয়ায় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আর পারছেন না সে। তার চেয়ে অনুপমা চলে যাক্। তার উৎসব মুখরিত রাত্রি, কৃতিত্বময় জীবন সব কিছু নিয়ে চলে যাক্। সাধারণ সমস্যা কেরানী সুবীর আর সহ্য করতে পারছে না বিশিষ্টা অনুপমাকে।

"কয়েকটা কথা তোমাকে বলবো অনুপমা।" সুবীর বললো। চোখ মেলে তাকালো অনুপমা। তারপর একটা হাইতুলে বল্লে—"আমি বড়ো ক্লান্ত। খুব কী প্রয়োজনীয় কথা?"

"হ্যাঁ"—দৃঢ়িত স্বরে সুবীর জবাব দিল।

উঠে বসলো অনুপমা। ভেঙেপড়া খোঁপাটাকে জড়িয়েনিল আলতো ভাবে। তারপর স্থির কণ্ঠে বল্লে—"বেশ বলো।"

কী বলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই সুবীরের। হয় তো অনেক অসংলগ্ন কথা। বেশ উত্তেজিতও হয়ে উঠেছিল ও। অনেকদিনকার পুঞ্জীভূত বেদনা, ঘৃণা সব কিছুই প্রকাশ পেয়েছিল হয় তো।

"আমায় মুক্তি দাও তুমি।" শেষ কথা ক'টি বলে হাঁপাচ্ছিল সুবীর।

খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল অনুপমা। তারপর শান্তকণ্ঠে বললো—

"বেশ তো। আমার আপত্তি নেই। ট্যাক্সিস্টিক্যাল ইন্সটিট্যুটে একটা রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যান্টের কাজ পাবো আমি। আড়াইশ থেকে শুরু। তাতে আমার একার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। তুমি যদি বলো তবে কালই চলে যাবো আমি। কিন্তু—"

একটু থেমে আরো শান্ত গলায় ও বল্লে—"কিন্তু চলে যদি যাই তবে কেন সেলাম তার কারণটা সবাইকে জানালে আশাকরি আপত্তি হবে না তোমার। মন তো লোকে নানা কথা ভাবতে পারে। এমন কী আমার চরিত্র নিয়েও কথা উঠতে পারে। তাই সত্যি কথাটাই আমায় সবাইকে বলতে হবে। পারবে তো তা সহ্য করতে?" কঠিন একটু হাসলো অনুপমা।

সুবীর স্তব্ধ হয়ে রইলো খানিকক্ষণ। এদিকটা ও ভেবে দেখেনি। পারবে কী ও সহ্য করতে? নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চায় ও। সবাই জানবে অনুপমার সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ভালোবাসার বিয়ে। মুখ টিপে হাসবেন আত্মীয়েরা সব। বিয়ে করতে মত দিয়েছিলেন মা বাবা—কিন্তু ভাঙতে মত দেবেন না। ভয় হয় সুবীরের। তারপর আছে বন্ধুবান্ধব অফিসের সমাজ। এই তো দুদিন আগে সবাই ঘটা করে ওকে কনগ্র্যাচুলেশনস্ জানালো ওর বৌয়ের ফুতিত্বের জন্য। আর সেই বৌ এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কেন? না অতিসাধারণ সুবীর বিশিষ্টা অনুপমার মনের মতো হতে পারেনি। সবার চোখের ইসারা, ঠোঁটের চাপা হাসি সবই যেন চোখের সামনে দেখতে পায় সুবীর। ভারী অসহায় মনে হয় নিজেকে। নিজের অযোগ্যতার জন্যে এর চেয়ে আর কী-বেশী প্রচার হতে পারে?

ঘাটের রেলিং ধরে কেমন যেন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সুবীর। ওর মনে হয় ওর চারপাশে যেন সবাই হাসছে—হাসছে অনুপমাও। ধিক্কারের হাসি। না, না, ও পারবে না ওই হাসির মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে। ওর শক্তি নেই।

"কী উত্তর দিলে না যে? পারবে তো সহ্য করতে?"

"পারবো না।" ভাঙা গলায় জবাব দিয়েছিল সুবীর।

"আমি জানতাম"—বলে ওরে পড়েছিল অনুপমা।

একটা নিশ্বাস ফেলে সুবীর। অন্যমনস্ক ভাবে ঘাস ছেঁড়ে কয়েকটা। কতদিন কেটে গেছে তারপর। আরো কতদিন কাটবে। অনুপমা আছে ওর চাকরী রিসার্চ বন্ধুবান্ধব এসব নিয়ে। সুবীর আছে ওর লালবাড়ীর জীবনটা নিয়ে ফাইলের স্তূপে মুখ গুঁজে। এমনি ভাবেই থাকবে। হয় তো অনন্ত কাল।

দুচার ফোঁটা বৃষ্টি করে পড়ে। হয় তো এক্ষুণি নামবে মুষলধারে। নামুক। কী হবে উঠে। না হয় ভিজলই একটু। ভেতরের অসহ্য জ্বালা একটু কী কমবে তাতে? হয় তো কমবে। কালীঢালা আকাশের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে সুবীর।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইন্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

যন্ত্রণা লালন করা আমাদের স্বভাবের দায়।
এখানে শান্তি নেই, এ সমুদ্রে চেউয়ের আকাশ
কেমন বিষণ্ণ নীল। স্রষ্টার হিরণ্য বেদনায়
আশ্চর্য সৃষ্টির রূপ। জন্মের আদিম বিশ্বাস
সেও তো যন্ত্রণালব্ধ : যন্ত্রণার কারুকার্য দিয়ে
আমাকে গড়েছে যার সিদ্ধ দুটি লাবণ্যের হাত
সে নারী আমার মা!

অপ্রাপ্য আকাঙ্ক্ষার পথে পথে রক্ত ঝরিয়ে
যে পুরুষ একা একা চলে গেছে দূরতর নক্ষত্রের দিকে
নির্জন নিষ্প্রভ নীল—: সেই সব অরণ্য-অলাত
আমার বুকের ঘরে :—আমি তার যন্ত্রণার নির্ভুল প্রতীক
দুর্লভ আত্মজ তার ; অস্ফুট একতম কান্নার আদিকে
আমার চেতনা বিদ্ধ—একক সূর্যের স্নেহ। অন্ধকার রাত।

আর্তির আহত দিন পার হয়ে রাত্রির গৈরিক—
সেখানে কান্নার ক্লান্তি আরো যেন দুঃসহ বিনাশ।
কী এক দুরূহ শুদ্ধি শ্রাবণের শয্যায় উতলা,
আমি তো জানি না নাম।

স্নিগ্ধ ভোরে মধুর-বাতাস
মেলেছে উজ্জ্বল পাপড়ি। আমি সেই স্বভাবের থেকে
কিছুই পারিনি নিতে। হৃদয়ের চরিত্র-চেতনা—
দুঃস্বপ্নের থেকে তার ঘুম আর কখনো ভাঙ্‌লোনা ;
ভোরের পাখীরা তাকে নিল না শান্তির দিকে ডেকে।

গল্প

অন্তঃশীলা

অমরেন্দ্র সান্যাল

পথ নয়, অজগর। আঁকা-বাঁকা। সর্পিল।

অনেক দিন আগে, দিন নয় অনেক যুগ আগে এখানে ছিল মাঠ। চাষের জমি। আলপথ। ঘুটি-কাটা ধানের ক্ষেত। বর্ষায় একহাঁটু কাদা। গরমে কাগের মত ধূসর মাটির ধূলো। সেই যুগ থেকে সুরু হয়েছে মানুষের চলাচল। পায়ে পায়ে সংকীর্ণ আলের বেড়েছে বিস্তার। মাটি পড়েছে। বছর বছর নতুন করে হয়েছে সংস্কার। তারপর ঐ এখন কেন্দুলি থেকে ইলমবাজার যাবার একমাত্র রাস্তা। ছুটো বর্ধিষ্ণু জনস্থানের যোগ সেতু। মেঠো পথ। বছর কেটেছে, যুগ গিয়েছে তবু গরমে ধূলো ওড়া বন্ধ হয় নি। বর্ষায় হাঁটু ভর্তি এঁটেল কাদার হাত থেকে নিস্তার মেলেনি পথিকের। এই অখ্যাত মেঠো পথটা ইতিহাসের কালের ঐতিহ্য বুকে জড়িয়ে, গেঁয়ো মানুষের সরল মনের সোহাগ নিয়ে বেড়েছে একটু একটু করে। বয়স বেড়েছে তত প্রাচীন হয়েছে। কিন্তু এতেও বোধহয় ভরেনি ওর মন। একটা মেঠো রাস্তার একবুক আকাঙ্ক্ষা ধূলো কাদার অনেক গভীরে ধুকপুক করছে আর সেই আকাঙ্ক্ষাটা হঠাৎ সত্যি আর সার্থক হয়ে উঠছে আশ্চর্য্য ভাবে।

কথাটা শুনেছে সকলে। চারপাশের গাঁয়ের আপামর সাধারণ। যে শুনেছে সেই খুসী হয়েছে। বাউল রাস্তাটা রূপ বদলাবে এবার। কংক্রিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে মেঠো পথের অনাবরণ ধূলোমাটির অসমান বুক। ইলম-বাজারের মুখে মহুয়া গাছের নীচে নীচে ওরা পড়েছে কদিন হলো। মাপজোক হচ্ছে। শোলার হাট মাথায় ওভারসিয়ার তীর্থ সামন্তকে প্রায় সকলেই চিনে ফেলেছে এর মধ্যে। রোগা একহারা মানুষ তীর্থ সামন্ত। কালো রং। মাথায় ছোট ছোট চুল। হাড় ওঠা ভাঙা গাল। টিকালো নাক। ঠোঁট জোড়া আর বেশী উজ্জ্বল ছুটো চোখের মণিতে চেহারার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম একটা রুক্ষতা। এই ছিপছিপে মানুষটা যখন কাজ করে তখন না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে তীর্থ সামন্ত দেহে দুর্বল হলেও কাজে দৈত্য। কাজের সময় অসুর। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি নিরলস পরিশ্রম করে। ঝাঁ ঝাঁ রোদকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তার নেই হুঁস আতপ্ত আগুন ঝরুকে। শুধু কাজ। একটা মাটি ধূলোর খোলা উদুনীচু বুককে পাথর সুরকির সঙ্গে সিমেন্ট বালি জমিয়ে বেঁধে দেওয়া। একটা চন্দন কোমল নরম ধূলোর বৈরাগী আত্মাকে রূপোর মত সিমেন্টের রূপের বাহার আর চেকনাই দিয়ে আধুনিক করে তোলার নেশায় তন্ময় তীর্থ সামন্ত। ওভারসিয়ার তীর্থ সামন্ত মনে মনে শিল্পি। শিল্পি আর কাজ পাগল।

বেলা নটাতেই সূর্য্য মাথার ওপর। আগুনের তাপ ছড়াচ্ছে। থেকে থেকে হঠাৎ বাতাস উঠছে। ধূলোর ঝড়। শুকনো বাতাস ঘুরছে। জল খেতে তাবুতে ঢুকেছিল তীর্থ সামন্ত। খালি গেলাসটা নামিয়ে রেখে শোলার হাটটা মাথায় তুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াতে হলো। তাবুর দরজা জুড়ে একটি মানুষ। মেয়ে মানুষ। কম বয়েস। নিটোল দেহ। অস্বীকার করে লাভ নেই তীর্থ সামন্ত অবাকই হলো একটু। বিস্ময় আর কেমন একটা দুর্বোধ্য খুসীর ধাক্কা লাগল চেতনায়। তীর্থ সামন্ত সামনে এগিয়ে এলো, কিরে, কি চাই এখানে?

কাজবাবু, মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, একটা কাজ যে আমাকে।

কাজ করবি, পারবি ?

কেনে পারবো না···

মাথায় করে পাথর কুচি বইতে হবে, পাথর ভাংতে হবে, আর দরকার হলে···

জানি জানি, সব কাজ পারবো, তুই দিয়েই দেখনা কেনে···।

আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে।

বহাল হয়ে গেল শুগনী সেই দিন থেকে। ওভার-সিয়ার তীর্থ সামন্তর কুলি কামিনের মনে আর একটা মানুষ বাড়লো, অন্তর তীর্থ সামন্তর মনে আর একটা সুর বাজলো। বিচিত্র আর বিহ্বল এক আতুর কামনা চুপিচুপি, প্রায় তীর্থ সামন্তর অজ্ঞাতেই কুড়ি মেলল তীর্থ বুকের পাথরে ঢাকা হৃদয়ের অতলে। ওটা লোভ। তীর্থ সামন্তর দৃষ্টির মুগ্ধ-বিস্ময় ধীরে ধীরে জমে গেল। জমে জমে ক্ষুধা হলো। একটা বুভুক্ষু পুরুষের সর্বগ্রাসী অসুস্থ আর অবাধ্য ক্ষুধা। স্তব্ধ চেতনায় অন্তরে তীর্থ সামন্ত অনুভব করলো এ ক্ষুধার নিষ্ঠুর জ্বালা। অবরুদ্ধ যন্ত্রণা।

প্রতি শনিবারে হপ্তা। নোট আর খুচরো পয়সা হাতে করে তাবু থেকে শুগনী বেরিয়ে যাবার আগেই তীর্থ সামন্ত চোখ তুলল, এই···

হাঁ বাবু।—

থাম একটু। তোর হিসাবে গোলমাল আছে।

নিরুত্তরে তাবুর এককোণে সরে গেল শুগনী। পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মাটির ওপরেই। একে একে পয়সা নিল গুনতে। খাতার শেষ টিপদিল নাগদেও সর্দার। চোখে চোখে এক পলক তাকাল নাগদেও আর তীর্থ সামন্ত। মুঠো হাতে খুচরো পয়সা গুনতে গুনতে তাবুর বাইরে চলে গেল নাগদেও।

চেয়ারের পিঠে দেহ এলিয়ে তীর্থ সামন্ত শুগনীকে ডাকলো, এদিকে আয়রে মেয়েমানুষ···।

বসেছিল। উঠল শুগনী। এগিয়ে এলো টেবিলের কাছে।

তীর্থ সামন্ত টেবিলের ওপর কনুই রেখে ঈষৎ ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তোর বাড়ী কোথায় রে ?

গাঁয়ে বাবু।

কে কে আছে তোর ঘরে ?

মা, বাপ, ভাই—

আর, আর কেউ নেই ?

না; কে থাকবে আর ? তীর্থ সামন্তর প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলোনা শুগনী।

কেন তোর ঘরা নেই ?

হেসে ফেলল শুগনী। মুখ নামাল। লজ্জা পেল। আর ওর সেই লজ্জায় কুণ্ঠিত একজোড়া আনত চোখের দিকে তাকিয়ে তীর্থ সামন্ত দেখল একটা বন্য-প্রায় কিশোরী-মন চিরন্তন একটা লজ্জাকর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারছে না। গলার মধ্যে কথা আটকে যাচ্ছে। বুকের একটা চকল শিহরণের ঢেউও আটকে গিয়ে রেখে যাওয়া কথাটা আরও বেশী করে এই মুহূর্তে লজ্জা দিচ্ছে শুগনীকে।

কিরে তোর বিয়ে হয় নি এখনো ? আবার প্রশ্ন করল তীর্থ সামন্ত।

না, চোখ না তুলেই মাথা নাড়াল শুগনী।

অবাক কথা। যোয়ান বয়সে এখনো বিয়েই করিসনি।

অবাক নয়, খুসীর কথা। খুসীই হলো তীর্থ সামন্ত। দুটো চোখের তীব্র দৃষ্টির আগুনে শুগনী নামের একটা পরম কামনাকে আহুতি করে ওভারসিয়ার তীর্থ সামন্ত একটা ক্লেদাক্ত চিন্তার রোমন্থনে তলিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত।

শুগনী···

হাঁ বাবু।

তোর যেমন আপন জন কেউ নেই, আমারও তেমনি কেউ নেই—

চমকে তীর্থ সামন্তর চোখের জলে চোখ ভুলল শুগনী। এক মুহূর্ত চেয়েই রইল। একটা ভিজে নিশ্বাসের মতন তীর্থ সামন্তর কথাগুলোও আচ্ছন্ন করল। প্রতিটি শব্দ যেন ছপছপে একবুক কান্নায় ভেজানো। তার কেউ না থাকার বেদনায় কেমন যেন হঠাৎ বিহ্বল হয়ে গেল শুগনীর সমস্ত অন্তর।

বাইরে ছায়া ছায়া মায়াবী দিন। আলো নিভছে। মহুয়ার পাতা ঝরা বিশীর্ণ ডালে বাতাসের সর সর দীর্ঘশ্বাস।

বাবু।

উঁ, চোখ ভুলল তীর্থ সামন্ত।

রাত হলো। আমি ঘর যাচ্ছিরে।

হুঁ, যা। তাবুর বাইরে আবছা সন্ধ্যার আঁধারে শুগনী মিলিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ মাথা নামিয়ে একই ভাবে বসে রইল তীর্থ সামন্ত। পরদিন। তারও পরদিন।...

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তীর্থ সামন্তর তাবুর পর্দাটেলে নাগদেও সর্দারের পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলো শুগনী। নিঃশব্দে অক্টোপাসের মত দুটো লোলুপ হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিল তীর্থ সামন্ত। অনেক পর— শঙ্কিত দ্রুত পায়ে ছায়ার শরীর মিলিয়ে যাবার তাবুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো শুগনী।

পর পর কদিন কাজে এলো না শুগনী মেহতান। তীর্থ সামন্তর জীবনে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। তাই তার কাজের এতটুকু ব্যতিক্রম হলো না। বরং আগের চেয়েও বেশী তলিয়ে গেল কাজের নেশায়।

সময় কাটছে। মুহূর্ত মুহূর্ত করে দিন রাত।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এতটুকু ফুরসৎ নেই তীর্থ সামন্তর। আর ফুরসৎ থাকলেই বা কি হতো। হুহাতের নির্লিপ্ততায় মাথা নামিয়ে তীর্থ সামন্ত ভাবতে বসতো না শুগনী মেহতানের কথা। শুগনী নামের একটা যৌবনবতী-মেয়ে নারীর একটা চিরন্তন কামনায় আকুল হয়ে উঠেছিল। আর তার সেই আকুলতার রঙে রং মিশিয়ে ছোট্ট আর মিষ্টি একটা স্বপ্ন এঁকে তার চোখের সামনে মেলে ধরেছিল তীর্থ সামন্ত। শুগনী নির্বোধ তাই বিশ্বাস করেছিল সবটা সত্যি বলে। হয়তো এখনো তার সে বিশ্বাস নষ্ট হয়নি।... কাজ বন্ধ হলে সন্ধ্যের পর তাবুতে ফিরছিল তীর্থ সামন্ত। সঙ্গে নাগদেও সর্দার। সমস্ত রাস্তাটা নিঃশব্দে পেছন পেছন হেঁটে এলো নাগদেও। তাবুর কাছাকাছি এসে মুখ খুলল, হুজুর—

কিরে?

হুজুর, নাগদেও ডোক গিলল বার কতক, ওই মেয়েটা!

কোন মেয়েটা?

হুঁজুর—শুগনী...

তীর্থ সামন্ত রাস্তার ওপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কি হয়েছে?

উর পেটে ছেলা আসছে...।

তীর্থ সামন্ত পাথর হয়ে গেল মুহূর্তে।

নাগদেও বলল, উঁ বলছে তু বিহা না করলে কা গাঁয়ের মাতব্বরকে তুর নামে নালিশ করবে। ই কথাটা সকলে শুনলে ডোকে ভানে মেরে দিবে হুজুর।

হুঁ, হাতের সোনার ঘুঁড়িটার ওপর তীর্থ সামন্তর হুহাতের দশটা আঙুল শক্ত হয়ে বসল।

উ মেয়েটা শয়তান হুজুর...

শয়তান, তীর্থ সামন্তর ভাঙা গালের দুটো হাড় আরও ঠেলে উঠলো। চোখের দৃষ্টি আরও তীব্র হলো। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে। তীর্থ সামন্ত আর নাগদেও সর্দার হাঁটতে আরম্ভ করল আবার।

তাবুর বাইরে এসে তীর্থ সামন্ত থামলো, সর্দার—

হুঁহুর···।

দোষ আমার ও বললে আমি মানবো কেন ?

তুই না মানলেও গাঁয়ের মানুষ মানবে। উর বাপ ভাই তোকে জানে মেরে তবে ঠাণ্ডা হবে। তুই ওকে বিয়া করেন হুঁহুর।

বিয়া, ওকে ? তীর্থ সামন্তর গলায় ঘরে অসহ একটা অস্বীকারের তীক্ষ্ণতা ঝরঝরিয়ে উঠলো।

হাঁ, তুইতো বুলেছিলি বিয়া করবি। ঘর বাধবি উর সাথে। ছেলা হলে সে ছেলা তোকে বাপ বলবে। বলিস নাই ?

তীর্থসামন্ত নির্বাক। নিথর। এই মুহূর্তে অন্ধকার রাতটা যেন একটা অতল কালো সমুদ্র। আর এই সমুদ্রের অজস্র উথাল পাথাল ঢেউএ ঢেউএ বিপর্যস্ত ওস্তাদ সিরাজ তীর্থ-সামন্ত। একটা হিংস্র আত্মা দু হাতে যেন গলা টিপে ধরেছে কেটে যেতে চাইছে অবরুদ্ধ শ্বাসে।

সর্দার···

হুঁহুর···

ভেতরে চল সর্দার, তাবুর দরজার কাপড়টা একহাতে তুলে ধরলো তীর্থ সামন্ত। নীরবে ভেতরে প্রবেশ করলো নাগদেও, তার পেছন পেছন তীর্থ সামন্ত।

ওখানে বস্, আঙুল তুলে ঘাড়ের খাটিয়াটা দেখিয়ে দিল তীর্থ সামন্ত।

নাগদেও সেখানে না বসে মাটির ওপর বসল। এক-হাতে টেনে বিছানার তোষকখানা উল্টে ফেলল তীর্থ সামন্ত। এক মুঠো খুচরো সিকি আধুলি তুলে নিল ব্যাগ হাতে। তারপর নাগদেও সর্দারের একখানা হাত টেনে নিয়ে নখগুলো গুণে দিল। মিনিট কয়েক পরে উঠে দাঁড়াল নাগদেও। তাবু ছেড়ে চলে গেল। ছোট টেবিলটার ওপর মাথা নামিয়ে নিল তীর্থ সামন্ত। দু হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে চঞ্চল ব্যস্ত মনে নিখুঁত একটা স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল। রাত বাড়লো। বেড়ে বেড়ে গভীর হলো। মহুয়া গাছের নীচে নীচে তাঁবুগুলোর মানুষ অচেতন হলো নিদ্রায়। অনেক পর, অনেক রাতে নাগদেও সর্দার মাঠের মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট ঝোপগুলোর আড়ালে আড়ালে সন্তর্পণে তীর্থ সামন্তর তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। ঘন অন্ধকার। নিস্তব্ধ। প্রেতের মত অন্ধকারে মিশে তাবুর বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল তীর্থ সামন্ত। সন্তর্পণে এগিয়ে গেল, সর্দার।

হুঁহুর।

এনেছিস ? হাঁ হুঁহুর।

এগিয়ে চল্ সড়কের ওপর। কাঁধে একটা ভারী বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে সরে গেল নাগদেও।

দুটো মানুষ নিরলস্ত কোদাল চালালে একটা প্রমাণ মত গর্ত হতে বেশী দেরী হয় না। হলোও না দেরী। কাপড় জড়ানো অসাড় দেহটা দুজনা ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলো গর্তের মধ্যে।

পরদিন সকালে তীর্থ সামন্ত মেঠো পথের একটা জায়গায় বুটের ঠোক্কর মেরে চেঁচিয়ে আদেশ দিল, আজ এখান থেকে কাজ সুরু করো মিস্ত্রি। আগে এখানে মসলা চালো।···

পাথর কুচি সিমেন্ট আর বালির মসলায় কোদাল চালাতে চালাতে নাগদেও সর্দার একবার থামল। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্তের জন্যে।···

পুস্তক পরিচয়

পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রহ্মসমাজের ইতিবৃত্তি

লেখক : বন্ধুবিহারী কর
ব্রহ্মমিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
মূল্য : দুই টাকা

পূর্ব বাংলা নামটিই আজ অগণিত মনে জাগায় এক অপরিসীম বেদনা। জাতীয়তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুভূতিতে যে অঞ্চলটি ছিল একদিন সারা বাংলার গৌরব আজ তা একটি পরদেশ! পূর্ববাংলার ইতিহাস হয়তো লেখা হবে কিন্তু আজকের পূর্ববাংলা থেকে যে ইতিহাস লেখা হবে সে ইতিহাসের পাতায় পূর্ববাংলার সত্যিকার জীবন-কাহিনী খুব কমই সার্থকভাবে প্রতিফলিত হবে। যাঁরা পূর্ববাংলার প্রাণসত্তার ইতিহাসকে জানতে চাইবেন তাদের সন্ধান করতে হবে আজকের আগের পূর্ববাংলায়। সেই ইতিবৃত্ত সন্ধানীদের কাছে 'পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' একটি অমূল্য তথ্য-ভাণ্ডার রূপে বিবেচিত হবে।

এই বইটি মুখ্যত লেখা হয়েছে গত ষেড়শ বছরের পূর্ববাংলার ব্রাহ্মসমাজের তাত্ত্বিক ইতিহাস রূপে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ও অবদান ধর্মের দিক দিয়ে ছাড়াও সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা তথা জাতীয়তাবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে ঢাকা সহরে, যে অপূর্ব জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার ওরফ গদার দু' মুলুকেই সোলা দিয়ে গেছে, সেই জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে পূর্ববাংলার ব্রাহ্মসমাজের অবদানকে অস্বীকার করে কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই পূর্ব বাংলার ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। এই বইটিতে এমন সমস্ত ঘটনা ও তথ্যের সমাবেশ হয়েছে যাতে শুধু ব্রাহ্মসমাজের কথা নয় পূর্ববাংলার সমসাময়িক অনেক কথাই জানা যায়। বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ মহামানবদের পূর্ববাংলা পর্যটনের কাহিনীও এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এরূপ একটি তথ্যমূলক বইলেখার জন্য বন্ধু বাবুকে অতি অসুস্থ ও অপটু শরীরেও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অগণিত ফাইল, চিঠিপত্র, সমসাময়িক পত্র-ও পত্রিকা, বহু ব্যক্তির স্মরণ ভাণ্ডার—অনেক কিছুতে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে বহুদিন ধরে পরিচালিত করে তবে তিনি এই মূল্যবান তথ্যের ভাণ্ডারটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তীব্র আগ্রহ ও আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত না হলে এত পরিশ্রম তিনি করতে পারতেন না। বন্ধু বাবু দীর্ঘ দিন পূর্ববাংলার ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত ছিলেন। তাই, এই বইয়ের পেছনে রয়েছে বন্ধুবাবুর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সারা পূর্ববাংলার গত ষেড়শ বছরের ইতিহাসের কথা যারা জানতে চাইবেন, তাদের কাছে এই বইটির সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য্য। ধর্ম, বিষয়ক তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক তথ্য—উভয় শ্রেণীর অনুসন্ধানীদের কাছে এই বইটি লেখার জন্য গ্রন্থের বন্ধু বিহারী কর মহাশয় ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন। এই বইটি সম্বন্ধে আমরা ঐতিহাসিক ও তথ্যানুসন্ধানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আজকের পশ্চিম

লেখক—ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

অনুবাদক—শ্রীমতী সাধনা সোম

প্রকাশক : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

দাম : সাড়ে চার টাকা

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইয়োরোপ ও আমেরিকা পরিদর্শনের পরে 'ওয়েষ্ট টু গো' নামে যে ইংরেজী বইটি লিখে বাংলা ও ভারতের বিদগ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আলোচ্য বইটি তারই সহজ বঙ্গানুবাদ। ডাঃ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী সাধনা সোম যিনি তাঁর সঙ্গে ইয়োরোপ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন, তিনি বইটী অনুবাদ করেছেন তাতে সরল ও সহজ ব্যঞ্জনার অনুবাদের জড়তা বিন্দুমাত্র নেই।

ভ্রমণকাহিনী বলতে ইয়োরোপ আমেরিকার নৈসর্গিক চিত্রের বর্ণনা অথবা দেশ ও দেশবাসীর তাসাভাসা হালকা জীবনের চিত্র অঙ্কন এই বইটির উপকরণ নয়। ভারতের জাতীয় প্রগতি ও সংগঠনের দিকে দৃষ্টি রেখে ডাঃ ঘোষ দেখেছেন ইয়োরোপ ও আমেরিকাকে। তাই তিনি শুধু সেই দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আতিথ্য গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি। নিজে রাজনীতিক হয়েও ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে রাজনীতির আপাতত চমকপ্রদ ঘটনাবলীকে পরিহার করে তিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা ও কৃষি-ব্যবস্থা এবং তার পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে। যারা ভারতের জাতীয় জীবন উন্নয়নে আগ্রহী এবং বিজ্ঞান তাদের পক্ষে এই বইটি একটি অনুপ্রেরণা ও তথ্যের খনি। এই বইটিতে বহু তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে আছে, নানা দেশ ও মানুষের সম্বন্ধে সরস বিবরণ। আমরা আশা করি ইংরেজী 'ওয়েষ্ট টু-গো'র মত বাংলায় 'আজকের পশ্চিম'ও বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করবে।

Pramatha Nath Bose :

By Jogesh Chandra Bagal; Published by P. N. Bose Centenary Committee; Parliament House, New Delhi.

মানব সভ্যতার মেরুদণ্ড আজ ইস্পাত। ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা স্থাপন এবং এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত নগরীর মসলা সংগ্রহের সন্ধান দিয়ে যিনি জামসেদপুর টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর পত্তন সম্ভব করেছেন তিনিই আচার্য প্রমথনাথ বসু। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল বিভাগের একজন উচ্চতম কর্মচারী। ময়ূরভঞ্জের গুরুমহীশানী পর্বতাঞ্চলে এবং মধ্য-প্রদেশের রূপ অঞ্চলে যে প্রচুর পরিমাণে লোহার আকর পাওয়া যায় গবেষণা করে সেই তথ্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

১৯০৯ সালে শ্রীবসুর দশবছরের অধস্তন একজন ইংরেজ কর্মচারীকে ভারত সরকারের সার্ভে বিভাগের ডিরেক্টার করায় অপমানিত প্রমথনাথ সরকারী কাজ ত্যাগ করেন। এই সময়ে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা প্রমথনাথকে তাঁর ষ্টেটের প্রধান জিওলজিষ্ট রূপে নিয়োগ করেন। প্রমথনাথ

গবেষণা করে গুরুমহিষানী পর্বত অঞ্চলের লৌহ সম্পদের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তখন জামসেদজী নওসেরওয়ানজী টাটা ভারতে একটি লৌহ কারখানা খোলার তথ্যানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের রূপ জেলাতে লৌহকারখানা খোলার কথা চিন্তা করেন। এ সংবাদ পেয়ে প্রমথনাথ তাঁকে গুরুমহিষানী অঞ্চলের খনির অফুরন্ত সম্পদ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান টাটা কারখানা স্থাপনে জামসেদজীকে উদ্বুদ্ধ করেন। বস্তুত, শ্রীপ্রমথনাথ বসুর গবেষণা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই জামসেদপুরের লৌহশিল্প সম্ভব হোলা সম্ভব হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত যে শ্রীপ্রমথনাথ বসুর একটি উপযুক্ত জীবনকাহিনী অপ্রকাশিত ছিল তা যথার্থই পরিতাপের বিষয়। প্রমথনাথের সুযোগ্য কন্যা শ্রীমতী সুষমা সেনের উদ্যোগে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ গবেষক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের কলমে রচিত এই বইটি সকলের নিকট এই বিজ্ঞান তপস্বীর জীবন কথা পৌঁছে দেবে বলে আমরা আশাকরি। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীনেহেরু ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণের পরিচিতি এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহার ভূমিকা সহ প্রমথনাথের এই ইংরেজী জীবনীটি ভারতের পাঠক সমাজের কাছে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ সাহা সত্যই লিখেছেন যে প্রমথনাথের অবদানকে স্থায়ীভাবে জাতীর স্মরণে রাখবার উদ্দেশ্যে ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজিকেল বিভাগে 'প্রমথনাথ চেয়ার' স্থাপন করে এই কৃতবিদ্য বিজ্ঞানীর প্রতি জাতীর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

সমবায় নীতি

লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ; দাম আট আনা

লোহাকে সোনা করার পরশ পাথর ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে। কবির হাতে যখন গল্প উপন্যাস অপরূপ রূপে আত্মপ্রকাশ করে—তাঁর গদ্য রচনাবলী যখন সাহিত্যে নূতন দিকদর্শন দেখায় তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় সাহিত্যিকেরা। আবার তাঁরই হাতে 'বিশ্বপরিচয়' 'বিজ্ঞানীদের কাছে অজস্রপরিচয় এনে দেয় রবীন্দ্রনাথের। সেই কবির হাতে যখন অর্থনীতিও অর্থপূর্ণ হয়ে সহজ সরল মর্মী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে তখন অর্থনীতিজ্ঞরাও বিস্মিত হয়ে পড়েন। 'সমবায় নীতি' নামে বইখানি লিখে তিনি যথার্থ তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন অর্থনীতিবিদদের। লেখাটি অর্থনীতি সংক্রান্ত। শুধু তাই নয়—সমবায়ী অর্থনীতি যে এ-যুগের ভাবী গণঅর্থনীতির এক মূল ভিত্তি,—কবির দূরদৃষ্টি তাকে এড়াতে পারেনি। সমবায় নীতির মূল কথাকে এমন সহজ ও সাধারণভাবে অসাধারণ করে তুলে ধরেছেন তিনি যে এই রচনাটি শতশত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েও এর পুনর্মুদ্রণের সম্ভাবনাকে অব্যাহত রেখেছে।

পশ্চিম বঙ্গের জনবিন্যাস: লেখক—শ্রীবিমল সিংহ।
বাংলার ভূমি সমস্যা: লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য
টাকার বাজার: লেখক—শ্রীঅতুল সুর।
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ শিবির, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

জনসাধারণের জন্য আট আনা দামের বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ প্রকাশ করে বিশ্বভারতী বাংলা পাঠক সমাজের ধন্যবাদার্হ হয়ে অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেছেন। শ্রীবিমল সিংহের লেখা 'পশ্চিম বঙ্গের জনবিন্যাস' বইটি সাধারণ পাঠক ও সমাজসেবী সমাইকার সহায়ক। আদমসুমারী অন্যান্য থেকে তিনি বাংলার জন সমাবেশের কয়েকটি সমস্যার

আধিক তত্ত্ব তুলে ধরেছেন এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে। রচনাটি শুধু সার্থক হয়নি, সহজ ও সরল ভাবে লিখিত হয়ে বাংলার জন ও জনজীবন সমস্যাকে সংক্ষেপে বাংলা-পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে কৃতিত্বের সঙ্গে সক্ষম হয়েছে।

ভূমি-সমস্যার কথা জানা এবং টাকার সমস্যা বোঝা শুধু অপরিহার্য নয় একান্ত আবশ্যকও বটে। জনসাধারণের জন্য লেখা এই সহজ বইগুলির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির মূলকথাগুলি সম্বন্ধে দেশের লোক যত সচেতন ও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে তত সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ পাবে দেশে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত। বাংলার ভূমি-সমস্যা, এবং টাকার বাজার বহু জ্ঞাতব্য সহ সুপাঠ্য এবং সুবোধ্য পাঠ্য।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

লেখক—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীউমা মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ডি, এম্ লাইব্রেরী। দাম—এক টাকা।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বলে আখ্যা দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং এই সিপাহী অভ্যুত্থানকে জাতীয় অভ্যুত্থানের মর্যাদাদানের মতান্তরে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা যে তথ্যবহুল রচনা প্রকাশ করেছেন তার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা নিয়ে যে বিতর্ক সুরু হয় এই পুস্তিকাটি সেই বিতর্কে মূলত ডাঃ মজুমদার ও ডাঃ সেনের যুক্তির স্বপক্ষে লেখা। ঐতিহাসিক মাল-মসলার এবং তথ্যনিষ্ঠ ভারত ও বিশ্ব পরিবেশে এবং জাতীয়তাবোধের সংজ্ঞায় ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের মূল্য কতখানি তিল এবং আজিকার দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সেই বিদ্রোহের রূপ কি দাঁড়ায় তার বিশ্লেষণে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ধারণে কেতাবী রায় যাই হোক না কেন—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যে পরবর্তী যুগে ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, বাংলা ও উত্তর ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন এবং নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অপূর্ব প্রেরণার উৎস রূপে সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহ্য যে কার্যকরী রয়েছে সে কথা, বিতর্কের মূল লেখকদের মত তাঁদের সমর্থকেরাও বহুলাংশে বিস্মৃত হয়েছেন। সর্বভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে এবং জাতীয়তাবোধের বর্তমান মাপকাঠিতে সিপাহী বিদ্রোহকে হয়তো স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেওয়া যায় না, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের ঐতিহ্য যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রবল ভাবে কার্যকরী হয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য। লেখকেরা অনেক যুক্তি সহ তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সমস্ত যুক্তির বিশ্লেষণ সমভাবে সুদৃঢ় না হলেও পুস্তিকাটি বহু তথ্য সম্বলিত এবং সুচিন্তিত ও সুপাঠ্য।

সমাজতন্ত্র-মতবাদ ও মূল্যবোধ

লেখক—অমলেন্দু দাশগুপ্ত ৮১-এ লোয়ার সার্কুলার রোড। দাম—ছয় আনা।

সমাজবাদ আজ সব দলের কথা। তাই সমাজবাদ কথাটিই এখন জনসমাজের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবাদের আদর্শ সম্বন্ধে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির ধারণা কি এবং প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির আদর্শবাদে এই সমাজবাদের পরিচয় কি সংক্ষেপে লেখক

সাধারণ পাঠকের জন্য সেই সমাজবাদ পরিচিতির সোজার কথা সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই পুস্তিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। সমাজবাদ সম্বন্ধে চিন্তাশীল আলোচনা এবং এই আলোচনার ব্যাপক প্রসার ছাড়া সমাজবাদী গণতান্ত্রিক আদর্শের গোড়া ভূমিকা তাহাতে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই এরূপ পুস্তিকা যত-বেশি প্রকাশিত হয় ততই জনশিক্ষার পক্ষে কল্যাণকর।

সৈনিকের প্রাণবীণা (প্রথম পর্ব)

লেখক—চুনীলাল মুখোপাধ্যায় ৬, বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা—১৪। দাম—আট আনা।

সাংকেতিক চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত কবিতার বই। দশটি কবিতার গুচ্ছ। সব কবিতাই আন্তরিকতার ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ এবং সংগ্রামী সৈনিকের মন নিয়ে লেখা। বৈপ্লবিক ইতিহাসের ঘটনা ও বিপ্লবীদের স্মরণে অধিকাংশ কবিতা উৎসারিত। কয়েকটি লেখা মনকে সত্যি আলোড়িত করে তোলে: যথা:

"নিত্যদিনের ভবানী বঙ্গভূমি
আজিকে জননী ছিন্নমস্তা তুমি"

ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন

লেখক: 'আয়ুরনম্যান' শ্রীনীরদ সরকার

প্রকাশক: প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। দাম—১'৪০নয়া পয়সা।

স্বাস্থ্য ব্যায়াম ও আসন সম্বন্ধে এবং ছেলে ও মেয়েদের শরীরচর্চা সম্বন্ধে ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকার অনেক বই লিখেছেন এবং সবগুলি বইই বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। নীরদবাবু ব্যায়াম জগতে 'আয়রনম্যান' নামে পরিচিত। শরীরেই শুধু তিনি ইস্পাতে গড়া নন সংকল্পের দৃঢ়তাও এই ব্যায়ামবীরের ইস্পাতে গড়া। ব্যায়ামের বইলেখা বা ব্যায়াম শিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে নীরদবাবুর আপাতপরিচয় পাওয়া গেলেও এই সুপরিচিত ব্যায়ামবীরের সত্যিকার পরিচয় তাঁর নিষ্ঠা ও আদর্শের অনুরাগে। বাংলার ছেলে-মেয়েরা স্বাস্থ্য ও শক্তিতে সুন্দর ও সবল হয়ে গড়ে উঠুক, তাদের মন হোক সতেজ আনন্দে স্বচ্ছল—এই উদ্দেশ্য নিয়ে নীরদবাবু লিখেছেন তাঁর বইগুলি। নীরদবাবুর সবগুলি বইই সমাজ কল্যাণের কাজে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। আলোচ্য বইটি তিনি লিখেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যায়ামচর্চার সহায়তা করার জন্য। আমরা আশাকরি প্রতি স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীতে এবং ব্যায়ামাগারে এই বইটি স্থান পাবে। সরকারী কল্যাণ বিভাগও নীরদবাবুর এই ব্যায়ামচর্চার বইগুলি এবং ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর আদর্শবাদী নিষ্ঠা ও পারদর্শিতাকে কাজে লাগাবেন বলে আমরা আশাকরি।

একটি

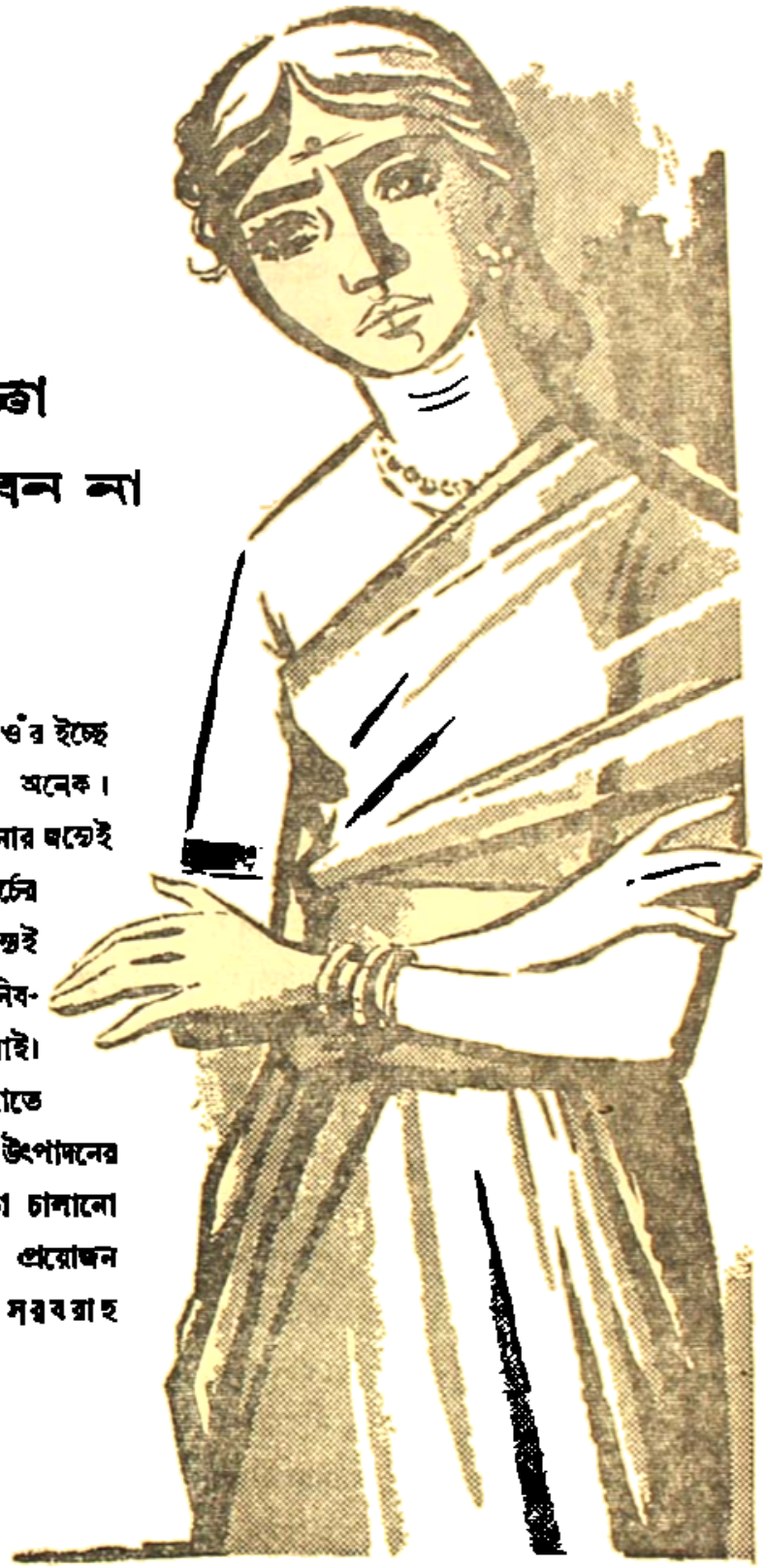

...ওঁকে অবজ্ঞা করবেন না

সাধারণ একজন গৃহকর্ত্রী...কিন্তু ওঁর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য আমাদের কাছে অনেক। ওঁর কি প্রয়োজন শুধু এইটুকু জানার জন্যেই আমরা সারা দেশে মার্কেট রিসার্চের কাজ পরিচালনা করি। সেইজন্যেই হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষ-পত্রের মান নির্নয় করছেন গৃহকর্ত্রীরাই। এই জিনিষগুলির গুণাগুণের যাতে কোন তারতম্য না ঘটে সেইজন্যে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নানাধরনের পরীক্ষা চালানো হয়। তাই আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল জিনিষপত্র সরবরাহ করতে সক্ষম।

দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL 11-240 BG

রূপকার

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

আকাশ নীরব যদি
স্তবহীন উদাসী বাতাস
তুমি তবে কিছু কথা কও,
মাটির দেয়াল ঘেঁষে
পদ্মআঁকা ঘরের দুয়ারে
কমলা লক্ষ্মীর রূপ নাও।
উঠোনে তুলসীবেদী
গোবরের ছড়ায়-নিকানো
চরণ-স্মরণ-আলপনা,
মাটির প্রদীপ জ্বলে
বুকের আশার মতো ভীরু
নেভে যদি নেই তো সান্ত্বনা।
তবু যদি ঝড় উঠে
মুখরতা ঘনায় আকাশে
প্রগল্‌ভ বাতাস আনে ভয়,
খড়োচাল মেটে ঘরে
তোমার প্রশান্ত আঁখিপাতে
মুছে দিও সকল সংশয়।
পূজাহীন এই ঘরে
স্তবহীন রেখো না আমারে
তোমার বুকের মন্ত্র দাও,
নীরব উঠোন ভরে
নহবতী সানায়ের সুরে
আগমনী সংগীত বাজাও।

[২৪০ পৃষ্ঠার পর]

আমার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়ে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।"

ডস্টয়েভ্‌স্কি হেসে উঠে বললেন, "বেবি, বেবি,—কী বেবি তুমি, বাবাঃ! তেমনি বেবিদের মত স্বপ্ন।" বলে এমন করে আমার দিকে চাইলেন যে মনে হল তাঁর দৃষ্টি যেন আমার মুখে আদর করে গেল।

তারপর সেদিনের নিমন্ত্রণের কথা উঠল।

"ধর্মমার বাড়িতে কিরকম কাটালে বলো।"

আমি বললুম, "খুব ভালো। খাওয়া দাওয়ার পর বড়রা ও তাসটাস নিয়ে বসলেন। আমরা ছোটরা মিলে ও-বাড়ির ছাদিতে বসলুম। আমাদের মধ্যে দুজন ছাত্র ছিলেন খুব সুন্দর,—খুব মিশুক—নানারকম আলোচনায় খুব সুন্দর সময় কাটল।"

ডস্টয়েভ্‌স্কির মুখ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি তাঁর মুখের চেহারা বদল হচ্ছিল যে আমি কিছু বুঝতে না পেরে কিরকম ভয় পেয়ে গেলুম; কী জানি, এই কি মৃগী রোগের লক্ষণ নাকি। সর্বনাশ, যদি মূর্ছা যান এখন!"

আমি তারপর জিজ্ঞাসা করলাম তিনি নূতন কি লিখছেন।

"একটা গল্পের কথা ভাবছি। প্রেমের গল্প।"

"তাই নাকি! নিশ্চয়ই খুব সুন্দর।"

"আমার ত তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যে একটা সাইকলজিক্যাল ফ্যাক্টর ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে একটি তরুণীর মন। আমি মস্কোতে থাকলে এখন সোনেচ্‌কা, আমার ভাইঝির পরামর্শ নিতে পারতাম, কিন্তু এখন ত তুমি ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না।"

শুনে সঙ্গে সঙ্গেই "বিখ্যাত লেখক"কে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম।

"আপনার এই গল্পের নায়ক কে?"

"নায়ক একজন আর্টিষ্ট। এই ধরো আমার মতই বয়স।"

"আচ্ছা,—"

এবং মুখে মুখে তারপর ডস্টয়েভ্‌স্কি চমৎকার একটা বর্ণনা দিয়ে গেলেন। এত ভাল গল্প, এমন প্রাণবান স্বতস্ফূর্ত এবং আবেগময় রচনা আমি ডস্টয়েভ্‌স্কির মুখে এর আগে কি পরে আর কখনোই শুনিনি। খানিকটা শুনেই আমার আর সন্দেহ রইল না যে এ গল্প তাঁর নিজেরই জীবনের, যা আমাকে দিনের পর দিন ধরে বলেছেন,—কেবল নাম এবং জায়গাগুলিই বানানো। এবং এই বর্ণনার ভিতর দিয়েই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের কি সম্পর্ক ছিল তা পরিষ্কার হয়ে গেল।

নায়কের শৈশবটা খুব দুঃখের। অল্পবয়সে তারপর বাবা মারা গেলেন; তারপর ভাগ্যের নানা বিপর্যয় এবং শেষকালে দুরারোগ্য ব্যাধি। দশবছরের জন্য আর্টিষ্ট তাঁর আটের জগত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। তারপর সহজ হয়ে যখন তিনি জীবনে আবার ফিরে এলেন তাঁর সঙ্গে একটি মহিলার আলাপ হল। আলাপ ক্রমে প্রেম, তা থেকে বঞ্চনা দুঃখ এবং ব্যর্থতা,—তারপর তাঁর স্ত্রী এবং প্রিয়তমা ভগিনীর মৃত্যু,—শেষে দৈন্য, ভয়াবহ ঋণ।

নায়কের নানা মানসিক স্তর, তার নিঃসঙ্গ ব্যর্থ জীবন, বন্ধুহীন দুর্বহ একাকীত্ব, তার জীবনের ক্ষুধা এবং ভালবাসবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির কথা এমন আবেগের সঙ্গে এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করলেন যে শুনতে শুনতে আমার মনে হল যে এর জন্য কখনই শিল্পীর কল্পনা থেকে নয়,—এ ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, একান্ত নির্জনতা এবং ব্যর্থ জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। যতদূর সম্ভব, ডস্টয়েভ্‌স্কি এই চরিত্রটিকে আমার সামনে কালিমালিপ্ত করে আঁকলেন, এবং বললেন, যদিও লোকটি

অকালেই বৃদ্ধ, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত,—খুশী সন্দিগ্ধ-চিত্ত এবং বিমর্ষ,—কিন্তু তার অন্তঃকরণ ভালো। কেবল সে নিজেকে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না। হয়ত শিল্পী হিসাবেও সে মহৎ, কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ কারণ তার আইডিয়াকে বেভাবে সে ফুটিয়ে তুলতে চায় তা এখনো পারেনি,—এবং কোনোদিন হয়ত পারবেও না,—তাই সবসময়ই সে দারুণ একটা মনঃকষ্টে আছে।

আমি সব বুঝলাম। এবং সেইজন্যই এখানে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনি এই লোকটির প্রতি যেন কিছু অবিচার করছেন।"

"তার মানে লোকটিকে তোমার ভাল লাগল না।" ডস্টয়েভ্‌স্কি বললেন।

"না, বরং একেবারেই উল্টো। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই লোকটি ও বাস্তবিকই উদার। এবং কী মহৎ এর মন। এত যে দুঃখ কষ্ট পেল, ভাগ্যের হাতে এত লাঞ্ছনা কিন্তু সব সত্ত্বেও ত আজো মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা মরেনি। আজো অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। আমি বলতে চাই যে এইটিই দুর্লভ। এবং এ-আবহাওয়ায় যদি আর কেউ হত ত নিশ্চয় এমনটি হতে পারিত না। অথচ এই লোকটির প্রতিই আপনার যেন কোনো সহানুভূতি নেই।"

"তুমি যে লোকটিকে ঠিক বুঝেছ আনা, এতে আমি বাস্তবিকই কৃতার্থ বোধ করছি।" ডস্টয়েভ্‌স্কি বললেন। "তারপর এই যখন অবস্থা" তিনি বলতে লাগলেন, "এই লোকটির সঙ্গে এক মেয়ের পরিচয় ঘটল। মেয়েটি তোমারই সমবয়সী ধরতে পারো,—কিম্বা হয়ত এক আধবছরের বড় বা ছোটো। আচ্ছা এই মেয়েটির নাম না হয় 'আনা' দেওয়া গেল, বার বার 'নায়িকা' বলার চেয়ে,—এবং নামটিও খুব সুন্দর,—"

আমার আর সন্দেহই রইল না যে এ তাঁরই জীবনের গল্প এবং নায়িকাটিও আর কেউ নয়, আনা গ্রিগরিয়েভ্‌না স্নিৎকিনা, তাঁর সর্বাধুনিক প্রণয়িনী, যাঁর কথা ডস্টয়েভ্‌স্কিই আমাকে সেদিন বলেছিলেন। আমার সেসময় মনেই পড়ল না যে আমার নামও আনা,—যা এই গল্পের সঙ্গে আমার কোনো যোগ থাকতে পারে। এবং আমার আরো মনে হল যে এই গল্পটি ডস্টয়েভ্‌স্কির মাথায় এসেছে আনার চিঠি পাওয়ার পরই—এই চিঠির কথাও আমি তাঁর কাছেই শুনেছিলাম। আমার ভিতরটা তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় যেন বেঁকে গুটিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু নায়িকার চিত্রটি তিনি খুব ঘোলাটে করে আঁকলেন। ডস্টয়েভ্‌স্কির মতে আনা খুব শান্ত সুশীলা ভদ্র ও বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে। প্রাণে ও স্বাস্থ্যে কানায় কানায় ভরা। আচার আচরণ নিখুঁত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার নায়িকা দেখতে সুন্দর না।"

"না। সুন্দর বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য সে নয়। তবে খুব সুশ্রী। এবং তার মুখটা আমি খুব ভালবাসি।"

যা বাকী ছিল, সবই শোনা হল। এবং দেখতে দেখতে আনার প্রতি আমার মনটা কিরকম বিরূপ আর কঠিন হয়ে উঠল। বললাম, "কিন্তু মিস্টার ডস্টয়েভ্‌স্কি, আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন আনার সম্বন্ধে একটু বাড়িয়ে বলছেন। আপনি তার সম্বন্ধে যত কথা বললেন, মেয়েটি কি সত্যিই তাই।"

"সত্যিই তাই।" ডস্টয়েভ্‌স্কি বললেন। "আমি যে খুব খুঁটিয়ে এবং মন দিয়ে ওকে দেখেছি। এই আটটি আনাকে এক আটটিমাসে যেমন এবং ক্রমশই তাঁদের পরিচয় যত গভীর হতে লাগল, এই মেয়েটির গুণে আটটি মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এবং স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে যথার্থ সুখ যাকে বলে, সে এই মেয়েটিই তাঁকে দিতে পারে। কিন্তু কথাটা এতই অবাস্তব এবং অসম্ভব যে নিজেই তিনি চুপ

করে গেলেন। তাছাড়া কী-ই বা করা যেত। এরকম বয়স্ক একটা লোক,—রোগগ্রস্ত,—দেনার দায়ে যে প্রায় দেউলিয়া সে এই সুন্দর, তরুণী, যৌবনবতী, আনন্দময়ী মেয়েটিকে প্রতিদানে কীই বা দিতে পারে। এবং অন্যদিকে এই মেয়েটির কথাও ভাবো। এমন মেয়ে, সে যদি এই লোকটির কাছে নিজেকে এইভাবে বিকিয়ে দেয়, সে ত আত্মহত্যার সামিল। এবং পরেও চিরটাকাল তার কী গভীর অনুতাপ হবে ভাবো যে যে ভুল সে জীবনে করেছে তার আর ক্ষমা নেই, তা থেকে কোনোদিন মুক্তি নেই। এবং এটাও কি সম্ভব যে এমন একটি মেয়ে আর্টিস্টের মত এমন একটা হতচ্ছাড়াকে কোনোদিন ভালবাসতে পারে!"

"আপনি অসম্ভবই বা ভাবছেন কেন।" আমি বললাম। "আনা যদি বাস্তবিকই সাধারণ মেয়েদের মত না হয়, তার যদি বোধ বুদ্ধি মনন এবং বিবেচনা থেকে থাকে,—যা আপনি বলেছেন,—তবে এই আর্টিস্টের প্রেমে সেও যে সাড়া দেবে এতে বিচিত্র কী। সে গরীব ত কী এসে যায়। আর মানুষের কি রোগ হয় না। ভালবাসা কি রোগ আর ঐশ্বর্যের অপেক্ষা রাখে। তাছাড়া আপনি যে আত্মত্যাগ বলছেন, তাই বা কই। যদি এই আর্টিস্টকে সে ভালবাসে তবে সে ধন্য হয়ে যাবে,—অনুতাপের কথা কোনোদিনই মনে হবে না।"

ডস্টয়েভ্‌স্কিকে যথেষ্ট উত্তেজিত ও অস্থির দেখাল।

"আনা, তুমি কি বাস্তবিকই মনে করো যে এই মেয়েটি আর্টিস্টকে সত্যিই ভালবাসতে পারে। এবং চিরদিনের জন্য!"

কয়েকমুহূর্ত তিনি অপেক্ষা করে রইলেন, যেন দ্বিধা, তারপর:

"আনা, একমুহূর্তের জন্য তুমি নিজেকে ঐ মেয়েটির জায়গায় কল্পনা করো।" তাঁর গলায় স্বর কাঁপতে লাগল, "মনে করো যে আমিই সেই আর্টিস্ট। আমি বলছি আনা, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু তুমিও কি আমাকে ভালবাসতে পারবে। আমি যদি বলি ত তুমি কি আমার স্ত্রী হতে চাইবে। বলো, এবার তোমার কী মনে হয় বলো।"

ডস্টয়েভ্‌স্কির স্বর, তাঁর দৃষ্টি, এবং মুখের উপর তাঁর ক্লান্তক্লিষ্ট হৃদয়ের যে-ছবি আমি এই মুহূর্তে ফুটে উঠতে দেখলাম, তাতে আর কোনো আড়াল রইল না,—এক মুহূর্তে সব আমার চোখের সামনে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং সেই মুহূর্তেই আমি ঠিক করে নিলাম যে এখন যদি কিছু না বলি, কি বাপসা একটা উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই ত সেটা হবে তাঁর প্রতি চরম আঘাত, প্রায় মৃত্যুর মত। মনে মনে আমি গুছিয়ে নিলাম নিজেকে, শান্তভাবে বললাম, "সেক্ষেত্রে আমি বলব যে হ্যাঁ, আমিও বাসি। এবং চিরদিন বাসব।"

৮

এর পরের কয়েকটা নিভৃত কথা আনা তাঁর ডায়েরীতেও গোপন রেখে গেছেন। কিন্তু সুন্দর নয় কী! জীবনে এই যে সাহিত্য, এ খুব বিরল, দুর্লভ। এবং সাহিত্যে জীবনের স্বাদ আছে মানি, কিন্তু জীবনে সাহিত্যের স্বাদ যারা পেয়ে গেল, তারা আরো বিরল, তারা ভাগ্যবান।

সেইদিনই যখন আনা ঐ বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছেন, ডস্টয়েভ্‌স্কি আমার সঙ্গে হল্‌ পর্যন্ত এলেন, ঐখানে যত্ন করে আমার কোটটা বেঁধে দিলেন। আমি দরজার দিকে হাত বাড়িয়েছি, তিনি বললেন, "জানো আনা। সেই হীরেটার কি হল আমি এখন বুঝতে পেরেছি।"

"ও, সেই স্বপ্নটা মনে পড়ল বুঝি।"

"না, স্বপ্ন নয়,—কিন্তু ঐ হীরেটা আমি খুঁজে পেয়েছি এবং চিরদিন আমি সেটা যত্ন করে রেখে দেব।"

আমি হাসতে হাসতে বললুম, "এ কিন্তু সে হীরেটা নাও হতে পারে। পরে হয়ত দেখা যাবে যে এ একটা ঘুড়ি।"

"কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি জানি যে এ-হীরে খাঁটি এবং এবার আমি ভুল করিনি।" [ক্রমশ]

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪১-এ, বালীবহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। ষষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৬৫

শারদীয়া

মহাকালের গতিছন্দের পথে পথে ঘটে ঋতুর বিবর্তন, প্রকৃতির রূপান্তর। আর তারই প্রতিফলন পড়ে মানুষের মনে। সৃষ্টির শৈশব থেকে চলে আস্‌ছে মানুষ ও প্রকৃতির এই পরস্পর-নির্ভর দ্বৈত অস্তিত্ব। মহাকালের ঋতু থেকে ঋতুতে যাত্রা, মানবীয় মনের ঋতুকে দিয়েছে জন্ম। কেন, কি প্রয়োজনে—কে জানে তার রহস্য! কিন্তু এ সত্যকে তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই আনন্দ-বেদনা, ক্ষয়-ক্ষতি, পাওয়া-না পাওয়ার বাস্তবকে অতিক্রম করে বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর জীবনে বারবার আসে শারদীয়া—এমন রিক্ত ভাগ্যহত কে আছে যে তাকে আমন্ত্রণ না জানায়? এই আনন্দঘন দিনের পরিপূর্ণতায় আমাদের পাঠক লেখকগোষ্ঠী ও কল্যাণেচ্ছু বন্ধুদের জানাচ্ছি প্রীতি সম্ভাষণ। শারদীয়া তাঁদের জন্য অঞ্জলিভরে আনুক সহজ আনন্দ ও গভীর অনুভবের পরিপূর্ণ প্রসাদ।

সঙ্গে সঙ্গে মনে না করে পারছি না নূতনকে আহ্বান করবার মত মানসিক ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণতা, পরিবর্তিত পরিমণ্ডলে জীবনের চলাকে নূতন ছন্দ ও রূপ দেবার সঞ্চয় যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কালের ঋতুর সঙ্গে মনের ঋতুকে বাঁধবার যে প্রবণতা, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের সহজ লভ্য আমরা যেন তা হারিয়ে ফেলেছি। এগার বৎসর—সময়টা খুব সংক্ষিপ্ত নয়—আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু স্বাধীন মানুষের মেজাজ বা চলা আমরা আজও আয়ত্ত করতে পারিনি। কেন? ভাবতে হবে সকলকে যারা বাঁচতে চায়, বাঁচাতে চায়।

অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিনে ভারতবাসী, বিশেষ বাঙ্গালী শত অত্যাচারেও যে অনমনীয় চারিত্রিক ঐশ্বর্য, আদর্শের উচ্চমান দেখিয়েছিল, স্বাধীনতা-উত্তর-কালে তাকে হারিয়েছেই শুধু নয়—যা অতি সহজ, তুচ্ছ ও অসুন্দর তাতেই যেন সে মেতে উঠেছে মাত্রাহীন উন্মাদনায়। বাঙ্গালীকে বাঁচাতে হলে তাকে এই গ্লানিকর আত্মাবমাননার পথ থেকে ফেরাতে হবে। এ দিক দিয়ে সমকালীন সাহিত্যের কাছে প্রচুর আশা করবার রয়েছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হয় সে আশা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে। পূজার অনুসঙ্গ হিসাবে যে বিপুলাকার শারদীয়া পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়—বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখায় আকণ্ঠপূর্ণ হয়ে—তাদের লেখায় সত্যের সুস্থ জীবনের সুর যত না বেজে উঠে, তার চাইতে অসুস্থ লক্ষণগুলির উপরই যেন জোর দেয়া হয় অস্বাভাবিক বেশী। অভাব ও দৈন্যের পটভূমিতে মানুষের চরিত্রের-শুচিতার পরাভব, মানবীয় মূল্যের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, এই কি একমাত্র আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিকে আবিল করে তুলছে? কোথাও কি কুৎসিৎ বাস্তবকে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের জয় তাঁদের দৃষ্টিতে পড়েনি বা পড়ে না? জাতির সামনে তাঁরা কি সম্ভাবনা তুলে ধরতে চান? মহৎ সাহিত্যের অবলম্বন কি মানুষের মনুষ্যত্বের পরাভব? সবিনয়ে সাহিত্যিকদের চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

শারদীয়া পূজাকে অবলম্বন করে যুবক ও তরুণদের মধ্যে যে রুচিহীন হুল্লোড় ও অমার্জনীয় অ-সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে আর একটী সমকালীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুস্থ রুচি ও সংস্কৃতিবান যুবকশ্রেণী এর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আভিযান করতে অগ্রসর হয় না কেন ভেবে বিস্মিত হতে হয়। অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নেতাজীর স্বদেশে সে কি খুব দুর্লভ প্রত্যাশা? একটী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্বাধীন দেশের মানুষের পক্ষে এ সবই অসুস্থ ও অপ্রকৃতস্থ মনের পরিচয়।

বাংলার শারদীয়া পূজা বাঙ্গালীর অনুভূতি ও উপলব্ধির অতি সুন্দর সুসমঞ্জস প্রকাশ। শক্তি ও মাধুর্যের যে প্রকাশ দুর্গাপূজায়, বাঙ্গালীর সমস্ত হৃদয়তন্ত্রীতে সে আনে এক অভূতপূর্ব অনুরণন্ যার সুর রয়েছে তার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের মধ্যে ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলা। আগামী শারদীয়া সেই উপলব্ধি আসুক বাঙ্গালীর জীবনে। সহজ ও অ-সুন্দরকে নয়, কঠিন-মধুরকে ভালবাসবার দুর্বার, দুর্লভ অধিকারে বাঙ্গালীর বিস্মৃত-প্রায় সম্বিৎ আবার ফিরে আসুক। এবারকার দেবী পূজায় নূতন মনুষ্যত্বের বোধন হোক্ বাঙ্গলায়।

২০শে আশ্বিন ১৩৬৫

সংস্কৃতি

প্রবন্ধ

অতুল গুপ্ত

॥ ১ ॥

দিন কয়েক পূর্বে আমাকে একজন চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছেন; "সংস্কৃতি বলতে কি বুঝায়?" এবং ওর স্বরূপ সম্বন্ধে আমার "নিজস্ব ধারণা" জানতে চেয়েছেন। এই প্রবন্ধে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

প্রশ্নটি অনেকটা ব্যক্তিগত। সুতরাং আমার নিজের ধারণার কথাই লিখছি। অন্য নানা মতামতের কথা না তুলে, এবং যথাসম্ভব তর্কের মধ্যে না যেয়ে। একজন লোকের মনের ধারণার প্রকাশ ছাড়া এ উত্তরের আর কোনও মূল্য নেই।

আমাদের উপনিষদ মানুষকে বলেছে অমৃতের পুত্র। কিন্তু চর্মচক্ষুর দৃষ্টিতে ও ব্যবহারিক জ্ঞানে তার জন্ম পশুর বংশে। তার শরীর উঁচু পর্যায়ের পশুর শরীর; কিছু বেশী পরিণত, কিছু বেশী জটিল। কিন্তু যে পরিণতি ও জটিলতায় নিম্নতম ও নিম্নতর স্তরের জীবের সঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ের পশুর যে প্রভেদ, তার তুলনায় পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ অনেক কম। শারীরক্রিয়ায় ও মনোবৃত্তিতে পশুর সঙ্গে যে মানুষের অনেক মিল তা লক্ষ্য করে আমাদের প্রাচীনেরা বলেছেন যে পশুতে ও মানুষে বড় প্রভেদ হচ্ছে 'মননে'; মানুষের বিপুল মানসিক শক্তি, ও তার গভীর ও ব্যাপক অনুশীলন ও প্রয়োগের ক্ষমতায়। পশুর বুদ্ধি ও চাতুরী মানুষের মনে চিরদিন বিস্ময় জাগিয়েছে। সে বিস্ময় প্রকাশ হয়েছে পশু ও পক্ষীর বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় ও কল্পনায় তৈরী বহু গল্পে; শেয়ালের নানা চালাকি, ও নির্বুদ্ধির প্রতীক গর্দভের বুদ্ধির গল্প থেকে, কাদম্বরীর কাহিনী প্রবক্তা শুকপক্ষীর আখ্যান পর্যন্ত। কিন্তু পশুপক্ষীর এই বিস্ময়কর বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির তুলনায় কিছুই নয়। মাথার ভিতরের যে মস্তিষ্ক বুদ্ধির শারীরিক পীঠস্থান তার বৃদ্ধি, পরিণতি ও জটিলতা ঠিক নীচের পর্যায়ের পশুর চেয়ে নাকি এত বেশী যে তার তুলনায় শরীরের অন্যান্য অংশের প্রভেদ একরকম অকিঞ্চিৎকর। আর মানুষের মস্তিষ্কের এই পরিণতি এসেছে হঠাৎ নয়, লক্ষ লক্ষ বৎসরের ধীরে ধীরে পরিবর্তনে। বহু ভুলচুকের মধ্য-দিয়ে আধা মানুষ, তিনপোয়া মানুষ, প্রায়-মানুষ গড়তে গড়তে প্রকৃতি পরিণত

মস্তিষ্কের ষোল-আনা মানুষ গড়েছে। সে হাজার হাজার বছর পূর্বের কথা। তার পরেও আরও হাজার হাজার বৎসর কেটেছে। পরিণত শরীর মস্তিষ্কের পূর্ণ মানুষ তার ঠিক নীচের স্তরের পশুর জীবন যাত্রা থেকে নিজের জীবনযাত্রার খুব বেশী পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটাতে পারে নাই। বনের স্বচ্ছন্দজাত ফলমূলে, মৃগয়ার পশুর কাঁচা কি ঈষৎ ঝলসান মাংসে সে শরীরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সূর্য্য ডুবলে বনে কি গুহার ভয়ালঅন্ধকারে রাত কাটিয়েছে। বেদে উষার স্তোত্রে আলোর যে আনন্দিত উৎফুল্ল আহ্বান তার মূলে কি আছে রাত্রির অন্ধকারের অবচেতন ভয়াতুর স্মৃতি?

তারপর আমরা যাকে সভ্যতা বলি মানুষের কোনও কোনও দলে তার গোড়াপত্তন হয়েছে। তারা কৃষির কৌশল আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভরতা কাটিয়ে অন্নকে বহু করার কৌশল, কিছু বন্য পশুকে পোষমানিয়ে পালন করতে শিখেছে। শিকারের অনিশ্চয়তা ঘুচিয়ে হাতের কাছে রাখা খাদ্যের ভাণ্ডার; পশু শ্রমে নিজেদের শ্রম লাঘবের উপায়। আগুন জ্বালাতে ও জ্বালিয়ে রেখে তাকে নানা কাজে লাগাতে শিখেছে। বাঁড়ি-কুড়ি গড়তে শিখে সংসার-যাত্রা সুসাধ্য করেছে। চাকার আবিষ্কারে তার বহনের কাজে যুগান্তর এনেছে। যুগের পর যুগ এ সব কৌশলের আবিষ্কার জমা হতে হতে মানুষ আজ পৌঁচেছে বর্ত্তমান সভ্যজগতেব যন্ত্রযুগে। যার সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বিপুলতা এবং সে সৃষ্টির সীমাহীন সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের নিজেরি বিস্ময়।

সভ্যতার এ জয়যাত্রার পথ একটানা সরল পথ নয়। বহু গলিঘুঁজির বাঁকা চোরা পথে এগিয়ে পিছিয়ে এর গতি। এক দলের মানুষ যারা ছিল এ-সৃষ্টির পুরোভাগে তাদের শক্তি স্তিমিত হয়েছে, অন্য দলের লোক যারা ছিল অনেক পেছনে তারা চলে এসেছে যাত্রীদের প্রথম সারিতে। হয় ত বহু কাল পরে। ইতিমধ্যে সভ্যসমাজ পুরাতনকেই মকৃশ করে চলেছে, তাকেই মেনেছে ধ্রুব ও সনাতন। অনুশীলনের অভাবে অনেক জ্ঞান লোপ হয়েছে, প্রয়োগের অভাবে অনেক আবিষ্কৃত কৌশল মানুষ ভুলে গেছে। পরবর্ত্তী সভ্যতায় তারা পৌঁছে নাই। তাদের অনেকগুলিকে নূতন করে আহরণ ও আবিষ্কার করতে হয়েছে। সভ্যতার পথ বহু মৃত সভ্যতার ভাঙা প্রস্তরখণ্ডে আকীর্ণ।

এমন কেন ঘটে? নানা সভ্যতার উত্থান ও ধ্বংসের তথ্যজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী ঐতিহাসিকেরা তার আলোচনা করেছেন ও কারণ দর্শিয়েছেন। সে সব কারণের অনেকগুলি অনেক সময় আকস্মিক ও বহিরাগত। তাদের সভ্যতা স্বীকার করতে হয়, কিন্তু মনের জিজ্ঞাসার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। তার কারণ সভ্যতার আরম্ভ ও উত্থান, অবনতি ও অবসান এদের মূলকারণ মানুষের মননক্রিয়ার সচলতা ও স্থবিরতা। পূর্ণাঙ্গ পরিণত মস্তিষ্ক মানুষের দল কেন হাজার হাজার বছর বন্য পশুর জীবন-যাপনের পর তার মধ্যে একদল মানুষের মন হঠাৎ অভূতপূর্ব সচল হয়ে উঠে সভ্যতার সৃষ্টির পথে পা বাড়াল,

কেনই বা সে পথে কিছুদূর বা অনেকদূর চলার পর তার মনের শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে সৃষ্টির কাজ থেমে গেল—তার তত্ত্ব ধর্মের তত্ত্বের চেয়েও অন্ধকার গুহায় নিহিত।

মানুষের বর্তমান সভ্যতা প্রায় পৃথিবী জুড়ে বহু দেশের নানা রকম মানুষের সমাজের সভ্যতা। তাদের মধ্যে ঐক্য অনেক, বৈশিষ্ট্যও কম নয়। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই সভ্যতার যারা ধারক ও বাহক, সভ্যতার সৃষ্টিতে যারা নূতন সৃষ্টি যোগ ক'রে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাদের সংখ্যা অতি অল্প। চোখ মেল্‌লেই তা চোখে পড়ে। তাদের মননের শক্তি ও সচলতা সাধারণের মধ্যে অসাধারণ। মানুষের আদিম সভ্যতার পদক্ষেপের ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব নয়। কিন্তু সে দিনও এই ঘটনাই নিশ্চয় ঘটেছিল। অল্প কিছু অসাধারণ লোক সময়ে সময়ে জন্মে তাদের মননের শক্তিতে সভ্যতার নানা উপাদান সৃষ্টি করে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তার স্মৃতি অনেক দেশের অলৌকিক পুরাণ কথায় আত্ম-গোপন করে আছে।

এ সব প্রতিভাবানদের সময়ে সময়ে কেন জন্ম হয় তার পুরোপুরি উত্তর নেই। যেমন এবং হয় ত সেইজন্যই, সভ্যতা কেন আরম্ভ হ'লো তার পুরোপুরি উত্তর নেই। কি সব ঘটনার সমাবেশ না ঘটলে প্রতিভার জন্ম বা স্ফুরণ সম্ভব নয় তা স্থির করা হয় ত চলে। কিন্তু সে সব ঘটনার সমাবেশেই যে প্রতিভার উদয় হয় না তাতেও সন্দেহ নেই। প্রতিভার আবির্ভাবের তত্ত্বও সভ্যতার আবির্ভাবের তত্ত্বের মতই গুহায় নিহিত।

॥ ২ ॥

সভ্যতার উন্মেষ থেকে তার উন্নতি ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কি মানুষের মনের শক্তি ও মননের সচলতা বেড়ে চলেছে? এবং সেই বৃদ্ধিই কি সভ্যতার ক্রমোন্নতির কারণ? মানুষের শরীর ও মনের পরিণতির ইতিহাসের যারা তত্ত্ববিৎ তাঁরা বলেন এ রকম বৃদ্ধির প্রমাণ নেই। মানুষ যেদিন পূর্ণাঙ্গ পরিণত মস্তিষ্কের মানুষ হয়েছে তার পর তার মনের শক্তির মূলপুঁজি বাড়ে নাই। মনের অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে যে সব মানুষের মাঝে মাঝে জন্ম হয় সভ্যতার বৃদ্ধির অনুপাতে তাদের জন্মের হার বাড়ে না। অবস্থার প্রতিকূলতায় যে প্রতিভার বিকাশ হতো না, হয় ত সভ্যতার অনুকূল পরিবেশে তার স্ফুরণ বাধামুক্ত ও সৃষ্টিশীল হয়। সভ্যতার উন্নতির প্রধান কারণ পূর্বের সৃষ্টির সঙ্গে ও সহায়ে পরবর্তী কালের সৃষ্টির যোগ। মূলপুঁজি সমান থাকে কিন্তু সুদ জমা হয়। অপচয় অনেক ঘটে কিন্তু মোটের উপর সুদ বেড়ে চলে। এই সুদই সৃষ্টি, মূলপুঁজি সৃষ্টির ক্ষমতা ও তার সক্রিয়তার সম্ভাবনা।

কিন্তু সুদের উপর সুদ জমা, কৌশলের পর সুকৌশলের আবিষ্কার সভ্যমানুষের জীবন যাত্রায়

যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এনেছে, এবং ভবিষ্যতে আরও যা সব বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন নিশ্চয় আনবে—সভ্যতার এবং মানুষের চলমান মনের যে শক্তি সে সভ্যতার সৃষ্টি করেছে তাই তাদের সর্ব কথা ও শেষ কথা নয়। মানুষ যুগে যুগে যা সৃষ্টি করছে তার মনের ক্ষমতা তার তুলনায় অনেক বড়। বিনা দ্বিধায় বলা যায়, "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" তার প্রমাণ যে ক্ষেত্রে মানুষ পূর্বে মননের শক্তি প্রয়োগ করে নাই, প্রয়োগ হতেই সেখানে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। সভ্যতার উন্নতির একটা বড় কথা নূতন নূতন ক্ষেত্রে মননের প্রসার। কোন একটি বা দুটি মাত্র ক্ষেত্রে সৃষ্টি জমা হয়ে আকাশের দিকে ওঠা নয়, সুবিস্তীর্ণ নানা ক্ষেত্রে নূতন নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব।

প্রকৃতি মানুষকে যে মন দিয়েছে তা বিরাট। মনের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বুদ্ধির কৌশলে শরীরকে বাঁচিয়ে বংশ রেখে যাওয়া। সম্ভব সভ্যতার আদিকালেও এই কাজেই মানুষের বুদ্ধির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল। তখনকার প্রতিভাবানেরা এই সব কৌশলই আবিষ্কার করেছেন। সে সব আবিষ্কারে আদিম সভ্যসমাজের শরীর যাত্রা যখন কিছু সুকর হয়েছে, পরিবেশের বিভীষিকা কিছু কমেছে, তখন মানুষের মন শরীরের নিরন্তর প্রয়োজনের তাগিদ থেকে কিছু মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্ত মন মনের বড় অংশ। শরীরের প্রয়োজনে তার যেটুকু ব্যয় হয় মনের বিরাটত্বের তুলনায় তা ক্ষুদ্র। এই বাহুল্য মনের কতক অংশ সুযোগ পেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সে মননক্রিয়ার যা সৃষ্টি তা শরীরের প্রয়োজন মিটাবার সৃষ্টি নয়, মন নিজের তাগিদে নিজের প্রয়োজনে সে সৃষ্টি করেছে। প্রাণের প্রয়োজনে প্রকৃতি মানুষকে যে প্রয়োজনাতিরিক্ত মন দিয়েছিল তা মন নিজের কাজে লাগাতে আরম্ভ করেছে, মননলব্ধ জ্ঞানের আকর্ষণে। সে জ্ঞান জীবনযাত্রার কাজে লাগুক বা না লাগুক তাতে নিস্পৃহ হয়ে মানুষের বুদ্ধি জ্ঞানের আকর্ষণেই জ্ঞান আহরণ ও আবিষ্কারে নিজেকে নিয়োগ করেছে। মানুষের বুদ্ধির সংস্কৃতি সুরু হয়েছে। জ্ঞান কেন চাই? আর কিছুর জন্য নয়; জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানকে চাই।

প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদে ও লোভে নয়, অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় নিষ্কাম জ্ঞানের চর্চায় মনের যে প্রবৃত্তি পরিণত সভ্যতার সেইটিই মূল শিকড়। এতে মনের বহু অংশ সচল ও সক্রিয় হয়, দুটি একটি অংশ নয়, বিশেষ কর্মসাধনের জন্য যার সক্রিয়তা দরকার। এই উদার মননক্রিয়া যে বহুধা বিচিত্র জ্ঞানের আবিষ্কার করে তার একটা সামান্য অংশের ব্যবহারিক রূপ সভ্যমানুষের ঘরকন্নার কাজে লাগে, বেশীর ভাগ সে কাজে লাগে না। সেই জন্য অনেক 'কাজের মানুষ' এই বেশীর ভাগকে অনর্থক পণ্ডশ্রম, ও অকাজে বুদ্ধির ব্যয় মনে করেন। ফলের লোভ তাদের অত্যন্ত বেশী। তারা মনে করেন এটা প্লানড্ ইকনমি নয়। অবশ্য নয়। এটা প্রকৃতির ইকনমি; যা চার জন ফলের জন্য গাছ ভরা মুকুল ধরায়। মনের প্লানড্ ইকনমির অর্থ মনের যেটুকু থেকে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায় তা বাদে মনের বাকী অর্থাৎ বড়

অংশকে অচল রাখা। এতে অভীষ্ট ফল সাময়িক হয় ত কিছু বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু মনের অচল অক্রিয় অংশটা ক্রমে অসাড় হয়। এবং বিশেষ ফলের উদগ্র লোভে, মননের বিরাট সম্ভাবনার ধ্বংশ হয়। মানুষের কোনও কোনও সমাজ সংকটের অবস্থায়, কি বুদ্ধির বৈগুণ্যে কখনও এ রকম চেষ্টা করেছে। পরিণাম হয়েছে মহতী বিনষ্টিঃ।

জীবনযাত্রায় সুফলের লোভে নয়, শুদ্ধ জ্ঞানের ডাকে মননের সাড়া, যার ফল বিশ্বের ভিত্তিহীন কল্পিত ধারণা থেকে বুদ্ধির বিচার সহ সত্যধারণার দিকে মনের গতি,—তা হচ্ছে মানুষকে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান। সংস্কৃতি খাদের মিশ্রণ থেকে বস্তুর শোধন। জৈব প্রয়োজনের মাধ্যাকর্ষণ থেকে মননের এই মুক্তি বুদ্ধির বড় সংস্কৃতি, সকল সংস্কৃতির মূল ভিত্তি।

॥ ৩ ॥

কিন্তু জ্ঞানলোক ছাড়াও মানুষের একটি আনন্দলোক আছে।

পশুপক্ষীর যে সব শরীরক্রিয়া মনে হয় অন্য উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ নিছক আনন্দের খেলা, কিছুদিন পূর্বেও বিজ্ঞানীরা বলতেন ও গুলির প্রকৃত লক্ষ্য শরীরের ও বংশের পুষ্টি। এতে যা কিছু আনন্দ তা কাজ করিয়ে নেবার জন্য প্রকৃতির ঘুষ। লেবারের বোনাস্। মতের বদল হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা পশুপক্ষীর এমন সব শরীরক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন যাদের ও ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। খেলার আনন্দ ছাড়া যার অন্য গূঢ় অভিসন্ধি নেই।

সভ্য-পূর্ব যুগের মানুষের জীবনেও এ-রকম আনন্দ ছিল। নৃত্য, গীত, বাদ্য, নানা রকমের খেলা। শরীরের সঙ্গে তাদের নিবিড় যোগ। তবুও তারা ছিল জৈব ক্রিয়ার অতিরিক্ত। গুহাবাসী মানুষ গুহার দেওয়ালে রং দিয়ে শিকারের পশুর ছবি এঁকেছে। পণ্ডিতেরা বলেছেন ছবি আঁকা ও ছবি দেখার আনন্দে সে ছবির সৃষ্টি নয়। ও রকম ছবি বনের পশুকে যাদু ক'রে শিকারীর সহজলভ্য করবে এই বিশ্বাসে। এ রকম ব্যাখ্যা কখনও পুরোপুরি সত্য নয়। শিকারের পশুকে যাদু করা যাবে এমন বিশ্বাসও যদি ছবি আঁকার প্রেরণা দিয়ে থাকে, ছবি যখন আঁকা হয়েছে তখন মানুষ তা থেকে শিকার লাভের সম্ভাবনায় আনন্দ ছাড়া ছবি আঁকা ও ছবি দেখার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের আনন্দ পায় নাই এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। মানুষের প্রকৃতির তা বিরুদ্ধ। হোক না সে মানুষ গুহাবাসী আদিম মানুষ।

মানুষের এই বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূতির ও আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে বিচিত্র রূপ নিয়েছে। সংসার যাত্রার প্রয়োজন মিটাবার জন্য যে সব জিনিস সে গড়েছে, তাদের সাদাসিদে

রূপে তার তৃপ্তি নেই। সে অসীম যত্নে তাদের অলংকরণে মুড়েছে। তাতে তাদের কার্যকারিত্ব বিন্দুমাত্র বাড়ে নাই, কিন্তু মন আনন্দে ভরেছে। আদিম নৃত্যগীত বাদ্যকে শরীরের নিবিড় সম্পর্ক থেকে যথাসম্ভব দূরে এনে তাদের মনের উপভোগ্য করেছে। সে ছবি এঁকেছে, ভাস্কর্য গড়েছে, কাব্য রচনা করেছে, সাহিত্য লিখেছে, নাটক রচনা ও অভিনয় করেছে। তার আনন্দলোক বৈচিত্র্যে ভরে উঠেছে। অবশেষে সভ্য মানুষ বলেছে এই আনন্দ লোকই তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জৈব প্রয়োজনে তার মূল্য নেই, মনের প্রয়োজনে সে অমূল্য।

জৈব প্রয়োজনের খাদ থেকে শোধন সংস্কৃতির লক্ষণ। মানুষের আনন্দলোকের দরকারী কাজ থেকে বিমুক্তি খুব স্পষ্ট। সেইজন্য ভুল হয় এই আনন্দ-লোকই বুঝি মানুষের একমাত্র সংস্কৃতি। বুদ্ধির সংস্কৃতি, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা ও তার আকর্ষণ যে সকল সংস্কৃতির মূলভিত্তি তা মনে থাকে না। সেই জন্যই সংস্কৃতি বলতে আমাদের দেশে এখন আমরা নাচ, গান, বাজনা ও অনুরূপ-ধর্মী আরও দুটি একটি জিনিষকেই বুঝি।

মানুষের মনের উপর তার আনন্দ লোকের যে আকর্ষণ তার বিপদও আছে। সে লোকের কোনও বিশেষ অংশের আকর্ষণ যার মনে প্রবল সে আকর্ষণ দুর্বার ও সর্বগ্রাসী। মদের নেশার মত। কালিদাসের ভাষায় 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ'। তার মনে হয় আর কোনও পুষ্টির প্রয়োজন নেই, এই নেশায় ডুবে থাকতে পারলেই জীবন সার্থক। মননের সঙ্গে সে আনন্দসৃষ্টির যোগ যত কম এ বিপদের আশংকা তত বেশী। যারা এ আনন্দের স্রষ্টা তাদের কথা আলাদা। দাম না দিয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। প্রতিভার সৃষ্টির জন্য প্রতিভাবানকে দাম দিতে হয় অনেক। মনের বহু অংশকে উপবাসী রেখে। কিন্তু সে আনন্দের যারা স্রষ্টা নন, কেবল রসয়িতা, নেশার ঝোঁক থেকে তাদের রক্ষা করে আনন্দের সঙ্গে মননের অর্থাৎ জ্ঞানের যোগ। প্রকৃত পক্ষে সভ্য সমাজের যে আনন্দ-লোক মননের আগুনেই তার বিশুদ্ধি। সভ্য-মানুষের আনন্দের সংস্কৃতি। সেই-জন্য পরিণত পক্বকষায় মনের যা আনন্দের উপকরণ, অপরিণত মন তাতে আনন্দ পায় না। অপরিণত মনের আনন্দের স্থূল উপাদান পরিণত মনকে পীড়া দেয়।

আমার মনে সংস্কৃতির কি ধারণা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেম। সে ধারণা আমার শিক্ষা-দীক্ষা ও মনের বিশেষ প্রবণতার ফল। তলের ভাষায় 'রিলেটিভ,' 'অ্যাবসলিউট' নয়। এর 'অ্যাবসলিউট' উত্তর নেই। কারণ কোনও উত্তরকেই সকলে সত্য কি পূর্ণ-সত্য বলে মেনে নেবে না। সব মানুষের দৃষ্টি কোণ এক নয়।

আশ্বিন, ১৩৬৫

কথিকা

নিচ্চনের নির্ব্বাসন

প্রমথনাথ বিশী

হিমালয়ের পাদদেশে জনপদ হইতে কিছুদূরে প্রাচীন কালে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। সেখানে মহাস্থবিরের অধীনে একদল ভিক্ষু বাস করিত। তাহারা ধ্যানধারণা ও শাস্ত্রচর্চা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিত। সকালবেলায় তাহারা জনপদে গিয়া ভিক্ষা করিত, ভিক্ষালব্ধ অন্ন তাহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়।

এই বিহারে নিচ্চন (নিত্যধন) নামে এক তরুণ ভিক্ষু বাস করিত। নিজের পূর্ব্ব পরিচয় সে না দিলেও কানাকানিতে রটিয়া গিয়াছিল সে নাকি রাজপুত্র। যাই-হোক, রাজপুত্র হইলেও কোনরূপ অভিমান বা অহঙ্কার তার মধ্যে ছিল না। নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, কর্ত্তব্যতৎপরতার জন্তে অচিরকাল মধ্যে সে সকলের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, মহাস্থবির তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

জনপদে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভিক্ষুগণ আনিয়া মহাস্থবিরের কাছে অর্পণ করিত। নিজের কাছে বা নিজের জন্ত কেহ কপর্দ্দক রাখিত না। নিচ্চন যেদিন ভিক্ষায় বাহির হইত সবু চেয়ে বেশি পাইত, খুব সম্ভব তাহার মধুর বাক্য ও তরুণ কান্তিই ইহার কারণ।

এই ভাবে কয়েক বৎসর গেলে দেখা গেল যে নিচ্চনের ভিক্ষালব্ধ অর্থের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। অন্যান্য ভিক্ষুগণ কানাকানি সুরু করিল, কেহ বলিল নিচ্চন আগের মতো আর ভিক্ষায় তৎপর নয়, কেহ বলিল গোপনে নিজের জন্তে কিছু সঞ্চয় করিতেছে। অবশেষে ব্যাপারটা মহাস্থবিরের কানে উঠিলে তিনি নিচ্চনকে ডাকাইলেন—বৎস, ভিক্ষালব্ধ অর্থ হ্রাসের কারণ কি? সে বলিল গুরুদেব, রাজা ও ভূস্বামীগণের কাছে আর আমি অর্থ যাচ্ঞা করি না। মহাস্থবির শুধাইলেন কেন কর না বৎস?

সে বলিল উহারা পরজীবী মাত্র।

সে কি রকম?

উহারা নিজেরা উপার্জ্জন করে না, অপরের পরিশ্রমে ভাগ বসায়।

এ কথা সত্য বটে।

ইহা কি পাপ নয়?

গৃহীর পরিশ্রম করা উচিত বটে।

তবে তাহার অর্থ গ্রহণ করিলে কি পাপে সহযোগিতা করা হয় না?

উত্তম বলিয়াছ বৎস, তুমি রাজা ও ভূস্বামীগণের কাছে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিও না।

অন্যান্য ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল সংসারে আর বিচার নাই, মহাস্থবির নিচ্চনের তরুণকান্তি দেখিয়াই ভুলিয়া গেলেন, আমরা হইলে কি আর রক্ষা ছিল!

এই ভাবে আরও বছর দুই গেলে আবার দেখা গেল যে নিচ্চনের ভিক্ষালব্ধ অর্থের পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য ভিক্ষুদের পীড়াপীড়িতে মহাস্থবির তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—বৎস, তোমার ভিক্ষালব্ধ অর্থ আবার হ্রাস পাইল কেন?

নিচ্ছন বলিল—গুরুদেব আমি শ্রেষ্ঠী ও ব্যবসায়ীগণের কাছে যাচ্ঞা বন্ধ করিয়াছি।

কেন, বৎস?

ব্যবসায় লব্ধ প্রত্যেকটি মুদ্রা পাপে ভারগ্রস্ত।

সে কি রকম?

এক খণ্ড বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ী একটি মুদ্রা পাইল। কিন্তু বস্ত্রখণ্ড ও মুদ্রাটি তো সমমূল্যের নয়, ব্যবসায়ী যাহা দিল তাহার কিছু বেশি পাইল। সেই অতিরিক্তকে তাহারা বলে লাভ। উহার অন্য নাম পাপ।

কেন বৎস?

উহা প্রবঞ্চনা বই কিছুই নয়। প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ক্রেতাকে প্রবঞ্চনা করিতেছে। সেই প্রবঞ্চনার অর্থ না গ্রহণ করাতেই আমার ভিক্ষার পরিমাণ কমিয়াছে। মহাস্থবির বলিলেন ব্যবসায়ীর কাছে প্রার্থনা না করিয়া তুমি উত্তম করিয়াছ। অন্যান্য ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল সংসারে বিচার নাই, মহাস্থবির নিচ্ছনের মধুর বাক্যে ভুলিয়া গেলেন, আমরা হইলে কি রক্ষা ছিল।

আরও বছর দুই অতিবাহিত হইলে দেখা গেল যে নিচ্ছনের ভিক্ষার ঝুলি প্রায়ই শূন্য থাকে। কোনদিন সে গোটা দুই কপর্দক আনে, কোন দিন কিছুই আনে না। তখন মহাস্থবির পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এমন কেন হইতেছে বৎস?

নিচ্ছন বলিল আমি ভিক্ষা করা ছাড়িয়া দিয়াছি।

কেন বৎস?

ভিক্ষা পরোপজীবিতা ছাড়া কিছুই নয়, তাহাতে দাতার অর্থের দায়িত্ব গ্রহীতার আসিয়া বর্তায়—সে দায়িত্বের স্বরূপ না জানিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই আর ভিক্ষা করি না।

তবে যে ২।১ কপর্দক আনো কোথায় পাও? কায়িক শ্রমে উপার্জন করি। জনপদে যেখানে গৃহ-নির্মাণ হইতেছে প্রাতর খণ্ড বহন করি, যে সরোবর খনিত হইতেছে মৃত্তিকা উত্তোলন করি—এইরূপে যা উপার্জন করি তাহাই আপনাকে নিবেদন করি।

মহাস্থবির বলিলেন আমো নাকি যে ভিক্ষুর উপার্জন নিষিদ্ধ।

গুরুদেব, ভিক্ষাও কি উপার্জন নয়।

না উহা ভিক্ষা, তুমি যা করিতেছ তাহা উপার্জন

যদি দাতার অর্থ পাপলব্ধ হয়?

সে বিচারের ভার তোমার উপরে নয়।

কিন্তু আমার বিবেক যে প্রতিবাদ করে।

বিবেকের চেয়ে গুরুর আদেশ প্রবলতর।

নিচ্ছন প্রতিবাদ করিল না কিন্তু বেশ বুঝিতে পারাগেল যে মহাস্থবিরের কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না।

মহাস্থবির তাহার নীরবতার অর্থ বুঝিয়া বলিলেন গুরুর আদেশ ও বিহারের নিয়ম লঙ্ঘন তুমি করিয়াছ, এখানে তোমার স্থান হইবে না নিচ্ছন।

গত দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বজন মহাস্থবির নির্ব্বাণ লাভ করায় নূতন মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

নিচ্ছন বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—এতদিনে সুবিচার হইল।

মহাভারতের কর্ণ

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী

চরিত্র চিত্র

॥ ১ ॥

জন্মকথা : সূর্যাতনয়ের সূতপুত্রত্বপ্রাপ্তি

স বলেতেজসা যুক্তঃ সূতপুত্রত্বমাগতঃ।

—শান্তিপর্ব

মহাভারত "কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্তাঃ সুপণ্যাঃ বিবিধাঃ কথাঃ।" অসংখ্য চরিত্রকথা এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—জীবনের এই চতুর্বর্গের কথা ঋষিকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বিরাট গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঋষিকবির লেখনীমুখে ফুটে উঠেছে। কর্ণ চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য মহাকবি বর্ণনা করেছেন সেটি হচ্ছে যে অসাধারণ বীর্য ও পরাক্রম, অলোকসামান্য প্রতিভা ও অসংখ্য গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও কর্ণের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কর্ণ মহাভারতে সব চেয়ে রূপবান ও বীর্যবান পুরুষ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলছেন—কর্ণ দীপ্তিতে সূর্যতুল্য কান্তিতে চন্দ্রের মতো ও দ্যুতিতে অগ্নিসদৃশ—"দীপ্তিকান্তি-দ্যুতিগুণৈঃ সূর্যেন্দুজ্বলনোপমঃ।" দেহের গঠনে তিনি প্রাংশু শালবৃক্ষের তালবৃক্ষের মতো। এত গুণ, এত প্রতিভা ও এত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও তাঁর জীবনের একমাত্র পরিচয় যে তিনি সূতপুত্র। সূতপুত্র ছিলেন না কর্ণ, ক্ষত্রিয় বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুন্তীর গর্ভে সূর্যের ঔরসে। কিন্তু সূতের গৃহে লালিতপালিত হয়ে সূতপুত্র-ত্বের যে কলঙ্ক তাঁর ললাটে অঙ্কিত হয়েছিল সে কলঙ্ক কর্ণের সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কর্ণ কিন্তু জীবনে কখনও এই গ্লানি বা পরাভবকে স্বীকার করেন নি। পুরুষকার এবং দৈব এই দুয়ের সংঘাতময় জীবন কর্ণের। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্ণ পৌরুষের গুণগান করে গেছেন। কবি ভট্টনারায়ণের "বেণীসংহার" নাটকে কর্ণের মুখনিঃসৃত বাণী

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।"

কর্ণের চরিত্রের এই অসাধারণত্বের ওপর আলোকপাত করছে। কর্ণ বলেছিলেন যে তিনি সূতপুত্র হতে পারেন অথবা আরও নীচ বা ছোট হতে পারেন। জন্মের জন্য মানুষ দায়ী নয়। জন্ম দৈবের অধীন। পৌরুষ বা পুরুষকার মানুষের করায়ত্ত এবং তাই হল তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ও সম্পদ। কর্ণের পৌরুষ কিন্তু বার বার দৈবের দ্বারা প্রতিহত হল। তাই কর্ণ-চরিত্রের মূল সুর—নিষ্ফলতার, হতাশার, ব্যর্থতার ও বিষাদের সুর। জীবনে বার বার তাঁর পরাভব ঘটেছে কিন্তু সে পরাভবকে তিনি কখনও চরম বলে স্বীকার করেননি। অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন চিরজীবন পরাভবের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্য মহাভারতে কর্ণের পরাভব দীপ্তিহীন বা কীর্তিহীন নয়, বরং সেই পরাভব দীপ্তির গরিমায় এবং কীর্তির মহিমায় সমুজ্জ্বল। কুরুক্ষেত্রে সমর প্রাঙ্গণে অর্জুনের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে কর্ণ তাঁর অহিতকামী সারথী মদ্ররাজ শল্যকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে কর্ণ পরাভবকে জীবনে কখনও স্বীকার করেননি, ভয় যে কি তা তিনি কখনও জানেন না, বিক্রম প্রকাশের জন্য এবং যশের জন্য তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ন হি কর্ণঃ সমুদ্ভূতো ভার্যামিহ মমেতি চ।
বিক্রমার্থমহং জাতো যশোঽর্থং চ তথাত্মনঃ।

পাণ্ডুপত্নী ও পাণ্ডবজননী কুন্তীর কন্যাগর্ভজাত জ্ঞানীন-পুত্র কর্ণ। একজন মহাতপস্বী ব্রাহ্মণকে পরিচর্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করে রাজা কুন্তিভোজের কন্যা কুন্তী তাঁর পিত্রালয়ে সেই ব্রাহ্মণের একটি বর লাভ করেছিলেন। কুন্তী তখন অবিবাহিতা। এই বরের দ্বারা কোনও দেবতাকে আহ্বান করলেই সেই দেবতা কুন্তীর কাছে উপস্থিত হতেন। একদিন কুন্তী পূর্বাকাশে নবোদিত অংশুমান সূর্যকে দেখে কৌতূহলান্বিত হয়ে তাঁকে আহ্বান করলেন। সূর্যের আগমনে এবং সূর্যের সংস্পর্শে কুন্তী গর্ভবতী হলেন। যথাসময়ে একটি সুসন্তান তিনি প্রসব করলেন। এই পুত্র সহজাত কবচ ও কুণ্ডল নিয়ে এসেছিল—

"সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলদ্যোতিতাননঃ।" দিবাকর সমদ্যুতি এই পুত্রকে কিন্তু কুন্তী লোকলজ্জাভয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।

পিত্রালয়ে রাজা কুন্তিভোজের গৃহে নিশীথ রাত্রিতে কুন্তী এই শিশু জন্মগ্রহণ করবার পরক্ষণেই ধাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বেতসনির্মিত একটি মঞ্জুষার ব্যবস্থা করলেন। সেই মঞ্জুষার মধ্যে কোমল বস্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে শয্যা রচনা করে সেই শয্যার ওপর শিশুসন্তানটিকে রেখে মঞ্জুষার সমস্ত দিকে মোমের প্রলেপ দিয়ে ছিদ্রহীন করে দিলেন। তারপর কুন্তী ধাত্রীর সঙ্গে রোদন করতে করতে গভীর রাত্রিতে সেই মঞ্জুষা নিয়ে এলেন অশ্বনদীর তীরে। কুমারীর গর্ভধারণ অবৈধ জেনেও পুত্রস্নেহে কুন্তী করুণস্বরে বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন। মঞ্জুষা অশ্বনদীর জলে ভাসতে আরম্ভ করেছে—এই দৃশ্য দেখে রোদন পরায়ণা কুন্তী বলতে আরম্ভ করলেন—পুত্র, শিবায়তে সন্তু পন্থানঃ, তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক্। সর্বদিক্ তোমাকে রক্ষা করুক, জলে জলাধিপতি বরুণ, অন্তরীক্ষে সর্বগ পবন এবং উর্ধ্ব আকাশে তোমার পিতা তপনদেব তোমাকে রক্ষা করুন। দিগের সমস্ত দৈবী শক্তি তোমার আপদেবিপদে তোমাকে রক্ষা করুক্। আজ আমি তোমাকে অকরুণভাবে নদীর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তুমি যদি বেঁচে থাক তাহলে বিদেশেও তোমাকে দেখামাত্র আমি চিনতে পারব, কেননা এমন সহজাত অমৃতময় কবচকুণ্ডল নিয়ে কোনও শিশু আর কখনও মাতৃগর্ভে আসেনি। মা হয়ে আমি তোমাকে স্রোতের জলে বিসর্জন দিচ্ছি কিন্তু তোমার পিতা বিভাবসু ধন্য যিনি সমস্ত স্রোতোপথ ধরে তোমাকে দেখতে থাকবেন; তাঁর চোখের আড়াল তুমি কখনও হবে না। মা হয়ে আমি তোমাকে মাতৃত্বস্তন দিতে পারলাম না কিন্তু সেই নারী ধন্য যে তোমাকে পুত্ররূপে পেয়ে একদিন তোমার তৃষিত মুখে স্তনদান করতে পারবে। সেই নারী কি সুখস্বপ্নই আজ দেখেছে যে তোমার মতো দিব্যবর্মসমাযুক্ত দিব্যকুণ্ডলভূষিত পদ্মায়ত-বিশালাক্ষ সুললাট সুকেশ আদিত্যবর্চ পুত্রকে লাভ করবে! পুত্র, তুমি যখন জানুযুগলভরে মাটিতে হেঁটে বেড়াবে, অব্যক্তমধুর বাক্য উচ্চারণ করবে এবং ধূলি-ধূসরিত হবে, তখন তোমাকে যাঁরা আদর করবেন তাঁরাও ধন্য। তারপর আবার তুমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে হিমালয়ের দৃপ্ত সিংহের মতো বিচরণ করবে সেদৃশ্যও যারা দেখবে তারাও ভাগ্যবান্। এইভাবে বারংবার বিলাপ করে অশ্বনদীর জলে মঞ্জুষা বিসর্জন দিয়ে পুত্রশোকাতুরা কুন্তী পিতার ভয়ে গোপনে রাজঅন্তঃপুরে ফিরে এলেন। হৃদয়ের ক্ষত আবেগ এবং মাতৃস্নেহ বিগলিত অশ্রুধারা আজ কুন্তীকে লোকলজ্জাভয়ে সংবরণ করতে হচ্ছিল।

মঞ্জুষা অশ্বনদীর জলে ভাসতে ভাসতে চর্মণ্বতী (বা চম্বল) নদীতে এসে পড়ল। তারপর চর্মণ্বতীর স্রোত বেয়ে সেই মঞ্জুষা যমুনায় এসে উপস্থিত হল। যমুনা সেই মঞ্জুষাকে প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে নিয়ে এল। অবশেষে

গঙ্গার প্রবাহে মঞ্জুষা উপস্থিত হল অঙ্গরাজ্যে গঙ্গাতীরে চম্পানগরীতে। মহাভারতের মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বর্ণনা করছেন: আজ যেন নদীও ধন্য এই মঞ্জুষাকে বক্ষে ধারণ করে—যে মঞ্জুষায় অমৃতময় দিব্য বর্মকুণ্ডলযুক্ত কুন্তী-নন্দন—সযত্নে রক্ষিত। তাই নদী পরম আনন্দে ও সগর্বে তরঙ্গের দোলা দিতে দিতে মায়ের মতো সেই শিশুকে বুকে করে তীরের দিকে নিয়ে চললো।

সেদিন সকালবেলা সূত অধিরথ পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে এসেছে। অধিরথপত্নী রাধা বন্ধ্যা—পুত্রকামনায় অনেক যত্নকরেও পুত্রমুখনিরীক্ষণের সৌভাগ্য তার জীবনে ঘটেনি। গঙ্গাজলে স্নান করতে নেমেছে রাধা। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটি মঞ্জুষা জাহ্নবীর তরঙ্গে নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে তার বুকের কাছে পৌঁছল। কৌতূহলী রাধা সেই মঞ্জুষাটিকে পেয়ে স্বামী অধিরথকে দেখাল। তখনই অধিরথ জল থেকে সেই মঞ্জুষাটিকে উদ্ধার করে তার মুখ খুলে তার মধ্যে দেখতে পেল তরুণ আদিত্য-সন্নিভ, স্বর্ণময়কবচভূষিত এবং কনক কুণ্ডলের দ্যুতিতে উদ্ভাসিতবদন একটি বালক। বিস্ময়ে উৎফুল্ল অধিরথ সেই বালককে বুকে করে রাধাকে বলল: দেখ, দেবতার আশীর্বাদে আপনা হতেই এই পুত্র আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা অপুত্রক, এই পুত্রকে তুমি গ্রহণ কর। স্বামীর কাছথেকে অনুমতি পেয়ে রাধা সেই পুত্রকে বুকে তুলে নিল। রাধার সুপ্ত মাতৃত্বকে জাগিয়ে তুলল এই পুত্র এবং এর পর রাধার গর্ভে কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। দৈবক্রমে প্রাপ্ত এই পুত্রের নামকরণ হল বসুষেণ, কেননা অজস্র সম্পদ নিয়ে এই শিশু পৃথিবীতে এসেছিল। সূত অধিরথের গৃহে লালিতপালিত হয়ে এই অমিতবিক্রম শিশু "সূতপুত্র" এই আখ্যায় পরিচিত হল।

অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরীতে শিশু দিনে দিনে বড় হচ্ছে। অধিরথ তার শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে। অবশেষে দেখা গেল যে পুত্রের গুণানুযায়ী অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে হচ্ছে না। তাই অধিরথ পুত্রকে পাঠাল চম্পাপুরী থেকে কুরুরাজধানী হস্তিনাপুরে। সেখানে অস্ত্রগুরু ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য—যাঁকে প্রাচীন ভারতের সামরিক ঐতিহ্যের স্রষ্টা বলা যেতে পারে—কুরুরাজ পুত্রগণের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং দ্রোণাচার্যের সামরিক শিষ্য তখন সমস্ত ভারতে অপূর্ব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অধিরথের ইচ্ছা হল যে তার পুত্র দ্রোণাচার্যের শিষ্য হয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করুক। যথাসময়ে অধিরথসুত বসুষেণ দ্রোণের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেল এবং সেখানে শীঘ্রই কুরুরাজকুমারগণের অগ্রণী দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হল।

আলেখ্য ১৩

বিষ্ণু দে

বসেছিল চুপ, ভাবছিল ব'সে, ভাবছিল কিছু, কোন্
ভাবনার মাথা হয়েছিল বাহুবদ্ধ,
দুই বাহু বাঁধা জঙ্ঘায়,
মনে হল যেন সব কিছু ফেলে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে
দূর নীহারিকা শুরু মনের আকাশে।

তারপরে কাজে, ঘরের কাজে, বা বাইরের—
সে করেছে ঘর বাহির, বাহির ঘর।
কাজের আবেগে চলে ফেরে ঘরে-বাইরে,
অগ্নিপুঞ্জ ছড়িয়ে চলে সে বিশ্রামহীন উচ্ছ্বাসে,
সঞ্চারিণী সে পল্লবিনীর পায়ের প্রতিটি পাতায়
আকাশ ভরেছে মুর্ছে মুর্ছে উল্লাসে।

তবুই কি তাকে জ্যোতির কেন্দ্র বলবে ?
অবশ্য তার সান্নিধ্যেরও আগে
হৃদয় ছোটে এবং হৃদয় গলায়—,
হৃদয় ? ছোটে সেই স্বয়ং হিমগিরির কন্যা !

সে যেন এক স্তব্ধ চূড়া,
নন্দাদেবী, কিংবা বুঝি কাঞ্চন যার জন্মায়,
যখন থাকে চুপটি ক'রে ব'সে,
যেমন ভাবি আমিও ঠিক থাকব ;
তারপরে সে আষাঢ় বন্যা, বৈশাখী শেষ ক'রে
যখন নামে গঙ্গায়।

আশ্বিনের এই প্রথম দিনে
কপিলগুহায় সাগরদ্বীপে আবার চিনে ডাকব।

কবিতা

রাজসাক্ষী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আমার বাড়ির জন্য জমিটা কোথায়
কেনা হবে···টালিগঞ্জ থেকে দূর দক্ষিণ কল্‌কাতা
ঘুরে শেষে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে
তিনকাঠা জমি পাওয়া গেল।
মধ্যে একটা গাছ, সেটা স্বভাবত আমার শরিকী
বুঝতে দরকার হয়নি আদালত পর্যন্ত যাবার।
বাড়িটা তুলতে গিয়ে আমার সর্বস্ব বিকিয়েছে,
সিমেন্টের দাম আজ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন্।
গৃহপ্রবেশের দিন ; মঙ্গলকলসে কল্যাণের
সুবিনয়ী উচ্চারণ অর্ঘশায়ী আমের পাতায়।

ঢুকতে গিয়েছে ঘরে, ঢুকতে পেছি যেই,
এমন সময় দেখি আশীবছরের বৃদ্ধ এক,
উঁচু কপালের নিচে পাথরের মতো শক্তমুখ,
দীর্ঘদেহ, অবাচিত দাঁড়ালের প্রাঙ্গণ বেদীতে,
অনাহুত ভাহুকের মতো তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায়
বলে উঠলেন : 'ওরে, এখানে কে, কার এত সাহস,
জানিস্ একার মাটি ? এ তোদের জমি হতে পারে,
জানিস্ একার মাটি ? ঐ গাছটার ঠিক নিচে
ওরা বসেছিল, আমি বসিয়েছিলাম, এই মাটি
ওদের শিশুর, কিন্তু সেই শিশু ফোটেনি কখনো
কেননা দু'জন তা'রা পর পর ভেসে চ'লে গেছে ;
জীবনে একবার আমি অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছি,
আমার পাপের আমি প্রতিশোধ নিয়েছি একবার,
এবার মৃত্যুর আগে, তোমাদের পাপের বিষদাঁত
ভেঙে ফেলে দিয়ে আমি নরকে যেতেও রাজি আছি।
সরাও সরাও ঐ পাতার ভঙ্গ, ভিত্তি ভাঙো,
তারপর বেরিয়ে যাও—যাও।'

: প্রবন্ধ

বাংলার সাম্প্রতিক শিক্ষা-সঙ্কট

অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী

বাংলা ও বাঙালীর শিক্ষানুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রে বাংলা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সামা দিকে অগ্রণী হয়েছেন। কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিক কালে বাংলার এ ঐতিহ্য নষ্ট হতে চলেছে। অন্ততঃ আগামী পনর বছর শিক্ষা ব্যবস্থায় যে হ্রাসবৃদ্ধি হবে বা হতে চলেছে, তা অনিবার্য্য। তার কিঞ্চিৎ আভাস-দান এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলা এখনও মরেনি। সুতরাং কেউ কেউ যে এর প্রতিকারের চেষ্টা করবেন এ আশা নিশ্চয়ই করা যায়।

বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী বড় বড় স্কীম বা পরিকল্পনা করতে নিতান্ত পারদর্শী। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার, কলকাতার ভূগর্ভ দিয়ে রেল-পথ স্থাপন, কল্যাণী'তে দেশের নানা কল্যাণের আয়োজন প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত। সুতরাং বর্ত্তমানে, কল্যাণীতে, জলপাইগুড়ি বা দার্জিলিং-এ নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনও যে ঐ পরিকল্পনার স্থান পাবে, আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। কোনরূপ ভুল বোঝা যেন না হয়, তার জন্য আগেই বলা প্রয়োজন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ আয়তন বিবেচনা করে, শক্তি ও সামর্থ্য থাকলে এ প্রদেশে যদি আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, তাতে কেউ অমত হবেন না। কিন্তু এ কাজ করা সমীচীন হবে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পঙ্গু করে নয়—তাদিগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর বজায় রেখে। তারপর দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করে একটা বড় প্রশ্নও দেখা দিয়েছে—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষকগণকে উপবাসী রেখে উচ্চ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষা-বাজেটের একটা মোটা অঙ্ক ঢালা ঠিক হবে কিনা? তর্কের খাতিরে এ প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" বলেও আরও একটা বড় প্রশ্ন উঠছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কি শুধু বড় বড় ইমারত স্থাপন, না আরও কিছু? নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য অধ্যাপক পাওয়া যাবে কি? বর্ত্তমানে অনেক কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ও বিজ্ঞান কলেজে অনেক অধ্যাপকের অভাব যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার মোটা মাহিনা দিয়ে অনেক অধ্যাপককে নিয়ে যাচ্ছেন। যেমনটী চলে যান, তেমনটী আর পাওয়া যায় না। তর্কের খাতিরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপক পাওয়া যাবে ধরে নিলেও, তাদের জন্য উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া যাবে কি? যদি যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী না পাওয়া যায়, তবে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ই বিশ্ববিদ্যালয় পদবাচ্য হয় না। তার থেকে বের হবে কতগুলি অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অযোগ্য বি এ ও এম-এ উপাধিধারী ছাত্র-ছাত্রী, যাদের কোন স্থান বিশ্ব দরবারে হবে না। বাংলার শিক্ষার বর্ত্তমান অ-ব্যবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য যে কোন নতুন বিশ্ব বিদ্যালয়কে এ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এটাই অনেকের বক্তব্য।

আমাদের বৃহৎ ভারতবর্ষ নানা প্রদেশ ও নানা ভাষা ভাষী লোকের সংমিশ্রণে গঠিত। প্রত্যেক প্রদেশে তা শিক্ষাপদ্ধতিও এক নিয়ম ধারায় গড়ে উঠছে। এ সত্ত

অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার একই ছাঁচে (বা দিল্লীর ছাঁচে) ভারতের সর্বপ্রদেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করতে বদ্ধপরিকর। কোন প্রদেশ তা না মানলে কেন্দ্রীয় "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশন" প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে লোভনীয় অর্থ-সাহায্য দিবেন না, বলা হয়েছে। সুতরাং বাংলা দেশের দশ শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজী স্কুলগুলিকে এগার-শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিবর্তিত করতে হবে; কলেজগুলিতে পাঠক্রমে এক বছর কমিয়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে, এ হল দিল্লীর হুকুম। এ পদ্ধতির সমর্থনে আছে ব্রিটিশ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি, যদিও অপেক্ষাকৃত জনবহুল আমেরিকায় এখনও স্কুলে বার বছর ও কলেজে চার বছরের কোর্স প্রবর্তিত আছে এবং সেখানে কেউ এর পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন নি। দিল্লীর একান্ত বশম্বদ বাংলার মন্ত্রী-মণ্ডলী বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎকে নস্যাৎ করে দিয়ে এবং প্রাদেশিক বিধান সভা বা বিধান পরিষদকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই বললেন তথাস্তু—এগার শ্রেণীর স্কুলই হোক্। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কতকগুলি সর্ত দিয়ে পরীক্ষা-মূলক ভাবে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে রাজী হলেন। বাংলার সরকারী শিক্ষা বিভাগ মোটামুটী ভাবে সর্তগুলি উপেক্ষা করলেন; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্টস্ কমিশন, অপর দিকে ইতিমধ্যেই সরকারের প্রবর্তিত এগার-শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের পরিকল্পনা—এ উভয় সঙ্কটের মাঝখানে পড়ে—শেষ পর্যন্ত তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করে তাকে কার্যকরী করতে অগ্রসর হয়েছেন। নতুন পাঠ-ক্রমের প্রবর্তিও চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মুখপাত্র বেসরার সঙ্গে বলেছেন "টপায় কি? ১৯৬০ সনে এগার শ্রেণীর হাইস্কুলগুলি থেকে যখন অন্ততঃ ছয় হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করে আসবে, তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় কি তাদের কলেজে পড়ার সুযোগ না দিয়ে বিতাড়িত করবেন? বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠক্রম আদি এখন থেকে প্রস্তুত করে রাখতেই হবে।" সত্য কথা। কিংবদন্তী আছে, কখন কখন "কুকুরের লেজই কুকুরকে চালায়।" এ ক্ষেত্রেও বাংলার শিক্ষাবিভাগের প্রবর্তিত এগার শ্রেণীর হাইস্কুল পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে বাধ্য করেছে। কোথায় আজ পুরুষ শার্দুল স্যার আশুতোষ—আর কোথায় তাঁর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদর্শ "স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয় এবং স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত?" এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্যন্ত ভারতের নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করেন নি:—বিহার, আগ্রা, বেনারস, এলাহাবাদ, বোম্বাই, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, জবলপুর, গুজরাট, গোরখপুর, উজ্জয়িনী, পুনা, উইলেনস্ বিশ্ব-বিদ্যালয় (বোম্বাই), জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব।

নীতির দিক দিয়ে ভারতে একদল শিক্ষাবিৎ আছেন (দু'একটী কমিশনও বলে গেছেন), যাঁদের মতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাক্রম হবে এগার বছরের, আর কলেজে হবে তিন বছরের। এই মতবাদকে অভ্রান্ত ধরে নিলেও, দেশকাল পাত্র বিবেচনায় শনৈঃ শনৈঃ এর প্রবর্তনে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কোন রকম প্রস্তুতি নেই, হঠাৎ বাংলার প্রায় চার শত স্কুলকে এগার-শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিবর্তিত করা হবে। বাংলার জনসাধারণের সামনে এক রঙীন আলোতে এ পরিকল্পনা প্রকাশ পেল। যে সব স্কুল এ পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, তারা পাবেন প্রায় দেড়লক্ষ টাকা এক ইমারতের জন্য, আরও প্রায় আধ লক্ষ টাকা সাজসরঞ্জামের জন্য। তথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে—এ সব স্কুলের ছাত্ররা হবে খুব শিক্ষিত এবং এদের ভবিষ্যৎ হবে খুব উজ্জ্বল, এরাই

শুধু সরকারী চাকুরীর অধিকারী হবে, এ কথাটা আজ শিক্ষাবিভাগ বলতে সাহস পায়নি। জনসাধারণ ও ছাত্রদের অভিভাবকেরা এতদিনে এ পরিকল্পনার পশ্চাতের বাস্তব চিত্র দেখতে শুরু করেছেন। দেশে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া এর বিরুদ্ধে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত চলছে। কিন্তু গরীব স্কুলগুলি কোন প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ সরকারী সাহায্য না পেলে তাদের একদিনও চলবে না। প্রথমতঃ যে প্রায় একশতটী স্কুলে শুধু মানবিকী শিক্ষা (Humanities) প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তাদের ছাত্রদের ভবিষ্যতে কলেজে আর বিজ্ঞান বা সায়েন্স কোর্স নেওয়ার কোন উপায় রইল না। তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ এখানেই নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। তারা শুধু বি, এ, এম-এ পাশ করে ঘরত কেরাণী বা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বৃদ্ধি করবে। দ্বিতীয়তঃ যে কয়টী এগার শ্রেণীর স্কুলে বহুমুখী (multipurpose) শিক্ষা বা কারিগরী (technical) শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তাদের অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক নেই। কতগুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্তও হয়েছে। অর্থাৎ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, বায়লজি বা অঙ্ক যতটুকু পড়াবার কথা, এ সব স্কুলের নবম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ততটুকু বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। নিয়ম হয়েছে এ সব যাঁরা পড়াবেন, তাঁরা হবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর এম-এ বা এম এস্‌সি পাশ শিক্ষক, বা বি, এ, বা বি এস্‌-সিতে ঐ ঐ বিষয়ে তাঁদের অবশ্য অনার্স থাকা চাই। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলে ঐরূপ শিক্ষক নেই। অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে সাধারণ বি এস সি একজন শিক্ষক তাঁর স্কুলে একাই তিনি কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স ও অঙ্ক পড়াচ্ছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল প্রতিবছর কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স প্রভৃতি প্রতি বিষয়ে গড়ে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী এম এসসি পাশ করেন। এর মধ্যে প্রায় ২০ জন শিক্ষক হন। অন্যেরা গবেষণা করেন বা বড় চাকুরী নিয়ে চলে যান। প্রতি বিষয়ে এ বিশ জন ছাত্র ছাত্রীকে কলেজগুলিই সর্ব্বাগ্রে টেনে নেন। কারণ বাংলা দেশে এখন এত কলেজ হয়েছে যে, কলেজেই ইংরাজী, ইকনমিক্স ও বিজ্ঞানের অধ্যাপকের বিশেষ অভাব। সুতরাং নতুন পরিকল্পনার এগার শ্রেণীর স্কুলগুলি কোথায় যে আজ বা অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিক্ষক পাবেন, ভেবে ওঠা যায় না। সহরের কলেজগুলি থেকে অধ্যাপকদের নিয়ে কোন কোন সহরের স্কুলে পার্ট-টাইম পড়ান হচ্ছে। অথচ প্রকৃত শিক্ষার জন্য এরূপ পার্ট-টাইম বন্দোবস্ত কোন স্কুল বা কলেজের পক্ষে সমীচীন নয় বা সরকারী নীতিও তা সমর্থন করে না। মফস্বলের স্কুলের দুরবস্থা আরও অধিক। এই দিক দিয়ে বাংলার বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটী সাম্প্রতিক বাস্তব চিত্র নিয়ে আমি উপস্থাপিত করছি। 'যুগান্তরের' ভ্রমণরত ষ্টাফ রিপোর্টার ১৭ই মার্চ্চ (১৯৫৮) কোচবিহার হতে খবর দিয়েছেন:—

"দোয়াত আছে, কালি নাই। স্কুলের বিরাট ইমারত তৈয়ারী হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষক নাই। সামান্য টাকা নহে; মোট প্রায় সোয়া তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে নূতন বিরাট ইমারত উঠিয়াছে, সেই সেদিন এবং নানা প্রকার কারিগরী বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু হায়! পনর মাস চলিয়া গেল, আজও মাদটি পারপাস্ স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কোনও কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন নাই।...ছাত্ররা যে কি পরীক্ষা দিবে, তাহা তাহারা ভাবিতে পারে না।...সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের মাল্টি পারপাস্ স্কুলগুলি আজ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দারুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছে, কোচবিহার জেলাকিন্তু তাহার মধ্যে পড়িয়াছে।" এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আমাদের সরকার এতদি

পর্যাপ্ত শিক্ষা সম্ভারের নামে ইঁট, কাঠ ও পাথরে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করছেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উপযুক্ত খোঁজ নেবার অবকাশ সরকারের হয়নি। বিরাট নয়াদিল্লীর স্কুল কলেজের সৌধমালা নির্মাণ এ দরিদ্র দেশের পক্ষে হাস্যকর বিলাসিতা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এ দৃশ্য মনোবৃত্তি পরিহার করবার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ করে বাংলা সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেছেন—"অতীতে আমরা এক ভুল পথে চলেছি। পড়াশুনার উপর অর্থব্যয় না করে আমরা তা করেছি ইঁট পাথরের উপর। গ্রামে, দালান কোঠার কথা ভুলে যেতে হবে এবং যাতে শিক্ষক ও বই পাওয়া যায়, তার উপর জোর দিতে হবে। গাছের তলায়ও ক্লাস করা যায়। শিক্ষকের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। গ্রামে ভুল বাড়ী তৈয়ারীর দাবী সমীচীন বটে, কিন্তু বর্তমানে সে দাবী পূর্ণ করা সম্ভব নয়।" সুদৃশ্য ইমারত না হলেও শিক্ষাদান সম্ভব; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক ভিন্ন কোন শিক্ষার পরিকল্পনাই যে একেবারে অচল, তার সমর্থনেই প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। উড়িষ্যা সরকার এ বিষয়ে বাংলা সরকার অপেক্ষা অধিকতর দূরদর্শী, মনে হয়। উড়িষ্যা সরকার ১১-৮-৫৮ ইং তারিখের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন—"কতগুলি উচ্চ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু নূতন উচ্চ বিদ্যালয় খুলিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, এই কথা মনে করা ভুল। বর্তমানে ট্রেইনিং প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট পাওয়াও সম্ভব নয়। দুইশত ছাত্র এবার গ্রাজুয়েট হইয়াছেন; মাত্র ২৬ জন ট্রেইনিং কলেজে ভর্তি হইয়াছেন। বিজ্ঞান শিক্ষার গ্রাজুয়েটদের সম্পর্কে অবস্থা আরও শোচনীয়। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কোন বি এস্‌সি শিক্ষক নাই। বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটগণ অন্যত্র আরও ভাল চাকুরী পাইলে চলিয়া যাইতেছেন। যে পর্যন্ত শিক্ষকের অভাব এরূপ থাকিবে, ততদিন নূতন বিদ্যালয় খোলা বিজ্ঞতার পরিচয় হইবে না। তবে যে সব স্কুল আছে, তাতে আরও সেকশন বাড়ান প্রয়োজন।" বাংলা দেশেও ট্রেইনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা স্কুলের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। সম্প্রতি দু'তিনটি বি টি ট্রেইনিং স্কুল খোলা হয়েছে। কিন্তু ভুক্তভোগী-মাত্রই অবগত আছেন যে, যত ছাত্র ছাত্রী বি টি কলেজে ভর্তির জন্য আকুল আবেদন করেন, তার এক-চতুর্থাংশই যথা-তাবে ভর্তি হতে পারেন না। অথচ ট্রেইনড শিক্ষক নতুন পরিকল্পিত এগার শ্রেণীর স্কুলে অপরিহার্য। উপযুক্ত শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা চালু করা একমাত্র বাংলা দেশেই সম্ভব মনে হয়। পরিকল্পনার সমর্থকগণ বলেন, কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে অন্তবর্তী কালে কিছুটা গোলযোগ হয়েই থাকে। কিন্তু এ ত শুধু গোল-যোগ নয়, এ যে আগামী পনর বছরের ছাত্র ছাত্রীদের একেবারে সর্বনাশ! আমরা যা পাব স্কুলে ভাল ছাত্র না পাব কলেজে ভাল ছাত্র। কারণ স্কুলে ভাল শিক্ষা না হলে, কলেজ ভাল ছাত্র পাবে কোথায়? আবার কলেজে ভাল ছাত্র না হলে, বিশ্ববিদ্যালয় ভাল ছাত্র পাবে কোথায়? তাই বলছিলাম, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুললে কি হবে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত ছাত্র না পাওয়া যায়? ঐ গোড়ার কথাটা মনে রাখা দরকার।

বাংলায় শিক্ষার এ নতুন পরিকল্পনা পাকা-পোক্ত হতে কত বছর লাগতে পারে অর্থাৎ কত বছর অন্তবর্তী কাল (transition period) চলতে পারে, এবার এ প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক। বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চারশত স্কুল এগার শ্রেণীর স্কুলে উন্নীত হচ্ছে বা হবে। বাংলা দেশে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের মোটসংখ্যা ষোল শতের অধিক। সুতরাং প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যদি চারশ হাই স্কুলকে এগার শ্রেণীর স্কুলে উন্নীত করা হয়, তবে বাকী বার শ স্কুলকে উন্নীত করতে লাগবে ১৯৬১

শূন্যের পরে আরও পনর বছর। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ইদানীং শিক্ষা বাজেটে যেরূপ ব্যয় সঙ্কোচ করছেন, তাতে প্রতি পাঁচ বছরে পুরোপুরি চারশ স্কুলকে উন্নীত করবার টাকা দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলা সরকার বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের বোঝাতে অস্থির হয়ে উঠেছেন। সুতরাং এ পরিকল্পনার সুফলের মাঝে বাকী বারশ হাই স্কুলের অধিকাংশ বা অনেকগুলিকে যদি আট শ্রেণীর জুনিয়ার হাই স্কুলে অবনমিত করা যায়, তবে বর্তমান শিক্ষা সঙ্কটের কতকটা মুক্তির আসান হতে পারে। কিন্তু সুশিক্ষিত বাংলা দেশ ও পরম শিক্ষানুরাগী বাঙালী কখন কোন হাই স্কুলের অবনতি হতে দিবেন না, এ কথা সহজে বলা যায়। সুতরাং পরিকল্পনাজনিত অন্তবর্তীকাল অন্ততঃ ১৯৬১+১৫=১৯৭৬ সন পর্যন্ত চলবে, সহজেই অনুমেয়। ঐ পর্যন্ত বাংলা দেশে হাই স্কুল পাশাপাশি থাকবে—কতগুলি দশ শ্রেণীর, কতগুলি এগার শ্রেণীর। এরূপ অধিক-সংখ্যক দশ শ্রেণীর হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য হবে দশম শ্রেণীর পর এক স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা; আর এগার শ্রেণীর কতিপয় হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্য হবে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার পর আর এক স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। কলেজগুলিতে থাকবে দশ শ্রেণীর স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রদের জন্য প্রাক-প্রবেশিকা কোর্স (Preparatory class); আবার এগার শ্রেণীর স্কুল থেকে পাশ করা ছেলেরা কলেজে এসে ভর্তি হবে ডিগ্রি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। কিন্তু দশ শ্রেণীর স্কুলে দশম শ্রেণীর পাঠক্রম এক রকম, আর এগার শ্রেণীর স্কুলে দশম শ্রেণীর পাঠক্রম অন্যরকম। অথচ এই দু'রকম ছাত্রই কলেজে ডিগ্রি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে এক-সঙ্গে পড়াশুনা করবে। এদের পাঠক্রমের সামঞ্জস্য বিধান করা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির পক্ষে হবে এক দুরূহ সমস্যা। দশ-শ্রেণীর স্কুলথেকে এসে যে সব ছাত্র কলেজ-গুলিতে বর্তমান অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের নিকট পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা বা প্রাণিতত্ত্ব বা অন্য প্রাক-প্রবেশিকা ক্লাসে পড়বে, ডিগ্রি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে তাদের স্থান হবে এগার শ্রেণীর হাই স্কুল থেকে আগত ছাত্রদের চেয়ে উচ্চতর। এবং অন্ততঃ ১৯৭৬ সন পর্যন্ত এ অন্তবর্তী ব্যবস্থা (?) চলবে। এ ব্যবস্থা হবে এক দুঃস্বপ্ন। এর ফলাফল ভেবে শিক্ষাব্রতী মাত্রই শঙ্কিত হয়েছেন। আর যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোন নির্দিষ্ট টাকা প্রাদেশিক সরকারকে দিতে অসমর্থ হন, তবে এর ব্যর্থতা নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতের বরাদ্দ অনেক কেটে দেওয়া হয়েছে। সূচনাটা মোটেই ভাল নয়।

এগার শ্রেণীর হাইস্কুলের পরিপূরক হিসাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলিতে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তিত হচ্ছে। এরও সাফল্য নির্ভর করবে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাতের উপর। অর্থাৎ প্রতি ২০।৩০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক। ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষার জন্য চাই ছোট ছোট ক্লাস, এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আরও নিবিড় সম্বন্ধ ও যোগাযোগ। বহু-সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর স্কুল বা কলেজে ঐ যোগাযোগ অসম্ভব। অভিজ্ঞ বাংলার শিক্ষাবিভাগ মনে করেন কলেজের ছাত্র-সংখ্যা কমলেই শিক্ষার উন্নতি হবে। সরকারের সাহায্য-প্রাপ্ত কলেজগুলিতে অনধিক এক হাজার ছাত্র সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং কলিকাতার বড় কলেজ-গুলিতেও প্রতি বিভাগে (সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায়) ১৫০০ পর্যন্ত ছাত্র নির্দিষ্ট করতে চান। কোন কলেজেই অধিক সংখ্যক ছাত্রের সমাবেশ অনুচিত। কোন শিক্ষাবিৎই তা করবেন না। কিন্তু ১০০০ বা

১৫০০ হাজারের বেশী যে ছাত্রসংখ্যা এ সব কলেজ থেকে উদ্বৃত্ত বা বিতাড়িত হবে, তাদের বিকল্প ব্যবস্থা কল্যাণকামী রাষ্ট্রকে অবশ্যই করতে হবে। যতক্ষণ না তা হয়েছে, ততক্ষণ ছাত্রসংখ্যা সিদ্ধিই করা অর্থ শত শত ছাত্র-ছাত্রী ও যুবকের শিক্ষা-সঙ্কোচ। বাঙ্গো-দেশ তাতে রাজী হবে না সরকার জেনে রাখুন। প্রকৃত শিক্ষার জন্য ছোট ছোট ক্লাস, অধিক সংখ্যক টিউটোরিয়েল, অধিক সংখ্যক শিক্ষক আর ও অধিক স্থান-সংগ্রহ দরকার। সে দিকে দৃকপাত না করে কেবল 'ছাত্রসংখ্যা কমাও'—এটা একটা যন্ত্রিকতীন বুলি বটে। এতে শিক্ষার মৌলিক প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। হয়ত ওর পশ্চাতে আছে শিক্ষা-সঙ্কোচ ও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস, যদিও এতে বেকার সমস্যার কোন সমাধান হবে না। ছোট ছোট ক্লাস ও অধিক সংখ্যক টিউটোরিয়েলের ব্যবস্থা কোন কলেজই করতে পারবে না, যদি না সরকার কলেজগুলিকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। সর্বোপরি চাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের স্বচ্ছলতা। আজ একজন প্রাইমেরী স্কুলের শিক্ষকের মাহিনা গড়ে ৬২।০ টাকা। একজন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের মাহিনা গড়ে ৭৫ টাকা একজন কলেজের শিক্ষকের মাহিনা গড়ে ১৫০ টাকা। শ্রীযুক্তবরী স্বয়ং বলেছেন, একজন প্রাইমেরী স্কুলের শিক্ষক চাপরাশীর চেয়েও কম মাহিনা পেয়ে থাকেন। এঁরা কি পরিবার প্রতিপালনের ধাঁধায় ঘুরবেন, না অনশনে হয়ে পড়াবেন। প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষা খারাপ হলে, মাধ্যমিক শিক্ষা খারাপ হতে বাধ্য। আবার মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষা খারাপ হলে কলেজী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। সবই মেরুদণ্ডের ন্যায় একসূত্রে গাঁথা। অতএব সকল শিক্ষা পরিকল্পনার মূলে বড়—প্রশ্ন হচ্ছে—সকল শ্রেণীর শিক্ষকের মাহিনা বৃদ্ধি।

এই শিক্ষকসমাজ কোনদিনই মোটা অন্ন-কাপড়ের বেশী কিছুই পাননি। খালি পেটে ও আধ পেটে থেকেই তাঁরা দিনের পর দিন দেশের ভবিষ্যৎ ভক্তদের মানুষ করে আসছেন। এই যৌনমুক, শান্ত ও শান্তি-প্রিয় শিক্ষক-সমাজকেও এই এগার বছরের কংগ্রেসী শাসন অবশেষে মুখর করে তুলেছে। যাঁরা শিক্ষকের অন্নের দাবীকে উপেক্ষা করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের স্বপ্ন দেখছেন, তাঁরা বাতুল। পরাধীন ভারতে একদিন আমরা শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা ও শিক্ষকের চরম দারিদ্র্যকে বিদেশী শাসনের কুফল বলে জানতাম এবং বার বার এই কথাই বলতাম যে, দেশ স্বাধীন হলে সর্বাগ্রেই আমরা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেব এবং শিক্ষক সমাজকে দারিদ্র্য মুক্ত করব। দেশ আজ এগার বছর হল স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু তোমার সেদ আমাদের সে মহান সঙ্কল্প? আমাদের শিক্ষকবর্গ যে প্রাচীন তপোবন আশ্রমের কুলপতি নন, তাঁরা যে জটাবল্কল পড়ে দিনান্তে একমুষ্টি আতপান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে অবিরাম শুধু আগম, পুরাণ, ছন্দ, অলঙ্কার ও দর্শন ব্যাখ্যা করেন না, তাঁরা যে আমাদেরি মত সমাজবদ্ধ মানুষ এবং তাঁদিগকেও যে ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিয়ে, রোগের চিকিৎসা, সব কিছুর ব্যয়ই সমানভাবে বহন করতে হয়, এ কথাও কি চীৎকার করে কাউকে বুঝাতে হবে? গভর্নমেন্ট বলেন—তাঁদের টাকা নেই। কিন্তু পুলিশ ও হস্তরপ্যানার বিজ্ঞাপনের কাজে রাশি রাশি টাকা খরচ করতে ত কোন কুণ্ঠা দেখি না। জাতির স্থিতি ও উন্নতির পথে যে সর্বপ্রধান ও সর্ব প্রথম কর্তব্য—শিক্ষার উন্নতি—যার উপর বিশাল ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে, একমাত্র সে সম্বন্ধেই কি রাজ্যের অভাব দেখা যায়। শিক্ষার দাবীকে যে সরকারী প্রচেষ্টায় অগ্রাধিকার দিতে হবে' সরকারই তা স্বীকার করেন বলে মনে হয় না। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার নানা অ-ব্যবস্থার মধ্যে সকল শ্রেণীর শিক্ষকের খাওয়াপরার উপযোগী নূতনতম জীবিকা-নির্ধারণ আজ দেশ ও জনের সামনে এক বৃহৎ সমস্যা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিকল্পনার উপর পরিকল্পনা চলছে; কিন্তু কোন উপযুক্ত প্রস্তুতি নেই, যোগ্য ও সচ্ছল শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব—তদ্রূপ যোগ্য ছাত্র ছাত্রীরও অভাব। এ সিদ্ধসঙ্কটের সমাধান কোথায়?

: প্রবন্ধ

বৈদেশিক মুদ্রাসমস্যা ও অর্থাগম

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

গত দুই বৎসরে আমাদের পূর্বেকার জমান বিদেশী মুদ্রার তহবিল যে প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে এ সংবাদ আজকাল প্রায় সকলের নিকট পৌঁছে গেছে। এর প্রত্যক্ষ ফলও আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ভাবে দেখতে পাচ্ছি। অত্যাবশ্যক হরলিক্স আজ দ্বিগুণ ত বটেই প্রায় তিনগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে। বিদেশীমুদ্রার তহবিল খালি হচ্ছে দেখে সরকারকে বিদেশী জিনিস আমদানি অনেক কমিয়ে দিতে হয়েছে। ফলে এইসব জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। বিদেশ থেকে আমদানি কাঁচা মালের অভাবে বহু কারখানার কাজও বন্ধ হবার উপক্রম দেখা দিয়েছে।

গত যুদ্ধের কয়েক বৎসরে আমাদের অশেষ কষ্ট পেতে হয়েছিল সন্দেহ নাই। এই দুঃখ-দুর্দশার ফল স্বরূপ আমাদের তহবিলে কিছু স্টার্লিং বা বিদেশী মুদ্রা জমেছিল। যুদ্ধের সময় এদেশে বহু ইংরাজ আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশী সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল। এই সৈন্যদের খাওয়া পরার [illegible] আমাদের সরবরাহ করতে হয়েছিল। অবশ্য টাকাটা সমস্তই এই সব বিদেশী সরকার হিসাব করে আমাদের দিয়ে দিয়েছে। এই পাওনা অর্থ হিসাবে কিছু স্টার্লিং আমাদের তহবিলে জমা হয়। ১৯৫১ সালের মার্চমাসে এর পরিমাণ ছিল ৮৮৫কোটি টাকা। এই বৎসরের ১লা এপ্রিল থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। পাঁচ বৎসরে জমান স্টার্লিং থেকে কিছু টাকা যন্ত্রপাতি আমদানিতে ব্যয় হয় ও ১৯৫৬ সালের মার্চমাসের শেষে এই তহবিলে জমা ছিল ৭৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মোট ১৩৯ কোটি টাকার স্টার্লিং ব্যয় হয়েছিল। এরপর থেকে সুরু হোল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ। এই পরিকল্পনায় শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও রেলের উন্নতির দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এবং এর জন্য বিদেশ থেকে বহু যন্ত্র আমদানি করতে হচ্ছে। আবার খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ না বাড়াতে বিদেশ থেকে গম চাল প্রভৃতি খাদ্যশস্যও বেশি পরিমাণে আমদানি করতে হচ্ছে। ফলে মোট আমদানির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার শেষ বছরে, আমরা মোট ৭৫১ কোটি টাকার জিনিস আমদানি করি। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানির পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ১০৯৬ কোটি টাকা ও ১৯৫৭-৫৮ সালে আমরা মোট ১১৭৫ কোটি টাকার জিনিস আমদানি করেছি। এই দুই বৎসরের প্রতিবৎসর আমরা মাত্র ৬২০-৬৩৫ কোটি টাকার জিনিস রপ্তানি করেছি। কাজেই বিদেশে আমরা যত মাল বিক্রয় করতে পেরেছি তা থেকে এই দুই বৎসরে প্রায় ১২০০-১২৩০ কোটি টাকার বেশি জিনিস আমদানি করেছি। এই কেনা মালের টাকা বিদেশীকে দিতে হয়েছে ও তার ফলে জমান বিদেশী মুদ্রার তহবিল ক্রমেই শূন্য হতে চলেছে। ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৮ সালের মার্চমাসের মধ্যে তহবিল থেকে ৪৭৩ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয়ে গেছে। ১৯৫৮ সালের জুনমাসের শেষে

বিদেশী মুদ্রার তহবিলে মাত্র ২২০ কোটি টাকা অবশিষ্ট ছিল। এখন প্রতি মাসেই প্রায় ২০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে খরচের হার চললে আর এক বৎসরের মধ্যেই যে তহবিল শূন্য হয়ে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ যদি দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ করতে হয় তবে এই বৎসর ও পরের বৎসরও আমদানির পরিমাণ কমবে না। রপ্তানির পরিমাণ যে বিশেষ বাড়ান যাবে—এ আশা করা ঠিক হবে না। বরঞ্চ বর্তমান বৎসরে রপ্তানি কমে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। কারণ আমেরিকার ব্যবসায়ের ভাল মন্দার ছন্দে পড়তে সুরু করেছে ও তার ফলে আমরা যে সব জিনিস বিদেশে বিক্রি করি—যেমন পাটের থলি, চা প্রভৃতির দাম পড়ে গেছে ও বিক্রির পরিমাণও কমে গেছে।

বিদেশী মুদ্রার তহবিলের ত এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এদিকে প্লান কেটে ছেটেও যে খাতগুলি থেকে যাচ্ছে তার জন্য আরো অন্ততঃ ৫৬০ কোটি টাকার জিনিস আমদানি করতে হবে। এই টাকাগুলি যতশীঘ্র সংগ্রহ করা যাবে ততই মঙ্গল। টাকা সংগ্রহ করার কাজে অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে সম্প্রতি বিদেশে রওনা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মাণী, জাপান ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক—এদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষের এই বিপদে তারা কতটুকু সাহায্য করতে পারেন এ নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ঘরোয়া বৈঠকে বসেছিলেন। শোনা যাচ্ছে যে সেখানে তারা বর্তমানে মোট ১৭৫ কোটি টাকার সাহায্য দেবেন বলে ঠিক করেছেন। বলা বাহুল্য এরা সকলেই এর পূর্বেও আমাদের টাকা সাহায্য বা ধার দিয়েছেন।

হয়ত এর পরে ঝুলিতে আরো কিছু ভিক্ষার দান বা ঋণ লাভ হতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে আমাদের সব অভাব মিটবে না। আর বিদেশ থেকে ঋণ করে আজকের সমস্যা কোন রকমে মিটতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অনেক কায়েলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর পর যখন সুদ ও আসল বাবদ টাকা শোধ দিতে হবে তখন বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? হয় রপ্তানির পরিমাণ খুব বেশি বাড়াতে হবে। নচেৎ আমদানির পরিমাণ, অনেক কমাতে হবে। ভবিষ্যতে আমদানি রপ্তানির অবস্থা যে কি দাঁড়াবে এ দেবতারা হয়ত জানতে পারেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে জোর করে কিছু বলা শক্ত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রয়োজনমত বিদেশী মুদ্রা সব সংগ্রহ হবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর পাওয়া গেলেও সমস্যাটির সাময়িক সমাধান হবে মাত্র। ভবিষ্যতের জন্য চলত আরো বেশি বিপদ জমিয়ে তোলা হবে। এই জন্য কিছু দিন থেকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে। আমাদের দেশে বহু টাকার সোনা ও রূপা জমা আছে। অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষ সোনারূপা আমদানি করছে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন যে মোটামুটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে এদেশে যা সোনা জমা আছে তার দাম অন্ততঃ ৩০৩৫ কোটি টাকা হবে। জমান রূপার দামও অন্ততঃ ২০৭৫ কোটি টাকা হবে। এ বিষয়ে গড়পড়তা হিসাবের অবশ্য কোন অর্থ নাই। তবু দেখা যাচ্ছে যে পরিবারের গড়ে ৫ জন লোক আছে এই ধরে নিয়ে বলা যায় যে প্রতি পরিবারে অন্ততঃ ৪ ভরি সোনা আছে। এ দেশের লোক এত দরিদ্র যে অধিকাংশ পরিবারেই এত সোনা নাই। কাজেই বাকী পরিবারগুলির হাতে অনেক বেশি সোনা জমা আছে। ভারত সরকার যদি সোনার মালিকদের নিকট থেকে কিছু সোনা ঋণ-হিসাবে আদায় করতে পারেন তবে এই সোনা বিদেশে বিক্রি করে প্রয়োজন মত যন্ত্রপাতি ও খাদ্যশস্য আমদানি করা যাবে। ধরা যাক—ভারত সরকার এদেশে গোল্ড সার্টিফিকেট বিক্রি করা

শুরু করলেন। এই সার্টিফিকেট সোনার বদলে কিনতে পাওয়া যাবে। এর সর্ত থাকবে যে সরকার দশ পনের কি কুড়ি বৎসর পরে সোনার যা দাম তা টাকায় শোধ দিয়ে দেবেন। কিংবা হয়ত সেই পরিমাণ সোনা ফেরৎ দেবেন। ইতিমধ্যে বছর বছর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া হবে। যার হাতে অর্থাৎ সোনা আছে সে দুটি সুবিধা পাবে। ঘরে সোনা থাকলে সুদ পাওয়া যায় না। কিন্তু সোনার বদলে সার্টিফিকেট কিনলে বছর বছর সুদ পাওয়া যাবে। এ একটা বড় লাভ। আর ঘরে বেশি সোনা থাকলে চোর ডাকাতের ঘথেষ্ট ভয় থাকে। সরকারকে ধার দিয়ে রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দেওয়া চলবে। অথচ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ইচ্ছামত সোনা বা সোনার দাম পাওয়া যাবে। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হয় তখনও টাকা শোধ পাওয়া যাবে। কিংবা এই সার্টিফিকেট জামীন রেখে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং তাদের দিক দিয়ে দুর্ভাবনার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ লাভের সম্ভাবনাই বেশি।

কিন্তু কথা উঠতে পারে যে ভারত সরকার এই সার্টিফিকেট বিক্রি করে যে সোনা পাবেন সে সমস্তই বিদেশে চালান দেবেন। তাহলে দেশের সোনা বিদেশে চলে যাচ্ছে বলে অনেকেরই মনে "কিন্তু" দেখা দিতে পারে। দেশের সোনা বিদেশে চলে যাবে তা ঠিক। কিন্তু সেই সোনার পরিবর্তে আমরা পাচ্ছি যন্ত্রপাতি যাদিয়ে আমরা নূতন নূতন শিল্প গড়ে তুলতে পারব। শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক উন্নতি হবে, বহু বেকারের কাজ হবে এবং জাতীয় আয় বেড়ে যাবে। ঘরের কোণে বাক্স আলমারীর মধ্যে অথবা মাটির নীচে যে সোনা লুকোনো আছে তার মূল্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি আরো টাটানগর, জিলাই, দুর্গাপুর গড়ে ওঠে শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি লাভ হয়—তার মূল্যও বেশি ছাড়া কম নয়। আজকের এই বিশেষ প্রয়োজনে সঞ্চিত সোনা যদি কাজে লাগান হয় তবেইত সঞ্চয় সার্থক হবে।

স্বর্ণ ঋণ যদি সব দিক দিয়েই সুবিধাজনক হয় তবে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করে তোলা হচ্ছে না কেন? কারণ এই ব্যবস্থার অনেক অসুবিধা ও বাধা রয়ে গেছে। প্রথমতঃ এদেশে বর্তমানে সোনার দর ভরিপ্রতি ১০৭।১০৮ টাকা। বিদেশে এক ভরি সোনার দাম ৬২'৫০ টাকা। মনে করুন সরকার কোন লোকের নিকট স্বর্ণ সার্টিফিকেট বিক্রি করে ১০ ভরি সোনা নিল। সোনা নেওয়ার সময় এর দাম ঠিক করতে হবে এবং বাজার দরের চেয়ে কম দাম দিলে কেউ সোনা দেবে না। তাহলে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এই যে ভারত সরকার ১০৮ ভরি দরে সোনা সংগ্রহ করে বিদেশে ৬২'৫০ দরে তা বিক্রি করছেন। ভরি প্রতি এত টাকা লোকসান দেওয়াত সহজ কথা নয়। এই লোকসানের টাকাই বা কোথা থেকে আসবে? অবশ্য যদি এই ব্যবস্থা করা হয় যেএখন যে সোনা কর্জ নেওয়া হচ্ছে দশের বৎসর পরে ঠিক সেই পরিমাণ-সোনা শোধ দেওয়া হবে। যে দশভরি সোনা দিচ্ছে—তাকে দশভরি সোনা ফেরৎ দেওয়া হবে। কিন্তু তাহলেও সোনার দামের সমস্যা থেকে যাবে। প্রথমতঃ সোনার উপর সুদ দেওয়া হবে এবং তদুপরি তার একটা দাম ঠিক করে নিতে হবে। দশভরি সোনা কর্জ নেওয়াহোল ও শতকরা তিন পারসেন্ট সুদ দেওয়া হবে ঠিক আছে। সোনার দাম ১০৮৲ টাকা হিসাবে ধরে নিয়ে ১০৮০৲ টাকার উপর ৫৲ টাকা হারে সুদ দেওয়া হবে? না সোনার দাম ৬২'৫০৲ টাকা হিসাবে ধরে ৬২৫৲ টাকার উপর সুদ দেওয়া হবে? অর্থাৎ যে ভাবেই কর্জ নেওয়া ও শোধের ব্যবস্থা থাক না কেন, সোনার দাম সমস্যা থেকেই যাবে। দ্বিতীয় সমস্যা হবে পরিশোধের সময় সোনা সংগ্রহ করায়। যে সোনা কর্জ নেওয়া হোল তা সমস্তই বিদেশে বিক্রি করে দেওয়া হবে। না হলে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি হবে কি

করে? দশপনের বৎসর পর যখন ঋণ শোধ দিতে হবে তখন সরকার সোনা পাবে কি করে? সে সময় বিদেশ থেকে সোনা কিনে এনে সোনা শোধ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তখন বিদেশ থেকে সোনা কিনে আনার মত বিদেশী মুদ্রা আমাদের হাতে থাকবে কি? অর্থাৎ এই দশ পনের বৎসরের মধ্যে দেশের আর্থিক উন্নতি এতটা অগ্রসর হবে কি যার ফলে আমরা আমদানি থেকে অনেক বেশি রপ্তানি করতে পারব? তা না করা গেলে বিদেশে সোনা কেনবার মত উপযুক্ত অর্থ আমাদের হাতে থাকবে না বা জমবে না। যদি এমন সর্ত করা থাকে যে, হয় সোনা না হয় সোনার দাম শোধ দেওয়া হবে, তাহলে সোনা না দিয়ে পরিবর্তে টাকা দিলে চলতে পারে। কিন্তু তখনকার বাজার দর যদি ৬২'৫০৲ টাকা ভরির বেশি থাকে তবে সরকারকে লোকসান দিতে হবে। যে দিক দিয়েই দেখা যাক না কেন, ঘরে বাইরে সোনার দামের এত পার্থক্য থাকার জন্য যে সমস্যা হচ্ছে এ বেটান হুকর।

তারপরে স্বর্ণ সার্টিফিকেট বিক্রি করে কি প্রয়োজনমত সোনা পাওয়া যাবে? এখানে ভেবে দেখতে হবে সোনা প্রধানতঃ কাদের হাতে আছে ও তারা সোনা কর্জ দেবে কি না। মহিলাদের গায়ের গহনা হিসাবে দেশে অনেক সোনা আছে সন্দেহ নাই। দশ কুড়ি কি চল্লিশ ভরি সোনার গহনা অনেক মহিলাদের বাক্সে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই গহনার বদলে কি কেউ স্বর্ণ সার্টিফিকেট কিনবেন? এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এখনও গহনা না গড়িয়ে বা গহনা বিক্রি করে টাকাটা ব্যাঙ্ক কি কোম্পানীর কাগজ নগদ করলে শতকরা বাড়ে তিন কি চার পারসেন্ট সুদ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও গহনা গড়ার হার যে বিশেষ কমেছে তা মনে হয় না। কমলেও তা হয়েছে খুব সম্ভব অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য। এ রকম মহিলা খুব কমই আছেন যিনি শতকরা তিন চার টাকা সুদের লোভে নিজের গহনা সরকারকে দিয়ে দেবেন। আর একশ্রেণীর ধনী লোক আছে যারা আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য নগদ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে কিংবা কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করতে পারছেন না। তারা ভাল ভাল সোনা কিনে ঘরে কিংবা ব্যাঙ্কের লেকটে উল্টে জমা রেখে দিয়েছেন। এর ফলে আয়করের কর্তাদের ফাঁকি দেওয়া হোল। অথচ প্রয়োজনের সময় সোনা বেচে নগদ টাকা পাওয়া যাবে। সোনা মানে যে এস্টেট ডিউটি ফাঁকি দেবার একটি পথ হবে সোনা কিনে রাখা। এর হিসাব রাজস্ববিভাগের কর্তাদের নিকট পেশ না করলেও চলে ও ডিউটি দিতে হয় না। এই শ্রেণীর লোকদের হাতে কত সোনা আছে বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে এই সোনা কোন রকমেই সরকারের হাতে এসে জমা হবে না। কারণ তাহলে আয়কর বা এস্টেট ডিউটির ফাঁকি ধরা পড়বে। যারা লক্ষ লক্ষ টাকা কর ফাঁকি দেয় তারা এত কাঁচা নয় যে এই চোরাই মাল দম সরকারের কোলে সমর্পণ করে দেবে। দু'একজন অর্থনীতিবিদ্ বলেছেন যে স্বর্ণ সার্টিফিকেট বিক্রি করে যে সোনা পাওয়া যাবে সে সোনা লোকটির হাতে কি করে এলো এ প্রশ্ন যেন না করা হয়, তবে কর ফাঁকির সোনা সরকারের তহবিলে জমা হবে। সরকারের পক্ষে এই রূপ ঘোষণা করা উচিত হবে কিনা এ বিচার করে দেখা দরকার। কারণ তার অর্থ চোরকে আমরা কোনদিনই শাস্তি দেব না এই কথা বলা। যে করদাতা ঠিকমত কর দিয়ে এসেছে এর ফলে তার মনোভাব কি হতে পারে? সে নিশ্চয়ই মনে করবে যে ঠিকমত কর দেওয়া তার ভুল হয়েছে ও ভবিষ্যতে ফাঁকি দেওয়াই ঠিক হবে। তা ছাড়া সরকার এই আশ্বাস দিলেও যে বেশি সোনা এসে জমা হবে এর সম্ভাবনা কম। আজকের সরকার হয়ত এই আশ্বাস দিল কিন্তু কালকের সরকার যে সেই আশ্বাস মেনে নেবে তার গ্যারান্টি কে দেবে? এখনকার সরকার যে "একশ ভুল

ফুটে উঠুক" (মাও সে তুং) নীতি অবলম্বন করবে না কর "ফাঁকিবেনেওয়ালারা এই ভরসা খুব বেশি রাখে না। কাজেই এই লুকোনো সোনা সরকারের চক্ষুর অগোচরেই থেকে যাবে। আর কিছু সোনা পুরোণো আমলের মঠ ও দেবস্থানে সঞ্চিত আছে। এও যে সরকারী ঋণতহবিলে এসে জমা হবে তার সম্ভাবনা বেশি নাই। কৃতপূর্ব দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের অনেকের হাতে অবশ্য সোনার তাল বা সোনার প্লেট, বাসন জমা আছে এবং অনেক ধনী গৃহেও তা পাওয়া যাবে। এর কিছু অংশ হয়ত সরকারী ঋণতহবিলে জমা হতেও পারে। কিন্তু এর পরিমাণ কতটা হবে? ফরাসী দেশে ১৯৫২ ও ১৯৫৮ সালে এই ধরণের স্বর্ণঋণ তোলার চেষ্টা হয়েছিল তার ফলে সে দেশের জমাট জমান সোনার শতকরা মাত্র দুই পারসেণ্ট সোনা পাওয়া গিয়েছে। ফরাসী দেশের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত ও তাদের দেশাত্মবোধ আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। সে দেশে যদি শতকরা দুই পারসেণ্ট সোনা পাওয়া গিয়ে থাকে তবে আমাদের দেশে তার চেয়ে বেশি পাবার আশা নিতান্তই কম। দুই পারসেণ্ট হারে এ দেশে যে সোনা সংগ্রহ হবে তা বিদেশে বিক্রি করলে বড় জোর ৩৫।৩৬ কোটি টাকা মিলতে পারে। যেখানে প্রয়োজন ৫৯০ কোটি টাকার সেখানে মাত্র ৩৫।৩৬ কোটি টাকায় কি হবে? অবশ্য-এ কথা যদি মনে করা যায় যে যার না মোটেই রাজা করেন না তার পক্ষে গুপ্ত বা পাস্তা ভাতের পার্থক্যের কথা ভেবে লাভ নাই তবে এই ধরণের স্বর্ণ সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবস্থা দেখা যেতে পারে। আমরা যখন ডুবতে বসেছি তখন খড়কুটা যাই হাতের নিকট পাওয়া যাবে ধরবার চেষ্টা করতে হবে। যদি বেশ সোনা পাওয়া যায়—ভাল কথা। না পাওয়া গেলেও আর বর্তমান থেকে খারাপ অবস্থা হবে না। সে কথা ঠিক। কিন্তু দেশে ও বিদেশে সোনার দামের পার্থক্য-সমস্যার সমাধান না পাওয়া গেলে তহবিলে যে সোনা জমা হবে তা হজম করা শক্ত হবে এবং যত বেশি সোনা জমা হবে ততই বহুহজমের আশঙ্ক বেড়ে যাবে।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

দেশ ও দেশমাতৃকা

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

পৃথিবীকে দেবী বলিয়া গ্রহণ করা ভারতীয় মনের একটি বিশেষ প্রবণতা বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। বেদ-উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ-তন্ত্র সাহিত্যাদিতে ইহার প্রমাণের অন্ত নাই। কিন্তু শুধু ভারতবর্ষেই যে পৃথিবী দেবী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে, প্রাচীন বহু দেশেই এই বিশ্বাস দেখিতে পাই; পৃথিবীর প্রাচীন দেবী পূজার ইতিহাসের মধ্যে এই তথ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বেদে স্থানে স্থানে আকাশ বা দ্যৌকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৃষ্টি দ্বারাই পিতা দ্যৌ এর বীর্য—তাহা লাভ করিয়াই পৃথিবী, শস্যশালিনী হইয়া উঠেন। প্রাচীন গ্রীস দেশেও দেখি, পৃথিবী শুধু দেবী-রূপে পরিকল্পিতা হন নাই, তিনি দ্যৌ-পত্নীরূপেই গৃহীতা হইয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক্ কবি হোমারের কবিতায় ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহার পৃথিবী বন্দনায় দেখিতে পাই—

O universal Mother, who dost keep
From everlasting thy foundations deep.
Eldest of things, Great Earth, I sing of thee.

... ...

Mother of Gods, thou wife of starry heaven
Farewell! be thou propitious, and be given
A happy life for this brief melody,
Nor thou nor other songs shall remembered be.

(Anthology of World poetry).

গ্রীক কবি ইস্কাইলাসের বর্ণনায়ও দেখিতে পাই,—

The pure sky yearns with love to wound
the Earth,
The loving Earth yearns likewise to be wed,
And from the heavenly bridegroom showers
descend
Upon the bride, who brings forth for mankind
The grazing cattle and Demeter's corn,
With precious moisture riping the fruits
To autumn fulness.

(Danaides, Aeschylus)

পৃথিবীর এই মাতৃরূপ আমাদের ঊনবিংশ শতকের দেশাত্মবোধের উন্মেষের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথম কবিতা রচনা করিয়াছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। ভারতবর্ষকে জননী সম্বোধন করিয়াই তাহার আরম্ভ।—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
বর্ষরূপ কূপাহীন হয়ে।
তোমার সন্তান যত সকলেই জ্ঞানহত
কেন নিজে মর তার বয়ে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান। কিন্তু শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপরও এই দেশমাতৃকার আদর্শ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দেশ ও দেবী

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব ঔপনিষদিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট; বাঙলা দেশের বা ভারতবর্ষের শাক্ত ধর্ম বা শাক্ত চিন্তাধারা কোনও দিনই রবীন্দ্রনাথের মনে কোনও অনুকূল আবেদন জানায় নাই, বরঞ্চ কখনও কখনও প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের চিন্তাধারায় পৃথিবীর যে এই একটি দেবীরূপত্ব এবং জননীরূপত্ব তাহা রবীন্দ্রনাথের মনেও গভীর বিশ্বাসরূপে দেখা দিয়াছিল। এই বিশ্বাসের দুইটি রূপ আছে। একটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' (মানসী), 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী), 'মাটির ডাক' (পূরবী) এবং 'পত্রপুট' কবিতা গ্রন্থের পৃথিবী সম্বন্ধীয় কবিতাটিতে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও কোনও পৌরাণিক বোধ নাই; আছে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত একটা গভীর কবি-অনুভূতি। যিনি সমস্ত দেহমন দিয়া অনুভব করিয়াছেন, মানুষের সহিত পৃথিবীর যে বন্ধন তাহা মাতার সহিত সন্তানের নাড়ীর বন্ধন। কিন্তু স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তখন উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত দেশ ও দেবীর অভিন্নতার বিশ্বাসের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। স্বদেশের মাতৃরূপ তাই শুধু আলঙ্কারিক ভঙ্গিতে নয়, একটা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকাররূপেই দেখা দিয়াছে তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতে। এই সময়কার তাঁহার গানে দেখি—

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখ পানে
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।

তুমি ত দিতেছ মা, যা আছে তোমারি,
ধর্ম শস্য তব, জাহ্নবী-বারি,
জ্ঞান ধর্ম কর্ম পুণ্য-কাহিনী।
এরা কি দেবে তোমে কিছু না, কিছু না,
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার একটি প্রসিদ্ধ গান—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাকু,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমকোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
হিমকোটি ছেলে মায়ের মেরিলে
দশ দিক্ সুখে ভাসিবে।

ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের—

'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে'

প্রভৃতির প্রতিধ্বনি একেবারে অস্পষ্ট নয়; অন্ততঃ সমঐতিহ্যের প্রভাব হইতে যে ইহা আত তাহা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেকগুলি গানও এই জাতীয় চিত্তপটভূমির সাক্ষ্য বহন করে। আমরা নিম্নে কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি:—

(১) মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে।

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন।
সে স্নেহ-উপহার
কচে না মুখে আর,
সে যে আমার জননী রে।

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।

ওমি ভুবন মনোমোহিনী,.....

আমরা পথে যাবো সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে দিবস যাবে যাবে।
বলবো 'জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ।"
তোদের মা ডেকেছে, কবো যাবে যাবে॥

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা॥

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা॥

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?

উপরে উল্লেখিত গানের সবগুলিতেই দেখিতে পাই একটা-বাঙালীজনোচিত সাধারণভাবে স্বদেশে মাতৃবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলিয়াছেন,—

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা ব'লে ভাসা তরী॥

সেখানে 'জয় মা'র লক্ষ্য 'মা' কে? তিনি 'দেশ-মা' ও বটেনই; কিন্তু বাঙলা দেশে 'জয় মা' বলিয়া তরী ভাসাইবার ক্ষেত্রে আর-এক বিপদ্‌নাশিনীতে যে বিশ্বাস এ-ক্ষেত্রে তিনিও কবির চিত্তে খানিকটা অবোধপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। অবোধপূর্ব বলিতেছি ইহা সাধারণিক উত্তরাধিকার জনিত বলিয়া। রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যেখানে বলিয়াছেন,—

আমি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী?
ওগো মা—
তোমার দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আমি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

সেখানে 'সোনার মন্দিরে'র 'জননী'কে বিশুদ্ধ আলঙ্কারিক বর্ণনা রূপেই গ্রহণ করিতে পারিতাম যদি না পরেই দেখিতে পাইতাম—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কি মূরতি আজি দেখিনু রে।

ইহাও আলঙ্কারিক বর্ণনা বটে; কিন্তু এই খড়্গধারিণী, শঙ্কাহরণী এবং অগ্নিবর্ণে চিন্ময়ী এক দেবীকে পশ্চাৎ হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলি কি করিয়া? আলঙ্কারণের ভিতরে ঐতিহ্য-প্রভাব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে; সেই সত্যটাই এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

ভারতীয়গণের মধ্যে কেবলমাত্র বাঙালী কবিমানসেই যে দেশ দেবী বা 'শক্তির' সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে তাহা নহে; এই প্রবণতা বাঙালী কবিমানসেই বেশি করিয়া দেখা দিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলেই এই প্রবণতার কম বেশি সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতী একজন আধুনিক যুগের জনপ্রিয় তামিল কবি। নিজে তাঁহার

'জননী ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে দুইটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রথম কবিতাটিতে কবি ভারতবর্ষকে পরাশক্তি রূপে কল্পনা ও বর্ণনা করিয়াছেন। এই পরাশক্তি মেঘমাতাও বটেন—আবার তিনি মেঘমাতা এবং শিব-গৃহিণীও বটেন।

Our mother is a spirit wild,
A spirit mad and stark;
Her lover, he hugs the swearing flame
And dances in the dark.

Waves of melody heave and eddy
In the fairy sea of song;
She leaps and laves in the spin of the waves
And rides their crest along.

In the woodland bright of the poets light
Blow buds divinely sweet;
She clasps them to her and with beauty drunk,
She reels on tripping feet.

She's covered the parts of a thousand arts
And showers them over the earth,
Behold, she sings, and the Veda rings
Her trident conquers death.

In the war of wars, she springs as the might
In the bend of Partha's bow;
She leaps to kill and slakes her will
With the blood of the cloven foe.

অন্য কবিতাটিতে দেখি, কবি জননী ভারতবর্ষকে জাগিয়া উঠিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। এখানে কবি জননী ভারতবর্ষকে পার্বতী উমার সহিত অভিন্ন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।—

Dost thou not know we are all athirst
For the grace that wills in thy eye?
Golden one, daughter of the spirit of
white Himachal,

How long, oh, how long are we to wait?
What more of penance are we still to do?
Thou sleepest yet, is it fair?
Life sweet, mother, awake.

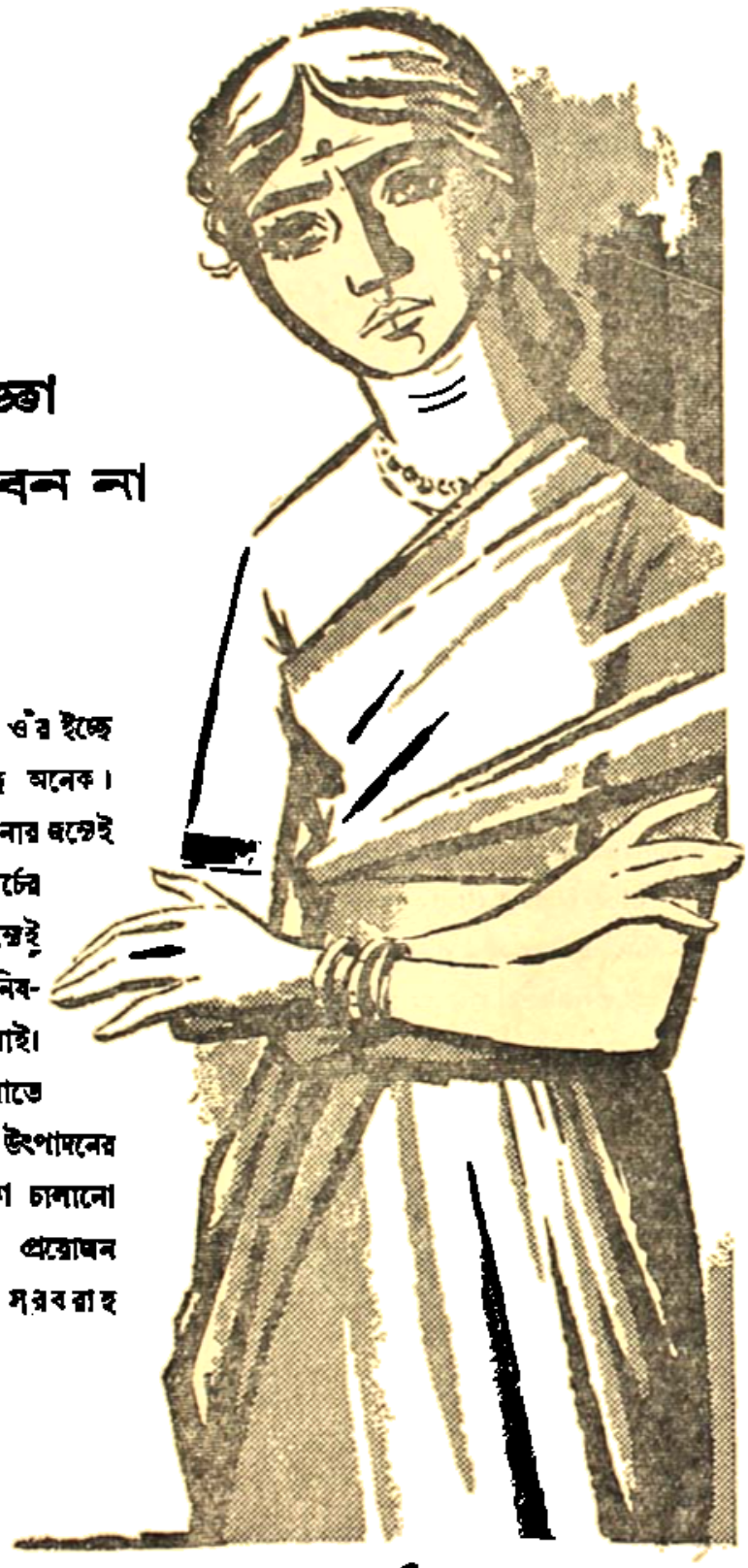

...ওঁকে অবজ্ঞা করবেন না

সাধারণ একজন গৃহকর্ত্রী... কিন্তু ওঁর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য আমাদের কাছে অনেক। ওঁর কি প্রয়োজন শুধু এইটুকু জানার জন্যেই আমরা সারা দেশে মার্কেট রিসার্চের কাজ পরিচালনা করি। সেইজন্যেই হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষ-পত্রের মান নির্ণয় করছেন গৃহকর্ত্রীরাই। এই জিনিষগুলির গুণাগুণের যাতে কোন তারতম্য না ঘটে সেইজন্যে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নানাধরনের পরীক্ষা চালানো হয়। তাই আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল জিনিষপত্র সরবরাহ করতে সক্ষম।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

SLL-13-XBB 80

কবিতা

এ শুধু বালকবেলা

অমলকান্তি ঘোষ

এ শুধু বালকবেলা চিরকাল।....
সামান্য সঞ্চয় ভরে আর শঙ্কায় চোখের আড়াল
করে রাখে। রাংতার পাত
কিম্বা আঠার শিশি, কালির দোয়াত,
কাগজের ফুল
কাউকেই দেবে না সে, বাবা আর ছোড়দিদি মা-মণি টুটুল।

এ শুধু বালকবেলা চিরকাল।....
বাঁশের কঞ্চি কেটে অপুর মতন তরোয়াল
হাতে নিয়ে প্রমত্ত রণে--
গাছেরা শত্রু হয়ে মিটিমিটি হাসে একমনে।
তারপরে বাড়ী ফিরে এসে
বলবে মায়ের কাছে, 'জানো মাগো, আজ কী হয়েছে।'—

এ শুধু বালকবেলা চিরকাল।...
নিমিষে বিলিয়ে দেবে মন আর শ্রমের প্রবাল।....
শুধু তাই নয়,
যে-টাকাটি পেয়েছিল রথের সময়
মা মণির কাছ থেকে, একটু আদরে
ভুলে গিয়ে গলে গিয়ে সে-টাকা ফেরৎ দেবে অতি অকাতরে।

কবিতা

পথের পাঁচালী

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী শেষ হ'য়ে গেল
নিভে গেছে ঘৃতদীপ,
শুকিয়ে গিয়েছে মর্ত্য-বাসরে
শ্বেত-চন্দন টীপ ;
বাংলা দেশের অকাশ-বাতাস
বিয়োগ-ব্যথায় ভরা,
ফুরালো আজিকে তোমার কথা ও
নতুন কাহিনী গড়া।
শ্যামলা দেশের মাটির মানুষ
অন্তর দিয়ে তুমি,
বেসেছিলে ভালো বন ও পাহাড়
ফুল, লতা, পাতা, ভূমি :
এ দেশের গাছে পাখী গান গায়
ময়ূর আষাঢ়ে নাচে,
ধানের ক্ষেতেতে ঢেউ খেলে যায়
চাতক 'দে জল' যাচে ;
শাল-মহুয়ায় ফুটে লাল ফুল
ঘেঁটু ও কলমী লতা,
বন-তুলসীর সোঁদালী গন্ধে
শিহরে চিকণ পাতা ,
হিজল-জারুল, মৌরি, আকন্দ
বেতস-বনের ছায়া,
"আরণ্যকে"র হাওয়ানিতে
রয়েছে মধুর মায়া।

দুই বোন : গল্প

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

মেয়েটার কপাল ভাল। এমন হট করে কবির বিয়ে হয়ে যাবে কেউ আশা করেনি। এক গুচ্ছের আইবুড়ো মেয়ে আছে হস্টেলে। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বয়স। সব শিক্ষয়িত্রী। গরীব স্কুলের স্বল্প মাইনে পেয়ে তারা তুষ্ট। তাদের অর্থলোভ থাকাটা শোভন নয়। বিলাস-ব্যসন বর্জন করে বিদ্যাদায়ীর কঠোর শুচির জীবন কাটানো যদি তোমার স্বপ্ন হয় আদর্শ হয় তবে আমাদের সঙ্গে এসে থাকো। আমরা আলোভরা রঙিন জীবনের মুখ দেখব না, দেখতে চাইব না। এই প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে তোমাকে দশটা পাঁচটা কচি মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। কঠোর ব্রত। প্রতিদান আশা করবে না। তারপর যদি একটি মেয়ে ভাল হয়, এই আমতা গার্লস স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে ফুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথম দশটি আসনের একটি আসনও দখল করতে পারে তখন,—সেদিন তুমি মনে করবে তোমার জীবন ধন্য, তোমার শিক্ষয়িত্রী জীবন সার্থক হয়েছে।

সুতরাং একটি মন্ত্র, একটি আদর্শ ছাড়া আর কিছু ভেবো না, আর কিছু চেয়ো না। কবিও এই আদর্শ সামনে রেখে দশটা বছর কাটিয়েছে। আরও কতকাল কাটাতো কে জানে। কিন্তু তা তো হল না। হট করে ওর বিয়ে হয়ে গেল। প্রস্তাব দিয়েছিল কবির এক মামাতো ভাই। দিল্লীর বড় চাকুরে। তার আফিসে ছেলে চাকরি করে। ছ শ টাকা মাইনে। কবি একবার ছুটি নিয়ে দিল্লী আসুক। হয়তো দেখলে সমীরের পছন্দ হয়ে যাবে। খুব ভাল ছেলে সমীর। মার্জিত শিক্ষিত বিনয়ী এবং স্বাস্থ্যবান।

কবির বুকের ভিতর দুরদুর করছিল অরুণদার চিঠি পেয়ে। একটা স্বপ্ন একটা মরীচিকা। তাই কি? আর পাঁচজন শিক্ষয়িত্রী চেপে ধরেছিল কবিকে—না না এই চান্স তুই নষ্ট করবিনে। যা তো একবার—বেশি দিন না—এক হপ্তার ছুটি নিয়ে চলে যা দিল্লী। মাথা নেড়ে কবি বলেছিল, 'ধেৎ! বুড়িয়ে গেছি এখন আমায় বিয়ে করবে কে।'

'করবে না আমরাও ধরে রাখছি—তা হলেও একবার বেড়িয়ে আসতে দোষ কি—তোমার মামাতো ভাইয়ের বাসা আছে সেখানে—অসুবিধে কিছু হচ্ছে না যখন—'

কবি কথা নিয়েছিল। পাঁচজন চটপটে হাতে কবির সুটকেস গুছিয়ে দিয়েছিল, কবির জন্য এক্সপ্রেসের ভাত রান্না করে দিয়েছিল, কবিকে সাজিয়ে দিয়েছিল।

দিল্লী পৌঁছে সাত দিন পর নীল খামে করে কবি প্রথম চিঠি পাঠিয়েছিল আমতা হোস্টেলের ঠিকানায়। সর্বজ্যেষ্ঠা শিক্ষয়িত্রী নীহারদির নামে চিঠি। কিন্তু চিঠি সকলের কাছে লেখা: 'কাল আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ও রেজিষ্ট্রী করে। তোমরা সবাই আমাকে আশীর্বাদ করো ভালবাসা জেনো। ইতি কবি।'

আমতা গার্লস স্কুলের গরীব হস্টেলের পাঁচজন টিচার সেদিন কবির শুভ জীবন কামনা করে বাজার থেকে এক ভাল মাছ ও মাংস আনিয়ে রান্না করে 'ফিষ্ট' করেছিল এবং প্রফেসর টিচার কবি সান্যালের নতুন দাম্পত্য জীবনের

আশীর্বাদ জানিয়ে মোটা খামে করে দিল্লীর ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছিল। চিঠিতে পাঁচটা সই ছিল।

সেই কবি সুভদ্রার করে তার ফলটুমেলের নতুন সাজানো ঘরে চুপচাপ বসে আছে। বড় বাড়ি। শ্বশুর শাশুড়ি ভাসুর জা ননদ নিয়ে কবির বড় সংসার। এদিক থেকে কবি সুখী। কেননা একলা থাকা তার স্বভাব না। আসতার হোস্টেলে পাঁচজন নিয়ে তার দীর্ঘকাল কেটেছে। যদি সমীর আলাদা বাসা করে কবিকে নিয়ে থাকত তবে কবির খারাপ লাগত। বড় সংসারে অহরহ হৈ-চৈ হাসি গানের মধ্যে জীবন সতেজ থাকে। ভাসুরের তিনটি ছেলে মেয়ে। ননদ বিধবা হয়ে এখানে আছে। তারও দুটি বাচ্চা। দেওর আছে দুটি। কলেজে পড়ে। শ্বশুর শাশুড়ি ভাল মানুষ। হাসি ছাড়া মুখে কথা নেই। ননদ আর জা কবিকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছে। কবির জীবন কাটছিল বেশ। কিন্তু তার মুখ ভার কেন। এত সুখের মধ্যে হৃদয়ের একটুকরো কালো মেঘ উদয় হল কবে থেকে, কখন থেকে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কবি দেবে কি?

'হ্যাঁরে ছোট, চুপচাপ বসে আছিস্ কেন?' বড় জা এসে ঘরে উঁকি দেয়। 'ঠাকুরপো আফিসে বেরিয়ে গেছে সেই কখন—তা এখানে এমন একলা গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছিস কি?'

'না কিছু না।' অল্প হাসি কবির পাতলা ঠোঁটে উঁকি দিতে দিতে তখনই মিলিয়ে যায়। 'ভাবছিলাম—'

'হ্যাঁ কি ভাবছিলি?' কবি শক্ত হয়ে প্রশ্ন করে।

কবি চুপ থেকে আঙুলের নখ খোঁটে। কি ভাবছে সে বলবে কেমন করে। বলা যায় কি? তাই নখ খোঁটা শেষ করে ছবির চোখে চোখ রেখে আবার হাসতে চেষ্টা করে। 'কিছু ভাবিনি। এমনি বসে আছি। মাথাটা একটু ধরেছে।'

এবার ছবি হাসে। মানে একটা কিছু গোপন করছে কবি বুঝতে তার কষ্ট হয় না।

'বেশতো, মাথা ধরেছে আমার ঘরে আয়, একটু চা খাবি? মুখ সোমড়া হয়ে একা একা বসে থাকলে মাথা আরো বেশি ধরবে।'

উঠে কবি ছবির ঘরে চলে যায়। সেখানে তাদের আড্ডা বসেছে। ননদ আর দেবর তাস কাটছে। যেন তারা কবির অপেক্ষায় ছিল।

'এসো এসো ছোট বৌ।' ননদ খুসি হয়ে কবিকে ডাকল। 'আমি আর বৌদি পার্টনার হব।' মিহির কবির হাতে ধরে টেনে পাশে বসাল। ছবি কি-কে ডেকে চার কাপ চা তৈরী করতে হুকুম করে তাস খেলতে বসে গেল।

বেশ কাটছিল, বেশ কাটত। কিন্তু একটা কাঁটা অহরহ কবির হৃদয়কে খুঁচিয়ে যাচ্ছে। কি, স্বামীর ভালবাসা? কবি পেয়েছে। পাচ্ছে। বিয়ের পর এই তিন মাসে সমীর এত ভালবাসা বৌকে ঢেলে দিয়েছে যে আর কোন পুরুষ বা দিত কিনা, দেয় কিনা কবি মাঝে মাঝে চিন্তা করে। কিন্তু কাঁটার খোঁচাটা তো বন্ধ হয় না। মিলিটারী আফিসে বড় চাকুরে সমীর। পয়সার অভাব নেই। তা ছাড়া তার দাদাও বড়লোক। গভর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার। কাজেই আন্দাজ করা যায়। সমীরের বাবা অল্প হিসেব। এখন অবসর নিয়ে মাস মাস মোটা টাকা পেন্সন টানছেন। সুতরাং সমীর তার বাপের একটা মোটা অংশ বৌয়ের জন্য খরচ করতে পারছে কবির জন্য এই তিন মাসে কত টাকার শাড়ি গয়না এটা-ওটা এনেছে হিসাব করলে বোঝা যায়। কিন্তু শাড়ি গয়না কি সব? তবে কি। না, সমীর কোনো রাত্রে বাড়ি ফেরেনি এই তিনমাসের জীবনে কবি দেখল না।

'টিফিন খেয়েছিলে বিকেলে—মিহির প্রবীর বা বৌদি কি মেঘদিকে নিয়ে একটু বেড়াতে টেড়াতে যাও তো?' ঘরে ফিরে সমীর প্রশ্ন করে। কবি ঘাড় নাড়ে। যেদিন তাদের আড্ডা জমেনা সেদিন সবাই মিলে বাইরে বেড়াতে যায়। 'আমি সুখী—সত্যি আমার জীবন সুখের।' যেন হেসে স্বামীকে বলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ কালো করে ফেলে। চোখ অন্যদিকে বেসালে চলে যায়।

'কি হ'ল?' সমীর জামা কাপড় ছেড়ে সিগারেট ধরায়।

'মাথা ধরেছে।' মুখ না ফিরিয়ে কবি কথা বলে।

'প্রায়ই তোমার মাথা ধরে—আমার মনে হয়—আমার যেন মনে হয় তোমার চোখের দোষ হয়েছে। না হলে রোজ মাথা ধরবে কেন। বেশ তো, মিহিরকে নিয়ে কর্ণেল চোপরার কাছে একদিন যাবে—চোখটা দেখাও?'

কবি মাথা নাড়ে।

'চোখ ঠিক আছে। চোখে কোনো দোষ হয়নি।'

'তা তুমি কি করে বুঝবে। স্পেশালিষ্ট ছাড়া—'সমীর থেমে যায়। সিগারেটের ছাই ঝাড়ে। কেন না কবির একটা লম্বা নিঃশ্বাস সমীর শুনতে পেয়েছে। এই নিঃশ্বাসটা সমীর অপছন্দ করে।

কবি, ঘাড় ফেরায়।

'ক'টা বাজে।'

সমীর হাতঘড়ি দেখে।

'এগারোটা চল্লিশ।'

'মানে পৌনে বারোটা।' কবির কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'হ্যাঁ, আজও একটু রাত হ'ল। সমীর চোখ তোলে না। কবি স্বামীর দিক থেকে চোখ সরায় না। যদি সমীর মুখ তুলে তাকাত দেখত কবির ফুলতে নাকের ডগায় ঠোঁটে ঘামের ফুটকি। স্বামীকে সে ঘৃণা করছে?

'আজও তোমার মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে।'

ক্ষীণ গলায় সমীর হাসল।

'সাহেবসুবোর পাল্লায় পড়ে সামান্য একটু—।' স্বামীর কথা শেষ করতে দেয় না কবি।

'একটু কেন, বেশ খেয়ে এসেছ, তোমার চোখ বলছে। যখন ঘরে ঢোকে তোমার পা টলছিল।'

অবোধবদন হয়ে সমীর সিগারেট টানে।

বেসালের কাছে সরে যায় কবি। সেখানে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'রোজ রাতে মদ খেয়ে চোরের মত বাড়িতে ঢুকছ—তোমার লজ্জা নেই।'

'কিন্তু আমি তো কারোর ক্ষতি করছি না।'

সমীর হাসতে চেষ্টা করল। কবির কঠিন চেহারা দেখে হাসি মিলিয়ে গেল। 'আমি সংসারের সব দায়ী দাওয়া মিটিয়ে মাঝে মাঝে একটু—'

'ক্ষতি করছ না কারোর সত্যি,—কিন্তু তুমি নিজের যে ক্ষতি করছ তা বুঝতে পার না।' একটু থেমে কবি অন্যদিকে তাকিয়ে কবি নিজের মনে বলল, 'আমি কি জানতাম, উঃ যদি জানতাম একটি মাতাল আমার স্বামী।'

আর তাদের আড্ডায় বসে কবি প্রথম যেদিন স্বামীর মুখে খারাপ গন্ধটা পেয়েছিল তার পর থেকে কাল পর্যন্ত প্রতি রাত্রের ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখছিল আর মনে মনে শিউরে উঠছিল। "বৌদির খেলায় মন নেই।' মিহির বলছিল। "শরীরটা বোধকরি ভাল নেই কবির।' নলদ বলছিল। বড় জা ছবি তখন বলেছে! 'থাক আর খেলে কাজ নেই - তোমার যখন মাথা ধরেছে একটু চুপচাপ শুয়ে থাকগে—' কবি আস্তে আস্তে আড্ডা থেকে সরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। লজ্জা লজ্জা। কবি কী করে তাদের বলবে কেন তার মনে অশান্তি—কোথায় তার ক্ষত।

লোকে মদ খায়, মাতাল হয়ে রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যায়, আবোল তাবোল বকে। দেখে মানুষ গালিগালাজ

করে, হাসে, কেউ বা অনুকম্পা করে লোকটার অধঃপতনের বিচিত্র সব কারণ চিন্তা করতে করতে সরে যায়। সেটা ভাল!

আর ঐ-ঘরের মাতাল?

ধীর স্থির নির্বিকার।

দিনের সমীর আর রাতের অন্ধকারের সমীর। কবি কদিন থেকে কেবল তাই ভাবছে। আশ্চর্য, কি করে এ হয়। দিনের আলোয় যে-মানুষ এমন সুস্থ, সৌম্য নির্মল—যার মুখের হাসি বলা যেতে পারে শিশুর মতো—রাতে তার এই কুৎসিত কদর্য রূপ। বিছানায় মুখ গুঁজে কবি কাঁদল। বিশ্বাস হয় কি—শিক্ষিত ধনী আভিজাত্যে ঝকঝক করছে এক পরিবারের ছেলে গভীর রাতে রোজ মাতাল হয়ে টলতে টলতে ঘরে ঢোকে? রাত বারোটা অবধি তার বাইরে কাটে?

মাথা ধরার ছল করে কবি খেতে গেল না। অনেক রাত্রে ফেরে বলে সমীরের ভাত এ-ঘরে টেবিলে এনে ঢেকে রাখা হয়। ভাত রেখে যি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে কবি উঠে বসল। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে। বস্তুত যদি এখন কেউ কবির চোখ মুখের দিকে তাকাত ভয় পেত। একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য। তাই। কবি প্রতিজ্ঞা করেছে আজ একটা চূড়ান্ত কিছু সে করবে। স্বামী ঘরে ঢুকলে সে শক্ত শাশুড়ি বা ননদ দেওরদের এ ঘরে ডেকে আনবে। আপনারা দেখুন—তোমরা দেখ, চিনে রাখ বাড়ির ভাল ছেলেকে। দিনের বেলায় যে এত ভদ্র বিনয়ী প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন রাত্রে সে কতটা উচ্ছৃঙ্খল অসভ্য হতে পারে।

কবির কেবলই মনে পড়ছে আমতার হোটেলের কথা। শান্ত নিরুপদ্রব শুচি-স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর জীবন। নীহার দি, রেণু, পূরবী, শোভনা। তোমরা দেখে যাও আমার জীবন কতগুলি এক ভণ্ড কাপুরুষকে নিয়ে কাটছে। মনের গন্ধ মুখে নিয়ে সমীর যতদিন কবিকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে কবি বিছানার পাশে সরে গেছে। বারান্দাবাড়ি দেওয়ালে খাট থেকে নেমে মেঝের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ঘরের আবিল বাতাস থেকে ও মুক্ত হতে পারেনি। বিশ্রী বাতাস নাকে না ঢোকে এভাবে প্রায় দম বন্ধ করে সে কোনোমতে রাত কাটিয়েছে। তারপর ভাল করে রাত ভোর হবার আগে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ননদ ও মা ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে বলে, 'কবির ঘুম কম। এত কম ঘুম যে মনে হয় কবি বুঝি বুড়িয়ে গেছে। ওদিকে তো কত রাতে ঘুমোয়, কত রাতে ঠাকুরপো ঘরে ফেরে।'

শুনে চুপ করে থাকে কবি। তাদের কথার উত্তর দেয় না।

কিন্তু আজ সব কথার উত্তর দেবে সে, আজ সবাইকে বলবার সময় এসেছে।

দেয়ালে পিঠ রেখে কবি রাতের প্রহর গুনছে। এগারোটা বাজল বারোটা বাজল। ঘুমে বাড়ি অসাড় হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কবি একটু সময় তার ঘরদোর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার রেলিং এর ফাঁক দিয়ে এক ফালি তারা দেখল। কালো আকাশে এক ফালি বুঁই ফুল ছড়িয়ে আছে।

তিন তলায় কবির ঘর।

কবির ঘরের ওপর বাড়ির ছাদ, আকাশ।

সুতরাং অনেক রাতে ছাদে ওঠার সুবিধা তার আছে।

চৌকাঠ পার হয়ে সে বারান্দায় এল, তারপর সরু ছোট সিঁড়ির প্যাসেজ ধরে ওপরে উঠে গেল।

মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস। বুক ভরে কবি নিঃশ্বাস নিতে পারল। রাত্রির স্নিগ্ধ শীতল আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নিজেকে সে বড় পবিত্র শুদ্ধ, মনে করতে লাগল। এখন থেকে এখানে এসে সে রাত কাটাবে। পূর্ব আকাশ ফরসা হবার আগে নিচে নেমে গেলে চলবে। একটা বড়

আলসে পেল ও। এসব ভেবে ছাদের আদিনা ঘরে কতক্ষণ ও দাঁড়িয়ে কাটাল বুঝল না। যেন সময় জান ছিল না তার। এক সময় চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল, পা দুটো টনটন করছে—চুপ চুপ আলস্য এসে ভর করছে শরীরে। রাস্তার ওপারে গাছের মাথায়, একটা পাখি ডানা ঝাপটায় কবি শুনল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কবির মনে হ'ল সমীর ঘরে ফেরেনি—হ্যাঁ, রাত দুটো বাজবে এখন—রাত দুটোয় যে লোক ঘরে না ফেরে সেই লোক রাত তিনটেয় ফিরবে তার নিশ্চয়তা কি। তিনটে চারটে—পাঁচটা—সকাল। রোদ উঠেছে। রোদ মাথায় নিয়ে লাল চোখ বিস্রস্ত বসন উল্লম্বল মাতাল ঘরে ফিরছে। ভাল, ভাল বাড়ির সবাই দিনের আলোয় মাতালের ঘরে ফেরা দেখ। দেখে চিনে রাখ তোমাদের ভদ্র অমায়িক শিক্ষিত রুচিবান সমীরকে। যেন অস্থির উত্তেজনা বুকে নিয়ে কবি সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। তাকে আর কিছু বলতে হবে না। সমীর নিজেই তার পরিচয় দিতে বাইরে রাত কাটিয়ে সকালে বাড়ি ফিরছে। পাপ কখনো চাপা থাকে।

ঘরে ঢুকে কবি আলো জ্বালল। দৃশ্যটা দেখে প্রথম ও খুব চমকে উঠল। তারপর সামলে নিল। তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মানুষটাকে। মুখ কাত করে মেঝের ওপর পড়ে আছে। যেন বাইরে কোথাও পড়ে গিয়েছিল। পেন্টুলনে কাদার দাগ। এক পায়ের জুতো খোলা হয়েছে আর এক পায়ের জুতো খোলা হয়নি। যেন জুতো খুলতে খুলতে এক সময় মেঝের চলে পড়েছে। পাট করা চুল এলোমেলো হয়ে আছে। মাতাল ঘুমোচ্ছে। শাস প্রশ্বাসের গাঢ় মন্থর শব্দ কবি শুনতে পাচ্ছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল ও অচেতন ঘুমন্ত মুখটা। দিনের বেলায় যে-মুখ শিশুর মুখের মতো সরল মনে হয় এখনও তাই মনে হচ্ছে। নিষ্পাপ নির্লিপ্ত শান্ত করুণ। দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন কী হল কবির। ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে মুখটা ওই মুখের কাছে নিয়ে যায়। তারপর সাপ দেখে মানুষ যেমন চমকে ওঠে আঁৎকে ওঠে কবির অবস্থা তাই হল। পেন্টুলনের পকেট থেকে একটা শিশি উঁকি দিয়ে আছে। কবি উবু হয়ে বসে অপলক চোখে শিশিটা দেখতে লাগল। তারপর প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে শিশিটা সে তুলে আনল। গায়ের লেবেল দেখে কবির বুঝতে কষ্ট হল না। শিশিটা নামিয়ে রাখল মেঝের ওপর। উঠে দাঁড়াল ও। আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বারান্দায়—বারান্দা ছেড়ে সোজা আবার ছাদে উঠে এল ও।

ভাল ভাল। কবি ভাবে। যে-ভাবে পড়ে আছে মাতাল সেভাবে থাক। শিশিটা ওখানে থাক। সকালে বাড়ির লোক এসে দেখুক তাদের সোনার ছেলে এখন কেবল বাইরে থেকে মদ খেয়ে ঘরে ফেরে না, ওসব জিনিস ঘরে আনতে আরম্ভ করেছে।

দুঃসহ জ্বালায় কবির আত্মা পুড়ে যেতে লাগল। তার ইচ্ছা করছিল ছাদ থেকে নিচে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে এই জীবন শেষ করে দেয়। কিন্তু তা তো আর পারবে না। পারে না বলে কবি কাঁদতে লাগল। আবার কতক্ষণ এভাবে কাটে খেয়াল থাকে না ওর। খেয়াল হল রাস্তার পাশের গাছের মাথায় পাখির কাকলী শুনে। চোখ তুলে তাকায় ও। যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। পূর্বের আকাশের অন্ধকার পাতলা হয়ে গেছে। ভোর হবে। এখনি রাত পোহাবে। রাত পোহাবার আনন্দে পাখিরা ডাকছে।

কবি উঠে দাঁড়ায়। তারপর ব্রস্ত দ্রুত পায়ে নিচে নেমে ঘরে ঢোকে। আলোটা তেমনি জ্বলছে। দরজার পাল্লা দুটো তেমনি হাঁ-খোলা হয়ে আছে। মাতাল এক মনে ঘুমোচ্ছে ও মনের শিশিটা কবি যেভাবে রেখে গেছে সেভাবে আছে। দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে কবি আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। পা দুটো ক্লান্ত। তাই

টেবিলে শরীরের ভর রেখে চিত্রার্পিতের মতো ও দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝি বাইরের আকাশের সবটুকু অন্ধকার মুছে গিয়ে রোদ ওঠা পর্যন্ত কবি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু তাকি আর হয়। হঠাৎ চমকে উঠল দোতালা ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনে। আর সেই মুহূর্তে কবি কি যে করল ও নিজেই বুঝতে পারল না। চট্ করে মেঝে থেকে শিশিটা তুলে নিয়ে টেবিলের টানার মধ্যে ঢোকায়। তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে সমীরকে জাগিয়ে দেয়। 'এই, বিছানায় উঠে শোও।' কবি টান মেরে তুতোটা খুলে ফেলে তারপর মাতালকে টেনে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। দোতালার সিঁড়ি বেয়ে নখটা তেতালায় উঠে এল। এসে কবির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল: 'হ্যাঁ রে, ছোট, তোর ঘরে যেন আলো জ্বলছিল, তুই কি বাথরুমে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ দিদি,' ভিতর থেকে কবি বলল, 'কটা বাজে?'

'তোর হয়ে গেছে।' কবি বাইরে থেকে উত্তর দেয় তারপর যেন আবার আস্তে আস্তে নিচে নেমে যায়। কবি কান খাড়া করে রাখে।

সেদিনই দুপুরে কবি তার সবুজ প্যাডের ঝরঝরে পাতা ভরে আমেরিকার নীহাররিকে চিঠি লিখতে বসল: 'লোকে মদ খায়, নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। আমি কিসের নেশায় বুঁদ হয়ে আছি তোমরা জান নীহাররি? ভালবাসার নেশা পালিশের নেশা, প্রেমিকের সোনালী মনের মধ্যে আমি ডুব দিয়ে আছি……'

কিন্তু সেই চিঠি কি কবি তাকে কেলতে পেরেছিল। পারেনি। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর ও বিছানা নিয়েছে। সারাদিন আর উঠল না। নখন ডেকে গেল, বড় মা ডেকে গেল। 'শরীর ভাল নয় আর জ্বর করছে।' বলে ও ওদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একলা ঘরের বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে কেঁদেছে।

সন্ধ্যার দিকে সমীর ঘরে ফিরল।

আজ, আর তার বাইরে থাকার দরকার নেই। আজ তার কামা বন্ধ টেবিলের টানার অপেক্ষা করছে। বুঝল কবি। চুপ করে রইল।

'কি হয়েছে তোমার?'

'কিছু হয়নি।' কবি বালিশ থেকে মুখ তুলল না।

'শরীর খারাপ?' সমীর বিছানা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

কবি নিরুত্তর।

'কি একটা বার করল সমীর পকেট থেকে।

'তোমার হাতটা দাও।'

কবি বাঁ হাত বাড়িয়ে দেয়।

নীল পাথর বসানো সুন্দর আংটিটা সমীর স্ত্রীর আঙুলে পরিয়ে দেয়। কবি অবাক চোখে তাকিয়ে নতুন আংটি দেখে। তারপর স্বামীর চোখে চোখ রাখে।

'হঠাৎ আংটি উপহার!'

'তোমার পুরস্কার।' সমীর ফীণ হাসল। 'আজ ভোরবেলায় যে-বিপদ থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়েছ। ইস্ যদি ওটা লুকিয়ে না রাখতে আর আমাকে বিছানায় তুলে না দিতে—বৌদি দেখতে পেলে কী বিশ্রী ব্যাপার হত।'

কথা বলে না কবি। তার দু চোখ বেয়ে আবার জলের ধারা নামে।

'কাঁদছ কেন?' সমীর স্ত্রীর মাথায় হাত রাখে।

কবি হাতের মধ্যে মুখ লুকায়। সমীর অবস্থিবোধ করে।

'কি হল, কাঁদছ কেন—কিসের দুঃখ তোমার!'

'দুঃখ না সুখ,—নতুন আংটি পরার সুখ পেয়ে কাঁদছি।' ধরধরে গলা কবির। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকে।

হাসতে গিয়ে সমীর মুখ বিকৃত করে।

'কি জানি বাবা! তোমাদের মেয়েদের মন বোঝা বড় শক্ত—আমি ত বুঝি নে।'

প্রশ্ন ?

নরেন্দ্র দেব

একটি আকাশ, ছোট্ট নেহাৎ ;
এক নজরেই ফুরিয়ে যায়।
দিগন্তরে দৃষ্টি অচল,
যতই না কেউ দেখতে চায়।

কেমন করে এক আকাশেই
চন্দ্র সূর্য করছে বাস ?
দিনের শেষে রাত্রি এসে
আলোয় কেন করছে গ্রাস ?

একটি হৃদয়, ছোট্ট হৃদয় ;
তার ভিতরেই কেমন করে ?
প্রেমের পাশে ঘৃণাও এসে
আসন পাতে কিসের জোরে ?

শত্রু মিত্র দুই পক্ষই
এক বুকেতে আছেন দেখি।
যায়না চেনা এ সংসারে
আসল কেবা ? কেইবা মেকি ?

একটি গোলাপ, ছোট্ট সে ফুল ;
অমল গন্ধ কোমল গায়,
তার বোঁটাতেও তীক্ষ্ণ কাঁটা
কেমন করে ফুটতে পায় ?

জন্ম, মৃত্যু, দিব্য থাকে
এক দেহেতেই দু'জন সদা,
যে হাতে তার পুষ্প-ধনু,
সেই মুঠিতেই যমের গদা।

কণ্ঠ একক, কিন্তু সেথায়
বাস করে' তো সাতটি সুরে !
মানুষ কেন পারছে না তা ?
পরস্পরে রাখছে দূরে।

কবিতা

সর্বার্থ-সাধনা

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুচ্ছ কলকোলাহল বণিকে বণিকে,
ধনিকে ধনিকে স্বার্থ-সংঘাতের হীন হানাহানি ;
বিশ্বার আতসবাজি আড্ডা ও মজলিশে
বুদ্ধির চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গের বৃথা অপচয়।
ধর্মের মুখোস পরা নীতিবাক্য বিশারদ জন
পরদুঃখে সকাতর অশ্রুসিক্ত নয়নের কোণে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সন্ধানী আলোক
আত্মস্বার্থ সাধনের গোপন প্রস্তুতি।
অথচ কাছারী ঘরে সদাব্যস্ত দয়াময় প্রভু
সদাব্রত দান ধ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি ;
লোকে বলে বাহোবা বাহোবা।
কালাকাল ভেদ নাই,
আধার ও আধেয়ের নাহিক বিচার ;
ভোগাবর্তে মজ্জমান নারীমেধ যজ্ঞেশ্বর এঁরা
এঁরাই সমাজপতি, লিপিকার অনুশাসনের।

সত্য-মিথ্যা একাকার
পাপ পুণ্যে সমজ্ঞান অঘোর পন্থীরা
ভৈরবী চক্রের গুরু সেরুয়া-বিলাসী
সংসার শ্মশান ঘাটে ব্যানী অবধূত।

এ ভৈরবী চক্র হতে যারা অতি দূরে
শুভ কর্মপথে চায় সবার কল্যাণ
বৃহতের কল্পনার ধ্যানে ধারণায়
মহতের মহিমারে ধরিবারে চায়—
দেহের আধার হতে আত্মরতি দিয়া বিসর্জন
দূর করি সাধনার পথের কণ্টক,
আত্মার ব্যাহৃতি মন্ত্র জপি' নিশিদিন
ঋদ্ধি আনিবারে চায় স্থিতপ্রাজ্ঞ তারা
কঠোর তাদের ব্রত, সুকঠোর ব্রত উদ্‌যাপন,
নির্বিঘ্ন নহেক কভু এ ধরাট সাধনার পথ।
তবু জানি একদিন সহর্ষিত অভীষ্ট সিদ্ধির
আনন্দ বিলাবে তারা কৃতাঞ্জলি ভরি'
অমৃতে বঞ্চিত যারা অভিশপ্ত আমাদের ঘরে।

স্বীকারোক্তি

গোপাল ভৌমিক

একেবারে মন্দ তো নয়
বেশ কিছুদিন গেল পৃথিবীতে
ধরা-ধরা গরম এবং শীতে,
কিছুটা সুখ, বেশিটাই অসুখে।
আজকে যদি বলতে পারি
এই বুকে তাল ঠুকে,
আছি ভাল, থাকতেও চাই,
পাত্রাপাত্র ভেদ কিছু নাই,
আমার চোখে পৃথিবীটাই
অনেক মায়ায় ভরা :
ফুল শয্যা রাতের বধূ
অনেক করে যায় না বাকে ধরা।

অনেক দিনের পরিচিতা,
মনে পড়ে অনেক রকম রূপ
ভিন্ন ভিন্ন চোখে দেখা :
হৃদয় তবু নীরব নিশ্চুপ।
যা পেয়েছে সেটা নিয়ে
আপশোষ তার হয়তো কিছু নেই :
কিন্তু যদি খুঁজে না পায়
আসছে দিনের খেই ;

অতীত নিয়ে খেলতে গিয়ে শুধু
হতাশ হয়ে পড়ে,
মরণ তবে সুনিশ্চিত
শঙ্কা ব্যাকুল বড়ে।

কি আর পাবো নতুন করে,
শোক বা সুখের আশা
মন্থরিত হয় কি মনে
মরলে প্রেমের ভাষা ?
তারও পরে জীবন থাকে
কাঁধের জোয়াল টেনে
অভ্যাসে যার চলাফেরা
অনেক বাঁধন এবং আগল মেনে।
পরিচিতা এ পৃথিবী
যদি বা হয় বাসি ফুলের মালা,
বাতিল হয়ে যাবার আগে
একটু কাঁক, একটুখানি জ্বালা
না দিয়েই সে হারায় যদি মোহ,
ভাগ্যে তবে নেহাৎ উপবাস :
নিরর্থক দুখে সুখ,
জীবনটা এক ব্যর্থ পরিহাস।

মল্লিকা : গল্প

সুশীল রায়

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—দূরে, ঐ মাঠের ওপারে, রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছে দলবেঁধে। বাঁশের ভেরা বেঁধে নিয়েছে ওরা, কেমন অনায়াসে তারা নীচে থেকে উঠে যাচ্ছে অনেক উঁচুতে। মাথায় উপরে ইটের পাঁজা চাপিয়ে নিয়ে কেমন সহজে উঠে যাচ্ছে যোগানদারেরা একে একে।

সরু ছড়-ওলা বুড়ো মিস্ত্রিটা হাতুড়ি দিয়ে কি-যেন পিটছে, দেখা যাচ্ছেনা এখান থেকে কিন্তু শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে ঠিক। ওঃ, একটা তক্তার পেরেক ঠুকে নিচ্ছে বুঝি! ও ঠুকছে, হাতুড়িটা উঠছে-নামছে; কিন্তু শব্দটা এখানে এসে পৌঁছচ্ছে কেমন এলোমেলো ভাবে। দেখা গেল, শেষ ঘা দেওয়া ওর হয়ে গেল, কিন্তু শব্দটা এলো তার কত পরে।

মাঠে বল্ পেটা দেখেছিল সে। সে হল অনেক দিন আগের কথা। বাবার হাত ধরে বেড়াতে যেত রোজ পদ্মার ধারে। এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের উপরে হেঁটে হেঁটে বেড়াতেন তার বাবা, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটত সেও। এক দিকে দেখা যেত পদ্মার ঘোলাজল, অন্যদিকে সবুজ মাঠ। পদ্মার সব হাওয়া এই এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টটা পার হয়ে গিয়ে যেন নামত ঐ মাঠে। এই বাঁধটা দিয়ে জল না হয় আটকানো গিয়েছে, কিন্তু হাওয়া আটকানো যায়নি।

মাঠে বল্ পিটত যারা তাদের গায়ের জামা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠত। মনে হত যেন ঝুরে-ঝুরে নৌকোর পাল তুলে দেওয়া হয়েছে; সেই নৌকোগুলি যেন সবুজ মাঠের মধ্যে হাওয়ার দাপটে এলোমেলো ভাবে ওলোট-পালোট করছে।

দেখা যেত, ছুটোছুটি করতে করতে ওরা বল্ পিটছে, পেটাটা দেখা যেত স্পষ্ট, কিন্তু শব্দটা আসতে দেরি হত অনেক।

কিছুই বুঝতে পারতনা মল্লিকা। কেন এমন হবে। এ কি তার বোঝার ভুল, না এ তার দেখার ভুল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে, বাবা বুঝিয়ে বলেছেন—আলোর গতি আর শব্দের গতি নিয়ে তিনি অনেক উপমা আর উদাহরণ দিয়েছেন; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি মল্লিকা।

সেই শিশুকাল, সেই জীবন, এবং সেই পদ্মা বহু দূরে সরে গিয়ে এখন একেবারে বুঝি মিথ্যেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, সেই আলোর গতি আর সেই শব্দের গতি এখনো বুঝি আছে অবিকল—

কথাটা মনে হতেই মল্লিকা বুঝি একটু চঞ্চল হল। জানলা থেকে সরিয়ে নিল তার চোখ। স্নেহ বন্ধ করল।

বাঁধ দিয়ে জল আটকানো যায়, কিন্তু হাওয়া? অবিকল ভাবে আবার মনে পড়ল ঐ কথাটা। চোখ বন্ধ করল সে, কিন্তু চোখের পাতাদিয়ে সব আটকানো গেল না তো। তার কানের মধ্যে বুঝি ছলছল-কলকল শব্দে বেজে উঠল পদ্মার স্রোতের সেই জলতরঙ্গ। আর, সেই সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড মাঠের হু-হু-হাওয়ার শব্দ। দুপুরটা যেন কাটে না। এই চৌকি, এই বিছানা, এই বালিশ, এই চাদর, আর এই স্বজনি—সব বিষাদ আর সব বিশ্রী লাগে তার।

সবই কেমন অবিকল আগের মতই আছে। এক মাস বয়স হল মল্লিকার।

আজ দুপুরটা তবু এক রকম কাটল। কিন্তু রোজ তো আর কাজ হয় না মাঠের ওপারে। ভিত গাঁথা হয়ে পড়ে ছিল বাড়িটা অনেক দিন হল। এই, ক-দিন হল আবার মিস্ত্রি লেগেছে। তার মধ্যে আজই একটু ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে কাজের।

রোজ দেখতে হয় ঐ মাঠ, ঐ তাল আর নারিকেল গাছ, ঐ নিমের পাতার উপর হাওয়ার মাতামাতি। ঐ গাছগুলো বাড়েও না, ঘাটোও হয় না। ওদের শরীরও কেমন অবিকল আছে।

একঘেয়ে হয়ে গেছে জীবনটা। এমন জীবন বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ?

পা-দুটো বাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে মল্লিকা। কিন্তু তার সারা শরীরের বাঁকি পা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় না। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত কেবল দুলে ওঠে।

একেবারে বিকল হয়ে গেছে মল্লিকা।

জানলার পাট-দুটো শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে বালিশের উপর উপুড় হয়ে পড়তে গিয়েই চমকে ওঠে।

কড়া নাড়ার শব্দ যেন।

কানদেতে পৌঁনে। আবার জেগে ওঠে কড়া।

দরজার ওপাশ দিয়ে কোনো রকমে আবার জানলার পাট ঈষৎ করে জিজ্ঞাসা করে, কে?

দরজার ওপাশ থেকে জুতো-পরা পায়ের শব্দ সরে এল জানলার কাছে।

আয়তনের মুখের দিকে তাকাল মল্লিকা। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

নিজের পরিচয় নিজেকেই অসত্য দিতে হল, লোকটি বলল, চিনতে পারেন নি নিশ্চয়? তা, চিনবেন কী করে। কত বদলে গিয়েছি। কত রোগা ছিলাম, কত মোটা হয়েছি। আমাকে চিনতে পারেন নি, কিন্তু আমি আপনাকে চিনেছি মল্লিকাদি, আপনি আছেন ঠিক আগেরই মত, একেবারে অবিকল আগের সেই মুখ।

মুখে বুঝি একটু হাসিই ফুটে উঠল মল্লিকার, বলল, কে তুমি? জনার্দন?

জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে জনার্দন জুতোয় একটু শব্দ করল, বলল, হাঁ। চিনেছেন তাহলে।

—কদিন বাদে দেখা হল?

জনার্দন বুঝি হিসেব করতে লাগল। হিসেব করতে লাগল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হয়তো আশ্চর্যও হতে লাগল। জানলার ওপারে আরামে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে কথা বলে চলেছেন মল্লিকাদি, একবার ভিতরে আসতেও বলছেন না, দরজা খুলে দেবার জন্যেও যেন কোনো ব্যস্ততা নেই তাঁর।

জনার্দন বলল, বিফটিন সিক্সটিন ইয়ার্স, তা হবে, কি বলুন।

—বেশিও হতে পারে, সতেরো-আঠারো বছরও হতে পারে। তা, তুমি অমন ভিন-কোণা দাড়ি রেখেছ কেন, জনার্দন।

ট্রাউজারের দুই পকেটে দুই হাত চালিয়ে দিয়ে সারা শরীরে যেন-জোর দিতে লাগল জনার্দন। হাসতে হাসতে বলল, কেউ যা-তে চট করে চিনতে না পারে।

—চিনলে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি নেই? ভীষণ ক্ষতি, অনেক ক্ষতি। তা হলেই দরজা খুলে দিতে হয়। ভিতরে এসে বসতে বলতে হয়।

ম্লান হাসল মল্লিকা, হেসে বলল, সুন্দর কথা বলতে শিখেছ দেখছি। আমাদের সেই বকুনিটির জন্য, সে কি না—

জনার্দন বাধা দিয়ে উঠল, বলল, সে আর সে জন নেই, সে এখন মস্ত বড় এক জন।

মল্লিকা ওর কথা শুনে হাসল, বলল, কী করছ এখন ?

—এখন ? এখন দাঁড়িয়ে আছি মল্লিকাদির দরজায়, মানে, জানলায়। আমাদের রাণীবাজারের ফুটফুটে যে মল্লিকাদি প্রাচীরের উপর দিয়ে আমাদের চুপ করে আমের আচার দিয়েছে কতদিন, আজ সে জানলার ওপার থেকে—

—জনার্দন।

হঠাৎ গলার স্বরে অস্বাভাবিক শব্দ শুনে জনার্দন একটু ঝুঁকে দাঁড়াল, বলল, কি মল্লিকাদি ?

—কোথায় থাক তুমি এখন ?

—আসানসোলে।

যে-প্রশ্ন করল মল্লিকা তার কি উত্তর জনার্দন দিচ্ছে, তা বুঝি শুনলই না সে। অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, আমি অনেক বদলে গিয়েছি, রাণীবাজারের সে-মল্লিকাদি নেই, তাই না ?

সমস্ত শরীরে ঝাঁকি দিয়ে যেন প্রতিবাদ করে উঠল জনার্দন, বলল, উঁহুঁ, উঁহুঁ, উঁহু। তা বলি নি। অবিকল আগের মতই আছেন আপনি। তা না হলে এতদিন বাদে চট করে কখনো চিনতে পারি ?

—ঠিক। একটু দাঁড়াও। বিকে ডাকি। দরজা খুলে দেবে। ও-ঘরে সে এখন ঘুমচ্ছে অকাতরে।

মল্লিকা ডাকতে লাগল, বিমলা, ও বিমলা। বেলা যে গেল, উঠে এসো। দরজা খুলে দাও।

বড় অস্বাভাবিক আর বড়ই আশ্চর্য লাগতে লাগল জনার্দনের। মনে পড়ল তার সেই গল্পটা। সেই জমিদার-গিন্নির গল্প। পানের বাটা সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছেন তিনি; হাত-দুই ঘুরে গড়াচ্ছে জরদার কৌটো। সেইটে ওঁর কাছে এগিয়ে দেবার জন্যে তিনি থেকে-থেকে ডেকে ডেকে উঠছেন—ওরে চাপা, চাপা রে। পাঁচমহলা-বাড়ির অন্য প্রান্তে হয়তো সেই দাসী অন্য কাজে ব্যস্ত। তার কাছে খবর গিয়ে পৌঁছল—যেমনা ডেকে-ডেকে যে গলা ভেঙে ফেলল চাপি, শিগগির যা। খবর পেয়ে হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল চাপা—কি মা। যেমনা বললেন, কৌটোটা এগিয়ে দে তো বাছা।

চোখে জল নিয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে বিমলা। মল্লিকা বলল, দরজাটা খুলে দে।

ঘরে ঢুকেই জনার্দন একটু থমকে দাঁড়াল, মল্লিকাদির আপাদমস্তকে বুঝি চোখ বুলিয়ে নিয়েছে সে এক নিমেষে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বসতে বসতে বলল, সরি।

মল্লিকা বুঝল, একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, হঠাৎ অমন দুঃখিত হবার হেতু।

মাথা নীচু করে বসে জনার্দন বলল, না। কিছু না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দুইজনে। অবশেষে মল্লিকাই কথা বলল, বলল, কত-কীই হয়তো ভাবছিলে আমার সম্বন্ধে।

মাথা নোয়াতে লাগল জনার্দন, বলল, উঁহুঁ, উঁহু। কিছু ভাবি নি।

—তাহলে অবিকল আগের মতই আমি আছি, তাই না ?

এ কথার কোনো উত্তর দিল না জনার্দন। মাথা নীচু করে বসে সে বুঝি ভাবতে লাগল সেই দেশটার কথা—যে-দেশে বড়কুঠি আছে, রাণীবাজার আছে, ঘোড়দৌড় আছে, মালোপাড়া আছে, গঙ্গা আছে, গঙ্গার এবব্যাঙ্কমেন্ট আছে।

সোজা হয়ে বসল জনার্দন, জিজ্ঞাসা করল, তারকদার কিন্তুতে সেই বুঝি সত্যি ?

—ঠিক নেই কিছু। মাঝে-মাঝে একটু দেরিও হয়।

মাস-তিন আগে তারকদা গিয়েছিল আসানসোলে। সেখানে জনার্দনের-সঙ্গে দেখা হয়। তখনই ঠিকানা নিয়ে নেয় জনার্দন। আগেও কতবার সে এসেছে কলকাতায়, কিন্তু ঠিকানাপত্র না জানায়—

মল্লিকা বলল, খুব খুশি হবেন তোমার দাদা।

আর আশ্চর্য হচ্ছে না জনার্দন। কেবল ভাবছে কী করে অবশ হয়ে গেল মল্লিকাদির ঐ পা-দুটো? পায়ের পাতা দুটো দেখা যাচ্ছে—কেমন যেন রং চটা আর কেমন রোগা হয়ে গিয়েছে।

এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে কত দিকে কত বদল হয়ে গেল। বদল মানেই অবশ্য বিকল নয়, কত দিকে কত উন্নতিও ঘটেছে। কিন্তু এতদিন পরে রাণীবাজারের সেই মল্লিকাদির সঙ্গে দেখা করতে এসে জনার্দনের মনও কেমন যেন বিকল হয়ে গেল।

বলল, মনে আছে মল্লিকাদি, ভয়-গুপুরে আমরা গিয়ে হাবলা করতাম তোমাদের বাড়িতে। তুমি তোমাদের উঠোনের কুলগাছের ডালের উপর পা রেখে প্রাচীরের উপর দিয়ে আমাদের হাতে দিতে—

—মনে আছে।

—তোমার সেই পিসিমা বেঁচে আছেন? তাঁকে আমরা কী ভীষণ ভয়ই করতাম।

—মনে আছে। তিনি বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে বুঝি ভালো হত।

হাওড়া স্টেশনে নেমে সোজা চলে এসেছে জনার্দন মল্লিকাদির। দেখতে বেশ বড়সড় হয়েছে সে, সত্যিই যেন মস্ত বড় এক জনা হয়েছে জনার্দন।

বিমলাকে ডেকে তার খাবার ব্যবস্থা করতে বলল মল্লিকা। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে উঠল জনার্দন। বলতে লাগল যে, ব্যস্ত হবার কিছু নেইকো, অত তাড়াহুড়ো করার আছে কি।

মল্লিকা হেসে উঠল, বলল, তুমি তো বেশ ভদ্র হয়েছ এখন জনা। হাবলা করে যার কাছ থেকে খাবার আদায় করতে একদিন, আজ তার কাছে বসে খুব ভদ্রতা করা হচ্ছে দেখছি! সত্যি, সব বদলে গেছে চারদিকে। এমনকি, মানুষগুলোও যেন আগের মত নেই। এমন কেন হয় জনার্দন।

কী করে সে বলবে কেন এমন হয়। চোখের আড় হলেই মনের বা'র হয়ে যায় মানুষ—এর তো দুনিয়ুদ্ধি দৃষ্টান্ত আছে। আসানসোলে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তারকদার সঙ্গে, তাঁকে দেখেই জনার্দন উল্লাসে যেন আত্মহারা হয়ে ছুটে গেল তাঁর কাছে। তার ধারণা ছিল, এতদিন বাদে তাদের সেই বড়মুটির ঘন্টি ছেলে-টাকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরবেন বুঝি তারকদা। কিন্তু তিনি তেমন আগ্রহ দেখালেন না, শুধু বললেন, কীরে মস্ত বড় হয়ে গেছিস্, কি করছিস্ এখন?

জনার্দন বলল, আর্টিস্ট হয়েছি।

—তা তো হয়েছিস্। কিন্তু করিস্ কি?

—ছবি আঁকি।

জনার্দনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে তারকদা বললেন, বটে? চেহারা দেখে তো ভেবেছিলাম বুঝি নেভিতে ঢুকেছিস্ নাবিক হয়েছিস্।

গল্প শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল মল্লিকা, বলল, ঠিক। কি যেন নাম ঐ সিগারেটের? তোমার দাদা মাঝে মাঝে খায়। তার প্যাকেটের উপর অবিকল তোমার চেহারার ছবি আছে।

হাসতে লাগল জনার্দনও।

হাসি থামতে না থামতেই বিমলা খাবার নিয়ে এল ট্রেতে সাজিয়ে।

চমকে সেদিকে তাকিয়ে জনার্দন মল্লিকাদির মুখের দিকে চাইল। বলল, সব বদল হয়ে গেছে। যার হাত থেকে একদিন আচার কেড়ে খেয়েছি, তার বাড়িতে এসে খাব কোরো মল্লিকাদি' এই হালচাল দেখে আর আহাড় খেলাম।

—তার মানে?

—তার মানে এই ট্রে। এসব কি আমাদের পোষায়? আমরা মাঠ-ঘাট বনবাদাড়ের লোক। এক থালা ভাত বেড়ে দিলে উপুড় হয়ে বসে পেটপ্রাণে সিলে নিতে পারি।

—কিন্তু তুমি তো মস্ত সায়েব জনার্দন।

নিজের সর্বাঙ্গে বুঝি চোখ বুলিয়ে নিল জনার্দন। বলল, মানুষের পোষাক দেখে তাকে চিনতে ভুল কোরো না মল্লিকাদি। আমি সেই জনার্দনই আছি' বড়কুঠির সেই দস্যি জনা।

দোকানের খাবার কিনে এনে দিয়েছে বিমলা। এতে সময় বেঁচেছে, পরিশ্রম বেঁচেছে। সবই ঠিক। এবং নিজের মুখে খাবারও পেয়ে গিয়েছে তাদের এই অতিথি। কিন্তু যে আশা ও যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিল জনার্দন তার বুঝি পূরণ হল না। সে এসেছিল রাণীবাজারের সেই ফুটফুটে মল্লিকাদির কাছে তার হাত থেকে কিছু কেড়ে খাবার জন্যে, তার সে ইচ্ছা বুঝি কেড়ে নেওয়া হল তার কাছ থেকে।

সময় কাটছে ধীরে ধীরে। বিকেল এসে পৌছল মল্লিকাদের বাড়ির উঠোনে। মাঠের ওপারে রাজমিস্ত্রিদের হাতুড়ির শব্দ গিয়েছে থেমে। তাল আর নারকেল গাছেদের লম্বা শরীর বেয়ে রোদ এখন উঠে গেছে তাদের মাথার উপর। সামনের ঐ মাঠটায় এসে নেমেছে পাড়ার বাচ্চা খেলোয়াড়েরা। তারা এখন বল্ পিটবে।

আজ দুপুরটা বড় ভালো কাটল মল্লিকার। অন্য দিন সময় কাটে না কিছুতে, আজ সেই সময়ই যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড় দিতে আরম্ভ করেছে।

মল্লিকার সঙ্গে দেশের কথা দশের কথা নিয়ে অনেক গল্প করতে লাগল জনার্দন। সেইসব পুরনো দিনের কথা গুলো নতুন হয়ে ফিরে আসছে না বটে, কিন্তু তার স্বাদ বড় সুন্দর লাগছে তাদের। যেন ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে সেই এমব্যাঙ্কমেন্টের উপর। সেখানে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিতে ইচ্ছে করছে পদ্মার সেই অফুরন্ত হাওয়া।

মল্লিকা বলল, তুমি আর্টিস্ট। আমার একটা ছবি তুমি আঁক, জনার্দন।

—আঁকব।

সংক্ষেপে ঐ সম্মতিটুকু জানিয়ে সে চুপ করে রইল। এতক্ষণে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার এখন দশা কি করে হল, বলো।

উত্তর দিল না মল্লিকা।

তাকে নিরুত্তর দেখে জনার্দন বলল, অসুখ নাহয় করেছে, কিন্তু তা সারিয়ে নিতে পারছ না?

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল কোথাও কোনো ওষুধ-পত্রের চিহ্ন নেই। এতে সে যেন একটু আশ্চর্যই হল।

—অনেক চেষ্টা হয়েছে জনার্দন, সারেনি।

—বিশ্বাস করি নে।

কিন্তু সে যদি বিশ্বাস না করে তাহলে তাকে জোর করে বিশ্বাস করাবে এমন শক্তি কোথায় মল্লিকার। তার চোখ-দুটো ছলছল করে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, চেষ্টা করলে এ কি সারে, জনার্দন?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল জনার্দন, এমন সময় দরজার ওপারে পায়ের শব্দ এসে থামল।

—তোমার তারকদা বুঝি।

উঠে গিয়ে জনার্দন দোর খুলে দাঁড়াতেই হাসল। হাসল জনা। কখন এলে?

ঘরে এসে ঢুকল তারক ব্রহ্মচারী। মাথা থেকে ছাতি টেবিলের উপর রেখে, কোট খুলে হাতায় ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি বসলেন, বললেন, তার পর—

জনার্দন বলল, সেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার পর থেকেই ভাবছি আসব-আসব।

—তার পর এলে। এসে কেমন লাগছে বল।

—বেশ। একটু হেসে জনার্দন বলল, কিন্তু মল্লিকাদির এই অবস্থা জানতাম না।

অট্টহাস্য করে উঠলেন তারক ব্রহ্মচারী। বললেন, এ আর কী দশা হে। যখন উনি পড়লেন টাইফয়েডে, তারপর যখন হল এই প্যারালিটিক অ্যাটাক—তখন যদি আসতে তাহলে দেখতে দশা কাকে বলে। এখন তো উনি অ্যাত্ত মানুষ। কিন্তু আমি আধ-মরা, আমি ক্রাচ ভাই ছেড়ে দিয়েছি হাল। বেঁচে থাকলেই হল। মানুষের একটি স্ত্রী থাকা দরকার, তা রইল আমার। বিপত্নীক আমি নই।

আবার শব্দ করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, তুমি নাকি আর্টিস্ট! তুমি নাকি ছবি আঁক? আমাদের এই সংসারের চিত্রটা তবে আঁক তো। বুঝব, তুমি বাহাদুর।

এ কথার কোনো উত্তর দিল না জনার্দন। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বলল, আপনি নাকি ক্রাচ—টারার্ড। যদি বলেন, আমি তার নিই।

আবার অট্টহাস্য করে উঠলেন তারক ব্রহ্মচারী, বললেন, কিসের ভার হে? তোমাদের সেই রাণীবাজারের মল্লিকাদির, না,—

বাধা দিয়ে উঠল জনার্দন বলল, না, তাঁর ভার নয়, তাঁর অসুখের।

দুই চোখে বিদ্রূপ ছুটিয়ে তুলে তারক বললেন, অসুখের ভার নেবে?

—হ্যাঁ। সারাবার ভার।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন তারক ব্রহ্মচারী, যাও, যাও, ছবি আঁক গিয়ে, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

জনার্দন বলতে গেল—আমাদের আসানসোলে আছেন এক ডাক্তার, নাম শুনে থাকবেন' তিনি এ বিষয়ে ধন্বন্তরী।

কিন্তু তার কথায় কান করলেন না তারক ব্রহ্মচারী বললেন, থাক্ থাক্।

তারকদার আচরণে বড় বিরক্তই বুঝি হল জনার্দন। হয়তো সে বলত আরো কিছুক্ষণ, কিন্তু এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, আজ তবে চলি তারকদা, চলি মল্লিকাদি:

তারকদা কথা বললেন না। বুঝি খুব ক্লান্ত তিনি, বুঝি খুব টায়ার্ড। চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন চুপ করে। তিনি তাঁর নিজের জীবনের ট্র্যাজিডির কথাই ভাবছেন, কিম্বা মল্লিকার জীবনের ট্র্যাজিডির কথাই ভাবছেন—বোঝা গেল না।

জনার্দন বলল, তাহলে চললেম তারকদা।

মল্লিকা ব্যাকুল চোখে তাকাল জনার্দনের দিকে। কি বলবে তাকে বুঝতে পারল না। একটু বসতে বলবে, না, আবার আসতে বলবে?

—চললেম মল্লিকাদি।

জনার্দন চলে গেল। তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল রাস্তার ওপারে।

এতক্ষণে চোখ খুললেন তারক ব্রহ্মচারী, যেন প্রতিধ্বনি করে উঠলেন, ধন্বন্তরী। ডাক্তুলেন।

অস্ফুট করে উঠল মল্লিকা, বলল, ডাক, ডাক একবার ওকে। কোনো ঠিকানা রাখা হল না, কিছু হল না। ডাক, ডাক লক্ষ্মীটি।

নড়েও বসলেন না তারক ব্রহ্মচারী। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে বললেন, সরল থাকে তো আবার আসবে।

তাঁর এ কথার মানে বুঝতে পারল না মল্লিকা।

গল্প

নেবরাস্কা মাউন্টেইনে পিকনিক

দীপ্তি সান্যাল

টীচার্স কলেজে পরীক্ষাটা দেবে সবে হাণ্ড্রেড এণ্ড টোয়েন্টি এখ ষ্ট্রীটে পা দিয়েছি এমন সময় বাসুদেব ছুটতে ছুটতে এল সঙ্গে ইরাণী ডাক্তার কৈজী।

"কি ব্যাপার ?"

"পরীক্ষা দেব ?"

"হ্যাঁ"

"তবে এটাতে সই কর্, ইন্টার ন্যাশনাল হাউস থেকে বেয়ার মাউন্টেনে একটা পিকনিকের এ্যারেঞ্জমেণ্ট করা হচ্ছে। আমরা সবাই যাচ্ছি।" বলে একগাদা কাগজ পত্র আমেরিকান কায়দায় সই করতে দিল—তাতে আমার বংশ পরিচয় থেকে আমার নেশা পর্য্যন্ত সমস্ত কুলুজী লিখতে হোল।—হাঁপাতে হাঁপাতে শুধালুম,—

"সবাই মানে ?"

সবাই মানে সবাই, বিমল গুপ্ত, বামাদা, তুই, আমি, নাইডু, শ্রীবাস্তব, সঞ্জয় সেন, এরা সব প্রাচ্যের, কৈজী মধ্যপ্রাচ্য, ভেসিমা সুরপ্রাচ্য, আর পাশ্চাত্যের অব্জি (পব্জি পুডিং এণ্ড পাই), অসবোর্ণ, প্যাট, জেন ইত্যাদি ইত্যাদি।—"

"বেশ।"

"নাও এখানে সই করে একটা ডলার দাও।"

"এক ডলার ?'

মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো এক্সচেঞ্জের রূপ এক ডলার ইজুয়াল টু পাঁচটাকা।

খেঁকিয়ে উঠলো বাসুদেব—"এখান থেকে টীমারে যাবে চল্লিশ মাইল। বেয়ার মাউন্টেনে নেমে পিকনিক করে আবার আসবে চল্লিশ মাইল। অথচ একটা ডলারও লাগবে না ?"

বাক্য ব্যয় না করে অগত্যা দিলুম। দিতেই হোত। বাসুদেব যদি এক ডলার না বলে দশ ডলার বলত তাহলেও দিতে হোত। বলেনি যে সে ওর কৃপা। কারণ আজ পর্য্যন্ত বাসুদেবের সঙ্গে তর্ক করে আমি জিতিনি। আর শুধু আমি কেন, তামাম ইন্টারন্যাশনাল হাউসের যাবতীয় বিশ্বছাত্রছাত্রীবৃন্দ, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, যুক্তরাষ্ট্রের বাসাড় এক আই বি—কেউ নয়। শোনা যায় ইউ এন ওর কর্তৃপক্ষ বাসুদেবের কাছে তর্কে পরাস্ত হয়েই নাকি ওকে নিউজবয়ের পোষ্টটা দিয়েছে। আর সেই থেকে বাসুদেব উপরি হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছাত্রছাত্রীবর্গের মধ্যে বিভেদ ঘোচানোর মহান কাজে লিপ্ত। রাত্রে ঘণ্টা চারেক ইউ এন ওর প্রেই বেশলাই বাস সদৃশ বাড়ীটায় কাজ সেরে এসে ও ঘুম দিত সকালে উঠতো প্রায় দশটায়। ততক্ষণে অবশ্য নিউইয়র্কের অধিকাংশ লোক দিনের অর্দ্ধেক কাজ সেরে ফেলেছে। কারণ নিউইয়র্কের সকাল পশ্চিমের অন্যান্য দেশের সহরের থেকে তাড়াতাড়ি সুরু হয়। লণ্ডনে ন'টা থেকে দিন সুরু, প্যারিসে তো এগারোটার আগে কিছুই হয় না ; কিন্তু নিউইয়র্কে আটটাতেই সকাল। যেহেতু এক ঘণ্টার অর্থ এক ডলার আর এক ডলার মানে এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে যে কি তা পূর্ব্বেই বলেছি। এক ডলারের ভারতীয় অর্থ পাঁচ

টাকা, ইংরেজী অর্থ আট শিলিং, ফরাসী অর্থ তিনশ ফ্রাঙ্ক। অতএব নিউইয়র্ক বাসিকে রাত দশটার দাপার শেষ করেই পরদিন সকালের ব্রেকফাষ্টের টেবিল সাজিয়ে রাখে। রাত্রি থাকতে দাঁড়ি কামায়। তারপর স্নান সেরে, ব্রেকফাষ্ট সিলে টিউবে মিলনস্থে মারামারি করতে করতে কর্মস্থলে পৌঁছয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু। আটটা থেকে পাঁচে যেখানে যান থাকে, দোকানে, স্কুলে সর্বত্র দেখবেন কাজ চলছে। সেখানে বাসুদেব উঠতো বেলা দশটায়। শুধু তাই নয় তখন আবার কেউ না কেউ তাকে কফি করে দিয়ে যেত। আর বাদশাহী চালে দুর্গাপিথুরী লেনের বাসুদেব হাডসন নদীর দিকে মুখ করে সুরসুরে হাওয়ায় ফ্রোকেটে কামড় দিয়ে কফিতে চুমুক দিত। এমনতর অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হোত কি করে? বলছি। এইসব খেয়ে বাসুদেব পোষাক পরে তৈরী হয়ে নিত। তারপর কফি ফ্লেট নিয়ে চলে যেত ইষ্টার ন্যাশনাল হাউসের ভূগর্ভ ভোজনাগারে। সেখানে দরকার মত আমুর খোসা ছাড়াত, গাজর কুচি কুচি করত, সেলি সুজিং বসাত ইত্যাদি। আবার এরি মধ্যে হয়তো লিফট ওয়ম্যান একটু রেষ্ট চায় তখনি ঘণ্টা দুই ধরে বাসুদেব লিফট চালাল। রিসেপসন ডেস্কের মিস কিলপ্যাট্রিক একটু বিশ্রামের সঙ্গে কোণে বাতচিত করবেন বাসুদেব অমনি কানে কলম গুঁজে তৈরী হয়ে তার মিস ডেস্কের। শোনা যায় ম্যানেজারের মিস অমলডিকে বাসুদেব একবার একটা ফুটন্ত গর্যন্ত সেলাই করে দিয়েছিল হঠাৎ কোন বিয়েতে নেমন্তন্ন পড়ায়। এত অদ্ভুত তথা কর্মঠ ব্যক্তি যে, ইষ্টার ন্যাশনাল হাউসের কর্মীরা তাকে এক কাপ কফি দিয়ে আপ্যায়িত করবে এ আর আশ্চর্য্য কি?

কলেজে যে একটা নাম সেখান ছিল না বাসুদেবের তা নয়। আজো ভিদুরাল এলুকেশনে পি এইচ ডি করছি এমনতর উক্তি তার মুখে হামেশাই শোনা যেত। কিন্তু বছরের পর বছর যাচ্ছে বাসুদেবের পরে আসা ছাত্রের দল যারা তারই কাছে ইনকরমাল্ গাইডেন্স নিত যদি ১০০ কি কোর্স টা নেয় বা ২০৮ এস্ কোর্স নেয়, প্রফেসর রায়ান বেশী মজর দেন না প্রফেসর বিশলো বেশী তারা পর্য্যন্ত পাশ করে পি এইচ ডি ডিগ্রীর জয়মাল্য নিয়ে দেশে ফিরে গেল। বাসুদেব যথাপূর্বম। যাক সে কথা। বাসুদেব চরিত বর্ণনা করতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। বেয়ার মাউন্টেনে পিকনিকের গল্পটাই বলি।

কৈজী আর বাসুদেব দুজনেই ষোলশ রবিবার আটটায় কিকটি সেকেণ্ড ষ্ট্রীটে এসো সেখান থেকে টীমারে বেয়ার মাউন্টেনে যাবো। সবাই আমরা পিয়েরে মিট করছি।

"তুমিও যাচ্ছ তো?" বাসুদেবকে শুধালুম।

"নিশ্চয়"। বাসুদেব ও কৈজীর যুগপৎ উত্তর।

পরীক্ষা সমাপ্তির নিশ্চিন্ততায় তখন ভাসছি। যেটুকু ক্লান্তি ছিল দুটো দিন ঘুমিয়ে সেটাও শেষ হোল। রবিবারের সকালে উঠে দেখি নিউইয়র্কের আকাশের মুখ অন্ধকার। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া,—রীতিমতো সাইক্রোনিক আবহাওয়া। ফ্ল্যাটমেট বাসাধাকে শুধালুম,

"যাবে?"

"না হে"

"না কিরকম এক তলার চাঁদা দিছি না? খাওয়া দাওয়া হইব বালো রসম, চিকেন কারি, পোলাও" বিমল ওর চাকাই আলাপ করে।

কিন্তু মোটা বাসাধাকে নড়ান গেল না। বিরাট বিছানার ওপর মধ্যে বাসাধা শুয়ে রইলেন। অগত্যা দি হি শীতে কাঁপতে কাঁপতে মুখ ধুয়ে, দাঁড়ি কামিয়ে কোবরকমে আমি আর বিমল আপাদমস্তক র‍্যাগীকে ঢেকে আধঘণি প্যালস পরে তো চললুম। নিউইয়র্কের মত বিধি সহরেও সেদিন বিশেষ জনপ্রাণী পথে নেই।

বৃষ্টি একটা কুয়াশার জালের মত সারা শহরটাকে ঘিরে ফেলেছে। কদাচিৎ দু একটা হতভাগ্য নিগ্রো বেরিয়েছে মরলা গাড়ী নিয়ে। এমন যে করটি লেকেণ্ড ষ্ট্রীট যেখানে বাসাদা রাত্রি তিনটের সময় হোটেল থেকে ফিরে খুব নর্ত্তনাদি জুতো বুরুশ করিয়েছিলেন সেখানেও বিশেষ লোক নেই।

ভয়ে ভয়ে বললাম বিমলকে "ওরা নিশ্চয় এমন দুর্য্যোগে পিকনিক ক্যানসেল করে দিয়েছে।" "ক্যানসেল? কম কি মশায়? একডা ডলার মিছে পাঁচ পাঁচডা কর করে টাহা! তাইলে আমার ডলার আমারে ফিরৎ দিক্।" আর কথা কইলুম না। দেখাই যাক্ কি হয়। কিফটি লেকেণ্ড ষ্ট্রীটের পিয়ারে যখন পৌঁছলুম তখন বৃষ্টির কপরুপানি একটু কমেছে। পিয়ের জনমানব শূন্য, কেবল একটা ষ্টীমার থেকে থেকে হুংকার দিচ্ছে। মনে একটি আনন্দের দোলা লাগল—নিশ্চয় ঐটেই আমাদের ষ্টীমার। যাক্ এখন তোফা আরাম করে বসা যাবে।

বিমল গুপ্ত বললে—"এইহানে খাড়াইয়া থাহেন। এমন চুলবুলাইত্যাছেন ক্যান? ভাবে কোন ষ্টীমার কোথায় লইয়া যাইব।"

অগত্যা সেই ভারী গ্যাবার্ডিন ও রেনকোট যা বৃষ্টিতে ভিজে ওজনে পর্ব্বত প্রমাণ হয়েছে সে সব সহ দাঁড়িয়ে রইলাম। আটটা ছেড়ে নটা বাজলো কারুর টিকি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। অসহ্য লাগছে। মনে মনে ভাবছি বাসাদা কি দূরদর্শী। নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছে একটা ডলারের লোভ সামলাতে পারলাম না? লোভে পাপ পাপে মৃত্যু আমের বচন না মানার শাস্তি এই। বিমলগুপ্ত পর্য্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে,—

"আরে আপনি যে খাড়াইয়াই রইলেন। পুছেন না যেয়ার মাউন্টেনে এ ষ্টীমার যাইব কি না?"

"সেটাই তো এতক্ষণ করতে চাইছি" রাগে গরগর করতে করতে একজনকে টিকিট চেকারের বর্ত্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলুম। উত্তর যা পেলুম তাতে হতভম্ব হওয়া গেল। বিমলগুপ্ত ততক্ষণ এগিয়ে এসেছে,—

"কইত্যাছে কি?"

"আর কইত্যাছে। কইত্যাছে যে যেয়ার মাউন্টেনে আজ কোন ষ্টীমারই যাইব না। কোন দিনই রবিবারে ষ্টীমার সেখানে যায় না। যায় শুধু বুধবার ও শনিবারে। এখন কি করণ?"

বিমলগুপ্তের চিন্তা নেই—"বাসুদেব আইলেই সব ঠিক অইয়া যাইব। ও নিশ্চয় ষ্টীমার রিজার্ভ করছে। তখনেন তখনই কইছিলাম ওই ষ্টীমারে উইঠব্যান না। গরীবের কথাডা ঠিকই।"

অগত্যা আরো কিছুক্ষণ কাটলো। বৃষ্টি আবার সুরু হয়েছে। রাস্তায় গিয়ে যে পায়চারি করে সময় কাটাবো তারও উপায় নেই। এদিকে ঘড়াচুড়া পড়ে পা টাটিয়ে উঠেছে কব্জির জন্য গলা ধরেছে শুকনো। বিমলগুপ্ত ঐখানে দাঁড়িয়েই রিউমা না সাবার ষ্টেপ ঠিক করছে। সে এক বৃত্ত। বেলা দশটা। আকাশের মুখ ছিঁচকাদুনি মেয়ের মত ভারাক্রান্ত।—ষ্টীমারটা দাঁড়িয়ে তখন ভঁপ ভঁপ করছে। হঠাৎ একটা কলরবনি দেখি বাসুদেব এবং সঙ্গে প্রায় জন চল্লিশেক ছেলেমেয়ে এসেছে। সকলের চেহারা ডুবুরীর মত আপাদমস্তক ঢাকা। যাক তবু যে এসেছে এতেই প্রাণে হর্ষ ঘোষ।

বিমলগুপ্ত এগিয়ে গেল—"হুনছেন বাসুদেবদা এ ষ্টীমার তো যাইত না কয়।"

যাইত না কিরে বুদ্ধু? আলবৎ যাইত"। বাসুদেব সবেগে এগিয়ে যায়। বিমলগুপ্তের খুব স্ফূর্তি। এদিকে তাকিয়ে দেখি মহামানবের মেলা। বাসুদেবের দলে কে নেই—চীনে, জাপানি, ইরানী, ফিলিপিনো, রাশিয়ান, জার্মাণ, আমেরিকান ইত্যাদি ইত্যাদি। আসর রীতিমতো সরগরম। ইতালিয়ান কায়দুচি সমানে একরডিয়ান

বাজিয়ে চলেছে তার সাথে ডিটো দিচ্ছে মাউথ অর্গ্যানে ভোম্‌কি। ফক্সট্রট্ নাচছে এরিয়ান আর ডেভিড। আমেরিকান ছাত্ররা সবাই ডেট নিয়ে ব্যস্ত। কেউ চকোলেটের বোড়ক খুলছে, কেউ সিনেমাযায় তাড়ছে। সেদিকটায় ডিনার, হলি, লাভলি, ইন্টারেস্টিংএর ছড়াছড়ি। আর্যাণ অগ্নি (যাকে অন্তরালে আমরা অগ্নি পুগ্নি পুডিং এও পাই বলি) ঐ কীরমাণ আলোতে আমাদের একটা প্রুপ ফটো তোলবার চেষ্টায় পলঘর্ম। ইরানী ডাক্তার কৈজির বোধ হয় তখনো একটু সেন্স অবশিষ্ট ছিল। এক ধারে ডেকে নিয়ে আমাকে বললো,—

'Isn't the weather awful?"

"Yes"

"Why did'nt they cancel the programme?"

'Ask Basudev.'

"Isn't he your friend!"

'Yours, too.'

খ্যাক খ্যাক করে হেসে ফেলল কৈজি। আধঘণ্টা পরে বিরক্ত মুখে এল বাসুদেব।—

"ব্যাটারা কিস্‌সু বোঝে না।"

"হোল কি?"

"কি আবার এতোগুলো লোক বেয়ার মাউন্টেনে যাবে কোন ব্যবস্থাই করতে পারছে না। অথচ দেখ ইনারটা খালি পড়ে আছে। খালি অবস্থাতেই ওয়েষ্ট পয়েন্ট যাবে।"

প্রশ্ন করলুম—"তুমি এদের আগে থেকে কিছু জানাওনি?"

বাসুদেব একটু হাসলে—"না"

"সে কি?"

"আবিষ্কার তো সব জায়গায় ট্রপ যায়। ভেবেছিলাম যে বেয়ারেও নিশ্চয় যাবে। এরা যে একটা বুধ্ শুধু শনিবার আর বুধবারে যায় তা কি জানি।"

"অসভ্য!" পেছনের জনতার দিকে তাকালাম। ওদিকে কিন্তু নাচ, খাওয়া, সঙ্গীত, প্রেমালাপ সবই চলেছে।—

"চল্ না সবাই ওয়েষ্ট পয়েন্ট ঘুরে আসবি।" প্রস্তাব করতে ইচ্ছে হচ্ছিল সেটা আবার কোথায় যে যাবা?

কিন্তু বাসুদেব হোল ক্ষিপ্রবুদ্ধির লোক। ততক্ষণে একটা মাইক জোগাড় করে ঘোষণা সুরু করে দিয়েছে। "অনুপস্থিত অনিবার্য্য কারণে, আর দেখছেনই তো ওয়েদারের অবস্থা, আমরা বেয়ার মাউন্টেনে যাচ্ছি না। তবে তার বদলে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আর একটি সুন্দর জায়গা যার নাম ওয়েষ্টপয়েন্ট। সেখানে আছে একটি মিলিটারী কলেজ হ্যাঁ মিলিটারী। আপনাদেরই চিরপরিচিত প্রিয়তম জেনারেল আইজ্যানহাওয়ার এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।"

একটা দারুণ হর্ষধ্বনি ও চটাপট চটাপট ক্ল্যাপ চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হোল। "আশ্চার্য্য এই আমেরিকান ছাত্রগুলোর ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে" বললো সঞ্জয় সেন। বিমলগুপ্ত ও সায় দিল "ঠিক কইছেন ক্যালকাটা হইলে এতক্ষণ টেবিল চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি ইনসাব জিন্দাবাদ কিনা হইত।" বেয়ার মাউন্টেন না যেতে পারার দুঃখে আমারি মত ম্রিয়মাণ।—

বাসুদেব শেষ করলো,—

"আসবার পথে আপনাদের একটি লেক দেখিয়ে। আসব সেটিও পিকনিকের জন্য বিখ্যাত স্থান। এই বাড়তি আনন্দটুকুর জন্য আপনাদের কোন পয়সাই দিতে হবে না। (আবার ক্ল্যাপ ও হর্ষধ্বনি) তাছাড়া আমাই ওয়েষ্টপয়েন্টে আছে একটি সুন্দর মিউজিয়াম,- পাহাড়, মাঠ আর একটি সুন্দর ক্যাফেটারিয়া।"

এবার অনন্তধ্বনি আকাশ ছাপিয়ে উঠলো।

• যাক্ আমরা এতক্ষণে নিশ্চিন্তে গিয়ে ট্রেনারে বসলুম। শেষ হোল আদিপর্ব।

ট্রেনার চলতে সুরু করল। বেশ লাগছিল হাডসন নদীর দুধারের বাড়ীগুলো দেখতে। চওড়া এ্যাসফাল্টের রাস্তা এঁকে বেঁকে নদীর পাশ দিয়ে গেছে কখনো উঠেছে কখনো নেমেছে।

"ইউ নো ম্যানহাটন ইজ অন দি আইল্যাণ্ড রাইট" বলল আমেরিকান ওয়াশিংটনার।

"রিয়ালি ? হাউ ইন্টারেষ্টিং" সঞ্জয় সেন উত্তর দেয়। কয় মাসেই আমেরিকান ইডিয়ম-বিশারদ হয়ে উঠেছে সে। বুদ্ধের মত স্মিত হাসি ওয়াশিংটনারের মুখে। হিন্দুস্থানী শিখছে সে, ইচ্ছে তার্ডা (ওয়ার্ডা) মাওয়ার।

প্রায় বারটা পর্য্যন্ত দৃশ্য উপভোগ করা গেল। এখন আর বাড়ী নেই শুধু পাহাড়, বন, নদী। বাদলাটাও কেটেছে। খিদের পেট চোঁ চোঁ। উঠে খোয়াকেরা সুরু করলাম। সবাই দল পাকিয়ে নিয়েছে। কেউ তাস, কেউ ছাদ্‌টে খেলছে, কেউ নাচছে বাকীরা তাল দিয়ে গান গাইছে। রেলিং ধরে সঞ্জয় সেন দাঁড়িয়েছিল।

"বাসুদেব কোথায়" ? শুধাল।

"তাকে তো আমিও খুঁজছি, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।"

"আমারও"

"তবে চলুন।"

বাসুদেবকে পাওয়া গেল ট্রেনার ডেকে। সেখানে গোটা পাঁচেক আমেরিকান ছেলে মেয়ের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করছে। "হেনরী প্লিজ গিভ মি এ স্যাণ্ডউইচ" বলে চেঁচাল লাল চুল কালো পোষাকপরা রিটা।

"ও নো হেনরী ইটস মাইন" বাসুদেব কপ কপ স্যাণ্ডউইচ খেতে লাগল।

সঞ্জয়ের চোখ বড় বড়। আমার বুকে দীর্ঘশ্বাস। হঠাৎ সঞ্জয় সেন শুধাল—

"মেয়ে মানুষের নাম হেনরী কখনো শুনেছেন মশয় ?"

"আজকাল অনেক মেয়েকে খোকন বলে ডাকে।"

"তাজ্জব ব্যাপার মশায়"

"চলুন এখানে কিছু বলে ফয়দা নেই। নীচে নিশ্চয় স্যাণ্ডউইচের দোকান আছে।"

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ট্রেনার ডেক থেকে রিয়ার ডেক তারপর একতলা, দোতলা, নীচতলা এমনকি মেশিনঘর যে পাতালে সেখান পর্য্যন্ত ঘুরেও কোথাও স্যাণ্ডউইচের দোকান মিলল না।

বিমলগুপ্ত কাতরে উঠলো—"সবই তাখছেন দাদা নীচে উপরে ?"

"সবই, কেবল ডেঞ্জার লেখা জায়গাগুলো বাদে" বলল সঞ্জয় সেন।

কৌজির কাছে চুইনগামের একটা প্যাকেট ছিল। তাই গালে দিয়ে বসে রইলাম। ওদিকে আমেরিকান ছাত্ররা কিনা খাচ্ছে চকোলেট, টফি, স্যাণ্ডউইচ, আখরোট, কাজু বাদাম, পটেটো চিপ্‌স, আপেল, অরেঞ্জ, কোকাকোলা।

বেলা দুটো। নদীর দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছি। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমেছে বটে, তবোট এখনও ঘুরে পাহাড়ের কোনে আরেকটা পাহাড়ের মত মেঘপুঞ্জ। কিন্তু নদীর জলে সূর্য্যের উত্তাপে আগুণের স্ফুলিঙ্গ উঠছে। এমন সময় বাসুদেব বেশ মুখটুখ মুছে হাজির—

"কি হে কেমন enjoy কর-ছ ?"

"বেশ" সঞ্জয় সেন মুখ টিপে উত্তর দিল। বিমলগুপ্ত কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলো—"আরে বিদায় হইয়া যাই তুমি কও enjoy ?"

"কেন তোমরা খাওনি ?"

"যা : আমরা কি করে খাব ?"

"কেন স্যাণ্ডউইচ বা কিছু আন নি ?"

আমরা চুপচাপ। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হোল,—

"পিকনিকে নিজেদেরই খাওয়া আনতে হয় বুঝি? তবে টাকার কি অর্থ?"

ততক্ষণে বাসুদেব সিগ্রি জ্বালানো ব্যাক ব্যাক হাসি ঝুলেছে।—"যা রে বুদ্ধুর দল। ওহে এটা আমেরিকা। খাওয়া টাওয়া সব নিজেদের আনতে হয়। তারতবর্ষ পাওনি যে যেমনতর মাসে বাড়ীর এতি সেতি থেকে হুকুর বেড়াল পর্যন্ত দিয়ে এসে আকণ্ঠ খেয়ে যাবে। তাছাড়া এতক্ষণ বলতে হয়। হেনরী—ও হেনরী, হেনরী নাম যেয়া পিঙ্কটেল ঝাঁঝা চুল মেয়েটি এল

"What's the matter Honey?"

বাসুদেবের হাসির মূর্তি দেখে তো আমরা তাজ্জব বনেই ছিলাম।

"Have some sandwitches?"

"No dear" ঠোঁট উল্টালো মেয়েটি।

বিজনেস এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন পড়ে নাকি সে। বাসুদেব আবার হাসল—"নাও পেটে কিল মেরে পড়ে থাক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়েষ্টপয়েন্ট পৌঁছব। সেখানের কাফেটারিয়াতে তোফা খাওয়া পাওয়া যায়।

পেটের ঘোটঁকানো পেটেই রেখে বসে রইলাম। ঝাঁঝা ঘুরছে, পা ঝিমঝিম করছে। মনে মনে বাবাদার কিনটি ভাইক সেন্টের লাক খাওয়া তৈলচিক্কণ পরিতৃপ্ত মুখটি ভেসে উঠতে লাগল। হায়, কেউ দেখে দেখে যেমন বাবাদা, কেউ ঠেকে দেখে যেমন আমরা। হঠাৎ বিমলগুপ্ত বিলাপ করে উঠলো,—"হতভাড়া আর নাম পাইল না, গাইয়াগোর নাম দিছে এনরী"। উত্তর দিলুম না। মুখে একটা তেতো জল জমেছিল ফেলে দিলুম।

শেষ পর্যন্ত ডিনটে নাগাদ ভোঁ ভোঁ করতে করতে আমাদের টামার ওয়েষ্ট পয়েন্টে পৌঁছলো। সবাই তৈরী নামবার জন্য। বাসুদেব ঘড়ারীতি মাইক নিয়ে ঘোষণায় ব্যস্ত—"বন্ধুগণ আমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছেছি। এই সেই সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট পয়েন্ট। ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন এবং আপনারাও ভাগ্যবান, ওই দেখুন সূর্য্য উঠেছে। (ক্ল্যাপ ও হর্ষধ্বনি) এবার আপনারা এখানে নেমে বেড়ান, নাচুন, খেলুন, ছবি তুলুন, পিকচার পোষ্টকার্ড কিনুন, প্রিয়জনকে পত্র পাঠান। কিন্তু মনে রাখবেন সাড়ে চারটের মধ্যে এখানে সবাই ফিরে আসবেন তা না হলে আমরা সেকটি দেখতে পারবো না। মনে রাখবেন সাড়ে চারটে, সাড়ে চারটে।"

জলপ্রপাতের মত হুড় হুড় করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। এখন আমাদের প্রোগ্যাম—টু কাফেটারিয়া।

"Oh, no, now it is closed" বললো ভদ্রি পদ্মি পুডিং এত পাই।

"Why?"

"It is a democratic country, the kitchen hands must get some rest."

"হ্যাঁ হতোস্মি।"

আমাদের অবস্থা দেখে করুণা হোল বোধ হয় আধাপাউ পুডিংয়ের, বলল সাড়ে তিনটেয় খুলবে।

অগত্যা পা বাড়ালুম মিউজিয়মের দিকে। মিউজিয়মে বিভিন্ন প্রকার তরোয়ারী, রিভলবার, যুদ্ধ জাহাজের ছবি, মেডেলিয়ান ইত্যাদি দেখে শেষ পর্য্যন্ত চোখে এল গোয়েরিং এর হাতের বেটন—হাজার খানেক হীরক খচিত। দেখবার মত জিনিষ। বাসুদেব তো ভারী পুলকিত এই নতুন খবরে। আগে জানা থাকলে পীয়ের্সের বক্তৃতায় এই পয়েন্টটা বলতে পারত। বাসুদেব প্রিয়া হেনরী চোখ কপালে তুলে রইল—মুখে বাক্য নেই। ঐশ্বর্য্যকে পশ্চিমীরা যেমন সম্মান করতে পারে তেমন আমরা পারি নে। এমতাবস্থাতেও বিমলগুপ্তের বিলাপ—"ও মশয় আর যে পারি না, প্যাটে যে খোঁচা মারতিছে। হইল আপনার সাড়ে তিনডা?"

কোন ক্রমে চোখকাণ বুজে জ্ঞান অর্জন করে চলেছি। শেষে সাড়ে তিনটের সময় প্রায় ল্যাঙাতে ল্যাঙাতে হতক্লান্ত শরীরটা নিয়ে পৌঁছলাম ক্যাফেটারিয়ায়। কেমন যেন নিস্তব্ধ ভাব। আমরা গোটা চল্লিশ ছাত্রছাত্রীই যা চ্যাচাচ্ছি। সঞ্জয় সেন এবার কেরামতি দেখালো। "অমন নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না মশাই, সক্রিয় হতে হবে। দেখছেন না ব্যাটা আমেরিকানগুলো টেবিলের ওপর চড়ে বসেছে।"

দুজনে চললুম। বিমলগুপ্তের অবস্থা কাহিলতম বলে তাকে চেয়ারেই রেখে গেলাম। প্রায় আধঘণ্টার উদ্বস্ত চেষ্টায় হ্যাঁচড়া হেঁচড়ি করে এক কাপ করে কফি ও একটি করে ডোনাট সংগ্রহ করা গেল। তাও সকলের ভাগ্যে জুটল না।

"মিল এণ্ড চীপস্?"

"No."

"হটডগ?"

"No"

"মিক শেক্?"

"No, nothing left"

বাকথাম থেকে এই ছোট্ট যে খিদেটা মরে এসেছিল ডোনাট আর কফি খেয়ে সেই খিদেটাও চাগিয়ে উঠলো। পেটের মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। কি আর করা সেই অবস্থাতেই একটু আধটু এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ালুম। ডেটদের অবশ্য কোন অসুবিধে নেই ধর্ম ধর্মা গ্যাতাল তাদের কাছে সুপ্ত। প্রেমে পড়ার এই এক সুবিধে খিদে তৃষ্ণা জ্ঞানগম্যি ঘুমি ঘীমি সব লুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য পকেটে এতৎসত্ত্বেও প্রচুর চকোলেট, ক্রুটন্স থাকে ও আছে। কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র। আমরা মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে, ঘাড়ভাঙা পরিশ্রমে আমাদের কোনক্রমে পড়াশুনোটা চালাতে হয় ওপর মধ্যবিত্ত বিলাস করবার সামর্থ্যই বা কোথায়? তবু সময় কাটাবার জন্যই প্রশ্ন করলাম সঞ্জয় সেনকে—(সেন বড়লোকের ছেলে)

"আপনার ডেট কোথায় মশায়?"

"ডেট? আপনি কি পাগল হলেন?"

"কেন?"

"ঐ পশ্চিমী মেয়েদের মত বিশ্বাসঘাতিনীদের সঙ্গে করব প্রেম?

"সে কি?"

"না মশায় দরকার নেই। বাংলা দেশের বাঙালী মেয়েই ভাল। আজকের পিকনিকের কাণ্ড দেখেও আপনার জ্ঞান হচ্ছে না?"

"কিন্তু দোষটা তো বাসুদেবের। ও যদি আমাদের আমেরিকান পিকনিক মানে নিজের খাবার দাবার বাসনপত্র ঝাঁকামুটে দিয়ে বয়ে একটা জায়গায় বসে একদল অপরিচিতের সঙ্গে খাওয়া এবং আপন প্রিয়ার সঙ্গে প্রেমে মশগুল হয়ে থাকা তবে তেমন ব্যবস্থা আমরা করতুম।"

"বাসুদেবের দোষ দিচ্ছেন কিন্তু আসল লিডার তো হেনরী। হেনরীই তো স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার লীগের সেক্রেটারী। বাসুদেব তো শুধু ওর বন্ধু।"

"কিঁয়াসে কম" চিঁ চিঁ স্বর বিমলগুপ্তের।

"তা যা বলেন" সঞ্জয় সেন উঠে দাঁড়ালো। সাড়ে চারটে বাজে অগত্যা পিয়েরে পৌঁছানো গেল।

বাসুদেব রণনীতি মাইকে ঘোষণা শুরু করে দিয়েছে। মা৷ সীতার ঘরার যোগ্যতা আছে ছোকরার। রীতিমতো এলেমদার ছেলে। হেনরী ততক্ষণে একটা প্রকাণ্ড পোর্ট ম্যাণ্টো নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে পিয়েরে হাজির। এতক্ষণে তিনি আমাদের দিকে একটু সহানুভূতি পাত করলেন—"এই যে এসে গেছেন, আমাকে একটু সাহায্য করবেন? এই পোর্টম্যাণ্টোটা উপরে তুলে দিন।"

বিমলগুপ্ত তখুনি রেডী। কিন্তু পোর্টম্যাণ্টোর ভারে বেচারী হুয়ে পড়ল। কিন্তু কি করা ড্যাবলেস ইন ডিস্ট্রেস! তুলে দিতে চলল হেনরীর নির্দেশে। সঞ্জয় সেনের মুখ চোখ লাল—"মিস্টেক, জানেন ঐ পোর্ট-ম্যাণ্টোতে ও স্যাণ্ডউইচ গুলো এনেছিলো।"

"চুপ করুন শুনতে পাবে"

"শুনতে পেলেই বা কি মশায়? গুপ্ত সাহেবের মত আমি খোদামুদে নই।"

সব ছাপিয়ে বাসুদেবের ঘোষণা রণিত হোল—"এবার আমরা চলেছি লেকে। বন্ধুগণ সেখানে আপনারা এক ঘণ্টা বেড়াতে পারবেন, লেকে নৌকো করে রোয়িং করতে পারবেন, কফি খাবার সরাই পাবেন। পাহাড়ে, সরোবরে, পপলার বনে অপরূপ এই স্থানের স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাবেন নিউইয়র্কের অন্ধকারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো আমাদের আর্মাণ বন্ধু অর্জি ও ফরাসী বান্ধবী ক্যাথরিন এসে পৌঁছয় নি।"

হেনরী মন্তব্য করল—"কি কাণ্ডজ্ঞানহীন এই কন্টিনেন্টালরা।"

আর মাত্র পাঁচ মিনিট—জাহাজ ভোঁ ভোঁ করতে সুরু করেছে। তীরের দিকে মুখ করে বাসুদেবের কণ্ঠ ঘোষিত হচ্ছে।—

"George come sharp, Dear Catherine come along, time is up……ইত্যাদি।"

ব্যাপার স্যাপারে আমার তো বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। কিন্তু আর সবাই নিশ্চিন্ত। ডেটরা যথারীতি কপোতকপোতী সব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সূর্য্যহীন সূর্য্যাস্ত দেখছে। জাহাজের সারেঙলোডর তুলছে, হেনরী পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে চকোলেট চিবোচ্ছে।

"ওরা এ কি জাহাজটা ছেড়ে দিল?" বিমলের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিলুম।—

"আরে মশায় দুই জনের জইন্য তো এতগুলান মানষেরে কষ্ট দেওন যায় না। এডা জেবোক্রেসী মনে রাইখবেন। যখন মেজরিটি খাইত্যাছিল তখন আপনা মাইনরিটি খাবার পাইলাম না কেউ কি তাগ দিছিল?

"তা বটে"

"তবে?"

"একেবারে হক কথা কইছেন" সঞ্জয় সেন তারিফ করে। এমন আমরা মেজরিটির দলে।

"তাখেন, তাখেন ওরা আইত্যাছে……"

সত্যিই দেখি একটা ছোট্ট বোটে ওরা আসছে। বোটের মাঝি হাত নেড়ে কি বলছে। শেষ পর্য্যন্ত টানাটানির ওদের তোলা হোল। সকলের সমবেত হর্ষধ্বনির মধ্যে ওরা তো লজ্জিত বদনে উঠলো।—

হেনরী শুধু মন্তব্য করল—"You irresponsible guys"

কৌতূহল মনে অপারগ বিমলগুপ্ত অর্জিকে শুধোল —"কি ব্যাপার?"

অর্জির ভাঙা ডোণ্টকেয়ার—ঘণ্টা ভুলছিল সে ক্যাথরিনের দেরী হয়ে গেছে তাই।—

"কিন্তু আপনার ভয় ভয় নাই? যদি টানার চলে যেত?"

"হুঃ, next টানারে আসতুম"

"এটা last টানার"

"তাহলে বোটে চেপে ফিরতাম।"

এর পর আর কথা নেই।

দশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম লেকে। যাঁরা সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ সঙ্গী সঙ্গিনীসহ এসেছেন তাঁরা বোট ভাড়া করে ভেসে যেতে লাগলেন। যাঁদের সঙ্গী নেই তাঁরা ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। সেই অস্ত সূর্য্যের সোণালী আলোয় লেক উইণ্ডসরকে মনে হোল অপরূপ। মনে হোল যুগি

তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ
তারি পরে তালে তরণী হিরণ
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি হাসিছ কেন ?

এতক্ষণে বেশ লাগছে। সারাদিনের অর্ধাসনে ক্ষুধার প্রকোপ নেই। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। এক ঘণ্টা কেটে গেল। এসে ষ্টীমারে লক্ষ্মী ছেলের মত বসে রইলাম। যথারীতি বাসুদেবের বক্তৃতা সুরু হোল,—

"এই অপরূপ সন্ধ্যা আমাদের স্মৃতিতে চির জাগরূক থাকুক। আপনারা যারা সহযোগিতা করলেন তাদের ধন্যবাদ। (সহযোগিতা! হায়!) আশা করি ষ্টুডেন্টস লীগ আপনাদের যাত্রার বন্দোবস্ত করে সুখী করতে পেরেছে। (বলে কি?) কিন্তু চরমের বিষয় অর্কি ও ক্যাথারিণ এখনো পৌঁছয় নি।" (আবার? কি যন্ত্রণা!)

পুনশ্চ সুরু হোল—"অর্কি come along, ক্যাথারিণ come sharp" ইত্যাদি। এবার ষ্টীমার ছাড়ার আগেই ওদের দেখা গেল, ছুটতে ছুটতে আসছে। হেমন্তী ফিস্ফাস—"আবার কি হোল?" এবার নাকি ওদের বোট লেকের পরপারে চলে গিয়েছিল তাই এ পারে আসতে দেরী। সঞ্জয় সেন হাতে চাপ দিল "প্রেমে পড়লে মানুষের জ্ঞান লোপের দৃষ্টান্ত দেখলেন তো?" মুখে বললুম "হুঁ"। মনে হোল enjoy সব থেকে ওরাই করেছে। পশ্চিমী সভ্যতা মানে রূপ-যৌবন ও প্রেম। আমাদের ভারতীয় মধ্যবিত্ত হিসেবী মনে তার স্বাদ নেওয়া বোধহয় অসম্ভব।

আবার বৃষ্টি নামল। নিউইয়র্কের ঘাটে যখন ষ্টীমার ভিড়ল তখন তো রীতিমতো ঝমঝম বৃষ্টি। বাসুদেবের মধুর ভাষণে ঘুম দেবার বা হাততালি দেবার উৎসাহ আমেরিকানদেরও ছিল না। নামতে নামতে ইরানী ডাক্তার কৈজী বলল—"now this is American Picnic" বুঝেছেন নিশ্চয় ডেমোক্রেসী মানে মধুর কথা মিথ্যে কথা বলা। এর থেকে ফিউডালিজমের তফাৎ কোথায় জানেন? সেখানে নিষ্ঠুর করে সত্যটা বলা হয়। "আর ক্যাপিটালিজমে নিষ্ঠুর করে মিথ্যেটা বলা হয়" টিপ্পনী সঞ্জয় সেনের।

"আর কমিউনিজম?" শুধালুম আমি।

কৈজী চোখ টিপলেন—"আপ-আমেরিকান কথা বলছেন?"

অর্থোপার্জনে কলকাতার মেয়েরা

শান্তি সেন

আমাদের দেশে গরীব ঘরের মেয়েরাই কেবল যারা এতকাল অর্থোপার্জন করে এসেছেন। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের আয়ের জন্য কাজ করাটা সকলে বড়ই লজ্জার মনে করতেন। গ্রামে গরীব মেয়েরা তাদের স্বামীর সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করতো, ধনী এবং মধ্যবিত্ত ঘরে, ঝি এর কাজ, রাঁধুনীর কাজ করে, বুড়ি ভেঙে, ঘুঁটে বেচে জীবিকার্জন করতো। এখন তারা কলকাতায় এসে কারখানার শ্রমিকের কাজ করে, অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে ঝি এবং রাঁধুনীর কাজ করে, বুড়ি ভেঙে, ঘুঁটে বেচে, পানের দোকানে মাছ বিক্রী, সবজী বিক্রী করে—জীবিকার্জন করে। কেহ কেহ গণিকাবৃত্তি করেও অর্থোপার্জন করে। সুতরাং নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েদের জীবিকার্জন চেষ্টা আজকে নূতন নয়। বহুকাল থেকেই চলে আসছে।

কিন্তু বর্তমান কালে ধনী এবং মধ্যবিত্তঘরের মেয়েরাও অর্থোপার্জনের জন্য ছেলেদের সঙ্গে যোগদান করেছেন। কয়েকটা পেশায় ছেলেদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। যেমন কেরাণীগিরি ও টাইপিষ্টের কাজে। অনেকে ক্ষুণ্ণ করে বলেন, মেয়েরাও যদি এভাবে কাজের জন্য ছোটেন, তবে ছেলেদের কাজ তো আরো জুটবে না! এই যে মেয়েরা অর্থোপার্জনের জন্যে ছুটেছেন, এ কি কেবল সখের জন্য? কিছুদিন আগেও ধনী এবং মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অফিসে চাকুরী করার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। একদিকে সামাজিক সংস্কার অন্যদিকে লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার চাপও এখনকার মত ছিল না। একে তো সব দেশেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা চাকুরী কম করে—তাতে আমাদের দেশে সামাজিক বাধা ও শিক্ষার অভাবের জন্য এতদিন ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা মোটেই চাকুরী করতো না। সব দেশেই পুরুষদের মধ্যে অতি ধনী, অতি অলস, ও রুগ্ন অক্ষম ছাড়া প্রত্যেকেই ১৫ থেকে ৬০ বৎসর পর্যন্ত অর্থোপার্জন করেন কিম্বা তার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের অবস্থার কিছু দিন আগে থেকেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং বিলাসপ্রিয়তার নারী জাগরণের ফলে, আমাদের সামাজিক বাধা অনেকাংশে খসে পড়েছে। তার ওপর বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাও ক্রমেই শুরুতর হচ্ছে। আগেকার দিন থেকে জিনিষপত্রের দাম অনেক বেশী বেড়েছে। এবং জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় মধ্যবিত্তদের অধিকাংশেরই আয় বাড়ে নি। অথচ জিনিষের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই নির্দ্দিষ্ট আয়ের লোক, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছে না। তাদের বেতন যদি বাড়েও তাহলেও যে হারে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে সেই হারে বাড়ে না। তাই তার পক্ষে সংসার চালান সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছে। মধ্যবিত্তদের উপরই অর্থনৈতিক চাপটা বেশী পড়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অনেকেই অর্থোপার্জন করতে বাধ্য হয়েছেন। ধনীগৃহের মেয়েরাও কতকটা জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য ও কতকটা নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চাকুরী নিচ্ছেন। তবে অধিকাংশকেই প্রয়োজনের চাপে নিতে বাধ্য হতে হয়েছে। এই

নারী প্রগতির যুগেও কলকাতা সহরে যারা রোজগার করছেন তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৫।৬ জন মেয়ে আর বাকী সবই পুরুষ। তাতে অবশ্য বিস্ময়ের কারণ নাই। মেয়েদের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ—কলকাতা সহরে কর্মক্ষম বয়সের লোকের মধ্যে অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬০ বৎসর বয়স্ক লোকের মধ্যে শতকরা ৭০ জনই পুরুষ আর মেয়ে মাত্র ২৭ জন। কাজেই পুরুষদের তুলনায় এই বয়সের মেয়ের সংখ্যা কলকাতা সহরে অনেক কম। কারণ বিহার, উড়িষ্যা, কাবুল প্রভৃতি দেশ থেকে বহু কর্মক্ষম পুরুষ কলকাতায় অর্থোপার্জন করতে আসেন। কিন্তু তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে আনেন না। দেশেই রেখে আসেন। সেই জন্য ১৫ থেকে ৬০ বৎসর বয়সের মেয়ে, কলকাতা সহরে এতো কম।

তাছাড়া মেয়েদের লেখা পড়া শেখাও ছেলেদের তুলনায় অনেক কম হয়। ৫ বছরের বেশী যাদের বয়স তাদের মধ্যে শতকরা ৬১ জন মেয়ের অক্ষর-পরিচয় আছে। আর ঐ বয়সের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জনের অক্ষর পরিচয় আছে। আর চৌদ্দ বৎসরের বেশী বয়সের মেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৬ জন মেয়ে ম্যাট্রিক কিম্বা তার উপরের পরীক্ষা পাশ করেছেন। কিন্তু ঐ বয়সের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ২১ জন ছেলে ম্যাট্রিক কিম্বা তার উপরের পরীক্ষায় পাশ করেছে। রোজগেরে ছেলের তুলনায় রোজগেরে মেয়ে কলকাতায় অনেক কম সন্দেহ নাই। তাহলেও এই শ্রেণীর মেয়েদের সংখ্যা বর্ষে বর্ষে ও অনেক বেড়ে চলেছে। তার প্রমাণ বাস-ট্রামের লেডিস্ স্পেশাল চালান।

মেয়েদের কাজ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার পূর্বে, তাদের সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ তথ্য জানা প্রয়োজন। সাধারণভাবে কলকাতাকে পুরুষ-প্রধান সহর বলা চলে। কারণ দেখা যায় যে এখানে প্রতি ১০০টি লোকের মধ্যে মাত্র ৩৭জন মেয়ে, বাকী ৬৩ জনই পুরুষ। অবশ্য সব বয়সের লোকের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের এত পার্থক্য দেখা যায় না। ১ থেকে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৪৯ জনই মেয়ে ৫১ জন ছেলে। আবার ৬০ বৎসরের বেশী যাদের বয়স, তাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যাই বেশী। এই বয়সের লোকের মধ্যে ৫২ জনই মেয়ে আর ৪৮ জন মাত্র পুরুষ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রভেদ ১৫ থেকে ৬০ বৎসর বয়স্ক লোকেদের মধ্যে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা শতকরা মাত্র ২৭ জন আর ৭৩ জনই হচ্ছে পুরুষ। কলকাতায় যে কেবল মেয়ের সংখ্যাই কম তা নয়—তাদের মধ্যে যে শিক্ষা কম একথাও পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে একটা বিষয়ে ছেলেদের থেকে মেয়েদের সংখ্যা বেশী। মেয়েদের মধ্যে অধিকাংশেরই বিয়ে হয়ে গেছে—২০ বৎসর বয়সের আগেই আর বিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২০ জনই বিধবা। ছেলেদের মধ্যে বিবাহিত এবং বিপত্নীক অপেক্ষাকৃত কম। বিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে গড়ে শতকরা ৪জন চাকুরী করেন বা অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত আছেন। অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে অর্থোপার্জনকারী মেয়ের সংখ্যা শতকরা ১০ জন। কিন্তু বিধবাদের মধ্যে শতকরা ২৪ জন চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছেন। আর একটি বিষয়ে মেয়েরা ছেলেদের থেকে এগিয়ে এসেছেন। যত মেয়ে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৮২ জন কাজ পেয়েছেন। আর বাকী ১৮জন বেকার বসে আছেন। কিন্তু ছেলে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯২ জনই কাজ পেয়েছেন, বেকার আছেন মাত্র ৮ জন। মেয়েদের মধ্যে কমসংখ্যক লোকই কাজের খোঁজে বের হতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু তাদের মধ্যেও আবার বহুলোক কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না। ছেলেদের মধ্যে অনেক বেশী লোক কাজ খোঁজেন কিন্তু তুলনায় অনেক কম লোক বেকার বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে যারা এই শহরের লোকেদের সম্বন্ধে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারা, পুরুষরা যতপ্রকারের কাজ বা বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, তাকে মোটামুটি ৬৬ ভাগে ভাগ করেছেন। এরমধ্যে সব কটি ভাগেই ছেলেদের পাওয়া যায়। কিন্তু মেয়ে এরমধ্যে মাত্র ৩৪ শ্রেণীর কাজ করে। অর্থাৎ মেয়েরা ছেলেদের মত সব রকম কাজ করে না বা করতে পারে না। অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, বর্তমানে মেয়েরা স্কুলে, কলেজে, কেরাণীর কাজে, টেলিফোনে, টাইপিংএ, নার্সিংএ, ডাক্তারীতে, ব্যবসায়েও আছেন। কেহ কেহ বাড়ী ভাড়া কিম্বা অন্যান্য সম্পত্তি থেকেও উপার্জন করেন। অবশ্য ঝি, রাঁধুনী, জমাদারনী, গয়লানী, ধোপানী, বাসনওয়ালা, বেচুনী, পানওয়ালী, ঘুটে কুড়ুনী বস্ত্রহরনী, সেলাই এর কাজ, ইত্যাদি কতগুলি কাজ মেয়েরা চিরকালই করে আসছেন। এ অবশ্য সবই জানা কথা কিন্তু এদের মধ্যে কত মেয়ে কী কাজ করেন, সে সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেই খবর রাখেন না। এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধেই আলোচনা করা হবে।

উপার্জনকারী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন মেয়ে রাঁধুনী এবং ঝি এর কাজ করে। শতকরা ১১ জন বাড়ী ভাড়া কিম্বা অন্য সম্পত্তি থেকে উপার্জন করেন। শতকরা ৪ জন জমাদারনী। বেশ্যাবৃত্তি করে শতকরা ৬ জন মেয়ে। বাড়ী ভাড়া থেকে যারা আয় করেন তাদের আয়কে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। এদের এবং যারা গণিকা বৃত্তি করে, তাদের বাদ দিয়ে বাকী যারা থাকেন তাদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন সাধারণ কায়িক পরিশ্রম করে উপার্জন করে, যেমন ঝি, রাঁধুনী, বস্ত্রহরনী প্রভৃতি। এদের যদি বাদ দিয়ে মোট কর্মী সংখ্যা ধরা যায় তবে তাদের মধ্যে শতকরা ৭ জন মেয়ে কেরাণীর কাজ করেন, ১১ জন মেয়ে স্কুলে ও ৩ জন কলেজে শিক্ষকতা করেন। টেলিফোনে এবং টাইপিষ্টএর কাজে শতকরা ৫ জন মেয়ে আছেন, নার্সিংএ আছেন ১০ জন, সেলাই এর কাজে আছেন শতকরা ৪ জন মেয়ে। চাকুরী, ব্যবসায় ও বৃত্তি, (profession) মোটামুটী এই তিনভাগে যদি মেয়ে কর্মীদের ভাগকরা যায় তবে দেখা যায় শতকরা ১৯ জন মেয়ে বিভিন্ন বৃত্তি (যেমন ডাক্তারী, নার্সিং, টাইপিং, বীমার এজেন্সি ইত্যাদি) থেকে উপার্জন করছেন। শতকরা ১৮ জন মহিলা ব্যবসায় ও ব্যবসায় সংক্রান্ত (saleswomen প্রভৃতি) কাজ থেকে উপার্জন করেন। বাকী সব মেয়েকর্মী চাকুরী করেন। যারা professionএ আছেন তাদের গড়ে মাসিক আয় ১৬৫৲ টাকা, যারা ব্যবসায়ে কিম্বা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ করেন তাদের গড়ে মাসিক আয় ৮০৲ টাকা। এদের আয় এত কম হওয়ার কারণ প্রথমত এরা ছোট দোকান করেন, দ্বিতীয়ত ব্যবসায়ীরা প্রকৃত আয় বলেন না। কম করে বলেন। যারা চাকুরী করেন তাদের মধ্যে যারা শিক্ষকতা করেন তাদের গড়ে মাসিক আয় ১২০৲ টাকা। যারা কেরাণীর কাজ করেন তাদের গড়ে মাসিক আয় ১৪৫৲ টাকা। ঝি এবং রাঁধুনীর মাসিক আয় গড়ে ৩০৲ টাকারও কম। কিন্তু জমাদারনীর গড়ে মাসিক আয় ৪৬৲ টাকা। মোট মেয়ে কর্মীদের মধ্যে শতকরা ৪১ জনের আয় ৩০৲ টাকার মধ্যে। ছেলেদের মধ্যে শতকরা ১৩ জনের মাসিক আয় ৩০৲ টাকার মধ্যে। আর শতকরা ২১ জন মেয়ে কর্মীর মাসিক আয় ৩১৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকার মধ্যে। আর ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন পুরুষ কর্মী ৩১৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকার মধ্যে মাসিক আয় করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন কর্মী ১০০৲ টাকার নীচে মাসিক আয় করেন। আর মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন কর্মী ১০০৲ টাকার কম মাসিক আয় করেন।

মেয়ে কর্মীদের মধ্যে শতকরা ১০জন মেয়ে ১০০৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকার মধ্যে মাসিক আয় করেন। আর পুরুষ কর্মীদের মধ্যে ১৭ জন কর্মী ১০০৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকার মধ্যে মাসিক আয় করেন। কিন্তু শতকরা ৫ জন মেয়ে কর্মী এবং শতকরা ৭ জন পুরুষ কর্মীর মাসিক আয় গড়ে ২০০৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকার মধ্যে। আর একহাজার মেয়ে কর্মীর মধ্যে প্রায় ৪ জন মেয়ে কর্মী ১০০৲ টাকা থেকে ১২০০৲ টাকা মাসিক উপার্জন করেন। পুরুষ কর্মীও প্রতি হাজারে ৪ জন পুরুষ মাসে ১০০৲ টাকা থেকে ১২০০৲ টাকা উপার্জন করেন। সুতরাং ১০০৲ টাকা থেকে ১২০০৲ টাকা, মাসিক আয়ের লোক, মেয়ে এবং পুরুষ কর্মীদের মধ্যে প্রায় সমান দেখা যায়।

এতক্ষণ আমরা মেয়ে এবং পুরুষ কর্মীদের মাসিক উপার্জন কে কেমন করে তারই আলোচনা করেছি। এই বারে শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা মেয়েরা কে কী প্রকার কাজ করে দেখা যাক। কলকাতার বি, এ, এম্, এ, পাশকরা মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন চাকুরী করেন। যারা চাকুরী করেন তাদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শতকরা ১১ জন কলেজে শিক্ষকতা করেন। শতকরা ৬ জন কেরাণীর কাজ করেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে অধিকাংশ মেয়ে কর্মীই শিক্ষকতায় নিযুক্ত। এবং শতকরা ৬৪ জন মেয়ে মাসিক ১০১৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকা পর্যন্ত আয় করেন। আর শতকরা ১০ জন মেয়ের মাসিক আয় ৭৫১৲ টাকা থেকে ১২৫০৲ টাকা। এই দলে মহিলা ডাক্তার এবং মহিলা ম্যানেজিং ডিরেক্টরও আছেন।

আণ্ডার গ্রাজুয়েট মেয়ে কর্মীদের মধ্যে, অর্থাৎ যারা ম্যাট্রিক কিম্বা আই, এ, আই, এস্, সি, পাশ করেছেন, তাদের মধ্যে শতকরা ১৪ জন চাকুরী করেন। তাদের মধ্যে আধার শতকরা ২৬ জন কেরাণীর কাজ করেন,

২২ „ স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করেন,

„ ২০ „ মেয়ে টাইপিষ্ট কিম্বা টেলিফোন অপারেটারের কাজ করেন। এদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন ১০১৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকা মাসিক উপার্জন করেন। শতকরা ২৫ জন আণ্ডার গ্রাজুয়েট মেয়ে কর্মী ২০১৲ টাকা থেকে ৭৫০৲ টাকা ও ১১ জন, ৩১৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা পর্যন্ত মাসিক উপার্জন করেন। আর নন্ ম্যাট্রিক মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৮ জন মেয়ে চাকুরী করেন। এদের

শতকরা ১৯ জন স্কুলে শিক্ষকতা করেন,

১৪ „ টেলিফোনে কাজ করেন,

„ ৩ „ বাড়ী ভাড়া থেকে আয় করেন। নন্ ম্যাট্রিক মেয়ে কর্মীদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন মেয়ে ৩১৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা মাসিক আয় করেন। শতকরা ৩২ জন মেয়ে ১০১৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকা মাসিক আয় করেন। এবং শতকরা ১৮ জন মেয়ে ২০১৲ টাকা থেকে ৩৫০৲ টাকা মাসিক আয় করেন। আর অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬১ জন মেয়ে কর্মী মাসিক আয় ৩০৲ টাকার নীচে করেন ও শতকরা ৩৮ জন মেয়ে ৩১৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয় করেন। এই অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে শতকরা ১৩ জন মেয়ে চাকুরী কিম্বা ব্যবসায় করে অর্থ উপার্জন করেন। আর সমগ্র উপার্জনকারী মেয়েদের মধ্যে ৬১ জন মেয়েই লেখাপড়া জানে না।

এখন বেকার মেয়েদের কথা কিছু বলা যাক। পূর্বে বলা হয়েছে যে কর্মপ্রার্থী মেয়েদের মধ্যে শতকরা ১৮ জন মেয়ে কাজ পাচ্ছে না। বেকার বসে থাকতে হচ্ছে। যদিও পুরুষ কর্মপ্রার্থী, মেয়ে কর্মপ্রার্থী থেকে অনেক বেশী তবু তাদের বেকার সমস্যা, মেয়ে বেকার সমস্যার মত

তত বেশী নয়। তাদের মধ্যে শতকরা ৮ জন পুরুষ যার কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে তবু পাচ্ছে না। বেকার বসে থাকতে হয়েছে। ছেলে বেকারের তুলনায় মেয়ে বেকার নিষ্ফল। ২০ থেকে ২৪ বৎসর বয়সের মেয়ে কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে ২৯ জন মেয়ে বেকার বসে আছেন। কিন্তু ঐ বয়সের পুরুষ কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে শতকরা ৬জন মাত্র বেকার বসে আছেন। একথা ঠিক যে পুরুষেরা যতপ্রকার কাজ করে, মেয়েরা তত প্রকার কাজ করেনা বা করতে পারে না।

সেইজন্য মেয়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যদিও পুরুষ কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা থেকে অনেক কম, তবু মেয়ে কর্মপ্রার্থীর মধ্যেই বেকারের সংখ্যা বেশী। বিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন মেয়ে কর্মীর স্বামীও রোজগার করেন। অর্থাৎ এই সব পরিবারে, স্বামী, স্ত্রী, দুজনের উপার্জনে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয়। আর সমগ্র মেয়ে কর্মীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০জন বিধবা। এদের চাকুরী করতে হয়, নিজেদের বা পরিবারের প্রতিপালনের জন্য।

কলকাতায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যে কম বেতন দেওয়া হয়—তার কোন পরিচয় এই তথ্যে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে মেয়েরা প্রথম যখন ছেলেদের সঙ্গে অর্থোপার্জনে যোগদান করেন, তখন ছেলে ও মেয়েকর্মীদের বেতনের হারে স্পষ্ট পার্থক্য করা হতো। সেইজন্য মেয়েদের তরফ থেকে যখন সাক্ষাতেই বা ভোটদানের অধিকার স্থায়ীর আন্দোলন করা হয়েছিল, সেইরকম সমানকাজে সমান বেতন (equal pay for equal work) দাবী করে মেয়েকর্মীদের আন্দোলন করতে হয়েছিল। কলকাতায় অবশ্য এই ধরণের আন্দোলনের প্রয়োজন নাই।

তবে মেয়েদের মধ্যে এই যে বেকার সমস্যা, এ দূর করার উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। স্কুলে শিক্ষিত, এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের মধ্যেই বেকার সমস্যা গুরুতর। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে মেয়েদের কাজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তারা যেন প্রায় সবরকম কাজই নিতে পারেন, করতে পারেন, সেদিকে নজর দিতে হবে। স্কুলের বিষয় বৃত্তি শিক্ষার দিকে (profession) মেয়েদের কিছু কিছু নজর গিয়েছে। এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। এদেশের সংবিধানে মেয়ে এবং পুরুষের সমান অধিকার আছে একথা বলা থাকলেও তাদের আসল অবস্থা সমান হয় না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে কোনদিনই মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবেনা। ছেলেমেয়েদের অবস্থাও সমান হবে না। প্রয়োজন হলে মেয়েরাও কাজ নিতে পারে, প্রত্যেক মেয়েকে, এইভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে ও তাদের কাজের ব্যবস্থা রাখতে হবে।*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সৌজন্যে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

: প্রবন্ধ

ধর্মঘট প্রসঙ্গে

সুব্রতেশ ঘোষ

সুপ্রতি কলকাতার কোন এক বিখ্যাত দৈনিকপত্র বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুর্দশার কারণ এবং তা প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এ উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং উল্লিখিত সংবাদ পত্রটির জাগ্রত চিত্তের পরিচায়ক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পপতি বা জীবনযুদ্ধে সফল বাঙ্গালীর অভিমত তাঁরা যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন—তাঁদের অধিকাংশের বক্তব্যেই মৌলচিন্তা বা জাগ্রত চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাধির কারণ প্রসঙ্গেও সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শোনা অভিযোগ, যথা, বাঙ্গালীর অল্পসন্তুষ্টি, শ্রমবিমুখতা ইত্যাদির ওপরে তাঁরা উঠতে পারেন নি। সমাধান প্রসঙ্গেও তাঁরা তাঁরা সুনীতিশিক্ষা জাতীয় পাঠ্যপুস্তকশোভন সদুপদেশ ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে আর কিছুই পাওয়া যায় নি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বা প্রাক্ যুদ্ধযুগের মনীষীদের অনুকরণের বাইরে একটি বক্তব্য অবশ্য তাঁরা জোরের সঙ্গে পেশ করেছেন। তাঁদের মতে বাঙ্গালীর আজকের দুর্দশার অন্যতম মূল কারণ শ্রমিক ধর্ম্মঘট।

এইসব শিল্পপতি, বাণিজ্যরথীদের বহুমূল্য পাদুকায় কোথায় যে কণ্টকবিদ্ধ হয় তা অবশ্য সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট এইসব ব্যক্তি ছাড়াও, ধর্ম্মঘটের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে, এমন কি অর্থনীতিজ্ঞ মহলের একাংশেও (শ্রমসঙ্কোচ অর্থতত্ত্বে বিশেষজ্ঞগণ বাদে) উদ্বেগ ও আশঙ্কা পরিলক্ষিত হয়। তাই ধর্ম্মঘটের ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি মোটামুটিভাবে সুপরিচিত। ধর্ম্মঘটের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়—এবং বিশেষ করে ভারতের মত উন্নয়মান অর্থনীতি (developing economy) তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়া ট্রামবাস্, জলসরবরাহ, বিদ্যুৎসরবরাহ ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণোপযোগী অত্যাবশ্যক কর্ম্মক্ষেত্রে (public utilities) ধর্ম্মঘট প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের অশেষ ক্লেশের কারণ হয়ে থাকে।

এই দু'টি অভিযোগের দ্বিতীয়টির যাথার্থ্য সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই। সর্ব্বজনোপযোগী অত্যাবশ্যক কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মঘট ছাড়াই বিরোধ মীমাংসা শ্রেয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে এ-ও স্মরণীয় যে এইসব কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্ম্মীরাও মানুষ এবং জীবনধারণোপযোগী বেতন বা কর্ম্মপরিবেশ সম্বন্ধে তাদেরও ন্যায্য দাবীদাওয়া থাকতে পারে। জনকল্যাণের কথা স্মরণে রেখে যেমন এদের ঘনঘন ধর্ম্মঘট থেকে বিরত থাকা উচিত, তেমনি এইসব কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচালকদেরও জনস্বার্থ ও নিজেদের কর্ম্মীদের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে অবহিত থাকা কর্ত্তব্য। অনেক সময় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফালালসা এই দায়িত্ববোধ গড়ে উঠতে দেয় না। এইজন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানেও শ্রমবিরোধ দেখা

দিতে পারে। প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে তা মেটান না গেলে মালিক প্রতিনিধি, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং নিরপেক্ষ সভাপতি নিয়ে গঠিত ত্রিপাক্ষিক বেতনবোর্ডের মত কোন প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক বিচারের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য নজর রাখতে হবে যাতে বেতন বোর্ডগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্য অযথা কালহরণ না করে।

কিন্তু সর্বজনোপযোগী অত্যাবশ্যক কর্মক্ষেত্র বা ইস্পাত ইত্যাদি উন্নয়নের পক্ষে অত্যাবশ্যক কয়েকটি মূলশিল্প ছাড়াও, যে কোন দেশে অন্ত বহুরকমের শিল্প এবং অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র থাকে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রগুলিতে বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির (compulsory arbitration) জন্য শ্রমআদালতের বা বেতনবোর্ডের এক্তিয়ার নিয়ন্ত্রণ করা ঠিক হবে না। বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির সাহায্যে ধর্মঘট রদ্দ করা যেতে পারে; কিন্তু কাজ চালু রাখা আর উৎপাদন বজায় রাখা এক কথা নয়। বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তিতে প্রায়ই উভয়পক্ষ অসন্তুষ্ট থাকে। দুপক্ষই তাই নিষ্পত্তির রায় এড়াবার চেষ্টা করে। ফলে যে কোন নতুন প্রশ্নে বিরোধ দানা বেঁধে ওঠে, নয়ত অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের অসহযোগের ফলে কাজ চালু থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই কারণেই এ যুগের শ্রমসংক্রান্ত অর্থতত্ত্ববিদ্‌রা শিল্পে শান্তি (industrial peace) বজায় রাখাকেই যথেষ্ট মনে করেন না। অর্থনৈতিক প্রগতির অন্যতম সর্ত হিসেবে তাঁরা শিল্পক্ষেত্রে সমভাব (industrial harmony) বা সৌহার্দ্যের ওপরেই বেশী জোর দেন। এঁদের মতে এই সৌহার্দ্য আনতে হলে বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির চাইতে সমষ্টিগত দরকষাকষিই (collective bargaining) বেশী উপযোগী। সমষ্টিগত দরকষাকষিতে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই কিছু কিছু দাবী ছাড়তে বাধ্য হন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যে সমাধান হয়, তা একটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ হয়। উভয় পক্ষ মেনে সমাধানে পৌঁছায় বলে চুক্তিটি মেনে চলতে উভয় পক্ষেরই নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে (কোন কোন দেশে এ' জাতীয় চুক্তিগুলিকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে এদের স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক করা হয়)। দেখাগেছে যে বিরোধ মীমাংসার এই পদ্ধতিতে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ও সৌহার্দমূলক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

কিন্তু সমষ্টিগত দরকষাকষির বিরুদ্ধে সমালোচকেরা একটি প্রধান আপত্তি তুলে থাকেন। দরকষাকষি বা আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হলে অবশ্য খুবই ভাল, কিন্তু তা' যদি সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তবে মতবিরোধ শেষপর্যন্ত বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির অভাবে ধর্মঘটে গিয়ে গড়াবে। এবং এঁদের মতে এর ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশের সর্বনাশ হয়।

আধুনিক অর্থতত্ত্ববিদ্‌রা কিন্তু এ যুক্তি পুরোপুরি মানেন না। ধর্মঘটের ফলে অবশ্যই কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু ধর্মঘট না হলেও শ্রমিক অসন্তোষের জন্য বা অন্য নানা কারণে উৎপাদন ব্যাহত হ'তে পারে। ধর্মঘটের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে এ দুরকম ক্ষতির তুলনা করে দেখতে হবে।

ভারতবর্ষে একটি হিসেবে দেখা গেছে যে ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ধর্মঘট বা লক-আউটের জন্য প্রতি কর্মী পিছু গড়পড়তা মোট নয় দিন নষ্ট হয়েছে অর্থাৎ এই সময়ে প্রতি বৎসর কর্মীপিছু গড়পড়তা মাত্র দেড়দিন নষ্ট হয়েছে। অপর পক্ষে অন্য একটি নির্ভরযোগ্য হিসেব অনুযায়ী প্রায় একই সময়ে কাজে অনুপস্থিতির (absenteeism) জন্য কর্মীপিছু প্রতি বছরে গড়পড়তা ৩২দিন

(১) B. Day'...Freedom of Association and Industrial Relations in Asian countries, International Labour Review (Geneva) May, 1955, p. 470

লোকসান হয়েছে। এর মধ্যে গড়পড়তা চব্বিশ দিন নষ্ট হয়েছে শুধুমাত্র দুর্ঘটনা বা শ্রমিকের অসুস্থতার জন্য। সুতরাং এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মঘটের জন্য উৎপাদনের কিছু ক্ষতি হলেও তা ভয়াবহ নয়। বরং কাজে অনুপস্থিতি ইত্যাদির ফলে যে ক্ষতি হয় তা' অনেক বেশী। এবং এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় এই যে বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির সাহায্যে বা ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করে কারখানা চালু রাখা যায়; কিন্তু তাতে নানা অজুহাতে শ্রমিকেরা অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা বা কাজে উপস্থিত হয়েও কাজ কম করা আটকান যায় না। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঘট বিরোধের জন্য সরকার বা মালিকপক্ষ যে উদ্যম দেখান তার সমপরিমাণ উৎসাহ তারা যদি শ্রমিকের অসুস্থতা নিবারণ বা দুর্ঘটনা নিরোধের জন্য দেখাতে পারতেন, তবে জাতীয় উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক প্রগতি অনেক বেশী দ্রুততর হ'ত।

এই সিদ্ধান্ত শুধু যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাই নয়। এশিয়ার অন্যান্য দেশের পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা গেছে যে কোথাও শ্রমবিরোধজনিত ক্ষতির হার ভয়াবহ নয়। Mr B. Dayaর হিসাব মত ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রতি কর্মীপিছু শ্রমবিরোধজনিত বাৎসরিক ক্ষতির গড়পড়তার পরিমাণ সিংহলে দেড় দিন, এবং ব্রহ্মদেশ, জাপান ও পাকিস্তানে চার থেকে পাঁচ দিন।

এ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক গবেষণার ভিত্তিতে A, Kornhauser, R. Dubin এবং A. M. Ross বলছেন যে সে দেশে ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা মোটামুটিভাবে শিল্পগত দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকের সংখ্যার সমান থাকে। এই তিনজন বিশিষ্ট শ্রমসংক্রান্ত অর্থতত্ত্ববিদের মতে যে সমস্ত কারণে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মধ্যে ধর্মঘটের ক্ষতিকারক শক্তি নিতান্ত সামান্য।

তবে এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে সামান্য ক্ষতিও ক্ষতিই। এবং তা' এড়াতে পারা সেলেই ভাল। কিন্তু তা' এড়াবার পন্থা জবরদস্তি, আইনের ভাঙাবাড়ি, বা আদালতের বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি নয়। বরং শ্রমিকদের অবস্থার বাস্তব উন্নয়ন এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থাই সেজন্য শ্রেয়। সর্বজনোপযোগী অত্যাবশ্যক কাজগুলি সম্পর্কে অবশ্য ধর্মঘটের বিপদ আরও বেশী। সেখানে একদিনের ধর্মঘটও সমাজজীবনের পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় কর্মক্ষেত্রগুলি ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রমকেই নিয়ম বলে চালাবার চেষ্টা স্বার্থসিদ্ধির উপায় হ'তে পারে কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থনীয় নয়।

(৪) K. A. Zachariah—Industrial relations and Personnel problems, p. 59

(৫) Industrial conflict, P. 8.

ফুরসৎ

ডাঃ জয়প্রসাদ মিত্র

'ফুরসৎ' কথাটা আরবী। বাংলাতে এ-সব আরবী ছাকো ব্যবহার করি। কবে, কোথায়, কোন্ বাঙালী প্রথম কোন্ সাহিত্যিক রচনার মধ্যে এ-কথাটি লিখতে লিখতে দীর্ঘশ্বাস যখন ফেলেছিলেন, সেই ভাবনা আজ মনে এলো। কারণ,—ফুরসৎ নেই। 'ফুরসৎ' মানে, অবকাশ, —মানে, অবসর! কোন্ ফুলের আড়ালে, পাখির বাঁকে, ধৈর্যের এবং প্রতীক্ষার পরপারে সেই বিরলের সন্ধান মিলবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতেই কাজ থেকে কর্মান্তরে মন দিতে হয়। ফুরসৎ যে বিশেষ একরকম উপলব্ধি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, সংসারে দায়িত্বের ওপর দায়িত্ব এগিয়ে আসে,—ঘড়ির কাঁটা যথারীতি এগিয়ে চলে,—কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর, কিন্তু একথা মানতেই হয় যে 'ফুরসৎ' মানে, ছেদ নয়, অতিক্রান্তি নয়, দিনের বিশেষ প্রহরও নয়, রাত্রির বিশেষ যাম ও নয়। ফুরসৎ এক-রকম অনুভূতি। অবকাশ ব্যাপারটাই পুরোপুরি মানসিক।

টেবিল, চেয়ার, বইয়ের খোলা পাতা, কলমের করুণ বেগ,—আর এরই মধ্যে ঘড়িটার টিক্-টিক্, রাস্তায় মোটর গাড়ির আওয়াজ,—মনের বিচিত্র গতি,—ভেতর থেকে কে যেন নির্দেশ করছে: 'কটা বাজলো'—দর্পণে প্রতিবিম্ব আসছে,—আসছে আর মিলিয়ে,—আর, এই বিচিত্রের ঘটনা এড়িয়ে একটা অভিপ্রায় এগিয়ে চলেছে পরিমেয়ের পথে—উদ্বেগ থেকে ফলের অভিমুখে,—সাধনা থেকে সমাপ্তির আশায়। যে-মানুষ সীমা থেকে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায়, প্রত্যক্ষ উদ্বেগবোধ থেকে ছাড়া পেয়ে অনিবিষ্ট পৃথিবীর উদ্দীপনায় বেঁচে ওঠবার সুযোগ যার বার-বার হাতে আসে,—যে খাঁচার বাইরে দিন কাটায়, শাসনের নাগাল উজিয়ে দিনের মধ্যে অন্তত কয়েক প্রহরের জন্যেও নিজেকে যে স্বাধীন ভাবতে পারে, সেই সার্থক মানুষের সংখ্যা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সাহিত্যে এ-অভাব কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়। একালে সে চিহ্ন দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু থেকে আজ পর্যন্ত এই সতেরো আঠারো বছরের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্পি মনের কাজ যে বন্ধ হয়ে গেছে, তা নয়। বরং অনেক বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে,—নতুন নতুন মানদণ্ডও আসছে। কিন্তু তবু কারও যেন ফুরসৎ নেই। মানুষের বাইরের খোলসটাই চোখ ঝলসে যাচ্ছে, ভুল বস্তুভারে কেবলই হাঁপ ধরছে, মতবাদের ওবোটে এবং অবসাদের প্রাচুর্যে মাঝে মাঝে সত্যিই এই ব্যাপক বহির্মুখিতা আর ভালো লাগে না। পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে। আগেকার দিনে জাতিতে—জাতিতে, দেশে-দেশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে যে সব পার্থক্যের সুযোগ ছিল, ক্রমশ সে সব বিভিন্নতার দিন বুঝি শেষ হয়ে এলো। মনে পড়ে, ১৩০৪ সালে 'প্রবাসী'তে মণিলীকান্ত গুপ্ত লিখেছিলেন—"একালে ইচ্ছা হইলেও আর একালে কোথাও নিভৃতে থাকিবার উপায় নাই; বাস্তবিকই পৃথিবীর মহাবেলায় একেবারে হাটেরই মাঝে

'আমরা সকলে পসরা খুলিয়া একাকার হইয়া বসিয়া গিয়াছি।"

একলা থাকার অধিকার নয়, মুক্তভাও নয়,—জনতার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতেও কুণ্ঠা নেই; কিন্তু তবু স্বাতন্ত্র্য চাই। সাহিত্যে লেখকদের দলবদ্ধ আন্দোলন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। সব সাহিত্যেই মাঝে মাঝে শ্রেণী বড়ো হয়ে ওঠে, প্রথা প্রাধান্য পায়, একের অভিপ্রায় অন্যের অভ্যাসের নীচে তলিয়ে যায়। ইতিহাসে তার নজীর বিরল নয়। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যযুগে প্রধান যে-দুটি ধারা টিঁকে ছিল তাদের একটিকে বলা হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক (feudal), অন্যটিকে সন্ন্যাসপন্থী (monastic)। একজন সমালোচক বলেছেন যে মধ্যযুগের সাহিত্য পড়তে-পড়তে একালের পাঠকের মনে হতে পারে যে ধূলি-জালাকীর্ণ কোনো এক বাদুড়ে চোকা গেছে বুঝি, চারদিকের জীর্ণতার মধ্যে ইতস্ততঃ কয়েকটি সূর্যরশ্মির রেখা এসে পড়েছে সেখানে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্য-শিল্পী চসারের কথাপ্রসঙ্গে বলা হয় যে, সেই বিরলদ বিস্তারের মধ্যে চসারের লেখা যেন হঠাৎ খুঁজে-পাওয়া প্রাণের একটা সরাই। আগেকার আমলের অনুপ্রাসময় অ,লো-ডাকৃশন কবিতার যাঁরা রাস্তা ছেড়ে চসার যে নতুন পথ ধরেছিলেন, তাতে ফরাসী কাব্যরীতির মাধুর্যের ছোঁওয়া লেগেছিল। পূর্বতন প্রথার আনুগত্য মাত্র না করে চসার বরং তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যযুগের ভাষা কেটে গিয়েছিল চসারের কিছু আগেই। ইটালি আর ফরাসীদেশ থেকে সে যুগে সাহিত্য রাজ্যের নতুন যে আস্বাদের হাওয়া উঠেছিল, সেই হাওয়াতেই তিনি তাঁর ডানা মেলে দিতে উৎসাহী ছিলেন। দান্তে, পেত্রার্কা, বোকাশিও-র আদর্শ তাঁকে মানবধর্মে আত্মবাহিত হবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। ইংলণ্ডে নর্মান-বিজয়ের প্রায় তিনশ' বছর পরের যুগের মানুষ ছিলেন তিনি। দেশের জনসাধারণ সে-সময়ে বিজেতার ভাষা মেনে নেয়নি; তবে, রুচিবান অভিজাতদের মধ্যে ফরাসীর ফ্যাশন চালু হয়েছিল—সম্রাট তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাণী ফিলিপা ছিলেন ফরাসীর পক্ষপাতী; জন গাওয়ার এবং অন্যান্য ইংরেজের কলমে ফরাসীর চর্চা চলছিল।

পুরোনো রীতির লেখকদের মধ্যে চসারের সমসাময়িক কবি উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ডের নাম প্রসিদ্ধ। কল্পনা, উদ্দীপনা, আন্তরিকতা ইত্যাদি গুণে ল্যাংল্যাণ্ড তো সমৃদ্ধ ছিলেনই, তাছাড়া ছবি আঁকবার শক্তিতে চসারের তুলনায় তাঁরও খ্যাতি কিছু কম ছিল না। রূপকে এবং নীতিগর্ভ রচনাতে তাঁর বিশেষ দক্ষতার কথা যাঁরা স্বীকার করেছেন, তাঁরাই আবার একথাও বলেছেন যে একালের পাঠকের চোখে ল্যাংল্যাণ্ড যেন অতীতের জীবাশ্মবৎ। যে আগুন আগেই নিভে এসেছিল, সেই অগ্নিকুণ্ডের ছাই থেকে তিনি নতুন শিখা ফিরে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। ল্যাংল্যাণ্ডের' Piers Plowman' এর অনুপ্রাস-রণিত ছত্রে ছত্রে নিয়মিত দমক-ফেরের ফলে যে যান্ত্রিকতা এবং এক-ঘেয়েমি ঘটেছিল, চসারের' Canterbury Tales এর সৌন্দর্যময় বহমান স্রোতপ্রবাহে এসে তা থেকে তৃপ্তিকর পরিবর্তন অনুভব করা গেল। চৌদ্দ শতকের প্রতিনিধি-স্থানীয় ইংরেজ কবি হিসেবে তো বটেই, তাছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের সারা ইতিহাসের মধ্যেও তাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকারযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে মধ্যযুগ বলা হয়, তার বিস্তার প্রায় শ' পাঁচেক বছর। খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত সেই পাঁচশ' বছরের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিত কথা,—রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-এর বঙ্গানুবাদ,—বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য—এবং এই তিন শ্রেণীর রচনা ছাড়া আরো কিছু কিছু—রচনা জন্মেছে। এই

সুদীর্ঘ বিস্তারের মধ্যে সত্যিকার স্মরণীয়তম ব্যক্তিত্ব হিসেবে কোন্ কোন্ লেখকের নাম প্রথমেই মনে পড়বে, সে প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অনেক কথা উঠবে। কারণ, প্রচলিত পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি, —চৈতন্যজীবনীলেখকদের মধ্যে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ ও লোচনদাস,—রামায়ণ-অনুবাদকদের মধ্যে কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, রামানন্দ যোষ,—মহাভারত-কাব্যের কাশীরাম ছাড়া আরো কয়েকজন, আরাকানের আলাওল প্রভৃতি,—এবং মঙ্গলকাব্যের একাধিক লেখকের নাম তো বটেই, তাছাড়া ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত হাল-আমলের কোনো কোনো কবির উল্লেখও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতে চাইবে। তাঁদের ব্যক্তিত্বের চেয়ে সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব, অর্থাৎ দলচর সাহিত্যিকদের দলীয়তার পরিচয়টাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বেশি স্মরণীয়, সন্দেহ নেই। তবু, তারই মধ্যে কারো কারো ভঙ্গি, কারো বা বক্তব্য অল্পবিস্তর স্বকীয়তার সমৃদ্ধ বলতে হয়। সুতরাং সেকালের সর্বাধিক অনন্যতা দেখা গিয়েছিল কোন্ বিশেষ কবি বা কবিদের মধ্যে, সে-প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ব্যক্তিত্ব, অনন্যতা, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি শব্দের প্রতিধ্বনিতে ভাবনার গতি কি অব্যাহত থাকবে?

অর্থাৎ ব্যক্তিগত মর্জির ব্যাপারটা মোটেই উপেক্ষার জিনিস নয়। ফুরসৎ ব্যতিরেকে সে মর্জির সম্ভাবনাও দেখা যায় না। মানুষ ফুরসতের কাঙাল, অবকাশের উপাসক। বহির্মুখিতার মধ্যেও সে অন্তর্মুখী হবার সুযোগ খোঁজে। বিরুদ্ধ পরিবেশে পড়লে সেই প্রয়াসই আবার নতুন উৎসাহে ধরে দেখা দিতে পারে। হয় ভাবালুতা, নয় তো ভাবাতিরেক! শৈথিল্যের কতো যে নমুনা, কতো যে ছেঁদো! একালে সেরকম উৎপাতেরও অন্ত নেই। মন-ভরছে না বলেই মনের দিকে বেশি নজর পড়ছে। যা ধরা যায় না, তাকেও ধরা চাই! গভীরে যাবো, অতলে ডুব দাও! একালের গল্পে মনস্তত্ত্ব, কবিতায় মনস্তত্ত্ব,—উপন্যাসে, নাটকে সর্বত্র মনস্তত্ত্ব। আঠারোর শতকে এ ঝোঁক ছিল না, উনিশেও না। পৃথিবীর সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস-এর প্রথম চর্চা ঘটেছিল আমাদের শতকের প্রথম দিকে,—আজ থেকে বছর চল্লিশেক কি তারও কিছু আগে। মার্সেল প্রুস্তের Remembrance of Things Past-এর প্রথম দুটি খণ্ড বেরিয়েছিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রুস্ত ছিলেন জাতিতে ফরাসী। ইংলণ্ডে ডরথি মিলার রিচার্ডসন নামে এক ভদ্রমহিলার লেখা বারো-খণ্ডের বই Pilgrimage-এর প্রথম খণ্ডটির প্রকাশকাল গেছে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে; তাঁর সে-বইয়ের শেষখণ্ড অনেকদিন পরে ১৯৩৮-এ ছাপা হয়। প্রুস্ত এবং রিচার্ডসন-এর বই দুখানির প্রথম প্রকাশকালের ধারাবাহিক সময়ে আয়র্লাণ্ডের অধিবাসী জেম্‌স্ জয়সের A Portrait of the Artist as a Young Man বইখানির ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। সে ছিল ১৯১৪ সালের ঘটনা।

একজন সমালোচক লিখেছেন যে, ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ র মধ্যে এই ভাবে বাইরের ঘটনার আকর্ষণ এড়িয়ে উপন্যাস অন্তর্মুখী হতে আরম্ভ করেছে। একশ' বছর আগে ব্যালজাক যে বহির্জগতের ধারাভাষ্যে মন দিয়েছিলেন, সেখান থেকে সরে এসে এঁরা মন দিলেন অন্তর্জগতের দিকে। এঁদের তিনজনের রচনাভঙ্গির মধ্যে সাদৃশ্যের লক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে। তিনজনেই আত্ম-জীবনীর মর্জি বেছে নিয়েছিলেন; তিনজনের লেখাতেই কাব্যিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল; সন্ধান, অভিমান বা তীর্থযাত্রার আগ্রহ তিনজনের গ্রন্থ-নামের মধ্যেই বিদ্যমান। অনুভূতি, সংবেদন ও অন্ত-র্জীবনের বিষয়ে তিনজন লেখকের মধ্যেই বিশেষ সচেতনতার চিহ্ন চোখে পড়ে।

সমালোচক-মশাই আরো এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে প্রুস্তের ক্ষেত্রে দীর্ঘ রোগভোগের যন্ত্রণা এবং সেই সঙ্গে ঘরে বন্ধ থাকার দুর্ভাগ্য,—আর, জয়েসের আজন্ম দৃষ্টি-ক্ষীণতা এবং সেইসঙ্গে তাঁর মনে-প্রাণে নৈশবের বাসস্থান ডাবলিন শহরের প্রবল আধিপত্য লেখার মধ্যে বিশেষ-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রুস্ত যেন বাইরের ধুলো—মোঁওয়া, ছুঁয়ে-স্পর্শ সম্পূর্ণ পরিহার করে একমনে আত্ম-বিশ্লেষণ করে গেছেন; তাঁর স্মৃতিরোমন্থনের স্বভাব তাঁকে পেয়ে বসেছিল। অতীত থেকে বর্তমানের দিকে তাঁর স্মৃতিসূত্র কিছুদূর এগিয়ে এসেই আবার অতীতে ফিরে গেছে। শ্রীমতী রিচার্ডসনের স্বাস্থ্য যদিও এঁদের তুলনায় আরো ভালো ছিল তবু তাঁরও ছিল চোখের দোষ। শিল্পী হিসেবে তাঁর আয়ুষ্কাল যদি এই তিনজনের মধ্যে সকলের শেষে ধরা যায়, তাহলেও তাঁর বিশেষত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রুস্ত তাঁর কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন স্মৃতিকথার ভঙ্গিতে; শ্রীমতী রিচার্ডসনও প্রথাগত রীতিই মেনে নিয়েছিলেন। এঁদের দুজনের লেখাতেই উপন্যাসের সাধারণ সূচনা-রীতি বজায় ছিল। কিন্তু জয়েসের মৌলিকতা তাঁর বইখানির প্রথম লাইন থেকেই চোখে পড়তে বাধ্য। নিজেকে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে নিজের মনের মনস্রোতের পুরোপুরি উদ্ঘাটনে মন দেওয়া সহজ কাজ কি শক্ত কাজ সে-বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তি যাই বলুন না কেন, এ-কাজ যে নতুন এবং চমকপ্রদ, তাতে সন্দেহ নেই। পাঠককে যেন সরাসরি লেখকের মনোরাজ্যে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হোলো। লেখকের অন্তরের ছবি তাঁর সামনে তুলে ধরা হোলো। গল্পের ধারাবাহিকতা, গ্রন্থিবন্ধন, অধ্যায়-বিন্যাস ইত্যাদি কোনো কিছুতেই নিজেকে সংকুচিত না করে, উপন্যাসের এই যে নতুন পথ খোলা হোলো, এতে ঔপন্যাসিকের কর্মকর্তার দায়িত্ব ঘুচলো বটে কিন্তু অসলের মনোভাবনার রূপ ধরে উঠলো।

সেই অসলের আতিশয্যের ভারই গুরুতর। আজ-কাল শিল্পীর চতুর্দিকে কেবলই সেইরকম ভার বাড়ছে। সেই ভার লাঘবের ভাবনাই পুনরায় ফুরসৎ-এর প্রসঙ্গটা মনে করিয়ে দেয়। তাঁরা কোন্ উপায়ে ফুরসৎ ফিরে পাবেন? কাজ থেকে পালিয়ে বাকি কাজ তুলে? সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বাকি লেখার সত্যিকার তাগিদের জন্যে আরো দীর্ঘ, দীর্ঘ প্রতীক্ষার জোর? প্রয়াসের মাত্রা বাড়ছে বলেই কি প্রেরণার দান ক্ষীণ হয়ে এলো?

হঠাৎ এসব কথার মীমাংসা মিলবে না। তবে, ব্যস্ততার মধ্যেও ছুটির আকাশ দেখা দেয়। কাজের মধ্যেও অকাজের বাঁশি বাজে। সে বাঁশি কানকে বেলে না, সে আকাশও সমবায়ের আঁকশিতে ধরা দেয় না। শিল্পীকে বরং শিকারী হতে হবে। ফুরসৎ জোটানো সত্যিই এক রকম মৃগয়া। হঠাৎ শুনলে কথাটা হয়তো অর্থহীন মনে হয়, তলিয়ে দেখলে ঠিক সেরকম লাগে না। কাজের অরণ্যে, উদ্দেশ্যের অতিরেকে, ফুল স্বার্থের এবং প্রাত্যহিক কর্তব্যের ঘন-বদ্ধ-করা অন্ধকারে পথ চলতে চলতে আরো এক গভীর উদ্দেশ্যের কথা মনে জাগিয়ে রাখাটাই লক্ষ্য সাধনার একমাত্র পথ। সেই অনিবার্যকে উপেক্ষা করাটা সুবুদ্ধি নয়। যে মানুষ বন্দুক বাগিয়ে ধরে ঠিকমতো হাঁটতে শেখেনি, বৃথাই তার শিকারের কল্পনা। কথাটি বিশদ করবার জন্যই আর একটু ব্যক্তিগত কথা যোগ করা যেতে পারে। উপসংহারে সেইটুকুই বক্তব্য। সেদিন একখানি শিকারের বই পড়ছিলাম। নতুন মৃগয়াশিকারীদের জন্যে তাতে এই নৈতিক সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণিহত্যা যখন অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য ব্যাপার,—তখন বন্দুকের গুলিতে নিরীহ পাখীর প্রাণান্ত ঘটানো অন্যায় বলাটা কিছু নয়। কারণ, প্রতিদিন মাংসাশী মানুষের জন্যে কতো প্রাণীরই তো প্রাণান্ত ঘটে

থাকে! আমরা কি মাংসাহার ত্যাগ করেছি? তাদা মাছ'যাঁরা উল্টোতে নারাজ, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু প্রতিদিন বাজারে গিয়ে মাছের বৈচিত্র্য এবং মাংসের কৌলীন্য সম্বন্ধে যাঁদের আগ্রহের অন্ত থাকে না, তাঁরা বৃথাই অহিংসার কথা বলেন! লেখক আরো বলেছেন যে, অ্যামেরিকার বড়ো বড়ো শহরে, মোটর-সাইকেলে ছড়িয়ে বেড়ানো কিংবা সাঁতারে সময় নষ্ট করা কিংবা এ ধরণের অন্যান্য খেয়ালে ডুবে থাকার চেয়ে বরং শরৎ-কালের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রশান্ত কোনো সকালে দশমিক-দুই-দুই নলের ঝকঝকে একটি বন্দুকের ভার বইতে সুখ বোধ করা অনেক কম বিপজ্জনক কাজ। তবে, সাবধান। নলটা যেন মাটির দিকে মুখিয়ে থাকে। যাঁরা ঘাড়ে বন্দুক উঁচিয়ে পাখি মারতে বের হন, কিংবা বন্দুকের নলটা যাঁদের হাসিখুসি মজির খাতায় নিজেদের শরীরের দিকে অথবা সঙ্গী বন্ধুদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাঁরাও সাবধান। সব সময়ে মনে রাখা দরকার যে, বন্দুকে গুলি ভরাই আছে—তা সত্যি থাক্ বা না-ই থাক্। আত্মরক্ষার দিকে শিকারীর নজর অটুট থাকা চাই। শিল্পীর ক্ষুরধারের কথা প্রসঙ্গে একথা ভোলবার নয়।

ওমর 'খৈয়ম' ও 'মেঘদূত' খ্যাত সুকবি নরেন্দ্র দেবের দেওয়ান-ই-হাফিজ

পারস্যের অমর কবি হাফিজের প্রেমোজ্জ্বল গজলের সচিত্র অনুবাদ: ৫৲

সাহেব বিবির দেশে (সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী) ৬৲

খেলার পুতুল : স্বাদুম্বর : আকাশ কুসুম

সর্বজনপ্রিয় মনোরম সামাজিক উপন্যাস, প্রত্যেকখানি ২৲

সুহাসিনী, 'গুপী কবিরাজ' প্রভৃতি হাসির গল্প সংগ্রহ ২৲

পূজাপার্বণে ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার মতো উপহারের বই

রাজপুতের দেশে ৩৲ : আনন্দ মেলা ২৲ : পরাগ ও রেণু ২৲

জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী ১৲ কৃষ্ণমাঝি পঞ্চ ২৲

অনেক দিনের অনেক কথা ২৲

মূল্যবান বই, ছাপা, বাঁধা, ছবি, লেখা, সবই উৎকৃষ্ট; কিন্তু, সকলে যাতে কিনতে পারেন তাই দাম যথাসম্ভব কম করা হয়েছে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

রম্য রচনা :

অষ্ট্রেলিয়ান্স ডিগ্রি

সুনন্দা ঘোষ

দক্ষিণ মেরুর উর্দ্ধে যে সুদূর তারা,
সে আমার নয়ন করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে—

নীরক্ষ-রেখার দক্ষিণ প্রান্তের এই নবীনা পৃথিবী অষ্ট্রেলিয়া কিন্তু আজও 'ডাউন আণ্ডারে'। অন্ততঃ ভারতবর্ষের সঙ্গে এর ভৌগলিক দূরত্ব এখনও যেন হ্রাস পায় নি।

শুধু ভারতবর্ষ নয় পশ্চিমী মানুষদেরও অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে মতামত অনুকূল নয়। একজন সাহিত্যিক অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে লিখেছেন, 'এ দেশে দৃশ্যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নাটকীয়তা বিরল। কোথাও এমন রহস্য বা রোমাঞ্চ নেই যা মানুষের নিঃশ্বাস কেড়ে নেবে। মেক্সিকোবাসী, আর্জেন্টিনা-নিবাসী, আরব দেশের লোক, সবারই একটা না একটা বৈশিষ্ট্য আছে শুধু অষ্ট্রেলিয়ার ঐ মানুষটি পুরোণ প্যান্ট আধখানা তুলে জুতোর আধাখি ভিতে ঢুলিয়ে ঘোড়ায় পা ঝুলিয়ে নিতান্তই নীরস ব্যক্তিত্বহীন হয়ে বসে রইল। এ কারণেই কি অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্যে প্রচণ্ড সে আবেগ, উত্তাপ বা তীব্রতা নেই যা হৃৎপিণ্ডকে মুঠো করে চেপে ধরবে।'

আমার মতে এ একটা মস্ত অভিযোগ যার কোন সত্যমূল্য নেই। অষ্ট্রেলিয়াতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই, রোমাঞ্চেরও অবধি নেই—সে শুধু এর ভৌগোলিক ভূমি বিস্তারের শস্যশ্যাম বৃত্তিকাময়ীরূপ ও উদাস অগাধ বিরল-বারি মরুপিও অথবা সমুদ্রের জলে চুল এলানো মৎস্যকন্যা। নীউনীর মত শহরই প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তার ওপরেও আছে মানুষ—অষ্ট্রেলিয়ার নবীন তরুণ মাটিতে ছিটকে আসা ইউরোপের জনপদ—এমন অনন্যতার বিচিত্রতায় যার চিত্ত মোহিত না হ'বে সে নিতান্তই নীরস।

আজ সকালে মিসেস চ্যাণ্ডলার ঘরে এসেছিল। উঁকি মেরে বল্লো "রেডিও লাগবে? ঠ্যাং ভেঙে খুব তো শুয়ে আছ।"

কাল ইউনিভারসিটিতে পা মচকে এসেছি এর মধ্যেই কি করে খবর পেলো কে জানে। বগলে করে নিজের ছোট রেডিও সেটটা নিয়ে এসেছে—নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় দুঃখ মোচনে—একই বাড়ীর প্রতিবেশী বিধবা ভদ্রমহিলা। ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলাম, পরিষ্কার মুখের ওপর বলে দিল, "বাজে বাজে ধন্যবাদ খরচ করো না তো। ঠ্যাং ভেঙেছে তোমার আর বিছানায় শুয়ে কি রেডিও শুনবো আমি। ইউ আর এ সিলি গার্ল।" তারপর একটা প্রচলিত গানের কলি ভাজতে ভাজতে বেরিয়ে গেল—এই ইউনিভারসিটির ক্লীনার মিসেস চ্যাণ্ডলার।

এই হল অষ্ট্রেলিয়া—সহজ ও মানবিক। ফর্মালিটির ধার ধারেনা—ইন্টেলেকচুয়ালিজমের বাড়িক নেই সাধারণের মধ্যে। মনটা এখনও যন্ত্রের ভারে পিষে যায়নি তাই হাসি-খুসীর অবধি নেই। ইতিহাসের বোঝা এদের খুব প্রাচীন নয়। তাই বর্তমানকেই দুহাতের মুঠোতে ভরে নিয়ে রং রস উপভোগ করে। এখানের বন্য বিশাল জীবন এদের প্রাণেও সমুদ্রের ঢেউ তুলিয়ে দিয়েছে। সীডনী হ'তে কুড়িমাইল দূরেও শুধু শ্যামবন আর অকলা কুমারী পৃথিবী—ক্যাঙ্গারু

উপত্যকার আদিম/বন্য প্রাণের রাজত্ব আর অ্যালিস স্প্রিংসের মরুভূমিতে বুমেরাং এ মাথা থেকে আজও আদিম প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান ঘুম নেই। পরের দিনের খাদ্য চিন্তা করবার মত খুব্‌ তা নেই তাদের বা নব্য অষ্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে।

তবে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ইয়োরোপের একটা ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ এই কুমারী পৃথিবীতে ছিটকে এসেছে। অনায়াসে না হোক অবশ্যম্ভাবী মিলন ঘটেছে গ্রীক আর ইংলিসে—ইটালিয়ান আর লাটাভিয়ানে—আদিম আর নবাগতদের। এখানের জনতা বহুবর্ণময় হবে সন্দেহ কি?

সকালে যাই বাজার করতে পাশের পিটারস্‌ কর্ণারে। মাছের দোকানের কালো চোখ মেয়েটি একগাল হেসে বলে "কেমন আছ আজ?" মাছ ওজন করতে করতে জিজ্ঞেস করে "কপালে ওটা লাল রংয়ের কি পরেছ তুমি জিজ্ঞেস করতে পারি।" তাড়া হয়েছে তবু মুহূর্তও খদ্দেরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ করে গ্রীক ব্যাবসায়িনী। বাহু ব্যাবসাদার এরা।

পাশের তরকারীর দোকানে ভয়ানক ভীড়—আলু মূলো কপি কিনি ইটালিয়ান ছেলেটা চোখের পলকে হিসেব করে দেয় ছ শিলিং। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করি "ছ শিলিং ঠেকেছ ভাল করে?"

চোখ পিটপিট করে নতুন করে হিসেব করে সাড়ে চার শিলিং ঠকাতে চেষ্টা-করা ইটালিয়ান ছোকরা। এখানে তরীর ব্যবসা এদের একচেটে। এরা পরিশ্রমী ও চালাক—অষ্ট্রেলিয়ানদের মতে ধড়িবাজ এবং কন্টিনেন্টের সব লোকদের মধ্যে নিকৃষ্ট। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়ানদের এমন অনেক বাঁধা ধরা সংজ্ঞা অনেকের মধ্যেই আছে। রবিবারে দিবসেক খেতে যাই, এতোনিয়ান যুবকটি ভাঙা ভাঙা অ্যাকসেন্টে, স্ট্যান্ড চায়।

চাইনীজ মেয়েটার একগাল হেসে ফ্রায়েড রাইস নিয়ে আসে আবদ্ধিনী মেয়েটী।

কিন্তু বৈচিত্র্য দেখতে হলে আসতে হবে হোপটাউন হাউসে আমাদের স্বনামখ্যাত (লর্ড হোপটাউন অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম গভর্নর জেনারেল) বোর্ডিং হাউসে।

মিসেস হোর্ণ এখানকার প্রাচীনতমা বাসিন্দা। কনভিক্ট খাটানোর কাজে এর পূর্বপুরুষ এসেছিল গভর্নর ফিলিপের সাথে। হাবে ভাবে পুরো উচ্চবর্গের ইংলিশ। আমাকে চুপি চুপি রান্না ঘরে বলছিলো "আমার পাশের ঘরে যে তাচ বাস করছে, তোমার কি মনে হয় সে সত্যি সত্যি তার বউকে বিয়ে করেছে?"

অবাক হয়ে আমি বলাম, "জানি না তো, কেন?"

মিসেস হোর্ণ গম্ভীর হয়ে বলেন, "আই ডাউট।"

পরমুহূর্তে উল্লিখিত যুবকের আগমন—রোজই যেমন আজও মিসেস হোর্ণকে দেখে খুব সাড়ম্বরে প্রকাণ্ড এক বাও করে বল্লো, "এই যে হোপটাউন হাউসের রাণী।"

মিসেস হোর্ণ দেখলাম অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। নাছোড়বান্দা ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপলো তারপর মিসেস হোর্ণকে আবার বল্লো "কি আপনার কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?"

মিসেস হোর্ণ মৌনী।

ছেলেটির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। চায়ের কেটলী হাতে ঝুলিয়ে ছেড়ে গলায় সে তখন গান ভাজতে সুরু করেছে, সী হ্যাজ ইন হার হ্যাণ্ড দ হোল ওয়ার্ল্ড—সী হ্যাজ ইন হার হ্যাণ্ড দ—হো.....ল ওয়ার্ল্ড..... " ঘর ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস হোর্ণ রাগে ফেটে পড়লেন—"আস্পর্দা দেখ। আমি অনেক দিন সহ্য করেছি আর আমি সহ্য করবো না। আমি আজই মিঃ কুনী কে (বাড়ীওয়ালা) বলবো। এখানে এরা হয়েছে টাকার পুতুল। টাকা পেলে যাতা যাতা সবাইকে বাড়ীভাড়া দেবে। অথচ আগে এই হোপটাউন হাউসে কত ডিসেন্ট লোকরাই না থাকতো।" তারপর আমার কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে

এসে বল্লেন, "জানো কাল রাত্রে কি হয়েছে—সারাদিন এই তো চীৎকার করে গাধার ডাকের মত গান করে লোকটা। কাল রাত বারোটা পর্যন্ত এই চীৎকার চালিয়েছে শেষে আমি আর থাকতে না পেরে ওদের ঘরে টোকা দিয়ে ওর স্ত্রীকে বলেছি (স্ত্রী কিনা কে জানে) তোমার স্বামী না কে ওকে ওই সুরোরের চিল্লানী থামাতে বলনা কেন?"

অপদার্থ লোকটা অমনি ঘরের মধ্যে থেকে বলে উঠেছে, "কে মিসেস হোর্ণ নাকি তুমিও আমার সঙ্গে যোগ দাও গানে তবে দুই সুরোরের চীৎকার চমৎকার জমবে।"

ততক্ষণে ১৭ নম্বর ঘরের ওয়েষ্ট্রেলিয়া অধিবাসিনী বরেল বারান্দার রিঙ্গে কি রাখতে এসেছে। মিসেস হোর্ণ তার দিকে চেয়ে বল্লেন "ডোণ্ট ইউ থিংক ইট্‌ইজ ট্রেডফুল।"

বরেল নির্বিকার মুখে বল্ল, 'আমার' কিছু আসে যায় না। "ভাজনট ওরি মি এ্যাট অল্।"

মিসেস হোর্ণ দৃঢ়ভাবে বল্লেন "ইট্ উইল ওরি এনি বডি—" তারপর মুখ ফিরিয়ে "উইথ রিগ্রিং।"

অষ্ট্রেলিয়ানদের প্রিয় দিব্যি-র ভাষায়—"মাই ওয়ার্ড। অসভ্য, দিলখোলা অষ্ট্রেলিয়ানরা"—ইংলিসম্যনোভাবাপন্ন প্রাচীন অষ্ট্রেলিয়ানদের নিশ্চয়ই আলাদা করবে—কিন্তু সুখের বিষয় সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে জাত্যাভিমান বা "স্নিভিং" নেই। এরা তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় তা মনে হয় না। এদের মুখে অজস্র অষ্ট্রেলিয়ান স্ল্যাং লেগেই আছে। এমন কি স্কুল টিচারের মুখেও স্টাফরুমের আলস্যের অবকাশে ইটেলেকচুয়াল কথাবার্তা বসে বসবার সুযোগ পায় না। কোন ব্যক্তি উৎসুক পিতামাতা সম্বন্ধে তারা সরবেই মন্তব্য করে "আর নট্ দে ব্রাণ্ডি পেন ইন দি নেক্?" কোন মেয়ে ছেলে যৌথ তাই নিয়ে সহাস্য মন্তব্য হয়, "ও দি রাজেন হাসি।"

ছোট ছেলে মেয়েদের উল্লেখ করতে হলে সর্বদাই স্কুলটিচারেরা বলে "ও দোজ র‍্যাট্‌স্।"

ইংরেজী ভাষা অষ্ট্রেলিয়ানদের মুখে অদ্ভুত স্বাধীনতা আর স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে প্রায় একটা স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে পড়েছে। তার ওপরে অদ্ভুত কক্‌নি ধরণের অ্যাকসেণ্ট। এরা অবশ্য নিজের স্বতন্ত্র অষ্ট্রেলিয়ান উচ্চারণের জন্য বেশ গর্বিত। কোন ছেলে ইংরেজী উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলে প্রায়ই নাম কেনে—"সেই যে অক্সফোর্ড-উচ্চারণ নকল করতে চাওয়া ন্যাকা ছেলেটা?"

এদের দেশের সোনার রোদ, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এক আর্কস্ট্রীম আর 'হাইস' (rays) নিয়ে এরা দিব্যি পরিতুষ্ট। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের ধারণা ভারী ঝোঁয়া ঝোঁয়া। আমি যে টমুলে পড়াই সে টমুলের মেয়েরা আমি আসবার পরের দিন বাড়ী গিয়ে বলেছে "আমাদের দিদিমনি রোজ ভারতবর্ষ থেকে পড়াতে আসে, এমন কি ভাকও আনে না। বাড়ী গিয়ে খায়।"

তবে গত বৎসর দুয়েক হল ক্রমাগত ভারতীয় ছাত্র, রাজনীতিক, নর্তক, ম্যাজিসিয়ান (পি, সি, সরকার মাস কয়েক হ'ল এদের নিয়ে ঘুরে গেছেন) ও ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিসের কর্মচারীর আসা যাওয়াতে—অজ্ঞতায় কিছুটা আলো সঞ্চার হ'য়েছে।

তা সত্ত্বেও কিছুদিন আগে পোষ্টগ্রাজুয়েটের ছাত্রী এখানকার এক সেকেণ্ডারী স্কুলটিচার আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, "এখনও ভারতবর্ষে বিধবাদের পুড়িয়ে মারা হয় কিনা?"

কি কারণে জানি না এদের স্কুলের ইতিহাস, ভূগোলে প্রশান্ত মহাসাগর-প্রতিবেশীর মধ্যে—ইণ্ডোনেশিয়া, মালয়, ইণ্ডোচীন, শ্যামের উল্লেখ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ নেই।

তবে জানবার আগ্রহ এদের প্রচুর। এমন দিন যায় না যেদিন রাস্তায় বা বাসে বা ট্রেনে কেউ আলাপ সুরু না করবে, "আশা করি কিছু মনে করবে না, কিন্তু তুমি কি ভারতবর্ষ থেকে এসেছো।"

বাসকণ্ডাক্টারদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিক যারা ভারতবর্ষে শিখেছিল—তারা একটু একটু হিন্দিতে কথা বলতে চায়। আর যা হোক এ জাতটা খুব বাক্যবিলাসী। পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখেনা নিজেরাই সেধে এসে আলাপ করে। স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে এটা খুব লক্ষ্য করা যায়—ওদের যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় বাড়ী সম্বন্ধে কিংবা পোষা কুকুর, কি বিড়ালছানার বিষয়ে—কি যে কোন কিছুর ব্যাপারে—ওদের সকলের হাত আকাশে উঠে যায়। ওরা পারলে বোধহয় সারাদিন বকর বকর করতে পারে। মুখচোরামী বা লজ্জার লবলেশ নেই।

সবচেয়ে যা বিশেষকরে বারে বারেই আমাকে আকৃষ্ট করেছে তা এদের ইনফর্মালিটি বা আদব কায়দা হীনতা। সেদিন ক্যানবেরা ফেরার পথে মোরী মাউন্টেন ক্রীমের একদল মজুর উঠেছিল, পাশের কামরায় যাচ্ছিল মেলবোর্ণ টিচারস্ কলেজের ছাত্রীরা। সঙ্গে অধ্যাপিকারাও ছিলেন। মজুররা অনায়াসেই হাত নেড়ে মেয়েদের ডাকে—"এই যে মেয়েরা এখানে সীট আছে এসো এসো সবাই মজা করে যেতে পারবে।" অংসল ষ্টেসনে নামার সময় মেয়েরা কেউ কেউ হাত তুলে বিদায় জানায় সেই অচেনা মজুরদের —"তোমার যাত্রা শুভ হোক বন্ধু। (হ্যাণ্ড এ হ্যাপি জার্নি মেট।)"

যন্ত্রযুগের লোহার চাকা এদের খেয়ালখুসীর হাসি একেবারে বন্ধ করে দিতে পারেনি এখনো। দিলখোস্ আরামদোস্তী পরিহাসপ্রিয় মানবিক অষ্ট্রেলিয়ান জাত এই মনকষাকষির হাইড্রোজেন বোমার পৃথিবীতে যেন এক ঝলক হঠাৎ খুসীর হাওয়া। আশা করা যায় আরো পঞ্চাশ বৎসর এরা তাই থাকবে এবং প্রাইমারী স্কুলের বাচ্চারা তখনো সুর করে এর বিখ্যাত কবি মেরী গিলমোরের কবিতা পড়বে :

'ও সীজনী টাউন ইজ মাই টাউন—অ্যাণ্ড আই উইল
হ্যাণ্ড ইউ নো,
আই উইল নেভার হ্যাণ্ড অ্যানাদার, হোয়ারএভার মাই
ফীট মে গো।"

দাশগুপ্ত কোম্পানী

আপনার বন্ধু বান্ধব
আত্মীয় পরিজনদের বলুন,
দাশগুপ্ত কোম্পানী মানে কী,
এবং সেটা কোথায়।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও
বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রেতা

— দাশগুপ্ত কোম্পানী

মানে নির্ভরযোগ্য একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান :
এখানে শিশু ও মহিলাদের সকলরকম কঠিন
ও জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

দাশগুপ্ত কোম্পানী
অভিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসকদের দ্বারা
প্রশংসিত ও পরিচালিত।

দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং
২২ বি হাজরা রোড : কলিকাতা-২৯

কবিতা

দেশান্তরক্ষ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দের কল্লোলিত সাগর পারায়ে
যে-দেশে এলাম, তার আকাশে মেঘের নিত্য নিশা।
অগ্নির মৌনের শিখা জ্বলে উঠলো বিচিত্রিত নারে,
তীরে নামতে লোলুপ প্রাবৃষা
হিংস্র শ্বাপদের মত ছুটে এল, তার
ধ্বনিত গতির আগে ছুটে এল ক্ষুব্ধ অন্ধকার।

কলসিত তারাগুলি আর মনে পড়ে না। চন্দ্রমা
পঞ্চমীর মধ্যরাতে সুধাকণ্ঠে বাসন্তী আলাপ
শোনায় না। ত্রস্ত ঢেউ কাঁপায় না জ্যোৎস্নার সুষমা
লীলার আবেশে। আঁখি যদি মেলে স্বপ্নের কলাপ ;
যারা আসে ভীড় করে, তারা—
শ্রাবণের শেষরাতে ক'টি ষড়যন্ত্রের পাহারা।

জানি সে আসবে না, তাই কেউ
কুসুমধনুর ছিলা বীণা করে বাজাবে না। পাশে
রাত্রির ফোয়ারা ঢেলে সমুদ্রের ঢেউ
নীলাঙ্কিত করবে না। আকাশে
মেঘের উপরে মেঘে নিশ্ছিদ্র যা দেখি চারিদিকে
সে আড়াল করে রাখে শুধু সেই মোহন মূর্ত্তিকে

কবিতা

সোনালী সকাল

শিবদাস চক্রবর্তী

অনেক বৃষ্টির পরে উঠেছে রোদ্দুর,—
অনেক কান্নার পরে ওষ্ঠপুটে প্রাণ-খোলা হাসি।
যে-আকাশ এতদিন ঢাকা ছিল কালো মেঘে মেঘে
সে-আকাশ কেঁপে ওঠে আলোর আবেগে।
নীড়-ছেড়ে দলে দলে ভীড় কোরে শালিক, চড়ুই
আপন অবোধ ভাবে করে তাই সূর্য-অভ্যর্থনা।
রূপালী ধানের শীষ ছুঁয়ে যায় উদাসী বাতাস,
দূরে নীল নদী তীরে হাসে শুভ্র কাশ।
জাফরাণী রাঙা রোদে মেলে দিয়ে সবুজ আঁচল
মুখরা প্রকৃতি আজ মূক হয়ে কাকে যেন খোঁজে।
আসন্ন হয়েছে পূজা—শিশুদল পুলকে চঞ্চল
শিউলী গাছের নীচে ফুল নিয়ে করে কাড়াকাড়ি।
এমন খুশীতে ভরা শরতের সোনালী সকাল
মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছি একা বসে জানালার ধারে।

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাস

স্মৃতিচিত্র :

যোগেশচন্দ্র বাগল

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসকে আজ স্মরণ করি। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় কমপক্ষে পঁচিশ বৎসরের। শেষ বার বৎসর উত্তর কলিকাতার এক বিরাট ভবনে বাসিন্দারূপে এক সঙ্গেই কাটাইয়াছি। তখন অতি নিকট হইতেই তাঁহাকে দেখিবার বুঝিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। "Familiarity breeds contempt" —এই ইংরেজী কথাটির তিনি ছিলেন যেন মূর্ত্তিমান্ প্রতিবাদ। অতিপরিচয় হেতু তাঁহার উপর তো মনে কখন বিরক্তি বা ঘৃণার ভাব উদয় হয় নাই। রামনাথ ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু অতি মহৎ। তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সাইকেলে চড়া ভূপর্য্যটক রামনাথের ছবি বিবরণ সহ পত্রিকায় ছাপান হইয়াছিল। সে বিবরণ হয়ত তখন পড়িয়া থাকিব। 'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত হইবার পরই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। লেখার ভিতর দিয়া তাঁহার পর্য্যটনের পরিচয় ইতিমধ্যেই পাইতে ছিলাম। এবারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিলাম। ঠিক আঁটসাট দোহারা চেহারা, দীর্ঘাকৃতি বলা চলে না, তবে খর্ব্বাকারও নয়। খুব চটপটে, আপিসে আসিয়াছেন, কিন্তু স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না; কোন অজানা দেশের ডাক যেন তাঁহার কাণে পৌঁছিয়া গেছে। কিটকাট তিনি কখনও ছিলেন না, তবে অগোছালোও নয়। প্রথম সাক্ষাতেই এই কৃতিমর বুদ্ধ-সন্ধান সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা হইয়া গেল।

ইহার পর বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে আবার দেখা হয় নাই। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেখার মাধ্যমে তাঁহার আশ্চর্য্য পর্য্যটন কাহিনীর পরিচয় পাইতাম। যে অর্থে বর্ত্তমান যুগে "লেখক" বলা হয় তাহা তিনি ছিলেন না। শেষ জীবনে অবশ্য রচনা কতকটা সহজ হইয়া আসিয়াছিল। আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন তিনি সবে লেখায় হাত দিয়াছেন। তাঁহার তখনকার রচনা পড়িয়া মনে হইত তিনি দেশ বিদেশের যে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত তাঁহার লেখনী-মুখে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু রচনা পারিপাট্যের অভাব হেতু তাহা প্রকাশের পথ পাইতেছে না। যেটুকু লেখার মূর্ত্ত হইতেছে তাহাও যেন অস্পষ্ট ঝোঁয়াটে হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষে কত ক্লেশদায়ক, মূল পাণ্ডুলিপি যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও সংশোধনের ভার প্রথম হইতেই আমার উপর পড়ে। সুতরাং প্রতি সপ্তাহেই ভূপর্য্যটক রামনাথকে 'সাহিত্যিক' রূপেও দেখিবার সুবিধা হইতেছিল।

রামনাথ বিশ্বাস ভূপর্য্যটক ঠিকই, কিন্তু তাঁহার পক্ষে লেখনী ধারণ বাতুলতা মাত্র—এই রূপ একটা মত তখন কি আমি কি রূপে সাহিত্যিক মহলে চালু হয়। এক সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁহার রচনা সম্বন্ধে অতি তাচ্ছিল্য-পূর্ণ উক্তি করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু রামনাথ বিশ্বাস তথাকথিত লেখক বা সাহিত্যিক ছিলেন না;

সাহিত্যিকের দায়িত্ব তিনি বহন করেন নাই। তিনি সাহিত্যিক নন। লেখাপড়া শেখেন নাই, বিদ্যা অতি সামান্য—এ ধরনের কথা তিনি বহুবার কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছেন। কৃতী সাহিত্যিক বা লেখক না হইলে কি হয়, তিনি জীবন দ্বারা বাংলার তরুণ সমাজের সম্মুখে যে আদর্শ ধরিয়া দিয়াছিলেন তাহার তুলনা মেলা ভার। আর এই খানেই তাঁহার কৃতিত্ব। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব বিশ বৎসর বাংলার তরুণ সমাজ দেশমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলো। স্বাধীনতার সত্যকার ইতিহাস কোনদিন রচিত হইলে এ বিষয়টি তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটী ভীষণ দোষ বা ত্রুটিও আমাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা হইল আমাদের "ঘরকুণো" মনোবৃত্তি। সে যুগের বাঙালী এই মনোবৃত্তি ছাপাইয়া উঠিয়াই 'বড়' হইয়াছিল। গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই দূষিত মনোবৃত্তি যেন আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। উত্তর-স্বাধীনতা যুগে ইহার কুফল আমরা মর্মে মর্মে পাইতেছি। কিন্তু রামনাথ বিশ্বাস ছিলেন এই মনোবৃত্তির একটি জীবন্ত প্রতিবাদ। সেই যুগে যখন আমরা রাজনৈতিক কারণে একান্ত ঘরমুখো হইয়া পড়িতে-ছিলাম, তখন তিনি আমাদের বাহিরের গীতিও শুনাইয়াছেন। 'মোহনের' দিগ্বিজয়ী অভিযান কাল্পনিক নিশ্চয়ই, কিন্তু রামনাথের ভূপর্যটন ছিল নিতান্তই বাস্তব। তাঁহার অম্লান লেখনী মুখে এই বিষয়টিই তখন আমি বারবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম।

রামনাথের সঙ্গে 'দেশ'-কর্তৃপক্ষ তাঁহার পর্যটন বৃত্তান্ত প্রকাশ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতিসপ্তাহে তাঁহার লেখা আসিত এবং আমাকে ঐসব সংশোধনান্তর প্রকাশযোগ্য করিয়া তুলিতে হইত। তখনই রামনাথ বহু দেশভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি বেশীরভাগ সাইকেলে এবং কখনো কখনো পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। ভারতবর্ষের পর্যটন কাহিনী আমরা ছাপি নাই। বিদেশ ভ্রমণের কথাই আমরা প্রকাশ করিতাম। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা তখন আমরা ছাপিতে আরম্ভ করি। ঐ অঞ্চলে বন জঙ্গল, জীবজন্তু, লোকজন যেখানে যেমনটি দেখিয়াছেন তেমনিভাবেই বিবৃত করিতেন। সংশোধনান্তর যখন প্রকাশিত হইত তখন তাহা শুধু পাঠযোগ্যই নয়, পাঠক-পাঠিকার নিরতিশয় হৃদয়-গ্রাহ্যও হইত। মূল লিপি ও প্রকাশিত লেখার মধ্যে ভাষাগত মিল খুব কমই থাকিত। বিষয়বস্তুটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা সংশোধন করিতাম। সম্পাদনার ইহাই রীতি। একটি লেখার পাণ্ডুলিপি আসিল। তাহার মধ্যে এক স্থলে দেখি, তিনি লিখিয়াছেন, "আমি Suited booted হয়ে সেখানে সেলাম।" আফগানিস্থান ভ্রমণের কাহিনীগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল; কোন কোন লেখার একেবারে "খোল নলিচা" পর্যন্ত বদল করিতে হইত। লেখার এক একটি পৃষ্ঠায় লাল কালি দিয়া সংশোধন করিতে করিতে মনে হইত, ইহা যেন বিচিত্রবর্ণ ছবির আকার ধারণ করিয়াছে; একজিবিশনে পাঠাইলেই হয়। ভূরুক ভ্রমণ, চীন ভ্রমণ—এসকলও ক্রমে ক্রমে ছাপা হইল। আমি যত দিন 'দেশ' সপ্তাহিকের সহিত যুক্ত ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে রামনাথের বিস্তর লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব লেখা লইয়া তিনি পরে, অনুমান হয়, ছয় শতখানি বই বাহির করিয়াছিলেন।

রামনাথের সঙ্গে একই ভবনে বাস করিতে শুরু করি ইহার কয়েক বৎসর পরে। তখন দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হয় হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই রামনাথের ভূপর্যটন বন্ধ হয়। তিনি দশ বার বৎসর যাবৎ পশ্চিম ভূখণ্ডের বহু স্বাধীন, পরাধীন, অর্ধস্বাধীন দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভূখণ্ডে ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া যাভা, শ্যাম, সুমাত্রা, বরদ্বীপ, বলীদ্বীপ, চীন, কোরিয়া এবং জাপানে সাইকেলে ও পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। আবার পশ্চিম এশিয়ার আফগানিস্থান, ইরাণ, ইরাক, এশিয়া-মাইনর, আরব পর্য্যন্ত যান। উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকারও কয়েকটি রাজ্য পর্য্যটন করিয়াছিলেন। নবীন ভূরস্ক তিনি বিশেষ ভাবে দেখিয়াছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তিনি যান। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি দেশ সম্বন্ধেই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের পল্লীর ও পল্লীবাসীদের সম্বন্ধে কত কথাই না তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। এই সব অঞ্চলের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তাঁহার মনের উপরে একটি দৃঢ় ছাপ রাখিয়া যায়। ঐ সকল স্থলের প্রতি পল্লীতেই 'ইন্' বা সরাইখানা রহিয়াছে। ভ্রমণের পর সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে এখানে আশ্রয় লইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লইতেন।

এত দূর দূর দেশ রামনাথ ভ্রমণ করিয়াছেন, বলিতে গেলে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়। বহু প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছিল, তাহাতে টাকাও আসিত প্রচুর, কিন্তু সকলই তিনি অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করিতেন। এ প্রকারের কত কাহিনী তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সেই শেষ দিন—শেষ সাক্ষাৎকালের কথা এখনও যেন কানে বাজিতেছে; "যোগেশবাবু, একজন টুরিষ্টের প্রধান আদর্শ হওয়া উচিত—'non-Saving' 'অসঞ্চয়'। এই আদর্শ বিচ্যুতি ঘটলে টুরিষ্টের—ধর্ম্ম নষ্ট হবে।" কি প্রসঙ্গে তিনি আমাকে একথা বলিয়াছিলেন তাহা পরে বলিতেছি। বলিয়াছি আমরা একই ভবনে একাধিক্রমে বারো বৎসর ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে নানা ভাবেই আমি দেখিতে সক্ষম হই। অনেক কথা, সবকিছু বলা সম্ভব নয়, আর এ যুগে সমীচীনও নয়। কথাবার্ত্তায় ও আলাপ-আলোচনে একটা সাদাসাটা অথচ জোরালো ভাব ছিল তাঁহার। রামনাথ ছিলেন শ্রীহট্টের অধিবাসী, প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম বালিয়াচঙ্গ তাঁহার জন্মভূমি। সৌহাটী কটন কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার নিকট-জ্ঞাতি। বংশ-মর্য্যাদায় এবং শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহারা ঐ অঞ্চলের সেরা। রামনাথ কিন্তু বেশী লেখা-পড়া শিখিতে পারেন নাই। তিনি কৈশোরে অনুশীলন সমিতি ভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মহাসমরে তিনি সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। যুদ্ধান্তে তিনি প্রায় দশবৎসর সিঙ্গাপুরে সামরিক দপ্তরে কেরাণির কার্য্য করিতে থাকেন। ১৯২৭-২৮ সালে কর্ম্মত্যাগ করিয়া ভূপর্য্যটন আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হইলে ভূপর্য্যটন বন্ধ করিতে হয়। তদবধি তিনি একই ভবনে একই প্রাসাদে থাকিয়া প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। শেষ দিকে তিনি আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দরদী মন সকলকেই আত্মীয় করিয়া লইয়াছিল। এই তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মানুষ—দোষেগুণে মানুষ। রামনাথের ভিতরেও দোষ ত্রুটি ছিল নিশ্চয়। কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি আমি মানুষ রামনাথের মধ্যে দোষের চেয়ে গুণের ভাগই দেখিয়াছি বেশী। তাঁহার কথাবার্ত্তার ভাষা মার্জ্জিত ছিল না, গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট ছিল খুবই। আলাপ আলোচনা কালে ভাক-মার্কিক কথাও বলিতে পারিতেন না। এসকল যদি দোষের হয় বলুন। কিন্তু আসল মানুষটিতে খাদ ছিল না বলা চলে। আমরা কলিকাতার ভাড়াটিয়া অধিবাসী। যোদার যুগ অন্তে কলিকাতায় আবার লোক ঝিজ্‌ঝিজ করিতে লাগিল। বাড়ীর মালিকেরা নিরাপদ

'আশ্রয়' হইতে স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। যে যেখানে লুকাইয়াছিল, সব আসিয়া রাজধানীতে ভিড় জমাইল। আমরা যাহারা বোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবিকার তাগিদে কলিকাতায় রহিয়া গিয়াছিলাম, তাহাদের অনেকে ভাড়া বাড়ীর অভাবে দিশাহারা হইয়া উঠিলেন। ১৯৪৪এর শেষ হইতে কলিকাতায় ভিড় জমিতে থাকে। '৪৫এর গোড়ায় 'ন স্থানং তিলধারণং'। এই সময় বাড়ী বদল করিতে গিয়া যে কি যাতনা সহ্য করিয়াছি, আজও স্মরণ হইলে শিহরিয়া উঠি। এই সময় রামনাথ আমার সহায় হইলেন। ব্যাপারটি নিতান্ত ব্যক্তিগত হইলেও 'মানুষ' রামনাথকে বুঝিবার জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছি।

ভাড়াবাড়ীর অভাবে সমগ্র উত্তর কলিকাতা তোলপাড় করিতেছি। একদিন আপার সার্কুলার রোড দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ রামনাথের কথা মনে হইল। যেখানে তিনি থাকিতেন, উত্তর কলিকাতায় সেটি একটি বিরাট বাড়ী। উত্তর কলিকাতায় যা বাঙালী মহলে অমন বড় বাড়ী ছিল কিনা সন্দেহ। সংখ্যাতত্ত্বিদেরা ছ হাজার লোক ঐ বাড়ীতে থাকিতে পারে। 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' [illegible] স্বাধীনতা লাভের পরে এই সংখ্যক বা ইহার বেশী লোক ঐখানে যাইয়া আশ্রয় লয়। এত জনসমাগম যেখানে, সেখানে যে ভালমন্দ দুই রকমেরই লোক থাকিবে, বলাই বাহুল্য। বাড়ীর নীচে বাজার বিভাগে দক্ষিণ দিকের সারির এক প্রকোষ্ঠে রামনাথ থাকেন। রামনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু তাহা ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে গিয়া উঠিয়াছিল বলা যায় না। তাঁহাকে আশ্রমবাজার অফিসে দেখিয়াছি মনে হয় মাত্র একবার। পরে হয়ত কোথাও কোথাও দেখিয়া থাকিব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিষদের প্রবীণ সদস্য ডাঃ সরসীলাল সরকার এই দিন সভাপতিত্ব করেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ রামনাথের বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। রামনাথ এই বাড়ীতে থাকিতেন জানিতাম, কিন্তু পূর্বে এখানে কখনও যাই নাই। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া রামনাথের ঘরে ঢুকিতেই তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যেন বহুকালের পরিচয়। কত ঘনিষ্ঠতা। আমার বিপদের কথা শুনিয়া রামনাথ লাফাইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমাধানের একটি উপায় বাৎলাইয়া দিলেন। তিনি ঐ ভবনের টেনান্টস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি, কাজেই বাড়ীওয়ালা (রোপার্জিত অর্থে তখন বিরাট ধনী) তাঁহার কথা হয়ত শুনিবেন না। অথচ ঐ বাড়ীতে ভাড়া মিলিতে পারে। বাড়ীওয়ালা কথা শুনিতে পারেন এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করিলে রামনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সুপরিচিত পাংলুন পরিধান পূর্বক আমাকে লইয়া তাঁহার বাসাবাটীতে গেলেন। আমাদের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি তো অবাক। 'আমি কেমন করিয়া ঐ বাড়ীতে থাকিব'—এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করায় রামনাথ অমনি বলিলেন, "আপনি বাড়ীর মালিককে বলুন, যোগেশবাবুর কোন অসুবিধা হবে না, আমি তাঁর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করব।" রামনাথের নিকট হইতে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া তিনি আমার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিলেন। আমি অন্য সূত্র ধরিয়া এখানে 'ঘর' জোগাড় করিলাম, কিন্তু রামনাথের ঐরূপ সাহায্যে ও স্বাভাবিক প্রয়াসে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ঐ দিন যাওয়া অবধি রামনাথ আমার 'পরম আত্মীয়' হইয়া উঠিলেন। সেই শাশ্বত চারুক্য শ্লোকের মর্ম তাঁহার সংস্রবে আসিয়া বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। 'উৎসবে—ব্যসনে—শশানে—' সর্বত্র রামনাথ। দীর্ঘ বারো বৎসরের মধ্যে ইহার কত পরিচয়ই না পাইয়াছি।

কলিকাতায় বিডিবাদ্ হইয়া রামনাথের প্রথম কাজ

হইল—সাময়িক পত্রে বিশেষতঃ 'দেশ' সাপ্তাহিকে মুদ্রিত লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ, অক্লান্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন পুস্তক রচনা ও তৎ সমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা। বিভিন্ন প্রকাশক তাঁহার কতকগুলি বই প্রকাশ করিতে ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'মরণজয়ী-চীন'-এর বেশ কাটতি হয়। রামনাথ নিজে কতকগুলি বই পর পর প্রকাশের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। পুস্তক রচনা ও প্রকাশনই হইল অতঃপর তাঁহার একমাত্র জীবিকা। প্রথম প্রথম ইহা দ্বারা জীবিকার্জনে তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। তাহার সোপন দান বা সাহায্যও ছিল কিছু কিছু। এই আয় হইতে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইত। প্রথম দিকে তাঁহার জীবিকার ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু ক্রমে এমন কতকগুলি বিপর্যয় আসিল যাহাতে সমাজের উপরে প্রতিক্রিয়া হইল ভীষণ। দ্বিতীয় মহাসমরের পর মহান value বা নৈতিক মানও অতি দ্রুত বদলাইয়া গেল। ১৯৪৬ সনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, ৪৭ সনের স্বাধীনতা লাভ, পূর্ব বঙ্গ হইতে অগণিত ছিন্নমূল নরনারীর ভারতবর্ষে আগমন, পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজকারবারের রদবদল—এই সকল কারণে সমাজ-জীবনের উপরে বড় রকমের আঘাত পড়িল। আমরা যাহারা এতদঞ্চলে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলাম, অথচ দেশের বন্দে যাহাদের যোগ ছিল তাহারা বিপদগ্রস্ত হইল অত্যধিক, ভুক্তভোগী মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। আয়ের পথ সঙ্কুচিত হইল, কিন্তু ব্যয়ের অঙ্ক বাড়িয়া গেল অভাবনীয় রূপে। অর্থনৈতিক তথা সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিল ব্যাপক ভাবে। রামনাথের উপরেও ইহার সংঘাত পড়িয়াছিল খুবই। তাঁহার লেখনী কখনও থামে নাই; কিন্তু দুশ্চিন্তা, অত্যধিক পরিশ্রম, এবং আয়ের সঙ্কোচনে তাহার শরীর অতি দ্রুত ভাঙিয়া যায়। সেদিকে সরকার হইতে কিছু আর্থিক সাহায্য হয় বটে, কিন্তু তৎকালীন প্রয়োজনের তুলনায় তাহা ছিল নিতান্তই অপ্রচুর।

এই ক'বৎসর রামনাথের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। দেখিতাম সাধারণ দুর্গত মানুষের জন্য তাহার প্রাণ কিরূপ কাঁদিত। একদিন ভোরবেলা উঠিয়া বাড়ীর নীচে গিয়াছি। বিস্তৃত গাড়ী-বারান্দা, বিস্তর লোক আর ভিখারী সেখানে রাত্রিতে শুইয়া থাকিত। দেখিলাম রামনাথ একঠোঙ্গা খাবার একটি ভিখারিণীকে দিতেছেন। আমি অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "আহা বেচারি, সারা রাত্রিতে কিছু পেটে পড়েনি ও এখন খেয়ে কিছুটা সোয়াস্তি পাক।" বুঝিলাম রামনাথ মুখে যা বলেন কাজেও তাহা করিতে চেষ্টা পান। সাধারণ মানুষের অভাব, দুঃখ, দুর্গতি তাঁহাকে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার যান নাই আগে বলিয়াছি। কিন্তু ইহার আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্গতিই তাহাকে এদিকে টানিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু এ নিমিত্ত তিনি যে সাম্যবাদী দেশ সমূহের বা এদেশের সাম্যবাদী দল ও কর্ম প্রণালীর অন্ধ সমর্থক ছিলেন তাহা নহে, তিনি ইহাদের সমালোচনা বা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত করিতেন না। অবশ্য ব্যক্তিগত আলাপের সময়ই এসব আলোচনা হইত। তাহার সকল কথায় সায় দিতে পারিতাম না, কিন্তু তাঁহার বিষয় যুক্তি প্রণিধানযোগ্য ছিল।

রামনাথ শিশু ও কিশোরদের বড় স্নেহ করিতেন। তিনি ছিলেন শিশুমহলের 'দাদু'। স্নেহ দিকে ছেলেদের সভা সমিতিতে তিনি যাইতেন। বাহির হইতে যাহারা ওবাড়ীতে আসিত তাহারাও তাহাকে 'দাদু' বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি যেমন ছেলেদের ভাল বাসিতেন, ছেলেরাও তেমনি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহার তীব্র

তৎসনার কখন কখন হয়ত কোন ছেলে উত্তেজিত হইত বা মনে ক্লেশ পাইত, কিন্তু যখন তাহারা তৎসনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিত তখনই অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া ভুল স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিত। দেশ বিদেশের শিশুদের কথা বলিতে রামনাথ বড়ই আনন্দ পাইতেন, আরব, তুরস্ক, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, নানা দেশের শিশুদের কথাই তাঁহার মুখে শুনিতাম। তাহাদের নিয়ম সংযম এবং গুরুজনদের প্রতি আনুগত্য; আবার স্বাধীন চলা ফেরা প্রভৃতির কথা কতই না তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। শিশু কিশোরদের কথা ভাবিয়া তিনি অতি সরল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বর্ণনা করিতে যত্নবান ছিলেন। কিশোর মহলে তাহার প্রভাব পর্য্যটন মূলক বই এর ভিতর দিয়া ব্যাপ্ত হয়। এবং হয়ত ইহার মাধ্যমেই কতকটা স্থায়িত্বও লাভ করিবে। শুধু শিশু ও কিশোর কেন, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ উদারপ্রাণ যুবক ও বয়স্কব্যক্তিদেরও তাঁহার নিকট আকৃষ্ট করিত। মানুষ রামনাথকে যতই দেখিয়াছি ততই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে মন ভরিয়া উঠিয়াছে।

এখন রামনাথের সাহিত্যচর্চ্চা সম্বন্ধে কিছু বলি। [illegible] কাগজ রীতিমত পড়িতেন, বই পুথিও যে না পড়িতেন এমন নয়। বাংলা ভাষা ও রচনা শিক্ষার উপায় সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে বাংলা ক্লাসিক্স্, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি পড়িতে বলিয়াছিলাম। রামনাথ এসকল পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না। তবে অবিরাম লেখনী চালনা হেতু তাঁহার রচনা অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার পুস্তকগুলি জনপ্রিয় হইবার ইহা একটি কারণ। বাংলা ভাষার যুক্তাক্ষর 'ন' 'ই' 'ঔ'-কার প্রভৃতি সহজ ও একপ্রকার করা সম্পর্কে বহু সময় আলোচনা করিতেন। "যাচ্ঞা" কে "যাচনা" লিখিলে ক্ষতি কি? এরূপ কথাও বলিতেন। কোন কোন বইয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে শব্দের বানান এইরূপ করিয়াছেন, মনে হইতেছে। তাঁহার শেষ দিকের বইগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন। সব সময়, তাঁহার কথায় সায় দিতে না পারিলেও, বুঝিতাম ভাষাকে সহজ সরল করিবার দিকে তাঁহার বেশ ঝোঁক রহিয়াছে। আমার চক্ষু পীড়ার কথা উঠিলেই রামনাথ বলিতেন "ঘোষেদমশায়, আমার লেখা correct করতে করতেই আপনার চোখ গিয়েছে। তখন কি আমি লিখতে পারতাম। না ভাষার উপরে কোন দখল জন্মেছিল, যেখানে যেমনটি দেখতাম, কালির আঁচরে কোন রকমে লিখে পাঠাতাম।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার পরিশ্রমের কথা রামনাথ 'দেশ'-কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কাহারও মুখে নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন। এ কথাটি তাঁহার বরাবর মনে ছিল। তিনি 'প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি' পুস্তকখানি আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রামনাথ শেষ দিকে কয়েক বৎসরই রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ই নিজের বই ব্যাগে করিয়া পুস্তক বিক্রেতাদের দোকানে জমা দিয়া আসিতেন, পূর্ব্বের জমা দেওয়া যে যে বই বিক্রয় হইত কমিশন বাদে তাহা লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার অসুখ বাড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট গিয়া কিছুক্ষণ বসিতাম। মধ্যে কিছু দিন ঘন ঘন যাইতে পারি নাই। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে, প্রথম দিকে তাঁহার ঘরে গেলাম। রামনাথ শুইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন, অতি উৎসুকতার সহিত একখানি বই আমার হাতে দিয়া বসিলেন।

রামনাথ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সাইকেলে ও পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। এ কারণ তাঁহার

"ভূপর্য্যটক" উপাধি সার্থক হইয়াছিল। তিনি এতগুলি দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন নিতান্তই সম্বলহীন অবস্থায়। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে কতলোকের নিকট হইতে তিনি অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। বহুক্ষেত্রে তাঁহার সহিত আলাপ—আলাপনে তাঁহার ভ্রমণের কথা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, এত দেশ ভ্রমণেও তাহার অর্থকষ্ট তেমন হয় নাই। যদি বা কখন হইয়াছে কোন এক অভাবিত উপায়ে তাহা বিদূরিত হইত। একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন "মার্কিণ মুলুকে পা দিতেই আমাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। একমাস আমি জেলে ছিলাম। তখনে নিয়ম উপযুক্ত পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে তবে সেখানে বিচরণ করার বা থাকবার অধিকারী হওয়া যায়। আমি জেলের যে প্রকোষ্ঠে ছিলাম সেই প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে বড় বড় গুণ অঙ্ক কষা রয়েছে। কার এই কাজ? জানতে বড় কৌতূহল হয়। পরে শুনতে পাই বিখ্যাত অঙ্কবিদ সোমেশ বসু অর্থাভাবে একবার এই জেলের অধিবাসী হন। আমি বেশ যোগ্যস্থানেই ছিলাম।"

শেষ সাক্ষাতের দিনটির কথা বলিয়াই আজকার প্রসঙ্গ শেষ করিব। ইহার আভাস আগেই একটু দিয়াছি। আমি যখন ঘরে ঢুকিলাম তখন রামনাথ শুইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি একখানি বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "সোমেশ বাবু, আমার জীবন ধন্য, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির আমার কয়েকখানি বই নিয়ে এই 'রামনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেছেন। কত বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিকের বই তাঁরা বার করেন। এ শ্রেণীতে তাঁরা আমাকে ফেলেছেন; আমি সাহিত্যিক নই, আমার জীবনে আর কি কাম্য থাকতে পারে। পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কে দু-চারটি বৈষয়িক কথার পর রামনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি কত দেশ ভ্রমণ করেছি, সব দেশের কথাই কিছু কিছু লিখেছি। এক গ্রেট-ব্রিটেন ছাড়া। বিলাত-ভ্রমণ লিখে আমার এই কাহিনী শেষ করবো। আমি মরবার পূর্ব্বে এ বিষয়টি লিখতে না পারলে আমার কথা অপূর্ণ থেকে যাবে। মরবার আগে যেন আমি এটি লিখে যেতে পারি।" ইহার পর তিনি বিলাত ভ্রমণ কিরূপে সাঙ্গ করিয়াছিলেন সাগ্রহে তাহা বলিতে থাকেন। তিনি বলিলেন, আমি যখন লণ্ডনে পৌঁছি তখন আমার কয়েকটি পেনি মাত্র সম্বল। ইষ্ট এণ্ডে গিয়ে একখানা কামরা ভাড়া করলাম। দু'দিন খাইনি, ক্ষিধের পেট চিঁচিঁ করছে রাস্তায় বার হলাম। একটি মুদি দোকানে গেলাম, ছোট্ট দোকান কিন্তু আমদোরা বিলাতী। দোকানীকে দেখে মনে হ'ল বাঙালী। আলাপে জানলাম তিনি সিলেটি মুসলমান। আমার চেহারা দেখে ও কথা শুনে বুঝে নিয়েছিলেন আমি অভুক্ত। আমাকে কিছু চাল, ডাল তেল, নুন দিলেন। বলে দিলেন রান্না নিজের মতই করবেন। কিন্তু সময় দিবেন না। সময়ের কাঁক এরা সইতে পারে না। তখন খুব বরফ পড়ছে। জুতো একেবারে ভিজে গেছে। দোকানী আমার পায়ে ভিজে জুতো দেখে বললেন—[illegible] তো এ সময় পড়বেন না; জুতো ছাড়ুন, নইলে নিউমোনিয়া হবে। আমি যে ভূপর্য্যটক এ পরিচয় তাঁকে দিয়েছি। আমার অবস্থার কথা জেনে একটু সময় নিয়ে বললেন পরদিন যেন ঐসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করি। ফিরে এসে চাল-ডাল সিদ্ধ করে পেট পুরে খেলাম। এত পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন ছিলাম যে, সেই যে সন্ধ্যায় শুয়েছি উঠেছি পরদিন বেলা আটটায়!"

রামনাথ আবার বলিতে লাগিলেন "নির্দ্দিষ্ট সময়ে দোকানীর কাছে গেলাম। বলা বাহুল্য আজও চাল-ডাল আমায় দিয়েছিল। দোকানী পাশের এক জুতোর দোকানে

আমাকে নিয়ে গেল। এই দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আমায় তার নিকট নিয়ে গেল। আমাকে জুতো ও মোজা পছন্দমত নিতে বলল। হাতের কোন টাকাই নেই, আর মূল্য দিবই বা কি করে। ফিরবার সময় ম্যানেজার বলে দিলে, আমি যেন পরদিন তার সাথে দেখা করি। জুতার দোকানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাওয়া মাত্রই ম্যানেজার আমাকে পাশের একটি রেঁস্তোরায় নিয়ে গেল। রেঁস্তোরার মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজ দোকানে চলে গেল। বুঝলাম রেঁস্তোরার মালিকের সঙ্গে আগেই তার কথা হয়েছিল, আমার সম্পর্কে। মালিক উপস্থিত মত আমার ভূপর্য্যটন সম্বন্ধে তার গ্রাহকদের নিকট কিছু বলতে বললেন। আমি তো আমার সিলেটি ভঙ্গ ও ভাঙ্গা ইংরেজীতে পর্য্যটনের কথা বলে চলেছি। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছে, রেঁস্তোরায় ভিড় জমে গেছে; আমি সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। মালিক এসে কানে কানে বলে গেল Please st·p. You have talked more than an hour, I wi'l not pay you mor·· than five p ou·l:—এখন থামো, এক ঘণ্টার উপর বলেছ। আমি তো তোমাকে পাঁচ পাউণ্ডের বেশী [illegible]। দক্ষিণা স্বরূপ পাঁচ পাউণ্ড পেলাম। জুতার দোকানী, মুদি দোকানী নিজ নিজ পাওনা নিয়ে গেল, ঘরভাড়াও কিছু দিলাম, আমার হাতে রইল পুঁজি দু'-পাউণ্ড। রেঁস্তোরার মালিক আর একটি রেঁস্তোরার মালিকের নিকট আমার পরিচয়-পত্র দিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন বক্তৃতা দিতে দিতে চলেছি। আমার কোনই আর অভাব রইল না। এই ভাবে সমগ্র ব্রিটেন ও স্কটল্যাণ্ড ঘুরেছি। আয়র্ল্যাণ্ডে যাবার সময় আর হল না। ইতিমধ্যে যুদ্ধ (মহাসমর) বাধল। শরীরও খারাপ হয়ে পড়ল। দেখলাম ভাড়া ও যাতায়াতের খরচাদি কুলবার মত আমার হাতে পাউণ্ডের মালি রয়েছে। তখন আমি জাহাজে চড়ে স্বদেশে রওনা হলাম। আমার যা টাকা ছিল, বোম্বাই পৌঁছান পর্য্যন্ত তাতেই কুলিয়ে গিয়েছিল। আমার আমি যে-কে সেই—নিঃসম্বল ভূপর্য্যটক।

রামনাথ অত্যন্ত উল্লাস ভরে এই কথাগুলি আমাকে বলিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যে অমূল্য কথাগুলি আমাকে বলিলেন তাহার উল্লেখ আগেই করিয়াছি। 'Non Saving'র সঙ্কল্পের অপ্রবৃত্তি প্রত্যেক ভূপর্য্যটকের ধর্ম্ম হওয়া উচিত তবেই তাঁহার উচ্চাশা সফল হইবে। আপনি যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন তাহা বর্ণনা করিয়া প্রচুর অর্থ রোজগার করিতে পারেন। কিন্তু একবার যদি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আসিল তখনই তাহার মৃত্যু। কেননা ভূপর্য্যটকের স্বাভাবিকী মনোবৃত্তির পদে পদে অপলাপ ঘটিবে।' রামনাথের এই শেষ উক্তিটি প্রত্যেকেরই প্রণিধানযোগ্য। এই সাদাসিধা বেপরোয়া হৃদয়বান মানুষটির কথা আমি আর কতটুকু বলিতে পারি।

গল্প

ক্লোরা সাইমন

অমরেন্দ্র সান্যাল

ছোট শহর বলতে যা বোঝায় এ শহরটা তার চেয়েও ছোট।

উত্তর দিকে একটা মাঝারি গোছের পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় একটা ছোট বর্ণা। বর্ণাটা পাহাড় থেকে শহরের কাছাকাছি নেমে এসে নদী হয়েছে। কুমারী নদী। বছরে ন মাস শুকিয়ে থাকে। উত্তরের পাহাড়টা বাদ দিলে বলবার মত আর একটা জিনিষ থাকে। ওটি তিরিশ বছর দেওদারের ছায়াঘেরা নিরিবিলি একটুকরো জায়গা। ওখানে শহরের মানুষ বেড়াতে আসে সকাল বিকেল। এই দেওদারের জঙ্গলটার কাছাকাছি থাকে ওরা দুজন। ক্লোরা সাইমন। নখু গোমেজ।

ক্লোরা সাইমনের বয়স হয়েছে। পিঠ থেকে ঘাড় অবধি বেঁকে গেছে বয়সের ভারে। শরীরে মাংস নেই একতিল। ভাঙা গাল। মিশকালো মুখ। বিবর্ণ শতছিন্ন একটা কমবুলের গাউন পরে থাকে অষ্টপ্রহর। চলাফেরার সময় গাউনটা কল কল করে ঘোরে কঙ্কাল কাঠামোর ওপর। ও ভাবে ওর হাঁটার সুন্দর ভঙ্গির দিকে লোক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হেসে ফেলবে বলে ওকে দেখলেই লোকে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অন্ধকার থাকতেই রাস্তায় বেরিয়ে আসে ক্লোরা সাইমন। তখন থেকে সুরু হয় শিকার ধরা। কাউকে দেখলেই তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্রস হাতে বুকের ওপর ক্রস আঁকে। চোখ তুলে বলে, ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করবেন। দু আনা পয়সা দাও। রুটি খাবো। নখু গোমেজ ভিক্ষে চায়না কারুর কাছে। তাকে ভিক্ষে লোকে আপনিই দেয়। শতছালি মারা ফুল প্যান্টের ওপর চাদর জড়িয়ে রুক্ষ বিবর্ণ হাত দুটো সামনে পেতে অসহায় চোখ মেলে বসে থাকে। সামনে দিয়ে যারা যায় তারা ওর করুণ আর নিষ্পলক চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখেই। দানও করে দু এক পয়সা।

ও বসে বসে ভিক্ষে পায়। ক্লোরাকে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হয়। বুড়ির তাই রাগ ওর ওপর। দিনান্তে একবার এই নিয়ে ঝগড়া হয়ই। অবশ্য ক্লোরা সাইমনের ঝগড়া করার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। চেঁচামেচি নয়। গালাগালি নয়। সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বুকের ওপর ক্রস আঁকে। একটানা না খেয়ে বলে যায়। ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করুন! তুমি এখান থেকে চলে যাও। দু আনা পয়সা দিচ্ছি। চার আনা দিচ্ছি। এক টাকা দিচ্ছি। গোমেজ না থাকলে ক্লোরার ভিক্ষে বেশী আসায় হবে। নইলে একটা টাকা ওর একখানা পাঁজরের সমান। কে নেবার [illegible] সাধাসাধি করতো।

মার্চের মাঝামাঝি। এক সকালে ঐ দেওদারের বনটার গা ঘেঁসে একটুকরো জমি পরিষ্কার করতে এলো একদল মজুর। পরদিন ওখানে ইটখালি সিমেন্ট এলো লড়িতে বোঝাই হয়ে। কন্ট্রাকটর নিজে এলো তার মোটর সাইকেলে। কাদার বিলস্ এলো রিক্সায়।

কিছু একটা হবে এখানে। দুজনেই আন্দাজ করলো। পরদিন সন্ধ্যায় ক্লোরা এসে উৎসুক মুখে গোমেজের সামনে

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন "ন্যাখ্, আমি না হয় মুখাসুখা মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব! রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন-"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা।"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোন্‌টি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে/আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত

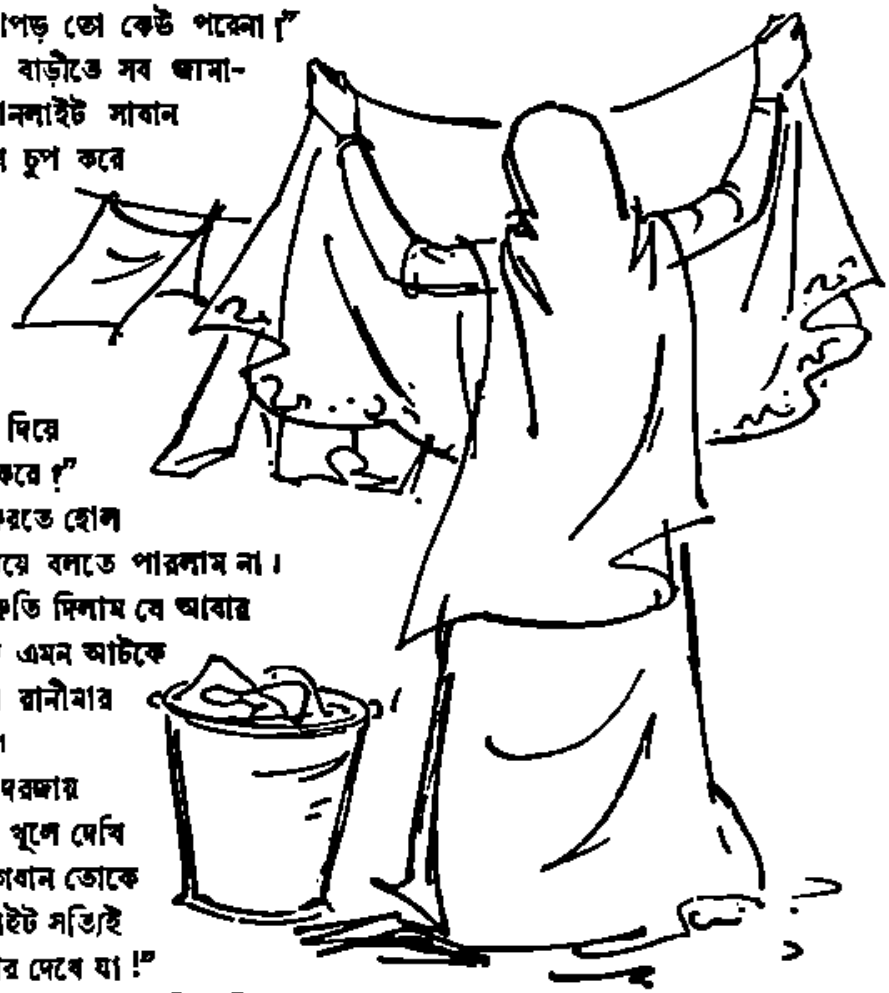

ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

দাঁড়াল। ক্রাইষ্ট তোমায় মঙ্গল করুন। খবরটা শুনেছো?

কি খবর? কোন খবর? সোমেস চোখ তুলে রইল।

শোননি তাহলে? ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করুন। ওখানে একটা চার্চ হচ্ছে। প্রভুর আরাধনার স্থান। এক-সেকেণ্ড চুপ করে থেকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দেবার ভঙ্গিতে ক্লোরা বলল, চার্চটা হয়ে গেলে আমি ওখানেই থাকবো। প্রভুর কাছে কাছে। দিনরাত আরাধনা করবো। প্রভুকে ডাকবো। গলার স্বর এবার আরও নীচু করে বলল আর সমস্ত মন ঢেলে ক্রাইষ্টকে ডাকলে নিশ্চয় সাড়া দেবেন, এঁ্যা। সামনে গেলে কি চাইব জানো? জানো না! ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করুন। চাইব—রং। গায়ের রং। পরের জন্মের জন্যে দুধের মত সাদা রং।

ও'পা হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলো ক্লোরা। ও অনেক কথা বলেছে কিন্তু সোমেস একটাও জবাব দেয়নি। কেন জবাব দিল না। ওর মুখের সামনে এসে কুঁকে পড়লো ক্লোরা, কি ভাবছো এঁ্যা? ভাবছিনে কিছু।

নিশ্চয় ভাবছো। ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করুন। ভাবার দরকার নেই। আমি তোমার জন্যেও প্রার্থনা করবো। ছ'আনা করে রোজ পয়সা দিও আমায়। এঁ্যা, দেবেতো? তোমার তো টাকা অনেছে। আমি জানি অনেক টাকা অনেছে।

পয়সা দেবার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে উল্টো কথা বলল, সোমেস। বলল, ওখানে চার্চ হচ্ছে না। চার্চ হচ্ছে না. চটে উঠলো ক্লোরা, ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করুন। কি হচ্ছে তবে? হাসপাতাল। কুষ্ঠ হাসপাতাল।

অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে সোমেসের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ক্লোরা তারপর সামনে থেকে সরে এলো কোন কথা না বলে। হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করতে লাগলো আপন মনে। সোমেস এক নম্বরের বোকা। এক নম্বরের পাজী। ক্রাইষ্ট ওর মঙ্গল করুন।

ফেওদারের ছাদার বাড়ীটা বাড়তে লাগলো। সকালে কাজ হচ্ছে। রাতেও কাজ হচ্ছে গ্যাস আলো জ্বালিয়ে। ছমাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। এইটুকুই সময় দেওয়া হয়েছে ফন্তকে। কুলি কামিন খাটছে বহু। লড়ি বোঝাই হয়ে ইটকাঠ আসছে হরদম। সকালে নিয়মিত কাজের তদারক করতে আসছে ফাদার বিগস। কাছে যাবার সাহস নেই সোমেসের। দূর থেকে চেয়ে থাকে রোজ। দেখে ইঁকি ইঁকি করে বাড়ছে বাড়ীটা। হাসপাতাল হবে। ওই হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা করে ভালো হয়ে যাবে সে। নিরাময় হয়ে যাবে হাত পায়ের গলিত ক্ষত। প্রভু···দয়াময় ক্রাইষ্ট।···

ক্লোরা সাইমন আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে রোজই। ফন্তকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল কদিন লাগবে শেষ হতে? ফন্ত তার কথার উত্তরই দেয়নি। তারপর থেকে কুলি-কামিনদের কাছেই খোঁজ খবর নেয় সাইমন। দিন-গোণে। মুহূর্ত গোণে। চার্চটা উঠলে ওর এক কোণে পড়ে থাকবে ফাদারের অনুমতি নিয়ে। অনুমতি না দিলে পায়ে ধরবে ফাদারের। তাহলে মত দিয়ে দেবে ফাদার। ফাদার বিগস সজ্জন মানুষ।

বাড়ীটা নির্দ্ধারিত সময়েই শেষ করে ফেলল ফন্ত। শেষ হবার পর ক্লোরা বুঝতে পেরেছে, চার্চ হলো না। চার্চ না হলে কুট হাসপাতাল। না-হলো চার্চ। হাসপাতাল তো হচ্ছে। আর্ত্তের সেবা হবে। প্রভু আর্ত্তের সেবার জন্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কদিন থেকে জিভের বেরোয় নি ক্লোরা ঘরের সামনে চুপচাপ বসে থেকেছে। অদ্ভুত একটা মমতা এসেছে সোমেসের ওপর। হাসপাতালটা হলে সোমেসের চিকিৎসা হবে। সোমেস নিরাময় হবে। প্রভু আর্ত্তের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

মে'র এক সন্ধ্যে। আলোয় আর রঙীন কাগজে সাজানো হয়েছে নতুন বাড়ীটাকে। উদ্বোধন হবে আজ। অনেক মেয়ে পুরুষ এসেছে। অনেক গাড়ী এসেছে।

ঘরের বেড়ায় পিঠের ঠেস দিয়ে বসেছিল গোমেস। ফ্লোরা ছুটতে ছুটতে এসে তার সামনে দাঁড়াল, শুনেছো? গোমেস চোখ তুলল না। সাড়াও দিল না।

তুমি শোননি নিশ্চয়! ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করুন। ওটা হাসপাতাল নয়। ক্লাব হবে। শনিবারে শনিবারে নাচ হবে ওখানে। ফ্লোরা ঝুঁকে বসে পড়লো হঠাৎ গোমেসের সামনে। এত কাছাকাছি এর আগে কোনদিন আসেনি। গোমেসের পাণ্ডুর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, ক্রাইষ্ট তোমার মঙ্গল করুন। তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমিও চলে যাচ্ছি। কাল সকালেই যাচ্ছি। আর থাকবো না এখানে। ওর গলাটা ছিঁড়ে গিয়ে কথাগুলো কাঁপতে লাগলো। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ফ্লোরা। দু'পা হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলো। গোমেসের মুখের সামনে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কেঁদনা। ক্রাইষ্ট তোমার ...তোমার...। ঝুল ছোট গাউনের একটা কোণ তুলে চোখে চাপা দিয়ে দ্রুতপায়ে অন্ধকারের মধ্যে সরে গেল ফ্লোরা সাইমন। পেছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে গোমেসের অনেকদিন পর আশ্চর্যভাবে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল।

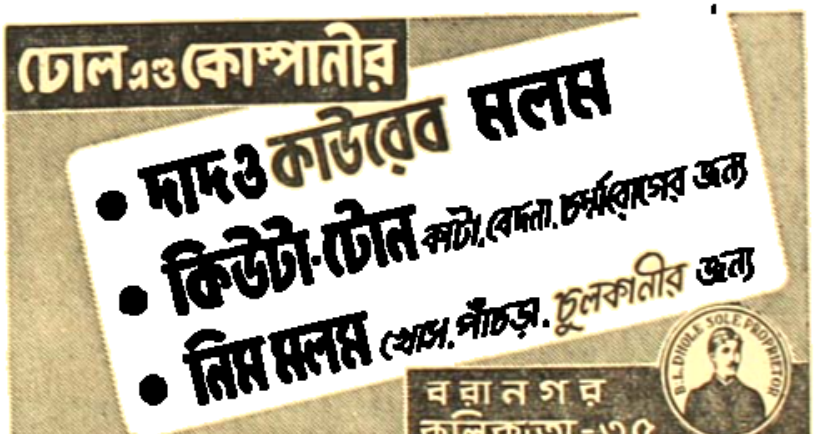

প্রবন্ধ — শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও বাঙলা সাহিত্য ..... অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

উনিশ শতকের বাংলার নব-জাগৃতির ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে যে সকল মনীষী বাঙালী স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনে এবং স্বধর্মের প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা কঠোর সাধনা ও তীব্র তপস্যার প্রভাবে শাশ্বত ভারতের রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ও ভারতের অন্তরাত্মার বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ, যাঁহারা 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাইয়াছেন,' তিনি ছিলেন সেইরূপ মহান পুরুষ-দেরই একজন, সর্বোপরি, তিনি ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের মতই অসাধারণ বাগ্‌বিভূতির অধিকারী, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াও যে অগণিত শ্রোতার মনে বিচিত্র ভাবের [illegible] করা যায় এবং তাহাদের চিন্তার গতি নব-নব খাতে প্রবাহিত করা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ এই বিচিত্রকর্মা পুরুষের পুণ্য চরিত-কথা ও তাঁহার রচনাবলীর সঙ্গে এ-যুগের পাঠকের পরিচয় একরূপ নাই বলিলেই চলে। তাঁহার অসংখ্য গানের মধ্যে একটি মাত্র গান আমরা স্মরণ রাখিয়াছি কিন্তু রচয়িতার নাম বিস্মৃত হইয়াছি, সে গানটি 'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী' ; আর কেহ কেহ হয়তো তাঁহার সম্পাদিত ভগবদ্গীতায় 'গীতার্থ সন্দীপনী' নামক অভিনব ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছেন। অথচ উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন শিক্ষিত বাঙালীর মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, কয়েকটি আখ্যান-কাব্য বাদ দিলে, সমগ্র মধ্যযুগে বাংলায় ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় না, কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালীই ধর্ম-সম্পর্ক-বর্জিত সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থক প্রয়াস করিয়াছে এবং তাহারই ফলে বাংলা সাহিত্য বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। কথাটি অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উনিশ শতকে ধর্মান্দোলনের ফলে বাংলা সাহিত্য যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা সামান্য নহে। প্রথমত রাজা রামমোহনের কথাই ধরা যাক। আমরা এখানে তাঁহার অসামান্য মনীষা এবং বিচিত্র ও বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার কথা আলোচনা করিব না, তিনি ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের মহান উদ্দেশ্য লইয়া এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের মত-খণ্ডনের জন্য যে সকল পুস্তক বা পুস্তিকা রচনা করেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্যে চিন্তামূলক ও বিচারমূলক প্রবন্ধ-রচনার সূত্রপাত হয়। রামমোহনের রচনাবলী দেশীয় পণ্ডিতগণের ও বিদেশীয় ধর্ম-প্রচারকদের চিন্তাকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় এবং কেহ কেহ রামমোহনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা গদ্যের আদি পর্বের লেখক রামমোহনের রচনা সাহিত্যিক গুণে মণ্ডিত হইবে, ইহা আশাকরা যায় না, কিন্তু তিনি অনাবশ্যক শব্দ বর্জন

করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং সূক্ষ্ম যুক্তির সাহায্যে আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার 'সহমরণ-বিষয়-প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' বাংলা সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহাতে রাজা রামমোহন প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া আপন বক্তব্য স্থাপিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রামমোহনের প্রবল যুক্তিবাদ ও নারীজাতির সর্ব্ববিধ অধিকার-রক্ষায় তাঁহার প্রয়াস আজও আমাদের বিস্মিত করে। বাংলা গদ্য যাহাতে আমরা সুষ্ঠুরূপে পাঠ করিতে পারি, তাহার জন্য তিনি একটি চিহ্নের প্রবর্ত্তন করেন এবং 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন।

রামমোহনের অনুগামী, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের ঋষিগণ ও পারস্যের সুফী সাধকগণের প্রভাব ছিল বিপুল। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান তো আছেই, তাহা ছাড়া বাংলার গদ্যের উৎকর্ষ সাধনেও তিনি স্বল্প সাহায্য করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ প্রবর্ত্তক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি শুধু ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা নহেন, তিনি অন্তরে ছিলেন কবি ও শিল্পী, তাই তাঁহার রচনায় কবিদৃষ্টি ও কবিহৃদয়ের গভীর উপলব্ধির পরিচয় রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে ইংরেজি শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে তাঁহার পিতৃদেব বাংলা সাহিত্যকে শৈশব হইতে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার 'আত্মচরিত' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিচিত্র ও বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়। দুঃখের বিষয়, এ যুগের অনেক শিক্ষিত বাঙালীও কেশবচন্দ্রের সম্পর্কে সামান্যই জানেন। বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্রের দান এ যুগে স্বীকৃতি পাইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে আজও তিনি যথাযোগ্য স্থান পান নাই। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশের সন্তান কেশবচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ছিলেন ভাবপ্রবণ ও ভক্তিধর্ম্মের অনুরাগী। পরবর্ত্তী কালে তিনি আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্য দেশে অদ্বিতীয় বাগ্মীরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিপুল জনতার সম্মুখে ভাবাবিষ্ট হইয়া বক্তৃতা করিতেন এবং তাঁহার হৃদয়ের উৎসমুখ হইতে কথার নির্ঝর উৎসারিত হইত। (শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সম্পর্কেও এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।) অনুভূতির এই গভীরতা ও আন্তরিকতার গুণেই কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' বাংলা সাহিত্যে একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। 'জীবনবেদ' ও 'সেবকের নিবেদন' কেশবচন্দ্রের অন্তর্জীবনের ইতিহাস। আবার 'মুলভ সমাচার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, কি ভাবে সকলের বোধগম্য ভাষায় দেশের নানা সমস্যার আলোচনা করা যাইতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টিতে ব্রাহ্ম সমাজের দান উপেক্ষণীয় নহে।

উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নরেন্দ্রনাথের নবজন্ম-লাভ অতোধিক বিস্ময়কর।

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা সংখ্যায় অধিক নহে, কিন্তু স্বামিজীর সমগ্র রচনার মধ্যেই তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্ত্তমান ভারত,' 'বীরবাণীর' অন্তর্গত কয়েকটি বাংলা কবিতা এবং বাংলায় লেখা 'চিঠিপত্র' এইগুলি স্বামীজীর বাংলা রচনার নিদর্শন। চলতি ভাষার কি অপরিসীম শক্তি, উহার মধ্যে কেমন দুর্দ্দমনীয় গতিবেগের সঞ্চার করা যাইতে পারে, স্বামীজী তাহা দেখাইয়াছেন। আবার সাধু ভাষা কত স্বল্পাক্ষরে প্রদীপ্ত ও কত গাম্ভীর্য্য হইতে পারে, 'বর্ত্তমান ভারতে' তাহারও নিদর্শন আছে। যদি তিনি সচেতন ভাবে বাংলা

সাহিত্যের সেবা করিতেন, তবে তিনি একজন বরণীয় সাহিত্যিক হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'ও বাংলা সাহিত্যের একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমরা যেন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করিতেছি।

উনিশ শতকের ধর্ম প্রবক্তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। (আবির্ভাব—১২৫৬ বঙ্গাব্দ, হিন্দোল-দ্বাদশী, তিরোভাব—১৩০১ বঙ্গাব্দ, ৩রা আশ্বিন।) তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করেন, অবশেষে অবধূত হরিদাস স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেন। সনাতন ধর্মের প্রচারকে তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। যে সময়ে তিনি ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়কে বলা যায় হিন্দুধর্মের নব-অভ্যুত্থানের যুগ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টা এই অভ্যুত্থানে কতখানি সহায়তা করিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের বিচার্য্য বিষয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের রচনাবলী ও বক্তৃতাবলী পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি বাংলা গদ্যে নূতন প্রাণবেগের সঞ্চার করিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি 'আর্য্যধর্ম-প্রচারিণী সভা,' 'সুনীতি সঞ্চারিণী সভা' প্রভৃতি সভার প্রতিষ্ঠা করেন, 'ধর্মপ্রচারক' নামে মাসিক পত্র, 'সুনীতি' নামে পাক্ষিক পত্র ও 'দি মাদারল্যাণ্ড' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়া এবং ভারতের নানা স্থানে হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'নীতিরত্নমালা' 'পঞ্চামৃত' ও 'শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি' উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'গীতার্থ সন্দীপনী' 'ভক্তি ও ভক্ত,' 'রামগীতা' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা পাই শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে। 'পরিব্রাজকের বক্তৃতায়' দেখিতে পাই অসাধারণ বাগ্মী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নকে, আর 'পরিব্রাজকের সংগীতে' পাই তাঁহার অন্তর্জীবনের পরিচয়। কাশীধামে 'বেদ বিদ্যালয়' ও 'যোগাশ্রমের' প্রতিষ্ঠাও তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

হিন্দুধর্মের নব-অভ্যুত্থানের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নব্য হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা, এ ধর্মের নাম সর্ববৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য, এ ধর্মের লক্ষ্য পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আর এই সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। 'অনুশীলন' (ধর্মতত্ত্ব) ও 'কৃষ্ণচরিত্রের' লেখক বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী, এই যুক্তি-বাদের আলোকেই তিনি ভগবদ্গীতার ভাষ্য-রচনায়ও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারক বঙ্কিমের উপরও ভারউইন, মিল ও কোম্‌টের প্রভাব অল্প ছিল না। তথাপি তিনি ইহা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য অনুশীলনের আদর্শ অসম্পূর্ণ, আর ভারতীয় অনুশীলনের আদর্শই পূর্ণাঙ্গ।

এই যুগে নবীনচন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, মধ্য-লীলা ও অন্ত্যলীলা অবলম্বনে কাব্যত্রয়ী রচনা করিয়া-ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুক্তিবাদী, কিন্তু নবীনচন্দ্র ছিলেন ভক্ত, তাঁহার হৃদয়াবেগ ছিল প্রচণ্ড ও দুর্বার। এই জন্য তিনি মহাকাব্য রচনায় অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি যে হিন্দুধর্মের নব-অভ্যুত্থানের কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন মনীষী চন্দ্রনাথ বসু ভারতের গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকে শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী ছিলেন কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত সংস্কারমুক্ত মন লইয়া ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রের চর্চা করেন নাই।

সে যুগে শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শিক্ষিত বাঙালীর মনে যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করিয়াছিল। তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিলেন। অথচ তিনি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।—আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি যে বিজ্ঞান সম্মত, তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, বিজ্ঞানের দোহাই না দিলে শিক্ষিত সমাজে তাঁহার কথা বিকাইবে না। অবশ্য তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অল্প ছিলনা, 'ধর্মব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থে তাঁহার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে।

উনিশ শতকের শেষ দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা স্বামী বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় ও স্বদেশ প্রত্যাগমন, কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত নানা স্থানে বক্তৃতা, ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ ও বাংলার যুবসমাজের উপর বিপুল প্রভাব।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে প্রায় বার বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ পাদ হইতেই আমরা তাঁহার বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা দেখিতে পাই। তখন কোন বক্তার পক্ষেই বাংলা ভাষায় ওজস্বিনী ও আবেগময়ী বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব, ইহা লোকের ধারণা ছিল না। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠের বক্তৃতা শুনিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন, বক্তৃতাস্রোতে দেশে নবভাবের প্লাবন আনিতে হইলে বিদেশী ভাষার আশ্রয় গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ভাষা কোথাও নির্ঝরিণীর ন্যায় দুর্দম প্রাণবেগে চঞ্চল, কোথাও নদীর মত কলধ্বনি-মুখর, আবার কোথাও সাগরের মত উদাত্ত ও গম্ভীর। ইংরেজি সাহিত্যে বার্ক বা মেকলে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের জন্যও সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

আমরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের গদ্যভঙ্গির কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

'ভারত! তুমি স্বাধীনতা চাও'? এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যথার্থ স্বাধীনতা বা আত্মিক স্বাধীনতা কি বস্তু, তাহা বিবৃত করিতেছেন—

'যিনি পিতামাতার ভক্তির অধীন, স্ত্রী-পুত্রের প্রেমের অধীন, আত্মীয়-কুটুম্বের অধীন, নিজ উত্তমর্ণের অধীন, বিষয়বৃত্তির অধীন এবং কোন না কোন প্রকারে সমাজের অধীন, তিনি স্বাধীন কিরূপে? যিনি জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থা ও গতিবিধির অধীন থাকিয়া আপনার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তিনি স্বাধীন কিরূপে? যিনি জাতি, কুল, অবস্থা, সংস্কার ও সম্প্রদায়ের অধীন, যিনি কামক্রোধাদি রিপুবর্গের অধীন যিনি জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন, তিনি আবার স্বাধীন কিরূপে? বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই যথার্থ বলবান, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, সেই ব্যক্তিই পুরুষপ্রধান, সেই মহাত্মাই প্রভু ও ধন্য, যিনি তপস্তেজোবলে মহাবলশালী দুর্জ্জয় রিপুবৈরী পরাভবপূর্ব্বক পঞ্চকোষরূপ দুর্গভেদে সমর্থ ও যিনি অষ্টপাশ-পারিষদ-পরিবেষ্টিত প্রবলবিক্রম মন মহারাজকে নিজ শাসনাধীন করিয়া তাঁহার উপর স্বয়ং আধিপত্য করিতে পারেন। আমরা সেই মহাত্মা বীর লোককে স্বাধীন জানিয়া বার বার নমস্কার করি।'

এবার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কলিকাতা আলবার্ট হলে ১২৮২ সালে 'ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ' সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

'এ দেশ সকল দেশের আদর্শভূমি……যদি মরুভূমির বিকট লীলা দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে বিকানীর দেশে হিঙ্গলাজের পথে গমন কর, যদি ইউরোপীয় সদা-জলকণা-সিক্ত শীত বাতপ্রবাহে বিহার করিতে সাধ হয়, তবে আসাম চেরাপুঞ্জী প্রভৃতিতে চলিয়া যাও, যদি শিশির-উপলোদ্গমে

বিলাত যাবার বাসনা মিটাইতে চাও, তবে দার্জিলিং, সিমলা, নৈনিতাল প্রভৃতি শৈলশিখরে আরোহণ কর, যদি স্বভাবের আমোদময়ী শোভা দেখিতে সাধ হয়, তবে ক্যাংড়া উপত্যকা, কাশ্মীর উপত্যকা প্রভৃতিতে বিচরণ কর,.....ভারত-প্রকৃতির সিংহাসনার তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে'।

সেযুগে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা শুনিয়া ও রচনা পাঠ করিয়া বহু বাঙালী আত্ম-সম্বৃত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কোন্ শক্তির বলে নানা-আদর্শে বিভ্রান্ত বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন? ইহা তাঁহার ভাষার শক্তি। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা ও রচনাবলী বাংলা সাহিত্যে সৌষ্ঠবী রীতির আদর্শ। আর ভাষা যেন আরের গিরির সৈরিক স্রাবের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠ ও লেখনীমুখ হইতে সদা উৎসারিত হইত। আর এই ভাষায় প্রকাশ পাইত তাঁহার প্রবল ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব।

কবিতা

যে নদীটি সমুদ্রে গেল

শচিকেতা ভরদ্বাজ

বনে বনে কোলাহল, ঝরা পাতা মাটি হয়ে গেছে
কবেই তো। ডালে ডালে বটফল মেলেছে দুচোখ,
কাঠবিড়ালীর চোখে নতুন ভোরের সোনা পেখম মেলেছে,
কিঙের ডানায় ফের শোনা গেল শিশিরের শ্লোক।
আবার যে দেখা হবে—সেও এই বাংলার জলবায়ু থেকে
এত দূরে—নীল নীল মনুরীর পাহাড়ের পথে—
ভাবিনি তা কোনোদিন। কোথাও তো কোনো চিহ্ন রেখে
আমি তো চলিনি পথ; স্বপ্ন শরীরেও কোনোমতে
ঘনিষ্ঠ হবার শেষ প্রয়াসকে দুই হাঁতে সরিয়ে রেখেছি....।

সে তবে এমন করে আমার দুচোখে তার ম্লান চোখ তুলে
নিজেকে ছড়িয়ে দিল কেন, কেন,—ঢেউ-ঢেউ কান্নার দুকূলে?
কুয়াশার পরদা ছিঁড়ে পরিচিত প্রকাশের সব কটি রঙ
আকাশে মেলেছে ফের-বাতাসেও বেদনার গৌড়-সারঙ।

দুপায়ে অমেয় জল—আকাশে অবাক রোদে কখন মেলেছি
নিজেরও স্বগত কথা—নিজেই তা জানতে পারিনি।
পাহাড়ের পাড় ধরে বহু দূর চলে গেছে পপলার পলাশ···
দুরূহ ঋণের বোঝা বয়ে নিতে জানলাম তুমিও তো ঋণী।
তাহলে কেন যে তুমি সমুদ্রের দিকে গেলে,
জ্যোছ্নার প্রপাত
বুকে নিলে ?···"ও কথা বল না আর···
হাতে তার মোমের দুহাত।

যে নদী সমুদ্রে গেল—সেও যদি বলে সব সোনা
সমস্ত স্বাদের শব ফেলে দিয়ে,—কোথায় সান্ত্বনা।
তাহলে ছিন্ন হৃদ খুঁজে পাবে ?—মৃত চেউয়ে তার
সমুদ্র কোথায় জেনে সে কখনো হয়নি তো বসন্তবাহার!
এত কী গভীর দুঃখ ? নীরবে কেবল কচি নীলাভ আকাশ
চেতনায় চিহ্ন রেখে চলে গেছে : অজানা ঠিকানা
ডানার সকল শাদা মুছে ফেলে চলে গেছে
রিক্ত রাজহাঁস।

তাকে আমি কী বলব ? কত কথা বলবার অধিকার দিয়ে
সে বলে, "এবার চলি !···"
ধূসর শাড়ীর গান রৌদ্রে ছড়িয়ে
আঁকাবাঁকা পথ ধরে কার সাথে চলে গেল···
কোনোদিন আর
দেখিনি কোথাও তাকে, দেখা তার পাব কি আবার ?

কবিতা

আপন প্রিয়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সবাই বললো তাকে ছাড়ো ছাড়ো এ ব্যর্থ সাধনা
অবজ্ঞাত ইসারা অন্যের। তার চেয়ে গ্রহণীয়
বরং নগদ প্রাপ্য যা ছড়ানো। যা অনুকরণীয়
তা' নিয়ে জীবন শান্ত হোক। নিঃসঙ্গ কামনা
কাঁটায় ধূলোয় ভরা অন্য কোনো দিগন্তের দিকে
পাখীর মতোই গেছে বারংবার অনিষ্ঠ সন্ধানে
গলিত সূর্যের রোদে কিংবা ঝড়োযুগে। কী আহ্বানে
কে জানে কেন যে সত্তা তাকায় এখনো অনিমিষে

যন্ত্রণার কবন্ধ গহ্বরে। কালো অঙ্গারের স্তূপে
বাড়ায় নির্ভীক হাত যে-হাতেই ভুজঙ্গ দংশন
যে-কোন মুহূর্তে প্রত্যাশিত। শস্তা আকাঙ্ক্ষার রূপে
সে বলি চায় না হাতে। বৃহত্তর কোনো সন্ধিক্ষণ
আসবে এ কথা ভেবে চলে তার নির্ভীক প্রস্তুতি ;
জীবন তো তার কাছে ক্ষোভ নয় কিংবা কোনো স্তুতি।

অনুকম্পা : গল্প

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শশীভূষণের টিকুজিতে লেখা ছিল দেশভ্রমণ। শশীভূষণ ভেবেছিল যখন যতি আছে তখন হয় তো শেষজীবনে কাশী, গয়া, প্রয়াগ কিংবা টাঁকের জোর থাকলে আরো দূর বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা অবধি যোরা হবে।

জমিদারী সেরেস্তার চাকরি। আর মাতামাতি। এ ছাড়া নিজের ধানজমি আছে বিলি ব্যবস্থা করা, দুটো বড় বড় পুকুর মাছ যোগাই। শাক সব্জীটাও আর কেনার দরকার হয় না।

দুটি মেয়ে। একটি ছেলে চয়েছিল, বাঁচেনি। তাতে কোন্ আক্ষেপ নেই শশীভূষণের। যে দিনকাল, ছেলে কেমন হ'য়ে উঠত ভগবান জানেন। সারাটা জীবন হয়তো বাপের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবার চেষ্টা করত। এত কষ্টের জমিজমা দুমনে খতম। তার চেয়ে এই বেশ। ভাল দুটি ছেলে দেখে মেয়ে দুটির বিয়ে দেওয়া। তেমন তেমন হলে ঘরজামাই রাখতেও আপত্তি নেই। সব তাদের হাতে তুলে দিয়ে বুড়ো-বুড়ি তীর্থযাত্রা করবে।

কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। যা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারে নি, মানুষের এক আঁচড়ে তাই হল। চৌদ্দ-পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে দলে দলে লোক পালাতে শুরু করল। প্রাণে বাঁচলে তবে আর সব। শুধু প্রাণ, ধর্মই যদি যায় তবে আর রইল কি।

শশীভূষণ কিছুদিন ঘাটি কামড়ে ছিলো কিন্তু আর সাহস হল না। সারা রাত হৈ হল্লা। আকাশ লাল হ'য়ে উঠল মশালের আগুনে। এক সঙ্গে তিন পুরুষ বাস করা প্রতিবেশী রাতারাতি দুশমন হয়ে উঠল।

পরের দিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে শশীভূষণ সপরিবারে গ্রাম ছাড়ল।

তারপর শুরু হ'ল দেশ ভ্রমণ। কাঁটায় কাঁটায় মনে গেল টিকুজির লেখা।

রাণাঘাট থেকে শেয়ালদা তারপর বিহারের অজ এক গ্রাম। বছর দুয়েক কাটাবার পরে আবার কলকাতা। তাও অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে।

টিনের বেড়া, টিনের চাল। অনেকটা ওদের ফেলে আসা গোয়াল ঘরের মতন। নাম অবশ্য পালভিলা। নেতাজী-নগর। শশীভূষণ বয়সের ভারে যতটা না হোক, দারিদ্র্যের ধাক্কায় বেশ অথর্ব। দুপা চলতে গেলেই হাঁপ লাগে। দুটো পা ঠক ঠক করে কেঁপে ওঠে। লাঠিতে ভর দিয়ে নিজেকে সামলায়। নিজে চাকরি করে পরিবার প্রতিপালন করবে এ আশা দুরাশা।

সম্বল দুটি মেয়ে। কিন্তু এরা লেখাপড়া এমন কিছু শেখেনি যে, চাকরির বাজারে মাথা গলাতে পারবে। লেখাপড়া জানা জোয়ান মদ্দ পুরুষরাই যেখানে হার মানছে, সেখানে উঠতি বয়সের একটা মেয়ের আর সামর্থ্য কতটুকু।

তবু ওরই মধ্যে শশীভূষণ চেষ্টার কসুর করল না। আশে পাশে জানা শোনা সবাইকেই ব'লে রাখল। যা হোক একটা চাকরি। চারটি প্রাণী যেন না খেয়ে মরে তার সামান্য ব্যবস্থা।

বরাত বলতে হবে শশীভূষণের। পাড়ার একটি ছেলেই খবর আনল।

নবারুণ কেমিকেল্‌স। তেল, সিঁদুর, সাবান থেকে শুরু করে সস্তা দামের স্নো পাউডার পর্যন্ত। সেখানে কয়েকজন মেয়ে দরকার। খুব লেখাপড়া জানা নয়, কারুর কাজ শিখিতে নেবেন খাঁটি। কিংবা টিনের কৌটায় পাউডার ভরা।

শশিভূষণ হাতে স্বর্গ পেল। ছুরাত্ত ভুলে আশীর্বাদ করল ছেলেটিকে তারপর ছেলেটির ছুটো হাত জড়িয়ে ধরল।

—তোমায় লতির একটা বন্দোবস্ত করে দিতে হবে বাবা। ওর কিছু একটা না হলে আমাদের উপোস করে মরা ছাড়া আর উপায় নেই।

ছেলেটি পরের দিনই লতিকে নিয়ে গেল, শশীভূষণ অবশ্য সঙ্গে রইল।

মালিক মারওয়াড়ী। শশীভূষণের সঙ্গে কথাবার্তা ভালই বলল। ইচ্ছা করেই উদ্বাস্তু এলাকায় কারখানা খুলেছে, তবু যদি কয়েকজন উদ্বাস্তুর অন্নের সংস্থান হয়। উদ্বাস্তু সমস্যা বিরাট সমস্যা। সব কিছু সরকারের ঘাড়ে চাপালে কিছুই সমাধান হবে না। যার যতটুকু সাধ্য, নিজেদের কিছু কিছু ভার নিতে হবে।

লতি কাজে বহাল হ'ল। প্রথম ছ মাস, মাইনে পঁয়ত্রিশ। কাজ দেখাতে পারলে উন্নতি আটকাবে না। শশীভূষণ প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ী ফিরল। কিন্তু আর এক সমস্যা। রোজ কারখানায় যেতে হলে ছ একখানা শাড়ী তো অন্ততঃ দরকার। একখানা শাড়ী কেচে ক্ষুচে আর কতদিন চালাবে। এ ছাড়া যে সব শাড়ী আছে তাতে উন্নতি বয়সের মেয়ের দেহ ঢাকা যায় না ভাল ক'রে। বাড়ীতে না হয় কোন রকমে জড়িয়ে থাকা চলে।

শশীভূষণ প্রথমে বৌয়ের কাছে হাত পাতল। কিন্তু বৃথা। টাকার বদলে সুখ কামটা। টাকার গাছ আছে কি না তাই নাড়লেই ঝনঝন করে টাকার মোহর পড়বে। অগত্যা পাড়া প্রতিবেশীর কাছে হাত পাতা শুরু হল। শোধ দেবার অসুবিধে নেই। মেয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। এখন মাইনে কম, কিন্তু মাস কয়েক গেলেই মাইনে বেড়ে যাবে।

লতি একলা নয়, পাড়ার আরো জন ছয়েক সঙ্গে জুটল।

প্রথম প্রথম মেয়ে বেরিয়ে গেলেই মেয়ের মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদত। শশীভূষণ বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়েও কি ভেবে থেমে যেত। মন খুলে কাঁদুক একটু, তবু মনটা হালকা হবে। মেয়েদের ঘিরে অনেক আশা আর আহ্লাদ ছিল, স্বপ্নের ঘোর, সে সব এমন করে ভেঙে চৌচির হ'য়ে যাবে, কে আর ভাবতে পেরেছিল।

ক্রমে ক্রমে সবই গা সওয়া হ'য়ে গেল। মাসের শেষে লতি শুধু পঁয়ত্রিশ টাকাই নয়, তার সঙ্গে আলতা, স্নো, সিঁদুরের কতকগুলো বাড়তি কৌটোও নিয়ে এল।

ছোট বোন বীথি আনন্দে আটখানা। আলতা আর স্নোর কৌটো ছুটো সরিয়ে ফেলল। দিদি তো দরকার হ'লে কারখানা থেকে কত নিয়ে আসতে পারে। ওর ছ কৌটোয় ছ মাস চলে যাবে।

এখন আর লতির জন্ত ভাবনা নেই। মাঝে মাঝে আসতে একটু রাত হয়, প্রথম প্রথম মা বাবা একটু উদ্বিগ্ন হ'ত, কিন্তু যখন বুঝল দেরীতে আসা মানেই বেশী টাকা রোজগার করা তখন বরং একটু খুশীই হত।

এ ছাড়া আজকাল লতির সঙ্গে ছ একটি ছোকরাও থাকে। তাদের বাড়ীতেও নিয়ে আসে।

মা প্রথম দিকে ভ্রুকুটি করেছিল।

—হ্যারে, এদের সঙ্গে আলাপ হ'ল কোথা থেকে? মেয়ে পুরুষ সব একসঙ্গে কাজ করিস নাকি?

যার কথার ধরণে লতি হেসে লুটিয়ে পড়েছিল, শোন কথা মার। একি গঙ্গার ধারে কথকতার ব্যাপার নাকি,

যে মেয়ে একধারে, পুরুষ একধারে, কিংবা দেশের যাত্রার মতন ঢিকের আড়ালে মেয়েদের বন্দোবস্ত।

কপাটের ফাঁক দিয়ে মা উঁকি দিয়েছিল, ছেলেটি কে?

—বীরেনদা। মালিকের প্রায় ডানহাত।

শশীভূষণ কিন্তু বিগলিত। মেয়ের হাত থেকে নিয়ে হাতল-ভাঙা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলে, বসুন বসুন, আপনাদের আশ্রয়েই দিয়েছি। কোনদিন যে আমাদের বাড়ীর মেয়েকে রোজগারের চেষ্টায় চৌকাঠের বাইরে পা দিতে হবে, তা ভাবি নি। সবই অদৃষ্ট বুঝলেন বীরেনবাবু।

বীরেন আপত্তি করেছিল, আমাকে আর আপনি, বাবু এ সব বলছেন কেন, আমি আপনার ছেলের সমান।

শশীভূষণ স্তম্ভিত। এ যুগে এমন ছেলেও আছে!

রোজই যে বীরেনই আসে এমন নয়, প্রায় এক এক দিন এক এক জন। সুবোধ, মনিময়, অশোক, বিজয়, প্রিয়তোষ এমনি অনেক নাম। সবাই নাকি মালিকের ডান হাত।

এ নিয়ে বীথি ঠাট্টাও করেছে।

—তোর মালিক যে রাবণকেও হার মানাল দিদি। হাতের আর সংখ্যা নেই।

লতি ধমক দিয়েছে, বড্ড ফাজিল হয়ে যাচ্ছিস, বীথি।

শশীভূষণ বীথির জন্যও চেষ্টা করেছে কিন্তু সুবিধা হয় নি। মেয়েটার চেহারা দিদির মতন নয়। রংটা চাপা, গড়নটাও তাই। এখন বয়স ষোলো পেরিয়েছে কিন্তু অনায়াসেই ফ্রকের খোলসে মুড়ে রাখা যায়। তাছাড়া, মেয়েটার মধ্যে রসকষও বেন কম। কাটা কাটা কথাবার্তা, বাড়ীতে এত ছোকরা আসে কিন্তু কথা বলা দূরে থাক কারুর কাছে গিয়েও দাঁড়ায় না।

তবে লতি ওরসা দিয়েছে সুযোগ সুবিধা হলেই বীথিকে কারখানার কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবে।

বছরখানেকও নয়, লতি একটা নতুন খবর আনল। কারখানার কতকগুলো মেয়েকে প্রসাধনের স্যাম্পল নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরতে হবে। মাইনেও বেশী তা ছাড়া বাসভাড়া বাবদও কিছু পাওয়া যাবে। লতিকে নিয়েছে সেই দলে।

শশীভূষণ দু হাতজোড় করে বুকে ঠেকাল। নিজেও এখন ঠিক বেকার নয়। নেতাজী নগরের প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী জুটিয়ে নিয়েছে। মাইনে এখন কিছু নয় তবে একেবারে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকার চেয়ে ভাল বই কি।

—তা হ'লে তো ভালই হ'ল কি বল? শশীভূষণ উল্লসিত।

—মাইনের দিক থেকে খুব খারাপ নয়, লতি গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, তবে খাটুনি বাড়ল। মাঝে মাঝে আবার বাইরে রাত কাটাতে হবে।

—বাইরে রাত কাটাতে হবে? শশীভূষণের গলা উদ্বেগের ছিটে, কেন বাইরে রাত কাটাতে হবে কেন?

—কাজ তো শুধু কলকাতা শহরেই নয়, দরকার হ'লে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর এ সব জায়গাতেও যেতে হবে। কাজ সেরে একদিনে ফেরাই মুস্কিল।

শশীভূষণ চুপ। সত্যিই তো, যে যেবতার যে বর যে অফিসের যেমন কাজের ধারা। তা ছাড়া ভিক্ষের চাল আবার বাছাবাছি। পয়সা যখন বেশী দিচ্ছে তখন আপত্তি করাই তো বোকামী।

বছর ঘুরতেই লতির হালচালও ফিরে গেল। মাথার ধামের সিল্কের শাড়ী, সর্বদা মুখ জবজবে মুখ, হাতে জমকালো বটুয়া। শুধু চেহারা নয়, ধরণ ধারণও পাল্টে গেল মিহি গলা, সামান্য রসিকতায় দাদাদের গায়ে চলে পড়া দুটি দিনও বাইরে বাইরে কাটানো।

শশীভূষণ চোখ ফিরিয়ে নেয়। পঁয়ত্রিশ টাকায় শুরু বছর শেষ হবার আগেই একশ দশ। বলতে গেলে

গোটা সংসারটাই তো হেলান দিয়ে রয়েছে লতির রোজগারের ওপর।

বীথিরও একটা বন্দোবস্ত লতি করে দিয়েছিল, নিজের কারখানায়। সিপি বোতল ধোয়ার কাজ। কিন্তু দিন সাতেক, তার বেশী বীথি চাকরি রাখতে পারেনি।

বাড়ীতে এসে লতি গজ গজ করেছে।

—অত খুঁতখুঁতে হলে কখন চাকরি করা চলে। কে কি বলেছে, অমনি মেয়ে খামা। হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়ের অভাব। একবার টুঁ শব্দটি দিলে একশটা মেয়ে কাঁপিয়ে পড়ছে। তবু আমার বোন ব'লে মাসিক ছদিন সময় দিয়েছিল। ওর দ্বারা কিছু হবে না বাবা। আমি আর ওর জন্য কিছু করতে পারব না।

আশ্চর্য, বীথি কিন্তু একটি কথাও বলেনি। কেন চাকরি গেল, কে কি বলেছিল কিছু বলল না। শুধু ঘরের কোণে হু হাঁটুর ওপর মুখ রেখে চুপচাপ বসে রইল। শশীভূষণ হু একবার জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেল। ব্যাপার দেখে মা আর এগোতেই সাহস করল না। চিরদিন বীথি এমনি অবুঝ মেয়ে। নিজের গোঁ ছাড়া হুনিয়ার আর কিছু বুঝতে চায় না।

গড়িয়ে গড়িয়ে তবু একরকম ভাবে সংসার চলছিল, বিপদ বাধাল শশীভূষণ নিজে। কোথাও কিছু নেই পড়াতে পড়াতে চোখে অন্ধকার দেখল তারপর কাত হ'য়ে পড়ল চেয়ার শুদ্ধ।

পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে এল, তাদের মধ্যেই একজন পাড়ার ডাক্তার নরহরি বক্সকে খবর দিল।

নরহরির পসার খুব। প্রিস্ক্রিপশনের মধ্যে ধরন্তরী। অনেকক্ষণ ধরে দেখে মুখটা বিকৃত করলেন।

—হার্টের অবস্থা ভাল নয়। চুপচাপ বিছানায় শুইয়ে রাখতে হবে। একটু নড়াচড়া বারণ। কয়েকটা টনিক আর ভাল কলমূল। মাস হুয়েকের মধ্যে রোগী চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।

বীথিই গেল ডাক্তারখানায়। লতি বাইরে, ফিরতে হু একদিন দেরী হবে।

টনিকের দাম শুনে বীথিরই হার্ট বিকল হবার দাখিল।

একটা বোতল সাড়ে নটাকা, আর একটা, সেটা আরো ছোট শিশি, একুশ টাকা। এর ওপর আবার আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবুর ব্যাপার আছে।

বাড়ী ফিরে বীথি মাকে সব জানাল। আঁচলে চোখ মুছে মা লক্ষ্মীর কাঁপিতে হাত দিল। অসময়ের সঞ্চয়।

কিন্তু ডাক্তারের কথা ফলল না। হু মাসে অবস্থা একটুও ভালর দিকে নয়। অথচ লুকিয়ে-চুরিয়ে বহু কষ্টে জমিয়ে রাখা টাকা নিঃশেষ। চোখের জল ছাড়া আর কিছু সম্বল রইল না।

ওই তো লতির টাকা কটা ভরসা। বিছানা নিয়ে অবধি শশীভূষণের মাইনে বন্ধ। গরীব স্কুল, যে সব মাস্টার চলা ফেরা করছে, তাদের মাইনেই সব সময় ঠিক মত দিয়ে উঠতে পারে না, আর কাত হ'য়ে পড়ে থাকা মাস্টারের কথাই ওঠে না।

শুয়ে শুয়ে শশীভূষণ ব্যাপারটা সবই আঁচ করতে পারল।

স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, আর কোন উপায় দেখছি না। আমার চিকিৎসা চালাতে তোমরা যে পথে বসবে। তার চেয়ে হোমিওপ্যাথি বরং চেষ্টা কর, খরচ কম পড়বে।

শশীভূষণের স্ত্রী কোন উত্তর দিল না। আঁচল চাকা দিয়ে নিজের শেষ সম্বল সোনার কলিহুটো নিয়ে বাইরে বেরোল।

লতির বাইরে যাওয়াটাও যেন বেড়েছে। সপ্তাহে হু তিন দিন বাইরে কাটায়। পরণের শাড়ী আরো দামী। কানে হাতে ঝকঝকে সোনার ইয়ারিং আর চুড়ি। প্রসাধনের প্রলেপ আরো গাঢ়।

মায়ের নজরে পড়েছে। কথায় কথায় এক দিন জিজ্ঞাসাও করেছে মেয়েকে।

সতি হেসেছে, হায়রে তোমরা বুঝি ভাবছ মাইনের পুরো টাকাটা তোমার হাতে তুলে না দিয়ে এসব কিনছি আমি? এ সব অফিস থেকে দিচ্ছে। ওর আয়নায় ঘুরে বেড়াতে হয় তাই পোশাকও সে রকম করতে হবে বৈ কি। এ সবই কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, বুঝলে।

মা কি বুঝল সেই জানে কিন্তু আর কথা বাড়াল না। সত্যিই তো মাইনের টাকাটা সব যদি মায়ের হাতে নাই দেয়, তাতেই কি বলবার আছে। উনতি বয়সের মেয়ের সাধ-আহ্লাদ নেই! বাপ মা আর কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে। যে টুকু দের তাই যথেষ্ট। এই তো আর একটা থুবড়ো মেয়ে বসে বসে কেবল অন্ন ধ্বংস করছে। একটি পয়সা রোজগারের চেষ্টা আছে! সংসারে এমন অবস্থা দেখেও চোখ বুজিয়ে আছে।

সেদিন খেতে বসে কলড়া বাধল। বীথি আর তাঁর মা সামনাসামনি বসে খাচ্ছিল। সকাল থেকে মায়ের মেজাজ খারাপ। শশীভূষণের ওষুধ শেষ। ঘরে একটি পয়সা নেই। সকালে একটি ছেলে খবর এনেছিল। ঠোঙা তৈরী করার জন্য মেয়ে দরকার। বীথি যদি যায় তো চেষ্টা করা যেতে পারে।

পাড়ার ছেলে, বীথি তাকে খুব ভাল করেই চেনে। কি ধরনের ছেলে তাও জানে।

—কোথায় ঠোঙা তৈরীর কাজ, দীপুদা, আদর্শ মহিলা শিল্পি-এ নাকি?

একটু ইতস্তত: করে দীপু ঘাড় নেড়েছিল।

—সেখানে শীতল ঘোষাল সেক্রেটারি আর তুমি সহকারী? বিস্মিত দীপু জোরে জোরে মাথা নেড়েছিল আবার।

বীথি গম্ভীর গলায় বলেছিল, অন্য কোন বাড়ীর মেয়েকে চাকরী দেবার চেষ্টা কর দীপুদা, আমি যাব না।

দীপু যেন পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু দরজার আড়াল থেকে বীথির মা সব শুনেছিল। প্রত্যেকটি কথা।

—হারে, গেলি না কেন?

—সেখানে সম্মান নিয়ে কাজ করা যায় না মা।

মা খিঁচিয়ে উঠল, দুনিয়ায় সব মেয়ে কাজ করছে, তোরই কেবল সম্মানের চিন্তা। কোথাকার রাজনন্দিনী তুমি শুনি! দু দিন পরে যে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, সে খেয়াল আছে?

বীথি কথা বলে নি, মাথা নিচু করে সরে গিয়েছিল সেখান থেকে।

খেতে বসে সেই কথাটারই জের চলল।

পাতের ভাত শেষ করে বীথি আর একটু ভাত চেয়েছিল। বেচারী খায় একটু বেশী, তাও অভাব অনটনের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া অনেক কমেই গিয়েছিল।

মার মেজাজ তিরিক্ষে হয়েছিলই। ভাত খোলায় যেন ঘিয়ের ছিটে পড়ল।

—লজ্জা করে না, পরের রোজগারে নিজের খোরাক বাড়াতে? একটি পয়সা দেবার মুরোদ নেই যার, তার দুবেলা অন্ন ওঠে কি করে?

ব্যস, মেয়েমানুষের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। বীথি মিনিট দুয়েক চুপ করে উঠে পড়ল। মুখ হাত ধুয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

রান্নাঘরের কাজ সেরে মা যখন এদিকে এল তখন বীথি নেই। মা বিশেষ খোঁজও করল না। যাবে আবার কোথায়। আশ পাশের কারুর বাড়ী গিয়ে জুটেছে। বেলা পড়লেই গুট গুট করে বাড়ী ফিরবে।

বেলা পড়ল, কিন্তু বীথির দেখা নেই। সতি ফিরল, সাড়ে সাতটা নাগাদ, তখনও বীথি এল না। এতক্ষণ পরে

মা একটু চিন্তিত হ'ল। রাসের মাথায় মেরে অঘটন কিছু ঘটিয়ে বসল না তো। কিছু বলা যায় না। ছেলের তলায় মাথা দিতে পারে কিংবা পুকুরে ঝাঁপ।

লতিকে খেতে দিয়ে মা নিজেই একবার ঘুরে এল। এপাশ-ওপাশ চারপাশ। কাকার বাড়ী আর খোঁজ করল না। তা হলেই সারা কলোনীতে হৈ হৈ পড়ে যাবে। বয়সের মেয়ে বাড়ী ছেড়ে উধাও। নানান লোকে নানা কথা বলবে। খোঁজ খবর নেবার ছুতোয় ভেতরের কথা জানতে চাইবে। ঘিনিয়ে বিনিয়ে হাজার কথা।

লতি খাওয়া শেষ করে একবার ঘুরে এল। হেঁটে হেঁটে বাসস্টপ পর্যন্ত। এদিকে কারখানার দরজা অবধি। কোথাও মেয়ে নেই।

বীথি ফিরল নটা নাগাদ। গম্ভীর মুখ। কারুর দিকে ফিরে দেখল না। সোজা মায়ের সামনে গিয়ে তার কোলের ওপর পাঁচটাকার নোট একটা ফেলে দিল।

—কোথায় ছিলি পোড়ারমুখী? রাসের কান বাঁচিয়ে মা চেঁচিয়ে উঠল।

—অত খবরে তোমার দরকার কি মা। টাকার দরকার টাকা এনে দিয়েছি। ব্যস, খেতে দাও এইবার।

মা আর বেশী চেঁচামেচি করল না। চুপচাপ ভাত বেড়ে দিল মেয়েকে।

দু'বোন একসাথে শোয়। লতি জিজ্ঞাসা করল, কোথাও কাজে লেগেছিস বুঝি?

বালিশে মুখ গুঁজড়ে বীথি ছোট্ট করে বলল, হুঁ।

—কোথায় রে?

—আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি। কাল সকালে বলব।

সকালে অবশ্য লতির জিজ্ঞাসা করার ফুরসৎ হল না। ভোরের গাড়ীতে তাকে বাইরে যেতে হবে। বীথি ওঠবার আগেই সে বেরিয়ে গেল।

সেদিনও ওই এক ব্যাপার। বীথি নটা নাগাদ বাড়ী ফিরে মার হাতে তিনটাকা তুলে দিল।

মা এইটুকু বুঝল কোথাও কিছু একটা বীথি যোগাড় করে নিয়েছে। কোন কারখানায়, কিংবা কোন দোকানে, ঠোঙা তৈরী কাজ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

খুঁটিয়ে অত জিজ্ঞাসা করার তার প্রয়োজনও নেই, সময়ও কম। কাল সকালেই ওষুধ কিনতে হবে শশীকৃষ্ণের। পয়সার অভাবে দুদিন লোকটা বিনা ওষুধে রয়েছে শুধু জিজ্ঞাসা করল, কাল পাঁচ টাকা দিয়েছিলি, আজ তিন টাকা যে।

বীথি মুখহাত ধুচ্ছিল, মার দিকে ফিরে বলল, রোজ কি সমান আয় হয় মা। যেমন খাটি, তেমনি রোজগার হয়।

সারাটা মাস এমনি চলল। রোজই বীথি কিছু কিছু এনে দিল।

এতদিন পরে শশীকৃষ্ণের নজরে পড়ল। বীথি বিকেলের দিকে বেরিয়ে যায় ফেরে রাত্রে।

—বীথি কোথায় যায় বলত?

মা হাসল, কোথায় যে কাজ পেয়েছে। এমন চাপা মেয়ে কিছুতেই বলবে না। একদিন খুব বকেছিলাম, সেদিনই বেরিয়ে গিয়ে কিছু ছুটিয়েছে।

শশীকৃষ্ণ একটি কথাও বলে না। দুর্বল দেহটা তিনের বেড়ায় ঠেস দিয়ে টেনে টেনে নিশ্বাস নিয়েছিল। দুচোখ আশাতঙ্গের অন্ধকার।

মাস তিনেক পর।

লতি ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরছিল। পাশে কারখানারই একটি ছোকরা। তার প্রসারিত হাতের ওপর মাথা রেখে লতি ক্লান্তচোখে এদিকে ওদিকে দেখছিল। চোখমুখে চেহারা ছেলেটির, তা হোক কারখানার কর্তার ছেলেরও

লোক। তা ছাড়া এক মাসে ছুটে দামী শাড়ী আর তিনমাসে একটা লেডিজ রিষ্ট ওয়াচ যে কিনে দিতে পারে তার চেহারা দেখে ঠোঁট ওল্টাবে এত কাঁচা মেয়ে লতি নয়, অন্ততঃ এতদিন কারখানার কাজ করার পর। সকলের সঙ্গে মিশতে পারে বলেই তার এত খাতির। নাক সিঁটকানো স্বভাব হলে কবে তলিয়ে যেত।

হঠাৎ লতি যেন ভূত দেখল। সোজা হয়ে বসে ড্রাইভারকে ধাক্কা দিয়ে বলল, এই রোখকে।

পাশের ছেলেটি জড়ানো গলায় বলল, মাঝ রাস্তায় কি হল আবার ?

লতি কোন উত্তর দিলনা। মোটর থামতেই দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

ঝাঁকড়া বটগাছ। স্টেশনের সামনেই। তার নিচে গুটি কতক মেয়ের জটলা। মুখে রং, চোখে কাজল। চং দেখলে আর চিনতে দেরী হয় না। তাদেরই মাঝখানে বীথি। কি একটা রসিকতায় হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

—বীথি! লতি প্রায় চিৎকার করে উঠল। মেয়েদের দল থেকে বীথি এগিয়ে এল। সোজা দাঁড়াল দিদির মুখোমুখী। মুখ দেখে মনে হল না একটু অবাক হয়েছে বা ভয় পেয়েছে।

—ও তুমি ? আমি তাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম মোটর থামতে। মোটরচড়া বাপের আমাদের বরাতে বড় একটা জোটে না।

—ছি, ছি, লজ্জা করে না তোর। এই ভাবে পয়সা উপায় করতে নেমেছিস। এর চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারলি না।

বীথি অবিচল। মুচকি হেসে বলল, তা হ'লে তো এক বছিতে দুজনকে মরতে হয় দিদি। ব্যবসা দুজনের একই। তোমার না হয় মাঝখানে বিরাট একটা কারখানার কাঠামো আছে, সহকর্মীর দল রয়েছে, রেটও উঁচু, বাইরে বেরোনোর ছলনা টুকু রয়েছে, আমাদের অবশ্য এই বটতলাটুকু সম্বল, এখানে দাঁড়িয়েই টানাহেঁচড়া করে যা রোজগার হয়। আমার বেশী দরকারও নেই। দুবেলা দু মুঠো ভাতের দাম তুলতে পারলেই যথেষ্ট।

লতি একটা কড়া কথা বলতে গিয়েই বাধা পেল। মোটরের ভেতর থেকে ছোকরাটি একটা হাত বাড়িয়ে লতির একটা হাত চেপে ধরল, কি কর মাইরী মাঝরাস্তায়, এরপর বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে গেলে আমায় কিছু বলতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।

হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে লতি থেমে গেল। এরপর আর বীথির কথার উত্তর দেওয়াও যায় না। উত্তর দিতে গেলে বীথির কথাই বুঝি মেনে নিতে হয়।

কবিতা

শিল্পিত

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

জানি আমি সে কঠিন যে আমার আত্মার ধরণী।
যে আমার জপমালা, যে আমার পরম প্রার্থিত
তারে আমি ভুলে যাই, ভুলি আমি প্রাণের সরণী
প্রথমের অগ্নি সাক্ষী ভবিষ্যের একান্ত ঈপ্সিত ;
হল না সর্বস্ব দেওয়া দ্যুলোকে ভূলোকে পরিণয়—
তাই আমি কক্ষচ্যুত, আই তামি এখনো ফেরার
সুন্দরের থেকে দূরে ; যে আমার ভয়ের অভয়,
আমার শরণাগতি—তার কাছে নব অঙ্গীকার
নেব আজ ; এ-জীবন সেই সত্যে হবে যে শিল্পিত—
প্রভাতের প্রসন্নতা, রৌদ্রদগ্ধ গেরুয়া দুপুর
রক্তরাগ সন্ধ্যাকাশ-অন্ধকারে আলোয় পুষ্পিত
মধুময় এ ধূলোয় নক্ষত্রের বাজাব নূপুর ;
সমস্ত সত্তার শিরে আদিগন্ত হবে মধুময়
আত্মার আলোয় জ্বালা প্রথমের শেষ পরিচয়।

আমাদের খাদ্য সমস্যা

ডাঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

প্রবন্ধ

বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময়ে সরকার পক্ষ থেকে জোর গলায় প্রচার হয়েছিল যে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এবং খাদ্যের ব্যাপারে আমরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছি। এক বছর পরে দেখা যাচ্ছে আমাদের উৎপন্ন খাদ্যশস্য ৬,৮৭ লক্ষ টন থেকে ৬,২০ লক্ষ টনে নেমেছে এবং বিদেশ থেকে আমদানি খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৪ লক্ষ টন থেকে ৩৯ লক্ষ টনে উঠেছে। এটা গত মাসের কথা। এ বছরের অবস্থা অনেক বেশী শোচনীয়।

সকল সমস্যার গোড়ায় খাদ্যের সমস্যা। স্বাধীনতা পাবার এগার বছর পরে আমাদের অবস্থা যথাপূর্বং তথা পরম্। অথচ এ সমস্যা সমাধানের জন্যে অর্থব্যয় ও ছোড়জোড় কম হয়নি। সে অনুপাতে ফল হল সামান্য। এর কারণ পরিকল্পনার বাস্তববোধের অভাব। খাদ্যের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়াতে হলে একসঙ্গে অনেক দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, যথা ভূমিস্বত্ব, জমির জলাপ্লব, সারের পরীক্ষা, সেচব্যবস্থা, শস্যের রোগ-প্রতিষেধন ইত্যাদি। এই ব্যাপক ও সন্ধানী দৃষ্টি খাদ্যবিভাগে দেখা যায় নি।

উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা

খাদ্য সমস্যা প্রধানত উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা। অবশ্য উৎপন্ন খাদ্য বণ্টনের প্রশ্নও রয়েছে এবং এ কাজেও সরকার বহু গলদের পরিচয় দিয়েছেন। এর গলদ দূর হলে রাজ্যে রাজ্যে খাদ্য বৈষম্য কিছু কমবে। চোরাকারবারীদের পোয়াবারো বন্ধ হবে এবং খাদ্যের দাম একটা গ্রাহ্য সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু আসল সমস্যা হল ঘাটতি। তার পরিপূরণের জন্যে উৎপাদন বাড়ানো দরকার।

অবশ্য উৎপাদন যে আদৌ বাড়েনি তা নয়। তবে জনসংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে এবং দ্রুততর হারে; যে জন্যে অশোক মেটা খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটী বলেছেন যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা অপসৃয়মান। আশঙ্কাটা মেনে নিলে ভবিষ্যত ভয়াবহ এবং মানবার পক্ষে যথেষ্ট কারণও নেই। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে:

"চাষের আবিষ্কৃত কৌশল ঠিকমত প্রয়োগ করলে এবং সেই সঙ্গে সাধ্যমত সেচের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার করলে ভারতবর্ষের ফলন চার-পাঁচ গুণ বাড়ানো যেতে পারে। এ হতে হতে আরো নতুন কৌশল বেরুবে এবং আরও উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেবে। খাদ্য উৎপাদন-বৃদ্ধির উদ্যোগে যে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়েছে তাতে কোন কোন চাষী গড় উৎপাদনের শতগুণ উৎপাদনও দেখিয়েছে। ভারতবর্ষের ফলন এখন পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম স্তরে কৃষিজীবী লোকের সংখ্যা যা আছে তাতে এক উচ্চতম স্তরে তোলা কিছু কঠিন নয়। সুতরাং কৌশল খাটালে উন্নতির সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট; বাধা শুধু দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা।"

সেচ ও ভূমি-সংস্কার

অনেকের ধারণা চাষীরাই শুধু অজ্ঞ। কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞদের অজ্ঞতাও কিছু কম নয়। এত খরচ করে

বিরাট বাঁধগুলি হল তাতে সেচের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হয় নি। বাঁধ থেকে জল ছাড়লে কোন জায়গা বানে ভেসে যায় কোন জায়গায় জল আদৌ পৌঁছায় না। সর্বত্রই সেচ পরিকল্পনায় খরচের অনুপাতে লাভ যে খুব কম হয়েছে এ কথা সরকার এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনুরূপ বসিরেও সেচের কাজ বেশী অগ্রসর হয় নি। ছোট বড় সবরকম পরিকল্পনাই প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ এই যে ক্ষেত-গুলিতে জল সরবরাহ করবার জন্যে নালী কেটে দেওয়া হয় নি। সরকারী কূপ অথবা প্রণালী থেকে জল ক্ষেতে টেনে নেবার দায়িত্ব চাষীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্যে তার ওপর উঁচু হারে জলকর ধরা হয়েছে। অথচ নালী কাটাবার মত অবস্থা অনেক চাষীর নেই। আর জল টেনে নিতে হলে কোথাও হয়ত অন্যের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে নিতে হবে, সে জলকর না দিয়েই জল পাবে। এ ছাড়া ফসল পাবার আগেই খাজনা দিতে কেউ সহজে রাজী হয় না।

অবশ্য সকল ক্ষেতে জল পৌঁছে দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এ দায়িত্ব নেওয়া উচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের। পঞ্চায়েতকে এর উপযুক্ত ক্ষমতা ও অর্থ দিতে হবে। যত-দিন এ ব্যবস্থা না হবে ততদিন জলকর বন্ধ রাখতে হবে। খাজনা তুলতে হলে তা ধরতে হবে ফসলের ওপর, জলের ওপর নয়। সরকারী পরিকল্পনার দোষে অনেক স্থানে জলকর দিয়েও জলের সুবিধা পাওয়া যায় না।

শুধু সেচকার্য নয়, কোন প্রকার গ্রামীণ উন্নয়ন গ্রাম-বাসীদের উৎসাহ ও সহযোগিতা ভিন্ন সম্ভব নয়। কৃষির উন্নয়ন আমলা ও কৃষিবিজ্ঞানীদের হাতে নেই, আছে চাষীদের হাতে। তাদের মনে উৎসাহ ও একতাবদ্ধ দায়িত্ব আসবে কি করে? তাদের মধ্যে অধিকাংশ ভূমিহীন অথবা নামমাত্র জমির অধিকারী। ভূমি সংস্কার আইন এদের হাতে জমি এনে দেয় নি। যাদের জোত অত্যন্ত ছোট তাদের জমি সমবায় প্রথায় একসঙ্গে আবাদ করবার কোন ব্যবস্থাও হয় নি। যাদের জীবন কাটে অর্ধাশনে পঞ্চায়েতী শাসন ও সমবেত উদ্যমে তাদের আগ্রহ আসবে কোথা থেকে?

যে কোন কৃষি-উন্নয়ন ও খাদ্য-উৎপাদন প্রচেষ্টার গোড়ার কথা জমি কটন। হতে পারে অনেক জায়গায় জমি এত কম, যে ভূমিহীন চাষী জমি পেলেও তাতে তার গ্রাসাচ্ছাদন হবে না। তবু এর একটা নৈতিক দাম আছে। একটুখানি সুবিচার পেলে, একটুখানি আত্মনির্ভরতা এলে, তাতে যে উৎসাহ ও সহযোগ-প্রবৃত্তির সঞ্চার হবে, তাতে যৌথ উদ্যোগের কাজ আটকে থাকবে না।

সার

ভারতবর্ষে জমির ফসল অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। শুধুমাত্র ভূমি-ব্যবস্থা ও সেচের অব্যবস্থা এর কারণ নয়। এর অন্যতম কারণ সারের অভাব। যে জমি আমাদের খাদ্য যোগায় তারও খাদ্য চাই। পশু ও মানুষের খাদ্যের মত জমির খাদ্যেও বৈচিত্র্য আছে—প্রতিনিয়ত একরকম আহার পেলে তারও উৎপাদন শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সে নির্লোভ, মিতাহারী, তার খোরাক খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। মানুষ ও পশুর মলমূত্র, নরদেহের হাড়, পচা উদ্ভিদের আবর্জনা, এই সব পরিত্যক্ত জিনিসই জমি চায়। এও তাকে যত্ন নিয়ে দেওয়া হয় না।

জমির খাদ্যের প্রধান রাসায়নিক বস্তু হল নাইট্রোজেন। ভারতবর্ষে প্রতিবছর উৎপন্ন ফসল জমি থেকে ৩৮ লক্ষ টন নাইট্রোজেন টেনে নেয়। সারের মারফৎ আমরা জমিকে ফিরিয়ে দিই ১০ লক্ষ টনেরও কম নাইট্রোজেন। এর কিছু অংশের ক্ষতিপূরণ হয় উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর আবর্জনা

থেকে স্বাভাবিক ভাবে। অধিকাংশ ঘটতি থেকে যায় এবং তার ফলে জমির ফসল বাড়তে পায় না।

এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন সার এমোনিয়াম সালফেট তৈরী হয় এবং চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির হিসাব অনুসারে আমাদের বছরে ১৪ লক্ষ টন রাসায়নিক সার দরকার। জনসংখ্যা ও কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিমাণ বাড়তে থাকবে। কিন্তু আমরা এখনও বছরে ৭ লক্ষ টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদন করতে পারি নি। বর্তমান সালে (১৯৫৭-৫৮) সিন্দ্রিতে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়েছে।

এ জিনিষটার ওপর খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি একটু অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের দেশে রাসায়নিক সারের চেয়ে প্রয়োজন বেশী জৈব সার ও সবুজ সারের। প্রচুর জল পেলে পর রাসায়নিক সার কার্যকরী হয়। অনুযায়ী এতে গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে জমির রস টেনে নেয় এবং ফলনের আগে জলের অভাবে শুকিয়ে যেতে থাকে। ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ২৫ভাগ জমি নিয়মিত সেচের জল পায়। বাকি ৭৫ভাগ অনিশ্চিত বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এখানকার সারের প্রয়োজন কারখানার রসায়ন দিয়ে মিটবে না।

সবরকম চাষের জমির সর্বশ্রেষ্ঠ সার হল গোবর। দুঃখের বিষয় এর অধিকাংশ জ্বালানির কাজে ব্যবহার হয়ে যায়। সস্তা কোন জ্বালানি যোগাতে পারলে এই অমূল্য বস্তু উদ্ধার করে জমিতে দেওয়া যেতে পারে। প্রায় গোবরের মতই মূল্যবান হল সবুজ সার,—অর্থাৎ লতাপাতা জ্বালপালা ইত্যাদি উদ্ভিদের আবর্জনা। ফসলের গাছ থেকে সার তৈরী হওয়ায় মত বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। এর জন্যে আলাদা করে সারের গাছ জন্মাতে হবে। যে সব গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন টেনে নিতে পারে সেগুলি সবুজ সারের পক্ষে প্রকৃষ্ট। প্রতি একর চাষের জমির জন্যে ৪টন করে সবুজ সার দরকার। এই সবুজ সারকে কম্পোষ্ট করে শুকনো জমি এবং শবজি ক্ষেতেও খাটানো যেতে পারে। মাদ্রাজে এর পরীক্ষা করে বেশ ভাল ফল পাওয়া গেছে। জমির সীমানা বরাবর এবং পতিত জায়গায় সবুজ সারের গাছ লাগিয়ে সেখানে সারের অভাব অনেক পরিমাণে পূর্ণ হতে পারে।

কৃষিশিক্ষা ও পতিত জমি উদ্ধার

কৃষিবিজ্ঞানের বহু তথ্য উদ্ভাবনের জন্যে আনা দরকার এবং প্রয়োগ করা দরকার। এগুলো কৃষি দপ্তরেই আবদ্ধ। বই ও পত্রিকা ছেপে এ তথ্য বিলি হয় বটে কিন্তু যাদের মধ্যে এর প্রচার হওয়া দরকার, হাতে হাতে পরীক্ষা হওয়া দরকার তাদের কাছে পৌঁছায় না। ফসলের রোগ দূর করবার উপায়, উন্নত বীজের ব্যবহার। জমিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করা যাতে জমি দীর্ঘ-প্রসবিনী হয়, দুই ফসলের অন্তবর্তী সময়ে জমির সদ্ব্যবহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে চাষীরা অজ্ঞ। পাতলুন ও বুশসার্ট পরা দপ্তরী শিক্ষক দিয়ে চাষীদের বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা হয় না। প্রতি বেলায় অন্তত দশটি করে অবৈতনিক কৃষি শিক্ষকের স্থাপন করা দরকার যেখানে প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে চাষীদের প্রতিনিধিরা এসে কাজ দেখবে এবং ফিরে গিয়ে নিজেদের সমবায় কৃষিবিভাগে তার প্রবর্তন করবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমির পরিমাণও বাড়াতে হবে। সরকারী মহলের ধারণা আমাদের আর অনাবাদী জমি নেই যা চাষের জন্যে উদ্ধার করা যেতে পারে। অথচ এর কোন সার্ভে বা হিসাব নিকাশ হয় নি। সম্প্রতি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের চাপে পড়ে আন্দামান ও উত্তরাঞ্চলে পতিত জমিতে আবাদের ব্যবস্থা হচ্ছে। আরো কত জায়গা এমন পড়ে আছে কে তার খবর রাখে? বাংলা

শতভাগার সুবরবন লোনা জলে ছারখার হয়ে গেল, মাছের কারবারিরা ধানক্ষেতকে মেছোভেড়িতে পরিণত করল, এর কোন প্রতিকার নেই। সরকার বাঁধের অভাবে বর্ষায় ভাগীরথির বন্যায় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী এবং চব্বিশ পরগণার শতকর অঞ্চল ডুবে যায় তার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য নেই। বাঁধ করতে হলে টাকা চাই,—সেচ, পতিত জমি উদ্ধার, সব কিছুর জন্যে টাকা চাই, সত্যি কথা। কিন্তু বিদেশ থেকে চাল আর গম আনতে যে তার চেয়ে বেশী টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে তা কি খেয়াল আছে?

ম্যালথাসের ভূত

আমাদের, বিশেষ করে সরকারী মহলের বিশেষজ্ঞরা খাদ্যসমস্যার জন্যে প্রধানত দায়ী করেন বর্ধমান জনসংখ্যাকে। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সনের মধ্যে জনসংখ্যা ৩১ কোটি ৬৮ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৬ কোটি ৪২ লক্ষ। অর্থাৎ দশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১৪। এর উত্তর প্রবন্ধের প্রথম দিকে উদ্ধৃত বিশ্বব্যাঙ্কের মন্তব্যে রয়েছে। দশ বছরে জনসংখ্যা বাড়ছে শতকরা ১৪। আর দশ বছরে কৃষির বিবর্তন করে ফলন বাড়া উচিত শতকরা ৫০। আমাদের অর্থশাস্ত্রীদের মাথা থেকে যে ম্যালথাসের ভূত এখনো নামে নি তা বেশ বোঝা যায়।

অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে জনবৃদ্ধি রোধ করতে পারলে তা করা দরকার। জনসংযম প্রয়োজন, কারণ দেশের বিত্ত অফুরন্ত নয়। মানুষের চেয়ে পশুর জননিয়ন্ত্রণ বেশী দরকার। মানুষের খাদ্যের ভাগীদার পশু, পশুর খাদ্যের জন্যে কৃষিযোগ্য জমি ছেড়ে দিতে হয়। অথচ আমাদের অধিকাংশে পশু অকেজো। আমাদের খাদ্যের অভাব পূরণ করার জন্য যথেষ্ট দুধ উৎপন্ন হয় না। স্বাস্থ্যহীন দুর্বল পশুর প্রজনন শক্তি নষ্ট করে উন্নত জাতের পশু প্রবর্তন করা দরকার।

অনেকে বলে থাকেন খাদ্যের অভ্যাস বদলাবার কথা। বাঙালী আটা আর ছাতু খাক, যাদের চাল আর গমের অভাব তারা আলু আর কলা খাক—এতে নাকি অনেক সমস্যা মিটে যাবে। তারা এই সাদা কথাটা ভুলে যান যে আমাদের ঘাটতি সব ফসলের, ধান ও গমের। ফসলের বদলে ফল ও শবজি জন্মাতে গেলে তাতেও জমি জল, সার সবই লাগে। অতএব খাদ্য-অভ্যাস পরিবর্তনের দ্বারা অভাব একটুও কমে না।

শস্যের বণ্টন ব্যবস্থা

আমাদের খাদ্যশস্যে যা ঘাটতি আছে তাতে অনটন এত নিদারুণ হোত না যদি তার বণ্টন সুশৃঙ্খল ভাবে করা হোত। চাল ও গমের দুষ্প্রাপ্যতা ও অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধির কারণ বিতরণের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি। ১৯৫৭ সালে ধান কাটার পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার চালের কলগুলির দায়রুৎ বাড়তি জেলাগুলি থেকে ধান সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করলেন। ঘোষণা করা হল শতকরা ২৫ ভাগ মিলওলারা রাখবে, ৭৫ ভাগ সরকার নেবেন। অকস্মাৎ হুকুম এল ধান সংগ্রহ বন্ধ রাখো। তিন সপ্তাহ পরে আবার ধান সংগ্রহের হুকুম এল। কিন্তু এবার সরকারের ভাগ ২৫, মিলওলার ভাগ ৭৫। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে ধান চলে গেল বাংলার বাইরে কিংবা কাল বাজারের গুদামে।

ন্যায্য মূল্যের দোকান কিংবা র‍্যাশানের দোকান দিয়ে সরকার বাজারের দাম কমিয়ে রাখতে পারেন যদি সরকারী গোলায় যথেষ্ট শস্য থাকে। যদি তার বেশীর ভাগ খোলা বাজারে কিংবা কালোবাজারে চলে যায় তা হলে সরকারী দোকানের মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায়

না।' আমাদের র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চাল ও গমের মূল্য-শাসনের দিক দিয়ে এজন্তে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে।

তাহলে বণ্টনের ব্যবস্থা কি রকম হবে? সম্পূর্ণ র‍্যাশনিং ও কন্ট্রোল ব্যবস্থা পরীক্ষিত হয়েছে। আবার তার অভাবহ পরীক্ষা করতে গেলে দেশে অরাজকতা দেখা দেবে, দুর্নীতির তারে সরকার ভেঙে পড়বে। দ্বিতীয় পন্থা খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা কারবারীদের হাত থেকে সরকারের হাতে নেওয়া এবং ছোট ছোট ব্যবসাদারদের মারফৎ বাজারে ছাড়া। বর্তমানে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এতেও যথেষ্ট দুর্নীতির অবসর রয়েছে। তার প্রতিকার হতে পারে যদি গ্রাম অঞ্চলে পঞ্চায়েত গুলি সক্রিয় ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে এবং শস্য সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে সরকার এদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

কি উৎপাদন, কি বিতরণ, যে কোন দিক দিয়ে দেখতে গেলে খাদ্যসমস্যার সমাধানের মূলে আছে গ্রামীণ যৌথজীবন পুনরুদ্ধারের কাজ। আর গ্রামীণ জীবন মানেই চাষীর জীবন। এদের অন্ন জোগাবার ব্যবস্থা না করলে এরা আমাদের অন্ন জোগাবে কোথা থেকে? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। যতদিন চাষীকে জমি দিয়ে তার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস আমরা না ফিরিয়ে আনবো ততদিন আমাদের এ অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ফ্রুস্‌কা পেয়ো

: গল্প

সন্তরেশ বসু

বর্ষায় সন্ত্রাসবাদীদের উৎপাত সম্বন্ধে বক্তিম যে খুব জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন যে—"

জি-ই-সি পুরনো রেডিওটা থেকে নাটকীয় গলায় ঘোষণা শোনা যাচ্ছে ঘোষকের।

কিন্তু এ চা-খানার আড্ডাবাজ, শিফটের বদলী দুটী পাওয়া মজুর ও তবঘুরে বেকারদের কানে সে কথা ঢুকছে কিনা সন্দেহ। যে যার নিজের কথাতেই ব্যস্ত। ঘোষকের ঘোষণার কোন গুরুত্ব যেন নেই এদের কাছে। নেহাৎ যারা সঙ্গীহীন বাঙালী তারাই একটু কান খাড়া করে আছে চা খানার হট্টগোলকে অস্বীকার করে।

এলাকাটার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে চটকল বিদ্যুতের কারখানা, নাটবল্টুর ফ্যাক্টরী, মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং এর সরকারী কারখানা। তাই এখানে ধাতু আর যন্ত্র গাড়ী আর মানুষের কথায় সর্বদা সর্বত্র এক বিচিত্র কোলাহলে মুখরিত।

সভয়ে যেতোয়ার মত আদবকায়দাওয়ালা চা-খানা নয়, সারি সারি বেঞ্চি পাতা। অজস্র চুনের দাগে ভরা। চা খানার গায়ে লাগা মিষ্টির দোকানের লাল পাতা এলোমেলো ছড়ানো চা' খানা। বেঞ্চিতে লোক ভরে গেলে কাঁচা মেঝেতে বসেও চা খায় কুলি কামিনের দল।

—তোর নাম ব্যাং আর আমার নাম সাপ।' চা-খানার এক কোণে ছোট পুরনো বেঞ্চিটায় দুজন খদ্দেরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটা বলল ঢ্যাঙা লোকটাকে। বলল ফিস্‌ফিসিয়ে, যেন অন্য কোন বেঞ্চির লোক শুনতে না পায়।

—কেন? ঢ্যাঙা লোকটা খিঁচিয়ে উঠল। তোর নামটা ব্যাং রেখে আমার নামটা সাপ রাখ্‌ না কেন?

—'ধ্যাঃ শালা!' বিরক্ত হয়ে বলল বেঁটে লোকটা। তা এতে তুই এত চটছিস্‌ কেন? নাঃ, তোর মধ্যে দেখছি প্রোলেটেট বলে কিছু নেই। চাকরী হলেও এটা দেশের কাজ, জানিস্‌?

—জানি। ওসব তোমার একলার মধ্যেই গজ্‌গজ্‌ করছে।

—আচ্ছা বাবা তোর নাম না হয় নেউল থাকল। এবার ঠিক আছে তো?

ঢ্যাঙা লোকটার পান খাওয়া ঠোঁটের কোনে একটু চাপা হাসি দেখা দিল। সম্মতি আর খুসী দুই-ই বোঝা গেল। চায়ের গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বেঞ্চিতে তাল ঠুকতে লাগল সে।

দেখলেই বোঝা যায়—লোক দুটো এ এলাকারই অধিবাসী, সোয়াদে কথাবার্তায় এরা খানিকটা চটকলের মিস্ত্রিদের মতন পুরোপুরি কলেরবাবু হয়ে উঠতে পারেনি, টানটা সেদিকেই। কথায় বার্তায় অল্পেতেই নাকের পাটাগুলো ফোলানো আর প্রচুর থিস্তি করা অভ্যাস।

হঠাৎ তাল ঠোকা বন্ধ করে, নেউল বলে উঠল, 'দরকার কি শালা ওসব নামের ঝামেলায়।'

—তুই শালা একটা পাকা উজবুক্। ও শালারা কি আর আমাদের আসল নামটা শোনেনি মনে করেছিস্?' বলে সাপ তাকাল তাদের পেছন নেওয়া শিকারের দিকে।

সরু লম্বা চা'-খানাটায় প্রায় ঘাকাঘাকি—দোকানের মালিকের গদীটার কাছাকাছি একটা বেঞ্চির উপর বসে বসে চা খাচ্ছে দোহারা, মাঝা মাঝা রং এর একটা লোক, সাপ নেউলের শিকার।

—অমন প্যাই প্যাই করে তাকাস্‌নি, শালাদের মজর বড় কড়া।' সতীর হয়ে সাবধান করে দিল নেউল সাপকে। দোকানে ভিড় অসম্ভব বেড়ে উঠেছে। কল কারখানা ছুটীর সময় এটা। সারা এলাকার কুলি কামিনদের ভিড়ে আবহাওয়া বন্ধ হয়ে উঠেছে।

নেউলের নজর পড়ল দুটো মাতালের দিকে। মাতাল দুটো গালাগালি দিচ্ছে তাদের কারখানার সর্দারদের। মাতালের মাতলামিতে সারা চা-খানাটাই প্রায় জমে গেল। এক একটা খিস্তির ঝড় ওঠে। আর অমনি বড় ওঠে হাসির।

একটা জোয়ান ওঁতী ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার সকলেই তাকাল তার দিকে। মাতাল দুটোও একবার তাকাবার চেষ্টা করল। তারপরেই ওরাও চড়া গলায় ধমকে উঠল; জাহান্নামে যাও শালা।'

সাপ হাসছিল। নেউল চেঁচিয়ে উঠল; জোর দুটোকে বাইরে বার করে যাও।'

সাপ কনুই দিয়ে একটা খোঁচা মারল নেউলকে।—'তুই চুপ করনা শালা।

নেউল চমকে চুপ করে গেল।

কয়েকজন মিলে মাতাল দুটোকে বের করে দিল।

শিকার তখন সিদাড়া খাচ্ছে। একটু একটু করে ভাঙছে, আর মুখে পুরছে।

—আচ্ছা, শালারা পয়সা কোত্থেকে পায়—এই খাওয়া পরার জন্য?' নেউল জিজ্ঞেস করল।

সাপ খানিকটা চালাক বটে, তবে সব কথার সঠিক ব্যাখা দেওয়া তার পক্ষে মুস্‌কিল। বলল, তোর আমার যেমন মনিব আছে, ওদেরও তেমনি মনিব আছে, বুঝিলি?'

বুঝল কিনা বোঝা গেল না। চুপ করে রইল নেউল।

—তা ছাড়া, নতুন একটা কিছু আবিষ্কারের মহিমায় সাপের চোখ চক্ চক্ করে উঠল। বর্ষায় ভাকাতরা তো এদেরই লোক্। সে লুঠের টাকাও পাচ্ছে যে।

নেউল এবার হেসে উঠল।—দূর শালা, ডাকাত কই রে, ওদের তো বিপ্লবী না কি বলে। তুই তো শালা আচ্ছা গুল্ মারতে শিখেছিস্?

—কেন?

—ওরা বুঝি লুট করে? ওরা তো গভর্নমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

সাপ তখনি জবাব দিতে পারল না। একটু পরে বলল, এই হল আর কি।

এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই তাদের। নিছক কথার কথা। দুনিয়া ডুবে যাক, আর যে কোন সরকারই থাকুক, নিজের পায়ের তলার জমিটুকু টিকে থাকলেই হল।

তবে হ্যাঁ, বউটা নেউলের বড় টেরিয়ান মেজাজের। নেউলকে বলে; মুরোদ বড় মান তার ছেঁড়া দুটো কান। পুলিশের চাকরীর মাথায় মারো ঝাড়ু। ছেলে বউ পারে না পুষতে, তেল কিনতে নুন জোটে না, নুন কিনতে তেল জোটে না, কুলি মজুর খরে খরে দিন গজ হচ্ছেন সব।

এ সম্বন্ধে নেউলের জোরালো জবাব কিছু না থাকলেও যুক্তিতর্কতঃ ধমকায়, তুই কি বুঝিস ওর?

বউ বলে, ও সব ঘাটায়ো বুঝে আমার দরকার নেই

যাইনে কাটলে, চাকরী গেলে, খেতে না পেলে বলবে না কেন? ঠিকই তো করে ফুলি মজুমদার। তোমরাও করনা কেন—

—চোপ! চো—প! খুব হয়েছে, বক্তিমে ছাড়তে হবে না। যারব মুখে—

মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। কোনকোনদিন মেয়ে বেড়ে দু'চার ঝাঁজর। দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

নিজের উপর ও তার বিচার আসে মাঝে মাঝে। ভগবানকে গালি দেয়। বলে, বলিহারি যাই শালা তোমার আক্কেল দেখে। আসলে জীবনটা তার বরবাদ হয়ে গেছে ঝুলে মনে হয়। তার মধ্যে জীবনের এই বিষাক্ত ক্ষতটার বুকে বউ আর ঐ ছেলেমেয়ের পাল কেন ছুঁচলো, শুড় বের করা পোকার মত কিলবিল করছে।

সাপের অবশ্য তা' নয়। সে খুব নির্ঝঞ্ঝাটের মানুষ। ঘর একটা তার আছে কোথাও, তবে খুব কমদিনই যায় যেঁষে তার। কেউ কোথাও নেই তার, কসড়া হলে বুক ঠুকে বলে; জন্মে আমি মা দেখিনি, আমার সঙ্গে পেরাজী করতে এসো না। জন্মের পর থেকে আজ অবধি বেঁচে থাকাটাই তার কাছে বিস্ময়ের, বাহাদুরীর তো বটেই।

আগে সে একটা চটকলের মিস্ত্রি ছিল। রোজগার করত, মদ খেত, রাত কাটাত লাইনের বেওয়ারিশ দুখা কামিনদের ঘরে। বাজারের ধারে খারাপ মেয়েমানুষের কাছে। মাঝে মাঝে গলা সেধিয়ে চন্দননগর থেকে প্রায় মাইল ক্রোশ ঘুরে একটা গাঁয়ে যেত, সেখানেই নাকি ওর জন্ম। তারপর লোহার মাল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে কারখানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর আপসারী দারোগা-বাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে অনেকগুলো কেস্ খরে দেয়। এখন তো সে থানার একজন। বড়বাবুর (O. C.) কাজ করে সে এখন। রাজনৈতিক আসামীদের সন্ধানে ঘোরে আজকাল সে বেশী। ফলে কারখানার বেয়াদপ কুলি কামিনদের ধর্মঘট ভাঙবার কনট্রাকটারদের মহা সহায় সে।

—এক আধটা সিঙ্গাড়া টিঙাড়া নে না।' নেউল বলল।

—হ্যাঁ, বাপের সম্পত্তি নিয়ে বেরিয়েছি। সিঙ্গাড়া খাবে। খিঁচিয়ে উঠল সাপ।

কিন্তু লজ্জা পায় না নেউল। বরং ঠোঁটটা একবার চেটে বলে, বড় খিদে লাগছে।

কটমট করে একবার তাকাল সাপ। পকেটের পয়সা গুণে হিসাব করে দোকানের ছোকরাটাকে দুটো সিঙ্গাড়া দিতে বলল।

—মরবে শালা! বিড় বিড় করতে করতে একটা বিড়ি ধরায় সে।

স্‌স্‌···! চোখ বড় হয়ে উঠল নেউলের। চোখের ইসারায় চা' খানার যাবতীয় তাদের শিকারকে দেখাল সে।

লোকটা ছোট একটা কাগজ পড়ছে, আর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছে।

—কিছু বুঝতে পারছিস? সাপ জিজ্ঞেস করল।

নেউল বলল, না, অনেকটা দূরে কি না! হবে শালাদের কোন গোপন ইস্তাহার টিস্তাহার। সিঙ্গাড়ায় একটা কামড় দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, মালকে আজ বাবার ভদ্র পাকড়াতে হবে।'

—ভাখ্ নেউল, এই হচ্ছে মরকা যদি প্রমোশন পেতে চাস্। লাইনে বস্তীতে কুলি কামিনগুলোকে ধরে কি হবে। লিডার টিডারগুলোকে ধরতে পারলে আখেরে একটা হিল্লে হবে।

—যা বলেছিস্। উৎসাহে গম্ভীর আর চিন্তাশীল হয়ে উঠল নেউল। সিঙ্গাড়াটা ফেলে ফেলে, চোখ ছুটে লোকটার দিকে রেখে বকের মত ঘাড় গুঁজে বেঞ্চিতে তাল ঠুকতে লাগল সে। প্রমোশন, টাকা, জীবন···এ সবই তো দুনিয়ার সব সেরা চীজ।

অনবরত লোক যাচ্ছে আসছে। দোকানের নেংটি পরা মীত্রাজি ছোক্‌রা বয়গুলো হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে। এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশী খাটুনি। বিরক্ত খদ্দেরদের খুশী করতে মাঝে মাঝে দোকানের মালিক খিঁচোচ্ছে ছোকরাগুলোকে।

—শালালোগ খালি গপ্ মারছে। ইধার দেখ, উধার বাবুলোক কি চাইছে সে না।'

সাপ আর নেউলের দিকে চেয়ে ঠোঁট বাঁকাল মালিক। দু' কাপ চা আর দুটো সিঙ্গাড়া নিয়ে যেন মাথায় তুলে দিয়েছে, আর ওঠ্‌বার নাম নেই।

রেডিওটার কড়কড় শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল নারী ঘোষকের মোলায়েম মিষ্টি গলা: 'এ গানটি গেয়ে শোনাবেন—

—তোমার ইয়ে—' একটা কটূক্তি করে উঠল সাপ।

—আর কি দেব বাবু। একটি ছোকরা এসে দাঁড়াল।

নেউল চমকে উঠল।—অ্যাঁ?

সাপ বলল, আর দু' গেলাস চা' দাও।

—শালা তো উঠবার নাম করে নারে।' বিরক্ত হয়ে উঠল নেউল।

—কি যেন গভীর রহস্যের জাল বুনে যাচ্ছে সাপের চোখে, এমনি গম্ভীর হয়ে বলল; উঠবে ঘোড়, সময় হলেই উঠবে। ব্যস্ত কেন হচ্ছিস্?

—এদিকে একবার বিষ্টু ওস্তাদের কাছে যেতে হবে ঘোড়ার বইটা নিয়ে। গেল হপ্তায় তো একেবারে গপ্পা গেছে।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সাপ।—উঃ, গেল হপ্তায় টাকা পিটল মাইরী বড়বাবু। ওর একবন্ধু আছে ভবানীপুরে। লোকটার শালা টিপ্ একেবারে অব্যর্থ।

তারা দুজনেই ভুলে গেল প্রমোশনের কথা। চিন্তার ছায়া যেন এক ফুঁয়ে উড়ে গেল নেউলের মুখ থেকে। শিকারের দিকে চোখ রাখতে পর্যন্ত গেল ভুলে।

নেউল বলল, সাক্ষাৎ দেবতাকে স্মরণ করবার মত দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে; যাঁ, শালাকে আমার হাজার পেন্নাম। লোকটা মানুষ নয়। দেবতা। উঃ, টিপ্ মারলে তো একেবারে মক্ষ হয়ে গেল। আমাকে তো একদিন কাঁদিয়েই ছাড়লে মাইরী।

কেন?

—ওই রসজ্ঞানি করে একদিন বড়মানুষি করতে ব্লাশ খেলতে বসেছিলুম। হকের ধন তো নয়। এক শালাকে পাগিয়ে পাগিয়ে পেয়েছিলুম কিছু। ইচ্ছে ছিল—তোর বউদিকে একটা শাড়ী কিনে দেব। তা' পাপের ধন পাপেই গেল।'

—আপদ গেছে।' বলে হাসতে গিয়ে সাপ থেমে গেল

তারা দুজনেই চোখা চোখে তাকাল শিকারের দিকে নেউলের একটা হাত এগিয়ে গেল সাপের হাতের দিকে হাতে হাত ঠেকিয়ে মনের কথা আদান প্রদান করল তারা অর্থাৎ সময় হয়েছে বন্ধু, তৈরী হও।

ঘরের মাঝের লোকটার চাঞ্চল্য খুবই স্পষ্ট। হাত ঘড়িটা বারকয়েক দেখল। কানের কাছে নিয়ে গেল কয়েকবার। ঝাঁকানি দিল হাতটা। বোধহয় সন্দেহ করেছে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। চা-খানার বড় দেয়াল ঘড়িটার দিকে ঘাড় ফেরাল কয়েকবার। আর মাঝে মাঝে উৎসুক ও বিরক্ত চোখে তাকাচ্ছে বাইরের দিকে।

নেউল আবার একটা ছোট টিপুনি দিল সাপের হাতে জবাবে সাপও দিল।

—অপেক্ষা করছে কারুর জন্য। ফিসফিসিয়ে বলল নেউল। মাল তা'হলে আরও আসবে?

সাপ বলল: তাই তো দেখছি।' ঠোঁট ওল্টিয়ে হাসল সাপ। জাল আজকে শালা ঠিক জায়গা মতই ফেলা হয়েছে দেখছি।—দেখিস্।' নেউল বলল; শালাকে চিনতে ভুলটুল হয়নি তো।

—পাগল হয়েছিস্? ঠিক জায়গা থেকে শালাকে কলো করেছি। আর চেহারা দেখছিস্ না মার্কা মারা চেহারা।' খুব চেপে হাসল নেউল, নিশ্চিন্ত শিকারীর হাসি।

—কিন্তু শালাদের বিশ্বাস নেই।' সাপ বলল; বর্ষা মালয়ে যখন ওদের লোক আছে, তখন বোমটোমা থাকতে পারে তো?

—তোর মাথা।' একটা কাঁচা খিস্তি করল নেউল। —তা হলে আর আমাদের এত বাহাদুরী ফলাতে হত না। মারই তো খাচ্ছে ওরা পড়ে পড়ে। বোমা বন্দুক থাকলে তো—

চোখ দুটো বড় বড় করে চুপ করে গেল নেউল।

—যা' বলেছিস্। সাপ বলল। দুনিয়াই উল্টে যেত। তবে হবে না কিছুই।

একথা বিশ্বাস করে না নেউল। বলে, পাপের ভরাডুবি হবেই। তালর মার নেই কক্খনো। বউ বলে—

—নে নে, থাম্। তাল আর মন্দ, আমাদের সব সমান।' সাপ বলে উঠল।

কিন্তু এখনকার ব্যবস্থাটাই চালু থাকবে, এটা তারা বিশ্বাস করে না। নিজেদের জীবন সম্বন্ধে ও তাদের এমনি একটা ধারণা। চিরকালই এমনি তাদের কাটবেনা। একদিন ঘুম থেকে উঠে হয়তো দেখবে, সবকিছু পাল্টে গেছে। সেইজন্য প্রায় কোন কিছুতেই তাদের বিশ্বাস নেই। তাই কোনরকমে পায়ের তলার মাটীটুকুকে ধরে রাখার জন্য তারা সবই করে। বাটপাড়ি, মিথ্যে কথা। এমন কি হাত সাফাই, কোন কিছুই বাদ যায় না।

তাদের পাশ থেকে একটা ভেলকালি মাখা ছোকরা চেঁচিয়ে গানজুড়ে উঠল। অব্ কাহেকা অবানা হায়!..... ভিড় বাড়ছে। লোক যত যাচ্ছে, আসছে তার বেশী। নেউল দোকানের মালিকের কপালের তারিফ করতে লাগল মনে মনে। হাঁ, একে বলে চালু দোকান। দু'দশটা গরুর পয়সা না দিলেও লোকসান হবে না।

গায়ক ছোকরা আবার একবার আঙুল মুখে চেঁচিয়ে উঠল; ইয়ে বাওা তুম্সে কহতা হায়, দিনরাত দুলুম খাও সহতা হায়?.....

বাহা বাহা বাহা!' চা-খানার ভিড় জমানো কুলি কামিনরা তারিফ করল। গাও, গাও, আরো গাও।

ছোকরাকে ঘিরে ধরল কয়েকজন।

—বেশ গাইছে তো শালা। নেউল বলল। বলে সে গানের সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে তাল ঠুকতে লাগল।

—অব্ হোম্ মে আবেদার হো বা!'...ছোকরা গাইছে, কিন্তু গানের সুরটা ধরতে না পেরে সোজাসুজি নিজের মেহাতি সুর চালিয়েছে।

এবার চা-খানার মালিক হেঁকে উঠল। বাস্ বাস্, বন্ধ করো গান!...

ইতিমধ্যে ওদের শিকার পয়সা মিটিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

সাপ লাফ দিয়ে উঠে পেছন ধরল তার।

কিন্তু বিপদে পড়েছে নেউল। সে হাঁক দিল: এই... এই...সাপ, সাপ?

সাপ? গানের আসর ছিরে ধাঁড়াল তার দিকে। সাপ কোথায়?

সাপ জলন্ত চোখে ফিরে এল। শালা উল্লুক!

—আমার ট্যাক মাইরী গড়ের মাঠ। পয়সাটা দিয়ে দে।' নেউল একটু কাচুমাচু করল মুখটা।

পয়সা মিটিয়ে বাইরে চলে এল তারা। ভেতর থেকে শোনা গেল সমবেত গলার গালাগাল আর হাসি।

বাইরে এসে সাপ নেউলকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে লাগল। যারে আর কি করে। শিকারের আর পাত্তা নেই। সন্ধ্যাকালীন ছুটির ভিড়ে হারিয়ে গেছে সে।

'শেষটায় নেউলও খেঁকিয়ে উঠল; সে সে, ওরকম ফস্‌কেই থাকে। ছোট বাচ্চাটার আবার হাম হয়েছে, বাড়ী চলে যাই।

তারপরে একটু থেমে বলল। ও শালা ধরাও যা না ধরাও তা।

—আরে মাল খাবার টাকা তো দুটো পাওয়া যেত বড়বাবুর কাছ থেকে!' রাগের চেয়ে আফসোস্ বেশী ফুটল সাপের গলায়।

—দেখা আছে শালা বড়বাবুকে।' নেউল বলল খিঁচিয়ে মিচি মিছি ক'যার ক'টাকে ধরলাম, তোর বড়বাবু তো কলা দেখিয়ে দিলে।

সাপ দমে গেল এবার।

ফুলি মহুয়া, ডিঙুক, রিকুলা, লরী, সমস্ত কিছুতে ভরে গেছে সহরতলীর সরু রাজপথ। রাস্তায় আলো জ্বলেছে—ডিমিত আলো।

কারখানায় আলোচনা, সাহেবকে সর্দারকে গালাগাল করি কটির আলোচনা, রিকুসাওয়ালার খবরদারী, ডিঙুকের হাহাকারে মুখরিত রাস্তার প্রথম রাত। হাসি ওঠে, গান ওঠে, ওঠে সোহাগি নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ ডিঙুকের নিষ্ঠের গলায়।

হঠাৎ সাপ চাপা গলায় বলে উঠল; ওই, ওই যে শালা, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে চলেছে।'

নেউল দেখল, সত্যি তাদের শিকার লোকটা একটা সিগারেট টানতে টানতে পূর্বদিকে চলেছে। সে বলল; একবার হাতিয়ে গিয়েও যখন চোখে পড়েছে, তখন শালার কপাল খারাপ।

পেছন পেছন চলল তারা লোকটার।

—একটা পয়সা, বাবু।—কয় শিশু বুকে যুবতী ডিঙুক মেয়ে।

—ভাগ্ ভাগ্! নেউল খেঁচিয়ে উঠল, যেমন করে খিঁচিয়ে ওঠে সে তার নিজের বউকে—পয়সা যা অন্য কিছুর আবদার করলে।

ছুঁ এঁটে গেল সাপের গায়ে।—ভিক্ষে?...অদ্ভুত উগ্র কামনায় জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল তার চোখ।

—তুমি যদি ভিক্ষে করবে, আমরা তো গলায় দড়ি দেব মাইরী।

তার ক্ষুধার্ত চোখে লেহন করতে লাগল সে মেয়েটাকে।

—ভাগ্ ভাগ্, বড়তে লাইনে যেতে পার না?' সাপকে টানল নেউল।

একটু কুঁচকে দ্রুত সরে গেল মেয়েটা।

হঠাৎ পেছনে মোটরের তীব্র হর্ণ শুনে লাফিয়ে পাশে সরে গেল তারা।

হাসি ছিটকে এল একটা মিহি নারীগলায়—পাশ দিয়ে পিছলে যাওয়া নীল গাড়ীটার অন্ধকার অভ্যন্তর থেকে, আর একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ।...

শা—লা! গাড়ীটার দিকে চেয়ে গালাগাল দিল নেউল।—ফুর্তি করতে চলেছে সব।

সাপ অবশ্য চেঁচিয়ে উঠল; নবাবজাদা, আস্তে থেকে হর্ণ মারতে পার না?'

ছুপোয় আছন্ন রাস্তা। কোন কোন দোকানে রেডিওতে গান শোনানো হচ্ছে। রাস্তার কোলাহলকে যেন আরও তীব্র করে তুলেছে রেডিওর গান। অতি একঘেয়ে দৃশ্য, প্রথম রাত্রির রোমঞ্চকর জল। বিচিত্র শুধু তার মানুষ। বিচিত্র তার দৈনন্দিন পরিবর্তন। বৈচিত্র্য শুধু জনতার ভিড়ে।

রাস্তার এলাকা ছাড়িয়ে শিকার ক্রমাগত টেলনের দিকে এগিয়ে চলল।

—এরা মাইরী খুব মেয়েমানুষের সঙ্গে দিনতে পায়।' শিকারকে দেখিয়ে বলল সাপ।

নেউল বলল; তা' শত হলেও লোক তো শালারা ভাল।

বেজেছেখানাও কম কি? সারা দুনিয়ার ভো ওরাই ভোল-ঘোল পাকিয়ে তুলেছে।

—হাঁ, হিম্মত আছে। ওরা যদি বেল্ বেল্ড ভো তোমার আর ঘোড়ার বই দেখতে হত না।

—যা বলেছিস্।

একটু চুপ করে আবার বলল: আচ্ছা, ওরা যা বলে, তা কি কখনও হবে?

সাপ বলল। চীনে ভো হচ্ছে।

পরমুহূর্তেই মুখটা বিকৃত করে বলল; ওতে আর আমাদের কি হবে? আমাদের ভো পালারা ঘেরে ফেলবে।

—কেন, আমরাও তখন ওদের সঙ্গে মিশে যাব।' যেন সহজভাবেই কথাটা বলল নেউল।

—থান ভানতে শিবের গীত। ওসব রাখ, দেখি। বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিল সাপ। জীবন, আর জীবনের ভবিষ্যৎ—সমস্ত কিছুই তার কাছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা। কি হচ্ছে আর কি হবে, এসব আলোচনা তার কাছে একটা মস্তবড় ধাপ্পাবাজী। ওদের চারিত্রিক নীতি হল-আপনি বাঁচলে বাপের নাম। যা হচ্ছে তা দেখে যাও। কোন রকমে একবার ওদের হাতিয়ে রোজগার কর চারটে পয়সা, গুছিয়ে নাও নিজেকে।

হ্যাঁ, ওদের নাকি একটা অতীত ঐতিহ্য আছে, ভাল মন্দ আর বড় ঘরের ছেলে বলে। ওদের এ অসাধারণত্বটুকু মুছে ঠুকে বাহির করতে হবে।

বাজার এলাকা ছাড়াবার পর রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন দেখাচ্ছে। এদিকটায় বাঙ্গালী অধিবাসীই বেশী। রাস্তার চেয়ে দোকানগুলোতেই ভিড় বেশী।

শিকার একটা গলিতে ঢুকল।

আচমকা চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সাপ তীর বেগে ছুটে গলির মোড়ে এল।

না ওর নেই। শিকারের গতি তেমনি মন্থর। কিন্তু গলিটা ভাল নয়। ও পাড়াটাকে তারা বিলক্ষণ চেনে। এখানে যেসাই রোখা ছেলেদের বাস। আক্রান্ত হওয়ার ভয় প্রচুর।

পাড়ার ডাক্তারখানাটা পেরিয়ে শিকার আবার পূব-দিকেই মোড় নিল।

—খুব সাবধান, সোজা পেরিয়ে চলবি, দাঁড়াস্‌নি যেন।' ফিস্ ফিস্ করে সাপ বলল।

গলিটার মধ্যে ঢুকে উত্তেজনা বোধ করছে তারা। গোপন কিছু জানবার আশায়, আর বিপদের আশঙ্কায় এ উত্তেজনা।

শিকার দাঁড়াল একটা আমগাছওয়ালা বাড়ীর সামনে। সামনের জমিটুকুকে রাস্তার আলো থেকে অন্ধকার করে রেখেছে সামনের ভাঙ্গা পাঁচিল আর দেয়ালে ঘাস গজানো একটা পাইখানা। অদূরেই জলকল আর লাইটপোষ্টটা কাছাকাছি রয়েছে।

পাড়াটায় চটকলের মিস্ত্রি আর কেরাণীদের বাস বেশী। কিন্তু পাড়াটা এর মধ্যেই অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

সাপ আর নেউল বাড়ীটা পেরিয়ে পাঁচিলের পাশে ঘেঁষে দাঁড়াল। কিন্তু এখানে দাঁড়ানো মুস্কিল। পাড়ার ভেতর রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে হয়তো সন্দেহ করবে। সাপ তাড়াতাড়ি নেউলের কামিজটা চেপে ধরে পাইখানার ঘরলা পাচার করার দরজাটার আড়ালে কতকগুলো কচুগাছের আড়ালে অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেল।

উঁ! নাকে কাপড় চাপা দিল নেউল।

চুপ! তার মাথার আলুগোছে একটা গাঁট্টা মারল সাপ।

—লখ করিস্‌নে।

কিন্তু জায়গাটা ভাল। রাস্তার লোক আর শিকার কেউই তাদের দেখতে পাবে না, অথবা তারা সবই দেখতে পাবে।

শিকার বাড়ীটার দরজায় কড়া নেড়ে নাড়া দিল।

দরজা খুলে গেল। একটা লোক বেরিয়ে এল। বেঁটে কর্সা, একটা মুদি পরা। দু'জনেই তারা হাসি বিনিময় করে আমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

অধীর উত্তেজনায় সাপ নেউলের বুকের মধ্যে চিপ্‌ চিপ্‌ করতে লাগল। ওরে নয়, কি তারা শুনবে—সেই আশায়!

কম্বতলাটায় দুটি বউ এল রাতের নির্জনতায় বাসন মাজতে। সবে বছর চারেকের একটি ন্যাংটো ছেলে, হাতে তার রুটি বেলবার বেলুন।

তুই কি আমাদের পাহারা দিতে এসি নাকি? একটি বউ জিজ্ঞেস করল ছেলেটিকে।

হ্যাগো! বলে সে লাইট পোষ্টটাতে বেলুন ঠুকতে লাগল—আর বক বক করতে লাগল নানান কথা।

সাপ নেউল কান খাড়া করে রয়েছে।

—দু'শো বস্তা সিমেন্ট পাওয়া গেছে বুঝলেন? শিকার বলল ফিস্‌ফিসিয়ে।

—Is it? মুদি পরা লোকটার সাদা দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল।

সাপ আর নেউল উলমুকের মত মুখ চাওয়াচায়ি করল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল সাপ;—শালাকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। এতো বড় বাবুর মোস্ত রে?

মুদিপড়া লোকটা এবার বলল; আমি চার গাড়ী করলার পারমিট যোগাড় করেছি। তবে খুব কষ্ট হয়েছে। যা হোক্‌ মোটামুটি লাভ হবে। প্রেসিডেন্ট নিজে পেয়েছে দশ গাড়ী।

—ওরা তো পাবেই। শিকার বলল; ওরাই তো এখন কর্তা…

ফুইনিন্‌ খাওয়ার মত বিকৃত হয়ে উঠল সাপ নেউলের মুখ। সাপকে চিমটি কেটে বলল; এর নাম শালা তোমার—ঠিক জায়গা থেকে কলো করা?'

একটা চোক গিলে বলল সাপ; এঃ, তাইতো দেখছি। শালা চোরাকারবারী?' চুপ্‌সে গেছে তার মুখটা।

নেউল প্রায় ক্ষেপে উঠল; শালা কানা কোথাকার। কোথায় বিপ্লবী, কোথায় চোরাকারবারী??'

দুজনেই তারা খিস্তি করতে লাগল, আর দোষারোপ করতে লাগল পরস্পরকে।

তাদের চোখ পড়ল কলতলায়।

একটি বউ উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কি যেন একটা বের করল আঁচল থেকে তারপর কি একটা করল নীচু হ'য়ে।

একটি বউ বলল, তুই রাত করেই নিয়ে বেরিয়েছিস্‌?

—তা কি করব? কর্তাতো পুলিশের হেফাজতে, আমার কাজ আমি করি। ব'লে সে, কলের সামনে, দেয়ালে একটি পোষ্টার সেঁটে দিল। রাস্তার সামান্য আলোতেও লাল লাল বড় বড়, আঁকাবাঁকা মেয়েলী অক্ষরের কথাগুলি জলজল ক'রে উঠল,

'কারখানা শ্রমিকের সম্পত্তি হোক।'

সাপ আর নেউল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হ'য়ে। কিযে করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

শুধু নেউল বলল, এ কিরে বাবা!

সাপ বলল ফাঁদ দেখালে মাইরি।

তখন বউ দুটি চলে গেছে। আর ওদের শিকার নয়, বোধহয় শিকারীই হবে, সেও কর্সা।

কবিতা

পৃথিবীকে

অমিরকৃষ্ণ রায়চৌধুরী

হে পৃথিবী, আজিকার এই মধু-বাসন্তী-বাসর,
তোমার এ-সুপ্রসন্ন অভ্যর্থনা, হাসি-গান যত
শেষ ক'রে দেবে জানি ; আবার বুকের 'পরে কত
নতুন অতিথি টেনে রাঙাবে তো প্রমোদ-প্রহর !
তোমার দ্বারের প্রান্তে প'ড়ে রবো বিরস, ধূসর,—
নিশান্তের গন্ধহারা, ছিন্ন, শুষ্ক মালিকার মত
অবজ্ঞাত, লয়হারা ; লীলাভঙ্গে তুমি তো নিরত
ভোলাবে নতুন মন গান গেয়ে কত মনোহর !

যদি উৎসর্জন করো, তবে কেন স্বপ্নের অঞ্জন
দিলে মুগ্ধ দুটি চোখে—আর ভালোবাসার প্রশ্রয় ?
রূপে-রসে কেন তবে প্রেমের বিহ্বল স্পর্শ আনো—
এ যদি বা ছলনার মিথ্যা খেলা ? যদিও হৃদয়
স্মৃতির উত্তাপ ভোলে,—বিরহিনী প্রিয়ার মতন
নিবিড় আশ্লেষে তবে কেন টানো, কেন বুকে টানো ?

মনোমত
সুন্দর, সস্তা, আর মজবুত জিনিষ যদি চান তা হ'লে
আরতির
"ম্লানী ম্লাসমণি"
শাড়ী ও ধুতি কিনুন।
কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটী থাকে
তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটী সংশোধন করবো।
আরতি কটন্ মিলস্ লিমিটেড
দাসনগর, হাওড়া।

কোন এক মৃত্যুর পঞ্চমমুহূর্তে

মদনশংকর দাশগুপ্ত

অবধা ভিড় বাইরে কোর না।
অবধা চোখের জলে
ভিজারো না ঘর, ওরা কান্নারা ভীতু ;
বরফে পাথর জল জমে জমে—
কান্না থামাও।

কুয়াশার ভিড় জানালার কাঁচে
অবধা মুছো না, মুছো না—
একটু শান্ত শান্তিরা ভালো
সূর্য অবধা ধারালো ;

ও-ঘরে প্রদীপ
অবধা ঢেকো না হাতে,
নীল দিগন্তে ছুরন্ত হাওয়া ভালো,
যদি সে আনেই আসুক উড়িয়ে সাথে
দু' একটি সাদা যুঁই ;

সেই ঢের ভালো, দু' চোখের হাত নামাও
কেন না মৃত্যু, মৃত্যু সে মৃত্যুই।

কর্ণাটক দাসকূট কবি পুরন্দরের উপদেশামৃত

অধ্যাপক
ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ভক্ত কবি-দার্শনিকগণের মধ্যে ব্যাসতীর্থ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-দার্শনিক। কিন্তু তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য তাঁর অপূর্ব শিষ্য-সৌভাগ্য। পুরন্দর দাস, কনক দাস প্রভৃতি তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিনিই মাধ্ব ধর্ম ও দর্শন কর্ণাটের ঘরে ঘরে সঙ্গীতের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য দাসকূট-সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। দাসকূট-সম্প্রদায়ের ভক্তগণের কন্নড়-ভাষায় প্রচারণার ফলে কন্নড় ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। কন্নড়-ভাষা নব তারুণ্য লাভ করে; এবং কন্নড় ভাষা মধ্যাবস্থা ত্যাগপূর্বক বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করে।

কন্নড়-ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে পুরন্দর দাস অন্যতম এবং দাসকূট ভক্ত কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দাসকূট ভক্তকবিরা মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মাধ্বর ভাবধারাকে যুগোপযোগী করে দাসকূট ভক্তগণ দীক্ষা-গ্রহণপূর্বক প্রকৃষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচার করতেন—তবে তাঁরা বাহ্যিক আড়ম্বর এবং অগণিত দেব-দেবীর পূজায় বিশ্বাস করতেন না। জ্যোতিষ-গণনার তীব্র সমালোচনা করতেন এবং বর্ণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বলতেন—জাতিভেদ দু'প্রকারের, মুক্তিরা এবং কুক্তিরা, এ দিয়ে জাতি-ভেদ করতে পারা যায়। তবে এই সব ধর্ম-প্রচারের জন্য তারা বীরশিবদের মত স্বকীয় ধর্ম-গণ্ডীর বাইরে যাওয়ার কোনও প্রচেষ্টা করেন নি। যাঁরা সনাতনপন্থী, তাঁরা "ব্যাসকূট" নামে পরিচিত হলেন, তাঁরা বর্ণপ্রথা মানতেন, সংস্কৃত-গ্রন্থের শিক্ষা এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তা হলেও "দাসকূট" ও "ব্যাসকূট" সম্প্রদায়ের সকলেই মধ্বপন্থানুসরণ—প্রচণ্ড পর্বতপ্রমাণ বাধা এদের মধ্যে কোনও দিন দণ্ডায়মান হয়নি।

পুরন্দরের উপদেশ

এই পুরন্দর ৪,৭৫০০০ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি ৮০ বৎসর কাল (১৪৮৪—১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) জীবিত ছিলেন। প্রথম জীবনে প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীরূপে তিনি প্রভূত বিত্ত অর্জন করেন। কিন্তু পত্নীর পুণ্যফলে তিনি ভগবানের অশেষ কৃপাপাত্র হন। সর্বস্বত্যাগ করে পত্নীসহ তিনি ব্যাসতীর্থের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম সঙ্গীতে তিনি স্নেহময়ী পত্নীর প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন।

ভগবান্ কিরূপ?

ভগবানের পা নেই, কিন্তু সকলকে তিনি চালান; তাঁর হাত নেই, সকলকে দিয়ে কিন্তু তিনি ধরান; দাঁত তাঁর নেই; কিন্তু সকলকে তিনি চর্বণ করান; নিজের উদর নেই—কিন্তু সকলকে তিনি খাওয়ান, বর্ণ তাঁর নেই,

কিন্তু সকলকে তিনি শোনান; তাঁকে কেও দেখতে পায় না অথচ তিনি আছেন ভিতরে বাইরে সর্বত্র। তাঁর থেকে সকলের উৎপত্তি। তিনি যেরূপ যেরূপ বলে মানুষ ভাবে, তিনি সেই সব কিছুই।

পুরন্দর দাস দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছেন—অদ্বৈত মতের তিনি একান্ত বিরোধী। ভগবান্ চিরকাল এবং মানব তাঁর দাস। "আমিই তিনি"—এই মতবাদ যাঁরা প্রচার করেছেন, তাঁরা জগৎকে ভুল শিক্ষা দিয়েছেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক

জীবাত্মা ও পরমাত্মা কখনও এক হতে পারে না। উপনিষদের সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক অবলম্বন করেই তিনি বলেছেন—একই নীড়ে দুটী পাখী—একই বৃক্ষে—রয়েছে। একটী ফল খায়, অন্যটী তা' করে না। একটী শাখা থেকে শাখান্তরে উড়ে বেড়ায়; অন্যটী তা' করে না। একটী অনেক কিছুই জানে; অন্যটী সে সব বিষয়ে অজ্ঞ। শাখা থেকে শাখান্তরে উড্ডয়নশীল পাখীটী অনেক উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পুরন্দর বিট্‌ঠলের সঙ্গে মিলে সেখানে আনন্দে বসতি করে।

সর্বনিয়ন্তা ভগবান্

তিনি পুনরায় উপনিষদের ভাব প্রকাশ করেছেন আর একটী সঙ্গীতে;

"পৃথিবী, পাহাড়, নদী সমুদ্র—সকলে তোমাকে ভয় করে। ভয় করে বলেই স্ব স্ব স্থানে থাকে তারা সকলে। মরুৎ তোমার ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করে; অগ্নি তোমার ভয়ে জ্বলে, বৃক্ষ ও লতাসমূহ ফল দান করে (তোমার ভয়ে)। হে পুরন্দর বিট্‌ঠল! তুমি কি আশ্চর্য নৃপতি।"

মানুষের কর্তব্য

কর্ম ব্যতীত মানুষের থাকা উচিত নয়। তবে সব কাজ ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্বক করা চাই। মানুষের প্রার্থনা হবে—"সর্বমঙ্গলময় প্রভো! আমাকে এই বর দাও—যেন আমি তোমার মধ্যেই থেকে জীবন-যাপন করতে পারি।" ভগবান্‌কে সেবা করতে পারার সৌভাগ্য মানুষেরই কেবল; এবং সেজন্যই মানবজীবন ধন্য। "এই কয়েক দিনের জীবন—এর মূল্য কি? এখানেই দানধর্মাদি সৎক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাক।"

"মানুষ রূপে জন্ম পরিগ্রহ করা একটা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। হে মূর্খ মানব!—এই সুযোগ নষ্ট করোনা। মিথ্যা জীবনযাপনের আবর্তে ধরা পড়োনা।" পুষ্করিণীখননাদি পূর্বক মানুষের কষ্টের লাঘব করাই ধর্ম। দান সর্বথা করণীয়।

কোনও প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন না করে ভিতিক্ষা সহকারে জগতের সব কিছুর মধ্যদিয়ে প্রশান্ত চিত্তে অতিক্রম করে যাওয়াই মানবের প্রকৃষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভবসমুদ্র মানুষকে পার হতেই হবে। সব বাসনা কামনা পরিত্যাগপূর্বক—পদ্মপত্রের জলবিন্দু যেমন পদ্মপত্রকে ভালবাসে, সেভাবে জীবনকে ভালবেসে শ্রীরামচন্দ্রের প্রণতি নেয়ে নেয়ে ভবসমুদ্র পার হয়ে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছা উচিত। তা'তেই হবে আত্মার সমস্ত কামনা তৃপ্ত।

অতঃপর পুরন্দরদাস ঘৃণার বিনিময়ে পরিচর্যাদানের, বিদ্বেষ বিনিময়ে সুখান্ত দানের, মিথ্যাপবাদপ্রদানকারীকে প্রশংসনের উপদেশ দিচ্ছেন।

জ্যোতিষ-বিচার

জ্যোতিষের প্রতি সমাসক্ত লোকের প্রতি তাঁর উপদেশ যেন একমাত্র ভগবানকেই সেই জ্যোতিষ বলে তারা বিশ্বাস করে। সব থেকে শুধ

অধিকারী বলা চলবে। অবশ্য একথা বলা যায় যে কারুর পক্ষেই সর্বদেশের, সর্বকালের বা সর্বশ্রেণীর শিল্পীর অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব হবেনা—কিছু শিল্পী বাদ পড়বেনই। কিন্তু যে যতো বেশী সংখ্যক শিল্পীর অনুভূতিকে অনুভব করতে পারবেন তাঁর রুচি ততোখানি উন্নত বলে স্বীকার করতে বাধা নেই।

একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন আমাদের পিতামহের আমলের কথা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই চিত্রকলার ক্ষেত্রে রবিবর্মাকেই আদর্শ বলে স্বীকার করতেন—অর্থাৎ রবিবর্মার চিত্রের বহিরঙ্গ ও অন্তর্নিহিত ভাব সব কিছুর সঙ্গেই ওঁরা একাত্ম হতে পারতেন। বর্তমান শতকেও এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যাবে যাঁদের পক্ষে রবিবর্মা শ্রেণীর শিল্পী ছাড়া অন্য কোন শিল্পীর অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ ওঁদের অনুভূতি একান্তই সীমিত এবং সেকারণেই মৃত। জীবনের প্রধান লক্ষণ বিকাশ—তা তাঁদের ক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। এর সঙ্গে তুলনা করুন আর একটি লোকের—যিনি রবিবর্মা ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের অনুভূতির সঙ্গেও নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছেন। অর্থাৎ দৃশ্যমান জগত ও জীবনের আরো একটি রূপ উন্মোচিত হয়েছে তাঁর কাছে। যদি এখন বলা যায় যে প্রথম জনের তুলনায় দ্বিতীয় জনের রুচি উন্নততর—বা দ্বিতীয়জন প্রথমজনের তুলনায় উন্নততর সুরুচির অধিকারী তাহলে কী খুব ভুল বলা হবে? আবার যিনি রবিবর্মা অবনীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে পিকাসো পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পীর অনুভূতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছেন তাঁকে যদি উপরোক্ত দুজনেরই তুলনায় উন্নততর রুচির অধিকারী বলা যায় তাহলেও কী খুব অন্যায় হবে?

বস্তুতঃ এই জগতের ও জীবনের যতো বিভিন্নদিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে ততোই আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে—এবং ততোই আমরা বিভিন্ন হতে বিভিন্নতর শিল্পীর অনুভূতির সঙ্গে সাযুজ্য বোধ করতে পারবো।

"Meaning of Beauty" গ্রন্থে এড্রিক নিউটনও মোটামুটি ভাবে একথা স্বীকার করেছেন। বইটির শেষে সংজ্ঞা (Definitions) নামক পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন:

"Beauty is that aspect of phenomena which, when perceived by the senses and thence referred to the contemplative faculties of the perceiver, has the power to evoke responses drawn from his actual experience.

The test, in any given case, of its presence and intensity is a sensation of pleasure in the perceiver caused by the gratification of his desire to repeat his experience on a contemplative level. Such desire is itself generated by our experience on any level.

Therefore the richer the experience of the beholder and the greater his capacity for contemplation, the more complete his equipment for perceiving beauty—the better, as the phrase goes, his 'taste'.

এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীবনের বিভিন্ন দিকের সংগে পরিচয় হলেই আমরা বুঝতে পারি যে জীবন অন্তহীন। আর তা যদি বুঝতে পারি তাহলে বিকাশকেই জীবনের লক্ষণ বলে ধরা যায়। আর বিকাশের অন্তর্নিহিত ভাবটি হচ্ছে নূতনকে গ্রহণ করা—অন্ততঃ তাকে যথাসাধ্য ভাবে যাচাই করে দেখা। যিনি শিল্পকলার ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভংগী বা অভিজ্ঞতাকে সহজভাবে সংগে বুঝতে ও যাচাই

করে দেখতে প্রস্তুত নন। তাঁকে সুরুচির অধিকারী বলা যায় না। ওপরে সুরুচির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হবে।

বস্তুতঃ নূতনের মূল্যায়নেই সুরুচির অস্তিত্বের প্রধান পরীক্ষা। কারণ অতীতের শিল্পকলার একটা নির্দিষ্ট মূল্যায়ন হয়ে গিয়েছে। সেই অনুযায়ী পছন্দ বা অপছন্দের মধ্যে দর্শকের সুরুচির চেয়ে Conformist ভাবটাই প্রকাশ পায় বেশী। তদুপরি পরিচিতির ফলে অতীতের শিল্পীদের অনুভূতি ও Visionএর সঙ্গে আমাদের একাত্ম হওয়া সহজ হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে একাত্ম হওয়ার পেছনে সুরুচি অপেক্ষা পূর্বপরিচিতিই কাজ করে বেশী। এজন্যই নূতনের মূল্যায়নকেই সুরুচির কষ্টিপাথর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এছাড়া আরো একটি কথা আছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সুরুচি বলতে আমরা এমন একটি রুচির কথা বুঝি যা একটি golden mean-কে আশ্রয় করে থাকে। অর্থাৎ নূতন, পুরাতন বিভিন্ন দলের মাঝখানে একটা মাঝামাঝি আপোষ করে চলা। কিন্তু শিল্পকলার সুরুচির ক্ষেত্রে এমন আপোষ করে চলা যায় না। অন্ততঃ এধরণের 'নিরপেক্ষ' নীতি শিল্পকলার ক্ষেত্রে অচল। সেক্ষেত্রে আমাদের Positive হতেই হবে। নিত্য নূতন সৃষ্টিকে যদি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখতে হয় তবে আমাদের আপোষপন্থী নীতিতে বিশ্বাস করলে চলবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে সুরুচির প্রসারে কলাসমালোচকের কী কিছু করণীয় আছে? এর উত্তরে বলতে হয় নিশ্চয়ই আছে। বিশেষ করে আজকের দিনে। আজও জন-সাধারণের অধিকাংশই চিত্রকলা ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে "আধুনিক" ধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে আধুনিক শিল্পীর অনুভূতি, চিত্রকল্প (Image) ও প্রকাশ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের অভাবেই এই বিরোধীতার মূল কারণ। পরিচয়ের অভাব আমরা আধুনিক শিল্পকলাকে সহজে বুঝতে অক্ষম এবং সেজন্য সহানুভূতির সঙ্গে তার বিচার-করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়না। কিন্তু যদি কলাসমালোচকেরা 'আধুনিক' শিল্পকলার মেজাজ, তার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সাধারণের নিকট বিশ্লেষণ করেন তবে এই অপরিচয়ের বাধাটা ক্রমশঃ দূর হয়ে যায়। পশ্চিমে অনুরূপ 'আধুনিক' শিল্পকলা নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। হার্বার্ট রীড, এরিক নিউটন প্রভৃতি বিদগ্ধ কলাসমালোচকের আধুনিক শিল্পকলার সমালোচন অপূর্ব। তাছাড়া পশ্চিমে শিল্পীরাও একেবারে নীরব বসে নেই—বিভিন্ন গোষ্ঠির শিল্পীরা নিজেদের শিল্পকলার আদর্শকে প্রায়শঃই সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। সে তুলনায় এদেশের 'আধুনিক' শিল্পীরা একেবারে নীরব। অবশ্য শিল্পীরা যদি বলেন যে সৃষ্টির পর তার বিশ্লেষণ করার অর্থ হবে শিল্পীর নিজের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করা—তাহলে অভিযোগ করার কিছু নেই। কাজেই কলা সমালোচককেই এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। আধুনিক শিল্পকলার মেজাজটি সর্বসাধারণের বোধগম্য করতে হবে—বুঝিয়ে দিতে হবে যে গত যুগের শিল্পাদর্শ দিয়ে এযুগের শিল্পকলাকে বিচার করা যাবে না। বুঝিয়ে দিতে হবে যে শিল্পকলার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের যুগের সৃষ্টিকে স্থিতিশীল যুগের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা অবান্তর।

॥ শুভদৃষ্টি ॥

গল্প

নীলিমা দাশগুপ্ত

দিল্লী থেকে মালার বড়মাসী এলেন। ক'দিন পরে শিলং থেকে ছোটোমাসীও, মালা ভারি অবাক হলো। আগাগোড়া ও শুনে এসেছে, ওরা নিতান্তই গরীব, তাই ধনীমাসীদের পক্ষে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। হঠাৎ একসঙ্গে দুইমাসী আলোর-মহল থেকে ছায়ামহলে। এমন যোগাযোগে বিস্ময় লাগে বৈকি। শিলং-এর সিভিল সার্জেন অবিনাশবাবুর পাঁচ মেয়ের মধ্যে একমাত্র মেজো মেয়ে মালার মা পড়েছেন গরীব অধ্যাপকের হাতে। মালার ঠাকুরদাদা একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, কিন্তু শেষ বয়েসে পর পর কতগুলি শোক পেয়ে ভাঙাহৃদয়ের হাহাকারটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে লাগলেন শুধু নেশা দিয়ে, মদের মাত্রা এতই বাড়িয়ে দিলেন যে সব চাপা পড়ে গেলো বিলিতি বোতলের তলায়। ছোটো ছেলে ত্রিদিবেশের জন্য রইলো শুধু সাবেক সৈত্রিক বাড়িটা।

বড়মাসী, ন' মাসী মিল্লী, মেজোমাসী সিমলায় আর শিলংএ ছোটোমাসী, সবাই পদস্থ অফিসারের ঘরণী, ছোটোমাসী কারো ঘরণী হননি এখনও। আকস্মিকভাবে মালার দাদু দিদিমা পরপর গত হওয়াতে বিয়েতে বিঘ্ন ঘটেছে। ছোটো মেয়ের বিয়ের জন্য রেখে গেছেন বিশ হাজার টাকা।

মালার মা শোভনা দুই বোনকে কাছে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলেন। সারাটাদিন অত্যন্ত উৎসাহে ছুটোছুটি ক'রে আদরে যত্নে ভ'রে রাখতে লাগলেন বোনেদের।

শীতের বিকেলের মিষ্টি একচিলতে রোদ গোভালার বারান্দায় এসে পড়েছে, সেই বিদায়ী রোদের আভা পিঠে নিয়ে বারান্দায় ব'সে গল্প করছেন বোনেরা। মালাও আছে পাশে।

"তোর মালা যদি মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হ'তো—" বিরাট একটা দরদী নিশ্বাস ফেলে বড় মাসী সুতপা মপাশে একবার শ্যামবর্ণা মালাকে দেখে নিলেন, ছোটো মাসী সুষমা চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন,

—"সত্যি অন্ততঃ তোর মত রংটাও যদি পেতো মেয়েটি—অথচ ত্রিদিবেশদাও তো কী ভীষণ ফর্সা—" কথা শেষ ক'রে নিজের নিটোল গৌরবর্ণ হাতখানার দিকে একপলক তাকালেন সুষমা। বড়মাসী উলবোনা বন্ধ ক'রে ভাল ক'রে এবার বোনকিকে নিরীক্ষণ করলেন একটু, "বাঙলাদেশে আইবুড়ো-মেয়েদের কত কিছু সব মাথায় বলে শুনেছি, তুই শুনিস্‌নি শুভ্র?... ...কাঁচাহলুদ, কাঁচাহলুদ, সরষাটা, কদলাযোসাবাটা আরো যেন কি কি সব আছে, তাই মাখিয়ে দেখ্‌না?—না হ'লে এই বাজারে বিয়ে দিবি কি করে?" সুতপার গলায় উদ্বেগের সুর লাগলো। সর্বাঙ্গ চড়বড়িয়ে উঠলো মালার—ও কী বাজারের আলু-পটল নাকি? মালা উঠতে যাচ্ছিলো, শোভনা ধমক দিলে, "যাচ্ছিস কোথা? বস্। কারুর সঙ্গে মেলামেশা নেই, সহবৎ শেখা নেই, কেবল বাপের মত বই মুখে করে থাকলেই হবে?" মালা অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে আবার বসে পড়লো। বোনের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে শোভনা কথা শেষ করলেন।

"ও কী আমার তেমন মেয়ে নাকি যে আমার কথা শুনে সমবাটা মাথবে, কাঁচা হলুদ মাখবে। এক বাপসোহাগী মেয়ে হ'য়েছেন বাবার কথা ছাড়া আর কারো কথা কানে তোলেন না।"

সুতপা আন্তরিকতার সুরে বললেন,

"বাবার বি-এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলে, দিল্লী নিয়ে ওকে আমার কাছে রাখবো কিছুদিন, মেজিস তৈরী ক'রে দেব একেবারে; সুমনাদের সঙ্গেই যেতে পারবে, উনি বলেছেন—শ্যামলকে দিল্লী বদলি করার ব্যবস্থা ছ'মাসের মধ্যেই করবেন।"

শোভনা খুশি গলায় বললেন,—

"বড়দি, তুই যে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিয়ের বাজার কেনা-কাটা শুরু ক'রে দিয়েছিস, শ্যামল যদি বিয়েতে অমত ক'রে?" "বলিস কী শুভ!....." বিস্ময়ের চোটে উলবোনা বন্ধ করলেন সুতপা, "শ্যামল শুনতেই আমার মেয়ে, কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি ওকে, তাছাড়া দাদা বৌদির ভারি ভক্ত ও। কলকাতায় পোস্টেড না হলে কোনো হাঙ্গামাই ছিলোনা, দিল্লীতে বিয়েটা হতো। অবশ্য এখনও হ'তে পারতো, তবে ভেবে দেখলাম, এ একপক্ষে ভালই হলো, দিল্লীতে সামাজিক সৌষ্ঠব বজায় রাখার খরচা দুর্ধান্ত, হাই সার্কেলের সকলকে না বলে তো পারতেন না; নিউ মার্কেটে অল্প খরচে বিয়েটা হয়ে যাবে। আমরা ঠিক করেছি, ঐ বিশ হাজার টাকায় দিল্লীতে ওদের একটা বাড়ি ক'রে দেব। ভারি সুন্দর সুন্দর প্লট বিক্রী হচ্ছে এখন—দেখেও রেখেছি একটা—" কথা শেষ ক'রে সুতপা সস্নেহে ছোটো বোনের দিকে তাকালেন, "আর দুষ্টুর মত মেয়ে, ওকে অপছন্দ করার সাধ্য কী শ্যামলের। রূপে-গুণে-ধনীতে তার ওপর অত টাকা নিয়ে শ্বশুর ঘর করতে আসছে; এমন কি ভবিষ্যতে, আমি সব ভেবে রেখেছি শুধু জেনেশুনে বাদুর করতে রাশ রাশ টাকা ঢেলে যাবার প্রবৃত্তিটা রাখতে হবে না, এ কী কম সুবিধে?—" যেন বিরাট একটি দায়িত্ব সম্পন্ন করতে যাচ্ছেন এমনি মুখের ভাব ক'রে আবার উলবোনা শুরু করলেন সুতপা।

সুমনা এম-এ পাশ করে সিলেবেই শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। শ্যামলের গুণাবলী এবং ফটোসমেত বড়দির পত্র পেয়ে বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন।

শ্যামলবোস কলকাতায় পোস্টেড হ'য়েছেন সম্প্রতি, কাস্টমসের এ গ্রেড অফিসার। মাস ছ'য়েকের মধ্যেই আবার দিল্লী যে ফিরে যাবেন দাদা উজ্জ্বল বোসের তদ্বিরে, সেটাও জানেন। লাসডাউন-টেরাসে ছোটো একটি ফ্লাট নিয়ে আছেন। বৌদির আচরণ ওঁর কাছে বেশ হেঁয়ালি ঠেকেছে। কলকাতায় এসেছেন অথচ ওঁর বাড়িতে ওঠেননি। উঠেছেন যে বোনের সঙ্গে মোটেই মাখামাখি নেই সেখানে। শুধু সেখানেই শেষ নয়, শ্যামলকে শনিবার বিকেল পাঁচটায় সেই বাড়িতে বিশেষ করে আহ্বান জানিয়েছেন।

অতঃপর শনিবার এলো, সাধ্যমত ঘর দুয়ার সাজিয়েছেন শোভনা। বোনেরাও নির্দেশ দিয়েছেন অনেক। সুতপা বাক্স থেকে বার ক'রে দিয়েছেন—আপানী নক্সা কাটা ট্রে, ফুলদানী, পর্দা, টেবিল ঢাকনা, এ্যাসট্রে। নিউমার্কেটে গিয়ে নিজে বেছে কিনে এনেছেন তাজা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। নিজের মেয়েরও নাকউঁচু রুচি ভালমতই জানেন সুতপা, যাকে দেখবে সেই শুধু সুন্দরী হ'লে হবেনা, তার পটভূমিও সুন্দর হওয়া চাই।

সুতপাদেবী নিজেই রিপিত ক'রে শোভনার নিয়ে আসবেন মেয়েকে—এটাই ঠিক হয়েছে। পাঁচটা বাজার সামান্য কিছু আগে নামলেই হবে নিচে। কিন্তু, উগ্র কৌতূহলটা শ্যামলকে ঠেলে পাঠিয়েছে অনেক আগে। চারটের আগেই এসে হাজির বৌদি যদি অমন ক'রে বিনয়ন বেঁধে না দিতেন, তাহলে শনিবারের অনেক

আগেই চলে আসতেন শ্যামল। মালা টিউটোরিয়াল ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যায় হচ্ছিলো, নক্ করার শব্দ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললো। আগন্তুককে দেখে চোখ বড় করলো মালা: ইনিই কী শ্যামলবাবু নাকি। কিন্তু তিনি তো পাঁচটার পরে আসবেন শুনলাম।

মালার চোখ বড় করা অবাক চাউনি দেখে একটু যেন থতমত খেলেন শ্যামল। নম্বর মিলিয়ে দেখা সত্ত্বেও দ্বিধা জড়ানো গলায় বললেন, "এটা ত্রিবিক্রম গুহর বাড়ি তো? আমি সুতপাদেবীর কাছে—" ততক্ষণে মালার আর সংশয় নেই,

"আসুন, আসুন, ওপরে আসুন, বড়মাসী ওপরে আছেন—"

শ্যামল ইতস্তত: ক'রে বললেন,

"বৌদিকে যদি ডেকে দেন একটু—"

শ্যামল ওপরে যেতে অনিচ্ছুক দেখে চারুকে ডেকে বড়মাসীর কাছে খবর পাঠালো মালা। তারপর একটু দাঁড়িয়ে গেলো ও। ভদ্রলোককে একেবারে একলা দাঁড় করিয়ে রেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবেনা বোধহয়—ওর মনে হলো। ছোটোমাসীর ভাবীবরকে আগের মতই চোখ বড় করে কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগলো—ছোটোমাসী সুন্দরী ঠিকই কিন্তু এমন মানানসই চেহারার পাশে একেবারে বেমানান। একহারা ছিপছিপে রুগ্ন চেহারা শ্যামলের, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, টিকোলো নাক, বড় বড় দুটি সুন্দর চোখ, আর ছোটোমাসীর একেবারে গোলগাল মিটোল চেহারা—ফোলা ফোলা গাল, মাত্র দুদিনেই মাষ্টারনি মাষ্টারনি ভাব ফুটে বার হচ্ছে চেহারায়। কল্পনায় দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একটু মজাই লাগলো মালার। হাসি হাসি ভাবটা ঠোঁটের বাঁকে চেপে রাখলো জোর ক'রে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সুতপা প্রায় ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এসেছেন, "এলো শ্যামল, সোজা ওপরে চলে এলো, আমার বোনের বাড়িতে তোমার আবার লজ্জা কী।"

মালা ক্লাস করতে চলে গেল।

অনুষ্ঠানপর্ব সম্পন্ন হলো নিখুঁত ভাবে। বৌদির আহ্বানের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে প্রথমদিকে একটু যেন বিব্রত হয়েছিলেন শ্যামল, তারপর সামলে নিয়েছেন। ডিসগুলি ক'রে খেলেন, সুরনার গান শুনে তারিফ করলেন, সিলং জায়গাটার সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

সুতপার তর সয় না। নিচে নেমেই দেবরের অভিপ্রায় জানতে চাইলেন, "খোলাখুলিভাবে এখুনি মত দিয়ে যাও শ্যামল, আমি বিয়ের দিন ঠিক ক'রে ফেলি—"

শ্যামল চারপাশটা আর একটু দেখে নিলেন,

"বৌদি চলো আমার সঙ্গে, কেমন বাড়িতে আমি বাস করছি অন্তত: সেটা দেখবে তো একটু—"

দুচোখ বন্ধুকের মত টানলেন সুতপা।

"আচ্ছা চলো, তোমার ওখানে যাই তাহলে, আমি তো প্রস্তুতই আছি, রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিলেই হবে।" যোলদের ব'লে দেবরের সঙ্গে বার হ'লেন সুতপা।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে সুতপা ফিরলেন এবং চোখমুখের চেহারা এমন বিকৃত আর নির্মম ক'রে ফিরলেন যে তার তলায় চাপা প'ড়ে গেলো এতদিনকার সযত্নলালিত আভিজাত্য, এটিকেট, সবকিছু।

সুরনা ঘাবড়ে গেলেন রীতিমত, শোভনা বিবর্ণমুখে, শুধোলেন, "বড়দি হয়েছে কী?"

"তোদের কলকাতার কথা বলিসনে আর—" জিভের ডগা দিয়ে কেটে কেটে কথা বলতে লাগলেন সুতপা,

"মেয়েকে মিথি করেছিস, একফোঁটা শিক্ষাদীক্ষা তো দিসনি, আগ বাড়িয়ে সবটায় মধ্যে যাওয়া চাই—সবটাতে

মাথা গলানো চাই, একেবারে যা-তা কলকাতার ট্রেনিং—, ওঁর মত সুন্দর বিয়েটা ভেঙে গেলো।" তীব্র আশাভঙ্গের জ্বালায় সুতপা একেবারে ক্ষিপ্তা! শোভনা মেয়ের শিক্ষা নিয়ে সব সময়েই অনুযোগ ক'রে থাকেন স্বামীর কাছে, কিন্তু হাজার হ'লেও মেয়ে ত বটে, আহতকণ্ঠে বললেন,

"তা, সুন্দর ট্রেনিং তো আর কলকাতায় হয়নি, মালার জন্য সুন্দর বিয়ে ভাববে কেন?"

"অতবুদ্ধি যদি তোর ঘটে থাকবে, তাহলে তোর আর এই দশা—রুদ্ধ আক্রোশের ঝাপটা দিয়ে কথা শেষ করলেন সুতপা দেবী। এরপর মালা ফিরে এলে ও কেন এগিয়ে গিয়ে দোর খুলেছিল এই নিয়ে নানা গঞ্জনা চললো অনেকক্ষণ, মালার উত্তর কানেই নিলে না কেউ। ছোটমাসী পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে কলকাতার মেয়েদের নিন্দা করলেন, নাক কোঁচকালেন, ঠোঁট মচ্‌কালেন। বিমূঢ়া শোভনা নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে এই সিদ্ধান্তে শেষে উপনীত হলেন,—মালা শ্যামলকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো নিচে, তাতেই বোধ হয় এই বিপত্তিটা ঘটেছে—, কিন্তু তাতেই বা এমন হবে কেন? মনের বোঝাপড়াটা ঠিক পরিষ্কার হলো না।

মালা তারপর একেবারে চুপ। শুধু ওর মন ভেতরে ভেতরে মৃদু জলা মোমের শিখার মত জ্বলতেই থাকলো।

তবে, শ্যামল বোসের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং তৎপরতা—একাধারে সবই আছে তা স্বীকার করতেই হবে। সাতদিনের মধ্যেই নিজের এক কলীগের সঙ্গে বৌদির বোনের বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললেন। পাত্র বীরেশ চৌধুরি তিনমাস বাদে ষ্টাডি লীভ্‌ নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন। ইচ্ছেটা হাজার দশেক টাকা নগদ নিয়ে একটু সলভেন্ট হয়ে বিলাত যান। সহজেই এক কথায় রাজি হ'য়ে গেলেন বিয়েতে। এমনকি বিপত্নীকের টাকার উল্লেখে গদগদ হ'য়ে নতুন আর একটা প্রস্তাব ছুড়ে দিলেন : তাহলে সস্ত্রীকই যাবো বিলেতে।

বৌদির গোপন তীব্র আকাঙ্ক্ষাটা জানতেন শ্যামল বোস। প্রতিবেশিনী মিসেস তালুকদার দিল্লীর নতুন কলোনীতে তিনকাঠা জায়গা কিনেছেন। ওঁকে টেক্কা দিয়ে বাড়ি তুলবেন বলে সুতপা পাঁচকাঠা জায়গায় বায়না ক'রে বসে আছেন।

"বৌদি তুমি ভাবড়িয়োনা, ও জমি কেনার টাকা আমি এখুনি দিয়ে দেবো তোমাকে আর ইনষ্টলমেণ্টে বাড়িও তুলে ফেলবো দুবছরে, শহরের টাকার বাড়িতে কী রকটান ক'রে থাকা যায়—" আশ্বাস দিয়েছেন শ্যামল।

প্রায় শান্ত হয়েছেন সুতপা। বিমিয়ে পড়া মন আবার জেগেছে কিছুটা। মুখার কোটেড হয়েছে পানসে কথাগুলো।

সুমনার রেশ আর বিন্দুমাত্র নেই। বরং আরো বেশি খুশি। খেতদীপে যাওয়ার আনন্দে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। গ্রেটব্রুটেনকে নিয়ে অনেক মধুর রঙীন কল্পনা সুমনার মধ্যে বিকীর্ণ, সে সব রঙীন্‌ ছবি আর ছবি থাকবেনা, নিজের দুটি চোখ ভরে দেখে ধরে নিয়ে আসবে মনের পর্দায়—মনের যেমি বেশি খুশিটা অনবরত ছন্দপতন ঘটাতে লাগলো সুমনার চলায় বলায়।

গোধূলিতেই সুমনার বিয়ে। বরযাত্রীদের আপ্যায়ন পর্বটা শেষ হ'য়ে গেছে। কন্যাকর্তা সুতপা তদ্বির তদারককের এবং অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি রাখেননি। নানা রঙের আলো ও পুষ্পশোভিত প্যাণ্ডেলের শোভা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, মনে সাড়া লাগায়।

সুযোগ খুঁজছিলো মালা। বরযাত্রীদের হল থেকে শ্যামল একটু বিচ্ছিন্ন হ'তেই পেছন থেকে ডাক দিলো।

"জিজ—ন।"

ঘাড় ফিরিয়ে মালাকে দেখে শ্যামল সুন্দর হাসলেন,

"আপনি—!"

"হ্যাঁ, কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"ভাল কথা, বলুন—"

উত্তপ্ত মালা চারপাশে চোখ চালিয়ে দেখলো, এই চলমান স্রোতে রাগ প্রকাশটা ঠিক উপযুক্ত হবেনা।

"একটু নিরিবিলিতে কথা বলবো, আসুন আমার সঙ্গে—"

"সে তো আরো ভালো—" মালাকে অনুসরণ করে বললেন শ্যামল।

"তার মানে—?" নীরস গম্ভীর গলা মালার, ভ্রূকুটিতে বিরক্তির ধার।

"মানে আর কিছু নয়, নিরিবিলিতে কথাবলার সুবিধে হয় এই আর কি"—শ্যামলের চোখে একটা চকিত কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো মালা কিন্তু কিছু বললো না।

নির্জনতা আশেপাশে মিললো না। একতলায় নিজের পড়ার ঘরেই নিয়ে এলো মালা শ্যামলকে। ঘরে ঢুকে বসার জন্য কোনোরকম অনুরোধ না করেই সোজা চ্যালেঞ্জ,—

"আপনি বড় মাসীকে কলকাতার মেয়েদের কথা কী বলেছেন?"

"আমি—?"—আশ্চর্য বিস্ময় শ্যামলের গলায়।

মালা প্রশ্নটা পরিষ্কার করলো আরো,

"কলকাতার মেয়ে মানে আমার কথা,—বলেননি?"

"হ্যাঁ, তা বলেছি—" শ্যামল একটি দুষ্টুহাসি চাপলো ঠোঁটের কোণে। শ্যামলের কবুল করার বে-পরোয়া ভঙ্গি দেখে উসখুসিয়ে উঠলো মালা,

"কী বলেছেন আমার কথা? আমি কী অভদ্র ব্যবহার করেছি সেদিন আপনার সঙ্গে—?"

"কৈ? ব্যবহারের তো কোনো উল্লেখ করিনি!"

"তবে কী বলেছেন?"

"সব খুলে বলবো?"

"নিশ্চয়—ই।"

"কিন্তু সবটা যথাযথ বলা কী—" কথা শেষ না ক'রে স্থির চোখে তাকালেন শ্যামল পাতলা ছিপছিপে দীঘল-সরল মালার দিকে,—কৌতুকে চোখের কোণদুটি চিকচিক ক'রে উঠলো।

"তা জানি, দিল্লীর ছেলেদের সে সাহসে কুলোবেনা—" শ্লেষের সুর মালার গলায়, পাল্টা জবাব দিতে পেরেছে এতদিনে।

"না তা নয়। তাহলে দিল্লীর ছেলেদের চেনেননি আপনি—"

"আচ্ছা বুঝলুম, শুনি এখন—" মালার গলায় অস্থির অধৈর্য।

"...বলেছিলাম, বৌদি!—তোমার বোন এত সুন্দরী, আমার মত চামচিকের পাশে কী মানায়..."

মালার অত রাগের মধ্যেও একটু যেন হাসি পেয়ে গেলো, কিন্তু, প্রাণপণে মুখের ভাব চেপে, এ কথার সঙ্গে ওর আচরণের কী যোগাযোগ থাকতে পারে তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো।

...বরং তোমার বোনটি, তার নামটা যেন কী?... মালা?—" কৌতুক চোখে পরিপূর্ণদৃষ্টিতে আর একবার মালার দিকে তাকালেন শ্যামল।

মুহূর্তে মালার সমস্ত রক্ত মুখে গিয়ে উঠলো, চোখের পাতাদুটি যেন ঘোমটা হয়ে ঢেকে দিলো চোখের তারা দুটিকে। আর সেই ব্রীড়া ও রং চোখ দিয়ে ছুঁয়ে আবার কথা শুরু করলেন শ্যামল,

"...মালাকে যদি আমার গলায় দাও, আমি অত্যন্ত সুখী হবো বৌদি—।" তার উত্তরে বৌদি বললেন..."

মালার চোখের পাতা ওকে না জানিয়েই ধীরে ধীরে উঠলো।

"……শ্যামল, বলো কী! এ যে সোনার মালা, রূপও নেই রূপাও নেই। ওর বাবা একটি পয়সাও দিতে পারবেন না। আমি বলবুম,—বৌদি! তোমার হলো কী! রূপোর কথা থাক্ কিন্তু রূপটাও কী চোখে পড়লো না তোমার……অমন কাজল কালো হরিণ চোখ, অমন টোল খাওয়া মিষ্টিমুখ—না, তুমি দেখ্‌ছি কবোষ্ণ প্রেমের প্রজাপতি দেখতে দেখতে চোখের মাথাটি খেয়ে বসে আছো বৌদি—"

মালার এই উনিশ বছর বয়েসে এমন কথা, ওকে নিয়ে এমন সুন্দর ক'রে কথা ও আর কখনো শোনেনি। শুধু শুনেছে, শুনে আসছে—ও কালো, ও গরীব বাপের কালো মেয়ে, ও অবাঞ্ছিত—অপ্রার্থিত। ওর রোশ্‌নাই নেই, এ বাজারে তাই কোনো দাম নেই ওর। ওর যৌবনের প্রত্যাশিত পুষ্পিত পদক্ষেপকে বার বার ধিক্কার দিয়েছে ওর অভিমানী অস্তিত্ব, কখনো স্বাগতম জানায়নি,—তবু মিতালি পাতায়নি দেহে আর মনে।

কেবল ওর বাবা মাঝে মাঝে মা'র কথার প্রতিবাদ ক'রে—ওর মুখের প্রশংসা করতেন, অন্য সুরে অন্য ভাবে।

আজ নিজে বেচে আকাশ ভরা প্রেম নিয়ে এমন একজন ধরা দিতে এসেছে ওর কাছে, যার বাজার দর অনেক চড়া।

কেন, অপ্রার্থিতার কপালে অপ্রত্যাশিত এই চন্দনের ফোঁটা।

কিসের একটা ব্যর্থতা আর অপমান বুকের একান্ত গভীরে এতদিন পুঞ্জীভূত হ'য়ে ছিলো, সেটা যেন গলে অশ্রুর আকার নিলো। দুহাতে মুখ ঢাকলে মালা একটু ইতস্ততঃ করলেন শ্যামল, কিন্তু, জীবনের পাখিওড়া প্রহর এখন—এগিয়ে এলেন পায়ে পায়ে। মালার হাত দুখানি সরিয়ে নিজের দুহাত দিয়ে মুখখানি তুলে ধরলেন ধীরে ধীরে,

'দেখ্‌লে তো কলকাতার মেয়ে! দিল্লীর ছেলের সাহস আরো কত বেশি—"মালা লজ্জালাল মুখ সরিয়ে নিলো, আঁচল তুলে চোখ মুখ মুছতে লাগলো ঘ'সে ঘ'সে। সবুজ হাওয়া বুকে লেগেছে ওর, যে হাওয়া কুঁড়ির বুকে চুমো খেয়ে, আনন্দ-অশ্রুর ভারে ওর চোখের পাতা কাঁপতেই থাকলো। শ্যামল আবার আগের সুরেই বললেন,

"দিল্লীর ছেলে তো সাহস ক'রে যথাযথ বিবৃতি দিলেন, এখন কলকাতার মেয়ে কী বলবেন, সেদিন অমন ক'রে তাকানো হয়েছিলো কেন?"

"ওমা! সে তো ছোটোমাসীর ভাবীবরকে দেখছিলুম—" কথা শেষ ক'রে মালা এবার হেসে উঠলো খিলখিল ক'রে।

"আর সেই মুখটিপে টিপে হাসি—"

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে মালা বললো,

"সে আমি বলবোনা—"

"দেখ্‌লে তো!!—কলকাতার মেয়েদের সাহস অনেক কম এবং তারা অকপট নয়—" শ্যামল এক্‌লাফে জানলা দিয়ে চাঁদকে ডিঙিয়ে চাঁদকে ডিঙিয়ে সাদা পাল তোলা অবুঝ মেঘগুলির দ্রুতগতির দিকে তাকালো তারপর বেপরোয়া খুশি নিয়ে একেবারে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে নীল দুখী ফুলের মত মালার মুখখানি দুই করতলের মধ্যে তুলে ধরলেন। কাজল কালো হরিণ চোখের কত কনীনিকার শ্যামলের মুগ্ধ চোখের ছায়া পড়লো।

বেলা শেষ

নবনীতা দেব

আলো-রাখাল তোমার বেণু মেঘের মাঠে মাঠে
সোনার রাধা ভাসায় ঘট বুকের ঘাটে ঘাটে
উধাও হাওয়া নীল পাহাড়ে ঘুমের সাথি নাচে
তোমার ছায়া নদীর মতো ওদের বনে আছে।

আলোর ছেলে বাজাও বেণু ঝরুক হীরেফুল
আকাশ চাঁদে সোনার রাধা কখন খোলে চুল!
উধাও হাওয়া নীলসাগরে কাদের তরী ভাসে
ঝিনুক মুঠি দেখায় খুলে, রুপোর মাছ হাসে।

নিখিল ভরে বেণুর খেলা বেণুর বেলা শেষ
আঁচল ছাড়ো বরং চোখ থাকুক অনিমেষ—
উজাড় হলো বুকের ঘট, ঘাটের কেলি থামে,
আলোর ছেলে ফেরাও বেনু, নিশীথ বুঝি নামে।

শাখা—১১৭এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সুখের বেদনা

নরেন্দ্র সিংহ

হয়েছি আপন হারা বিশ্বের মাঝারে
সুদূর ভ্রমণে তীর্থে কোথা চলে যাই,
অজানা স্নেহের নীড়ে জীবন জুড়াই,
ভালবেসে কাছে লয় ডাকিয়া আমারে।
চিনিতে নারিনু তবু তাদের সবারে
কে যে তারা সে সন্ধান খুঁজে নাহি পাই,
মায়া পাশে বদ্ধ হ'য়ে অস্তিত্ব হারাই :
মুক্তির প্রয়াস সখা জানাই তোমারে।

দিওনা দিওনা আর সুখের বেদনা,
অতলে হারায়ে যাবো মানব জীবনে।
মিলনে বিরহ আসে অসহ যাতনা,
তিলে তিলে দগ্ধ হিয়া মরমে মরমে।

রঙ্গিন স্বপনে আর ভুলায়ে রেখো না,
চোখের আড়ালে তুমি লুকায়ে থেকো না।

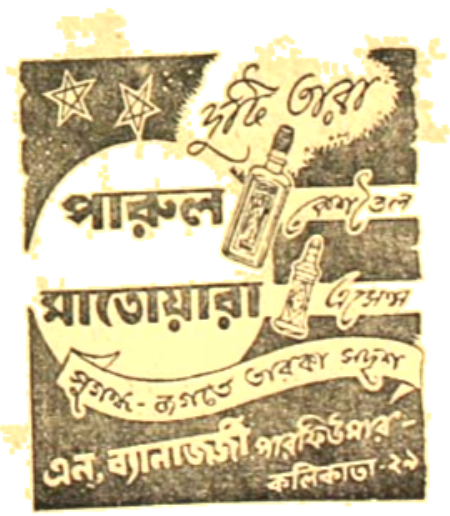

প্রবন্ধ

বর্তমান বাংলা সাহিত্য ও সমাজ-পরিস্থিতি

নারায়ণ চৌধুরী

আমাদের বর্তমান সাহিত্যের প্রকৃতি, ধারাবাহিক পর্যালোচনা করলে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। সেই সব তথ্যের সব কটিই যে সমান প্রীতিকর এমন মনে করবার কারণ নেই। এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেশী বেড়ে গিয়েছে। একদিকে যেমন লেখক-সংখ্যা, রচনা-সংখ্যা, পুস্তক-সংখ্যা ইত্যাদির দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে, অন্য দিকে তেমনি সেই সব লেখক, রচনা আর পুস্তক সম্পর্কে সমাজ-মানসে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। এর একটা কারণ স্বাধীনতা-পরবর্তী পরাধীনতার গ্লানি থেকে মনের মুক্তিলাভের অনুকূলতি; অন্য কারণ শিক্ষার বিস্তৃতি। শিক্ষা বলতে আমি এখানে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার কথা বলছি না, সাধারণ লিখনপঠনক্ষম শিক্ষাকেই বোঝাচ্ছি। শিক্ষিতের হার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে এ সত্য অনস্বীকার্য; তবে সংস্কৃতি-মূলক বা উন্নত শিক্ষার প্রচারে বর্তমান সরকারের কোনরূপ কৃতিত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। সে যাই হোক, সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্যকর্মী সম্পর্কে জনমনে যে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহের প্রবলতার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মুদ্রিত পুস্তকের ক্রম-বর্ধমান চাহিদা জনমনের উৎসাহেরই একরকমের মাপ।

এ সবই শুভলক্ষণ। কিন্তু আগাগোড়া সব লক্ষণই অগ্রগতি বা উন্নতির সূচনা করছে এমন কথা বলা চলে না। মূলটা গণতন্ত্রের। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এখনকার সাহিত্যে বেশ প্রবল ভাবেই প্রতিফলিত। শুধু যে সাহিত্যের ভাববস্তুর মধ্যেই গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে তাই নয়, লেখকদের শ্রেণীস্বরূপের মধ্যেও আমরা গণতন্ত্রের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করছি। আজকের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ লেখকই মধ্যবিত্ত আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন। তাঁদের শ্রেণীস্বরূপ তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে অবধারিত ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। এক সময়ে বাংলা সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবিত্ত বা অভিজাত সমাজের মানুষ। অবসর তাঁদের জীবনে ছিল প্রচুর, এবং সেই যুগে অনেকে অবকাশরঞ্জনী মনোবৃত্তির পোষকতাবশেই প্রধানতঃ সাহিত্যচর্চা করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আমল পর্যন্ত মোটামুটি এই নিয়ম চলে এসেছিল, শরৎ-চন্দ্রের সময় থেকে পরিবর্তনের শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্ত স্তরোদ্ভূত লেখক ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় আবির্ভূত হতে থাকেন। এখন পর্যন্ত ওই ধারা অব্যাহত গতিতে চলে এসেছে, শুধু তাই নয় ওই ধারার সম্প্রসারণও ঘটেছে। এখন দুই-একজন শ্রমিক-কৃষক সমাজেরও প্রতিনিধি দেখা যাচ্ছে লেখক-সমাজের মধ্যে। এ রকমটি আগে ছিল না।

তবে এই বিস্তার ও সম্প্রসারণ সামাজিক বিবর্তনের নিয়ম অনুসারেই বুঝি অবধারিত ছিল। লেখকের সংখ্যা-বৃদ্ধি আর সাহিত্যের পরিধির বিস্তৃতির মানেই হল জন-জীবন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া—কি সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর মধ্যে, কি লেখকদের শ্রেণীস্বরূপের বিচারে। এত এত লেখক বর্তমানে লিখছেন সে কি একটি আকস্মিক ঘটনা? এখন বোধগম্য কারণেই লেখকসংখ্যা উচ্চবিত্ত আর অভিজাত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, ফুলের চাষে মধ্য আর নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ ক্রমশঃ অধিক

মাত্রায় লেখক সমাজের গভীর মধ্যে এসে ধরা দিচ্ছেন। সাহিত্যকর্ম জিনিসটা যত বেশী অর্থকরী হচ্ছে ততবেশী সাধারণ আর্থিক স্তরের মানুষ সাহিত্যকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। লেখা বর্তমানে একটা বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকার প্রকৃষ্টতম উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তিদের নিকট সাহিত্যের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য অর্থকরী আকর্ষণটাই একমাত্র আকর্ষণ এমন কথা বললে ভুল হবে, তবে এটিও যে তাবৎ সাহিত্যিক কর্মতৎপরতার পিছনে অন্য কতিপয় অভিপ্রায়ের সঙ্গে একত্র প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সে বিষয়ে বুঝি ভুল করবার যো নেই। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান চেহারা স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবেই মধ্যবিত্ত সাহিত্যের চেহারা। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা এ সাহিত্যের ভাববস্তু ও ভাষা-প্রকরণ উভয়ই সমানভাবে প্রভাবিত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত জীবনে ভাঙন ধরেছে অনেক দিন থেকেই, কিন্তু সাহিত্যে এখনও মধ্যবিত্ত আদর্শেরই আধিপত্য। বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান গণতান্ত্রিকতার মধ্যেই তার মধ্যবিত্ত স্বরূপ লুক্কায়িত রয়েছে বলা যায়।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এই যে বিশিষ্ট শ্রেণীস্বরূপ, এর দ্বারা পুরাপুরি আমরা লাভবান হয়েছি এমন কথা বলতে পারব না। সাহিত্যের আভ্যন্তরিক মধ্যবিত্ত প্রবণতার মধ্যেই যেন ওই সাহিত্যের মজ্জাগত অপকর্ষের বীজ প্রোথিত রয়েছে বলে মনে হয়। সত্য বটে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে বহু বহু লেখক কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের রচনার পরিমাণ পূর্ব-পূর্ব যুগের লেখকদের রচনার পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু তাঁদের রচনার মান কি পরিমাণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানুপাতিক হারে এগিয়ে যেতে পারছে? লেখকদের পরিমাণগত স্ফীতির সঙ্গে কি গুণগত স্ফীতি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলছে? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে এত এত লেখক যে ক্রিয়াশীল রয়েছেন, তাঁরা কি বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করতে পারেন? সাহিত্য হচ্ছে সমাজ-মনোভূমির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুসুম, এমন যে সেরা সৌন্দর্য ও সুষমার ভরা সাহিত্যকুসুম, তা কি নিজের দিকে সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণীজন মন আকর্ষণের আকৃষ্ট করতে পেরেছে? আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ফলটি যেমন মূলতঃ মধ্যবিত্ত, তেমনি তার গুণও মধ্যম শ্রেণীর। উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত মানুষেরা সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত নেই বলেই আমার ধারণা। তাঁরা ভিন্নতর বৃত্তির আকর্ষণে সাহিত্যকে পাশ কাটিয়ে তাঁদের শক্তি, উদ্যম আর সময়কে অক্ষয় নিয়োগ করে সমাজজীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। যে গুণপনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হলে সাহিত্যকে নানা দিক্ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারত, সেই সব নৈপুণ্য ভিন্নতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে তদ্বৎ বিভাগের উন্নতি বিধান করছে। সুতরাং, স্বভাবতঃই অন্যান্য বিভাগের বেলায় যা লাভ, তা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এই দৈন্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তির অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। আমাদের বর্তমান সাহিত্য গণতান্ত্রিক প্রবণতাযুক্ত হতে পারে, মধ্যবিত্ত মানসিকতাযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তার যে অভিজাত্য নেই সে কথা অতি সত্য। সাহিত্যের আভিজাত্য খুইয়ে আমরা সাহিত্যের গণতন্ত্রকে তুলনা করছি। এ কথা যে কথার কথা নয় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গে এখনকার সাহিত্যের তুলনা করলেই সে বস্তু আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারব। সাহিত্য এখন প্রচুর সৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর বই বেরুচ্ছে, পাঠক সমাজে সে সব লেখা আর বই নিয়ে প্রচুর উৎসাহেরও সঞ্চার হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের মানের সুস্পষ্ট ক্রমাপকর্ষ ঘটেছে বলে আমার ধারণা। সৃষ্টি-সাহিত্যের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে, তার মান সেই হারেই নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

সাহিত্যের বিস্তার হচ্ছে, গভীরতা সাধিত হচ্ছে না। অনেকানেক লেখক মিলে সাহিত্যের একটি প্রকাণ্ড সৌধ খাড়া করিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তার ভিত্তি পলকা এবং তা তথাকথিত মার্কিন আকাশচুম্বী অট্টালিকার মত সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যবিহীন। এঁরা মাথা-গুনতিতে লেখকেরা খুবই ভারী সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের মাথা ভারী নয়। সাহিত্যে তরল রসেরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সংখ্যায় মাথাভারী লেখকেরা হাল্কা মেজাজে চটুল সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন।

যদি বলেন, সাহিত্যে যে মধ্যবর্গভুক্ত লেখকেরা আসর জাঁকিয়ে আছেন তার নিশ্চিত প্রমাণ কী। তার নিশ্চিত প্রমাণ হচ্ছে এই যে, বেশীর ভাগ লেখকই তথাকথিত গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা-ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি মূলতঃ চিত্তবিনোদনী সাহিত্যসৃষ্টিতে নিরত আছেন; কাব্যে নাট্যে বা প্রবন্ধ সন্দর্ভ সমালোচনা জাতীয় চিন্তামূলক সাহিত্য-রচনায় তাঁদের ক্ষমতার ব্যবহার হচ্ছে না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতাই নেই তো তার ব্যবহার হবে কী প্রকারে। গল্প-উপন্যাস খারাপ জিনিস তা বলছি নে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসের স্তরভেদ আছে, প্রকার ভেদ আছে। যে গল্প-উপন্যাস নিতান্তই পর্যবেক্ষণনির্ভর, যার পিছনে মনন নেই, চিন্তার উদ্দীপনা নেই, যা শুধু কাহিনীবিস্তারেই সীমাবদ্ধ ও তাতেই নিঃশেষিত, তেমন গল্প-উপন্যাস নিয়ে যে সাহিত্যের খুব বেশী সমৃদ্ধি হয় এমন মনে করবার হেতু নেই। আজকাল এই জাতীয় গল্প-উপন্যাসেরই প্রচলন বেশী, প্রভাব বেশী। একান্তভাবেই কাহিনীমাত্র-সার মননবিহীন রচনা। সংবাদপত্রের রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে এখনকার প্রচলিত গল্প-উপন্যাসের পার্থক্য শুধু আয়তনে, প্রকারে নয়।

এই যে মননবিরহিত কাহিনী-সর্বস্ব রচনা, এই আদর্শটি প্রকারান্তরে লেখকদের বিশিষ্ট শ্রেণীস্বরূপের প্রতিই অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে। লেখকেরা মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্ত বলেই তাঁদের রচনার ভিতর মননের এত দৈন্য। তাঁদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আছে, সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে উপযুক্ত সাহিত্যসম্মত ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতাও মোটামুটি তাঁদের আছে, কিন্তু তাঁদের রচনার পিছনে মননের দ্যোতনা অনুপস্থিত। এই সব রচয়িতার দল গল্প বয়নের ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন ক্ষমতার অনুশীলন করবার অবকাশ জীবনে মোটে পাননি। তাঁরা বৈদগ্ধ্যের অনুশীলন করেন নি, সাংস্কৃতিক মনঃপ্রকর্ষের অনুশীলন করেন নি। তাঁদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বরূপ তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে পদে পদে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে, উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হয়ে রয়েছে। ফলে তাঁরা জীবনে নিজেকে সর্বাঙ্গীন ভাবে পরিপুষ্ট করে তোলার অবকাশ পান নি। বিদ্যাচর্চা আর জ্ঞানের অনুশীলনের দিকে তাঁদের প্রচণ্ড ঘাটতি থেকে গেছে। তাঁরা তাঁদের সহজ রচনা শক্তির উপর যতটা নির্ভরশীল হয়েছেন, মননশীলতার আদর্শ তার একাংশও অবলম্বন করতে পারেন নি। বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যে দুই চারিটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বাদ দিলে (যথা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি) আর সকলেই প্রায় মননের দৃঢ়ভিত্তিহীন কাহিনীসার গল্প-উপন্যাস সৃষ্টির লৌকিক আদর্শটিকে আঁকড়ে আছেন বলে মনে হয়। কাহিনীর নির্বাচনেও তেমন বিচার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সবাই প্রায় ব্যতিক্রমবিহীনভাবে প্রথম-দর্শনে প্রেম-উপন্যাস বা তথাকথিত চাওয়া-পাওয়ার কাহিনী নিয়েই ব্যস্ত। এই ধরণের কাহিনী তরুণ মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে কিন্তু বিচক্ষণ মনের খোরাক এর মধ্যে নেই। বিচক্ষণ পাঠকেরা কাহিনীর মধ্যে জৈব প্রেমের বর্ণনা চান না; তাঁরা চান এমন কাহিনীর রূপায়ণ যা তাঁদের চিত্তকেও বিনোদন করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাবজীবনকেও মহত্প্রাণিত ও

উন্নীত করবে। এমন কাহিনী আজকাল কটা লেখা হয় সেই প্রশ্ন সবতোভাবেই উত্থাপন করা চলে।

আসলে এখনকার লেখকেরা অধিকাংশই স্থূল জনপ্রিয়তার আদর্শের পূজারী। তাঁদের খ্যাতি কৃতিত্ব সাফল্য ইত্যাদির ধারণা তথাকথিত জনপ্রিয়তার মাপকাঠি দিয়ে যাচা এবং মুখ্যতঃ ওই সূত্র থেকেই পাওয়া। লোকপ্রিয় হবার জন্যে তাঁদের আকুলি-বিকুলির অন্ত নেই। লোকপ্রিয়তার এঁরা তুলনা করেন নানা ভাবে—কখনও সস্তা কাহিনী-রচনা করে, কখনও সিনেমাঘেঁষা সস্তা গল্প-পত্রিকায় লিখে, কখনও রুচিবিগর্হিত চটকদার সব মলাটের আবরণে স্বীয় রচনাকে প্রকাশিত হতে দিয়ে। জনপ্রিয়তার উর্ধ্বে সাহিত্য সৃষ্টির যে একটা উচ্চতর মান আছে, তা খুব কম ক্ষেত্রেই এই সব জনপ্রিয়তার আশ্রয়ী লৌকিক লেখকদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার ধারা এঁরা আবিষ্ট বলেই, জনপ্রিয়তার প্রতি এঁদের এত লোলুপতা। সাধারণ পাঠকের বাহবা কুড়তে পারলে এঁরা বোধ হয় আর কিছু চান না। কোন এক আধুনিক সমালোচক জনপ্রিয়তাকে "দুর্গন্ধবাহী" (malodorous) আখ্যা দিয়েছেন। আমি অবশ্য এতদূর যেতে চাই না। তবে জনপ্রিয়তার আদর্শের ভিতর যে অনেকখানি চটুলতার আমেজ আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। জনপ্রিয়তার ধারা সাধক তাঁরা তাঁদের রচনার মান অবনীত না করে পারেন না। জনপ্রিয়তার মধ্যেই ওই অবনয়নের বীজ নিহিত আছে। যেখানে বিজ্ঞ, অর্ধ-বিজ্ঞ বহু পাঠককে একই কালে পরিতৃপ্ত করবার সমস্যা, সে স্থলে রচনার উচ্চ আদর্শের আংশিক খর্বীকরণ বোধ হয় অনিবার্য। বহুজনের প্রত্যাশা পূর্ণ করেও রচনার উন্নত মান অক্ষুণ্ণ রাখা—সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। পুরাতন ক্লাসিক রচনায় এই গুণ ছিল; এখনকার চটুলতাধর্মী সাহিত্যের কাছ থেকে এ মিলিল আশা করা যায় না।

কাহিনী নির্বাচনে বিচারহীনতার কথা বলেছি। প্রসঙ্গটিকে আরও একটু বিস্তারিত না করলে ওই মন্তব্যের তাৎপর্য বোধ হয় সম্যক্ পরিস্ফুট হবে না।

আজকালকার যে-কোন উপন্যাস-গল্পের বই হাতে নিলেই দেখা যায়, সে সবের কাহিনী জৈব প্রেমের বর্ণনায় ভরপুর। শুধু যে সাধারণ ক্ষমতার লেখকেরাই এই জাতীয় কাহিনীকে তাঁদের বইয়ের উপজীব্য করেন তা-ই নয়, অনেক সময় নামী লেখকেরাও বিষয়বস্তুর মনোনয়নে এবম্বিধ দুর্বলতার পরিচয় দেন। অপরুচি দুষ্টরুচির জন্মই এইরূপ ঘটে থাকে। সাহিত্যক্ষেত্র থেকে আভিজাত্যের ধারণা অন্তর্হিত হওয়ার পর এই জাতীয় স্থূল প্রেমের আদর্শ লেখকদের কল্পনাকে বিশেষভাবে অধিকার করেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা আভিজাত্যকে বাংলা সাহিত্যের আঙিনা থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। এই অভিজাত্য মনের আভিজাত্য, অনুভূতির আভিজাত্য, রুচির আভিজাত্য। গভীর জীবনবোধের সঙ্গে এই আভিজাত্যের যোগ আছে। এখন সে সবের বালাই নেই। বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তার আদর্শ ক্রমবিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচির স্থূলতা লেখকদের ভাব ও কল্পনাকে ক্রমশঃই অধিক মাত্রায় প্রভাবিত করে চলেছে। শরৎচন্দ্রের সময় থেকে ওই রুচিবিকারের প্রক্রিয়ার শুরু, কল্লোল-যুগের লেখকদের মধ্যে তার উগ্র প্রকাশ, এখনও সেই অন্ধবিবর আবিল ধারা অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্য এগোচ্ছে।

বোধ হয় এই রুচিবিকারের সঙ্গে মধ্যবিত্ত মানসিকতার কোথাও সংযোগ আছে। মধ্যবিত্তের প্রেম জৈব কামনা-বাসনার সীমায় আবদ্ধ, প্রেমের শুচি-শুভ্র শান্ত আদর্শের সঙ্গে এ-জাতীয় চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক নেই, পরিচয়ও নেই। যে জীবন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সতত-নিয়োজিত, জীবিকা-নির্বাহের তাড়নায় যা নিরন্তর পীড়িত, সেই জীবনের পরিকল্পনার মধ্যে প্রেমের একটি মাত্র রূপেরই প্রকাশ ঘটতে

পারে—রক্ত-মাংসের রাগীযুক্ত স্থূলতাযুক্তিত প্রেম। এই জীবনে অনাবিল শান্ত শুদ্ধ প্রেম চর্চার পরিবেশও নেই অবকাশও নেই। জীবনের পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুটা স্বাস্থ্য আর অবসরের হাওয়া না বইলে বোধ করি ইন্দ্রিয়ের প্রেমকে অতীন্দ্রিয় প্রেমের স্তরে উন্নীত করা সম্ভব হয় না। যেখানে ভোগসুখ পরিতৃপ্তির উপকরণ পর্যাপ্ত ও না চাইতেই লভ্য, সেইখানেই ভোগবাসনাকে অতিক্রম করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভোগ নিবৃত্তির পরে যে ত্যাগ, সেই ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত জীবনের স্তরে এইরূপ ত্যাগ বা সংযমের ধারণা অনুপস্থিত। সেই কারণেই মধ্যবিত্তের রচিত সাহিত্যে এত কাম-বিকারের চিত্রণ লক্ষ্য করা যায়। যে সমাজ ভোগের অনুভূতির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই সমাজ অতীন্দ্রিয় প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করবে কিরূপে। স্থূল জৈব কামনা-বাসনার বন্ধন অতিক্রম না করলে কি প্রেমের সমুন্নত শুভ্রোজ্জ্বল রূপের মুখোমুখি হওয়া যায়?

মনে হয় এইটিই প্রধান কারণ, যার জন্য মধ্যবিত্ত সাহিত্যে প্রেমের আভিজাত্যময় রূপের বর্ণনায় অসদ্ভাব। এ-সাহিত্যের আগাগোড়া স্থূল জৈব কামনাবাসনার ক্লেদ জড়িয়ে আছে। যেহেতু এখনকার অধিকাংশ লেখকই মধ্যবিত্ত স্তর থেকে উদ্ভূত, সেই কারণে প্রেমের মধ্যবিত্ত ধ্যান-ধারণার অক্টোপাস বন্ধন এড়ান এঁদের পক্ষে প্রায়শই সম্ভব হয় না। আর তারই জন্যে তাঁদের সাহিত্যে এত জন-জানাজানি মন দেওয়া নেওয়া চাওয়া-পাওয়া আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষের ছড়াছড়ি। এ চাওয়া-পাওয়া আর কিছু নয়, জৈব সুখ আকাঙ্ক্ষা ও তার নিবৃত্তির তাড়না মাত্র। প্রেমের উন্নীত (sublimated) সমুন্নত রূপের সঙ্গে এঁদের সারা জীবনেও পরিচয় ঘটবার অবকাশ হয় না। তাঁদের ভাবনা-কল্পনা দেহের স্তরে আটকে আছে, সুতরাং তাঁদের সাহিত্যে দেহবাদের এতাদৃশ আধিপত্য। হ্যাঁ, 'দেহবাদ'ই এঁদের সাহিত্যকে বিশেষিত করবার একমাত্র উপযুক্ত অভিধা। দেহকে বাদ দিয়ে এঁরা যেন কিছু ভাবতেই পারেন না। বর্তমান লেখকদের মজ্জাগত মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বরূপের জন্যেই যে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের এই অবস্থার চেহারা তা আশা করি আর বিশদ বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই।

তাই বলে এসব কথা বলার মানে এ নয় যে আমরা বর্তমান সাহিত্যের গণতান্ত্রিক আদর্শকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে পুরাতন বনেদিয়ানার যুগে ফিরে যেতে চাই। পরশ্রমপুষ্ট পরগাছা বনেদিয়ানার যুগ শেষ হয়েছে, ইতিহাসের এক কৃষ্ণ অধ্যায়ের অবসান হয়েছে। যে আভিজাত্যের উপর আমি জোর দিয়েছি তা আর্থিক বা অর্থনীতিগত আভিজাত্য নয়, রুচির আভিজাত্য, অনুভূতির আভিজাত্য। আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখব, জনজীবনের মাহাত্ম্যের কীর্তন করব, কিন্তু সঙ্কীর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেব না। রুচিতে আমরা হব অভিজাত। আমাদের ভাবকল্পনা ও ভাষাকে আমরা যথার্থ আভিজাত্যের দ্বারা মণ্ডিত করে তুলব। আমাদের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে স্থূলতার কিংবা গতানুগতিকতার কোন স্পর্শ থাকবে না। এইভাবে গণতন্ত্রকে যদি আমরা রুচির আভিজাত্যের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে এনে মেলাতে পারি তবেই আমাদের একান্তীন সাহিত্যচর্চা সার্থকতায় ভরে উঠবে, নচেৎ নয়। জনজীবনের আদর্শের সঙ্গে রুচির সমন্বয় হোক।

হে বিচারিণী কলিকাতা!

সুধাঙ্কিত

সাধনা সোম

ওভোট গহ্বরের পর আকাশ ফেটে নামলো জলের ধারা। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও ট্রাম বাসের কোন লক্ষণই চোখে পড়ল না। অগত্যা মিসেস রুদ্রের বসবার ঘরে কৌচেই ফিরে গিয়ে বসে পড়া ছাড়া উপায় রইল না। নিয়ন লাইটের আভা বাইরের বৃষ্টিধারার সঙ্গে তাল রেখে রহস্য রচনা করলো ঘরে। আধঘন্টা আগেও ভাবতে পারিনি মন এত নরম ও স্বপ্নালু হয়ে উঠবে। বুক শেলফে যত কটি মাসিক পত্র-পত্রিকা ছিল উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একসময় যখন সমাপ্তিতে এসে দাঁড়াল, মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। সঙ্গীসাথী ছাড়া বসে থাকা সত্যি অস্বোয়াস্তিকর।

মিসেস রুদ্র ওদ্ধকে সবিতাদি বেশ কিছু সময় হলো ঘরে ঢুকেছেন। এখন শোবার ঘরে নয়তো খানা কামরায়। ছোট ছেলেটি অবশ্য চুলে চুলে পড়েই চলেছে ইংরেজীর কোন এক পাঠ। ইতস্তত: করে ওকে জিজ্ঞেস করি,—"মা কোথায় যে এত?"

—"জানিনা। যান্ না ভেতরে—।"

পর্দা সরিয়ে অন্দরে ঢুকি। খানাকামরা বন্ধ। এবার ডানদিকে ফিরি। এই সবিতাদির নিরাপদ বিশ্রামকক্ষ, তথা সঙ্গীত আড্ডাস্থান। অর্থাৎ শোবার ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ সবিতাদির রাজ্যে। বর্ষার দুরন্তপনাকে মনে মনে চোখ রাঙিয়ে একবার কেশে উঠি।

—"কে?"

—"আমি নন্দিনী।"

—"এই তাখো কাণ্ড। তোমায় যে খাওয়া হয়নি, এ খেয়াল করাটাতো আমার উচিত ছিল। এখন কি করছে? মেয়েটো ছেলেটার কি বুদ্ধিশুদ্ধি! সে তো একবার এসে বলতে পারতো—।"

—"আসবো কি ভেতরে—?"

—"একশোবার, একশোবার। তোমার জন্য আবার নিয়ম নিষেধ কি? হট্‌হট্ করে এ ও চোকে আমার ভালো লাগে না। তোমার দাদাটিকে তো চেন। অতো ভাল মানুষ নিয়ে তাই কোলকাতায় চলে না! তিনি নামে রুদ্র, আর আমাকে কাজে রুদ্র হতে হয়েছে বুঝলে?"

হো হো করে হেসে পড়েন সবিতাদি। সারা চোখ মুখ দিয়ে অনাবিল সরলতা যেন ঝরে পড়ছে। এ সবিতাদিকে কেন যে বান্ধবী কৃষ্ণা 'বেজায় ঝগড়াটে' বলে ভেবে পাই না। গান শিখতে এসে কতবার নাকি তাকে শুনতে হয়েছে,—"বাড়ীতে এত বেশী গানের আসর হলে ছেলেকে নিয়ে অন্য বাড়ীতে উঠে যেতে হবে, নয়তো কোন হস্টেলে যেতে হবে। দিনরাত 'হা হা আর আহা আহা' শুনে শুনে তো হয়রাণ। গানের ইস্কুলে যেতে পারেন না?"—ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সবিতাদি পণ্ডিতাদী, কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। কিন্তু একবার যদি তাঁর অন্তরঙ্গ হওয়া গেছে তো তিনি সুন্দর মানুষ আমি তো দেখা না করে একবারও ফিরে যাই না কোলকাতা থেকে!

—"কি খাবে বল",—খাটের উপর পা তুলে আরাম করে বসতে আদেশ দিয়ে সবিতাদি জিজ্ঞেস করেন।

—"কিছু না, বৃষ্টি থামলেই তো ফিরে যাচ্ছি।"

—"তুমও যেমন। কোলকাতার বৃষ্টি কি আর থামতে বললে থামে? লোকে বলে না? হুঁ কোলকাতার বৃষ্টি আর কোলকাতার বৃষ্টি-দুইই কোন বাবা নিষেধ বাগাইয়ের ধার ধারে না—।" বলে সবিতাদি হাসেন।

জোথায় যেন ঝড় কড় শব্দে বাজ পড়লো। পর্দা তুলে মন অন্ধকারে একবার বাইরে তাকালেন। সবিতাদির স্বামী তখনো ফেরেন নি। বলি,—"বর্ষা এত চমৎকার! কিন্তু কোলকাতায় বলে বর্ষার সে শুচি শুভ্র রূপ দেখা যায় না।"

—"শুচি শুভ্র রূপের দরকার কি? কোলকাতার কোন জিনিষই যখন শুচি শুভ্র নয়, বর্ষা বেচারাই বা দোষ কি?"

—"হঠাৎ কোলকাতার উপর খেপলেন যে বড়?"

—"যা দেখছি ভাই! মন ত্রাহি ত্রাহি করছে। তোমরা মফঃস্বলের লোক তা বুঝবে কেন?"

—"পারি সবিতাদি, পারি। কিছু কিছু জিনিস চোখে পড়ছে। আজকাল বড় বেশী নজরে আসছে। বরদাস্ত করতে কষ্ট হয়। জানিনা আপনার কি মত,—একটা জিনিস এত দুর্লভ হচ্ছে।.....বলুন তো সবিতাদি, শালীনতা বা রুচি বলে একটা জিনিস উবে গেল কি কোলকাতা থেকে? যে দিকেই তাকাই,—হাটে, বাজারে দোকানে, পথে, ছবিঘরে, ট্রামে, বাসে—কেমন যেন এক অহেতুক দেহলিপ্সা চোখে পড়ছে। মেয়েরা যে কোথায় ছুটে চলেছে ঠিক করে কূল পাই না। যে সব আদর্শবাদী বন্ধুদের একদিন কাছে পেয়েছিলাম তাদের সঙ্গে কথাবার্তাতেও আনন্দ পাই না। বেশীর ভাগের গায়েই চরম ভোগের বিশ্রিরি গন্ধ। দেশ, সমাজ, শিক্ষা,—সব কিছুই পায়ে মাড়িয়ে কোলকাতার তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর মেয়েরা যেন শুধু পিঠকাটা পেটকাটা জামার প্রদর্শনী দিয়েই যাবে। আচ্ছা, দেশ যদি এত দরিদ্র, তবে এ সব পরিচ্ছদের প্রদর্শনী কি করে করছে মেয়েরা? এত অর্থ কি করে আসে?"

অদ্ভুত জোরে হেসে ওঠেন সবিতাদি।—"ভাইতো বলি, ভাবছো অনেক কিছুই দেখেছো। কিন্তু ভাইরে, দেখনি অনেক কিছুই। তাই অবাক হয়ে যাও। সব ব্যবসা—সব ব্যবসা।"

সবিতাদির ইঙ্গিতে কেমন যেন বিশ্রী এক আভাস। মন সঙ্কুচিত হলো। কথা ফেরাতে চাই। সবিতাদি ঠিক সূত্রটিই আবার ধরিয়ে এনে বললেন,—"কোলকাতায় হরেক রকম ব্যবসা। কতোরকম জানতে চাও? এ্যারিষ্টোক্রেসীর ব্যবসা, অফিসের ব্যবসা, বেতার ব্যবসা, সিনেমার ব্যবসা, স্বামী ব্যবসা;—এক কথায় নারী দেহের ব্যবসা।"

শীতকে উষ্ণ। সবিতাদি সত্যই কি মানুষের ভালো দিক দেখতে পাবেন না?—"ছিঃ সবিতাদি—।"

—"ছিঃ করবার কি আছে শুনি? কিমান তুমি যে এসব কথা বিশ্বাস করতে চাইবে? কোলকাতায় থাকা কেন, শুধু মাত্র আমার জীবনে যা ঘটেছে যা যে অভিজ্ঞতা হয়েছে শুনলে চমকে উঠবে। অথচ আমি ভূত ও ভবিষ্যতও নই, একান্তভাবে বর্তমান। অর্থাৎ ঘটনাগুলো খাঁটি সত্যি।"

বুঝলাম প্রতিবাদ করা নিরর্থক।

নড়ে চড়ে বসেন সবিতাদি। বাইরের প্রবল ঝড় যেন তাকে মুখর করেছে।

—"বিয়ের পর স্বামী বললেন আধুনিক হবার পাঠ নিতে হবে। স্বামী গানের ভালিমদার—বহু মেয়ে মহিলা ছাত্রী তথা শিষ্যা তাঁর। তাঁদেরই মধ্য থেকে বাছাই করা কয়েকজনের হাতে সঁপে দিলেন গেঁয়ো আমাকে। ভাবলাম সত্যই তো স্বামী ভাবছেন আধুনিকা নই,—অন্যদের তুলনায় অতি সাধারণ আমি। এক মহিলা

আসতে সুরু করলেন যখন তখন। আমাকে আধুনিকা করার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। এখানে ওখানে সেখানে—কোথায় না নিয়ে যাচ্ছেন! সত্যি বলতে কি ভুলে যেতে সুরু করলাম বাড়ী ঘর··· স্বামী! একদিন দুপুরবেলা মহিলা এলেন চৌরঙ্গী অঞ্চলের কোন্ এক ক্লাবে নিয়ে যাবেন পার্টিতে। গিয়ে যা দেখলাম হলওঁর হ'বার প্রথম পাঠ সুরু হয়ে গেল। কিছুতেই পারিনা ওদের সঙ্গেও সব বেয়াদাপনায় যোগদিতে। দু'চারজন যাঁরা ঈঙ্গিতে ডেকে এলো আমার কাছে। আর যাবে কোথায়? রক্ত মাথায় চড়ে গেল। বুঝলাম আধুনিক হতে গিয়ে আমার সর্বনাশ হবার পথ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে! বললাম চুলোয় যাক্ আধুনিকারা। গুটিগুটি করে বাড়ী ফিরে আসি। দেখি স্বামী বসে আছেন আরাম কেদারায়। একদল মেয়ে চারদিকে কিল্‌বিল্ করছে। গানের আধুনিক আসর তাই।। সোজাসুজি সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম,—"খবরদার আমাকে আর আধুনিক হতে পাঠিয়েছ তো কেলেঙ্কারী করে ছাড়বো। আমার ঘর আলাদার ব্যবস্থা পাকা করছো না?"···তখন আমার এত জন্মায়নি। এতগুলো মেয়ের সামনে স্বামী আর বাক্যটি ব্যয় করলেন না। সেই থেকে সাবধানে হয়ে গেলাম।·· সেই মহিলা সব খবর শুনলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তেড়েফেড়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। হেড্‌মিষ্ট্রেস্ যেমন ছোট মেয়েকে পাঁচুনি দিয়ে শাসেতা করেন, ঠিক যেন তাই। বললেন তিনি,—জান? তোমার স্বামী বাইরে কি করে বেড়ান? তিনি যদি করতে পারেন তুমি কেন পারবে না? ইকোয়েল রাইট্‌স্। আজকের সোসাইটিতে তোমার মত ঘরমুখো কুনো মেয়ের কোন জায়গা নেই।

—চলো বেড়াতে যাই।' আমি সেই যে 'না' বলে খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালাম, কিছুতেই মহিলা 'হাঁ' করাতে পারলেন না। বললাম তোমাদের আধুনিক উচ্চ সোসাইটি মাথায় থাক। পার্টি, ক্লাব—সব সাধই মিটেছে। এখন দয়া করে আমার ঘরের কোণে শান্তিতে থাকতে দাও। ···যাক্। সে মহিলাকে বিদায় দিয়ে বাইরে যাবার এবং আধুনিক যাবতীয় রাস্তা বন্ধ করলাম। স্বামী মহাশয় সুখ হলেন! কিন্তু আমিও তখন প্রায় বাঈজী হয়ে উঠেছি। তাই আমৃতা আমৃতা করে খেয়ে গেলেন। আমিও মুক্তি পেলাম অযাচিত বন্ধু-বান্ধবীদের কবল থেকে।—

একদিন রেডিওতে প্রোগ্রাম পড়ল ওঁর। আমাকেও টেনে নিয়ে গেল। গানেরেখে কি একটা কাজ ছিল, সেব করে একসঙ্গেই ফিরবো—এই ইচ্ছে। বসলাম চুপচাপ ওয়েটিং রুমে। এক মহিলা, বিনিই কর্মী, দু' একবার দেখলেন কোণায় বসা আমাকে। ভাবলেন নিশ্চয়ই কোন অবুঝ কেউ হবে। অতএব আমাকে পরোয়া না করলেও চলবে। আমারই সামনে দাঁড়িয়ে যে ভাবে ভ্যাবলাদো সুরু করলেন কি বলবো। আপাদমস্তক জ্বলে গেল। আরো মজা —এক একবার বেহায়াপনা করেন, আবার আমার দিকে তাকান। যেন আমাকে ঠাট্টা করছেন। এ ভাবে যত রকম আধুনিকতা হতে পারে সবই দেখালেন। ঠিক সে সময় স্বামী এসে ঢুকলেন। দু' চারকথা বলে ফিরলেন ঐ মহিলার দিকে। আমি ততক্ষণে কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছি। আমার স্বামীর সঙ্গে ওসব বেয়াদবী করেন তো, মেরে দেবো চটপট দু'থাপ্পর দু'গালে। শেষে যা হবে হোক, অসভ্যতার জবাব না দিয়ে ফিরবো না। তারপর আদালত হোক, বিচার হোক। উঠে দাঁড়িয়ে তৈরী হয়ে আছি। মহিলা তাকালেন একবার আমার দিকে, তারপর কি ভাবলেন কে জানে। দু চার কথা ওঁর সঙ্গে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভগবানকে ধন্যবাদ, সুস্থ মস্তিষ্কে ফিরে আসতে পেরেছিলাম।"

—সত্যি? দিদিভাই, আমিও জানি, রেডিও সিনেমা

এবং আসবার যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা অমন নকলিয়ানা ভাব পায় কোথা হতে? কথা বলবার সরল সহজ অন্দাসে পর্যন্ত বদলে ফেলে। ওদের দেখাদেখিই ঘুম করবার উপায় নেই কোন্ ঘরের থেকে আসছে। এদের দেখে নীতিবোধ জন্ম পাই! এরা তো সব ব্যাধির ও নিয়মবাধির অতীত মেয়ে। মাত্র তাড়াতাড়ি রুচির এমন বিকার কি করে স্বীকার করে নেব! আমাদের সাধারণ শ্রেণীর ঘরে থেকে সুরু করে মফঃস্বলের ছাত্রীদের পর্যন্ত বিকৃত রুচি করছে এ সব দৃষ্টান্ত। ন' দশ বছরের স্কুলের মেয়েরাও বা হয়ে উঠেছে,—সারা দেশটাই যেন সিনেমা-মার্কা হয়ে যাবে। অন্তরের কেমন লাগে জানিনা, আমার তো মনে হয় আইন করে ছোটদের মধ্যে এসব বিকার আসা বন্ধ করা দরকার। পথের ধারে ধারে যে সব পোষ্টার ঝুলিয়ে রেখে সিনেমা কোম্পানীর লোক, তার চেয়ে মনে হয় ওরা স্কুলের লোকদের মত আবার বারণ পরাও অনেক শালীন ও সুন্দর ছিল। সভ্যতার তথা আধুনিকতার নাম নিয়ে কোলকাতা নগরীতে যা হচ্ছে মফঃস্বলের মেয়েরা তারই অনুকরণ করে বলে আর একদলের ব্যবসা এ জগতে থেকে উঠেছে। কিন্তু অন্তর থেকে কেমন এক নিরাশা ও ভয় জাগে সমাজের নীতিবোধ ও রুচি দেখে। চরিত্রের বলিষ্ঠতা না হলে সমাজ-সুন্দর হবে কি করে? স্বাধীনতা পাবার আগে এমন রুচি-বিকার ও স্বেচ্ছাচার তো ছিলনা—। স্বাধীনতা—"

—"আরে ভাই স্বাধীনতা যার যা। তোমার আমার গায়ের আমরে এমন কেউ কেউ আছেন যাদের দেখলে আমার ঢিল ছুঁড়তে ইচ্ছে হয়। এক তার (?) মহিলা আছেন। ছিমের ছেলে পুলে, স্বামী সব আছে। কিন্তু তিনি বেড়ান সকাল থেকে রাত পর্যন্ত—যেখানে সেখানে দেখবে ওকে। আরও কত যে উদাহরণ আছে। আর একদলের কথা জানো? এরা ব্যবসা করেন স্বামীকে বিদেশে রেখে।"

—"সবিতাদি!!"

—"চমকাচ্ছো কেন? হাওয়ায় উড়বে কেন? আমি নিজের চোখে না দেখে কি আর শুনু শুনু বলছি! এসব ঘটনা তো আকছারই হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে সিনেমা তারকাদের অথবা উচুতলার সোসাইটি মহিলাদের মধ্যে প্রায়ই দেখবে তাঁরা সিনেমা অমুক আর সিনেমা তমুক। অথচ স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ও, ও, তাকে নিয়ে দিব্যি ঘুর ঘুর করছে। বর্তমান সমাজ কোথায় পড়ে আছে গ্রামবাসের মেয়ে, তুমি কল্পনা করবে কেমন করে? আমার যদি অন্য আয়ের পথ থাকতো তোমার দাদাকে আমি হিড়হিড় করে টেনে বে'র করে নিয়ে যেতাম যেখানে এসব মুক্ত হাওয়া যেতো না!"

"কেন এমনটি হচ্ছে? মানুষের হৃদয় বা নীতিবোধ কি একেবারে চুলোয় গেছে?"

—"বলছি আমি। চুলোয় গেছে। পড়ে আছে মুঠো খানেক ছাই। সাধে কি সোসাইটির মহিলা হ'বার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি? এইতো আমারই উপর তলার এক মহিলা। শেষ পর্যন্ত আমিই তাকে এ পাড়া ছাড়তে বাধ্য করি। ওর আমার ছোট ছেলে রয়েছে, সে কি সাধারণ দুশ্চিন্তা। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। যখন তখন গাড়ী আসে, যখন তখন মহিলা বেরিয়ে যান। স্বামী বেচারী সারাদিন অফিসে থাকে, কিছুই জানতে পারেনা। কোন এক অফিসের সাধারণ কেরানী ভদ্রলোক। স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াবার অবসরই পেতে দেখিনা। মহিলা বলেন,—'ওঁর বন্ধু।' যিনিই আসুন না কেন 'ওঁর বন্ধু।'—ভোর পাঁচটায় আসেন 'ওঁর বন্ধু,'—আর দুপুরে আসেন 'ওঁর বন্ধু।' আজকে বলে 'উহুন্ দিন' কাল বলে 'একটু বি দেখেন' পরশু বলে 'পানের বাটা আছে'—এমনি চলতে থাকে 'ওঁর বন্ধু'দের আপ্যায়ন ব্যবস্থা। একদিন লক্ষ্য করি রাত ন'টায় চুল আঁচড়ানো হলো, তারপর তা নিয়ে দাঁড়ালো।

ঘুক হোল ঠোঁটে মুখে রং, চোখে সুর্মার বাহার। যেন যাবী 'ফ্রিউ পেট্রা', সাজতে বসেছেন ! দুদিন আগেও ছেঁড়া কাপড়ের মধ্য দিয়ে শরীর দেখা গেছে। একদিন মহিলার স্বামী টের পেয়ে বললে এসব বন্ধ করতে হবে ! —আর যায় কোথায়। কোন যুগ থেকে কে জানে ভীমমূর্তির মত শাশুড়ী এসে হাজির। তারপর পাড়া কাঁপিয়ে বাক্যবাণ ছুঁড়তে সুরু করলে বেচারাকে ধরে। তদুপরি লোক না পেলে পাড়া ভর্তি ভাড়াটেদের কান কাটিয়ে ওসব কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না। শাশুড়ীর কথাতেই সকলে জেনে গেলাম,—কেরানী স্বামী স্ত্রীর বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে পারছেন না। সামর্থ্য নেই। তাই শাশুড়ী আনিয়ে দিলেন কেরানী ভদ্রলোককে যে তাঁর মেয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। যে-আশায় মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোন আশাই পূর্ণ হয়নি। পূর্ণ হ'বার আশাও নেই। অতএব মেয়ের কোন কাজে বাধা দিতে গেলে বেগেমেগারী কাণ্ড বাধিয়ে তবে ছাড়বেন। কি বলবো নন্দিনী ! শুনে অপমানে ভদ্রলোক পাগলের মত হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করলেন। পোড়াকপাল। কোথায় মুঁটি ধরে বের করে দেবে অমন শাশুড়ী আর স্ত্রীকে, তা না, এত গুলো লোকের মধ্যে নিজের অপমানে হাউ মাউ করে নাটুকে আবহাওয়াকে আরো ঘনিয়ে তুললে !—"

—"শেষ পর্যন্ত কার জিত রইলো ?"

—"কার আবার ? ঐ শাশুড়ীর। সে মহিলাই শেষ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে নিজ মেয়ের। রীতিমতো ব্যবস্থা করলে আরও দুই মেয়েকেও এনে জোটালে। কেরানী বেচারা হজম করতে লাগলো সে বিষ। কোলকাতায় যার যা ইচ্ছে তাতে বাধা দেবার 'রাইট' কারো নেই কিনা ! শেষটায় আমরা সকলে মিলে ওদের তাড়ালাম এ পাড়া থেকে। সেদিন বেদি বাজারে এসেছে। কি কিনতে কে জানে। যেন যজ্ঞে জিনিষের তালিকা। তালিকা না তালিকা রাক্ষসী। লোকজন জিনিস কিনবে, না ঐ মহলের দেখবে ?···এসব মেয়েদের গলায় আজ মণিও জোটে না। কালচার। সোজা কথায় এ হচ্ছে ভদ্রতার মুখোস এঁটে অসুক মুক্তি !! বুঝলে হে ? তোমার ঐ ছান আর তান ক্লাব থেকে সুরু করে আধুনিক-পল্লী যেখানেই যাবে দেখবে ঐ মহলের ব্যবসা। আজব নগরী কোলকাতার কথা আর কত শুনতে চাও···?"

মনটা কেমন যেন অযোগাস্তিতে ভরে উঠল। চোরা অন্ধ গলি ঘেঁষে ভালো রাস্তা তৈরী হচ্ছে বাইরে, ভেতরে মানুষ গুণ্ডারই মত নখদন্ত আড়ালে রেখে আরও চোরা এবং অন্ধ-গলির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'কলিকাতা চলিয়াছে'—তান্ত্রিক সাধনার ইন্ধন আজ সমাজের তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত নারীরা। একদল ছুটেছে পেটের ক্ষুধায়, আর এক দল নেশার নেশায়। শরীর গুল্ গুল্ করে উঠলো। ঐ ফেলাক্ত ছবির কথা ভেবে।

বৃষ্টি তখনো থামেনি। আকাশ ঘন কালো। চট্ করে ছাতা খানা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কবিতাদি-তখনও পিছু ডাকছেন। আর কবিতাদি ! ততক্ষণে আমি ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে এসেছি !

হে বিচারিণী কলিকাতা ! বহু নারীদেরও তুমি কি সাজে সাজিয়েছ ? আর কি তাদের সংযোজন করা চলে বাড়িয়ে ? দেখী বলা তা উপহাস ! "মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে—" কবি এদের দেখে কোনদিন তো বলতে পারবেন না ! নিয়ন লাইটের মহলের মত কোলকাতার নারীকুলও (ব্যতিক্রম বাদে) আবরণে আকর্ষণে ছলনাময়ী !

বীভৎস

মীরা সান্যাল

সুন্দর শিশির কণার মত
আলতো বলা ভালবাসার কথা
মৃদু আলোয় দেওয়ালে ছায়া ফেলে' ফেলে'।
আর কতোই না ছলছুতো খোঁজা—
একবার যাতে দেখা হয়।
চোখের পাতায় নামে ঘুমঘুম আবেশের ঢেউ
দু' চার কথার পরে নেমে যাওয়া
না বলা কথার সাগরে।
বলা-না-বলায় মেশা অনুভব
বোঝানো যায় না সবটা, একথা ঠিক।
বোবা এ হৃদয় দেহের তীরে তীরে
প্রকাশের ভাষা খোঁজে—
আর দেহের বিবশ ক্লান্তির দেওয়ালে
মাথা ঠুকে ঠুকে ভোঁতা হয়ে যায়
ভালবাসার বেদনার ফলা।
এই তো মানুষের প্রেম এই অবক্ষয়
তবুও ভুলেছি আমি ভোলাই তোমায়।

MODERN DECORATORS
FOR
PANDALS • ARTISTIC DECORATION & EVERYTHING ON HIRE
65A, W.C. BANERJEE STREET • CAL-6 • PHONE • 55-2549

হাল্কা ফিল্ড

: রচনা

কুমারলাল দাশগুপ্ত

চাবীটা বন্ধ করে ঘরে ঢুকলো অমল। পঞ্চানন একখানা ছোট আয়না সামনে ধরিয়ে মুখভঙ্গী করে দাড়ি কামাচ্ছিল, একটু ঘাড় বাঁকিয়ে বল্ল "মক্-সেস্‌ফুল?" চৌকির উপর বসে পড়ে অমল বল্ল "হ্যাঁ—দশ টাকা ভাড়া, এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে এসেছি।" পঞ্চানন একটা গাল কামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্ল "ঘরখানা কেমন? অমল বল্ল "মন্দ নয়, দুটো সিট ভালই হবে। উপ্টোডাঙ্গায় এর চেয়ে ভাল ঘর দশ টাকায় পাওয়া যাবে না। বাড়ীওলা রমেশবাবু বেশ লোক, এক সময়ে অবস্থা ভাল ছিল, বল্লেন "ষ্টক ব্রোকার" কাপড়ের দোকানে খাটা লিখি বলাই সত্তরটি টাকা মাইনে পাই, তাতে তো আর সংসার চলে না, তাই বাইরের ঘরখানা ভাড়া দিতে বোলো।" পঞ্চানন অপর গালে ক্ষুর বসিয়ে বল্ল "ওয়ানডারফুল।"

অমল রায় আর পঞ্চানন মিত্র দুই বন্ধু, অমল স্কুলমাষ্টার, পঞ্চানন মোটর মিস্ত্রী। যে ঘরটা ভাড়া নিয়ে তারাদুজনে একত্রিত বাস করছিল বাড়ীওলা সে ঘরটা ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ দিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অমল ওইমাত্র আর একটা ঘর ঠিক করে এল। দাড়ি কামান শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রকম রকম মুখভঙ্গী করতে করতে পঞ্চানন বল্ল "কাল রোববার আছে, কালই হেটে পড়ি—কি বলিস্?" ক্লান্তভাবে অমল বল্ল "হুঁ"।

পরদিন সকালবেলা একখানা রিকসাতে বাক্স বিছানা, বালতি তোলা উনুন, কলাই করা থালাবাসন ইত্যাদি বোঝাই করে দুইবন্ধু নতুন আস্তানায় এসে ঢুকলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হৈ হল্লাকরে পঞ্চানন ঘর গুছিয়ে ফেল্ল। লম্বা শুকনো চেহারা হলে কি হয়, হাতগুলো মোটা, গায়ে শক্তি রাখে পঞ্চানন। ফুটবল খেলায় একবছরের মধ্যেই সি-টিম থেকে একেবারে এ-টিমে তরফপ্রোমোশন পেলেও ক্লাস সেভেন থেকে তিনবছরেও যখন ক্লাস এইটে উঠতে পারলোনা তখন 'ফুটোস' বলে স্কুল ছেড়ে দিয়ে মোটর মেরামতের কাজ শিখতে লেগে গেল। একই সঙ্গে পড়তো অমল, বি, এ পর্যন্ত এক মৌড়ে পৌঁছে গিয়ে থামতে হোলে তাকে, পয়সার অভাবে এম, এ পড়া হোলোনা। মন্ত করলো মাষ্টারী।

পঞ্চানন যতক্ষণ ঘর গোছাচ্ছিল অমল ততক্ষণ ছোট জানলাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চারিদিকটা দেখে নিচ্ছিল। সরু পথটার একপাশে একটা শুকনো পুকুর, পুকুর না বলে ডোবা বলাই ভাল, তার ওপারে একফালি মাঠ, গোটা কয়েক আম কাঁঠাল আর নারকোল গাছ। হঠাৎ পঞ্চাননের গর্জনে আর ধ্যান ভাঙলো—কাপড়ের ফল্ড পঞ্চানন চিৎকার করছে "চৌক ধরিয়ে চা কর্ ফেটে ফেটে হয়রান হয়ে গেলাম—প্রাক্টিক্যাল গোড়া পড়ে দেখি।" অমল তাড়াতাড়ি চৌক ধরিয়ে চা বানাতে বসলো।

নতুন আস্তানায় তাদের জীবনযাত্রা সুরু হোলো। ভোর পাঁচটাতে একপেয়ালা চা আর একটুকরো রুটি খেয়ে কারখানায় যায় পঞ্চানন, দুপুরবেলা ফেরে। ন'টাতে স্কুলে যায় অমল, সকালের রান্নার ভার তার উপর। ভোরে

উঠে তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে সে বাড়ীওয়ালার টিউবওয়েল থেকে ব্যাং টিপ্‌করে জল নিয়ে আসে—রান্নার কাজে মন দেয়। এক একদিন জল আনতে গিয়ে দেখে রমেশবাবুর মেয়ে লাবণ্য বা লাবি বড়শিতে জল তুলছে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে একপাশে দাঁড়ায় অমল। এক একদিন আবার সে জলতুলছে এমন সময় বড়া নিয়ে এসে দাঁড়াল লাবি, তাকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে অমল, তাড়াতাড়ি বালতিতে জল ভরে দেতে পারলে যেন বাঁচে। সেদিনও জল তুলতে তুলতে হঠাৎ বুকফুলে অমল দেখে কখন যেন নিঃশব্দে লাবি এসে দাঁড়িয়ে আছে। জলের বালতিটি তুলে নিয়ে সে ঘরে চলে আসে—রান্নার কাজে মন দেয়। কিন্তু আজ যেন সে কিছুতেই নিশ্চিন্তমনে কাজ করতে পারে না। লাবির মুখখানা বারে বারে তার মনের মধ্যে ছবির মত ফুটে থাকে। কি সুন্দর মুখখানা। আর, লাবণ্য নামটা ওর ঠিকই দেওয়া হয়েছে—এত লাবণ্যও মানুষের থাকে!

বিকেলবেলা ফুলঝেকে নিয়ে গঙ্গাননের সঙ্গে অমলের প্রায়ই দেখা হয় না—দুপুরে বাড়ী এসে খেয়েদেয়ে একটা ঘুম লাগিয়ে গঙ্গানন চাঙ্গটে নাগাত বেড়াতে চলে যায়, রাত ন'টার আগে ফেরে না। বিকেলটা অমলের কাটে একা, একটু আধটু লেখাপড়া করে, জানালার ধারে বসে বাইরের আম জাম নারকোল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার যেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই খুলে বসে সেদিন তার সময়ের হুঁশ থাকে না।

আজ বিকেলে ফুলঝেকে নিয়ে ঝুঁটা ঝুঁটা করতে করতে কয়েকবার অমল কলতলার দিকে তাকায়, একবার দেখে হালকা সবুজ রংএর শাড়ীপরে লাবি কোথাও যাবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ভিতরে তার যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে যায়, সে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে জানালার ধারে দাঁড়ায়,—সামনের নারকোল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নারকোল গাছ দেখতে পায় না, দেখতে পায় সবুজ রংএর শাড়ীপরা একটি মেয়ে। অনেকক্ষণ সেইখানে সে দাঁড়িয়ে থাকে। কখন একবার আপনার মনে বলে "লাবণ্য।"

পরদিন সকালবেলা অমল তাড়াহুড়ো করে কলতলায় জল আনতে যায় না, অনাবশ্যক এটা ওটা করে বেলা করে, তার পরে হঠাৎ চেনা একটা আওয়াজ পেয়ে চট্‌পট্ বালতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে দেখে লাবি কলতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ লজ্জায় যেন সে মরে যায়, ভাবে কী বিশ্রী কাণ্ডটাই না সে করে বসলো—এখানে কি সেখানে ঠিক করতে পারে না—সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। লাবি আজ আবার লালনীল ডোরাদার শাড়ী পরেছে, দুপুরে একবার অমলের দিকে তাকিয়ে কলসীতে জলভরে ধীরে ধীরে চলে যেন। শূন্য কলতলায় এসে অমল বালতিটা রাখে, টিউবওয়েলের হাতলটা ধরতেই তার বুকের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায়—লাবির হাতের উষ্ণতা যে এখনও সেখানটায় রয়েছে!

সারা সকালটায় অমলের যেন একটা ভাবের ঘোরে কাটে, তার মন পড়ে থাকে কলতলায়। কোনরকমে রান্না খাওয়া সেরে সে ঘুমে যায়। ঘুম থেকে উঠে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখ ও মন আজ আর নারকোল গাছের দিকে নয়, পাশের পথটার দিকে, বিকেলবেলা ছোট ভাইটার হাতধরে লাবি এসে রোজ ঐ পথে দাঁড়ায়। সময় যেন কাটতে চায় না, অস্থির হয়ে ওঠে অমল, একবার ভিতরে গিয়ে বসে, একটু পরেই জানালার ধারে ফিরে আসে আবার। খানিক পরে লাবি তার ভাইএর হাতধরে এসে পথের ধারে দাঁড়ায়। বুকের ভিতরটা চমকে ওঠে অমলের, নির্নিমেষে তাকায়—সেদিক থেকে কি সুন্দর দেখায় লাবিকে। কিন্তু হঠাৎ যদি ফিরে দাঁড়ায় লাবি, কি অসভ্য ভাববে তাকে—তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে দাঁড়ায় অমল।

রাত্রে শুয়ে অমলের ঘুম আসে না, শুনতে পায় গঙ্গাননের নাক ডাকছে, শুনতে পায় পাড়ার যত কুকুর

তাড়াতে—ঘুমিয়ে ঘিমিয়ে সে ভাবে লাবিকে। একটা কথা প্রথমে শুয়ে শুয়ে মনের কোণে উঁকি মারে—নিশ্বাসে আসে বাঁধ, তার পরে ধীরে ধীরে—সাহস পায়, ধীরে ধীরে সে মনে মনেখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়—পাশফিরে শোয় অমল, বালিশে মুখগুঁজে মনে "লাবণ্যকে আমি ভালবাসি।"

সকাল থেকে অমলের যেন এক নতুন জীবন সুরু হয়। এখন থেকে রোজ সকালে এমন একটি সময়ে সে কলতলায় যায় ঠিক যখন ভিজে থেকে কলসী নিয়ে বেরিয়ে আসে লাবি। কোনদিন আগে সে স্নান করে, পাশে দাঁড়িয়ে থাকে লাবি, কোনদিন লাবি জলভরে আগে, সে নিশ্বাসে পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় দিনই দুজনের চোখাচোখি হয়। লাবির চোখে সে যেন কি একটা দেখতে পায়—একটা আলো, একটা রহস্য, একটা প্রশ্ন। কি তা? নিজেই অমল শতরকম ভাবে শতবার তার উত্তর দেয়।

অমল আজকাল কবি হয়ে উঠেছে। অনেকরাতে পঞ্চানন ঘুমিয়ে পড়লে সে একটা মোমবাতি জেলে কবিতার খাতা খুলে বসে। কবিতা সে আগে কখনো লেখেনি, দিন দিয়ে কবিতা না লিখে সে গদ্যকবিতা লেখে। হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা ঢেলে সে লেখে—

ওগো সবুজ রং এর শাড়ী পরা কন্যা
সকাল বেলা তুমি যখন সামনে এসে দাঁড়াও
মনে হয় যেন মেঘ নিয়ে এলো আমার সারা রাতের স্বপ্ন।
ওগো সবুজ রং এর শাড়ী পরা কন্যা
খোঁপা তোমার খুলে গিয়ে পিঠের উপর এলিয়ে পড়ে—
কুঁচকুচে চুল।
ভোরের আলোয় ঝলমলকরে কাণের দুলদুটি।

আমি যে বলতে গিয়েও বলতে পারিনে "ভালবাসি তোমাকে।" আবার যেদিন লাবি আসমানী রং এর শাড়ী পরে সেদিন অমল লেখে—

আজ তুমি পরেছ নীল রং এর শাড়ী
ওর রং চুরি করা আমার মনের আকাশ থেকে।

যেদিন আবার মনের ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা হয় না সেদিন রবীন্দ্রনাথ থেকে চুরি করে লেখে—

মনে গোপনে থাকে প্রেম যায় না লেখা,
কুসুম যেন তাই লেখনায়।
দাঁড়ায়ে থাকি ধারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কী বলে আপনারে দেব তায়।
তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি শরমে।
কবিতা মনোমাঝে প্রেমের কারাগার
ঘুচেছি আপনার মরমে।

অনেকরাতে কবিতার খাতা বন্ধকরে শুয়ে পড়লেও অমলের মনে কাব্যের স্রোত বয়ে চলে। সোনার সুতো দিয়ে কল্পনার জাল বোনে সে—একদিন শোধুলি লগ্নে সানাই বেজে উঠবে, তারপরে যজ্ঞপক্ষে পুরোহিত, লাবণ্যের কোমল হাত যেয়ে উঠবে তার হাতের উপর। আবেগভরে বিছানার উপর উঠে বসে অমল, মনে মনে বলে "হবে, হবে, নিশ্চই হবে। তার যে ভালবাসার দাবি, সে যদি লাবণ্যকে বিয়ে করতে চায় লাবণ্যের বাবা কেন আপত্তি করবেন, সে তো অপাত্র নয়।"

রবিবার দিন পঞ্চাননের ছুটি। সেদিন তার সারা দুপুর উৎসব চলে, কখনো অহীন চৌধুরীকে নকল করে অভিনয় করে, কখনো গান গায়। সে গান আবার সিনেমার প্রেমের গান।—ঘুমিতে যাবেও সে যাবে না, তারি বিরক্ত হয়ে পড়ে

অমল বলে "তোর কি একটুকু আক্কেল নাই পক্কা, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসব কি গান? কি মনে করবে ওরা?" পক্কা জবাব দেয় "এই তো আধুনিক গান যে মুর্খ—বাংলা দেশটা এই গানের সুরে মেতে উঠেছে খবর রাখিস্ সে বুঝি?" পক্কা এবার আর একটু গলা চড়িয়ে গায় সুরে—বহুক্ষণ সে খানদশেক হাত চৌকিবার হাত

ভুল হারিলদার হাত।

এইবার রাগ হয় অমলের, পক্কাননের মুখ চেপে ধরে বলে "থাম-থাম বলছি অবজ্ঞা।"

দিনগুলো উড়ে চলে অমলের, বৈশাখের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আর্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী, তা টের পায় না অমল, সে যে মনের রাজ্যে বাস করে সেখানে বইছে মলয়, গুলবাগিচায় ফুটছে ফুল আর বুলবুল গাইছে। আজ পর্যন্ত লাবণ্যকে সে একটি কথাও বলেনি, বলবার সে প্রয়োজন বোধ করে নি, সে নিশ্চিত জানে হৃদয়ের টান হৃদয়ে পৌঁছেছে। লাবণ্যকে সে যতই দেখে ততই যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। কি আশ্চর্য তার স্বভাব, শান্ত, সমাহিত, মুখের উপর নিখিলের যত টলমল করে ওঠিতা। ক্রমে ক্রমে অমলের কবিতার খাতা প্রেমের কবিতায় ভরে ওঠে।

সেদিন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে পৃথ্বীর তৃষ্ণা মিটে গেছে, পুরবিয়া বাতাসে কাঁপছে নারকোল গাছের সিঁথে পাতা, মাঠের বুকে জল জমে আছে এখানে ওখানে, আকাশের নীল চোখে অশ্রুসৌত কাজলের মত এখনও কিছু লেগে আছে মেঘ। আজ আধা ভুল হচ্ছে, তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকে চলেছে অমল। গুণ গুণ করে গান ধরেছে—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

বাড়ীর সামনের চৌরাস্তায় অনেকখানি জল জমেছে, কোথা থেকে একটা আর্ত মানুষ গভীর বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। অমলের খুশী মন আরো খুশী হয়ে ওঠে, কিন্তু বাড়ীর ঘোর গোড়ায় এসে সে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে যায়। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে সে দেখে কলতলায় কাঁখে কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্য আর ঘরের ভিতর ঘিরেটারী চঙে বুকের উপর হাত রেখে পক্কানন গাইছে—

এক পলকে একটু দেখা,
আরও একটু বেশী হলে ক্ষতি কি?
যদি কাটেই প্রহর পাশে বসে
মনের দুটো কথা বল, ক্ষতি কি?
মিষ্টি হাসির ছুটুমিতে
ভালোই লাগে সাড়া দিতে
ঘরে ফুরু ভরিয়ে নিয়ে
দিনগুলি সব যাক না চলে, ক্ষতি কি?

অমলের আবির্ভাবে এই অঙ্কের শেষ না হতেই হঠাৎ যবনিকা পড়ে যায়। লাবি দ্রুত প্রস্থান করে, পক্কানন গান থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

কোনরকমে টলতে টলতে অমল এসে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে। অপরিসীম ব্যথায় মুখখানা তার বিকৃত হয়ে যায়। পক্কানন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে "ব্যাপার কি আজ এমন সময়ে স্কুলথেকে চলে এলি?" চোখমুখে কৌতুক অমল বলে "শরীরটা ভাল নেই।" পক্কানন হাসতে হাসতে বলে "তুই বড্ড বেরসিক, অসময়ে এসে পড়ে রসভঙ্গ করে দিলি।" একটুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে হাতদুটো সুটো করে ধীরে ধীরে উঠে বসে অমল, বিকৃত কণ্ঠে বলে "রসভঙ্গ করলুম-বলছাইস, ঐ কচিমেয়েটার মুখে রসিকতা করা চলছিল—তোর না বিয়ে হয়েছে একটি ছেলে পর্যন্ত হয়েছে। শরীরটা থর থর করে কাঁপতে থাকে অমলের। পক্কাননের হাসি আরও বিস্তীর্ণ হয়—তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে হাতনেড়ে বলে "নে, নে, বক্তৃতা ঝাড়িসনে। কারখানার লোহা পেটা

জীবন, একটু আধটু রসিকতা না করলে বাঁচবো কেন? দেখনি তো, আমি কেমন তুড়িমেরে ছুঁড়ীগুলোকে পটাতে পারি।" আর কোন কথা কয় না অমল, নিঃশব্দে আবার শুয়ে পড়ে।

রাত্রে পঞ্চানন খেতে ডাকলে অমল বলে "আমার শরীর ভাল নেই—খাব না। সকালে আমি ক' দিনের জন্যে বাড়ী চলে যাব, ছুটি নিয়ে এসেছি।" পঞ্চানন দরদের সঙ্গে বলে "তাই যা।"

পঞ্চানন ঘুমিয়ে পড়লে অমল নিঃশব্দে উঠে কবিতার খাতাখানা বার করে, সেখানা ছুঁতেও আজ তার ইচ্ছে করে না। উনুনের নিবন্ত আগুনে খাতাখানা ছিঁড়ে গুড়িয়ে ফেলে।

পরদিন ভোরবেলা বিছানা আর বিছানা চাপিয়ে অমল ষ্টেশনের দিকে রওনা হয়। সকালের কাঁচা রোদ মাঠের উপর, নারকেল গাছের পাতার উপর ঝলমল করতে থাকে, আমগাছের ডালে একটা দোয়েল শিশ দেয় অমল কিছু দেখতেও পায় না—শুনতে ও পায় না।

অনেক কৃতী ছাত্র

মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিয়া সুস্থ-মনে পড়াশুনা করিবার জন্য

বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল

ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা হয়।

BATHGATE & CO., LTD.
17-19. OLD COURT HOUSE ST.
CALCUTTA-1

৪৮৫৩-B

প্রবন্ধ

জীবনমানের বৈষম্য সৃষ্টিতে চলচ্চিত্র

পঙ্কজ দত্ত

দিন কতক আগে "মধুমতী" নামে একখানি ছবি মুক্তি-লাভ করেছে। বিমল রায়ের ছবি, দেখতেই হয়, এবং দেখতেও হলো। কিন্তু দেখার পর বেশ খানিকটা মানসিক কষ্ট নিয়েই ফিরতে হলো। কষ্ট হলো দেখে যে, যে বাক্তি "অঞ্জনগড়" "উদয়ের পথে" ও "দো বিঘা জমীন" এর মত ছবি পরিবেশন করে দীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে একটা গভীর আবেদন রেখে দিতে পেরেছেন তার অধঃপতন দেখে। একটা অবাস্তব লৌকিক কাহিনীই শুধু নয়, প্রায় ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে অবাস্তবের একটা বিরাট দৃষ্টান্ত হাজির করার অপপ্রয়াস ওঁর মতো ব্যক্তিও দেখাতে পেরেছেন বলে। চলচ্চিত্রকে নিরক্ষরের প্রমোদ মাত্র থেকে উদ্ধার করে মানুষের জীবনবোধ পরিস্ফুট উন্মেষের কাজে নিয়োগ করার যুক্তি যার মধ্যে দেখা গিয়েছিল তাঁরই একেবারে বিপরীত পথে নেমে পড়া, এর হেতুই বা কি এবং তার জন্যে দায়ীই বা কে?

একটা খুব চলতি সাফাই এসব ক্ষেত্রে যা দেওয়া হয়ে থাকে তা হচ্ছে অনেক টাকার ব্যাপার, কাজেই প্রথম এবং প্রধান চিন্তা টাকাটা যাতে অন্ততঃ উঠে আসে তার ব্যবস্থা করে যাওয়া। অর্থাৎ এমন সব উপাদানের সমাবেশ করা যাতে সহজেই অধিক মানের জোগান হয়ে যেতে পারে। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে বহু টাকার ঝুঁকি নিয়ে বসেছে কে? এটা অবশ্যই ভাববার দিক। কে এমন সিদ্ধান্তই বা নিয়েছে যে অনেক টাকা খরচ না করে যেন ছবি তোলা না হয়, অথবা এ সিদ্ধান্তই বা কোথাকার আবদারী হলো যে অনেক টাকা খরচ না করলে ছবি তৈরী হবেনা। আসলে চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বক্ষেত্রে দেশ ও সমাজের প্রতি মমত্ববোধহীনতা এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে বিশে মানুষের অনিষ্ট হতে পারে, দেশের আর্থিক সামর্থ্যে অপচয় ঘটে যেতে পারে সে বিষয়ে চেতনা একেবারেই অসাড়।

অর্থের অভাবে মানুষের শিক্ষা অনগ্রসরই থেকে যাচ্ছে, অথচ সেই দেশেরই ছবি দিনের পর দিন ধরে অশিক্ষা ও কুশিক্ষাকে প্রয়োচিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বহর দেখিয়ে আমায় হাঁকিয়ে বসে। যদি দেখা যেতো এই শিল্প মানুষকে দেশের বহু সংখ্যক জ্ঞানী গুণী ও বুদ্ধিমান লোকের প্রতিপালনের ব্যবস্থা হয়েছে, একটা উপায় হয়েছে তাহলে একটু শুধু সান্ত্বনা থাকতো। কিন্তু ছবি যারা তৈরী করে, এবং ছবির যারা পরিচালক বা পৃষ্ঠপোষক, এই দুপক্ষেরই মধ্যে যেটা, মর্মের মিল সেটা হচ্ছে অজ্ঞতা ও কুশিক্ষা। জ্ঞান আর শিক্ষা নেই বলেই মানুষের প্রতি সত্যিকারের কোন টান নেই, ছবির মধ্যে শ্রী নেই, সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধও নেই। এমন মানুষ এরা, যারা দেশকেও চেনেনা, দেশের মানুষকেও চেনেনা। এদের চিন্তার মধ্যে বিমল ছাড়া আর কিছুই ঢোকেনা। এইটেই হচ্ছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডী।

দেশের প্রতি সঙ্কটময় অর্থনৈতিক অবস্থার সামনে উদাসনতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সাধারণ মানুষের, বিশেষভাবে যুবসমাজের, জীবনে বিরাট ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া ভারতীয় চলচ্চিত্র আর আর কোন কাজে আসছে না। ছেলেমেয়েরা

ছবি দেখে বালা রকম আনন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ে সেটা এখনকার অবস্থায় অবাঞ্ছিত এবং গর্হিত। জীবনে আমোদ থাকতে থাকবে না, এমন কথা নয়। দারিদ্র ও দুর্দশার অবস্থার কোন এক ফাঁকে অল্পেও সুখের একটু আস্বাদ পাবার সুযোগ কিছু থাকবে না, সে কথাও নয়। কিন্তু তার মধ্যেও সমতি ও শোভনতার একটা মাত্রা থাকা দরকার। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিবাদ এই নিয়েই।

কাগজ খুলতে প্রথম পাতায় দেখা যেল অসুক রেস্তর লোক আত্মহত্যা করছে, হেলেমেয়ে কিনছে। আবার সেই কাগজেরই ভিতরের পাতায় পূর্ণ বিজ্ঞাপন অমুক ছবি পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকায় তোলা হয়েছে। কেমন লাগে ব্যাপারটা? বিকট দারিদ্র্য আর অশ্লীল বিলাসের সহাবস্থান পথে অভিযানের এমন সমন্বয় আর কোন দেশে সম্ভব হয়?

একজন শিক্ষক বা একজন অধ্যাপককে তার নিতান্ত সেই চাকরের মতো সমতির নিশ্চলতা আনায় করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, ক্ষুধা-নিদ্রিতে দাঁড়াতে হয়—অন্ধ সকল শিক্ষাকে, সকল রীতিবোধকে, পণ্ড করার কাছে যারা নিত্য তাদের ঐশ্বর্য ও বিলাসের খবর আজ সংবাদপত্রের উপজীব্য। দেশের সেরা বৈজ্ঞানিক, সেরা শিক্ষাবীদ, সেরা কবি-সাহিত্যিক-চিত্রকর-ভাস্কর যারা জীবন ধরে যে পরিমাণ উপার্জনের কথা কল্পনাও তাই নিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, সিনেমা-থিয়েটারের এক একজনেই এক কি দুজনই তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ অর্জন করে নেয়। অন্তত আলাউদ্দীন খাঁ কিংবা আরো একদিক পণ্ডিত রবিশঙ্কর কি হীরাবাঈ বরোদেকর বা কেশরীবাঈ জীবনভোর যা না উপার্জন করতে পারল, খাঁটি মেরুদণ্ড কি দেশ ভুবাপাধ্যায় কি নজরুল সংগ্রাম করলা দু'এক বছরেই তার চেয়ে বেশী উপার্জন করে নেন। সাধারণ লোকের মনে এর প্রভাব কি প্রকার পড়বে? গণিতের ব্রহ্মগুপ্তের জনপ্রিয়তা পণ্ডিত নেহরুর চেয়ে বেশী বলে এদেশের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা নেই। একটি ছায়ার দেখা দিয়েছে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ বাজাতে বসতে মেয়েকে হাঁটুগোল তুলে তাকে আসর ত্যাগ করিয়ে সভামঞ্চে সকল, সুকেশ, ভদ্রও মানুষ প্রতিটির প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। তার রাস্তাঘাটে যদি আজ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেন তো কোন দৃষ্টি তার ওপর পড়বে না, কিন্তু উত্তম-কুমারের বা সুচিত্রা সেনের কোনখানে আগমন সম্ভাবনা থাকলেই ভীড়ে ভীড়ে একটা ট্রাফিক সমস্যাই দেখা দেয়। কিছুকাল আগে কলকাতায় এক রেস্তোঁরায় মধুবালার মতো দেখতে একটি মেয়েকে দেখেই সে কী ভীড়! প্রকৃত গুণী ও মনীষীর অনাদর এবং দারিদ্র্যের পাশে পাশে যেখানে রূপের সম্মান ও ঐশ্বর্যের এমন বৈষম্যমূলক অবস্থা পৃথিবীর আর কোন দেশ বড়ো দেশ বলে জানা নেই।

এর ভাল খুঁজতে গেলে যায় আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প নিজেকে গড়ে নিয়েছে আমেরিকার প্যাটার্ন টায় অনুকরণে। কিন্তু আমেরিকার সাধারণ মানুষের যে আর্থিক সমতি, শিক্ষার যে মান তার সঙ্গে এদেশে 'মিলিয়ন' 'মাল্টি মিলিয়ন' ডলার ছবি তোলাটা অসঙ্গত নয়, হয়তো বিশেষ অসঙ্গতি অতি বিদ্রূপ রকমের হয়ে দেখা দেয় আমাদের দেশের লোকের আর্থিক সমতি ও শিক্ষার মানের সামনে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যয়ের ছবি! সমাজের তলায় এমন অসমানদৃষ্টক ছবিটা বছরের পর বছর ধরে চলে আসতে থাকবে অথচ আমরা সোস্যালিজমের জয় ধ্বজা উড়িয়ে যাচ্ছি—এ বড়ো মারাত্মক ধরনের। এখানে চলচ্চিত্র শিল্প অপেক্ষাকৃত কম খরচে বাংলার মতো বিশ্বজনীন ছবি তোলার দিকে চিন্তাকে নিয়োগ করা কথা ভাবে না—কারণ তাদের চিন্তার সে ক্ষমতাই নেই। উঠতে বসে টাকা বেশী খরচ করে ছবি তোলা হবার ফলে চলচ্চিত্রের অর্থের জন্য বেপারীদের কাছে আটকে পড়ে

তাদের সেই দুঃখের জন্য চলচ্চিত্র-শিল্প দুর্দশায় পড়েছে —এ অবস্থায় প্রতিকারের জন্য চিত্রনির্মাতারা প্রধান মন্ত্রীর কাছে দরবার করতে যাওয়ার দুঃসাহস দেখান। ঠাট্টার কথা নয়, চলচ্চিত্রে নাম করেছে (এবং নাম করা মানে পয়সাও) এমন সব অভিনেতা, পরিচালক বা অন্যান্য বিভাগের ব্যক্তি সরকারের নিছিই চিন্তাকে যতোটা টলিয়ে দিতে পারে, সরকারি নির্দেশকে অমান্য করার যতোটা আস্কারা পেয়ে যায়, আর কোন ক্ষেত্রে কেউ তা পায়েও না, পায়ও না। সেন্সারের কতকগুলো নিষেধ-বিধি আছে, কিন্তু চিত্রনির্মাতারা সে সব বিধির কোন খবরই রাখে-না—সে সব বিধি সদাই অমান্য করে চলে এবং ধরা পড়লে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার দোহাই দিয়ে একেবারে প্রাণে না মারার (অর্থাৎ ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেওয়ার) আবেদন জানায় এবং সামান্য সামান্য কাটাকুটি করা মেনে নিয়েই ছবি মুক্তিদান করে অপরাধ থেকে পার পেয়ে যায়।

মস্ত একটা ভুল ধারণা, সম্ভবত অজ্ঞতার জন্যেই, চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সেটা হচ্ছে, ভাল ছবি করতে গেলেই ভাল অর্থাৎ অনেক বেশী টাকা খরচ না করলে সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর সেরা যতো ছবিরই নাম তোলা যাক না কেন, কোনখানিই পয়সা বেশী খরচ করে বেশী ভাল হতে পেরেছে, এ নজির কোন দেশেই পাওয়া যায় না। তাহলেই তো তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। "পথের পাঁচালী," "অপরাজিত," "কাবুলিওয়ালা," "জাগতে রহো" প্রভৃতি ছবি দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের বহু দেশ থেকে সম্মান অর্জন করে এনেছে, কিন্তু বেশী খরচ করে তোলা ছবি বলে অপবাদ দেওয়া যায় না এর কোনটিকেই। দেশের জীবনযাত্রার মান ও সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও ভাল যাতানো ছবি তোলার দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলি হয়ে থাকবে এসব শিল্পকৃতিত্ব। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত শিল্পচিন্তার জৈবকে চাকচিক্য দিয়ে আড়ম্বরের চালোয়া আস্তরণের কথাটাই চিত্রনির্মাতাদের মনে ধরে বেশী করে। আর এটা এমনভাবে চাউর হয়ে গেছে যে দেশের সরকারও এর প্রকোপ থেকে রেহাই পেয়ে নেই। তাই দেখা যায়, বেতারশিল্পী এবং নার্সিস 'পদ্মশ্রী'তে ভূষিতা হন, দেবকী বোসকে 'পদ্মশ্রী'তে সম্মানিত করা হয়, কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সরকারের কথা এমনে কেউ মনে করে না।

সর্ব ব্যাপারেই একটা নিদারুণ অসামঞ্জস্যতা ভারতীয় চলচ্চিত্রের আত্মিক ও নৈতিক মানকে এমন খাদে নামিয়ে রেখেছে যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে কঠিন হওয়ার প্রয়োজন। চলচ্চিত্র খেলো ব্যাপার বলে দেশের নেতৃস্থানীয় ও পথপ্রদর্শনকারীদের কাছে অবহেলিত হয়ে আসছে। যারা রাজনীতিক, যারা সমাজসেবী, দেশের লোকের মঙ্গলের চিন্তায় কাজ করে চলেছেন, তারা এদিকটা নিয়ে ভাবছেন না। কিন্তু তাদের দরকার হয়ে পড়েছে। আন্দোলন করে চলচ্চিত্র একেবারে লোপ করে দেওয়া হলো অবাস্তব চিন্তা। তা হবার নয়। চলচ্চিত্রেরও প্রয়োজন আছে; সে কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু দরকার তাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। এমনভাবে চালানো যাতে দেশের জীবনমানের সঙ্গে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করে না রাখে। অর্থের অনটনের জন্য দেশের বহু উন্নয়ন কাজ যখন আটকে যায়, সে সময়ে চলচ্চিত্রশিল্পকে প্রমোদ-বিতরণের জন্য বছরে প্রায় তিন কোটি টাকা খাটাতে দেওয়া যায় কিনা, সেটা বিচার করা দরকার। সেই সঙ্গে এটাও বিচার করা দরকার, এখন যারা ছবি তুলছেন—সেই সব প্রযোজক যারা সমাজ ও দেশ সম্পর্কে দায়িত্বহীন নগ্ন অশ্লীল বিলাসকে প্রমোদ হলে গণ্য করেন—তাদের চলচ্চিত্রশিল্পে আরো থাকতে দেওয়া সমীচীন হবে কি না।

প্রবন্ধ

সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল

সুনন্দা দাশগুপ্ত

বাংলা কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, উনবিংশ শতকের নবজাগরণান্বিত বাংলাদেশে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার স্মারক রহিয়া গিয়াছে তাঁহাদের রচিত মহাকাব্যে। রঙ্গলালের কাব্যে গিরিক ও ক্লাসিক এই দুইটি প্রবণতাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই ক্রমশঃ দুইটি ধারা বঙ্গসাহিত্যভূমিকে সরস করিয়াছে।

বাংলা কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে লিরিক কবিরূপে রোমান্টিক ভাবাবেগের প্রথম স্পর্শ আনিয়াছেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। নবাবঙ্গের এই রোমান্টিক ভাবধারার প্রথম কবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সে ইতাকৃতে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী দুটিই সুন্দর সুরে গান করিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।"

বাল্মীকি রামায়ণ তাঁহার পরম প্রিয় ছিল। কালিদাস ও ভবভূতিও তাঁহার কবি ছিলেন। "তাঁহার অনেক ছন্দিস্তাই বিশ্লেষণে তিনি এই সব কবির কাব্য হইতে দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।"

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য মধ্যযুগীয় মঙ্গলগান নহে। সারদামঙ্গলে কবির প্রেম সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ কবি শেলী যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "Spirit of Beauty"—সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী। পৃথিবীর সমস্ত খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্যের ছবি ইঁহারই মধ্যে কেন্দ্রীভূত।

দেবীস্তোত্রের "যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেন সংস্থিতা" এই ধারণাটিও কবির মনে বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার সারদা কোন পৌরাণিক দেবী নহেন। কবি এই যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নানা আকারে, নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। কবির চক্ষে এই সারদা সৌন্দর্যরূপে জগতের অন্তরালে বিরাজ করিতেছেন এবং স্নেহ, দয়া ও প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন। বিহারীলালের 'সারদা' নিখিল বিশ্বের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিতা প্রাণময়ী শক্তি।

কবির মনে ইঁহারই সঙ্গে নানা লীলা চলিয়াছে। কবির এই বিচিত্র লীলা কোন পারিবারিক সম্বন্ধে চিরকাল নিহিত নহে। নারীসম্পর্কের সমস্ত মাধুর্যই যেন ইঁহার সহিত সম্পর্কে এক হইয়া গিয়াছে। ইঁহার মধ্যে যে কোন অসামঞ্জস্য দুঃখের ভাবের অবতারণা থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে কবি সচেতন নহেন। সমস্ত সারদামঙ্গল কাব্যে এই সৌন্দর্য ও কল্যাণরূপিনী দেবী সারদারই বর্ণনা ও কবির সহিত তাঁহার বিশুদ্ধ লীলাবৈচিত্র্য ছত্রে ছত্রে নানা বর্ণনায় মাধুর্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

'সারদামঙ্গল' কাব্য পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। প্রথম তিনটি সর্গে সারদার মূর্তি কল্পনা ও কবির সঙ্গে সারদার ভাব

সমুদ্রের বিস্তার এবং পরবর্তী সর্গগুলিতে কবি-প্রাণের বিচিত্র লীলারহস্য অঙ্কিত করা হইয়াছে। কাব্যের আরম্ভে দেবি এবং ও উষার উদয় হয় নাই, সুপ্ত প্রকৃতির পানে কাহার কৌতূহল দৃষ্টি কাব্যারম্ভে রোমান্টিক স্বপ্নাবেশকে ঘনিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

"হয় হয় প্রায় ভোর
তারা তারা ঘুম ঘোর
সুপ্তরত পৃথী উঠি, উষারাণী সবে বলে।
বিরল হিমির জাল
শুভ্র অভ্র লালে লাল
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।"

জগৎ নিশীথে প্রহরগণিয়া চলিয়াছে। সুপ্ত প্রকৃতির শীর্ষে একটি শুকতারা জ্বলিতেছে। এমন সময়ে উষার উদয় হইল।

"হিমাদ্রি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি : ওই পূর্ণ তপোবনে।
বিকচ নলিনে চেয়ে
হাসিছে হৃদয় মেয়ে
উষসী-হৃদয়-উষা কুমারী রতন!" ইহা আমাদের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয়।

উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগতের মানব-প্রকৃতির ও উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি হিমালয়কে বিদীর্ণ করিয়া "কনকায় কান্তিজ্যোতি প্রকাশ পাইল"।

ভাববিহ্বল বাল্মীকি মুনি শ্লোকবিয়োগের আকস্মিক বেদনায় অভিভূত হইয়া প্রথম ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিলেন।

"শ্লোকী প্রিয় সহচরে
যে হ বেরে শোক করে
অন্য পুরী। তার কাতর ক্রন্দনে।
চকে করি দরশন
অঙ্কিম অঙ্কিত মন
করুণ হৃদয় মুনি-বিহ্বলের প্রায়;
সুধা ললাট ভালে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা আসে
আসিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।"

এই "জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী" "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে" কৌতুকে করুণ ক্রন্দনে কিরিয়া চাহিলেন। ইহা সারদার 'করুণ মূর্তি' কবি জিজ্ঞাসা করেন—

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
দুরু দুরু দু-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও?
কমলা চমকে হাসি
ছড়ায় রতন রাশি
অপাঙ্গে ক্রুচক্ষে আহা ফিরে নাহি চাও।"

সারদাদেবীর করুণামূর্তি বর্ণনার পর কবি আবার তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তি বর্ণনা করিয়াছেন—"

"ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে চলচল করে
নীল জলে মনোহর স্বর্ণ নলিনী,
পারপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।"

কবি এই সৌন্দর্যের বন্দনা করিয়া গাহিয়া উঠিলেন —"যেদিকে তোমার যানে, কমলার ধন মানে নাহি অভিলাষী"।

দ্বিতীয় সর্গ হইতে প্রেমিকের ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো উৎসব—দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে

উদিত হইয়া বিচিত্র সুখদুঃখে সতত্যাগে সঙ্গীত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছেন।" বিষাদ, বিরহ, সংশয়ের নানা স্তরের পর কবি অবশেষে হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত মিলনের চিত্রে গ্রন্থের আনন্দময় পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। সারদা হইতেছেন কবিত্বের আদিম উৎস। ইহার নানা সহচরী আছে। সারদার রূপে সমস্ত বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত। কাব্য সরস্বতীর সঙ্গে কবির এই সম্পর্ক বাংলা-সাহিত্যে নূতন।

কবির প্রেমের বিচিত্র লীলা আরম্ভ হইয়াছে বিরহের চিত্র দিয়া। বোধ হয় বিরহের যে অনন্যসাধারণ গভীরতার কালিন্দীকূলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর নিত্যলীলা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই অতলস্পর্শ গভীরতা ও ব্যঞ্জনাময় ভাবকে কবি অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়সর্গের প্রারম্ভেই তিনি ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন—"মানস-মরালী মম কোথা গেল বল না!" কবির হৃদয় একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে—

"কোনো সুখ নাই মনে
সব গেছে তার সনে
• •
তবু কেন প্রাণ টানে। কি করি, কি করি!"

কবির ব্যক্তিপুরুষের নিজস্ব অনুভূতির তীব্রতা ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা কবির প্রেমসম্বন্ধীয় ভাবকে বিচিত্রতায় ও মহনীয়তায় সমৃদ্ধ করিয়াছে।

কবি ও সারদার মাঝে যে বিরহের অতলস্পর্শ অন্ধকারাক্ত সমুদ্র আছে, ইহার কবির উক্তি "Oh while our merges meet again" এর মতো কবিও সে বিরহের অন্তসন্ধানের কথা লিখিয়াছেন—

"চক্রবাক চক্রবাকী দুজনে দুজন।
• • •
কেন মন্দাকিনী তীরে দুজনে দুজন।"

বিরহের তীব্রতা কবির মনে আনিয়াছে এক আকুল আকুতি। প্রকাশের বেদনা তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। বিশ্বরহস্যের মাঝখানে অনন্তরূপময়ী দেবীকেই উদ্দেশ করিয়া কবি বলেন—

"কে আমারে অবিরত
খেপায় খেপায় মতো?"

কবি জগতের সর্বত্র তাঁহার বাসন্তীমায়ীর সন্ধান করেন।—

"বল দেবী মন্দাকিনী!
ভেসে ভেসে একাকিনী
সোনারূপী তরীখানি গিয়েছে কোথায়?"

কবির নিকট সমস্ত জগৎ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। ভক্তি ও প্রেম এ দুয়ের মধ্যে তাঁহার মনোভাব আবর্তিত হইতেছে। কবির প্রেমের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সম্মিলন দেখিতে পাইয়াছেন। কবির কল্পনায় পরিধি-পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করিয়া দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কবি প্রেমের এই চিত্তবিপ্লবকে তুলনা করিয়াছেন ধ্যানতন্ময়তার সঙ্গে। ধ্যানতন্ময়তায় কবির মনে যে বিচিত্র ধ্যানমূর্তি আবির্ভূত হয়, তাহাই বিশ্বের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশা ও নৈরাশ্যের উত্থানপতনে প্রণয়ের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সারদার বিচিত্রতর বিকাশ দেখিয়াছেন কবি। কবি কখনও বা প্রেমের "মাতোয়ারা বেশ" দেখিতে পান কখনও বা দেবীর বিষাদিনী মূর্তিতে প্রাণে বেদনা অনুভব করেন। এই বৈচিত্র্য ইহাই ঘোষণা করে যে, সারদার মাঝেই জগতের যাহা কিছু সৌন্দর্য নিহিত আছে। বিশ্ব-সৌন্দর্যের সার বস্তু কবি তাঁহারই মধ্যে পাইয়াছেন। ইহারই নিকটে যে প্রাণ-লীলার শাশ্বত প্রকাশ, তাহারই চকিত উপলব্ধিতে কবি সারাজীবন ধরিয়া এই কবিকে জ্যোতিকে চিরন্তন করিয়া পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। যে অমৃত জ্যোতিলোককে কবি সারদাতে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে বিশ্বের সমস্ত রস

হইতে তাহাদের প্রাণশক্তির বিচ্ছুরণ। সমস্ত বস্তুর অতিরিক্ত প্রাণের বহিঃস্ফূর্তি। বসন্তের সৌন্দর্যের পট-ভূমিকায় যে প্রাণের লীলা আছে, তাহাকেই কবি বনবালা-রূপে তুলনা করিয়াছেন। ইহা মূলতঃ জীবনশক্তি, প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, ইহার ঠিক বাস্তবরূপ নাই। এই প্রতিবিম্বের অন্তরে প্রেমের নানা ভাব ও লীলা এমন অনায়াসে হয়। ইহার পর বিহারীলাল যে নিছক প্রেমের কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে দার্শনিকতা ও কাব্য এক হইয়া গিয়াছে।

কবি বলিতেছেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের প্রেমের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রাখে না। প্রাণের আনন্দ দিয়া বিচার করিতে গেলে এ সম্বন্ধে সন্দেহের তো কোন অবকাশ থাকেনা। কবি ইহার পর প্রেমের সত্যতা ও বস্তুবিরহিততা বুঝাইবার জন্য কাম ও রতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

"প্রণয় পবিত্র কাম
দুই-স্বর্গ মোক্ষ ধাম।"

জীবনের পরিপ্রেক্ষিতের জন্য কবি প্রেমকে একবার ভুল বলে করিয়াছিলেন। কিন্তু আবার তিনি নিজেই ইহার পরিবর্তন করিয়াছেন। প্রেম ভুল বটে কিন্তু সকল ভুল নয়। এ প্রেম অপরাধমুক্ত নয়—এ জীবনের অমৃতবরদান।

"এ ভুল প্রাণের ভুল
স্বর্গে বিরচিত ভুল
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী।"

মানবের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তরাত্মা এই প্রেমের দুইটে রূপ-ভাবে আবিষ্ট হয়। প্রেমের মধ্যে বৈচিত্র্য হইতেছে মানবের নিকট বিভিন্ন দৃষ্টিতে আবির্ভূতি ও পরিচয় করার জন্য। জীবন যে ভুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত, প্রেমও সেই ভুলের উপরেই অধিষ্ঠিত।

এই প্রেম এত তীব্র মহত্তের সহিত নিমূলভাবে মর্মস্পর্শী। তবু কবির বৈচিত্র্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন—

"কভু বসন্তের করে,
চাঁদে যেন সুধা ঝরে—
কবির মধুর ঘরে অতি প্রধান;
কখন মেঘমালা,
জীবন নিশুতবালা,
শশি-তারে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর।
তীব্র সূর্য হুতাশন
অতি অতি দুনয়ন,
ধরারে বিদরে যোষ, লুকায় মিহির।
ঘোর ঘট্ট অট্টহাসি
জ্বলন্ত পাবকরাশি;
প্রলয় সাগরে যেন উঠিছে তুফান।
কভু আলুথালু বেশে
শ্মশানের প্রান্তদেশে
যোগীবর আছেন বসি বিশ্ব বরনে;
গলায় তরঙ্গমালা
সম্মুখে বহিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে।"

চতুর্থ সর্গে হিমালয় বর্ণনা। হিমালয়ই দেবীর যোগ্য বাসভূমি। হিমালয়বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়া কবির রোমান্টিক আত্মা এখানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও হিমালয়ের বর্ণনা-কৌশলের সরলতা কবিচিত্তকেই পাঠকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ইহার পূর্বে বাংলাকাব্যে প্রকৃতিবর্ণনায় কবি-চিত্তের পরিচয় খুব স্থান অধিকার করে নাই। হিমালয়ের উদার বিশালতা, রহস্য ও বৈচিত্র্য যেন কবিচিত্তেরই আবরণ উন্মোচন করিতেছে।

"কি স্থান অতিশয়।
বিচিত্র শিখর সব
চৌদিকে পাষাণে আছে বেষ্টিয়ে পাঁথায়।

তোমরা কি সারদারে
দেখেছ, এনেছ তারে
সৃষ্টিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ সুন্দর?
হা দেবী, কোথায় তুমি
পূর্ণ গিরি-ফলভূমি!
কোথায় কোথায়-হায়—সারদা—সারদা!—

সারদামঙ্গলের শেষসর্গে বিচিত্রতর মানুষের রহস্যময়তা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে ও এই রহস্যের পটভূমিকায় দেবী সারদার আবির্ভাব ও কবির সহিত তাঁহার মিলন ঘটিয়াছে।

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে,
হে প্রশান্ত গিরিভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে।

দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী
ত্রিভুবন আলো করি,
নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়;
দেখিতে যেটে না সাধ
কি জানি কি আছে সাধ
কি জানি কি আছে ও সুন্দর আননে।

পুন কেন অশ্রুজল
বহ তুমি অবিরল।
চল কমল আহা মুছাও দেবীর।"

দেবের প্রীত সাধিতে কবি গাহিয়া সাধিও বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমের যে স্বর্গীয় শক্তি সারদার মধ্যে নিহিত আমাদের গৃহলক্ষ্মীর মাঝেও নারীরূপে সারদারই সেই প্রকাশ ঘটিয়াছে।

"ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার
ঘুমা কুমা দূরে রাখি
তোর ঘরে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।—
তোমার তো নাই অনিবার,
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোল গে এ বসুমতী যার খুশী তার।"

বিহারীলাল ভাবুক কবি তিনি সর্বদা আত্মভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। কবি বিশ্বের মধ্যে এক বিচিত্র রহস্য-রূপিণীর সন্ধান পাইয়াছেন—একটা ঘন রহস্যের আবরণে বিশ্বের অন্তর্নিহিতা এই দেবীকে অবগুণ্ঠিতা রাখিয়া আপন অন্তরের দীপশিখায় কবি তাঁহার আরতি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অসীম মহিমময়ী করিয়াছেন। কবি এই হৃদয়প্রতিমার সন্ধান পাইয়াছেন বিশ্বভুবনের ভিতর দিয়া অনন্ত আকাশে ও ইঙ্গিতে। এই বিশ্বব্যাপিনী কান্তিময়ী ও রহস্যময়ী ছায়ামূর্তি, যিনি কবির হৃদয়-প্রতিমা, ইনিই দেবী সারদা। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, শুধু 'সারদামঙ্গল' কাব্য নহে, কবির প্রায় সব কাব্যই সারদামঙ্গল। একটি "কায়াহীন বিশ্ববিমোহিনী মায়ার" ন্যায় এই দেবী একদিকে যেমন বহির্বিশ্বে রূপে, রসে, প্রেমে, মাধুর্যে নিজেকে বহু বৈচিত্র্যে প্রকাশিত করিয়াছেন, অন্য-দিকে তেমনি তিনি সৌন্দর্যে, প্রেমে, জ্ঞানে "অন্তরব্যাপিনী" হইয়া যোগময় কবির বিহ্বল মানসে বিরাজমানা।

কবির সারদামঙ্গল পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া "কোন সম্রান্ত সীমন্তিনী," চারিদাস হাবর হতে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন কবিকে উপহার দেন। কবি লিখিয়াছেন—এই আসনের নাম "সাধের আসন"। সাধের আসনে অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষরে বুনিয়া সারদামঙ্গল হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"হে যোগেন্দ্র। যোগাসনে
চুপ্‌চুপ্ ছনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কারেরে খোঁজও?

প্রথমকালে আসনদাত্রী উদ্ভূত শ্লোকের উত্তর চাহেন।.....এই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই...এই ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল 'সাধের আসন।' সাধের আসনে কবি বলিয়াছেন—"কাব্যিকলে সর্বকৃতে বিভাসিত' কবির 'প্রাণের প্রাণ" এই বিচিত্ররূপিনী তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে।

"সবাই সম্মুখে দেখি, তবু তোরে চিনি না।
যখন যা আসে মনে
তাকি সেই সম্বোধনে।
* * *
আপন রহস্য মাঝে আপনি ঘুমিয়া যাও।

কিন্তু 'রহস্যই বিশ্বের প্রাণ' তাই কবি বলিয়াছেন —

'রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না'

বিশ্বসৃষ্টি ভরিয়া কবি এই এক অনন্ত রহস্যলীলার খেলাতেই মগ্নচিত্ত হইয়া সমস্ত জগৎকেই এই অনন্তরহস্যের লীলাবিভূতিরূপে দেখিয়াছেন—

"রহস্যই মনোলোভা
বিশ্বের সৌন্দর্যশোভা
"সকলি কি যেন এক সাধের স্বপন।"

কবির ধ্যানের ধন সর্বজ্ঞা সরস্বতী এই "মানসসরসী মম আনন্দরূপিণী"-ই কবির অন্তরলক্ষ্মী। ইহাকে অবলম্বন করিয়া এবং ইহারই প্রেরণায় কবি সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্যে ইহারই অঙ্গের সাধনার উপস্থিতি দেখিতে পাইয়া তাঁহার ধ্যান করিয়াছেন। ইহাই কবির সাধনা।

'সারদামঙ্গল' কাব্যখানি কবির মনের বিচিত্র প্রকাশ। আপন ভাবতন্ময়তায় কবি সারদার যে বিচিত্র ভাবমূর্তি-খানি চিত্রে চিত্রে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা কবির সুযোগ্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভাকে" যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম, তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম, অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে। সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘ-মালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুরের সৌন্দর্যবর্ণ হইতে একটি অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে। .....সারদামঙ্গলের মধ্যে কবি যাহা গাইতেছেন, তাহা ভাল পাওয়া শুনিলে একটি অপূর্ব সঙ্গীত সুধার মতো অতিরিক্ত হইয়া উঠে। ইহাই বিহারী-লালের সারদামঙ্গলের অন্তরতম পরিচয়।

মুম্বাই না বোম্বে ?

বিভা সরকার

সূর্যাস্তের অস্তরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে অকাশ-সমুদ্র। ছড়িয়ে পড়েছে সে রক্তরাগ তীর ঘিরে। বিরাট এক অনচর সরীসৃপ যেন পিঠে করে বহন করছে এ-সুন্দর নগরী। দূরে দেখা যায় কয়েকটি জেলে ডিঙি— কুটোর মত সমুদ্রের বুকে ভাসছে। মন ভেসে যায় অতীতে যখন এদেশ সাতটি দ্বীপের সমাহার ছিল আর এর অধিবাসীরা ছিলো কোলে। সেদিন এই সাতটি দ্বীপ ছিল বিচ্ছিন্ন তার মধ্যে জেলেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহা-অম্বা বা মুম্বাআইর মন্দির বুকে নিয়ে প্রধান ছিল মুম্বাই। ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজদের উচ্চারণে মুম্বাআই বা মুম্বাবাই বম্বেতে পরিণত হল। অন্যদিকে বেসিন, সলসেট, ধারাবি, ট্রম্বে, পারাপুরী, এলিফেন্টা ও বম্বে এই সাতটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ প্রাকৃতিক খেয়ালে ও মানুষের চেষ্টায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বর্তমান বম্বে গড়ে উঠল।

আজকের বম্বেকে বিদেশীদের হাতে গড়া বললে ভুল হবে না। সেই আদিম অধিবাসীদের স্মৃতি লেগে আছে শুধু মহুয়ের কেন্দ্রে ঘনবসতিপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন কোলাবার পরিবেষ্টিত জেলেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুম্বাবাই এর মন্দির-টিতে। পূর্বে মন্দিরটি ছিল অন্যত্র। বর্তমান ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ ও এলগ্রানেডের জন্য মুম্বাবাইকে স্থানত্যাগ করতে হয়েছে। জেলেদের পর এদেশে এসেছিল পিটনী অর্থাৎ নারকেল গাছ কাটিয়েরা আর আজও এরা পশ্চিম ঘাটে অজস্র নারকেল গাছের সঙ্গে সঙ্গে বসে গেছে। বম্বে সাগরের চতুর্দিকে প্রহরীর মত ঘিরে আছে পাহাড় আর এই পাহাড়গুলির কোলে—কোলেই কোলানিদের বসতি।

পরপর কত রাজবংশ কত রাজাই না বম্বেতে রাজত্ব করেছে। একসময়ে এখানে বৌদ্ধধর্মের যে বিশেষ প্রচার ঘটেছিলো কানেহরি, কার্লা প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার বা গুহাগুলিই তার প্রমাণ বহন করছে আজ এগুলি একান্তই পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রায়। মহলপুরী, শ্রীপুরী অথবা ঘারপুরী নামেও পরিচিত ছিলো মৌর্য ও চালুক্য রাজধানী এবং এলিফেন্টা দ্বীপে ছিল রাজপুর। এর মূর্তিগুলি, বিশেষভাবে মহাকায় প্রধান গুহার ত্রিমূর্তিটী, শিল্পকলার একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

এই মহলপুরীকে শ্রীপুরীও বলা হত। সমুদ্রের দিক দিয়ে গুহার প্রবেশ পথে পাথরের বৃহৎ খোদিত হস্তী মূর্তি ছিলো। পর্তুগীজরা এর থেকেই এই গুহার নাম এলিফেন্টা রাখে। আজ এই নামেই এই গুহা পরিচিত। সেই পাথরের হস্তীটি বাইকুলার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামের ভিক্টোরিয়াবাগে অর্থাৎ, বম্বের চিড়িয়াখানার প্রবেশ পথের সামনে দেখা যাবে। অনেকের মতে এই শিলপুরীর সময় ৭৫০ খৃষ্টাব্দ। এই গুহাটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য অর্থাৎ শাক্ত দেব-দেবীর মূর্তি—মহাদেব ও মহামায়ার জীবন আলেখ্যই বহন করছে। ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যা-বিশারদ বিখ্যাত জেমস সন সাহেবের মতে এগুলির সময় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে নয়। তাঁ উইলসন কিন্তু পৌরাণিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বলে মনে করেন এবং যে মার্শেল ও তাঁর সঙ্গে একমত।* তাঁর মতে এই গুহার চিত্রগুলি ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাকবি কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যের উপাখ্যানের অনুকরণ। এই গুহার একটি

'নারায়ণ' ও অর্ধনারীশ্বর খোদিত নীলমোহর পাওয়া যায় যা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রতীক। এখানকার মৃন্ময়মূর্তির হাতে বেত নেই যা পরবর্তী মূর্তিগুলিতে দেখা যায়।

অয়োদশ শতাব্দীতে এই প্রদেশে তীমদেব রাজত্ব করেন এবং তাঁর রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী অর্থাৎ আধুনিক মাহিম। আলাউদ্দিন খিলজীর আক্রমণে দুর্লভরাজ ছেড়ে তিনি এই প্রদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। তিনি এই প্রদেশের সত্যই একজন কল্যাণকামী রাজা ছিলেন। হাসপাতাল, প্রসাদ, বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপন করে এই নগরের উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯০ এর মধ্যবর্তীকালে গুজরাট প্রদেশ থেকে মুসলমানেরা এদেশ আক্রমণ করে। সে-সময়ে রাজা নসরতের মহিষি ও সালসেটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একসময় তিনি যখন একেশ্বরে ছিলেন তাঁর ঐশ্বর্যশালী পত্নী রইয়মতলক্ষ্মের প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রহরিত ও নিহত হন। খবর পেয়ে বকেশ্বর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজা নসরতেরও বাইকুয়ার কাছে পরাজিত ও নিহত হন এবং রাজত্ব মুসলমানদের কবলে চলে যায়। এদের প্রত্যেকের মুসলমানরাই কিছুদিন রাইকাবতী ও তার আশে-পাশের রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এর পতন হয়। এই সময়কার একজন ছিল—রাজকাবতী যা মাহিম নগরীর আরবপ্রীর রাজপ্রাসাদ-তারিখ-আজ নামক গ্রন্থে আছে। নসরতের হাত থেকে রাজধানী মুসলমানের হাতে নিলেও প্রত্যেকের প্রকৃত প্রদেশ শাসক ছিলেন—হিন্দু সামন্তরাই।

এই সময়ে ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশগুলি বাণিজ্য বিস্তার করতে মৌসুমেই হয়ে ওঠে এবং বিদেশ থেকে বহুবিধের আমদানী করতে। এজন্যই কৃষ্ণা নদীর পশ্চিমতীরে পর্তুগীজরা কুমুদের পশ্চিমঘাটে এসে দেখা দিল—যার উপকারের ফলে ফলে বিরাট আলবাট্রস পাখীর মত এদের অর্ণবপোত গুলি ভাসতে দেখা গেল—ভারতের মাটিতে সেই প্রথম ইউরোপীয়ানদের পদার্পণ। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ওরা দখল করলে। তখনকার পর্তুগীজ শাসক নুন-ড-কুনহা মুসলমান রাজাদের সাহায্যে এই সকল প্রদেশ পর্তুগীজ রাজাকে চুক্তিপত্রে লিখে দিতে বাধ্য করেন। এই প্রদেশের কোন মূল্যবান সাধনাই করেনি উপরন্তু নিজেদের মধ্যে ভাগ—বাটোয়ারা করে নিয়ে প্রদেশটিকে বিভক্তি করেছিলো।

প্রখ্যাত ঐতিহ বিশারদ ডাঃ প্রেসিয়া ড অর্টা ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে বম্বে নগরী পাঁচশত পাইত্রিশ টাকায় মহারাজা পান। তিনি যে ম্যানরটিতে থাকতেন সেটি আজও টাউন হলের পেছনে দেখা যায়। এই সময় খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা এ-দেশে ছেয়ে ফেলে এবং বহু অধিবাসীরা খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করে। এইভাবে কিছুকাল গত হবার পর—বম্বে নগরীর সব চেয়ে চমকপ্রদ ও ঘটনাবহুল যুগ অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয়। সুরাট তখন ইংরাজ বণিকদের আড্ডা—এঁরা ফ্রান্সের নিম্ন দলে টেনে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করতে চেষ্টা করে সফল হন। কিন্তু তবুও তারা ভারতের এই পশ্চিম উপকূল ত্যাগ করে চলে যায়।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সুরাটের ইংরাজ বণিকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পর্তুগীজদের নিকট থেকে বম্বে কিনে নেবার পরামর্শ দেন। এরপর ১৬৬১ সালে ২৩শে জুন বম্বে নগরীর সবচেয়ে স্মরণীয় দিন বলে চিহ্নিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। এই বিশেষ দিনটিতে লণ্ডনের হোয়াইট হলে গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে পর্তুগাল রাজকুমারী ক্যাথারিন ব্রাগানজার বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হয়। রাজকুমারী তাঁর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এই বম্বে নগরী ব্রিটেনের রাজবংশের হস্তে নিয়ে আসেন। সেদিন থেকে এই ছয়দ্বীপ বিশ্ববন্দী নগরী ইংরেজের অধীনেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। যদিও দ্বিতীয় চার্লস প্রেমিক হিসেবেই

তখনকার অধিবাসী পর্তুগীজদের কাছে বিশেষ দাখাপ্রাপ্ত হতে হয় এবং তিনটি মুক্তোহাতে করে তিনি যে পাঁচজন ইংরেজকে এনে ছিলেন তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশীর ভাগ্যে নানা দুর্গতি ও মৃত্যু ঘটে। যে কয়জন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় তারাই টাই ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ইউরোপীয় মেম্বিমেন্টের পত্তন করে। তার পরের ইতিহাস তো সেদিনের কথা।

ঘনায়মান সন্ধ্যার আধো আধারে মেরিন ড্রাইভের নিয়ন আলোর চোখ-ঝলসানো ঝকঝকে আজকের এই বহুভোগ্যা নগরীর মহানগরী হাসি দেখে কে বলবে, নারকেল বীথির সবুজ স্নিগ্ধ বেষ্টনে একদিন সে-ই ছিল প্রকৃতির হাতের মমতায় সৃষ্টি শান্ত ছেলের ও সিরিজহার কোলে তৃপ্ত অধিবাসিনী।

কে তোলায় আয়ার মন? সেদিনের মুম্বাই তা আজকের বোম্বে?

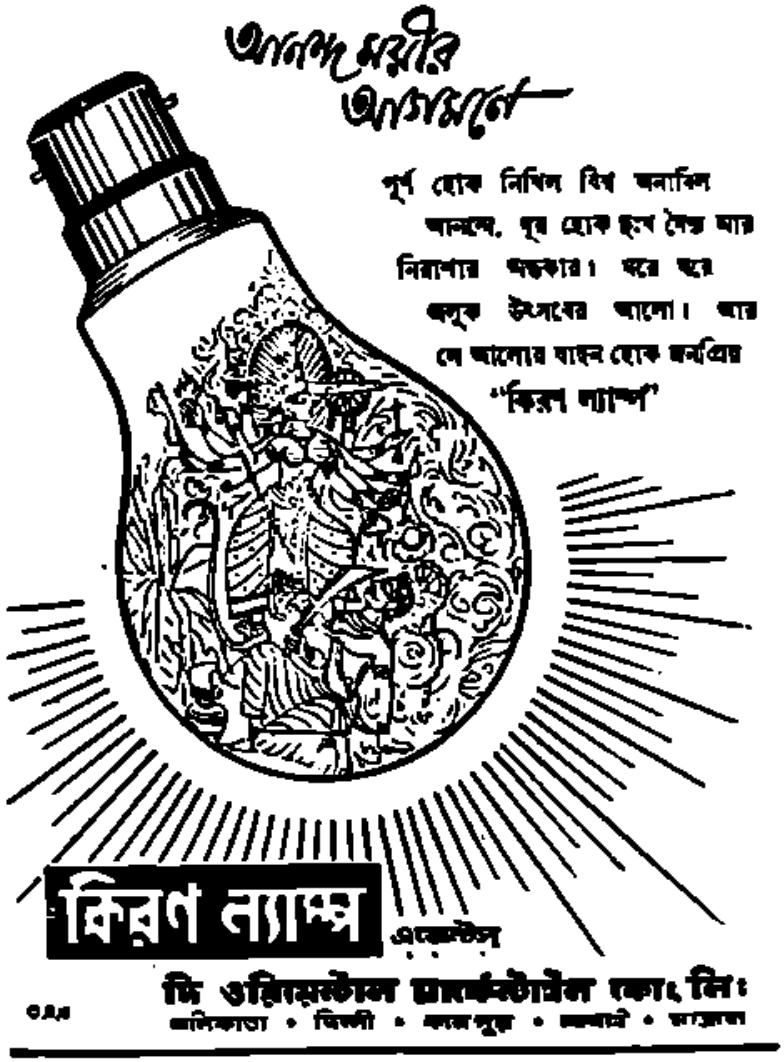

কেমন করে যে ভুলি

সুনীল গুহ

মনে পড়ে সেই রমনার মাঠ বুড়িগঙ্গার জল,
ভালো লাগা সেই ছায়া ভরা দিনগুলি
প্রান্তরময় সবুজের গান ঘাসে ঘাসে অবিরল
সেই সব দিন কেমন করে যে ভুলি

বৈশাখ দিন মনে পড়ে সেই
সোনা মাখা মাঠ ঘাস
সবুজের বুকে শ্রাবণের ধারা
তা-ও আজ ইতিহাস

সেই মনে পড়ে ছবির মতন রঙ মাখা কত দিন
গুণ গুণ গান, মনের বাসর জুড়ে
সে কবিতা আজো অলিখিত আছে
রঙ ছায়া সীমাহীন
তা-ও যেন আজ দূর হতে কত দূরে।

কার্ল ওম্‌স্‌ এণ্ড কোং

(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

কর্তৃক নির্মিত

কৃষি যন্ত্রপাতি

- সিড ড্রীল (বীজ বোনার যন্ত্র)
- উইনোয়ার
- রাইল হো (নিড়ন যন্ত্র)
- জাপানী প্যাটার্ন খেঁসার (ধান মাড়াই যন্ত্র)
- জাপানী প্যাটার্ন উইডার (ধান নিড়ান যন্ত্র)
- দিস হ্রেসার ইত্যাদি ইত্যাদি।

খামার ও বাগানের যন্ত্রপাতি

- থ্রি-প্রঙ্গড কালটিভেটর
- রেইক
- ডিগিং ফর্ক
- হুয়েল বিদার
- অল সিয়ার উইডার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া চা-বাগানের যন্ত্রপাতি, সীলের আসবাব, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, চামাইয়ের ছাচ, কিক্সচারস এবং কলকারখানার যন্ত্রপাতির কাজ করা হয়।

হেড অফিস :

২৮, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১।

ফোন : ২৩-৬১২৭।

২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৯) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। সপ্তম সংখ্যা। কার্তিক, ১৩৬৫।

গান্ধী ও বিপিনচন্দ্র

নির্মলকুমার বসু

বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ গুরুবাদের দেশ বলিয়া অখ্যাতি আছে। কোনও তত্ত্বকে মূলমন্ত্র হিসাবে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একজন এমন লোককেও খুঁজি যাঁহাকে পূজা বা অনুসরণ করিলে তবের পূজা (অন্ততঃ বিকল্পে) করা চলিবে। চারিদিকে আজ গান্ধীবাদের দুর্দশা এবং গান্ধীপূজার আড়ম্বর দেখিয়া মনে হয়, উপরোক্ত অবস্থা আমাদের আজও কাটে নাই।

গান্ধীজী ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসার বিস্তৃত ব্যবহার করিয়া এক নূতন পরীক্ষার সূচনা করেন। এবিষয়ে তাঁহার প্রতিভার তুলনা হয় না। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে বা যে সকল উদ্দেশ্যে এই নূতন কর্মকৌশল নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজীর সহকর্মীগণ সকল সময়ে যথাযোগ্য বিচার করিয়া দেখিতেন না, অথচ সময়কালে মহাত্মাজীকে সমর্থন করিয়া ভোট দিতেন। মহাত্মাজীর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের বশে কেহ যদি নির্বিচারে ভোট দেয়, অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহাতে তত আপত্তির কারণ নাই। অবশ্য দুঃখের কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু সত্যসত্যই আপত্তির কারণ তখনই দেখা যায় যখন এইরূপ অন্ধ অনুকরণকারীগণ স্বাধীনচেতা চিন্তাশীল অপর সকলকে নিন্দার দ্বারা হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন।

১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় দুইজন সর্বভারতীয় নেতাকে জনসমূহের কোলাহলোত্থিত তিরস্কার বা নিন্দাবাদের দ্বারা বিপর্যস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রথম, শ্রীযুক্তা এনী বেসান্ত,

দ্বিতীয়, বিপিনচন্দ্র পাল। ইঁহাদের প্রবর্তিত মতামত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী বলিয়াই ভ্রান্ত, অথবা এই নেতৃদ্বয় স্বাদেশিকতার ব্রত হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ ভাবিবার কারণ নাই। আমাদের বক্তব্য হইল, গান্ধীপূজনের অন্ধ আবেগে আমরা গান্ধীর মতবাদকেও যেমন বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখি নাই, এনী বেসান্ত বা বিপিনচন্দ্রের মতবাদকেও তেমনই যাচাই করিয়া দেখি নাই। ইঁহাদের মতামত আমাদের-গুরুপূজার অন্তরায় বলিয়া মনে হওয়ায় যেমন অন্ধভাবে আমরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছি, বেসান্ত ও বিপিনচন্দ্রের মতকেও তেমনই সত্য সত্য অস্পৃশ্য বোধ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি।

এনী বেসান্ত সে সময়ে অসহযোগের বিরুদ্ধতা করিয়া বলিয়াছিলেন, ভাজার নেশাকে প্রশ্রয় দিলে পরে তাহাকে আর সামলানো যাইবে না। উপরন্তু তিনি ভারতকে স্বায়ত্বশাসিত ডোমিনিয়ন হিসাবে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এই দুইটি মতের সেসময়ে যথাযথভাবে বিচার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ সমকালীন সংবাদ পত্রাদি হইতে মনে হয় আমরা গুরুভক্তির আতিশয্যে হেলায় বেসান্তের মতবাদকে বিসর্জন দিয়াছিলাম।

বিপিনচন্দ্র ছাত্রজীবন হইতেই যুক্তিবাদের উপাসক এবং গুরুবাদের বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার দীক্ষা এবং পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান, অথবা সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা, এমন কি উড়িষ্যার কোনও ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে ইস্তাফা দেওয়া পর্যন্ত সকল ব্যাপারেই আমরা তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রমাণ পাইয়া থাকি।

ভারতবর্ষে অহিংস অসহযোগের প্রথম প্রয়োগ খিলাফৎ আন্দোলন লইয়া সূচিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের দুঃখে যদি আমরা সমদুঃখী হই, তবে তাহারা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে হয়তো যথাযথভাবে সহযোগিতা অর্পণ করিবে।

বিপিনচন্দ্র সংস্কারবাদী, স্বাধীনচেতা হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিনই ইসলাম বা মুসলীমসমাজের বিরোধী বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন না। মুসলমানের ধর্ম বা সমাজব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এক বস্তু এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার করা সম্পূর্ণ অপর বস্তু।

গান্ধীজী এই সময়ে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯শে জুন ১৯২১, পৃঃ ২০৪) :

"If we mean really well by our Mussalman brethren, we must sympathise with them over the movement going on in Europe to destroy Turkish nationalism. It is a thousand pities that the British Government is secretly or openly leading

the movement. Let Hindus not be frightened by Pan-Islamism. It is not—it need not be—anti-India or anti-Hindu. Mussalmans must wish well to every Mussalman state, and even assist any such state, if it is undeservedly in peril. And Hindus, if they are true friends of Mussalmans, cannot but share the latter's feelings. We must therefore co-operate with our Mussalman brethren in their attempt to save the Turkish Empire in Europe from extinction."

আজ প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে এই বিচিত্র লেখাটি পড়িয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের প্রতি আনুগত্যের কথা নাই; তুর্কীর সাম্রাজ্য মুসলমান সাম্রাজ্য বলিয়া ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে তাহার প্রতি আনুগত্য ন্যায়সিদ্ধ বা সঙ্গত, এই অভিনব বিচার মহাত্মাজী ভারতের অধিবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। এবং আন্তরিকভাবে ইহার ন্যায্যতায় স্বয়ং বিশ্বাস করিতেন বলিয়া হিন্দুকেও তিনি খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ১লা জুন ১৯২১, ইয়ং ইণ্ডিয়ার ১৭৩ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন:

"It was only when I found that the Mussalman claim was just from every point of view, that I plunged myself into it. For me it was a chance of a life-time. I felt that if I could but show my loyalty to any Mussalman country-men in the hour of their trial, I would be able to secure everlasting friendship between the two great communities."

যাঁহারা সেকালে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে স্থান দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অপরেও ছিলেন, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের মত তাঁহাদের ভাষার শক্তি ছিল না, নেতৃত্বের গৌরব ছিল না।

যাহাই হউক, মতভেদের জন্য পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্রকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। সে কথা স্বতন্ত্র। কেননা বিপিনচন্দ্র স্বাধীনচেতা ছিলেন বলিয়া, গুরুবাদের পরিবর্তে যুক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া বহু লাঞ্ছনা যৌবনকাল হইতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জীবনের অপরাহ্ণকালের নূতন লাঞ্ছনা তাঁহাকে পীড়া দিলেও পথচ্যুত করিতে পারে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ, রাণাডে, বাল গঙ্গাধর টিলক বা লালা লজপত রায়ের মত তিনি হিন্দু হইয়াও হিন্দু-রাষ্ট্র বা হিন্দু-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন নাই। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের মধ্যে বহুযুগের কর্মফলে যে তমোরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা হইতেও তিনি সমানে মুক্তির সাধনা করিতেন। যুক্তিবাদ তাহার

জীবনে মূলমন্ত্রের মত ছিল। তৎসহ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ তাঁহার চিন্তকে যৌবনে সিঞ্চিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল। সে অবস্থায় তিনি যেমন একদিকে হিন্দুর সংরক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই, ভারতীয় মুসলমানের স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন, অপর রাষ্ট্রের প্রতি কোনও আনুগত্য (extra territorial loyalty) থাকিতে পারে, ইহাও কিছুতে স্বীকার করিতে পারেন নাই।

ভারতের মুসলমানের প্রতি মুসলমান হিসাবে তোষণনীতির প্রয়োগ যে শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই, নানা আপোষ নিষ্পত্তি, দরাদরি করা সত্ত্বেও ভারতীয়তার বোধ অপেক্ষা মুসলমানত্বের বোধই যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভারতকে খণ্ডিত এবং অপেক্ষাকৃত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন ভারতবর্ষের ভূমি আত্মঘাতী হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত তখন গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছিলেন যে তোষণনীতির ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হইল না। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ সাল, নোয়াখালীতে অবস্থানকালে গান্ধীজী কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীর সহিত আলোচনা কালে বলেন :

"Congressmen should not however approach Muslims in a spirit of appeasement or flattery (khushamad). Although something like that had been done, and it might even be justifiably said that he himself had partly been responsible for such an attitude, yet, his eyes were now open and he held that it had been unwise to do so. It was by safeguarding every person's **legitimate interests** that Congressmen could prove their genuine love for nationalism. Gandhiji did not mind even if the Congress were manned by Hindus alone. If its members placed the cause of the whole nation above everything else, then their idealism, would ultimately triumph over communalism." (Bose. N. K : **My Days with Gandhi**, 1953, P.102).

বর্ত্তমান প্রসঙ্গ

বিপিনচন্দ্র পাল

(জন্ম-৭ই নভেম্বর,১৮৫৮—মৃত্যু-২০শে মে,১৯৩২)

স্বাধীন ভারতবর্ষের বহুবিধ দুর্ভাগ্যের মধ্যে অন্যতম দুর্ভাগ্য ভারতবাসী নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে কেবলমাত্র অজ্ঞই নয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুও নয়। অথচ একটা প্রাচীন জাতি, অন্যূন চার সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যে অবগাহন করে, যে আজও প্রবাহিত রয়েছে, তার উৎস, গতিপথ ও প্রধান বাঁকগুলিকে জানা, নিজের অতীতকে স্বীকৃতি-দানের পক্ষে নিয়তম কর্তব্য। আমাদের ধর্ম পিতৃ-পুরুষের ঋণ স্বীকার করার মাহাত্ম্য জীবনের প্রতি বিশেষ সময়ে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু পার্থিব পিতৃপুরুষের অপেক্ষাও মহত্তর ও গুরুত্বময়—জাতির পিতৃপুরুষকে জানার ও স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা আজও আমরা উপলব্ধি করিনি। আমাদের ইতিহাস পাঠও আমাদের সে শিক্ষা দেয়নি, তার পরিবেশও আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হয়নি। হয়তো তার কিছু দায়িত্ব বর্তমান রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের কিন্তু জাতির যাবতীয় কর্তব্যপালনে বিমুখতা ও ঔদাসীন্যের জন্য একমাত্র কর্তৃপক্ষকে দায়ী করার মনোভাব আমরা স্বীকার করি না। জাতির যাঁরা চিন্তাশীলঅংশ সরকারী দপ্তরখানাতেই কেবলমাত্র তাঁদের সমাবেশ ঘটবে জাতির পক্ষে এমন দুর্ভাগ্য আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কাজেই এই অমার্জনীয় অবহেলার জন্য আমরাও কমভোগ করছি কম নয়। জাতির এই সমস্যা-বিড়ম্বিত অন্ধকার অধ্যায়ে যে জ্যোতিষ্কের নিকট থেকে আলোকের সন্ধান মিলত তাঁদের দ্যুতি আমাদের চোখ ও হৃদয়কে আলোকিত করছে না, ফলে অন্ধকারে পথচলার যে শ্রেষ্ঠতম ভরসা—অন্ধকারের নিশ্চিত অবসানে বিশ্বাস—থেকে জাতি বঞ্চিত হয়েছে। তবু বিচ্ছিন্ন ও শৃঙ্খলাহীন ভাবেও মধ্যে মধ্যে বর্তমানের কুয়াশার অন্ধকার দূর হয়ে অতীতের আলো চোখে ঠেকে ও আমরা জেগে উঠে সানন্দে বলি 'জন মানুষের জন্য, কে তার অন্ধযাত্রার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করতে পারে'—এবং সঙ্গে সঙ্গে যে প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস লাভ হয় সে ক্ষণিক ও স্বল্পকালস্থায়ী হলেও তার মূল্যকে আমরা স্বীকার করে নম্র কৃতজ্ঞতায় জাতির অন্তরতম পরি-চয়ে, জাতীয়তার ভূমিকে, চিন্তা ও কর্মের আশ্চর্য সমন্বয় সাধকে—বিপিনচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করি।

যে যুগে বৃটিশ-সম্পর্ক-বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতা স্বপ্ন-বিলাস রূপে আখ্যায়িত হোতো, সে যুগে পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয় চিন্তা করেছিলেন মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাব সিংহ লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে বাংলার এই প্রদীপ্ত-বুদ্ধি নির্ভীক যোদ্ধা। এই তিন জন একই সঙ্গে আসন পেতেছিলেন জাতির অন্তরে। এঁদের নিকট ত্যাগের মন্ত্র, নির্ভিকতার মন্ত্র পেয়েছে বাংলা ও ভারতবর্ষ। স্বল্পাকৃতি মানুষের প্রকৃতি—সহজে বাজীমাৎ করার প্রয়াসকে বিপিন চন্দ্রের লেখনী তীব্র,তীক্ষ্ণ শ্লেষে জর্জরিত করে জাতির মনুষ্যত্ব-বোধকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছে। জাতির মন, বুদ্ধি ও কর্মকে উদ্দীপিত করতে আজ আবার স্মরণ করি তাঁর বাণী —"It is easier to plunge one's self...before

the eyes of the admiring multitude than to live laborious days, working up the national life by hourly sacrifices of life and happiness. ...This is a severer trial, it is a heavier yoke···. Are we prepared to make them? Shall we take this yoke up.

কালের পরপারথেকে বিপিনচন্দ্রের অভ্রভেদী কণ্ঠ বজ্রনির্ঘোষে আজও জিজ্ঞাসা করছে ঐ প্রশ্ন, আমরা কি যোগ্য উত্তর খুঁজে পেয়েছি ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে? আজ এই জয়ন্তবার্ষিকীতে এই আত্ম-জিজ্ঞাসাই আমাদের শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধা নিবেদন জাতির অন্যতম অগ্রদূতের স্মৃতির উদ্দেশে।

পাকিস্তানের সামরিক একনায়কত্ব

পাকিস্তানের পক্ষে যা অনিবার্য ছিল তাই ঘটেছে। পাকিস্তানের উৎপত্তির ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের অস্বাভাবিকত্ব পাকিস্তানকে একদিন এরূপ একটি পরিণতির পথে অনিবার্যভাবে ঠেলে দেবে একথা সচেতন রাজনৈতিক সমালোচকদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলাদলি, যুক্তরাষ্ট্রের উপর তার বৈদেশিক নীতির নির্ভরতা, ঘন ঘন মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরিবর্তন, বিধান-সভাকক্ষে খণ্ড যুদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়—পাকিস্তানের রাষ্ট্রসত্তাকে এমনভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছিল যে পাকৃরাষ্ট্রের রক্ষার অজুহাতে সামরিক কর্তৃত্বের আবির্ভাব যে প্রত্যাসন্ন, পাক্-নাটকের বাইরের দর্শকদের অনেকের কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গণচেতনার পশ্চাদপদ এবং জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহ্যহীন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অত্যুগ্র হয়ে ওঠে স্বভাবতই এবং সে অবস্থায় রাষ্ট্রে সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে সামরিক শক্তি। ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে এবং কাশ্মীর ও খাল সমস্যা নিয়ে যুদ্ধের নিত্য ত্রাসক পাকিস্তানী জনসাধারণের কাছে সামরিক শক্তিকে জাতীয় আশা ও মর্যাদার প্রতীক রূপে শুধু নৈতিক বলেই বলীয়ান করেনি, আমেরিকার সামরিক সাহায্যপুষ্ট পাক সামরিক বাহিনীকে ক্রমশঃ পাকিস্তানের একক শক্তি কেন্দ্রে পরিণত করার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরলোকগত ডাঃ খানসাহেবের 'রিভল্যুশনারী কাউন্সিল' এবং সদ্য পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট 'মীর্জার কনট্রোলড ডিমোক্রেসীর' জিগির অনেক আগেই সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়েছে পাকিস্তান কোনপথে অমোঘ নিয়তির মত এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তান গণতন্ত্রের শেষ ভরসাস্থল ছিল সীমান্ত-গান্ধী এবং ভাসানীর মৌলানার নেতৃত্বে সংগঠিত ভাশনাল আওয়ামী পার্টি। কিন্তু নানা-ঘটনাচক্র, বিশেষতঃ মৌলানার ঘন ঘন বিদেশ যাত্রা এবং সীমান্ত গান্ধীর সীমান্ত প্রদেশের সমস্যার উপরে প্রাধান্য দান, আওয়ামী পার্টিকে পাকিস্তানের জাতীয় দলের মর্যাদা ও গণ সমর্থন অর্জনে বঞ্চিত করেছে। পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্বের অভ্যুত্থান যে প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে এ সম্বন্ধে একাধিকবার অগ্রণী সম্পাদকীয় মন্তব্যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পাকরাজনীতির রঙ্গমঞ্চের যাঁরা প্রধান অভিনেতা, তাঁদের ইতিহাসের এই ইংগিত বোঝবার মত স্বচ্ছ দৃষ্টি অথবা জনসাধারণের প্রতি আনুগত্যের বালাই নেই যে তাঁরা ঘটনাস্রোতের গতিরোধ করতে চেষ্টা করবেন। কাজেই যা ঘটা নিশ্চিত ছিল তাই ঘটেছে।

পাকিস্তানে যা ঘটেছে ও ঘটছে, সামরিক আইন জারীর আখ্যা দিয়ে তার গুরুত্বকে গোপন করবার চেষ্টা হলেও এই ঘটনার অর্থ একটাই। এই ঘটনা পাকিস্তানের সাধারণ শাসনতান্ত্রিক রূপান্তর নয়—আমূল রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে রাষ্ট্র-বিপ্লব বলা যায় না কারণ এর পশ্চাতে অনুমাত্র গণ-সহযোগিতা নেই।

শুধু তাই নয়,—এই পরিবর্তনের পেছনে কোনো রাজনৈতিক আদর্শবাদ নেই। এমনকি এই অভ্যুত্থান সাধারণভাবে সেনাবাহিনীর সচেতন ও সক্রিয় প্রয়াসেরও পরিণতি নয়,—ফৌজের উচ্চতন সামরিক নায়কদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খাসাধনের দুঃসাহসী প্রয়াস মাত্র। এই পরিবর্তন তাই বিপ্লবও নয়, এমন কি রাজনৈতিক 'কূপ'ও নয়। কারণ 'কূপে'র পেছনে রাজনৈতিক দল বা আদর্শ থাকে—যা এ পরিবর্তনের পেছনে নেই। এই পরিবর্তন ফৌজের সামরিক নেতৃত্বের অভ্যুত্থান মাত্র।

নিছক সামরিক অভ্যুত্থানে আধুনিক কালে কোনো দেশে জাতীয় কল্যাণ সাধিত হয়েছে বলে কোনো ঐতিহাসিক নজীর নেই। মিশর বা ইরাকের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কত্বের কোনো সাদৃশ্য নেই, অতএব তুলনা চলে না। মিশর ও ইরাক-দুইটি দেশের পেছনেই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ইতিহাস এবং আরব জাতীয়তার প্রবল আদর্শবোধ। পাকিস্তানের পেছনে এরূপ কোনো ঐতিহ্য নেই। মিশর ও ইরাকের সামরিক একনায়কদের পেছনে রাজনৈতিক আদর্শবাদের ঐতিহ্য না থাকলেও, জাতীয় আদর্শবাদের ঐতিহ্য এই সামরিক নেতৃত্বকে একটি সুস্পষ্ট আদর্শবাদের দিকে পরিচালিত করার পরিবেশ রচনা করেছে। পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শবাদ বা 'কায়েদে আজম' নামে অভিহিত মিঃ জিন্নার ঐতিহ্যও বিস্মৃত ও বর্জিত হয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক অধিনায়কেরা একবারও 'কায়েদে আজম' বা ইসলামের নাম উচ্চারণ করেনি বরং পরিষদ পরিকল্পনা ইত্যাদির কথা বলে ইসলামী ঐতিহ্যের পরিপন্থী মনোভাব দেখিয়েছে। পাকিস্তানী সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে বর্মার সামরিক নেতৃত্বে গঠিত সরকারেরও কোনো সাদৃশ্য নেই।

নেতাদের ব্যক্তিগত আত্মম্ভরতা, আদর্শহীন দলাদলি ও তার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিক্ষুব্ধ পাক-জনতার কাছে পাক সামরিক একনায়কত্ব হয়তো সাময়িক সমর্থন লাভ করবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জনতার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে সামরিক একনায়কত্ব কোথাও কখন জনতার বাঁচা-মরার সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনেও প্রগতি আনতে পারে না। আপাতঃ রাজনৈতিক স্থিরতা লাভে সন্তুষ্ট পাক্-জনতা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝবে যে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল সামরিক নেতৃবর্গের মধ্যে পারস্পরিক ক্ষমতার লড়াইয়ের মাধ্যমে সেই একই অস্থিরতা আরেক নূতন পর্যায়ে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে। জোর করে ক্ষমতা দখলের পর স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগের ইতিহাস পৃথিবীতে নেই। দুই মাসের মধ্যে সামরিক শাসনের অবসান ঘটান হবে এই অবিশ্বাস্য কথাটি জনসাধারণ বিশ্বাস করেছিল এবং একনায়কত্বে যে ব্যক্তিদের ও ক্ষমতার স্বপ্ন নিহিত তা এত দ্রুত আত্মপ্রকাশ করার ফলে মীর্জাকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে বিদায় নিতে হবে সেকথা অনেকেই ভাবতে পারেনি।

সামরিক একনায়কত্ব সামরিকভাবে দুটি কাজ করতে পারে। একটি হলো রাষ্ট্রের উপরে জবরদস্তি করে ঐক্য চাপিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল দুর্নীতি দমন। এই কাজ দুইটিও পাক্ সামরিক একনায়কদের পক্ষে দুষ্টভাবে করা সম্ভব নয়। ঐক্য প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানে সহজ নয়। পাক-ঐক্য সৃষ্টি করার পথে প্রধান পরিপন্থী পাকিস্তানের পঁচিশ হাজার মাইল ভৌগলিক বিচ্ছেদ। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব বাংলার সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রূপে পশ্চিমী নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং শাসন বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ও অ-বাঙালীকে দিয়ে আজ পূর্ব বাংলায় যে শাসন চালু করা

হচ্ছে তার তাৎপর্য ঔপনিবেশিক শাসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই অবস্থা ঐক্য সৃষ্টির অনুকূল নয়। সামরিক বাহিনীর পক্ষে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। কিন্তু বৃটিশ ঐতিহ্য-পুষ্ট এবং সামাজিক আদর্শ-সংস্পর্শ বহির্ভূত সেনাবাহিনী প্রথম সুযোগেই সিভিলিয়ানদের চেয়েও অতি তাড়াতাড়ি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। প্রতিটি যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতার ইতিহাস তার সাক্ষী। 'বুটি' হলো সামরিক বাহিনীর স্বীকৃত পুরস্কার। সীমান্তের চোরা-কারবারী বন্ধ করার কাজের ভারপ্রাপ্ত পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্তেই এই 'বুটি'র স্বাদ এরই মধ্যে পাকবাহিনী লাভ করেছে। তাই সামরিক শাসন যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়—যার সম্ভাবনাই বেশী—তবে পাক সামরিকবাহিনী অতিরিক্ত দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পাক্ জনজীবনকে এমন অতলস্পর্শী দুর্দশায় নিমজ্জিত করবে যা কল্পনা করাও কঠিন।

পাকিস্তানে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনে পাক্-ভারত সমস্যার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে অবনতির সম্ভাবনা আছে। অবাঙালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলীমদের কর্তৃত্ব পূর্ববাংলায় নিরঙ্কুশ হওয়ায় পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ বাড়বারই সম্ভাবনা বেশী। কাশ্মীর সমস্যার অবনতির যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি সমাধানেরও সম্ভাবনা ছিল। কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্বের কথার পুনরুক্তি করা হলেও তিন হাজার মাইল পাক্-ভারত সীমান্ত সমস্যা ফেলে একমাত্র কাশ্মীরের উপরে পাকিস্তানের সুরক্ষা নির্ভর করে না। কাশ্মীর প্রধানতঃ পাকিস্তানের 'প্রেস্টিজের' প্রশ্ন। এই মর্যাদার প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে আপোষ-রফার পথে পাক্-ভারতের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়ার সাহস করা একমাত্র সামরিক একনায়কদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবে জেনারেল আয়ুব খান যে সমস্ত গরম বুলি ঝাড়ছেন তাতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

কাজেই সামরিক একনায়কত্বের অধীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবনে ঐক্য ও প্রগতির সম্ভাবনা খুবই কম। বরং যে চক্রে পাকিস্তান বাঁধা পড়ল সেই চক্রের গতি পাকিস্তানকে এমন এক স্থানে নিয়ে যেতে পারে, যা আজ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিনেন্স

চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের আত্মরক্ষা এবং দ্রব্যসামগ্রী গোপনের সুযোগ দিয়ে অহেতুক ও অমার্জনীয় বিলম্বে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিনেন্স জারী করা হলেও আমরা আশা করি যে এই অর্ডিনেন্সকে যথার্থভাবে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হবেন। এখন পর্যন্ত আটা; ময়দা ও বেসনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু আটার পাইকারী দর কলকাতায় নির্ধারিত হয়নি, শীঘ্রই আমন ধান উঠবে—এই অজুহাতে ধান ও চালের পাইকারী ও খুচরা দরের উচ্চ সীমা বেঁধে না দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন। কিন্তু আমরা মনে করি ধান ও চালের দর এখনই নির্ধারিত করা উচিত। প্রয়োজন বোধে নতুন ধান ও চাল বাজারে উঠতে থাকলে ধান ও চালের উচ্চতর দর পুনরায় নির্ধারিত করা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় তাম, তেল মসলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করাও অবিলম্বে প্রয়োজন।

যথার্থই যদি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করে চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের হাত হতে সরকার জনসাধারণকে

রক্ষা করতে আগ্রহান্বিত হন তবে এ সম্বন্ধে সরকারের আন্তরিকতা ও তৎপরতা একান্ত আবশ্যক।

কন্ট্রোল ব্যবস্থার প্রয়োগ না করে এবং অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য বিরাট কর্মচারী-বাহিনী নিয়োগ না করেও যথার্থভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন নির্ধারিত দ্রব্যমূল্য চালু করার জন্য জনমত গঠন এবং জনসাধারণের সহযোগিতা। দ্রব্যমূল্য তত্ত্বাবধানের যথাপ্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব দিয়ে অবিলম্বে সমগ্র স্তরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি তথা সম্প্রসারিত ক্রয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বাংলা দেশে বিভিন্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অবিলম্বে নির্ধারণ করা আবশ্যক।

সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক আচরণবিধি.

পাকিস্তান, বর্মা ও থাইল্যাণ্ডের সামরিক অভ্যুত্থান ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শের উপরে স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিস্তার করবে। যদিও যে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে এই সমস্ত দেশগুলিতে সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছে তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ভারতের ক্ষেত্রে কিছুটা বাস্তবতা বর্জিত। যে দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্বন্ধে জনচেতনা শিথিল এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির নামে অ-গণতান্ত্রিক আচরণ তীব্র হয়ে ওঠে, সেই দেশেই অসামরিক পরিবেশেও সামরিক অভ্যুত্থান ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসত্তা, জাতীয় মর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করেছে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জনজাগরণের অবদানরূপে। ভারতবর্ষেও বর্তমান নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির পশ্চাতে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে অর্জিত গণসংযোগের নৈতিক গুরুত্ব। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষের রয়েছে বিরাট ভৌগলিক বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর বিচিত্র-বিন্যাস। সুতরাং, নিকট ভবিষ্যতে গৃহযুদ্ধ ব্যতীত ভারতে পাকিস্তান, বার্মা বা থাইল্যাণ্ডের ন্যায় সামরিক অভ্যুত্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই বললে অতিরিক্ত আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ করা হয় না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কম হলেও ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শ সুষ্ঠু, বলিষ্ঠ এবং ঐতিহ্যপূর্ণ হয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতকে খুব সুদৃঢ় করে তুলেছে একথা বলা যায় না। ভারতে কিভাবে গণতান্ত্রিক নীতি ও ঐতিহ্য গড়ে উঠবে তার মুখ্য দায়িত্ব রাষ্ট্র কর্তৃত্বে ক্ষমতা অধিকারী দলের। কিন্তু বিরোধী দলের দায়িত্বও কম নয়। অবশ্য বিরোধীদলগুলির মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি নীতিগত অর্থে এবং আন্তরিকভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কম্যুনিষ্ট পার্টিও গণতন্ত্রের প্রতি, অন্তত সাময়িক ভাবে হলেও, আস্থা স্থাপনে বাধ্য হয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি একদলীয় শাসন তথা একনায়কত্বে বিশ্বাসী হলেও পাকিস্তান, বার্মা বা থাইল্যাণ্ডের অথবা মিশর কি ইরাকে যে ধরণের সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেরূপ একনায়কত্ব চায় না। সেদিক দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার গণতন্ত্র-বিরোধী যে সামরিক শাসনের পরিবেশ রচিত হয়েছে তার বিরোধিতায় কম্যুনিষ্ট পার্টিও অগ্রণী হবে বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

ভারতের চারিপাশের সামরিক শাসনের প্রভাবরোধ করার একমাত্র উপায় ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ঐতিহ্যকে

সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা। ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ শক্তিশালী হতে পারে দুইটি কার্যক্রম দ্বারা। গণতান্ত্রিক ভারতের আর্থিক ও সামাজিক প্রগতি ভারতের বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতর দিয়ে কতখানি সম্ভব, তার ফলাফলের উপরে গণতন্ত্রের আদর্শের উপরে একদিকে ভারতের এবং অপর দিকে এসিয়ার জনসমের আস্থা নির্ভর করবে। জাতীয় উন্নয়নের এই পরীক্ষায় গণতন্ত্রের এই আদর্শকে সার্থকভাবে উত্তীর্ণ করার প্রধান দায়িত্ব ক্ষমতাসীন দলের।

গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় উপায় হলো লোকসভা ও বিধান সভায় এবং বৃহত্তর জন-জীবনে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করা। এরূপ ঐতিহ্যের মূলকথা কয়েকটি গণতান্ত্রিক আচরণ সর্বদলীয় স্তরে এবং সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে নেওয়া এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই আচরণ অনুসরণ করা। আচার্য বিনোবা ভাবে এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এরূপ একটি সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক আচরণ বিধি বা 'ডিমোক্রেটিক কোড অব কণ্ডাক্ট' গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং এ সম্বন্ধে উদ্যোগীও হয়েছেন। হিংসা ও অরাজকতার পন্থা বর্জন, ছাত্রদের উত্তেজনামূলক দলীয় রাজনীতিতে ব্যবহার না করা, লোকাল বোর্ড এবং গ্রাম্য নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দাঁড় না করান, নির্বাচনে অসদুপায় গ্রহণ না করা, লোকসভা ও বিধান সভায় গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি রক্ষা করা—এরূপ আরও কতগুলি সর্তসহ একটি গণতান্ত্রিক আচরণ বিধি রচনা করা এবং সমস্ত দল দ্বারা সেই নীতি সমূহের জাতীয় অঙ্গীকার ঘোষণা করার এক প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা মনে করি এই প্রস্তাবটি বিশেষ সময়োপযোগী এবং এই প্রস্তাবটিকে অনতিবিলম্বে কার্যকরী করে গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি ভারতের জাতীয় সংকল্প প্রকাশ করা ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সামনে এক আশু কর্তব্যরূপে দেখা দিয়েছে। এসিয়ার গণতন্ত্রের আদর্শের অগ্নিপরীক্ষার রঙ্গপীঠ ভারতবর্ষ। এই পরীক্ষায় গণতন্ত্রের আদর্শকে সার্থকতার সঙ্গে উত্তীর্ণ করা ভারতের এবং বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির এক অনিবার্য ও ঐতিহাসিক কর্তব্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী

এই নভেম্বর মাসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের শত বার্ষিকী। আচার্য জগদীশচন্দ্র ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঐতিহ্যের পুনঃ প্রবর্তক। তিনি শুধু আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান মনীষার পথিকৃৎ নন, আচার্য জগদীশচন্দ্রের ঔচ্চাধিক বৈজ্ঞানিক অবদান বিশ্বের বিজ্ঞান প্রতিভার সর্বজনীন এবং সর্বকালীন নিদর্শনরূপে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জগদীশচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি বিজ্ঞানাচার্যরূপে ভারতের বিজ্ঞান প্রতিভাকে গড়ে তোলার জন্য যে আগ্রহে অগ্রণী হন, 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তার শ্রেষ্ঠ স্মারক। আমরা আশা করি পূর্ণ জাতীয় মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রয়াস সরকার ও জন-সাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতায় সার্থক হয়ে উঠবে।

সীমান্তের ছিটমহল বিনিময়

নেহেরু-নূন চুক্তির নূন সাহেব এরই মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেও চুক্তিটি এখনও বিলুপ্ত হয়েছে কিনা আমরা সেকথা জানি না। কিন্তু ছিট মহল বিনিময় এবং সীমান্ত রেখার পুনঃনির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তিটি করার সময়ে সীমান্তবর্তী ছিট মহলগুলির ভৌগলিক অবস্থান এবং সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে সতর্ক

ভাবে বিচার বিবেচনা করা হয়নি সেকথা অতি সুস্পষ্ট। জলপাইগুড়ি এবং অন্যান্য অঞ্চলে এমন কতকগুলি স্থান পাকিস্তানকে হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে যে সমস্ত স্থানে পূর্ববাংলা থেকে আগত বহু উদ্বাস্তুর সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চে যথোপযুক্ত সন্ধান না করে সে সমস্ত জনবসতিবহুল স্থান পাকিস্তানে হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব করা শুধু নৈতিক ও জনস্বার্থের এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দিকথেকেই অন্যায় নয়, বোধহয় এরূপ চুক্তি ভারতের সংবিধানের দিক থেকেও অসিদ্ধ। আমরা আশা করি, যে সমস্ত ছিট মহল জনবসতিবহুল, সেই সমস্ত এলাকার হস্তান্তর সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার গুরুত্ব ভারত সরকার উপলব্ধি করবেন।

খাদ্য সমস্যা ও ভূমি সংস্কার

খাদ্য-সমস্যার মূল সমস্যা হলো ভূমি-সমস্যা। ভূমি-সমস্যার সমাধান ব্যতীত খাদ্য সমস্যার সমাধান অসম্ভব। এই কথাটি হাজারবার হাজার মঞ্চথেকে উচ্চারিত হয়েছে। যারা রাষ্ট্রকর্তৃত্বে আসীন তাঁরাও এই কথাটি বারবার উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু এগার বছরের কংগ্রেসী শাসনেও ভূমিসংস্কার হয়নি। অতি শিথিল ভাবে ও সরল গতিতে কয়েকটি প্রদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে বটে কিন্তু এখনও ভূমি সংস্কার হয়নি। জমিদারী প্রথা বিলোপের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমির মালিকানা প্রথার পরিবর্তন করে প্রকৃত চাষীকে জমির মালিক করা। কারণ প্রকৃত চাষী জমির মালিক না হলে জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সব প্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপ হয়নি, যেখানে হয়েছে সেখানেও চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টনের ব্যবস্থা হয়নি। এতদিন পরে ভূমি-সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় বারবার সে-সম্বন্ধে কত প্রস্তাব নেওয়ার পরেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আবার আরেকটি প্রস্তাব পাশ করে একটি সাবকমিটি গঠন করেছে। ভূমি সংস্কার সম্বন্ধে কংগ্রেসের এই চিমে-তেতালা গড়াইলস্করী-নীতির কবে যে অবসান হবে অথবা আদৌ অবসান হবে কিনা তাই আজ অনাহার-পীড়িত জনতার জিজ্ঞাস্য।

রূপায় কাটাবাজারে পুলিশের হানা

বড় বাজারের রূপায় কাটা বাজারে সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ অতর্কিতে হানা দিয়ে একলক্ষ টাকা ও কতগুলি চোরা টেলিফোন বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রায় ৪০০ ব্যক্তিকে জুয়া খেলার অভিযোগে গ্রেপ্তারও করেছে। কলকাতার জনসাধারণ পুলিশের এরূপ কাজে সানন্দ সমর্থন জানাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহযোগিতাও করবে। পুলিশ যদি এরূপ ভাবে দুর্নীতির ক্ষেত্রে হানা দেয়, জুয়ার কারবারীদের ন্যায় চোরাকারবারীদেরও গ্রেপ্তার করে, তবে পুলিশ ও সরকার উভয়েই জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করবে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, আকস্মিক করে জুয়ারীদের এই গ্রেপ্তার পরে না অপরাধীদের অর্থহীন মুক্তিতে শেষ হয়। একবার জুয়ারীদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে অনেক জুয়ারী নিজে থেকেই পাপচক্র গুটিয়ে নেবে।

জমি-সন্ধান কমিটি

পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের যোগ্য উদ্বৃত্ত জমি আছে কিনা তার সন্ধান করার জন্য পশ্চিম বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন থেকে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। শিবিরের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবী নিয়ে যে সত্যাগ্রহ

আন্দোলন হয় সেই আন্দোলন সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পরিসমাপ্তির সময় সরকারের নিকট জমি-সন্ধান কমিটির দাবী করা হয়। এই দাবীর যৌক্তিকতা পশ্চিম বাংলার কয়েকটি সংবাদ পত্র সমর্থন জানিয়েছিল। আমরা শুনেছি এরূপ একটি কমিটি গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রীরও নাকি আপত্তি নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরূপ জমি-সন্ধান কমিটি গঠনে রাজি নন্।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপযোগী আর উদ্বৃত্ত জমি নেই। কিন্তু উদ্বাস্তু নেতৃবর্গ দাবী করছেন যে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রয়োজনানুযায়ী জমি এখনও আছে। পশ্চিমবঙ্গে জমি আছে কি নেই এই সমস্যাটির উপরে পশ্চিম বঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তুদের যাওয়া-না-যাওয়ার যুক্তি নির্ভর করছে। সরকার যদি একটি জমি সন্ধান কমিটি করে উদ্বৃত্ত জমির সম্ভাবনা ও তার পরিমাণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেন তবে বাংলার বাইরে যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্নটির সমাধান অনেক সহজতর হয়। অথচ সরকার একদিকে জোর গলায় বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের উপযোগী জমি নেই, আবার অন্যদিকে জমি সন্ধান কমিটি গঠনেও অস্বীকার করছেন—সরকারের এই দুইটি নীতি ও উক্তির সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দৃঢ় মত অবিলম্বে সরকারের একটি উচ্চ-পর্যায়ের জমি সন্ধান কমিটি গঠন করা উচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নারী সত্যাগ্রহ

শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একত্র বসবাসকরার অযোগ্য বলে ঘোষণা করে আফ্রিকানদের দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন সহরের বাইরে বসবাস করার হুকুম দিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষান্ত হয়নি, আফ্রিকানদের সব সময় নিজেদের কাছে পরিচয়পত্র রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ত্রিশ দশকের ইংরেজ আমলে বিপ্লববাদ দমনের প্রচেষ্টায় বাংলা দেশেও যুবক ও তরুণীদের এরূপ পরিচয় পত্র রাখার জন্য আইন করা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবা-যুবতী সব বয়সের আফ্রিকানদেরও পরিচয়পত্র রাখার জন্য আইন জারী করা হয়েছে।

এই মানবতা-বিরোধী আত্ম-অবমাননাকর আইনের প্রতিবাদে আফ্রিকান মহিলাসমাজ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছেন। এরই মধ্যে প্রায় দুই হাজার আফ্রিকান নারী নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ পন্থায় কারাবরণ করে মানবতার মর্যাদা রক্ষার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করেছেন। এই দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেনসবার্গের অন্যতম অধিনেই গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পন্থার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেন। সে সময়ে অবশ্য এই সংগ্রাম পন্থার নাম ছিল নিরুপদ্রব প্রতিরোধ। পরে এই সংগ্রাম পদ্ধতিরই নাম হয় সত্যাগ্রহ। গান্ধীপ্রবর্তিত সত্যাগ্রহের এই আদি স্থানে আফ্রিকান মাতাদের প্রাথমিক মানবিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে ভারত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন ও শুভকামনা জানাবে। এই সত্যাগ্রহের মান অত্যন্ত উচ্চপর্যায়ের। কোনো আফ্রিকান নারী সত্যাগ্রহী জামীন গ্রহণ করেনি, ৫০০ শত্রুর জন্য আত্মীয়েরা জামানের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সত্যাগ্রহীরা জামীন নিতে অস্বীকার করেছেন। সত্যাগ্রহী আফ্রিকান মাতাদের সন্তানদের তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই সত্যাগ্রহের মাধ্যমে আফ্রিকান নারীসমাজ তথা সমগ্র আফ্রিকান সমাজের জন-জাগৃতি ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। তবু নাকি আফ্রিকানরা অসভ্য, বর্বর এবং অনুন্নত হওয়ার জন্য শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একত্রে বসবাস এবং একত্রে জীবনযাত্রার অনুপযোগী। দক্ষিণ আফ্রিকার

শ্বেতাঙ্গ সমাজের ঔদ্ধত্য ও অমানুষিকতা আজ সারা বিশ্বের ধিক্কারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ এই আটক সত্যাগ্রহীদের বিচারের জন্য যেদিন আদালতে উপস্থিত করা হয় সেদিন একটি নারী সমাবেশ হয় সত্যাগ্রহীদের প্রতি সমর্থন জানাবার জন্য—শ্বেতকায় পুলিশ বাহিনী এই সমাবেশে অংশ-গ্রহণকারী নারীদের উপর নৃশংস অমানুষিকতার যথেচ্ছ বেত্র চালনা করে। মোহাল্লবার্গের রাস্তাগুলি আক্রান্ত নারীদের আর্তনাদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। শিশু সন্তান পিঠে নারীরাও বাদ যায়নি এই বর্বর অভিযানের নৃশংসতা থেকে। এই শ্বেতকায় সাম্রাজ্যবাদীরাই তাদের উন্নতসংস্কৃতি ও জাত্যাভিমানের দাবীতে অশ্বেতকায়দের উপর মানবতাবিরোধী অমানুষিক বিধি-ব্যবস্থা আরোপ করতে সাহস পায়।

অবিলম্বে U. N. O-তে এ বিষয় উত্থাপিত হওয়া উচিত এবং সারাবিশ্বের জনমতের ধিক্কার যাতে এদের চৈতন্যোদয় হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতবর্ষেরই এবিষয়ে অগ্রণী হওয়া সকলে আশা করবে।

কলকাতার চিড়িয়াখানা

কলকাতার চিড়িয়াখানা সাধারণ মানুষের পক্ষে শিক্ষা ও আনন্দ দুইয়েরই সুযোগ দেয়। কিন্তু কলকতার চিড়িয়াখানার অব্যবস্থা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কয়েকটি (মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য) পশুর জীবনহানি ঘটেছে। হিপ্পোর মৃত্যু এবং চিড়িয়াখানার পুকুর থেকে হাঁস ও অন্যান্য জলচর পাখীদের অন্যত্র স্থান পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উঠেছে জনসাধারণের মনে। চিড়িয়াখানার পুকুরগুলি নাকি আবর্জনায় ভর্তি হয়ে হাঁস ও অন্যান্য পাখীদের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও চিড়িয়াখানাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত করে গড়ে তোলার সতর্ক ব্যবস্থা চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের গ্রহণকরা কর্তব্য।

বিসর্জন পূজার রুচি ও শৃঙ্খলাবোধ

কলকাতার অগণিত পূজামণ্ডপে এবং পূজার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থায় এবার যত্রস্থানে রুচি ও রীতি রক্ষা করা হয়েছে। অকথ্য অশ্রাব্য রেকর্ড বাজিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের রুচিতে আঘাত করে কর্ণ বিদীর্ণ করা হয়নি এবং পূজার উৎসব সুষ্ঠু ও সঙ্গত ভাবেই পালন করা হয়েছে বলে এবার কলকাতার নাগরিকদের কাছ থেকে প্রশংসা শোনা গেছে। বিসর্জনের দিনেও জনতার সুশৃঙ্খল ব্যবহার এবং প্রতিমা সহ শোভাযাত্রীদের নিষ্ট আচরণের ফলে একদিকে যেমন পুলিশের পক্ষে জনতা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে কলকাতার জনতার আত্মমর্যাদা, অনুশাসনপ্রীতি এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে কলকাতার নাগরিক জীবন প্রশংসাযোগ্যভাবে উন্নত হয়ে উঠেছে। কলকাতার জনতার এই রুচি ও শৃঙ্খলাবোধ নিশ্চয়ই আগামী জীবনের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করবে।

নোবেলপ্রাইজ ও পেস্টারনেক :—১৯৫৮ সনের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার গৌরব ছুটেছিল রুশ সাহিত্যিক বোরি পেস্টারনেকের ভাগ্যে, তাঁর লিখিত "ডাক্তার জিভাগোর" জন্য। এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে অতি স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন ও গৌরব বোধ করেছিলেন। কিন্তু তারপরই সুরু হোলো সোভিয়েট দেশের নিয়ন্ত্র প্রধান কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার প্রধান

'বল' মিঃ ক্রুশ্চেভের এই পুরস্কার প্রাপ্তিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বলে ব্যাখ্যা করা। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সাহিত্য-সোষ্ঠী পেস্টারনেককে তাঁদের সাহিত্য প্রতিষ্ঠান থেকে পদচ্যুত করলেন। এর পর নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া পেস্টারনেকের গত্যন্তর ছিল না।

'ডাঃ জিভাগো' বিতীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস। সোভিয়েট সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা করা এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য অথবা বিষয়বস্তু নয়। এর নায়কের চরিত্র চিত্রণে কোনো দলের অথবা মতের জয়পরাজয় বিবৃত না করে স্বাভাবিক মানুষের চিরন্তন মানবতার জয় দেখানো হয়েছে। একেই মিঃ ক্রুশ্চেভ ও তাঁর দল সোভিয়েট আদর্শ ও নীতির প্রতিকূলতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের নির্দিষ্ট একটিমাত্র, সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাবে কম্যুনিষ্ট পদ্ধতি ও মতবাদের জয় প্রচার করা—রুশীয় সাহিত্যিকের পক্ষে এর ব্যতিক্রম অমার্জনীয়। মানুষের জয় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এঁরা ব্যস্ত নন্। এঁরা চান প্রকৃতির আমোঘ নিয়মের মত স্বতঃসিদ্ধভাবে কম্যুনিজমের জয় প্রতিষ্ঠিত করা। কাজেই পরবর্তী অধ্যায়ে পেস্টারনেক 'প্রাভদা'র সম্পাদকীয় বিভাগের উদ্দেশ্যে লিখিত একটী চিঠিতে প্রকাশ করেছেন যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁর প্রাথমিক আনন্দ অহৈতুকী ছিলনা, কারণ গত পাঁচবৎসর ধরে উপন্যাসটি এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়ে আসছে। এর পর যখন উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে অভিযান চলতে সুরু হয় এই পুরস্কার দানের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তখনই মাত্র তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং তিনি স্বেচ্ছায় এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন। সোভিয়েট দেশে থাকবার অনুমতি দানের জন্য পেস্টারনেক মিঃ ক্রুশ্চেভের নিকট সানুনয় আবেদন করে প্রভদায় প্রকাশিত উপরোক্ত চিঠিতে বলেছেন যে তাঁর ও তাঁর স্বদেশের মধ্যে যে প্রাচীর গড়ে উঠেছে তার জন্য তিনি নিজেকেই দোষী মনে করেন এবং তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির ক্ষতি করার উদ্দেশ্য তাঁর কোন সময়েই বিন্দুমাত্র ছিলনা।

উপরোক্ত চিঠি সম্বন্ধে মন্তব্য করা নিষ্প্রোজন। ব্যাপারটি যেমন করুণ তেমনি ভয়াবহ। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বের দিকে দিকে মানসিক স্বাধীনতার এই যে অবরোধ এর অবসান কবে হবে কে জানে? একদা নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গেলিলিওকে প্রাণ দান করতে হয়েছিল, আবার কি মানসিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে মানব ইতিহাসের পুনরাভিনয় ঘটবে?

ডস্‌টয়েভ্‌স্কি :

স্ত্রী ও মেয়ের দৃষ্টিতে

সত্যব্রত বসু [গতবারের পর]

৯

তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল অক্টোবরে। ডস্টয়েভ্‌স্কি প্রোপোজ করেন নভেম্বরে,—বিয়ে হল আরো তিনমাস পরে,—পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটতে মাত্র চারমাস লাগল। বিয়ের দু মাস পরে তাঁরা জার্মানী গেলেন এবং পিটস্‌বার্গ ফিরে এলেন আরো চারবছর পরে।

এই চারবছরের পুরো গৃহস্থালীর ছবি নেই,—কেবল জার্মানী গিয়ে প্রথম দুমাসের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি আছে। দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের পরেই আনা সম্পর্কে ডস্টয়েভ্‌স্কির চেহারা বদলেছে। দারুণ জুয়ার নেশায় পড়ে ভদ্রলোকের এখন অবস্থা যে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ বলা যায়। পিটস্‌বার্গের বাড়িতে বিখ্যাত লেখক এবং ভদ্রলোক যে ডস্টয়েভ্‌স্কির সঙ্গে আনার পরিচয় ছিল, এ সে-ব্যক্তি নয়। আত্মকর্তৃত্বহীন ডস্টয়েভ্‌স্কির এই বেপরোয়া মূর্তির সঙ্গে আনার পরিচয় ছিল না। এইরকম জিদ, অবাধ্য একরোখা হালহীন স্বভাব, আনা এমন প্রস্তুতই ছিলেন না। এ ঠিক অস্থির বোধহীন দুরন্ত অমনোযোগী একটা বালকের মত। এই সেদিন পিটস্‌বার্গের বাড়িতে বসে ডস্টয়েভ্‌স্কির সঙ্গে আনা 'গ্যাম্বলার' লিখেছেন,—এবং গ্যাম্বলারকে আনার একেবারেই ভাল লাগেনি,—আনা কি করে জানবেন যে সেই গ্যাম্বলার ডস্টয়েভ্‌স্কি নিজে! জানলে নিশ্চয়ই অবধারিত পরিণামের মুখে নিজেকে এইভাবে ছেড়ে দিতে চাইতেন না।

কিন্তু এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর কোনোই উপায় নেই।

কিন্তু আনা আশ্চর্য এই কারণে যে ডস্টয়েভ্‌স্কির জীবনে পূর্ববর্তী আরো মেয়েদের মত তিনিও অল্পদিনের জন্য এসে আবার মুছে যেতে পারতেন,—এবং গেলে কিছুমাত্র দোষের ছিল না—কিন্তু তা তিনি করেননি, সম্ভবত মনেও হয়নি—পরিবর্তে, স্রোতের মুখে ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,—তারপর প্রবল আত্মশক্তিতে ভাগ্যের গতিটাকেই অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।

আনার মত শক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে বাস্তবিকই বিরল; এবং আনার মত স্ত্রী পেয়ে ডস্টয়েভ্‌স্কিও ভাগ্যবান।

জার্মানীতে প্রথমদিকের যে সব ছবি তাতে ডস্টয়েভ্‌স্কি-চরিত্রের একটা দিক খুব স্পষ্ট: আনাও অনেক সামনে। ডস্টয়েভস্কির উপর রাগ হয় সত্যিই,—কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই। 'গ্যাম্বলার' লিখতে লিখতে আনাকে তিনিও এই জিনিষটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন। আনার চেয়ে যে তিনি নিজে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন, এটি আনার মত মেয়ে তাই প্রথম থেকে বুঝেছেন। এবং বুঝে সেইভাবে চলতে পেরেছেন বলেই পতনের অতল গহ্বর থেকেও আনার হাত ধরে ডস্টয়েভ্‌স্কি উঠে আসতে পেরেছেন। আনার আয়গায় অন্য চরিত্রের অন্য মেয়ে হলে ঘটনার পরিণতি ডস্টয়েভ্‌স্কির জীবনে নিশ্চয়ই অন্যরকম হত।

দুমাসের এই কাহিনী বেশ দীর্ঘ। কিন্তু সবটার দরকার

নেই। ডস্টয়েভ্‌স্কির জন্ম যতটা দরকার তাই বেছে বেছে আনার কলমে এখানে সাজিয়ে দেওয়া গেল :

১০.

'পয়লা মে' আঠারশ সাতষট্টি।

'সন্ধ্যার সময় বসে কেভিয়ার হাম্‌বার্গ যাওয়া নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। [কেভিয়া ডস্টয়েভ্‌স্কির প্রথম নাম দিয়ভর থেকে। স. ব.] কেভিয়া নেই, আমি এই অচেনা জায়গায় বিদেশে তিনটে ঘর জুড়ে একা একা আছি, একথা ভাবলেই আমার কিরকম ভয় করে উঠেছিল। তবুও আমি বললুম যে আমার জন্য চিন্তা নেই। আমি ভালই থাকব। অসুখ বিসুখ বা বিপদ আপদ হবেনা, হলেও আমি সামলে নিতে পারব।

'উনি আমাকে রোজ একটা করে চিঠি লিখতে বললেন। তা আমি লিখব। সে বরং ভালও। তবু একটা আনন্দ। একা একা থাকার একটানামি থেকে কিছু মুক্তি এবং সান্ত্বনা।

'আমার এই রাজী ভাব দেখে উনি তারপর বললেন যে উনি গেলেই নাকি আমি বাঁচি, মনে মনে তাই আমি চাইছি। কারণ তাঁর প্রতি ত আমার ভালবাসা নেই। কিন্তু এসব কথা কি ঠিক। তাঁর যাওয়া নিয়ে আমি যে অমত করছি না তার কারণ নিশ্চয় এই নয় যে আমি চাই ফুর্তি দিতে তিনি অনেক টাকা নিয়ে আসুন। বরং বলতে কি, আমি এসবে বিশ্বাসই করি না। কিন্তু আমি দেখছি যে এখানে এইভাবে তাঁর ভাল লাগছে না,—একা একা হাঁপিয়ে উঠছেন। তার থেকে হাতেনাই মেজাজ খারাপ হচ্ছে। একটা লোক নেই, বন্ধু নেই, কথা বলবার একটা মানুষ নেই,—এইভাবে তাঁর কাটে কী করে।'

তা ত বটেই। আনা তাঁর কাছে সাধারণ লেখকের লেখা একখানা সাধারণ বই ছাড়া আর কী। তাও ত বহুবার পড়া হল। আবার কী। কিন্তু আশ্চর্য, আনার লেখায় এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অভিযোগ বা অভিমান নেই। খাঁটি ওরিয়েন্টাল মেয়ে আনা। আনার মেয়েও তাঁর বইতে বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্য ইত্যাদি অবতারের নাম নিয়ে এক-আধবার লিখেছেন যে তিনি হলেন এঁদের দেশের মেয়ে, যাকে হালকামি করে যে উড়িয়ে দেবে সে উপায় নেই। এবং ভারতীয় পাঠকের চোখে সে সব লাইন বাস্তবিকই থ্রিলিং। কিন্তু আনার মেয়ে এমির কথা পরে—তাঁর আসতেও এখনো দেরী।

'তবু ভাল', আনা তারপর লিখছেন, 'যে এখানে পড়বার মত বই পাওয়া যাচ্ছে। নাহলে ত একঘেয়েমির চাপে ভদ্রলোক যাবা যেতেই বসেছিলেন।

'হামবুর্গ যাবেন, সে তাঁর অভিলাষ,—আমি সেখানে বাধা হব কেন। না গেলে অনর্থক কষ্ট পাবেন,—সারাক্ষণ সেই নিয়ে মনে মনে অশান্তি আর আফশোষ—তার চেয়ে যাওয়াই ভাল। উনি যদি ওখানে গিয়ে আনন্দ পান, বৈচিত্র্যে খুশি হন ত আমিও তাই জেনে খুশি থাকব এখানে। তারপর ত তিনি আবার ফিরে আসছেন,—তখন সব আবার আগের মত হবে।'

তারপর দৈনন্দিন জীবনের একটুকরো ছবি :

'সন্ধ্যাবেলায় আমরা পড়ি। তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়ত একেবারে চুপ। একসময় আমি হয়ত চোখ তুলে তাকাই, তিনিও এইসময় মুখ তুলে উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি একটু হাসেন। আমি খুব সুখী। খুব সুখী।

'সে রাত্রে অনেকক্ষণ আমরা কথা বললাম। উনি বললেন যে যদি ভালরকম কিছু টাকার ব্যবস্থা করা যায় ত এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, তারপর বাসা খুঁজে আমরা ওখানেই থাকব। সে খুব সুন্দর। কিন্তু তা কি হবে।

আমার ত কিরকম ভয় হচ্ছে যে, না। এর থেকে তিনি বরং না গেলেই ভাল।'

জার্মানীতে এই শহরের নাম হেসভেন। এখানে আনাকে একলা এগার দিনের জন্ত রেখে ডস্টয়েভ্‌স্কি জুয়া খেলে বড়লোক হবার জন্ত তারপর হামবুর্গ গেলেন। এ খুব ভাল বুদ্ধি সন্দেহ নেই। কারণ চাকরী বা বাণিজ্য করে টাকা রোজগার অনেক ঝামেলা—তাড়াতাড়ি টাকা পেতে হলে নিঃসন্দেহে জুয়াই খুব প্রশস্ত। ডস্টয়েভ্‌স্কি হামবুর্গ যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে আনার এই লেখা :

'আজ কেবল বৃষ্টি। সারাদিন বাদল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আমার যে কী ভয়ানক একলা লাগছে। বসে বসে এতক্ষণ আমার জামাটা সেলাই করলুম, এইবার পোষ্টঅফিস যাব। কিন্তু সংবাদ যে কিছুই ভাল হবে না, এ আমি জানি। আমার মন বলছে। সারাটা পথ আমি ধীরে ধীরে হাঁটলাম। কেভিয়ার চিঠি আছে ঠিকই কিন্তু চিঠিতে কি থাকবে সে আমি না পড়েও জানি। লিখেছেন ওখানে আরও কয়েকটা দিন থেকে আসতে চান। থাকা মানে খেলা। আমি কি করব। কেবল তাকে লিখে দিলাম যে আমার জন্ত কিছুমাত্র চিন্তা নেই,—আমি ভাল আছি এবং থাকব। তিনি ইচ্ছা করলে আরো কয়েকটা দিন সেখানে থেকে আসতে পারেন। আজ বৃহস্পতিবার, আগামী সোম কি মঙ্গলবারের আগে আমি ওঁকে আশা করবনা।

'আমি কেবল ভাবছিলাম যে এই নেশাটার হাত থেকে ওঁকে কি করে বাঁচানো যায়। সমস্ত মিলিয়ে আমার মনটা এত ভারাক্রান্ত হয়ে আছে যে আর আমি পারছিনা। আমার কিছুই ভাল লাগছেনা।'

পরের দিন।

'কেভিয়া হয়ত আজ ফিরবেন, এই আশা করে আমি একটু তাড়াতাড়ি উঠলুম। তৈরী হয়ে তক্ষুণি ষ্টেশনে যেতে চাইছিলাম কিন্তু মনে হল যে তার আগে পোষ্টাফিসটা একবার ঘুরে যাওয়া ভাল। গিয়ে দেখি কেভিয়ার চিঠি। যা ভয় করছি ঠিক তাই। লিখেছেন যে আমার চিঠিটা পেয়েছেন কিন্তু ব্যাঙ্কারকে দিয়ে যে টাকা পাঠানো হয়েছিল তা পাননি, আরো দু একটা দিন দেরীর অপেক্ষা না করে উপায় কী। কিন্তু এ একটা অজুহাত নয় কী। চিঠি পড়ে আমার বেশ অদ্ভুত লাগল। লিখেছেন, দাঁতের যন্ত্রনা আমাকে আরো কয়েকটাদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আচ্ছা বেশ, ধৈর্য ধরে থাকব। লিখে দিলাম যে তাই হবে—দরকার হলে আরো কয়েকটা দিন তিনি সেখানে থেকে আসতে পারেন।'

তারো পরের দিন :

'আজ বারোটার সময় আমি ষ্টেশনে গিয়েছিলাম কিন্তু না, কেভিয়া আসেননি। ওখান থেকে আবার পোষ্টাফিস। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে আজকে চিঠিতে আরো খারাপ খবর থাকবে : কেভিয়া নিশ্চয় লিখবেন যে টাকাকড়ি সব গেছে এবং এখান থেকে অবিলম্বে জোগাড় করে কিছু পাঠিয়ে দিতে হবে। সেই দেখি তাইই। আমি কেবল তাকেই ওঁকে চিঠি পাঠিয়ে ব্যাঙ্কারের কাছে এলাম। কিন্তু সে লোকটা তখন ব্যস্ত করছিল, বলল, আবার তিনটের সময় খুলবে। আর আর কি করি, বাড়ি ফিরে এলুম। আসার সময় পথে একপেয়ালা কফি খেয়ে নিলাম। ব্যাঙ্কারকে দেবার জন্ত তিনটের সময় আবার টাকা নিয়ে গেলাম কিন্তু আমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে এবার বোধহয় তারু সেরকম ভয় হলনা, বেশ অনেকক্ষণ সে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখল এবং ফেরার সময় অন্তদিনের মত দরজা পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিতে এলনা।'

ডস্টয়েভ্‌স্কি আরো দুদিন পর ফিরলেন :

'ডস্টয়েভ্‌স্কির আশা আমি আরও ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম—এমন সময় টেম্পলে ঘুরে তাঁকে দেখলাম। কয়েক মুহূর্ত আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না,—ভয় হচ্ছিল যে একবার চোখ সরালেই আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কয়েকমুহূর্ত নিজের দৃষ্টিকেও আমার বিশ্বাস করতে ভয় হল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরলুম। আঃ, এখন কী শান্তি। কী নিশ্চিন্ত আরাম। কী আনন্দ। কেভিনার একটু যেন পরিবর্তন দেখলাম,—কিন্তু সেটা ট্রেনলাইনির জন্যও হতে পারে। মুখও কিছু উদ্ভাসিত লাগল। কিন্তু তবুও খুব সুন্দর। এবং পরস্পরকে পেয়ে আমরা দুজনেই খুব খুশি।'

১১

ডস্টয়েভ্‌স্কি ফিরে এলেন কিন্তু মাথার মধ্যে ঐ একটিই চিন্তা: জুয়া এবং টাকা। মনে হচ্ছে যে এ ধারায় একেবারে সর্বস্বান্ত না হওয়া পর্যন্ত এ চিন্তা থেকে তাঁর মুক্তি নেই। এদিকে পুঁজি যা ছিল তার অধিকাংশই বাকি। তাঁর এজেন্টার কাটকভের কাছে নভেলের জন্য অগ্রিম টাকা চেয়ে চিঠি লেখা হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে কোনো জবাব আসেনি এখনো। টাকা তিনি না দিতেও পারেন। যদি না দেন তা আর কোথাও থেকে টাকা আসার সম্ভাবনা নেই। এজন্য দুজনেরই খুব দুশ্চিন্তায় কাটছে। কথায় কথায় বৈরিতা এবং বিতণ্ডা বাধছে। এইসময়ের ডস্টয়েভ্‌স্কির যে-আচরণ আনা তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন সে বেশ অদ্ভুত। লেখকের বই পড়ে তাঁদের সম্বন্ধে আমরা একটা কল্পনা করে নিই—, কিন্তু আনার লেখা আমাদের সেই আগু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা কোরোধ-প্রতিবাদ। হয়ত কথাবেশি সব প্রতিভাবান লেখকরাই তাঁদের পারিবারিক জীবনে এইরকম,—খুব স্বাভাবিকও,—কেবল সে সব কথা কোনোদিন বাইরে আসে না বলেই তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কাল্পনিক ছবিটিই অটুট থেকে যায়।

'আজ আমাদের উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল'। এক-দিনের ঘটনাপ্রসঙ্গে আনা লিখছেন। 'এখন আমাদের ঘড়ি নেই, [বাড়ীটা বাঁধা রেখে ডস্টয়েভ্‌স্কি জুয়া খেলে এসেছেন। স. ব.] সেইজন্য এখন সময় কত কিছুই জানা যেত না। কিন্তু আমার মনে হল যে আমি প্রায় বারোঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠলুম। উঠে আমি পড়াশুনো এবং অনুবাদ নিয়ে বসলাম। কেভিনা কিছুক্ষণ পর উঠে চা খেতে বললেন। মুখের চেহারা দেখে একেবারেই ভাল লাগল না। কাল রাত্রে তিনি অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, সেই পুরনো স্নায়ু রোগের প্রকোপ। মুখ দেখেই বুঝলাম যে চা তাঁর খুব বিস্বাদ লাগছে। বললেন যে নিজেই তিনি চা ঢেলে নেবেন। আমাকে উঠতে হবে না। আমি তার উত্তরে কেবল "আচ্ছা" বলেছি কিন্তু তিনি হঠাৎ রেগে গিয়ে দারুণ ধমক দিয়ে উঠলেন। যানে আমার গলার স্বর পর্যন্ত তাঁর সহ্য হচ্ছে না।

'আমার খুব খারাপ লাগল তাতে। নিজেকে খুবই আহত এবং অপমানিত লাগল। লজ্জা গোপন করতে আমি উঠে যাতে যাতে ওঘরে চলে গেলুম।

'কিন্তু পাঁচমিনিট পরেই হাসিমুখে কেভিনা আবার ওঘরে হাজির—মার্জনা চাই।

'এসব কলহাকাটি চীৎকার আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগে না। আমি এসব পারিইনা। আমি বরং শান্তির জন্য সবসময়ই আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছি।

'কেভিনা সারাদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কতবার করে বললেন যে আমি "সাধু," "খুব ভাল," "নিষ্পাপ" "নিষ্পাপ", "নারীজাতির আদর্শ," "ভিক্টিমার প্রতিমূর্তি," ইত্যাদি কতসব কথা। শুনতে আমার ভাল লাগল অবশ্যই কিন্তু আমি ত তাঁর এসব কথার যোগ্য

নয়। আমি তা জানি। কিন্তু তবুও আমি চুপ করেই রইলাম।'

আর একদিনের কথা :

'আজ আমরা বাইরে আমাদের খাওয়াদাওয়া সারলুম। ফিরে এসে বসে বসে আমি একটা চিঠি লিখলাম এবং চিঠিটা নিজেই গিয়ে তাকে দিয়ে এলাম। কেতিয়া বললেন যে চলো হাঁটতে হাঁটতে লাইব্রেরী থেকে বইগুলো বদল করে আনা যাক। কিন্তু আমার এত ক্লান্ত লাগছিল যে ইচ্ছা করল না। কেতিয়া তারপর একলাই গেলেন। ফিরে এসে আবার বললেন, বেড়াতে বেরব কিনা। আমি বললাম "আচ্ছা"। কিন্তু কাটকভ্‌ এখনো কোন উত্তর দিলেন না। কোনোদিকেই টাকার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের হাতে যা ছিল সবই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তারপর যে কি করে চলবে আমরা কিছুই জানি না। দুশ্চিন্তা এবং ভয়ে আমাদের এখন অবস্থা হয়েছে যে বলবার নয়। কেতিয়া ত সবসময়ই গম্ভীর। মেজাজও খুব খারাপ। তখন তখন যাতা কথা নিয়ে কেবল খিটিমিটি বাধছে। খুঁটিনাটি নানা ব্যাপার, যা তাঁর চোখে পড়ার কথা নয়, তাই নিয়ে এমন অস্থির করে তুলছেন যে বলবার নয়। আমার মনে হয় ছুতো খুঁজে খুঁজে তিনি কেবল ঝগড়া পাকিয়ে তোলার চেষ্টায় আছেন। এ রকম হীনস্বভাব ত তাঁর কোনোদিন ছিল না। আমার ধৈর্যই বা কতক্ষণ থাকে। মাঝে মাঝে উত্তর দিতে গিয়ে এক আধটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে যাচ্ছে। তা থেকে যা হচ্ছে,—কী বলব!—তাকে কুরুক্ষেত্র বলাই ভাল।

'এইত আজই। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা যে কাণ্ডটা করলাম সে কেবল বাচ্চাদেরই মানায়। বেড়াতে বেড়াতে আমরা আজ অনেকটা চলে গিয়েছিলাম। আমি বুঝলাম যে কেতিয়া ফিরতে চাইছেন কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। আমি তাই বললাম, "যদি বাড়ি যাও ত চলো যাই।"

'সঙ্গে সঙ্গে সে কি রাগ। কোনো কথাবার্তা নেই, মুখ ফিরিয়ে অমনি হাঁটতে আরম্ভ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, "এই বাগানে বরং একটু বসা যাক।" বলা মাত্রই আবার কোনো কথাবার্তা নেই, বাগানের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটা সুরু হল। কিন্তু মজুর হল যে মাত্র পাঁচমিনিট বসা চলবে, তার বেশি একটা সেকেণ্ডও তিনি বসতে পারবেন না।

'আমি বললুম, সে আবার কী! বসতে হয় ত অন্তত আধঘণ্টা। তা নাহলে বাড়ি যাওয়াই ভালো।

'কিন্তু না, একবার যখন বলেছি, বসতেই হবে।

'আমি বললুম, না। তাহলে বাড়ি যাওয়াই ভালো। এবং তিনি যদি না আসেন ত আমি একলাই যাচ্ছি।

'কেতিয়া বাগানের দিকেই গেলেন, আমিও মুখ ফিরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলুম। এরকম করে কাঁহাতক পারা যায়।

'কিন্তু আমারই দোষ। আমি কেন এরকম করতে গেলুম। নিজেদের মধ্যে সামান্য সামান্য কথায় এই যে অহোরাত্র খিটির মিটির চলছে, আমরা ত আসলে এরকম লোক নয়। এ সব কেবল আর্থিক দুশ্চিন্তার জন্যই। নাহলে আমাদের ত কিছুই অভাব ছিলনা। কত সুখী ছিলুম আমরা।

'কেতিয়া আধঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে এলেন। মুখ দেখলাম ভীষণ অন্ধকার। চা খেতে বসে বললেন, এই টেবিলটা যে সরিয়েছি যে কেবল তাঁকে অপমান করার জন্যই। আমি বললুম, এরকম কথা ভাবাই মূর্খামি।

'তারপর তাঁর খিটিমিটি আবার সুরু হল।

'বললেন যে এখন অবশ্য তাঁর টাকা নেই কিন্তু টাকা তাঁর হবেই। টাকা দেতে তিনি বাধ্য। সুতরাং এখন থেকেই তাঁকে আমার সম্ভ্রম করা উচিত।

'শুনে হঠাৎ আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। টাকা

টাকার জন্ত তবে আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করব। এতবড় কথা তিনি আমাকে বলতে পারলেন!

'আমি বললুম যে একথা যে সত্য নয় তা তিনিও জানেন। সত্যি হলে আমি সেদিন "টি"কেই বিয়ে করতে পারতাম। তার অনেক টাকা এবং সে আমাকে চেয়েছিল। এবং কেন যে করিনি তা ডস্টয়েভ্‌স্কির জানেন।

'কথাটায় এত লাগল যে আর আমার সহ্য হলনা, আমি মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললুম।'

১২

এখান থেকে বিস্তৃত পাশাপর্ব: মানে জুয়াকাহিনী। ডস্টয়েভ্‌স্কির অন্ত এক রূপ। এখন লেখক বা ভদ্রলোক নন,—একজন গ্যাম্বলার,—এক নেশাগ্রস্ত জুয়াড়ী। প্রেসডন থেকে এখন তাঁরা যে জায়গায় এসেছেন, তার নাম বেডেন। ষ্টেশনের গায়ে কাছেই একটা 'ক্যাসিনো', —মানে গ্লাবঘর। ডস্টয়েভ্‌স্কির নিত্যনৈমিত্তিক কাজ দাঁড়ালো, সকালে উঠে সেখানে গিয়ে জুয়া খেলা,—এবং সারাদিন প্রায় সেইখানেই কাটানো। মাঝে মাঝে যে বাড়ি আসেন সে কেবল আবার টাকা নিয়ে নিয়ে সেখানে দিয়ে আসার জন্ত। এবং এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলছে প্রতিদিন। এর মধ্যে মাঝে মাঝে একআধদিন ছেদ। হয়ত জয়,—সামান্ত বৈচিত্র্য,—কিন্তু সে খুব কম বাদলের দিনে এক একলহর আকাশের মেঘ হঠাৎ পাতলা হয়ে গিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্ত এক এক ঝলক আলো আসার মত। যেদিন টাকা কিছু বেশি, সেদিন ডস্টয়েভ্‌স্কির দানও খুব বড় বড়,—নিজেদের আর তাই নিজেদের বাজেই তলিয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই চোখে পড়ছে না।

এই একটানা বাদলের কাহিনী কিন্তু ভাল লাগেনা। কাহিনী হিসাবেও তা বেশ দুর্বল। দরকারও কম। কেবল ডস্টয়েভ্‌স্কি চরিত্রের বৈচিত্র্যের জন্ত যা দরকার কিছু কিছু আভাসে আমার কলমে এখানে রাখা গেল।

আমার ডায়রীতে এদিনের তারিখ, ২৩ জুন, ১৮৬৭। খুব বর্ষামুখর অন্ধকার একটা দিন,—এমন দিনে বাইরে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চা এবং কফির পর ১০টা দুই এবং কয়েকটি খেলার দিয়ে ডস্টয়েভ্‌স্কি বেরিয়ে গেলেন। দুই মানে বেশ মোটা অঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা,—খেলার রৌপ্যমুদ্রা।

উনি বেরবার সময় বলে গেলেন যে আজ খেলবেন না, যদিও খেলেন ত সব টাকা নষ্ট করবেন না। বাড়িতে একা একা আমার কোনো কাজ নেই। আমি কিছুক্ষণ পুরনো জামা কাপড় ইত্যাদি সেলাই করে কাটালাম। বড় একা একা লাগছিল। মনটাও খুব খারাপ। মনটা কেন যে হঠাৎ এমন খারাপ হয়ে গেল কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি কিছু দেখতে চাই না, কোথাও যেতে চাই না, কেবল এই অন্ধকার ঘরে এমন চুপচাপ একা একা সমস্ত দিন আমি শুয়ে থাকতে চাই।

'প্রায় ঘণ্টা তিন পর ফেডিয়া ফিরে এলেন। বললেন, যা ছিল সব খেয়ে, একটা পয়সাও ফেরেনি। আমাদের কাছে আর তাহলে মাত্র পঞ্চাশ দুই রইল,—এখনো এই দিয়েই কোনোরকমে চালিয়ে নেওয়া চলে।

'আমি উঠে পোষাক বদলে ফেডিয়ার সঙ্গে তারপর ক্যাসিনোয় এলাম।

'বাড়িটা বেশ প্রকাণ্ড। ভিতরের হলও খুব বড়। এই বড় হলটার দুপাশে আবার লম্বা লম্বা দুটো হল। মাঝের বড় হলে লম্বা প্রকাণ্ড একটা টেবিল, টেবিলটার মাঝখানে জুয়ার মেশিনটা। বাস, সেই পর্যন্ত তাহলে জুয়া আজ দেখা হল। কিন্তু আমি যেরকম সাংঘাতিক একটা ব্যাপার দেখব ভেবেছিলাম সে সব কিছু নয়। যে টেবিলটার কথা বললাম, যার উপর ঐ মেশিন, সেটাকে

ঘিরে ছজন লোক—ওরা হল ক্রুপিয়ার—ওরা টাকা দেয় এবং বিক্রেতাকে হিসেব করে কিরিয়ে দেয়। টেবিলের দুই পাশে ওরা দুজন করে বসেছে আর দুজন টেবিলের দুই মাথায়।

'কেডিয়া বললেন, "পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে আগে তুমিই একটা ধরো।" তাঁর নির্দেশ মতই আমি একটা ধরে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক রাখলাম কিন্তু হার হল। তারপর কেডিয়া আরম্ভ করলেন।

'অনেকক্ষণ খেলা চলল। শেষে আমরা আমাদের আসল ছাড়াও পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা প্রায় দু'শ নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে এলাম।'

একদিনের পক্ষে বেশ যথেষ্ট লাভ। এবং দেখা যাচ্ছে আমারও খুব পয়। কিন্তু এখানেই শেষ হলে হবে কি করে,—এই ত মাত্র সুরু।

'আমরা ডিনারে গেলাম। বাড়িতে এসে কেডিয়া বললেন যে জিতের টাকা সব একটা চামড়ার থলিতে আলাদা করে সরিয়ে রাখা হবে। আমাদের আসল টাকা না ফুরলে ওতে আর হাত দেওয়া নয়। সে খুব ভাল। ঐ পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক দু'শ মুদ্রা চামড়ার থলির মধ্যে ভরে আমরা সেটা আলাদা রেখে দিলাম এবং ঠিক হল যে আসল না ফুরলে ওটা আমরা খরচ করব না।'

এই পর্যন্ত হলে বাস্তবিকই বেশ ভাল ছিল, কিন্তু,

'ডিনারের পর আমরা আবার ক্যাসিনোয় এলাম। ওখানে কফি খেলাম এবং কেডিয়া খবরের কাগজ পড়লেন —তারপর আমরা আবার ঐ টেবিলটার ধারে এসে দাঁড়ালাম। কেডিয়া খেলতে লাগলেন এবং এবার আমাদের ভাগ্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠিক একটা সুতোর মুখে ঝুলে রইল। তারপর শেষে প্রায় পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্ক জিতে আমরা ওখান থেকে উঠে এলাম।

'ইতিমধ্যে অনেক রাত্রি হয়ে গেছে,—প্রায় দশটা বাজে। আমার এবার বাড়ি ফেরা উচিত। বাড়িতে ফিরেই এই পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আমরা সেই ব্যাগে আলাদা সরিয়ে রাখলাম। এবং আমাকে পৌঁছে দিয়েই কেডিয়া আবার টেবিলের ধারে গেলেন। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন। বললেন পাঁচ দুই বা নিয়ে বেরিয়েছিলেন, সব গেছে। কী করা যাবে। ব্যাগ খুলে তখন আরো কিছু দিতে বললেন। দিলুম। কারণ না দিয়ে উপায় বা লাভ ছিল না। এবং দিয়েই আমিও সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম যে এ খেলার মানে কি। কেডিয়া চা রাখতে বলে চলে গেলেন, বললেন যে এখনই ফিরবেন। এবং ঠিক আধঘণ্টার মধ্যেই আবার খালি হাতে ফিরে এলেন। বেচারা কেডিয়া। তাঁর মুখ দেখে এত কষ্ট হতে লাগল যে আমি কোনো কথাই খুঁজে পেলাম না। কী করা যায়! আমাদের ব্যাগে আর মাত্র ৪৫ দুই রইল।'

সকালে ছিল ৬৫ দুই,—তার মানে ২০ দুই লোকসান। এক দুই মানে এক স্বর্ণমুদ্রা,—টাকার হিসাবে বেশ ভালই।

১৩

আজকের তারিখ ২৪ জুন, ঠিক তার পরের দিন।

আলা এখন ভাবী মা। ঐ বাড়িটা ছেড়ে আজ সকালে তাঁরা অন্য একটা বাড়িতে উঠে এসেছেন।

'নূতন বাড়িতে এসে আজ আর আমি উঠতে পারছি না। শরীরটা খুব ক্লান্ত। খুবই খারাপ। সারাদিন আমি কোচটার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। গতদিনের ঐ টাকা থেকে আমাদের পাঁচ দুই খরচ হয়েছে। কেডিয়া নিয়ে গেছেন ১০ দুই। আমাদের হাতে তাহলে আর মাত্র ৩০ দুই রইল।

'আমি কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, একসময় চোখ মেলেই দেখি, মাথার দিকে কেডিয়া। চেয়েই চমকে

উঠলাম। কেভিনার মুখ বন্ধার মত লাল। কী হয়েছে বুঝতে কিছু বাকী রইল না।

'আমি তবু বোকাতে লাগলুম যে ও কিছু না। কিছু চিন্তা করার দরকার নেই।—আমাদের যা আছে ওতেই চলে যাবে। কিন্তু কেভিনা ঝারো ৫ দুই ছেড়ে বললেন। আমি তক্ষুণি উঠে টাকাটা বার করে দিলুম। কেভিনা এমনভাবে আমার দিকে চাইলেন যেন তাঁকে খুব কৃতার্থ করেছি। আমি তাঁকে বাইরে রেস্তোরেঁতে খেয়ে নিতে বললুম,—কারণ আমার আজ কিছুতেই বাইরে যাবার অবস্থা নয়।

কেভিনা গেলেন চলে। বলে গেলেন যে অল্প পরেই ফিরে আসবেন। আমি অপেক্ষা করে রইলাম কিন্তু কেভিনা আর আসেন না। তারপর পাঁচটা বাজল। ক্রমশ ছটা, সাতটা,—কেভিনার দেখা নেই। কিছু রুটি এবং কয়েকটা মোমবাতির দরকার ছিল কিন্তু কাকে দিয়ে আনাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু কেভিনা আর আসে না। আমি একসময় ফিরে স্যাণ্ডেলডিকে কিছু রুটি এবং মোমবাতি আনিয়ে দিতে বলে এলাম। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে আবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্রমশ সাতটা বেজে গেল। তারপর দশটা। এবার আমার মনে নানারকম দুর্ভাবনা দেখা দিতে লাগল। কী জানি, কেভিনা যদি ক্যাসিনোয় আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকেন। হয়ত ভাইই এবং বাড়ির ঠিকানা জানা নেই বলে কেউ খবর দিতে পারছে না। আমি ভাবলাম যে এগারটা অবধি দেখব, তারপর নিজেই যাব।'

ডস্টয়েভস্কি কিন্তু ঠিক এগারটাতেই ফিরলেন। কিন্তু এরিনের লাভ লোকসানের পরিষ্কার কোনো হিসাব দেবা নেই। ডস্টয়েভস্কি বললেন যে প্রায় ৪০০ ফ্র্যাঙ্ক জিতেছিলেন কিন্তু কিছুতেই টেবিল ছেড়ে উঠে আসতে পারছিলেন না। যদিও আমার জন্ম সবসময়ই তাঁর মন পুড়ছিল।

'আমি অবশ্য বললুম যে আমার জন্ম ভাববার নেই। আমি ঠিক ছিলুম। কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ডস্টয়েভস্কি বার বারই বলতে লাগলেন যে তাঁর খুব অন্যায়,—তাঁর কৃতকর্মের সাজা হওয়া উচিত। আত্মগ্লানিতে তিনি পুড়তে লাগলেন এবং বললেন যে এসময় আমি যেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে না যাই। কারণ তাঁর কষ্ট পাওয়াই উচিত। বললেন যে তিনি মূর্খ, দুর্বল,—এবং অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে আমি ক্ষমা করি। ক্ষমা কি জন্ম তা অবশ্য আমি ঠিক বুঝলাম না। এবং কেভিনাও বললেন যে তাতে কিছু এসে যায় না।' তবুও তাঁকে শান্ত করার জন্ম আমি বোকাকে পাঠিয়ে দিলাম। বললাম, "কিছু চিনি কফি এবং বাতি নিয়ে এসো।"

'ওরেবো এসে তিনি আবার তাঁকে বাইরে পাঠাবার জন্ম পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বললেন, "আন্না, তুমি আমার আমাকে বাইরে পাঠাও। এবার আমি তোমার জন্ম কিছু একটা নিয়ে আসি। হ্যাঁ আন্না, তুমি আমাকে আর একবার পাঠাও।"

যাদে এইভাবে আমার রাত্রি যোক। কেন মনার লোক ডস্টয়েভস্কি। এবং নিজে মনার লোক না হলে বইতে এইরকম মনার চরিত্রগুলি আঁকবেন কি করে।

১৪

পরদিন ২৫ জুন। ইতিমধ্যে অপরিবর্তিত। এদিকে হু হু করে টাকা বলে আসছে। এডিটার কাছ থেকে চিঠি নেই। এদিন সকালে দেখা গেল আর আছে মাত্র ২০ ফ্রাঁ, তার থেকে ৫ ফ্রাঁ নিয়ে ডস্টয়েভস্কি যথারীতি অবশ্যই রওনা হয়ে গেছেন। ডস্টয়েভস্কি বেরিয়ে গেলে

আনা খুব কাঁদলেন। আহা! কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মনে হল যে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। আহা বেচারী! তারপর ডস্টয়েভস্কি ফিরে এলেন। খোলা খামটি হাতে।

'আমি খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, কী, ধরে এনেছ ত!

'ডস্টয়েভস্কি ঠিক সেই রকম সুরে বললেন, "হ্যাঁ।" বলেই সঙ্গে সঙ্গে, "কিন্তু এবার থেকে খুব সাবধানে খেলব।"'

অনুতপ্ত অপরাধীর মত নিজেকে তারপর খুব অকথ্য অপমানজনক ভাষায় তিনি গালাগালি দিলেন। দিয়ে বললেন,

"শোনো আনা, তুমি খুব সুন্দরী এবং ধনবতী। বাস্তবিকই বলছি, আমার মত একটা পাষণ্ড স্ত্রী হওয়া তোমার সাজে না। মানে উচিত হয়নি।"

তারপর সত্যিসত্যিই, "আমাকে আরো কয়েকটা টাকা দাও।"

কিন্তু আনা আজ কঠিন :

'না, কোনো মতেই না। "On no account"। কাল কিছু দিতে পারি, কিন্তু আজ কিছুতেই নয়।'

কিন্তু ডস্টয়েভস্কির মত জিনিয়াসের সঙ্গে যে লড়বেন, আনার অত জোর কই। অতএব দেখা গেল যে বোকা মেয়ে আনার মুঠি আলগা করে ডস্টয়েভস্কি মুঠি দুই নিয়ে দিব্যি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। বাকি রইল আঁঠার। তার থেকে আবার তিন। তারোপর আবারো তিন। বাকি রইল বারো।

এবং পরদিন এই বাকি বারো থেকে পাঁচ নিয়ে ডস্টয়েভস্কি বেরবার আগে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন,

"ভাবো আনা, এপর্যন্ত তোমার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। মানে চমৎকৃত। কিন্তু আর নয়। যেদিন তুমি এই সুন্দরী তন্বী সরলা মোহিনী বালিকাটি আর থাকবে না, যখন তোমার নাম হবে মহিয়সী ম্যাডাম আনা গ্রিগরিয়েভনা ডস্টয়েভস্কি, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে সেদিন তুমি তোমার আজকের এই মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে অসীম করুণায় অস্থির হয়ে উঠেছ। সেদিন তোমার মনে হবে যে যতটা প্রয়োজন ছিল ঠিক ততটা কর্তব্যপরায়ণ তুমি হতে পারোনি। এবং সেজন্য সেদিন নিজের প্রতিই তোমার ঘৃণা হবে। আনা, আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী তোমার সেই ভবিষ্যৎ দুর্গতি থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে অভিলাষী।" বলে দুই পাঁচটি নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অবশ্য আবার দীর্ঘ আত্মদর্শনের পরই ডস্টয়েভস্কির এই অযোগ্য লাভের সূচনা।

আনার কলমে এদিনের যে ছবি আছে তাই দিয়ে এ পর্বের সমাপ্তি টানা হোক।

বক্তৃতা দিয়ে ডস্টয়েভস্কি ত গন্তব্য স্থানে গেলেন। আনাও একটু বেরাবার জন্য একাকীই পথে বেরিয়ে এলেন।

'আমিও ফিরলাম, অল্পপরে দেখি ফেডিয়াও ফিরে এলেন। দেখলুম যে যে-পাঁচটা দুই নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন তার থেকে সাবাড়ই গেছে।

'বললেন, "চলো, ক্যাসিনোয় গিয়ে একটু বাজনা শুনে আসি।"

'আমি সঙ্গে সঙ্গেই তৈরী।'

'ক্যাসিনোয় গিয়ে আর একটু ঘোরাঘুরি করে ফেডিয়া আমার খেলার টেবিলে এলেন। খেলা সুরু হল। আজ অনেকক্ষণ ধরে অবশ্যরাজ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। হয়ত একবারে কিছু উঠল, তারপর আবার হার। এমনি করতে করতে ফেডিয়ার টাকা যখন এক দুইতে ঠেকেছে

আমরা সে টেবিল ছেড়ে অন্য হলে আর একটা টেবিলে এলাম।

'সেখানে তখন খেলা প্রায় ভাঙবার মুখে। ওদের লোক ডেকে বলে দিল, আর মাত্র তিন হান, তারপর আজকের মত খেলা শেষ।

'কেভিয়া তাঁর শেষ দুইটা দান হেরে তুলে দিলেন। অবাক কাণ্ড,—জিত। দ্বিতীয়বার,—এবং সেবারও তাই। এখন কেভিয়ার হাতে তিন দুই। তিনবারের বার আবার,—এবং আবার জিত। বিস্ময়ে আনন্দে উৎসাহে আমি হতবাক হয়ে গেলুম। আমরা কিছু জিতিনি তা ঠিকই কিন্তু আমাদের কিছু হারও হয়নি: যে পাঁচটা দুই নিয়ে কেভিয়া খেলতে বসেছিলেন সে-পাঁচটা দুইই আমরা ফিরে নিয়ে যাচ্ছি।

'অনেক দিন পর আজ আমরা হঠাৎ ভারি হালকা বোধ করলাম। পথ হাঁটতে হাঁটতে অনেক গল্প করলাম আজ এবং সমস্ত পথটা ঘাসিখুসির ভিতর দিয়ে পার হয়ে এলাম।

'বাড়িতে আসার আগে কেভিয়া আমার হাতে একটি চুম্বন রেখে বললেন, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে তাঁর মত সুখী কেউ নয়।'

[ক্রমশঃ]

কবিতা

অনেক দূরের সিন্ধু

যোগেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হে নাবিক পাল তোল
বেচা কেনা শেষ হোল
এই বন্দরে,
কি আনন্দরে।

আবার যাত্রা শুরু
বাজাও ডমরু,
চল ঊর্মি মুখর
উত্তাল সাগর
পেরিয়ে
অনেক দূরে গিয়ে
নিশ্চয় মিলবে বন্দর
চল নিরন্তর।

কথা : গল্প

মীরা সান্যাল

কিন্তু যদি কোনদিন তোমার সুস্মিতা জানতে পারে? সেদিন কী হবে? হঠাৎ অন্যদিকে তাকিয়ে মলয়া বলে ওঠে। তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে বলে—হয়তো তার আগে তুমিই হয়ে যাবে উদাসীন। আর ভালবাসবে না আমাকে। কোন উত্তর দেয় না সুধাময়। শুধু আদরে আদরে ভাসিয়ে দেয় মলয়াকে।

শুধু হৃদয়কে এড়াতে পারে না!

তোমার কথা সব চেয়ে বেশী অন্যায় কখন তা কী জানতাম। দেখো তোমাকে যা দিতে পারলে সুখী হতাম তা দেবার উপায় নেই। তোমাকে হৃদয়ে রাখলাম, কিন্তু জীবনে স্বীকৃতি দিতে পারলাম না। সুধাময় বলে।

ছলছল করে ওঠে মলয়ার চোখ। সুধাময়ের দুটী হাত নিজের নরম দু'টী হাতের মুঠিতে ধরে বলে ওঠে

—থাক থাক বলতে হবে না ওসব। আমিই বা কী দিতে পারলাম তোমাকে। যা দিতে চাই তার কতোটুকু?

সুধাময়ের স্ত্রী আছে। একটী ছেলেও আছে। আর মলয়ার দু'টী বোন। স্কুলে পড়ে। হষ্টেলে থাকে। চাকরী করে মলয়া। ওদের মানুষ করতে হবেন তিরিশ বছর বয়সেও তাই মলয়া কারো দিকে মুখ তুলে চায় নি, কাউকে ওর দিকেও চাইতে দেয় নি। কিন্তু জীবনের সত্যকে এড়ান যায় না। তাই একদিন মালয়াকেও চোখ তুলে চাইতে হল। আর চাইল সে সুধাময়ের দিকে যার ঘরে সুস্মিতার মতো স্ত্রী আছে, আর আছে টুটুলের মতো ছেলে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে যে সুধাময় নিশ্চিন্ত মনে সুন্দর সাজানো ঘরে নিরিবিলি বসে চা খেতে পারে তার সুস্মিতার মতো স্ত্রীর সঙ্গে।

নিশ্চিন্ত মনে নিরিবিলি ঘরে সুস্মিতার সঙ্গে সোনালী চায়ের পেয়ালায় সুখকাল সুধাময়ের অসহ্য লাগেনি। টুটুল সুধাময়ের বুকের পাঁজর, তবু সুধাময়কে আসতে হয় এই একশ এক নম্বর নিমু গোস্বামী লেনের বাড়ীতে—স্যাঁতস্যাতে একতলা ঘরে—সন্ধ্যা কাটাতে। আর প্রতি সন্ধ্যায় একটী প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়—যদি সুস্মিতা জানতে পারে।

—চল সিনেমায় যাই। একটা ভাল ছবি এসেছে Friendly Persuasion সুধাময় বলে।

না, না তুমি বোঝ না তোমার বাড়ীর কেউ যদি দেখে ফেলে কী হবে। মলয়া আপত্তি তোলে।

তবুও মাঝে মাঝে যেতে হয় বাইরে সুধাময়ের সঙ্গে। সুন্দর মায়াবী সন্ধ্যা। মলয়ার জীবনের সব আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ফুলের মতো নরম আর সুন্দর। তার সঙ্গে আছে শংকার কাঁটা। যদি সুস্মিতা জানতে পারে!

সুধাময় বলে—

জানো মলয়া, আমার জীবনের আশ্চর্য ট্র্যাজেডি আমি সুস্মিতাকেও ভালবাসি। ওকে যদি না ভালবাসতে পারতাম তাহলে হয়তো আজ আমার মনে এতো করে বিঁধতো না এ ব্যাপারটা।

মলয়া বলে—

আমি ভাবি যদি সুস্মিতা জানতে পারে ও কী করবে। জানো তোমার সুস্মিতা তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। সেবারে যখন তোমার অসুখ হয়েছিল কী অদ্ভুত সেবা করেছিল সুস্মিতা।

মলয়া তুমিও তো করেছ আমার সেবা সুধাময় বলে। মেনো তখন আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিল। অন্তত একটা জায়গায় গণ্ডী টেনে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর তখন সুস্মিতার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে লজ্জা করে নি। আত্মগত ভাবেই যেন বলে চলে মলয়া।

অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ে। যখন এক-বাড়ীতে থাকতো সুধাময় আর মলয়া। মলয়া তখন স্বচ্ছন্দ ছিল তার প্রীতির প্রকাশে। মনের গোপনে যে ভালবাসার ব্যথা ছিল তাকে লুকিয়ে রাখতে পারতো ও। সুধাময় তখন আহ্বান করলেও নিজেকে সামলে রাখবার শক্তি ছিল ওর।

সুধাময় বাড়ী ফেরে রাত করে। সুস্মিতা কয়েকদিন আগেও জেগে বসে থাকতো। সপ্তাহখানেক হল কোন উদ্বেগ নেই কোন প্রশ্ন নেই সুস্মিতা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে থাকে। সুধাময় নিজের বাড়ীতে ঢোকে চোরের মতন। চাকরটা দরজা খুলে দিয়েই শুয়ে পড়ে। সুস্মিতা ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে টুটুল। তাই, তাড়াতাড়ি যা হয় খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সুধাময়। দিন কাটে একটা একটা করে। দু জনের মাঝখানে তফাতার বরফ জমে ওঠে আরও একটু বেশী করে। সুস্মিতা অনেক গভীর। অনেক নীরব। সুধাময় অপরাধী একথা যেন নিঃশব্দে বলছে সমস্ত বাড়ীটা। নিজের বাড়ীতে প্রবাসী হয়ে গেছে সুধাময়। জানতে পেরেছে সুস্মিতা। ফুলের মতো নরম সত্তার গায়ে যে কাঁটা ছিল সেটা বিঁধেছে।

সুধাময় কেমন বেপরোয়া হয়ে গেছে। যাদুক। যাদুক সুস্মিতা। সুধাময় মলয়াকে ভালবাসে। না ভালবেসে পারবে না। হতে হবে ওকে মলয়ার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে, আর এডমাণ্ড ব্রাডলের বক্তৃতা শুনতে। নির্জন নদীতীরে আর উন্মুক্ত মাঠের হাওয়ায়। সুস্মিতায় যেমন দেখেছে দেখেছে ওর বাস্তবী চপলা, ওদের দু জনকে। দেখুক।

মেয়েরা বোঝেনা পুরুষের জীবনের ব্যাপ্তি অনেক অনেক বেশী। অনেক বেশী ওদের প্রয়োজন। এক নারী কোন পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে সুখী করতে পারে না। মেয়েরা বোঝে না প্রেমের সম্পর্কের একটা পরিণতি আছে। বোঝে না হৃদয়ের একটা ঢেউ মিলিয়ে গেলে আর একটা ঢেউ উঠবে সেখানে। সুধাময় জানে আজ যেমন তার জীবনে সুস্মিতাকে প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন মলয়াকে। মলয়াকে ছাড়লে ওর জীবন হবে অসম্পূর্ণ, অব্যক্তর। যদি সুস্মিতা বোঝাপড়া করতো এসব কথাই বলবে সুস্মিতাকে। সুধাময় ভেবে রেখেছে। বলাই ভালো। মনের কথা সব পরিষ্কার ভাবে বোঝা এবং বোঝান দুটোই দরকার।

আজ না হোক কাল সুস্মিতা এসব প্রশ্ন তুলবেই। তখন সুধাময় বলবে সবকিছু বুঝিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য। সুস্মিতা কিছুই বলল না। সুধাময় মধ্যেকার উদাসীনতা আর স্তব্ধতা কঠিনতর হয়ে উঠল। সুধাময়ের সন্ধ্যা কাটতে লাগল নিরু সোয়ামীর সেনে ভাজা কাপে চা খেয়ে, আর মলয়ার ঘিরু ভাজন খাইয়ে।

কিন্তু জীবন কখনও একটানা চলে না। মাঝে মাঝে ফাঁক নিয়ে, মোড় ঘোরে। একটা অধ্যায় শেষ হয় আরেকটা অধ্যায় সুরু হয়। তাই একদিন সুধাময় মন ঠিক করে ফেলল। মলয়াকে না হলে ওর চলবে না। সেই কথাই মলয়াকে বলবে আজ। সুস্মিতা জানুক। তিরিশ বছরের মলয়ার কুমারী জীবনকে অপবাদের কালিতে কুৎসিত করতে পারবে না সুধাময়। তাকে রাখিয়ে তুলবে প্রেমের

মুখিয়ে। এখন কিছু বলা সম্ভব নয় সুস্মিতাকে। পরে জানবে। সুস্মিতাকে ভালো বাসলেও মলয়াকে ফেলতে পারবে না সুধাময়। সে কথা সুস্মিতা জানবে যথাসময়ে। চেষ্টা করবে সুস্মিতাকে জীবনের সত্যকে বোঝাবার।

মলয়া, মলয়া—সুধাময়ের গলায় ব্যস্ততা আর ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। মলয়া আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। তোমাকে আমি বিয়ে করব। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে তাকাল ওর দিকে সুধাময়।

মলয়া পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে জানলায় ওর দু'চোখে জলের ধারা।

তোমার সুস্মিতা এসেছিল। কী বললো জানো? বললো—মলয়া আমি ওকে হারিয়েছি চিরকালের মতো। আমার কাছে থাকলেও ও তোমারই। তাই আমি প্রার্থনা করছি তোমরা সুখী হও। আমি আজ চলে যাচ্ছি রাত-দশটার গাড়ীতে দিল্লীতে বাবার কাছে। টুটুলও যাবে আমার সঙ্গে। আমি ওর মুখের সে রিক্ত চেহারা ভুলতে পারছি না সুধাময়। এখন কী হবে?

সুধাময় অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। সুস্মিতা চলে যাচ্ছে? সুস্মিতা চলে যাচ্ছে? বারবার আবৃত্তি করলো একটী প্রশ্ন।

ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল সন্ধ্যাবেলার সুন্দর সাজানো ঘরে সোনালী চায়ের পেয়ালা হাতে সুস্মিতা আর টলমল করে হাঁটা নরম একমুঠি ফুলের মতো টুটুল। সুধাময় আর একটী কথাও বলল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল একদম এক নম্বর নিমগোস্বামী লেনের একতলার ভাঁড়-ভাঁড়ে ঘর থেকে। আর তিরিশ বছরের মলয়া আশ্চর্য সব সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ সম্পদ বুকে নিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিল আরো অন্ধকার ঘরের কোণে।

কবিতা

॥ উপলব্ধি ॥

মানিক মুখোপাধ্যায়

দু' চোখে তোমার তৃষ্ণা অপার
বুকে দক্ষিণা ঝড়;
তোমার গতির উষ্ণতা আনে
আমাদের মনে দোলা।
তোমার মমতা জড়িয়ে ছড়িয়ে
প্রেমিক বাঁধলো ঘর,
তোমাকে ছুঁয়েই এখন দেখি সে
বন্ধ দুয়ার খোলা॥

কবিতা

স্মৃতির জ্যোৎস্নাকী

ঘনাক্ত ঘোষ

কেন যে পুড়িস মিছে নামহীন স্মরণের ধূপে
ভস্মে একা অবলীন তারচেয়ে অন্ধকার ঘরে
করুণ কান্নার অভিনেতা কিংবা দাস্তরূপে
রঙ্গময়ী হোস যদি !—হয়নি সে, এতকাল পরে
চিনেছি নিজের ছায়া দীর্ঘশ্বাস আলোর দেয়ালে।

দেখেছে শীতের মেঘে হৃদয়ের হাহাকার সুরু
দুরন্ত শায়ক স্পর্শে, থরো থরো হাওয়া
চিকুর সীমার প্রান্তে, ভীরু দুরুদুরু
প্রার্থনার অন্ধ ভাষা, মৌনম্লান যত পথ চাওয়া

দুর্বল চোখের জলে ! রোদ্দুরের চেয়ে জ্বলা
উজ্জ্বল যন্ত্রণা, তবু কি এখনো
দ্বিধা তোর, তোর তো বিফলই সব অনিঃশেষ চলা
সুতীক্ষ্ণ শিখায় কাঁপা। তা কে বলে। ওরে শোন

এই যে প্রত্যহ এত ক্ষমা ধর কামনার চাওয়া
আঁধার কিছুই নয় : বলে গেল নম্র এক বসন্তের হাওয়া।

এতটুকু বাসা

: গল্প

শক্তিপদ রাজগুরু

—ই কে রে বাসি? বুড়ী ওর সঙ্গের লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। বয়স এমন কিছু বেশী নয়, আন্দাজ ত্রিশ হবে চোখেমুখে পাড়াগাঁয়ের সরলতার ছাপ মাখানো। নিটোল নিটোল দেহ যেন সতেজ দেওদার গাছ—লকলকিয়ে উঠেছে তালপালা সমেত। হেলসোল নয় কঠোর পরিশ্রমের কাঠিন্যমাখা নিষ্পাপ সে চাহনি। অবাক হয়ে বাড়ীটার চারিদিক দেখছে। খোপে খোপে পায়রার বাসা বাধা রঙ্গিনীরা, কেউ চুল খুলে ঝোদ নিচ্ছে; কেউ নীচের উঠোনে বক্ বক্ করছে। পরণে একটা শাড়া আর উত্তরাঙ্গে একটা গামছা জড়ানো। মুকুন্দ এর আগে দু একবার এসেছে এ বাড়ীতে। বাড়ীউলি মাসী একটু পরখ করে চিনতে পারে, শুকনো গলায় একটু রসান দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবার ভাণ করে।

—এসো জামাই এস।

খুব খুশী হয়েছে বোঝা গেল না। এখানে খুশীর মাপকাঠি টাকা; আবছা অন্ধকারে গা ঢেকে আসে খদ্দেরের দল। টাকাগুলো এসে পড়ে ওর হাতে—যার যা রোজকার হিসেব রাখে' বখ্‌রা পরে হয়। মুকুন্দ চাড় থেকে পুটুলিটা নামিয়ে দেয় বাসীর কাছে। নোতুন গাছের আমকটা দিয়ে এল্‌ম, সেই সঙ্গে নোতুন কেনা জমির দু'পাই কিষ্টিতির ভাঁটাদিকে লাগবেক ভালো।

—বাঃ! টক্‌টকে সিঁদুরে আমগুলো। বাসিনীর মনে পড়ে যায় পুকুরের ধারে ভিটেতে তার নিজের হাতে লাগান আমগাছটা; এতদিনে ফলেছে সিঁথির ঘন লাল সিঁদুরের মত টকটকে আগুন মাখান। একটা অতীতের পুঞ্জীভূত নীরব বেদনা তাকে যেন কুরে কুরে খায়। মুকুন্দের দিকে চাইল।

অভাব অভিযোগ—কষ্ট। নিদারুণ কষ্ট। চাষী শাক-ভাতের স্বপ্নও দেখেনি। মুকুন্দ সবজমি বন্ধকদিয়ে শূন্যহাতে বসে আছে। ভাঙ্গা ঘরের আগুড়ে টোকা মেরে যায় পাড়ার যোয়ান ছেলেরা—পথেঘাটে ইসারা করে।

এ ইসারার মানে বোঝে নোতুন বৌ বাসিনী। মুকুন্দ এপা ওপা মনের কাছে ঘোরে—ছায়ানামা উঠানে অবেলায় গলা খাঁকারি দিয়ে আসে পেতুল মহাজন—টাকা শোধ দে বাপু-নইলে তুইও ঘোয়ামীর দেনা শুধতে পারিস।

গলা নামিয়ে কথাটা ফিস ফিস করে বলে এদিক ওদিক চেয়ে।

…পেটের জ্বালা আর বাগ মানে না। কদিন ঘাটি কামড়ে উপুড় হয়ে ভিটেতে পড়ে থেকে সতীত্বের মড়া আগলানো যায়! হাতের কাছে চাঁদ ফেলে মুকুন্দ চোদ্দদিন কোথায় পেড়ে দশখানা ঘরে আনে। সাঁঝ পহর থেকে মড়ার মত পড়ে ঘুমায়। কাল সকালে কোথায় আবার আটগণ্ডা পাবে তার ভাবনাটুকু করবারও সময় নাই তার। পরণের কাপড়খানা ছিঁড়ে গেছে—পিঠ ঢাকা আর ঢাকা যায় না। আদুড় পুরুষ ভাঁজ কাটা পিঠে এসে ঠেকে কত চাহনি। ধকধকে জ্বলন্ত চাউনি।

—বাসি, ও বাসি। গলাখাকরে মহাজন চাদরের নীচে

থেকে শাড়ীখানা বের করে দেয়—পর তুকে যাবাবে। মুকুন্দ আসবে কখন?

মৌমাছির মৌচার খুঁজ নিতে দেরী হয় না। কাজ স্যাকরা দুপুরের দিকে আসে; নিরুম দুপুর—তেঁতুল-গাছটা সব আলো চেকে উঠোন আঁধার করে রাখে।

আংটিটা পরকেরে বাসি—তুর জন্তে আনলম।

কাজের বয়স হয়েছে—পিটপিটে লোভী চাহনি। হা করে চেয়ে আছে ওর দিকে। গায়ের কাপড়চোপড় ঠিক করে নেবার চেষ্টা করে হেসেফেলে বাসি—উদিকে নজর দিতে গেলে হার পরাতে হবে অলোকার মশায়। সৌন্দবে যা লাগে কাজের। বলে ওঠে—সে আর বেশী কথা কি বাসি। হাত ফেরের যাব। তাই হবে।

—বেশ চলছিল। মুকুন্দের কানে আসছিল কিছু কিছু। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে যায় ব্যাপারটা। বাসিনী বাঘিনীর মত রুখে দাঁড়িয়েছে।

—ও লোককে কিছু বলবা না কিন্তু।

রাগে কাঁপছে মুকুন্দ। রোদলাগা দুপুরে কোদালে যন্ত্রণায় মুকুন্দ কাঁপছে। কোঁস করে ওঠে বাসিনী—তুর তুরোয় ত দশ আনা। তাতে একটা প্যাটই ভরাতে পারিস না—আবার খেতেদিবি আমাকে? তারি আমার পুরুষ—তার আবার রাগ!

দামী জর্দা পানে পোরে আজকাল। পাঁচ করে তুর তুরে গন্ধওয়ালা পিচ খানিকটা মাটিতে ফেলল। গর্জন করে ওঠে মুকুন্দ—গলায় স্বর ভেঙে যায়।

—আমার উপরে থাকতে গেলে—ইসব চলবেক নাই। তুর কোনদিন কোদালের পাশার ঘায়ে জিনেলীপনা ছুটিয়ে।

বাসিনী ছোট্ট একটু জবাব দেয় ঠোঁটের ডগায়—ও।

পরদিনই জনখেটে ফিরে এসে দেখে মুকুন্দ ঘর বাসি। শিকল তোলা দরজা—বাড়ীতে কেউ কোথাও নেই। হা হা করছে বাড়ী। বাসিনী চলেগেছে—হারিয়ে গেছে কোথায়। একটি মুহূর্ত! ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে দাওয়ায় বসেপড়ে সে—রাগ! রাগ করবার মত তেজ তার নেই। দুচোখ দিয়ে ঝরে ছিল অসহায় অশ্রু। আজ সে নিতান্ত একা—আপন বলতে আর কেউ রইল না।

…বাঁধনহারা জীবন। রাঢ়ের মাঠে ধান উঠে গেছে। বাসিনী এসে ওঠে খাগড়ার ভুবন বাড়ীওয়ালীর দিদায়। ভুবন ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—অন্তর্দৃষ্টিতে দেখছে নোতুন সতেজ কচি মাদার গাছের মত সবুজ মেয়েটাকে; পাতলা কাপড়ের আবরণ ভেদকরে ওর দৃষ্টি বুক, সারাদেহের অস্থিসন্ধিতে ঠেল যাচ্ছে—যেন নিপুণ পাইকের গরু কিনতে এসেছে হাটে। তেজ, পিঠের শির দিপে মাংস দাবনার বেগ সব দেখছে খুঁটিয়ে।…মন্তব্য করে—তা থাকো বাছা। তবে যেখানকার যা তা করতে হবে বাছা। কাঁচা পয়সা দেখে মাথা গরম করলে চলবে না—এ 'লাইনে'। দেহটার দিকেও নজর দিতে হবে। ওই টাইতো আসল কিনা।

দরজার এদিক ওদিক বেশ কয়েক জোড়া চোখ বাসিনীর দিকে চেয়ে রয়েছে—ভুবনমাসী বলে চলেছে

—ভুবনমাসীর কথাটা শুনিস বাছা—অনেক অগতির গতি করেছি আমি। তোদের জন্তেই বদনাম কিনেছি। কুথায় বা যাবি তুরা—আর আমার কাছেই। মরণের মুখপোড়ারা তাই তো বলে আমাকে উজানপুরের ঘাট—এখানে মড়া আসে না।

গলা চড়িয়ে বিশাল মেদবহুল দেহ নাড়াচাড়া দিয়ে হাঁক পাড়ে—ওরে ও নতি, বাছাকে ঘর দিখিয়ে আয়। আসবাবপত্র বিছানা সবদিচ্ছি যা—কিন্তু দাম কেটে লোব জেমশঃ। তখন 'না' বলতে পারবে না।

বছরের মধ্যে ভিনবার ওদের পরিক্রমা সুরু হয়। কিন্তু

থাকে সহরে পুরোনো ঠাট বজায় রাখতে—বাকী সবাই বের হয় রাতের খান-ওঠা প্রান্তরে—মেলায় মেলায় দেহ কিরি করতে। নগদ খানবেচা কাঁচা পয়সা চাষীবহাতে, ঝকে নাচন লাগে তার। সহরে সাজগোজ করা মেয়ের দল মেলার বাইরে আস্তানা পাতে। রাতের আবছা অন্ধকারে হানাদের বাপবলালসাতরা মানুষ নেকড়ের দল। কাঁচা পয়সা—স্রোত বইছে নদীর জলের মত। ছিনিয়ে হও তো যে পার ধরে নাও। কতুর করে দাও যেনো সুদে জমিদার মহাজনের। মেলার আলো—রোশনাই; সার্কাসদলের ব্যাণ্ডের শব্দ, যাত্রার আসরের বাঁশীর সুর—লোকের কোলাহল থেমে আসে অধিক রাত্রে—মেলা ফিরতী লোকজন তখনও এদিক ওদিক ঘুরছে—চোখে মনে তাদের লালসার ছাপ।

এ এক বিচিত্র জীবন। বাসিনী বানে ভাসা খড় কুটোর মত চলেছে। জগেশ্বর—কপিলেশ্বর—গইঘে বৈরাগীতলা—ঘটাধারীতলা আশপাশের মেলায় মেলায়। অতীতের জীবনটা সব কপসা হয়ে গেছে।

সড়ানে পাথর—গায়ে জ্বরের শেওলা পড়ে না। বেউস্তের মনের মানুষ খুঁজতে যানা। আনাগোনাই যাদের জীবন বাঁধা পড়া তাদের মরণ। দলের রক্ষক গোপীগুণ্ডা—পানের দোকান দিয়েছে মেলায়। পিছনের দিকে কাঠের বাক্সে ভর্তি থাকে সোডার বোতল আর দেশী বিলেতী মদ। দরকার হলে ছুরি ছোরাও বের হতে দেরী হয় না।

—কি গো দিদি। মেলা আলো করে রেছো কত্তি?

গোপীর দিকে চাইল বাসিনী—লাল শাড়ীতে আঁধার আমবাগান আলো হয়ে উঠেছে। হাসে বাসিনী—এমনি ঘুরছি।

গোপী গাছের নীচে কাঠের আগুনজ্বেলে একটা পাঁঠার ঝাবনা বসিয়েছে। মনের চাট ঘুরে।

—লক্ষীকে ছেড়ে দোব?

গোপী জবাবদিইছিল—দাও ছেড়ে, লক্ষীকেও নিয়ে যাবো তাকে। দলের অন্যতম রূপবতী মেয়ে ওই লক্ষী, একটা ভাল মেয়ে থাকে—তিনটে কুৎসিত মেয়েও রোজগার করে—দলের খাতিরেই রাখতে হয় তাকে। গোপীনাথ তার কথায় বলে ওঠে—ঠাট্টা করছো বাসিদিদি?

—নাগো ঠাকুরজামাই। বরাতজোরে তুমি তোমার মত পুরুষ পেয়েছে। —লোভ হচ্ছে নাকি? গোপী বিশাল দেহটা অকারণে দুলিয়ে দুহাত ছাতি মেপে ধরে।

বাসিনীর বাপসা স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—লক্ষী-গোপীর এই মনজানাজানি তার কাছে পুরোনো। অকারণেই মনে পড়ে ছোট একটি ছায়াঘন বাড়ী। খিড়কীর ডোবার সবুজ কচুরীপানায় ফুটে হয়েছে ভেলভেট রংএর ফুলগুলো। পড়ন্ত বেলায় ঢোলকলমি লতার আড়ালে তারকদুটো মুখোমুখিবসে আছে—কতদিন ওদের দিকে চেয়ে মুকুন্দকে বলতো—

—বড্ড দেহারা ওর।

মুকুন্দকে মনে পড়ে। গোপীর চেয়ে ঢ্যাঙা বলিষ্ঠ চেহারা; আগুনজ্বালা নেশা ধরানো একটু বুদ্ধি।

পায়ে পায়ে ঘরে গেল বাসিনী—মনটা কেমন উদাস হয়ে যায় তার।

হঠাৎ মুকুন্দকে দেখে কপিলেশ্বরের মেলায়। গঙ্গাধারের বিস্তীর্ণ দেওয়ারে এসেছে শীতের ছোঁয়া।

ঘরটার চোখ যায় সমুখ আর সমুদ্র। জোলামটরের ক্ষেত। ছুঁয়ে তারার মত কুচিকুচি ফুলগুলো আলোকরে রেখেছে মাঠের বুক। বাতাসে সাইবাবলার হলদে ফুলের সুবাস। ……মেলার লোকজন তখনও ফেরেনি। আবছা আলোয় মুকুন্দকে রেখে এগিয়ে যায় বাসিনী। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। যদি না চেনে তাকে। মুকুন্দের সারাদেহে একটা সুন্দর সরল ভাব। চোখদুটো তেমনি ভাগর;

—শোন!

চমকে ওঠে মুকুন্দ? একমিনিট। ঠায় ওর দিকে চেয়ে থাকে—বাসিনী ওর হাতদুটো টানতে টানতে মেলার বাইরে গঙ্গার ধারে নির্জন বটগাছের নীচে নিয়ে এল।

কাঁদছে বাসিনী; হু হু কান্না। গোপীর জন্যও সেদিন লক্ষ্মী অমনি কেঁদেছিল। কিন্তু বাসিনীর কাছে মুকুন্দ আরও বড়—অনেক আপনজন।—

কাঁদিস না বাসি।

অভ্যেসমত মুখভুলে চাইল বাসী; কই মুকুন্দ ওকে বুকেও টেনে নিল না। অবাক হয়ে ওর রঙীন শাড়ী—গহনাপরা যাযাবরী চিকন দেহের দিকে চেয়ে থাকে। সেই উলুবেড়ের মেটো ঘরের মুকুন্দগোপের বৌ বাসিনী এ নয়। এ অন্য কোনজন—যাকে সে আদৌ চেনেনা। গায়ে হাত দিয়ে সন্দীহ করে।—

বিয়ে করিসনি আজও?

ঘাড়নেড়ে জবাব দেয় মুকুন্দ—না। জমি বন্ধক ছাড়াতে পারিনি। যেতেহবে কোত্থেকে; বিয়ে করতেও টাকা লাগে ঢের। ঘরটা ছাওয়াতে হবে—ছাউনি বাপড়ে গলে গলে পড়ছে দেওয়ালে। আগান কপ্‌নি বেশ আছি।

ওরমধ্যে কি একটুকুও মন কাঁদেনা মুকুন্দের। মনে হয় বাসিনীর মুকুন্দের মন থেকে সে নিঃশেষে মুছে গেছে। সব হারানো দুঃখ তার নিঃস্বজন ব্যথাতুর করে তোলে।

—ভালো আছিস তুই?

বাসিনী একথার জবাব দিলনা। মুখভুলে নীরবে চেয়ে রইল ওর দিকে। ভালো। ভালো সইই আছে তার। মুকুন্দও তাই দেখতে পাচ্ছে। ওর হাতে গুঁজে দেয়—এতদিনের সঞ্চয় ঘুলাপাকানো কয়েকশো টাকার নোট।

—একি! এতটাকা? মুকুন্দ অবাক হয়ে যায়।—ঘর বাড়ী ছাওয়াও, জমির টাকা মিটিয়ে দিও।

মুকুন্দ যেন স্বপ্ন দেখছে আবার বাড়ীঘর উঠবে। জমির ধান আসবে গোলায়—সেই স্বচ্ছল সংসার। কিন্তু!

মুকুন্দ বাসিনীর দিকে চেয়ে থাকে—একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও থেমে গেলসে। বাসিনীর হাতখানা ওর হাতে—বাসিনীর চোখের চাহনি তার চেনা। যে মেয়েটি বিয়ের পর এসে নিজের ঘরবাড়ী জমি জায়গা চিনেছিল। উঠোনে সন্ধ্যাদীপ জ্বালতো আজও সেই চাহনি তার চোখে।

—সহরে এসে খোঁজ খবর নিও।

তুই যাবিনা? বাড়ীঘর জমিজায়গা করবো—এ কথার জবাব দিল না বাসিনী। তার যাবার পথ কোথায়। ও সুখীহোক—বাসিনী তবুও সান্ত্বনা পাবে দূরে থেকেও।

খুঁজে খুঁজে এসেছে কয়েক বছর পর। মেলায় বেউড়াদের তালপাতার ঠেকা দেওয়া ঘর আর আজকের এই সহরে জীবনের পরিবেশ দুটো আলাদা।

একটা তক্তপোষে কাটকটে সাদা বিছানা, দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি। —বস। মুকুন্দ বসলো একটা চেয়ারে। চেয়ারে বসা অভ্যাস নেই। বড় আয়নাটায় নিজের ছায়া পড়েছে—আশেপাশে নানান পাউডার-সন্ধতেল—স্নো এর শিশি। ওপাশে একটা চামড়ার সুটকেস।

—নাও, বাসিনী ইতিমধ্যে দোকান থেকে খাবার চা আনিয়েছে।

—এতসব কি হবে?

—খাও। বাসিনী নিজের হাতে মুখে একটা রসগোল্লা গুঁজে দেয়। হাসছে বাসিনী—তেমনি চাঁদনি, যৌবনপুষ্ট দেহ কাঁপছে হাসির তালে তালে।

—ওই 'চা' করে দেখছো কি গো। আমাকে কি দেখব দেখছো নাকি? বাধা বাড়িয়ে যেতে থাকে সে নীরবে। বড্ড ভালোলাগছে বাসিনীকে—তার আদর যত্ন, ওই হাসি—যৌবন পুষ্ট দেহ—কি এক নেশালাগানো বাসিনী। ওর সাহস বেড়ে যায়। বাসিনী এগিয়ে এসে ওর গালে গাল রাখলো—থর থর কাঁপছে মুকুন্দ।

—ওলো বাসি। ও বাসি। বাঈবাই গলায় হাক পাড়ছে মোতালাথেকে ভুবনডাঙ্গী। দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। জুতোর শব্দ শোনা যায় সিঁড়িতে।

চমকে সরে দাঁড়াল বাসিনী। মুকুন্দ অবাক হয়ে গেছে—ওকে জোরকরে জড়িয়ে ধরতে চায়।

—না। বাসিনী কাপড়চোপড় সামলে নিয়ে ওকে পাশের দরজা দিয়ে ঢিলে ছাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল। গোপী নেই—লক্ষ্মীকে নিয়ে চলে গেছে। ঘরটা খালি।

—এই খানেই থাকো পরে আসছি।

নেমে এল বাসিনী—। খানকলের মালিক দরবারে এসেছেন। বাঁধা বাবু এসময় বাসিনীকে হাজিরা দিতেই হবে।

আলোঝলমল সহর। নেশালাগানো সহর। দিনেরাতে এর রূপ বদলায়। বাসিনীর সেই হাসি—একটু স্পর্শ এখনও ভুলতে পারেনি সে। গালের কাছে আগুনের ফলক জ্বলছে এখনও। কিন্তু সব স্বপ্ন যেন চুরমার করে দিল। বাসিনীর উপর তার দাবী আর যেন নেই।

বাড়ীঘর তুলেছে। বাসিনী যাকে যাকে টাকা পাঠায় তাকে। অধিকারাত্ত কিরিয়ে নিয়েছে। ঘোমটা থেকে নটু ঘোষ এসেছিল বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছে মুকুন্দই। বাসিনীকে এখনও ভুলতে পারেনি।

—কি গো জামাই? একা একা বইছো ভাবলাম যাই গল্পোগাছা করি একটু।

বাসী বলতে মেঘনিয়ে চুকলো। নীচেথেকে হাসির টুকরো গানের সুর শোনা যায়। জড়িত কণ্ঠে কে গান ধরেছে, হাসির শব্দ কানে আসছে। হাসছে বাসিনী—কে যেন তাকে ধরতে আসছে। ধরবার ছুটোছুটি ধড়োধড়ির শব্দ। এ বিচিত্র এক জগৎ। দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে—রাতের আঁধারে জেগে ওঠে। অদ্ভুত এখানকার লোক—স্বাভাবিক মানুষ এরা কেউ নয়। এদের চেনে না মুকুন্দ।

বাসী বলে চলেছে—হেসেখেলে কাটাচ্ছে যাছারা, তাও কি মিশ্চিন্দে থাকতে দেবে। ঘরজুলে দেবে নাকি সরকার।

—সত্যি। মুকুন্দ আশার আলো দেখতে পায়।

হাসে বুড়ী-হাঁ, তুমিও যেমন বাবা; ঢেক বয়স হোল আমার। মানুষের এ নেশা নক্কের নেশা। সী রীক খুঁজে নেবেই। সবই থাকবে কেবল হের ফের হবে—বুইলা কিনা জামাই। খস্ খস্ করে আধপড় গায়ে ঝুলে পড়া মাংসগুলো চুলকোতে থাকে বুড়ী।

রাত হয়ে গেছে মুকুন্দ একাই ছাদের ঘরে পড়ে আছে। মনে হয় এখানে না এলেই ছিল ভালো। মিথ্যা আশা নিয়ে এতদিন বসেছিল সে। বাসিনী অন্য জগতের বাসিন্দা। হাসি-গান-ভোগবিলাস আর আনন্দের স্বাদ পেয়েছে সে। অন্য কোথাও ফিরে যাবে না।

বাড়ী নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে কলরব—হৈ-হল্লা। অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যে যেখানে পেরেছে। আলো নিভে গেছে। এক আকাশ তারা ঝিকমিক করে নীল নির্জনে। হঠাৎ তার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল।

—ঘুমোও নি। বাসিনী ঢুকছে।

স্নান সেরেছে এতরাত্রে; মাথার চুলগুলো চূড়ো করে বাঁধা। সেই জমকালো পোষাক ছেড়ে আটপৌরে একটা হলদে শাড়ী পরে এসেছে। সিঁথিতে আজও সিঁদুর জল জল করছে তার। বিছানায় এসে বসলো। মুকুন্দ তখনও অভিমানভরা চাহনিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

মিনমে কি চেতে চায়। জড়িয়ে ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে কেবল বাজে কথা শোনাবে। মুরোদ ওইটুকুনই।

মুকুন্দের পাশেই আলতো ভাবে শুয়ে পড়ে হাইতোলে —আঃ।

মুকুন্দ কি এক নেশার ঘোরে তার গায়ে হাত দিল—কথাকয়না বাসিনী। ওর দিকে চেয়ে থাকে—এমনি করে অতীতে কত রাত্রি কেটে গেছে।

ওরা দেখলে হাসাহাসি করবে। যাই।

বিছানা থেকে উঠে বের হয়ে গেল বাসিনী। মুকুন্দের মনে ঝড় উঠেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছরের চাপাপড়া ঝড়—বুক কাঁপছে। কাঁপছে তার সারাদেহ কি নিবিড় উত্তেজনায়।

—বাসিনী। ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। মাতালের মত টলতে টলতে এসে বিছানায় বসলো।

বাড়ীটা স্তব্ধ হয়ে গেছে পাথরের মত।

মুকুন্দ ফিরে যাবে বাড়ীতে। বাসিনীর কাছে আর চাইবার কিছু নেই। বাসিনী পর হয়ে গেছে। বাসিনী তার একার নয়—সবার। সামান্য টাকায় বিনিময়ে কেনা যায় তাকে বাঁদীর অন্যান্য জিনিষের মত।

সারা বাড়ী খালি। সকালেই ওরা দলবেধে গঙ্গাপুজো দেখতে গেছে'। হঠাৎ কাদের আসতে দেখে একটু থামকে যায়। খাকীচুড়া পরে থানাদার এসেছে।

সরকারী হুকুম—সহরে ওদের সমস্ত হিসাব চাই। ওদের তোলবার প্রশ্ন উঠেছে। ওই নিয়ে চারিদিকে মাতামাতি চলেছে।

—এরা সব কোথায়?

মুকুন্দ চেয়ে থাকে অবাক হয়ে ওর দিকে। থানাদারও প্রথমে একটু অবাক হয়। পয়সাওয়ালা লোক ও নয়—এ আয়গায় যারা আসে তাদের ও কেউ নয়।

—তোমার কেউ থাকে এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মুকুন্দ জবাব দেয়—দেখতে আসি মাঝে-মাঝে।

কি যেন ভাবছেন ইন্‌স্পেক্টর বাবু। এখানে যারা আছে তাদের অনেকেরই পিছনে এক একটি ইতিহাস আছে, কেউ সমাজে-সংসারে—কারোও বা কিছু নেই। নিঃসঙ্গ—একক এসে ঠেকেছে এই ঘাটে।

—চাষ আবাদ করো?

মুকুন্দ এইবার তার নিজের মত কথাবার্তার ইঙ্গিত শুনে যেন কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে—আজ্ঞে। কবি বিঘে দশেক নিজের আছে কিছু ভাগে করি। আধাআধি ভাগ। ভাবতা দিলে তা আজ্ঞে বছরের খোরাকটা হয়েও বিচি কিছুটা। বাসিনীই আজ্ঞে টাকাকড়ি দিয়েছে—

—বাসিনী! ইনস্পেক্টার বাবুর চোখের উপর ভেসে ওঠে সেই হাসিখুশী মেয়েটা—তোমার বৌ? লজ্জায় মাথা নামাল মুকুন্দ। তুখন মাসী খবর পেয়ে হাসতাস করতে করতে উপরে উঠে আসে—কখন এলেন গো?

শাড়ীর ভাঁজ থেকে এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন বের করে এগিয়ে দেয়—নিন, সেবা করুন।

—দিনকাল বড্ড খারাপ তুখন। ব্যবসা তুলে দাও।

হাসে তুখন—সে কথা তো ঢের দিন হতেই শুনছি। সন্ধ্যে বেলায় এসেন কেনে।

ইন্‌স্পেক্টার বাবু মুকুন্দের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন ভাবছে মনে মনে।

—রাতে তোমার বাসিনীকে আজ একা থাকতে বলো —বুঝলা। কথাটা বলে থানাদার বাবু একবার মুকুন্দের দিকে চেয়ে ভুবনকে বলে ওঠে—তোমার জামাই আজ আছেতো?

ভুবন একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। থানাদার বাবু আসা মানেই বাসিনীর আজ রাতের রোজকার বন্ধ। এতগুলো টাকা বরবাদ। একটু নিস্পৃহকণ্ঠে বলে ওঠে—কে জানে বাবা! ছুঁড়িতো ইদিক বাড়ায় না দেখি, তবু হাপিতোশ যাবে কতি?

জুতোর শব্দ তুলে থানাদারবাবু নেমে গেলেন।

বাসিনী অবাক হয়ে যায় লক্ষ্মীকে দেখে। প্রথম চিনতে পারেনি। চেহারায় শ্রী ফুটেছে। প্রথম ছেলেকে এনেছে গঙ্গায় চান করাতে।

—গোপী কোথায় রে? দেখতে একবারে তার মত হয়েছে যে! লক্ষ্মীর কোল থেকে দামাল ছেলেটাকে বুকে তুলে নেয় বাসিনী। বুক ঠাণ্ডাহয়ে আসে ওর ছোঁয়াচ—বুকজুড়োন ছেলে। লক্ষ্মীর কোল ভরে গেছে—মনও ভরেছে তার। চোখেমুখে তারই মিষ্টি ছায়া। লক্ষ্মী জবাব দেয় —সি দোকানে গেছে। রাধার ঘাটের মোড়ে পানের দোকান দিইছে।

গোপীকেনিয়ে ঘর বেঁধেছে লক্ষ্মী। বেঁচেগেছে এই অকথ্য অত্যাচার-অশান্তির বেড়াজাল থেকে। বাসিনী আনমনে গঙ্গার ঠাণ্ডাজলে ডুব দিতে থাকে—ডুবের পর ডুব দেয়। তবু বুকের ধড়ফড়ানি থামেনা। হঠাৎ কি ভেবে উঠে এল জিজে ভাপ্‌সেলে কাপড়ে।

কি যেন লজ্জার ছায়া এসেছে ওর সারা মনে। অন্যদিন গায়ে সেপ্‌টে লাগা নীল • কাপড় • ছুটে উঠতো উগ্রযৌবন—সেই নিয়েই সহরের রাস্তাদিয়ে কতলোকের বুকে তুফান তুলে এগিয়ে যেতো বাসিনী। আজ আর পারেনা। লক্ষীর কথা বার বার মনেপড়ে। একটি মোমটাঢাকা বৌ—কোলজুড়ে তার দামাল ছেলে—একটি ছোট্ট ঘর রাংচিত্তির সবুজ বেড়ার সবুজ সীমারেখা—বৃষ্টির জলে বাঁশবনথেকে ধারাপাত চলেছে।

মুকুন্দ চলে যাবার আয়োজন করছে। ভুবনমাসীও ফেন তাকে চলে যাবারই আভাষ দিয়েছে। গতরাতে ভেবেছিল বাসিনী আসবে নিবিড় আলিঙ্গনে ওকে ঘেরে তার বিশুষ্ক দেহ মন। সে আশা পূর্ণ হয়নি, আজও হবেনা—থানাদার সাহেবের বলিষ্ঠ বিশাল দেহটা মনেপড়ে, কোনদিনই আর বাসিনী একা তার হবেনা। দুজনের পথ বেঁকে গেছে দুদিকে।

দাঁড়াও।...মুকুন্দ ফিরে চাইল। বাসিনীর চোখেমুখে কি একটা দৃঢ়তা; লক্ষ্মীর হাসিমাখা মুখ মনে পড়ে—কোল আলো করা ছেলেটা। একটু ঘর। বাসিনী ভুলতে পারেনি—তার মনে ঝড় উঠেছে। একটা পুঁটুলি হাতে বাসিনী তার দিকে এগিয়ে আসছে—একনিবিড় ব্যাকুলতা ওর চাহনিতে। ওর হাতধরে পিছনের ঘরটা দিয়ে নির্জন দুপুরে রাস্তায় নেমে পড়ল। খাঁ খাঁ রোদজোড়া শহর—অবাক স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যার পরই থানাদার আসেন—ভুবনমাসী গজ গজ করছিল, থানাদার বাবুকে দেখে ঘোমার মত ফেটে পড়ে। ঝনঝনকরে খাপকাটা কাগার মত গলা—এর বিহিত করেন বাবু। যে ছুঁড়ীকে কত করে বললাম তা কে কার কথা শোনে। ছুঁড়ি বাক্সপ্যাটরা নিয়ে ভ্যাং ভ্যাং করে চলে গেল সেই ছোঁড়ার সঙ্গে। বুকে তার ডর কিছু নাই গা। সাতকেলে ভাতার বিনা—তাই ঘর করতে গেলেন তিনি। মরণও হয় না তোর। সব শয়তান বাবু —হাড় শয়তান। প্যাটের জ্বালায় মরতে আসে এই ঘাটে।

থানাদার বাবুর মুখে চোখে একটা চাপা খুশীর আভা। মুহূর্তের হতাশাভরা মুখখানা বার বার মনে পড়ে, এখন সেই হতাশার কালো ছায়ার নয়, আনন্দের আভায় ভরে উঠেছে তার মুখ। বাসিনীও তার ঘর ফিরে পেয়েছে। বেঁচে গেছে সেও।

তার হিসাবের খাতা থেকে বেশ কয়েকটা নামই কাটা পড়ছে লাল কালিতে। সন্ধ্যা হয়েছে—বাসিনীও গেল-বার ও এখান ওখান থেকে যত্নআত্তি ওরা-ঘরে ফিরছে পথচেয়ে।

—বসবেন না? ভুবনদাসী এগিয়ে আসে।

—না। কাজ আছে। থানাদার বাবু বের হয়ে এলেন খুশীমনে।

কবিতা

পাড়

শ্রীভূষণ চাকী

সাগর বড্ড বড়ো
এসো পুকুর ঘাটেই বসি,
যেখানে বুনো ঘাস
জল-বধূর পা জড়িয়ে ধরে;—

রোদের দোলনায় দোলে
ঘর পালানো ফড়িং,
ছোট্ট শাখা পাখিকে নিয়ে নাচে—
খাঁইমশা ঘুরে ঘুরে জলছবি আঁকে,
পা টিপে টিপে হাঁটে পানকৌড়ি
পাছে দুপুরের ঘুম ভাঙে পাতার শব্দে।
এখানে আকাশ নাইতে নামে।

সাগর বড্ড বড়ো,
এসো পুকুর ঘাটেই বসি।

উত্তরণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

। নীলিমা দাশগুপ্ত ।

ভাবিত হয়েছেন মায়াদেবী।

সন্ধান থেকে ছেলে-মেয়ে—বউ তিনজনেই থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরছে ফিরছে, হল কী? কী এমন কারণ ঘটলো শ্বশুরের বাড়ীতে? তবে কী অপমানিত হয়েছে ওরা? না তা সম্ভব নয়। বউমার কাছ থেকে যে আপ্যায়ন গল্প শুনেছেন তিনি ঘোষকাকার তাতে ও প্রশ্ন ওঠেই না। তবে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনজনকেই নানা কথা জিজ্ঞেস করেছেন কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হননি তিনি। ভয়কারী কুটতে কুটতে চিন্তা করছিলেন মায়াদেবী। খবর নিয়ে জেনেছেন মল্লিকা কাল বিয়েবাড়ি থেকে খেয়ে আসেনি, অথচ মল্লিকা বললে অসম্ভব খেয়ে এসেছে। এর মানে কী? মেয়েকে এর মানে জিজ্ঞেস ক'রে আর লজ্জা দিতে চাইলেন না। অরুণ মুখ শুকনো করে অফিসে চলে গেলো। মলিনাকে দেখতে পাচ্ছেন আধঘণ্টা অন্তর বাপের বাড়িতে টেলিফোন করে যাচ্ছে। মল্লিকা ডুবে থাকে পড়ার ঘরের বইয়ের মধ্যে। সুখ-সহজ ভাব মায়াদেবী কারুর মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছেন না। মলিনাকে নিচে নেমে আসতে দেখে ডাকলেন,

"বউমা শোনো তো—!"

মলিনা শাশুড়ির সামনে এসে সিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়লো। হাত বাড়িয়ে ডালা থেকে বঁটিখানার খাঁটি নামিয়ে নিয়ে শুরু করলো বাছতে। মায়াদেবী একনজর তাকালেন বউ এর মুখের দিকে। সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন,

"তোমার বাপের বাড়ির কেউ অসুস্থ হ'য়েছেন নাকি?"

"না তো—" সংক্ষেপে উত্তর সারলো মলিনা, মায়াদেবী এবার স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কী হ'য়েছে বউমা? তুমি অত ঘন ঘন ফোন করছো কেন?"

"ছোড়দাকে বড্ড দরকার মা, কিন্তু বাড়িতে কিছুতেই পাচ্ছিনে। ছোড়দা বড়দা কেউ বাড়ী নেই! তাই—" মলিনার ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে মায়াদেবী আর জিজ্ঞেস করলেন না। মনে মনে ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলেন।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ মলিনা তার ছোড়দার রেখা গেলো, কল্যাণ পা টিপে টিপে উপরে উঠে, বোনের বেণী ধরে এক টান্। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ছোড়দাকে দেখে মলিনা কেঁদে ফেললে।

"কী হোলো রে টুনটুন? পাঁচ মিনিট পরে কাঁদিস লক্ষ্মীটি, আমাকে আগে এক কাপ চা খাইয়ে নে—" চেয়ার টেনে ধপ করে বসে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে লাগলো কল্যাণ। মল্লিকা পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, "বৌদি তুমি বস, আমি চা নিয়ে আসছি। মল্লিকা ক্ষিপ্র পায়ে নীচে নেমে গেলো। "ছোড়দা—!" বেতের চেয়ারটা কল্যাণের সামনে টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললো মলিনা, "তুমি মীতাকে কি বলেছো?"

"কী বলেছি…?" জেনেও কল্যাণ না জানার ভান করলো।

"বলেছো—বলেছো যে তোমার বুকের অসুখ হ'য়েছে।" টি-বি কথাটা মুখ দিয়ে মলিনা কিছুতেই উচ্চারণ করতে

পারলে না। মলিনার দুর্বলতার কৌতুক অনুভব করলো কল্যাণ. হেসে ফেলে বললে, "হ্যাঁ বলেছি—।"

"বলেছো ?" ভীরু আর্তস্বর মলিনার কণ্ঠে,

"তোমার ঐ অসুখ তাহলে সত্যিই হয়েছে নাকি—?"

"না"—। রহস্য চপল কণ্ঠ কল্যাণের।

"তবে—?"

"তবে কিছু না।" মুখ টিপে হাসছে কল্যাণ—

"শিগগির খোলসা করে বল ছোড়দা, ওদিকে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে—"

"দম ফেলেনে টুনটুন, বলছি আস্তে আস্তে—" চোখে হেলান দিয়ে হাসিমুখে আরাম করে বসলো কল্যাণ, "এক পেয়ালা চা না খেয়ে আর কিছু বলতে পাচ্ছিনে—। দাদার যন্ত্রণায় হয়রানির একশেষ হ'য়েছে আজকে—।"

"তোমার পায়ে পড়ি ছোড়দা, অল্পকরে বলো, দাঁড়াও আগে একটু চায়ের তাগাদা দিয়ে আসি।" "থাক তোর আর তাগাদা দিতে হবে না। বলছি আমি, বীতার হাত-থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য—"

"বল কী ছোড়দা ? সেজন্যে এমন এক মর্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা করলে ! তুমি দেখছি সব পারো ছোড়দা। তোমার ভাবী বধূটি কে···? বলো না ছোড়দা লক্ষ্মীটি। আমি আর কাউকে বলবো না।" ঠিক্ এই সময় মল্লিকা ট্রে-হাতে করে দরজা পর্যন্ত এসে গেছে। ঐ ধরনের কথা কানে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো।

"আমার ভাবী-বধূর খবর দিলে কে তোকে ?"

"দিদি—বিপিঠাকুর কি—"

"ও, মল্লিকা-দেবী—?" বিচিত্র এক অদ্ভুত হাসি হাসলো কল্যাণ।

মলিনা আগের কথার জের টেনে বললে "তুমি যে ভাবী বধূর জন্যে দুশ' টাকার টিকিট কেটেছো, তাও জেনেছি।"

"যেন করেছিস্। তবে খোলসা করে বলো বুঝে পাগল হচ্ছিলি কেন ?"

"তাঁর নামটা বলো না ছোড়দা !"

মলিনার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর !

শুধু নাম দিয়ে মানুষের পরিচয় হয় নাকি ? আমি যদি বলি প্রাক্তোবিবি—" খিলখিল করে হেসে উঠলো মলিনা "অর্থাৎ তুমি বলবে না—"

ও ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা আর ভাল লাগলো না মল্লিকার। অথচ এই কথাবার্তার মাঝখানে যেতেও যুক্তিল লাগে। কিন্তু এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকি গেলে শোনাটা তো আরো অন্যায় ! ওদিকে কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে···। শেষ পর্যন্ত ঢুকেই পড়লো মল্লিকা ট্রে-হাতে নিয়ে।

মলিনা তাড়াতাড়ি উঠে একটা টিপয় এনে ছোড়দার সামনে দিলো, মল্লিকা নত হয়ে ট্রেটা রাখলো তার উপর। কল্যাণ তৎক্ষণাৎ পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো, "ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ মল্লিকাদেবী। চমৎকার কফি বানাতে পারেন তো—।" মল্লিকা লাজুক হেসে বললো, "ভাল হ'য়েছে ? বৌদির কাছে শিখেছি আমি—"

"অর্থাৎ প্রশংসাটা আপনার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য বৌদির—এই বলতে চান তো ?"

মল্লিকা হাসি মুখে চুপ করে রইলো। চেয়ার ঠেলে ওঠে দাঁড়িয়ে মলিনা বললো, "শোন্ ছোড়দা শোন্···। তুই তো আমাকে আমলই দিতে চাস্নে। আমার সিঙ্গার হাত দিয়েই কেমন তৈরী হয় কফি···।" হেসে বাকী অংটা বোঝালো মলিনা।

"তুই আবার চল্লি কোথায়···। বোস্। মল্লিকাদেবী বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?" চামচ-দিয়ে মাখনেটের টুকরো ভেঙে মুখে দিতে দিতে বললে কল্যাণ।

দাঁড়া, আগে মাকে দিয়ে একটা হরিষমুটের ব্যবস্থা করে আসি, কাল রাত থেকে যা দুঃশ্চিন্তায় কাটিয়েছি—। ওরে ও একটা ফোন করতে হবে—" যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে মল্লিকা বললে, "ছোড়দা! তোর নাকি বিলেত যাওয়া একেবারে ঠিকঠাক্, মার কাছে শুনলাম।"

"হ্যাঁ। মাস-খানেকের মধ্যেই যাচ্ছি—"

"তোর ফিরে আসার সময় মা বাবা যাবেন শুনলুম; সে সময় আমিও যাব রে, মাকে বলে রেখেছি—"

"উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তুই কি অরুণবাবুকে ছেড়ে পারবি থাকতে অতদিন? এখানে তো একদিনও—" "ধ্যুৎ তুই বড় ফাজিল হ'য়েছিস ছোড়দা—" মুখ রাঙা করে চলে গেল মল্লিকা। "আপনি যে একেবারে চুপ মল্লিকাদেবী?" হাসিমুখে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে কল্যাণ বললো। মল্লিকা উত্তর দিলো, "আমি আপনাদের কথা শুনছিলুম। বিলেত যাচ্ছেন তাহোলে—?"

"হুঁ, যাওয়া একরকম ঠিক।" মল্লিকা মনে মনে একটু চিন্তা করে বললে, "আর কোথাও যাবেন নাকি···?"

"নিশ্চয়ই যাওয়া উচিৎ। বিধাতা বিরূপ না হলে কাছাকাছি সব দেশগুলোই দেখে আসবো।" মল্লিকা কল্যাণের মাথার ওপর দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে। দু তিন সেকেণ্ডের বেশি নয়, কল্যাণ তার মধ্যেই দেখতে পেলো, মল্লিকার চোখের তারায় বাষ্পের —ছায়া। তখুনি চোখ নামিয়ে স্মিত মুখে বললে মল্লিকা - "আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে না? কত দেশ ঘুরবেন, দেখবেন কতকিছু, কতকিছু শুনবেন—"

"ও সব দেশ দেখতে ইচ্ছে করে নাকি আপনার?"

"ওমা! কার না ইচ্ছে করে" মল্লিকা শব্দ করে হেসে উঠলো।

"বেশ তো, চলুন না—" "সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো কল্যাণ।

"কেমন করে?" মল্লিকার কণ্ঠে কৌতুক, কল্যাণ যাওয়া শেষকরে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বললো,

"কেন? প্রেমে—। ইচ্ছে করলে জাহাজেও ভেসে পারেন, তবে তাতে বড্ড সময় বেশী লাগে—" খিল খিল করে হেসে উঠলো মল্লিকা, বললো "মেয়েদের যাওয়া অত সোজা নয় কল্যাণবাবু। কার সঙ্গে যাবো···? তাছাড়া সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো প্রচুর টাকা লাগে।" কল্যাণ সহজে বললো আপনি এ ব্যাপারে একটু কম খবর রাখেন মল্লিকা দেবী। আকছার যাচ্ছেন মেয়েরা আজকাল, তবে বিলেত পর্যন্ত এসকর্ট নিয়ে যাওয়া অবশ্য ··" হেসে বাকী কথাটুকু শেষ করলো, তারপর বললো "চেষ্টা করলে টাকার যোগাড় ও হ'য়ে যায়, কত রকম স্কলারশিপ দিচ্ছে আজকাল, আপনার সত্যিকার ইচ্ছে থাকলে, আনায়াসে আমার সঙ্গে যেতে পারেন—" মল্লিকা আবার শব্দ করে হাসলো, বললো, "আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ।"

"ছেলে মানুষ··!" সোজা হয়ে বসলো কল্যাণ,

"তাই তো দেখছি—"

"আপনার বয়স কত?" কপট গাম্ভীর্য্য কল্যাণের কণ্ঠে। মল্লিকা হাসলো হেসে হেসে বললো 'মেয়েরা নিজের বয়স কখনও কী ঠিক বলে—"

"তবু শুনি—?"

"আঠারো শেষ হয়ে গেছে—"

"আর আমার চব্বিশ। আমি হলেম ছেলেমানুষ—" মুখে গাম্ভীর্য্যের ভাব আনতে চেষ্টা করলো কল্যাণ হাসি চেপে মল্লিকা বললো, 'সাংসারিক অভিজ্ঞতা মেয়েদের আঠারোতে যা হয়, ছেলেদের আঠাশেও তা হয় না। আপনার তো চব্বিশ সবে—" 'আচ্ছা মানলাম, আমার ছেলেমানুষিটা কোথায় দেখলেন তাই না হয় বুঝিয়ে বলুন।'

মল্লিকা বললো, "আপনার সঙ্গে যাওয়াটা বুঝলুম, কিন্তু আপনার টাকায় কেন যাবো···?" "আমি দেব কেন···? আর আপনি দেবেনই বা কেন?" "আহা! যারই না হয় দিলেন, কেউ কি নেয় না যায়···।" মল্লিকা মুখ টিপে টিপে বললো, "কেউ এ-ভাবে নিয়েছে কিনা জানি, তা আমার জানা নেই কল্যাণবাবু, তবে আপনার এ দেনাটা চিরদিন আমার মনে থাকবে।"

কী মনে হোলো মল্লিকার হঠাৎ একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলো, "রমাদি যাচ্ছেন নাকি—?"

কল্যাণ মনে মনে হাসলো। নিরীহ কণ্ঠে বললো, "না তো, রমা যাবে কেন? রমার যাওয়ার কোন কথা হয়েছে নাকি?" মল্লিকা ভয়ানক অপ্রতিভ হলো। যেটার কথা বলার জন্য নিজেকে চুপিচুপি বিস্তর দিলো বারবার। মুখে বললো "না, এমনি আমি বলছিলেম—" কল্যাণ মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হাসিমুখে বললো, কিছু যদি না মনে করেন তো বলি, চট্ করে কথা গাপা দেওয়ার মতো যদি কিছু থাকে তো অমনি—পথটা, কীবলেন?" মল্লিকার কাণের দুপাশ লাল হোল একটু। আর সঙ্গে সঙ্গে কথা পালটালে কল্যাণ; "কোনো বই পড়লেন নাকি?" সহজ হয়ে মল্লিকা বললো—

"হ্যাঁ দুখানা বই শেষ করেছি—।

"তবে যে বললেন, ইংরিজি বই পড়তে বড্ড সময় লাগে আপনার।" মল্লিকা বললে, "ছোট ছোট দুখানা বই—। 'এ-টিয়ার এ্যাণ্ড এ-স্মাইল' আর "দি রোমি অব থ্রি ক্যাট্ উইমেন।"

"কেমন লাগলো?" কল্যাণের প্রশ্ন।

মল্লিকা বললো, "প্রথমখানা খুব চমৎকার আর দ্বিতীয়খানা ভারি মজার—" একটু চুপ থেকে মল্লিকা আবার বললো "কল্যাণবাবু! আপনার তো ইতিহাসে অনার্স ছিলো-না?"

কল্যাণ বললো, "ছিল নামকোয়াস্তে। কোনমতে সেকেণ্ডক্লাস পেয়েছিলাম। কেন বলুন তো? বই চাই?" মল্লিকা মিন মিন করে বললো, "না। নোট্সের জন্য বলছিলুম।"

হো হো করে হেসে উঠলো কল্যাণ, "আচ্ছা লোভিকে! তাহলে ধরেছেন মল্লিকাদেবী। চিরটাকাল আমি পড়াশুনার ফাঁকি দিয়ে এসেছি। মল্লিকা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "আপনার মুখ দেখে কিন্তু অন্যরকম মনে হয়—।"

"কি রকম···?" মল্লিকা অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলো। বৌদিটা আসে না কেন? দাদারও অফিস থেকে ফেরার সময় তো হ'য়ে গেছে, কেউ একজন এলেই তো পারে"?

"কৈ···? কিরকম লাগে বললেন না—"

"এই···মানে···খুব পড়াশুনো করেছেন; সেইরকম মনে হয়—" থেমে থেমে উত্তর দিলো মল্লিকা। কল্যাণ হাসতে হাসতে বললে, "বেশ একটা বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব—না?

দেখুন, ভগবান একেবারে তো আর নির্দয় হতে পারেন না, দুখের ও ভাবটুকু দয়া করে দিয়েছেন ওরই দৌলতে এতদিন কষ্টে পেয়ে এসেছি ফাইভে ফাবে—"

মল্লিকা হাসি মুখে চুপ করে রইলো।

"চলুন আপনার পড়ার ঘরটা ঘুরে আসি একটু—" কল্যাণ উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ। মল্লিকাও উঠলো "আমার ঘর দেখে খুসি হবেন না—। বই নেই বললেই হয়—" পড়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে মল্লিকা। ঘরে ঢুকে পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে দিলো, কল্যাণ দেখলে কিরে শেলফের বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখা শুরু করেছে। শেলফের বই দেখা শেষ করে, দেয়াল আলমারীর বই-

গুলোর নাম মনোযোগ দিয়ে পড়লো "আপনার বাংলা বইয়ের কলেকশন তো···" ঘাড় ঘিরিয়ে মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে থেকে গেলো কল্যাণ, গোধূলির সোনালি আলো এসে পড়েছে মল্লিকার চোখে মুখে। অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর লাগছে ওকে, অপূর্ব। একেই বুঝি বলে মেধা সন্ধে বলে, কল্যাণকে থামতে দেখে মল্লিকা মুখ তুললো, তাকালো কল্যাণের দিকে, এক মুহূর্তের জন্যে। শুধু মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো—বিমানবাবু সামনে দাঁড়ালো, বিমূঢ় হয়ে পড়লো ও একটু কাল, তারপর জোরে হেসে উঠলো।

"কী হলো—?"

কল্যাণ চোখ নামিয়ে নিলো। "না কিছু না।" মল্লিকা হাসতে হাসতে বললো, "তাহলে কল্যাণবাবু, চট্‌করে কথা চালা যাওয়ার জন্য আমার আরও একটা কথা মনে রইলো—না কিছু না," একসঙ্গে হেসে উঠলো দুজনে। বাহাদুর সিং সাড়া দিয়ে জানিয়ে গেলো মিসিমনিকে ঠাকুরঘরে যাইতে একবার তাকালেন। মাত্রক: সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো, যাওয়ার সময় বলে গেল, "আপনি বসুন, কল্যাণবাবু। আমি বৌদিকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" কল্যাণ বসলো না, ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো ঘরের চারিদিক, চারটে দেওয়ালে শুধুমাত্র চারখানা হাতে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি, একখানা ছবির সামনে এসে অনেক সময় দিয়ে দেখলো কল্যাণ; তারপর চোখ সরালো, পর্দাগুলির এম্ব্রয়ডারির ওপর ঘুঁরে গেলো চোখ, ঘরের একেবারে দক্ষিণ কোন ঘেঁষে ছোট একটা টেবিল, টেবিলের পাশে সাধারণ একটা চেয়ার, আকাশি রঙের—টেবিল ভর্তি চার কোনে চারটে রঙের স্টেনসিলের তৈরিতে জলের পাশে তিন চারটে লম্বা লম্বা ঘাস, ঘাসের ধারে বক তার স্বভাব অনুযায়ী এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সামান্য কয়েকটি নিপুণ তুলির টানে ঘাস আর জল অপূর্ব ফুটে উঠেছে। বকের রঙ এতই স্বাভাবিক হয়েছে যেন একেবারে জীবন্ত। কল্যাণ এগিয়ে এলো টেবিলের সামনে, বকের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, টেবিলের উপর কয়েকখানা খাতাপত্তর ছিলো। একটু ইতস্তত করে কল্যাণ ওপরের খাতার প্রথম পাতাটা ওল্টালো, মোগল যুগে আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার সম্বন্ধে লেখা।

"বেশ কাজের মানুষ দেখছি মল্লিকা দেবী, এরই মধ্যে নোট্‌স যোগাড় করে ফেলেছেন—খাতাটা বন্ধ করতে গিয়ে, ছোট্ট একটা খামের কাগজ এদিক ওদিক কোথা থেকে যেন পড়ে গেলো, হেঁট হয়ে কাগজটা তুলে রাখতে গিয়ে লেখা কয়েক ছত্র পড়ে ফেললো·····"জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিসিস্‌ম আর রিয়ালিস্‌মের প্রশ্ন চিরদিনই মনকে ভাবিয়ে তুলেছে, অজস্র চিন্তা, সহস্র জিজ্ঞাসা, সদুত্তর কোনদিনই নিজেকে নিজে দিতে পারিনি—যদিও কোন একটা বিশেষ প্রশ্ন ওঠে নি, যার জন্য একটা বিশেষ উত্তর দরকার—তবু—" অন্যমনস্ক হয়ে ঐ লেখাটার দিকে তাকিয়ে কী ভাবলে কল্যাণ কে জানে, কাগজের টুকরোটা ভাঁজ করে রেখে দিলো পকেটে—

ঘর থেকে বেরুতেই অরুণের সঙ্গে মুখোমুখি—

"আরে তুমি ওখানে? আমি এদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে—। বলো, বলো অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে"। মহাস্তে বললো অরুণ। কল্যাণ চেয়ারে বসে পড়ে বললো, "অনেক কথা—? কথা নয়?"

"না, না, কথা টথা নয়, মেরে কাটা। প্রয়োজন হলে ঘুঁসোঘুঁসি চলতে পারে।

তোমার ছেলেমানুষিতে কাল আমরা ঘুচোখের পাতা এক করতে পারিনি—তা জানো?" কপট ক্রোধ অরুণের কণ্ঠে। কল্যাণ দুহাত জোড় করে হাসতে হাসতে বললো, "আমার দুষ্কৃতির জন্য

আপনাদের সকলের কাছে করজোড়ে আমি মার্জনা চাইছি অরুণদা। অসুখের কথাটা যে এমন ভাবে ছড়িয়ে যাবে তা একবারও ভাবিনি। ওদিকে দাদার কাণ্ড শুনুন—সকালে বেরুবার—শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন 'চল একটু আমার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলুম—কোথায়? পরে শুনবি। চল্ তাড়াতাড়ি। 'সারাদিন ধরে, কলকাতার সমস্ত নামকরা ই-বি-স্পেশালিষ্টকে দিয়ে আমার বুক পরীক্ষে করালেন। বাধাদিয়ে যত বলি—দাদা আগে আমার কথাটা শুনে নাও—তা কে কার কথা শোনে। ধমক দিয়ে উঠলেন—তুই থাম হতভাগা। বোললাম এমন দাদা থাকলে সে হতভাগা হয় না—। দাদা ক্ষেপে গেলেন। আবার শুরু হচ্ছে, শিগ্‌গির থাম বলছি। সমস্ত ডাক্তারের মন্তব্যেও ঘুচলোনা সন্দেহ। ফ্লুরিং করিয়ে ডাক্তারের রিপোর্ট শুনে তবে আমাকে বিকেল চারটের নিষ্কৃতি দিলেন। দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত দাদার পাগলামিতে হোটেলে খেতে হয়েছে……। এদিকে বাড়িতে এসেই শুনি বার দশেক ফোন করে বসে আছে টুনটুন—বাড়িতে পা দেওয়া মাত্রই আমি যেন টুনটুনের কাছে চলে আসি—। বুঝুন তাহলে আমার অবস্থাখানা। আজ একেবারে বাকে বলে তাজা তাজা হয়ে গেছি—" স্মিত মুখে বললে অরুণ, "তারাহে, অবস্থা তোমার বুঝেছি বৈকি। বুঝলাম—শুনলাম এমনকি এ রাস্তাটুকু আসতে আসতে মাথাও খাটালাম; তুমি শুধু নাম ঠিকানাটা বাতলে যাও। যা ব্যবস্থা করার—কাল আমরা।

বিস্ময়ের ঘরে কল্যাণ বললো, 'কার নাম ঠিকানা?" অরুণ বললো, "কার আবার, হায় হাইনেসের…। বাঙলায় আরেকটু মিষ্টি করে বলতে পারি তোমার মনোহারিনীর।" সকালের নরম মিষ্টি-রোদের মতো কল্যাণের চোখমুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপরই মেঘ এসে ঢেকে দিলো রোদ্দুর। উত্তরের অপেক্ষায় কিছু সময় অপেক্ষা করে অরুণ আবার তাগাদা দিল "কৈ-হে, বলো—"

ধীরে ধীরে কল্যাণ বললো, "সে হয় না।"

"সে হয় না মানে? আমরা আছি কি করতে?" অরুণের কণ্ঠে প্রচুর উৎসাহ।

নিস্তেজ নিরুত্তাপ কণ্ঠে কল্যাণ বললো, "নানান গোলমাল আছে, তাছাড়া মাসখানেকের মধ্যে তো বাইরেই চলে যাচ্ছি—" "তাতে কী? কথাটা যেন লুফে নিলো অরুণ যেমোনা সাতদিনের মধ্যে বিয়ে ঠিক করে ফেলছি তোমার। বিলেত গিয়ে বিরহের লম্বা লম্বা পত্রালাপ চালাতে পারবে যে তাহলে—। আর গোলমাল যত জটিল হক না কেন, তুমি মাৎ মারবড়াও। তিনি যিনিই হন না কেন, ঘষা-মাজা-রেঁদা-কুরুপা-কুরূপা, গুণহীনা গুণবতী যাই হোক্…আমি মলিনা আর সাধনবাবু তিনজনে মিলে সব ব্যবস্থা করে ফেলছি। তোমরা হলে টাকাপয়সার মানুষ, ফোনে ফোনে বিয়ের বাজার করে ফেলবে একদিনে—। অতএব পরিচয় প্রকাশ করো—"

কল্যাণ যেন আকাশ পাতাল ভাবতে শুরু করলো।

বিস্মিত কণ্ঠে বললে অরুণ, "কী হলো হে—"

"অসুবিধে আছে—" একটু উসখুস করে উত্তর দিলো কল্যাণ। "কিসের…? বলই না খুলে। তবে তো বুঝি ব্যাপারটা—" অরুণের কণ্ঠে অনুযোগ। কল্যাণ এতক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে চিন্তা করে উত্তর দিচ্ছিলো। এবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো অরুণের দিকে। হাল্কা হাসলো একটু। বললো তারপর…"মানে তার কাছে এই ব্যাপার নিয়ে কোনদিন কোনরকম প্রোপোজ মানে আমার মনোভাব তাকে বিন্দুমাত্র জানাইনি…মানে—"

"সে কী—?" বিস্ময়ে অরুণের চোখ কেটে পড়বার

মতো। কল্যাণ লজ্জা পেলো। কানের ডগা গরম হলো একটু। কল্যাণের আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণ আবার বললো, "আচ্ছা, তোমরা ভাই বোনেরা কী বলতো? একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিলে আমাদের। একে প্রেম বলে নাহে, এ একরকম মানসিক ব্যাধি। মনে মনে স্বপ্ন জাল বুনে যাওয়া। পরিচয় পর্যন্ত ভালভাবে যার সঙ্গে হয়নি। তারজন্য রীতাকে প্রত্যাখ্যান করলে। আর প্রত্যাখ্যান করলে এমন একটা উপায় বেছে নিয়ে— যা অদ্ভুত হাস্যকর," কল্যাণ নড়ে চড়ে বসলো "কাজল জন্ম না হলেও আমি বিয়ে করতেমনা রীতাকে। রীতার রুচির সঙ্গে আমার আলো মেলে না।"

"এদিকটা বুঝলাম —" স্মিতমুখে উত্তর দিলো অরুণ, কিন্তু ওদিকে যব তুমি বিলেত থেকে এসে দেখলে তোমার মনোনীতা আর একজনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পরমানন্দে ঘর করছে, তখন—।" এতক্ষণে আড়ষ্টভাব কাটিয়ে উঠেছে কল্যাণ। কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হচ্ছিলো। এইবার হাসতে হাসতে বললো, "তাল লাগলেই তাকে বিয়ে করতেই হবে নাকি? ও আমি মানিনে। সংসারের সবক্ষেত্রেই বৈর্যের প্রয়োজন আছে। আর কিছু না হোক। আমার ভাল লাগা তো থাকবে আমারই; ওতো আর কেড়ে নিচ্ছেনা কেউ—। এবার অন্যকিছু বলুন অরুণদা। মাত্রীমাগা আসছেন মনে হচ্ছে।"

(ক্রমশঃ)

কবিতা

বর্ণালী বুদ্বুদ

সুধীর মুখোপাধ্যায়

বর্ণালী বুদ্বুদ যেন
দু'একটা ভাবনাকে ছুঁড়ে দিই
আকাশের নীলে,
গায়ে তার সাতরঙ লাগে
তারপর মহাশূন্যে সবকটা
একে একে ফেটে ফেটে যায়,
আবার নতুন করে ফিরে ফিরে
ওড়াতেই হয়।

কেননা তখনও যে
স্বর্ণ-চাঁপা-এই-মন যন্ত্রনায় জ্বলে জ্বলে
কী অবাক। আরকের মত—
তবু কি নিস্তার আছে,

যে মুহূর্তে মনে হয়
আমি ঠিক মাটিতেই আছি
এপাশে ওপাশে কোন আকাশের-নীল-নেই
অথবা হাতের কাছে
রক্তপদ্ম পলাশের ধোকা—
কিম্বা কোন প্রজাপতি—
চক্রব্যূহ সৃষ্টি করে
আমাকে কেন্দ্রে রেখে,ঘুরে ঘুরে
বেদনার চারপাশ ঘিরে,—
এই মন অসংখ্য তরঙ্গ হয়ে
নড়ে নড়ে উঠে,
ব্যথার-সায়র যেন তোলপাড় করে।
তারপর ধীরে ধীরে তীরে তীরে আছড়িয়ে
ঠিক থেমে যায়—
কেঁদে কেঁদে নীল-হওয়া শিশুদের মত।

আমাকে ঘিরেই যেন, চেয়ে থাকে
লক্ষকোটি ম্যাডোনার ছবি
মরা চাঁদ কোলে নিয়ে,
কী করুণ! কী করুণ!
শিশিরে ভেজানো চোখ
কত যেন অভিযোগ করে।
উত্তরের খোঁজে আজ
এইমন মুসাফির হবে
বর্ণালী বুদ্বুদ তাই
বার বার ফেটে ফেটে যায়॥

নাট্যকার ও'নীল ও আধুনিক আমেরিকা

: প্রবন্ধ

অধীর মল্লিক

আধুনিক আমেরিকার নাট্যকার ইউজিন ও'নীলের নাম আজ সর্বজনবিদিত। তিনবার আমেরিকার পুলিট্জার পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নাট্যকারের স্থান আজ সুনির্দিষ্ট। সমগ্র আমেরিকান সমাজের মনস্তত্ত্বটি ইউজিন যেমন সুন্দর করে ফুটিয়েছেন—তেমন আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

একথা সত্য যে, আধুনিক আমেরিকার ধনতান্ত্রিক কাঠামোর ঐশ্বর্যে, যান্ত্রিক প্রগতির মধ্যে ব্যক্তির মনোবিকলন, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি মোটামুটিভাবে আমেরিকার সব চিন্তাশীল লেখকদের রচনাতেই অন্তর্বিস্তর ফুটে বের হচ্ছে। টেনেসি উইলিয়ামসের নাটক, উইলিয়াম ফকনারের উপন্যাস ইত্যাদি আরো অনেকের রচনাতেই একথা সুপরিস্ফুট। আধুনিক আমেরিকার, আবেগ-ক্ষয়-সাধনা-ব্যাধি-জীবন-সংগ্রাম জানতে গেলে এঁদের লেখা পড়তেই হবে। ইউজিন নিজে-ও তাঁর এক চিঠিতে বলেছেন "The playwright to-day must dig at the roots of the sickness of to-day as he feels it—the death of the old God and the failure of science and materialism to give any satisfying new one for the surviving primitive religious instinct to find a meaning for life in, and to comfort its fears of death with."

তাই ইউজিনের নাটকে আধুনিক আমেরিকার প্রাচুর্যের মধ্যে যে-বিকৃতি, যে-কৃত্রিমতা, যে-অসফলতা লুকিয়ে আছে, তাকেই তিনি পরিস্ফুট করেছেন।

১৯০৬ সালে ইউজিনকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় তিনি সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর পূর্বে তিনি মুষ্টিমেয় লোকের কাছে কেবল নাটকলেখক বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচনার সাহিত্যমূল্য স্বীকৃত হয়েছে অধুনা।

ও'নিলের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—বাস্তবতায়। তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রী, ঘটনা সন্নিবেশ এতোই বাস্তবানুগ যে-সময়বিশেষে তা হয়ত আমাদের পক্ষে অতিরিক্ত সত্য বলে, অসহনীয় হয়ে ওঠে। কারণ, অনেক সময়েই আমাদের বাস্তববোধে কুৎসিত ও ঘৃণ্যকে টেকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—'Desire under the Elms-এ এর সৎমায়ের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের লীলার অসহ্য ঘৃণ্যাবলী দেখে আমাদের মন আঁৎকে ওঠে। আমাদের নাটকীয় ঐতিহ্য ঠিক একে মেনে নিতে পারেনা। আমাদের প্রাচীন নাট্যসমালোচক নাট্যকারকে যে-সব ব্রীড়াজনক ও বিষ্ঠুর দৃশ্যের অবতারণা করতে নিষেধ করেছেন—তাতেই আমাদের চোখ ও মন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এর কারণও বহু প্রাচীন বলে মনে হয়। আমাদের আলংকারিক নাটকের সংজ্ঞায় নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' বলেছেন। 'কাব্য' কথাটি অনুধাবনযোগ্য। তাই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের সংযোগে যে-রসের নিষ্পত্তি

হয়—তাকেই বিশ্লেষণ করেছেন প্রথমে। (দ্রষ্টব্য ভারতের 'নাট্যসূত্র'), আর পাশ্চাত্য সমালোচক নাটকের প্রথমেই দৃশ্যত্বকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাই তিনি নাটককে 'Mirror of life' বলে অভিহিত করেছেন Aristotle-Poetics)

এইজন্যই গ্রীকনাটক, শেক্সপীয়র, ইবসেন প্রভৃতি ইউরোপীয় নাট্যকারদের মধ্যে এই বাস্তবানুগতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তবে, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আধুনিকযুগে—আধুনিক কেন? কিঞ্চিৎ অতীতে-ও বলা যেতে পারে—পাশ্চাত্য নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক নাটকের কাব্যত্বের দিকে লক্ষ্য রাখছেন। নাট্যসমালোচক লেসেল তাই বলেছেন—নাটককে দুইদিকথেকে বিচার করতে হবে—"How far it is poetical and how far it is theatrical."

অতএব ইউজিনের নাটকের দৃশ্যত্ব ও কাব্যত্ব-সাহিত্য মূল্য-দুইই আমাদের কাছে আকর্ষণীয়। ইউজীনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে—তিনি, গ্রীকনাট্যকার, শেক্সপীয়র ও ইবসেনের ঐতিহ্যবাহক হয়েও নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেননি। গ্রীকনাটকের বিধয়নিয়তির কাছে মানুষ ক্রীড়নক মাত্র। এই নিয়তি-তাড়িত মানুষের দুঃখ-ভাগ্যের খবর পাওয়া গেলেও—ইউজিনের মধ্যে মানুষ যেন নিয়তির কাছে ধরা দিতে চায় না। কোথায় যেন একটা অপরাজেয় মনোভাব ইউজিনের জীবন দর্শনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

সর্বদিক থেকে নায়ক নায়িকা বিপর্যস্ত হয়েও তাদের প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে। জীবনের সকল সংগ্রামে পরাজিত হয়েও নায়ক বলতে পারে—"I've loved, lusted, won and lost, sung and wept" (Great God Brown.) আধুনিক আমেরিকান লেখক হেমিংওয়ের সেই সমুদ্রের বীরের দৃঢ় মানুষটির মতো বলতে হয়—'Man can be destroyed, but not defeated" (Old man and the Sea.)

মৃত্যু, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, খুন, ইত্যাদি নায়ক-নায়িকার জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে ও ক্রমশঃই তাদের ঠেলে দিয়েছে অতল-অন্ধকারের দিকে। তবু সেই অবৈধ, অসামাজিক, অস্বীকৃত প্রেমের মধ্যেও নায়ক-নায়িকা পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকারে উন্মুখ। অবৈধ প্রেমের কলঙ্ক, শিশুহত্যার নারকী-যন্ত্রণা স্কন্ধে বহন করে—নায়ক-নায়িকা কারার দিকে অগ্রসর হয়—এবং নায়িকা উদীয়মান সূর্যের দিকে নায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে—"Sun's rizin.' Purty, hainz't it. I"

[Desire under the Elms.]

শেক্সপীয়রের নাটকের যে ট্র্যাজিক অনুভূতি আছে তার সঙ্গে ইউজিনের নাটকের ট্র্যাজিক অনুভূতির কিছু পার্থক্য আছে। শেক্সপীয়রের নায়কের পতনের মধ্যে যে-Grandeur আছে তা' ইউজিনের নাটকে নেই। ইউজিনের নাটকের মধ্যে পতন আছে—কিন্তু, শেক্সপীরিয় মহানুভবতা নেই। এর কারণ, শেক্সপীয়রের যুগ ও ইউজিনের যুগের তফাৎ। প্রেমের শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক আলোচনা করতে গিয়ে এইদিক সম্পর্কে ভূমিকাতেই আলোকপাত করেছেন। (জয়ন্তী-উৎসর্গ)। মধ্যযুগের ও এলিজাবেথের যুগের যে ঐতিহাসিক বীরত্বব্যঞ্জক (Chivalrous) পটভূমিকা ছিলো, তা আর নেই। ব্যক্তির জীবনে যে-সব উচ্চাশা, যে-বৃহৎ ও দু-উচ্চ ভাবনা-কল্পনা ছিলো, যে-মোটামুটি ও উচ্চাঙ্গ-রাগিণী বেজে উঠত তা' আধুনিক আমেরিকার রিক্ত, সংকীর্ণ, বিদূষিত ব্যক্তি-জীবনে আশা করা যায় না। তাই ইউজিনের সঙ্গে শেক্সপীয়রের এইখানেই তফাৎ।

শেক্সপীয়রের পর ইউরোপের নাট্যজগতে যিনি

আলোড়ন এনেছিলেন—তিনি হলেন, হেনরিক ইবসেন। নরওয়ের এই নাট্যকারকে তাঁর বাস্তবধর্মী সৃষ্টি ও বিদ্রোহের জন্য—তাঁর নাটকের নায়ককে নিজের ভাষা বলে বেছে নিতে হয়েছিলো—"An enemy of the People."

ইবসেনের নাটকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও চিত্রায়ণ অনেকের কাছেই অসহ্য মনে হয়েছিলো। চলতি সমাজের লুক্কায়িত মোহরাকে তিনি আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে সমাজের এক একটি বাস্তব সমস্যা তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু, এতো বাস্তবধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ওনীলকে ইবসেনের মতনিজ কিছুতেই বলা যেতে পারে না।—কারণ, ইবসেন প্রধানতঃ সমাজ-বিদ্রোহী। আর ওনীল সমাজের মধ্যে ব্যক্তির তাৎপর্যহীন ভূমিকাটি এঁকেছেন। ব্যক্তি এখানে অবচেতনভাবে সমাজের শিকার মাত্র। আর ইবসেনে ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধে সর্বদাই বিদ্রোহ করেছে। ইবসেন সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘা-দিয়েছেন—আর ওনীল একান্তই ব্যক্তিমনের অবাঞ্ছনা ও অসুখকে এঁকেছেন। ইবসেন সামাজিক আর ওনীল মনস্তাত্ত্বিক। ব্যক্তি-মনের 'Repression', 'Complex', Fixation-এর সমস্যাই তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে।

নিগ্রো-সমস্যা, আমেরিকার এক সামাজিক সমস্যা। কিন্তু সেখানেও (All God's chillun got wings) ওনীল শ্বেতাঙ্গ সমাজের বাহ্যিক অত্যাচার ও অবিচারের চিত্র আঁকেননি। বরঞ্চ, এই সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে নায়ক-নায়িকাকে যে-মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে—সেটাই উল্লেখ্য। Jim ও Ella-র পারস্পরিক প্রেম বর্ণবিভেদ ঘুচে দিয়েছে।—কিন্তু তাদের মিলনের পথে প্রধান বাধা সামাজিক। এক্ষেত্রে বাহ্যিক-ভাবে সমাজ কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি—কিন্তু, নিজেদের সম্প্রদায়ের চিরাচরিত, বন্ধুদের অত্যন্ত সাধারণ ভাবা মিলেমিশে এগোতে পারেনি। আধুনিক কালের জা পল সার্ত্রের "The Respectable Prostitute" তুলনা করলেই খুব ভালো বোঝা যায়। সেখানে শ্বেতাঙ্গ সমাজের বাহ্যিক অত্যাচারটি অত্যন্ত সুন্দর, ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইউজিনের "Hairy Ape" একটা পরীক্ষামূলক নাটক। বিপ্লবী-ধর্মের প্রচার ঐ নাটকের উদ্দেশ্য। সমাজের অবজ্ঞাত ও শোষিত মানুষের কথা ঐ নাটকের ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। বেঁচে থাকাই যাদের বিড়ম্বনা তাদের হয়ে নায়ক Yank উন্মত্ত হয়ে রাস্তার পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—"Enuf to Gimme life for I was born, see? Sure, dat's de charge!"

তবু নাটকের মধ্যে শোষিত মানুষের উপর সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারের চিত্র যতনা ফুটে উঠেছে—তার চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে yank-এর মানসিক অবাঞ্ছনা ও "Inferiority" Complex। Yank-এর মনস্তাত্ত্বিক বেদনাই নাটকের প্রধান উপজীব্য।

'Strange Interlude-এর মধ্যে অতিরিক্ত মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্রণ ফুটাতে গিয়ে ওনীলকে নোতুন আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখি। যদিও ইবসেনের পর নাটকে স্বগতোক্তির (Soliloquy) ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে, তবুও এখানে পাত্রপাত্রীর হৃদয়ের মানসিক বিকাশের ছবি আঁকতে দীর্ঘ স্বগতোক্তি প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবচেতন মনের এই লীলায় মানুষের মধ্যে যে মানসিক বিকৃতি, হতাশা ও নৈরাশ্য কিংবা সমাজ-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে—তার ফলে ওনীলের নাটকের সর্বত্রই একটা করুণ অসহায়তা ফুটে বের হচ্ছে। এবং এই অসহায়তা ওনীলের পাত্রপাত্রীকে মানুষিক করে তুলেছে। সভ্যতার এই বিরাট পটভূমিকায় ব্যক্তি জীবনের অসহায়তা ফুটে বের হয়

কোনো পরমস্নেহের অকল-আচ্ছাদনের আশ্রয়ের ইচ্ছায়। ইতিহাসের এমন পরিবর্তনের মুহূর্তে ব্যক্তির নিষ্ফল আহুতি ও বিকৃতি বাস্তচেতনার মধ্যেই পরমশান্তি লাভ করে ও শক্তি খুঁজে পায়। তাই নায়ক Eleen-এর মতো প্রায় সবাই 'Stands barefooted looking about him in bewilderment, mutters wonderingly—"Maw | Whar sir yew ?"

নায়িকা Abbie-র Eleen-এর প্রতি আকর্ষণ অনেকটা মাতৃসুলভ। কারণ, Eleen-এর নিঃসঙ্গ জীবন এবং মাতৃ-স্নেহের প্রতিহিংসার ফলে যে করুণ অসহায়তার সৃষ্টি হয়েছে তা Abbie-র মনকে করুণায় আপ্লুত করেছে, তাই মায়ের কথা বলতে গিয়ে Eleen-যখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তখন Abbie বলেছে (there is a sincere maternal love in her manner and voice—a horribly frank mixture of lust and mother love) "Don't cry Eleen, I'll take yer Maw's Place! I'll be everythin,' she was t'ye | Let me kiss ye, Eleen."

'The great god Brown' নাটকে ও Dion-এর প্রতি Cybet-এর ভালোবাসা একই রকম লক্ষ্য করি. বর্তমান জগতে Dion-এর মতো সৎ, প্রেমিক ও বিশেষত্বে ভাবপ্রবণ ব্যক্তির স্থান নেই।

Dion-দের প্রতি ভাকে খাটিয়েই Brown-রা প্রতিপত্তি শালী বৈষয়িক সমাজের এই অবস্থা। অনেক দুঃখে প্রিয় বান্ধবী Cybet কে Brown এর জন্য Dion-কে পথ করে দিতে হয়। Dion-এর প্রতি Cybet-এর আকর্ষণ থাকলেও Brown-এর টাকার দাম আরো বেশী। ি য় বান্ধবীর সোহাগের উত্তরে Dion শুধু বলে—(in a choking heart-broken cry) Mother |

ব্যক্তির কি করুণ ও অসহায় উক্তি |

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্ম-যন্ত্রণায়, ব্যক্তিমানুষ যখন বিড়ম্বিত, অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে—তখন তাকে খুঁজতে হয় এমনই কোন এক পরম আশ্রয়।

তুর্কী ও পাঠান আক্রমণের (ত্রয়োদশ শতক থেকে) ফলে বাঙলাদেশে ব্যক্তি মানুষ যখন এমনই অত্যাচারিত এবং অসহায়, প্রবলের হাত এড়াবার দুর্বলের যখন কোনো পথই খোলা ছিলোনা - তখন বাঙলাদেশ এক বিরাট বাস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিলো।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে এবং সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক জীবনের বিরাট যন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তি মানুষ হয়ে পড়েছে একটি মাট্, ক্রু বল্ট্ বিশেষ। ব্যক্তি আজ বৃহত্তর শক্তির ফলাফল মাত্র। অথচ ব্যক্তির মধ্যে আছে, স্বাধীন ও স্বপ্রকাশ হবার বিরাট এষণা ও অভীপ্সা। সেইখানেই মানসিক সংঘাত এবং অসুস্থতা।

সমষ্টিশক্তি অতিরিক্ত কেন্দ্রানুগ হয়ে পড়েছে বলেই ব্যক্তি সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করছে না। সমাজে তাই দেখা যাচ্ছে—"Human association tends to be inadequate···Emotional and mental growth is discontinuous···The signs of very great individual unhappiness are legion.—They range from complete breakdown—suicide or permanent mental illness through sickness with a large psycho-somatic component to the obsessive thinking and morbid states of dejection which have no statistical table to themselves."

(UNESCO—The Community factor in Modern Technology by Scott and Lycon. P.29.—30)

সভ্যতার যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে যে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তা তীক্ষ্ণ চিন্তা-শীলের অন্তরেই আঘাত করছে। Aldous Huxley

বহুকাল পূর্বে একবার বলেছিলেন—"A highly progressive technology entails incessant and often very rapid and startling changes of economic, political and ethical state ; and such changes tend to keep the societies subjected to them in chronically uncomfortable and unstable condition." (Science, Liberty and Peace. P.17)

সভ্যতার এইযুগে মানুষের আর্তরূপ রূপটি ওনীল তার তুলিতে অভিসুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমার মনে হয়, এই দিকটি আজ আমাদের বিশেষ করে দেখে নিতে হবে। ব্যক্তিমানুষের এই শক্তিহীন, নিঃসহায়রূপ আমরা ইতি মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় পড়ে অনুভব করছিনা কি ?

তাই আমাদেরও Dion এর মতো বলতে হয়—"Peace, poor tortured one, brave, pitiful pride of man, the hour of our deliverance comes."

এই সতর্কতার জন্যই ওনীলকে জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। নয়ত, আমাদের আত্মিক ঐতিহ্য নিয়ে, শীলধর্মকে চোখের সামনে তুলে ধরে, মনের মধ্যে লালন করেও—আমাদের সকল সুচেষ্টা, সকল আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। Marco র মত রাজকন্যা Kukachin-এর পবিত্র প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থ ও স্বর্ণকেই প্রধান করে তুলব। (দ্রষ্টব্য "Marco Mleelons") তখন আমাদের বলতে হবে—"Soul lies mouldering in crib but his body goes marching on !'

(Great God Brown)

তাই ওনীলের চিত্রিত আমেরিকা আমাদের সাবধানী সংকেত।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

কবিতা

একটি ব্যর্থ কাহিনী

প্রভাকর মাঝি

না, তার শরীরে জ্যোৎস্নার ছিটে কোথাও জেগে নেই
নরম নরম নীল।
চোখ দুটো নয়। কালো কুচ্ছিত। ফুলকো কপোলে কই
তিলোত্তমার তিল?
ঝক্‌ঝকে কোন নাটকের এক পার্শ্ব চরিত্রেও
অভিনয় করবার
আসবে না ডাক। পলাশের টিটকিরি দেবে তাকে।
হীরক-সকাল। আর
ত্রিশ বছরের যৌবন করে বোবা-কান্নায় রাত
নির্ঘুম পথ চেয়ে,
হয় তো। হয় তো। শঙ্খিনী নয়। কেরাণী বাপের এক
কালো কুচ্ছিত মেয়ে।
ট্রাম-ঘড়-ঘড় একটু সময়। তাকে দেখলাম ঘরে
দুটো চোখে লেখা রয়
করুণ কোমল ব্যর্থ কাহিনী। কলেজস্ট্রীটের মোড়ে
অনুভূতি বাসায়।

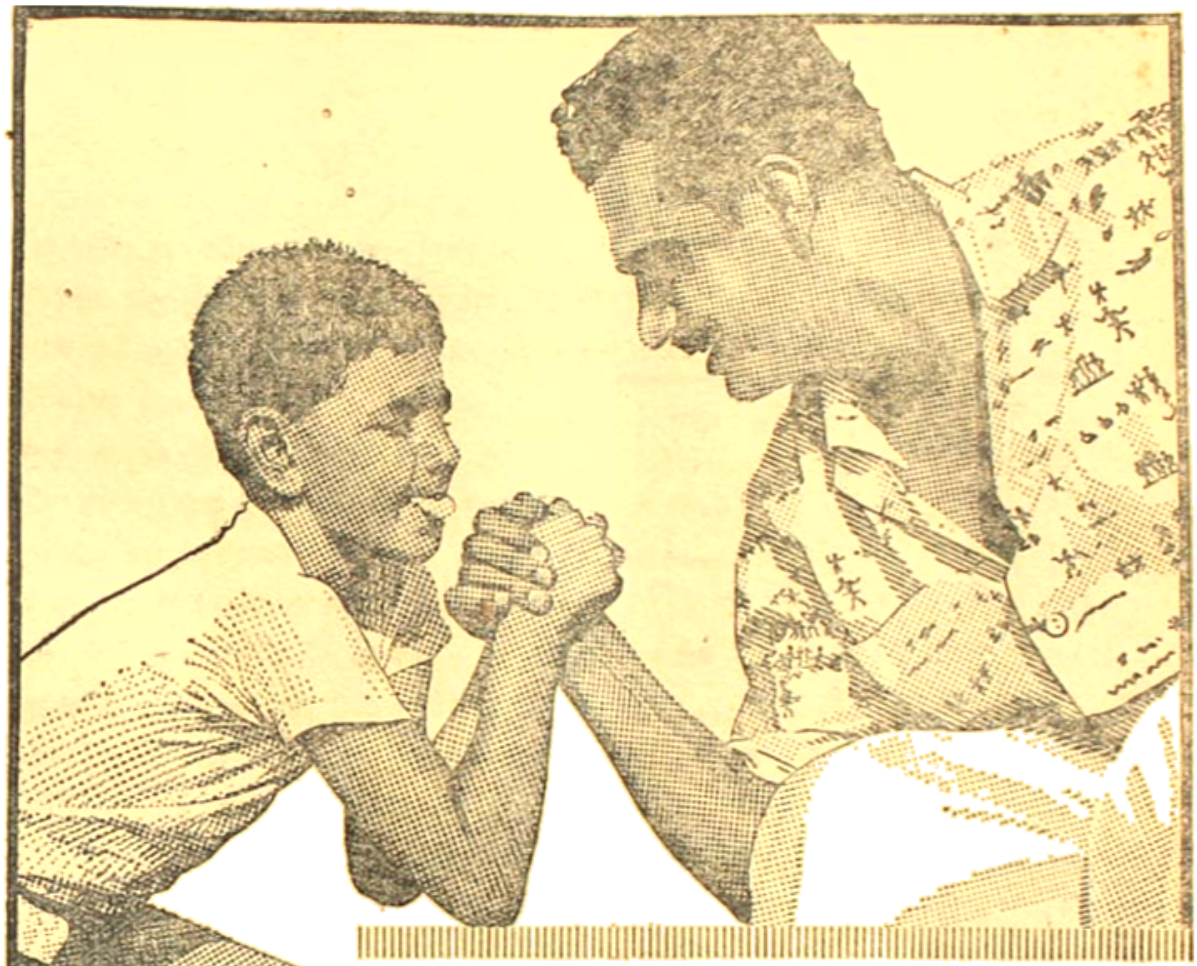

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** দিয়ে স্নান করেন

খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড, বম্বে এইচ।

L 270-52 BG

বিশ্বাবর্ত

ফ্রান্সের গণভোট

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্যারী সহরের ব্রাঁদ বা লা রিপাব্লিক-এ গুলল তাঁর নূতন সংবিধানের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য শুরু করে যে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বিপুল ভোটাধিক্যে তা গণভোটে জয়ী হয়ে গুলপাসনের প্রথম পর্যায় পরিণতি পেলো। গুলল-সংবিধানের মধ্য দিয়ে চতুর্থ রিপাব্লিকের সমাধির ওপর পঞ্চম রিপাব্লিকের ভিত্তি স্থাপিত হল। কিন্তু এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ফরাসী রাজনীতির ঝোঁক কতটা একনায়কত্বের দিকে ঘোড় নিল, গণতান্ত্রিক শক্তিসমাবেশের আপাত-দৌর্বল্যের পশ্চাতে স্থায়ী ক্ষয়-ক্ষতি কতটা গভীর ও ব্যাপক হল, সেটা বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তবে একথা নিশ্চিত যে গুলের অভ্যুত্থান গণভোটের মধ্যদিয়ে যে ব্যাপক স্বীকৃতি পেলো তার প্রবল আঘাতে ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী চেতনা বিলম্বে হলেও প্রতিহত হতে বাধ্য। সেই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে কি প্রভাব বিস্তার করবে বর্তমানে তার কোনো স্থির-নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

পক্ষে বা বিপক্ষে কারা

গণভোটের পক্ষে ছিল দক্ষিণপন্থী সব পার্টি ও সোস্যালিষ্ট পার্টির একাংশ। অবশ্য উগ্র দক্ষিণপন্থীরা বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বিপক্ষে ছিল সোস্যালিষ্ট পার্টির একাংশ, কম্যুনিষ্ট পার্টি, র‍্যাডিকাল সোস্যালিষ্ট পার্টির একাংশ ও আরও অনেক ছোট বামপন্থী দল। মোট তেইশটা রাজনৈতিক দল গণভোটের প্রচারে অগ্রসর হয়েছিল এবং সকলের অনুমান ছিল শতকরা পঞ্চাশটি থেকে ষাটটি ভোট গুলের পক্ষে যাবে। কার্যত দেখা গেল গুলল-সংবিধান শতকরা আশিটি ভোট পেয়েছে। আর সব চাইতে অবাক করেছে আলজিরিয়া। সেখানে শতকরা ৮০ জন ভোটদাতা ভোট দিয়েছে এবং তাদের শতকরা ৯৬টি ভোট গুলের পক্ষে গেছে। একমাত্র পশ্চিম আফ্রিকার গিনি প্রদেশ সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার পেয়েছে। গণভোটের আরও কয়েকটি লক্ষ্যণীয় দিক রয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সকল ঘাঁটি প্যারীর বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রেও গুলল-সংবিধান শতকরা পঞ্চাশটি ভোটের বেশী পেয়েছে। ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মঁসিয়ে থোরেজ স্বীকার করেছেন যে কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তত পনের লক্ষ ভোটার গুলকে সমর্থন করেছে। পার্টির নির্দেশ সত্ত্বেও এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের গুল-সমর্থনকে থোরেজ অবশ্যি সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে বোধগম্য করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ফরাসীদেশের নির্বাচনী বিধির পরিবর্তন ও আলজিরিয়ার শান্তি কামনা এইক্ষেত্রে পার্টি নির্দেশ লঙ্ঘনের কারণ। গুল কম্যুনিষ্ট ব্যূহে ভাঙন ধরিয়েছে একথা আজ অনস্বীকার্য। গুলের অপর বিরোধী মেঁদেজ্রান্সের দলের ও এই অবস্থা, স্বয়ং মেঁদে-ফ্রান্সের নির্বাচনী কেন্দ্রে গুল আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে।

নূতন সংবিধান

২৮শে সেপ্টেম্বর গুল গঠিত যে সংবিধান গৃহীত হল

তার ফলে ৫ই অক্টোবর থেকে পঞ্চম রিপাব্লিকের পত্তন হোলো। পঞ্চম রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য আগামী ১৪ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে ড গল সাত বছরের জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হবেন। ড গল রাষ্ট্রপতিত্বের অধিকারে নিযুক্ত করবেন প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাকে। সম্ভবতঃ পী য়োলে প্রধানমন্ত্রী হবেন। পার্লামেন্ট বাতিল করার অধিকার থাকবে রাষ্ট্রপতির, তিনিই হবেন সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা। মন্ত্রীসভার কোনো প্রস্তাব নাকচ করবার অধিকারও তার থাকবে। এমন কি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় এবং যুদ্ধ ঘোষণায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। তাছাড়া নূতন সংবিধানে পার্লামেন্টের সভ্যরা খুশী হলেই মন্ত্রীসভা বদল করতে পারবে না। একটা বিশেষ সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হবে। তার উপর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা তো রয়েছেই। নূতন সংবিধানে রাষ্ট্রপতি প্রায় ডিক্টেটরের ক্ষমতার অধিকারী।

নূতন নির্বাচন আইন

নূতন নির্বাচন আইনে প্রতি প্রতিনিধিকে পার্লামেন্টে প্রায় ৫০,০০০ অধিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে এবং প্রাক্তন পার্লামেন্টের ৪৩৯ জন সভ্যের পরিবর্তে নূতন পার্লামেন্টে ৪৬৯ সভ্য থাকবেন। নির্বাচন কেন্দ্রগুলি একক-সভ্যসম্বলিত হবে। আলজিরিয়ার ৬৬ জন প্রতিনিধি থাকবেন তার মধ্যে ৯৫ জন মুসলমান। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে ফরাসী পার্লামেন্টে আলজিরিয়ার কোন প্রতিনিধি নেওয়া হয় নাই, যদিও তার পূর্বে ৩০ জন আলজিরিয়ান প্রতিনিধি ছিলেন এবং তারা প্রায় সকলেই ইউরোপীয় ছিলেন।

ড গলের কাছে আলজিরিয়ার সমস্যাই আপাততঃ, প্রধানতম সমস্যা। সংবিধানের স্বপক্ষে আলজিরিয়ানদের বিপুল সমর্থন ও গল-নীতির প্রতি স্বেচ্ছায় সমর্থন জ্ঞাপন কিনা, সে-সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু আলজিরিয়ানদের মনে এ-বিশ্বাস জন্মে থাকবে যে ড গল আলজিরিয় সমস্যার সুমীমাংসা দিতে পারেন। আলজিরিয়ানদের বিপুল সমর্থনের মূলে এ-বিশ্বাস থাকা বিচিত্র নয়। গত ৩রা অক্টোবর কনষ্টানটিনে ড গল আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়ে আলজিরিয়ানদের আহ্বান জানিয়েছেন। নির্বাচন আইনেও আলজিরিয়ার জন্য ৬৬টি আসনের ব্যবস্থা করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৪৫ জন হবেন মুসলমান। সর্বোপরি সেনাবাহিনীর সন্ত্রাসের পাবলিক সেফটি কমিটি ও আলজিরিয়ার নির্বাচন থেকে দূরে থাকবার এবং আলজিরিয়ার নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ বহির্ভূত হস্তক্ষেপ না করবার নির্দেশ দিয়ে ড গল্লিস্ট-জিরিয়ার মুসলিম অধিবাসীদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছেন। সুতরাং, আলজিরিয়ার পরিস্থিতি সুমীমাংসার দিকে অগ্রসর হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পরিবর্তনের ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে অনিশ্চয়তা ও হতাশা দেখা দিয়েছিল, যার ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতিও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে—সুনিশ্চিতভাবে তার অবসান ঘটলেও নূতন রিপাব্লিক একনায়কত্বের লৌহকঠিন শাসন, ফরাসী রাষ্ট্রের জীবনে নূতন পীড়নের অধ্যায় রচনা করবে।

সামরিক শাসনে বর্মা ও থাইল্যাণ্ড :

গত ২৮শে অক্টোবর বর্মার পার্লামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে জেনারেল নে উইনের হাতে সর্বময় শাসন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বর্মার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উ ন্যু সামরিক অভ্যুত্থান আশঙ্কা করে নে উইনের হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সাধারণত যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে বেসামরিক শাসনতন্ত্র

ভেঙে পড়বার উপক্রম হলে কিংবা সেনাবাহিনী বেসামরিক শাসনের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলে সামরিক অভ্যুত্থানের মুখে সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা দখল করে বসে। প্রথম অবস্থার দৃষ্টান্ত অসংখ্য ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। মিশর দ্বিতীয় অবস্থার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বর্তমানে যা ঘটলো তার কোথাও নজীর নেই। সেনাবাহিনীকে ডেকে এনে সর্বসম্মতিক্রমে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলো—তার পশ্চাতে গুরুতর বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ছিলো। বর্মার পরিস্থিতিতে সে সম্ভাবনাটি কি এ-প্রশ্ন ওঠই উঠবে।

বর্মায় কিছুদিন পূর্বে শাসন ক্ষমতায় আসীন হলে ফাটল দেখা দেবার পর থেকেই বর্মার রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা ঘনীভূত হয়েছে। ইতিপূর্বে কয়েকবছর যাবৎ অন্তর্বিদ্রোহের আগুন বর্মাকে অশান্ত করে রেখেছে। এ, এফ, পি, এল, এল দলে ভাঙন ধরার ফলে উ নু কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের মুখপাত্র ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্টের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, তার শাসন ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য। এই ঘটনার যে প্রতিক্রিয়া বর্মার সেনাদলে সুরু হয়, তারই পরিণতিতে সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা প্রকট হয়ে পড়ে। এই নূতন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য উ নু স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে নে উইনের হাতে শাসনভার তুলে দিলেন।

নে উইনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পশ্চাতে সকল পক্ষের সম্মতি থাকলেও, নিরুপায় হয়েই সকল পক্ষ এ-সম্মতি দিয়েছেন। 'Rule of Law'র গণ্ডীর মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকলেও গণচেতনা-নিরপেক্ষ সামরিক শক্তির উদ্যত আঘাতের সামনে পার্লামেন্টারি ডিমোক্রাসির পরাভব ও নীতিই বর্মার ঘটনায় স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্মার পরিস্থিতিতে যেমন ডেমোক্রাসীর সামরিক শাসনে অবলম্বন সম্ভব হয়েছে, তেমনি ছয়মাস পরে সামরিক শাসনের ডেমোক্রসীতে সার্থক উত্তরণ সম্ভব হবে কিনা সেই প্রশ্নের মীমাংসার উপর শুধু বর্মার ভবিষ্যৎ নয় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে সামরিক শক্তির ভূমিকার কোন নবায়ন সম্ভব কিনা সে প্রশ্নেরও মীমাংসা নির্ভর করবে।

২০শে অক্টোবর থাইল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক সারিট থানারাট ক্ষমতা দখল করেছে। সারিট দাবী করেছেন যে প্রাক্তন গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমেই এই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছে। সামরিক শাসনের আওতায় থাকলেই যে সমস্যার সমাধান হয় না, থাইল্যাণ্ড তার প্রমাণ। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই থাইল্যাণ্ডে সামরিক শাসনের খুপ চলেছে। গত ডেরমাসে সেখানে দুইবার ক্ষমতা দখলের অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সকল রাজনৈতিক দল লোপ করা হয়েছে। তবুও দুর্নীতি ও অনাচারের স্রোত অব্যাহত গতিতে সেখানে বয়ে চলেছে। সামরিক শাসন সেখানে কোনো সমস্যারই সমাধান করে নাই বরং জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। থাইল্যাণ্ডের সর্বশেষ সামরিক অভ্যুত্থান পূর্বএশিয়ার গণতন্ত্রের দুর্দিন ঘোষণা করছে।

২০৩, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিশলচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

উদয়ন

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫।

জগদীশচন্দ্র

নলিনীকান্ত গুপ্ত

জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক—"সায়েনটিষ্ট"; তাঁহার ক্ষেত্র জড়-জগৎ—তাঁহার কাজ স্থূল বস্তু সম্বন্ধে স্থূল উপায়ে সত্য আবিষ্কার। সত্যকে হাতে কলমে প্রমাণ করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—স্থূল ইন্দ্রিয় যাহাকে ছুঁইতে না পারে তেমন সত্যকে সত্য বলিয়া না মানাই হইল তাঁহার স্বধর্ম্ম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের পর্যবেক্ষণ আর বুদ্ধির পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ—ইহাই হইল বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত অনুমোদিত জ্ঞানের যন্ত্র।

বৈজ্ঞানিকেরা হইলেন যুক্তিবাদী (rationalist); ইন্দ্রিয় এবং মন বা তর্ক-বুদ্ধিকেই তাঁহারা ধরিয়া চলেন। সত্যের অনুসন্ধানে অন্য বৃত্তির উপর তাঁহাদের আস্থা নাই; কারণ অন্যান্য বৃত্তি পড়ে অনুমানের, কল্পনার, কবিত্বের পর্য্যায়ে। বিজ্ঞান চাহে সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান; বৈজ্ঞানিক চলিবেন নিরেট বা নির্জ্জলা মস্তিষ্কের নির্দ্দেশে—আর কোন রকম বৃত্তিকে আশ্রয় করা তাঁহার পক্ষে ভয়াবহ। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিকের কারবার হইল একান্ত স্থূল জগতের সহিত; এই ক্ষেত্রের তত্ত্ব বা তথ্যের উদ্‌ঘাটনের জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বিচার বা যুক্তিই যথেষ্ট—আর কাহারও দুয়ারে যাইবারও প্রয়োজন নাই।

অবশ্য সায়েনটিষ্ট যিনি, তিনি আবার কবি, ভাবুক আধ্যাত্মিক হইতে পারেন—কিন্তু তাহা হইল সম্পূর্ণ অন্য ক্ষেত্রের, ভিন্ন জগতের কথা। সায়েনটিষ্ট যখন সায়েন্সে ব্যাপৃত তখন তিনি তাঁহার ঐ অন্যদিকটির দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবেন। দুইয়ের সংযোগে হয় গোলমালের সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইতে হইবে মস্তিষ্কের, ইন্দ্রিয়ের কড়া পাহারায়—তাহাতে যদি আসিয়া পড়ে হৃদয়ের প্রাণের কল্পনার আশা-আকাঙ্ক্ষা-অনুভব তবে সায়ান্সের পরিবর্তে গড়িয়া উঠিবে রোমান্স—উপকথা। এডিংটন বা জীন্স এত বড় বৈজ্ঞানিক হইয়াও এই দোষ হইতে মুক্তি পান নাই। বিজ্ঞানের মধ্যে তাঁহারা বিজ্ঞানেতর জিনিষ কেবলই আনিয়া মিশাইয়া দিতেছেন। এই হইল গোঁড়া বৈজ্ঞানিকের মনোভাব বা দৃষ্টি-ভঙ্গী। সাধারণ বিজ্ঞান-ভক্তেরাও হয়তো এই কথাই সমর্থন করিবেন।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে চলিত শাস্ত্র এই বটে—কিন্তু বাস্তবে কার্য্যতঃ দেখি ঘটে অন্য রকম। জগদীশচন্দ্রের বিশ্লেষণ তিনি বৈজ্ঞানিক—খাঁটি বৈজ্ঞানিক হইয়াও, আবার "কবি"। আর এই "কবিত্ব" তাঁহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বৃত্তি হইতে পৃথক একটা বস্তু নয়—পৃথক ত নহেই, উহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উৎস ও রহস্য, নিভৃত শক্তি। কবি অর্থ অবশ্য বাক্য-রচয়িতা নয়, কবি অর্থ যাঁহার আছে দিব্য-দৃষ্টি এবং এই দিব্য-দৃষ্টির জোরে যিনি করেন সৃষ্টি। এই শক্তিটির কল্যাণেই জগদীশচন্দ্রকে সময়ে সময়ে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা যাদুকর বলিয়া বেশী মনে হয়। অবশ্য একা এক জগদীশচন্দ্রই যে এই হিসাবে অতুল অদ্বিতীয় তাহা নয়। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও স্রষ্টা যাঁহারা তাঁহাদের সকলের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে ঐ শক্তির পরিচয় পাই—কারণ সকল সৃষ্টির মূলে থাকিতে বাধ্য এই দৃষ্টি। গেলিলিও হইতে আইনষ্টাইন অবধি সকল আবিষ্কারকের মস্তিষ্কেই খেলিয়াছে একটা ইন্দ্রিয়াতীতের মানসাতীতের দৃষ্টির জ্যোতি। তাঁহাদের সকল কৃতিত্বই—অন্ততঃ জগদীশচন্দ্রের সকল কৃতিত্ব হইল এই দৃষ্টিকে ইন্দ্রিয়ের মনের কাঠামের মধ্যে নামাইয়া কিরূপে প্রমাণিত-পরিচিত-গোচর করিয়া ধরিয়াছেন।

দিব্যদৃষ্টি কাহাকে বলি? দিব্যদৃষ্টি অর্থ একাত্মানুভূতি—কোন বস্তুর সত্য যখন লাভ করি সেই বস্তুর সহিত একাত্ম হইয়া। ইহার অন্য নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা—অর্থাৎ যাঁহারা স্রষ্টা নহেন কিন্তু মাত্র, যাঁহারা কেবল বা বেশীর ভাগ ভাষ্যকার, ব্যবস্থাপক, তাঁহারা—এই বৃত্তিটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বলিয়াছি ইহার উপর তাঁহাদের ভরসা নাই, কারণ ইহার উপর কর্তৃত্ব বা অধিকার তাঁহাদের কিছু নাই। তাঁহাদের হইল পরোক্ষ জ্ঞানের সহজ পরিচিত পথ। তাঁহারা চলেন বিশেষ উদাহরণ হইতে ক্রমে সাধারণ সিদ্ধান্তে, কার্যের সূত্র ধরিয়া উঠিতে থাকেন কারণের মধ্যে [illegible] হইতে কম স্থূলে, ইন্দ্রিয় প্রমাণ হইতে অতীন্দ্রিয় বা ধারণাগত প্রমাণে (যেমন, গাণিতিক বিজ্ঞানে)।

অপরোক্ষ জ্ঞানের গতি ঠিক ইহার বিপরীত। এখানে জ্ঞাতা বিষয়টিকে আপনা হইতে পৃথক করিয়া আপনার বাহিরে সম্মুখে স্থাপন করিয়া, স্থূলরূপ ক্রমে ভাঙ্গিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুসন্ধানে চলেন না; জ্ঞাতা প্রথমেই তাঁহার জ্ঞেয়ের সহিত একীভূত হইয়া যান, তাহার সত্তায় নিজের চেতনা তাঁহার ওতপ্রোত হইয়া যায়, এক হিসাবে তিনি জ্ঞেয়ই হইয়া উঠেন—শ্রীরাধার যেমন অনুভব হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণই হইয়া গিয়াছেন। সেই অবস্থায় বস্তুর যে সত্য যে রহস্য, যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বতঃই তাহা জ্ঞাতার জ্ঞানে সঞ্চারিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বাহিরের কোন প্রমাণকে আশ্রয় না করিয়া এই রকম ভিতর হইতে বস্তুর যে সাক্ষাৎ জ্ঞান—যদি যথার্থ পাই, তবে তাহা হয় অভ্রান্ত নিঃসন্দেহ, তাহাতে থাকে একটা পরিপূর্ণতার অখণ্ডতার ছন্দ।

জগদীশচন্দ্র সত্যকে ধরিতে পাইয়াছেন যে ধরণার বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়গত সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণের সহায়ে তাহা নয়—এই দুই হাত তাঁহার মধ্যে যতই প্রচুর থাকুক না কেন, তিনি তাঁহার জগতের সহিত—জড়ের, বিশেষভাবে উদ্ভিদলোকের সহিত—স্থাপন করিয়াছেন একটা একাত্মতা, সত্তার চেতনার ঐক্য; এবং তাহারই ফলে তাঁহার মনে প্রতিফলিত হইয়াছে সেই জগতের সত্য ও তথ্য। তবে তাঁহার কৃতিত্ব—হয়ত ইহাকেই বলা যায় খাঁটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব—এই সকল অন্তর্জ্ঞান-লব্ধ সত্যকে তথ্যকে তিনি পরীক্ষা করিয়া, যাচাই করিয়া, সাজাইয়া স্পষ্ট স্ফুট করিয়া দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন হাতে কলমে—স্থূল মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সহায়ে স্থূলতম যন্ত্রাদির সহায়ে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেও—স্থূল যন্ত্র প্রক্রিয়াদির উদ্ভাবনে অনুসরণে তিনি যে একটা অদ্ভুত চাতুর্য্য, সারল্য—যাদু—দেখাইয়াছেন, তাহাও আমরা বলি সম্ভব হইয়াছে ঐ অপরোক্ষানুভূতির কল্যাণে।

জ্ঞানের যন্ত্র বা উপায়ে ছাড়া জ্ঞানের বস্তু বা তথ্য যাহা জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছেন তাহারও বৈশিষ্ট্য আসিয়াছে ঐ অপরোক্ষানুভূতির, ঐ দিব্যদৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য হইতে—তাহার মূল কথা "ঐক্য"। সমস্ত জড় এক—বৈজ্ঞানিকের কাছেও এই সত্য পুরাতন—তবে জগতের ঐক্য বা একত্ব আজকাল যে নিবিড়তা, যে পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বকালে জানা ছিল না। জগদীশচন্দ্র এই জড়াত্মক ঐক্যের মধ্যে আর একটা নূতন ঐক্য-সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন, জড়াত্মক ঐক্যকে উর্দ্ধে তুলিয়া "রূপান্তরিত" করিয়া ধরিয়াছেন—জড়ের একত্ব ছাড়া সৃষ্টিতে আছে প্রাণের একত্ব; জড় জড় নয়, তাহাতে আছে প্রাণ—জড়ের ছন্দে লুকায়িত জীবনেরই ছন্দ। যাবতীয় পদার্থেরও আছে শ্রান্তিবোধ, বিষ প্রয়োগে তাহারাও হয় মূর্চ্ছিত, মুমূর্ষু, মৃত। উদ্ভিদও জড় উপকরণের সমষ্টি মাত্র নয়—তাহাদেরও আছে প্রাণীর অনুরূপ নাড়ীর বা স্নায়ুর সাড়া, হৃদয়ের স্পন্দন আছে সুখ, দুঃখের বোধ—আছে অন্তঃসংজ্ঞা।

জগদীশচন্দ্র জড়কে এইভাবে প্রাণের মধ্য দিয়া প্রায় চৈতন্যের দুয়ারে লইয়া গিয়াছেন। আমাদের সুপ্রাচীন আর্যদৃষ্টি তাঁহার প্রতিভায় আজ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিতেছে।

যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা নানা নয়—তাহা এক। সেই এক, জড় বা অন্নময় নয়, তাহা প্রাণময়, তাহা জীবন্ত—তাহা আবার জীবন্ত কেবল নয় তাহা সচেতন। দিব্য-দৃষ্টিতে, অন্তরাত্মার অভিজ্ঞায় ঋষি যে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ কি রকম প্রমাণ কি রকম, স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের ছন্দ কি প্রকারে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে, সৃষ্টির "অধ্যাত্ম" সত্য যে সৃষ্টির ওপরে বা বাহিরে আপনাকে লুকাইয়া রাখে নাই পরন্তু অধিভূতের মধ্যে আপনাকে সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, উহারই প্রভা যে ইহাকে প্রভাষিত করিয়াছে—তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—জগদীশচন্দ্র এই বিজ্ঞান কথঞ্চিৎ আমাদের সাধারণ প্রত্যয়ের স্থূলদৃষ্টির গোচর করিয়া ধরিয়াছেন।

এই ভাবে জগদীশচন্দ্রেও আমরা পাইতেছি যুগোপযোগী একটা গভীর ও বৃহৎ সামঞ্জস্যের, মিলনের, ঐক্যের বার্তা—একদিকে প্রাচী ও প্রাচীন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ও আধুনিক, একদিকে ইন্দ্রিয়াতীত, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়—একদিকে অধ্যাত্ম, অন্যদিকে অধিভূত এই যুগ্ম সত্যের সেতু-বন্ধ।

• 'বাংলার প্রাণ'

আচার্য জগদীশচন্দ্র

বিমলেন্দু মিত্র

ইংরাজ শাসনকালে প্রথম যে ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনা-দ্বারা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন তিনি শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। জীবিত প্রাণী ও জড়বস্তু উভয়ই তাঁহার পরীক্ষা-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং তিনি জড় ও জীবের সাড়ার সমতা বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় সত্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার আবিষ্কারের এই বিশিষ্টতা আমাদের দেশবাসীর সর্বেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি শুধুই বিজ্ঞানী ছিলেন না, উপরন্তু তিনি মহাকাব্য, পুরাণের যুগ ও বৌদ্ধ আমলের ধ্যানধারণার বিশিষ্ট অনুরাগী অনুসন্ধানী ছিলেন, মুঘল পূর্ববর্তী যুগের ভারতীয় স্থাপত্যের একজন উৎসাহী আবিষ্কারক, প্রাচীন তীর্থস্থান ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন ওঙ্কারেশ্বর ও প্রাচীন নালন্দা তক্ষশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানের বিশিষ্ট অনুসন্ধানীও ছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন রূপায়নের মধ্যে যে একমাত্র অন্তর্নিহিত সত্য লুক্কায়িত আছে তাহার আবিষ্কারই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

জগদীশচন্দ্রের পৈত্রিক নিবাস পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের রাঢ়ীখাল গ্রামে। বহু প্রাচীনকাল হইতেই তাহার নানা সংস্কৃত টোলের মাধ্যমে বিক্রমপুর একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। উহার বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায় সহজেই প্রথম হইতে ইংরাজি শিক্ষার দিকেও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজশাসনের অব্যবহিত ফল-স্বরূপ বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহাতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু প্রথম যুগের ইংরাজি শিক্ষিতদের একজন এবং তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দৃঢ়চরিত্র ও স্নায়বৎসল ছিলেন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উভয়কার্যেই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। দেশের লোকদের তিনি ভালবাসিতেন। যে স্থলেই তিনি যাইতেন সেখানেই প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রাগান মেলা প্রভৃতির আয়োজন করিয়া উহাদের মাধ্যমে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। জগদীশচন্দ্রকে তিনি অন্যান্য আমলার ছেলেদিগের মত সরকারী ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য না পাঠাইয়া প্রথমে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁহার জীবনের তীব্র দেশানুরাগ ও গ্রাম্য-সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা এইভাবে পিতৃ-প্রদত্ত প্রাথমিক শিক্ষা হইতেই লাভ করেন।

ভগবানচন্দ্র আমাদের দেশের সেই আমলের সাধারণ কয়েকজন আদর্শবাদীদের একজন ছিলেন। তিনি গ্রাম্য সমবায় সমিতি, ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান, চা বাগান প্রভৃতি করিয়া দেশীয় অর্থ-নৈতিক সংগঠন কার্যে নিজের উপার্জিত প্রায় সমস্ত অর্থই ব্যয় করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ এক বাঙ্গালীর ভাগ্যে যাহা ঘটে তাঁহারও তাহাই ঘটিয়াছিল। ঋণগ্রস্ত হইয়া মানসিক অশান্তি ও অত্যধিক পরিশ্রমে মধ্য-জীবনেই তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন।

এই পরিবারে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচ

জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সন্তানদের মধ্যে দ্বিতীয় ও পাঁচটি কন্যা ও দুইটি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-পুত্র ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়সেই লোকান্তরিত হন।

জগদীশচন্দ্রের শৈশব স্মৃতি ফরিদপুর সহরে পদ্মার ক্ষুদ্র উপনদীর তীরে পৈতৃক বাংলোকে কেন্দ্র করিয়া জাগ্রত ছিল। সেখানকার সেই নদীস্রোত ও ক্ষুদ্র সেতুটিকে চিরদিন তিনি কল্পনার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বালক বয়সে যখন তিনি কলিকাতায় বাস করিতেন তখন তাঁহার প্রিয় খেলা ছিল একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম স্রোতস্বতী ও কৃত্রিম সেতু নির্মাণ করা। আর পরবর্তী জীবনে যখন তিনি কলিকাতা ও দার্জিলিংয়ে বাড়ী নির্মাণ করেন তখনও বাড়ী-সংলগ্ন উদ্যানে সেইরূপ কৃত্রিম স্রোতস্বতী ও ক্ষুদ্র সেতুর অপরিবর্তনীয় উপস্থিতি। নদীস্রোত যেন তাঁহাকে বিচিত্র-ভাবে আকর্ষণ করিত। যখনই সম্ভব হইত তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অবসরগুলি কোন না কোনও নদীতীরে যাপন করিতেন। শিলাইদহে পদ্মার উপরে রবীন্দ্রনাথের নৌকায় দিনের পর দিন কাটাইয়াছেন; সিরাজগঞ্জে, ফলতঃ চন্দন নগর সর্বত্রই তাঁহার বাসস্থল নদীতীরবর্তী।

জগদীশচন্দ্রের বাল্যসখী, তাঁহার পিতার আশ্রিত সেই ভূতপূর্ব ডাকাতের গল্প সকলেই জানেন। সেই ডাকাতের নিজ কীর্তিকাহিনী জগদীশের শৈশবের মুগ্ধ আকর্ষণের বস্তু ছিল। এই ভূতপূর্ব ডাকাতের জন্য একবার ভগবানবাবু ও তাঁহার সপ্রশ্ন পরিবার নদীপথে রাত্রিকালে সত্যকারের ডাকাতের হাত হইতে বাঁচিয়াছিলেন। আর একবার ভগবানচন্দ্র কর্তৃক আশ্রিতা একজন দুষ্টলোক তাঁহার ঢাকাবাংলোবাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার দুরন্ত প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাঁহারা সকলে উদ্ধার প্রাপ্ত হন।

এগারো বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় সেন্ট-জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার পিতা এসময়ে বর্ধমান বিভাগের কাটোয়ার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। এসময় ভয়ানক ম্যালেরিয়া মহামারীতে বর্ধমানের বহুলোক মারা যায়। সহস্র সহস্র অনাথ বালক নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িল। ভগবানচন্দ্র এসময় অনাথ বালকদের কারিগরী শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিল্প বিদ্যালয় খোলেন। নিজ বাড়ীও জমীর অধিকাংশ এই বিদ্যালয় ও তাহার বিভিন্ন অংশের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে একটি ধাতু ঢালাই কারখানা পর্যন্ত ছিল। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রপাতির দিকে আকর্ষণের গোড়াপত্তন এখানেই। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে সাধ্য সাধনা করিয়া ভাঙ্গা-বাসনপত্র সংগ্রহ করিয়া ঐ ঢালাই কারখানা হইতে একটি ছোট পিতলের কামান তৈয়ারী করাইলেন। ঐ কামানটি এই পরিবারে বহুদিন পর্যন্ত ছিল, এমন কি তাঁহার ভাগিনেয় প্রভৃতিরাও উহা লইয়া খেলা করিয়াছে।

১৬ বৎসর বয়সে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া জগদীশচন্দ্র সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এখানে তাঁহার শিক্ষক ফাদার লাফোঁর দৃষ্টান্তে তিনি পদার্থ বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। এখনও তিনি কলেজ জীবনের অপেক্ষা বহির্জীবনের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট। তাঁহার ছুটীর দিনগুলি কাটিত কলিকাতা হইতে দূরে, সেখানে ঘোড়ায় চড়িয়া মুক্ত মাঠের মধ্যে ঘোরাইতেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি হিমালয়ের পাদ-দেশের তরাই অঞ্চলে একবার একমাস কাল যাপন করেন। ছয়মাস পর তাঁহার এক বন্ধু আসামে গণ্ডার শিকারের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। সন্ধ্যায় ষ্টেশনে নামিয়া তিনি দেখিলেন সম্মুখে একটি গাড়ী ও উহাতে করিয়া সারারাত্রিব্যাপী ২১ মাইলের পথযাত্রা। পরদিন সারাদিন শিকারের পর সন্ধ্যায় তাঁহার তীব্র জ্বর আসিল। সুতরাং স্থির হইল জ্বর আরও বাড়িবার পূর্বেই তাঁহার

কলিকাতা ফিরিতে হইবে। পাল্কী পাওয়া গেল না। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিবেন স্থির করিলেন। একটি মাত্র দুরন্ত রেসের ঘোড়া পাওয়া গেল। ঘোড়াটি তাহার আগের সওয়ারকে ফেলিয়া দিয়া প্রায় হত্যা করিয়াছিল। যাহাই হউক জগদীশচন্দ্র ঐ ঘোড়ায় চড়িয়াই যাত্রা করিলেন। ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। পথে দুরন্ত বন্যায় নদীর সেতু ভগ্ন। কোন ক্রমে বাঁশবাঁধা তৈয়ারী অস্থায়ী সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত জগদীশচন্দ্র ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। ঐ জ্বর কলিকাতায় পৌঁছিয়াও ছাড়িল না। কুইনাইনেও কমিল না। লাগিয়াই রহিল। ফলে বি এ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। এই জ্বর তাঁহার ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিবার পরও বহুদিন পর্যন্তও নিত্যসাথী ছিল এবং এই জ্বরের জন্যই তিনি শেষ পর্যন্ত বিলাতে ডাক্তারী পড়া ত্যাগ করিয়া কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে গেলেন।

১৮৮০ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার ঐ জ্বর সাধারণ জ্বর ছিল না, এখন আমরা জানি উহা আসামের ভয়ানক কালাজ্বর। তাঁহার শরীর-সংস্থান বিদ্যার অধ্যাপকের পরামর্শে অবশেষে তিনি ডাক্তারী পড়া ছাড়িলেন। ১৮৮০ সালেই কেম্ব্রিজে ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্তি হইলেন। বিজ্ঞানে বি, এ, পাশ করিলেন ১৮৮০ সালে। ঐ একই সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস সি, ও পাশ করিলেন। কেম্ব্রিজে তিনি বিখ্যাত অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। লর্ড রেলী (Rayleigh) তাঁহার পদার্থ বিদ্যার প্রতি অনুরাগের কারণ। পরবর্তীকালে যখন জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কার বার্তা লইয়া বিলাতে গমন করেন তখন লর্ড রেলীর নিকট হইতে তিনি অমূল্য সাহায্য পান। আরও একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক ভাইন্‌স্। তিনিও জগদীশচন্দ্রকে প্রভূত সাহায্য দান করেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের নিকট একটি সুপারিশ পত্র লইয়া। উহার ফলে বিভাগীয় আপত্তি সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে নিম্ন-অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এইখানেই তিনি ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সসম্মানে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ও ১৯১৫ সালের পরও তিনি "এমেরিটাস" অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে, জগদীশচন্দ্রের যখন ৩৫ বৎসর বয়স, তখন তিনি বিশেষ ভাবে গবেষণার কথা চিন্তা করিলেন। এর পূর্ব-পর্যন্ত তিনি নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক খেয়ালে মত্ত থাকিতেন। ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার গবেষণাগার গঠনের দিকেই মন দিয়াছিলেন ও তথায় মধ্যে মধ্যে, পরবর্তীকালে তিনি যে জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সেই পরীক্ষাসহ বক্তৃতা দান করিতেন। মটোগ্রাফীর তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এতদিনের মনোগ্রাফ দ্বারা গলার স্বর রেকর্ড করা তাঁহার আর একটি অবসর বিনোদনের উপায় ছিল। এ সময়ে তিনি নিজ উপার্জন হইতে পিতা ভগবানচন্দ্রের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া দেন। দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইবার পর তাঁহার পিতা মাত্র আর এক বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। বহু বৎসর পরে তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুর মেলার পঞ্চাশ বাৎসরিক উদ্বোধনে জগদীশচন্দ্রকে যখন বক্তৃতা দিতে ডাকা হয় তখন তিনি বক্তৃতা দেন—'A failure that was great' অর্থাৎ 'একটি বৃহৎ অসাফল্য'। এই বক্তৃতায় তিনি তাঁহার পিতার বিভিন্ন স্বদেশী প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন—যাহা করিতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"এটি কি একটি অসাফল্য? হ্যাঁ, কিন্তু অগৌরবের নয়, নিরর্থকও নয়। তাঁহার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার পুত্রের এই শিক্ষা হইয়াছে যে সে সাফল্য এবং অসাফল্যকে একই চোখে দেখিতে শিখিয়াছে এবং

বুকিতে লিখিয়াছে যে কোন কোন পরাজয় জয়লাভের অপেক্ষাও মহৎ।"

জগদীশচন্দ্রের বিবাহ হয় ১৮৮৭ সালে, শ্রীমতী অবলা দাসের সহিত। তিনি ছিলেন জগদীশের পিতৃবন্ধু, বিক্রমপুরেরই দুর্গামোহন দাসের কন্যা। এই দাস পরিবার হইতে বহু বিখ্যাত লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, চিত্তরঞ্জন দাস তাঁহাদের অন্যতম।

বিবাহের সূত্রে এরূপ দুটি দুর্লভ প্রতিভার যোগাযোগ খুব কমই হইয়াছে, এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়া স্বামী ও স্ত্রী দুজনে দুজনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে—বিজ্ঞান ও শিক্ষা, সংস্কার ও সমাজ সেবায়—যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহা অন্য দম্পতির ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

বিবাহের পর বন্ধুদম্পতির প্রথমে অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়া কাটাইতে হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমে চন্দননগরে একটি ক্ষুদ্র বাসায় বাস করিতে থাকেন। জগদীশচন্দ্রকে প্রতিদিন ভাগীরথী পার হইয়া কলিকাতার ট্রেন ধরিতে হইত। প্রতিদিন বৈকালে তাঁহার স্ত্রী নিজস্ব একটি ডিঙি লইয়া নদীর এপারে আসিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেন। ছয়মাস পর তাঁহারা পুনরায় পৈতৃক বাসায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। বছরে দুইবার তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত তীর্থ-স্থান সমূহ ভ্রমণ করিয়া ছিলেন। সঙ্গে যাইত তাঁহাদের প্রকাণ্ড গ্রেট-কাবেরাটি। তাঁহারা যাইতেন—অজন্তা, ইলোরা, সারনাথ, বোধগয়া, পাটলিপুত্র, নালন্দা, তক্ষশীলা, শ্রীনাথ, কেদারনাথ,—পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন তীর্থ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে।

জগদীশচন্দ্র একদা ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া গরুর-গাড়ীতে করিয়া সদ্য আবিষ্কৃত অজন্তাগুহা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে অজন্তা গুহাচিত্রের মধ্যে একটি তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। উহা তিনি ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁহার "মুকুল", প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পর যখন তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি ঐ চিত্রানুরূপ একটি ধাতুফলক তৈয়ারী করাইয়া দেওয়ালে গ্রথিত করেন। উহাতে সেই দুইখানি হরিণের সংঘর্ষের মধ্য হইতে প্রতিভাত আলোক ও অন্ধকার, সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চিত্রিত হইয়াছে। অন্য একটি বাংলা রচনা, "ভাগীরথীর উৎসব সন্ধানে"—উহাতে বর্ণিত হইয়াছে ভাগিরথীর উৎসমুখ সন্ধানে তাঁহার নিজের যাত্রার কথা।

পরবর্তী জীবনে তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান করেন সস্ত্রীক, এবং সে সময় তিনি প্রায় সমগ্র ইউরোপ (রুশিয়া ব্যতীত), আমেরিকা, জাপান ও মিশর ভ্রমণ করেন।

১৮৯৪ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ জগদীশচন্দ্রের সমস্ত সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কার্যে ব্যয়িত হওয়ার অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত, এইভাবে তিনি তাঁহার ভ্রমণ ও প্রাচীন মহাকাব্য পুরাণ ভাস্কর্যাদি পাঠের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক একতা আবিষ্কারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই অনুভব পরবর্তী-কালে তাঁহার প্রতি কথার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিত।

---

* অজন্তা মেয়ের মোহন সম্ভব ইংরেজি-ভাষা হইতে আংশিক অনুদিত।

বর্তমান প্রসঙ্গ

আচার্য জগদীশচন্দ্র

ভারতীয় জীবনবোধ কী অপূর্ব সুষমায় আত্ম-প্রকাশ করতে পারে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন তার এক বিস্ময়কর পরিচয়। যে যুগে ছিল তাঁর বিজ্ঞানের সাধনা ও জীবনের তপস্যা সে যুগের পরিবেশ ছিল তাঁর পক্ষে সবদিক দিয়েই প্রতিকূল। বিজ্ঞান ছিল সে যুগে বস্তুধর্মী। নিউটনের গতিবিজ্ঞান ও ডালটনের পরমাণুবাদ বস্তুকে দিয়েছিল সর্বসত্তা নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক অধিকার। সেই অধিকারকে অস্বীকার করে প্রাণের সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে বিজ্ঞানী-কবি অগ্রসর হয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না সেদিনে; ভারত সেদিনে পরাধীন অবজ্ঞাত, বিশ্ব-বিদ্বৎ সমাজে পঙ্‌ক্তিচ্যুত। সেই ভারতেরই এক সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানের বাণীর সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্যের সমন্বয়ে এবং আরেক সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ তথ্যের সঙ্গে জ্ঞানের/উপলব্ধির স্বর্ণসেতু রচনার প্রত্যয় নিয়ে বেরিয়েছিলেন বিশ্ব অভিযানে। ভারত তীর্থের দুই অভিযাত্রী, ভারতের একই ভূমিখণ্ড থেকে, একই সময়ে, একই বয়সে দিগ্বিজয় করে ফিরে এসে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতকে শুনিয়েছিলেন উজ্জীবন আশ্বাসের বাণী, তার আত্ম গ্লানিতে এনে দিয়েছিলেন সগর্ব আত্মচেতনা। এই দুই অভিযাত্রী হলেন—স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র। একই সত্যকে দুই দৃষ্টি ভঙ্গীতে নূতন করে ভারতের এই অভিযাত্রীরা তুলে ধরেছিলেন বিশ্বের সামনে। বস্তুত, বিস্মৃত ভারতকে আবার বহু শতাব্দীর পরে বিশ্বের সভার গৌরবের আসনে বসিয়ে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্র তড়িৎ-তরঙ্গের যে মৌলিক গবেষণা করেছেন তার কীর্তি বিজ্ঞান জগতে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বেতার, যুক্ত-দর্শন, র‍্যাডার তথা তড়িৎ-তরঙ্গ প্রয়োগের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক অবদান বার বার স্মরণীয় হয়ে মানব মনীষার বিস্ময় সৃষ্টি করবে। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র অধিকতর অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন জড় ও চেতনার ক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ব ও অবিশ্রান্ত গবেষণার জন্য। জীবনবোধের অখণ্ড সত্তার এই সত্য-দ্রষ্টাকে বিশ্ব-বিজ্ঞান এক অনধিগম্য ক্ষেত্র সন্ধানের পথিকৃৎ রূপে চিরদিন বিনম্র শ্রদ্ধা জানাবে।

এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক তপস্যার প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণে আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় ও চেতনের সীমান্ত ভেঙে দিয়েছেন। জীবনের এই পূর্ণ রূপ জ্ঞানের উপলব্ধিতে ভারতীয় ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র জ্ঞানের সেই উপলব্ধিকে বিজ্ঞানের নিরীক্ষণে পর্যবেক্ষণক্ষম করে দিয়েছেন—বাহ্য তথ্যের ভিত্তিতে পরিদৃশ্যমান করে তুলেছেন।

বিজ্ঞান এতদিন পর্যন্ত বিশ্বসত্তার জড়রূপের সন্ধানেই তন্ময় ছিল। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানীর সামনে তুলে ধরেছেন বিজ্ঞান সাধনার এক নূতন আলেখ্য—সর্বময় প্রাণ-তত্ত্বের এক অপরূপ উপলব্ধি। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অবদানের মৌলিক তাৎপর্য এখনও অনুসৃত হয়েছে। অরবিন্দের অতিমানবতা বোধে মানব মন যতই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে ততই দীপ্তিমান হয়ে উঠবে জগদীশচন্দ্রের জড়-চেতনের সীমান্ত-ভাঙার বৈজ্ঞানিক অবদানের অন্তর্নিহিত মূল্য।

প্রাচীন ভারতের অরণ্যবাসী ঋষিদের সত্যদর্শনকে নূতন করে অনুভব করার জন্য তিনি বেরিয়েছিলেন ভারততীর্থের পরিক্রমণে। সমন্বয় ধর্মের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি আচার্য জগদীশচন্দ্র। জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের, অতীতের সঙ্গে আধুনিকতার, অন্বেষানুরাগের সঙ্গে বিশ্বানুভূতির, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের; এই জীবন-শিল্পী কী গভীর অনুরাগে জীবনের সমস্ত অন্তরালে করার তুলেছিলেন এক অনন্যসাধারণ অলৌকিক ঐক্যতানে। আজ দীর্ঘ দিন পর আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন আলেখ্যের পুনরানুসন্ধানে কবি সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে-কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে :—

জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে কিসের কে সে দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা অন্ত-অন্ত-সংগমে।
• • •
ভুবন ভরে বিরাজ করে অনন্ত-অখণ্ড-প্রাণ—
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা অন্তরতরে স্পন্দমান!
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে।
সত্য মহাসমুদ্রেতে সমযেরি তীর্থ হে!
হারা আনন্দের কহিলে পথ পরিষার
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

মহাকবি কালিদাস

মহাকবির রচনাবলী দেশ ও কালের সীমানুভূতিতে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের চিরন্তন অনুভূতিকে মথিত করে।

যে যুগে ভারতে শিল্প ও সাহিত্য উপেক্ষিত ছিল, সর্বব্যাপী দুর্গতি ও পরাধীনতার গ্লানিতে জাতীয় মানস ছিল তমসাচ্ছন্ন সেই যুগেও মন্দ ধারায় মত রস পিপাসুর চিত্তে কালিদাসের কাব্য অমৃত সিঞ্চন করে প্রবাহিত হয়েছিল।

কালিদাস দেশকালোত্তীর্ণ কিন্তু তবু যুগে যুগে জাতীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা দানের প্রয়োজন আছে। জাতীয় সরকার উদ্যোগী হয়ে ওঠে জাতির অমর সন্তানদের অবদানকে বারবার স্মরণ করে জাতীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে। জাতীয় জীবন এভাবেই মহামানবের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে বেগবতী জাহ্নবীতে পরিণত হয় এবং শক্তিমান্ প্রবল জাতীয় সত্তায় পরিণত হয়। তাই কালিদাস জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতের সমস্ত ভাষায় মহাকবির রচনাবলীকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার এবং মহাকবি কালিদাসের নামে একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র-প্রসাদ করেছেন তাকে সময়োচিত বলে আমরা মনে করি।

বাংলা কংগ্রেস

প্রায় আট বছর একচত্র সভাপতি থাকার পর শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেছেন। শ্রীযাদবেন্দ্র পাণ্ডা মহাশয় নূতন সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। লোকসভার সদস্য ও কংগ্রেসের সভাপতি থাকা একই ব্যক্তির পক্ষে কংগ্রেসের নীতি বিরোধী—এই অজুহাতে অতুল্যবাবু পদত্যাগ করেছেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদের সপক্ষে লোকসভার সদস্য-পদ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী কমিটি অতুল্যবাবুকে লোকসভার সদস্য-পদ ত্যাগের অনুমতি দেননি।

অতুল্যবাবুর বক্তব্য একটি বাহ্যিক বিবৃতি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আট বছর পরেও অতুল্যবাবু বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি থাকেন তা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা নয় এবং বাংলা কংগ্রেসের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠিও ইহার বিরোধী। তাই অতুল্যবাবুকে ৮ বৎসর পর বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

শ্রীযাদবেন্দ্র পাণ্ডা মহাশয় যে নূতন সম্পাদক ও সহসম্পাদক এবং কার্যকরী সমিতি মনোনয়ন করেছেন

তার মধ্যে নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সেই পুরাতন ব্যক্তি এবং পুরাতন গোষ্ঠীই নূতন কমিটিতে বহাল রয়েছেন। শুধু পদাধিকারীর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। তাই নূতন কংগ্রেস কমিটি হতে নূতন কিছু আশা করার আছে বলে মনে করার কারণ নেই। কংগ্রেস জনপ্রিয়তা ও জনভিত্তি হারিয়েছে প্রায় সম্পূর্ণরূপে। কংগ্রেস টিকে আছে সরকারী ক্ষমতা ও প্রভাবকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে। জনপ্রিয়তা, জনসমর্থন ও গণভিত্তি হারিয়েও কি ভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে রাখা যায় তার কৃতিত্ব অতুল্যবাবু ভালভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু ভারতে যদি গণতন্ত্রকে যথার্থ বাঁচতে হয় তবে এরূপ কৃতিত্ব বেশি দিন কার্যকরী হবে না।

মুনাফা-বিরোধী অর্ডিনান্স

গত ২২শে অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন, মুনাফা-বিরোধী অর্ডিনান্সটি কল্‌কাতা গেজেটের একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই অর্ডিনান্সটির উদ্দেশ্য প্রতি স্তরে কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যথা,—চাউল, ধান, গম, গমজাত দ্রব্য, ডাল, মসলা, তেল, চিনি, শিশুদের খাদ্য, কাগজ এবং ঔষধপত্র—সর্বোচ্চ দর বেঁধে দেওয়া। উপরোক্ত দ্রব্যগুলিতে মুনাফাবাজী করলে যে কোন ব্যবসায়ীকে ঊর্ধ্বে দুই বছরের সশ্রম কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা কারাবাস এবং জরিমানা দুইটি শাস্তিই ভোগ করতে হবে। এছাড়া হিসাবপত্র ঠিকমত না রাখলে, নির্ধারিত দ্রব্য বিক্রি করতে অসম্মত হলে অল্প-বিস্তর সাজার ব্যবস্থা অর্ডিনান্সটিতে আছে।

২৩শে অক্টোবর শুক্রবার থেকে গম ও গমজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বাঁধা হলে কার্যত অর্ডিনান্সের প্রয়োগ সুরু হয়। খুচরা ব্যবসের প্রতি : গম ৩৭ নয়া পয়সা, আটা ৪১ নয়া পয়সা ও সুজি ৪৯ নয়া পয়সা। সেই সঙ্গে উৎপাদকদের ও পাইকারদের জন্যও দর বেঁধে দেওয়া হয়। এই সর্বোচ্চ দরের প্রয়োগ কল্‌কাতা ও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ২৬শে অক্টোবর পত্রিকায় এ-সংবাদ পরিবেশিত হয় যে এক সপ্তাহের মধ্যে চাউল ছাড়া অর্ডিনান্সে উল্লিখিত অন্যান্য দ্রব্যের দর বেঁধে দেওয়া হবে। চাউলের দর না বেঁধে দেবার কারণ হিসেবে বলা হয় যে বছরের এই সময়ে চাউলের দর বেঁধে দিলে যারা প্রচুর চাউল কিনে রেখেছে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, যার প্রতিক্রিয়া বাজারের উপর অশুভ হবে। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয় যে নূতন ধানের আমদানী না হওয়া পর্যন্ত চাউলের দর বাঁধা সম্ভব হবে না এবং চাউলের সর্বোচ্চ দরের পরিমাণ বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য অর্ডিনান্সের খসড়াটি দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির সহি সম্বলিত অর্ডিনান্সটি বাকি ২০শে অক্টোবর রাজ্যসরকারের হাতে আসার দুইদিন পর ২২শে তারিখে সেটি জারী হয়। অর্ডিনান্সটি জারী হোতে দেড় মাসের ওপর কেটে গেল কেন তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। অথচ এই দেড় মাসের মধ্যে আসন্ন অর্ডিনান্সের যাতায়াত যোগাযোগ মুনাফা-শিকারীদের সতর্ক করে দিয়ে যে আপ্যায়িত করা হয়েছে, তা সরকারী কর্তৃপক্ষের অজানা নেই। যাদের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্ডিনান্সের প্রয়োজনীয়তা, তাদেরই সতর্ক হবার সুযোগ দিয়ে সেই অর্ডিনান্স জারী করার মধ্যে যে যোগসাজস রয়েছে—পরোক্ষ না হলেও অপরোক্ষ—সরকার তা অস্বীকার করবেন কি করে?

অর্ডিনান্স জারী হবার পরও গমের পাইকারী বিক্রেতা ও উৎপাদকদের জন্য সর্বোচ্চ দর বাঁধা হল না কেন এই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। চিনির দর বাঁধা হবে না

একথা পশ্চিম বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে। চিনির সর্বোচ্চ দর না বেঁধে চিনি-কল মালিক ও চিনির কারবারীদের ওপর বাধ্যিনা দেখাবার কারণও অনুমান করা কঠিন নয়। একই কারণে যে চাউলের ব্যাপারীদের ওপর বাধ্যিনা দেখানো হয়েছে, সে অনুমানও দুঃসাধ্য নয়। নূতন ধান আমদানীর পর দাম নেমে গেলে সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেবার আশু প্রয়োজনীয়তাও যে ফুরিয়ে যাবে সে-সংবাদ কে না রাখে। তাই যদি সরকারের অভিপ্রায় ছিল, অর্ডিনান্সের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? অর্ডিনান্সের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় জরুরী সঙ্কটের জরুরী সমাধানের জন্য এবং তার সাফল্য নির্ভর করে ক্ষিপ্রপ্রয়োগের ওপর। সরকারী নীতিতে কোনো সঙ্কটের তাগিদ কিম্বা প্রয়োগের ক্ষিপ্রতা কোনোটারই রেখাপাত নাই। শিশুদের খাদ্য ও ওষুধের ক্ষেত্রে যদিও দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও দেখা যায় বাজার দরের চাইতে খুব কম ক্ষেত্রেই নীচু দর বাঁধা হয়েছে এবং বাজার দরের সীমা ছাড়িয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দর বাঁধা হয়েছে।

তাছাড়া, মাছ, ডেল, মসলা, ডাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে দর বাঁধার কোনো চেষ্টাই সরকার পক্ষ থেকে এ-যাবৎ করা হয় নাই। সব মিলিয়ে অর্ডিনান্সটি একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ে সরকারী ব্যবস্থা

গত ৯ই নভেম্বর দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ ৪৫০০ কোটি টাকায় স্থির করার পরও পরিকল্পনার মূলধনী সম্পত্তিতে ৬০০ কোটি টাকা ঘাটতি রয়ে গেছে। এই ঘাটতি পূরণ অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করে সম্ভব হবে না। বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এই ঘাটতি পূরণে সহায়তা করা হবে কিনা সে সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী ফেব্রুয়ারীর পূর্বে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু এই পরিমাণ চূড়ান্ত রূপের জন্য কাঁপাই যায় যে অবশ্যম্ভাবী সে-সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে কাঁপাই যাবে যারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় ফলে চূড়ান্ত রূপের পরিমাণ অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাবে। তাই এই প্রতিক্রিয়ার আঘাত থেকে পরিকল্পনাকে রক্ষা করার জন্য খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তাব জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে চাউল, গম ও ছোলার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সকল রাজ্যেই আসল পাইকারী ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সমুক্ত করে নির্দিষ্টমূল্যে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট খাদ্যশস্য বিক্রি করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। এইভাবে মধ্যবর্তীদের মুনাফার সূত্র বন্ধ করে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য বেঁধে রাখবার ব্যবস্থার কথা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ চিন্তা করেছে এবং এই নীতি কার্যে পরিণত করার বিশদ পরিকল্পনা রচনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তর ও পরিকল্পনা কমিশনের ওপর দেওয়া হয়েছে।

খাদ্যশস্যে নিয়ন্ত্রিত পাইকারী ব্যবসায় কতটা সফল হবে সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ ইতি-পূর্বে নিয়ন্ত্রণের আওতায় দুর্নীতির চক্র খাদ্যশস্যের পাই-কারী ব্যবসায়ে প্রবেশ করে বাংলাদেশে মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া গ্রামীন কো-অপারেটিভের মারফৎ গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ক্রয়ের যে ব্যবস্থাপনা এখনও সুদূরপরাহত। সুতরাং সরকারকে অবিলম্বে বর্তমান পাইকারী ব্যবসায়ের নানা পথঘাটের বিকল্প একটি সংস্থা গঠন করবার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। অবশ্য

এ-পথে বিঘ্ন অনেক। কারণ প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে ২ কোটি মণ খাদ্যশস্য গ্রাম থেকে দেশের প্রায় ১৩০০ বড় বড় বাজারে বিক্রির জন্য চলে যায়। এর জন্যে পরিমাণ খাদ্যশস্যের লেন-দেনের জন্য প্রায় চারশ কোটি টাকার প্রয়োজন। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের জন্য মজুত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা, কৃষক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের ধারনের ব্যবস্থা ও সর্বোপরি সুসংগঠিত কর্মচারী গোষ্ঠী প্রয়োজন।

অশোক মেহেতা কমিটি খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ের সুপারিশ করেছিলেন। ভারত সরকার প্রথমে সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করে খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা-বিরোধের জন্য অনন্যোপায় হয়ে অবশেষে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। বিলম্বে হলেও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত যথার্থ হয়েছে এবং এই নীতি প্রয়োগের সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র পাইকারী ব্যাপারীদের লাইসেন্স দিয়ে নির্দিষ্ট মূল্যে খুচরা ব্যাপারীদের খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নির্দেশ দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে অবস্থা আরও জটিলতর হবেমাত্র।

লোকসভায় অবমাননা

গত ২৭শে নভেম্বর লোকসভায় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রীপাদের বিরুদ্ধে লোকসভার অধিকার সংক্রান্ত মাদানীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং প্রস্তাবটি অধিকার সংরক্ষণ কমিটিতে পেশ করা হয়েছে। কংগ্রেসদলের সভ্যদের অধিকাংশ ভোটের অধিকার দেবার ফলেই মাদানীর প্রস্তাবটি গৃহীত হতে পেরেছে। লোকসভার জনৈক সদস্যের উক্তিকে নাম্বুদ্রীপাদ 'Slander' বিশেষণে বিশেষিত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটি তার পাঠাবার ফলেই এই বিতর্কের উদ্ভব হয়। মাদানীর প্রস্তাব প্রত্যাহারের পক্ষে প্রধান-মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অভিমত পোষণ করতেন বলে জানা গেছে। কারণ এই প্রস্তাবটির মধ্যে কেন্দ্রশাসিত কাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। বিশেষ করে যেখানে একটি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা, কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থা যে দলের হাতে রয়েছে তাদের হাতে না থেকে অন্য একটি বিরোধী দলের হাতে রয়েছে। অপর একটি বৈধানিক প্রশ্নও এই বিতর্কের সঙ্গে জড়িত ছিল। লোকসভার অধিকার যদি কোনও বিধান সভার অধিকারসম্পন্ন একটি সভা ক্ষুণ্ণ করে থাকেন, তবে এই দায়ের শাস্তি সেযোক্ত ব্যক্তির উপর কিভাবে প্রয়োগ করা হবে? এই দুইটি সংবিধানিক প্রশ্ন ছাড়াও যে প্রশ্নটি এই বিতর্কের অন্তরালে থেকে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তা হচ্ছে, কেরলে কম্যুনিষ্ট পার্টির শাসনের ফলে একতান্ত্রিকতার দীর্ঘায়িত ছায়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ ও আশঙ্কা।

হয়তো সংবিধানগত প্রশ্নের কষ্টিপাথরেই এই বিতর্ক যাচাই হয়ে লোকসভায় হয় প্রত্যাহৃত হত না হয় পরাজিত হত—কারণ স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিপ্রায় যখন সেরকম ছিল বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু বিতর্কের সময় লোকসভায় ঘটনাপরম্পরায় যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তার ফলে এই প্রস্তাব পাশ হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে টি, সি, এস, মেননের বক্তৃতা সকল পক্ষ ধীরভাবে শোনার পর যখন প্রস্তাবের সপক্ষে পি, এস, পির ডাঃ কে, বি, মেনন বলতে ওঠেন তখন কম্যুনিষ্ট দল থেকে চীৎকার ও হট্টগোল করে বাধা দেওয়া হয় এবং এই পন্থা চলতে থাকে যখন পি, এস, পির অশোক মেটার বক্তৃতা সুরু হয়। লোকসভায় একতান্ত্রিকতার এই ছায়াপাতে বাধা হবার তাই হয়েছে।

জাতির বিশিষ্টদের স্মরণে

স্বাধীনতাউত্তর কালে একটা কাজে আমরা কিছু বেশীমাত্রায় ব্যাপৃত আছি—অন্ততঃ আমাদের তাই মনে হয়। রাস্তাঘাটের পুরোনো নাম পরিবর্তন ও তার স্থানে জাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে সেগুলির নামকরণ, বিশেষ ব্যক্তিদের স্মরণোদ্দেশে কয়দিন উদ্‌যাপন এবং সেই দিনগুলিকে স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে সেই সব ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি সম্বলিত ডাক টিকিট প্রকাশ প্রভৃতি। কিন্তু সেই অনুপাতে তাঁদের যথার্থ যোগ্য মর্যাদা দান অথবা তাঁদের স্থানকে স্মরণীয় করবার ও তার দ্বারা লাভবান হবার উদ্দেশ্যে জাতির সম্মুখে সেগুলিকে অনুসরণ-যোগ্য রূপে উপস্থাপিত করবার কোনো প্রচেষ্টা হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব প্রচেষ্টার পেছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির অভাব অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। কয়েকটী উদাহরণ দিচ্ছি। যথা মহাজাতি সদনে নেতাজী ও স্বদেশ সেবকদের প্রতিকৃতি রাখার উদ্যোগের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসুর মত অবিসম্বাদী দেশ-প্রেমিকের প্রতিকৃতি রাখতে ভুল হওয়া, যেমন ভারতসরকার কর্তৃক বিপিন পাল শতবার্ষিকীর স্মারণিক ডাক টিকিট প্রবর্তন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, মহাজাতি সদনে বিপিনপালের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি না দেওয়া এবং সর্বশেষ আশ্চর্য রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, এবং নেতাজী সুভাষের মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই মহাত্মা গান্ধির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অস্থায় ভিড়। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মহাত্মাজীকে সম্মান দেখানোর ছলে নেতাজীর মূর্তির প্রতি অমার্জনীয় তাচ্ছিল্য প্রদর্শন। কোনো যুক্তিবাদই খাটবে না সরকারের এই অশোভনীয় আচরণ ঢাকা পড়বেনা। বিশেষভাবে কোন্ মাধ্যমে কোন্ দেশপ্রেমিকের দানকে কিভাবে স্বীকৃতি দান করা হবে সেটা নির্ধারণ করবে কে? এ নির্ধারণের প্রকৃষ্টতম পথা কি সরকারি ফতোয়া? এবং সেই ফতোয়াই কি একমাত্র গ্রহণীয় হবে দেশবাসীর নিকটে? মহাত্মাজী ও নেতাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোনো "কম্পিটিশনের" প্রশ্নই এ নয়। স্বার্থসন্ধিৎ ব্যক্তিরা এভাবে এটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে এবং যারা সরকারের অশোভনীয় আচরণের প্রতিবাদ করবার মত মূঢ়তা রাখে তাদের প্রতি নানা বিশেষণ আরোপিত করেছে। বাংলার মহাত্মাজীর মূর্তি ও স্মারণিক যাদবপুরে গান্ধীঘাটে স্থাপিত করা হয়েছে, কলকাতারও উপযুক্ত স্থানে তা করা যেতে পারতো; আউটরামের মূর্তি অপসারিত করে মহাত্মাজীর মূর্তি স্থাপিত করায় কি মহাত্মাজীর প্রতি বিশেষ প্রকারের কোনো সম্মান প্রদর্শন করা হোয়েছে? যাহোক্ আপাততঃ মহাত্মাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়ে গেছে এবং এনিয়ে আলোচনার সার্থকতা বিশেষ নেই। অত্যন্ত 'উদারতার' সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন যে নেতাজীর মূর্তি কলকাতা ময়দানে স্থাপিত করবার জন্য তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। নেতাজীর মূর্তি-চাদর পরিহিত মূর্তিই নাকি তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করবেন মনস্থ করেছেন। অশোভনতা ও স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত—নেতাজীর অবিস্মরণীয় মহত্ত্ব ও অবদান যে ঘটনাকে অবলম্বন করে—যার ফলে সমস্ত দেশবাসীর তিনি নেতাজী, যার ফলে ইংরেজ এদেশ পরিত্যাগ করে গেল সেই অধ্যায়কে এই ক্ষুদ্র-মতি ব্যক্তিরা ঘুলিয়ে দিতে চান মূর্তি চাদরের আড়ালে। আমরা আশা করি প্রয়োজন হলে বাঙলা এই ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত উত্তর দেবে এবং নেতাজীর মূর্তির প্রতি এই উদ্দেশ্যমূলক অপমান কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

রুচির অমার্জিত বিকৃতি

স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য কি, এ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে

কোন ভারতীয়ের সুস্পষ্ট ধারণা আছে কিনা জানিনা কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান কর্ণধারদের ব্যবহার, কাজ ও কথায় এত পরস্পর-বিরোধী নীতি ও রীতি প্রতি মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে যে—জাতীয় লক্ষ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া অতি স্বাভাবিক। একদিকে মহাত্মা গান্ধীকে জাতির জনক আখ্যাদিয়ে বিনম্র বাড়াবাড়ি আর একদিকে পাশ্চাত্যের নিকৃষ্টতম রুচির দাসসুলভ অনুকরণ—এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা আমাদের জাতীয় লক্ষ্য? এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সুস্পষ্ট ভাবে জানবার অধিকার আছে।

প্রসঙ্গটা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কয়েকটি কারণে। উপলক্ষ্যে দিল্লীতে "১৯৫৮র ভারত" নামে প্রদর্শনীর আয়োজনের মধ্যে। প্রদর্শনীর নাম থেকে যা সহজে বোঝা যায়, প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, আজ পর্যন্ত ভারতের সমাজ-উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের অগ্রগতির একটা ধারণা দেবার জন্য। অন্যান্য বিষয়গুলি এখানে উপস্থাপন করবার প্রয়োজন নেই কিন্তু ভারতবর্ষের সামাজিক ও কৃষ্টিগত উন্নতির যে নিদর্শন এখানে দেয়া হয়েছে তাতে যে কোনো আত্মসম্মান সম্পন্ন সুরুচিমান ব্যক্তিকে লজ্জায় অধোবদন হতে হবে। এ সম্বন্ধে কোনো সহযোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা যে তথ্য দিয়েছেন তা থেকে জানাগেল যে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকে দিল্লীর জনৈক দৈনিক ও অন্যান্য সংবাদ পত্রের 'এ্যাটেচ' কলামে—প্রদর্শনীর জন্য "সুন্দরী সেলস্ গার্ল" প্রয়োজন বলে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। কিন্তু প্রদর্শনী চালু হবার পর দেখা গেল যে ঐ সব সুন্দরীরা সকলেই বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত হননি, উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে কেবলমাত্র শোভাবর্ধনের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে—সহযোগী মন্তব্য করেছেন "তারা সুন্দরী কিনা জানি না তবে নিজেদের আকর্ষণীয় করবার জন্য তারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি।" পোষাকের স্বল্পতা ও বিশেষধরণ নিজেদের আকর্ষণীয় করবার প্রধান উপায় ছিল। প্রদর্শনীর একটী স্থানে এই বিকৃতরুচির চূড়ান্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে একটী লোক চিৎকার করে বল্‌ছিল "আসুন, আসুন, দেখুন একটী ষোড়শী তার সব কিছু দেখাবে" এবং পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে যুবক ও তরুণেরা সেদিকে ছুটছিল। সোমনা সেবক ব্যাপার কি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন যে সেখানে আলোকপাতের কারসাজির ফলে একটী ষোড়শী বালিকাকে কখনো কেবল-মাত্র কঙ্কাল এবং কখনো সম্পূর্ণ অনুরূপ বলে প্রতীয়মান করা হচ্ছিল। তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন "ঐ ভাবে লোকটী জাদুবাজী সৃষ্টি করছিল কি উদ্দেশ্যে" উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নিঃসন্দেহ অতি স্থূল ও নিম্নরুচিকে আকৃষ্ট করবার জন্য। "১৯৫৮র ভারত" এর স্বরূপ কি ঐ? আমরা কি ঐ লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ? এবং এটাই কি আমাদের জাতীয় লক্ষ্য—প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ—বর্তমান সরকারের নাকের উপর এ প্রদর্শনীর আয়োজন ও পরিচালনা ঘটেছিল। আমাদের বিদেশে দেশবিদেশের প্রতিনিধিদের নিকট এই ভারতকেই যারা দেখালেন, তাঁরা কি এ দেশ ও এদেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছেন?

কেরলে শ্রমিক-নীতি

ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের বিরোধী যদি কোন শ্রমিকদল কর্মেচ্ছু থাকে এবং তাদের এই কাজের ইচ্ছা যদি ধর্মঘটী শ্রমিকদের দ্বারা-বলপ্রয়োগের দ্বারা রুদ্ধ হবে—প্রতিহত হবার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে বাধা-প্রাপ্ত শ্রমিকদল নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সাহায্য পেতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন উঠেছে। কেরলে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং কেরল সরকারের মুখপাত্রগণ উপরোক্ত অবস্থা কর্মেচ্ছু শ্রমিকদের পুলিশের সাহায্য দেবার বিরোধী

শ্রমিক-মালিক বিরোধে শ্রমিকেরা একযোগে মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, সেটাই কাম্য। তা না হোলে শ্রমিকের সংগঠন দুর্বল হয়ে থাকবে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে অক্ষম হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার ও সাধারণভাবে এদেশের শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে যদি রাজনৈতিক দলগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিক স্বার্থ-নিরপেক্ষ কোনো সংঘাতে তারা ব্যবহৃত হয়, সেই দ্বন্দ্বে যুক্ত না হবার অধিকার শ্রমিকদের নিশ্চয়ই রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে অনিচ্ছুকদের নিরাপত্তা ব্যাহত হলে, পুলিসের সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছান উচিত। কেরলের কম্যুনিষ্ট পার্টি কিম্বা কেরল সরকার যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অধিকার হরণ করতে চান, তাহোলে তারা গণতন্ত্রে স্বীকৃত নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণের অপরাধে অপরাধী হবেন। এই সমস্যার সমাধান অধিকার হরণ করে হবে না। শ্রমিকদের অধিকতর সচেতন ও সংগঠিত করে এই সমস্যার মীমাংসার পথে অগ্রসর হতে হবে।

ভারতে যক্ষ্মা

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা ডাঃ পি ভি বেনজামিন সম্প্রতি বলেছেন ভারতব্যাপী অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে প্রতি বৎসর প্রায় ১২ লক্ষ পুরুষ ও নারী এদেশে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়। এই রোগ সহরাঞ্চলে অধিক হলেও গ্রামাঞ্চলেও একে উপেক্ষা করা যায় না; এবং উভয় অঞ্চলেই এর ক্রমবৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে যক্ষ্মা একটী জাতীয় সমস্যায় দাঁড়িয়েছে; কিন্তু একে নিবারণ করবার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক তার কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ শিশুকাল থেকে দুগ্ধসঙ্গত ও উপযুক্ত আহারের অভাব, সহর এমনকি গ্রামাঞ্চলেও আলোবাতাসহীন অনুপযুক্ত বাসস্থান, যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই দুইটি প্রাথমিক প্রয়োজন কি ভাবে মিটবে? দ্বিতীয়তঃ যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীকে অবিলম্বে সুস্থব্যক্তি থেকে পৃথক করার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা, তৃতীয়তঃ হাসপাতাল প্রত্যাগত রোগীর পুর্নবাসন—এর সবগুলিরই শোচনীয় অপ্রাচুর্য্য ও অব্যবস্থা। এই কলকাতা সহরেই এমন অনেক সংবাদ আমরা জানি যেখানে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আত্মীয় স্বজন, সুস্থব্যক্তিদের এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষাকরবার অন্য উপায় না পেয়ে রোগীকে উন্মুক্ত পার্কে অথবা ফুট-পাথে রেখে এসেছে, মানুষের অমানুষীয় অবস্থায় ভিলে ভিলে মৃত্যু বরণের জন্য। কাজেই অবিলম্বে প্রয়োজন যক্ষ্মা হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সহজ প্রবেশের ব্যবস্থা, হাসপাতাল-প্রত্যাগত রোগীর উপযুক্ত পুর্নবাসন। এবং সর্বাপেক্ষা মূল প্রশ্ন জাতির জন্য দুগ্ধসঙ্গত ও উপযুক্ত খাদ্য ও উপযুক্ত বাসস্থান।

মালেনকভের মোক্ষলাভ

গদী গেলে গর্দান যায় এটাই কম্যুনিষ্ট রাজনীতির স্বত-সিদ্ধ সূত্র। ষ্টালিন আমলে এই সূত্রটি একেবারে নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। মালেনকভও এই সূত্রেরই একাগ্র অনুসারী ছিলেন। মালেনকভের পরে বুলগেনিন তথা ক্রুশ্চেভ এই নীতিটিকে একটু শিথিল করে নিয়ে প্রয়োগ করে দেখছিলেন তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কি ফল।

বুলগেনিন গেছেন, এখন এসেছেন ক্রুশ্চেভ। ক্রুশ্চেভ একে একে মালিনকভ সমর্থক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গদীচ্যুত

[শেষাংশ ৫৬৭ পৃষ্ঠায়]

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় · সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লাতে থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা করকরে করে তোলে।

L. 271-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রচার।

ভারত ও গণতন্ত্র

সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? বিশেষ ভাবে এশিয়ায় সামরিক একনায়কত্বের অভিজ্ঞতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও তার মীমাংসা ভারতের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে গণতন্ত্রের মর্মবস্তু ও অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ কি, তার স্বরূপ ও বাহন কি, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি, পশ্চাৎপদ দেশ সমূহে এদের উপযোগিতা—বিশেষ ভাবে দ্রুত সংগঠন ও শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এদের উপযোগিতা এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভারতবর্ষে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের বিপদ এবং বিপদ মুক্তির পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক্ থেকে আলোচনা প্রকাশ করতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই আলোচনা-চক্রের প্রথম প্রবন্ধ শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের একেশ্বরবাদ।

ঃ সঃ

একেশ্বরবাদ

অন্নদাশঙ্কর রায়

তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে আরো দুটি বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আয়ুব খান্ হলেন অধিকন্তু প্রধান মন্ত্রী। তাঁর ইচ্ছায় রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জাকে পদত্যাগ করতে হলো। তখন আয়ুব হলেন রাষ্ট্রপতি তথা প্রধান সেনাপতি। প্রধান মন্ত্রী পদটা রদ করা হলো। বারোজন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি শাসনপরিষৎ গঠন করা চলো। এঁদের বলা হবে মন্ত্রী। অথচ এঁরা মন্ত্রী নন। পরামর্শ দাতা। আয়ুব ইতিপূর্বেই নিরঙ্কুশ হয়েছিলেন। এবার হলেন নিষ্কণ্টক।

আর মির্জা? মির্জা গেলেন মানে মানে নির্বাসনে। সেখানে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার মর্ম, আপাতত বছর তিনেক লাগবে ঘর কাঁট দিতে, ময়লা সাফ করতে। তার পরে প্রবর্তন করা হবে গণতন্ত্র। তার পদ্ধতিটা হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কা। অর্থাৎ যিনি প্রেসিডেন্ট তিনিই প্রধান মন্ত্রী। নামে নয়, কাজে। তিনি রাষ্ট্রেরও মাথা, সরকারেরও মোড়ল। একাধারে রাজা ও প্রজাপ্রতিনিধি। প্রজা ও প্রজাপতি। দ্বৈতাদ্বৈত।

কিন্তু মির্জা সাহেব বোধ হয় ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেননি। আমেরিকা যেমন তার রাষ্ট্রপতিকে রাজ্য পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছে তেমনি আইন প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছে প্রজা-প্রতিনিধিদের কংগ্রেসকে। কংগ্রেস যদি ইচ্ছা করে প্রেসিডেন্টকে তার সামনে হাজির করিয়ে তাঁকে ইম্‌পীচ করতে পারে, তাঁর জবাবদিহি নিতে পারে, তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে। এ রূপ ঘটনা আমেরিকার ইতিহাসে এক আধবার ঘটেও গেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের মাথার উপর ইম্‌পীচমেন্টের খড়্গ ঝুলতে থাকে। এই তো সেদিন কে একজন প্রজাপ্রতিনিধি বললেন, "দাঁড়াও, আইসেনহাওয়ারকে ইম্‌পীচ করছি।" এমন উক্তি আয়ুব খানের কানে সুধাবর্ষণ করত না, তিনি যদি হতেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তিন বছর পরে তিনি যদি সত্যি সত্যি নতুন এক শাসনতন্ত্র রচনা করে শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হন তা হলে কি তিনি ইম্‌পীচমেন্টের খড়্গ প্রতিনিধিসভার হাতে তুলে দিতে রাজী হবেন? বিশ্বাস তো হয় না।

তারপর আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট ও তার অধীনস্থ আদালতগুলি প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের ঊর্ধ্বে ও কংগ্রেসের খপ্‌পরের বাইরে। রাজাপ্রজা কারো সাধ্য নেই যে ধর্মাধিকরণের ক্ষমতা খর্ব করে বা হরণ করে বা তাঁর সমান ক্ষমতার অধিকারী হয় বা তার ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলে। সামরিক আইন জারি করে আমেরিকার প্রজাদের শাসন করা যায় না, করলে আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট দেখে নেবে। আমেরিকার জনতা কোর্টকেই সমর্থন করবে, নিষ্ক্রিয় থাকবে না। তারা বৃন্দাবনের লোক নয় যে বলবে প্রেসিডেন্টই একমাত্র পুরুষ, আর সকলে নারী।

আমেরিকার শাসনতন্ত্র ক্ষমতাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ দিয়েছে প্রেসিডেন্টের হাতে। এক ভাগ কংগ্রেসের হাতে। এক ভাগ সুপ্রীম কোর্টের হাতে। যে যার এলাকায় ঈশ্বর। এ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের কথা। এ ছাড়া রাজ্য সরকারের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা। ক্ষমতার উৎস নিচের দিকে। অসংখ্য ছোট ছোট অঞ্চল। তারা উপরের দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত নয়। যে যার সীমার মধ্যে স্বাধীন। এত বেশী নির্বাচন আর কোনো দেশেই নেই। কর্মচারীরাও বহুক্ষেত্রে নির্বাচিত। গভর্ণরাও নির্বাচিত। সেই দেড় শ' বছর আগে থেকে এ ব্যবস্থা চলে আসছে। ভাবলে অবাক হতে হয় কী করে এটা সম্ভব। আমাদের দেশে তো মিউনিসিপালিটি বা ইউনিয়ন বোর্ড বা জেলা বোর্ড শতকরা নব্বুইটা অচল। যেখানে সচল সেখানে ওয়ান-ম্যান শো। গণতন্ত্রের শিক্ষানবীশী হয় স্বায়ত্তশাসনের এই সব প্রতিষ্ঠানে। ইংলণ্ডেও হাতে খড়ি হয় কাউন্টি কাউন্সিলে, বরা কাউন্সিলে। নিচের দিকে যদি গণতন্ত্রের পাট না থাকে, লোকে যদি মিলেমিশে কাজ করতে না শেখে, হাতে কলমে সংসার চালাতে না শেখে তা হলে বৃহত্তর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। অযোগ্যতার পরিচয় দেয়। কর ধার্য করতে সাহস নেই, করলে

আদায় করতে সাহস নেই, আদায় করলে বারো ভূতে লুটে খাবে; এই যদি হয় ঐতিহ্য তা হলে আল্লুর খান্ তার শেষ পরিণতি। পাকিস্তানের মিউনিসিপালিটিগুলোতে আজকাল কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে থাকে বকেয়া দাখিল করতে। একমেবাদ্বিতীয়মের আদেশ।

আমেরিকায় একজন প্রেসিডেন্ট আছেন, তাঁর কোনো প্রধান মন্ত্রী নেই, তার থেকে মনে হতে পারে আমেরিকার রাজনীতিতে একমাত্র খোদাতালা আছেন, তাঁর কোনো দোসর নেই। কিন্তু সেটা ভুল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়করা সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকেই এমন এক ব্যবস্থার সূত্রপাত করে গেছেন যার কোনোখানে ডিকটেটরশিপের জন্যে এতটুকু ছিদ্র নেই। অথচ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর মন কষাকষি বা বল কষাকষি চলবে তার জন্যেও পথ খুলে রাখেননি। প্রধান মন্ত্রী থাকলে প্রশ্ন ওঠে, প্রজাপক্ষের মোড়ল কোন জন? প্রেসিডেন্ট? না প্রধান মন্ত্রী? আমরা হলে উত্তর দিতুম, কেন? প্রধান মন্ত্রী। আমাদের চিন্তাধারা ইংরেজের মতো। ইংলণ্ডের রাজা যেমন ভারতের প্রেসিডেন্ট তেমনি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে। তাঁকে রাজনীতির আসরে নামালে তাঁরও একটা প্রতিপক্ষ স্বীকার করে নিতে হবে। রাজার আবার প্রতিপক্ষ কে? গণতন্ত্রে রাজার কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না। তা বলে তিনি একেশ্বর নন। তিনি বরং আমাদের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। প্রকৃতিই সক্রিয়। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রজার প্রতিনিধিরাই সর্বশক্তিসম্পন্ন। ইংরেজ মার্কা শাসনতন্ত্রের এই তত্ত্ব মার্কিন মার্কা শাসনতন্ত্রে নেই। সেখানে এক ঈশ্বর নয়। তিন ঈশ্বর। প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ কর্মকর্তা। কংগ্রেস অর্থাৎ আইনকর্তা। সুপ্রীম কোর্ট অর্থাৎ বিচারকর্তা। পাকিস্তানী একেশ্বরবাদীরা কি তিন ঈশ্বরবাদের তাৎপর্য বুঝবে?

আপাতত একেশ্বরবাদই পাকিস্তানের ললাটলিখন। একে খণ্ডাবার উপায় নেই, থাকলেও তা আমাদের হাতে নয়। আরো অনেক দেশকে এর ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে। খোদ ইংলণ্ডও তো তিন শতাব্দী আগে ক্রমওয়েলের মিলিটারি ডিকটেটরশিপ আস্বাদন করেছে। রাজার মাথা কাটা গেল, প্রজার মাথা হেঁট হলো, সেই অভিজ্ঞতার স্থায়ী ফল হলো রাজায় প্রজায় সন্ধি। রাজা হলেন শাসনতান্ত্রিক রাজা, তাঁর শাসনক্ষমতা চলে গেল প্রজাপ্রতিনিধিদের পার্লামেন্টের হাতে, পার্লামেন্টের আস্থাভাজন মন্ত্রীদের হাতে। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীদের একজন হলেন প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করার অধিকারী। মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব বলে গোড়ায় কিছু ছিল না। ক্রমে ক্রমে তাও বিবর্তিত হলো। ইংরেজরা পদে পদে ঠেকে শিখেছে, কেউ তাদের শিখিয়ে দেয়নি। আমরা দেখে শিখেছি, তাই আমাদের শিক্ষা তাদের মতো পাকা নয়। আমাদের গণতন্ত্র অপরের দ্বারা ও অপরের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রবর্তিত। আমাদের নিজেদের দ্বারা বিবর্তিত নয়। সেইজন্যে কাঁচা। আমাদেরি ঘরের একাংশে

তার পরিণতি দেখে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। পাকিস্তানের ছিদ্রান্বেষণ করে সময়পাত করলে কি আমাদের কাঁচা গণতন্ত্র পাকা হবে ?

না, আমাদের গণতন্ত্র স্বতঃবিবর্তিত নয়, সুতরাং পাকা নয়। প্রবর্তিত গণতন্ত্র একদিন না একদিন কেঁচে গেছে পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে। ইটালীর গণতন্ত্র পঞ্চাশ বছর ধরে পোক্ত হয়েছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের ধোপে টিকল না। যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলোর সমাধান দিন দিন কঠিন হয়ে উঠল, তাই মুসোলিনি একটা শর্ট কাট বাতলে দিলেন। জার্মানীর গণতন্ত্র উঠল কাইজারের পতনের পরে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলো নিয়ে তারও হয়রাণির একশেষ। পনেরো বছর পরে বেকারসংখ্যা যখন অভ্রভেদী তখন হিটলার এসে চিট করে দিলেন। সেও এক শর্ট কাট। রাশিয়াতে গণতন্ত্র কোনো কালেই চালু হয়নি, সুতরাং লেনিনের ধারা বেটা ঘটল সেটা আর যাই হোক গণতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সংক্ষিপ্ত সড়ক নয়। প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ ছিল মার্কস্ এঙ্গেলস্ প্রভৃতি কমিউনিস্ট পিতামহদের মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন। শত বর্ষ ধরে তার সাধনা চলেছিল ইউরোপের নানা দেশের মুনিজনের মানসে। মুসোলিনি বা হিটলারের পিছনে সে রকম কোনো প্রস্তুতি ছিল না। তাঁরা রাশিয়ায় লেনিনের সাফল্য দেখে ইটালীতে ও জার্মানীতে কমিউনিস্টদের উদ্যোগ লক্ষ করে নিজেরাই অগ্রণী হয়ে ক্ষমতা হস্তগত করেন। গণতন্ত্র বাধা দিতে পারল না, কারণ পাকিস্তানের মতো দেউলে হয়েছিল।

আমাদেরও গণতন্ত্র সম্বন্ধে সাবধান হবার সময় এসেছে। একেই তো এ জিনিষ কাঁচা। তারপর এর মূলনীতি আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত বিশেষ কারো জানা নেই। ইংরেজ তাড়াতেই আমরা ব্যস্ত ছিলুম। মৌমাছিকে তাড়িয়ে মৌচাক দখল করে মধুপান করতেই আমরা ব্যস্ত রয়েছি। মূলনীতি সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ কোথায় ? বহু শতাব্দীর অভ্যাস, তাই সাধারণ লোক মনে করে গবর্ণমেণ্ট হচ্ছে কল্পতরু। আবেদন নিবেদন আবদার আন্দোলন এই সব করে ফল পাড়তে হয়। ফল কী করে ধরবে তার জন্যে মাথাব্যথা নেই। আর অসাধারণদের ধারণা ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়ে একবার গাছের ডালে উঠে বসতে পারলেই হলো। গণতান্ত্রিক নির্বাচনপদ্ধতি এইরূপ একটি উপায়মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হয় তা হলে জোর করে রাইটার্স বিল্ডিঙ ও রাজভবন দখল করা যাবে। তা হলেই মোক্ষফল লাভ। এই যাদের মনোবৃত্তি তারা তো কথায় কথায় আইন নিজের হাতে নেবেই। তাদের সায়েস্তা রাখার জন্যে পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হয়, সৈন্যের সংখ্যা বাড়াতে হয়। নির্বাচনী বলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও শান্তি নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হয়।

ইংলণ্ড আমেরিকার লোক ভাবতেই পারে না যে একবার নির্বাচন যুদ্ধে হারজিত স্থির হয়ে

যাবার পর আবার মাঠে ঘাটে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা উঠতে পারে। সরকারের উপর বিরূপ হলে তারা সভাসমিতি করে, শোভাযাত্রাও করে, কিন্তু আইন নিজের হাতে নেয় না। একবার আইন নিজের হাতে নেওয়া রেওয়াজ হয়ে গেলে আর আইনসভা বা পার্লামেন্টের দরকার থাকে না। আইন পাশ করার প্রয়োজনও থাকে না। তখন জঙ্গল আইন। জোর যার মুলুক তার। গণতন্ত্রের মূলনীতি লঙ্ঘিত হয় এতে। সাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা বিকৃত হয়। অতি সহজেই তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার হারায়। ইংলণ্ডের লেবার পার্টির চরমপন্থীরা একদা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পিছনে ধনিকদের কারসাজি দেখে এমন বিতৃষ্ণ হয় যে সোজাসুজি ক্ষমতা দখল করার কথা ভাবে। তখন তাদের দূরদর্শীরা তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করে এই বলে যে একবার যদি খেলার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় তা হলে খেলায় ফাউল করে রক্ষণশীলরাই আগে জিতবে। ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ প্রবর্তন করবে। আমাদের এ দেশেও সেই ভয় আছে। অনেকে রাতারাতি প্রগতি চান, দুর্নীতি তাঁদের সহ্য হয় না, সর্বত্র তাঁরা ধনিকদের কারসাজি দেখছেন। কিন্তু এর প্রতিকার যদি অবৈধ উপায়ে হয় তা হলে সেই অবৈধ উপায়টা জলচল হয়ে যাবে এবং ধনীরা অকাতরে ডিকটেটরশিপের বায়না দেবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। গুণ্ডা লাঠিয়াল দিয়ে গদি দখল করা ধনীদের পক্ষেই আরো সম্ভব।

গান্ধীজী উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেয়ে উপায়শুদ্ধির উপর জোর দিয়ে গেছেন। গণতন্ত্রকে যদি ক্ষমতা ভোগ করার উপায় বলে মনে করা হয় তবে উপায়টা সব সময় শাসনতন্ত্রের চৌহদ্দির ভিতরে থাকা চাই। যদি অধিকার রক্ষার উপায় বলে গ্রহণ করা হয় তা হলেও সেই কথা, তবে সরকারপক্ষ শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করলে বা শাসনতান্ত্রিক পন্থা বন্ধ করলে প্রজাপক্ষ সত্যাগ্রহ করতে পারে। এটা সব সময়ের অস্ত্র নয়, শেষ অস্ত্র।

গান্ধীজীর মনে বরাবর একটা শঙ্কা ছিল যে দেশ যদি সামরিক উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে তবে মৌচাকটা সামরিক নেতাদের হবে, রাজনীতিকরা হবেন তাঁদের হাতের পুত্তলিকা। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ভাবে স্বাধীন হলো তাতে সে রকম কোনো শঙ্কার কারণ রইল না। তা সত্ত্বেও তিনি শঙ্কাপোষণ করলেন সামরিক ব্যয়ভার বৃদ্ধি দেখে, সামরিকতার প্রেস্টিজ বৃদ্ধি দেখে। একবার তিনি বলেছিলেন সিভিলের সঙ্গে মিলিটারির সংঘাত এদেশেও দেখা দিতে পারে, কারণ সিভিল যে উপরে, মিলিটারি যে নিচে, এটা এদেশে চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত হয়নি। তাঁর কথা ভারতবর্ষের সিকি অংশে অর্থাৎ পাকিস্তানে ফলেছে। বাকী অংশে অর্থাৎ ভারতে ফলবে কিনা কে জোর করে বলবে? রাজনীতিকরা মোরগের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারেন, বলতে পারেন ভারতের গণতন্ত্র দৃঢ়মূল। কথাটা পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় সত্য। কিন্তু ফ্রান্সের তুলনায়? কতকালের বনেদী গণতন্ত্র ফ্রান্সের! কত পুরাতন তার পার্লামেন্ট!

দেখা গেল সেই পার্লামেন্টের কাছে যিনি গ্রাহ্য সৈন্যদলের কাছে তিনি অগ্রাহ্য। কোনো রাজনীতিককেই তারা তাদের উপর হুকুম চালাতে দেবে না। যদিও পার্লামেন্টের তিনি আস্থাভাজন। বোঝা গেল প্রজাসাধারণের দ্বারা যথাবিহিতভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টটার উপরেই তাদের অবজ্ঞা। তারা গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করে না। তারা চায় তাদেরি মনোনীত একজন সৈনিক রাষ্ট্রশাসক হবেন। হলোও তাই। সেনাপতি স্ত গল উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। পার্লামেন্ট আত্মহত্যা করল। তাঁর তৈরি শাসনতন্ত্রই দেশের লোক গলাধঃকরণ করেছে। এবার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে অধিক হবে। প্রধান মন্ত্রী যে কেমন করে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট উভয়ের মনোরঞ্জন করবেন তা তো আমরা ভেবে পাইনে। প্রতিপক্ষ যারা হবে তারা কার প্রতিপক্ষ? রাষ্ট্রপতির না মন্ত্রীমণ্ডলীর?

আতঙ্ক ভালো নয়, কিন্তু সতর্কতা ভালো। দেশের নাড়ীজ্ঞান গান্ধীজীর যেমন ছিল আর কার তেমন আছে? গান্ধী নেই বলে কি রিয়ালিটি বদলে গেছে? তা নয়। প্রকৃত সত্য এই যে জাতীয়তাবাদ এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র এখনো পরাধীন। যেমন ইটালীতে। যেমন জার্মানীতে। অথচ নানা বিষয়ে এ দেশ রুশ চীনের কাছাকাছি। ইংলণ্ড আমেরিকার নয়। কোটি কোটি অশিক্ষিত বুভুক্ষু নরনারী দশ বিশ বছরের মধ্যে অবস্থার উন্নতি আশা করে। নিরাশ হলে নির্বাচনে যোগদান করবে কি না সন্দেহ। নির্বাচনে যদি লোকের অরুচি ধরে যায় তা হলে গণতন্ত্রের মূল কোথায় যে দৃঢ়মূল হবে! গণতন্ত্র তখন হবে অমূল তরু। তখন দেশে দুটিমাত্র দল থাকিবে। একটি একেশ্বরবাদী ক্ষমতাপ্রাসী দল। একটি বিবেকচালিত সত্যাগ্রহী দল। প্রজাপক্ষের শেষ প্রাচীর হচ্ছে সত্যাগ্রহ। লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স। গান্ধীজী যাবার আগে লোকসেবকসংঘ গড়তে বলে গেছেন। সেটা রাজনীতিকদের সংঘ নয়। গঠনকর্মীদের সংঘ। আবশ্যক হলে এঁরা সত্যাগ্রহ করবেন। আমাদের কতক লোককে রাজনীতি ছেড়ে প্রজানীতি নিয়ে থাকতে হবে। বিনোবাজীর মতো। আর কতককে প্রহরী হতে হবে। বিনিদ্র প্রহরী।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

চিত্রপট

সুনীল ঘোষ

এখানে অনেক ক্ষণ, বলীকীর্ণ পুরুষের মুখ,
কালের কুটিল গর্ভে নিমজ্জিত সে দারুমূর্ত্তিকা
সুন্দরের অন্তস্তলে যে প্রাচীন কৌশিকী কৌতুক
তার হাতে তুলে দিলে শেষাবধি বাসনার শিখা

তাবি অন্ধকারে আর তাকাবোনা, তাকাবোনা,
ক্লান্তিহীন ঘরে যাক যদি ঝরে স্মৃতির তুষার—
ইচ্ছার শিরায় নামে উদ্দামতা ; জড়
করমূলে ধরে থাকি নিবিড় যন্ত্রণা।

নিস্তরঙ্গ চারিদিকে কালের ভ্রূকুটি—
প্রাণধারণের মেনা সে তো শোধ পথে,
এই ভেবে অভিসার লাস্যে রঙ্গনটী
হয়ে যদি পাবে কিছু অপ্রাপ্যের সুখে!

পারে না যা ধরে থাকা চিরন্তন এতো,
কামনার গুঞ্জরণে ভরা বুকে ডাকে
স্নায়ুর অক্ষরে লেখা, বিমর্ষ আহত
সাদা পায়রাকে চেনা নিষ্ঠুর শায়কে।

উত্তরণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

। নীলিমা দাশগুপ্ত ।

আজকের আকাশ মেঘে ঢাকা, সারা দিনভর ছুড়ে মেঘ ঘিরে আছে। ঘন কালো, কালো মেঘ। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। চড়্‌বড় করে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়েছে একটু আগে। কিন্তু তাতে গুমঠানি কমেনি, বেড়েছে আরো বেশি। ঝলকে-ঝলকে ধুলো উড়ছে, তারসঙ্গে এলোমেলো অশান্ত হাওয়া। বহুদূর থেকে বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে রাত্রির আত্মার চাপা-কান্না। সমস্ত রাত্রির আত্মা যেন একটা তীব্র নিঃশব্দে হাহাকার করে ফিরছে। নারকেল গাছগুলোর ব্যাকুল আন্দোলনে তারি নিরুদ্ধ বেদনা গুমরে গুমরে ছড়িয়ে পড়ছে—মনে হলো মল্লিকার। এত রাত্রে গাঢ় অন্ধকারে জানলায় চোখ মেলে স্থির হয়ে বসে আছে মল্লিকা।

গত চারদিন ধরে ভোবলদা বাড়িতে অনুপস্থিত, ইদানীং ভোবলদার হাবভাব মল্লিকার মনের কোণে তীব্রতা ছায়া ফেলেছিলো, ওর অনুপস্থিতিতে সেটা আরও স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। বিশেষ করে কটা দুয়েক আগে যে ফোন পেয়ে, দাদা অমন হন্তদন্ত হ'য়ে চলে গেলেন, তার মধ্যে ও যেন সমর মিত্রের একটা অস্পষ্ট নামোল্লেখও শুনে ফেলেছে। চোখ বিস্ফারিত করে রাত্রির ভয়াবহ রূপ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করছে মল্লিকা, আর কান পেতে রয়েছে সিঁড়িতে। ভোবলদার কী হতে পারে? সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব কিছু ভাবতে ভাবতে মল্লিকার ভাবনার দিক পরিবর্তন হলো কিছুটা। : আচ্ছা, ভোবলদা তাঁর সমস্ত কিছুর বিনিময়ে কী পেলেন?—ছোটবেলা থেকে ভোবলদার কথা কত শুনেছি—এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এমন মেধাবী ছেলে, এমন শক্তিমান ছেলে আর একটিও নাকি নেই শ্রীরামপুরের মধ্যে। কী করলেন ভোবলদা তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি উৎসর্গ করে?…দেশ সেবা? সুস্থ মানুষ সৃষ্টি? শুভবুদ্ধি দিলেন তাদের কানে কানে? মল্লিকা একটু ভাবলো এ নিয়ে,—কী—জানি, মল্লিকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে স্বগতোক্তি করলো—আমি তো দেখছি বিকৃত বুদ্ধির জোয়ার এসে সারা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছে। সকলের চোখের সহজ দৃষ্টি ঈর্ষার গাঢ় কাজলে বিলুপ্ত। একটি মাত্র উগ্র আকাঙ্ক্ষা ধক্ ধক্ করছে সকলের বুকের মধ্যে—প্রভুত্ব চাই। দেশসেবা—তাতেও দলাদলি, সমাজসেবা তাতেও দলাদলি—রাজ্যসেবা তার কথা আর বলে কাজ নেই। মল্লিকা মাথা কাত করে জানালায় হেলান দিলো। আমি মিথ্যে এ সব নিয়ে মাথা গরম করছি কেন? কী-ই-বা আমি এসবের বুঝি, কতটুকুই বা আমার বুদ্ধি!…কিন্তু এটুকুন তো বুঝি, ভোবলদা তাঁর সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য ছেড়ে যেচ্ছায় দুঃখ বরণ করেছেন। কেন…? কিসের মোহে…? আর—আর বন্দনাদির মত অমন মেয়ে, যার সত্যিই দ্বিতীয় হয় না—তার একনিষ্ঠ প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন। জেনে শুনে ভিলে ভিলে ধ্বংস করছেন বন্দনাদিকে। কী পাচ্ছেন, কী পেলেন এর বিনিময়ে ভোবলদা?

হাসা ঘুম নেবেছে মল্লিকার চোখে, ঘুমের মধ্যেও চোখেমুখে চিন্তার চিহ্ন সুপরিস্ফুট, ভুরু ঈষৎ কোঁচকানো।

ক্রীং……ক্রীং…… ক্রীং।

মল্লিকার ঘুম ছুটে গেলো। একলাফে ঘোর খুলে এসে গেল বললো। হ্যাঁ, আমি মল্লিকা। কে দাদা? কী বললে? ভোম্বলদার শেষ অবস্থা? আমি জানতাম—আমি জানতাম—আমি জানতাম—। মল্লিকা অব্যক্ত আর্তনাদ করে উঠলো—।…কী করে হলো? গুলি লেগেছে বুকে? ওদের দলপতি বড়দাকে বাঁচাবার জন্য উনি প্রাণপণ নিয়েছিলেন? কোথায় আছেন? পুলিশ হাসপাতালে? …ও দাদা, দাদাগো। যেমন করে হো'ক ভোম্বলদাকে বাঁচাও, বন্ধনাদি মরে যাবেন না হোলে, বন্ধনাদি ওখানে এসে গেছেন? তুমি চেনো বন্ধনাদিকে?…না, না, না দাদা আমি যেতে পারবো না। আমি পারবোনা, ওসব দেখতে আমি পারবো না। ভোম্বলদা দেখতে চাইছেন আমাকে?…না, দাদা না। আচ্ছা—আচ্ছা যাব তাহোলে, যাচ্ছি। পিসুসির গাড়ী পাঠিয়ে দাও।

অফিসের ড্রাইভার ত্রিলোচন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো, "আয় মিলি আয়।—" হাতের ঘুষিয়ে দরজা খুলতেই বোনের পাশে স্ত্রী এবং মাকেও দেখে ফেললো। "তোমরাও এসেছো? এসো এসো—তাড়াতাড়ি এসো, আর দেরী না—"উদ্ভ্রান্ত অরুণ রাস্তা দেখিয়ে ওদের নিয়ে চললো। দরজার সামনে কয়েকজন পুলিশ মোতায়েন ছিল। একজন ইন্সপেক্টারও ছিল বুঝি এরমধ্যে। স্যালুট করে সব সরে দাঁড়ালো। মল্লিকা ওদের দিকে একবার এমন ঘৃণিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো, যেন হঠাৎ ভুলে আস্তাকুঁড়ে পা দিয়ে ফেলেছে। মায়াদেবী এবং মণিনা দুজনেই সারারাত কাঁদতে কাঁদতে এসেছেন। চোখ মুছতে মুছতেই ঘরে ঢুকলেন। মল্লিকার চোখে একফোঁটা জল নেই। একেবারে শুকনো খটখটে। চোখের চাউনি এত তীব্র যেন বর্শার ফলার মতো ঝকঝক করছে—যে কাউকে দৃষ্টি দিয়ে বিঁধে টুকরো টুকরো করতে পারে। ঘরে ঢুকে কিন্তু তিনজনেই অবাক হ'য়ে গেলেন। ভোম্বলদা বেশ সহজ ভাবে জোরে জোরে কথা বলছেন। যাদের সঙ্গে কথা বলছেন, একমাত্র মল্লিকাই তাদের চিনতে পারল—ডাক্তার ও বন্ধনা। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন ডাক্তার ও সেদিনকার সেই মিঃ রক্ষিত। মল্লিকা আশ্বাসিত হলো। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে এসে ফিসফিসে বললে, "ডাক্তারবাবু! শুনুন একটু এদিকে—" মল্লিকার আহ্বানে ঘরের এক-কোণায় সরে এলেন ডাক্তার। "আপনার কি মনে হচ্ছে, বাঁচবেন উনি?" উগ্র অস্থিরতা মল্লিকার কণ্ঠে। ডাক্তার একটুকাল মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, "সময় মিত্র আপনার কে হ'ন?" "আমার দাদা—বড়দা"—উত্তর শোনার জন্য মল্লিকার মন আটকে আসছে। ডাক্তার ঘাড় ঘিরিয়ে শায়িত ভোম্বলদার দিকে তাকালেন, মুখ ফেরালেন—মল্লিকার ব্যগ্র জিজ্ঞাসু, নির্নিমেষ চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল। মনে হলো দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটে চাপ দিয়ে কী যেন ভাবলেন একটু তারপর অতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। প্রথমে ডান দিক থেকে বাঁ তারপর বাঁ থেকে ডান। "না—"? মল্লিকার কণ্ঠ চিরে তীব্র করুণ আর্তস্বর বার হলো। রক্ষিত ইতিমধ্যে ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মল্লিকা তাকাতে লাগলো ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার অন্তর্হিত হলেন। চোখে মুখে বর্শার ফলা বুঝি বিদ্ধ করেছে তাঁকে।

"আপনি তবে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?" রক্ষিতের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ কটু কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো মল্লিকা।

"আমি…আ--মি" ঢোঁক গিললেন বিরাট আকৃতির

মিঃ রক্ষিত। ওরই গুলিতে সমর মিত্রের বুক ছিদ্র হয়েছে —আনে নাকি মেয়েটা। "এবার সমর মিত্রের প্রাণটা বুঝি আটক করতে চান? তারই চেষ্টা চলছে বুঝি?" দাঁতে দাঁত চেপে মল্লিকা আবার তীব্র চীৎকার করে উঠলো।

একটু অসহায় বোধ করতে লাগলেন মিঃ রক্ষিত। মুখ ফিরিয়ে দেখলেন অজয়বাবু ঘরে নেই। উপস্থিত এখানে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। মেয়েটা চোখ দিয়ে যা আগুন বার করছে! আজকালকার মেয়েদের বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে। খুশিও হলেন সেই সঙ্গে একটু, আপাততঃ মিত্তিরের বোনের দিকে নজর রাখলেই তাঁর এই কেসটার হদিস্ মিলবে। পায়ে পায়ে এগিয়ে মিঃ রক্ষিত দরজা দিয়ে বার হ'য়ে গেলেন। মল্লিকা তোষলের কাছে এসে দাঁড়াতেই, হাসবার চেষ্টা করলেন তোষলদা। কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে ক্ষীণ, ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটিয়ে বললেন, "মিলি! তুই কি সকলকেই বাড়ীর লোক পেয়েছিস্…? কাকে আবার ধরক দিয়ে এলি—?" চোখ বড় করে তোষলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মল্লিকা, কোন উত্তর দিলো না। তোষলের সারা বুক জুড়ে পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রক্তে লাল হ'য়ে গেছে বাঁদিকের ব্যাণ্ডেজ। তোষলদা যাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন সে বাঁধাটা। মায়াদেবী কাঁদছেন, বন্দনা কাঁদছে, মণিদা কাঁদছে। তারপর—সেও কাঁদছে। মল্লিকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সবাইকে।

: কিছু করার নেই—কিছু না। কোনমতেই না, কিছুতেই না। অর্থ দিয়ে না, রক্ত দিয়ে না, প্রাণ দিয়েও না শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি তাজা প্রাণের অকাল মৃত্যু এই ভাবে দেখতে হবে। অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায় মল্লিকার বুকের ভেতরটা টন্ টন্ করে উঠলো। "মা দাদা কোথায়—?" অনেক চেষ্টার পর মল্লিকা এবার ঠোঁট ফাঁক করলো। "শ্রীরামপুরে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে গেছে—" মায়াদেবী রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

"আয় মিলি, কাছে এসে ব-স্" তোষলদা থেমে থেমে ডাকলেন মল্লিকাকে। মল্লিকা এগিয়ে এসে বন্দনার পাশ ঘেঁষে বসে পড়লো। কাঁপছিলো বন্দনা, ঠোঁটের ওপর দাঁতের প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ও, ওর সমস্ত শরীরের কাঁপুনি থামাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এতক্ষণে। ঠোঁটে ছিটে ছিটে রক্তের আভাস, সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে ওর, এবার বুঝি সম্বিত হারাবে। আর ও পারে না। সব চুপ, এত অজস্র কথা আছে বন্দনার, এত সহস্র জিজ্ঞাসা আছে ওর, তোষলদার সে সব শোনার সময় হবে কী? শুরু করলে পারবে কী সামলা করতে? ওর কথা শুনতে কোনদিন সময় দিলে না তোষলদা, ওর জন্য যার এক মুহূর্তের অবকাশ মেলেনি, তাকে এই দুর্লভ মুহূর্তে ও আর নোতুন করে শোনাবে কী?……তার চেয়ে এই ভাল, এই ভাল।

বন্দনার কম্পমান দেহের ধাক্কা খেয়ে মল্লিকার চেতনা জাগ্রত হলো। খুব আস্তে আস্তে বললো তোষলদাকে "তোষলদা, আমরা সবাই অন্তঃপুরে যাচ্ছি, তুমি বন্দনা-দিকে কিছু বলবে?" উত্তর দিতে সময় লাগলো তোষল-দার, কণ্ঠস্বরে বোবা গোলো, কথা বলার ক্ষমতা ওঁর নিঃশেষ প্রায়, ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন "না বোন কাকেও যেতে হবেনা, সকলেই আমার কাছে থাকো। টেনে টেনে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন তোষলদা, মল্লিকা তোষলদার দিকে মুঁকে ধরা গলায় ফিসফিসিয়ে বললো "বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে তোষলদা"? তোষলদা ঝিমিয়ে চক্ষু বড় করবার চেষ্টা করলেন, "এ সময় সকলের যেমন হয়, তার চেয়ে বেশি হবে কেন বোন"? শরীর কুঁচকে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। সমস্ত রগ ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁট একেবারে

নীলবর্ণ। হে ঠাকুর। তবু এ কথা কেমন করে বলতে পারে।

কাঁদতে কাঁদতে বন্দনা বললে: "তোবলদা, তোমার এই পরিণাম তুমি আগেই যদি জেনেছো, সকলের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে রেখে গেছ বেমন—সেই সঙ্গে আমার ভাবনাও কেন একটু ভাবনি তোবলদা। তাহলে কী পারতে এমন করে গুলির সামনে বুক পেতে দিতে? আমার জন্ত এক কোঁটা দায়দাও তোমার মনের কোথাও কী নেই? তোমার দুখচেরে আমি যে সব ছেড়েছি। আমার নিজের বলতে যে আর কিছু নেই। এখন কী আমি করি—কী করি আমি—কী করি—" না, মুখ দিয়ে শব্দগুলো বার করতে পারেনি বন্দনা। ওর অন্তর আর্তনাদ করছিলো। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন মায়াদেবী আর ধীরে ধীরে হাত বুলোচ্ছিলেন তোবলের বুকে। তোবলদা খুব জোরে ডেকে উঠলেন, "কাকীমা—।"

"কেন বাবা—?" কাঁচল দিয়ে আঁচল তুলে চোখ মুছতে মুছতে সাড়া দিলেন মায়াদেবী। "তোমাকে একটা কাজের ভার দেব কাকীমা—" মায়াদেবী কান্না চেপে বললেন, "আমার সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় সে কাজ করবো তোবল—"। তোবলদা হাঁপাতে হাঁপাতে মুখ একটু ঘুরিয়ে বন্দনার দিকে তাকালেন। "বাহু—" বন্দনা মুখ তুলে তোবলদার চোখে চোখ রাখলো, পলকহীন আর্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তোবলদার দিকে। অভিমান—অনুযোগ—প্রার্থনা—মিনতি—হতাশা সব যেন এক সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠলো ওর সজল দুটি ভাগর চোখে। আবার তোবলদার সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। কেন হয় এমন গোলমাল? নিজের সর্বস্ব দিয়ে দেওয়া কী যায় অপরকে? আর একটা ঘরে কথাটা বলতে চেষ্টা করছেন তোবলদা কিন্তু বন্দনা তাকালেই কেমন গোলমাল হ'য়ে যায়। "এসে গেছে স্নেহের ভাক। আর ক'টি দণ্ড, ক'টি মুহূর্ত। এই অন্তিম মুহূর্তেও আমি ওকে অন্তের বলে ভাবতে পাচ্ছি না? কিন্তু বড়দার ছদ্মবেশ পরে যখন নিশ্চিত মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করছিলেম, তখন কেন মনে হয়নি বাহুর কথা? ছি, একবারও তো মনে হয়নি। বাহু, তোকে এত ভালবাসি আমি নিজেই বুঝি জানতেম না রে—।"

"তোবলদা। মাকে কিছু বলবে?" তোবলের দিকে ঝুঁকে আস্তে জিজ্ঞেস করলো মল্লিকা। তোবলের চোখের দৃষ্টি আগের চেয়ে কিছুটা স্বচ্ছ দেখা গেলো, কিন্তু বুক খুব দ্রুত ওঠা নামা করছে, "একটু জল খেতো মিলি—।" আগের মতই ক্ষীণ কণ্ঠ তোবলদার, মাথার কাছে ছোট টেবিলে ঢাকাদেওয়া জলের গ্লাস ছিলো, মল্লিকা উঠে দ্রুতপায়ে নিয়ে এলো গেলাসটা। "বন্দনাদি, আপনি বাইরে যেবেন—?" মল্লিকা জলের গ্লাসটা বন্দনার হাতের কাছে ধরলো বন্দনা কথা বলার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না, শুধু মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো। মল্লিকা তোবলের মাথার কাছে সরে এসে অত্যন্ত সন্তর্পণে মুখে একটু জল ঢেলে দিলো। জলটুকুন গিলে তোবলদা আবার খুব জোরে ডাকলেন, "কাকীমা—"

"বল বাবা"—মায়াদেবী আরো ঝুঁকলেন। তোবলদা আর তাকালেন না বন্দনার দিকে। জোরে শ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, "আমার এই বাহু, আমার অতি স্নেহের পাত্রী। ওকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি কাকীমা। আর ঐ যে আমার ছোট ভাই—?" চোখের ব্যর্থ ইঙ্গিতে ডানপাশে দাঁড়ানো ডাক্তারকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। "ঐ ডাক্তারও আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন—" একটা ঢোক গিললেন তোবলদা। "ওদের দুজনেরই মা নেই, ডাক্তারের মা-বাবা-আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। ওদের আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলুম কাকীমা। তুমি নিজে সামনে থেকে ওদের বিয়েটা

কেওয়াবে। আমার অসমাপ্ত কাজ—"। ভোম্বলদা ঘন ঘন জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। ডাক্তার-বন্ধুরা দুজনেই অদ্ভুত চমকে উঠলো। তীব্র বুকফাটা আর্তনাদের মতো যন্ত্রণার মুখ দিয়ে "—না—" শব্দ বার হলো, তারপরই মাথা গুঁজে ফেললো ভোম্বলদার বুকের পাশে। সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো কান্নার দমকে। মায়াদেবী কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবতে চেষ্টা করলেন, বোধ করি মেয়ের বাবার কথা মনে হোল একবার, করুণ চোখে বন্ধনার কাঁপা কাঁপা পিঠের ওপর একবার তাকালেন তারপর সহজগলায় বলতে চেষ্টা করলেন "ওদের আমি ছেলে-মেয়ে বলেই বুকে তুলে নিলাম ভোম্বল, তোর ইচ্ছেমতো বিয়েটাও দেওয়াবো—।" ভোম্বলদার বাঁ হাতটা এবার শিথিল হয়ে খসে পড়লো বন্ধনার মাথার ওপর। বাঁ দিকের ব্যাণ্ডেজ ভিজে গল্ গল্ করে রক্ত বার হচ্ছে। রক্তে রাঙা হ'য়ে গেলো বন্ধনার মাথার চুল। জামা-কাপড়ও ভিজতে লাগলো, কে যেন রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছে ওর সঙ্গে। ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালো। এ দৃশ্য আর দেখা যায় না। মল্লিকা চোখ ঢাকলো তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে। মায়াদেবী চোখবুজে অস্ফুটে নারায়ণের নাম করতে লাগলেন। মল্লিকা ভোম্বলদার মাথার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো এতক্ষণ। বাঁদিকের কাঁধ ঘেঁসে হাঁটু মুড়ে বসলো। ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজের ওপর বাঁহাত চেপে রেখে আস্তে ধীরে অত্যন্ত মমতার সঙ্গে ভোম্বলের কপালে ডান হাত বুলোতে লাগলো। কপালের ওপর লেপ্টে যাওয়া ভিজে ক'টি চুল ধীরে ধীরে তুলে দিলো ওপরে। আস্তে আস্তে ডাকলো "ভোম্বলদা—"। ভোম্বলদা নিশ্চল চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করলেন। মল্লিকাকে গলাটা পরিষ্কার করার জন্য থামতে হলো একটু। তারপর সেই আগের মতোই আস্তে আস্তে ডাকলো, "ভোম্বলদা! আর কষ্ট নেই। সব দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে এসেছো তুমি। যেখানে তুমি যাচ্ছো, সেখানে অনন্ত সুখ, অনাবিল শান্তি। সেখানে অ্যাঠা-মশাইকে পাবে, অ্যাঠিমাকে পাবে, তাঁরা তোমার জন্য কোল পেতে আছেন ভোম্বলদা। আর কোন কষ্ট নেই—" কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় থেমে গেলো মল্লিকা। ভোম্বলের চোখে যেন রাজ্যের ঘুম নেমেছে। জোর করে তাকাতে চাইলেন, "মিলি বোনটি! আমার যদি জন্মান্তর থাকে তবে তোর মতো যেন একটি ছোট বোন পাই।" ভোম্বলদা থেমে থেমে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। মল্লিকার তুলতুলে ঘটঘটে চোখ ছাপিয়ে এবার টস্ টস্ করে জল ঝরে পড়তে লাগলো। অনেক আঘাত পেয়েছে মল্লিকা। আঘাতের পর আঘাত এসে ওকে কম শক্ত করে দিয়ে যায়নি এইটুকু বয়সে। কিন্তু, তবু আজকের রাত্রির মতো ভয়ানক রূপ ও যেন আগে আর কখনো দেখেনি।

"অরু! মা কী এসেছে? কণু-বুলু-বীনু এসেছিস্ তোরা? তোরা কেন এসিয়ে—কেন এলি? তোদের তো ডাকিনি, আমি শুধু মাকে—। মাগো! তোমার অযোগ্য অকৃতী ছেলেকে মাপ করতে বলছিনে, শুধু একটু শেষ সময় পায়ের ধুলো দিয়ে যাও—" চোখ বন্ধ করেই ভোম্বলদা কাতরাতে কাতরাতে বলছেন। "শেষ দেখা আর হোলনা অ্যাঠাইমার—" অস্ফুটে বললো মল্লিকা তারপর জোর দিয়ে ডাকলো "ভোম্বলদা—।" ভোম্বল চোখ টেনে খুলবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ চোখ আশ্চর্য রকম বিস্ফারিত হয়ে খুলে গেলো। চোখের মণি গোল হ'য়ে যেন ঘুঁজে বেড়াচ্ছে কাকে। মল্লিকা রুদ্ধ কণ্ঠে বললো "এই যে বন্ধনাদি—" এবার ভোম্বল বন্ধনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ডাক্তারকে। "...ঐতো ওরা—ঐতো ওরা। তোমাদের মধ্যেই আমি রইলাম। ডাক্তার! বাবু! আমি রইলাম তোমাদের মিলিত জীবনের বাকখানে।"

আশ্চর্য্য। কথা সম্পূর্ণ করেই তোবলা শেষ হ'য়ে গেলেন।

• •

স্থান দিল্লী। সকাল সোওয়া সাতটা, রাউন এভিনিউর সুদৃশ্য একখানি বাংলোর সামনে বাদামি রঙের ছুতিবেকার থামলো একটা। চারজন তরুণী নামলেন, তাঁদের গতি কিছুটা ক্ষিপ্র, কলিং বেলের শব্দে বেয়ারা দরজা খুলে সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়ে সরে দাঁড়ালো। "ছোটা সাবকা সেলাম দেও"—প্রায় সমবেত কণ্ঠে কথা ক'টি বলে তরুণী চারজন গতির ক্ষিপ্রতা বজায় রেখে ছুইংরুমে ঢুকে সোফায় বসে পড়লো। আচরণ দেখে বোঝাগেলো, এ বাড়িতে ওঁদের যাতায়াত নোতুন নয়। বেয়ারা অস্ফুটে কী যেন একটা জানাবার চেষ্টা করে ভেতরে চলে গেলো। মিনিট পাঁচেক পরে যিনি ঢুকলেন, তিনি ছোটো সাব নন, মেমসাব। ওঁরা উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করতেই মেমসাব বললেন "বসো, বসো, উঠতে হবে না, যাঁর কাছে তোমরা এসেছো, তিনি কিন্তু এখনো শয্যা ত্যাগ করেননি—"

"সে কী মিসেস্ গুহ? ডাক্তার অসুস্থ নাকি?" লম্বা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি কাশ্মীরি ফ্রোকটা সামনের দিকে টানতে টানতে প্রশ্ন করলেন।

"না, ঠ্যাঁ, অসুখ একরকম বলতেও পারো—কাব্য ব্যাধিতে ধরেছে ঠাকুরপোকে—" মুখটিপে হাসলেন মিসেস্ গুহ। "এ্যালোপ্যাথিতে এর কোনো ঔষুধ আছে বলে আমার জানা নেই। তোমাদের হাতে যদি কোন টোট্‌কা থাকে তো দেখো—" মিষ্টি হেসে মেমসাহেব উত্তর শেষ করলেন।

আঁটো ব্লাউসের চাপে ঘাসকাঁদ করতে করতে মোটা মৃদুলা জিজ্ঞেস করলেন, "কাব্যরী রাখতে শুরু করেছেন?" লম্বি-বনি ছুঁচোর টেনে টেনে এবার হাসি আরম্ভ করলেন, মিসেস্ গুহর উত্তর আর শোনা গেলনা। ছিপছিপে এলা হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন, "আঃ, হচ্ছে কী তোমাদের? হাসাহাসি করে সময়নষ্ট করতে এসেছি নাকি আমরা? এই সাত সকালে উঠে?" এলার অকারণ উষ্মার গভীর কারণ ছিলো, বাকরী ক্র তা জানতেন বলে হাসিমুখে চুপ করে গেলেন। এলাও হঠাৎ ধৈর্য্য হারিয়ে লজ্জিত হ'লেন একটু। মুখে সহজ ভাব আনার চেষ্টা করে হাল্কা সুরে বললেন "কাব্য-ব্যাধিতে কী ঘুম বাড়ায় নাকি মিসেস্ গুহ? এ তথ্য তো আমার জানা ছিলো না।" মিসেস্ গুহ সহাস্যে বললেন "আমারও কী ছাই জানা ছিলো? কিন্তু নিদ্রাদেবী তো আর ছেড়ে কথা কইবেন না। কবিতা পড়ে পড়ে রাত একটা দেড়টা নাগাদ যদি তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা হয়, তাহলে একটু বেলা পর্যন্ত তাঁর পাত্তা পুছিয়ে নেবেন বৈকি।" "সত্যি মিসেস্ গুহ, কী ব্যাপার খুলে বলুন তো? ভদ্রলোক একেবারে পাত্তা পাচ্ছিনে, ক্লাবে আসছেন না, কি করলে সাড়া মেলেনা চেম্বারে গেলে দেখা পাইনা। ডাক্তার যদি সিরিঞ্জ ছেড়ে উর্ব্বশীর কলম ঝাঁকড়াতে থাকেন আর প্রেম এ্যানাটমির বদলে সফলিতার পাতা ওল্টান, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর চিকিৎসার আশু প্রয়োজন, তবে সেটা কিছিকাল নয় মেন্টাল।" ঠোঁট একটু বেঁকিয়ে ঈষৎ শ্লেষ মেশানো স্বরে বললেন এলা।

অন্য সময় হ'লে মিসেস গুহ অর্থাৎ নিলিমেবী দেবরের নামে এই খোঁটা সহজে কিছুতেই হজম করতেন না। কিন্তু এখন তিনি নিজেও কিছু বিরক্ত, তাই কষ্ট না হয়ে আগের মতো হাসিমুখেই বলেন "দেখো ভাই, তোমরা চেষ্টা করে যদি মানসিক ব্যাধির কিছু উপশম করতে পারো—আমি তো বলে বলে হার মেনেছি।"

মৃদুলা চোখেমুখে কপট দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে বললেন "ঘাই ওত্‌নেন। ভদ্রলোক ওহর কাঁধে ভূত-টুত চাপেনি তো? শুনেছি বাঙলাদেশে তাওড়া আর গাব গাছে নাকি প্রচুর ভূত কিলবিল করে—" লম্বি-বনি তরীয়ার টেনে টেনে এবার

হৃদয়ের হাসি শুরু করলেন যেন ঘরোঁকেনের নিয়ন্ত্রণ একটা। হাসি আর থামে না।

হায় জগত্তারিণী দেবী। তুমি যদি জানতে তোমার যজ্ঞ নাতনি, যাদের নামনির্বাচনে তিনদিন তিনরাত সময় নিয়েছিলে তুমি, বাক্যস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে যাদের শিখিয়েছিলে শ্রীকৃষ্ণের এক'শ আট নাম, যাদের সপ্তমবর্ষে যজ্ঞপুরুষ আর যাজ্ঞসেনীদের ব্রত করিয়েছো, কঠিনমৃত্তিকায় অষ্টমবর্ষের পূর্বেই শিবমূর্তি নির্মাণ করে শিব পূজো শেষ করিয়েছো, সেই রেবলীনা, মনোবীনা—নামের সঙ্গে শুধু চুল ছেঁটেই ক্ষান্ত হননি, লজ্জাও ছেঁটে দিয়েছেন একেবারে। বাছাইকরা এমন সব পরিচ্ছদ অঙ্গে চাপান, যাতে যৌবনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তুমি ম'রে বেঁচেছো জগত্তারিণী দেবী!

"সুপ্রভাত।" নিঃশব্দে কখন ঘরে ঢুকেছেন বিমান। হাতজুলে সকলকে একসঙ্গে নমস্কার জানালেন। এনা বাদে সকলেই প্রতিনমস্কার জানালেন। বনি মুখ টেনে বললেন "হাল্লো···ডক্টর। কী ব্যাপার?" বিমান সোফায় বসে বৌদির দিকে তাকিয়ে বললেন "বৌদি। আমাদের একটু চা দিতে বলো—"। তারপর ওঁদের দিকে একনজর দেখে নিয়ে এনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের রক্তকরবীর রেন রিহার্সেল কবে হচ্ছে?" এনা কোন করে উঠেও কিছু বলতে পারলেন না। দুর্জয় অভিমান ওঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দিলো। এই সেদিনও, মাত্র মাসখানেক আগে বর্তমানে রওনা হওয়ার আগের দিনও কতরাত পর্যন্ত ওরা ওখানে বসে গল্প করেছে হাতে হাত দিয়ে। আগে গিয়েছিলো কুতুব মিনারে, সেখানে ছিলো দর্শকের ভিড়, এদিক-ওদিক এমনকি পাথরের ভাঙা টুকরোগুলোর আশে পাশেও নির্জনতা মেলেনি। বিমানের ইচ্ছেয় তারপর যেতে হয়েছিল ওখানে। দূর বনে আপত্তি টেঁকেনি ওর। শ্রাবণে শারদীয়া উৎসবে রক্তকরবী নাটকের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে বিমান অত্যন্ত ঘোরালো গলায় সমর্থন করেছিলেন। তার একমাত্র কারণ নাকি এনা: এনাকে এখানে বলেছিলেন বিমান—"নন্দিনীর পার্ট তুমি যা ফোটাতে পারবে এনা—দুর্দান্ত।" সেই এনা হ'য়ে গেলো কিনা আপনি, আপনাদের রক্তকরবী···। চোখ ঝাপ্সা হ'য়ে জল এসে গেলো এনার। চোখ নিচুকরে কাশ্মীরি টিপয়ের কারুকার্যগুলো হঠাৎ দেখতে লাগলেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

—কানে এলো ওদের বাক্যালাপ।

"···এক্সকিউজ মী, আজ একেবারে সময় নেই আমার—" মৃদুলা অনুযোগের সুরে বললেন "এত সময়াভাব আপনার কবে থেকে হলো ডক্টর গুহ?"

সকৌতুকে বিমান বললেন "বোধ হয় ইতিমধ্যে 'সহস্রধারা' সিরিয়ালটা আমার সেব করেছে, অসম্ভব কল, একেবারে সময় পাচ্ছি না মৃদুলা দেবী।"

বনি তাড়াতাড়ি করে বললেন "কিন্তু আপনি না গেলে নন্দিনীর পার্ট কিন্তু চৌটালি ক্যান্সিল হবে, তা বলে দিচ্ছি ডক্টর—" ইঙ্গিতময় হাসি হাসলেন বনি। বনি গলা মিলিয়ে সেটাকে প্রকাশ করলেন আরো। বিমান প্রথমে উত্তর খুঁজে পেলেন না, বিব্রত বোধ করতে লাগলেন, মুহূর্ত কয়েক পর কী ভেবে নিয়ে জোর করে হেসে ফেললেন। এনার আনত মুখের উপর চোখ রেখে বললেন। "মিস মল্লিকের অদ্ভুত ট্যালেন্টের কথা আপনাদের কারুর অজানা নেই। নন্দিনীর ভূমিকায় মিস মল্লিকের পার্ট হারমানাবে যে কোনো নাম করা অভিনেত্রীকে। অভিনয় যে সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে, নিখুঁত হবে, সেবিষয় আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। অভিনয়ের দিনে দেখবেন আমি সকলের আগে গিয়ে হাজির হবো।"

"অহ্গ্রহ। ডিয়া।" চোখ নিচু করেই এনা মুগ্ধ হতে থাকলেন।

"আর একটিবার গেলে, হোয়াই ইজ দি হার্ম?"

"একেবারে সময় নেই আজ—" ধনির প্রশ্নে হেসে-হেসে উত্তর দিলেন বিমান। এনা আর থাকতে পারলেন না। চোখ তুলে সোজা চার্জ করলেন, "মিথ্যে বোল না ডাক্তার। বলো যে, আমাদের সঙ্গ আর তোমার ভাল লাগছে না। বলো যে, আর কেউ তোমার নয়ন ভরিয়ে দিয়েছে, যার প্রেরণায় ডাক্তারি ছেড়ে রাতারাতি কবি হবার চেষ্টা করছো—"

ডাক্তার একটুকাল এনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন "না, এর কোনটাই সত্যি নয়—"

"তবে কোনটা সত্যি?" গভীর তাৎপর্য ঘুরিতে বিমানের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন এনা। সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে বিমান বললেন, "সত্যি? সত্যি কিছুই নয়। দুচারটা কবিতা পড়ছি এইমাত্র।" ইতিমধ্যে বেয়ারা প্রত্যেক টিপয়ের সামনে চা-টোষ্ট আর পোচ দিয়ে গেছে। সকলেই শুরু করেছিলেন কেবল এনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন বিমান। এনা পুরো অনিচ্ছার সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন এবং ততোধিক অনিচ্ছার সঙ্গে চায়ে ছোট্ট একটা সিপ্ দিয়ে বললেন,

"তুমি কি ভাবো ডাক্তার আমি কিছু জানিনে—বিশ্বভারতীর ধ্ দিয়ে সমস্ত রবীন্দ্র কাব্য আনিয়েছো—সে খবর আমরা পেয়েছি।"

"বেশ তো, কাব্য পড়া কি অপরাধ?"

"সে তুমিই ভাল জানো," নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন এনা। "অমুক কাব্য পড়ার বিরুদ্ধ মন্তব্যই তোমার মুখে শুনে এসেছি চিরকাল। কবিদের টিটকারি দিয়েছো, এমন কী রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে পর্যন্ত বলেছো, কবিতা পড়িয়ে পড়িয়ে তিনি পুরুষদের মেরেলি চং আর মেয়েদের রাজ্যের ডাকাবি শিখিয়ে গেছেন—"। বিমান বললেন "ভুল করেছি, ভুল কি মানুষের হয় না?" ডাক্তারের এড়িয়ে যাওয়া আগ্রহ-শূন্য উত্তর শুনে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে লাগলেন এনা। বাজনা থেমে হঠাৎ কী ঘটতে পারে, যাতে ডাক্তারের এমন অভাবনীয় পরিবর্তন। যাক যেমনও লাভ নেই। আসলে যদি ঘুচেই থাকে বিমানের, তাহলে যে আর টানা-পোড়েন চলবে না, সে অভিজ্ঞতা এনার আছে। চায়ের প্রায় ভরা পেয়ালা সশব্দে নামিয়ে রেখে চট্ করে উঠে দাঁড়ালেন এনা। "আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম তোমাদের যদি হ'য়ে থাকে তো এসো—" গট্ গট্ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন এনা কোন দিকে না তাকিয়ে। যেহেতু ওঁদের খাওয়া শেষ হয়েছিলো আগেই, ওঁরাও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিমানকে শুধু নমস্কার ঠুকে এনার অনুসরণ করলেন। বাতাসে ঝুলে গেলো শুধু বৃদ্ধ বাঁকানো গন্ধ।

লিলি দেবী বোধকরি আড়ি পাতছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে বললেন "দিলে তো এনাকে চটিয়ে—। নাও, দেখো, এখন কতদিনে মানভঞ্জনের পালা শেষ হয়—।" বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন বিমান, মুখ ঘুরিয়ে মৃদু হেসে বললেন "সে পালা একেবারেই শেষ হ'য়ে গেছে বৌদি।" লিলিদেবী মুখ তুলে বেয়ারার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন "কাজটা ভাল করোনি ঠাকুরপো, এমন মেয়ে সহজে মেলে না—"

"যথা—?"

"যথা, চেহারাভাল, ফিগার ভাল, নৃত্য-গীতে নামকরাদের মধ্যে একজন। সোসাইটিতে মেশার টেক্‌নিক জানে, আর চাও কী—? আরো একটা ভাববার বিষয় হচ্ছে, এনার বাবা দিল্লীর মধ্যে একজন মানী লোক এবং বিত্তবান।" হাল্কা সুরে বিমান বললেন "তাহলে তোমরা এবার ভাব, আমার ভাবা শেষ হয়ে গেছে—।" লিলিদেবী ভেতরে ভেতরে বেশ ক্ষুণ্ণ হলেন। কণ্ঠ স্বরেও তার কিছুটা প্রকাশ পেলো—"তোমার যে এমন বিকৃত রুচি হবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি ঠাকুরপো। কাব্য-প্রীতির অর্থ যদি

যা কিছুটা বুঝি, কিন্তু মল্লিকার মতো একজন গেঁয়ো—পানসে মেয়ে তোমার কিসে যে এত আকর্ষণ করলে, তা আমি ভেবে পাইনে। আমি কিন্তু কোনো মতে ওকে স্ট্যাণ্ড করতে পারবো না।" বিমান ম্লান হাসলেন, "তুমি খামোখা অস্থির হচ্ছো কেন বৌদি, ও অবস্থা তোমার কোনো দিন হবে না।" লিলিদেবী চোখ কপালে তুললেন, "ও আমাদের সঙ্গে বুঝি থাকতেও চাও না, বিয়ে করেই আলাদা থাকার ইচ্ছে—" প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়লেন লিলি দেবী। হো-হো করে উচ্চহাস্য করে উঠলেন বিমান। হাসি থামিয়ে বললেন, "তুমি হাসালে যাহোক বৌদি, গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল। বিয়ে কী আমার একার ইচ্ছেতেই হবে নাকি?" লিলি দেবী কোঁ-স্ করে উঠলেন, এর পর ওঁর পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হলো। "তুমি আমাকে আর বলিও না ঠাকুর-পো। তুমি ইচ্ছে করলে মল্লিকা অমত করবে এটাও আমাকে বিশ্বেস করতে বলো নাকি?"

"ও কথা থাক," বিমান হাসিমুখে বৌদির দিকে তাকালেন, "তোমার না এখন ফিসেস্ গোবিন্দের বাড়িতে পানতুয়া আই মীন গুলাবজাম খেতে যাওয়ার কথা—। বাস্তবিক তোমার হাতের গুলাব জাম যে একবার খেয়েছে—" "ও ভাবে কথা চাপা দিলে চলবে না ঠাকুর-পো। তোমার কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে—" অভিমানে লিলিদেবীর কণ্ঠস্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। বিমান আবার শব্দ করে হাসলেন, "জানো বৌদি! মানুষের মন একটা অদ্ভুত জিনিষ, ওর নাগাল পাওয়া ভার। যার কাছ থেকে অল্পেই সাড়া পাই, সে যতই কেন না সরেস হ'ক কেন তাকে ভাল লাগে না, আর যার সাড়া মিলবে না কিছুতেই, তার ত্রুটি খুঁজে না বিচার করে মন কেন অহোরাত্র সে দিক পানেই টানে—এ রহস্য আজও রহস্য হ'য়ে রইলো।" উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বিমান বললেন আবার "আপাতত এ আলোচনা এই পর্যন্তই থাক্। তুমি তৈরী হওগে আর লালমোহনকে বলো আমাকে আর একটু চা দিক্—" উত্তর একটা হাই চেপে বিমান বেরিয়ে দুইং রুমে বাঁধিক লাগোয়া তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। লিলি দেবী অপ্রসন্ন মুখে বিমানের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল তারপর মাথা ঝাঁকি দিয়ে আপন মনে বললেন "হুঁ। সাড়া আবার মিলবে না—" বাকী কথাগুলি এত আস্তে বললেন আর শোনাই গেলো না। উনিও বেরিয়ে গিয়ে ঢুকলেন ওঁদের ডানদিকের ঘরে।

(ক্রমশঃ)

শীতের প্রার্থনা

গল্প

অমরেন্দ্র সান্যাল

শুধু এই দুপুরটা। নয়ন অব্দ রোদ-ছড়ানো পড়ন্ত বেলার এই মুহূর্তটুকুই শুধু। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের অসংখ্য মুহূর্তের সঙ্গে যার এতটুকু মিল নেই। এই তুলনাহীন মুহূর্তটা এমনি করে হঠাৎ আসবে আর এসে প্রহ্লাদকে চমকে দেবে তা আগে কে জানতো। এখন একটু সুখের মুহূর্তকে আহ্বান জানাবার জন্যে কতকি করা উচিত। করেও অনেক। দোকানের মাথায় মাথায় বিচিত্র সাইনবোর্ডের রাজটিকা ছাড়াও লাল শালুর ওপর রুপোলী রংতার কতকি লিখে টাঙিয়ে দেয়। মুখে সর্বদা অম্লানের হাসি জিইয়ে রাখে। চোখ কখনও অসতর্ক হয়না। এবং মাঝে মাঝে, হ্যাঁ ব্যাপারটা লজ্জা জনক হলেও অনেকেই তাও করে। রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যারা এদিক পানে তাকায় তাদের লক্ষ্য করে অনুচ্চ স্বরে মিনতি করে, "আসুন স্যার, কি বই খুঁজছেন?"

প্রহ্লাদ ওদের মতন নয়। প্রহ্লাদ পারে না অতখানি নীচু হতে। তার ইজ্জতে বাঁধে। তার সুচেতন অন্তঃস্থান তাকে বাধা দেয়। দ্রৌপদী বুক হাউস রীতিমত রূপসী। কাঁচের ঝকঝকে শো-কেস। সামনে মেহগনির পালিশ করা টানা কাউন্টার। মাথায় গগন নিওন আলোর সাইনবোর্ড। সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহ রূপসী—অস্বীকার করার উপায় নেই। এ গলির পাশাপাশি আর পাঁচটা দোকানের মত জরাগ্রস্ত নয়। অঙ্গের রূপের ওপর আঁচড় নেই এতটুকু। খুঁত নেই একতিল। পাশের দোকানগুলো যেন অকর্মা গন্ধ মত—দৈন্য-গ্রস্ত সবাই। পাড়ার আড়ালে সর্বদা খুঁকছে। পালিশ-ওঠা কাউন্টার। ফাটা কাঁচে খবরের কাগজ সাঁটা; পাশার আনাচে কানাচে মাকড়সার জাল। বইএর মলাটের ওপর এক ইঞ্চি ধুলো। সব মিলিয়ে করুণ এক অবস্থা। ওরা জেনে গেছে আর এসে গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। দিনে সাত-বার ঝাড়লেও ধুলোর যে পাহাড় সেই পাহাড়। আলমারির কাচ মাসে চৌদ্দবার পাল্টালেও থেকে যায় সেই ফাটা। দোকানের পেছনে গতর খাটিয়ে খাটিয়ে এখন ওরা ক্লান্ত। বুদ্ধি খরচ করে করে দেউলে। পয়সা যা ছিল তাতো আগেই ফতুর। উৎসাহ নিঃশেষ। এই দৈন্য-করুণ রূপ দেখে খদ্দেরের গদ্গদ হয় আসবে, না আসে···

না আসে তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কেউ লক্ষ্য করছে কিনা দেখে নিয়ে, আসুন স্যার···কি বই খুঁজছেন?

ওদের সঙ্গে তর্ক করে প্রহ্লাদ, এ ব্যবসার এ নিয়ম নয়। অঘন করে তাকাতাকি গলিতে চলে। সেখানে ডেকে না এলে হাত ধরেও ঘরে টেনে তোলে। তাতেও কিছু যায় আসে না তাদের। ওই ব্যাবসার ওই দস্তুর। কিন্তু এখানে···এখানে আগে চাই চ্যাকের জোর। তারপর ব্যবসা-বুদ্ধির সঙ্গে একটু আর্টিস্টিক শুক। এ সব তাদিয়েই সৃষ্টি করো। রূপ দাও। রূপ। হ্যাঁ রূপই আসল বস্তু। চোখ ধাঁধানো ফার্নিচার। মন মোহিত-করা সাইনবোর্ড। কায়দে কাগজে পাবলিসিটি। প্রহ্লাদের কথা শুনে ওরা মৃদু টিপে হাসে। নিশ্বাস ফেলে কেউ কেউ। দ্রৌপদী বুকহাউসের রূপও চিরদিন এমন থাকবেনা। নিটোল নিখুঁত থাকবেনা যৌবন। একদিন কাউন্টারের পালিশ উঠবে।

শোকেসের কাঁচ কাটবে; ধুলো জমবে বইএর পাতায়। সাইনবোর্ডের রং রোদে জলে ঘুরে মুছে হবে বিবর্ণ। সেদিন ওদের পাশেই এসে দাঁড়াবে প্রহ্লাদ, গায়ে গায়ে এক হয়ে। হেরে যাওয়া, ক্লান্ত হয়ে যাওয়া একটা পশু বিষাদ ঠেলে তাদের মতই দ্রৌপদী বুকহাউসের অতীত যৌবন নিয়ে সুরু করবে রোমন্থন। মধুর উজ্জ্বল দিনগুলো অকারণ মনে টেনে দীর্ঘশ্বাস জমা করবে অবর্জনা পাহাড়ের নীচে। এখনো ট্যাকের জোর কমেনি তাই উৎসাহ মাত্রাছাড়া বেশী। এ লাইনে আনকোরা নতুন তাই অন্যের চেয়ে আশাগুলো বেশী উঁচু, স্বপ্নগুলো বেশী গভীর। জানেনা, ইতিহাস এখানে একই রকম। একই রাস্তা ঘুরে চলে। চলেছে যুগ যুগ। ওই দ্রৌপদী বুক হাউসের পাশে নতুন যৌবনের চোখ-ধাঁধানো চমক নিয়ে আর একটা নতুনতা বুকহাউস একদিন হঠাৎ ঝকঝকিয়ে উঠবে। বড় বড় আশার কথা বলবে। আর সকলের দিকে অবজ্ঞা-দৃষ্টির বিষ্ বিষ্ কণার যন্ত্রণা ছড়িয়ে তাকাবে। তারপর আবার সেই ইতিহাস। তারপর পড়া। এ গলিতে যে আসবে সেই মুখ থুবড়ে পড়বে। যে এসেছে সেই হোঁচট খেয়েছে। সামলে নিয়েছে যার যার। তারপর শেষবার আর উঠতে পারেনি। অসহায় উদাসীনতার অতলে তলিয়ে গেছে।

• •

এ আয়নাটা ভারী অপয়া। ধক্কের পা দাঁড়াতে চায় না এদিকে। ওরা মোহাই মেয়। নিজেদের অকর্মণ্যতার ফাঁক ঢাকতে চায়। শুনে প্রহ্লাদ হাসে। অপয়া আয়নাটা নয়। অপয়া নিজেরা—আর ওই ওরা।

হাত তুলে ফুটপাতের ওপর সারি সারি পুরনো বইএর দোকানগুলোর দিকে ইশারা করে প্রহ্লাদ। আজকাল ওদের অর্ডারেই ধক্কের নতুন বই এরা দোকানে ভিড়তে চায় না। আর ভিড়বেই বা কেন। যে বই এখানে পাঁচটাকা সেই বইই ওখানে পাঁচ সিকে। তফাৎ, সামনের মলাটটা শুধু পাঁচ হাতের উত্তাপে রুক্ষটা। পাঁচজনের নিবিড় স্পর্শে কলঙ্কিত। তাতে ক্ষতি কতটুকু? সম্পর্ক তো মলাটের সঙ্গে নয়, ভেতরের পাতা কটার।

আজকের দুপুরের পার্থক্যটা জানাচ্ছিল না বলেই কাউন্টারের ওপর মাথা নামিয়ে, দুহাতের আড়ালে মুখ ঢেকে বিমুচ্ছিল প্রহ্লাদ। রোজ যা করে। তাপলা গরম। ওধারের ফুটপাতে রাধাচূড়ার বিশীর্ণ ডালপালা স্থির। সকালেও ওমনি ছিল। এখনো অমনিই হয়েছে। না নড়ল চড়ল, না দুলুনি। সকাল থেকে গাছটাকে লক্ষ্য করেছে প্রহ্লাদ। খদ্দের এসেছে গিয়েছে। প্রহ্লাদ বাক্স থেকে বই পেড়েছে তুলেছে। প্যাকেট বেঁধেছে। কাম নিয়ে খুচরো পয়সা ফিরিয়ে দিয়েছে। আর তারই মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেলেছে মরা ডালপালাগুলোর ওপর। হাওয়া নেই। সকাল থেকেই নেই। দুপুরে চোখ বুজে আসার আগে অবধি ওই দিকেই তাকিয়ে ছিল প্রহ্লাদ। এক একবার ওখান থেকে চোখ সরিয়ে গলির মোড়টার দিকে। এবং সেখান থেকে যতটুকু বড় রাস্তার নজর চলে ততদূর পর্যন্ত। ট্রামের তার, তেতলা একটা বাড়ীর ছাদের আলসে আর খানিকটা রাস্তা।

এখন খদ্দের আসে না। কি হবে হাসিতোষ বলে ওকে। এ যেন শকুন-চোখ মেলে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা, কখন তাগাড়ে মরা আসবে। পাশের দোকানগুলো যে যার কপাট টেনে দিয়েছে শুধু এক চিলতে ফাঁক। হাওয়া আসবে সেখান দিয়ে অথচ দিবানিদ্রায় খিল পড়বে না এতটুকু। সবাই যখন ছিল ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন, তখন ঠিক তখনই রাস্তায় ছড়ানো নরম রোদের আকরি আলপনার ওপর দিয়ে ঝিকে সবুজ গাড়ীখানা এসে গলির মুখে থামলো। ঘরদা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল হিরেন্দু। তারপর স্বামী-ভূত্যের বিচিত্র বাসনার শব তুলে এগিয়ে এলো গলির

ঘরে। দ্রৌপদী বুক হাউসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো সে। চোখ তুলে সাইন বোর্ডটা পড়ল। তারপর সটান উঠে এলো ভেতরে। গাড়ী থামার সঙ্গে প্রহ্লাদের মুখ চিড় খেয়েছিল। তবুও চোখ তোলেনি প্রহ্লাদ। হাতের আড়াল সরিয়ে নেয়নি মুখের সামনে থেকে। গাড়ী অমন হরদম থামে। থেমে চলে যায় আবার, ওই থামার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই গলির এই দোকান ভলোর। গাড়ীর খদ্দের আসেনা এদিকে। ভুলেও না। তাদের জন্যে আছে বড় রাস্তার দোকান। বড় দোকান। দ্রৌপদী বুক হাউসের চেয়ে অনেক বেশী রূপসী তারা। চোখ খোলেনি প্রহ্লাদ। তাই দেখতেও পেল না গাড়ীর আরোহীটি হেঁটে হেঁটে তার দোকানের সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছে। আর খুশী খুশী চোখ তুলে সাইন বোর্ডটা পড়ছে। প্রহ্লাদের অনুমান আদৌ সত্যি হবার কথা নয়। সত্যি হলে এত দোকান থাকতে হিমেন্দু এখানে আসতো না। আর তার ফলে প্রহ্লাদকেও হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জালে জাল মিলতে গিয়ে অপ্রতিভ মুখ খানার তাঁজে তাঁজে জোর করে বোকা হাসি ফুটিয়ে আর অপেক্ষাকৃত যাত্রা ছাড়া হাত কচলে মুঁকে পড়তে হতো না দীন আর ঘৃণিকটু একটা স্বভাব-বিরুদ্ধ ভঙ্গিতে।

কি বই দেব স্যার? আগন্তুকের লাল রংএর টাই এর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে প্রশ্ন করলো প্রহ্লাদ। পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে প্রহ্লাদের দিকে এগিয়ে দিল হিমেন্দু তারপর কাউন্টারের ওপর দু হাতের কনুই রেখে হাতের ওপর মুখ নামিয়ে দাঁড়াল। ব্যস্ত চোখে লিষ্টটার ওপর থেকে নীচ অবধি এক নিমেষে চোখ বুলিয়ে নিল প্রহ্লাদ। চোখ দুটোর ব্যগ্রতার ওপর একটা উজ্জ্বল আলোর আভা ধপ্ ধপ্ করে উঠলো। অনেক বই, একশো টাকার নিশ্চয়তে।

লিষ্টটা হাতে করে আলমারির সামনে এগিয়ে গেল প্রহ্লাদ। আলমারির তালাটা টানার আগে মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাল একবার। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ওভারকোট। নড়েনি এতটুকু। লাল টাইটা তেমনি ধবধবে সাদা সার্টের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। হাতের আংটিটা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আলো। হিরে বোধহয়। বোধহয় কেন, নিশ্চয়। এরা ছাড়া কে পরবে হিরের আংটি। আর যারা হিরের আংটি পরে তারাই তো একসঙ্গে একশোটাকার বই কেনে। শুধু কেনা নয়, এমনি ভাবে কেনে। কোন দরদস্তুর নয় কমিশনের কচাকচি নয়। এমন কি একটা কথা পর্যন্ত নয়। না যারা গাড়ীচড়ে তারা সকলেই খারাপ আর অবিবেচক নয়। ভালোও থাকে দু একজন। বড় রাস্তার বড় দোকানের মোহ কাটিয়ে দ্রৌপদী বুক হাউসের কথাও মনে করে কেউ কেউ। মনে করে আর এমনি ভাবে হঠাৎ এসে চমকে দেয়। কৃতার্থ করে দেয়।

বইগুলো ঘর করে বাদামী কাগজে মুড়লো প্রহ্লাদ। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো প্যাকেটটা। তারপর কাউন্টারের ওপর নামিয়ে দিয়ে বলল, একশো সাত-টাকা।

লাল টাইটা নড়লো এবার। সোজা হয়ে দাঁড়াল আর দুপুরের বিস্ময়কর আগন্তুক। ডানহাত প্যান্টের পকেটে পুরে পার্সটা টেনে বার করলো। হিরের আংটি আর একবার ওঠা নামার ঝলমলিয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে একশো দশটা-টাকা নেমে এলো কাউন্টারের ওপর।

দু আঙুলে নোট দুটো তুলে নিল প্রহ্লাদ। ক্যাস খুলে তিনটে টাকা হাতে হাতে তুলে দিল। তারপর বই-এর প্যাকেট তুলে নিয়ে হিমেন্দু রাস্তায় নেমে যাবার আগেই হাত তুলে কপালে ঠেকাল, স্যার, আবার আসবেন স্যার।.....মাথা ঝাঁকাল হিমেন্দু। ধীর পায়ে নেমে গেল সিঁড়ির শেষ ধাপে। সেখানে গিয়েই থামলো। তারপর ঘুরে

দাঁড়াল। আবার উঠে এলো দোকানের মধ্যে। আচ্ছা 'শীত বসন্ত' বলে কোন কবিতার বই আছে? শীত বসন্ত, আস্তে আস্তে একই কথার পুনরুক্তি করল প্রহ্লাদ। ঘাড় নাড়লো—না শীত বসন্ত বলে তো কোন কবিতার বই—নেই কথাটা উচ্চারণ করল না প্রহ্লাদ। দ্রৌপদী বুক-হাউস থেকে নেই বলে পদ্যের কিস্তিরে দিতে হবে এ চিন্তাটাও তারপক্ষে মর্মান্তিক। একটা বিব্রত মুহূর্ত। বই-এর নামটা মনে আসছে না হিমেন্দুর। চোখ মুখ ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে একটা অবস্তি জমছে, আচ্ছা বসন্ত গ্রীষ্ম? এবারও ঘাড় নাড়লো প্রহ্লাদ, না তাও নেই।

হাতা আবস্তিটা ভারী হলো হিমেন্দুর চোখের ওপর। লাল টাইটা মাথা নড়বার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প দুলল। চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিল হিমেন্দু। কয়েক মুহূর্ত। আপ্রাণ চেষ্টা করলো নামটা মনে করবার। গ্রীষ্ম বর্ষা, উহু, বর্ষা শরৎ না···বসন্ত শরৎ না···শীত বর্ষা না না না···। একরাশ বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ছোটবড় একগাদা রেখা স্পষ্ট হলো। জুতোর ডগা মেঝের ওপর ঘসলো কয়েকবার। তারপর চোখ তুলল প্রহ্লাদের মুখের ওপর, না নামটা মনে করতে পারছিনে কিছুতেই।

হেরে গেল যেন ও। একটা দুর্বোধ্য লজ্জা, অসুখ যন্ত্রণার মত হিমেন্দুর সমস্ত মনের ওপর ভারী হয়ে চেপে বসল। কয়েক যুগের জন্যে অসহায় করে ফেলল তাকে। নিজের স্মৃতি শক্তির ওপর নিজের বিশ্বাস নেই। অন্ততঃ এই মুহূর্তে তাই মনে হল হিমেন্দুর। যে শুনবে সেই হাসবে। ইঞ্জিনিয়ার হিমেন্দু চৌধুরী সামান্য একখানা বই এর নাম মনে রাখতে পারে না। যারা হাসবে তাদের বুকোলেও বুঝবে না কত কঠিন এই কবিতার বই এর নামটা তার কাছে। ইট কাঠ সিমেন্ট এঞ্জিনেট আর ড্রইং···একতলা, দোতলাট বসতলা, কটিং আর লেভেল এ গুলোর সঙ্গে, এগুলোর মধ্যে কি দুর্বোধ্য আর রেখানান একটা কবিতার বই এর মিষ্টি নাম। 'দোষ হিমেন্দুর স্মৃতি শক্তির নয়, দোষ তার, যে এমন ভাবে বিব্রত করে তাকে। অদ্ভুত অদ্ভুত নামগুলো দিয়ে হাস্কির দিতে চায়। হাস্কিয়ে দিয়ে অকারণ মজা পেতে চায়। হিমেন্দুর সমস্ত বিরক্তি একজনার ওপরেই জমা হলো শেষ অবধি। বইএর প্যাকেট দুটো তুলে নিয়ে সে রাস্তায় নেমে যাবার পূর্ব মুহূর্তে মুখ খুলল প্রহ্লাদ, লেখক কে তাও মনে নেই? লেখক? চোখ তুলল হিমেন্দু। লেখক ··নীচের ঠোঁটটা চেপে গেল একটু দাঁতের দংশনে, বসু, কি বসু যেন। বসু, কথাটা প্রায় লুফেই নিল প্রহ্লাদ, বুদ্ধ বসু? হাঁ—হ্যাঁ, বুদ্ধ বসু···একটা হাল্কা বাতাসের মতন নরম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো হিমেন্দু। বইটার নাম তাহলে 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর,' প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসু চোখ তুলল সম্মতির আশায়, তাই নয়? তাই, কাউন্টারের ওপর দুটো হাত ছড়িয়ে দিল হিমেন্দু। মনের সমস্ত বিরক্তি একদমে উবে গেল। মিটিয়ে গেল ভুলে যাবার লজ্জাটা। বইখানা আলমারি থেকে বার করে কাউন্টারের ওপর রাখল প্রহ্লাদ। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হিমেন্দু তুলে নিল সেখানা। খুসী হবে ও। খুসী হবে বইটা পেলে। আর আশা রাখবে হিমেন্দুর ভুলো মনটার ওপর। এইটেই সবচেয়ে বড় স্বস্তির কারণ। আর আর কি? আরও অনেক কিছু। যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ বইখানার মধ্যে তলিয়ে থাকবে দ্রৌপদী। হিমেন্দু ডাকলে সাড়া দেবে না। দ্বাদশবার ডাকার পর একবার উঁ করবে। নয় তো মুখ তুলে একবার হাসবে, ঠিক হাসবেও না। তাকাবে হিমেন্দুর দিকে চোখ তুলে। অদ্ভুত এক খুসীর আবেশ দুলবে তখন সেই দৃষ্টিতে।

তারপর ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে একলাই খেয়ে নেবে হিমেন্দু। ঠাকুর ওর খাবারটা টেবিলে ঢেকে রেখে চলে

রাখেন। রাত বাড়বে, কাছে গিয়ে হাত ধরে টানবে হিমেন্দু, "এই রাত এগারোটা বাজে খেয়ে নাও।"

যাচ্ছি, যাচ্ছি···একমিনিট দাঁড়াও···

একমিনিট···পাঁচমিনিট···দশমিনিট···পরপর দুটো সিগারেট হিমেন্দুর মুখে পুড়ে যাবার পরেও দ্রৌপদীর এক-মিনিট হবে না। আবার ডাকবে হিমেন্দু, "সাড়ে এগারোটা হলো যে—খেয়ে শুয়ে পড়ো। কাল আবার বাকীটা পড়ো।"

প্লিজ প্লিজ···প্লিজ···আর একমিনিট, ঠিক একমিনিট।

কাটা ঘুরবে টাইমপিসের। সময় ঘুরবে। সাড়ে এগারোটা থেকে বারটা। গলা অবধি চাদর টেনে দিয়ে এর পর শুয়ে পড়বে হিমেন্দু। ঘুমিয়ে পড়বে একসময়। ঘরের এক কোণায় একশো পাওয়ারের বাতির সামনে বই এর পাতায় ঘাড় গুঁজে তখনো বসে থাকবে দ্রৌপদী। মাঝে যদি কখনও হিমেন্দুর ঘুম ভেঙে যায় নিদ্রা জড়ানো ভারী চোখ তুলে দেখবে একমিনিট তখনও হয়নি দ্রৌপদীর। এরপর শেষরাতে।...পাশ ফিরে শুতে গিয়ে হিমেন্দুর খেয়াল হবে একখানা নরম হাত তার গলার ওপর এসে পড়েছে। একটা ঘুম অচেতন মুখ তার বুকের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। পাশ ফেরা হবে না। মিষ্টি একটা আমেজে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে সমস্ত হৃদয়। ঘুমোলে দ্রৌপদীকে বড্ড অসহায় দেখায়। দুটু আর ছেলে একটা অনুপমা মেয়ে আশ্চর্য্য ভাবে রূপ বদল করে হিমেন্দুর বুকের উত্তাপে।

বইগুলো হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আবার থামলো হিমেন্দু। মুখ ঘুরিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা একটা কথা—?

বলুন বলুন, সঙ্কোচ কিসের,···প্রহ্লাদ কাউন্টারে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে পড়লো।

মানে মানে—কথাটা···। বিব্রত হতে লাগল হিমেন্দু, মানে দোকানের এই নাম দিয়েছেন কেন জানতে চাচ্ছিলাম।

নামটা পছন্দ হয়েছে আপনার? প্রহ্লাদ মনের খুশী মনে চেপে প্রশ্ন করল।

পছন্দ? ঘাড় কাত করলো হিমেন্দু, হ্যাঁ তা হয়েছে। না হয়ে উপায় কি। আমার ইস্কুলেও যে ঐ একই নাম। কথায় শেষে হাসলো হিমেন্দু। আর হাসতে হাসতে অনুভব করলো একটা লজ্জাকর খুশী তার সারা মুখে জোনাকির ঝিকমিক আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওর খুশীটা দৃষ্টি দিয়ে নিজের মনের মধ্যে শুষে নিতে চাইল প্রহ্লাদ। কিম্বা সম্পূর্ণ নূতন্ একটা অনুভূতি এই মুহূর্তে জন্মনিল তার মনের মধ্যে। সেই অনুভূতির আবেগ তাকে মর্মে মর্মে জানিয়ে দিল এই আশ্চর্য্য দুপুরের সময়টুকু অচেনা অজানা এই আগন্তুকের একজন আপন মানুষের কথা চিন্তা না করেও হঠাৎ আশ্চার্য্য ভাবে খুশী হয়ে ওঠা যায়। আর হঠাৎ খুশীর সেই ঝিমঝিম শিহরণটা যতক্ষণ চেতনা জুড়ে থাকে ততক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে পৃথিবীকে ভুলে থাকা যায়। অথবা সব কিছু ছাড়িয়ে সব কিছু মনথেকে ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ আনমনা হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

হিমেন্দুকে একটা জবাব দেওয়া দরকার। কিন্তু চেষ্টা করেও সহসা জবাব খুঁজে পেলনা প্রহ্লাদ। দোকানের এই নাম করণের পেছনে কোন স্মরণ-যোগ্য ইতিহাস নেই। কোন অকথিত কৃতজ্ঞতাও নেই। নামটা ভালো লেগেছিল হঠাৎ। সেই ভালো লাগার পরিণতি দ্রৌপদী বুক হাউস। হ্যাঁ এছাড়া আর কোন নাম দিতে মন ওঠেনি প্রহ্লাদের। কৈফিয়ত চায়নি হিমেন্দু। চেয়েছিল কৌতূহল মিটোতে। প্রহ্লাদের একটা নিরর্থক খেয়ালের সুন্দর স্বপ্নের ঘাস মনে নিয়ে সেবারের মত রাস্তায় নেমে গেল সে। গলিটুকু রেটে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। দিকে সবুজ গাড়ীটা চলে যাবার পর বড় রাধাচূড়া গাছটার কপালের দিকে চোখ

ভুলে আনকোরা নতুন অনুভূতিটায় গভীরে তলিয়ে গেল প্রহ্লাদ।

বিকেল হলো। সন্ধ্যে হলো। রাত হলো। এতক্ষণ পরেও প্রহ্লাদের মন থেকে দুপুরটা মুছে যেতে চাইল না। একটা লোভি চিন্তা বার বার উঁকি এসে অন্যমনস্ক করে দিল তাকে। দিনরাতের বৈচিত্রহীন সময়গুলো কেমন করে যেন এই প্রথম ভালো লেগেগেল প্রহ্লাদের।

পরদিন দুপুরে ঘুম এলোনা প্রহ্লাদের চোখে। সতর্ক দৃষ্টি ভাসিয়ে গলি রাস্তার সীমানা ছাড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল সে। অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষী কামনায় উন্মুখ হয়ে রইল সে। আশ্চার্য্য মানুষটা হয়তো আসবে আজকের দুপুরেও। ফিকে সবুজ রং এর গাড়ীটা গলির মোড়ে থামিয়ে দামী জুতোয় মুহন্মা বাজানা বানিয়ে গ্রৌপদী বুক হাউসের সামনে এসে দাঁড়াবে। তারপর ভেতরে উঁকি এসে কাউন্টারের ওপর কনুই রেখে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে যৌবন বয়সের দীপ্ত সরল ঋজু চেহারার আশ্চর্য্য মানুষটা। আজও হয়তো পকেট থেকে বইএর একটা লিষ্ট বার করে ফেলে দেবে কাউন্টারের ওপর। তারপর কালকের মতন ঠিক কালকের মতন সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে। দুচোখে খুশীর জোনাকী জ্বেলে জিজ্ঞাসা করবে, দোকানের এমন একটা আশ্চর্য্য নাম কেন রেখেছে প্রহ্লাদ। যে নাম তারই একজন প্রিয়জনের। দুশোএকশো টাকার বই এর লিষ্টটার চেয়েও অনুপম সেদের এই মুহূর্তটা। ঘুনধরা ব্যাবসায়ী মনের অবচেতনে আর একটা মন ছিল আর সে মনটা এমন হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে যাবে তা ঘুণাক্ষরে টের পায়নি প্রহ্লাদ। এবং এই নতুন মনের নতুন কামনা বাসনাগুলো তার সমস্ত চেতনার ওপর থেকে ব্যবসায়ী প্রহ্লাদ বস্তুকে মুছে ফেলে সম্পূর্ণ পৃথক একটা আত্মার খোলস পরিয়ে তাকে ঠেকে ফেলতে চাইছে তাও স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি প্রহ্লাদ। শুধু অনুমান করেছে কত তাড়াতাড়ি নিজে বদলে যাচ্ছে। যে সব জিনিষগুলো সে চিরকাল এড়িয়েই এসেছে, সেই সব ক্ষয়ের উত্তাপ-উষ্ণ স্বপ্নময় ভাবনা চিন্তার অসংখ্য টুকরো টুকরো অবিরাম কল্পনা তার টাকা আনা পাই এর ঘুনধরা আত্মাটার টুঁটি চেপে ধরেছে।

হাওয়া নেই আজও। থাকলে রাধাচূড়ার মরা ডাল-পালা মাথা নাড়তো। চোখ তুলল প্রহ্লাদ। তুলেই রইল অনেকক্ষণ। বিশীর্ণ রাধাচূড়ার মাথা ডিঙিয়ে ভেতলা বাড়ীটার চুনবালির পলেস্তারা খসা দেয়ালে। মাটি ছেড়ে রোদ্দুর উঠে গেছে ওখানে। ওখান থেকে আরও ওপরে উঠবে। ভেতলার ছাদের আলসের। তারপর কোথায় হারিয়ে যাবে হলুদ রং এর টুকরো টুকরো রোদের ছায়া। দুপুরটা শেষ হয়ে যাবে এর পরেই। একটু নড়েচড়ে বসল প্রহ্লাদ। দুপুরতো শেষ হয়েই এলো। চোখের প্রদীপ্ত দৃষ্টির ওপর পাতুর হতাশা নামলো। বোধ হয় আজ আর আসবে না। আসবে না ফিকে সবুজ মোটর আর লালটাই।

• • • দুপুর সত্যিই থাকলে না বেশীক্ষণ। নিভে গেল রোদ। গলি রাস্তাটা আবছা হয়ে এলো ধীরে ধীরে। টুল ছেড়ে উঠে পড়লো প্রহ্লাদ। একনাগাড়ে বসে থেকে ঝিম ঝিম করছে কোমর। আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে পা দুটো। একটা বিস্বাদ যৌন ব্যাথা বিপরিৎ করছে বুক জুড়ে। লালটাই এলো না আজ। আসার সময় উত্তীর্ণ। প্রহ্লাদের কামনা-উন্মুখ একটা দুপুর বৃথা গেল। বৃথা গেল কিন্তু অস্পষ্ট রইল না আর একটা নতুন কামনার বেদনা। কি আশ্চর্য্য আর কি অদ্ভুত। প্রহ্লাদ নিজেই নিজের মনের আশা ভঙ্গিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। কামনাটা তার বইএর একশো টাকার লিষ্টের প্রতি নয়। ফিকে সবুজ মোটর আর টুকটুকে লাল রংএর টাইএর জন্যেও নয়। আর চেয়েও বেশী কিছু। তার চেয়েও অসম্ভব

কিছু। যার সঙ্গে তার দোকানের নামের মিল আর দুপুর তাকেই আশা করেছে প্রহ্লাদ।

সন্ধ্যের দিকটা প্রহ্লাদ ব্যস্ত থাকে। খদ্দেরের ভীড়, বেচাকেনা—তারপর রাত্তিরে দোকান বন্ধকরবার আগে পর্য্যন্ত হিসেব নিকেশ। নতুন বইএর লিষ্ট তৈরী করা—আরও পাঁচটা পাঁচমিশেলী কাজ। দ্রৌপদী বুক হাউসের রাত সবগুলো প্রহ্লাদকে নিশ্বাস ফেলার সুযোগ দেয় না কখনও। আজও দেয়নি। তবু ওর মধ্যেই থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে সে। সাগ্রহ দৃষ্টি তুলে বার বার গলির মুখে তাকিয়েছে। না গাড়ীটা আসেনি।

দুটোদিন কাটলো একে একে। দ্রৌপদী বুক হাউসের বৈচিত্র্যহীন জীবনে দুদিন আগের একটা দুপুর আচমকা এসে সব কিছু অগোছাল করে দিয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে তার আর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। ভুলেই গেছে প্রহ্লাদ। ফিকে সবুজ মোটর আর লালটাইয়ের নেশাটা ফিকে হয়ে হয়ে বেমালুম কেটে গেছে। ঘিঞ্জিয়ে গেছে দুরাশা ভরা ভীরু অতি গোপন মিষ্টি স্বপ্নটা। একটা যেন বিশ্রী দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে প্রহ্লাদ। রেহাই পেয়েছে একটা আকাশ-কুসুম মিথ্যার পেছনে পেছনে অনর্থক ছোটার হাত থেকে। রাধাচূড়ার ওঁড়ির গা বেয়ে বেয়ে রোদ কুটপাতে নামতে না নামতেই কাউন্টারের ওপর মাথা নামিয়ে নিল প্রহ্লাদ। হাত দুখানা দুপাশে ছড়িয়ে আড়াল করলো মুখ। আজ হাওয়া আছে। সর সরিয়ে ডালপালা নড়ছে রাধাচূড়ার। ছোট ছোট সবুজ কচিপাতা বেরিয়েছে গা ভরে। জীবন আসছে। নতুন যৌবন আসছে কৃষ্ণচূড়ার। বিশ্রী দুপুরের নিষ্ঠুর স্তব্ধতা ছিঁড়ে ফিকে সবুজ গাড়ীখানা গলির মুখে এসে দাঁড়াল।

গলির পাথর-ওঠা বুকে শব্দ উঠলো হিমেন্দুর পায়ের দামী জুতোর। এগিয়ে এলো সে। সিঁড়ি অতিক্রম করে সোজা উঠে এলো কাউন্টারের পাশে। আজকেও মাথা নামিয়ে রিমোছে প্রহ্লাদ। একমুহূর্ত ইতস্তত করল হিমেন্দু। তারপর আঙুল দিয়ে কাউন্টারের ওপর ধীরে ধীরে কয়েকটা টোকা দিল। ঘুমের পর্দা ছিঁড়ে গেল সেই অল্প শব্দেই। চোখ তুলল প্রহ্লাদ। আর পরক্ষণেই অনুভব করলো বুকের মধ্যে থেকে একটা কিসের স্রোত শির দাঁড়া বেয়ে নীচে নেমে গেল। ছড়িয়ে পড়ল সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য্য হলো, খুশী হলো আর দিশেহারা হয়ে গেল প্রহ্লাদ। ওর দিশেহারা ব্যস্ততা কৌতুক চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখল হিমেন্দু। পরমুহূর্তে পকেটে হাত পুরে বইএর লিষ্টটা বার করতে গিয়ে থমকে গেল।

ইস্ কি ভুল। আজকেও ভুল ছিঃ ছিঃ।

কি হলো? একটা কিছু হয়েছে আন্দাজ করেই জিজ্ঞাসা করলো প্রহ্লাদ।

মাথা নাড়লো হিমেন্দু, বইএর লিষ্টটা আনতে ভুলে গেছি। ভুলো মানুষ। এমন ভুলো মনের মানুষ এর আগে চোখে পড়েনি প্রহ্লাদের। এ সংসার করে কি করে। কে জানে, হয়তো সংসার এ করেই না। করে অন্য একজন। দূর থেকে বাড়ীতে বসে বসে বই এর পাতার মধ্যে ডুবে থেকেই লাগামটানে। পুতুল নাচের পুতুলের মতন সুতোর টানে টানে এ মানুষটা ঘোরে ফেরে। হাটে চলে। দুনিয়া দেখে। বিশ্ব পরিক্রমা করে। কি সুন্দর। কি আশ্চর্য্য খুশীর এই জীবন। অন্য একজনের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা।

কত কম সময়ের মধ্যে কত রঙীন একটা জীবনের ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকলো প্রহ্লাদ। এঁকে পরক্ষণেই আবার মুছে ফেলল, না এর কেউ নেই নির্ভর করার মতন। থাকলে সেও এই মানুষটার মত নিজের সমস্ত কিছু তার

হাতে আত্মসমর্পণ করে উদাসীন হয়ে কেউ সীমাহীন পৃথিবীর ছক্ কাটা জীবন নাটকে।

অপ্রস্তুত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমেন্দু। প্রহ্লাদই কথা বলল, ভারী ভুলো মন কিন্তু আপনার। ওঁ্যা তাঁ হ্যা, স্বীকার করলো হিমেন্দু, হ্যাঁ তা ঠিক। কথাটা মিথ্যে বলেননি। আজকাল কিছুই মনে থাকে না। চেষ্টা করি মনে রাখবার কিন্তু দরকারের সময়ে দেখি··· কথাটা অসমাপ্ত রেখে হাসলো হিমেন্দু। আজ আর লাল টাই নেই ওর গলায়। পরনে প্যান্ট নেই। ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবী। সেদিনের চেয়ে অনেক বেশী মানিয়েছে আজ: চোখ তুলে পাঞ্জাবীর বোতামগুলো দেখল প্রহ্লাদ। দেখতে দেখতে তুলনা করলো সেদিন আর আজ। কোন পোষাকটা বেশী মানানসই। ভাবনাটা শেষ হবার আগেই আর একটা ভাবনা এলো। পাঞ্জাবীর বোতামগুলো নিশ্চয় সেই পরিয়ে দিয়েছে। এবং আজকের এই পোষাকটা হয়তো তারই পছন্দ অনুযায়ী পরতে হয়েছে। নিজের হাত-কাটা ময়লা সার্টটার সঙ্গে তুলনাই চলে না কোন। তবু তুলনাটা মনে এলো। আর প্রায় নিঃশব্দ একটা নিশ্বাস উঠে এলো বুক ঠেলে। তার ওপর চোখ রাখবার কেউ নেই যে বলে দেবে কি পরতে হবে। আর তাই পরবে প্রহ্লাদ। পরে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখের মানুষ সেজে ঘুরে বেড়াবে। আরও একটা নিশ্বাস মোচড় খেল প্রহ্লাদের বুকের গভীরে। আরও···ঠোঁট দুটো কাঁপবার আগেই হাত দিয়ে চেপে ধরলো সে। যখন বয়স ছিল, সময় ছিল তখন সামর্থ্য ছিল না। সামর্থ্য ছিল না বলেই কাউকে চাওয়া হলো না নিজের করে। কাউকে পাওয়া গেল না একান্ত ভাবে। আজ সামর্থ্য আছে কিন্তু সময় নেই। বয়সের দাগ ধরেছে দেহে। অনেক কিছু চাইবার ইচ্ছা থাকলেও অধিকার নেই। মনে মনে দেহে বুড়িয়ে গেছে প্রহ্লাদ।

একটা খস্ খস্ শব্দে প্রহ্লাদ মুখ তুলল। জুতোর তলাটা মেঝের ওপর ঘষছে হিমেন্দু। অপ্রস্তুত হলে বোধ হয় অমনিই করে সে।

বইগুলোর নাম মনে নেই আপনার? প্রহ্লাদ শুধালো।

না, মাথা কাঁকাল হিমেন্দু, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত নাম মনে রাখাও বেশ কঠিন।

একদেকেত্তের নীরবতা। হিমেন্দু বলল, নীল পৃথিবী, ইটের ঘুড়ির পাঁজা, কাঁচের এ্যাসট্রে, কারখানার চিমনি আরও আরও এমনি সব নাম। মনে রাখা সহজ কথা?

হাসলো প্রহ্লাদ, সত্যিই সহজ নয়।

তাছাড়া চিরকাল আমার মন এমনি ভুলোও ছিল না, হিমেন্দু একটু থামলো কাউন্টারের ওপর আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে মুখ নামিয়ে বলল, ওই ওর জন্যেই এই দশা হয়েছে। প্রহ্লাদ একথার উত্তরেও হাসতে গেল। কিন্তু গলার মধ্যে কি রকম একটা ছিঁড়ে নিঃশ্বাস আটকে হাসিটা অস্ফুট একটা চাপা কান্নার মতন কেঁপে কেঁপে বুকের মধ্যে আবার নেমে গেল।

তাকিয়ে থমকে গেল। বুকের মধ্যে সেতারের দ্রুতলয়ের ঝংকার থেমে গেল আচমকা। কেউ যেন নির্মম হাতে টেনে টেনে তার ছিঁড়ে থামিয়ে দিল। স্রোতস্বীর আগুনে ঝলসানো ফুলস্ফিত মুখখানা নীচু হলো একটু। এক মুহূর্তের জন্যে। কাউন্টার শো-কেস বইএর ওপর ঘুরে ঘুরে স্থির হলো। সুন্দর দুটো আঙুল একটা কাগজের টুকরো মেলে দিল কাউন্টারের ওপর। মিষ্টি একটা কণ্ঠ রিণরিণিয়ে উঠলো, "এই বইগুলো দিন তো।"

আড়ষ্ট একখানা হাত দিয়ে কাগজখানা ঠেলে দিল প্রহ্লাদ। বলল, নেই। বইগুলো একখানাও নেই আমার দোকানে।

নেই?

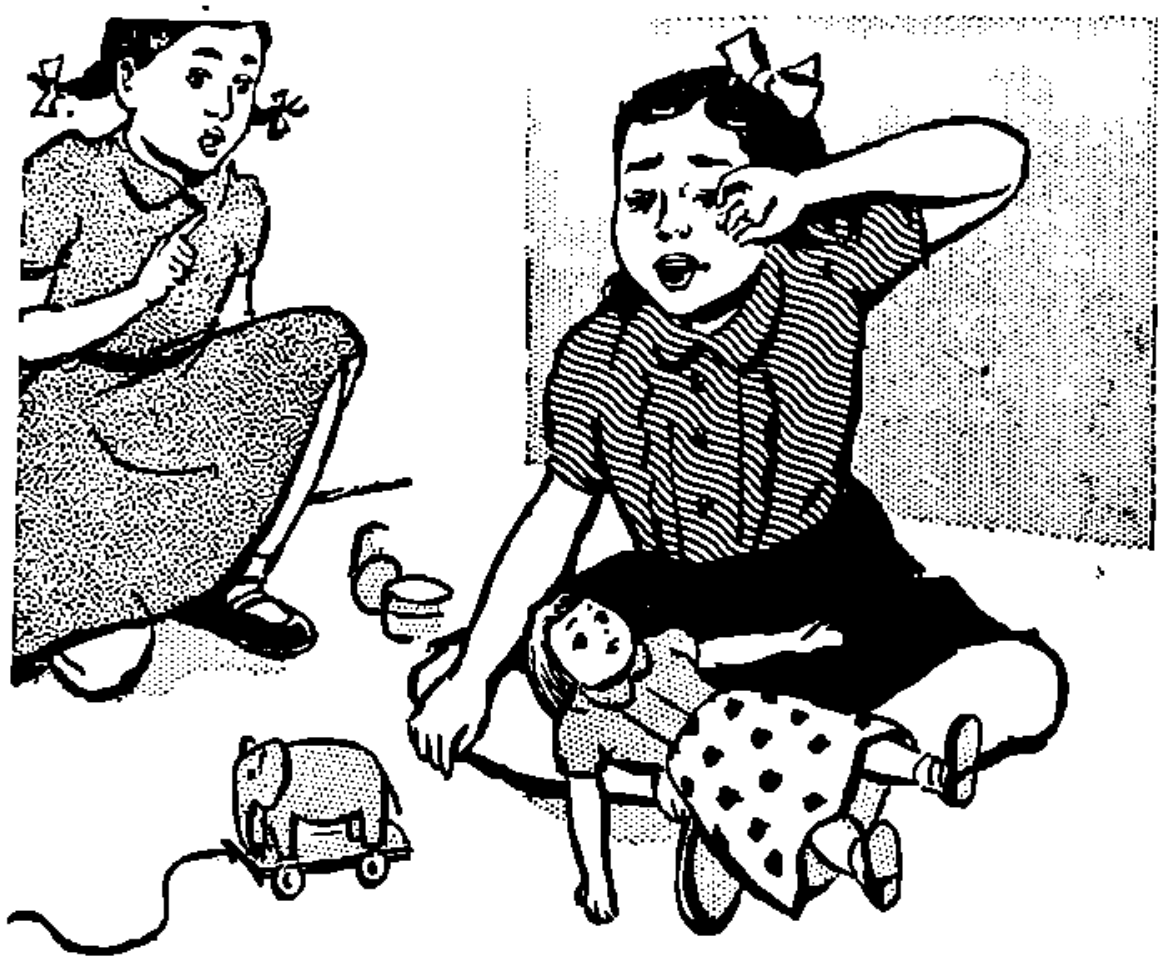

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি কেঁদোতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট বিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন জল পুতুলটির দুধে আলতোয় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলার ফাঁকিয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজেই এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এজোর, এজোর' শুনে তাদাদের সিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে বিনু—আহা বেচারা—তবে খুবখুবে হলে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় ছোটে এলো বিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আবার লক্ষী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মালী, মালী, বিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা বিনুকে পাঠিয়ে দেব আর তোমাকে এতটা সময় ধরে দেব।"

"আমার জন্যে নয় দাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা বুঝিকে, বিনুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় বুবি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "জলের জন্যে তোমার নতুন ব্লক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ব্লক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারণ আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম বুবির জলের ব্লকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা যখন করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক জায়গা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু গোনাতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, সার্ট, ফ্রক, আরও নানাধরণের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৪৫টি জামা কাপড় অনায়াসে কাচা যায়।"

আমি তখুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

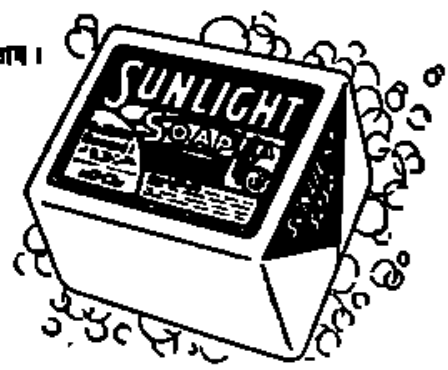

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বই নং ৪০০ ০৩০

ঘাড় নাড়লো প্রহ্লাদ, না।

কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে ধীর পায়ে রাস্তায় নেমে গেল দ্রৌপদী। • • • পরদিন সকালে পথী দোকানীরা অবাক হয়ে দেখল, দুজন লোক ধরাধরি করে দ্রৌপদী বুক হাউসের সাইনবোর্ডখানা খুলে ফেলছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করছে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের চারপাশে ভিড় করলো তারা, কি ব্যাপার সাইনবোর্ড খোলা-খুলি চলছে, কি ব্যাপার?

প্রহ্লাদ বলল, নামটা বদলে নেব।

নামটা, সে কী দ্রৌপদী নামতো খাসা ছিল।

না, মাথা নাড়লো প্রহ্লাদ, বাজে নাম। অচল আধ।• ...কথাটা শেষ করলো না প্রহ্লাদ। ওদের জানাতে চাইল না দ্রৌপদী নামটা কি ভয়ানক ভাবেই না তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। দ্রৌপদী নামের একটা কল্পিত স্বপ্নের মরীচিকা হাজার চেষ্টা করলেও এখন আর প্রহ্লাদের মনে মায়াযন্ত্রের মত রঙ রঙের আবেশ ছড়াতে পারবে না। সেতারের মত ঝঙ্কার হয়ে বাজতে পারবে না। এমন কি একটা সামান্য মুহূর্তের জন্যে প্রহ্লাদকে আনমনাও করে দিতে পারবে না।

কবিতা

আলেখ্য

গৌরীশঙ্কর দে

এইতো কার্তিক এলো, এখনো ফাল্গুন ঢের দূরে,
সবুর সয়না তবু শ্যামলিয়া এ কৃষ্ণচূড়ার ;
শাখা ভরে রাঙা স্বপ্ন ঢেলে দেবে একদা দুপুরে
সকালের শুভলগ্নে, সন্ধ্যায়। মুগ্ধ অন্ধকার
বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দূরে চেয়ে দেখবে কে এলো আকাশে
রুপসীর ঝিলে তার ছায়া ফেলে প্রান্তরের পাশে ;
রাতে তার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির আশ্চর্য বসতি,
স্বয়ংবরা হতে যেন চলেছে সভায় রূপবতী।

আমার দেখা কয়েকজন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইচ্ছা হয়, আমার দেখা কয়েকজনের কথা লিখিয়া রাখি। এই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে পারিব না, তবে তাঁহারা আমার মনে যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু বলিব।

ভারতচন্দ্র সরকার

ভারতচন্দ্র সরকার আমাদের গ্রামের এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একশত আট বৎসর বয়সে মারা যান। সংবাদ পত্রে অবশ্য পড়িয়াছি, সওয়াশত, দেড়শত বৎসর বয়সের লোকও কোথায় কোথায়ও দেখা যায়। ভারতচন্দ্র ব্যতীত তাঁহার বয়সের ঊর্ধ্ব লোকের সঙ্গে অবশ্য আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ বলিয়াই তিনি আমাদের বালক-বৃদ্ধ সকলের শ্রদ্ধা প্রীতি অর্জন করেন নাই, তাঁহার আরও অনেক গুণ ছিল। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁহার ভগিনীপতির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এই ভগিনীপতির দিক দিয়া আমাদের পরিবার বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। এ-কারণ ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি ছিলেন ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'self-made man,' তিনি নিজের চেষ্টায় ও-অঞ্চলে বেশ ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে এত বড় হইলে সাধারণ লোকেরা নানা গল্পগুজব সৃষ্টি করে। আমরা ছেলেবেলায় তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা একঘার শুনিতাম—'ভারত সরকার ধন পাইয়াছে।' 'ধন' মানে গচ্ছিত অর্থ। পূর্বে টাকা মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হইত—দস্যু তস্করের হাত হইতে নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত। পুষ্করিণী খননের সময়ে তিনি ধন পাইয়াছিলেন, গাছ কাটিবার কালে উহার গোড়ায়ও তিনি ধন পান। ভারতচন্দ্র পূর্বজীবনে খুবই গরীব ছিলেন। কোন শ্রমের কার্যকেই তিনি হেয় বা তুচ্ছ মনে করিতেন না। পুষ্করিণী খনন, মাটি কাটা, কাঠ ফাড়া সকল কাজই নিজে করিতেন। তিনি বিপুল শক্তির অধিকারী ছিলেন। নাতিদীর্ঘ মানুষটি, শরীরের গড়ন ছোটা-পেটা; বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াও মনে হইত তিনি কত শক্তি ধরেন।

'ধন' পাওয়া প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে হইল। ভারতচন্দ্র পুরাণো বাড়ী ছাড়িয়া, গ্রামের উত্তর প্রান্তে বিস্তৃত জায়গার উপরে নূতন বাড়ী নির্মাণ করিলেন। চক মেলানো কোঠাবাড়ী। আমাদের ও-অঞ্চলে কোঠাবাড়ী নাই বলিলেই হয়। দু'দশ গ্রামের মধ্যে এই একটি মাত্র কোঠা-বাড়ী। ঝড়-বন্যা-প্লাবনে অনেকেই এখানে আসিয়া আশ্রয় লইত। এই স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। পূর্বে পা'ইতা নামে এক শিল্পী শ্রেণীর কিছু লোক ওখানে বাস করিত। তাহারা পাটি তৈয়ারী করিত। পাটি যাহারা তৈরী করে তাহারা পাটিতা, পা'ইতা বা পা'ড়তা। তাহারা এই শিল্পের দ্বারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। ইহাদের বংশ নির্মূল হইয়া যাওয়ায় এই জায়গাটি বহুকাল যাবৎ পতিত অবস্থায় থাকিয়া জঙ্গলে পরিণত হয়। ভারতচন্দ্র জঙ্গল কাটিয়া নিজ বাড়ী নির্মাণ করেন। আমরা ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম গ্রামের ঐ দিকটায় বাঘ দেখিতে পাওয়া যাইত। কেহ কেহ বাঘের ডাক শুনিয়াছেন,—আমাদিগকে বলিতেন। শুনিয়া বড়ই ভয় হইত। এখানকার পা'ইতারা কেন নির্মূল হইল জানি না, তবে দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শিল্পী বা শিল্পিক শ্রেণীর উপর যেরূপ আঘাত পড়ে, এমন আর

কাহারও উপরে পড়ে না। দ্বিয়াত্তরের মন্বন্তরে যে শিল্পী-শ্রেণী নিপাত যায়। এখানকার পা'ইতাদেরও কি তাহাই হইয়াছিল? তাহাদের 'ধন' বা মাটিতে পোতা অর্থের ট্রাডিসান্ বা কাহিনী আসিল কোথা হইতে? পা'ইতাদের ধন থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতচন্দ্র যে ধনবন্ত ছিলেন, এবং কোন কার্যকেই হেয় মনে করিতেন না তাহার কথা বিস্তর শুনিয়াছি।

ভারতচন্দ্র শক্তিধর মানুষ ছিলেন। তিনি খাইতেও পারিতেন খুব। আমাদের গ্রামে একটি স্কুল ছিল, বোধ হয় সে কালের 'বাংলা স্কুল।' ভারতচন্দ্র ছিলেন স্কুলের প্রেসিডেন্ট, মদীয় পিতৃদেব ইহার সেক্রেটারি। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা উভয়ে একবার ইনস্পেকটারের খোঁজে নৌকা করিয়া গ্রাম হইতে দূরে নদীপথে গিয়াছিলেন। বৈকালে ঝড় উঠিল, নদী হইতে নৌকাখানি একটি খালের ভিতরে আশ্রয় লইল। ঝড় থামিতে থামিতে রাত্রি হইয়া গেল। তাঁহারা এই দুর্যোগের মধ্যে অসময়ে কোথায় যাইবেন? গ্রামের ভিতরে গিয়া এক ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীর কর্তা তাঁহাদের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া বিশেষ আদর আপ্যায়ন করিলেন। ফলাহারের ব্যবস্থা হইল। সের দুই চিড়া ও এক কাঁদি কলা আনিয়া দিলেন। পিতৃদেব স্বল্পাহারী, সামান্য কিছু গ্রহণ করিলেন, বাকী সবটাই ভারতচন্দ্র উদরস্থ করেন। অবশ্য আধমণি কৈলাসের তুলনায় ইহা কিছুই নয়, তবে সে সময়ের মানুষ এইরূপ ভোজনে পটু ছিলেন। ভারতচন্দ্রের সাধারণ আহারের নানা কাহিনীও আমরা শুনিয়াছি কিন্তু সে কথা এখানে বলিব না।

ভারতচন্দ্র শুধু নিজেই ভোজনপটু ছিলেন না, অন্যকে খাওয়াইতেও তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাঁহার ধন সম্পদ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিবাসীবৃন্দকে বহুবার ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। আমি ছেলেবেলায় এইরূপ অন্তত তিনটি বিরাট ভোজ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উপলক্ষ্য ছাড়াই তিনি এইরূপ ভোজ দিতেন এবং এক একবার অনূন হাজার লোক নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজ্য গ্রহণ করিতেন। বার মাসে তের পার্বণের তিনি প্রবর্তন করেন। সে সব উপলক্ষ্যেও ভোজ চলিত। কিন্তু ঐরূপ বিরাট ও ব্যাপক ভোজ বিশেষ কোন উপলক্ষ্য বাদেই প্রায় হইত। তাঁহার বাড়িতে "মনসা" স্থাপিত ছিল; প্রতিদিন পূজার্চনার নিমিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত ছিলেন। প্রতিবৎসর বা দুইবৎসর অন্তর 'মনসা' [মনসার ভাসান] গান হইত। সাধারণতঃ পাঁচ দিন বা সাতদিন ধরিয়া এই পালাগান হয়, তিন দিন হইবারও রীতি ছিল। এই সব উপলক্ষ্যেও লোকের ভিড় হইত খুব। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই গান শুনিতে আসিত।

একটি বিষয়ের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। ভারতচন্দ্র একমাস কথকথার আয়োজন করিয়াছিলেন। তখন তিনি অতি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারাইয়াছেন। সকালে মহাভারতের আদি বিশেষ পাঠ হইত, বিকালে পঠিত অংশের ব্যাখ্যান চলিত। সারা বৈশাখ মাস কথকতা চলিল। প্রত্যহই বিস্তর জনসমাগম হইত। হিন্দু মুসলমান শ্রোতার ভিড়, আমরা ছেলেরাও ভিড় জমাইতাম। প্রায়ই দেখিতাম ভারতচন্দ্র সিঁড়ির উপরে বসিয়া কথকতা শুনিতেছেন। শেষ পর্যন্ত যে সব শ্রোতা থাকিতেন তাহাদিগকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হইত। আমাদের মনে পড়ে কোন কোন যুবক চর্ব্যচুষ্য ভোজনের আশায় কথকতার শেষ পর্যন্ত থাকিত। ছেলেবেলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত অনেকটা পাঠ করিয়াছিলাম। কথকতার বিষয়বস্তু মোটামুটি জানা ছিল। কথক মহাশয়ের স্বললিত ব্যাখ্যা এবং মাঝে মাঝে অনুপম সঙ্গীত জানা বিষয়গুলিকে কেমন যেন মধুর করিয়া তুলিত। কৈশোরে শোনা এই কথকতার মতন এখন আর ত

শুনি না। ভারতচন্দ্র আমোদিত এই কথকতার সুর যেন এখনও কানে বাজিতেছে। ধন্য ভারতচন্দ্র।

ভারতচন্দ্র দাতা ছিলেন। বহু লোক তাঁহার দ্বারা শোষিত হইতেন। বাখরগঞ্জ জেলায় দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুর্গতদিগকে চাউল, বস্ত্র ও কম্বল দান করিয়াছিলেন। এই দানের প্রবৃত্তি তাঁহার বরাবরই ছিল। তাঁহার সময়ে পল্লীতে পল্লীতে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া যায় নাই। হয়ত এরূপ রেওয়াজ চালু থাকিলে তাঁহাকে ধরিয়া করিয়া একটি ইংরেজী স্কুলও প্রতিষ্ঠা করা যাইত। তবে তাঁহার বিরাট বাড়ীর একাংশে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং ইহার জন্য তিনি নিজ হইতে যথোচিত অর্থসাহায্য করিতেন। এই বাংলা স্কুলটি বোধ হয় পরে, আমাদের জন্মিবার পূর্বে মাইনর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। ইহারও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভারতচন্দ্র।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়াছি। নানা কারণে ইহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। আমার পিতামহের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে চালানী ব্যবসায়ের প্রাবল্য ঘটে। যে সব ধনী বাহির হইতে আসিতেন, অর্থের অভাব ঘটিলে ভারতচন্দ্র পিতামহের কথার উপর নির্ভর করিয়া টাকা যাচন দিতেন। ইহার ফলে তাঁহার বেশ অর্থাগম হইয়াছিল। পিতামহের সঙ্গে তাঁহার খুবই হৃদ্যতা ছিল। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি তাঁহার শ্রাদ্ধের দিনে তিনি সমস্ত দিন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া সব দেখাশুনা করেন এবং পরে নিজ ভবনে চলিয়া যান। পিতৃদেবকেও তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যখনই কোন বিশেষ উপলক্ষ্য উপস্থিত হইত তখনই তিনি তাঁহাকে পরামর্শের জন্য ডাকিতেন। এইরূপ দুই-একটি ঘটনার কথা আমার স্মরণ আছে। অন্য বন্ধু ও অঞ্চলে তখন কেহ ছিলেন না। আমরা যখন নবম-শ্রেণীতে পড়ি তখন তিনি মারা যান। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা শেষ দর্শনের নিমিত্ত শ্মশানে আসিয়া সমবেত হন। ভারতচন্দ্র সরকারের নাম গ্রামান্তরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দোষ যে ছিল না এমন কথা বলি না, আর মানুষ তো দোষে গুণেই। তথাপি তাঁহার গুণাবলী দোষকে আড়াল করিয়া মানুষের সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে ধরা দিয়াছিল।

চণ্ডীচরণ বিশ্বাস

চণ্ডীচরণ বিশ্বাস বালক-বৃদ্ধ সকলের নিকট 'চণ্ডী বিশ্বাস' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের মনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিলেন। তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছি। যখন তিনি মারা যান—আমি বোধ হয় তখন কলেজে পড়ি। কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁহার সেবা-পরায়ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। পাকানো বেঁটে মানুষটি, একটি লাঠি তাঁহার সম্বল। তিনি ছিলেন বিপত্নীক। দুষ্টলোকে বলিত তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডী বিশ্বাস এতই আমাদের আপনার জন ছিলেন যে এ কথায় কেহ কান দিত না, আমাদের মনেও ইহা জানিবার জন্য কোন কৌতূহলের উদ্রেক হয় নাই।

দশ বার বৎসর পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে এক সাহিত্যিক বন্ধুকে বলি, আরও অনুরোধ করি গ্রামীণ পরিবেশে তাঁহার মত এক সেবাব্রতী ব্যক্তিকে নায়ক করিয়া যেন একটি গল্প লেখেন, তিনি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন রসোত্তীর্ণ হয় নাই। সেই গল্পের একটি উক্তির কথা একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও করি। খ্রীষ্ট ভক্ত নিপীড়িত সাধুসন্তদের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "Ye are the salt of the earth," অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর লবণ। লবণ না দিলে যেমন তরকারী স্বাদু হয় না, সাধু সন্তরা মানব সমাজে বিচরণ না করিলে সমাজ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। কথাটি যে কত সত্য,

বলিয়া কি বুঝাইব। প্রতিটি পল্লীতে সেবাব্রতী কর্মৎপর এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রায়ই দুই হয়। চাণক্য শ্লোকের সেই উৎসবে ব্যসনে চৈব···শ্লোকাংশটির যেন মূর্ত প্রতীক তাঁহারা। সমাজে যদি সমুদয় লোকই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও হিসাবী হইতেন তাহা হইলে সমাজ কি বিসদৃশ আকারই না ধারণ করিত! বিদ্যাবুদ্ধি-বিবর্জিত বেপরোয়া লোকেরই প্রয়োজন। নির্বোধ না থাকিলে বুদ্ধিমানের কদর হইবে কিরূপে। পরহিতব্রতী চণ্ডীচরণ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তবে তিনি প্রচলিত অর্থে যাহাকে আমরা 'নির্বোধ' বলি তেমনটি ছিলেন না।

আমাদের গ্রামে মঙ্গল ব্রহ্ম নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে আমরা দেখি নাই। তবে তাঁহার কথা বয়স্কদের প্রমুখাৎ শুনিতাম। তিনি আমার পিতামহের প্রিয় সহচর বা সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—তিনি ছিলেন পরহিতব্রতী সেবাপরায়ণ। বিদ্যা লোকের মত তিনি নিজেকে লইয়া বিব্রত থাকিতেন না। আমাদের গ্রামে বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল বলিয়াছি। তাঁহার তাড়নায় কোন ছেলে স্কুল পালাইতে পারিত না। তখন ছেলেদের বেতন সামান্যই ছিল। কিন্তু এই সামান্য বেতনও অনেকে দিতে চাহিত না। মঙ্গল ব্রহ্ম মহাশয় এই বেতন যেন তেন প্রকারেণ আদায় করিয়া দিতেন। তিনি কোন পদাধিকারী ছিলেন না, কিন্তু নিজ হইতেই তিনি ইহা করিতেন। সে কালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাসও ফেল করা ছাত্র [অবশ্য তখন বয়স্ক] আমি দেখিয়াছি। তাঁহাদের সাহিত্যজ্ঞান বেশ অন্নিয়াছিল। তখন তো অতশত বুঝিতাম না এখন ভাবিয়া বিস্মিত হই। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' ও হেমচন্দ্রের কোন কোন পুস্তক পাই। হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীও উদ্ধার করি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার মেঘনাদ বধ কাব্যের উপরে প্রশ্ন থাকিত। ছেলেদের এখানি ভাল করিয়া পড়িতে হইত।

এখন আসল কথায় আসি। চণ্ডীচরণ দাসের কি শিরঃকর ছিলেন জানি না। তবে যে সব ছেলে স্কুল দিয়া সেবা পড়া করিত তাহাদের তিনি বড় ভালবাসিতেন। আমরা গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুল দেখি নাই, তখন ইহা উঠিয়া গিয়াছিল। পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা কয়েকটি মাত্র ছিল। যেরূপ শুনিয়াছি, মঙ্গল ব্রহ্ম ছিলেন একধরণের কিন্তু চণ্ডীচরণ ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে দুইয়েরই সাদৃশ্য—উভয়েই ছিলেন সেবাব্রতী। চণ্ডী চরণের খাওয়া পরার ভাবনা নাই। এক 'বিতা' ছিলেন তাঁহার। তাঁহার মাথে নাম। 'বিতার' বাড়ীতেই ছিল তাঁহার আস্তানা। বিতার আপদে বিপদে তো সর্বদা সহায়। ইহা ছাড়া পল্লীর অন্য দশজনের হিতকর্মে তিনি নিরতিশয় তৎপর। ও-অঞ্চলে খালবিলের অন্ত নাই। আমাদের গ্রামটি কিঞ্চিৎ উঁচু, বিল নাই। কিন্তু খাল অনেক। উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে খাল, আবার গ্রামের পেট চিরিয়া তিনটি খাল। গ্রামা পথে এ-পাড়া ও-পাড়া করিতে হইলে বহু সাঁকো পার হইতে হয়। ও-দিকে সাঁকোকে 'চার' বলে। সাঁকো পুল বা সেতু অর্থে 'চার' কথাটির আমদানী হইল কোথা হইতে ভাষাতত্ত্ববিদ বলিবেন কি? বাঁশ, তালগাছ, খেজুর গাছ বা নারিকেল গাছের খানিকটা খালের বা সোঁতা খালের উপর শোয়াইয়া দিয়া এই 'চার' করা হয়। 'চার' না থাকিলে যাতায়াতের অসুবিধা অথচ মধ্যে মধ্যে ইহা থাকিত না। লোকের যাতায়াতের বড় অসুবিধা হইত। যেখানেই বা তখনই এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইত সেখানেই দেখিতাম চণ্ডী বিদ্যমান হাজির। তিনি লোক লাগাইয়া এবং নিজে গতরে খাটিয়া বাঁশ এবং অন্য গাছের গুঁড় এ বাড়ী ও বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিতেন। কখন

গৃহস্থকে বলিতেন, কখন বলিতেন না। ইহাতে কেহ কিছু মনে করিত না। চণ্ডী বিশ্বাস চাইয়া গিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। তাঁহার নামই ছিল 'পাসপোর্ট'।

কাহারও অসুখ-বিসুখের কথা শুনিলে চণ্ডীচরণ স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিতেন। রোগীকে আশ্বাস দিতেন, গৃহস্বামী-আত্মীয়-স্বজনদের নানারূপ পরামর্শ দান করিতেন। কবিরাজদের মত তিনি নাড়ী দেখিয়া রোগীর অবস্থা নিরূপণ করিতে পারিতেন। প্রত্যেক গৃহই ছিল তাঁহার নিজ গৃহ। নরনারী-শিশু সকলেই তাঁহার উপস্থিতিতে কেমন যেন আশ্বস্ত হইয়া উঠিত, তাহাদের প্রাণে বল আসিত। সকাল-বিকাল-রাত্রি যে কোন সময়েই তাঁহাকে রোগীর পার্শ্বে দেখা যাইত। দিনরাতে অন্তত একবার তিনি আসিবেনই। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলি। পিতৃদেব বর্ষাকালে জ্বরে পড়িলেন। একবার জ্বর হইল শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে। বর্ষা-জল-কাদা—গ্রামা পথে যাতায়াত কতই না কষ্টকর। সেই জল কাদা ভাঙিয়া রাত্রি দশটা নাগাদ চণ্ডীচরণ আসিয়া হাজির। তখন তিনি বৃদ্ধ, বয়স সত্তরের কম নয়। তিনি তখন আমাদের বাড়ী হইতে একটু দূরে থাকিতেন। অন্যদের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় তিনি দিনমানে আসিতে পারেন নাই, তাই অন্ত রাত্রেও একবার দেখিবার-জন্য আসিয়াছেন। তিনি পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, সময়োপযোগী উপদেশ দিলেন, অল্প নানা কথা বলিয়া কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া গেলেন। একবারের কথা মাত্র এখানে বলিলাম।

শুধু ব্যসনে বা বিপদে নয়, উৎসবে আমোদে আহ্লাদেও তাঁহাকে গ্রামবাসী সকলে পাইতেন। তবে তিনি ছিলেন কর্মী, বসিয়া থাকা তাঁহার অভ্যাস নয়। বিবাহে বা শ্রাদ্ধে কোথায় কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহাও তিনি দেখিতেন। প্রচুর-অর্থে একটি সম্পত্তি কিনিয়া অনেক প্রতিবেশী বিপদে পড়িয়াছিলেন। চণ্ডী চরণ বিষয়ী লোক নন, তথাপি তাঁহার ডাক পড়িল। তিনি বিপদের বন্ধু হইয়া এখানে সেখানে যাইতে লাগিলেন। একবার তাঁহার উপর নিতান্তই অকারণে তাঁহার এক নিকট আত্মীয় আঘাত করে; খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন। গ্রামের লোক ঐ আত্মীয়টির কৃতকর্মে বিশেষ দুঃখিত হয় এবং চণ্ডীচরণের দ্রুত আরোগ্যের নিমিত্ত যথাবিধিত চেষ্টা করে। চণ্ডীচরণ পরার্থে সমস্ত জীবনটাই বিলাইয়া দিয়াছিলেন। দুই একটি কথা বা দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার ত্যাগের পরিমাপ করা যায় না। তাঁহার ধন সম্পদ কিছু ছিল না, কিন্তু প্রাণ ছিল। পল্লীবাসীর সেবায় তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাই তিনি সমাজের 'রতন'।

মিলিকান্তের মা

রত্নবতী-মেমিম জিজ্ঞাসা করিলেন তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেদের পড়িতে কি বই দেওয়া যায়। শুনিবামাত্রই বলিলাম রামায়ণ মহাভারত। আজকাল কাহারও কাহারও মুখে শুনি রামায়ণ মহাভারত বড় কঠিন, আর অত বড় বই কেমন করিয়া ছেলেদের হাতে দেওয়া যায়। একথা কিন্তু মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতেছি। রামায়ণ মহাভারত বলিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামী [বা, কাশীরাম দাসের] মহাভারত। ছোটদের রামায়ণ ছোটদের মহাভারত এক সময়ে যাহির হইয়াছিল, মুদ্রিত বই। কিন্তু ইহার বহুল প্রচারে খানিকটা অসুবিধাও হইয়াছে মনে হয়। কেমনা কাহিনী বা গল্পগুলি জানিয়া ফেলিলে মূল পড়িতে আগ্রহ স্বভাবতই হ্রাস পায়। আমার বড় হইলে ছন্দোবদ্ধ রামায়ণ মহাভারত পড়িবার সময় হইবে না।

এখন তার-বেতারের যুগ ; লোক ছুটিয়া চলিয়াছে, দ্রুত বসিয়া রস-করিয়া অত বড় বই পড়িবার সময় কোথা ? তাই গতবারে জিজ্ঞাসা মাত্রই বলিয়াছিলাম—রামায়ণ মহাভারত পড়িতে দিন।

এই রামায়ণ মহাভারত প্রসঙ্গেই নিশিকান্তের মা'র উল্লেখ করিয়াছি। আমরা বালক, তিনি বৃদ্ধা, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশ কি সত্তর বৎসর হইবে। ছোটখাটো মানুষটি, দ্রুত চলেন, কম কথা বলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন রামায়ণ-মহাভারত-গত প্রাণা। তাঁহার সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানিতাম ; তিনি সধবা, নিজ পুণ্যবলে সধবা অবস্থায়ই মারা যান। তখন স্কুলের নীচের কোন এক শ্রেণীতে পড়ি। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। অর্ধশতাব্দী পূর্বে ষাট সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা ক'জনেই বা লেখা পড়া জানিতেন ! কিন্তু অক্ষর জ্ঞান না থাকিলেও ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁহাদের কত গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল তাহার পরিচয় পাইয়াছি প্রচুর। আমার অনেক বন্ধুকে [বর্তমানে উচ্চতর পাড়া কলেজের অধ্যাপক] বলিতে শুনিয়াছি তাঁহার ঠাকুরমা পণ্ডিতে পাণ্ডিতেন কিন্তু লিখিতে পারিতেন না। প্রাচীন মহিলাদের মধ্যে এ রকম কচিৎ দেখা গেলেও কিছু কিছু ছিল।

বৈশাখ মাসে রামায়ণ মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ তখন এক বিশেষ রীতি ছিল। বৃদ্ধবৃদ্ধারা ইহা শুনিতেন। কোন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ব্যক্তি সুর করিয়া এই গ্রন্থ দুইখানির বিভিন্ন পর্ব পড়িতেন, শ্রোতার দলে ছিলেন বেশীর ভাগ বৃদ্ধা বৃদ্ধা। পিসিমাদের মত এখন কিছু বিশেষ নয়। তবে তাঁহার মত অমন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সুদ্ধাপি দেখি নাই। ইহা সেই ছেলেবেলায় আমাকে যে কত মুগ্ধ করিয়াছিল বলিতে পারি না। তিনি সম্পর্কে ছিলেন আমার পিতার মাসীমা। দুইটি দিন তাঁহাকে রামায়ণ পড়িয়া শোনানো, সৌভাগ্যে দেখিয়াছি। পিতৃদেবের একটি কর্তব্য মধ্যে ছিল। তিনি সুর করিয়া রামায়ণ এবং কখন কখন মহাভারত পাঠ করিতেন, তাঁহার পাঠ বড়ই মিষ্টি লাগিত। তাঁহার মত সুর করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সুরে হইত কোথায় যেন ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে নিশিকান্তের মা আমাকে ধরিয়া বসিতেন। সেই কথাই এখন বলি।

আমি তখন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে সবে ভর্তি হইয়াছি। নিশিকান্তের মা অন্যান্য সময়েও, বিশেষতঃ বর্ষাকালের রাত্রির অবসরে এই গ্রন্থ দুইখানির পাঠ শুনিতে চাহিতেন। তাঁহার সঙ্গে জুটিতেন পরোক্ষিণী পিসীমা ! তিনি স্বামী-পুত্র হারাইয়া ধর্ম কর্মে মন দিয়াছেন। রাত্রিযোগে রামায়ণের কিয়দংশ প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতাম। আমি ছেলেমানুষ, শিশু বলিলেও হয়, রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্তও পড়িতাম। ঘড়ি ছিল না, আন্দাজে বুঝিতেছি। অধিক রাত্রি যে জাগিতাম তাহাতে সন্দেহ নাই। দিনের পর দিন এইরূপ রাত্রি জাগিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়াছি। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বোধ হয় এইরূপ চলিয়াছিল। তবে মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক না যাইত তাহা নয়। নিশিকান্তের মা সম্পর্কে আমার ঠাকুরমা। আমার উপর জোরও চলিত, একারণে অনেক দিন তাঁহার নির্দেশে বিশেষ বিশেষ অধ্যায়-পড়িতে হইত। মনে হইত সমগ্র রামায়ণ মহাভারতের বিষয়াদি তাঁহার জানা। এইরূপে রীতিমত পাঠনার ফলে এই গ্রন্থ দুইখানির বিষয়বস্তু ও কাহিনী উপাখ্যানাদি প্রায়ই আমি জানিয়া ফেলিলাম। পঞ্চম শ্রেণীতে থাকাকালে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর "ছোটদের রামায়ণ" আমাদের পড়িয়া শুনানো হইত। স্নেহ পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতেন। তখন দেখি তাহার মুখে যাহা শুনিলাম তাহার অধিকাংশই তো আমি আগে জানিয়াছি।

রামায়ণ মহাভারত পাঠের রেওয়াজ এখন বড় একটা দেখি না। গত বৈশাখে আমতলায় বসিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সুরের ভিতরে পিতৃদেবের সুরের যেন রেশ মিলিল। বড়ই আনন্দ পাইলাম। ছেলেবেলায় রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে দিলে নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার উপরে দখল হইবে। শুধু রামায়ণ মহাভারত কেন মঙ্গল-কাব্যগুলিও তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া উচিত। সব যে বুঝিবে তাহা নয়, সব বুঝিবার দরকারও নাই। বাংলা ভাষার সব সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞান হইবে। বাংলা সাহিত্যের সুরের সঙ্গেও তাহাদের পরিচয় ঘটিবে। রওনক আমার কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলেন। নিশিকান্তের মা'র জন্যে যে মিঠা দেখিয়াছি তাহা যেন আমাতেও অনুক্রামিত হইয়াছিল। তাঁহাকে আজ বারবার নমস্কার করি।

শরৎ চন্দ্র ব্রহ্ম

শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম পিরোজপুর [বাখরগঞ্জ] ধর্মবিজয় স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি আমার দুই ক্লাশ উপরে পড়িতেন। অনুমান হয় বয়সেও তিনি আমার চেয়ে দুই বছর বা তাহার কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কত বিদ্যা জানা, কত পড়াশুনা। তাঁহার দিকে আমি সহজেই আকৃষ্ট হইলাম। তখন একটু বড় হইয়াছি, সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। এই দুই বৎসর তাঁহার সঙ্গ পাইয়াছি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে। পূজার ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটি এই দুই ছুটিতেই তিনি বাড়িতে থাকিতেন। এই সময়টি আমাদের বড়ই আনন্দে কাটিত। কত আলাপ আলোচনা হইত, অনেক রাত্রি পর্যন্ত।

আষাঢ়ের বাড়ীর রকে রাস্তার কোণে, চায়ের ষ্টলে বিভিন্ন ছেলে ভদ্রলোকের আড্ডা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কথাই না তাহারা বলে। এত কি কথা? আশ্চর্য হইতে ইচ্ছা হয়। অনেক বন্ধু বলেন এখন কি বিষয়ের অভাব আছে। যোদ্ধা, বিমান, খেলা, সিনেমা, সিনেমা-ষ্টার কত কি আলোচনার বিষয়। ছেলেরাও কি এইরূপ আলোচনায় লিপ্ত হয়! তবে কোন কিছুই তাহাদের আলোচনা হইতে বাদ যায় না, এক পড়া শুনার কথা ছাড়া। আলোচনা কর, তর্ক কর ক্ষতি নাই; কিন্তু বয়োধর্ম তো মানিয়া চলিতে হইবে। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ—ঋষি বাক্য; শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনং—এও ঋষিদের উক্তি। এই দুটি উক্তি বা বাক্য আমাদের ছেলেদের হৃদয়ে গাঁথিয়া দেওয়া দরকার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়াছি। 'আড্ডা' আধুনিক অর্থে নয়। মাঝে গল্প-গুজব আমাদের হইত না। বৈকাল চারটা পাঁচটা হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত একত্রে কাটাইতাম। দেশ-বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে কত আলোচনা চলিত। এই যে অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিতাম, এ জন্য পিতৃদেব কিছুই বলিতেন না। আমা-দেরকে লক্ষ্য করিয়াছি, আমার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'Trust begets trust' এই ইংরেজী কথাটি নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। পিতা আমাকে বিশ্বাস করিতেন, আমিও কখন বিশ্বাসভঙ্গ করি নাই। শরৎচন্দ্র সৎ ছাত্র, ভাল সঙ্গী, তাহার সঙ্গে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইব ইহাতে আপত্তির কি কোন কারণ থাকিতে পারে?

প্রথম মহাসমর শেষ হইতে না হইতেই ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ রব তুলিয়াছিলেন "Back to village" অর্থাৎ গ্রামে ফিরিয়া যাও। বিলাতে খাদ্য দ্রব্যের বড় অভাব ঘটে। লয়েড জর্জের ওরূপ বলার উদ্দেশ্য—লোকেরা গ্রামে ফিরিয়া গিয়া খাদ্য শস্য উৎপাদন করুক

কৃষি কর্মে মন দিক। আমাদের দেশেও একথার ঢেউ আসিয়া পৌঁছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গ্রামের উন্নতির কথা বলিতেছিলেন। আগের যুগে দেখিয়াছি দেশসেবক নেতারা অনেকে নিজ নিজ জেলায় অবস্থান করিয়া তথাকার উন্নতিতে সবিশেষ অবহিত হইতেন। জমিদার-কুল তথা ধনী সম্প্রদায় একে একে কলিকাতায় আসিয়া ভিড় জমাইতে থাকেন। কলিকাতায় ভিড় হইবার অবশ্য আর একটি বলবৎ কারণ ছিল—ম্যালেরিয়া মহামারী। যাহা হউক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের গ্রামের উন্নতি কর্মে লিপ্ত হইবার কথা লবেজ জর্জের উক্তিতে খুব বেশী জোর পাইল। শরৎচন্দ্র রীতিমত সাময়িক সাহিত্য পড়িতেন। তাঁহার মুখে গ্রামের উন্নতিমূলক কত কথা শুনিয়াছি। বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা কৃষির উন্নতি এবং 'ভদ্রলোকের' কৃষি কর্মে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি তাঁহার মুখে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকাখানি শরৎচন্দ্রের নিকট প্রথম দেখি। এইরূপে প্রথম দেখিয়াছিলাম —"সায়ান্টিফিক আমেরিকান" পত্রিকাখানি। শরৎচন্দ্র এই পত্রিকার কয়েক সংখ্যাই আনাইয়াছিলেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা ছিল মনে হইতেছে। আজকাল 'কম্পোষ্ট' সারের কথা কত শুনি। এই পচা সার আমাদের দেশে নূতন নয়। শুধু নামটি নূতন। এই কম্পোষ্ট সারের কথা ঐ পত্রিকায়ও ছিল। গরু ও ষাঁড়ের ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তখনও বড় শহরে বা গ্রামে পদার্পণ করি নাই। অত বড় গরু বা ষাঁড় দেখিব কোথা হইতে? বৈজ্ঞানিক লাঙল থাকা সত্ত্বেও মাকিনীরা বলদ বা ষাঁড়কে ছুটি করে নাই। দুধ দিবার আয়োজনই বা কত।

শরৎচন্দ্র ছিলেন একটি চলন্ত গ্রন্থাগার। কত বিষয় জানেন আবার কত বিষয়ের বই তাঁহার নিকট। গল্প উপন্যাস নয়, কঠিন কঠিন বিষয়ের বই। শুধু বিষয় পড়া আলোচনা করা, অনুধ্যান করার প্রবৃত্তি অল্প বয়স হইতে। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী ইয়ংগের পিটের বক্তৃতা সম্বলিত একখানা বই তাঁহার নিকট হইতে লই। লম্বা লম্বা বাক্য, শব্দগুলিও বড় বড়। পড়িতাম, তবে পড়িয়া রসের ভাগই বুঝিতাম না। তবু পড়িতাম। মেগোলিয়নের সম্বন্ধে যুদ্ধকালীন বক্তৃতা, বিষয়টা জানা ছিল, আমাকে অনেক কথা বলিয়া লইতাম। টলস্টয়ের গল্প, বেকনের রচনা—ইংরেজী পুস্তকাদি, যতদূর স্মরণ হয় শরৎচন্দ্রের নিকট হইতে লইয়া পড়িয়াছি। তিনি ঐ বয়সেই ফরিদপুরের গ্রন্থ অনবদ্যর শিরস্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনবদ্যর একজন প্রধান ভক্ত শিশু রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি বালকদের চরিত্র গঠনোপযোগী এবং স্বাস্থ্যোন্নতিকর কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি বিখ্যাত বই ছিল "ব্রহ্মচর্য" নামে। শরৎচন্দ্র আমাকে এই বইখানি পড়িতে দিলেন। বইখানি পড়িয়া অনেক নূতন কথা জানিলাম। তিনি রাত্রির প্রথমার্ধে ছাত্রদের ঘুমাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে পড়ায় অধিকতর মনঃসংযোগ ঘটিবে; অল্প সময়ে অধিক পড়া যাইবে, আবার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা ভাল। গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকদিন এক্সপেরিমেণ্ট করিলাম। কিন্তু অভ্যাসের অন্যথা দাঁড় করাইতে পারিলাম না। পরে দেখিয়াছি রমেশচন্দ্রের উক্তির মধ্যে সত্যতা আছে। আই. এ-র টেষ্ট পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

শেষ রাত্রে পড়ায় মন খুব বসে, পাঠও অগ্রসর হয় অতি দ্রুত। পরবর্তীকালে দেখি কোন কোন বিষয়-রচনায়ও ইহার যাথার্থ্য বুঝিয়াছি।

'গ্রামে ফিরিয়া যাও' 'পল্লীসংস্কার কর' এই কথাগুলি তখন দেশের আকাশে বাতাসে। আমরা দেশের ছাত্ররা গ্রামের সেবায় লাগিয়া গেলাম। আমাদের পুঁজি নাই, খালি গন্তরে খাটিয়া সব কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইবে। গ্রামের মধ্যে ভাল রাস্তা নাই, আমাদের রাস্তা বাহির করিয়া তাহাতে মাটি দিয়া উঁচু করিতে হইবে। আপনারা তো জানেন অনেক পল্লীতে পথ আছে কিন্তু রাস্তা নাই। পল্লীর এই অভাব মিটাইবার জন্য আমরা তৎপরে লাগিয়া গেলাম। শরৎচন্দ্র বাহিরে থাকেন, গ্রামোন্নতিমূলক নানা বই পুঁথি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, আমাদের পড়িতে দিলেন। রাস্তা তৈরী দিয়া আমাদের কাজ আরম্ভ হইল। দুঃস্থ পল্লীবাসীর সাহায্যার্থে আমরা মুষ্টিভিক্ষা তোলারও আয়োজন করিলাম। আমাদের একটি নিজস্বতন্ত্র ছিল। উদ্দেশ্য মধ্যে প্রথমে একটি পাঠাগার স্থাপন এবং একটি ডাকঘর আনয়নের ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে ও গ্রামের বাহিরে বিভিন্ন স্থানের বিশেষতঃ নিকটবর্তী হাই স্কুলে যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত যাহাতে অন্তত একটি লোকাল বোর্ডের রাস্তাও মঞ্জুর হয় সে জন্য আমরা কিছু চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইহাতেও শরৎচন্দ্রের খুব যোগ ছিল। কিন্তু আমরা ও ব্যাপারে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। আমাদের পল্লী, শুনিতে পাই, এই নূতন যুগেও যে তিমিরে সেই তিমিরে। তবে ডাকঘর স্থাপন বিষয়ে আমরা যে প্রয়াস শুরু করি, দশ বার বৎসর পরে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। ইহাতেও শরৎচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। তিনি একজন সেবাপরায়ণ ব্যক্তি। জ্ঞান অর্জন স্পৃহা তাঁহার প্রবল। যতদূর মনে হইতেছে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি নিজ বাণিজ্য সম্বন্ধে বহু পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্কুলে অধ্যয়ন কালেই বোধ হয় দেখিলাম আমাদের গ্রামের শরৎচন্দ্রের লেখা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার কতই না আনন্দ হইল। পরপর আরও কিছু লেখা প্রবাসীতে স্থান পাইল। আমরা রীতিমত প্রবাসী পড়ি, দেখিতাম প্রবাসীতে পরিসংখ্যান মূলক রচনার বেশ কদর। পরে অতি নিকট হইতেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শরৎচন্দ্র আমাদের পাঠোপযোগী জ্ঞানগর্ভ বই কলিকাতা হইতে আমাকে পাঠাইতেন, মাঝে মাঝে পত্রাদিও লিখিতেন। তাহাকির আমলে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল। প্রথম নির্বাচন কংগ্রেস বয়কট করায় উদ্যোগ বা হৈ হুল্লোড়ের একান্ত অভাব ছিল। এবারকার নির্বাচন তাহা সুদে আসলে পুরা করিয়া দিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল আসরে অবতীর্ণ—আর কি কথা আছে। শরৎচন্দ্র লিখিলেন, কলিকাতায় নির্বাচন যেন বড়লোকের বাড়ী মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতেছে। আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে ভাবিতেছি শরৎচন্দ্রের এই 'শ্রাদ্ধ' কথাটি অর্থপূর্ণ। তিনি অবশ্য নিশ্চয়ই অতটা ভাবিয়া লেখেন নাই। এখন দেখিতেছি এক একটি সাধারণ নির্বাচন মানে, অর্থ, নীতি, বিনয় সংযম, শৃঙ্খলা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ। ডেলী মেলের সংবাদদাতার নিকট পাকিস্থান সেনাধ্যক্ষ মহম্মদ আইয়ুব খাঁ একটি অতিবড় সত্যকথা বলিয়াছেন—"Democracy without education is hypocriecy without limitation" সম্প্রতি একটি পত্রিকায় এই কথাটিরই ভাষানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছি—গণ-শিক্ষা ব্যতীত গণতন্ত্র যেন লোনার পাত্রের বাটি। গণশিক্ষা না থাকিলে গণতন্ত্রে দুঃখ দুর্দশা চরমে উঠে। আইয়ুব খাঁর উক্তিরও ইহাই তাৎপর্য। এক একটি সাধারণ নির্বাচনেই বিষম কাঁপড়ে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাই।

প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে একবার কলিকাতায় যাই এবং

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পাঁচ সপ্তাহের উপর থাকি। তখন বহু-বাড়ী ভাড়িয়া বিবেকানন্দ রোড বাহির করিবার সবেমাত্র উদ্যোগ হইতেছিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নানা স্থানে যাইতাম, এবং নানা মানুষ দেখিতাম। এই সময় প্রথম সত্য-পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ রায়কে দেখি। তিনি প্রবাসীতে নিয়মিতরূপে অর্থনীতির পরিভাষা লিখিতেন। তাঁহার 'টাকার কথা' বইখানি বহুপূর্বে ১৯২৬ সনে বাহির হয়। ইহার পরে বাংলায় আরও বই বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ সবের মধ্যে এই বইখানিই পথিকৃৎ। এই সময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান। তাঁহার স্মৃতিসভা হইল রামমোহন লাইব্রেরীতে। শরৎচন্দ্র গিয়াছিলেন কিনা মনে নাই, কিন্তু আমি আমাশোড়া উপস্থিত ছিলাম। পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছি, বহু নামজাদা লোক দেখিবার সৌভাগ্য হইল। স্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী [বীরবল] প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিলেন। দুই তিন বক্তার বক্তৃতার পরই রবীন্দ্রনাথ উঠিলেন। তিনি মুখে কিছু বলিয়া একটী দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। স্ব-রচিত কবিতা কি অদ্ভুত পড়া। স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে পাঠ দুরূহ হইল তো বটে, উপরন্তু মধুরও হইয়া উঠিল। আবৃত্তির ধরনে এমন পাঠ পূর্বে কখনো শুনি নাই, পরেও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হইলাম কলিকাতায় বি, এ পড়িতে আসিয়া। তিনি কয়জন বন্ধু লইয়া একটি ছোট প্রকাশ্যার করিয়াছেন, একটি সেবা সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সেবা সমিতির অধীনে আমরা সিটি কলেজের কিছু ছাত্র চন্দ্র-গ্রহণ উপলক্ষে ভলান্টিয়ারী করিয়াছিলাম। তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ-একজিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান কর্মকর্তা। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি নির্বাসিত হন।

শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী; তিনি দেশে গিয়া ব্যবসায় কর্মে লিপ্ত হইলেন। বহু পরিশ্রম করিয়া এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি মধুপুরে যাইবার এবং মধুপুর হইতে ফিরিয়া আমার আতিথ্য স্বীকার করেন। কিন্তু এ শরৎচন্দ্র যেন আগেকার শরৎচন্দ্রের ছায়া। বুঝিলাম মৃত্যু তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। পল্লীগত প্রাণ শরৎচন্দ্র প্রিয় পল্লীতে ফিরিয়া অল্পদিন পরেই মারা গেলেন। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি আমার মন জুড়িয়া আছে।

(চলবে)

ডস্টয়েভ্স্কি :

স্ত্রী ও মেয়ের দৃষ্টিতে

সত্যব্রত বসু [গতবারের পর]

১৫

ডস্টয়েভ্স্কি তাহলে ভাল লোক নন। জুয়া ত খেলছেনই, রাশি রাশি টাকাও উড়ছে,—এবং তাঁর মত একজন বয়স্ক বিবাহিত ভদ্রলোকের পক্ষে এ সব ত বাস্তবিকই অন্যায়। আরো অন্যায়, ইতিমধ্যে ভদ্রলোক আর-একটি গর্হিত কাজ করে বসে আছেন। পূর্বপরিচিত এক মহিলার সঙ্গে আনাকে লুকিয়ে এইসময় আবার পত্রালাপ সুরু করেছেন। আনা প্রথমে খেয়াল করেন নি অত, সন্দেহ হতে একদিন একখানা চিঠি খুলে পড়তেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তববুদ্ধি খুবই প্রখর বলে এ নিয়ে আনা কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কির পার্সোনালিটি বলতে বাস্তবিকই কিছু ছিল না, —এবং সেই মহিলা,—পলিনা সুসলোভা,—সাহিত্যপ্রতিভা ছাড়া আর-সব বিষয়ে তাঁকে অগ্রাহ্য করতেন বলে, এই চিঠিতেই একদিন এমন একটা জবাব পাঠালেন যে তারপর কোনো ভদ্রলোকের পক্ষেই আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আনা বরাবরই চুপ : ডস্টয়েভ্স্কির উপর এ-চিঠির প্রতিক্রিয়াও চুপচাপ লক্ষ্য করলেন। পলিনা আসেন আনার আগে এবং ডস্টয়েভ্স্কির সঙ্গে ইনিও অকথ্য ও অমার্জনীয় ব্যবহার করেছিলেন,—যার নাম, বলা যায় না প্রতারণা,—এবং এঁরই কাছে ডস্টয়েভ্স্কি চিঠিতে আনার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যাপারটা এমনভাবে বর্ণনা করলেন যেন আনাই দায়ী, তাঁর যেন হাত ছিল না ; 'কী করি বলো, মেয়েটি বেশ ভাল। প্রথমে আমার স্টেনো হিসাবে আসে, পরে দেখি আমার প্রতি সে গভীরভাবে আসক্ত। এইরকম সময়ে প্রস্তাব আসে এবং আমারো তখন "না" বলার উপায় ছিল না।'

দুর্বলচিত্ততা। তা ছাড়া আর কী।

কিন্তু ডস্টয়েভ্স্কির এইরকমই স্বভাব।

পলিনা ছাড়াও আর-একটি মেয়ের কাছে তিনি আনার আগে প্রস্তাব করেন,—তাঁর নামও আনা এবং এঁর কথাই একদিন গল্প বলতে বলতে আনাকে বলেছিলেন। এই আনার সঙ্গে বিবাহ ঠিক হতে একদিন সেই আনাকে লিখলেন : 'ছ-মাস আগেও যে এরকম হবে কেউ কি ভাবতে পেরেছিল। এমন একটা ঘটনা এবং আমিও রাজি হব।' অর্থাৎ সেই আনাও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর জীবনে প্রথম মহিলা মেরিয়া ডিমিট্রিয়েভ্না,—তিনি এক বিবাহিতা মহিলা। রূপে আনা পলিনা এবং অন্য আনার চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠা কিন্তু স্বভাবে চমৎকার। ডস্টয়েভ্স্কিকে তিনিও প্রতারণা করেন,—এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে,—যদিও পরে আবার তাঁরই স্ত্রী হন,—স্বামী অবশ্য মারা গেলে পর। অনেকের মত, এই মহিলার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবনের কথাই ডস্টয়েভ্স্কি তাঁর 'দি ইটার্নাল হাসব্যাণ্ড' বইতে লিখেছেন। কিন্তু সাহিত্যে সব সময়ই জীবনের ইগ্নরাআরেশন। সে যাই হোক, এই মহিলা বেঁচে থাকতেই আবার পলিনার সঙ্গে,—এই পলিনাই গ্যাম্বলারের নায়িকা,—ডস্টয়েভ্স্কির পরিচয়, —সে পরিচয় ক্রমে প্রণয় এবং তা থেকে আরো দূরগামী ঘটনাবলী।

বেশ বোঝা যায় যে মেয়েদের সম্পর্কে ডস্টয়েভ্‌স্কি কখনই সুখী হননি এবং না হওয়ার কারণও তিনি নিজেই,—তাঁর অক্ষমতা এবং অক্ষমতাজনিত দুর্বলচিত্ততা। সাহিত্য-প্রতিভার জন্য মেয়েদের সম্পর্কে আসা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল কিন্তু কোনো মেয়ের প্রতি একবার আকর্ষণ পড়লে তিনি সেখানে কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত এমন পাগলের মত ব্যবহার করেছেন যে তার তুলনা একমাত্র তাঁর সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভাল লেখক হলেই যে ভাল লোকও হতে হবে, —এমন একটা প্রত্যাশা আমাদের থাকে যদিও,—এ ভারি অদ্ভুত আবদার। এবং তা হয়ও না সাধারণত। ভাল লেখক মানেই বুঝতে হবে যে মনে এবং স্বভাবে সে তার কালের সাধারণ মানুষেরই মত: কেবল তফাৎ এই যে তার মন এবং স্বভাবের কথা সে বলে, মানে বলতে পারে, —সাধারণ লোকে যেটা পারে না। এবং সাহিত্য মানে ও তাইই। সাহিত্য মানেই যে লিখেছে সে,—সে, তার কাল এবং দেশ। সাহিত্য পড়ি কিন্তু জানি আমরা একটি মানুষকে,—সাহিত্য মানে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সেই লোকটির বোধ ও অভিজ্ঞতা,—পৃথিবীর প্রতি, পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রতি তার চেতনার প্রতিক্রিয়া,—সাড়া। এবং এই ডাক ও সাড়ার কথা সে যদি বলতে পারে ঠিকমত এবং তার সঙ্গে আমাদের অনেকের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতিগত মিল হয় তবেই সে সার্থক লেখক।

একজন লেখকের সঙ্গে একজন পাঠকের তাহলে এই মূল সম্পর্ক: যদি তাঁর লেখা ভাল হয়, আমার কাছে মানে, তবে তাঁর বই বার করে পড়ব,—পরে আরো বহুবার পড়বার জন্য বহুকে পড়াবার জন্য বার করে রেখে দোব,— আর তা যদি না হয় তবে তার আসন হবে বাজে কাগজের ঝুড়িতে; লেখকের সঙ্গে আমার সম্পর্কও সেইখানেই ইতি। আমারই জন্য, আমার নিজের প্রয়োজনে আমি আবার অন্য লেখকের খোঁজ করব।

অতএব ডস্টয়েভ্‌স্কির সঙ্গে আমাদের প্রধান সম্পর্ক তাঁর লেখা নিয়ে। এবং দেখা যাচ্ছে যে জুয়াই খেলুন বা আমাকে লুকিয়ে পলিনার কাছে প্রেম চিঠিই লিখুন, সঙ্গে সঙ্গে বইও লিখছেন। এবং সেইটিই কথা: আসল হওয়ার মত খবর।

তাঁর এইসময়ের বই, 'দি ইডিয়ট'। কিন্তু মাথার মধ্যে সবসময় যদি জুয়া ঘোরে ত বই হয় না,—বই না হলে টাকা হয় না,—এবং টাকা না হলে জুয়া এবং জীবন দুইই অচল। অতএব টাকার জন্যই ডস্টয়েভ্‌স্কিকে জুয়ার টেবিল ছেড়ে মাঝে মাঝে লেখার টেবিলেও বসতে হচ্ছে।

কিন্তু এডিটার কাটকভ বাস্তবিকই তাঁর ওভাথী বন্ধু। এই লোকটির উদার ও অকৃপণ সাহায্য না থাকলে আনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়াই মুস্কিল হত: 'কল্পনা করো, সাড়ে চার হাজার রুবল'—ডস্টয়েভ্‌স্কি এক চিঠিতে বন্ধু মাইকভকে লিখেছেন,—'সাড়ে চার হাজার রুবল হে, ভাবো একবার, কাটকভ দিয়েছেন।' মাইকভ্‌ সেই কবি বন্ধু, গাম্বলার লিখতে লিখতে যাঁর সঙ্গে ডস্টয়েভ্‌স্কি একদিন আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই অঙ্কের টাকার উপর ক্রাইম এণ্ড্‌ পানিশমেণ্টের লেখক হিসাবে ডস্টয়েভ্‌স্কির যতখন দাবী ছিল —এই এক নভেলেই কাটকভের কাগজের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পাঁচ শ বেড়ে যায়। এই টাকার তারপর ডস্টয়েভ্‌স্কির বিবাহ এবং বিদেশযাত্রা। তারপরেও প্রতিমাসে একশ' রুল' যখন যা চাইছেন ডস্টয়েভ্‌স্কি, কাটকভ নিয়মিত পাঠিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, পাগল হলেও একজন ভয়ানক লেখক, এবং এই পাগলটিকে হাতে রাখতে হলে একমাত্র উপায় টাকা। অতএব বহু অনুনয়ের পর রীতিমত টেনে হিঁচড়ে কলম দিয়ে একটু একটু ক'রে

বেরুতে লাগল তাই ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে ডস্টয়েভ্‌স্কি কাটকভকে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মস্কোতে কাটকভের কাগজে ছাপা হয়ে বেরুতে লাগল।

এইসময় নভেলের জন্য অস্থির উদ্বিগ্ন ও উদগ্রীব লেখক ডস্টয়েভ্‌স্কি তাঁর বন্ধু মাইকভকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন তা থেকে তাঁর আর একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেদিকের কথা এবার কিছু বলা দরকার।

১৬

ডস্টয়েভ্‌স্কির চিঠি : 'ইডিয়ট' প্রথম অংশ এভিটারের কাছে পাঠিয়ে বন্ধু মাইকভ্‌কে লিখছেন।

'মাইকভ, লেখা বলতে কি মানে হয় তুমি কি জানো! না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এ নরক যন্ত্রণা তোমাকে ভোগ করতে হয়নি। আমার মনে হয় তোমাকে গুছিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শাসন যেনে কখনো লিখতেই হয়নি। হলে বুঝতে কি ভয়ানক ব্যাপার।

'লেখার জন্য এতগুলো টাকা এ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছি,—কম টাকা ত নয়। সাকে চার হাজার রুবল্‌,—ভাবো একবার।—কিন্তু শেষকালে যে এই কাণ্ড ঘটবে আমি জানব কি করে।

'বছরের প্রথমদিকে আমি ভাবছিলাম যে মা-সরস্বতী নিশ্চয় একটা নির্দয় হবেন না। নিশ্চয় বছরের শেষদিকে গিয়ে মাথার মধ্যে অনেক কল্পনা জমা হয়ে উঠবে এবং মাসল লিখব,—সকলকেই খুব খুশি করা যাবে। এটা বিশ্বাস করবার কারণও ছিল,—কারণ মাথার মধ্যে প্রায়ই থেকে থেকে নানা চিন্তা কথা সব ছবি ভাবনা আইডিয়া হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত ঝিলিক দিয়ে উঠত,—তা নিয়ে আমি চিন্তাও করেছি, মনে ধরে রাখতে চেয়েছি মনে, এবং ভেবেছি যে সময়ে সব আপনি গুছিয়ে উঠবে।

'কিন্তু এ কেবল জিনিসই। ধরো নানারকম রঙে তুলির এক একটা হঠাৎ হঠাৎ টান। যতক্ষণ না সমস্ত ছবিটা মনের মধ্যে স্থিরভাবে ভেসে উঠতে পারে, যতক্ষণ না স্থায়ীভাবে চেতনায় মুদ্রিত হয়ে যায়, তুমি তাকে ছুঁতেই পার না। কিন্তু এ যে কখন হবে নিশ্চয় করে কিছুই আবার বলা চলবে না। যখন হবার তা আপনিই হয়,—যখন হয় না, শত সাধ্যসাধনাতেও হবার উপায় নেই। কিন্তু চেতনায় যদি একবার সমস্ত জিনিষটা আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ও তখনই কেবল শান্ত মনে এবং নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে লেখা আরম্ভ করা চলে। সে লেখা তখন সহজও। ঠিক যেখানে যেটি দরকার সবই আপনাআপনি তখন গুছিয়ে উঠতে থাকে।

'থাক। এখন ত সমস্ত গ্রীষ্ম এবং শরৎকালটা আমি মনে মনে আইডিয়া বেছেই কাটালাম,—তার মধ্যে কয়েকটা বাস্তবিকই সুন্দর,—কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝছিলাম যে এর মধ্যে কোন্‌গুলো খাঁটি, কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা বাজে,—তারপর তার থেকে একটা নিয়ে একটানে হু হু করে অনেকটা লিখে ফেললাম। কিন্তু এই সেদিন, এই ডিসেম্বরের ৪ তারিখে, হঠাৎ কি যে হল, একেবারেই ভাল লাগলনা,—সমস্তটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললাম। লেখাটা অবশ্য খুব খারাপ হত না আমি জানি,—কিন্তু এই চিন্তাটাই অসহ্য। আমি চাই অসম্ভব রকম ভালো।'

লেখাটা নষ্ট করে দিয়েছেন, ঠিক তার পরই লেখা চেয়ে কাটকভের চিঠি। অতএব কলম নিয়ে আবার বসলেন এবং তৈরী করে খানিকটা পাঠাতেই হল। পাঠিয়ে দিয়ে বন্ধুর কাছে এই চিঠি।

'প্রথম পরিচ্ছেদটা যে ভাল হয়নি তা আমি জানি।

ভাল কী! রীতিমত দুর্বল। কিন্তু আমার মনে হয় যে এখনো আশা আছে। কারণ পরিষ্কার করে ও এখনো কিছু বলা হয়নি। সুতরাং মনে হয় কখনই লেখাটা পরের অধ্যায়গুলিতে আরো ভাল হয়ে উঠবে। প্রথম পরিচ্ছেদ অবশ্যই একটা ভূমিকা,—কিন্তু তবুও এমন হওয়া চাই যেন পাঠকমনে একটা প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। সেটা হয়েছে কিনা আমার পক্ষে ঠিক বোঝা মুস্কিল। এখানে আমার একটিমাত্রই পাঠক,—আনা—লেখাটা তার যদিও খুব ভাল লাগছে কিন্তু এসব ব্যাপারে তার অভিমতের কোন দাম নেই।'

কী অন্যায়!

আরো পরের চিঠিতে :

'মাইকেল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আটকে গেছি,—আমার সব বুঝে যাচ্ছে। কী করা যায় বলো ত! আমি এখন একটা কোনমতে শেষ করতে পারলে বাঁচি। লেখাটা একেবারে নষ্ট হোক তা আমি চাইনা,—কারণ এটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু এখন আমি আর অতকিছু চাইনা,—সাফল্য ত নয়ই,—আমি চাই লেখাটা কোনোমতে পার হোক,—পাঠকের পড়তে খুব যদি ক্লান্ত না লাগে ত তাহলেই ঢের।'

প্রথম অংশ সম্বন্ধে কিছু পরে আবার :

'তুমি যে প্রথম অংশটা সম্বন্ধে কিছু লেখনি তার মানে আমি বুঝতে পারছি যে তুমি ভদ্রতা বলেই চুপ করে আছ। অপ্রিয় কথাটা বলতে চাও না। কিন্তু আমি যে সেইটিই চাই। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত এ যে কী জ্বালা তুমি বুঝতে পারবে না।'

পরের চিঠিতে :

'যাক, তাহলে অত নিরাশ হবার কারণ নেই বলছ! তবু ভাল। তোমার চিঠি পড়ে অনেক ভরসা পেলাম মনে, অনেক আশা জাগল। 'কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ বন্ধু, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষটা পড়ে তোমার কিরকম লাগে আমাকে অবশ্য অবশ্য জানাবে। শেষটা লিখতে লিখতে আমার খুব প্রেরণা এসে গিয়েছিল—তার মানে পর পর দুটো কীই। কিন্তু সে যাই হোক, আমার ভয় হচ্ছে যে শেষ দিকে হয় ত সঙ্গতি বা মাত্রা জ্ঞানটা বজায় নেই—হয়ত কিছু বেশি বলা হয়েছে,—সুতরাং জেনো, তোমার নিরপেক্ষ মতামত না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব না।'

শেষের দিকে এই চিঠিতেই :

"ইডিয়ট" নিয়ে আমার যে কি ভয়, কী দারুণ ভয়, তুমি কল্পনা করতে পারবে না। এ একটা অদ্ভুত ভয়, যা কখনো হয়নি।'

পরে :

'তোমার চিঠিতে "ইডিয়টের" সাফল্যের কথা শুনে আনা ত হুঁ পিয়ে কেঁদে ফেলল। বলল, আমার জন্য তার গৌরবের সীমা নেই।"

কিন্তু মাইকেল্, যাই লিখুন 'দি ইডিয়ট' ডস্টয়েভ্স্কির উপযুক্ত বই হয়নি। এই সময়ের আর একটি লেখা আছে, —'দি ইটারনাল্ হাসব্যাণ্ড্'। এটিকে একটি ছোট নভেল বলাই ভালো,—কিন্তু এ বইটি দারুণ। বনফুলের 'নক্-তৎপুরুষ' যদি পড়া থাকে ত এ বইটির ভাব বেশ সুন্দর বোঝা যাবে। তার পরের বই 'দি পসেস্ড্'—খুব লম্বা নভেল,—এবং এ বইটা লিখতে লিখতেই তাঁরা দেশে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে চারবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পারবর্তী সব-কেশগুলিও ধোয়া হল,—এবং শেষের দিকে, আমার ও ঘটেই, ডস্টয়েভ্স্কিরও বিদেশ আর ভাল লাগছে না। নূতন বই আরম্ভ করেছেন, কিন্তু,

'লেখা এত ধীরগতিতে চলছে যে বিরক্তিতে ক্লান্তিতে

আমার কেবল পাসপোর্ট হওয়া বাকি আছে। আমি বুঝতে পারছি যে এর কারণ হল রাশিয়া,—দেশে না ফিরলে আমার আর লেখা হবে না।'

অতএব জার্মানী, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড,—তাড়াতাড়ি সব দেশগুলিতেই কিছু কিছু কাটিয়ে চার বছর পর জুলাইর এক গরমের দিনে আবার দেখা গেল যে তাঁরা পিটার্সবার্গ ফিরে আসছেন। কিন্তু এবার আর দু'জন নন,—সঙ্গে আর একজন যাত্রী,—তাঁদের শিশুকন্যা সুবজ্‌। ইনিই এবী, এবং এঁর বই থেকেই পরে ডস্টয়েভ্‌স্কির পিতৃ-মূর্তিটি আঁকার কথা আছে।

কেবার এই দৃশ্যটুকু সুন্দর, যদিও ছোটো—এবং এটুকু আনার কলম থেকে :

'ওয়ুস্ স্টেশন চলে গেল। তার পর "হোলি ট্রিনিটি"র গির্জাও আমরা পার হলুম। এখানেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল। ফিয়ডর এবং আমি দুজনেই গির্জার দিকে ফিরে ক্রশ আঁকলুম। আমাদের দেখাদেখি আমাদের শিশু-কন্যা সুবজ্‌ও তার দুই ছোট হাতে ক্রশ করল।

'ফিয়ডরের এইসময়ের কথাগুলি আমার মনে পড়ছে! "তাহলে আনেচকা,—আমরা তাহলে আবার দেশে ফিরে যাচ্ছি। যদিও মাঝে মাঝে খুব দুঃসময় গেছে কিন্তু বিদেশে এই চারটে বছর আমরা ভালই কাটিয়েছি। এখন জানি না পিটার্সবার্গে আমাদের জন্য কী আছে। সমস্ত ভবিষ্যৎটাই এখন কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে সামনে এখনো অনেক দুঃখ, আরো দুর্দিন,—নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে আমাদের আরো দেরী। একমাত্র ঈশ্বরই ভরসা। তাঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।"

তা ত বটেই। মানবজীবন মানেই হল ভগবানের লীলা। তার উপর সত্য সত্য এতগুলি টাকা আবার দুয়ার দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এ সব কথার মানেই হল তাঁর উপর এবং নার্ভাস্ নেচার। নূতন পরিস্থিতিতে পড়বার আগে সেই বোবা ভয়, আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তা। যা সহজ মানুষের মনেও হঠাৎ ভয় ধরিয়ে দেয়ে। কিন্তু আনা প্র্যাক্‌টিকাল :

'আমি বললুম, আগে থেকে তা নিয়ে অত ভেবে কী হবে! আমরা যে আবার দেশে ফিরে যাচ্ছি, এইটাই বড় কথা।'

এটা ১৮৭১। ডস্টয়েভ্‌স্কির সামনে আর দশটি বছর। কিন্তু পরের এই দশটি বছর তাঁদের জীবন খুব শান্তিময় ছিল। পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও বটেই,—ডস্টয়েভ্‌স্কিরও যশ খ্যাতি মান মর্যাদা প্রতিপত্তি অর্থ,—মানে এককথায় সবই : যা একটা মানুষ সারাজীবনে কামনা করতে পারে। মৃত্যুর আগে ডস্টয়েভ্‌স্কির শেষ বই, 'দি ব্রাদার্স্ কারামাজোভ্'—অতি প্রকাণ্ড বই,—পৃথিবীর সাহিত্যে যে ক'খানা বই সার্থকতায় ও শ্রেষ্ঠতায় সমুজ্জ্বল, এ বই তার অন্যতম,—বিশিষ্টতম। মানবজীবনকে কেন্দ্র করে সারাজীবনে তাঁর মনে যত প্রশ্ন চিন্তা সমস্যা ও অভিজ্ঞতা তা তিনি এই বইতে এনে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও শিল্পীর বোধে বিচার করে একটা সমাধানে পৌঁছতে চেয়েছেন,—কিন্তু তাঁর যে বিশাল পরিকল্পনা ছিল, অর্থাৎ আরো বিস্তৃত পটে আরো বিস্তৃত পরিণতির মধ্যে পৌঁছানো, সেটি হয়নি,—তার আগেই মাত্র ষাট বছর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু। কিন্তু বইখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ,—পাঠকমনে কোথাও অপূর্ণতা বা আকস্মিকতার আঘাত বাজে না। ডস্টয়েভ্‌স্কি ক্রমশই নির্জন গতিতে যশের ও প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিলেন কিন্তু এই 'ব্রাদার্স্ কারামাজোভ'-এ এসে তাঁর নাম যেন জোড়া খ্যাতিতে হঠাৎ ফেটে পড়ল। পুনর্জিনের মৃত্যিসভায় দাঁড়িয়ে, সবচেয়ে আনন্দের কথা যে, নিজের চোখে এই সাফল্যের রূপ তিনি দেখে যেতে পেরেছেন। শিল্পীর জীবনে এর বড় সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কির লেখার গল্প যখন উঠল, কিছু আগে থেকেই ভালো। [ক্রমশ]

এদের ভবিষ্যত জীবন বীমার দ্বারা সুরক্ষিত ও আনন্দময়

দূরদর্শী ব্যক্তি তাঁর পরিবারের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জীবন বীমার সাহায্য নেন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬৲
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৪৷৷০
ভারত-আত্মার বাণী	৫৲
বুদ্ধবাণী	৷৷০
কর্ম্মবাণী	১৷৷০

মণি বাগচির

বিদ্যাসাগর	৭৲
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫৲
নিবেদিতা	৪৲
গৌতম বুদ্ধ	৪৲

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩৲
বাংলার মনীষী	১৷৷০
বাংলার বিদুষী	২৷৷০
বীরত্বে বাঙালী	১৷৷০
ব্যায়ামে বাঙালী	২৲
বিজ্ঞানে বাঙালী	২৷৷০
রাজর্ষি রামমোহন	১৷৷০
রবীন্দ্রনাথ	১৷৷০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১৷৷০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১৷৷০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১৷৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

[৫২২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করেছেন, মালেনকভ, বুলগেনিন, ক্রুশ্চভ। মালেনকভ তাদের মধ্যে অন্যতম।

এই একজালীন রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে বিরোধ গর্জায় যায়নি দেখে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বিবরণীর তাৎপর্য অনুধাবন করছিলেন। সেই সময়ে সংবাদ এলো মালেনকভ আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। অবশ্যের কি হয়েছে জানা যায় নি। তবে শোনা যাচ্ছে বুলগানিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। পরের সংবাদটি কি হবে তা কারোই অনধিগম্য নয়!!

কলকাতা করপোরেশনের অভিযোগ

কলকাতা করপোরেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। কলকাতা করপোরেশন, বিশেষ করে কলকাতার মেয়র—খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল নিরোধ, এবং খাটাল বন্ধ করা এবং করপোরেশন ট্যাক্সের হার পুনর্বিবেচনা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই সব বিষয়ে উদ্যোগী হয়েও তিনি কিছু করতে পারছেন না। জনকল্যাণকর কাজের উদ্যোক্তা ও কার্যক্রমের সুযোগ করপোরেশনের হাতে থাকলেও, আইন প্রণয়নের অধিকার করপোরেশনের হাতে নেই। এ অধিকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

কলকাতার মতো নাগরিক জীবনের পক্ষে উপরোক্ত বিষয় তিনটি সমান জরুরী। ভেজাল, ধী ও অন্যান্য ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষুধপত্রের ব্যবহারের ফলে কলকাতার নাগরিকেরা ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হারাচ্ছে। অথচ ভেজাল নিবারণের ন্যায় একটি জরুরী বিষয়েও সরকারী ঔদাসীন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে এক অমার্জনীয় বিচ্যুতি বলে আমরা মনে করি। খাটাল সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ট্যাক্সের পুনর্বিবেচনাও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশাকরি বিরোধীপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে করপোরেশনের জনকল্যাণকর উদ্যমকে বাতিল করার নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবেন।

ফারাক্কা বাঁধ

একজন বিরোধী পক্ষের বক্তার কণ্ঠে বাঁধ নির্মাণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যেরূপ জোরাল বক্তৃতা হওয়া সম্ভব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঠিক সেরূপ জোরাল ভাষায় গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন কলকাতার বন্দর রক্ষার জন্য, গঙ্গার জলের লবণাক্ত আধার দূর করবার জন্য, পশ্চিম বাংলার সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য, পশ্চিম বাংলার নদীগুলিতে জল সরবরাহের জন্য এবং—এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কল্যাণকর দিকের কথা বিবেচনা করেও গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণ যুক্তিযুক্ত।

এত জোরাল যুক্তির পরে বাঁধ নির্মাণের দ্রুত উদ্যোগের কথা শোনা যাবে আশা করা গিয়েছিল কিন্তু বাঁধ নির্মাণের কার্যকরী ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় ক্ষীণ কণ্ঠে উক্তি করেছেন যে সুযোগ উপস্থিত হলেই গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণে হাত দেওয়া হবে। অর্থাৎ গঙ্গায় বাঁধ একটি মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিকল্পনা,—তবে ভারত সরকারের আশু গুরুত্বের কোনো জরুরী পরিকল্পনা নয়। সুতরাং বাঁধ নির্মাণের মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যখন যথার্থ সুযোগ উপস্থিত হবে কেবলমাত্র তখনই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার কথা চিন্তা করা যাবে। বাংলার একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই উপেক্ষাও কি বাঙ্গালাকে অনিচ্ছা ও সন্তোষের সঙ্গে সহ্য করতে হবে?

৭।১২।৫৮

২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

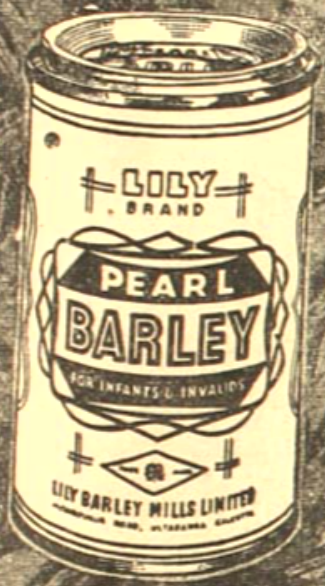

প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত

লিলি বার্লি

খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

উত্তরসূরী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। নবম সংখ্যা। পৌষ, ১৩৬৫।

বর্তমান প্রসঙ্গ

বিদায় ১৯৫৮

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে হয়তো নববর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। তবে আন্তর্জাতিক নববর্ষ হিসাবে জানুয়ারি মাস স্বীকৃত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। নানাদিক দিয়ে জগত যত পরস্পরের নিকট এগিয়ে আসছে, পরস্পর-নির্ভর হয়ে উঠছে, বিশ্বমানবের নববর্ষের হিসাবে জানুয়ারি মাসের গুরুত্ব তত বাড়ছে।

১৯৫৮ বিশিষ্ট হয়ে থাকবে নানাদিক দিয়ে। একদিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ-কল্পনীয় অগ্রগতির স্মারক স্পুটনিক। অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে একের পর এক পটপরিবর্তন ও মিলিটারি একনায়কত্বের আকস্মিক উত্থান। এমনকি প্রজাতন্ত্রের পীঠভূমি ফ্রান্সেও তীব্র মোড় ঘুরেছে জনসাধারণের চিন্তা; যার ফলে তিনি পুনঃ হয়ে উঠেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বের দিকে দিকে মানুষ প্রশ্ন মুখর হয়ে উঠেছে। এত দিনের লক্ষ্য কি যথার্থই অধিগম্য? একদিকে মানুষের বুদ্ধি ও মননা নূতন নূতন সীমারেখা অতিক্রম করে পাড়ি দিয়েছে অনন্ত নিঃসীম শূন্যলোকে, আর একান্ত পরিচিত বহুদিনের বাসভূমি এই পৃথিবী ক্রমশঃই হয়ে উঠছে তার বাসের অ-যোগ্য। আজ থেকে মাত্র আর পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে এমন সব জটিলতার সৃষ্টি করবে যাতে এতদিন ধরে মানুষ যে ব্যক্তিসত্তাকে পরম-মূল্যবান জ্ঞানে সুরক্ষিত করতে বহু যত্ন করেছে, হয়তো বা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রম-বর্ধমান আক্রমণ থেকে তাকে আর রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। ফলে যে মিলিটারি একনায়কত্ব আজ গণতন্ত্রের প্রধানতম শত্রু হিসাবে চরম আপাংক্তেয়, অদূর ভবিষ্যতে সেই হয়তো ব্যতিক্রম না হয়ে প্রত্যাশিত নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে। অন্ততঃ হাক্সলির মত একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবির বিশ্লেষণী

প্রতিজ্ঞা সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। আর ভারতবর্ষে মার্কিন, হুতাশন ও সর্বগ্রাসী বন্ধনার আগ্নেয়গিরির উপর বসে আমরা সেদিনারে, লোকসভায়, জনসভায় বার বার জপমন্ত্রের মত উচ্চারণ করছি "অন্ত জায়গায় যেখানে যাই হোক্ ভারতবর্ষে কখনোই একনায়কত্বের আবির্ভাব হতে পারে না, আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।" কিন্তু এই কল্পলোকচারী বিশ্বাসই কি আমাদের ত্রাণ পাবার শেষ অস্ত্র?

যে দীর্ঘ পথকে অতিক্রম করে এসেছে বহু মূল্য দিয়ে আবার যেন সেখানেই মানুষ ফিরে যাচ্ছে। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি-প্রবলতা হ্রাস পেয়ে অন্ধসংস্কার মূক অনুষ্ঠান ও জাঁকজমকে মানুষ যেন মেতে উঠছে; অর্থাৎ পুরোনো রক্ষাকবচে বিশ্বাস হারিয়েছে কিন্তু নূতন আশ্রয় এখনো খুঁজে পায়নি। তাই যেকোন ভাবে চিন্তাহীন তারল্যে দাঁতার দিয়ে দিন কাটিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েট রাশিয়া আসন্ন যন্ত্রবার্ষিকী পরিকল্পনার ফিরিস্তিতে বস্তুসত্তায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তার দিগ্বিজয়ী পাল্লা প্রস্তুত তাকে করে তুলবে তার ভবিষ্যৎ বিশ্বরূপে আবার বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। সুদূর মনে ১৯৪৯এর মুখেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহুদেহনে ফেলে স্বর্গলোকের দিকে যে পাড়ি দিয়েছে তার উচ্চাসার নিদর্শন স্বরূপ। স্বভাবতই শক্তির মদে ভারসাম্যের এই অসম্ভাব্য ভূমিকম্পের গুরু-গুরু এখনই শোনা যাচ্ছে। বার্নিনের বিতর্ক তার একটি কম্পন মাত্র।

১৯৪৯এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বস্তুতঃ দুটি বার ভবিষ্যৎ এজন্যেই স্থিত হয়ে আছে। তবু এখে ভেবেদেখে নিজের প্রয়োজনের অনুরূপ করতে মানুষ বিরত থাকবেনা, কারণ সে মানুষ, সে অসাধারণ।

লোকসভা ভাষা-কমিটির রিপোর্ট

লোকসভা ভাষা-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কমিটির রিপোর্টে মূলত হিন্দীর স্বপক্ষেই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। কমিটির মতে ১৯৬৫ সালের আগেই হিন্দীকে ইংরেজীর সহযোগীরূপে এবং ১৯৬৫ সালের পরে ইংরেজীকে হিন্দীর সহযোগী ভাষারূপে ভারতের সরকারী ব্যবহার স্থান দেওয়া উচিত। বিচার কার্যের ভাষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচার কার্যের ভাষা ইংরেজীই থাকবে। ভাষা কমিটির এই রিপোর্ট লোক সভায় বিতর্কের জন্য উপস্থাপিত করা হবে। এই রিপোর্টের উপরে যে তুমুল বিতর্ক হবে তা' নিঃসন্দেহ। ভাষা-কমিটির রিপোর্ট তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালায়োলমী ভাষা-গোষ্ঠী এবং বাংলা, উড়িয়া ও আসামী ভাষা-গোষ্ঠীর মনঃপুত হবে না। বস্তুতঃ, এরই মধ্যে এই সমস্ত ভাষা-গোষ্ঠীর মুখপত্রগুলি তাদের বিরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করেছে। হিন্দীভাষা অনগ্রসর এবং একটি বিশেষ অঞ্চলবাসীর ভাষা। এই কারণেই এই ভাষা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ আধিপত্য ও সুবিধা লাভের সুযোগ করে দেবে এই আশঙ্কা অহিন্দী ভাষীদের কাছে একটি বাস্তব সমস্যা। এ ছাড়া হিন্দীকে প্রধান সরকারী ভাষার মর্যাদা দিলে সরকারী ভাষার মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাও বর্তমান রয়েছে।

ইংরেজীর পক্ষে যুক্তি—ইংরেজী ঐতিহাসিক কারণে সর্বভারতীয় প্রশাসনতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক সংযোগের ভাষায় পরিণত হয়েছে। ইংরেজী একটি উচ্চমানের ভাষা—যা সর্ববিদ্যার পরিভাষায় সমৃদ্ধ এবং আন্তর্জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত। সুতরাং যে ভাষা জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সংযোগ ও ভাব বিনিময়ের বাহন এবং যে ভাষার ব্যবহারে শিক্ষিত ভারতীয় জন-সমাজের

সুবিধা ও অসুবিধা সমান সেই ভাষাকে নিছক বিজাতীয় ভাষার অনুপাতে আপাতদৃষ্টে কম অনেকের কাছেই যুক্তিসঙ্গত নয়। মাতৃভাষার প্রশ্নে হিন্দীর জোর সুর, দক্ষিণ ভারতীয় জনসাধারণের কাছে খুব ধনিষ্ঠ নয়। ইংরেজী ঐতিহাসিক কারণেই বিশ্বের অনেক জাতির ভাষারূপে মর্যাদা পেয়েছে। ভারতের ভাষা-বিন্যাস এবং ভাষার উৎপত্তির ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা স্মরণ রাখলে ইংরেজীকে বিজাতীয় ভাষা বলে বর্জন করে হিন্দীকে স্বজাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী খুব বাস্তব নয়।

হিন্দীকে জোর করে একাধিপত্যের উচ্চ আসনে চাপিয়ে না দিয়ে ১৯৬৫ সালের পরেও হিন্দী ও ইংরেজীকে ভারতের শাসন কার্যে সমমর্যাদার অধিকার দিয়ে ভারতের ভাষাদ্বন্দ্বের সমাধান করা সম্ভব। ইংরেজীকে হিন্দীর সহযোগী ভাষারূপে নয়, হিন্দী ও ইংরেজী উভয় ভাষাকেই সম অধিকার ও সম-মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। হিন্দীর শক্তি যদি বেশী হয় তবে একদিন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হিন্দী শ্রেষ্ঠের আসন লাভ করবে। ভাষার প্রশ্নটি ভারতের বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মনে যে কত প্রবল সেকথা লোকসভার সদস্য, বিশেষ করে, হিন্দীভাষী অঞ্চলের প্রতিনিধিদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লববাদের ভূমিকা

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতের প্রাক্তন বিপ্লবীরা দিল্লীতে সম্মিলিত হয়ে বিপ্লববাদের ইতিহাস রচনার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। এই মহৎ সংকল্প নিঃসন্দেহ ভারতের মুক্তিকামী জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করবে। বিপ্লববাদের ইতিহাস, ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রয়াস সরকারী স্তরে অতি স্পষ্ট। বিপ্লববাদের ইতিহাসকে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন স্থান দিতে রাজী নয়। শুধু তাই নয়, যে বিপ্লবীরা জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর ঐতিহ্য রচনা করেছেন সেই ঐতিহ্যের কোন ঘটনাকেও বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখাতে কংগ্রেস সরকার ইচ্ছুক বা অগ্রণী হননি। বিপ্লবীদের অমর কীর্তিগুলি আজও অবজ্ঞাত এবং কি আশ্চর্য বিশ্বের ঐতিহ্যও সরকারী প্রয়াসে আজও স্মরণীয় করা হয়নি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল তাঁর পক্ষে তা পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লববাদ এবং নেতাজী ও আজাদ হিন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় ডাঃ মজুমদারকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের পছন্দমত এক ব্যক্তির উপর স্বাধীনতার ইতিহাস সঙ্কলন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী এবং অহিংস আইন অমান্যের অবদানের কথা অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করার মত মানসিক সংকীর্ণতা কোন বিপ্লবীর নেই। কিন্তু বিপ্লববাদের অবদানকে অস্বীকার করার যে মনোভাব কংগ্রেসী নেতৃবর্গ প্রদর্শন করছেন তা শুধু দুঃখজনই নয়, ভারতের জাতীয় ইতিহাসের প্রতি গভীর ভাবে অমর্যাদাকর। গান্ধী নেতৃত্বের আবির্ভাবের আগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লববাদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। গান্ধী আন্দোলনের সমসময়েও বিপ্লববাদী আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ে নেতাজী ও আজাদ হিন্দের বিপ্লবী প্রয়াস সর্বজন বিদিত এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাই কংগ্রেস নেতৃবর্গের দ্বারা অস্বীকৃত।

বিপ্লবী সঙ্ঘের বিপ্লববাদের ইতিহাস রচনার যে

সরকার গ্রহণ করেছেন তা' সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সময়োচিত হয়েছে। বিপ্লববাদের বিভিন্ন ঘটনাবলী তথ্য ও কাহিনী সংগ্রহ করে উপযুক্ত ঐতিহাসিক মর্য্যাদার উপরে তথ্য-নির্ভর ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার ভার অর্পণ করা প্রয়োজন। সম্মেলন বিপ্লববাদের ইতিহাস রচনার সঙ্গে বৈপ্লবিক ঘটনাবলী এবং বিপ্লবী শহীদদের স্মৃতি রক্ষার যে দাবী করেছে তা'ও অত্যন্ত সঙ্গত বলে আমরা মনে করি।

ভারতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন

এসিয়ার বিভিন্ন দেশে একে একে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র ভারতই এখন গণতন্ত্রের শেষ আশাস্থল। গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রয়োগের একটি প্রধান উপায় নির্বাচন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরিচালনা। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে প্রায় সত্তের কোটি ভোটার যেভাবে ভোট দিয়েছে তা'তে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ও উৎসাহের সঙ্গত কারণ রয়েছে। জনসাধারণ নির্বাচনে যেরূপ শান্তির মনোভাব ও শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছে এবং নির্বাচনী কমিশন যেরূপ নিরপেক্ষ ও যোগ্যতার সহিত নির্বাচন পরিচালনা করেছেন যে কোন জাতির পক্ষে তা' গৌরবের বিষয়। ভারতের ন্যায় গণতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে অনভিজ্ঞ দেশের পক্ষে এ আরও গৌরবের কথা।

ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা আশাপ্রদ ভাবে পরিচালিত হলেও সেই সঙ্গে আমরা কতগুলি আশঙ্কাও সৃষ্টি হয়েছে। এই আশঙ্কা নির্বাচনী ব্যয় ও জালভোট সম্বন্ধে। নির্বাচনী ব্যয়ের মাত্রা এত বেড়ে যাচ্ছে যে সৎ ও সুযোগ্য কিন্তু অর্থহীন ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচন দ্বন্দ্বে প্রার্থী হওয়া এবং সফলতার সহিত নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনী ব্যয় সংকোচ করবার পরিবেশ যদি সৃষ্টি না হয় তবে ক্রমশঃ যথার্থ যোগ্য জনপ্রতিনিধি অপেক্ষা বিত্তবান শ্রেণীর ব্যক্তিরাই সকল আসন দখল করে বসবে। এই দিক থেকে বিবেচনা করে নির্বাচনে নিয়তম ব্যয়ের সীমা তুলে দেওয়ার যে সুপারিশ নির্বাচন কমিশন করেছে তা' সম্পূর্ণ অ-গ্রহণযোগ্য। বরং অতিরিক্ত নির্বাচনী ব্যয় কিভাবে রদ্দনীয় করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন। এ ব্যতীত ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে ভোটারের নম্বর ও ভোটদান কেন্দ্রের ঠিকানা ইত্যাদি সহ স্মারণিক কার্ড প্রতিভোটারের নিকট সরকারি ব্যবস্থা ও ব্যয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। এব্যবস্থায় প্রার্থীরা বড় একটা ব্যয় হতে বেঁচে যান্। ভারতবর্ষে এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন না করবার পক্ষে কোনো কারণই আমরা খুঁজে পাইনা। নির্বাচন পরিচালনা রাষ্ট্রের একটি অবশ্যকরণীয় কাজ, তার দায়িত্ব ও ব্যয় সরকারের গ্রহণ করার পক্ষে নিঃসন্দেহ যুক্তি প্রবল।

সম্প্রতি জাল ভোট আর একটি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। গত দুইটি সাধারণ নির্বাচনে এবং কতকগুলি উপনির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই জয়-পরাজয় নির্ণয়িত হয়েছে জাল ভোটের দ্বারা। সম্প্রতিকালে জাল ভোট রোধ করবার বাস্তব উপায় উদ্ভাবন করা একান্ত প্রয়োজন। ভোট দাতাদের টিকা দেওয়ার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। কি ভাবে জাল ভোট রোধ করা যায় সে সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

লোক প্রতিনিধিদের দাবী

লোকসভার সদস্যদের পক্ষে জনসংযোগের সকল রকম সুযোগ থাকা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহের পক্ষে যাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে

সেদিকে দৃষ্টি রাখাও বাঞ্ছনীয়। লোকসভার সদস্যদের জন প্রতিনিধিরূপে জনসেবা করার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাদানের দাবীর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি উঠবে না। কিন্তু লোকসভার সদস্যদের সুযোগ সুবিধার যে নূতন দাবী উত্থাপিত হয়েছে তাতে জনসাধারণ বিস্মিত না হয়ে এবং বিরক্তিবোধ না করে পারবে না।

লোকসভার সদস্যেরা বর্তমানে মাসিক ৪০০৲ টাকা বেতন পান এবং লোকসভার অধিবেশন চলা কালে দৈনিক ২০৲ টাকা করে ভাতা পান। সামান্য ব্যয়ে নির্দিষ্ট যানস্থানেরও সুব্যবস্থা রয়েছে। ইহা ব্যতীত লোকসভার সদস্যেরা ভারতবর্ষের যে কোনস্থানে যাতায়াতের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর পাশ এবং একজন সহকর্মীর জন্য একটি তৃতীয় শ্রেণীর পাশ পান। এই ব্যবস্থার উপরও কিছু সদস্য আরো দাবী করেছেন, লোকসভার সদস্যদের বেতন বাড়িয়ে ৫০০৲ টাকা এবং দৈনিক ভাতা বাড়িয়ে ৩০৲ টাকা করা হোক। বিমানে যাতায়াতের এবং প্রতি সদস্যের জন্য একটি স্থায়ী কর্মচারী ও একজন ষ্টেনোগ্রাফার রাখার ব্যবস্থা করা হোক। কোন কোন ক্ষেত্রে বিমানে যাতায়াতের সুযোগ দানের বিষয় বিবেচনা-যোগ্য হতে পারে; কিন্তু অন্য সমস্ত দাবীগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য—যে এই সব সদস্যদের মনেরাখা উচিত তাঁরা কোন বিশেষ দেশ ও জাতির প্রতিনিধি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের এই মনোভাবকে আমরা লজ্জাজনক বলে মনে করি।

বিপ্লবী ডাঃ তারকনাথ দাসের লোকান্তর

সুপরিচিত বিপ্লবী এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ডাঃ তারকনাথ দাস ৭৪ বৎসর বয়সে আমেরিকায় পরলোক গমন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে যে কয়জন বিপ্লবী চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন লোকান্তরিত ডাঃ তারকনাথ দাস নিঃসন্দেহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে। বিদ্যা লাভের প্রয়াস অসমাপ্ত রেখেই তিনি ছাত্র জীবনে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। বিপ্লবী সংগঠনের কাজ এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তরুণ কর্মী রূপে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ১৯০৫ সালের পরে আরও কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি ভারত ছেড়ে বাইরে চলে যান। আমেরিকায় গিয়ে তিনি আবার শিক্ষা জীবন শুরু করেন এবং উপযুক্ত ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন। মৃত্যুকালে তিনি কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আমেরিকায় গিয়েও তিনি ভারতের প্রবাসী বিপ্লবী সংস্থা, বিশেষভাবে গদর পার্টির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীরা যে বিপ্লবী প্রচেষ্টায় অগ্রবর্তী হন ডাঃ তারকনাথ দাসও সেই প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু বিপ্লববাদের প্রয়াসেই নয় ভারতীয় যুবকদের কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যও তিনি সচেষ্ট হন। তাঁর প্রয়াসে বহু ভারতীয় ছাত্র বাইরে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। তিনি ভারতীয় চিন্তাধারাও বহির্ভারতে প্রচার করার জন্য বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। ভারত বিদ্যা ডাঃ তারকনাথকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাহত করে।

আমরা পরলোকগত এই স্বদেশ-প্রাণ বিপ্লবীর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

নাসপুরে অনুষ্ঠিত এবারকার নিখিল-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। অধ্যাপক বসু প্রবিত্তক

বিজ্ঞানী। তিনি বাস্তবতার একনিষ্ঠ সাধক। বিজ্ঞানীকে সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসনে বসিয়ে নিখিল-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন এই সত্যটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন যে বিজ্ঞান ও সাহিত্য পরস্পর-বিরোধী নয়। বস্তুত বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যুগ্মসঙ্গ ব্যতীত জীবনের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান সন্ধান করে প্রকৃতির তথ্য ও তত্ত্ব, প্রকৃতির উদ্‌ঘাটিত ও অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য। বস্তুর বিশ্লেষণে বিজ্ঞানী যে তথ্যের সন্ধান পান, সেই তথ্যের নিপুণ প্রয়োগে শিল্পী ও সাহিত্যিক জীবনকে সুন্দর ও রমণীয় করে তোলে জীবনের বিচিত্র অনুভূতির নূতন নূতন অনাবিষ্কৃত দিক্‌সীমা খুলে দিয়ে। কেবলমাত্র বাস্তব-রসে যেমন সাহিত্য হয় না, হয় অন্য কিছু, তেমনি শুধু কল্পনাও কোন রাষ্ট্রতন্ত্রকে জয়ের উপরে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে পারে না। বাস্তব ও কল্পনা, এই দুইয়ের সুষম মিশ্রণেই সৃজনশীল সাহিত্য গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানের অবদানে যে শুধু সাহিত্যেই বাস্তবতার স্পর্শ আসে তাই নয়, বিজ্ঞানও সাহিত্যের স্পর্শে মানব-ধর্মী হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি সাহিত্যের প্রভাবকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানের পক্ষে সৃষ্টিধর্মী হওয়াও সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গতি একই দিকে। পরস্পরের আলোতেই উভয়ের যাত্রাপথ আলোকিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন—কবি ও বিজ্ঞানীর গতি একই দিকে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে কবি পথের কথা ভাবেন কিন্তু বিজ্ঞানী পথ চলতে চলতে পথেরও সন্ধান করে।

নিখিল-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন এই সত্যকে নূতন করে আমাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য ধন্যবাদার্হ।

সিংহলে ভোটাধিকারের বয়স হ্রাস

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অনুকরণে ভারতবর্ষ ও সিংহলে ভোটাধিকারের নিম্নতম বয়স ছিল ২১ বৎসর। সম্প্রতি সিংহল সরকার ভোটাধিকারের বয়স এক লাফে ছয় বছর কমিয়ে ১৮ করেছেন। ভারতবর্ষ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সংসদ প্রার্থীর বয়স অন্তত ২৫ বৎসর হওয়া চাই। সিংহল সংসদপ্রার্থীর বয়সের সীমা ২১ বৎসর করার পক্ষপাতী। বয়স হ্রাসের ফলে অপেক্ষাকৃত তরুণেরা ভোটদানের ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তরুণদের এই আবির্ভাবে, ভাবাবেগের প্রভাব ও অভিজ্ঞতার অভাবের পরিচালনে ও অস্থিরতাই দেখা যেতে, যা রাজনীতিতে সততা ও আদর্শানুগত্য বৃদ্ধি পেয়ে রাজনীতি পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর হয় দেখবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে থাকবো।

সামাজিক সমস্যায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ

কলকাতায় গত ৮ই ডিসেম্বর হতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউনেস্কো ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্ত-প্রচেষ্টায় দক্ষিণ এশিয়ার ১৩টি দেশে শিল্পায়নের সামাজিক ফলাফল বিচার বিশ্লেষণের জন্য আঞ্চলিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সেমিনারে উপরোক্ত ১৩টি অঞ্চলের এবং রাষ্ট্র সঙ্ঘের সমাজ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞেরা নানা বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল বিবৃত করেন।

তাঁদের সকলের বক্তব্যেই একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে এই অঞ্চলে তথ্যের অ-প্রতুলতা ও তথ্য সংগ্রহের অসুবিধা প্রচুর। অথচ এই অঞ্চলগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। আর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য

প্রাথমিক প্রয়োজন তথা। আর একটি অনুবিধার বিষয় সেমিনারে উল্লিখিত হয়েছে যে এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামে মেয়েদের গতানুগতিক ভূমিকা তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের অন্তরায় স্বরূপ অথচ এই অন্তরায় দূর না হলে যথার্থ পরিবর্তন আসাও সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে ইউনেস্কো রিসার্চ সেন্টারের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডাঃ ডার্লিন দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার এবং সন্তানদের উপর অশিক্ষিত মায়েদের প্রভাবের অকুফলের দিকে দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছেন। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্যিক বিভাগগুলির পরস্পর সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই সেমিনারের উপযুক্ত প্রচার হয়নি এবং সমাজ-কর্মীদের অতি অল্প সংখ্যকই এতে যোগ দিয়েছিলেন।

নূতন খাদ্যনীতি

১লা জানুয়ারী থেকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নূতন খাদ্যনীতি চালু হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী উৎপাদক—সহরে চাউল কলগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে—পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে মোটা, মাঝারী ও মিহি চাউলের উচ্চতম দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং ধানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চদরকেই সর্বনিম্নদর বলে ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। নূতন খাদ্যনীতি চালু করার পর বাজারে ধান চাউলের অভাব দেখা দিয়েছে এবং মিহি ধরে বিক্রির বাধ্যবাধকতাও বিক্রেতারা অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। নূতন নীতি অনুযায়ী চাউল-কলের উৎপাদিত চাউলের শতকরা পঁচিশভাগ সরকার সংগ্রহ করবেন এবং এইভাবে এক লক্ষ টন চাউল পাওয়া যাবে বলে সরকার মনে করেন। তাছাড়া উড়িষ্যা থেকে আড়াই লক্ষ টন চাউল ও একলক্ষ টন ধান সংগৃহীত হবে বলে জানা গেছে।

এ বছর পশ্চিম বঙ্গে প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়েছে বলে সরকার মনে করছেন। এই সঙ্গে উড়িষ্যার চাউল ও মধ্যপ্রদেশ থেকে চাউলের সম্ভাবিত সংগ্রহ যোগ করলে এবছর পশ্চিম বঙ্গে মোট চাউলের সরবরাহের পরিমাণ প্রায় উনপঞ্চাশ লক্ষ টন হতে পারে। সেক্ষেত্রে চাউলের অভাব হওয়া উচিত নয় এবং নূতন খাদ্যনীতি ব্যর্থ হওয়াও উচিত নয়।

কিন্তু কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে এই নীতি বানচাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার কতটা দৃঢ় মনোভাব দেখাবেন এবং কতটা তৎপরতার সঙ্গে এই ধরণের কৃত্রিম সঙ্কট এড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকবেন তার উপর নির্ভর করবে নূতন নীতির সাফল্য।

নূতন নীতিতে চাউল কল, আড়তদার, পাইকার ও খুচরা বিক্রেতা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রতিটি মুনাফার অংশ একযোগে নির্দিষ্ট করবে। এই চক্রে একপ্রান্তে যে চাউলকলওয়ালা সে-ই যদিনাবে, যেমনে ছদ্মবেশে পাইকার ও খুচরা বিক্রেতা হয়ে চাউলের ব্যবসা অন্তত পাইকার ও অন্তত খুচরাবিক্রেতাকে কোণঠাসা করে উচ্ছেদ করবার প্রয়াস পাবে। এটা সম্ভব কি

তুলতে পারলে মাত্র কয়েকটি চাউলকলওয়ালা—পাইকার আড়তদার ও খুচরাবিক্রেতার চক্রে চাউলের ব্যবসায় সীমাবদ্ধ হয়ে এই ব্যবসায়কে একচেটিয়া ব্যবসায়ের নাগপাশে বেঁধে ফেলবে। সেই সময় যদি সরকারের হাতে প্রচুর খাদ্য মজুত না থাকে তারা একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না। পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায়ও এই সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সরকার কোন আশ্বাস দিতে পারেননি।

উৎপাদিত ফসলের শতকরা পঁচিশ ভাগ বাজারে বিক্রি হয় অশোক মেহেতা কমিটির এই অভিমত। এবার পশ্চিম বাংলার উৎপাদন ন্যূনপক্ষে চল্লিশ লক্ষ টন হিসাবে বাজারে দশ লক্ষ টন বিক্রির জন্য থাকবে। সরকার তার মাত্র শতকরা দশ ভাগ সংগ্রহ করবেন। সরকার যদি এই উদ্বৃত্তের শতকরা পঁচিশ ভাগ সংগ্রহ করেন তবেই মুনাফাবাজদের এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে খাদ্যনীতি অপরিবর্তিত রাখতে পারবেন।

জাতীয় স্বাস্থ্য :

কটকে নিখিল ভারত ম্যাজিক্যাল এসোসিয়েশনের বাৎসরিক অধিবেশন গত ২২শে ডিসেম্বর থেকে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডাঃ সি, ও, কল্যাকরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হোল। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ সহ প্রায় ১২০০ প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে নয়টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রস্তাবগুলি এই রূপ :

(১) ভারতবর্ষের ক্রমবর্দ্ধমান জন্মহারে সম্মেলন বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতীয় ম্যাডিকেল এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতিকে ইহা রোধ করার জন্য জনপ্রিয় উপায় উদ্ভাবনের অনুরোধ করেছে।

(২) এদেশে এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধগুলির আমদানীর উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করায় জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে অবস্থার পরিবর্তন দাবী করা হয়।

(৩) অন্য একটি প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় যে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানশিক্ষা, জনসাধারণের চিকিৎসায় সহায়তা, জন-স্বাস্থ্য, চিকিৎসা শাস্ত্রে রিসার্চ

প্রভৃতি বিষয়ে সাগ্রহ সহায়তার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভারতীয় মাডিকেল এসোসিয়াশনের সাহায্য পরিকল্পনা-কমিশন, কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যসরকারগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অপর প্রস্তাবগুলিতে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সপ্তাহ, চিকিৎসকদের বেতনের হার, মাডিকেল কলেজ গুলিতে নিযুক্ত মাহিনা-ভোগী সর্বক্ষণের ডাক্তারদের পক্ষে প্রাইভেট চিকিৎসা নিষেধ ও বিভিন্ন রাজ্যে চিকিৎসকদের ঘাটতি দেখাদিলে রাজ্যের বাহির হ'তে চিকিৎসকদের নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করবার জন্য আইন প্রণয়নের দাবী জানানো হয়।

উপরোক্ত সর্বভারতীয় সম্মেলন ব্যতীত জাতীয় জনস্বাস্থ্য সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্তব্য করেন যে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য চিকিৎসকদের গ্রামের অবস্থা ও গ্রামবাসিদের মনস্তত্ত্ব জানা অত্যাবশ্যক। এজন্য চিকিৎসা-বিদ্যার্থীদের পাঠ্য-তালিকায় পল্লী-স্বাস্থ্য বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

স্বাস্থ্যহীনতার ভয়াবহতা সহজেই কল্পনা করা যায়—ভারতীয় মাডিকেল এসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার প্রকাশিত পুস্তক হতে যখন জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও হাইস্কুলে যথা ক্রমে মোট ২৩২১৩৯৬ ও ৭৮৫৫৫৯ ছাত্র-ছাত্রী পড়ে তাদের মধ্যে শতকরা ষাট জনেরই স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এবং এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে পুষ্টির অভাব। যার ফলে এদেরমধ্যে রক্তের ব্যাধি, দৃষ্টিহীনতা, দাঁতের অসুখ ও শরীরে বৃদ্ধির অভাব দেখা যায়।

ফাঁকির রাজত্ব :

কেবলমাত্র স্বাস্থ্য নয় জাতির মানসিকতার বুনিয়াদ রচিত হবে যার প্রসাদে সেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় চলেছে বহুদিন ধরে। একজন গুণী শিক্ষকের স্থান পূর্ণ হয়ে সদ্যজাতদের শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠে, এমনকি প্রেসিডেন্সি কলেজের মত নামী কলেজেও। শিক্ষকতার মানও ক্রমশঃ নিম্নগামী। বিখ্যাত বিজ্ঞানী জে, বি, এস হেলডেন সম্প্রতি পরিষদের সাম্প্রতিক কোনো অধিবেশনে মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষে পুরোদমে জাতি ভেদ লোপ পাবার পূর্বেই নূতন ধরণের জাতিভেদ দেখা দিয়েছে। তার জন্মদাতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। তার সঙ্গে যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সুপারিশ থাকে তবে যে কোনো উচ্চ-পদে প্রার্থীর নির্বাচন ও প্রবেশ অনিবার্য। এভাবে বহু অযোগ্য ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ফলে, জাতির ভালমন্দ নির্ভর করে যে সকল প্রতিষ্ঠানের উপর তার মর্যাদা শুধু ক্ষুণ্ণই হতে বসেনি, জাতির মানসিকতার ভিত্তি-স্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রেও এর কুফল অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই আত্ম প্রকাশ করেছে। এই সব অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষায় প্রদারতার জন্য আগ্রহ থাকুক্ বা না থাকুক্ উচ্চপদ অধিকার করবার মৌলতে সরকারী অর্থে দেশ বিদেশে ভ্রমণ এবং ঐশ্বর্যসম্ভার বৃদ্ধি পুরোদমেই হয়ে থাকে। যদিও এঁদের মৌলিকদান অথবা গবেষণার সামান্য পরিচয়ই দেশ পেয়ে থাকে। ভারত-দরদী অধ্যাপক হেলডেন ভারতের ভবিষ্যৎ চিত্র দেখে রীতিমত শঙ্কিত হউন—এই অবস্থার আশু পরিবর্তন হইবার লক্ষণ আমাদের তো চোখে পড়ছে না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই ফাঁকি জিনেহেলন বৃদ্ধি আবিষ্কার করেছে এবং এ সম্বন্ধে তিনি তীব্র মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সংশোধনের কোনো উপায় বাৎলে যেন নি। কিন্তু জাতির সর্বস্তরে এই ফাঁকি জমে উঠে সমস্ত জাতিকে

যে. যন্ত্রের পথে এগিয়ে নিচ্ছে তাকে ঠেকাবার উপায় চিন্তা করবে কে ?

নিছক মাল-মসলার উপর ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করলে সে যেমন নড়বড়ে ও অল্পকালস্থায়ী হতে বাধ্য তেমনি বিভিন্ন কক্ষযুক্ত আস্ত একটা পরিকল্পনার সৌধটী শেষ পর্যন্ত গড়েওঠে অন্যান্য সম্পদের ভিত্তিতে শুধু নয়, যন্ত্র-বিউম্যান রিসোর্স—যন্ত্রের সম্পদের-উপর। অথচ খাদ্যে, শিক্ষায় জীবন ধারণের নিম্নতম সঙ্গতিতে চরম অভাব এদেশের মানুষকে নিরন্তর কুরে কুরে খাচ্ছে। তার উপর দুঃসহ ব্যয়বহুল পরিকল্পনার সৌধ গড়ে উঠবে কি ভাবে ? হিউমেন রিসোর্সে উন্নতি বিধানের জন্য একদিকে প্রয়োজন সুচিন্তিত ও সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থাগ্রহণ ও তার প্রয়োগে আন্তরিক প্রয়াস; অপর দিকে জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্খা।

কর্ম সংস্থানে কুটীর শিল্প :

ভারতবর্ষে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ষোলকোটীর উপরে। কিন্তু সাত কোটিও পুরো কাজ পায় না. বাকী নয় দশকোটি কর্মপ্রার্থীর মধ্যে বেশ কিছু বেকার, কিছু আংশিক ভাবে কর্মে নিযুক্ত, আর কিছু বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে। এই বিপুল জন-সংখ্যাকে কুদ্র ও কুটীর শিল্প ব্যতীত কোনো ভাবেই কর্মে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে শিল্প উন্নত দেশগুলির নজীরও রয়েছে। জাপান, সুইজারলেণ্ড, বৃটেন এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত অর্থনৈতিক কাঠামোতে কুদ্র ও কুটীর শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎশিল্পের দেশেও বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কুদ্রও কুটীর শিল্পে পাঁচগুণ লোক নিযুক্ত হয়। কিন্তু এ সব দেশে বৃহৎ কুদ্রও কুটীর শিল্পের পারস্পরিক ভূমিকা অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যাতে এই উভয় শ্রেণীর শিল্পে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীতা না থাকে। বরং তারা পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করে থাকে। ভারতবর্ষে বৃহৎও কুদ্র শিল্পের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়াতে শিল্পের উভয় দিকই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শুধু তাই নয়, একদিকে কুদ্র ও কুটীর শিল্পের সুষ্ঠ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠতে পারছে না এবং অপর দিকে কুটীর শিল্পকে বাঁচাবার তাগিদে হাতে চলা তাঁত ও খদ্দর ইত্যাদির অতিরিক্ত ব্যাপ্ত ব্যবহারের জন্য মিলের কাপড়ের উপর বিশেষ কর বসিয়ে যেই অর্থ রিবেট স্বরূপ দেয়া হচ্ছে। এতে কুটীর শিল্পে অর্থনীতি বিরুদ্ধ কৃত্রিম মূল্য নির্ধারণ করে একটি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি ফলে উৎপন্ন কাপড়ের উপর বেশী দাম ধরার ফলে এই গরীব-দেশের জনসাধারণ তাদের স্বল্প আয় থেকে অযথা বঞ্চিত হচ্ছে।

১৯৫৭ সনের আমদানী রপ্তানীর হিসাব থেকে দেখা দেখা যায় যে এবৎসরে প্রায় বার কোটি টাকার মত হাতে-তৈরী জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয়েছে। যদিও মোট রপ্তানীর তুলনায় এই পরিমান সতকরা ৬ ভাগের উপর কিছুতেই নয় তবু শিল্পোন্নতির একটি সামগ্রিক নীতি গ্রহণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের উপরেই স্থায়ী বেকারিত্ব দূর, কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপন্নদ্রব্যের মূল্য হ্রাস সম্ভব। আশা করি সেদিকে পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে দৃষ্টি দেবেন।

৩১।৪৯

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ

গণতন্ত্রের যাত্রা ও ফ্যাসিজমের মোহ

প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

পাকিস্তানের বিপ্লব উপলক্ষ্যে আজকাল অনেকে রাষ্ট্রনীতিতে একনায়কত্বের স্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন। এ যাবৎ দুর্নীতি দমনে এবং জন সাধারণের জীবনযানে উন্নয়নে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার অপারগতায় ইহারা অতি-মাত্রায় অসহিষ্ণু হইয়াছেন।

অন্যায় অঘটনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গণতন্ত্রে আশু-ফলপ্রদ ফল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া হতাশ হইয়া কি শেষে গণতন্ত্রকেই বিনাশ করিতে হইবে, করিয়া-বুদ্ধস্থায়ী একটি বিরাট অন্যায়, তথা কোন মহা-প্রভুর অধিতীয় স্বৈরাচারকে আবাহন করিয়া আনিতে হইবে?

গণতন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রজাল সাধিত হয় না, কিন্তু দেশের ও দশের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের সুসমন্বয় এক গণতন্ত্রেই হইতে পারে। প্রতি লোককে গণতন্ত্র সজাগ ও সতর্ক হইতে শিক্ষা দেয়, প্রত্যেককে, অল্পীয়ান পরিমাণে হইলেও, দেশশাসনে নিয়ামক ও ভাগীদার করে এবং এই ভাবে তাহার আত্মমর্যাদা এবং আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করে। যাঁহারা আত্মসম্মানবোধশূন্য, সমাজহিতে যাহাদের অনুরাগ নাই, ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রনেতা সদয় থাকিলে তাহারা ডিক্টেটরশিপের অধীনে চোখ কান বন্ধ করিয়া কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কিন্তু ডেমোক্র্যাসির শিক্ষা ও উদ্দেশ্য ইহা নহে। ডেমোক্র্যাসির উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রগঠন এবং সমাজের প্রতি মমত্ববোধের বিস্তৃতি—অর্থাৎ যে সকলের অভাবে গণতন্ত্র সফল হয় না বলিয়া বিজ্ঞেরা বহু আখির করিয়া থাকেন, গণতন্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে আপনিই অবশ্যি-ভিলম্বে সে অভাব নিরাকরণের পথ প্রস্তুত হইতে থাকে। কোন অধিতীয় প্রভুর চাবুক সঞ্চালনে গণমানবের উৎকর্ষ হইতে পারে না। ডিক্টেটরী ব্যবস্থায় ডিক্টেটর স্বয়ং যে নিজেকে একমাত্র চরিত্রবান দেশপ্রেমিক, এবং বাকি সকলে মাত্র কাঠের পুতুল কিংবা ভেড়ার পাল বলিয়া মনে করেন বলিয়া মিলের যে উক্তি আছে, তত্ত্ব হিসাবে তাহা চিরস্থায়ী সত্য। অর্থাৎ ডিক্টেটার নিজেকে সর্বজন সম্পন্ন ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান এবং সেই অনুপাতে অন্যেরা নিকৃষ্টতর জীব বলিয়া মনে করেন।

ডিক্টেটরী স্বৈরতন্ত্রের আদর্শ কৌটিল্য সংহিতায় ভাল রকমে পাওয়া যায়—তাহার অধিকাংশ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া রকমারি শাস্তির খুঁটিনাটি বিবরণ যাহা আছে তাহা জানিলে অবাধ্যপ্রজা—আঁৎকাইয়া উঠিয়া বিশ্বাবাধ্য ডিক্টেটর সংকলিত শৃঙ্খলার আওতায় বাধ্য হইয়া থাকিবে।

আমরা শ্মশানের কিংবা কবরখানার শৃঙ্খলা ও সুযোগ চাই না, তাহা অপেক্ষা বাঁচিয়া থাকুক আমাদের সংবিধান তাহার যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, বাঁচিয়া থাকুক কিছু-দিন অভাব মোচনের জন্যে আমাদের অভিযোগ ও চেঁচার কোলাহল। স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে আমাদের এই ভাল—

আমরা ঝগড়া করিব—কাহার দোষ ঢাকিয়া কথা বলিব না—অশান্তি থাকিবে, কিন্তু চেষ্টাও থাকিবে সমবেত ভাবে আগাইয়া যাইবার, আঘাতে আগাইয়া যাইব—এমন দিন আসিবে যখন অসংখ্যের মধ্যে বাস্তবিকতার তীব্রতা অস্পষ্ট হইবে—বহু অনেক কষ্টে অনেক দুঃখের পর, তথাপি উন্নত মস্তকে দৃঢ়চিত্তে স্বাধীনতা না হারাইয়া মানুষ অন্ততঃ মর্য্যাদা না হারাইয়া আমরা যাহা এখন চাহিতেছি তাহা প্রায় সব পাইব, সেই পাওয়াটাই হইল আসল পাওয়া, যথার্থ, উপযুক্ত স্বাধীন মানুষের মত পাওয়া—তাহাতে দেরী হইতে পারে, দুঃখ নাই কারণ ব্যক্তির আয়ু অল্পকালের হইলেও দেশ এবং জাতির জীবন অনেক বেশী—দেশ ও জাতি তাহাদের আদর্শের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে। ইংরাজীতে একটি প্রচলিত কথাই রহিয়াছে "Good Government is no substitute for self-government"—বড় শাসনের শৃঙ্খলা চাহিয়া কি স্বাধীনতার মর্য্যাদা বিসর্জন দিব?

সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত যদি জনসমাজের প্রত্যেক লোকের ভোটের উপর প্রতিটি আইন রচনা নির্ভর করিত—যদি প্রতিনিধিমূলক লোকসভা তুলিয়া দিয়া সমগ্র প্রজাসাধারণের একটি সমাবেশ রাষ্ট্রের জন্য বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিত। তাহা হইলে দেশে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে কার্য্যকরী হইত। কিন্তু বলাবাহুল্য আমাদের এই বিশাল দেশের বিপুল জনতার পক্ষে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অসম্ভব। একই কারণে সুইটজারল্যাণ্ডের কয়েকটি প্রদেশ ছাড়া গণতন্ত্রের এই আদর্শরূপ পৃথিবীর কোথাও বাস্তবাকার ধারণ করে নাই।

পৃথিবীর অন্যত্র যেখানেই গণতন্ত্র বিরাজ করিতেছে সেই খানেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র অর্থাৎ Parliamentary Democracy বিদ্যমান। সাধারণ মানুষকে তাহার মনুষ্যত্ব এবং সমাজ জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন রীতি বা বিধিব্যবস্থা অদ্যাবধি উদ্ভাবিত হয় নাই।

গণতন্ত্র আমরা চাই বা বলিব না, বরঞ্চ বলিব গণতন্ত্র আমরা আমাদের জীবনে আরও সম্পূর্ণ ভাবে চাই। শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ক্ষমতাপন্ন হইলে সাধারণ মানুষের চলিবে না, পরন্তু সামাজিক বিষয়ে, ও আর্থিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মর্য্যাদা—মূলভাবে রক্ষিত হইতে হইবে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য হইল সাম্য, অর্থাৎ উচ্চনীচের বিভেদ লোপ করিয়া প্রজাদিগকে সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যদি জনসাধারণের বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক সঙ্গতিতে বহু তারতম্য থাকে, বাস্তবিকপক্ষে তখন মোটামুটি ভাবেও সকলের ঠিক সমানাধিকার থাকা সম্ভব নহে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক গণতন্ত্র না হইলে, গণতন্ত্র বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া যায়। আর্থিক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরাই তখন ক্ষমতা একচেটিয়া করিয়া জনসাধারণকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। এই রকম অবস্থার ফল আমরা আজকাল হাতে হাতে পাইতেছি। স্বিতস্বার্থ ব্যক্তিদের দুর্নীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, পোষাকী নামে যাহা সমাজতন্ত্র বলিয়া কথিত হয়। সমাজতন্ত্রের সহিত গণতন্ত্রের সমন্বয় না হইলে রাষ্ট্রজীবনের লক্ষ্য বা সর্ব-সাধারণের জন্য সর্ব্বাধিক মঙ্গল করিবার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রের নাই।

সমাজতন্ত্রবাদ বলে একমাত্র অর্থলোভই মানুষকে

কাজে অনুপ্রাণিত করে না, অর্থলোভ না থাকিলেও মানুষের পক্ষে তাহার স্বাভাবিক প্রেরণার দ্বারা চালিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিবর্তনের ফলে মনুষ্য-সমাজ আজ কাল যে স্তরে আসিয়াছে তাহাতে অর্থলোভ না দেখাইলে কাজ পাওয়া যায় না। এতদিন ধরিয়া লোকে শিখিয়াছে যে অর্থলোভ ও আত্মসর্বস্বতাই প্রকৃত প্রস্তাবে পারিব সমৃদ্ধির প্রধান কারণ। প্রকৃত সমাজবাদ কায়েম করিতে হইলে এই অর্থলোলুপতত্ত্ব সংবলিত আদিম মনোভাবকে অপসারিত করিয়া ইহার বিপরীত নীতিতে জনমঙ্গলের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত কার্যপ্রেরণার শক্তিতে- লোকের বিশ্বাস ও আস্থা আনিতে হইবে।

বুঝা যাইত যদি শেষোক্ত জনমঙ্গল নীতিতে জনমনকে অভ্যস্ত করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাময়িকভাবে লোক স্বাধীনতা স্থগিত রাখিয়া কোন এক অকপট সর্বজনমান্য নেতার নিরঙ্কুশ শাসন প্রবর্তনের কথা উঠিত। কিংবা জাতীয় জীবনে কোন মহাবিপদের উপস্থিতি যথা বহিঃশত্রুর আবির্ভাবের অথবা সশস্ত্র অন্তর্বিপ্লব বা বিদ্রোহের যথেষ্ট সম্ভাবনা, এইজাতীয় অবস্থাতেও গণতন্ত্র স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া মানিয়া লইতাম। কারণ জাতীয় মহাসঙ্কটে সাময়িক আইন প্রয়োগ না করিলে প্রয়োজনানুসারে জীবন-মরণ সমস্যার যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক্ষিপ্রতার সহিত হয় না। গণতন্ত্রের স্বভাবধর্ম বাকবিতণ্ডা, ক্ষিপ্রকারিতা নহে। এই সকল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাময়িক এক নায়কত্বের জন্য গণতন্ত্র পরিত্যক্ত হইলেও আসলে এস্থলে একনায়কত্ব গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিরোধী নহে—বরং উহার উদ্দেশ্য হইল পরিণামে বিপ্লবগুলি উৎপাটন করিয়া ভবিষ্যতে সত্যকার জনরাজের পথ সুগম করা।

সুতরাং ভারতের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বর্মায় গণতন্ত্রের খাতিরেই সাময়িক আইন জারী হইয়াছে বলিতে হইবে,—অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ার পরে বর্মায় জনপ্রিয় নায়ক সাধারণ নির্বাচনের আশ্বাস দিয়াছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের মহাশীর আয়ুব খাঁ সমস্ত গণতন্ত্র প্রথাটিকেই সবিস্তারে গালি দিয়াছেন।

সাময়িক এক নায়কত্বারা ভবিষ্যতে গণতন্ত্রকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করিবার তরসা নাই—মূলগত ভাবে পুঁজীবাদই চালু থাকিবে, চোরা কারবারীর উপর রাশ করিয়া অশেষ কষ্টে অর্জিত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজী নই। অর্থাৎ এককথায় হিটলার মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারিব না। লাস্কি যথার্থ বলিয়াছেন যে Fascism এ নিজস্ব মৌলিক দর্শন বলিয়া কিছুই নাই, উহা অসত্যদস্যুবৃত্তি বা ঠগীবৃত্তি মাত্র।

আমাদের স্থির বিশ্বাস সমাজিকতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের পথেই আসিবে—নির্বাচনের মাধ্যমেই আসিবে। কথাই ত আছে, সকলকে সব সময়ের জন্য ঠকান যায় না। নির্বাচকদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই যে অনায়াসে অগ্রগণ্য সেকথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। —শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে একদিন সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারিবেই যে প্রকৃত স্বার্থ তাহার কোথায়—ধনতান্ত্রিক পুঁজীবাদে, অর্থ সকল যেখানে মূলকথা এবং সে কারণে যেখানে দুর্ভব্যবসায়ীরা এবং লোভী সরকারী কর্মচারীদের জোট ন্যূনা দুর্নীতিতে সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে,—না সমাজতন্ত্র,—সকলের মধ্যে সমানভাবে ধনবণ্টন হইল যাহার নীতি—যেখানে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিতে অর্থসঞ্চয়ের প্রয়োজন অবধি গৌণ হইয়া পড়ে তাহার মধ্যেই।

তবে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের দিকে ফিরাইতে হইলে তাহার জন্য সাধনা ও অপেক্ষা করিতে হইবে—প্রচার চাই, ধৈর্য চাই। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে

ব্যক্তি সাধারণের চরিত্র এবং আকাঙ্খা পরিবর্তিত করিয়া স্থায়ীভাবে উচ্চমানে বসাইতে একমাত্র গণতন্ত্রই পারে কিন্তু আগেই বলিয়াছি গণতন্ত্রের প্রভাব লোকমনে ধীরে ধীরে কার্যকরী হয়। শিক্ষা বিস্তারের সহিত ক্রমে সাধারণ লোকও নির্বাচনে তাহার ভোট প্রয়োগ অধিকতর বিবেচনার সহিত করিতে শিখিবে। জন-সাধারণকে তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতার পুরাপুরি এবং উপযুক্ত প্রয়োগ বিষয় সচেতন করা অবশ্য প্রচুর অধ্যবসায় সাপেক্ষ। কিন্তু সাফল্য আসিবেই, এবং তাহার জন্য স্থায়ীভাবে ন্যায় ও স্বাধীনতার কথা জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য করিয়া তুলিবার জন্য সব কষ্ট সহনীয়, সকল অধ্যবসায় সার্থক। ইহার সহিত ডিক্টেটরী বাদশাহীর উপকারিতার তুলনা হইতে পারে না—ডিক্টেটরী বড় জোর জুজুর ভয় দেখাইয়া কতকগুলি অসৎ জনগোষ্ঠীকে দুর্নীতিমূলক কার্য্য হইতে ক্ষণিক বিরতিতে বাধ্য করিতে পারে মাত্র।

গণতন্ত্রের বাক্ স্বাধীনতার সুবিধা নিয়া একনায়কত্ব বা বাদশাহী তন্ত্রের জয়গানে মুখর হওয়ার কোন বিপদ নাই, কিন্তু গণতন্ত্রের নিন্দাকারীদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্যই কি বাদশাহ আসিলে অচল জীবন যাত্রা সচল হইয়া উঠিবে, চোরাকারবারীর দল চিরতরে শায়েস্তা হইয়া যাইবে? তাহা হইলে ২০ বৎসর ধরিয়া General Franco-র অবাধ বাদশাহীর পরেও স্পেন এখন শিল্প-সম্পদে ইয়োরোপের অন্য দেশের তুলনায় অতীব পশ্চাৎপদে কেন, কৃষি ও সভ্যতায় নিম্নশ্রেণীভুক্ত কেন? সালাজারকে কর্ণধার করিয়া পর্টুগালের অবস্থাও স্পেনের সহিত প্রায় তুল্য মূল্যই। উচ্চ পদস্থ দুর্নীতি দুই দেশেই অব্যাহত।

যদিই বা কোন সত্যকার প্রজাহিতৈষী এবং বিচক্ষণ অধিপতি দেশের সমৃদ্ধি দ্রুত বাড়াইয়া দেশে শান্তি ও সম্ভোষ আনিতে সক্ষম হন তাহা হইলেও সেই সমৃদ্ধি, শান্তি ও সন্তোষ যে কয়দিন স্থায়ী হইবে তাহার আগে স্থিরতা নাই। সাধারণ বুদ্ধিতেই অনায়াসে বোঝা যায় যে এক নায়কত্বের একটি প্রধান দুর্বলতা হইল উহার অনিশ্চয়তা। একজন ভাল শাসকের পর আর একজন যিনি স্যালিনের তিনিও যে প্রজার মঙ্গলকারী হইবেন তাহা কিরূপে জানিব? অন্য দেশের ইতিহাসের মতই আমাদের দেশের ইতিহাসও বাদশাহী স্বৈরাচার ও দুর্নীতি পোষণের নজীরে পূর্ণ।

"কবে সে খেয়ালী বাদশাহী সেই যে অতীত আজও চাহি" বুঝি! দেবতাদের মধ্যে যাঁহারা সহিংস ষড়যন্ত্র করিয়া হউক আর স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যস্ত বাধ্য প্রজাগণের মূক সমর্থনের জোরেই হউক, নিছক ব্যক্তিত্ব প্রভাবে প্রতিপক্ষদলকে বিলুপ্ত করিয়া কিংবা অন্ততঃ বিতাড়িত করিয়া একনায়কত্ব লাভে সচেষ্ট হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে কে ভাল' কে মন্দ,—কে প্রজারঞ্জক হইবেন, কে হইবেন না তাহার কিছু স্থিরতা আছে? বিভিন্নদেশে অশোক, আকবর ইহারাও বাদশাহ, আবার আলাউদ্দিন খিলজি, আওরঙ্গজেব ইহারাও বাদশাহ। একনায়কত্বের অভিলাষী মূল্যবান দেবতাদের মধ্যে যিনি জয়ী হইবেন তিনি অশোক বা আকবর হইবেন, না আলাউদ্দিন খিলজি কি আওরঙ্গজেব হইবেন তাহা জাতির দৈব ভাগ্যের উপর নির্ভর করিবে।

আরও মনে রাখিতে হইবে যে গণতন্ত্রবিরোধীকে অবাধে তীব্র সমালোচনা করা এখন যাহা সম্ভব হইতেছে, dictator-ship কায়েম হইলে বিদেশ ব্যতীত ইহলোকে আর তাহা সম্ভব হইবে না। একনায়কত্বের আওতায় দেশ যখন গুহাচরে ছাইয়া যাইবে, ঔপ্রভাব জেলখী-সমালোচনা-প্রবণ স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের জীবন তখন একদিনের জন্যও নিরাপদে থাকিবে না। একটি বিখ্যাত কথা ইহাদের

অনেকটা প্রথায় দাঁড়াইয়াগিয়াছে, যে অবতরণ অবতারক কথা বলিবার স্বাধীনতার সিঁড়িতেই অবতরণের মাথায় উঠিলেও উঠিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রথম কাজ হয় সেই সিঁড়িকে সরাইয়া ফেলা অর্থাৎ নিজের ছাড়া অন্য সকলের মুখ বন্ধ করা।

গণতন্ত্রকে বিলাতী ভাবধারা বলিয়া স্বদেশী গোঁড়াদিগের নিকট তাহাকে অপাংক্তেয় করিবার অপচেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি প্রতাপের আবার দেশী বিলাতী কি? যেখানে ভাল দেখিব সেখান হইতে সেটি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে স্বকীয় করিয়া লইব—ইহাই ত সজীব সমাজের লক্ষণ। মনু পরাশর কৌটিল্য সংহিতার যুগে কেহ কি কের রামরাজত্ব আসিতে চান! মনু পরাশরেরাই বাঁচিয়া থাকিলে বলিতেন, আমাদের সময়ের অবস্থার উপযোগী করিয়া আমরা রাষ্ট্র ধর্ম ও সমাজনীতি রচনা করিয়াছিলাম—তাহার পর হাজার হাজার বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, পূর্বেকার পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও সমস্যা আর নাই—তোমরা এতদিন কি করিলে? সেই পূর্বব্যবস্থাই চালাইতে চেষ্টা করিতেছ?

মনুসংহিতা রচনাকালে একনায়কত্বের প্রয়োজন ছিল। মানুষ তখন প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রাণে বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। দেশে তখন নূতন বসতি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। বিস্তীর্ণ অরণ্য সমূহ প্রকৃতির অজানা রহস্যাবৃত রূপ লইয়াই তখন মানুষের অতি সীমাবদ্ধ আয়োজনকে ব্যঙ্গভাবে বিপন্ন করিতেছে; শত্রু পরিবেষ্টিত রহস্যাবৃত পৃথিবীতে তখন তাই নিতান্ত বাঁচিবার তাগিদেই মনুর-সমাজ সামরিক আইনের অনুরূপ নিয়মতান্ত্রিকতা ও কড়া শৃঙ্খলার আড়ালে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিত। সভ্যতা যাহাকে বলি তখন ছিল তাহার আদিকাল, প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিজের কাজে লাগাইবার যে হাতিয়ার এখন মানুষের আছে, সেই বিজ্ঞানের সাহায্য সেদুসের মানুষ পায় নাই। কাজেই সমাজের পক্ষে শাসন শৃঙ্খলা শিথিল করিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকারের ঝুঁকি লইবার মূল তখন আসলে আসে নাই।

অতঃপর পাকিস্তানে সাময়িক একনায়কত্বের কার্যকারিতার কথা: উহার আপাত চটকে মোহগ্রস্ত হইলে চলিবে না। জিনিষপত্রের দাম নূতন ব্যবস্থায় বেশ্‌কটের খোঁচার ভয়ে হ্রস্ব করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুমে কয়দিন জিনিষপত্র নিয়ন্ত্রণে সহজলভ্য থাকিবে তাহা লক্ষণীয়। অর্থনীতিতে চাহিদা এবং যোগানের সমন্বয়ের একটি সূত্র আছে। দেশে পণ্য না থাকিলে তাহার দাম নিয়ন্ত্রণে বাঁধিয়া দেওয়া বৃথা।

পাকিস্তানে যে গণতন্ত্রের সমাধি হইয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানেরা বহুদিন হইতে অধীনতায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। গজনভীরা হইতেই উহারা তার সুলতান আহমেদের নেতৃত্বে স্বাধীনতার লড়াইয়ে শিখিত থাকিতে কিংবা উহার বিরোধিতা করিতে শিখিয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব মুহূর্তেই উহারা যে পাকিস্তান করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তাহা তীব্র হিন্দুবিদ্বেষের জ্বালায় যত, নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য তত নহে। এবস্তাবস্থায় উহাদের পক্ষে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মর্ম গ্রহণ করা সহজ নহে।

কেহ যেন মনে না করেন যে ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক শিক্ষা মুসলমানরা তাহাদের রাজনীতি কিংবা তাহাদের সমাজনীতিতে রপ্ত করিয়াছে। মুসলমান রাজ্যের ইতিহাসে রাষ্ট্রাধিপতিরা যেচ্ছাচারী যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে। মুসলমান সমাজব্যবস্থাতেও সমস্ত-মতো শ্রেণীভেদ, জন্ম ও বংশগতভাবে ইজ্জতের তারতম্য,

এমন কি জাতিত্বের অবধি রহিয়াছে। পাকিস্তানে বংশও জাতির বিচারে 'আশরফ' ও 'পাঠান' মুসলমান শ্রেষ্ঠ, 'আজলফ' মুসলমান নিকৃষ্ট এবং 'মোমিন' মুসলমান নিকৃষ্টতর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যাহারা স্বাধীনতার সাধনা করে নাই পরন্তু যাহারা বলবন্ত হইয়া অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বহুবৎসর ধরিয়া বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত করিয়া শেষে দেশের বুকে প্রাচীন ভারতবর্ষকে দুই ভিন্ন ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে, তাহারা স্বকার্য্যের ফলভোগ করিতেছে। তাহাদের ইয়োজ অভিভাবক চলিয়া গেলে তাহারা যে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের কবলিত হইবে, আর বেশী কথা কী? কিন্তু আমাদের যাহা আছে তাহা আছে—স্বাধীনতা আছে অভাব মোচনের কিছু চেষ্টা আছে। এ অবস্থায় আমরা ধরিত্র ফললাভের আশার মোহে বিভ্রান্ত হইতে চাহি না, জাতীয় পীড়া দূরে নিবারণার্থ কোন যাদুছিন্না নিবাসে আমাদের কষ্ট লব্ধ গণস্বাধীনতার আবহাওয়া হারাইতে চাহি না।

ফলকথা আমরা চাই সাম্য ও স্বাধীনতা দুইই,—ইহারা একে অন্যের অনুপূরক। সাম্য শুধু আইনের চক্ষুতে নহে, শুধু রাজনৈতিক নির্বাচনের সময়ে ভোটাধিকারে নহে—আমরা চাই অর্থনীতির বাস্তবে সাম্য পরিস্ফুট করিতে। সে কার্য্য সহজ সাধ্য নহে কিন্তু কোন ভাল কাজ কি অনায়াসে হয়? —শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা এই যে ব্যক্তির জীবন সীমিত কিন্তু দেশের বা জাতির নিকট দিশ পঞ্চাশ বৎসর কিছুই নহে। আমাদের জীবনকালে অসুবিধা ও কষ্টে অসহিষ্ণু না হইয়া যদি সাম্য ও স্বাধীনতার বুনিয়াদে ক্রমে জাতীয় চরিত্র গঠন ও অভাব লাঘবে সক্ষম হই, উত্তরবংশীয়রা কৃতজ্ঞতার সহিত আমাদিগকে স্মরণ করিবে। অপর পক্ষে যদি একজনের হাতে একণে সর্বক্ষমতা তুলিয়া দিবার হঠকারী অভিসন্ধি গোপন করি, তাহা হইলে আমরা অতীতে পুনঃপ্রবেশ করিব, জগতের ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের কাছে ব্যর্থ হইয়া যাইবে—অতীতের অভিজ্ঞতার এক বহু মূল্য উত্তরাধিকার হারাইব।

ভুল সংশোধন

একেশ্বরবাদ

আলাপচন্দ্র রায়

এই প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের তৃতীয় লাইনে "কিন্তু গণতন্ত্র এখনো পরাধীন" এর পরিবর্তে "কিন্তু গণতন্ত্র এখনো পরীক্ষাধীন" হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

জঃ সঃ

কবিতা

অসামান্য

পুলক আঢ্য

একটু সংগ চেয়েছি কেবল, সময় একটুখানি,
অসংখ্য কাজে মাঝে চেয়েছি সামান্য অবসর।
একটি রঙীন স্বপ্ন, দু' একটি কথা বিনিময়,
বারেক বিস্মৃতি চাই—ক্ষণিক হারাতে পরিচয়।

কয়টি মুহূর্ত মাত্র দু'জনেতে মুখোমুখি বসে,
তাকিয়ে থাকতে চাই আকাশের, অরণ্যের পানে।
কথা নয়, কাজ নয়, নয় চিন্তা, উদ্যোগ, উদ্যম,
শুধু চেয়ে বসে থাকা কোন এক তন্দ্রা মুগ্ধ গানে।

আদিম কামনা লয়ে একটি হৃদয় ছুঁয়ে যেতে,
চেয়েছি জীবনে শুধু, চাহিয়াছি সোনালী সন্ধ্যায়,
বারেক হারিয়ে যেতে, খানিক আড়ালে গিয়ে বসে,
তাহারে, নিজেরে লয়ে জীবনের হিসাব মিলাতে।

* * *

একটু প্রেমের, আর প্রিয়ার স্বপন চোখে নিয়ে,
জমাতে চেয়েছি পাড়ি প্রত্যহের পাওনা পেড়িয়ে।

পুনরাবৃত্তি

সুব্রতেশ ঘোষ

মহাত্মাজীর মূর্তিটির কাছে বাবাকে বসিয়ে দিয়ে একটু এগিয়ে গিতা একেবারে বেলাভূমির ওপরে এসে দাঁড়াল।

এখান থেকে আরও ভাল করে দেখা যায় সমুদ্রের মাতাল রূপ। মহাত্মাজীর মূর্তি আর সমুদ্রের মাঝখানে ভাউগাছের সারি। শুধু মূর্তিটির একেবারে সামনে কিছুটা জায়গা খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে না দাঁড়িয়ে যেন তৃপ্তি নেই। সমুদ্রের জলরাশি বুক চিরে পাগল শিশুর মত নাচতে নাচতে ছুটে আসছে ঢেউয়ের রাশি। হয়ত ওদের আশা তীরের সবাইকে টেনে নিয়ে যাবে খেলার সাথী হবার জন্য। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত শক্তিতে কুলোয় না। শ্রান্ত শিশু ঝরে পড়ে বেলা-ভূমির বুকে; শেষ চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে দেয়। যেন মিনতি করে—ঘুরে দাঁড়িয়ে কেন? এস, চল, কত খেলা যে বাকী পড়ে রইল।

এ ধরণেরই কোন কিছু হয়ত ভাবছিল গিতা। কিংবা হয়ত কিছুই ভাবছিল না। সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য আর তীরের কাছে ঢেউয়ের চপল মাতামাতি এ দুয়ের সৌন্দর্য্য হয়ত তাকে এমন অভিভূত করেছিল যে কোন কিছুই ভাবতে সে ভুলে গিয়েছিল। সারা মন জুড়ে ছিল একটা আবেশ। একটা অপূর্ব মনোরম নিস্তব্ধতা। শুধু চেয়ে দেখা আর মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়ত করার শক্তি তার ছিল না।

তবে আবির যে সে হয়ে গিয়েছিল এ কথা ঠিক। নইলে পেছনে যে একটি লোক দাঁড়িয়েছে, শুধু দাঁড়িয়েছে নয় তাকে বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছে তা সে টের পেত নিশ্চয়ই।

চোখে হাত পড়তেই প্রথম চমকে উঠেছিল গিতা। শুধু চমকে ওঠা নয়—ভয় এবং রাগও। সজোরে একঝটকায় হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে কড় ভঙ্গিতেই পেছন ফিরে তাকিয়েছিল সে। কিন্তু পেছনের লোকটির সাদাসিধে মুখের দিকে তাকান মাত্র সে রূঢ়তা মুছে গিয়ে কখন যে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে নিজেও বোধহয় তা টের পায় নি।

অমিত। এতদিন পরে।

আবার অল্প করে কাঁপল গিতা। অমিত-ই তো। চেহারার অবয়ব ওর পরিবর্ত্তন এসেছে বহু। সেই রোগা রোগা শীর্ণ ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে পুরন্ত স্বাস্থ্যের ঋদ্ধিলাভ ওর সর্ব্বাঙ্গে। আরও যেন উজ্জ্বল হয়েছে ওর গায়ের রঙ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন যেন হয়েছে ওর পোষাকে। সেই চিরাচরিত ছিটের শার্ট আর মোটা মিলের ধুতির বদলে দামী সিল্কের হাওয়াই সার্ট। কর্ডের প্যান্ট [illegible] ফ্রেঞ্চসোল স্যু না বলতেই জানিয়ে দেয় যে [illegible] চেহারার স্মৃতি আসলে তার সন্ধানের [illegible] প্রতিচ্ছায়া।

"কি ব্যাপার? চিনতেই পারলে না নাকি? অমিতই প্রথম কথা বলল।

দীর্ঘ বার বছর পরে। মনের পুটে কত স্মৃতিই না ঝিলিক্ দিয়ে যেতে চায়! কিন্তু স্মৃতি রোমন্থন করার সময় এটা নয়। তা' ছাড়া অমিতও সে অমিত নয়—সিতাও আর আগের সে সিতা নেই।

মুখে বলল, "তুমি অবশ্য বেশ পাল্টে গেছ। কিন্তু তা বলে না চিনতে পারার মত নয়।"

একটু যেন আহত হল অমিত। সিতার কণ্ঠ এত নিরুত্তাপ কেন? তবু সে তার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল, বলল, "তোমার বাবাকে দেখলাম। প্রথমে একটু সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু পরে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম উনিই। তখনই মনে হল তুমিও হয়ত কাছাকাছিই কোথাও আছ।"

বাবার কথা উঠতেই সিতার মুখে একটা ছায়া পড়ল। সত্যিই তো, বহুক্ষণ ধরে বাবা একলা বসে আছেন। পঙ্গু মানুষ, এতক্ষণ ধরে তাঁর কথা ভুলে থাকা মোটেই উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "সত্যিই তো। বাবা একা আছেন। ওঁর কাছে যেতে হবে।" তারপর কি ভেবে যেন বলল, "তুমিও চল না?"

"আমি?" মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঝিলিক্ মেরে গেল অমিতের মনে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর হাসি পেল। [redacted]র ওর কি? সেদিন যে দারিদ্র্যের দিকে তাকিয়ে [redacted] কর্মচারী ভদ্রলোকটি নাক সিঁটকেছিলেন। আজ [redacted]র ছায়াও নেই অমিতের চারদিকে কোনখানে। [redacted] থেকে দেখা সিতার বাবার চেহারা আর সামনে [redacted]তার আধময়লা মিলের শাড়ি তো মনে হয় বলে [redacted] সেদিনের পাশা-ই উল্টে গেছে। সহজ সুরেই তাই সে বলল, "চল।" আর পরমুহূর্তেই ওর প্রত্যয়শীল পদক্ষেপ বেলাভূমির ওপরে দাগ কেটে কেটে চলল এগিয়ে।

সে গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে নিজের গতিবেগ একটু বাড়াতে হল সিতাকে। আর সে মুহূর্তেই কিসের যেন অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল ওর মন। একবার যেন মনে হ'ল বহুচেনা এই মানুষটিকে সত্যিই কি সে কোন-দিন দেখেছে?

সময় হয়ত অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়। নইলে এক-দিন যাকে দেখামাত্র ঘৃণি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত, আজ তাকে সিতার সঙ্গে একসঙ্গে দেখেও হাসতে পারতেন না সুধীরবাবু। কিংবা সময়ের ব্যবধান ছাড়াও অমিতের সর্বাঙ্গে যে নতুনের বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে তাও হয়ত কিছুটা দায়ী এ জন্য। মোট কথা, সুধীরবাবু অমিতের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, অমিত না, তুমি কোথা থেকে?"

অমিতও মৃদু হাসল। সৌজন্যের সঙ্গে জানাল যে ব্যবসায়সূত্রে দিন দুই হোল সে পুরীতে এসেছে। সঙ্গে এ-ও জানাতে ভুলল না যে উঠেছে সে রেলওয়ে হোটেলে।

মুখের চোখ আরও সম্ভ্রমপূর্ণ হয়ে উঠল। রেলওয়ে হোটেলে একজনের দৈনিক চার্জ যে অন্তে ওঠে, আজকাল তাদের বাপে মেয়েতে তাতে দিন ভিনেক চলে যায়। বললেন, "বিজনেস্ করছ নাকি তুমি? কি বিজনেস্?"

"সে অনেক কিছু। নিতান্তই হেলা ফেলার সুর অমিতের গলায়, "লোহার কারবারটাই প্রধান ছিল এক-কালে। এখন আরও অনেক কিছু জুটেছে—চামড়া রপ্তানী করি, একটা জুট মিল কিনেছি, একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করেছে বছরখানেক হয়। তা ছাড়া ছুটকো ছাটকা আরও বহু ঝামেলা আছে।"

কি করে ভাগ্য ফিরে গেল এমন করে, কেমন করে একদিনের প্রাইভেট টিউশনি করে পড়ার খরচ জোটানো ছেলে আজ এতবড় সম্পদের মালিক হোল আজ তার ব্যাঙ্ক

ব্যালান্স কত, ইত্যাদি বহু প্রশ্নই জবাব খুঁজছিল সুধীর বাবুর মনে। কিন্তু সেগুলি আর বাইরের আলো দেখার অবকাশ পেলনা। তার আগেই শিতা বাধা দিল, "এবার বাড়ী চল বাবা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।"

সত্যিই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। ঘড়ির দিকে তাকাবার অবশ্য দরকার ছিল না। তবু ঘড়ি উল্টে রেডিয়াম্ আঁকা ঘড়িটা একবার দেখ্‌ল অমিত। তারপর অন্তরঙ্গ স্বরে বল্‌ল, "যাই হোক। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। আমার হোটেলে এক ভদ্রলোক এসে বোধহয় অপেক্ষা করছেন এতক্ষণে।" বলে এক পা বাড়িয়েই আবার ফিরে দাঁড়াল সে, "কিন্তু আপনারা উঠেছেন কোথায়? চলুন না আপ্‌নাদেরও একটা লিফট দিয়ে দি: গাড়ী তো সঙ্গেই এনেছি।"

ভারী খুশি হয়ে উঠলেন সুধীরবাবু, "গাড়ী এনেছ? আমরা উঠেছি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে—কিন্তু তোমার আবার দেরী হয়ে যাবে না তো?"

অমিত জবাব দেবার আগেই কিন্তু শিতা আপত্তি করে উঠল, "থাক্ অমিত-দা। তোমার দেরী হয়ে যাবে। হোটেলে আবার কে যেন তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।" আর সে বলার ভঙ্গীও এমন, যে অমিত পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় অনুরোধ করার সুযোগ পেল না।

একটু রাগই হোল সুধীরবাবুর শিতার ওপরে। আশ্চর্য্য মেয়ে। কোথায় গাড়ীতে চড়ে আরাম করে হাওয়া খেতে খেতে যাবেন। না, এখন মেয়ের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে এই পঙ্গু অথর্ব দেহটা হিঁচড়ে নিয়ে চল ধর্মশালা পর্য্যন্ত।

পারিনি। আসতে অমিতকে বলা হয়নি। তবু ঠিক পাঁচটা বাজতে না বাজতে ওদের ধর্মশালার গেটে গাড়ী এনে দাঁড় করিয়ে দিল অমিত।

গাড়ী থেকে অমিতকে নামতে দেখে নিজেই গেটের দিকে এগিয়ে গেল শিতা।' পথ দেখিয়ে অমিতকে নিজেদের ঘরের দিকে নিয়ে আসতে শিতার একটু লজ্জাই করছিল। ধর্মশালার অধিবাসীদের দারিদ্র্য এতই সুপরিস্ফুট যে অমিতের চোখে তাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাবার কথা ভাবতেও খারাপ লাগে। অমিত হয়ত সে সব কিছুই লক্ষ্য করছিল না। সোজা ঘরে ঢুকে বলল, "বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবনা, তোমরা তৈরী হয়ে নাও। পুরী বোধহয় এখনও ভাল করে সব দেখা হয় নি। আমার গাড়ীতেই ঘুরে আসবে চল।"

শিতার বাবাকে বলল, "আপনার শরীরটা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে দেখছি। সমুদ্রের হাওয়া খুব ভাল ঠিকই। কিন্তু হাঁটাহাঁটির ধকল আপনার সইবে না। আমি যে-কয়দিন আছি রোজ গাড়ী নিয়ে আসব বিকেলে। গাড়ীতে করে বেড়ানোই সব দিক থেকে ভাল।"

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুধীরবাবুর মুখ। শিতাও খুশী হল। অমিতের কথা বলার ধরণটা ওর কানে খুবই নতুন ঠেকছে সন্দেহ নেই। তবু এত কালের পরে আজও যে তার বাবার ভাল-মন্দের ওপর অমিতের এতটা নজর। সেটা খুবই ভাল লাগে।

শিতার বাবা কিন্তু আজ বের হতে পারলেন না। বাতের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। মোটরে করেও বের হওয়া সম্ভব নয়। শিতাও বাবাকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না। কিন্তু সুধীরবাবুই একরকম জোর করে মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। "তুই যা মা, একটু ঘুরে আয়। রোগীর সঙ্গে থেকে থেকে নিজেও কি রোগী হয়ে পড়বি? আমার জন্য কিছু ভয় নেই। এত লোক ধর্মশালায় আছেন। দরকার পড়লে ওরাই দেখাশোনা করতে পারবেন।"

পাশাপাশিই বেড়িয়ে এল ওরা। ধর্মশালার কুঠরিগুলি থেকে অনেক জোড়া চোখ অবাক বিস্ময়ে ওদের নিরীক্ষণ

করছিল। কিন্তু তা ওরা গ্রাহ্যই করল না। সোজা এসে উঠল গাড়ীতে। চালকের আসনে বসল অমিত। আর তার পাশেই শিতা।

অমিতের বোধহয় ইচ্ছে ছিল সহর ঘোরা। কিন্তু শিতাই বাধা দিল। বলল, "সহরে আর কি দেখবে। চল সমুদ্রের ধারে যাই।"

অমিত একটু হাসল; বললে, "কেন? সমুদ্রও তো দেখেছ, তাতেই বা নতুন কি দেখবার আছে?

"কী আছে? অনেকটা যেন ফুঁসে উঠল শিতা, "সমুদ্র কখনও পুরোন হয়?"

সেরকমই হাসির রেশ টেনে রেখেছিল অমিত তার মুখে। বললে, "বোধহয় কারো কারো চোখে হয় না। যেমন তুমি কোনদিনই পুরোন হও না আমার চোখে।"

কথাটা জানা। তবু লজ্জায় লাল হয়ে উঠল শিতা। আর একটা অসহ্য ভাল লাগার অনুভূতি। এত জানা কথা, তবু কি সুন্দর করেই না বললে অমিত। পর মুহূর্তেই ওর মনে পড়ে গেল এ যে অমিতের মনের কথা তা বহুদিন আগে জানলেও, ঠিক এমন করে কোনদিন তা বলতে পারে নি সেদিনের লাজুক মুখচোরা ছেলেটি।

সমুদ্র এসে গিয়েছিল। তীরটা এঁকিয়ে তীরের কাছে একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়ী দাঁড় করাল ওরা। তারপর উঁচু পাড় বয়ে নিচে নেমে বসে পড়ল একেবারে ঢেউয়ের মুখোমুখি।

অনেক কথাই জমেছিল দুজনের মনে। কিন্তু তার প্রায় কিছুই বলা হল না। শিতা ছুটোছুটি করে কিছুক কুড়োল। বালিতে গর্ত খুঁড়ল, আর লিখল হিজিবিজি। আর বালির ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অমিত শুধুই তাকিয়ে রইল শিতার সেই চঞ্চল গতির দিকে।

এরই মধ্যে কখন যেন অন্ধকার নেমে এসেছে। আর চমকে উঠে শিতা বলেছে "ইস্, কত দেরী হয়ে গেল। চল বাড়ী ফেরা যাক্। বাবা একলা আছেন।"

আগের মতই অনাবশ্যক কথার মালা বুনতে বুনতে ওরা উঠে এসেছে গাড়ীতে; আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ীর নিখুঁত চাকাগুলি ওদের পৌঁছে দিয়েছে অজয়ের বৈঠকখানায়।

কেন জানি গলায় সুর জমে উঠেছিল শিতার। কলকাতা হলে হয়ত সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গুনগুন করে গেয়েই ফেলত তার প্রিয় কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি। কিন্তু এখানে কপাল জোড়া সিঁদুর, চওড়া লাল পেড়ে আধময়লা শাড়ী, সবলা গান, রুদ্রাক্ষের মালা আর হাঁটুর ওপরে তোলা ধুতির ভিড়ে বরফা মেয়ের গলায় তাকি বেমানান শোনাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিশেষ করে পাশে যদি থাকে সিল্কের হাওয়াই সার্ট পরা কোন স্মিথের কোঠার পুরুষ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গলার সুর গলাতেই আটকে রেখেছিল শিতা। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই সে সুর যেন রক্ত হয়ে চড়ে বসল ওর মাথায়।

খাট থেকে গড়িয়ে পড়েছেন ওর বাবা মেঝের ওপরে। অসহ্য যন্ত্রণায় সারা মুখ কুঞ্চিত। গলা থেকে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হচ্ছে।

একটা অস্ফুট চিৎকার করে শিতা গিয়ে বাবার মাথাটি তুলে নিল নিজের কোলে। তারপর চোখ তুলে তাকাল অমিতের দিকে। ওর সারা চোখে তখন এক অসহায় উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

অমিত কিন্তু একটুও ঘাবড়ায় নি। সে শুধু একবার বলল "ভয় পেও না। ডাক্তার ডেকে আনছি।"

তারপরেই তার ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা গেল সিঁড়ির ওপর। দ্রুতগতিতে সে নীচে নেমে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচ হতে না হতেই রাস্তা থেকে অমিতের মোটরের গর্জন

ভেসে এল। সেই আতঙ্কের মধ্যেও, স্নিগ্ধার মনে হল কি যেন একটা আশ্বাস ভেসে আসছে।

এরপরের কয়েকটা দিন যে কেমন ভাবে কেটেছে গুছিয়ে মনে করতে স্নিগ্ধা পারে না। শুধু তার মনে আছে ডাক্তারের আসা যাওয়া, প্রেসক্রিপশন আর দামী দামী ওষুধ। জল আর পথ্যের জোর। এগুলিই তার দিনরাতের জাগ্রত প্রহরগুলিকে এমন করে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে অন্য কোন কথা ভাববারও অবসর তার হয়নি।

এই মধ্যে সঙ্ঘের ধর্মশালা ছেড়ে ওরা উঠে এসেছে রেলওয়ে হোটেলের একটা ঘরে। ধর্মশালার আবহাওয়াটা চিকিৎসা শুশ্রূষার পক্ষে খুব অনুকূল নয়। তা ছাড়া যে কয়দিন ধর্মশালায় থাকা চলে তার নির্দিষ্ট মেয়াদও ফুরিয়ে গিয়েছিল। অমিতের কথায় তার হোটেলেই উঠে এল ওরা। বাবে বাবে গাড়ী নিয়ে ছোটাছুটি করার পরিশ্রমটা ওর বাঁচল তাতে। টাকার প্রশ্নটা অবশ্য একবার যে ঝিলিক মেরে যায়নি স্নিগ্ধার মনে তা নয়। কিন্তু অমিত সেদিকে ছিল না। পরে নানা গোলমালে সে কথাটা জিজ্ঞেস করে ওঠাই হয়নি। আর তা' ছাড়া টাকার প্রশ্ন তো শুধু হোটেল ভাড়াতেই নয়। এই বড় বড় ডাক্তারদের বিল; ওষুধ আর পথ্যের দাম—টাকা তো লাগে সবেই। কিন্তু এর একটা পয়সার কথাও স্নিগ্ধাদের ভাবতে হয় নি। কেমন করে জোগা দিয়ে সবই শুধু সহজ ভাবে এসে গিয়েছে।

এতদিন যে কথা ভাববার অবসর হয়নি, আজ অবশ্য তা নিয়ে চিন্তা করার অবসর মিলেছে। একটু আগেই সিভিল সার্জন এসে বাবাকে পরীক্ষা করে গেছেন। তাঁর মতে উনি এখন আউট অফ ডেঞ্জার। তবে ভালভাবে সেরে ওঠবার জন্য কিছুদিন অন্য কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকা উচিত। পুরীতে আর কিছুদিনের মধ্যেই মনসুন্ ভেঙে পড়বে। সে সময় এ সহর মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। তার আগেই যদি অন্য কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে যাওয়া যায়, তবে তাই উচিত হবে।

কথাটা শুনে একটু ভাবনায় পড়েছিল স্নিগ্ধা। স্বাস্থ্যকর জায়গা বলতে বাঙালীর প্রথমেই মনে পড়ে পশ্চিমের কথা। কিন্তু পশ্চিমের কোন স্বাস্থ্যকর সহরে গিয়ে থাকার খরচ তাদের জুটবে কোথা থেকে? এমন কোন আত্মীয় স্বজনের নামও তো তার মনে পড়ছেনা যার কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকা যায়।

অমিত অবশ্য কোন কথা বলে নি। সিভিল সার্জনকে তাঁর গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজেও গাড়ী বের করেছে। তারপর কোনকিছু না বলেই বেরিয়ে গেছে সহরের দিকে।

অমিতের সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করার কথাটা একবার মনে হয়েছিল স্নিগ্ধার। কিন্তু পরমুহূর্তেই মানা করে উঠল ওর মন। নিজেদের দুরবস্থার অনেক পরিচয় দেওয়া হয়েছে ওকে। আর বেশী না দিলেও চলবে। এমনিতেই এ কয় দিনের খরচের বহর বেশ ভারী হয়েই ওর কাছে জমেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু চিন্তা করার সময়ও তার হাতে অনেক কই? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল স্নিগ্ধা। এগারটা বেজে গিয়েছে। বাবাকে চান করাতে হবে। তারপর ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে এগারটায় ওঁকে খাইয়ে, তার আধঘণ্টা পরে এক গ্লাস ওষুধ। আবার আর আধঘণ্টা পরে আর একটা ওষুধ দিয়ে নিজের স্নান খাওয়া সেরে ফেলতে হবে। ভাল করে ভাববার মত যথেষ্ট অবসর এখনই বা কোথায়?

বারান্দার ইজিচেয়ারটা ছেড়ে উঠে ওষুধ আনতে ঘরের দিকে যাবে, ছুতো খুঁজতে করতে অমিত এসে হাজির। "মধুপুরে আমাদের ব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চ আছে। ম্যানেজারকে তার করে দিলাম। তোমাদের জন্য একটা

বাড়ী আগাম ভাড়া করে রাখবে। কাল পরশুর মধ্যেই শর্ট করা ভাল। কি বল? পারবে তো তৈরী হয়ে নিতে। বল তো আজই এয়ার কণ্ডিশনড্ কামরা বুক করে রাখি ট্রেণে। লাষ্ট মোমেণ্টে যদি রিজার্ভেশন না পাওয়া যায়?"

"আগাম বাড়ী ভাড়া! এয়ার কণ্ডিশনড্ কামরা। কিরকম যেন আচ্ছন্ন লাগছিল শিতার। শুধু বললে, "কিন্তু টাকা?"

হা হা করে বাঁধভাঙা হাসির বন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অমিত। "টাকা? লোহার কোল্‌সেল্ বিজনেসে লাভ, একটা মুট্-মিলের ডিরেক্টর-শিপের পাওনা, একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের রেম্যুনারেশন্, আর একগাদা কোম্পানীর ডিভিডেণ্ড—সব মিলিয়েও কি তোমার মধুপুরের বাড়ীর ভাড়া আর পুরী টু মধুপুর এয়ার কণ্ডিশনড্ কম্পার্টমেণ্টের চার্জ্জ কুলোবে না?"

কথাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। হয়ত একটি তের বছরের খুকীও বুঝতে পারত। কিন্তু শিতা বোধ হয় আর বড়ই ক্লান্ত। কিম্বা কোন কিছু ভাববার বা তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতাই হয়ত তার নেই। শুধু তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "কিন্তু সে তো তোমার টাকা?"

কেমন যেন অদ্ভুৎ একটা হাসি ফুটে উঠল অমিতের মুখে। শিতার আরও কাছে সরে এল সে, তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই ওর একটা হাত এসে শিতার কাঁধে যেন নিজের বহুদিনের নীড়ে এসে স্থির হয়ে রইল। একটা অদ্ভুৎ শিরশিরে অনুভূতি শিতার সমস্ত চেতনাকে ঢেকে ফেলছিল। তবু তারই মধ্যে সে শুনতে পেল যেন বহুদূর থেকে অমিতের গলা ভেসে আসছে, "কিন্তু সে টাকা কি তোমারও নয়?"

তার টাকা? একবার অমিতের মুখের দিকে তাকাল শিতা। রক্তাভ সুপুষ্ট গাল। প্রত্যুৎপন্ন জলজলে চোখে ওপরে দামী কাঁচ বসান রিম্‌লেশ চশমা। আগাগোড়া সিল্কের দামী স্যুট। এই কি অমিত? সেদিনের শিতা?

নিষ্প্রাণ হাতে নিজের কাঁধ থেকে অমিতের হাতটা নামিয়ে দিতে দিতে শিতা শুনতে পেল, তারই গলায় কে যেন বলছে। "না, তা হয় না।"

স্তম্ভিত অমিতের চোখের সমুখ দিয়ে একটা আবছায়া মিলের শাড়ী যেন ঘুমের ঘোরে সিধে ঢুকল পাশের একটা ঘরে।

সেখান থেকে শোনা গেল, "বাবা, জল দিই এবার চানের বেলা হয়ে গেল যে।"

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসান্সোল

কবিতা

অপেক্ষা

মাণিক মুখোপাধ্যায়

স্যাঁৎ স্যাঁতে এই অন্ধ গলির নীড়ে
তোমার আমার প্রেমের কেটেছে দিন,
পংকিলতার গ্লানি তো ছিলো না মনে ;
আমরা ভেবেছি অন্ধ এ সীমা ছিঁড়ে
আনবো দু'হাতে সোনালী সে দিন
রৌদ্র রঙিন
আমাদেরই এই কুটিরের অঙ্গনে ॥

তাইতো অনেক দুঃখের সিঁড়ি ভেঙে
লক্ষজনার প্রাণের পেয়েছি মিল,
অন্ধকারের বুকে জ্বালি রোশনাই ;
আমাদের গানে অমিত সূর্য রেঙে
ছড়ালো মাখালো দিগন্ত ঘননীল
জয়ের ছন্দ, আজ তাই ক্ষোভ নাই ॥

আমরা জেনেছি আমাদেরই জয় জয়
অন্ধকারের মসনদ তাই টলে
মহাজনের যন্ত্রণা যেন আনি
মুক্ত সকাল জীবনের কল্লোলে ॥

উত্তরায়ণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

। নীলিমা দাশগুপ্ত ।

অফিস-ফেরৎ অরুণ ওপরে ওঠার সময় মাকে ডেকে গেলো ইসারায়। মায়াদেবী অবাক হ'লেন একটু। চরকা কাটা বন্ধ করে একবার মেয়ের দিকে তাকালেন, চোখমুখে আপনমনে গুনগুন গাইছে মল্লিকা। নিঃশব্দে উঠে এলেন। অরুণ নিচু হয়ে জুতো খুলছিলো, মা'র পায়ের শব্দে সোজা হ'য়ে বসে বললো, "মা বসো, কথা আছে।"

"কী বাবা?" মায়াদেবীর কণ্ঠে উদ্বেগ। অরুণ হাসলো, কোন খারাপ খবর নয় মা, একজায়গা থেকে মিলির বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। মিলিটা আইবুড়ো আছে এতদিন, তাই তোমাকে ও ভাবে ডাকলাম।"

মায়াদেবী আশ্বস্ত হ'লেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওঁর রঞ্জনের কথা মনে পড়লো। অরুণ বললো, "সোপার বর সোমেন চিঠি লিখেছে আমাকে, ওর বন্ধু তাপস দে'র—তোমার তাকে মনে আছে কিনা জানি না, মিলিকে পছন্দ হ'য়েছে খুব। তাপস বাবু ওখানকার একজন সেটেলড্ অধিবাসী। ওঁর বাবা চিরস্থায়ী যে, এলাহাবাদেরই নামকরা এ্যাডভোকেট। ওখানেই বাড়ীঘর করেছেন। তাপসবাবু এবং ওঁর মা-বাবা-ভাই-বোন সকলেই খুব লোক ভাল আর খুবই না ক সুখী পরিবার—একথা খুব জোর দিয়ে বিশেষ ভাবে লিখেছে সোমেন। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে মিলির বি-এ পরীক্ষার পরই শুভকাজ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। মেয়ে দেখতেও চান্ না, শুধু ফটো চেয়েছেন একটা, কোনরকম দাবী-দাওয়া নেই। "তোমার কি মতামত মা বলো?" মায়াদেবী হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না। চুপ করে ভাবতে লাগলেন, অরুণ মা'র মনোভাব কিছুটা আঁচ করলো। "তুমি বুঝি রঞ্জনের কথা ভাবছো মা?"

"হ্যাঁ, তাই।" মায়াদেবী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, "যদি মিলিকে মত করানো যায়, তাহলে রঞ্জনই তো ভাল পাত্র সবচেয়ে—"

"তা বটে মা—" অরুণ জুতো খুলে একপাশে সরিয়ে রেখে বললো, "তবে আমার কি মনে হয় জানো? অন্তত ঘরে ঘরে কাজ করার চেয়ে, সমান সমান ঘরে কাজ করাই বোধ হয় ভাল। তাছাড়া, আমাদের পক্ষ অর্থাৎ মেয়ের পক্ষ থেকে আগ্রহ না দেখিয়ে বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হ'য়েছে বলে, রঞ্জনের মা-বাবা বেশ ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন। বিরক্তিও যে কিছুটা প্রকাশ করেননি তা নয়। এখানে তুমি সোমেনের চিঠিখানা পড়ে দেখো, বুঝতে পারবে যে শুধু ছেলেরই আগ্রহ নয়, বাড়ির সকলের খুবই আগ্রহ, অথচ তারা মেয়েকে এখন পর্যন্ত মিলিকে চোখে দেখেননি" অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে মার হাতে দিলো, মায়াদেবী ধীরে ধীরে চিঠিখানা পড়লেন। তারপর চিঠিখানা অরুণের হাতে ফেরৎ দিয়ে বিষণ্ণমুখে বললেন,

"বাস্তবিকই ওঁরা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তুই এক কাজ কর, আগে তো একখানা ফটো পাঠিয়ে দে, আর লিখে দে ঐ সঙ্গে এখনও তো বি-এ পরীক্ষার দু' মাস বাকী, পরীক্ষার পর পাকা কথাবার্তা হবে।' আমি নিচে যাই, মিলিটা না হলে চটকলে উঠে আসবে,' মায়াদেবী চলে গেলেন। মল্লিকা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে সব

শুনছিলো। এবার সামনে সরে এসে হাত বাড়ালো। চিঠিখানা নিয়ে স্মিত মুখে বললো, "ক্ষেপেছো তুমি, তোমার বোনের মত না নিয়ে ফটো-টটো আর পাঠিও না বাপু। মিলি ব'লে কোনমতে দাঁতের সময়টা পার করতে পারলে বেঁচে যায়। অপেক্ষা করছে এম-এ ডিগ্রীটার জন্ত। বি-টি পরীক্ষা নাকি এমাসেই দিয়ে ফেলবে। তারপরই খুলবে ওর নোতুন পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয়। তার শিক্ষা পদ্ধতি এমনই অভিনব হবে, যা এ-পর্যন্ত কেউ নাকি দেখেওনি-শোনেওনি। বি-এ পড়ার প্রথম থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু হ'য়ে গেছে। দেখ তোমা বই কিনে কিনে ঘর বোঝাই করে ফেলেছে ঠাকুরঝি, ডুবে আছে দিনরাত বইয়ের স্তূপের মধ্যে আর দিনরাত মুখ গম্ভীর ক'রে ম্লান ভাবছে তো ভাবছেই—।"

অরুণ শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে হাসিমুখে বললে, "তুমি ছাই বুঝেছো, মেয়েরা যখন মুখ অত গম্ভীর ক'রে ভাবতে শুরু করে, তখন তাদের ভাবনা শেষ করার জন্ত একজন সঙ্গীর দরকার হয়, বুঝেছো মশাই?"

"কে বললে?"

"আপাতত অরুণকুমার মিত্র বলছেন," মলিনা হেসে উঠলো। বললো, "কচুখোনো না—"

"আচ্ছা, এ-তথ্যটা তোমাকে ধীরে সুস্থে রাত্রে বুঝিয়ে দেবো'খন। তুমি এখন মিলির একখানা ফটো আমার ঘরে এনে রাখো, মিলি যেন টের না পায়।"

"মিত্র মশাই যখন একাই বুঝেছেন, তখন আর বোনকে তার কিসের?"—বললে মলিনা। ওয়ার্ডরোব খুলে কোটটা ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে সহাস্তে বললে অরুণ,

"জানতো, মেয়েরা ভাববে, তবু মচকাবে না। আমি মিত্রে চললুম, তুমি ফটোখানা রেখে এসো।"

"কোন ফটোখানা রাখবো?" মলিনা জিজ্ঞেস করলো। অরুণ বললো, "মিলির ফটোই তো কুড়ে ডুবেছি দুখানা, তাও ওকে প্রস্তুত হ'তে না দিয়ে—। তারমধ্যে যে কোন একটা ঠিক ক'রে রাখো। বলা ফটোখানা বোধহয় মিলির পড়ার ঘরে ফটোগ্রাফে আছে—ওটাই বোধ হয় বেশী-ভাল।" হাত মুখ ধুয়ে অরুণ জলখাবার খেলো। খুব ধীরে ধীরেই খেলো, কিন্তু তবুও মলিনাকে আসতে না দেখে, নিজেই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ওপরে উঠে এলো। মলিনা তখন, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে একেবারে বার করে, সোফাটেবিলের ওপর রেখে ঝুঁকে পড়ে কী যেন খুঁজি-পাতি করে খুঁজছে। "কী হোলো মিনু? ফটো পেলে না?" স্বামীর গলার শব্দে মলিনা ঘাড় ফিরিয়ে মুখভার করে বললে, "না, মিথ্যে হয়রানি, ফটোও পেলুম না তোমার খাওয়ার কাছে যাওয়াও হোলো না। ঠাকুরঝির দুখানা ফটোর একটাও নেই, ভারি আশ্চর্য কিন্তু। কেউ বোধ হয় চুরি ক'রে নিয়ে গেছে—"

অরুণ হো হো করে উচ্চ হাস্ত করে উঠলো।

"ফটো চুরি। বলেছো ভাল মিনু। আগাথা ক্রিস্টির বই আজকাল খুব পড়ছো না?"

মলিনা বললে, "অমনি অমনি হাসলেই হলো, না যদি চুরি হবে, তবে দুখানা ফটোই একসঙ্গে হাওয়া হয়ে উড়ে গেলো নাকি?"

অরুণ হাসি মুখে বললো, "হয় মিলি সরিয়ে রেখেছে, নয় কোন বান্ধবীকে দিয়েছে টিয়েছে—আজ ক্রিস্টির কোন বই খানা শেষ করলে?"

"হুঁ, না পড়েই বইয়ের সমালোচনা—। ওটা তোমার ভঙ্গিতে বাধে বলেই আমতায়। এমন কোর্মুল রাইটিং আর এমন সব থ্রিলিং গল্প, একখানা পড়লে ওঁর লেখা সব বই শেষ না করে আর ছাড়তে না—তা আমি লিখে দিতে পারি—"

অরুণ শূন্য পেয়ালা ট্রেপয়ে নামিয়ে রেখে স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালো। হেসে হেসে বললো, "তারিণে কোন বই

পড়ে ফেলেনি মিনু, তাহলে তো চাকরী রাখা দায় হতো আমার, যা চাকরী আমাদের. সময় পেলেনা এক কৌটা, বই শেষ করে ছিউটি দিতে গেলে চাকরী একেবারেই নাই।" মলিনা ফ্রেমটা যথাস্থানে আবার রাখতে রাখতে বললে, "এই শোনো। ভাল কথা মনে পড়েছে, তুমি কিন্তু খবরদার আমাকে আর মিনু বলে ডেকোনা। কাল তুমি ডাকছো আমাকে, আর মিসি ঠাকুরঝি পড়ার ঘর থেকে সাড়া দিচ্ছে "যাই বাবা, যাই বাবা।"

"ও। এই কথা—" অরুণ মুখটিপে হাসলো. "তোমাকে তাহলে মলিনা বলেই ডাকবো, কারুর মা-ঠা বলে মচ্ছবে ডাকা যেত কিন্তু সেদিক দিয়ে তো—"

"এই চুপ কাজলামো করতে হবে না—" মলিনা স্বামীর মুখ চেপে ধরলো। অরুণ হাতটা ধরে নামিয়ে নিয়ে হেসে বললো, "তাহলে মলিনা, ফটোর একটা কী ব্যবস্থা করা যায় বলতে পারো?"

"কী যাছে—ও নামে তুমি আমাকে ডাকতে পারবে না—" কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করে বললো মলিনা। অরুণ হাসলো, "সকলে যে নামে ডাকে সে নাম হ'লে গেলো বাজে. এবার কিন্তু যে নাম ঠিক করেছি, সেটা কানে কানে ডাকার নাম, কাছে এসো, যদি শুনতে চাও." মলিনা ভ্রুভঙ্গি করলো, "থাক মশাই হয়েছে—" গোল-টেবিলের ওপর ফটোর এ্যালবাম ছিলো একটা, সেটা তুলে নিয়ে মলিনা এবার ছুয়ারে রাখতে গেলো।

অরুণ বললো, "তোমার এই এ্যালবামে মিনির ফটো ছিলো নাকি?" মলিনা বললো, "হ্যাঁ, দাঁড়ানো ফটোখানা আমার এ্যালবামে ছিলো—।"

"কিন্তু মিলি তোমাকে না বলে তোমার এ্যালবাম থেকে ফটো তুলে নেবে, এমন ছাইলের মেয়ে তো ও নয়। দেখি ওটা—" মলিনা সেই খাপি ধারণাটা বার করে অরুণের হাতে দিলো, দেখেই বোঝা গেলো যে নিয়েছে সে কাজটা খুব দ্রুত সেরেছে, দু পাশের কর্ণারই টানের চোটে গেছে ছিঁড়ে, স্ত্রীকে মুখে কিছু বললো না বটে অরুণ কিন্তু মনে মনে ভাবলো, যে নিয়েছে সে না বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়াছে।

এরপর মলিনা এক ফাঁকে কথাটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে মল্লিকাকে, "আমার ফটো এ্যালবামটা একটু দেখছিলাম, তোমার ফটোর জায়গাটা খালি। তুমি নিয়েছো নাকি তুলে?" বিস্ময় কণ্ঠে মল্লিকা উত্তর দিলো "কী আশ্চর্য! আমি নিতে যাবো কেন?" মলিনা হঠাৎ বলে ফেললো, "তোমার ফটোগ্রাফের ফটো কী হোলো?" "কেন? সেটাও নেই নাকি?"

"না," মলিনা বললে।

"আশ্চর্য সেছে। ফটোটা আমার একেবারে ভাল লাগে না—" পড়ার ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালো মল্লিকা। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ভুরু কুঁচকে বললে, "হঠাৎ আমার ফটোর ওপর খোঁজ পড়লো কেন?" "দাঁড়াও, যা কেন ডাকছেন শুনে আসি—" মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে কোনমতে হাসি চাপতে চাপতে মলিনা নেমে এলো নিচে।

সৌম্য চাপা হাসি মল্লিকা দেখে ফেলেছে। ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে মল্লিকা ঢুকলো গিয়ে পড়ার ঘরে। তারপর এটাও মনে হোলো—সত্যিই তো ফটোগুলোই বা কী হলো?—ঠোঁট কামড়ে সামান্য একটু ভাবলো এ নিয়ে, তারপর চেয়ারে বসে অসমাপ্ত বইখানা টেনে নিলো সামনে—অরোপিথুজের সিলেক্টেড ডিলোগফিকাল এসেস্—।

মল্লিকা বলেছে অনেক। বেডাবে গেছেছে বই কিনেছে রাশি রাশি, আর ভুবে আছে দিনরাত তার মধ্যে। মায়াদেবী ভাবেন, বাপের মতো বইপাগলা হয়েছে মেয়ে, মলিনা ভাবে—মোটুল অভিনব ফুলের প্রতিটি

হচ্ছে। কিন্তু অল্প ভাবে অনেক কিছু। সন্ধ্যার পর গানবাজনা শেষ করে, মল্লিকা বোজই এসে দাঁড়ায় সামনের বারান্দায় খানিকক্ষণ। কতদিন দূর থেকে অশ্রু লক্ষ্য করেছে, বোনের এই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি। চেয়ে চেয়ে ওর মনে হতো, এখন ও বোন মিলি নয়—আর কেউ। কিম্বা মনে হতো, কাছে থেকেও মিলি একেবারে পর হ'য়ে গেছে, ক্রমশই যেন দূরে সরে সরে যাচ্ছে ওদের কাছ থেকে। ভারি কষ্ট হতো তখন। ওর বিবেক যেন একবারের দর্শন করতো। নিশ্চয়ই ওর কর্তব্যে কোথাও, না হ'লে এতদূরে চলে গেলো বোন কী করে? যে মিলি একদিন দাদার পা ঘেঁসে হেসে হেসে বলেছিলো—"দাদা তুই তো আমার গার্জেন?—আমাকে চল্লিশ না পার করিয়ে ঘরদোর কিছু দিবে দিবিনে—।" সেই কী ঐ যে, দাদার উপস্থিতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে বারান্দার অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে চোখ মেলে একেবারে পাথরের মতো নিশ্চুপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে? কী এত ভাবে মিলি দিনরাত? যা ভাবে, তা কী বাস্তব? যা পড়ে, তা কী চোখে না দাখায়…?

মল্লিকার ভাবনা থামতে না মেলে কোথায় ছুটে চলেছে দিকে দিকে, ও নিজেও কী তার খবর রাখে ছাই। এই তো, ডস্টোয়েভস্কির 'এ হিউ অন দি বিগিনিং এ্যাণ্ড এভরিথিং লাইকে'র চ্যাপ্টারটা খুলে রেখে ভাবছে—

কদিন তোফলদার বই ঘাঁটতে তুলে রাখার সময় [illegible] বইটা আবিষ্কার করেছিলাম, অবিকল সেইরকম [illegible] তো দেখতে পাচ্ছি, বৌদির ছোড়দা কল্যাণবাবুর। [illegible] কী চিকুটে আফসির ভদ্রলোক অরুচির বস্তু [illegible] বাবু নাকি? অথচ এই বাড়ীতে বসে, মেজ-[illegible] বিরুদ্ধে একদিন কী গরম গরম কথাই না বলেছিলেন। তর্কাতর্কি অবশ্য ভদিনীপতির সঙ্গেই হচ্ছিল। অল্প কোন পেয়ে কাজে চলে গেলো, মল্লিকা দাদার চেয়ারে বসে সেই মূলতুবি আলোচনা শুরু করেছিলো আবার। মল্লিকা যখন বললো "দেখুন কল্যাণ বাবু, দোষত্রুটি কোথায় নেই? অজস্র গলতি ধৈর্তমান-স্বদেশের মতন থাকতে পারে কিন্তু আমাদের মতো যারা সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন কাটায়, এই ধরুন, যারা ফ্রীজিডিয়ারে রাখা আইসক্রীম সন্দেশ খেয়ে বিয়ে বাড়াতে মোটরে হাওয়া খেতে বেরোয়, কিম্বা যারা নরম তুলতুলে গদিতে ফ্যানের বাতাস খেতে খেতে আরামে আস্তে আস্তে চোখ বোজে আর তারপর নীলাভ নরম আলোর স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে অত চটকরে স্বদেশদ্রোহিতের সম্বন্ধে মন্তব্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়।" কল্যাণ রাগেনি। বিস্ময়ে চোখ গোল করে বললো, "আপনিও কী ও সম্বন্ধে ভাবেন নাকি মল্লিকাদেবী"? মল্লিকা হাসলো, বললো, "আমি কেন ভাবতে যাব? আমিও তো গদিতে শুই আর ফ্যানের বাতাস খাই।" কল্যাণ বললো হাসতে হাসতে, "আপনি কিন্তু আমাকে ইন্‌সাল্ট করেছেন মল্লিকাদেবী। এইমাত্র আমি টুনটুনকে বলেছি—আজ আর কিছু খেতে পারবো না, অনেকগুলো আইসক্রীম সন্দেশ খেয়ে ফেলেছি। সেই আইসক্রীম যে এভাবে গরম হ'য়ে বোমা বিস্ফোরণের মতো আমারই ওপর ফেটে পড়বে তাতো একবারও ভাবিনি।"

অপ্রস্তুত হয়েছিলো মল্লিকা। কারোকে আঘাত দিতে চায় না। আনন্দে থাকুক সকলেই। সকলের মঙ্গল হোক্। প্রসঙ্গটাকে হালকা করার জন্য ও তোফলদার উল্লেখ করে ফেলেছিলো। কিরকম একটা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। কত সুখে স্বচ্ছন্দে অনায়াসে দশজনের একজন হয়ে দিন কাটাতে পারতেন। এখন ওঁর কাছে এসবের অতি সাধারণ বিছানায় শোওয়াও বিলাস।

বিছানার বদলে চাদর একখানা হলেই যথেষ্ট। বালিশের বদলে মাথায় দেন বই। নিজের বলতে যা কিছু, সমস্ত বেচে টাকা দিয়েছেন পার্টিকে। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ওঁর নিজের কতগুলি বই—যেগুলো ছিলো ওঁর কাছে সম্পদ, পার্টির অর্থের প্রয়োজনে বেচে দিতে হলো। এমনকী অ্যাঠারনায়ের শেষ পরিচিহ্ন রিস্ট-ওয়াচটা পর্যন্ত পাছলেন না রাখতে। অথচ তোষলদা সব সময় বলতেন—ঘড়িছাড়া আমার একটি সেকেণ্ড চলে না। এই যে আস্তত্যাগ, এইযে স্বার্থত্যাগ, কী দাম দিবেন তোষলদা আমাদের কাছে? বলতে বলতে কতবার যে মল্লিকার চোখ ভ'রে জল এলো, কতবার যে গলা ছলছলিয়ে উঠলো, তা কল্যাণের অজানা ছিলো না। কল্যাণ কিন্তু না বোঝার ভান করে, চটুকরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনা শুরু করেছিলো। মিনিট একটু পরে বোসের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই, কল্যাণ চলে গিয়েছিলো সেদিন। ঠিক তার দুদিন পরেই তোষলদার হাতে নোকুন সুদৃশ্য ঘড়ি দেখে মল্লিকা অবাক হ'য়ে জিগ্যেস করলো, "ঘড়ি কে দিলে তোষলদা?" তোষলদা দরজার তালা দিচ্ছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন একটু।

"আমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু—"তারপর তালা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "বুঝলি মিলি, ভগবানের অস্তিত্ব এক এক সময় বিশ্বাস না করে যেন আর উপায় নেই—" মল্লিকা ঘড়ির প্রশ্ন ভুলে গিয়ে চোখ বিস্ফারিত করে বললো, "তোমার কী ভগবানেও বিশ্বাস নেই নাকি?" তোষলদা মৃদু হেসে চলে গেলেন। কোন উত্তর দেননি। ঘড়ির কথা পরে আর একবার মনে হয়েছিলো। স্নানটিচ ঘিলে বন্ধনাদি যখন হাতঘড়িটা চেয়ে নিলেন, তখন মনে হয়েছিলো মল্লিকার, এত অভাব অনটনের মধ্যেও তোষলদা অমন দামী ঘড়িটাতো বেচেননি, [illegible] হবে বোধ হয় বন্ধনাদিরই উপহার এটা, আর বন্ধনাদি বোধ হয় অনেক চেষ্টায় কবুল করিয়ে নিয়েছিলেন যে এটা যেন কিছুতেই না বেচেন।

তোষলের মৃত্যুর কিছুদিন পর, মল্লিকা তোষলদার অবশিষ্ট কয়েকখানা বই ঝেড়ে দিয়ে মেজেঘষে তুলে রাখছিলো, কয়েকছত্র লেখা একটা ছোট্ট চিঠি পড়লো হাতে। লেখা পড়ে আবিষ্ট হ'য়ে বসে রইলো মল্লিকা কিছুকাল। লেখা ছিলো—"প্রিয় তোষলদাবাবু, ঘড়িছাড়া আপনার এক মুহূর্ত ও চলে না। আপনার কাজের ভারি অসুবিধে হচ্ছে। আমাকে আপনার একজন অ-কৃত্রিম বন্ধু বলে জানবেন। এই ঘড়িটা উপহার দিলেম আপনাকে এবং প্রতিমাসে এ ঘড়ির ব্যাটারির খরচ করে এইভাবে জানালা গলিয়ে রেখে যাবো, আমার একান্ত অনুরোধ ঘড়িটা বিক্রীকরে আপনার কাজের আর অসুবিধে ঘটাবেন না। ইতি অকৃত্রিম বন্ধু।"

লেখাটা মল্লিকা পড়েছে বহুবার। চিঠিখানা সযত্নে রেখে দিয়েছে তুলে, অ-নামা দাতা সম্বন্ধে ওর মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা স্থান নিয়েছিলো। তারপর কল্যাণের লেখা চিঠি দেখে দেখে ওর সে অস্পষ্ট ধারণা প্রায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সময় পেলেই মল্লিকার মনে সে ধারণা উঁকিঝুঁকি পড়ে। সেই ছোট্ট চিঠির কয়েক ছত্র লেখার মধ্যে, টাই-টাই আর য ফলার অদ্ভুত বিশেষত্ব মল্লিকার নজর আকর্ষণ করেছিলো প্রথমেই। বিলেত গিয়ে কল্যাণ প্রথম যে চিঠিখানা দিয়েছিলো মলিনাকে, তাতে ওপরে তার ঠিকানা ছিলো ক্রসকোর্ড-ষ্ট্রীট, ষ্ট্রীট লেখা দেখেই চমকে উঠলো মল্লিকা। অবিকল সেই সাহেবের মতন বাঁকা টাই, আর একটু বেশীরকম নিম্নাভিমুখী য-ফলা। ওর [illegible] ভাব লক্ষ্যকরে মলিনা সহাস্যে বললো, "কী ঠাহর হচ্ছে। অমন হা করে দেখছো কী? চিঠিখানা পড়ে দেখো, 'বিলেতে প্রথমদিন' বলে কী মজার বর্ণনা দিয়েছে ছোড়দা।

তারপর অবশ্য মল্লিকা সহজ হবার চেষ্টা করে, হাতবাড়িয়ে চিঠিখানা পড়লো।

এরপর মল্লিকা কয়েকদিন কেবল ভেবেছে আর ভেবেছে। ভাবনাকে চাপাদেবার জন্য বই কিনেছে পাদা পাদা আর তাতে ডুবে গেছে। কিন্তু তবুও ছাপার অক্ষর ওকে আশ্রয় দিল কৈ? অনবরতঃ বই পড়ে পড়ে, মনের উত্থান বন্ধন মল্লিকা থামিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু মাসখানেক আগে, রমা সান্যাল যেদিন এসে তার বিয়ের নেমন্তন্ন করে গেলো মলিনাকে, সেদিন থেকে ওর মনের ছোটোয় এসেই ফুলে ফেঁপে উঠলো, ওর সাধ্য নেই সে উদ্দাম গতি রোধ করে।

মল্লিকার এখন ভাল লাগে না ভোরে উঠতে, মন লাগে না ব্যায়াম করতে, আনন্দ পায় না কোথাও যেতে, শুধু করে যায় ও সবই যেন প্রাণহীন যান্ত্রিক নিয়মে। শুধু নির্জনতা ভাল লাগে, আর ভাল লাগে ভাবতে।

রমা চলে যাওয়ার পর মলিনা ওর কাছে এসে আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে বলেছিলো "কী কাণ্ড! ছোড়দার বন্ধু সুশীল চট্টর সঙ্গে আজ তিনবছর ধরে রমার এনগেজমেন্ট হ'য়ে রয়েছে, অথচ আমি তার বিন্দু বিসর্গ কিছু জানিনে। কত না খেপিয়েছি আমি ছোড়দাকে এই জন্য—। যাক্‌গে। কী দুষ্টু এই ছেলেটা, আমাকে কিছু বলেনি—।"

"কেন, কেন বলেননি কেন?" মল্লিকা জিগ্যেস না করে আর পারলো না, "সুশীলবাবুর মানা ছিলো একেবারে। ওঁর বাবা গোঁড়া হিন্দু কিনা, কানে শোনে আর মনে ছিলো না। তাছাড়া উনি ছটের অসুখে ভুগছিলেন খুব। সামান্যতম উত্তেজনাতেই নাকি মৃত্যু অনিবার্য, তাই ওরা এ ভাবে চেপে রেখেছিলো ব্যাপারটা, বেচা-কা ছোড়দা! আমি রমার কথা নিয়ে কম আলিয়েছি" ছোড়দা সামনে নেই তবু অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর বার হলো মলিনার, মল্লিকা প্রশ্ন করলো "সুশীল বাবুর বাবা বুঝি মারা গেছেন?"

"হাঁ, মাস ছয়েক হলো, আর সুশীলবাবুর মা নাকি খুশি হয়েই এ বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন।"

সে দিন বইয়ের গন্ধে গন্ধে রমা সান্যাল মল্লিকার পড়ার ঘরেও ছিল কিছুক্ষণ—। "তোমার ছোটখাটুকুতে তো নেহাৎ মন্দ বই নেই মল্লিকা—"বইগুলোর উপর চোখ বুঁজতে বুঁজতে বললে রমা সান্যাল। তারপর একপাশে সারি সারা ইংরেজি গল্পের বইগুলোর ওপর চোখ রেখে বললে, "ওগুলো খুব নামকরা বই। আমার এখনও পড়া হয়নি, এরপর একদিন সময়মতো এসে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবো, মল্লিকা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই রমা আবার বললো "কল্যাণবাবু বিলেত গিয়ে অবধি আমার বন্ধু বই পড়ার অসুবিধা হচ্ছে, এখন আর তেমন—"

"ওগুলো তো কল্যাণবাবুরই বই" মল্লিকা বলে উঠলো

"তাই নাকি? কটা কবিতা কপি করতে হয়েছে তোমার?"

"কবিতা কপি কিরকম?"

"আমার সঙ্গে ঐ কলকিসন ছিলো কিনা' রমা হাসতে হাসতে বললো।

"কবিতা লেখেন নাকি কল্যাণবাবু?" মল্লিকার কণ্ঠে অল্প কৌতূহল, "লেখেন মানে—অনবরত লেখেন, দিনরাত লেখেন আর দিনরাত পড়েন। কেন, তুমি "প্রতিমুখে"র লেখা কবিতা পড়োনি? প্রায় প্রত্যেক মাসিক আর ত্রৈমাসিক পত্রিকাতেই তো ওঁর লেখা বেরোয়—"খুশিতে ঝলমল রমা সেদিন মল্লিকার দ্রুত বিস্ময় লক্ষ্য করেনি।

"প্রতিমুখই কল্যাণবাবু? আমরা কেউ তো তা জানি না, বৌদি পর্যন্ত না—। আমার নীলুদা তো দারুণ ভক্ত প্রতিমুখের কবিতার। কী অদ্ভুত আশ্চর্য্য। তারপর মল্লিকাও উঠেছিলো ঝলমলিয়ে।

রমাকে এগিয়ে দিয়ে মলিনা উল বুনতে বুনতে আবার ছোটঘরে ঢুকলো, "রমার বিয়ের পরদিন ভাবি মজালগঞ্জে না ঠাকুরঝি?" একটু চিন্তা করে, "আচ্ছা কে তাহলে ছোড়দার মনোনীতা হতে পারে বলোতো?"

মল্লিকা মুখ ভার করে বললো, "বারে—আমি কি করে বলবো?" মলিনা মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আজ যে বড় খুশি-খুশি? ভালবাই বুঝি একখানা সেধে করলে?" মল্লিকা সামনের খোলা বইখানা তুলে মুখ আড়াল করে বললে, "হ্যাঁ।"

ছি. এ. পরীক্ষার দিন দশেক বাকী মল্লিকা ছোটঘরে বসে দাদার জন্য অপেক্ষা করছে। অরুণ গেছে নিউ আলিপুরে। নীলুর কাছথেকে কয়েকখানা বই আনতে, পরশু এসেছিলো ছোলা খবর দিয়ে গেছে, নরনারায়ণবাবু রিটায়ার করে নিউ আলিপুরের বাড়ীতে এসে গেছেন। মল্লিকার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে জানতে চেয়েছিলো ভোলানাথ, মুখ ভার করে বললো, 'কিছু হয় নি ভোলাদা, যে মেয়েরা বারটায় হতে পারে না, তাদের অনার্স নেওয়া একদম উচিৎ নয়—

"কেন রে—?

"লাইব্রেরীতে যেতে না পারলে সব বই কী আর কিনে পড়া যায়?" "তা বটে, তা—আজকাল তো সব মেয়েরাই লাইব্রেরীতে—"নিমিমার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় থেমে গেলো ভোলা। তারপর বললো, "তুই বড্ড ভুল করেছিস্ মিলি, এ্যাদ্দিন একটা চিঠি কেন দিস নি নীলুকে? ওর কাছে সেলাই হিন্ট্রীর রেয়ার বই আছে। "ইস্—" বলে মল্লিকা আরো মুখভার করে বসে রইলো। "তা—তুই এক কাজ কর" ভোলা বললে, "তুই বরঞ্চ কাল গিয়ে নীলুর কাছ থেকে বেছে-টেছে কয়েকখানা বইনিয়ে আয়—। এ কদিনে যতটুকু পড়তে পারিস সেরে ফেলা করে—।" মল্লিকা যায়নি। তাই সন্ধ্যের দিকে অরুণের অবসর ছিলো। ওকেই খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে পাঠিয়েছে।

সিঁড়িতে দাদার জুতোর শব্দ শুনে, মল্লিকা ওর ঘর—ছেড়ে তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরে এগিয়ে এলো। বোনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তেই মুখ ঘুরিয়ে নিলো অরুণ। হাতের মোটা মোটা বই চারখানা খপ্‌করে সামনের চেয়ারটায় নামিয়ে রেখে, বোনের সঙ্গে কোন কথা না বলে, সটান নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মল্লিকা অবাক। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো দাদার ঘরে দরজা পর্য্যন্ত। পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালো একটু। অরুণ জুতো শুদ্ধ বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে। দুহাতের মধ্যে মুখ ঢাকা। মল্লিকা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো। একছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে।—নিশ্চয়ই মামাবাড়ীতে কারুর কিছু হ'য়েছে। মাকে প্রথমেই জানাতে সাহস পেলোনা। ইশারায় বৌদিকে ডাকলো, "বৌদি! শিগ্‌গির দাদার কাছে যাও। কী যেন হ'য়েছে দাদার—।" মল্লিকা হাতের কাজ ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়োলো। মল্লিকা ঠায় ওখানে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর পা যেন কে আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। খানিক পরে মলিনা ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'ঠাকুর-ঝি ভাই, কী যেন সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। মাকে খবর দিতেই হবে। উনি একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদছেন।" মায়াদেবী ভাঁড়ার ঘরে ছিলেন। ওখান থেকেই ওদের দু চারটে অস্পষ্ট কথা কানে গেছে। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাস করলেন, 'কী হ'য়েছে বউমা?" মলিনাকে কাঁদতে দেখে কেঁপে উঠলেন,

"অরুর পায়ের শব্দ শুনলুম না? এসেছে অরু? কিছু বলছে নাকি তোমাকে—হ্যাঁ বউমা?" মলিনা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললো, "না, কিছু বলেননি, এসেই শুয়ে পড়ে কাঁদছেন।" মায়াদেবীও ছুটলেন

উর্ধ্বশ্বাসে। মলিনা, মল্লিকা মলিনমুখে মায়াদেবীর পেছু পেছু উঠে এলো।

"অরু বাবা! কী হয়েছে?" মায়াদেবী অরুণের গা ঘেঁসে খাটে বসতে বসতে বললেন। অরুণ ফুলে ফুলে কাঁদছে। কাঁদতেই থাকলো। মায়াদেবী কোনমতেই অরুণকে শান্ত করতে পারলেন না। বলছেও না কিছু গাল দুটো শক্ত করে চেপে ধরেছে বালিশে।

মায়াদেবী কেঁদে ফেললেন, "ওরে অরু। বলবে বল্। আমার দাদা নেই-রে? সবাইকে ছেড়ে দাদা আমার চলে গেছেন, তাই না? খুলে বলবে অরু—। দাদা যে শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন, কলকাতায় এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। যাবতে হবে দাদার কাছে কিছুদিন, সব শেষ হ'য়ে গেলো। আমার সব শেষ হয়ে গেলো—।" অরুণ এবার অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ভাঙা গলায় বললো, "আমাদের সবাই ভাল আছেন, কিন্তু দাদুনি—"

"তবে অমন করিস্ কেন অরু? খুলে বল। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে" গলা কাঁপতে লাগলো মায়াদেবীর।

অরুণ টানদিয়ে পকেট থেকে একটা বড় আকারের খোলা খাম মার হাতে দিয়ে আবার উপুড় হ'য়ে মুখ গুঁজলো। মায়াদেবী কাঁপতে কাঁপতে খামের ভেতর থেকে চিঠি বার করলেন। প্রথমেই চোখে পড়লো চিঠির ভাঁজে একখানা ফটো অনিন্দ্য সুন্দর স্বর্গীয় সুষমা দিয়ে ঘেরা দুটি শিশুর ছবি, পাঁচ-ছ' বছরের একটি মেয়ে আর বছর দুয়েকের একটি ছেলে, সামনের দিকে ঝুঁকে বড় বড় কৌতূহলী চোখ মেলে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে,—ঠিক এমন একখানি মুখ বুকে চেপে ধরে মায়াদেবী প্রথম মাতৃত্বের আস্বাদ পেয়েছিলেন। আর এই যে সুন্দর মেয়েটির মতো—সেকি—সে ও কি—। কম্ কম্ করে কেঁপে উঠলেন মায়াদেবী। চিঠি পড়তে কষ্ট হচ্ছে, তবু বারে বারে চোখ মুছে মুছে চিঠি পড়তে লাগলেন। পেন্সিলের বড় বড় আঁকা বাঁকা করে লেখাটা পড়লেন [illegible] দিদা, না বলে তুমি রাগ করেছো, যাকে ভালবাসি না, কত বড় রাগ করেছো তুমি দিদা? আমি সারাদিন দুষ্টুমি করি, মা তো ভালবাসে। মিঠু তো ভয়ানক দুষ্টু, কারুর কথা শোনে না কেবল পাকামতী দিয়ে ওটা কথা করে তবু তার দিদা আসবে পাঠিয়েছে—বোঝা-মাত্র—। তুমি পার দিদা আসতে যাবাতে—আর স্কুলের আচার! মা বলে পার—তবে আমাদের পাঠাও না কেন—রুমা।

পরের চিঠিখানা আর ঠিকমতো পড়তে পারলেন না মায়াদেবী। ঝাপ্সা চোখ টেনে টেনে খুলে খুলে পড়তে চেষ্টা করছেন।

ছোলাদা, তুমি একবারটি এসো। আর যুক্ত মাসিমা রুমা। রুমার প্যাসলামি তো জানিয়েছি তোমাকে। যখন যেটা ভাবে দিনরাতই ভাবে—ভোলে আর না। বরফের সময় সবাই সিমলা ছেড়ে কোথাও না কোথাও যায়, সীজন চাইবে সকলের বাড়ীতে কেউনা কেউ আসে। আমরা কেন যাইনা কোথাও—আমাদের কেউ কেন নেই? রুমার অসংখ্যবার এই প্রশ্নের অসংখ্যরকম উত্তর দিয়েছি।

আমাদের নিকটতম বাঙালী প্রতিবেশী একজন ডাক্তার। ওঁর মেয়ে মিঠু রুমার রাতদিনের খেলার সাথী। কিছুদিন হল মিঠুর ছোটমামা সিমলা বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন মার হাতের তৈরী বাঙালী-দেশের খাবার। সেই মিঠুর দেওয়া খাবার খেয়ে রুমার আশ মিটছে না—দিদাকে ও খুঁজে আর দরকারই। কাল সকালে খেলা ফেলে কাঁদতে কাঁদতে রুমা এসে হাজির, —মা! মিঠুর সঙ্গে আড়ি, আর কখনো খেলবো না ওর সঙ্গে। ও বলে কিনা—তোর দিদা নেই, নিশ্চয়ই আমার দাদুর মত সগ্গে চলে গেছে, তাদা হলে—কেঁদে আমার

বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো রুমা। আমি তখন জবাব দেবো কি? মা, মেয়ে দুজনেই কাঁদছি। কোঁপাতে কোঁপাতে রুমা জিজ্ঞেস করলে—বলো না মা সত্যি করে আমাদের দিদা কী নেই? চীৎকার করে উঠলাম—ওরে রুমা, কী অলুক্ষুণে কথা বলছিস্ রে তুই? তোদের সব আছের সব আছে। তোদের দিদা, সে যে কী দিদা—কী করে তোকে সে কথা বোঝাইরে, কত পুণ্য ফলে অমন মা পেয়েছিলাম আমি, কত তপস্যা করে পেয়েছিলাম অরুর মতো ভাই, মিলির মতো বোন, আমীর হীরা পান্নার মতো ভাই বোন্—ওরে রুমা—।

হঠাৎ মায়াদেবী জ্ঞান হারিয়ে বিছানার পাশ থেকে নিচে পড়ে গেলেন। ফটোখানা ছিটকে ঘুরে গিয়ে পড়লো। শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠলো অরুণ। অস্ফুটে চীৎকার করে উঠলো সকলে। ধরাধরি করে সবাই মায়াদেবীকে খাটে শোয়ালো। ঝলিমা ছুটোছুটি করে নিয়ে এলো জল আর পাখা। মল্লিকা দাদার হাতে হুয়েলিং-সল্টের শিশি এনে দিয়ে, হেঁট হয়ে চিঠি ও ফটো তুলে নিলো। তাকিয়ে রইল ফটোর দিকে। চিনতে লাগলো যেন। ফটোর নিচে নাম লেখা রুমা—বাচ্চা। রুমা-বাচ্চা, রুমা-বাচ্চা নাম দুটো মনে মনে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে লাগলো মল্লিকা। তারপর শুরু করলো চিঠি পড়া। চিঠির শেষে চারেলি জানিয়েছে-কালকেই রুমা তার দিদার কাছে দশখানা চিঠি লিখে ফেলেছে। পাঠাতেই হবে ঠিকানা দিয়ে। ও নিজে চাপরাশীর সঙ্গে গিয়ে ডাকে দেবে সে চিঠি, দেবেই। করি কি? ওর সেই একখানা চিঠি তোমার ঠিকানা দিয়ে পাঠাতে হলো। কবে থেকেই তো আসবে আসবে করছো তোমরা, এসোনা একটিবার। আমাদের কথা মাই না লিখলাম। রুমা-বাচ্চা মাথা পেরে বড় হ'ক। মল্লিকার বুক অসহ যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো। চাপা গোঙানির শব্দ শুনে মল্লিকা ছুটে এলো যার কাছে। বৌদির হাত থেকে পাখা নিয়ে মা'র মাথার জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগলো। মায়াদেবীর সোঙনি বেড়েই চলল ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। বেদাক্ত হয়ে উঠলো সারা শরীর। অরুণ জলের ঝাপটা দাওয়া থামিয়ে অপরাধীর মতো মুখ ক'রে মা'র পায়ের কাছে গিয়ে পায়ে হাত বুলোতে লাগলো। মাকে মেরে ফেললাম বোধহয়—তীব্র কষ্টের সঙ্গে অনুশোচনা শুরু হলো। মল্লিকা কি ভাবলো পাখা রেখে নেমে এলো নিচে। মা'র উদ্দেশে মুখ নরম ক'রে পাথরের পেয়ালায় আধ পেয়ালা আন্দাজ দুধ ঢেলে, এক চামচ ব্রাণ্ডি মিশিয়ে দ্রুত পায়ে ফিরে এলো। খুব আস্তে আস্তে প্রায় কোঁটা কোঁটা করে মাকে দুধ খাইয়ে দিলে কিছুটা। মিনিট একটু পরেই মায়াদেবীকে স্বাভাবিক মনে হলো। হাত বাড়িয়ে ফটো চাইলেন, তারপর বুকে চেপে ধরলেন সেটাকে। সব চুপ, সব স্থির। কেবল মাঝে মাঝে মায়াদেবীর বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস শব্দ ক'রে বার হয়ে বাতাসে মিশিয়ে যাচ্ছে। মনে হলো এই ভাবেই সারারাত কেটে যাবে বুঝি বা। টপ্ করে এক কোঁটা উষ্ণ অশ্রু মায়াদেবীর কপালে পড়লো। মায়াদেবী চোখ মেলে তাকালেন মাথার দিকে। মল্লিকা করুণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কাল চোখে জল টলমল করছে। মায়াদেবী যেন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চোখ আবার বন্ধ করে ফেললেন। সকলে একেবারে চুপ। শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মার মুখের দিকে একদৃষ্টে। ঘরের আবহাওয়া ভিজে ভিজে কেমন যেন ভয়ঙ্কর। টপ্ করে মায়াদেবীর কপালে আর এক কোঁটা জল পড়লো। মনে হলো মায়াদেবী কেঁপে উঠলেন, চোখ খুললেন আবার। মাথার দিকে আর না তাকিয়ে তাকালেন পায়ের দিকে। অরুণ শঙ্কিত মুখে মার পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে

চিৎ করে ডাকলো—"মা! মা—!" মাতাদেবী তাকিয়ে রইলেন একটু কাল ছেলের ভাতর মুখের দিকে। তারপর যেন সব দিধা-দ্বন্দ্বের অবসান করে সমস্ত শক্তি দিয়ে হঠাৎ উঠে বসলেন খাটের ওপর। হাপাতে হাপাতে বললেন "চল্ অরু, কালই আমরা সকলে চাবেলির কাছে যাই।"

[ক্রমশঃ]

কবিতা

আকাশের শীত ও বসন্ত

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

একটু হিমেল ঠাণ্ডা, মধু-স্বপ্নে রাত হলে ভোর—
পূবের বারান্দা থেকে দূরের পারুলডাঙা রাঙা
গৈরিক ধুলোয় মেশা সকালের সূর্য উঠে আসে ;
ছড়ানো বুকের পরে অনাবিল সুখস্পর্শ তার।

ছড়ানো এখানে মাঠ, সুনিবিড় নেই তরুছায়া—
অযুত আলোর ঘোড়া নিমেষেই দিকে দিগন্তরে
আগুন ছড়িয়ে নামে ; হাড় মাস, পোড়া ধুলোমাটি
হাঁ-করা কুকুর হয়ে পড়ে থাকে বুকে নিয়ে ত্রাস।

সে-বুঝি অনাদি তৃষ্ণা ! নিংড়ে এ রোদ্দুরের হিমে,
অথবা আত্মার নীড় ? চলে পড়বে বিকেলে আকাশে—
আরো বড় কোনো তৃষ্ণা-আরো ব্যথা আদ্রুত ভ্রূণের
গাঢ়তম অন্ধকারে চলে যাবে দিন অবসানে ?

আকাশ নক্ষত্রময়—আরো আলো পৃথিবীর রাতে
আমি খোলা বারান্দায়, সুরভিত সন্ধ্যা হাওয়া দেয়।

চিঠি

সনাতন মণ্ডল

হলধর পূজার ছুটিতে এই বার বাড়ি এসে পৌঁছাল।

সঙ্গে তার স্ত্রীও এসেছে—তার নাম চাঁদিমা।

সন্ধ্যা হলধরের নাম শুনেই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে। ছুটে আসার কারণ আছে। তার স্বামী কলকাতাতে থাকে। আজ প্রায় দু'বছর হ'ল বেশেও আসেনি টাকাও পাঠায় না। চাঁদিমা সন্ধ্যাকে দেখে ঈষৎ হেসে বললে, "কি-লো সন্ধ্যে-দি, কেমন আছিস? বল্।"

সন্ধ্যা ছিন্ন মলিন কাপড়টা গায়ের সঙ্গে ভাল ভাবে জড়িয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললে, 'মলেই বাঁচি, পড়ামুখো ঘরের কি কোন আক্কেল-বুদ্ধি আছে? তা আমার কথা যাক্। তোরা কেমন বল?"

হলধর গামছা নিয়ে পুকুরে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সন্ধ্যার দিকে চাইল।

চাঁদিমা বললে। 'কেন ভাই ও কথা বলছিস সন্ধ্যে? সংসারকরা ও মোটে শুরু। মাত্র একটা ছেলে। এরি জন্যে মরণ ডাকছিস কেন?'

সন্ধ্যা একটু বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, তারপর মান-বাঁধানো দাওয়াতে ঠেশ দিয়ে বসে বললে, 'আচ্ছা তোরা ত কলকাতায় থাকিস, হরিঘোষ ষ্ট্রীটটা কোথায় বলতে পারিস?'

হলধর বললে, 'কেন দাদা আসেনা বুঝি? তা ঐ তো—মানে, আমাদের বাড়ির কাছ থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।'

সন্ধ্যা বললে, 'তা ঠিক ধরেছ ঠাকুর-পো। আমাকে একবার তোমরা নিয়ে যেতে পার? জেনেছি সবই, জানতে কিছু বাকি থাকে না। তবুও একবার শেষ বারের মতো মিনসেকে দেখ্‌তেম।'

চাঁদিমা হলধরের মুখের দিকে চাইল। চাউনির অর্থ, বলে দাও না? আমরা পারব না। 'সন্ধ্যার স্বামী লোকটা চরিত্রহীন। শেষকালে নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়ব আমরা।'

হলধর বললে, 'তা বউদি তোমার হুট্‌করে যাওয়া কি উচিৎ? বরঞ্চ একটা চিঠি লিখে দাও।'

সন্ধ্যা সহসা উঠে দাঁড়াল। 'তারপর পেটের তলা থেকে একটা পুরনো চিঠি বার করে চাঁদিমার হাতে দিয়ে বললে, দেখ্‌তো পড়ে? তবে তাই যে, মনের মতো ক'রে একটা চিঠিই লিখে যে।'

হলধর পুকুরে চলে গেল।

হলধরের মাস্তীয়ের মতো দূর সম্পর্কের এক মাসী এবং মাসীর একটি নাবালক পুত্র। মাসী ছেলেটাকে নিয়ে এই হলধরের বাড়তেই থাকে। একতলা ইটের দু'টি কুঠুরী। সারা বছর মাসীর দখলেই থাকে। কিন্তু কখন কখনও যদি এরা বাড়িতে আসে একটা কুঠুরী খালি ক'রে দিতে হয়।

মাসীর নাম করুণিনী। করুণিনী তাড়াতাড়ি কুঠুরী খালি করছিল। কিন্তু দাওয়াতে সন্ধ্যাকে দেখে বেরিয়ে এসে বললে, "কি লা সন্ধ্যে, তোর কি কোন আক্কেল নেই? বাছারা বহুকাল দিনে সাধ ক'রে বাড়ি এল কি তোর

চিঠি লিখতে? যা হোক যা! এমন চিঠি লেখা বাই ত কাউকে দেখিনি! যদি কেউ একটু লিখতে পড়তে জানে শুনেছে ও সন্ধ্যা চিঠি নিয়ে চলল দেখাতে, বলি ওর কি আর লজ্জা শরমের কোন বালাই আছে? ধিক্।'

কথাটা মিথ্যে নয়। এ-গ্রামে দু'একটা ছেলে মাত্র লেখা পড়া জানে, সুতরাং তাদের দেমাক বড্ড বেশী। কিন্তু লিখতেও যা ভাল জানে কৈ? সন্ধ্যা বলে এস, তারা লেখে অন্য। সন্ধ্যা বলে, প্রথমটায় কি লিখলি হারু?

'পূজনীয়।'

'এই দেখ, বরাবর প্রাণেশ্বর লিখে আসছিল, আজকে পূজনীয় লিখলি কেন? না, বাবলের কাছে গেলেই ভাল হত। না, ওটা কাটু, লেখ প্রাণেশ্বর।

হারুর বয়স আঠারো। তার লজ্জা হয়। তার মুখটা রক্তিম হয়ে ওঠে। সে মুখ নিচু ক'রে বলে, 'না সন্ধ্যে দিদি, আমি ও-সব লিখতে পারব না—বরঞ্চ বাবলের কাছেই নিয়ে যাও।'

প্রাণেশ্বর কথাটা লিখতে কি এমন যে লজ্জা, গ্রাম্য মূর্খ সরলা যুবতী সন্ধ্যা তা বুঝতে পারে না। রাগ ক'রে বলে, 'চিঠি লিখতে গেলে ওটা লিখতে হবেই, লিখতে হয়। উনি যখন বাড়ি এসেছিলেন, আমাকে বলে গেছেন। লক্ষ্মী ভাই,—ওটা কেটে প্রাণেশ্বর লেখ।

হারুর লজ্জায় বাকস্ফূর্তি হয় না। সে অগত্যা কেটে লিখে দেয় 'প্রাণেশ্বর'।

বাড়ি আসতে আসতে মনে মনে বলে ধিক্ আমাকে। একটা চিঠি লেখার জন্যে এত কাকুতি-মিনতি! আজকে এই ধিক্ কথাটা সন্ধ্যার প্রাণে বড্ড বাধা দিলে। সে বললে, 'অন্তর্যামী, তবু ধিক্ কেন, আমার অদৃষ্টকে শতধিক; তোমরা অভিশাপ দাও আমার যেন মরণ হয়!

তখন মাসী তখনও ঘরে চলে গেছে।

সন্ধ্যার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

চাঁদিমা সন্ধ্যার কথায় প্রাণে অত্যন্ত আঘাত পেল, সে বললে, এই চিঠিটা দু'মাসের আগেকার। কাউকে পড়াসনি?'

সন্ধ্যা বললে, 'হায় আমার অদৃষ্ট! তবে বলি শোন, ছোড়া দু'টোকে কিছুতেই চিঠিটা পড়াতে পারিনি। তারা বলে, 'হবে না সন্ধ্যে-দি বাড়িতে বারণ করেছে। তা কি লিখেছে রে?'

চিঠিটা পড়ে চাঁদিমা হেসে বললে, 'লিখেছে কার্তিক মাসে তোকে এসে নিয়ে যাবে। যেখানে কাজ করত সেখান থেকে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন এক জায়গায় কাজে লেগেছে, কিন্তু টাকা পাঠাতে একটু দেরী হবে।

সন্ধ্যা পুলকিত হয়ে বললে, 'আসছে-মাসে?'

'হ্যাঁ। যাবি ত?'

সন্ধ্যা একটু মুচকে হাসল। তারপর বললে, 'তেমন অদৃষ্ট আগে হোক তারপরে কথা। তা চিঠিটা লিখে দে ভাই।'

'কি লিখি বল?'

'লেখ, প্রাণেশ্বর তোমার—'

চাঁদিমা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। তারপর হারুর দিকে বললে, 'দূর এখন কেউ প্রাণেশ্বর-টর লেখে না। এখন লেখে, প্রিয়তমেষু।'

সন্ধ্যা বললে, তোরা কলকাতাতে থাকিস্—যেটা ভাল হয় লিখে দে ভাই, আমি কিছু বুঝিনে। ভাগ্যিস্ তোরা গাঁয়ে এসেছিলি, এমন ওছিয়ে কথা লেখা হারুর দ্বারা হত না। কি বললি, 'প্রিয়তমেষু?'

তরঙ্গিনী হন্তদন্ত ঘরে ঢুকল, তারপরে বললে, 'এখনও লেখা হল না? ধন্যি তোর চিঠি লেখা সন্ধ্যে?'

সন্ধ্যা ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

চাঁদিমা দ্রুত কলম চালায় চিঠিটা সমাপ্ত করবার জন্য।

হলধর ঘরে ঢুকে বললে, 'কি ধন্যি মাসী?'

তরঙ্গিনী হাত নেড়ে বললে, 'ঐ সন্ধ্যের চিঠি লেখা

কি যে লিখবে তা আর ও পাচ্ছে না। আমি, আমি সবই, তবুও যদি কল্‌কেতের মিন্‌সে পুছতো ?'

হঠাৎ লজ্জায় চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভংগমাসী মেটা লক্ষ্য ক'রে হয়তো নিজেও একটু লজ্জা পেল। কথাটাকে ঢেকে দেবার উদ্দেশ্যে বল্‌লে, 'তাড়াতাড়ি নে বউমা, ও-ঘরে খাবার হয়ে গেছে, পড়ে পড়ে জুড়োচ্ছে।'

চাচিমা বললে, 'ওকে দাওগে মাসীমা, আমাকেও মনোরমাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে, তা না হলে সে বড্ড উদ্বিগ্ন হবে।'

'সে আবার কে গো বাছা ?'

'কল্‌কাতার চেনাশোনা বন্ধু।'

ভংগ মাসী মুখটা একটু বিকৃত ক'রে বল্‌লে, 'বন্ধু'। তারপর ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে স্বগতোক্তি করে বলে চল্‌ল, 'না, শুধু সন্ধ্যেরই চিঠি লেখার বাই নেই। আমাদের বউ-এরও ও-বাই রয়েছে। জানিনে বাপু, ঐ চিঠিতে কি রস থাকে ? আমাদের বেলায় ও-সব ছিল না। আজকাল মেয়েদের বোঝা ভার। খামাকায় শুধু লিখছে চিঠি, চিঠি, চিঠি।।'

কবিতা

পশু প্রাকৃত

নকুলা চক্রবর্তী

ইটে ইমারতে ধূসর করেছ শ্যামল ধরনী
বিমর্ষ বিশুষ্ক বনস্পতি—
ঘুরে গেছে সভয়ে সঙ্কোচে—
ঘুরে চলে গেছে দূরে প্রান্তর।
বিদ্যুতে বাষ্পেতে আর যন্ত্রের গর্জনে
আকাশ-বাণীর গানে
ঘুরে বেড়ায়ে,
বাতাস, ফোঁপানে, গুলি, গ্যাসের বোমাতে
তাণ্ডবে ও সত্যাগ্রহে আর ধর্মঘটে
অকৃত্রিম অনাবিল আদিম প্রকৃতি
সম্পূর্ণ হারিয়েগেছে।।

তবু প্রাজ্ঞ, বলো
সে আদিম প্রবৃত্তিকে পেরেছো ঠেকাতে ?
আরক্ত সে হিংসারে ?

পারোনি।। কেন তা জানো ?
পশুর দেহেতে আর তোমার তনুতে
একই অণু রক্ত-রক্ত,
সেই রক্ততারে—
কেবলই পেছনে টানে যেমন তব।।

পাশ্চাত্যের চোখে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান সর্বত্র পূজিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র সেই 'বিদ্যার' বলেই স্বদেশের স্কুলে অকর মশোমালা পরিয়ে অপমানিত ভারতের বাণীকে বিজয়ী করিয়েছিলেন। প্রথমে যদিও তাঁর 'বিদ্যাকে' বিজ্ঞানমণ্ডলীর সামনে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচিত সীমা অতিক্রম করে জ্ঞানের দিগন্তকে দূর প্রসারী করিতে গিয়ে সেদিন তাঁর কাছে পৃথার চেয়ে বাধাই এসেছিল অধিক। কিন্তু সে বাধা ক্ষণস্থায়ী। 'যে সিদ্ধান্তকে স্বয়ং সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে বিদ্যা সত্যকে প্রকাশ করে তা সর্বত্র ও সর্বদা পূজ্য। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ভারতের এই পূজা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞান শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল।' শুধু স্বদেশের বন্ধু বা স্নেহাতুর ভক্তের অবদানেই নয়, তাঁর খ্যাতির শঙ্খ বেজেছিল বিশ্বে দিগন্তরে, সমুদ্রের একূলে ওকূলে।

'সমুদ্রের ওকূলে তাঁর মনীষার স্বীকৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণিধান যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন 'ভারতবর্ষের অন্তরের ঘোড়া তোমার হাতে আছে।' এই 'অন্তরের ঘোড়া' সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পশ্চিমের বিজ্ঞান লক্ষ্মীর মন্দিরে জগদীশচন্দ্রের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিল। বিদেশী মনীষীর প্রশস্তিতে ও পত্র পত্রিকায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বারে বারে।

প্রিন্স ক্রপৎকিন জগদীশচন্দ্রের রয়েল ইন্‌স্টিটিউশনের বক্তৃতার পরীক্ষার সহজ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, বৈজ্ঞানিকত্ব প্রমাণের এই সহজ প্রক্রিয়া শ্রেষ্ঠ প্রতিভারই (this was the simplicity of the highest genius)। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গেই সে দেশের বিখ্যাত পত্রিকা Spectator মন্তব্য করেছেন, 'তিন হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজ এক বিজ্ঞানীর সাধনায় এমন ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে পশ্চিমে আমরা যার পুনঃ প্রকাশ পর্যন্ত আশা করতে পারিনে (which we cannot quite duplicate in the West)। তিনি (জগদীশচন্দ্র) প্রাচ্যের বিদ্যা গবেষকদের অন্যতম এবং তিনি এ যুগের সত্যদ্রষ্টা গুরু (prince among physiological research workers and a prophet of his age)। এই সময়েই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ইংলণ্ডের অগ্রগণ্য বিদ্বৎসমাজ ভারত-সচিবের কাছে জগদীশচন্দ্রকে গবেষণার অধিকতর সুযোগ-দানের জন্য এক স্মারকপত্র পেশ করেন। এই বিজ্ঞান-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন রয়েল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলভিন, অধ্যাপক ক্লিফটন প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ১৯২৬ সালে পুনর্বার একই কারণে ভারতের বড় লাটের

কাছে আর একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল। সেই স্মারক পত্রে স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ছিলেন রয়েল সোসাইটির সভাপতি, সুবিখ্যাত Nature পত্রিকা ও Manchester Guardian পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়।

১৯২৭ সালে প্যারিসে ফ্রান্সের Academie des Sciences-এর সভাপতি যা কর্ম অভিমত প্রকাশ করেন, 'আপনার দেশ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব দিয়েছিল আপনি পুনরায় সেই ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করুন।' যে রয়েল সোসাইটি একদিন তাকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেছিল, তারই সভাপতি স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স্ ১৯১৩ সালে স্বীকার করেছেন, 'তখন ভেবেছিলাম প্রাচ্যের অভাবজাত কল্পনা আপনাকে বিপথে পরিচালিত করছে। কিন্তু আজ অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছি আপনি আগাগোড়া ঠিক পথে চলেছেন (you have all along been right)।

কেম্ব্রিজে তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ ফ্রান্সিস ডারউইন 'বলেন 'ক নিঃ সংগতা ও দ্বৈতের মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে একথা স্মরণ রেখে বলতে হবে যে তিনি এক অপূর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষক।' ডিয়েনার তিনিও যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ Plant physiologist অধ্যাপক মলিশের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানপত্রিকা Nature-এর সম্পাদক স্যার বিচার্ড গ্রেগরী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জগদীশচন্দ্র তড়িৎতরঙ্গ গবেষকদের পুরোভাগে স্থান পাবার যোগ্য! Plant physiology তে তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক বিপ্লব আনবে।

জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার Patrick Geddes বলেছেন, 'জগদীশচন্দ্রের মত বিজ্ঞানীর ভাগ্যে স্বীকৃতি আসে বহু সংগ্রামের শেষে। তিনি বিজ্ঞানের চিরাচরিত সীমার মধ্যে থেকে কাজ করেননি, তাই তাঁকে একদা অবাহিত বৈজ্ঞানিক আখ্যা পেতে হয়েছিল।' কিন্তু পরবর্তী যুগে ডিয়েনার শরীর তত্ত্ববিদ্গণ স্বীকার করেন যে, 'কলকাতা বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অনেক অগ্রবর্তী।'

তনু-বিজ্ঞানের মহলে নয় বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে শব্দ রাজ্যেও তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল। স্বয়ং রোঁলার অভিনন্দন বাণী তার প্রমাণ। রোঁলা তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় বলেছেন, হে ঋষি, আপনি আপনার অধ্যাত্ম ও ঋষিকল্প অন্তর্দৃষ্টির আলোকে প্রকৃতির মর্মলোকে প্রবেশ করেছেন। বন্ধন ও প্রস্তরের অন্তরালে আপনি জীবন স্পন্দন শুনেছেন। আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই।—প্রাচীন মহাকাব্যের নায়ক ওডিসন বিজয়ী সিসফিউসের মত আপনি আমাদিগকে জীব ও জড়ের প্রাণকেন্দ্রে যে প্রাণধারা প্রবাহিত তার বাণী শুনিয়েছেন। ...আপনি এক অজ্ঞাত মহাদেশের মহান বিজেতা।... আপনি মনের রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন,—প্রাণের জগতকে সর্বত্র প্রসারিত করেছেন।... এমন দিন সমাগত যেদিন আপনি প্রাচ্যের ধারায় প্রতীচ্যের বিজ্ঞান সাধনাকে সন্নিবেশিত করেছেন একথা সর্বজনের স্বীকৃতি পাবে।'

জর্জ বার্নাডশ' তাঁর গ্রন্থ উপহার কালে জগদীশচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানবিশারদ এবং তাঁর এই-উপহারকে দীনতম জীব-বিজ্ঞানবিশারদের শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

পাশ্চাত্যের আর এক সাহিত্যরথী অলডুস হাক্সলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Jesting Pilate'-এ জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে যে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। হাক্সলি কলকাতায় বসুবিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শন ও আচার্য জগদীশের গবেষণা নিরীক্ষণ করে তাঁকে মাইকেল ফ্যারাডের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। তাঁর মতে প্রমাণের তুলনায় যন্ত্রের সারল্যে ও সামান্যতায় জগদীশ

চন্দ্রের প্রতিভা একমাত্র ফ্যারাডের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি তাঁর দীর্ঘ বর্ণনায় অন্তিমে বলেছেন, 'আমি সাহিত্যের মানুষ বলে···পদার্থ জগতকে ভালবাসি। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মত একজন নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক যখন পদার্থকে এক নূতন অভিজ্ঞতা দেন, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না।'

এইভাবে পাশ্চাত্য জগতের পূজা জগদীশচন্দ্র লাভ করেন। সর্বশেষে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের অমর উক্তিটি স্মর্তব্য—তিনি বলেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রতিটি গবেষণা স্মরণযোগ্য (a monument ought to be raised for each one of his experiments)। এ জাতীয় প্রশস্তি অপর কোন বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে জুটেছে কিনা জানি না।

কবিতা

হে ঈশ্বর

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কঠোর আঘাতে যে
সুখের ভালোবাসা
নিবিড় অবরোধে
অসুখ কাছে আসা
ভুলেছি ঈশ্বর।
কেবলা সাদা হাড়ে
নিহিত কাঙ্কাল

মেঘেছি আধিকারে
প্রবীন বেদনা যা।

এবারে ঈশ্বর
নতুন সুর আনো
আরেক আকুলতা
সূর্য চেতনায়।

(ভুল সংশোধন)

শীতের প্রার্থনা

অমরেন্দ্র সান্যাল

অগ্রহায়ণের ভারতীতে শ্রীঅমরেন্দ্র সান্যালের লিখিত "শীতের প্রার্থনা" কবিতাটির ৪৪৭ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ১৭ লাইনে 'বুকের ভেতর খুশীর মেয়ে, খেলা'র পরে দাঁড়ের অংশ সাজাবার সময় কি ভাবে বাদ পড়ে যায়। আমরা লেখক ও গ্রাহকদের নিকট সবিনয় ত্রুটি স্বীকার করছি।

ভঃ সঃ

তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে একটা মানুষ উচ্ছলতায় টেঁচিয়ে প্রকাশ করেছিল প্রহ্লাদের চেয়ে কত সুখী সে। একজনার কাছে হেউলে হয়ে নিজেকে বিকিয়ে কতুর হয়ে গিয়েও কত সুখী।

পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল টেনে বার করেছে হিমেন্দু। মুখের ওপর আলতো হাতে বুলোচ্ছে সবুজ বর্ডার দেওয়া রুমাল খানা। একটা অল্প পরিচয়ের মানুষের কাছে একটা অনাবশ্যক কথা বলে ফেলেছে। বলার পর হয়তো ভাবছে ও সব কথা এর কাছে না বললেও চলতো। রুমাল খানা মুখ থেকে সরিয়ে আবার পকেটে রাখল হিমেন্দু। বলল, "হাজারবার বলি এ সব কবিতা টবিতা আমার আসে না তাও রেহাই নেই। নিজের জিনিষ দোকানে এসে নিজে পছন্দ করে কিনে নিলেই হয়···সে কথা কে কানে তোলে।"

হিমেন্দুর কথাটা শেষ হবার আগেই প্রহ্লাদের বুকের মধ্যে কিসে নিশ্বাসটা গোখরোর মত পাল্টে নেওয়ার ছলে বাজতে সুরু করেছে। একটা দুঃসাহস উঠে এসেছে গলার কাছে। দুর্বার আর অদম্য হয়ে উঠেছে একটা কামনা। খুব বেশী ভাববার আগেই প্রহ্লাদের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল, এবার থেকে ওনাকেই না হয় পাঠিয়ে দেবেন দোকানে।

এখানে···দ্রৌপদীকে।···আবার মেয়ের জুতোর জন্য বলতে সুরু করলো হিমেন্দু। হয়তো কথাটা তার কানে ভালো লাগেনি। কিম্বা প্রহ্লাদের স্বরটা মনের অনন্ত গভীরে থাকলেও জেনে ফেলেছে হিমেন্দু। বুঝে ফেলেছে একটা বয়সের রাগ ধরা মানুষ তাকে একবার চোখের দেখা দেখে কৃতার্থ হয়ে যেতে চাইছে। অথবা দ্রৌপদী বুক হাউস আর দ্রৌপদী দুজনার মধ্যে কার রূপ বেশী অনুপম তাই যাচাই করবার যে ছেলেমানুষী ইচ্ছেটা এই মুহূর্তে প্রহ্লাদকে পেয়ে বসেছে তাই অনায়াসে আন্দাজ করে নিয়েছে হিমেন্দু। সামান্যক্ষণ পর জুতো ঘষা বন্ধ করলো হিমেন্দু। মুখ তুলে বলল, তাহলে সেই ভালো। কাল না হয় ওকেই পাঠিয়ে দেব। নিজে দেখে নিজের জিনিষ নিয়ে যাবে। কথাটা শেষ করে আর দাঁড়াল না হিমেন্দু। পা বাড়াল দোকানের চৌকাট ছাড়িয়ে যাবার আগে একবার মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমি কিন্তু আপনার দোকানের সঙ্গে ওর নামের মিলের কথা ওকে বলেছি। কথাটা বলতে বলতেই রাস্তায় নেমে গেল সে। মোটর ছেড়ে চলে যাবার আগে আর একবারও এদিকে ফিরে তাকালো না। তাকালে দেখত কাউন্টারের ওপর মুহ্যমান ছড়িয়ে কেমন অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে ঝুঁকড়ে দাঁড়িয়েছে প্রহ্লাদ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় একটা অবাধ্য কৌতূহলকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে মন থেকে। শেষের কথাটা হিমেন্দু বলে গেল না। বলে গেল না, দ্রৌপদী বুক হাউসের নাম শুনে দ্রৌপদী নামের সেই মেয়েটা কি বলেছে। সুখী হয়েছে না অবাক হয়েছে। অথবা ·····না রাগ করেনি। নিশ্চয় রাগ করেনি। খুশীই হয়েছে। অদ্ভুত এক তৃপ্তির আস্বাদ গুনগুনিয়ে উঠলো প্রহ্লাদের হৃদয়ে। প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে সে অনুভব করলো। অদেখা অপরিচিত একটা মেয়ের খুশীর নেশা কি এক দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্বে তার মনের তারে তারে সুর হয়ে

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন "দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন—"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি বাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

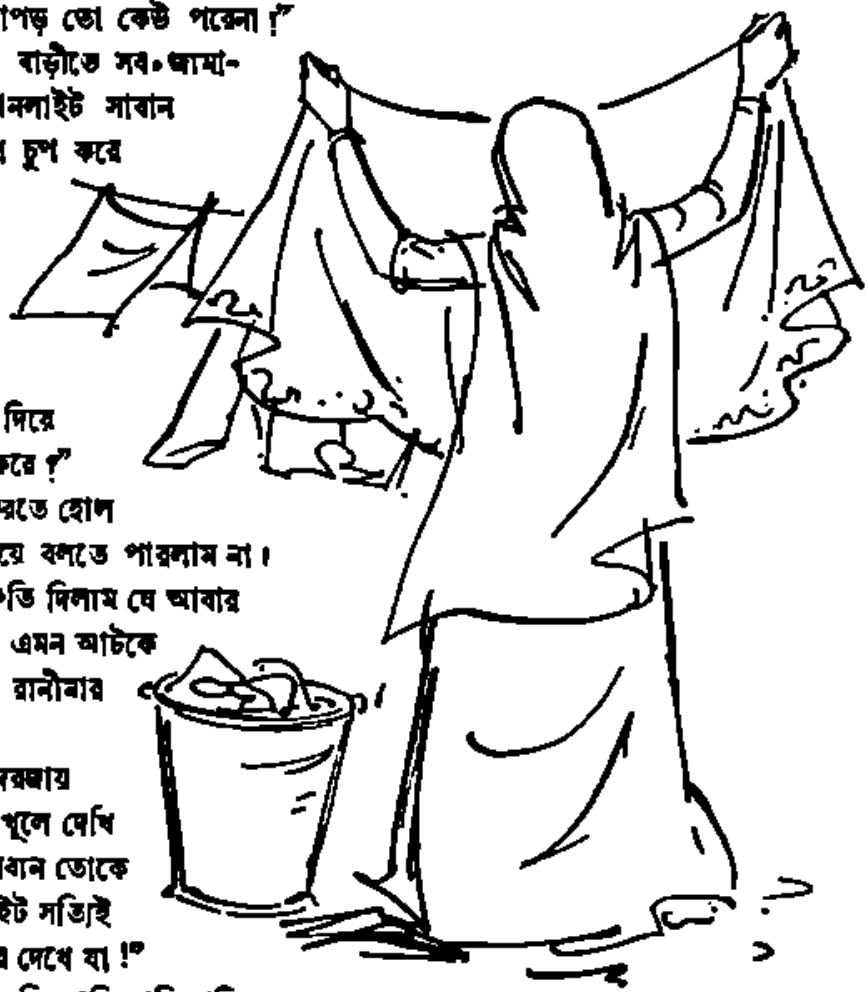

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেনায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেনা হয় প্রচুর। আর এ ফেনা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বই এরফ।

S. 361B-X52 BG

বাজতে সুরু করল। • • • দুপুরের পর থেকেই সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। নইলে এখনো সন্ধ্যে হলো না কেন। সন্ধ্যে শেষ হয়ে রাত আর তারপর আবার সকালটা এলো না কেন? অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে প্রহ্লাদ। সময় কাটুক। সময় কাটুক সময়ের চেয়েও আগে।

পরদিন সকালেই রাধাচূড়ার ওপর দৃষ্টি আটকে গেল প্রহ্লাদের। রাতারাতি যেন রূপ বদলেছে গাছটা। পুরন্ত হয়ে উঠেছে অজস্র পাতার সম্ভারে। তার ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিলে। পাথর-ওঠা পলি রাস্তাটা। খাবলা খাবলা ছনুদ রোদ ছড়ানো। ওখান থেকে রোদ সরবে। সরে সরে উঠে যাবে তেতলা বাড়ীটার দেয়ালে। তবে লাল। দ্রৌপদী বুক হাউস আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশী ঝকঝকে। কালরাতে অনেকক্ষণ মেহনত করেছে প্রহ্লাদ। ঝুলো ঝেড়েছে। আলমারির কাচ মুছেছে। বই সাজিয়েছে··· যে আসবে সে দেখে মুগ্ধ হবে। অবাক হবে। তারিফ করবে প্রহ্লাদের রুচির। তারপর···দ্যাখ হেরে যাবার লজ্জাটা স্বীকার করবে না কক্ষণো মুখ ফুটে। তা না করলেও মুখ দেখে বুঝে নিতে পারবে প্রহ্লাদ।

তেতলার দেয়াল থেকে এক সময় রোদ উঠে এলো কার্ণিশে। ওখান থেকে কার্ণিশটা ডিঙিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যাবার আগেই দিকে সবুজ গাড়ীখানা গলির মুখে এসে থামল।

এসেছে···সেই এসেছে···প্রহ্লাদের বুকের মধ্যে একই সঙ্গে সহস্র সেতার ঝমঝমিয়ে বেজে উঠলো। দুহাতে শক্ত করে কাউন্টার আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো সে। গাড়ী থেকে নামলো দ্রৌপদী। এগিয়ে এল ছায়া পায়ে। সাইন বোর্ডটা চোখ তুলে পড়ল। রাধাচূড়ার গায়ে বাতাস লেগেছে। দুলছে সরসরিয়ে। প্রহ্লাদ চোখ সরিয়ে তাকাল দ্রৌপদীর মুখের দিকে। তাকিয়ে থমকে গেল। বুকের মধ্যে সেতারের দ্রুত লয়ের ঝংকার থেমে গেল আচমকা। কেউ যেন নির্মম হাতে টেনে টেনে তার ছিঁড়ে ঝাঁঝরে দিল। দ্রৌপদীর আগুনে ঝলসানো ক্ষুধিত মুখখানা নীচু হলো একটু। এক মুহূর্তের জন্যে। কাউন্টার, শোকেস বইএর ওপর ঘুরে ঘুরে স্থির হলো। সুন্দর ছুটো আঙুল একটী কাগজের টুকরো মেলে দিল কাউন্টারের ওপর। মিষ্টি একটা কণ্ঠ ঝিম ঝিমিয়ে উঠলো, এই বইগুলো দিন তো?

আড়ষ্ট একখানা হাত দিয়ে কাগজখানা টেনে নিল প্রহ্লাদ। বলল, নেই। বইগুলো একখানাও নেই আমার দোকানে।

নেই?

ঘাড় নাড়লো প্রহ্লাদ, না।

কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে ধীরপায়ে রাস্তায় নেমে গেল দ্রৌপদী। • • •

পরদিন সকালে পশী দোকানীরা অবাক হয়ে দেখল, দুজন লোক ধরাধরি করে দ্রৌপদী বুক হাউসের সাইনবোর্ড খানা খুলে ফেলছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করছে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের চারপাশে ভীড় করলো তারাও, কি ব্যাপার সাইন বোর্ড খোলাখুলি চলছে কি ব্যাপার?

প্রহ্লাদ বলল, নামটা বদলে দেব।

নামটা। সেকি দ্রৌপদী নামও খাসা ছিল।

না, মাথা নাড়লো প্রহ্লাদ, যাচ্ছে নাম.। অচল নাম। ও নাম।···কথাটা শেষ করলো না প্রহ্লাদ। শুধের জানাতে চাইল না দ্রৌপদী নামটা কি ভয়ানক ভাবেই না তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। দ্রৌপদী নামের একটা কল্পিত স্বপ্নের মরিচিকা হাজার চেষ্টা করলেও এখন আর প্রহ্লাদের মনে রামধেনুর মত বহুবর্ণের আবেশ ছড়াতে পারবে না। সেতারের মত ঝংকার হয়ে বাজতে পারবে না। এমন কি একটা সামান্য মুহূর্তের জন্যে প্রহ্লাদকে আনমনাও করে দিতে পারবে না।

ভস্‌টয়েভ্‌স্কি :

স্ত্রী ও মেয়ের দৃষ্টিতে

সত্যব্রত বসু [গতবারের পর]

১৭

'পুওর ফোক' ভস্‌টয়েভ্‌স্কির প্রথম বই। এর আগে ছাপা অতীব কিছু লিখেছেন কিন্তু সেসব কিছু নয়। কিছু অনুবাদ করেছেন কিন্তু সেও কিছু নয়। ভাত্‌ লিখিয়ে মানেই হল আতসাপ,—দারুণ বিষ,—তাদের বিষের নেশায় পাঠকমন অচ্ছন্ন ও মাতাল হয়ে যায়,—এদের দিয়ে কখনো বাজে কাজ হয় না। এদের দিয়ে অনুবাদ মানেই মধুসূদনের উপমা : ভাস্করকে ছেনি আর হাতুড়ি চালিয়ে উনুন বানাতে বলা। ভস্‌টয়েভ্‌স্কির তা ভাল লাগেনি। লাগবার কথাও নয়।

অতএব মস্কো থেকে তাঁর খরচের জন্য যে টাকা আসত সেই টাকায় তিনি হস্‌পিটালের সাধারণ পেশেন্টদের ঘরে ঘরে চা খাওয়াতেন। অসুখের তাঁর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলার অভ্যেস ছেড়ে দিয়ে যেতেন। শহরের যত গরীব নোংরা ও অন্ধকার এলাকা খুঁজে খুঁজে তিনি রেস্টুরেন্টে গিয়ে উঠতেন। সেখানে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসতেন, গল্প জমাবার জন্য অন্যদের চা অফার দিতেন এবং চা খাওয়ার ফাঁকে, খেলতে খেলতে বা গল্প করার অবসরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানুষদের লক্ষ্য করতেন। সাধারণ মানুষের জীবন কিরকম, তারা কিভাবে বাঁচে, এসব নিজের চোখে দেখা দরকার। পাপ কি, ক্ষুধা কেমন, দুঃখ বঞ্চনা হৈত উৎপীড়ন এবং কামনা কিরকম, কেন মানুষ কাঁদে, এসব তাঁকে নিজের চোখে দেখতে হবে। সাধারণ মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি, অত্যন্ত অবহেলিত বিচিত্র বিশাল ও অন্ধকারময় সেই জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হওয়া চাই। এরাই তাঁর মডেল, তাঁর মেটিরিয়ালস্‌। এদের ভিতরেই তাঁর সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথা হবে।

এসব কথা তাঁকে কেউ বলে দেয়নি কিন্তু সেকালের অল্প কয়েকজন যুগস্রষ্টা কথাশী সাহিত্যিকের মতই,—ভস্‌টয়েভ্‌স্কির আগে যদিও গোগোল,—মডেলের দিকে, র' রিয়েল লাইফের দিকে, স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টি গিয়েছিল। সাহিত্য মানেই তা মানুষের জীবনের ভিতর থেকে গড়া চাই, সাহিত্যে জীবনের উত্তাপ এবং নিবিড় স্পর্শ থাকবে,—সাহিত্য হবে মানুষের কথা, মানুষের জীবনের কাহিনী,—এবং তার কথা তাকে দেখে লিখতে হবে,—না দেখে এবং কল্পনা করে নয়। উপরতলার সেই কাল্পনিক সাহিত্য,—আঃ, অসহ্য অসহ্য,—শত শত বছর ধরে তা লেখা হয়েছে,—পচা এবং দুর্গন্ধময়,—হে ঈশ্বর, ভস্‌টয়েভ্‌স্কিকে সেই নরকের অসহ্যতা থেকে রক্ষা করো।

এইরকম মন নিয়েই তাঁর প্রথম বই 'পুওর ফোক'। এই প্রথম বই এবং শেষ বই, 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' —এই দুখানি বইই খুব যত্ন করে এবং ধৈর্য নিয়ে লেখা, —'পুওর ফোক' দুতিনবার করে লেখা এবং পরিমার্জনা করা,—এবং এর জন্যে যে বইদুটি, অর্থাৎ দুটোর উপর,

দৌড়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখা। তার মধ্যে ছুট ছাট অনেক।

'খুওর কোক' লেখার সময়ে তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ,—এবং এই সময় ডস্টয়েভস্কি ড্রাফটস্‌ম্যানশীপের একটা চাকরী নিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরীর বাঁধাধরা গতানুগতিক জীবন তাঁর ভাল লাগেনি। 'বিধবা, আদুর মত বিবাহ'—তিনি লিখেছেন একজায়গায়,—এবং আত্মীয়বন্ধু সকলের অমতেই চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বিশুদ্ধ লেখক-জীবন যাপন করার জন্য সাহিত্যাচার্য আর এক বন্ধুর সঙ্গে এক ছিমছাম কোঠার ঘরে গিয়ে উঠলেন। সেখানে পুরোদস্তুর প্যারিসিয়ান বোহেমিয়ানিজম চলল কিছুকাল এবং সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে দিনরাত্রি কেবল লেখা নিয়েই রইলেন।

সঙ্গের এই বন্ধুটিরও সমান সংকল্প কিন্তু বাণিজ্য-বুদ্ধিতে এঁর চেয়ে কিছু বেশী অগ্রসর। ডস্টয়েভস্কি যখন কলম নিয়ে তাঁর চরিত্রদের সঙ্গে হাসিকান্নায় মগ্ন, ইনি বেলঘরটা শহরের মজলিশি মহল ঘুরে ঘুরে পরিচয় ও বন্ধুত্ব শিকারে ব্যস্ত। এই বন্ধুটিই তারপর ডস্টয়েভস্কিকে একদিন তাঁর সঙ্গে একটা ঘরোয়া সাহিত্যিক মজলিশে নিয়ে গেলেন। সেখানে তরুণ লেখকদল এবং তাঁদের মুখ্য টুর্গেনিভ ছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে এই দিনই ডস্টয়েভস্কির প্রথম পরিচয়।

টুর্গেনিভ দেখতে সুন্দর,—লেখাও চমৎকার। আর ডস্টয়েভস্কি তখনো অপ্রকাশিত,—নিজের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই,—আবার টুর্গেনিভের লেখার খুব ভক্ত। প্রথম দিনেই তিনি এই চতুর সুদর্শন ও অভিজাত নাগরিকের সঙ্গে চালে এমন একটা ভুল করে বসলেন যার কাঁটা তাঁর মন থেকে সারাজীবনেও গেল না। এক একজন পুরুষ যেমন থাকে, প্রথম আলাপেই মেয়েদের সামনে উন্মুকের মত একেবারে প্রাণ খুলে প্রেম নিবেদন করে, টুর্গেনিভের সামনে ডস্টয়েভস্কি প্রায় সেইরকম একটা কাণ্ড করে বসলেন। ডস্টয়েভস্কি হয়ত ভেবেছিলেন,—এবং এ ভাবা খুব স্বাভাবিকও—যে টুর্গেনিভ তাঁকে বুঝবেন,—কিন্তু টুর্গেনিভ হা না কোনো কথা নয়,—নিঃশব্দে মুখে ডস্টয়েভস্কির স্তুতি সব শুনলেন তারপর তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আবার কথার মধ্যে ডুবে গেলেন।

এটার জন্য অবশ্য কারুরই দোষ নেই। একজন শক্তিশালী নূতন লেখক যদি মানসিক হয় ও কিছু অস্বাভাবিক নয়। লেখকদের সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ যদিও কিন্তু মাঝখানে একটা অদৃশ্য, প্রায় দুরতিক্রম্য ব্যবধান। ছাপা বইতে বিখ্যাত লেখক যদি একটা সই দিয়ে যেন,—অবশ্যই মুস্কে—ও পাঠকের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যের সেটাই সর্বোচ্চ সীমা,—তাকে না মেনে আরো কাছে এসে কিছু তাড়ুর হবেই। তখন সাপের মুখে মানুষের যা ঘটে,—অর্থাৎ মর্মান্তিক ছোবল। এবং যেহেতু এরা জাতসাপ, এদের বাহন বিষ, এই ছোবলের প্রতিক্রিয়াও খুব মারাত্মক হতে পারে। এবং ভাগ্যচক্রে এইরকম ক্ষেত্রে দুজনেই যদি জাতসাপ হয় ও সে বিরোধ সারাজীবনে মেটে না।

সাইকলজিতে এসবের অবশ্যই খুব সরল ব্যাখ্যা আছে কিন্তু সেকথা থাক। রসের আসরে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নেই,—যেমন অর্বাচীন কবিদের বাসরে বিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠদের।

যাই হোক, টুর্গেনিভের সঙ্গে ডস্টয়েভস্কির প্রথম সাক্ষাৎটা এইভাবেই হল। টুর্গেনিভ ডস্টয়েভস্কির চেয়ে দুই কি তিন বছরের বড়,—এইসময় বয় ঘোর সাতাশ,—ইতিমধ্যেই সুলেখক বলে পরিচিত,—আর ডস্টয়েভস্কির তখনো কেউ নামই শোনেনি।

ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে আমাদের শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত

লেখার পরবর্তী ঘটনাবলীর অনেক সাদৃশ্য আছে,—ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আরো ঘনিষ্ঠ মিল আছে নানা দিক দিয়ে,—কিন্তু সেকথা অন্যত্র।

'পুঁওর ফোক' লেখা, আবার এবং আবার লেখা এবং পরিমার্জনার কাজ তারপর একদিন শেষ হল। এবং শেষ হতেই ডস্টয়েভস্কি খুব দুর্ভাবনায় পড়লেন। কারণ যারা লেখে, ঘরে বসে লেখা তাদের পক্ষে কিছু কঠিন নয়,—কঠিন এর পরের ধাপগুলিই। এবং আশ্চর্যের কথা এই যে যারা বাস্তবিকই ভাল লেখে, এর পরের ধাপগুলিতে অবধারিত যে তারা অসফল হবে,—লাজুক ত বটেই, অলস, অনড়, অপটু, অমিশুক, অনিচ্ছুক,—মানে অসফলতার যতগুলি বাছা বাছা বিশেষণ, সবই তাদের ক্ষেত্রে অতি সুন্দরভাবে খাটে। ঘরের বাইরের মানুষের চলা ফেরা এবং কাজের জগৎটাকে তাদের অমানুষিক ভয়: ঠিক শীতকালে শীতকাতুরেদের স্নানাতঙ্কের মত। এই মানসিক জড়তাটা ওদের কোনোক্রমে একবার ভাঙা চাই,—নাহলে সব মাটি। যাই হোক, এখন ঠিক হল যে কোনো ভাবেলা নয়,—কপালে যা হয় তা হবে, তখনকার কালের যে নামী কাগজ, তার সম্পাদকের টেবিলেই এই পাণ্ডুলিপিটা চোখ চেকে একদিন রেখে আসতে হবে।

হতও তাই। কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ গলি একটা গলি পাওয়া গেল এবং কিছু না ভেবে সেটা ধরে কয়েক পা যেতেই হঠাৎ আলোময় এস্প্লানেড,—ভীড় এবং আলোয় কিছু বোঝবার আগেই আবার একটা ধাক্কা,—এবং পরিচিত মুখটা পলকেই এমন আগাগোড়া বদলে গেল যেন সমস্তটাই ভোজবাজি।

ডস্টয়েভস্কির স্বাভাবিক বুদ্ধি যেটুকু ছিল তাও এবার একটু ঘুরে নিতে গেল।

১৮

আসলে ঘটনাটা এইরকম। ডস্টয়েভস্কির যে-বন্ধুর কথা বলেছি, তাঁর আবার এক বন্ধু সাহিত্যমহলে এঁদের চেয়ে কিছু অগ্রসর ছিলেন। এমন অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল যার ফলে অনেক কঠিন কাজও বেশ সহজে হয়ে যেতে পারত। এই তৃতীয় বন্ধু,—নাম নেক্রাসভ,—সেইসময়ে নিজের একখানি কাগজ বের করার মতলবে ছিলেন। ডস্টয়েভস্কির বন্ধু নিজের জন্যই সাহিত্যমহলে একটু ঁাক খুঁজছিলেন কিন্তু নিজের কোনো লেখা যেহেতু সম্পূর্ণ তৈরী নেই, তিনি ডস্টয়েভস্কির নাম করে এঁর কাছে প্রস্তাব করলেন যে এই ছেলেটিও লেখে এবং সম্প্রতি একটা বই সে শেষ করেছে: সেখানি পাঠালে তাঁর কাগজে ইনি যদি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন।

নেক্রাসভ স্বভাবতই খুব গরজ করেন নি। নূতন লেখক, তায় অপ্রকাশিত,—কথাটা তাঁর শোনা রইল এই মাত্র। এবং পুওর ফোক-এর পাণ্ডুলিপিও বেশ কয়েকদিন তাঁর টেবিলে অপঠিত পড়ে রইল।

তারপর 'আচ্ছা দেখি ত' এইজাতীয় একটা মনোভাব নিয়ে দুই বন্ধু একদিন রাত্রে বইখানা নিয়ে বসলেন। সাধারণভাবেই খানিকটা দেখা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠাই তাঁদের অজ্ঞাতে চুম্বকের মত তাঁদের মনদুটিকে টেনে নিয়ে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল,—উদ্দেশ্য এবং সময়ের কথা কারুরই খেয়াল রইল না। ক্রমশ রাত্রি গভীর হয়ে এল, চারিদিক ঘুমে নিঝুম,—কিন্তু নাঃ অসম্ভব, এ বই শেষ না করে ছাড়া যায় না।

পালা করে করে দুইজনে পড়ে যখন বই শেষ হল তখন রাত্রিও প্রায় শেষ,—এবং বিশ্বের নেশায় দুজনেই বুঁদ,—বুদ্ধি আচ্ছন্ন—দুজনেই হতচেতন। নেক্রাসভ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলো। ডস্টয়েভস্কিকে রেখে আসি।'

'সে কি।' দ্বিতীয় বন্ধুর ঘোর একটু পাতলা হয়ে এল।

' নেকরাসভ আন্দ্রেয়ের মুখ শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, চলো।'

'দূর। সে ছোঁড়া এখন ঘুমিয়ে আছে। ভোরবেলা সেরে তাকে এখন ডাকাডাকি করা কি ভাল হবে।'

'ঘুম!' নেকরাসভের আদ্রেয় দৃষ্টি হঠাৎ জ্বলে উঠল। 'এ বই ঘুমকে ঘুম পাড়ায়। চলো যাই, আর কোনো কথা নয়।'

কিন্তু ডস্টয়েভস্কির চোখেও সে রাতে ঘুম ছিল না। আগের দিন বিকেলে তিনি এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন কাব্যচর্চার অভিলাষে। কিছুকাল আগে গোগলের 'ডেড্ সোল্স্' বেরিয়েছে,—তিনি নিজে ছিলেন সেই নেশায় মাতাল,—কাব্যচর্চা শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাঁরও রাত্রি ভোর হয়ে গেল। এত রাত্রে ফিরে আর শোবার কথা ভাবা যায় না,—অন্ধকার ঘরে খোলা জানালার সামনে চাতাল দাঁড়িয়ে তিনি শেষরাত্রির আকাশ দেখছিলেন, এমন সময় কনকনিয়ে দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

বন্ধুরা এসে এই অবস্থায় তাঁকে আবিষ্কার করলেন। কিছুকাল কারো মুখ দিয়ে ভালভাবে একটা কথা বেরুল না। শেষরাত্রির ঘুমন্ত প্রহরে হঠাৎ এই নাটকীয় পরিস্থিতি; ডস্টয়েভস্কি রীতিমত বিব্রত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

খবরটা বলা হতে তিনজনে তারপর গাঢ় বন্ধুত্ব জমে উঠল। ঐ খানে বসে বসে তক্ষুনি একটা অবিকৃত পরিকল্পনাও হয়ে গেল। নেকরাসভ সম্পর্কে ঘোষণা করলেন যে এই বই বেলিন্স্কিকে তিনি পড়াবেনই,—পড়িয়ে মুগ্ধতার ভাব দাগিয়ে দিতে হবে। বেলিন্স্কি সে যুগের দুর্বহ সমালোচক,—নবীন লেখককুলের গুরু। তারপর নেকরাসভের কাগজে এ বই ছাপা হবে। 'সাংঘাতিক বই—ডস্টয়েভস্কি নিঃসন্দেহে জিনিয়াস,—এবং তাঁকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব ও সৌভাগ্য তাঁরই।

নেকরাসভ চলে যেতে যাক রাতটুকু ডস্টয়েভস্কি তাঁর ঘরে অধির পদচারণায় কাটিয়ে দিলেন। ঘরে এখন যাক। কী সুন্দর। কী মনোহর। কী সাংঘাতিক। কিন্তু কী উত্তেজক।

কিন্তু বিস্ময় এবং চমকের আর একটা পর্ব এখনো বাকী ছিল।

'পুওর ফোক' বেলিনিস্কির টেবিলেও বেশ কয়েকদিন পুত্রের মতই অনাদৃতভাবে পড়ে ছিল। তারপর একদিন ঐ 'আন্ধা দেবি'র ভঙ্গীতেই তিনিও বইখানা তুলে নিলেন এবং মুহূর্তে রাত্রির কথা, নিজের পাণ্ডিত্য বড়াই এবং পরবর্তীদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বইটার মধ্যে তলিয়ে গেলেন। শেষ রাত্রিতে যখন বই শেষ হল, তিনিও বিশ্বে অবাক,—এবং বই শেষ হতেই নেকরাসভকে প্রচণ্ড হুঙ্কার :

'ডস্টয়েভস্কি। এ্যাণ্ড্ এ্যাটোআনস্।'

ডস্টয়েভস্কি হতচেতন অবস্থায় স্বপ্নের মত বেলিনিস্কির ঘরে এসে দাঁড়ালেন। বেলিনিস্কি সামনে তাকিয়ে দেখলেন রোগা, একেবারে কচি একটা ছেলে। ফ্যাকাশে লম্বা মুখ, বোবা বিস্ফারিত দৃষ্টি,—থেকে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার ঠোঁট কোচড়াচ্ছে। কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর চোখে পড়ল, কপালটা কী সুন্দর। উগ্র কথাহীন কঠোর দৃষ্টিতে ছোকরার আপাদমস্তক বার দুই দেখে নিয়ে বেলিনিস্কি হঠাৎ আরো জোরে ফেটে পড়লেন :

'ইজন্যান্, কি লিখেছ কিছু ধারণা আছে কী। না নেই। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে নেই। থাকতে পারে না। অসম্ভব। তুমি তারুণ্যে ভরপুর,—নিজেকে পরিষ্কার করার মত এখনো বুদ্ধিই পাকেনি। কিন্তু জেনে রাখ যে তুমি একজন অসাধারণ লেখক। সাংঘাতিক প্রতিভা। কিছু বুঝতে পারছ কি, যা বলছি! যাও, এখন। নিজেকে তৈরী করো গিয়ে। যাও।'

এরপর আর একটা স্যালিং পাওয়ার। বেলিনিস্কি

থাকতে ডস্টয়েভস্কি টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। তখনো তাঁর মাথা ঝিম ঝিম করছিল, কোনো চিন্তাকেই তিনি পরিষ্কারভাবে ধরতে পারছিলেন না।

রাস্তায় এসে একটা খালসা খুঁজে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে শহর চোখে পড়লো,—ব্যস্ত শহর, ব্যস্ত মানুষ, রাস্তা, বাড়ী, উপরের আকাশ,—অবারিত ক্ষেত্র। সব কী সুন্দর। অস্পষ্ট একটা অনুভূতি আস্তে আস্তে তাঁরপর মনের ভিতর ধানা বেঁধে উঠল। কিছুই আর আগের মত নয়। এই কিছুক্ষণ আগেও এই অসংখ্য মানুষের ভীড়ে তিনিও ভিড়ে ছিলেন,—এক নগণ্য তুচ্ছ অতি সাধারণ মানুষ,—হঠাৎ পরমুহূর্তে তিনি জেগে উঠলেন, সকলের আগে এবং উপরে উঠে এলেন,—এবং এই একজন, কেউ-না থেকে হঠাৎ বিশেষ একজন হয়ে ওঠা কী সুখের। চোখের সামনে কৌতূহলী শহর এবং ব্যস্ত মানুষের ঘিঞ্জিদের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল এদের সঙ্গে তাঁর অতি নিবিড় ও মধুর একটি সম্পর্ক: সে সম্পর্ক প্রীতির, সে সম্পর্ক আত্মীয়ের, বন্ধুর এবং ভ্রাতৃত্বের। এবং সে সম্পর্ক কী সুন্দর, কী আনন্দময়, কী মধুর।

নেক্রাসভের কাগজে 'পুওর ফোক' বেরুল এবং বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই ডস্টয়েভস্কি একদিনে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

১৯

টুরগেনিভ ছিলেন বড় অভিজাতা,—সেটা শুধু নয় অবশ্যই,—সেটা আচারে, আচরণে, বন্ধুত্বের ধরণে এবং সাহিত্যিক মজলিসে। এই অভিজাতের জন্যই বেলিন্স্কির তীব্র আক্রমণ তাঁর জনপ্রিয়তায় কিছু হানি করেছিল কিন্তু সে কথা থাক। 'পুওর ফোক' যখন বেরুল, তিনি প্যারিসে। প্রথমত বলা যায় যে ডস্টয়েভস্কির সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কয়জন লেখক ছিলেন টুরগেনিভের বন্ধু, —তারপরে গোগোল। গোগোলের শিষ্য এবং টুরগেনিভের একান্ত অনুরাগী। কিন্তু ডস্টয়েভস্কি সম্ভবত এঁদের চিনতেন না,—তাঁদের লেখাও পড়েননি। টুরগেনিভের বন্ধুতালিকা খুব ভাল,—তাঁর পরিচয়ের পরিধিও খুব বিস্তৃত ও মহার্ঘ।

শহরময় যখন দারুণ ডস্টয়েভস্কি রব, সেই সময় টুরগেনিভ ফিরে এলেন। এবং ফিরেই ভিতরে ভিতরে তিনি ডস্টয়েভস্কির জন্য তৈরী হয়ে গেলেন এবং বাইরে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসাবে সানন্দে প্রতিভাবান নূতন লেখক ডস্টয়েভস্কিকে বরণ করে নিলেন। টুরগেনিভের বন্ধুত্ব পেয়ে ডস্টয়েভস্কি ও ভাবলেন যে স্বর্গলাভের যেটুকু বাকি ছিল তা এবার সম্পূর্ণ হল। কিন্তু এ বন্ধুত্ব ত স্বাভাবিক নয়,—স্বতস্ফূর্তও নয়,—এমনকি এ বন্ধুত্বই নয়। মনের মধ্যে তাঁর একটা সাবধানতা, সতর্ক হবার একটা প্রয়োজনীয়তা অস্পষ্টভাবে হলেও সাড়া দিয়ে উঠছিল,—এমনকি ভিতর থেকে একটা টান এবং রাশও,—কিন্তু উত্তেজিত ও উদ্বেলিত ডস্টয়েভস্কি এসব অস্ফুট মর্মবাণী একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না। তার্জিভেভা হঠাৎ-ধনীর মত তাঁর আচরণ এবং কথাবার্তা সবই একদিনে বেপরোয়া উগ্র এবং অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

বেলিনিস্কির মত তীব্র ও দুর্বহ সমালোচকের তিনি পরম স্নেহভাজন, ডস্টয়েভস্কিকে সর্বসাধারণের সামনে তিনি প্রতিভা বলে অভিনন্দিত করেছেন,—সুতরাং এর পরে কি কোনো বাধা থাকতে পারে। ডস্টয়েভস্কি যা বলেন তাই সোনা, যা দেখেন তাই হীরে, যা করেন তাই অনুকরণীয়। ডস্টয়েভস্কির কথা বলতে লোকে পাগল,—ডস্টয়েভস্কির লেখা পাওয়ার জন্য শহরের যত জ্ঞানী গুণী সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তি অধৈর্য ও অস্থির। কিন্তু ডস্টয়েভস্কির সময় নেই। কত লোককে তিনি

একই সঙ্গে খুশি করবেন। একজন রাজতন্ত্র ও এই উদীয়মান প্রতিভাকে একবার মাত্র তাঁর বাড়ীতে পাওয়ার জন্য সর্বস্ব পণ করে বসে আছেন। কিন্তু না, ডস্টয়েভ্‌স্কির সময় নেই। তাঁর এখনো বহু বাকী। এখনো বহু লিখতে হবে। বহু টাকা চাই। সোনোর একপৃষ্ঠা লেখার এখন একহাজার রুবল পান,—পুশকিন একবার একটিমাত্র কবিতার দামই এক স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছিলেন,—আর তিনি! লেখার আইডিয়ায় তাঁর মগজ ঠাসা,—কেবল সময় এবং শক্তি চাই। সম্পাদকরা তাঁর জন্য আকুল,—প্রকাশকরা পাগল,—লেখার জন্য অনেকে বহু টাকা এ্যাডভান্স রেখে গেলেন। একজন তাঁর যা ঋণ ছিল, সব অযাচিতভাবে শোধ করে হাতে আরো টাকা গুঁজে দিলেন। কিন্তু অত সময় কই। অত সময়, শক্তি এবং লেখা।

ডস্টয়েভ্‌স্কি জ্বলতে লাগলেন প্রচণ্ড দীপ্তিতে,—ভুবড়ির কোয়ারায়, অজস্র উৎক্ষিপ্ত অগ্নিকণার উল্লাসে মনে হল তিনি অশেষ,—এবং তাঁর সমসাময়িক বড় লেখক, এমন কি টুর্গেনিভও, এসময় তাঁর পাশে ম্লান এবং তারপর ক্রমেই কত পিছনে সরে গেলেন।

শহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত মহলে ডস্টয়েভ্‌স্কির অবারিত দ্বার,—যেসব সাহিত্যমজলিসে কেবলমাত্র অগ্রজদেরই দাবী, সেইসব মহলেও ডস্টয়েভ্‌স্কির সম্মান এবং অবাধ অধিকার। চোখধাঁধানো প্রতিভার আলোয় সর্বদিক উদ্ভাসিত করে ডস্টয়েভ্‌স্কি একটা অলৌকিক বিস্ময়ের মত মানুষের মানসলোকে জেগে রইলেন।

কিন্তু যে-কোনো উত্তেজনা মাত্রই অতি অল্পকালের স্থায়িত্ব। এবং ডস্টয়েভ্‌স্কির মন, প্রতিভা, বুদ্ধি, এ সবই এখনো অপরিণত। প্রকৃত পক্ষে লেখা তাঁর এখনো লেখাই হয়নি। তারজন্য যে সাধনা সময় এবং অভিনিবেশ দরকার তাঁর জীবনে এখনো সবই অনুপস্থিত: লোকের উত্তেজনা থিতিয়ে আসতে আসতে তাঁর লেখার ভেজও ক্রমে মিতে আসতে লাগল। এবং উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষের যে ব্যবহার, সহজ অবস্থার সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। ক্রমশই সকলের, এমনকি সাধারণ পাঠকেরও, মনে হতে লাগল যে ডস্টয়েভ্‌স্কিকে নিয়ে যতটা হৈ চৈ করা গিয়েছিল সেটা অহেতুক। রীতিমত অশোভন। এখন সকলেরই কিরকম লজ্জা এবং বোকা বোকা লাগল। এবং এখানে এবার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া যা হওয়া উচিত, অর্থাৎ রোষ, রাগ, অবজ্ঞা, অসহিষ্ণুতা এবং পরোক্ষ বিদ্রূপ, সবই ঠিক-ঠিক দেখা দিতে লাগল। এমন কি বেলিনিস্কির মতো যে লোক তিনিও এপিস্তেমিকের পরবর্তী জ্বর অবসাদ থেকে রেহাই পেলেন না।

এইসময়ে ডস্টয়েভ্‌স্কির যে রচনা তারও প্রকৃতিতে এই দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব খুব স্পষ্ট। দুর্বলতাকে আর চাপা দেবার উপায় নেই! 'পুওর ফোক' নিয়ে যে সমালোচকদের কলম উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠেছিল এবার তাঁরাই সশ্রদ্ধে তাঁর লেখা ছি ছি বলে চাপা দিতে লাগলেন। এবং ডস্টয়েভ্‌স্কির সমসাময়িক সাহিত্যিক বন্ধুরা,—ডস্টয়েভ্‌স্কি এমন সরল যে এঁদের সকলকেই তিনি তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ভেবেছিলেন,—বন্ধুসৌরবে যাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তাঁরা এবার একযোগে তাঁকে কোণঠাসা করতে উদ্যত হলেন। এঁদের মুখ্য টুর্গেনিভ—তিনি এতদিন এই সুযোগটিরই অপেক্ষায় ছিলেন,—এবার চেয়ার ছেড়ে ধীরে সুস্থে উঠে দর্শকদের সামনে কাতর অসহায় ভীত এবং আনাড়ি ডস্টয়েভ্‌স্কিকে একেবারে কাবু করে দিতে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানের মতই পরম নির্ভয়তায় স্টেজিয়ামের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

এইসব মজলিসে ডস্টয়েভ্‌স্কি আগে নিজের আসন নিয়ে একপাশে সন্তর্পণে বসে থাকতেন। আলোচনায় কদাচিৎ যোগ দিতেন। পরে নায়কের আসন থেকে কয়েক-

দিনের জন্ত টুর্গেনিভকে সরিয়ে তিনিই প্রধান। রীতিমত দিগ্বিজয়ীর মত ব্যবহার। যে একেবারে নীরব ছিল, তার কথার তোড়ে আর সকলে তারপর ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু এই বেপরোয়া মাত্রাহীন স্বতস্ফূর্ততা যে শাইনেসেরই আর একটা প্রকাশ, এ বোঝবার মত বুদ্ধি বা সহৃদয়তা তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিক বন্ধুদের ছিল না,—টুর্গেনিভের ও নয়ই।

এক মহিলার বাড়িতে তাঁদের এই মজলিশটা ছিল। এবং টুর্গেনিভ যেহেতু সুলেখক, ভাষার খুব দখল, উপমা প্রয়োগে অদ্বিতীয়, এই আসরে ভস্টরেভস্কির প্রথম আবির্ভাবকে তিনি একটা ছুঁচোর সঙ্গে তুলনা করেছেন: 'ঠিক একটা ছুঁচোকে যেন গর্ত থেকে বের করে এনে দিনের আলোর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল।'

কারণ তাঁরা ত অভিজাত। আর ভস্টরেভস্কি নিম্নমধ্যবিত্তের অধিবাসী। এবং এরই নাম ছিউম্যান স্টুপিডিটি। ওলড্‌ এ্যাণ্ড বোরিং স্টোরি অব দি স্টুপিড্‌ হিউম্যানিটি। মানুষের এই স্টুপিডিটি সেদিনও ছিল, আজো আছে,—এবং হয়ত চিরকালই থাকবে।

এই সভাতেই টুর্গেনিভ এবার স্বমূর্তিতে বেরিয়ে এলেন। ইতিমধ্যেই বেলিনিস্কিকে তিনি ভস্টরেভস্কির বিরুদ্ধে চটিয়ে রেখেছিলেন। এবং 'পুওরফোক' নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপও বন্ধুদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেছে। ভস্টরেভস্কির দ্বিতীয় বই 'দি ডাবল্‌' যখন বেরবে তার আগে টুর্গেনিভের দল রটিয়ে দিলেন যে যে-কাগজে এ বই বেরবে সেই কাগজে এই লেখার পৃষ্ঠাগুলি, ভস্টরেভস্কি চান যে সোনার জল দিয়ে চারিপাশে যেন কাজ করা থাকে।

এবং এই সভায় এলেই টুর্গেনিভ কৌশলে ভস্টরেভস্কিকে আলোচনার মধ্যে টেনে এনে উত্তেজিত করে তাঁর মুখ দিয়ে আবোলতাবোল উল্টোপাল্টা নানারকম কথা বের করে আনতেন। ঐ মহিলা লিখেছেন যে এই খেলায় টুর্গেনিভ নাকি অতিশয় নিপুণ ছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই ভস্টরেভস্কিকে উস্কিয়ে ঠেলতে ঠেলতে খেওয়ালে ঠেলে• দিতেন এবং কল্পনা করা যাক যে টুর্গেনিভ চাপা কৌতুকে উৎসুক এবং শান্ত আর ভস্টরেভস্কি নিজেকে ভিজেও করার জন্ত পাগলের মত ঘরীয়ার মত চীৎকার করে যা খুশি জবাব দিয়ে যাচ্ছেন এবং সকলকে তুমুল হাসিয়ে নিজে হাস্যাস্পদ হচ্ছেন।

যে-ভদ্রমহিলার বাড়িতে এই ঘটনা তিনি একটা লেখায় তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই রকম উত্তপ্ত বিতর্কের পর ভস্টরেভস্কি চলে গেলে টুর্গেনিভ ঘটনাটি নিজের মত করে বেলিনিস্কিকে তারপর পরিবেশন করতেন। তাঁকে একদিন বললেন, 'আপনার শোনা উচিত যে ভস্টরেভস্কি নিজেকে একজন প্রকাণ্ড জিনিয়াস মনে করে।' মানে বেলিনিস্কি বুঝুন যে এই পরিণামের জন্ত তিনিই দায়ী।

'তাই নাকি!' শুনে বেলিনিস্কি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন। "কী পরিতাপের বিষয়! ছোকরার ট্যালেণ্ট ছিল তা ঠিকই কিন্তু নিজেকে তৈরী না করে সে যদি এইসব করে তা হলে ও ভয়ানক বিপদ।'

কিন্তু ঘটনাটা একদিন চক্রবৎ উঠল এবং সেইদিনই এই সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে চিরকালের মত ভস্টরেভস্কির বিচ্ছেদ হয়ে গেল। ঘটনাটা ঐ ভদ্রমহিলার মুখেই শোনা যাক:

'একদিন টুর্গেনিভ আমাদের একটা গল্প বলছিলেন, – সেখানে ভস্টরেভস্কিও ছিলেন। টুর্গেনিভ খুব মজা করে বলছিলেন যে কী করে মফঃস্বলের একটা লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সে লোকটা নিজেকে কিরকম একটা ভয়ানক প্রতিভা বলে মনে করত। বলতে বলতে টুর্গেনিভ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটির এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর সব বর্ণনা দিতে লাগলেন যে আমরা হেসে মরি।

'শুনতে শুনতে এক সময় দেখি ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে উঠেছেন। মুখ একেবারে ফ্যাকাশে, মুখের মত বিবর্ণ, সর্ব শরীর কাঁপছে,—কাউকে কিছু না বলে তিনি হঠাৎ মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেলেন।...

'এরপর আর কোনদিন তাঁকে এ বাড়ীতে দেখিনি। এমনকি রাস্তায়ও এঁদের কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন।'

খুব চমৎকার।

এবং চমৎকার এই ভদ্রমহিলাও। কিন্তু এঁর কথা বাদ, কারণ ইনি একজন ইরেস্পন্সিবল্ ফ্যাশনেবল্ মহিলা। এবং এঁদের কাছ থেকে কোনো রকম সামাজিক বা ঐতিহাসিক দায়িত্ব আশা করাই চলে না।

কিন্তু টুরগেনিভ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে একটা আশ্চর্য এই যে এরা কিছুতেই উত্তরপুরুষের কথাটা একবার মনেও আনে না। পরবর্তীকালের মানুষের চোখে এই সব ঘটনায় কি তাঁদের গৌরব খুব বাড়ে!

আমাদের দেশেও অহিফেন, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ধরনের কত যে স্টুপিডিটির ইতিহাস, সব লিখলে একখানা মহাভারত হয়। এবং তাতে কারুরই গৌরব নেই,—কেবল লজ্জাই সার। লজ্জা, অজ্ঞতা এবং কৃপা। আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার অবশ্যই ক্ল্যাশ থাকবে,—নাহলে মূলধন অসঙ্গত। কিন্তু এ সব কী। লোক হাসানোর জন্য এ যে রীতিমত ইচ্ছাধি এবং নোংরামি ব্যাপার।

কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই। এবং স্বভাবকে অতিক্রম করতে মানুষের এখনো অনেক দেরী। [ক্রমশঃ]

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীসীতা	৬৲
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৪৷৷০
ভারত-আত্মার বাণী	৫৲
বুদ্ধবাণী	।৷০
কর্মবাণী	১৷৷০

মণি বাগচির

বিদ্যাসাগর	৭৲
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫৲
নিবেদিতা	৪৲
গৌতম বুদ্ধ	৪৲

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩৲
বাংলার মনীষী	১৷৷০
বাংলার বিদুষী	২৷৷০
বীরত্বে বাঙালী	১৷৷০
ব্যায়ামে বাঙালী	২৲
বিজ্ঞানে বাঙালী	২৷৷০
রাজর্ষি রামমোহন	১৷৷০
রবীন্দ্রনাথ	১৷৷০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১৷৷০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১৷৷০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১৷৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ;; ১৫ কলেজ স্কোয়ার ;; কলিকাতা—১২

আমাদের দেখা কয়েকজন গুণী

যোগেশচন্দ্র বাগল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জলধর সেন

ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেনের কথা প্রথমেই স্মৃতিপথে উদয় হয়। তিনি সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, বিখ্যাত 'হিমালয়' রচয়িতা। এ সমুদয়ই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে না। তিনি ছিলেন বাঙালী সাহিত্যিক সমাজের দাদা। এই 'দাদা' কথাটির মধ্যেই তাঁহার সমাক পরিচয়। তিনি স্নেহশীল, প্রীতিপরায়ণ, উদীয়মান সাহিত্যিকের উৎসাহদাতা, আশ্রয় স্থল। দাদাকে কতবার বলিতে শুনিয়াছি, "আমি সাহিত্যসেবী নই, আমি সাহিত্যিকের সেবী।" 'সাহিত্যসেবী নই' একথা অবশ্য বিনয় কিন্তু পরবর্তী অংশ অতি সত্য। আর এই জন্যই তিনি ছিলেন সাহিত্যিক মাত্রেরই দাদা।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করিয়াই সহকর্মী-প্রধান-রূপে পাইলাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি প্রৌঢ়, আমি যুবক। কি জানি কেন প্রথমাবধিই আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ব্রজেন্দ্রবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম। তখন ১৪নং পার্শীবাগান লেনে (ইউনিভার্সিটি ল্যান্সান কলেজের উত্তর পার্শ্বের গলি) ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর ভবনে বেশ একটি আড্ডা জমিত। বহু বিদগ্ধব্যক্তি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী, শিল্পী, ব্যবসায়কর্মী আসিয়া এখানে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও গল্পগুজব করিতেন। বস্তুতঃ মনে হয় এই খানেই সর্ব প্রথম জলধর সেন—'দাদা'কে দেখি। আরও কয়েকজনকে ক্রমে ক্রমে দেখিলাম—রাজশেখর বসু (পরশুরাম), শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সেন, কবি শৈলেশ রায় প্রভৃতিকে। গিরীন্দ্রশেখরের বড়দা রসিক প্রবর শশীশেখর বসুকে এখানে দেখিলাম। দাদা কালা—কানে শুনেন না, চেঁচাইয়া বলিলে তবে কিছু কিছু শুনেন। নীরবে বসিয়া থাকেন, মুখে বর্মা চুরুট, মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু কিছু বলেন। এখানে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়া থাকিবে হয়ত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল অন্য ক্ষেত্রে।

মানসী ও মর্মবাণীর সুবোধ জন্য 'রবি-বাসর' পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ১৯২৯ কি ৩০ সনে এই সাহিত্যিক সভাটি পুনর্গঠিত হইল। তখন ডিক্টেটরের যুগ। রবিবাসরের সদস্যগণ জলধরদাকেই ডিক্টেটর করিলেন। বাংলায় নাম দেওয়া হইল সর্বাধ্যক্ষ। জলধর তোলানাথ মানুষটি, তিনি ডিক্টেটর—একথা তো ভাবাই যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক বা সেক্রেটারী হইলেন এবং জলধরদাকে পুরোভাগে রাখিয়া তিনিই রবিবাসর পরিচালনায় অগ্রসর হইলেন। রবি-বাসরের মাসিক অধিবেশনগুলির প্রসিডিংস বা কার্য বিবরণ লেখার ভার পড়িল আমার উপর। তখন নরেন্দ্রনাথ বসু (রবিবাসরের

বর্তমান সম্পাদক। এই বৈঠকটির বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। ব্রহ্মানন্দ পার্কের উত্তর দিককার বিরাট কলিকাতা হোটেলের দ্বিতলের একটি কক্ষ প্রায়ই ছাড়িয়া দিতেন রবিবাসরের পাক্ষিক অধিবেশনের জন্য। নিয়ম ছিল, রবিবাসরের সদস্য সংখ্যা অন্যূন পঞ্চাশ জন হইবে এবং পঞ্চাশে এক একজন সদস্য ইহার অধিবেশন আহ্বান করিবেন। কলিকাতা হোটেলে, সর্বাধ্যক্ষ জলধরদা'র গৃহে, প্রবাসী অফিস ভবনে এইরূপ নানা স্থলে বিভিন্ন সদস্যের আহ্বানে রবিবাসরের পাক্ষিক অধিবেশনগুলি হইত। কখন কখন কলিকাতার বাহিরেও তখন অধিবেশন ডাকা হইত। একবার আমরা সভা করিতে যাই অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ গাঙ্গুলীর আমড়াতলার ভবনে। এই অধিবেশনে কবি শৈলেশ কৃষ্ণ লাহা "সাহিত্যে আর্ট"—কি এইরূপ একটি শিরোনামায় একটি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি এ ধরণের সাহিত্য বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা কোন কোন প্রবন্ধ প্রবাসীতে পরস্থ করি। দুইটি অধিবেশনে আচার্য যদুনাথ সরকারের উপস্থিতি ও বক্তৃতা দানের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। ঔপন্যাসিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রেতাত্মা" সম্বন্ধে একবার ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথও প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। জলধরদা বা আমাদের সর্বজন প্রিয় 'দাদা' কি কলিকাতায়, কি কলিকাতার বাহিরে সর্বত্র রবিবাসরের অধিবেশনে যাইতেন। একবার তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের কথা ছিল। আমরা সকলে নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় আছি। দাদা হঠাৎ একটি লেফা পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিলেন 'বড় চমৎকার জিনিস আছে,' বলিয়াই ব্রজেন্দ্র বাবুকে পড়িতে দিলেন। লেখাটি ব্রজেন্দ্র বাবুরই। 'সমাচার দর্পণ' হইতে বহুলাংশে তিনি 'সমাচার পত্রে সেকালের কথা' নাম দিয়া ধারাবাহিক ভাবে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করাইতেছিলেন। এই কিস্তিতে ছিল পাতিপুর নিবাসিনী ভূতাকাটুনীর পত্র। বড়ই মর্মস্পর্শী, উপভোগ্যও বটে। দাদা নিজের ছাপিতেও অধিবেশন ডাকিতেন এবং আমাদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করিতেন।

তৃতীয় দশকের গোড়াতে কলিকাতায় জয়ন্তীর হিড়িক লাগিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বর্ষ পূর্তির জয়ন্তী হইয়া গেল। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু শতবার্ষিকী হইল। ইহার ফাঁকে ফাঁকে আরও অনেক জয়ন্তী হইল। আমরা জলধরদার সপ্তম বৎসর পূর্তির উৎসব উদ্‌যাপিত করিলাম। রামমোহন লাইব্রেরীতে উৎসবের আয়োজন হয়। ছোট্ট আয়োজন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতি। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) এবং আরও বহু নামজাদা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়, তাহার পর বক্তৃতা। শরৎচন্দ্র বোধ হয় তখন অসুস্থ ছিলেন। দুই তিন মিনিট অন্তর অন্তরই এক একবার মঞ্চ হইতে নীচে নামিয়া যাইতেছেন। এই অন্তবর্তী সময়ে বার বার 'বীরবল' সভাপতির আসনে বসিতে থাকেন, ইহাতে সভার কার্যে কিছু ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু আন্তরিকতায় সব মানাইয়া গেল। জলধরদার গুণমুগ্ধ সকলেই; বহু বক্তা তাঁহার প্রশস্তি করিলেন। কে কি বলিলেন পৃথক ভাবে তা বড় একটা মনে নাই। তবে এক বিশেষ কারণে একটি বক্তৃতা মনে আছে। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরু সদয় দত্ত আই-সি-এস প্রথম জীবনে সাহিত্য সেবায় জলধর দাদার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তিনি ভক্তি গদগদ কণ্ঠে এ ধরণের কয়েকটি কথা বলিয়া একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম পংক্তি "এপো আমার জলধর……" ইত্যাদি। প্রথম কলি বলিতে বলিতেই তিনি গান ধরিলেন। আর সুরে সুরে

নৃত্য। মঞ্চের এদিক হইতে ওদিক নৃত্য করিতে করিতে 'ওগো আমার জলধর' গান। হল ফাঁপাইয়া করতালি ধ্বনি। অমন গম্ভীর পরিবেশ মুহূর্ত মধ্যে হালকা চটুল হইয়া গেল। আমরা উপভোগ করিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে কষ্ট পাইলাম। যাহা হউক শেষ রক্ষা হইল। জলধরদা একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। এখানেও তিনি বলিলেন "আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যিকদের সেবক মাত্র।" আমরা জলধরদার প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইয়া স্থানান্তরে ফিরিয়া গেলাম।

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন জলধরদার বিশেষ অনুরক্ত, স্নেহভাজন এবং বিশ্বস্ত। আমরাও ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গীরূপে তাঁহার স্নেহলাভে সক্ষম হইলাম। ব্রজেন্দ্রবাবুর 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, (১ম সং) তখন বোধ হয় বাহির হইয়াছে। তাঁহার সাক্ষেবেদি করিতে করিতে দেখিলাম উনবিংশ শতকের মহামনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে-সমকালীন সাহিত্য হইতে অনেক নূতন কথা জানা যাইতেছে। এই সব মনীষীর জীবন ও কার্যকলাপ আলোচনাসবেষণায় রত হইলাম। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন আমার এ কার্যের প্রধান উৎসাহ-দাতা। বিখ্যাত পার্সী ধনী ও দানবীর রুস্তমজী কাওয়াসজী সম্বন্ধে একটি তথ্য-ভিত্তিক বড় প্রবন্ধ রচনা করিলাম। আমরা তখন প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মে লিপ্ত। কিন্তু দ্রুত প্রকাশনার নিমিত্ত ব্রজেন্দ্রনাথ আমার এ প্রবন্ধের বিষয় জলধরদাকে বলিলেন। জলধরদা আমার প্রবন্ধটি সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং 'ভারতবর্ষের' পরবর্তী সংখ্যায় উহার অর্ধেকটা প্রকাশিত হইল (চৈত্র, ১৩৩৮)। দ্বিতীয়াংশ বাহির হয় পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই আমার প্রথম নাম সংযুক্ত মুদ্রিত রচনা। প্রথম লেখা এইরূপ দ্রুত প্রকাশে কত যে উৎসাহিত হইয়াছিলাম বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আরও উৎসাহিত হইলাম একটি কারণে। একদিন দেখি জলধরদা স্বয়ং প্রবাসী অফিসের দোতালায় আমাদের কক্ষে আসিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবাসীতে আসা অবধি কখন কখন জলধরদা প্রবাসী অফিসে আসিতেন বটে, কিন্তু এবার আগমনের লক্ষ্য ছিলাম আমি। "তাহা, এই নাও" বলিয়া পকেট হইতে একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া আমার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিলেন। বুঝিলাম ইহা আমার লেখার দক্ষিণা। এ দিন ছিল শনিবার। আমি মেসের অধিবাসী। রবিবার বৈকালে কুলা বিদ্যাধরকে দিয়া ইহার কিয়দংশ হইতে খাবার আনাইলাম এবং মেসের সকল বন্ধুকেই খাটিয়া খেওয়া হইল, বলিয়া-ছিলাম আমার 'পাকা দেখায়' খাবার। কি কারণেই না এই কথাটি মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। সত্যিকার বিবাহিত জীবনে 'লক্ষ্মী'র আর সাক্ষাৎ মিলিল না। সরস্বতী ঠাকুরাণীর আঁচ পাইয়া তিনি কি চিরতরে বিদায় লইয়াছেন? জলধরদার নিকট হইতে সেদিন যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাই। জীবনে তাহা পাথেয় স্বরূপ হইয়া আছে। এইরূপ কত তরুণই না তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়াছেন; এখন বুঝিতেছি গুরুসদয় জন্মতীর দিনে আনন্দাধিক্যেই নৃত্যপর হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে 'ভারতবর্ষে' আরও লেখা প্রকাশিত হয়, তাহাতেও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রথম দিনের সে অনুভূতির তুলনা নাই।

'জাল প্রতাপচাঁদ' সম্পর্কে জলধরদার অত্যধিক ঔৎসুক্য ছিল। তিনি একখানি পুস্তক লিখিবার বাসনাও হয়ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সমাচার দর্পণে' জাল প্রতাপচাঁদ ঘটিত মামলার আনুপূর্বিক বিবরণ বহুদিন ধরিয়া প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর মুখে জলধরদা একথা শুনিয়া থাকিবেন। তিনি এই বিবরণগুলি নকল করাইয়া লইতে চাহিলে ব্রজেন্দ্রবাবুর নির্দেশে আমি উহা নকল করি। ষোল পৃষ্ঠা পরিমিত এক্সারসাইজ খাতার ভিন্ন-

আয়ত্ত করিয়া ফিরাইতেন। কেমন করিয়া দিনের পর দিন ইহা সকল করিয়াছিলাম এখন ভাবিলে বিস্মিত হই। কলমরূপ ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা অনেকে ব্রজেনবাবুর নেতৃত্বে রবিবাসর ছাড়িয়া সাহিত্য পরিষদে যোগ দিলাম। কিন্তু জলধরদাকে আমরা কখনও ভুলি নাই, তিনিও আমাদের ভুলেন নাই। আমাদের সময়ে সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে 'বিশিষ্ট সদস্য' শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। এটি খুবই সম্মানের পদ। পরিষদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে এক একজন বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহার স্নেহ প্রীতি বরাবর অটুট ছিল। দেখা হইলেই সেই মিষ্ট সম্ভাষণ "তারা কেমন আছ ?"

কৃষ্ণকান্তি ঘোষ

কৃষ্ণকান্তি ঘোষ ভক্তি-ভাজন ছিলেন আমাদের 'দাদা-বাবু'। পরিচিত মহলে 'দাদাবাবু' বলিলে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝাইত। তিনি নীরবে আসিয়াছেন, নীরবে চলিয়া গিয়াছেন। অতবড় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হইয়াও কখনও নিজেকে জাহির করেন নাই। এইখানেই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

দাদাবাবুকে বাহির অবশ্য জানেন না, জানিবারও কথা নয়। একারণ তাঁহার সম্বন্ধে প্রথমে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। কৃষ্ণকান্তি অমৃতবাজারের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সন্তান। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশির কুমারের মাতা অমৃতময়ীর নামে 'অমৃতবাজার' আখ্যাত। এখান হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের নামও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। দাদাবাবু কৃষ্ণকান্তি ১৮৭১ সনে ঐ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মুখে কি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একই সনে জন্ম, এবং তাঁহারা মাত্র পাঁচ ছয় মাসের ছোট বড়। দাদাবাবু অন্নাবধি ঘোষ পরিবারের জনহিতকর কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কি করিয়া পল্লীগ্রাম হইতে বাহির হইয়া পত্রিকাখানি অমন বিরাট শক্তিশালী হইয়াছিল তাহাও তাঁর প্রত্যক্ষীভূত। এক কথায় তিনি ঘোষ পরিবার তথা ঘোষ ভ্রাতা ভগিনীগণের সহযোগিতায় একটি সুন্দর পরিবেশ ও ঐতিহ্যের মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্ত, নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। দাদাবাবু বৈষ্ণব, "তৃণাদপি সুনীচেন"—এই বৈষ্ণব আদর্শটি তাঁহাতে যেন মূর্তিমান দেখিয়াছি। শিশির কুমার সন্ধে ও পল্লে একটি অভিনব ধরণের বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া তোলেন; দাদাবাবু ধনপ্রাণ দিয়া তাহা রক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা খানির সংগঠনকালে দীর্ঘদিন যাবৎ যাঁহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, দাদাবাবু তাঁহাদের অন্যতম। শেষ জীবনে বহু বৎসর তিনি পত্রিকার ডিরেক্টর সভা বা পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

দাদাবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৩৩১-৩২ সনে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে পুরনো পত্রিকা অফিসে। এখানে পরে যুগান্তর অফিস ও ছাপাখানা এবং বর্তমানে বোধ হয় তদুপরি ছাপাখানা অবস্থিত। স্বর্গত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্রে আমি প্রথম পত্রিকা অফিসে যাই। ব্রজেনবাবু তখন বঙ্গীয় নাট্যশালার নজরুল তথ্য সংগ্রহে লিপ্ত। তিনি মধ্যে মধ্যে পত্রিকা অফিসে যাইতেন এবং আমি তাঁহার হইয়া প্রত্যহই সেখানে গিয়া পত্রিকার পুরাতন ফাইলগুলি দেখিতাম। পত্রিকার প্রথম দুই বৎসরের ফাইল অফিসে ছিল না। পরে সংগৃহীত হইয়াছে কিনা জানি না। দাদাবাবু একবার কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, রাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে পাইয়াও উহা শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। দাদাবাবু ১৮৭০ সন হইতে পত্রিকার প্রতি সংখ্যার বাঁধানো

মহাশয় একে একে দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দিনের পর দিন ধৈর্যের সঙ্গে এই কার্য করিয়া যাইতেছি দেখিয়া দাদাবাবুর দৃষ্টি অল্পই আমার উপর পড়িতে লাগিল। এই সময় কাইলে প্রাপ্ত কতকগুলি নূতন নূতন বিষয়ের প্রতি ব্রজেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথমতঃ পত্রিকায় প্রকাশিত জয়োচ্ছ্বাস বর্ষারম্ভে রবীন্দ্রনাথের "হিন্দুমেলার উপহারে" শীর্ষক কবিতা। ব্রজেন্দ্রবাবু ইহা পাইবা মাত্রই প্রবাসীতে ছাপাইয়া দিলেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যতদূর মনে হয় কবিবর মধুসূদন দত্তের ঢাকায় প্রদত্ত একটি বাংলা বক্তৃতার খবর। এটিও ব্রজেন্দ্রনাথ সোৎসাহে মধুসূদন সম্পর্কীয় রচনার প্রকাশ করিলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার পরে বাঙলার সাময়িক পত্র সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারেও পত্রিকা অপিসে যাইতে থাকি। ক্রমশঃ আমার অলক্ষ্যেই দাদাবাবুর স্নেহ প্রীতির অধিকারী হইতে লাগিলাম। অবিলম্বে ইহার প্রমাণ ও পাওয়া গেল।

'রাধানাথ শিকদার' শীর্ষক আমার ইংরেজী প্রবন্ধ 'মডার্ণ রিভিউ' (এপ্রিল ১৯০৩) মাসিকে প্রকাশিত হয়। এডারেষ্ট পৃথ্বে যে জগতে সর্বোচ্চ শিখর, ইহা প্রাপ্ত তথ্যাদির নিরিখে রাধানাথ ভারতীয় জরীপ বিভাগের অধ্যক্ষের গোচরে আনয়ন করেন। তখন এডারেষ্ট পৃথ্বের উপর দিয়া বিমান পরিচালনা করা হয়, আবার এডারেষ্ট পৃথ্ব আরোহণের চেষ্টা চলে হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রীর দ্বারা। এই সময় প্রবন্ধটি খুবই topical বা সময়োপযোগী হইয়াছিল। মডার্ণ রিভিউতে প্রবন্ধ প্রকাশের পরই উহার একটি কাইল লইয়া গিয়া দাদাবাবুর হাতে দিই। তিনি ইহা হাতে লইয়াই শিরোনামা দেখিলেন এবং ডাকিলেন 'যতীন' 'যতীন'। এক ভদ্রলোক, মনে হইল আমার চেয়ে একটু বেশী বয়সের, তৎক্ষণাৎই পাশের ঘর হইতে আসিলেন। দাদাবাবু লাইনটি দিয়া বলিলেন, "এইটি নাও, দেখো আগামী কালই যেন বা'র হয়।" দেখিলাম পর দিনই ২রা এপ্রিল লীডার পেজে 'রাধানাথ শিকদার' বাহির হইয়াছে। আমার তো আনন্দ আর ধরে না। ইহার পর দিন মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছিল। অন্যান্য ইংরেজী বাংলা সংবাদ পত্রেও আমার লেখাটি মূলে ও অনুবাদে প্রকাশিত হইল। বুঝিলাম দাদাবাবুর 'নিউজ সেন্স' ছিল প্রবল। আমার লেখাটি পাইবামাত্র তিনি যেন ইহার উপযোগিতা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। আমার গবেষণাত্মক লেখা তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইতেছিল। উক্ত রচনা প্রকাশে আমার প্রতি দাদাবাবুর স্নেহ প্রীতিও কম সূচিত হয় নাই! পত্রিকা অপিসে যাতায়াত ক্রমশঃ কমিয়া গেল। তবে কখন সখন যে একেবারে যাওয়া হইত না এমন নয়। 'দেশ' সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত হইবার পর এই যাতায়াত কিছুকাল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

দাদাবাবু সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন বহু বৎসর; কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। অনেক দিন পরিষদে তাঁহার সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ হইত। সামান্য সাক্ষাতেও বুঝিতাম আমার প্রতি তাঁহার স্নেহপ্রীতি অটুটই রহিয়াছে। 'দেশ' সাপ্তাহিক হইতে পুনরায় প্রবাসীতে চলিয়া যাই, তখন আবার অবসর মিলিল। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে পূর্বের মত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম। এই সময় তাঁহাকে হামেশা দেখিতাম। তিনি কায়স্থ সমাজ পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন। পত্রিকা-খানির ভালরূপ সম্পাদনা করার নিমিত্ত ঐ বৃদ্ধ বয়সেও যত্ন লইতেন। তিনি আমার নিকট একটি প্রবন্ধ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" নামক আর একখানি বৈষ্ণব পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। দ্বিতীয়

সম্পাদক ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত বরিশাল নিবাসী বিষ্ণুচরণ সরকার। 'দাদাবাবু' আনন্দ বাজার পত্রিকা পরিচালনা মণ্ডলীরও একজন ছিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে তিনি ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন।

পুনরায় গবেষণা কার্যে একান্ত ভাবে রত হইলাম। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' প্রকাশিত হইবার পর আরও কয়েকখানি বই পরপর বাহির হইল। হিন্দুমেলা আমাদের জাতীয় জীবন তথা মুক্তি আন্দোলনে বিস্তর রসদ যোগায়। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত-এ' একটি অধ্যায়ে ইহার মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু এই জাতীয় মেলার গুরুত্ব বিবেচনায় ইহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। হিন্দু মেলার জন্ম হয় অমৃতবাজার পত্রিকার আবির্ভাবের (২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮) এক বৎসর পূর্বে, চৈত্র সংক্রান্তির দিবসে। হিন্দু মেলার কথা নিশ্চয়ই অমৃতবাজার পত্রিকায় পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া পুরাতন ফাইল দেখিবার নিমিত্ত পুনরায় দাদাবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। দাদাবাবুর গবেষণা-প্রীতি পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। এবারেও বলিবামাত্র তিনি পত্রিকার প্রথম দিককার ফাইল দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দিনের পর দিন, অবসর সময়ে, পত্রিকা অফিসের দ্বিতলে দাদাবাবুর ঘরে বসিয়া ফাইল দেখিতাম। হিন্দুমেলা সম্বন্ধে বহু মালমসলা পাওয়া গেল। বলাবাহুল্য এ সম্পর্কে অন্যত্র গিয়া অন্যান্য পত্রিকা আমাকে দেখিতে হইয়াছে। "জাতীয়তার নবমন্ত্র" নামে হিন্দুমেলা বিষয়ক পুস্তকখানি লইয়া গিয়া যখন দাদাবাবুর হাতে দিলাম তখন তিনি খুবই প্রীত হইলেন। একদিন দেখি, পত্রিকাখানির সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি স্বতন্ত্র ছোট অনুচ্ছেদে বইখানি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার স্নেহপ্রীতিতে অভিভূত হইলাম।

প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর পূর্বে ব্রজেনবাবুর নির্দেশ মত অমৃতবাজার পত্রিকার ফাইলগুলি দেখিয়াছিলাম। তখন আমার দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। উহার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে উনবিংশ-শতকের শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া দৃষ্টি অনেকটা প্রসারতর হইয়াছিল। হিন্দুমেলার তথ্য সংগ্রহকালে পত্রিকার স্তম্ভে এমন বিস্তর জিনিষ পাইলাম যাহাদ্বারা ঐ শতকের শেষ পাদের বাঙালীর কৃতিগুলি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। পোলুয়া মাওয়ার (অমৃতবাজার) ঘোষ পরিবারের কার্যকলাপ এবং পত্রিকার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিল। এ কারণেই বোধ হয় দাদাবাবুর নির্দেশে প্রথমদিককার পত্রিকাগুলির ফাইল প্রায়ই তাঁহার প্রকোষ্ঠে সুরক্ষিত থাকিত। এই সকল ফাইল হইতে বিস্তর নোট লইতাম। আমার আগ্রহ দেখিয়া দাদাবাবু তাঁহার বড় পিসী-মা ক্ষিরোদমোহিনী, একখানি ঘোষ পরিবারের কাহিনীর নকল আমাকে দিলেন। শীঘ্রই মৃণালকান্তির রবিবাসরীয় সংখ্যায় কিছু লিখিবার আহ্বান আসে ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর নিকট হইতে। "পোলুয়া মাওয়ার ঘোষ পরিবার" শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ পর পর প্রকাশিত হইল। ঘোষ পরিবারের ঐতিহ্যপুষ্ট দাদাবাবুর দৃষ্টি অতি সজাগ এই প্রবন্ধগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহার মনে হইতেই বুঝিলাম, এই লেখাগুলি পড়িয়া তিনি বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছেন। যে সব মালমসলা আমার হাতে সংগৃহীত আছে তাহার ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা "শিশির কুমার ঘোষ ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" শীর্ষক একখানি পূর্ণাঙ্গ বই লেখা যাইতে পারে; আমার মুখে এই কথা শুনিয়াই তিনি আমায় উপর ঐরূপ একখানি বই লিখিবার ভার অর্পণ করিলেন। যাহাতে আমি চাহিবা মাত্রই পত্রিকার দীর্ঘজীবনের ফাইলগুলি দেখিতে পারি তাহার সুযোগও তিনি করিয়া দিলেন। তিনি

শিশির কুমার রচিত একপ্রস্ত বইও আমাকে দিয়াছিলেন। আমার কার্য আরম্ভ হইল, দাদাবাবু প্রায় প্রত্যহই নিজ-কক্ষে আমার নিকট বসিয়া আমাকে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। বৎসর খানেক তথ্য সংগ্রহের পর উক্ত পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলাম: অর্ধেকের মত লিখিয়া দাদাবাবুর দর্শনার্থ অর্পণ করি। দাদাবাবু তখন অতি বৃদ্ধ বয়স, পঁচাশীর কাছাকাছি। তাঁহার পক্ষে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা সম্ভব ছিল না। তিনি কর্তৃস্থানীয় এক যুবককে ইহা পড়িতে দেন। কতকটা আকস্মিক কারণে—দাদা-বাবুর শরীর ভাঙিয়া পড়িল, তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি আর ফিরিয়া আসিল না। সংক্ষিপ্তাকারে কিয়দংশ প্রবর্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এইরূপে আমার একটি মহৎকার্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। এই বিষয়টি মনে হইলেই স্বতঃই দাদাবাবুর কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। 'তৃণাদপি সুনীচ' বৈষ্ণব প্রধান ঘোষ পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দাদাবাবুকে বার বার নমস্কার করি। (ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

ব্যঞ্জনা ও কাব্য (তৃতীয় খণ্ড)—শ্রীহরিহর মিশ্র
রত্নাকর গ্রন্থ মালা
গ্রন্থজগৎ
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
আড়াই টাকা

'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' গ্রন্থমালার প্রথম দুটি খণ্ডে যথাক্রমে শব্দ ও শব্দশক্তি এবং বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনির আলোচনা শেষ করে বর্তমান খণ্ডে রসধ্বনি ও ধ্বনিবাদ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র তাঁর সরস বিশ্লেষণ গ্রন্থস্থ করেছেন। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিনি বলে নিয়েছেন যে "কবিকর্মের সমালোচনায় রসস্বরূপের যথার্থ অবধারণ যতটা সহজ ব্যাপার মনে করা যতটা সহজ রস কথাটির উচ্চারণ মাত্র। রসের আস্বাদ্যমানতা স্বীকার করে নিয়ে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত নাটকের রস-নিষ্পত্তির কথা ভেবেছিলেন। নাট্যসাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। ভরতের উক্তি থেকেই তাঁর রসসূত্রের অর্থ-নির্ণয়সূত্রে অধ্যাপক মিশ্র স্থায়িভাব, ব্যভিচারিভাব, বিভাব, অনুভাব ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। অভিনব গুপ্ত, মম্মট প্রভৃতি শাস্ত্রকারের কথা তুলে তিনি ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ, এবং অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে সুবোধ্য আলোচনাও করেছেন, আবার এইসব মতের পারস্পরিক সম্পর্কও বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রস ও ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর এ-আলোচনা অনুরাগী পাঠকের বিশেষ তৃপ্তিকর। দ্বিতীয় অধ্যায় ধ্বনিবাদের বিরোধী মতের আলোচনা সূত্রে তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসের কথাও আভাসে জানিয়েছেন। শেষ অনুচ্ছেদে সেটি আরো স্পষ্ট হয়েছে; তিনি বলেছেন—"বস্তুতঃ এইসব বিরুদ্ধমত যে আনন্দবর্ধন—অভিনবগুপ্ত

প্রবর্তিত স্বনিবাদকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহার প্রধান কারণ ইহাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। কাব্য-সৌন্দর্যের সমুচিত ব্যাখ্যা স্বনিবাদ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না।"

অধ্যাপক মিত্রের এই আলোচনাগুলি খণ্ড খণ্ড গ্রন্থ থেকে ক্রমে আরো বড়ো পরিসরের একটি উল্লেখযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত হয়ে উঠবে, এই প্রতীক্ষা রইলো।

হরপ্রসাদ মিত্র

পাথেয়—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী, ভারতী।
শ্রীবিভা পাবলিশিং হাউস, রজনাথপুর,
পোঃ বড়িষা, কলিকাতা-৮
তিন টাকা

'পাথেয়' সুকবি স্নেহলতা দেবীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এর আগে প্রকাশিত এঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মনের কোণে' বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের অভিনন্দন লাভ করেছিল। ১৩২৭ থেকে ১৩৬২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দুত্রিশ বছরে বিভিন্ন সময়ে রচিত চৌত্রিশটি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কবি বয়সে প্রবীণা। কিন্তু সুদীর্ঘকালের গার্হস্থ্য জীবনের রুক্ষতা যে তাঁর সৃষ্টিধর্মী মনের তারুণ্য শোষণ করতে পারেনি আলোচ্যমান কবিতাগুলির বিষয়বৈচিত্র্য ও সহজ ভাবাবেগ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাক্‌ভঙ্গীর দিক থেকে হয় তো কবিতাগুলি বর্তমান যুগের রুচি চরিতার্থ করতে পারবে না। কিন্তু কাব্যের মূল্যায়নে সেইটাই একমাত্র পরশপাথর নয়। যে গুণ থাকলে কাব্য কালাতীত মহিমায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, 'পাথেয়' গ্রন্থে সংকলিত কবিতার অধিকাংশে সেইগুণের অধিকারী। 'আর্ত-সেবিকা,' 'জীবন-রহস্য,' 'কোন আমি দামী,' 'রবীন্দ্র-প্রয়াণ,' 'শবরী' ও 'সোনার বাংলা' শীর্ষক কবিতাগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। কবি যদি জীবনের সুদীর্ঘকাল আত্মগোপন করে না থেকে প্রকাশ্য অনুশীলনে অভ্যস্ত থাকতেন তা'হলে তিনি হয়তো বাংলার মহিলা কবি-কুলের অগ্রণী হতে পারতেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে তাঁর বহুল গ্রন্থ দর্শনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

শিবদাস চক্রবর্তী

২০৯, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। দশম সংখ্যা। মাঘ, ১৩৬৫।

২৩শে জানুয়ারী

বছরের পর বছর ২৩শে জানুয়ারি আসে। কি আনে ও কি সে রেখে যায়, রুদ্ধশ্বাস দৌড়ে-চলা জীবনে তা ভাববার অবকাশ আমাদের কোথায়! বরং এই দিনটীকে অবলম্বন করে প্রতিবারই বিচ্ছিন্নতা ও তিক্ততা যেন বেড়েই চলেছে লক্ষ্যকে ভুলে উপলক্ষ্য নিয়ে বাড়াবাড়ির দৌরাত্ম্য ও কুশ্রীতা আমাদের জাতীয় জীবনের যেন এক অপরিহার্য অনুসঙ্গ হয়ে উঠেছে।

মতান্তর, মনান্তর প্রতি দেশে, প্রতি কালেই ঘটে থাকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু স্থান কাল ও লক্ষ্য ভেদে তার উগ্রতা আবৃত থাকে, সংযম ও মর্যাদার আবরণে। এ দেশে সে আবরণের কোন বালাই নেই। জনসাধারণেরও ব্যবহারিক মানদণ্ড কিছু নেই। তাই প্রতিবারই যে দিনটী পরিপূর্ণ আনন্দ ও মাধুর্যে আমাদের নিকট বিশিষ্ট হয়ে থাকবার কথা, তার সমাপ্তি ঘটে গভীর ক্ষোভ ও অবসাদে। স্মরণীয়দের স্মারণিক তিথিগুলি যাতে উপযুক্ত মর্যাদা ও আবহাওয়ায় উদ্‌যাপিত হয় তার উপায় বের করতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই সচেতন হতে হবে জাতির জীবনে শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধাদানের প্রয়োজন তাঁরা যদি স্বীকার করেন।

নেতাজীর চরিত্রের সহস্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমাদের আকৃষ্ট করেছে তাঁর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য অনুসরণে সকল বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করবার মত সাহস ও দৃঢ়তা। আজ গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি জাতি ও দেশের কল্যাণে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিকেন্দ্রগুলিকে একলক্ষ্য ও পথে সংগ্রথিত করবার তাঁর সুদুর্লভ ক্ষমতাকে। আজ কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের শক্তি দানা বাঁধছেনা। কেবলই বিচ্ছিন্ন হতে হতে আমরা বার বার এক গিয়ে ঠেকছি এবং ছোট বড় সকল প্রয়াস-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। এই প্রবণতাকে রোধ করবার সঙ্কল্প নিয়ে বিচ্ছিন্নতার ঊর্দ্ধে সমলক্ষ্য ও সমদৃষ্টি-কোণগুলিকে সংগ্রথিত করাই ২৩শে জানুয়ারীর আহ্বান।

মহাপ্রকাশ

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কবে কোন্ দিন হারাইয়া যাব জনারণ্যের মাঝে
কেহ খুঁজিবে না নগণ্য জনে তাতে কোনো ক্ষতি নাই,
হৃদয়-বীণার ছেঁড়া তারে তবু তোমারি রাগিণী বাজে
বিহ্বল মন, বিকল স্বপ্ন, আশা পুড়ে হ'ল ছাই।

দু'চোখে অশ্রু শুকাইয়া গেছে, তবু যে শুষ্ক চোখে
জ্বলে না আগুন, হায়রে ভাগ্য, আর্ত কণ্ঠে আজ
অস্ফুট ধ্বনি উঠে থেমে যায়, গুঞ্জন লোকে লোকে
হারাণ মাণিকে সূর্যরশ্মি সংশয়ে হানে বাজ।

আশা-নিরাশার দোলায় দুলিছে মন
কভু আকাশের কিনারে নিরখি আলোক-সঞ্চরণ।

কভু মনে হয় সে আলোক যেন সরে যায় দূরে দূরে
মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় দিক বলয়ের রেখা।
গানের ছন্দে যতি-বিচ্যুতি তবু বিষাদের সুরে
জাগাব না স্মৃতি স্বপ্ন-সাধের, পরম ভাগ্যলেখা

পরশ-মণির ছোঁয়া লেগেছিল সেদিন আমার প্রাণে
শ্রুতিমূলে আজ ও লেগে আছে সেই মধুর কণ্ঠ ধ্বনি
কোথায় কখন কি যে হারালাম মন তাহা ভাল জানে
মহাপ্রকাশের প্রতীক্ষা তার চলিতেছি দিন গনি।

২৭।১।৫৯

দক্ষিণ কলিকাতা নেতাজী-জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি কর্তৃক পঠিত।

স্বভাবর্পণ :

ত্রিশূলতলের তীর্থযাত্রী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দিলীপ

সুভাষ

শ্রীমতী লীলা রায়,

সুচরিতাসু,

আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন সুভাষ সম্বন্ধে লিখতে। একটু যদি সময় দিতেন তবে গুছিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু আপনি দিনদশেকের মধ্যেই লেখাটি চেয়েছেন। তাই ভাবছি—আমার The Subhash I Knew থেকে কিছু উপাদান নতুন ক'রে লিখে পাঠাই। ইংরেজিতে-লেখা স্মৃতিচারণে যা লিখেছি বাংলায় ফের লিখতে হ'লে একটু আধটু অদল বদল করতেই হবে। তবে মূল বক্তব্যটির অঙ্গহানি হবে না।

সুভাষ সম্বন্ধে আমার ধারণা আপনি হয়ত জানেন। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে আমি তার কাছে কী গভীরভাবে ঋণী। তাকে আমি যে চোখ দিয়ে দেখেছিলাম সে হ'ল অনুরাগীর চোখ : আর কে না জানে—অনুরাগের অঞ্জনে মানুষ দেখতে পায় এমন অনেক কিছু যা শাদা চোখে দেখা যায় না! আমার এ-ভঙ্গিকে সুভাষ নিজেই সময়ে সময়ে hero-worship ব'লে ঠাট্টা করত। কিন্তু আমি চিলটির প্রতিদানে পাটকেল ফিরিয়ে দিতাম এই ব'লে যে তার নিজের ভালবাসার মধ্যেও নিরপেক্ষ দর্শকের চোখে পূজার ভাব বরাবরই অতি প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠত। কিন্তু না, "নিরপেক্ষ" বিশেষণটির উপর আমার একটু বিতৃষ্ণা আছে। আমার মন বলে—নিরপেক্ষ হ'ল উদাসীনেরই অন্য নাম, কাজেই বড় সমালোচক সে নয় যে নিজেকে নিরপেক্ষ ব'লে বড়াই ক'রে।

এ ফুল যোগার জগতে এক প্রেমই যা-কিছু নির্ভরযোগ্য অভ্রান্ত সোপান। এই প্রেমের দৃষ্টিই ফুলে ফলে তরুবল্লী তথা সত্যবল্লী ক'রে আমাদের হ'য়ে এসেছে, তবু তারই এমাহারের মানুষ তারা বুঝতে পারতে পেরেছে: "অনন্ত অবধি হাম রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" নিষ্ফল বিচারকের দৃষ্টি তো বেদনারই দৃষ্টি—সে কী ক'রে পাবে কোনো কিছুর স্বরূপের দিশা? আমার কাছে চিরদিনই গেটের একটি উক্তি মনে লেগেছে: "Aufrichtig zu sein kannich versprechem, unparteiish zu sein aber nicht": অর্থাৎ, আমি আন্তরিক হব এ-কথা দিতে পারি, কিন্তু নিরপেক্ষ হব এমন ভরসা দিই কী ক'রে? গেটে ছিলেন মহামতি মানুষ, একজন বিরল সত্যদ্রষ্টা, তাই তিনি বেখেছিলেন যে কাউকে ভালবাসতে না বাসতে আমাদের দৃষ্টি কতকটা বদলে যাবেই যাবে, আর যারা ভালোবাসেনি তাদের চোখে সে-নেকনজর পক্ষপাত মনে হবেই হবে।

সুভাষকে আমি শুধু ভালোবাসা নয়—পূজা ক'রে এসেছি আকৈশোর। যৌবনে আমার এ-শ্রদ্ধা নাড়ীর ভক্তির কোঠায় পৌঁছেছিল। কারণ তার মধ্যে আমি দেখেছিলাম শুধু দেশভক্ত ত্যাগীকে তো নয়—দেখেছিলাম ভারতের সন্ন্যাসী আত্মাকে যে-আত্মা আধুনিক বাংলাদেশে তার আগে মাত্র দুটি মহাজনের মধ্যে এমন মহিমময় হ'য়ে ফুটে উঠেছিল: স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ। দেশবন্ধুর সঙ্গে যেমন নিকট সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়নি—ঠিক যখন তাঁর একটু কাছে এসে তাঁর স্নেহস্পর্শ পেতে সুরু করেছিলাম—তিনি আমাকে ডেকেছিলেন চিরনিদ্রে—সেই সময়ে দুর্ভাগ্যবশত আমি শিলঙে চারিটি কলাই দিচ্ছিলাম। কলাই সেরে তাঁর কাছে যাব যাব করছি, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। সুভাষের কাছে শুনতাম প্রায়ই তাঁর "মৃত্যুহীন প্রাণের" শুধু নতীর ধারণার কথা। এ-দুটি অমরপ্রাণের একটি অপরূপ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল—খানিকটা গুরু শিষ্যেরই আদান প্রদান বলব। দেশবন্ধু বলেছিলেন: "আমার স্নেহ দিয়ে সুভাষকে ঘিরেছি—অপেক্ষা করো, তিনি তোমাদের সবই দেবেন।" [পরমহংসদেবও তাঁর তপঃশক্তি স্বামীজিকে দিয়ে এমনি সুরে বলেছেন, "আজ আমি ফকির হ'লাম।"] অন্যদিকে সুভাষও তাঁকে ভক্তি করত ঠিক যেমন ভক্ত ভক্তি করে দেবতাকে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সে আমাকে মান্দালয় জেল থেকে ২৫এ জুন, ১৯২৫ তারিখে যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিল তার খানিকটা অনুবাদ দিই এ কথা প্রমাণ করতে:

"তাঁর বিয়োগব্যথায় আমি মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছি। আজ স্মৃতির জগতে আমি এ-মহাপ্রাণ মানুষটির এত কাছে কাছে আছি যে তাঁর মহৎ গুণাবলীর কথা বিশ্লেষণ ক'রে বলিয়ে তোলার চেষ্টা করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আশা করি পরে কোনো দিন আমি তাঁর মহত্ত্বের যে-চকিত দর্শন লাভ করেছিলাম তার কিছু আভাস অন্তত জগতকে দিতে পারব: এমন আভাস—যা আমি পেয়েছিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে, তখন তিনি সেকথা আদৌ জানতেন না। আমার মতন আরো অনেকে নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা সত্ত্বেও তারা করে লিখতে পারছেন না—পাছে মুখর প্রশংসায় তাঁর লোকোত্তর মহত্ত্বকে ছোট ক'রে ফেলা হয়।

"তুমি লিখেছ, দুঃখ বেদনার শেষ অবসান মরণ নয়। এ কথায় আমার পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু শুধু জীবনে এমন অনেক বোধ্যাবহ ঘটনা ঘটে—যেমন দেশবন্ধুর অকাল-

মৃত্যু—যাকে আমি বরণ করে নিতে অক্ষম। আমি ঋষিও নই, ভক্তও নই তাই বড় গলা ক'রে বলতে পারিনা যে সর্বপ্রিয় বস্তুনাই আমার কাছে বরণীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন আমাকে বারবারই ভাবিয়ে তুলেছে যে, এমন দুর্ভাগাও দেখা যায় না কি [যদিও হয়ত তারা ভাগ্যবান্ —কে বলতে পারে?] যারা নিয়তির প্রত্যুটিই স'য়ে এসেছে পদে পদে। কিন্তু এই সোচনীয় দুঃখবিলাসের তর্ক রেখে বোধ হয় বলা চলে যে দুঃখের পেয়ালা নিঃশেষে পান করাই যদি কারুর কারুর ভবিতব্য হয় তাহ'লেও খানিকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই তাকে বরণ ক'রে নেওয়া ভালো।

"১৯২২ সালে যখন আমি জেলে যাই তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে এক কুঠরিতেই থাকতাম। আমাদের জেলে একটি কয়েদী আমাদের উঠানে কাজ করত। দেশবন্ধুর স্নেহশীল হৃদয় তাকে বরণ ক'রে নিয়েছিল যদিও সে ছিল ঘাগী আসামী—এর আগে আটবার জেল খেটেছিল। তা সত্ত্বেও সে অবাধে দেশবন্ধুর প্রতি ঝোঁকে ও ক্রমশঃ তাঁকে প্রভুর মতন ভালোবেসে ফেলে। যখন তাঁর কারামুক্তি হয় তখন তিনি তাঁর এই নবলব্ধ ভক্তটিকে বলেন যে সে যেন থেকে বেরুবামাত্র তার দুষ্কৃতির সহচরদের ছায়া না মাড়িয়ে যেন সোজা তাঁর কাছে চ'লে আসে। সর্বহারা মানুষটি রাজি হয় ও পরে প্রতিশ্রুতি পালন করে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, যে-মানুষ চিরদিন ছিল দুর্দান্ত নরাধম সে সেই থেকে আমাদের মহান নেতার আশ্রয়েই আছে, এবং যদিও সময়ে সময়ে সে আজও অস্থির হয়ে ওঠে, তবু মূলতঃ সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে ও আর পাঁচ জনের মতনই নিরীহ জীবন যাপন করছে। আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে দেশবন্ধুর বিয়োগব্যথা যাদেরকে সবচেয়ে বেশি বেজেছে তাদের মধ্যে সে অন্যতম। কেউ কেউ বলে—মহৎ মানুষের মহত্ত্ব সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর ছোট ছোট আচরণে, দৈনন্দিন ঘটনায়। এ-মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলেও দেশবন্ধুকে মহাত্মা বলতেই হবে—যদি তাঁর বিপুল দেশসেবার কথা বাদও দেওয়া যায়।"

এর উত্তরে সুভাষকে আমি আমার গভীর সমবেদনা জানিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখতেই সে আমাকে কের লেখে মান্দালয় জেল থেকেই [৯ই অক্টোবর ১৯২৫] :

"দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তুমি যা যা লিখেছ ঠিকই।...আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও গভীর আনুগত্য দিয়ে বরণ করেছিলাম শুধু এ জন্যে নয় যে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি তাঁর অনুগামী ছিলাম, আরো এই জন্যে যে আমি তাঁকে খানিকটা জানতে চিনতে পেরেছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। একসময়ে আমরা জেলে ছিলাম একাধিক্রমে আট মাস —তার মধ্যে ছ মাস আমার কাটিয়েছিলাম একই কুঠরিতে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই আমি তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম।"

সুভাষ এই ভাবে নানাসময়েই আমার সঙ্গে নানা অন্তরঙ্গ আলোচনা করত কখনো মুখোমুখি, কখনো বা পত্রের মাধ্যমে। দিনে দিনে তার সঙ্গে এ-সব আলোচনার ফলে আমার কৈশোরের এ-ধারণা আরো দৃঢ় হয় যে তার মহত্ত্বের পরিমাপ করা মোটেই সহজ নয়, যেহেতু সে শুধু কর্মবীর ও দেশনেতাই ছিল না, ছিল উচ্চবিকশিত ধ্যানী, ভক্ত, প্রেমিক—যে দেশকে বরণ করেছিল অন্তরের গভীর ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে, মহত্ত্বকে বরণ করেছিল হৃদয়ের উচ্ছল ভক্তি দিয়ে, সর্বোপরি ত্যাগকে বরণ করেছিল তার অন্ন-উদাসী প্রাণের নিবিড় প্রেম দিয়ে। তার নেতাজি-রূপের মহিমার কাছে সবাই মাথা নীচু করেছে কিন্তু তার এই ধ্যানী ও ভক্তের রূপ সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। তাই আমি তার একটি ইংরাজি চিঠির কিয়দংশ

এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। এ চিঠিটি সে আমাকে —লিখেছিল ভিয়েনা প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজ থেকে—যখন আমি তাকে আমার এক অপেরা-গায়িকা হাসেরিয়ান বান্ধবীর সঙ্গে মৈত্রিক পরিচয় ঘটিয়ে দিই। তিনি পরে লিখেছিলেন: সুভাষ কেমন মধুর কেমনি সরল—আমার চিঠি পেয়ে কী আনন্দ যে করে···ইত্যাদি। ভিয়েনা থেকে সুভাষ লিখেছিল যে তার অসুখে: "She had been an angel to me." যাক —

সুভাষ আমাকে জাহাজ থেকে যে-চিঠিটি লেখে সেটি আমার "অনামী"-র দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছে ব'লে সবটা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই, শুধু তৃতীয় প্যারাগ্রাফ-টুকুর অনুবাদ দিচ্ছি—যাতে ফুটেছে ওর ধ্যানী ও ভক্তের রূপ। ও লিখেছিল [৪ঠা মার্চ, ১৯০০]:

"তোমার একটি পত্রে তুমি আমাকে শিব সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছিলে। বলতে কি, আমার মন কখনো ঝোঁকে এদিকে কখনো ওদিকে—তাই দুর্গা কালী শিব কৃষ্ণ কাকে যে বরণ করব ভেবে পাইনা। আমি অবশ্য জানি যে শক্তির সবই অভেদ—একমেবাদ্বিতীয়ম্ —কিন্তু তবু কার্যক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের কোনো একটি বিশেষ ভাবরূপের অনুরাগী না হ'য়েই পারি না। আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার মনের নানা ভাবাবেগে আমি কখনো বরণ করি শিবকে, কখনো কালী বা দুর্গাকে, কখনো কৃষ্ণকে। এদের মধ্যে আবার কখনো চাই শিবকে কখনো শক্তিকে। শিবের পরম যোগিরূপ আমার কী যে মন টানে! হয়েছে কি জানো! সম্প্রতি—গত চার পাঁচ বৎসর হ'ল—মনশ্চক্ষুতে আমার বিশ্বাস এসেছে—মানে, আমার মনে হয় এক একটি মন্ত্রের এক একটি নিবিড় শক্তি আছে। ইতিপূর্বে আমি যুক্তিবাদীদের মতনই মনে করতাম যে মন্ত্র নিছক প্রতীক মাত্র—শুধু আমাদের মনকে সংহত করবার সহায়তা করে। কিন্তু উপনিষদ প'ড়ে আমার প্রত্যয় এসেছে যে এক একটি বীজমন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে এক একটি সহজ শক্তি—আর প্রতি আধারই এক একটি বিশেষ মন্ত্রের অধিকারী। সেই থেকে আমি ভেবে সারা—আমার আমার কোন্ মন্ত্রের অধিকারী। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি কেন না আমার মন, ঐ যে বললাম, কখনো ঝুঁকে ওঠে শৈবের দিকে, কখনো শাক্তের, কখনো বা বৈষ্ণবের। আমার মনে হয় এইখানেই, গুরু আমাদের পরম বিশারি হ'তে পারেন কেন না সদ্‌গুরু আমাদের জানেন আমাদের নিজেদের চেয়ে বেশি, তাই তিনিই নির্দেশ দিতে পারেন কে কোন মন্ত্র জপ করবে, বা কোন্ পূজারীতি অবলম্বন করবে।"

শ্রীঅরবিন্দ সুভাষের এ-চিঠিটি প'ড়ে আমাকে লেখেন যে উচ্চবিকশিত মানুষ মাত্রেরই চরিত্রের নানাদিক থাকেই, তাই তার মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপের স্বতন্ত্র টান গ'ড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।

সুভাষের জীবন একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে মনে না হ'য়েই পারেনা যে ওর উচ্চবিকাশ হয়েছিল এই জন্যেই যে প্রতিকূলতা ছিল ওর অসামান্য। তাই নিরন্তর শ্রান্তিহীন কর্মব্রতী হওয়া সত্ত্বেও ওর চিত্তের অন্তরীণ অনুসন্ধিৎসা ওকে নিয়তই টেনেছে পরম আত্মজিজ্ঞাসার দিকে। নৈলে ওর মতন দীপ্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী কিছুতেই গুরুবাদের প্রাণের কথাটি এমন সহজে ধরতে পারতনা যে গুরু শিষ্যকে তার নিজের চেয়ে বেশি জানেন ও চেনেন। কিন্তু এ গভীরদৃষ্টির—উপনিষদের ভাষায় 'ব্যাবৃতচক্ষুর'—উন্মেষ হয় না বহির্মুখী রাজনৈতিকদের, কেননা ওঁদের সবসই হ'ল আলাদা। তাই সুভাষকে স্বভাবে অধ্যাত্মবাদী তথা ধর্মপ্রাণ বললে একটুও অত্যুক্তি হবেনা। আর যে স্বভাবে আত্মসন্ধানী ও অন্তর্মুখী তার সঙ্গে সেই সব অগভীরমনী মৈমনারঞ্জনের তুলনাই হ'তে পারেনা যাঁরা ওদ্ধত্যের আস্কারা দেবার খবর রাখেন না কি যাঁরা

মনে প্রাণে বুদ্ধিবাদী বলে মনে করেন যে শুধু সমাজসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক চর্চার ফলেই ভারতের সত্যিকার চতুর্বর্গ লাভ হবে।

কিন্তু আত্মসমর্পন বা গুরুবাদের বর্জন হওয়া সত্ত্বেও সুভাষ কোনোদিনই পরতন্ত্র ছিলনা। তাই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অনেক সস্তা বুলিই তাকে প্রতিহত করত—আমাদের সাধকদের গতানুগতিকতা, তামসিকতা, স্বাধীনচিন্তার দৈন্য আরো কত কী। আমি এই দিক দিয়ে ওর সংস্পর্শে কম লাভ করিনি—বিশেষ ক'রে যখন পণ্ডিচেরি আশ্রমে আমি গুরুবাদের নানা গোঁড়ামিকে তার স্বরূপে দেখতে শিখিনি—যে-গোঁড়ামি ভাবে যে "গুরু গুরু" করলেই পরমার্থ লাভ অবধারিত। পণ্ডিচেরি আশ্রমে এমন কথাও শুনেছি কোনো কোনো বুদ্ধিমান সাধকের মুখে যে আমরা গুরুর চরণে শুধু প্রণত হতে পারলেই রাতারাতি অতিমানসের নাগাল পেয়ে অতিমানব বনে যাব—সেকেলে জপ তপ ধ্যান ধারণা ওসব আমাদের মতন এ-যুগের বরপুত্রদের জন্যে নয়—ওসব নিয়ে মাথা বকাক সেই সব মামুলিপন্থী গড়পড়তা সাধক যাদের গুরুও গড়পড়তা ব'লে জানে না—কেমন ক'রে সুপ্রামেন্টাল যোগে সরাসর সুপারম্যান হ'তে হয়···ইত্যাদি। এ-ধরণের কথা যখন আমি প্রথম শুনি তখন ভাবি—হবেও বা। কিন্তু সুভাষকে আমাদের আশ্রমের এ-জাতীয় তমসাবিধুর গুরুবাদীদের কথা লিখতে না লিখতে ও আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে সত্যিকার বন্ধুর কাজ করেছিল। ও লিখেছিল [১ই অক্টোবর, ১৯২৫—মান্দালয় জেল]:

"তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি জ্ঞানী—আর আমার মনে হয়—স্বামী বিবেকানন্দও চেয়েও গভীর, যদিও স্বামীজির 'পরে আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দেই যে, 'নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা' সময়ে সময়ে দরকার হয়,—এমন কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মের দিকটা পঙ্গু হ'য়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একদেশে বিকাশের ফলে সে সমাজ বিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন উঁচুই কিন্তু একটা হ'য়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন দু চারজন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম বা লোকহিতই হবে সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা পুষ্ট হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের 'double dose'। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি যদি অসাড় না হয়ে যায়, তা হ'লে নির্জনে ধ্যান যতদিনের জন্য তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব না। কিন্তু আমরা যেন 'sicklied over with the pale cast of thought' না হ'য়ে পড়ি; সাধক নিজে হয়ত সর্ববিধ তামসিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে,—কিন্তু তার চেলারা? তার সাধনপদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবে না?"

এ-চিঠি পেয়ে আমার মনে প্রথম দিকে একটু আঘাত লেগেছিল বৈ কি, কিন্তু সুভাষের অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও আন্তরিকতায় আমার শ্রদ্ধা গভীর ছিল ব'লে আমি সময়ে দেখতে পেরেছিলাম যে গুরুবাদের যথার্থ রূপটি অনিন্দনীয় হ'লেও আমাদের জাতীয় তামসিকতার অলক্ষ্য প্রভাবের কার্যক্ষেত্রে সে-নানা সূক্ষ্ম ও জটিল কারণে অনেক সময়েই আমাদের চেলা-বাজে পরিণত হয়। এইখানে আশ্রমের সুভাষ এ-যুগের নেতাদের মধ্যে ছিল অদ্বিতীয়—স্বামী বিবেকানন্দের একমাত্র বাণীবাহ ও উত্তরাধিকারী। তিনি

বলেছিলেন জলদনির্ঘোষে [ভাববার কথা—বর্তমান সভ্যতা।]:

"দেখিতেছ না যে সমুদ্রমন্থন ঘুরা ধরিয়া ধীরে ধীরে যেন তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া যেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় ক্রমাগত বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় কুসংস্কারী অন্ধতাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই —কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষারোপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থ, প্রতিভা চর্বিত চর্বণে, এবং সর্বোপরি, গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম কীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?" কিম্বা তাঁর আর একটি বাণী যা সুভাষ প্রায়ই উদ্ধৃত করত: "Worship your Guru, but do not obey him blindly; love him heart and soul but think for yourself. No blind belief can save you." [Inspired Talks—১০৪ পৃষ্ঠা]

এর পাশাপাশি উদ্ধৃত করি ১৩২১ সালে চল্লিশ বৎসরের যুবক সুভাষের অনুভোজন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—তাঁর:

"আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি বাহ্যের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিতরণের শান্তির মধ্যে নয়: আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি—দুঃখ বরিয়া নির্যাতনের মধ্যে; অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে; অশান্তি, অবিচার, অনাচারের মধ্যে—সবার উপরে, মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে।"

এ কি সত্যি রাজনৈতিক নেতার বাণী, না তারতের আত্মার? মানি, সুভাষ বিবেকানন্দের আত্মার আত্মীয় তথা পতাকাবাহী হ'য়েও কার্যক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। আমি এতে একসময়ে যে একটুও আক্ষেপ বোধ করিনি তা নয়, কিন্তু বিশেষ ক'রে সুভাষের আই এন এ সৈন্যদল গঠন করার পরে আমার মনে হয়েছে যে হয়ত এইই ছিল ওর ধর্ম, কে বলতে পারে? বলে না —"কা জানে কৌন ভেষমে নারায়ণ মিল্ জায়?" শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছিলাম যে একটা মহত্তর আলো যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে তখন সে চলে খানিকটা অদৃষ্ট দেবতার হাতের খেলার পুতুল হ'য়ে—খানিকটা যেন মূর্ছাবেশে। ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রথম দিকে এই ভাবেই প্রাণ দিতে ছুটেছিলেন যত মহাপ্রাণ আত্ম-বলীদানব্রতী। তাঁদের মধ্যে কারুর কারুর কাছেও শুনেছি যে অগ্নিযুগে যখন তাঁরা "আগে চল্ আগে চল্ ভাই"-এর বহ্নিবাণীর ঘরছাড়া ডাক শুনে উধাও হ'তেন তখন সত্যিই তাঁরা জানতেন না কোথায় চলেছেন কিসের টানে কোন্ সিদ্ধির পথে। শুধু জানতেন—বাঁশি যে শোনে তার উধাও না হ'য়েই উপায় নেই। সুভাষ যখন সাতসমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে ইম্ফলে হানা দেয় তখন চমকে উঠে এই কথাই মনে হয়েছিল যে ও সর্ববিঘ্ন বাধার বাঁধ ভেঙে যৌবের বন্যাবেগে এভাবে অচিন সুরভিসারে ছুটেছিল শুধু এইজন্যেই যে মেঘমাতৃকার মধ্যে ও চাক্ষুষ করেছিল জগন্মাতার মহিষমর্দী মূর্তি। মৈরেং-কি ও "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" লঙ্ঘন ক'রে "রাত্রিনিশীথে" তারত থেকে কাবুল থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে ইতালি, ইতালি থেকে যাদের আপান বর্মা হ'য়ে মেবে মণিপুরে হানা দিতে পারত কুলিশসিংহকে জবে কাঁপিয়ে তুলে? মনে হয় ওকে ঘিরে একটা মস্ত ভাগ্যের ও সৌর্যের আদর্শ আমাদের মুগ্ধ চোখের সামনে ধরতে চেয়েই বিধাতা ওকে গড়েছিলেন জল-অপাত্র ক'রে। ও যদি গড়পড়তা রাজনৈতিক হ'ত তা'হলে ওর ধর্ম কী সে-বিষয়ে সহজেই একটা কাটাছাঁটা সিদ্ধান্তে পৌঁছন যেত। কিন্তু যে-মানুষ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়—"কেবল একটা ব্যক্তি নয়, কোনো একটা প্রচারক মাত্র নয়—যাহার সমগ্র জীবন যেন মন আত্মা একটা অখণ্ড সত্যের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি"—তার স্বধর্ম স্বভাব স্বরূপ সম্বন্ধে সংজ্ঞানির্দেশ সুসাধ্য নয়।

একথা অনুভোত্তরেই বলা যায় যে তবু সুভাষ যে বহু দুঃখবরণ ক'রে পদে পদে হাজারো বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তার নিরভিনিবিষ্ট সত্যসন্ধানে ছুটেছিল প্রাণকে পর্যন্ত বাজি রেখে তার মূলে ছিল তার অন্তরের এই আলোক-প্রত্যয় যে তার আত্মবিকাশ ছিল নির্বৈয়ক্তিক।

তাইতো তার একটি অতি প্রিয় মন্ত্র ছিল শেক্সপীয়রের :

To thine own self be true
And it must follow as the night the day :
Thou canst not then be false to any man.

এ আমার কল্পনাবাস নয়। সুভাষও ঠিক এই কথাই লিখেছিল তার পূর্বোদ্ধৃত বাসন্তীদেবীর পত্রের শেষে :

"আমি একথা মানি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা পেতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এ্যাশর্নের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গ'ড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক ধরনের পথিক হব এমন কোনো কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা রাজনীতির সে সাধনা নয়। কিন্তু আমার মনে হয় সবাইকার আদর্শ প্রায় একই। সোনারকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চাক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হ'লে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হ'তে পারে না। তাই আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই বেছে নেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের-শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, তা'হলে অচিরেই সমগ্র জাতির মধ্যে নব-জীবনের মুকুল হয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয় যাতে তাকে বাহির থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হ'তে পারে। কিন্তু সে-অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাহিরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে তখনই লোকে তার বিচার করবে; সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে, তা'হলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়।"

এই আত্মবিকাশের চিন্তা যার কাছে সত্য, তার ভয় কোথায়? নিজেকে যে ফাঁকি দেয় না সে কি কখনো অন্যকে ফাঁকি দিতে পারে? আমাদের এ-তামসিক দেশের আবহাওয়ার সুভাষ এসেছিল যেন আগুতির নিত্যসিদ্ধ পুরোহিত হ'য়ে। ওর মনে ১৯৩৭ সালে আমার একটি দীর্ঘ কথালাপের বিবৃতি আমি দিয়েছি The Subhash I Knew বইটিতে। তার শেষের অংশটুকু থেকে একটি উক্তির সংক্ষিপ্তসার দিয়ে এ-তর্পনের সমাপ্তি টানি—সমাপুনা হোক সমাজলে :*

সুভাষ বলল : "জেলে আমি অনেক কিছুই লিখেছি দিলীপ, বিশেষ ক'রে আমার নিজের সম্বন্ধে। কারণ

* এর মূলের এ-অনুলিপি তার মূলের সঙ্গে মিলে যাবে এমনটি দাবি করা—তাছাড়া অসম্ভব নিজের ভাষায় বলা। তবে এ বিষয়ে যে ভাষা সম্বন্ধে সাবধানতারই মুটিয়ে মূলত তার ভাষা এর মূল সত্যনিষ্ঠা। তাই তার আমার হ'লেও বক্তব্যটুকু আমি এভাবে বলতে পারি অনুরোধেই।

তুমিও নিশ্চয়ই জানো যে বাইরের জগতের দুয়ার বন্ধ হ'লে অন্তরালের অন্তরে একটা নতুন জগতের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু তুমি নির্জনবাস বরণ করেছিলে স্বেচ্ছায়—আর্তরে, আমাকে বরণ করতে হয়েছিল অনিচ্ছায়—জেলে। কাজেই আমাকে পদে পদে লড়তে হয়েছে এই বাধা হ'তে বিজনবাসী হওয়ার জন্যে। কিন্তু তা'হলেও এই পথেই আমার নিয়তির বিধানে ভগবৎ-বশ্যতার [resignation] মন্ত্রদীক্ষা হয়, আমি শিখি—দীনতা কাকে বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বাইরে থেকে যেখানে এ-বস্তুতাকে দুঃখময় মনে হলেও কার্যতঃ আমি খুব বেশি লাভ করি—নিজেকে এই দুঃখের আলোয় আবিষ্কার ক'রে। তুমি খানিক আগে বলছিলে—তুমি আত্মসমর্পন কাকে বলে জানতে পেরেছ অনেক দুঃখ সেয়ে তবে। আমি বলতে পারি না সে কথা। তবে আমার ক্ষেত্রে হয়ত প্রশ্নটাই ওঠে না, যে হেতু আমাকে চিরদিন লড়তে হয়েছে আমার যথোচিত এক আন্তর বিদ্রোহের সঙ্গে—যে আমাকে কখনো দুঃখও স্বস্তি দেয়নি। তাই তো আমি জেলে আসতে না আসতে প্রতিবারই অসুখে পড়েছি—স্বাস্থ্যরক্ষার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু উপায় কি? আমি অশান্ত হ'য়ে উঠতাম জেলে আসতে না আসতে—সময় যে ব'য়ে যায়—বলত মন, আর বাধায় পড়তাম আমি দুর্বহ হ'য়ে।"

সুভাষ চিন্তিত মুখে বলে চলে: "আমার স্বাস্থ্য কখনই ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু আমি করি কী? আমার তো এমন কোনো গুরু নেই যে আমাকে পথের নির্দেশ দেবে। অগত্যা আমি নিজেকে নিরীক্ষা করতে সুরু করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম যে পঞ্চশরের সব চেয়ে বড় দিশারি হচ্ছে বাইরের জগতের সঙ্গে তিতিক্ষা—charity, আর অন্তরে বিনম্রতার সাধনা—humility। এরা উভয়ে আমার যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, আমরা ভিক্ষু হ'য়ে বিচারের নামে অবিচার কেননা আমরা সবাই কম বেশি অন্ধ ও অজ্ঞান—কাজেই দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি আরো একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করলাম: যে আমরা যে মুহূর্তে দুর্বল এটা উপলব্ধি করতে না করতে বল এসে যায়।"

"প্রতি উপলব্ধির সঙ্গেই আসে পরিবর্তন। আমার মধ্যে এই পরিবর্তনের পরে আমি কৃতসংকল্প হলাম যে আমাকে সব আগে নিজের কাছে খাঁটি হ'তে হবে,—'to thine own self be true' মন্ত্র জপ ক'রে। এর মানে কি! না, আমি নিজের প্রতি কাজকে তেমনি ভাবে ওজন ক'রে ক'রে দেখব যেমন ভাবে দেখি আর সবার কাজকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পেলাম যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্বন্ধে শুধু যে আমাকে সহিষ্ণু—lenient—হ'তে হবে তাই নয়, তাদেরকে ভালবাসতে হবে।"

সুভাষ থেমে ঈষৎ করুণ হেসে ব'লে চলল: তোমাকে আর কি বলতে হবে না যে আমি হাড়ে হাড়ে জানতাম যে কর্তব্য কী তার দিশা পাওয়া আর সে-কর্তব্য পালন করা এক জিনিষ নয়—ঠিক যেমন কোনো কিছু কামনা করা আর তাকে হাতে পাওয়া এক জিনিষ নয়।...আমার বৈশোরে আমি পড়েছিলাম বুদ্ধের বিখ্যাত বাণী যে সবাইকে তেমনি ভালোবাসতে হবে যেমন বাসে মা তার একটি মাত্র সন্তানকে। বেশ মনে আছে—যখন এ-কথা প্রথম পড়ি তখন আনন্দে আমি যেন হাওয়ায় উড়ে চলতাম—মাটিতে পা পড়েনা অবস্থা! কিন্তু হ'লে হবে কি, সংসারকে যতই দেখতে বুঝতে চিনতে শিখি—ঠিক কি সেই অনুপাতেই ভালোবাসবার শক্তি আসে ক'মে—যাকে অবশ্য বে-ভালোবাসার কথা বুদ্ধ বলেছিলেন।"

সুভাষের মুখে যেন আত্মজনক হাসি ফুটে ওঠে: "কিন্তু দিলীপ, জীবনের সঙ্গে পরিচয় গভীর হ'তে না হ'তে আমরা পদে পদেই ঠেকে শিখি না কি যে, কোনো বড় উপলব্ধির

পথই কুসুমাবৃত নয়। তুমি শুকনোর পথ বেছে নিয়েছিলে। আমি অকপটেই স্বীকার করছি যে অনেকদিন ধরেই আমার মনের সংশয় কাটেনি—তুমি ঠিক পথে চলছ না ভুল। কিন্তু আট বৎসর বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হ'তে না হ'তে আমার সব সংশয় কেটে গেছে। সাধুকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করতে হয়—[আর এর চেয়ে সত্যের বিচার আর কীই বা হ'তে পারে?]—তাহলে কিছুতেই বলা চলে না যে তুমি আলেয়ার পিছনে ছুটেছিলে। পথ-চলায় আমি যদি সহিষ্ণু ও ডিভিশনীল হ'তে শিখে থাকি তাহলে তুমি কী শিখেছ—বলব খোলাখুলি! আচ্ছা শোনো।"

একটু থেমে সুভাষ ব'লে চলল ধীরে একটানা: "সেদিন অনেক রাত অবধি তুমি আমার কাছে না রেখে ডেকেই বললে তোমার নানা অগ্নিপরীক্ষার কথা, তোমার কথা, দুর্বলতার কথা। আমি খুব মন দিয়েই শুনছিলাম—ক'রে যেমছিলাম—ওজন করছিলাম তোমার প্রতি কথার নিহিতার্থ। তুমি যটা ক'রেই বললে তোমার নানা সংশয়ের কথা; বিশ্বাসঘাতের কথা, নিরাশার কথা—এমন কি তোমার নানা প্রবর্ধমান অবিশ্বাসের—cynicism-এর—কথাও তুমি বললে খোলাখুলিই। কিন্তু একটিবারও তুমি তোমার গুরু কি ইষ্টের সম্বন্ধে এমন কোনো কথা বলোনি যাকে বলতে পারি disloyalty: তাই তুমি যতই বলো না কেন, আমাকে তুমি একটুও বিশ্বাস করাতে পারোনি যে তুমি বিশ্বাসে প্রত্যয়ে মেউলে—একটিবারও তুমি আফশোস করোনি সংসারে নানা ভাবে সফল হবার সুযোগ ছেড়ে দিয়েছিলে ব'লে। এর পরে আমি কেমন ক'রে তোমার নিজের সম্বন্ধে এ-রায়ে বিশ্বাস করি বলো যে তুমি স্বভাবে সন্দিগ্ধ—sceptic! না, তোমাকে বেশি বিব্রত করতে চাই না—অন্য প্রসঙ্গ পাড়ছি এখুনি—কেবল একটা কথা বলি। কিছুদিন আগে কোথায় পড়েছিলাম কবি ব্লেকের এক একটি চমৎকার উক্তি: যে, ভগবান মানুষকে অনেক কিছুই বর দিতে পারেন বটে, কিন্তু মানুষ তাঁকে দিতে পারে একটি মাত্র উপহার: বিশ্বাস। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম কথাটি পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে খৃষ্ট সাধারণ মানুষকে—Scribes ও Pharisee থেকে বিশ্বাসে হীন ব'লে ঠেলে দিয়ে তাদের প'রে একটুও অবিচার করেননি। এ যুগের মানুষ সম্বন্ধে কি তাঁর ভর্ৎসনা আরো বেশি খাটে না? এক কথায় সংসারে সবচেয়ে বড় পাথেয় হ'ল বিশ্বাস। তাই দিলীপ, আমার মনে সময়ে সময়ে প্রশ্ন জাগে: আমি আমার প্রতিপক্ষকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে পারব এ-বিশ্বাস আমার সত্যি আছে তো? কিন্তু—" ব'লে ও ধীরে একটু থেমে বলল—"যে-পথেই চলি না কেন হার না মেনে শেষ পর্যন্ত চলা কঠিন না হ'য়েই পারে না। নয় কি?"

সুভাষের একটি অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল নিবেদিতার "The Master As I saw Him." বিলেতে সে প্রায়ই উদ্ধৃত করত এ-বইটিতে স্বামীজির নানা মতামত। এরই মধ্যে একটি উক্তি ছিল ওর বিশেষ প্রিয়। নিবেদিতা লিখেছেন:

"To the Swami it was only natural to say in answer to an enquirer, "Had I lived in Palestine, in the days of Jesus of Nazareth, I would have washed His feet, not with my tears but with my heart's blood." [২৮১ পৃষ্ঠা]

এর পরেও সুভাষকে "চিরন্তনের তীর্থযাত্রী" উপাধি দিলে কি খুব ভুল হবে? দিলীপকুমার রায়

নেতাজী স্মরণে

নির্মলকুমার বসু

কটক হইতে পুরী বেশী দূর নয়। আমি যখন পুরী ইস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আদর্শ ছাত্র হিসাবে সুভাষ বাবুর নাম প্রথম শুনিতে পাইয়াছিলাম। তখন পাটনা বা উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয় নাই; সকলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সুভাষবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন এবং মাঝে মাঝে পুরী বেড়াইতে আসিতেন। সেইরূপ এক ছুটিতে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের যে দিকটা সকলকেই আকর্ষণ করিত তাহা হইল তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা, সেবাপরায়ণতা এবং কঠোর সত্যনিষ্ঠা। তপস্যার একটি ভাব তাঁহার মধ্যে তখনই স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুরী সমুদ্রের কূলে আমাদের মত আরও কয়েকজন ছাত্রকে লইয়া প্রায় দুই মাইল দৌড়ান, তাঁহার প্রাত্যহিক সন্ধ্যাকালীন কসরৎচী হইয়া দাঁড়াইল। একবার তিনি পদব্রজে কণারকের মন্দির দেখিতে যান; তখন খুব বেশি লোক সেখানে যাতায়াত করিত না।" ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মুখে পুংখানুপুংখ বর্ণনা শুনিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে মন্দিরের ছবি যেন প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়া উঠিল। সেই হইতে কণারকের মন্দির দেখিবার আগ্রহ আমার মনে জাগে, এবং পরবর্তী কালে তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মন্দির স্থপতি বা স্থাপত্যের প্রতি আকর্ষণ আরও নিবিড় হইয়া দাঁড়ায়।

সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে ছাত্রাবস্থার গল্পও নানা প্রকারের শুনিয়াছিলাম। ক্রমশ আমাদের ধারণা হইয়াছিল, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মত হয়তো সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করিবেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়িবার পর তিনি যখন স্কটীশ চার্চ কলেজে ছাত্র, তখন সেখানে আমিও পড়ি। সে সময়ে কিন্তু আর তাঁহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারি নাই।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। সুভাষচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একান্ত স্নেহভাজন হইয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ঘটনার স্রোতে আমিও সাক্ষাৎ রাজনীতির কর্মপ্রবাহের সহিত সংযুক্ত না হইলেও গান্ধীজীর মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছি। গান্ধীজীর অহিংস কর্মপন্থা এবং জনসমূহের মধ্যে অহিংস প্রতিবাদ প্রচেষ্টার সম্ভাবনাতেই হয়তো আকর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। " ব্যক্তিগতভাবে মনে হইত,

গান্ধীজী যেন সময়ে সময়ে প্রাচীন মতবাদকে বেশি পোষণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও যে শক্তিময় ভাব, জনসাধারণকে জাগ্রত ও শক্তিধর করিয়া তুলিবার একান্ত সাধনা তাঁহার মধ্যে আমার মত আরও অনেককে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই উত্তরোত্তর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে আমাদের যেন দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মতান্তর ঘটিল। এ সকল লক্ষ্য করিলাম এবং হয়তো কিঞ্চিৎ আহতও হইলাম। কেননা যে আদর্শনিষ্ঠা অথবা প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসের ভাব ছাত্রাবস্থায় আমাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছিল, তাহার সহিত রাজনৈতিক সুভাষচন্দ্রের চিত্র যেন সকল অংশে মিলিতেছিল না।

আরও বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। সুভাষচন্দ্র সুকৌশলে স্বদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার চাঞ্চল্যকর নিরুদ্দেশ কাহিনীর বিষয়ে দেশে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। ক্রমে বিদেশ হইতে বেতারে তাঁহার বাণীও শুনিলাম। মনে হইল, দেশের মুক্তি-কামনায় সেই বাল্যকালের সন্ন্যাসীকে যেন নূতন এক রূপে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার সমস্ত চিন্তা, সকল ধ্যান ও কর্মশক্তি যেন শুধু স্বদেশের মুক্তিব্রতে, হোমশিখায় আত্মদানের মত সমর্পিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর সহিত ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের সমসাময়িক কালে নেতাজীর মতভেদ সর্বজনবিদিত। অতি যত্নসহকারে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সকল পত্র পত্রিকা যথাসম্ভব নিষ্ঠার সহিত পড়িয়াছি এবং নিজের মনে তাহা বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে নেতাজীর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার শ্রদ্ধার কোনও অন্তরায় ঘটে নাই। বরং মনে হইয়াছিল, অন্তত একজন দেশবরেণ্য নেতা মনে প্রাণে গান্ধীবাদকে স্বীকার করিতে না পারিয়া স্বাধীন পথ অনুসরণ করিবার সাহস অবলম্বন করিয়াছেন। অন্য কোন কোন নেতাকে দেখিয়াছি। শুধু গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া অহিংসার পথ অন্ধ পথিকের মত গ্রহণ করিয়াছেন; সম্মুখের আলো যখন নিভিয়া গিয়াছে তখন অন্তর্বর্তী ভাব বা আদর্শের ও তৎসহ বিচারের অভাববশত সম্পূর্ণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন; অহিংসার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেশকে বিপথে চালিত করিতেছেন। কিন্তু নেতাজী এই অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলেন।

যে বলিষ্ঠতা তাঁহার চরিত্রে প্রকাশিত হইত, তাহা রজোগুণাশ্রিত। রজোধর্ম যেমন একদিকে সাত্ত্বিকতাকে স্পর্শ করে, অপরদিকে তমোধর্মের আভাসও তাহার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য আসিয়া পড়ে। কিন্তু নেতাজীর ক্ষেত্রে তাহা সর্বদাই ঊর্ধ্বগামী ছিল। এইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হইয়াছে, বাল্যকালে

স্বামী বিবেকানন্দ বা পরমহংস রামকৃষ্ণের যে-আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, উত্তরকালে তাহাই তাঁহার চরিত্রের ক্রমবর্ধমান রাজসিকতাকে সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা সর্বদা সিঞ্চিত করিয়া রাখিত।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির বিধ্বস্ত গ্রামে পরিভ্রমণ কালে নেতাজীর জন্মদিবসে একটি ভাষণ দেন। তাহাতে তিনি বিশেষ ভাবে নেতাজীর সংগঠন প্রতিভার উল্লেখ করিয়া বলেন, যে-ভারতবর্ষ ধর্ম বা ভাষাগত নানা ভেদে বিভক্ত হইয়া আছে, নেতাজী তাঁহার জলন্ত আদর্শনিষ্ঠা এবং গঠনক্ষমতার দ্বারা তাহারই মধ্য হইতে বিদেশে এক আশ্চর্য জাতীয় ঐক্যের ভাব গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের সুযোগ লাভ করিয়া আমার ইহাই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল যে, মতানৈক্য হইলে বা বিভিন্ন মতের সংঘর্ষ ঘটিলে তিনি স্বীয় মত হইতে স্খলিত হইতেন না, এমন কি অপর মতের যথেষ্ট বিরোধিতাও করিতেন, কিন্তু মতভিন্নতার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে কখনও অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন না। মতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মানই করিতেন। ব্যক্তি এবং মতের মধ্যে সর্বদাই তিনি ভেদ স্বীকার করিয়া চলিতেন। কারণ তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, কেহই সংসারে সত্যকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিতে পারে না, সকলের সত্যই খণ্ড সত্য।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬৲
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৪৷৷০
ভারত-আত্মার বাণী	৫৲
বুদ্ধবাণী	।৹
কর্মবাণী	১।০

মণি বাগচির

বিদ্যাসাগর	৭৲
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫৲
নিবেদিতা	৪৲
গৌতম বুদ্ধ	৪৲

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩৲
বাংলার মনীষী	১।০
বাংলার বিদুষী	২৷৷০
বীরত্বে বাঙালী	১৷৷০
ব্যায়ামে বাঙালী	২৲
বিজ্ঞানে বাঙালী	২৷৷০
রাজর্ষি রামমোহন	১।০
রবীন্দ্রনাথ	১।০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১।০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১৷৷০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১৷৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা—১২

দিল্লী চলো *

উষা দেবী

লাল কেল্লার উপরে নেমেছে রাত্রি
গভীর নিশীথ রাত্রি—
কে আছ তোমরা দিল্লী পথের যাত্রী—...
চল চল সঙ্গে চল। —

শত ঢিল্লন, সেহ্‌গল আর শানওয়াজ
তোমাদের পথ দেখাবে আজ .....
লক্ষ্মী সোয়ামীনাথনের বীরবাহিনীর—
কাহিনী শোনাবে কামানের আওয়াজ ...
চল চল দিল্লী চল।—

বন্ধুরা শোনো সেই আঠারশ সাতান্ন সাল পরে
এই তো প্রথম শাসনের ভার নিজেদের হাতে নিয়েছি—
স্বীকার করেছে সভ্যতা তার অনেক অনেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা
সেই আঠারশ সাতান্ন সাল পরে
এই তো প্রথম দাঁড়ালাম এসে কাঁধে কাঁধে হাত দিয়ে
স্বাধীন সাম্যে উন্মাদ বীরদল—
সেই আঠারশ সাল পরে
এই তো প্রথম বিপ্লব-বন্যায়
অসহ্য সুখে আমরা ঐক্য পেয়েছি—
চল্ চল দিল্লী চল। —

* ইম্ফল অভিযানের পূর্বে অভিযাত্রীদের নিকট "দূরে, ঐ বহুদূরে কৃষ্ণরাত্রির ওপারে আমাদের জন্মভূমি···ইত্যাদি" নেতাজীর সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা অনুসরণে।

তাদের ধন্যবাদ—
অত্যাচারের অগ্নিদাহনে শুদ্ধ ক'রেছে যারা ....
অত্যাচারের প্লাবনে যাদের শাসন ভগ্নবাঁধ —
ধন্যবাদের যোগ্যপাত্র তারা।
আছে বুভুক্ষা বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের ক্রূরতম ইতিহাস
শস্য শ্যামলা এদেশের মাটী হয়েছে লোনার ফাঁস
বিচারের দায়ে বাঁধন যাদের বাঁচানোর দায়ে মারা—
ধন্যবাদের যোগ্যপাত্র তারা ....
বন্ধুরা শোনো পূর্ব-আকাশে উদিত নূতন সূর্য্য
বাজাবে নূতন—আলোর বিজয় তূর্য্য
এই অবসরে এই পবিত্র স্বাধীনতার-নতুন লগ্নোদয়ে—
সদ্য-আগত চির-ঈপ্সিত জয়ে
রাখবোনা কোনো বিদ্বেষ ভয় হিংসা কিম্বা জিঘাংসা কুটিলতা
পুরাণো দিনের প্রেম-হীনতার ব্যথা
শত্রুরা যদি পঙ্গুই হোলো, ক্লৈব্যে তাদের শাসনের অবসান
বীর সৈনিক করেনি কখনো দুর্বলে অপমান
.. সৈন্য প্যারেডে···শবের মিছিল···ভিক্ষাপাত্র বুভুক্ষু কারা আনে

—নিজেদের কিছু জানো ?
তোমাদের তাজারক্তে যাদের অত্যাচারের খাদ—
পূর্ণ হয়েছে — আজকে তাদের জানাবো ধন্যবাদ
চল চল দিল্লী চল।—

এই তো পরমক্ষণ—
এই তো আজকে এসেছে চরম লগ্ন,—
অতীত কালের প্রচাশাসনের হ'য়েছে ভিত্তি ভগ্ন
সেই আঠারশ-সাতান্ন সাল আবার এলো যে কঠিন মূর্ত্তি নিয়ে
ঘূর্ণায়মান ঐতিহাসিক চক্রের মাঝ দিয়ে —

ভবিষ্যতের বনিয়াদ পাকা এইবার নিশ্চয়,—
বন্ধুরা চল সম্মুখে নির্ভয়—
চল চল দিল্লী চল—

শোনো স্বদেশের ভাই—
স্বদেশ-নিবাসী বিদেশ-প্রবাসী এক আত্মার ভাই—
সময় যে বেশী নাই—
সময় নাই যে আর
আনো আনো হাতিয়ার
সুরু কর সংগ্রাম
দেশ-মাতৃকা মন্ত্র কণ্ঠে জপে যাও অবিরাম—
চল চল দিল্লী চল।—

পূর্ব এসিয়া হ'তে প্রবাহিত বীরদল বাহিনীর
কাহিনী দীপ্ত উদ্দাম আহ্বান
শোনো কামান,—
শক্তি দৃপ্ত মিত্রেরা জাগ্রত
জাতীয় যজ্ঞে শেষ আহুতির শিখায় আমরা হলাম পূর্ণব্রত,
শত্রুর পরাজয়,
এবার সুনিশ্চয়,
চল চল দিল্লী চল।

স্বাধীন পতাকা উড়াবে প্রথম দেশের স্বাধীন প্রান্ত
পূর্ব সীমান্ত—
শত্রুর সব বাধা হবে উৎক্রান্ত
হবে জানি উৎক্রান্ত,—
তারপর সুরু হবে আমাদের দীর্ঘ পথের যাত্রা
ঘড়ির কাঁটার গুনবোনা কাল-যাত্রা,—

প্রতি ইঞ্চিতে নীরস পৃথিবী শক্ত,—
করবে সরস আমাদের তাজারক্ত,—
প্রতি ইঞ্চির স্বাধীন বাতাসে গ্রহণ করবো নিঃশ্বাস—
আছে দৃঢ়-বিশ্বাস —
চল চল দিল্লী চল।

যাত্রা যে কবে শেষ হবে তার ঠিকানা নাই,—
অতীতেরও কোন নিশানা নাই,—
বর্ত্তমানের আছে শুধু মূল মন্ত্র —
দিল্লী চল,—
শোনো স্বদেশের ভাই—
একটিও যদি বিদেশী শত্রু থাকে ততদিন শান্তি নাই,
দিল্লী চল,—
জাতীয় পতাকা গর্বিত হয়ে স্বদেশে যখন উড়বে—
স্বাধীন দেশের স্বাধীন বাতাসে উড়বে,
শত্রুর উচু প্রাচীর যখন এ মাটীতে হবে বল্মীক
যাত্রা তখন নিজের গন্তব্যে পৌঁছবে জানি ঠিক,
ততদিন বীর পথচারী চল দিল্লী চল
ভারতের নব স্বাধীন সৈন্য দিল্লী চল
সেনানীর কুচ কাওয়াজে—দিল্লী চল—
কোটি কামানের আওয়াজে—দিল্লী চল,—
লাল-কেল্লার উপরে নেমেছে রাত্রি
কে আছ তোমরা সূর্য্যপথের যাত্রী—
দিল্লী চল, দিল্লী চল, দিল্লী চল—
স্বাধীন পতাকা উত্তোলনের উৎসবে—
—দিল্লী চল—
স্বাধীন দেশের বীরদল চল দিল্লী চল
—দিল্লী চল.....দিল্লী চল.....

আমাদের দেখা অনেকের কথা

যোগেশচন্দ্র বাগল

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

রামকমল সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রামকমল সিংহ অভিন্ন বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতিভাত হইতেন; রামকমল ছিলেন ইহার সহিত এতই জড়িত। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অক্লান্তচিত্তে সাহিত্য পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অতি নিকট হইতে অন্যূন পঁচিশ বৎসর কাল দেখিয়াছি। এমন পরিষদ-গত প্রাণ দুইটি এই দীর্ঘকালের মধ্যে চোখে পড়ে নাই। রামকমলবাবুর আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায়। তিনি উত্তর রাঢ়ীয় বিখ্যাত সিংহ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। রামকমলবাবুর মত বিনয়ী সদালাপী মানুষও বোধ হয় খুব কমই দেখিয়াছি।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তাফী প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়েরই মানুষ রামকমল সিংহ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বা ব্যোমকেশ মুস্তাফীকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদেরই হাতে গড়া রামকমল সিংহকে দেখিয়া বুঝা যাইত তাঁহারা কতবড় মানুষ ছিলেন। রামকমল তাঁহাদের ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তিনি যেন অতিরিক্ত আরও কিছু। যেখানেই গণতন্ত্র সেখানেই দল এবং দলাদলি। রামকমল বাবু এই দল ও দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন। পক্ষ প্রতিপক্ষ দুইই তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিতেন। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের পূর্ববর্তীরেরাও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রামকমল সিংহের বিদায়-অভিনন্দন সভায় ডক্টর মহেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার এই অপক্ষপাতের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন 'রবিবাসরীয়' সভ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সদস্যশ্রেণী ভুক্ত হই বোধ হয় ১৯৩১ সনে। যতদূর মনে হইতেছে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন পরিষদের সভাপতি ছিলেন। পরিষদে তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর তাঁহাকে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরে পরিষদের সভাপতি হন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আমরা পড়াশুনা বিশেষতঃ গবেষণা কার্যের সুবিধার নিমিত্তই পরিষদে ঢুকি। রামকমলবাবু আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, সাহিত্য ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ মাত্র, তথাপি তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। পড়াশুনার সব রকম সুবিধাই তিনি করিয়া দেন। পার্শী রাজদূত কন্তরজী কাঁওয়াসজী সম্বন্ধে গবেষণাকালে ছয় মাসের অধিককাল প্রত্যহ অপরাহ্নে প্রবাসী আপিস হইতে সাহিত্য পরিষদে যাইতাম এবং রাত্রি আটটা পর্যন্ত সমানে বই-পুঁথি-পত্র লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি

করিতাম। একটি দিন বা একটি বারের জন্যও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

রামকমলবাবু ছিলেন পরিষদের মধ্যমণি, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পরিষদ চক্র ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হইত। কার্য নির্বাহক সমিতির অধিবেশনের দিন অনেক নূতন নূতন লোক দেখিতাম। তাঁহারা কিছুকাল থাকিয়া যাত-সমস্ত ভাবে সভার কাজকর্ম সারিয়া যে যাহার গন্তব্যস্থলে চলিয়া যাইতেন। তাঁহাদের আগমনে পরিষদে খানিকটা উচ্ছলতা দেখা দিত ও তাঁহাদের অন্তর্ধানে পরিষদ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিত—কাহা করিব না, মনে হইত পরিষদ যেন শীতকালের নদীর মত আবার স্বাভাবিক শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

কর্মকর্তারা কেহ কেহ অবশ্য মাঝে মাঝে আসিতেন, রামকমলবাবুর নিকট বহু বিষয়ে ওপদেশ লাভ করিতেন, কখনও বসিয়া গল্পগুজব করিতেন, কখন বা কাজ হইলেই চলিয়া যাইতেন। তবে পরিষদের একজন কর্মকর্তার উপস্থিতি প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম—তিনি বোধ হয় পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন—মৌলবী আবদুল করিম। শুনিয়াছি তাঁহার নিবাস বসিরহাটের নিকটে এবং এখনও জীবিত। পরিষদে একটি গল্পগুজব ছিল, তিনি আসিলেই হোহো করিয়া তামাক সাজিয়া দিত। তিনি তামাক সেবন করিতে করিতে নানা গালগল্প করিতেন। কাকে কাকে রামকমলবাবু এবং আরও উহাতে যোগ দিতাম। এই গল্পগুজবটি কোথায় শেষ জানিবার কৌতূহল হইয়াছে অনেক দিন। রামকমলবাবু জীবিত থাকিতে জিজ্ঞাসা করি নাই, এখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর দিতে পারিবে কিনা জানি না। কর্মকর্তা সহও পরিষদে কত গুণী জনের সমাগম হইত। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' আবিষ্কর্তা কয়েকজন ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ মন্দিরে প্রায়ই আসিতেন। তাঁহাকে ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে দেখিয়াছি। তখন জানিতাম না ইনি কে। বোধ হয় রামকমলবাবুই তাঁহার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দেন। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যের একটি সুপ্তার দিক খুলিয়া গিয়াছে। পরিষদ এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া ধন্য। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের সারগর্ভ ভূমিকা গ্রন্থখানি বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচিত করাইয়া দিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হইতেই তাঁর আওতোষ গ্রন্থখানিকে অন্যতম পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়া বসন্তরঞ্জনকে ইহার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন। এ হেন বসন্তরঞ্জনকে দেখিলাম। দেখিলাম শিশুসুলভ সরল প্রাণ, একান্ত বিনয়ী এবং তরুণদের কার্যকলাপের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। প্রথম পরিচয়েই যেন তাঁহার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইলাম। পরে যতবার দেখা হইয়াছে তিনি কুশলবার্তা তো লইতেনই, উপরন্তু তাঁহার আলাপ হইতে বুঝিতাম যে আমাদের সব বন্ধু-কনিষ্ঠদের কার্য কলাপের সঙ্গেও তিনি পরিচিত।

পরিষদ মন্দিরে আরও বহু পণ্ডিত ও মনীষী-প্রধানকে দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই মনে হয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কে। যতদূর মনে হয়, তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক পদ হইতে তখন অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিতেন, এবং কলিকাতায় আসিলেই পরিষদ মন্দিরে পদার্পণ করিতেন। দর্শন শাস্ত্রে বিশেষতঃ ন্যায় দর্শনে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য। ন্যায়-দর্শনের উপর তাঁহার গবেষণা-মূলক এক বিরাট গ্রন্থ পরিষদ কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও সদালাপে আমরা তরুণেরা মুগ্ধ হইতাম। তাঁহাকে পরিষদ মন্দিরে বহুবার দেখিয়াছি এবং তিনি বরাবরই আমাদের কুশলবার্তা ও কার্যকলাপের

খোঁজ খবর লইতেন। ১৯০৮ সালে কৃষ্ণনগরে যে-বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয় তাহাতে আমরা কলিকাতা হইতে এক সঙ্গে যাত্রা করি। কৃষ্ণনগর যাইবার সময় রাণাঘাটে আমরা গাড়ী বদল করি। ট্রেনের প্ল্যাটফরমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক নির্মল নাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের কয়েকজনের একখানি গ্রুপ ফটো তোলেন। ইহাতে ছিলেন মহামহোপাধ্যায় কবিভূষণ তর্কবাগীশ, হীরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এবং আমরা দু তিন জন। বলা বাহুল্য এই ফটোখানি আমার নিকট একটি অমূল্য সম্পদ হইয়া আছে। কবীভূষণের মত অমন নিরহঙ্কার, বিনয়ী, প্রীতিপরায়ণ মানুষ কদাচ দেখিতে পাই।

পরিষদ মন্দিরে সুবিখ্যাত বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্র নাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবকেও কয়েকবার দেখিয়াছি। তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ, এবং প্রায়ই অসুস্থ থাকিতেন। তিনি অল্পকাল মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। কবি কামিনী রায় পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি ছিলেন। তিনি কোন কোন সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিদুষী মহিলা। বেথুন স্কুল ও কলেজের ইতিহাস রচনা-কালে তাঁহার ছাত্র ও কর্মজীবনের পরিচয় বিশেষ পাই। ইহা পরবর্তীকালের কথা। কবি কামিনী রায় শান্ত-স্বভাবা; দেখিবা মাত্র মনে মাতৃভাবের উদয় হইত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সময়ে একবার পরিষদ মন্দিরে অভ্যর্থনা করা হয়। এই সময় অতি নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। রমেশ ভবন দ্বিতল করিবার নিমিত্ত যে প্রথম অনশন হয় তাহাতে পৌরোহিত্য করেন সরোজিনী নাইডু।

পরিষদের যতরকম উদ্যোগ আয়োজন সকলের মধ্যেই ছিলেন রামকমলবাবু। এ সকলের মূলেও ছিলেন তিনি। আমরা কৌতুক করিয়া বলিতাম টাঁক একমিকিউটিভ অফিসার—যেমন কর্পোরেশনের। সত্য কথা বলতে কি রামকমলবাবু ঠিক এই কথাটির মূর্তরূপ ছিলেন। আমরা—আগের কথা জানি না, যে সময় পরিষদে যাইতে লাগিলাম সে সময় হইতেই রামকমলবাবুকে পরিষদ আগলাইয়া থাকিতে দেখিতাম। পরিষদের কাজকর্মতো আছেই, ইহা ছাড়া আগন্তুক অভ্যাগতও কম ছিল না। সকলের সঙ্গেই তাঁহার আলাপ আলোচনা করিতে হইত। পরিষদকে তিনি কত ভালবাসিতেন এই সব আলাপ আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইত। কি ভাবে পরিষদের সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে সেদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি। কাহার নিকট কি বই আছে, কোথায় কি পুঁথি পাওয়া যায়, পরিষদের কোন বইয়ের অভাব অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে এ সব বিষয়েও তিনি কর্মতৎপর ছিলেন। পুরাণো বইয়ের দোকানে ঘোরা আমার এক সময়ে অভ্যাস ছিল। 'ভালী' ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পত্র পত্রিকার কাটতি যাহা কিছু পাইতাম অল্পমূল্যে কিনিয়া পরিষদে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিতাম। প্রবীণ বা নবীন সকল সাহিত্যিকের প্রতিই তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এজন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিককে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে দেখিতাম। পরিষদের উদ্দেশ্য বহুবিধ, এই সকল উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মপরিচালনায় যে তৎপরতা ও নিষ্ঠা আবশ্যক তাহাতে এক সময় যেন খানিকটা হানি ঘটিয়াছিল। আমরা নূতন সদস্যেরা ব্রজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিষদের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইলাম। পরিষদে নূতনকর্মীর প্রবেশে ইহার উন্নতি অবধারিত এই বিশ্বাসে তিনি আমাদিগকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। পরিষদেরই উন্নতি ছিল সর্বদা তাঁহার কাম্য। ইহা তিনি অ-পক্ষপাত হইয়াই করিতেন। একারণ প্রবীনেরা কখনও তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। তিনি যে আমাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথাও ঘুণাক্ষরে আমরা

কুলিতে পারিতাম না। পরিষদে নূতন দল আসিয়া ইহার বিভিন্ন বিভাগে কর্ম-কুশলতা দেখাইতে লাগিলেন। বাংলা লাইব্রেরি এই সময়ের একটি প্রধান কথা। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় একে একে বঙ্কিম রচনাবলী, মধুসূদন রচনাবলী, রামেন্দ্র রচনাবলী প্রভৃতি বাহির হইতে থাকে। প্রবীন কর্মী রূপে রামকমলবাবু সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল পরিষদের সঙ্গে তাঁহার একাত্মতা আমাদের নিকট প্রকট হইয়া পড়িল।

এক নাগাড়ে দীর্ঘকাল পরিষদের সেবা করিয়া রামকমলবাবুর শরীর অপটু হইয়া উঠিল। তিনি আর রীতিমত কার্য করিতে পারিতেন না। সামান্য কিছু পেনসন লইয়া তিনি পরিষদের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বিদায়ের দিনে তাঁহাকে একটি সভায় অভিনন্দিত করা হয়। আচার্য যদুনাথ সরকার তখন পরিষদের সভাপতি। এ সভায় তিনিই পৌরোহিত্য করিলেন। নবীন প্রবীন পরিষদের বহু সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ সুরেশ চন্দ্র মজুমদারের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বক্তৃতায় রামকমলের কর্মতৎপরতা এবং অপক্ষপাত দৃষ্টির বিশেষ প্রশংসা করিলেন। তাঁহারা—সাধারণ দাস অন্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কুমার, হেমচন্দ্র বাগচী এবং নিজে যুক্তভাবে এক সময়ে প্রবীন সেক্রেটারির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, প্রবীনদের প্রতিও যেমন নবীনদের প্রতিও তেমনি রামকমল নিজে সমান ব্যবহার করিতেন। আচরণে তারতম্য তাঁহাতে তিনি কখন লক্ষ্য করেন নাই। বিদায়ের সভায় রামকমল বাবু একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। গদগদ কণ্ঠে দাদাভাই বলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার পরিষদ প্রীতি সম্যক প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি অবসর জীবন অধিকদিন যাপন করিতে পারেন নাই, অল্পকাল পরেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

মোহিনী দেবী

বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যাঁহারা সামান্য মাত্রও পরিচিত তাঁহারা মোহিনী দেবীর নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। সাদা খান চুড়ি পরা আধা-পাকা আধা-কাঁচা কেশ সমন্বিতা নাতিদীর্ঘা নাতিখর্বা মোহিনী দেবীকে দেখিলে কাহার মনে না শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত? তিনি বিশিষ্ট রাজপুরুষের দুহিতা এবং বিশিষ্ট রাজপুরুষের পত্নী। কিন্তু 'সরকারী' আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াও তদানিন্তন রাজকর্মচারীমণ্ডল মনোভূমি তাঁহাতে যেন কিছু মাত্র স্পর্শে নাই। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তখন তিনি ষাট পার হইয়া গিয়াছেন, তথাপি স্বদেশী প্রচারে তাঁহার উদ্যম-উৎসাহ ও তৎপরতা তরুণদেরও হার মানাইয়া দিত।

রামানন্দ সেন সেকালের বিখ্যাত জেলাটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবান চন্দ্র বসুর সমসাময়িক। সে যুগে পদস্থ রাজকর্মচারীরা পরবর্তীকালের কর্মীদের মত শাসন ব্যাপারে এতটা ব্যাপৃত ও ব্যাতিব্যস্ত হইয়া পড়েন নাই; স্বদেশের বিভিন্ন হিতকর্ম সাধনেরও বিশেষ সময় পাইতেন। রামানন্দ ছিলেন এইরূপ একজন কর্মচারী। তিনি স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই কন্যা মোহিনী দেবী। মোহিনী দেবী পিতার অনুপ্রেরণায় পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়াছিলেন। মহাত্মাগান্ধীর আহ্বানে তিনি গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং প্রথমে গৃহে গৃহে খদ্দর ফেরি করিতে লাগিলেন। এরূপ অভিজাত বংশের মহিলার খদ্দর বিক্রয়ে বাহির হওয়ায় তখন কলিকাতার রক্ষণশীল সমাজে

বিশেষ বিস্ময় উদ্রেক করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু তেমন উৎপন্নতা দেখিয়া মহিলারা ক্রমে খদ্দরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। খদ্দরকে জনপ্রিয় করার কাজে মোহিনীদেবীর অবদান আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

মোহিনীদেবীকে প্রথম দেখি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমায়। ১৯২৩ সন। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী গিয়াছি। শুনিলাম পিরোজপুরে বাখরগঞ্জ জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন আসন্ন। আমরা পল্লীবাসী, সহরের কোন কাজে আমাদের প্রায়ই ডাকা হইত না। বন্ধুর মনে হইতেছে, দুই দিন সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল, দুইদিনই মোহিনী দেবীকে দেখিয়াছিলাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সম্মেলনে যোগ দিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন কি না স্মরণ নাই। তিনি বোটে থাকিতেন। একদিন সকালের দিকে বোটে গিয়া দেখা করি। আমি তাঁহার কলেজের ছাত্র এই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। মোহিনীদেবীর সঙ্গে আরও দুইজন মহিলা ছিলেন। মোহিনীদেবী বক্তৃতা করিলেন না। তাঁহার বক্তৃতা কখনও শুনিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁহার একজন মহিলা সঙ্গী ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া গেলেন। একজন বাঙালী মহিলার মুখে এমন অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের সকলেরই তাক্ লাগিয়া গেল। কিন্তু শুভ্র খদ্দরভূষিতা বর্ষিয়সী মোহিনীদেবী আমাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। নীরবে নিষ্কাম কর্ম করিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে কথার খৈ ফুটিত না। তবে যেখান হইতেই তাঁহার আহ্বান আসিত সেখানেই তিনি যাইতেন, এবং কংগ্রেসের গঠনাত্মক কাজ কর্মের যথাযথ নির্দেশ দিতেন।

যশোহরে সেবার [১৯২৩] বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, ডাঃ সুন্দর চক্রবর্তী সভাপতি। আমরা বাগেরহাট হইতে একদল স্বেচ্ছাসেবক যশোহরে গিয়াছিলাম। এখানেও মোহিনীদেবীকে দেখিয়াছিলাম কিনা মনে হইতেছে না। তবে আর একজন মহিলা এখানে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে সে কথাটা উল্লেখ করিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই মহিলার নাম হেমপ্রভা বসুমজুমদার। কালপেড়ে সাদা খদ্দরের শাড়ী পরিহিতা হেমপ্রভা আমাদের সম্মুখে যেন মূর্তিমতী অবতীর্ণা হইলেন। তিনি সামান্য শিক্ষিতা, কিন্তু গৃহে বসিয়া বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ইহাতে বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ইতিপূর্বেই বাঙালী মাত্রকেই বিস্মিত করিয়াছে। তাঁহার পূর্ণ পরিচয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'তে ছাপাইয়াছিলেন। হেমপ্রভার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। কি ওজস্বিনী বাণী, কি তেজঃপূর্ণ বক্তৃতা। এখানে তরুণ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নবীন নেতৃবৃন্দকে প্রথম দেখিলাম।

মোহিনীদেবীর কথায় আবার আসা যাক্। কলিকাতার পথিতে আসিয়া মোহিনীদেবীকে বিভিন্ন সভাসমিতিতে দেখিয়াছি। তখন অসহযোগের ঘরদুয়ার চলিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিধা বিভক্ত—ইংরেজীতে 'নো-চেঞ্জার' ও 'প্রো-চেঞ্জার' নামে আখ্যাত। গঠনাত্মক কার্যে তো আর হলাহলি নাই, আর বিশেষ করিয়া মহিলারা তখন হলাহলির মধ্যে আসিতেন না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে মহিলা সদস্যও গৃহীত হইতেছিলেন। বন্ধুর মনে হয় মোহিনীদেবী অল্প দুই তিন বছরের সঙ্গে কমিটির সদস্য হন। কয়েক বৎসরে আসিল সত্যাগ্রহ আন্দোলন। মোহিনীদেবী কিছু কাল যেন স্তব্ধ ছিলেন। আবার তিনি প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িলেন।

মহাত্মাজীর ধর্মী বাঙ্গা ঐ যুগের এক অভিনব ব্যাপার। বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এই ধর্মী বাঙ্গা তখন যে সাড়া জাগাইয়াছিল তাহার তুলি যেন

তার। পুরুষারী বৃদ্ধ শিশু সকলেই যেন এই উৎসবের স্থানে জুটিয়াছে। 'ভারতবর্ষের মুক্তি চাই' মুখ ফুটিয়া একথা না বলিলেও মনের দুয়ারে এই কথা কটি যেন অবিরত ঘা মারিতেছিল। বাংলার নারী সমাজ এবারে বিশেষভাবে সাড়া দিলেন। কলিকাতায় [এবং সমগ্র বঙ্গেও] নারীদের মধ্যে সত্যাগ্রহ শুরু হইল একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে। প্রভাতের পার্ক হইতে শোভাযাত্রা শুরু হইল। প্রবীণাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মোহিনী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। নবীনাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্তা শান্তি দাস, শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবী প্রভৃতি। শান্তিদাস উচ্চশিক্ষিতা—এম. এ পরীক্ষোত্তীর্ণা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সহপাঠিনী ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে তো খুবই দেখিয়াছি। বিমল প্রতিভা দেবীকে এই প্রথম দেখিলাম। তিনি পরে বিপ্লব কর্মে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহিলা শোভাযাত্রা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট হইয়া বেহুবার [বর্তমানে, আজাদ হিন্দ বাগ] আসিয়া পরিসমাপ্ত হইল। পরিসমাপ্তির পূর্বে ঊর্মিলা দেবী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। মোহিনী দেবী আগাগোড়া শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন। বর্ষিয়সী হইয়াও, ক্লান্তির ছাপ তাঁহার মুখে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হইল না।

ইহার অল্পকাল পরেই কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। সরকার শোভাযাত্রা, সভা, পিকেটিং প্রভৃতি বেআইনী ঘোষণা করেন। কলিকাতার নেতৃস্থানীয় মহিলারা সত্যাগ্রহ আন্দোলন দানা বাঁধিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে নারী সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন। যেদিন এসব হয় সেদিন প্রকাশ্য জনসভায় এই কমিটি গঠিত হয় সেদিন আমি কলিকাতায় ছিলাম না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে নারী সত্যাগ্রহ সমিতির উদ্দেশ্য সুতরাং কিছুই বলিতে পারিব না। এই সভায় একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তাহাতে সভানেত্রী হন ঊর্মিলা দেবী। সহসভানেত্রীদের মধ্যে ছিলেন মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার প্রমুখ প্রবীণা মহিলাগণ। সম্পাদিকা হন বিমলপ্রতিভা দেবী ও শ্রীযুক্তা শান্তি দাস। নারী সত্যাগ্রহ কমিটি বা সমিতির আহ্বানে বাঙালী অবাঙালী হিন্দুমুসলমান মহিলাগণ অকুণ্ঠচিত্তে সাড়া দিলেন। অনেক পর্দানশীন মাড়োয়ারী ও মুসলমান মহিলারা প্রকাশ্যভাবে আসিয়া সভা শোভাযাত্রা পিকেটিং প্রভৃতিতে লিপ্ত হইয়া সকলকে মহিলা কারা বরণ করেন। নেতৃস্থানীয়রাও বাদ যেলেন না। মোহিনী দেবী বার্ধক্য সত্ত্বেও কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা কালে দেখিয়াছি নারীগণ গৃহে থাকিয়াও বিবিধ সংকর্মে লিপ্ত থাকিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মাজীর আহ্বানে নরনারী উভয়েই রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় সমানভাবে যোগ দেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কালে নারী সমাজের যোগদান আকস্মিক না হইলেও ইহা ছিল ব্যাপকতর ও গভীরতর। মোহিনী দেবী উক্ত প্রচেষ্টায়ই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। আসন্ন বিপ্লব কালে তিনি ছিলেন অশীতির বৃদ্ধা। তখন সক্রিয় ভাবে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম যাহাতে অব্যাহত হয়, সেজন্য তাঁহার আন্তরিক আকুতি আমরা বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি নীরবে কাজ চালাইয়াছেন। তিনি নবতিতম বর্ষ বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

পেছিয়ে পড়া দেশে গণতন্ত্রের সমস্যা

সুব্রতেশ ঘোষ

গণতন্ত্রকে চলতি অর্থে প্রায়ই একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। গভীরতর অনুধ্যানে কিন্তু দেখা যাবে যে, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন যাতায়াতি হতে পারে; জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। অ-গণতান্ত্রিক পরিবেশে ওপর থেকে সংবিধান বা আইন মারফৎ একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো খাড়া করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার ভিত্তি দুর্বল হতে বাধ্য। ফলে সামান্য কড় ঝাপ্টাতেই সে তাসের ঘর ভেঙে পড়বে। যদি না-ও ভাঙে, তবু এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে জীবনযাপনপদ্ধতির মূলগত অসামঞ্জস্যের ফলে সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতিগুলি এমন রূপ ধারণ করবে যা গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির ব্যভিচার। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে দেখলে তার প্রাতিষ্ঠানিক সর্তগুলি দাঁড়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তন, নির্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদ, আইনের শাসন, এবং শাসকমণ্ডলী তথা ব্যবস্থাপরিষদের প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা। সংবিধান মারফৎ এ প্রাতিষ্ঠানিক সর্তগুলি পূরণ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু পরিবেশ অনুকূল না হলে এদের কর্মপদ্ধতি গণতান্ত্রিক হওয়া দূরের কথা, এই কাঠামোর স্থায়িত্বও দীর্ঘস্থায়ী না হওয়াই সম্ভব। সার্বজনিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা চলে। কিন্তু সুগভীর সামাজিক ও বৈষয়িক বৈষম্যের ফলে সেই নির্বাচনপদ্ধতির সমান সুযোগ সকলের আয়ত্তাধীন নয়। সেক্ষেত্রে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তিশালী লোকেদের পক্ষে নানা উপায়ে এ ব্যবস্থাকে নিজেদের কাজে লাগান সহজ হয়ে পড়ে। ফলে যে সাম্যের আদর্শ থেকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের উৎপত্তি তার সামান্যতম চিহ্নও আর অবশিষ্ট থাকে না। তেমনি আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার ঘোষণা করা সম্ভব। কিন্তু কোন অত্যাচারিত নিরন্ন যদি অর্থাভাবে প্রবল প্রভাবান্বিত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করতে বা যথোপযুক্তভাবে মামলা চালাতে না পারে, তবে আইনসঙ্গত সুবিচার লাভের তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকার তার কাছে অর্থহীন। সত্য কিনা জানি না, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মারফৎ বিচার ব্যবস্থাকে দীনতম নাগরিকের পক্ষে সুলভ ও সহজলভ্য করা চলে, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকের কাঠামোয় যে বিচার কতখানি সুবিচার হবে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন প্রতিযোগীতাহীন গোষ্ঠীর (non-competing groups) অস্তিত্বের জন্য এবং শ্রমের অব্যাহত গতির (mobility of labour) অভাবে বিচারপতিরা সমাজের উচ্চতলা থেকেই (অর্থাৎ যাদের পক্ষে দীর্ঘ সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যবহার বিজ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি অধ্যয়ন সম্ভবপর) সাধারণতঃ এসে থাকেন। যে সামাজিক আর্থিক পরিবেশে এরা মানুষ তার প্রভাব এদের ওপরেও পড়তে বাধ্য। সুতরাং ব্যক্তিগত সততা সত্ত্বেও শ্রেণীগত বিরোধ বা

বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এরা সমাজের নীচুতলার লোকেদের সুবিধা ও দৃষ্টিভঙ্গী কতদূর সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে পারেন তা ভেবে দেখার বিষয়। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিখুঁৎ থাকলেই যে তার ভেতরের প্রাণও সবাই নিখুঁৎ থাকবে, একথা মানা চলে না।

এ ছাড়া, বিশেষ করে অনুন্নত দেশে এ হেন বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্থায়িত্বও সন্দেহযোগ্য। অর্থনীতিবিদ্‌রা দেখিয়েছেন যে স্থিতিশীল (static) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে যদিও বহুদেশে(১) মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির কাঠামো এখনও শক্ত নয়, তবুও সচল দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে মুদ্রাব্যবস্থার ব্যবহার ও প্রসার যে সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান এ কথা স্বীকার করতে হবে। সুতরাং এই প্রসারমান মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির যুগে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলেও মানুষের সম্মানবোধের মান হিসেবে শারিরীক শক্তি, পশুসম্পদ, বস্ত্র, জমি ইত্যাদির তুলনায় ব্যক্তিগত অর্থসম্পদের মূল্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সে অবস্থায় প্রাগ্রসর অর্থনীতিগুলির মত এ সব দেশেও লোকের সুখ, শান্তি, স্বস্তি, সম্মান এবং সর্বোপরি নিরাপত্তাবোধ তার ব্যক্তিগত অর্থসম্পদের ওপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। সুতরাং যে কোন সামাজিক-রাষ্ট্রিক কাঠামোর পক্ষে জনগণের আনুগত্য কতদূর পর্যন্ত লভ্য তা ক্রমশঃই একটি প্রধান মাপকাঠিতে নির্দ্ধারিত হচ্ছে। এ মাপকাঠি মানুষের অর্থসম্পদের জন্য ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন বিশেষ সামাজিক রাষ্ট্রিক কাঠামোর সামর্থ্য। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতির পক্ষে গণধনে বৈষয়িক উন্নতির এই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা মেটান তো দূরের কথা, তাদের অন্যান্য জীবনযাত্রার মান পর্য্যন্ত বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। এর ওপর আছে এগিয়ে যাবার প্রয়াসের ফলে পশ্চাৎপদ দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ। সামাজিক শক্তি, প্রতিপত্তি এবং ধনসম্পদের একচেটিয়া সিংহভাগ যাদের হাতে আছে, সে সব শ্রেণী আবার তাদের বিশেষ অবস্থার সুযোগে এ চাপেরও সিংহ অংশ নীচুতলার লোকেদের ওপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন। ফলে দেশের বৈষয়িক প্রগতি ও বিদেশের সঙ্গে নিয়ত বর্দ্ধমান যোগাযোগের ফলে ওপরতলার লোকেদের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে, আর অপরদিকে তারই অনুকরণে নিজেদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নীচুতলার মানুষের জীবনের মান ক্রমেই চলেছে নীচের দিকে। এর ফলে যে হতাশা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাই আজ অনুন্নত অর্থনীতিগুলির সামাজিক রাষ্ট্রিক কাঠামোর সবচেয়ে বড় বিপদ। জনগণের বৈষয়িক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা যে কাঠামোতে নেই, এ হেন নিছক রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব তাই এসব দেশে টলটলায়মান। যে কোন বড় ঝড়ে তা ধসে পড়তে পারে।

এই পটভূমিকায় গণতন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্যের পুর্ণবিচার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। সেদিক থেকে গণতন্ত্রকে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে না দেখে, একটি সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রা-পদ্ধতি হিসেবে দেখলেই সে তাৎপর্য্যের প্রকৃত অনুধাবন সম্ভবপর। একটি বিশেষ রাষ্ট্রিক কাঠামো নির্ভর করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর। কিন্তু বিশেষ একটি জীবন-

১। আফ্রিকার অনাবাদায় বা এশিয়ার কোন কোন দেশের দুর্গম গ্রামাঞ্চলে এখনও মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির পরিধি বিশেষ সঙ্কীর্ণ। মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতিতে আর্থিক পারিশ্রমিক-ই (money remuneration) শ্রমের সরবরাহকে উৎসাহিত করে। কিন্তু এ সব অঞ্চলে এ জাতীয় পারিশ্রমিকের সাহায্যে লোকেদের এক-বিন্দুতে উৎসাহিত করা চলে না। এ সম্বন্ধে W. A. Moore Ac. Industrialization and Labour দ্রষ্টব্য আলোচনা আছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা সুনিশ্চিত ভাবে কয়েকটি মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল। সেগুলি কি এবং কোন কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে তারা সার্থক তথা স্বার্থক, তা খুঁজে বের করতে পারলেই আমাদের কাম্য জীবনযাত্রাপদ্ধতির পক্ষে উপযোগী পরিবেশ ও তা' গঠনের উপায় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

একটু ভাবলে দেখা যায় যে জীবনযাত্রাপদ্ধতি হিসেবে সার্থক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক সর্ত মোটামুটি চারটি যথা, আত্মবিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, গতিশীলতা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা। অন্ততঃ এগুলি বজায় না থাকলে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রাপদ্ধতি তো দূরের কথা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র প্রভাবিত করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যদি না থাকে, তবে সে অধিকার প্রয়োগ করতে উৎসাহী হওয়ার চাইতে আপাতকাম্য কোন লক্ষ্য-সাধনে যাকে সক্ষম বলে মনে হবে তার হাতে সর্বতোভাবে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হবার ঝোঁকটাই অধিকাংশের মন আচ্ছন্ন করে থাকবে। ফলে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। ম্যানহিম প্রমুখ আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের লেখার সঙ্গে পরিচিত পাঠকমাত্রেই জানেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানীর বৈষয়িক দুরবস্থা ও জাতিগত অবমাননা এবং সার্বজনীন হতাশার পটভূমিকায় কেমন করে জার্মান নাগরিকের আত্ম-বিশ্বাসের সর্বাধীন ধ্বংস হয়েছিল, আর সেই সুযোগে তার আহত আত্মাভিমানের পুনরুদ্ধারের প্রতীক হিসেবে নিজেকে তথা নিজের পার্টিকে স্থাপন করে হিটলার কি ভাবে এ যুগের কঠোরতম একনায়কত্বের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন।

ব্যক্তিমানুষের আত্মবিশ্বাস আবার কতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে, অন্ততঃ যেগুলি না মেটালে নিজের সামাজিক গুরুত্ব তথা শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা যায় বৈষয়িক নিরাপত্তাকে। এ যুগে অর্থসম্পদের সামাজিক তথা মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু আভাস একটু আগেই দেওয়া হয়েছে। নিজের শ্রেণী, শিক্ষা তথা পারি-পার্শ্বিকের পক্ষে জীবনযাত্রার যে যান ন্যূনতম প্রয়োজন বলে ব্যক্তিমানুষ মনে করে, অন্ততঃ সেই যান বজায় রাখার উপযোগী আয় তথা অর্থসম্পদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে না পারলে হীনমন্যতা ও হতাশা তার সমস্ত আত্মবিশ্বাসের ভিৎ শিথিল করে দেয়। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রথম সর্ত ব্যক্তি-মানুষের আত্মবিশ্বাস-কে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এমন হওয়া দরকার যাতে প্রত্যেকের জীবিকা, আয়ের ও আশ্রয়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মবিশ্বাসের গঠনোপযোগী ব্যবস্থা বলে আমরা 'প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র' নামে পরিচিত বিধিতন্ত্রকে উল্লেখ করতে পারি। পরোক্ষ গণতন্ত্র নাগরিক-কে নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বিশেষ সাহায্য করে না। পাঁচ বছর অন্তর লক্ষ লক্ষ ভোটদাতার একজন হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সে যে তার সামাজিক পরিবেশকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে তা অনুধাবন করা তার নিজের পক্ষে একান্তই কঠিন। কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার গ্রাম বা সহরের দৈনন্দিন ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে সে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সুতরাং নিজের গুরুত্ব অনুভব করা তার পক্ষে এ ক্ষেত্রে সহজতর। সেজন্যই তার আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে এ প্রথা বিশেষ কার্যকরী। একনায়কত্ব এ হেন লোকের পক্ষে কোন-ক্রমেই কাম্য বা সহনীয় মনে হতে পারে না।

গণতন্ত্রের আর একটি অত্যাবশ্যক সর্ত সমাজজীবনে মূল্যবোধ হিসেবে সহিষ্ণুতার বিকাশ। আত্মবিশ্বাস

থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু তা' যখন মাত্রা ছাড়িয়ে নিজের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তা' গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা বিশেষ প্রযোজ্য। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দল যখন নিজের অভ্রান্ততা এবং অদায়াত্বতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন, তখন সমালোচনা মাত্রেই মূর্খতা, অসহিষ্ণুতাপ্রণোদিত ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সে অবস্থায় অপরের মত, নীতি ও সমালোচনা সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার অভাবে, ক্ষমতাধিকারীর মনে শাসনশক্তি প্রয়োগে সমালোচনা ও ভিন্ন মতের অস্তিত্ব অসম্ভব করে তোলার আকাঙ্ক্ষাও দেখা দিতে পারে। এর পরবর্তী পদক্ষেপই গণতন্ত্রের অবসান ও একনায়কত্বের অভ্যুদয়।

যে সমাজব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হতে চায়, তাকে তাই এমন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করতে হবে যা সামাজিক সহিষ্ণুতার স্বল্প প্রকাশের সহায়ক। বহুদল প্রথা এবং বিরোধী দল কর্তৃক ক্ষমতাসীন দলকে সমালোচনার অধিকার, মতামতের স্বাধীনতা, স্বাধীন সংবাদপত্র ইত্যাদি, এই হিসেবেই গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যক প্রাতিষ্ঠানিক সর্ত।

গণতন্ত্রের সার্থকতার পক্ষে অত্যাবশ্যক আর একটি উপাদান হচ্ছে সামাজিক গতিশীলতা। সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে সময়োপযোগী পরিবর্তন সহজে এবং কাঠামোর কোন অস্থিসাধন না করেই হ'তে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্র-কাঠামো অনমনীয় হলে যে কোন মৌল পরিবর্তনই কঠিন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের প্রয়োজনে সে পরিবর্তন তখন অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দেয়, তখন অনমনীয় রাষ্ট্রিক সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সংঘাত তার অনিবার্য হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতিতে যে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ প্রয়োজন, এ জাতীয় সংঘাত তার পক্ষে একান্তই দুর্ভিক্ষর। কিন্তু প্রগতির গতিও অনস্বীকার্য। তাই সমাজ কাঠামোই এমন হওয়া দরকার যাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বিপর্যয়কারী সংঘাত ছাড়াই সম্ভব হয়। যে কোন প্রকৃত গণতন্ত্রেই তাই বিধিসম্মত ভাবে শাসকগোষ্ঠী, আইন এবং কি প্রয়োজন স্থলে সংবিধান পর্যন্ত পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকে। যথাযথভাবে কার্যকরী হলে এই নিয়মগুলিই সংঘাতহীন সামাজিক রূপান্তরের বাহন হতে পারে।

কিন্তু রূপান্তরের প্রয়োজন স্বীকৃত হওয়া যায় আর একটি সর্তের স্বীকৃতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তা' ব্যক্তি স্বাধীনতা। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, পরম সৎ বা মহদুদ্দেশ্যপরায়ণ হলেও, তাঁর শাসনপদ্ধতির সম্পূর্ণ ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। কাঁচা কেরোসিন পায়ুকারীর পায়েই বেধে, সে জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার যোগ্যতা সম্বন্ধে ক্ষমতাসীন নয়, ক্ষমতাধীনের মতামতই অধিক মূল্যবান। কিন্তু সাধারণ নাগরিক যেখানে স্বাধীনভাবে নিজের সুবিধা অসুবিধা ব্যক্ত করতে কিংবা শাসন যন্ত্রের স্খলন, পতন বা বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতে পারে না, সেখানে কোন পরিবর্তনই সহজ নয়। বহু দিন সঞ্চিত গলদ সেখানেই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, আর একদিন ফেটেও পড়ে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে। গণতন্ত্রের বলিষ্ঠতম বাহন যদি হয় প্রগতি, ব্যক্তিস্বাধীনতা তবে তার অবিচ্ছেদ্য সখী।

গণতন্ত্রের মৌল উপাদানগুলি আমরা আলোচনা করেছি। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, আচ্ছা যে দেশের দেশে বাস করি, অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'সোসিয়ো গড়া দেশ' বলে অভিহিত করা হয়, সেখানে এ উপাদানগুলি কি পরিমাণে উপস্থিত এবং উপস্থিত না থাকলে এদের গড়ে তোলা কতদূর সম্ভব।

ব্যক্তিমানুষের আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা

যায় তবে দেখা যাবে যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠার সর্তগুলি অনুন্নত দেশে প্রায়ই অনুপস্থিত। বৈষয়িক নিরাপত্তা যে অনুন্নত দেশে থাকতে পারে না এ তর্ক বোঝাবার অপেক্ষা করে না। অনুন্নত অর্থনীতি মানেই প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈষয়িক উৎপাদনের উপকরণগুলির অভাব অথবা অপচয়ের ব্যবহার। পেছিয়ে পড়া দেশে মূলধনের অভাবে দেশের শ্রমবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। বেকার সমস্যা তাই এখানে মাত্র চক্রনির্ভর নয়, মূলতঃ সুদীর্ঘকালীন (secular)। শ্রমশিল্প বা অন্য বিকল্প লোকনিয়োগ ব্যবস্থার অভাবে জমির ওপর চাপ অত্যধিক। তারপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে লোকবল কৃষিক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত, আপাত দৃষ্টিতে তারা কর্মরত বলে বোধ হলেও প্রকৃত পক্ষে সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে তাদের শ্রমসম্পদ কার্যতঃ অপচয়িত হচ্ছে। এ অবস্থাকেই বলে ছদ্ম বেকার সমস্যা (the problem of disguised unemployment)। পূর্ণ বেকার, অর্ধ-বেকার বা ছদ্মবেকারদের ঘরে দেশের শ্রমসম্পদের এই সর্বাধিক অপচয় জাতীয় আয়কে অত্যন্ত নীচুস্তরে নিয়ে এসেছে। তা ছাড়া যাদের শ্রমবলের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত সে সব শ্রমিকেরও মাথা পিছু উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম। এর ফলে জাতীয় আয় কম হওয়ায় মাথাপিছু আয়ও শোচনীয় ভাবে কম। তাই ফলে আবার শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা ব্যাহত হয়। ফলশ্রুতি খাওয়া বা জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি না মিটলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণ দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এ ভাবেই অনুন্নত দেশে এক পাপচক্রের সৃষ্টি হয়েছে, যা উন্নততর জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার বদলে, জীবনযাত্রাকে ক্রমেই কঠিন করে তুলছে। এর ওপরে আছে বাণিজ্য-চক্রের আবর্তন সহ্যত বেকার সমস্যা, যা অনুন্নত দেশগুলির সমস্যাকে তথা সংশ্লিষ্ট অংশগুলিকে প্রথমে বিপর্যস্ত করে পরিণামে অসংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিকেও প্রভাবিত করে—সব মিলিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা পেছিয়ে পড়া দেশগুলিতে মানুষের মনে বিপর্যয়, হতাশা ও বিক্ষোভকে পুঞ্জীভূত করে তুলছে। অথচ পুরোন সামাজিক সংগঠনে যৌথ পরিবার প্রথা প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান বৈষয়িক অনিশ্চয়তাকে হ্রাস করতে কিছুটা পরিমাণে কার্যকরী ছিল, সামাজিক আর্থিক বিবর্তনের অনিবার্য গতিতে তাদের অবক্ষয় সামাজিক নিরাপত্তার প্রাচীন কাঠামোকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছে। অন্যদিকে উন্নততর অর্থনীতিগুলির মত আধুনিক পদ্ধতির রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার অভাব ব্যক্তি-মানুষের জীবনে ন্যূনতম নিশ্চয়তাবোধের ভরসা দিতে পারছে না। ভারতবর্ষে এবং এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে শিল্প শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ভূমিকা ও সুযোগ এতই সীমাবদ্ধ যে তাতে সমস্যার কোন মৌল সমাধান অসম্ভব। এ হেন অবস্থায় ব্যক্তিমানুষের আত্মবিশ্বাস বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা কোনটাই নির্ভর-যোগ্য হতে পারে না। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে 'পেছিয়ে পড়া দেশে' গণতন্ত্র অপ্রাপ্য বিলাসবস্তুবিশেষ। রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসত্ত্বেও সুসংগঠিত বৈষয়িক নিরাপত্তা পরিকল্পনার ক্রমবিস্তার এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ধন-বৈষম্যের হ্রাস করে গণমনে অসন্তোষ দূর তথা উদ্দীপনা-সৃষ্টি করা যেতে পারে। অল্প মূলধনে বেশী লোককে কাজ দিতে পারে এ রকম শিল্প ও কর্মপ্রয়াসের বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্র জাতীয় সম্পদের অপচয় নিবারণ এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধির কার্যকরী ব্যবস্থা করতে পারে। বৈষয়িক নিরাপত্তার সমস্যা অবশ্য এতে রাতারাতি দূর হবে না, কিন্তু জনমনের হতাশ দূর করার কার্যকরী প্রয়াস

হিসেবে এ পদ্ধতি গণতন্ত্রের প্রতি মানুষকে আস্থাশীল করে তুলবে।

রাষ্ট্রিক কাঠামোতে এ্যাংলো-স্যাক্সন গণতন্ত্রের অনুকরণে পুরোক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র নির্ভর শাসনযন্ত্র মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির পরিপন্থী। ভারতবর্ষে বিশেষ করে পঞ্চায়েৎ প্রথার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সৎ ও নির্ভীক পরীক্ষা স্বাভাবিক হতে পারত। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মারফৎ দৈনন্দিন শাসন পরিচালনার স্থানীয় প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলিকে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারদান এবং নিম্নতম স্তরে 'প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের' ব্যবস্থা এদেশের সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক গণতন্ত্রের আদর্শের পক্ষে বেশী কার্যকরী। জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে, অবশ্যম্ভাবী কেন্দ্রাভূত বিষয়গুলির জন্য এবং বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাজের সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়োজনে কেন্দ্রে ও তাবাসত অঞ্চলে উচ্চতর শাসন কর্তৃপক্ষ থাকবে। কিন্তু এরকম কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ছাড়া অন্যসমস্ত ক্ষমতা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ত্তাধীন তথা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্থলে সংবিধানে লিখিত থাকবে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আমলাতন্ত্রের নাগপাশ শিথিল করে আনা যায়। প্রকৃত ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রয়াসই কেবলমাত্র ব্যক্তি-মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কথাকাহিনীর স্তর থেকে বাস্তবতার স্তরে নিয়ে আসতে পারে।

অন্নবিশ্বাসের মত সামাজিক সহিষ্ণুতার বিকাশও কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক সর্ত পূরণের অপেক্ষা রাখে। বহুদলপ্রথা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সমেত সর্ববিধ উপায়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি এ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক সর্তের অন্তর্ভুক্ত। ভারত সমেত পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশেই এ প্রাতিষ্ঠানিক সর্তগুলি উপস্থিত। কিন্তু সমস্যা জনমত-গঠনের উপকরণগুলি নিয়ে। গরীব দেশে কায়েমী স্বার্থ-ভোগীদের বিরুদ্ধতা করছে এমন কোন দলের পক্ষে সম্পদশালী হওয়া সহজ নয়। এ সমস্যার কোন সোজা-পথের সমাধান নেই। অসুবিধে সত্ত্বেও জনসমক্ষে নিজেদের বক্তব্য আংশিক ভাবেই প্রগতিশীল প্রচারযন্ত্র গঠনে সাহায্য করতে হবে। এ ছাড়া বিশেষ সজাগ থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচারযন্ত্র যেন কোন সময়েই ক্ষমতাসীন দলের দলীয় প্রচারযন্ত্র না হয়ে দাঁড়ায়। এ কাজ কঠিন, তবু সৎ প্রয়াস অন্ততঃ কিছু পরিমাণে ফলপ্রসূ হবে এ আশা করা অন্যায় নয়।

অনুন্নত দেশে গণতন্ত্রের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক সামাজিক গতিশীলতার অভাব। দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য ও স্বল্প অর্থনীতি যখন মানুষের সর্ববিধ বাস্তব সুযোগের পরিধি সঙ্কুচিত করে আনে, তখন মানসিক বৃত্তিগুলির দৈন্য ও অনুদারতা অবশ্যম্ভাবী। এরই ফলে আসে অন্ধ প্রথানুগত্য, লোকাচারের দীর্ণতা, সামাজিক অসহিষ্ণুতা ও বিপক্ষোপযোগ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রগতিবিরোধী চাপ। ভারতে এভাবেই একালের পক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রথা যথা যৌথপরিবার প্রথা বা বর্ণভেদ—অন্য যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির পথে মূর্তিমান বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রকাঠামোতে সরকার পরিবর্তনের বিধিসম্মত পদ্ধতি, সাংবিধানিক নমনীয়তা ইত্যাদির ব্যবস্থা মারফৎ গতিশীলতার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু সামাজিক গতিহীনতা রাষ্ট্রিক তথা বৈষয়িক প্রগতির পথও দুর্গম করে তুলবে। যুক্তিনিষ্ঠ শিক্ষা, সক্রিয় সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং প্রয়োজনমত আইনদ্বারা সমাজসংস্কারে আনুকূল্য এদিকে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু একথা অবশ্যস্মরণীয় যে সামাজিক প্রথাপদ্ধতির পরিবর্তন চিরদিনই সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এদিকে অতি দ্রুত সাফল্যের ভরসা করাও আত্মঘাতী হবে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি সংবিধানসম্মত করা কঠিন নয়। কিন্তু এর প্রকৃত সার্থকতা প্রতিটি মানুষের মর্যাদা তথা অধিকারগত সাম্যের স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল। মনঃস্তাত্ত্বিক স্তরে এ মূল্যগুলি সুদৃঢ় করবার জন্য প্রথমে চাই সামাজিক, বৈষয়িক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অন্যান্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। কিন্তু তা' সময়সাপেক্ষ। তবু অবিলম্বেও কিছু করণীয় আছে। চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক উপাদানগুলিকে পবিত্র তথা অলঙ্ঘ্য বলে শুধু সংবিধানে নয়, প্রতিটি মানুষের মনেও দৃঢ়বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। এর ওপরে বিচার-বিভাগীয় সততা ও নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারলে ক্রমে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপযোগী পরিবেশ গঠন আজকের অনুন্নত দেশেও অসম্ভব নয়।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে গণতন্ত্রের যাত্রাপথ পেছিয়ে পড়া দেশে মসৃণ নয়। অদূর ভবিষ্যতে হবার আশাও নেই। তবে নিরুৎসাহেরও কারণ নেই। জীবনযাপন পদ্ধতি হিসেবে গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য ও আকর্ষণ অনস্বীকার্য। সুতরাং বাধা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস আমাদের করতেই হবে। বৈষয়িক ও সামাজিক অনগ্রসরতা কিছুটা দূর করতে পারলে এ প্রয়াস নিজেই স্বয়ংক্রিয় শক্তির আধার হয়ে উঠবে এবং স্বীয়বেগেই নিজেকে সঞ্চালিত করবে আশা করা যায়। সুতরাং অনুন্নত দেশে গণতন্ত্রের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে জাতীয় অর্থনীতিতে কি পরিমাণে অগ্রগামী গতিবেগ সঞ্চার করে তার ফল জনসমাজের পরিণামের বৈষয়িক নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করা যায়, তারই ওপর। এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্রানুগ মূল্যগুলি আমাদের জীবন পদ্ধতিতে সুগ্রথিত করতে পারলে সাফল্য অনায়ত্ত থাকার কোন কারণ নেই।

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

শনিবারের সন্ধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ বসু

গাঢ় ঘুমের ঘোর প্রত্যুষে ঘাম-চকচকে অনাবৃত পিঠটা উঠছে আর নামছে, সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একান্ত বিরক্তিতে মালতী পাশের লোকটির দিকে পিছন ফিরে শুল। চোখের কোণে কখন জল জমেছিল, টপ করে পড়ল এক ফোঁটা বালিশে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ঘরের অন্ধকারে। পুরুষদের পক্ষে ঘুম কত সহজ—নিষ্ঠুর হওয়াও কত সহজ। ঐরকম কড়া কথাগুলি তাকে শুনিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। মুখ বন্ধ হতে না হতেই প্রায় নেশাখোরের মত অচেতন হয়ে পড়ল—মনে হয় যেন কতকাল ঘুমায়নি। মালতী একটা জবাব দেওয়ারও সুযোগ পেলে না। যাক, ভালই হয়েছে, ঐ ধরণের কথা বর্তার জবাব দেবার প্রবৃত্তি তার নেই।

আসলে, মালতীর মনে পড়ল অন্ধকারে স্থির চোখ মেলে চেয়ে থাকতে থাকতে, আসলে গত কদিন থেকেই তার স্বামীর ব্যবহার নানা রকমে অত্যন্ত অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য ঠেকেছে তার চোখে। হ্যাঁ, সেই শনিবার বিকেল থেকে ঠিক এক সপ্তাহ হয়। সেই যে রাস্তায় জামার কাপড় কিনে এনে তাই নিয়ে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তার পর থেকেই কি যে হয়েছে, দিনে দিনে তার বেলাজ বদলাচ্ছে—মানুষটার কোনও কূল কিনারা পাচ্ছে না মালতী। সেই দিনই কটা তিনেক পর যখন সে ফিরল হাতে তখনও সেই কাপড়ের টুকরো। মালতী যখন জানতে চাইলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি কেন, কোনও জবাব তো দিলেই না, এমনভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন ছুঁলে জাত যাবে। স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য সরল না মালতীর মুখে, প্রায় শিউরে উঠল সে। সে চোখ যেন চিনতেই পারছে না তাকে, বহু দূরের কি এক অপার্থিব আলোর প্রতিবিম্ব জ্বলছে তার মধ্যে।

তারপর দু'তিন দিন বিজয়ের কাটল (মনে মনে চলল মালতী) এক অন্তর্দহনজ্বালার ঘোরের মধ্যে। সংসারে আর কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, নিজের মনে এতই নিমগ্ন যে স্ত্রী ও কন্যাকে যেন ভুলেই গিয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ এক সময় মালতীকে জিজ্ঞাসা করে বসল—মুখে এক রহস্যময় হাসি মেখে—কিছু টাকা যদি পাওয়া যায় তো কেমন হয়। বাস্, ঐ পর্যন্ত, কিসের টাকা কি বৃত্তান্ত, মালতী আর একটা কথাও বার করতে পারলে না তার থেকে। সেই দিনই বিকেলে বাড়ি ফিরল সে বিছিরি মেজাজ নিয়ে, রাস্তাকে বকাবকি করে একচুলচেরা কাণ্ড বাধিয়ে তুললে।

তারপর দু' দিন যেতে না যেতে হঠাৎ দেখা গেল আর একরকম ভাব—যেন সেই মানুষই নয়। যে চোখে জ্বলত এক অদ্ভুত উত্তেজনার আভা অথবা অপরের সান্নিধ্যে যেখানে জেগে উঠত বিরক্তি সেখানে ঘনিয়ে এল এমন গাঢ় বিষাদের ছায়া যে মালতী একটু ভয়ই পেয়ে গেল। স্বামীর এমন চেহারা সে আগে কখনও

দেখে নি, কিছু জিজ্ঞেসা করতেও পেরে উঠলে না। বিজয় নিজেও বললে না কিছু, যদিও তখন আবার তার মন ফিরে এসেছে গৃহিবারের মধ্যে—আগের চেয়ে বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে, আরও নরম, স্নেহার্দ্র হয়ে ; মেয়ের পড়ার প্রতি মনোযোগ, তার সঙ্গে কত রকম সোহাগের খেলা, মালতীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ ও যত্ন—এ সবের মধ্যে কাটল কটা দিন। মাঝখানে একদিন আবার এক অদ্ভুত প্রশ্ন করলে সে, রাত্তিরে শোবার ঘরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, সংসারে মায়ের ভালবাসা ছাড়া আর কোনও ভালবাসা সত্যিই আছে কি না···।

আর আজ, সেই লোকই, তেমনি শুতে যাবার আগে মালতীর মার সম্বন্ধেই এমন কড়া কথাগুলি শোনাল !··· কি যে হয়েছে লোকটার ভেবে পেলে না মালতী। আপিসে কাজের চাপ বেড়েছে, অথবা সেখানে কি কোনও গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে ! না কি সেই শনিবার বিকেলে যে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল তার থেকেই এই দুর্বোধ্য খামখেয়ালীপনার সূত্রপাত। কিন্তু মালতীর মন সায় দিলে না তাতে। এই ধরণের ঘটনা কিছু নতুন নয় —আর তা ছাড়া এমন কিছু মালতী বলেনি সে দিন যার জের এমন ভাবে এত দিন ধরে চলতে পারে। যার রাগ করে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল স্বামীকে রাহুর জামার জন্ত কি রকম কাপড় চাই, তা সত্ত্বেও সে কিনে নিয়ে এল ঐ বিশ্রী ডিজাইনের ছিট, ঠিক যা বলে দিয়েছিল তার উল্টো, কোনও রুচি সম্পন্ন লোক যা পছন্দ করতে পারে না, তাতে মালতী শুধু বলেছিল যে তার মেয়েকে সে কখনও ঐ জিনিস পরাতে পারবে না, তার উত্তর হল কিনা যে ওটা অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে, রাহুর জন্য আবার কাপড় কিনে আনবে সে, তাতে মালতী শুধু বলেছিল (খুব শান্ত ভাবেই বলেছিল) যে অন্য কিছুর জন্য কাপড়ের দরকার নেই তার, যাই বল টাকা তো আর গাছে ফলে না যে এমনি করে তা ওড়াতে হবে, আর তা ছাড়া কাপড়টা মাপেও ঠিক নেই, একটু বড় আছে, সেটুকু তো কেলা যাবে, তার চেয়ে বরং...কিন্তু তার কথা শেষ করতেই দিলে না, বাড়ি ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল—আজ্ঞা আজ্ঞা বলেই আনছি, তার পর রাগ করে বেরিয়ে গেল দুম্ করে দরজা বন্ধ করে, চা পর্যন্ত খেলে না, যদিও জল ফুটছে ততক্ষণে, অবশ্য রাহুর গালে ঠাস্ করে এক চড় মেরে বেরিয়ে যেতে ভুলল না, কারণ মেয়ের মধ্যে কাপড়টা তারও পছন্দ হয় নি···

এমনি ভাবতে ভাবতে যখন এক সময় মালতীর চোখে ঘুম এল, প্রশ্নের মীমাংসা তখনও সে পায় নি। সেই শনিবারের সন্ধ্যায় কি ঘটেছিল এবং পরবর্তী কটা দিন কি নতুন অভিজ্ঞতার ঘষা দিয়ে কেটেছে তার স্বামীর, তার হদিস এর পরেও মেলে নি তার কখনও। দাম্পত্য অন্তরঙ্গতার মধ্যেও পরদা থাকে কিছু কিছু। অবশ্য সমস্ত জিনিসটা ভুলে যেতে দেরি হয় নি মালতীর। সব জানতে পেলেও ভুলতে দেরি হত না, কারণ এই ঘটনাবলীর মধ্যে কোনওটাই অসাধারণ নয়। মালতীর স্বামীর মত যে কোনও লোকের জীবনেই তা ঘটতে পারত।

১

এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেবে রাস্তায় পড়ে হন হন করে এগিয়ে চলল বিজয়, যদিও গা দিয়ে তখন তার ঘর ঘর করে ঘাম ঝরছে, যদিও তার স্ত্রী বা মেয়ে কেউ যে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে টানাটানি করবে ফিরে যাবার জন্য এমন কোন সম্ভাবনা নেই তা সে জানে। দোকানটা বেশী দূরে নয়, কিন্তু পৌঁছে দেখা গেল এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মুহূর্তে বিজয়ের ক্ষুব্ধ-বিরক্ত মন বিশ্বের প্রতি তিক্ত হয়ে উঠল।···হ্যাঁ, এই তো চাই, নয় তো ষোল কলা পূর্ণ

হবে কি করে! দুপুর ফুরোতে না ফুরোতে দোকান বন্ধ করে কি করে যে এই সব লোকের পেট চলে তা তারাই জানে! আমি ছাড়া সংসারে আর সকলেরই যথেষ্ট পয়সা আছে দেখছি। আমি অবশ্য রাস্তায় পয়সা ছড়িয়ে বেড়াই অন্ততঃ মালতীর তাই মত। অদ্ভুত, অদ্ভুত!

দোকানের সামনে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলে বিজয়। চায়ের তৃষ্ণায় দেহ জর্জরিত; কিন্তু বাড়ি ফেরার বিতৃষ্ণা আরও প্রবল। শনিবার বিকালেও বেলা চারটা পর্যন্ত কাজ করে, এবং তার পরে সন্ধ্যা করে, বাড়ি ফিরে প্রথমেই স্ত্রীর মুখঝামটা খায় খেতে হয় তার চা খাওয়ার জন্য দোকানই ভাল। বসে একটু জিরোবার আগেই বার বেরিয়ে আসতে হয় এক টুকরো ছাকড়া দোকানে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কাছে, তার গায়ে ঘাম শুকোবার জন্য আছে মাঠ। মালতীর কেটলিভরা চা সে একাই সিদ্ধুক বসে বসে।

আবার সে পা চালিয়ে দিলে চায়ের দোকানের খোঁজে। বড় রাস্তায় পড়ে তার দিকে ঘুরে একটু পরেই এক তাপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তরাঁ। ফরাসী নাম, সামনে প্রকাণ্ড ঘষা কাঁচের দরজা আর দেয়াল, তার গায়ে খোদাই করা স্বল্পবসনা বিদেশী নর্তকীর নকশা—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক পায়ে, আর এক পা ছুঁড়ে তোলা আকাশের গায়ে। হঠাৎ সেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল এক আধুনিকা, তার পর তার অনুসজ্জিত সঙ্গী: এক ঝলকা হিমেল হাওয়া ছুটে এসে আলিঙ্গন করলে বিজয়ের তপ্ত দেহকে, টানলে তাকে ভিতরের দিকে। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো কোর্তাপরা দরোয়ানটির নির্বিকার পাথুরে মুখের দিকে চোখ পড়ে তার আর পা বাড়ল না সে দিকে, সোজা এগিয়ে গেল সে। ঐ বাঁদরটার উদ্ধত দৃষ্টি তাকে পেছিয়ে ফুরের দিকে নিবদ্ধ থাকতে আর এত লোকে দেখে বুক ভেঙে উঠল তার, এক কালে যখন প্রায়ই তার পায়ের ধুলো পড়ত ঐ দোকানে তখন বরাবর তার সামনে ঐ মুখেই ফুটে উঠত পদলেহনকারী বিনয়।

পাশের এক ছোট্ট রাস্তার একটু ভিতরে এক দোকানে ঢুকে পড়ল সে। এখানে তাপ বাইরের তুলনায় বরং বেশী, তবে চায়ের দাম অনেক কম। রং-ধরা পাত্রে চায়ের নামে যা এল তেল চটচটে মার্বেলের টেবিলটার ছোপা বাঁচিয়ে কয়েক চোঁকে তা গিলে তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে পড়ল, দ্রুত হেঁটে চলল আবার, যেন কত কাজ। আসলে লক্ষ্য অদূরের এক প্রকাণ্ড পার্ক; উদ্দেশ্যহীন অবসরের সন্ধ্যায় ঐখানে গিয়ে বসা বহু দিনের অভ্যাস তার। হ্যাঁ, বিয়ে করে সংসারী হওয়ার পরেও মাঝে মাঝে সময় কাটানো দায় হয়ে পড়ে, সাধারণত রবিবারের সন্ধ্যায়। আজ বিশেষ করে সে চায় খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া—অনেকক্ষণ ধরে একলা বসে।

পার্কের এক নির্জন কোণে খালি বেঞ্চি পাওয়া গেল একটা। এখানে গাছের নিচে অন্ধকার জড়িয়ে এসেছে, যদিও বাইরে তখনও দিনের আলো। বসার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ের দেহ মনের ভার অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। দক্ষিণ থেকে বইছে অবিরাম ফুরফুরে হাওয়া। পাঞ্জাবির বোতামগুলি খুলে দু হাত ছড়িয়ে দিলে সে। হাতের মোড়কটা পাশে রাখতে রাখতে নিজেকে মনে করিয়ে দিলে আপন মনে যেন উঠবার সময় ভুলে না যায়। পর মুহূর্তেই মনটা জেগে উঠে শুধু হাসি হেসে বললে, কেন নয়, ভুলে গেলেই বরং আপদ চোকে, নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বাবেলার হাত থেকে। সোমবারের আগে সাহু পাবে না তার জামার কাপড়, ইতিমধ্যে ওটাকে আর সে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না। ফিরিয়ে নেওয়া মানেই আবার ওটাকে নিয়ে দু দিন বাদে দোকানে যাওয়া, সেখানে এক প্রস্থ কিচিমিচি—তাতেও জ্বর আসে। এতটুকু এক টুকরো কাপড়—বর যদি তারা কেরত নিতে না চায়, দোষ দেওয়া

যায় না তা হলে, ওটুকু দিয়ে কি করবে দোকানদার? মালতী হলে অবশ্য তর্ক করে ঝগড়া করে ওটা ওদের আবার গছিয়ে দেবেই, এবং এক বিন্দু সংকোচ বোধ করবে না—মেয়েরা ঐ ধরণের তর্কাতর্কি শুধু যে পারে তাই নয়, বেশ উপভোগ করে।··· ···ধ্যা, ঐ খুদে বোতাটা এখানে নামিয়ে দেওয়াই ভাল। কিই বা দাম—কত লোকে কত দামী জিনিস হারায় পার্কে, এই ক্ষতিটুকু বরং আরও হালকা করবে তার মন।

কিন্তু আপাতত সে দূর করতে পারলে না ঐ এক টুকরো কাপড় তার মন থেকে···আড়াই গজ, এখন বলছে মালতী। কিন্তু আগে বলেছিল তিন, আমার পরিষ্কার মনে আছে। তা হলেও অবশ্য সব দোষ আমারই—আমি পয়সা নষ্ট করছি। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত বিশ্রী ইচি আমার। আমাদের মেয়ে কিনা পরবে ঐ জিনিস! আহা, কি যা মেয়ে—যেন এর চেয়ে ভাল কিছু পাবার যোগ্য সে। কেমন মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই সুরে ধরলে খুদে শয়তানীটা। বোতামে চেষ্টা করলুম মিষ্টি করে যে কিছু খারাপ নয় কাপড়টা, তাতে ফল হল উল্টো, গলা ছেড়ে এমন চীৎকার শুরু করলে যাতে পাড়া সুদ্ধু সবাই শুনতে পায়—ইচ্ছে করে, শুধু আমাকে জব্দ করবার জন্য, যেন আমি ওর সমস্ত জীবনটাই ধ্বংস করতে চলেছি। আচ্ছা বেশ, এটা দিয়ে অন্য কিছু বানাও—কিন্তু না। এক বার বলেছে ফিরিয়ে দিতে হবে, সুতরাং দিতেই হবে ফিরিয়ে, নয়তো মান থাকে না তার। এ দিকে রাস্তাটা সমানে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে চলেছে, কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে সারা মুখ, কিন্তু অসম্ভব পিটপিটে চোখদুটি একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে; সে চোখে দুঃখ কষ্টের লেশ মাত্র নেই, আছে কেবল জিতবার জেদ; যেন মনে মনে বলছে 'আর একটু চালিয়ে যা, তা হলেই হেরে যাবে বাবা।' দেখে হঠাৎ হাত নিশপিশ করে উঠল গালে এক ঘা বসিয়ে দিতে। আমরা মেয়ে পর্যন্ত পাবে বটে হতচ্ছাড়ী, কিন্তু তার দাম অন্তত একটুখানি দিতে হয়েছে আজ তাকে।···

হঠাৎ চোখের সামনে ঘুরে কতগুলি আলো জ্বলে ওঠাতে বাধা পড়ল বিজয়ের একমুখী চিন্তার স্রোতে। সন্ধ্যার গাঢ় নীল আকাশের পটে কাঁচা সোনার রঙের দুটি অক্ষরে সেই ফরাসী রেস্তরাঁর নাম ফুটে উঠল পরিষ্কার ঝকঝকে টোপাজের মত। ক্ষুব্ধ উত্তপ্ত মনের উপর দিয়ে যেন খেলে গেল দূর সাগরের কোমল শীতল ঢেউ, পৌঁছে দিয়ে গেল ভিড় করে ছুটে আসা পুরনো কালের সুখস্মৃতি সব।

···এমনি শনিবারের সন্ধ্যায়, স্নান করে ফরসা জামা কাপড় পরে ঐখানে আমরা জমা হতুম। কোণের দিকে যেখানে দেঁষে লম্বা আসন, সেখানে বসে গদির ঠাণ্ডা গায়ে হাত বোলাতেও কি আরাম লাগত! ডুবার, দেবব্রত, ঘানশ্যামদা···চৌধুরি···পি রায় (কেমন করে এরা সব সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল!)···সিগারেটের ধোঁয়ায়, কয়েক পাত্র পানীয়ের আবেশে জমে উঠত আড্ডা···নতুন শোনা naughty গল্প বলাবলি। আধ-অন্ধকার ঘরের ও পাশ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে আসত বাজনা—কখনও গরম কখনও নরম। স্প্যানিশ আর সাউথ আমেরিকান সুর ছিল আমার পছন্দ—আর ক্যালিপ্সো; প্রত্যেকটির নাম বলতে পারতুম তখনকার দিনে, কার্নানতো নতুন একটা তান ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই। ওস্তাদ বাজিয়েছিল লোকটা···আর কিটি, ওঃ হাজারে একটি মেলে না ওর মত মেয়ে—যেমন গানের গলা, তেমনি চমৎকার কথার বার্তায়—আমাদের কবি যেমন বলত 'হাস্যময়ী, লাস্যময়ী'। সত্যি কিটি যখন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ওর ঐ ঈষৎ ভাঙা ভাঙা গাঢ় গলা খুব নামিয়ে দিয়ে গান শুরু করত, চোখ বন্ধ করে শুনলে ঠিক মনে হত মার্লিন

ডিক্টিশন। চোখ খুললে দেখা যেত রুক্ষকাটা চাইট জামার নিচে অল্প অল্প দুলছে ওর সুগঠিত দেহ, আর বোজা চোখ, হাত দুটি অল্প বাড়ানো, যেন কাকে আজ সমর্পণ করছে—আজও সেই ডিটি, সেই কার্লাবুতো ওখানে আছে কি না কে জানে!

অতীতের এই সব স্মৃতির তলে তলে একই সঙ্গে বিমল বর্তমানের ঐ ছটি নিওন-অক্ষরের অস্থিরতা একাগ্রে অনুধাবন করে চলেছে। সবগুলি নিভে গিয়ে আবার একের পর এক ফুটে উঠছে, লিখছে ওম ওম, এক সেকেণ্ডের অপেক্ষা, তারপর আবার ঘুরে যাচ্ছে এক সঙ্গে, দু সেকেণ্ডের অপেক্ষা, আবার ফিরে আসছে একের পর এক, যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে···। প্রায় অবচেতন মনে কিছুক্ষণ সে খেলে চলল মুহূর্ত গুণে গুণে এই অর্থহীন পুনরুক্তির সঙ্গে আশা হেরার খেলা। মনের অপেক্ষাকৃত সক্রিয় অংশটা অবশ্য ভাবে বিবেচনা করছিল উঠে গিয়ে ওখানে ঢুকবে কি না, বিমল সন্ধ্যাটা এখনও একটু সরস করে তোলা যায় কি না। হয়তো দেখা হবে দু একজন বন্ধুর সাথে, কিছুটা জমে উঠবে পুরনো দিনের মত—পুরোপুরি জোর্মি স্টিক সার্ভ্যান্ট মনে যাওয়ার আগের দিনের স্বাদ মিলবে আবার। পয়সা অবশ্য খরচ হবে, বিশেষ করে ডিটি যদি এখনও থেকে থাকে, আজ-কালকার দিনে ওখানে ঢুকলে মেয়ে পেটে অন্তত দশটি টাকা যাবেই। কিন্তু পকেটে তো আছে কিছু, আর মাস শেষ হতেও বেশী দেরী নেই—ঠিক সাত দিন বাকি—ও কটা দিন একটু সাবধানে থাকলেই চলবে। এখন বাড়ি ফিরে তো দেখতে হবে মালতীর গোমরা মুখ, বরং অলুক সে আরও কিছুক্ষণ নিজের মনে মনে।···

হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে বরাবর পরিবারের স্বার্থটাই আগে দেখেছি, নিজের খরচ সব কেটে ছেটে বাদ দিয়ে জীবনটাকে করে তুলেছি নিরস, একঘেয়ে—তার পুরস্কারে উলটে যদি শুনতে হয় যে দুহাতে পয়সা ওড়াই আমি (যে পয়সা 'গায়ে ফলে না'।) তবে বরং ঐ দুর্নামটাই সত্যি হক, যদি তার বদলে কিছু আনন্দ মেলে।

আর এত অনুযোগ অভিযোগই বা কিসের জন্য তাও তো বুঝি না। আমি বড়লোক নই, কিন্তু যা রোজগার করি নেহাত সামান্য নয় তো। অন্তত আর দশজনের তুলনায় আমার পরিবার মোটামুটি আরামেই আছে। মাসে মাসে কিছু কিছু জমাই, যা সামর্থ্যে কুলোয়। আমার ব্যক্তিগত খরচ প্রত্যেকটি পাপা, একে বারে যা না হলে নয়।···

উঠবার কোনও লক্ষণ দেখালে না বিমল। বরং হাই তুলে নড়ে বসল, ঐ আলোর হাতছানির দিকে পিছন ফিরে।···হ্যাঁ, আমার প্রত্যেকটা খরচ ছোট আর বড়ো বাঁধা। কিন্তু প্রতি মাসে মালতীর জন্য নতুন একটা কিছু খরচের মধ্যে পড়তে হবেই। এখন সে তাল তুলেছে মাকে আনতে বলবে কিছু দিনের জন্য। কিছু দিন মানে যে ক তা আমার জানা আছে—মেয়ে পেটেও অন্তত দু মাস, সেই দু বছর আগে সে বারের মত। অতি অস্বস্তিকর ব্যাপার—সর্বদা মুখে রাখতে হবে হাসি আর মিষ্টি কথা, যদিও মনে মনে···

অথচ আমার নিজের মা, কত বছর হয়ে গেল তাঁকে দেখিনি—সেই বছর দেড়েক আগে যে একবার মেসে গিয়ে মাস তিন দিন ছিলুম সে বাদ দিয়ে। মায়ের স্বাস্থ্য ভাল নয়, কিন্তু কিছুতেই দেশের ভিটে ছেড়ে আসবেন না বিশেষ করে বাবার মৃত্যুর পর। পঞ্চাশ বছরেরও আগে বরে এসেছিলেন পাড়াগাঁয়ের শ্বশুর বাড়িতে, আজও পড়ে আছেন সেখানে।···মায়ের চিঠিও তো বহু দিন পাই নি,

কেমন আছেন কে জানে। একটা চিঠি লিখলে হয়; হ্যাঁ, কাল সকালেই লিখব মনে করে।

কাচের বেকি ক্রমেই কটমটে হয়ে উঠছিল। আবার মনে চড়ে বসতে বসতে সে ভাবছিল এবার উঠে বাড়ি যাবোই না, এমন সময় পায়ের তলায় কাপড়ের মোড়কটা বেঞ্চির পিছন দিকে পড়ে গেল। একটু আগেই যে ওটাকে বিসর্জন দিয়ে যাবে স্থির করেছিল সে কথা ভুলে গিয়ে অচেনা লোকের মত সে তার বাঁ হাতটা নামিয়ে দিলে নিচে। ঘাসের মধ্যে হঠাৎ প্রথমেই ঠাণ্ডা আর কঠিন কি একটা ঠেকল হাতে, আঙুল চালিয়ে বোধ হল মসৃণ ধাতুর পাতের মত। তাড়াতাড়ি তুলে এনে চোখের কাছে ধরে তারার আলোয় দেখলে মেয়েদের হাত ঘড়ি একটা। দেখা যায় হাত নামিয়ে এ দিকে ও দিকে তাকালে দাববানে। আকাশে চাঁদ নেই, থেকে থেকে আধবরা এক রকম বিদ্যুৎ ঝিয়ে উঠছে নিঃশব্দে, কালো ঘন অন্ধকার চার দিকে। একটু আগেও যে দু এক জন বাবু মেয়ীকে আশেপাশে অনুভব করেছে তারাও চলে গিয়েছে, তার নিভৃত কোণে সম্পূর্ণ একা সে। ঘড়িটা সে তার কাপড়ের মোড়কের মধ্যে গুঁজে দিলে একটু যেন চোরের মত, তার পর উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে বাড়ির দিকে।

রাস্তায় সন্দেহ উঁকি দিল মনে, অন্ধকারে সে ভুল দেখে নি তো? কিন্তু একটু বিবেচনার পর সে সন্দেহ দূর করে দিলে সে। ঘড়িই যে পেয়েছে সে বিষয় সে নিশ্চিন্ত, এবং মনে হয় বেশ দামী ঘড়ি। কে জানে, হয়তো খাঁটি সোনা—আর ব্যান্ডটা, ওটাও কি সোনা? ছুটোয়ই কিন্তু বেশ চকচকে হলদে রং মনে হল। হঠাৎ হাত নিশপিশ করে উঠল ওটাকে বার করে রাস্তার আলোর নিচে আর এক বার দেখতে, কিন্তু লোভ দমন করে তবু যায় চলার গতি বাড়িয়ে দিলে সে।

বাড়িতে ঢুকেই মালতী যেন ঐ মোড়কটার দিকে হাত বাড়িয়ে কি একটা প্রশ্ন করলে, কিন্তু বিজয়ের হাতটা আপনা থেকেই তাকে এড়িয়ে গেল। সোজা পায়খানায় গিয়ে ঢুকল সে। দরজায় খিল দিয়ে অস্থির আঙুল ঢুকিয়ে সে আবার ঘড়িটাকে টেনে বার করলে, তার পর আলোর নিচে ধরে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল একদৃষ্টে। ক্যালসি ডিজাইনের মোটা ঘড়ি, সরু লম্বা গড়ন, পুরু ঢাকা কাঁচ। ফেলফেটের মত ধরে তৈরি কারুকাজ করা চিকন কবজি-বন্ধ। ঘড়ি আর ব্যান্ড দুইই মনে হয় সোনার। চোখের কাছে এনে অনেক কষ্টে সে পড়লে এক প্রসিদ্ধ ঘড়ির নাম। লক্ষ্য করলে হাতলের ঘুঘটা ভাল করে আটকায় না। ঘড়ি তখনও চলছে, আটটা বেজে যায়ো মিনিট—সেই দিনই হারিয়েছে মনে হয়।

ওটাকে পকেটে ফেলে সে বেরিয়ে এল। দরজা খুলবার আগে চেইন টেনে দিতে ভুলল না।

সেই রাত্রে ঘড়িচোরাক্রান্ত ঘুম থেকে সে কয়েক বার জেগে উঠল বিগত সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা সত্য না মিথ্যা এই প্রশ্ন নিয়ে। জবাবটা মনে করে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার ফিরে গেল ঘরে। এক বার দেখলে অভিজাত বংশের এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী তার কাছে বসে, কি এক অনাঘ্রাদিত সূক্ষ্ম সুবাসে ঘেরা তার যৌবনোচ্ছলিত দেহ, মহল রেশমী বস্ত্রবাস বিজয়কে প্রায় ছুঁয়েছে, অথচ বারে বারে মুখ বাড়িয়ে দিয়েও সে তাকে ধরতে পাচ্ছে না, এ দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটি তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে। হঠাৎ তীব্র এক ঘণ্টা বেজে উঠল অ্যালার্ম ঘড়ির মত, ঘুম দিয়ে চুরমার করে—জেগে উঠে মনে পড়ল অ্যালার্ম ঘড়ি তো তার নেই।

২

পর দিন সব কাজের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন আনন্দ ঘড়িয়ে

রইল তার মনে। সকালে উঠে চা খেতে খেতে খবরের কাগজটার উপর উপর চোখ বুলিয়ে ময়লা জামাটা চাপিয়ে বাজারে গিয়ে অন্যান্য রবিবারের মত মাছ আর মাংস কিনছে ঘর করে বেড়ে, তার পর বাড়ি ফিরে জলখাবার খেয়ে কাগজ পড়া শেষ করলে ভাল করে। আবহাওয়ার পণ্ডিতরা বলছেন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই শিগগির, গরম এই রকমই চলবে কিছু দিন। সিনেমার সমালোচনা পড়ে দেখলে মালতীকে নিয়ে যেতে যাবার মত বাংলা ছবি-ও সপ্তাহে কিছু নেই; মাসের শেষে তা এক রকম জানাই।

ধীরে সুস্থে কাগজ পড়া শেষ করেও স্নানে যাবার আগে কিছু সময় বাকি থাকে। সাধারণত এই সময়টা কাটে প্রতিবেশীদের থেকে ধার করে আনা মালতীর কোন পত্রিকা বা বই নাড়াচাড়া করে। আজ তেমন কিছু সে হাতের কাছে পেলে না, বসে বসে কিছু ক্ষণ মনে করতে চেষ্টা করলে রবিবার করবে এমন কোন কাজ ঠিক করে রেখেছিল কি না। সে দিকেও কিছু মনে পড়ল না, এমন সময় আপিসের বন্ধু রাজেন এল আড্ডা দিতে। তার সঙ্গে গল্পে, ডিপার্টমেন্টের কর্তা রোহিণীবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচনায়, আরও এক পাত চায়ের সঙ্গে-সময়টা কেটে গেল।

নানা রকম আলোচনার মধ্যেও কিন্তু বিজয়ের প্রস্তাব অন্যমনস্কতা রাজেনের চোখ এড়াল না। সেই আজ-নিয়ে তাদের মধ্যে তার কাটল বাকি দিনটা। বেশী কথা বার্তা বললে না কারও সঙ্গে। দুপুরে খুব ভাল চিরপরিচিত ডাল-পেট নিয়ে, কিন্তু বিছানায় পড়ে রইল সে আর। মন ঘুরে বেড়াতে লাগল বিবাহযুগের অলি-গলিতে।

—আচ্ছা, ওটার নতুন দাম কত হতে পারে, আর তার ভুটোর এখনই বা দাম কত হবে আন্দাজ, বেচতে গেলে? কিছুটা সোনা নিশ্চয়ই আছে, মেরে কেটেও তিন শ' টাকা হওয়া উচিত; প্রায় আমার এক মাসের মাইনে। আচ্ছা, কি করব আমি ঐ টাকাটা দিয়ে—না না, ঘড়িটা আমি নিয়েই নিয়েছি বা বেচে দিচ্ছি এমন কথা কেউ বলতে না—কিন্তু ধর যদি ঐ টাকাটা কোনও রকমে আমি পাই, ধর তিন শ টাকার বোনাস দিলে আপিস কি করব তা হলে?

এক হতে পারে বেড়ানো; যে সব জায়গা অনেক দিন থেকে দেখবার ইচ্ছে সেগুলি ঘুরে আসা—যেমন, দিল্লী, আগ্রা; অবশ্য ওদের নেওয়া সম্ভব হবে না যাক এ কটা টাকায়, তার চেয়ে বরং বেশ ভাল দেখে কিছু কিনে দেব দু জনকে—এই ধর টাকা পঞ্চাশেকের মধ্যে। কিন্তু এই গরমে ট্রেনে চড়ে অনেক দূর যাওয়া খুব আরামের হবে না। তার চেয়ে মেনে করে দার্জিলিং ঘুরে আসা ভাল কিছু দিনের জন্য, তার মধ্যে হয়তো এখানেও গরমটা কমে যাবে কিছুটা। কিন্তু এত কাছে গেলে রাহু মালতীকে বাগ মানা যায় না, আর তা হলে আমার এ টাকায় কুলোয় না। ট্রেনে করে দার্জিলিং যাওয়া যা ঝকমারি তার চেয়ে এখানে বসে থাকা ভাল।

হ্যাঁ, সে এক রকম মন্দ নয়। ছুটি নিয়ে একটানা করেকটা দিন একেবারে নিজের খুশি মত কাটানো। না, এই ঘর কটার মধ্যে বন্ধ হয়ে একঘেয়ে কুঁড়েমির কথা ভাবছি না, এই বর্ণহীন গতানুগতিকতার বাইরে খানিকটা নতুনত্ব আর উত্তেজনার কথাই ভাবছি। প্রথম যৌবনের বেপরোয়া দিনের মত করেকটা দিন কি আবার ফিরিয়ে পাওয়া যায় না, এত বড় শহরে সবই পাওয়া যায়, টাকা থাকলে কেনাও যায়। হ্যাঁ, কিটিকে পর্যন্ত যে কিটিকে কাল মনে হচ্ছিল, কত দুর্লভ আজই সে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কাল শুনে শুরে হিসেব করে পয়সা খরচ করবার প্রশ্ন আর নেই, এ তো প্রায়

উপার্জনের টাকা নয়, easy come easy go, কোনও দুঃখ থাকবে না। ঐ রকম বেপরোয়া মেজাজ না হলে লাইফ এনজয় করাও যায় না।

দূর, কি যে সব ভেবে চলেছি! যেন টাকাটা আমার পকেটে এসেই গিয়েছে, যেন ঘড়িটা বেচব বলে ঠিক করে ফেলেছি। বেচে দেবার অধিকার তো আমার নেই। কিন্তু···কার বা আছে অধিকার, এক মালিকের ছাড়া? আর তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? অবশ্য পুলিশের কাছে যেতে পারি আমি; কিন্তু তার ফল কি হবে, ইচ্ছে থাকলেও তারাই বা মালিককে বার করবে কি করে? যাযখান থেকে ঘড়িটা হয়তো সোজা পাবে কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর স্ত্রীর কবজিতে। আমার সাধুতার শেষ পর্যন্ত ঐ পুরস্কার। না, পুলিশের কাছে যাওয়ার চেয়ে বোকামি আর কিছু হতে পারে না।···

এ কথাও এক বার মনে হল বিজয়ের যে জিনিসটা হয়তো চোরাই মাল, কোনও কারণে তাড়াতাড়ি বাসের মধ্যে লুকিয়ে রাখা। তা যদি হয়, সে ভাবলে, তবে কি চোরের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে আমাকে? ইচ্ছা থাকলেও, উদ্যোগ সাধু হলেও, কি করতে পারে লোকে এ অবস্থায়, ভালমত মালিককে যদি না পাওয়া যায়? আর তাকে যে পাওয়া যাচ্ছে না তা তো আমার দোষ নয়।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য সূক্ষ্ম এক গ্লানির ছায়া পড়ল মনে। কাল রাত্রে ঘড়িটা পাওয়ার পর হঠাৎ অত তাড়াতাড়ি বেকি ছেড়ে চলে এসেছিল কেন সে? মালিক ফিরে আসতে পারে ওটার খোঁজে এমন কথা কি তার···না না, মোটেই মনে হয় নি—আসলে সে তো উঠি উঠি করছিল কিছুক্ষণ থেকে, পিছনটা চুলচুল করছিল ঐ কাঠের বেঞ্চিতে বসে···

পাশের বাড়ির বাচ্চাটার আকস্মিক কান্নায় বিজয়ের ধ্যানসূত্র ছিঁড়ে গেল। ঘাট ছেড়ে বিরক্ত হয়ে সে বারান্দায় চলে এল। ঐ এক কালি আয়না-টুকুতে সে পায়চারি আরম্ভ করলে, বিকেলের চায়ের আগে পেটে কিছু আনবার চেষ্টায়।

সন্ধ্যার পর মালতী যখন ব্যস্ত রান্নাঘরে, বিজয় ঘড়িটা বার করলে আর একবার পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। আলোয় বালুবটার ঠিক নিচে সে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ মনে হল পিছনে যেন কে। তাড়াতাড়ি ওটাকে মুঠোর মধ্যে বন্ধ করে সে ঘুরে দাঁড়াল, দেখলে রাহু চেয়ে আছে তার দিকে বড় বড় চোখ মেলে। সে চোখে অগাধ কৌতূহলের সঙ্গে ভয়ের ছায়া মেশানো একটুখানি।

"কি দেখছ বাবা?"

"কিছু না কিছু না, কি দেখছি তাতে তোর কি? কে বলছে তোকে এখানে আসতে—যা, বেরিয়ে যা।"

এক মুহূর্ত রাহুর চোখদুটি আরও বিস্ফারিত হয়ে পড়ল বিস্মিত বেদনায়, তার পর দেখতে দেখতে জলে ভরে উঠল তার, ঠোঁট কাঁপতে লাগল অবাধ্য ভাবে। ঘর ছেড়ে দৌড়ে পালাতে পালাতে সে শুনতে পেলে বাবা বিড়বিড় করে আরও কি যেন বলছে তার উদ্দেশে।

বাবার বিরক্তির কারণ হয়ে এই রকমের ব্যবহার যে সে আগে কোনও দিন পায় নি তা নয়, কিন্তু এমন চোখ ফেটে জল আসেনি বুঝি আর কখনও। রবিবার সকালে অথবা বিকালে কিছুটা সময় তাদের এক সঙ্গে কাটে—গল্পের বই পড়ে, খেলায় অথবা গল্প শুনবে, আদরে আবদারে। আজ বাবা তাকে ডাকেন নি, এক বার তাকিয়েও দেখেন নি তার দিকে। তার আমার ব্যাপারটা নিয়ে বাবা এখনও ক্ষেপে আছেন তার উপরে, সারা দিন ধরে কখন এই বাজনা বন্ধ হয়েছে রাহুর মনে অবশেষে সন্ধ্যা বেলা সে সাবধানে এসেছিল সন্ধির চেষ্টায় কিন্তু এত বড় আকস্মিক বিস্ফোরণ সে কল্পনাও করতে পারে নি। মুহূর্তে তার তীব্র আশা চুরমার হয়ে ছিটকে পড়ল চার দিকে।

(ক্রমশঃ)

২৩শে জানুয়ারী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আলোক-তীর্থ পানে
অন্তর মন্ত্র গানে
হে পান্থ,—ত্বরন্ত তব যাত্রা অভিরাম ;
নেতাজী, প্রণাম !

মুক্তির অমর জ্যোতি
তোমারে দিয়েছে গতি,—
বিপ্লবের বহ্নি চিত্তে জ্বালি' অবিরাম ;
নেতাজী, প্রণাম !

হে দেশ-গৌরব-প্রাণ,
ভারতের ধ্যান জ্ঞান,—
তব কর্মে ওঙ্কারিল সমরঢ়-সাম ;
নেতাজী, প্রণাম।

তব জন্ম-বরণের,—
মহাজাতি-সদনের
দীক্ষা হোক সাম্য-প্রেমে,—উদাত্তনিকাম।
নেতাজী. প্রণাম !

উত্তরণ

বার্ষিক উপহার প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় স্থানপ্রাপ্ত

দিল্লীর আপট্রেনটা ছেড়েছে সবেমাত্র। ট্রেনের বিচিত্র কোলাহল নতুন ধরনের সিম্ফনি পরিবেশন করছে এখনও। ট্রেনের গতি ক্রমে থেকে দ্রুততর। মন অবশ্য সিমলা পৌঁছে গেছে ট্রেনটা ছনবর প্ল্যাটফর্মে ইন্ করার সঙ্গে সঙ্গে। লম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে তোলা, "ওঠ্‌রে মিলি, বেডটা টেনে তোর বিছানা করে দি। বাপরে সমস্তক্ষণ এমন অদ্ভুত ঘটাপটা সহ্যের চোখে পড়ে না।"—আড় চোখে উল্টো দিকের বার্থে উপবিষ্ট বিশালকায় এবং বিশালতর ভুঁড়ি সমেত মহাপ্রভুর দিকে এক নজর তাকিয়ে নিলো। মল্লিকার চিন্তা থামালো।

…দিদির আকর্ষণ হওয়ার সব লক্ষণ ছবি দেখে ফেলে ও ভাবতে শুরু করেছে দিদির বাড়ীর ছবি—পাহাড়ের গায়ে বাড়ী। তেমন বড় নয় হয়তো, বড় দরকারও নেই ছোট কিন্তু সুন্দর। বাড়ির একপাশে এঁকে বেঁকে গেছে পাহাড়ি রাস্তা আর পাইন গাছের সারি, আর একপাশে পাইন গাছের ফিরি ফিরি হাওয়া, মিষ্টি মিষ্টি ছায়া এসে পড়ে বাড়ির সামনের খোলা আঙিনা ছুঁয়ে যেতে। দিদির যেমন বাগানের সখ, বাগান করেছে নিশ্চয়ই। কোন দিকে থাকবে বাগানটা? ধরিবে না পুবে? ছবিতেই থাক। ছোটোখেলুন গাছও নিশ্চয়ই বাড়ির কাছেই পাহাড়ি রাস্তার ধারেই আছে। ফুলের ফল-ও গাছটাকেও রাখিয়ে থেকেছে হয়তো বা, আমরা গিয়ে পড়বো এপ্রিলের সময়। রবিবার যখন তখন জামলদা নিশ্চয়ই থাকবেন বাড়ীতে। আচ্ছা কেমন দেখতে জামলদা? ওনেছি সুন্দর। তার মতো হবে—বাবা না তোলাদা? যাকগে—ও ভেবে লাভ নেই। একদিন পরেই ত দেখ্‌বো। বেলা এগারোটার সময় গিয়ে দেখবো, জামলদা বাড়ীর বাইরে পাইন গাছের ঝিরি ছায়াতে বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। দিদি সামনেই থাকবে। জামলদার পাশের চেয়ারে বসে খবরের কাগজের খবর মুখে মুখে শুনছে। কিম্বা জলের ঝারি নিয়ে বাগানে ঘুরে ঘুরে জল দিচ্ছে হয়তো। জামলদা ডেকে ডেকে শোনাচ্ছেন শোনার মত খবরগুলো। লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দিদি আমার—দিদির নিটোল সৌন্দর্য্য টোল্ খায়নিতো আমাদের কথা ভেবে ভেবে?…ক্ষমা-বাধা কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ দুলিয়ে নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে, দিদির কাছে একবার, একবার জামলদার কাছে। আমাদের দেখেই লাফিয়ে ছুটে আসবে ওরা—। কাকে আগে কোলে নেব? কথা না বাধা? দুজনকেই! আর দিদি—

তোলা এই সময় বললো, "ওঠ্‌রে মিলি—" দুষ্টু ছেলের মতো ঘুমোনো মল্লিকা। মল্লিকার চোখে মুখে উছলে পড়ছে আনন্দের উজান আভা। "না তোলদা বেশ আছি, এখন এই থাক—" বললে মল্লিকা।

তোলা বললো, "আচ্ছা থাক তবে। পরে হবে' খন।" পকেট থেকে সিগারেট বের করে সিগারেট ধরালো তোলা। মল্লিকা আবার মুখ ঘোরালো জানলার দিকে। শুরু হয়ে গেল আনন্দের জাল বোনা—সিমলার পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট সেই বাড়ী, পাইনের ঝিরি ছায়া এসে পড়েছে উঠোনে—। তোলা প্রবাসী দুজনকে তাকিয়ে তাকিয়ে

চান করে লক্ষ্য করতে লাগলো। অদ্ভুত কনট্রাষ্ট দুজনের। বিশালতম মূর্তির পাশে যে কীণকায় হিলহিলে রোগা মেয়েটি প্রায় চাকা পড়ে যাওয়ার মতো, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তোমার—যেন হিমালয়ের পাশে উইএর ঢিবি। মোটা মেয়েটির প্রতি কথার শিটে যে হো হো করে হিসে গলে দিয়ে রোগাটি উত্তর দিচ্ছিল, "যদং আজ্ঞাহী—।" মজা লাগছিলো তোমার। এরিমধ্যেই তোমা মনের আনন্দে টইটম্বুর, কত দীর্ঘকাল পরে সহজ ভাবে আবার দেখা হয়ে গিয়েছে বন্ধু স্বাদনের সঙ্গে, অথচ কেউ তাদের চাবেলি বোনের রঙে যার কাউ দিনেরে পাবে আশ্চর্য দিয়ে গড়া দুটি তন পুতুলের মতো আছে, তাবি। এত আনন্দ কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। মিনিটা এখন ডুব দিয়েছে বিস্ময়ের মধ্যে। তার মন আরও দ্রুত গতিতে উড়ে চলেছে পাখনা মেলে। উন্মুক্ত কিছুক্ষণ।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে হাত ঘড়ির দিকে তাকাল একবার, মানে মানে—সান একটা হয়েছে। আরো ঘন্টা খানেক বন্ধুতে হবে। তারপর আবার তাকালো মহাত্মীর দিকে। মোটাটি সেই আগের মতোই গলায় একগাড়ি ছুলের মালা ছমের শাড়ির পেছনে হেলান দিয়ে মুখে বিচিত্র ভাব নিয়ে বসে আছেন। রোগাটি অবশ্য এখন আগের মতো কথা বলছে না। একটা মোটা খাতা খুলে উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে লিখছে কি যেন মেয়েটি। মেয়েটির মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোমার, খাতির মেখিয়েছে, উৎকট ভক্তির আতিশয্য দেখিয়েছে যে আগ্রহে, তাতে করে এঁকে একটু খুব উঁচু দরের অধ্যাপক বলেই মনে হচ্ছে তোমার, যদি না এঁর মুখটি অন্যরকম হতো। যেমন একরকম অদ্ভুত লালসাময় মুখ। উৎসুক্য আগ্রহে যেন চোখে মুখে আগুন। এদের সঙ্গে কখনও মেয়ে হয়ে কে আসে। "তোমাদা—।"

মিনিটার মোহ হয় একটা অত আনন্দ আর ধরিতে পারছে না—। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অবশিষ্টটুকু আগুন গলিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তোমা মিষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলো "কী মে?"

উপরে পড়া আনন্দ কোন মতে চাপতে চাপতে মল্লিকা বললে, "আচ্ছা তোমাদা, আমরাতো একেবারে না জানিয়ে বাড়ি, হঠাৎ এত আনন্দ দিদি আবার সইতে পারলে হয়। অজ্ঞান উজ্ঞান না হয়ে পড়ে আবার—" এর উত্তর নেই তোমার। তোমা দুটি চুপ করে চেয়ে রইলো।

"...তোমার কি মনে হয় তোমাদা, দিদি খুব মোটা হয়েছে?" এরও উত্তর নেই। কারণ চারেদিকে তোমা আর দেখেনি।

"রংটা ঠিক দিদির মতো হয়েছে না?"

"হ্যাঁ, অবিকল—" তোমা আবার হাসতে হাসতে জবাব দিলো।

"আর বাবাটা ঠিক জামদার মতো" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মল্লিকা তাকালো তোমার দিকে।

"না মাঝা তার বাবার মত হয়নি; সামান্য কিছু থাকতে পারে। তাদের চেহারা একেবারে অন্যরকম।" উত্তর দিলো তোমা।

জামদার চেহারা কিরকম হতে পারে, তাই নিয়ে মাঝা একটু ভাবলো। মল্লিকা তারপরই মোড় ঘোরালো কথার, "ইস্ মা—মাঝা বৌদি সবাই যদি একসঙ্গে খেতো, কী যে মজা হতো একবার ভাবোতো তোমাদা? তোমা ভাবলো না। মনে মনে উত্তর দিলো তোমা, "অত কিছুতেই ছুটি মেলো না কাই যেতে পারলো না—মেটা বুঝলাম, কিন্তু সিমিমা বাবুদার অত শুত অফিস হয়ে গেল পর্যন্ত কেন যে পিছিয়ে গেলেন, সেটা কিন্তু বুঝলাম না—।" "আমিও যা" —মিনিও মনা মেরালো। তারপর তারপর, "মামার পরীক্ষার জেরটেক ছাইছিলোনা মাঝ দিদির কাছে

যাওয়ার জন্য মা এমনই পাগল হয়েছিলেন। কালকে মা নিজে সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করলেন রাত এগারটা পর্য্যন্ত। মার পাথরের বাসন কোসন কত সাবধানে প্যাক করা হলো। সকালে উঠে দেখি মা প্যাক্ খুলে খুলে নিজের জিনিষপত্র আবার বার করছেন। মুখ থমথমে, চোখ কোলা কোলা, গলার আওয়াজ ক্যাসক্যাসে। আজকাল অনেক সময় মাকে যেন ঠিক বুঝি না ভোলায়া—কী-ই যে হয় মার" মুহূর্তে মল্লিকার কণ্ঠ উঠল চলচলিয়ে।

"পিসিমার যেমন কাণ্ড। এত মোরানাড়ু কদিন ধরে থাকবে বলো?" কথা পালটালো ভোলা। কাজও হলো সঙ্গে সঙ্গে। চোখ উজ্জ্বল করে বললো মিলি, "পিসি যে কত নাড়ু ভালবাসে। তিলের নাড়ু পেলে পিসি আর কোন মিষ্টি চায় না। দেখোনি, মা কত বড় একটিন ভরা তিলের নাড়ু দিয়েছেন।" ইতি মধ্যে আরও একঘণ্টা কেটে গেছে। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই ভোলা মিলিকে তাগাদা দিয়ে উঠলো। বিছানাটা পেতে চটপট খাওয়া সেরে নিয়ে ওপরের বার্থে লাফ দিয়ে উঠলো ভোলা। বালিশটা একটু ঠিক করে নিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, "মিলি এবার একটা লম্বা ঘুম দে। সকাল সাড়ে ছটায় ঠক্ ঠক্ করে এসে চা দিয়ে যাবে তখন উঠবি একেবারে।" নিচ থেকেই মিলি বুঝলো ভোলাদা এবার আরাম করে বিছানায় ডুবে গেলেন। মিলিও ডুবে যেতে চাইছে। অনায়াসে জয় করে চলেছে নাকি শরীরের, আর মিষির জয় মনের। সেদিন দিদির চিঠি পড়ে আর মার অমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে মল্লিকার মনের ওপর দিয়ে যে কী অদ্ভুৎ ট্রেন গেছে এ কদিন তা মল্লিকা নিজেও কাউকে ঠিক বোঝাতে পারবে না। তবে একটা দুঃস্বপ্নের হাত থেকে সে কদিন রেহাই পেয়েছিলো মল্লিকা। আবার যেন সে দুঃস্বপ্নটা উঁকি দিচ্ছে একটু একটু। দিদির মুখটা ঠেলে সরিয়ে কার অস্পষ্ট মুখটা মনের চোখে পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে। দুঃস্বপ্নতো ওর কম নয়? বিমান কী ঘোর করলো! আর রঞ্জন?…না। ওরা—যেন একটু… ওরা যেন ঠিক, কোথাকার ওদের আছে অনেক, আপাততঃ মল্লিকা সেগুলো খুঁজে পাচ্ছে না। না পাক। কিন্তু ঘোর ওদের আছেই। কেমন যেন অন্য রকম—ঠিক কল্যাণবাবুর মতো নয়।

মল্লিকা তো বুঝলো না, জানলোনা—এই যে কল্যাণকে ওর ভাল লাগা এর পেছনে রয়েছে রঞ্জন, এর সামনে রয়েছে বিমান। ওর মনের অন্তর্বর জমিকে উর্বর করেছে রঞ্জন, বীজ লাগিয়েছে বিমান, সেই বীজ মনমতো জমি পেয়ে পুর্ণোদ্যমে অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে পত্রপুষ্পে ছেয়ে গেছে তবে না ফল ফলাতে পেরেছে কল্যাণ।

মল্লিকা চোখ বুজে নিজের চিন্তায় এতই বিভোর যে, পাশের বার্থের সহযাত্রী দুজন যে কী গভীর কাজে লিপ্ত তা আদৌ টের পেলো না। টের কিন্তু পেয়ে গেছলো ভোলা। ওদের উসখুসানি দেখে ভোলা কিছু একটা আন্দাজ করেছিল বোধ হয়, তাই না ঘুমিয়ে ঘুমের ভান করে পড়েছিলো। চোখ মিটমিট করে দেখছিলো ওদের কাণ্ড কারখানা। স্তূপীকৃত নোট ওদের সামনে। দুজনের কোমরের ছুটো গেঞ্জি থেকে এসব বেরিয়েছে। শুধু একশ আর হাজার টাকার নোট। রোগাটা গুণছে আর মোটাটা পেন্সিল দিয়ে খেরো বাঁধান মোটা খাতার পাতে টিক্ দিচ্ছে। গোণা হয়ে গেলো সব নোট। রোগাটা অস্ফুটে বললে, "এক-লাখ চল্লিশ হাজার—" "ঠিক আছে—" উত্তর দিয়ে কোলের খাতাখানা কপাস করে বন্ধ করে দিলেন বিশালবাবুটি। পাশে রাখা অপেক্ষাকৃত ছোটখাতাখানা কোলে তুলে নিলেন। রোগাজন পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে মুখ খুলে উপুড় করলো। টাকা এবং তাড়ানি গুনলো এক এক করে।

"চৌব্বিশ রুপেয়া হে আনা।" জানালে রোগাটি।

"কেয়া গড় বড় লাগায়া তুম—চৌব্বিশ রুপেয়া দশ আনা হোনা—" ভুরু কুঁচকে গর্জন করে উঠলেন বিশালবপু।

ট্রেনের দোলায় ঘুমিয়ে পড়েছে মল্লিকা। ভোলাও চোখ মিটির মিটির করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোলার ঘুম ভেঙে গেল খুব ভোরে। চোখ কচলে আড় মোড়া ভেঙে উঠে পড়লো। প্রথমেই নজরে পড়লো সহযাত্রী দুজনকে। বসে বসেই ঢুলছেন। মুখে অশান্তি ফুটিয়ে সেই একই ভাবে ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন মোটাটি, আর রোগাজন খোলাখাতা সামনে রেখে পেনসিল্ কামড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে চুলুনির চোটে মাথা নেমে আসছে খাতার ওপর। ভোলা চোখ গোল করলো। সারাটা রাত জেগে বসে আছে? হঠাৎ দিনের আলোয় বুঝি খেয়াল হলো কথাটা, রোগা চেঁচিয়ে উঠলো "—জী! আপ কোলিকো চার আনা বখসিস্ দেনেবোলা" তড়বড়িয়ে গেলো মোটার। মুখের অশান্তি গেল উবে, হো হো করে উচ্চহাস্য করে উঠলেন কামরা কাঁপিয়ে। এক থাবড়া বসালেন রোগার পিঠে, "সাবাস ছগনলাল। ঠিক হায়। আভি সো যাও—" খাতার তলায় ঠেলা দিয়ে তৎক্ষণাৎ আপার বার্থে উঠে শুয়ে পড়লো ছগনলাল। প্রভু চিৎ হয়ে পড়লেন নিচের বার্থে। ছোট নাকের সুর মিলে শব্দ হতে লাগলো ভোঁ—কোঁস—ফুস্, ফুস।

টাকুনিতেই এসেছে ওরা কালকা থেকে। রবির রওই কেন সম্ভাবনা থাকুক না টাকুনিতে, বেলা এগারটা আর তিনটেতে তফাৎ অনেক। এত দেরী কিছুতেই করা যায় না। বি-ওয়ান, বেমক্কা। কাশীরি কুলিরাই মাল তিনিয়ে নিয়ে এলো, কোন মুস্কিল হলো না। নেমে গেট টা একবার দেখে নিয়ে মল্লিকা—ভোলা দুজনেই এক সঙ্গে গেট খুলে ঢুকলো যে যাবে কার আগে সেই অবস্থা। সামনে বিরাট-লন্। মধ্যে বিরাট বাঙ্গলো প্যাটার্সের বাড়ী পারা রাস্তা যা ভাবতে ভাবতে এসেছে মল্লিকা তার সঙ্গে একটোটাও মিল নেই।" বাড়ীর গায়ে পাহাড় নেই, নেই পাইন গাছের ছায়া। দিব্যি প্লেন রাস্তা কাটরোডের সামান্য একটু উপরে বাড়ীখানা। বাড়ীর চারপাশ ঘিরে বাগান। অজস্র বরষুয়ী ফুল ফুটে আছে। আর কিছু লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা তখন মল্লিকার ছিল না। লনের অর্ধেক আসতেই ছোট্ট একটি মেয়ে বারান্দা থেকে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। ওরা দুজনেই বুঝলো ও রুমা। "দিদি—।" প্রায় চিৎকার করে উঠলো মল্লিকা। থেমে আর থাকা যায় না।

"শ্যামল—।" উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়ে ভোলা লাফিয়ে বারান্দায় উঠলো। আনন্দের উত্তেজনা ওদের সর্বাঙ্গে। কয়েকটা মিলিত পায়ের দ্রুত শব্দ পাওয়া গেলো। পর্দা ঠেলে এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো শ্যামল ও চামেলি। চামেলির হয়ত একমুহূর্ত দেরি হয়েছিল তবু মল্লিকাকে চিনতে। মল্লিকা "দিদি" বলে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো চামেলির বুকে। "ওরে মিলি! মিলিরে—তুই তুই এসেছিস? মা তাহলে ক্ষমা করেছেন, ওরে মিলিরে—" বোনকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো চামেলি। শ্যামলও লাফিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো বন্ধুকে। ওদের চোখ দিয়েও আনন্দ বেদনায় মিলিত অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো ধীরে ধীরে। ওদের এই কান্নাকাটি কতক্ষণ চলতো কে জানে—। পেছন থেকে শিশুকণ্ঠে শোনা গেলো, "আমি তালে গনিয়ে উঠবো বাপি?" আলিঙ্গন ছেড়ে সকলেই শব্দ করে হেসে উঠলো। মল্লিকা বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় রাঙা করে দিলো মুখ। মাসির আদরের ঠেলায় বাচ্চা হাঁস ফাঁস করতে করতে কোনমতে ফুল করে কোল থেকে নেমে পড়ে এক দৌড়। মল্লিকা ঘর্মিত আঁচলটা কাঁধে তুলতে তুলতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, "রুমা, কই দিদি—? "ওমা তাইতো, রুমা—"

জোরে তাকলো চামেলি। খিল খিল করে হাসতে হাসতে দরজার পাশ থেকে যার হলো জমী কুমার মুখ থেকে "কারা মামণি" বের না হতেই মল্লিকা ঝাঁপিয়ে পড়লো কুমারকে।

"চিদি তোরা মোর থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে কাজাকাটি কর বাপু, কুলিদের আগে বিদায় করে দি' বাদলরওলো ওরা রেখে আসুক ভেতরে। ওরা দিব্যি মজা করে বাঙালীদের কাণ্ডকারখানা দেখছে।" বললে তোলা। ওরা তাড়াতাড়ি সরে গেলো একপাশে। শ্যামল দ্রুত এগিয়ে এলো "তরুণ তোর এত ব্যস্ত হতে হবে না। ভেতরে গিয়ে তোরা বিশ্রাম কর। আমরা সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোর আক্কেলখানা কী বলতো তরুণ! হিল ষ্টেশনে এতো মাল নিয়ে আসতে হয়? আমরা যাচ্ছি কি করতে? দুটো লোকের মত চাপ্রটে কুলি"। কলকণ্ঠে বলে উঠলো তোলা, "ঝিনিমপত্র আর আমাদের কোথায়, সব তো তোদের—"

"কি বলছ—?" শ্যামল একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

"ঐ দুটো সুটকেস আর হোল্ড অলটি ছাড়া আর সব তোদের। ঐ ট্রাঙ্ক তিনটে, দুটো বেতের ঝুড়ি আর বড় টিনটা—ও সবই তোদের—আমরা শুধু বাহক মাত্র—" চামেলি ভেতরে চলে গেছে কুলিদের মাল রাখার নির্দেশ দিতে ও থাকলে বাস্তু ঘুঘির কথা নিয়ে আরও কিছু জিজ্ঞেস করতো হয়তো। শ্যামল কিছুটা থাঁচ করে চুপ করে গেলো। একটু লজ্জা লজ্জা করছিলো মল্লিকার—! এইবার একপা এক পা করে এগিয়ে এসে—"শ্যামলদা"—বলে পায়ের ধুলো নিলো নিচু হয়ে। "ঠিক আছে, ঠিক আছে—" শ্যামল ব্যতিব্যস্ত হয়ে দু কাঁধ ধরে তুললো মল্লিকাকে। উঠে দাঁড়িয়ে আবার তাকলো মল্লিকা, "শ্যামলদা—" মল্লিকার মুখে হাসি চোখের কোনায় জল।

(ক্রমশঃ)

দিলীপকুমারের

অনামী—দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এতে আছে প্রচ্ছদপট—অবনীন্দ্রনাথ, আশীর্বাদ শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।

মণিমঞ্জুষা—সংস্কৃত, ইংরাজি, ফরাসী, জর্মন ও হিন্দি থেকে বাংলা কবিতা তর্জমা।

কবিতাকুঞ্জ—প্রথম সংস্করণের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও আরো অনেক নতুন কবিতা-সংকলন।

গীতিগুঞ্জন—দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গানের সংকলন।

মীরাভজন—ইন্দিরা দেবীর হিন্দি ভজনাবলী সুধাঞ্জলির অনুবাদ—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের ভূমিকাসহ।

পত্রাবলী—বাংলা পত্র : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, মোহিতলাল, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি।

ইংরাজি পত্র : শ্রীঅরবিন্দ, জর্জ রাসেল, লোরেন্স ডিকিনসন, কৃষ্ণপ্রেম, সার পল ডিউকস্, সজীব রাও প্রভৃতি—চারশো পৃষ্ঠার বই। মূল্য—৬৲

সবে প্রকাশিত হয়েছে—(FALL OF MEVAR)

দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতনের ইংরাজি অনুবাদ Brian Rhys-এর ভূমিকাসহ। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য-২৲

Pundit Jawaharlal : I liked it very much. It is a powerful and moving drama.

প্রাপ্তব্য : ভারতীয় বিদ্যাভবন, চৌপাটি, বম্বে ও Dunlavin Cottage, Poona-5

শ্রীকণ্ঠ ঔষধালয় ●

অনুবাদক : ডাঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায়

বেণীমাধব সিংহ গৌরীপুর গ্রামের জমিদার ও নফরচন্দ্র। ওঁর পিতামহ এক সময় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। গাঁয়ে বাধাঘাট, পুকুর আর মন্দির—যার সংস্কার করা এখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে—তাঁর কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লোকে বলে একদিন তাঁর দরজায় হাতি বাঁধা থাকত। এখন সে জায়গায় একটা বুড়ো মহিষ রয়েছে। আর সে মহিষের পাঁজরার কয়েকটা হাড় ছাড়া আর কিছু বাকী নাই। চাকর এক সময় খুব দুধ দিত, কেননা কেউ না কেউ তাকে নিয়ে সব সময় ওর পিঠের উপর বসে থাকত। সম্পত্তির অর্ধেকটা উকীলকে উপহার দিয়ে বেণীমাধব সিংহ এখন চুপচাপ বসে আছেন। এখন ওঁর বার্ষিক আয় হাজার টাকার বেশী নয়। ঠাকুর সাহেবের দুই ছেলে। বড়টীর নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। অনেক কষ্টেসৃষ্টে বি. এ. পাস করে অফিসের চাকরী করছে। ছোট ছেলে লালবিহারী সিংহ, একবারে জোয়ান মরদ। যোদ্ধার মত চেহারা, সোনার মত মুখ, চওড়া ছাতি। সকালে উঠে দুসের দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে নেয়। শ্রীকণ্ঠের স্বাস্থ্যটা একেবারে উল্টো। বি, এ, এই দুটি অক্ষরের জন্য চোখে পড়ার মত মানুষের চেহারার যা কিছু থাকতে পারে তা একেবারে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। এই দুটী অক্ষর ওর শরীর দুর্বল ও কান্তিহীন করেছে। এই জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর খুব ঝোঁক। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উপর খুব বিশ্বাস। তাই সকাল সন্ধ্যায় ওর ঘর থেকে কল ঘর্ঘর ঘুমঘুর আওয়াজ শোনা যায়। লাহোর ও কলকাতার কবিরাজদের সঙ্গে খুব চিঠি লেখালেখি চলে।

ইংরেজী শিক্ষার মালিক হলেও কিন্তু শ্রীকণ্ঠ ইংরেজী সামাজিক প্রথার উপাসক ছিল না। বরং খুব জোরের সঙ্গেও সকলের নিন্দা করত। এই জন্যে গ্রামের মধ্যে তার খুব খাতির ছিল। গৌরীপুরে সে ছিল রামলীলার প্রবর্তক। দশহরার দিন খুব উৎসাহের সঙ্গে রামলীলায় যোগ দিত আর ওতে কোন না কোন পার্ট নিত।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার গুণগান করা ওর ধার্মিকতার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। গ্রামে যৌথ পরিবারের ও ছিল একমাত্র সমর্থক। আর কাল যেয়েরা যে শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে এক সাথে থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে ও তা খুব অপছন্দ করত। ও মনে করত যে ওতে দেশ ও জাতির ভয়ানক অকল্যাণ হবে। এই জন্যে গাঁয়ের মহিলারা ওকে অপছন্দ করতেন। কেউ কেউ ওকে শত্রু জ্ঞান করত। এমনকি ওর স্ত্রীও এবিষয়ে ওর সময়ে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করত। তার কারণ এ ছিল না যে, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর ননদের প্রতি তার কোন ঘৃণা ছিল। তা নয়। তবে সে ভাবত যে যদি এত সহ্য করেও, নানা প্রকারে দিয়ে থুয়েও, পরিবারের সঙ্গে জীবন নির্বাহ করা যদি কঠিন হয়ে পড়ে, তবে ভবিষ্যতের ঝগড়াঝাটির মধ্যে নিজের জীবন নষ্ট না করে পৃথক হয়ে যাওয়াই ভাল কাজ হবে না?

আমলী বড় বংশের মেয়ে। ওর বাবা একটা ছোট

● হৃদ্রোগের সৌখিন মূল্য প্রেসক্রিপশনের বিধি অনুযায়ী।

জেলী রাজ্যের তালুকদার ছিলেন। মস্ত বড় বাড়ী, একটা হাতী, তিনটে বুলুক, তিন রকমের বাঘ পাখী, পাখী খোয়ার, বাড়বাতি ও কাহল, অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটী আর কত কী। একজন বনেদী তালুকদারের যাকা দরকার, তা সবই তাঁর ছিল। নাম ছিল ভূপ সিংহ। খুব উদার চিত্ত ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি ছেলেও ছিল না তাঁর। সাতটী মেয়ে ও তাদের কোলে সবই নীহিত। প্রথম উৎসাহের চোটে তিন মেয়ের বিয়ে খুব ধুমধাম করে দিলেন। তার পর যখন দেখলেন যে পনের বিশ হাজার টাকার ঋণের বোঝা ঘাড়ের উপরে চেপেছে তখন হাত গুটিয়ে নিলেন। আনন্দী ছিল চতুর্থ কন্যা। সব বোনের মধ্যে ও ছিল রূপসী ও গুণবতী। এই জন্যে ঠাকুর ভূপ সিংহ ওকে খুব ভালবাসতেন। ঠাকুর সাহেব ওকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়লেন। কোথায় ওর বিয়ে দেন। তিনি এক দিকে যেমন চান না যে ঋণের বোঝা বাড়ে, তেমনি এও চান না যে মেয়ে ভাবে সে বড় হতভাগিনী। এক দিন শ্রীকণ্ঠ ওঁর কাছে একটা চাঁদার টাকা চাইতে গিয়েছিল। বোম্বের হিন্দী প্রচারের জন্যে চাঁদা। ওর স্বভাব চরিত্র দেখে ভূপ সিংহের খুব ভাল লাগল ও ধুমধাম করে আনন্দীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেন।

আনন্দী নূতন বাড়ীতে এসে দেখল যে এখানকার রকম সকম একেবারে আলাদা। ছোট বেলা থেকে যে-সব লোক চলনের মধ্যে ও অভ্যস্ত ছিল তার কিছুমাত্রও এখানে দেখতে পেল না। হাতী ঘোড়ার কথা তো দূরে থাক, একটা কুকুরের গলার পাড়ীও ছিল না। সঙ্গে যেসব চটী নিয়ে এসে ছিল, কিন্তু এখানে পরবে কোথায়? বাগান কোথায়? কাঁচা রেঙে। বাড়ীতে না ছিল একটা আনাচ, না ছিল দেয়ালে একটা ছবি। এ ছিল একটা সাদাসিদে ভদ্রা গৃহস্থের বাড়ী। কিন্তু পাঁচ দিনের মধ্যেই আনন্দী এমন ভাবে এই নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল যেন জীবনে সে কোন দিন বিলাসের সামগ্রী দেখে নি।

একদিন দুপুর বেলা লালবিহারী সিং মুরলী নিয়ে বাজা ছিলেন ও বৌদিকে বলল, "সীসিপর রেঁধে খাও। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে"। আনন্দী রান্নাবান্না শেষ করে ওর অপেক্ষায় রাস্তার দিকে চেয়েছিল। এখন আবার এই নতুন ফরমাস রাঁধতে বসল। হাঁড়ি খুলে দেখে যে এক পোয়ার বেশী ঘি নেই। বড় ঘরের মেয়ে হাঁড়িয়ে চলতে জানে না। ও সমস্ত ঘি টুকু মাংসের মধ্যে ঢেলে দিল। খেতে বসে লালবিহারী দেখে যে ডালে ঘি নেই। বলে, "ডালে একটু ঘি কেন দিলে না? আনন্দী বলল, "ঘি সব মাংসে ঢেলে গেছে।" লালবিহারী একটু চটে বলল: "পরশুই ঘি এসেছে। এত তাড়াতাড়ি শেষ হল?" আনন্দী উত্তর দিল: "আমতো মোট পোয়াটেক ঘি ছিল, আমি সবটুকু মাংসে ঢেলে দিয়েছি।"

শুকনো কাঠ যেমন একটু তাত পেলেই জ্বলে উঠে তেমনি শুকনো মানুষও একটুতেই ক্ষেপে যায়। বৌদির ঐ কথা লালবিহারীর কাছে বড়ই খারাপ মনে হল। চটে উঠে বলল, "তোমার বাপের বাড়ী বোধ হয় ঘি এর নদী বয়ে যায়।"

স্ত্রীলোকেরা গালাগালি সহ্য করে, মারপিটও সহ্য করে, কিন্তু বাপের বাড়ীর নিন্দা সহ্য করতে পারে না। আনন্দী মুখ মুছিয়ে নিয়ে বলল। "যার হাতীও তো ন'শ টাকা। ওখানে তো অতটুকু ঘি চাকর চাকরাণীরাই খায়।"

লালবিহারী জ্বলে উঠল। খাদি উপুড় করে ফেলে দিল, আর বলল: "ইচ্ছা হচ্ছে যে তোমার জিভ ছিঁড়ে নিই।"

আনন্দীরও রাগ হ'ল। বলল: "তা যদি হয় তবে আগে যমা দেখিয়ে দিতাম।"

ও ছিল একটা মূর্খ গোঁয়ার রাজপুত সন্তান। ওর পা

ওর পক্ষে মেয়ের ঠিক মাথা অসম্ভব হল। ওর স্ত্রী ছিল সামান্য জমিদারের মেয়ে। যখন খুশী তার উপর হাত চালিয়ে দিত। খড়ম উঠিয়ে জোরের সঙ্গে আনন্দীর গায়ে ছুঁড়ে মারল ও বলল: "যার মেয়েকে তুমি সব ভুলে গেছ, তাকে আর তোমাকে মেরে নেব।"

আনন্দী হাত দিয়ে খড়ম ধরে ফেলল। মাথা বেঁচে গেল কিন্তু আঙুলে খুব চোট লাগল। রাগের চোটে হাওয়ায় দোল খাওয়া পাতার মত কাঁপতে কাঁপতে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়ে রইল। স্ত্রীলোকের বল আর সাহস, মান আর মর্য্যাদা পতির উপর নির্ভর করে। স্বামীর বল ও বীর্য্যের জোরেই তার জোর। ক্রোধের ঘোল পান করে আনন্দী স্তব্ধ হয়ে রইল।

প্রতি শনিবার শ্রীকণ্ঠ সিংহ বাড়ী আসত। বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটল। দুদিন ধরে আনন্দীর রাগের জ্বালা একটুও কমল না। না খেল খাবার, না খেল জল। স্বামীর রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীকণ্ঠ অভ্যাস মাফিক বাড়ী ফিরল আর বাইরে বসে নানা গল্প-গুজব, খেত আর কাজ সম্বন্ধে নানা ঘটনা অথবা নতুন মোকদ্দমার চর্চা করতে লাগল। এই ভাবে রাত দশটা বেজে গেল। গ্রামের ভদ্রলোকদের এই সব কথায় এত আনন্দ হত যে খাওয়া দাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যেত। এই সব আলোচনার মধ্যে শ্রীকণ্ঠের বৈঠকখানা ছাড়া মুস্কিল হয়ে পড়ত। এই দুদিন কটা আনন্দীর বড় কষ্টে কাটল। এই ভাবে খাওয়ার সময় এল। গ্রামের লোকেরা উঠে চলে গেল। যখন একলা হল তখন লালবিহারী বলল: "দাদা আপনি বাড়ীর ভিতরে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবেন যেন মুখ সামলে কথাবার্তা বলেন নতুবা এক দিন অনর্থ ঘটে যাবে।"

যৌবনবতী ছেলের পক্ষে দাদাই পাইলেন, "হাঁ, বউ বেটীর এ স্বভাব হওয়া ঠিক নয় যে পুরুষের মুখে মুখে জবাব দেয়।"

লালবিহারী "উনি যদি বড় ঘরের মেয়ে হয়ে থাকেন তো আমরাও তো কোন চাকর নোকর নই।" শ্রীকণ্ঠ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কি?" লালবিহারী, "কিছুই নয়। উনি খাবার খুব বেগে চৌ হয়ে যান। বাপের বাড়ীর সামনে আমাদের মানুষ বলেই জ্ঞান করেন না।" শ্রীকণ্ঠ ধীরে ধীরে আনন্দীর কাছে গেল। ও ঠাই বসে ছিল। মনটা খুব বিচড়ে ছিল। আনন্দী জিজ্ঞেস করল: "ভাল আছ তো?" "বেশ ভাল আছি, কিন্তু তুমি বাড়ীতে এ সব কি উপদ্রব শুরু করেছ?"

আনন্দী চটে উঠল। রাগের জ্বালায় শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। বলল: "তোমার মনে যে আগুন জ্বেলেছে, ওকে যদি পাই তো মুখ পুড়িয়ে দিই।" শ্রীকণ্ঠ: "এত চটছ কেন, ব্যাপারটা তো বল।"

আনন্দী: "কি বলব? এ আমার অদৃষ্টের ফের। নইলে একটা গেঁয়ো ছোকরা যার একটা চাপরাশীগিরি করবার মুরোদ নাই, সে আমার খড়ম নিয়ে মেরে এই রকম চাষাড়ী করত না: শ্রীকণ্ঠ: "সব খুলে বল যাতে বুঝতে পারি। আমার তো কিছু জানা নাই" আনন্দী: পরশু তোমার শেয়ারের ভাইটী আমাকে মাংস রাঁধতে বলল। হাঁড়ীতে একপোয়ার বেশী ঘি ছিল না। ওটুকু সব আমি মাংসের মধ্যে ঢেলে দিলাম। খেতে বসে বলে যে ভালে ঘি নাই কেন? যাগ, এর পর আমার বাপের বাড়ীর কথা তুলে তাল মন্দ বলতে লাগল। আমি থাকতে পারলাম না। আমি বললাম, আমার বাপের বাড়ী অতটুকু ঘি তো কি চাকরেরাও খেয়ে নেয়। কেউ জানতেও পারে না। ব্যস, এইটুকু কথায় পাষী ছোকরা আমার মুখে খড়ম ছুঁড়ে মারল। যদি হাতে না ধরে ফেলতে পারতাম তবে

মাথা হেঁট হেত। ওকে জিজ্ঞেস করি আমি যা বলেছি তা সত্যি কি মিথ্যে।

শ্রীকণ্ঠের চোখ লাল হয়ে উঠল। বলল, "এত দূর হয়ে গেছে? ছোকরার এত বড় আস্পর্দা!"

স্ত্রীলোকের স্বভাবানুসারে আনন্দী কাঁদতে লাগল। চোখের জলতো আঁখির পলকেই ওদের লেগে থাকে। শ্রীকণ্ঠ বড় ধৈর্যবান ও শান্ত পুরুষ ছিল। খুব কমই ওকে রাগতে দেখা যেত। কিন্তু স্ত্রীলোকের চোখের জল পুরুষের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে আগুনে তেল ঢালার কাজ করে। শ্রীকণ্ঠ সারারাত এপাশ ওপাশ করতে লাগল। নানা চিন্তায় চোখের পলক পর্যন্ত পড়ল না। সকাল বেলা পিতার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, এবাড়ীতে আর আমার থাকা চলবে না।"

এই রকম বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য কতবার শ্রীকণ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ তাকে নিজের মুখেই একথা বলতে হল। অন্যকে উপদেশ দেয়া কত সহজ!

বেণীমাধব সিংহ ঘাবড়ে গেলেন, বল্লেন: কেন, কেন?"

শ্রীকণ্ঠ: এইজন্যে যে, আমার মান সম্মানের জন্য কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে। আপনার বাড়ীতে অন্যায় ও হঠকারিতার জন্য বাড় বেড়েছে। তাকে বড়দের ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে হবে সে এখন মাথায় চড়েছে। আমি অন্যের চাকরী করি, বাড়ীতে থাকতে পারি না। এদিকে আমার পেছনে আমার স্ত্রী-র উপর দুবেলা খরচ যোগা হচ্ছে। কড়া কথার জন্য পরোয়া করি না। এক কথার জায়গায় দু কথা বলে তা সইতে পারি। কিন্তু আমার উপর জুতো লাথি চলবে আর আমি ঘাস বন্ধ করে বসে থাকব, এ হতে পারে না।

বেণীমাধব সিংহ জবাব পর্যন্ত দিতে পারলেন না। শ্রীকণ্ঠ সব সময় ওঁকে সম্মান করে চলত। ওর এই রকম রাগ দেখে বুড়ো ঠাকুর তো অবাক হয়ে গেলেন। কেবল এই টুকু বললেন, দেখ বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে—তুমি এই রকম কথা বলছ? স্ত্রীলোকেরা এমনি করে সংসারের সর্বনাশ করে। ওদের খুব মাথায় তোলা ঠিক নয়।

শ্রীকণ্ঠ একথা আমি জানি। আপনার আশীর্বাদে আমি এত মূর্খ নই। আপনি জানেন যে এই গাঁয়ে আমি বুদ্ধিতে যুক্তিতে অনেক সংসার বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যে-নারীর মান-সম্মানের জন্য আমি ভগবানের কাছে দায়ী তার সঙ্গে এইরূপ ঘোর অন্যায় পক্ষপাত ব্যবহার আমার পক্ষে অসহ্য। আপনি এটুকু জানবেন যে লালবিহারীকে যে আমি কোন শাস্তি দিচ্ছি না এ আমার পক্ষে কম সহ্যের বিষয় নয়।

এতে বেণীমাধব উষ্ণ হয়ে উঠলেন। বল্লেন: এ সব কথা শুনতে ভাল লাগে না। লালবিহারী তোমার ভাই। ওর যদি কোন দোষ হয়ে থাকে ওর কান মলে দাও। কিন্তু—"

শ্রীকণ্ঠ—লালবিহারীকে আমি ভাই মনে করি না।

বেণী—স্ত্রীর জন্যে?

শ্রীকণ্ঠ—আজ্ঞে না। ওর গোঁয়ারতুমি ও চাষামীর জন্য।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপ করে রৈল। ঠাকুর সাহেব ছেলের ক্রোধ শান্ত করতে চান, কিন্তু এ স্বীকার করতে চান না যে লালবিহারী কোন অনুচিত কাজ করেছে। এর মধ্যে গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক হুঁকো খাওয়ার বাহানায় ওখানে এসে উপস্থিত হল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেউ কেউ যখন শুনলেন যে স্ত্রীর জন্য শ্রীকণ্ঠ বাপের সঙ্গে ঝগড়া করতে তৈরী হয়েছে তখন তাঁরা ভারি খুশী হলেন। দুপক্ষের মধুর বাক্যালাপ শুনবার জন্যে ওঁদের মন নেচে উঠল। গ্রামের কুটিল প্রকৃতির লোকেরা ওদের বাড়ীর উচুঘরের নৈতিক চালচলন দেখে মনে মনে জ্বলে যেত।

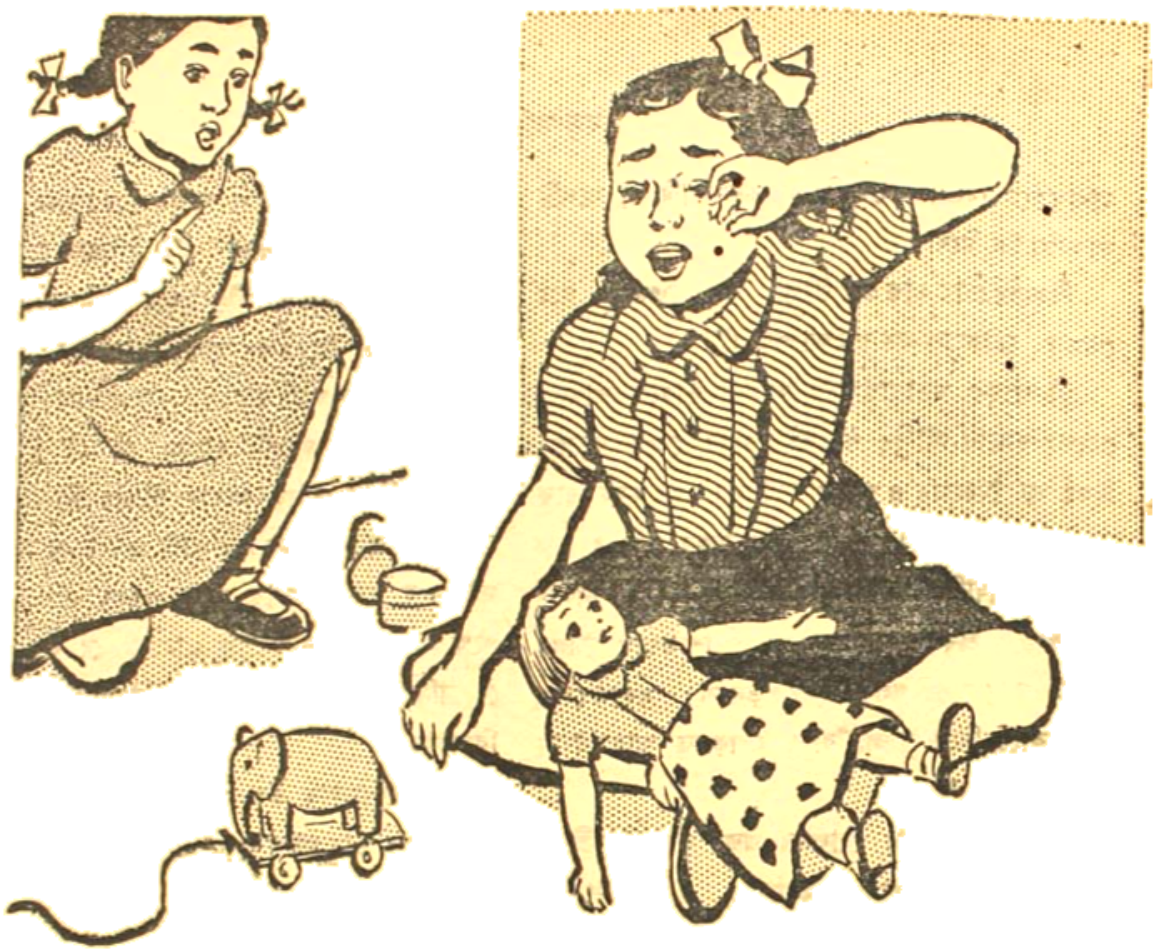

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি কোপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বড় বোন নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ওকে মিষ্টি আর আদর করার বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা অফিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন জলপুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে মহলার হাত লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে মহলা আঙুলের দাগ—আমি আমার জানলার দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিচে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেন 'এতোক্ষণ এতোক্ষণ তবে তাহাদের গিন্নিপিসির কষ্ট কেটে যায়। আমাদের প্রতিবেশির ছেলে নিনু—আমা বেচারা—ভয়ে জড়সড় হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় ঘরে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মামী, মামী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

© ১৯৯৯-২০১২ BCC

"আম্মা, আমরা নিহুকে শান্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় রাণী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা বুঝিবে, নিহুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় বুবি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "জলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারণ আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম বুবির জন্যে ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আম্মা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু গোনাতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, সার্ট, ঘুতী, ফ্রকআরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম যাবা: এতগুলো

জামাকাপড় কাচতে-কত সময় আর কতখানি শ্রমই না জানি লেগেছে। সুশীলা আমার বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তখুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেনা হয়—আর সে ফেনা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

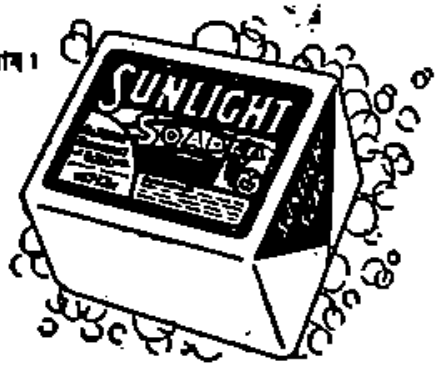

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেনা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

এ.২৫৫৪-২৪৫ BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে সেবক।

ওরা বলত যে বাপের চাপে শ্রীকণ্ঠ ভেড়া হয়ে গেছে। ছেলেবেলা বই পড়ে পড়ে বই এর পোকা হয়ে গেছে তার পরামর্শ বিনা বেণীমাধব সিংহ যে কোন কাজ করেন না —এটাও তারা বাপের বোকামী মনে করত। এই সব ভক্তাদুধারী ব্যক্তিগণ দেখল যে তাদের গুপ্ত কামনা আজ সফল হতে চলেছে। কেউ হুঁকো খাওয়ার অছিলায়, কেউ বা খাজনার রসিদ দেখাবার অজুহাতে ওখানে এসে বসে গেল। বেণীমাধব অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এ সব চাল তিনি ভাল ভাবেই জানেন। তিনি ঠেরেছিলেন যে আর যাই হোক এই সব ছোট লোকদের হাসিমাসা করবার সুযোগ দিবেন না। তাই মিষ্টি কোমল স্বরে বল্লে: "এখন দেখছি ছেলের কাছে অপরাধ করে ফেলেছি।"

অন্তর্ভেদিনী মাধবগঞ্জ এলাহাবাদের ব্যাঙ্কারের সেনী বুঝতে পারল না। জিবেটি ক্লাসে নিশ্চয় বুদ্ধি বীকারে সবে থাকা যার অভ্যাস ছিল, সে এই চালাকী কি করে বুঝবে? বাপ কি কারণে নিজের কথা পাল্টে নিলেন সে কথা সে বুঝতে পারল না। বলল: "আমি আজ থেকে লালবিহারীর সঙ্গে আর এক বাড়ীতে বাস করব না।"

বেণীমাধব—বাবা, বুদ্ধিমান লোক মূর্খের কথা কানে তোলে না। ও অবুঝ ছোকরা। তুমি বড় ভাই। ও যা ভুল করেছে ক্ষমা কর।

শ্রীকণ্ঠ—আমি ওর এই সব বেয়াদপি কখনও সহ্য করব না। ও ও বাড়ীতে থাক নয় আমি থাকি। ও যদি আপনার প্রিয় হয় তবে আমায় বিদায় দিন। আমি আমার ভার নিজেই সামলে নেব। আর যদি আমাকে রাখতে চান তবে ওকে বলুন যেখানে খুশী চলে যাক। এই আমার শেষ কথা।

লালবিহারী দরজার চৌকাঠের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে বড় ভাই এর কথা শুনছিল। ও দাদাকে খুব সম্মান করত। ওর এমন সাহস ছিল না যে, শ্রীকণ্ঠের সামনে চারপায়ের উপর বসে, অথবা হুকা টানে বা পান খায়। বাপকেও সে এত সম্মান দেখাতো না। ওর উপর শ্রীকণ্ঠেরও আন্তরিক ভালবাসা ছিল। সজ্ঞানে কখনও একটা কড়া কথা ওকে বলেনি। এলাহাবাদ থেকে আসবার সময় ওর জন্যে কোন না কোন জিনিষ অবশ্য নিয়ে আসত। এক ঘোড়া মুক্তা বানিয়ে দিয়েছিল। গত বছর নাগ পঞ্চমীর দিন ওর ছেড়গুলা এক যুবককে কুস্তিতে হারালে পর শ্রীকণ্ঠ স্বয়ং আখড়ায় গিয়ে ওকে বুকে ধরেছিল ও পাঁচ টাকার গলা হরিলুট দিয়েছিল। এমন, ভাই এর মুখ থেকে এমন হৃদয়বিদারক কথা শুনে লালবিহারীর নিজের প্রতি ঘৃণা হল। ওর ভীষণ কান্না পেল। নিজের কৃতকর্মে যে সে এখন অনুতপ্ত এবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। দাদা আমার একদিন আগে থেকেই তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছিল, না জানি দাদা কি বলেন। আমি ওঁর সামনে কেমন করে যাব—ওঁর সঙ্গে কেমন করে কথা বলব—ওঁর দিকে কেমন করে তাকাব—এই সব চিন্তা ওর মনে হচ্ছিল। ও ভেবেছিল দাদা ওকে ডেকে বসিয়ে নেবেন। আজ দেখল বিপরীত মূর্তি। ও মূর্খ ছিল বটে কিন্তু ওর মনে হচ্ছিল যে দাদা আমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করছেন। যদি শ্রীকণ্ঠ ওকে একদা ডেকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিত কিংবা এমন কি দু চার থাপ্পড় লাগিয়ে দিত তাহলে ওর মনে এত কষ্ট হ'ত না। কিন্তু দাদার এই কথা যে "আমি ওর মুখ দেখব না" এ লালবিহারী সইতে পারল না। ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এল। কুঠরীতে গিয়ে কাপড় পরল, চোখ মুছল যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে ও কাঁদছিল। তারপর আনন্দীর দরজার উপর এসে বলল, "বৌদি, দাদা ঠিক করেছেন যে উনি আমার সঙ্গে এ বাড়ী আর থাকবেন না। উনি এখন আর আমার মুখই দেখতে চান না। এই জন্যে আমি চলে যাচ্ছি।

আমার মুখ আর তাঁকে দেখাব না। আমার যে অপরাধ হয়েছে ক্ষমা কোরো।" এই বলতে বলতে লালবিহারীর গলা ভারী হয়ে এল।

যে-সময় লালবিহারী মাথা নীচু করে আনন্দীর দরজার উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সময় শ্রীকণ্ঠ চোখ লাল করে বাহির বাড়ী থেকে অন্দরে ঢুকল। ভাইকে খাড়া থাকতে দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিল ও ঘৃণায় পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন ওর ছায়া মাড়াবে না।

আনন্দী লালবিহারীর নামে নালিশ করেছিল, কিন্তু এখন অনুতপ্ত হয়েছিল। স্বভাবতঃই ও ছিল ক্ষমাশীলা। ওর এতটুকুও খেয়াল হয়নি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। ওর স্বামীর সম্বন্ধে একটা ঘিনিয় ও অপছন্দ করত। এত সামান্য ব্যাপারে উনি এত উত্তপ্ত হন কেন? এর উপর ওর ভয় হয়েছিল যে যদি কখনও আবার এলাহাবাদ যেতে বলেন তো সে কি করবে? এই সব চিন্তার মাঝখানে যখন দরজার উপর থেকে লালবিহারীকে বলতে শুনল যে, "আমি চলে যাচ্ছি; আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তো ক্ষমা কোরো;" তখন ওর পক্ষে রাগ একবারে জল হয়ে গেল। ও কাঁদতে লাগল। মনের ময়লা ধোবার পক্ষে চোখের জলের চাইতে আর কোন বস্তু নেই।

শ্রীকণ্ঠকে দেখে আনন্দী বলল, "বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লালা খুব কাঁদছে।"

শ্রীকণ্ঠ—তার আমি কি করব?

আনন্দী—ভিতরে ডেকে নাও। আমার জিভ থেকে এ আগুন জ্বলেছে। আমি বলতে এই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে।

শ্রীকণ্ঠ—আমি ডাকতে পারব না।

আনন্দী—পেয়ে পস্তাবে। ওর মনে খুব লেগেছে। শেষকালে কোথাও চলে না যায়।

শ্রীকণ্ঠ উঠলো না। এই সময় লালবিহারী বলল, "বৌদি, দাদাকে আমার প্রণাম দাও। উনি আমার মুখ দেখতে চান না এই জন্যে আমিও আমার মুখ ওঁকে দেখাব না।"

এই কথা বলে লালবিহারী পেছন দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের দরজার দিকে অগ্রসর হল।

আনন্দী থাকতে না পেরে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওর হাত ধরে ফেলল। লালবিহারী পেছন দিয়ে দেখল ও জলভরা-চোখে বলল, "আমায় যেতে দাও।"

আনন্দী—কোথায় যাচ্ছ?

লালবিহারী—যেখানে কেউ আমার মুখ দেখতে না পায়।

আনন্দী—আমি যেতে দেব না।

লালবিহারী—আমি তোমাদের সঙ্গে বাস করার যোগ্য নই।

আনন্দী—আমার মাথার দিব্যি, তুমি এক পাও বাড়াতে পারবে না।

লালবিহারী—যতক্ষণ না আমি বুঝছি যে দাদার মনে আমার প্রতি কোন বিরূপ ভাব নেই ততক্ষণ আমি এ বাড়ীতে কখনও থাকব না।

আনন্দী—আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি যে তোমার প্রতি একটুও খারাপ ভাব নেই।

এখন শ্রীকণ্ঠের মনও নরম হল। সে বাইরে এসে লালবিহারীকে বুকে টেনে নিল। দু ভাই খুব কাঁদতে লাগল। লালবিহারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল—"আর কখনও বলতে পারবেন না যে তোমায় মুখ দেখব না। এ ছাড়া আপনি যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব।"

কম্পিত স্বরে শ্রীকণ্ঠ বলল—"লালু, এসব কথা একেবারে ভুলে যাও। ঈশ্বর করুন আর যেন এ সব কথা বলার কোন অবসর না হয়।"

বেণীমাধব সিংহ বাইরে থেকে ভিতরে আসছিলেন। দুই ভাইকে গলাগলি করতে দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বলে উঠলেন, "বড় ঘরের মেয়ে তো, এমনিই হয়।"

গাঁয়ের লোকেরা যারা এই কথা শুনল তারা সকলে বলতে লাগল—"বড় ঘরের মেয়ে তো, এমনিই হয়।"

২০

এখন থেকে আরো অন্তত কুড়ি বছর আমার জন্য ডস্টয়ভ্‌স্কিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর আমা, পৃথিবীতে যে মেয়েটি তাঁকে শান্তি এবং সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল, সে এখনো ভূমিষ্ঠই হয়নি। ডস্টয়ভ্‌স্কির জীবনে আনাবিহীন মাসের এই যে কুড়িটা বছর, এ কেবল চাপা বৃষ্টি, ঠাণ্ডা ঝড়, একটানা দীর্ঘ একটা শীতরাত্রি আর বোবা কান্নার কাহিনী। সেই কালো কাহিনীতে মাঝে মাঝে আচমকা রোদের হেসে আছে কিন্তু আশা এবং আনন্দ কম, —তার মধ্যে অনিশ্চয়তাই বেশি।

কিন্তু এই কালো রাত্রির কথা সংক্ষেপে। কারণ পিটার্সবার্গের পথে এইবার নিয়ে আনা এবং ডস্টয়ভ্‌স্কি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে ; তাঁদের নিয়ে এবার ধরা দরকার।

কিন্তু ডস্টয়ভ্‌স্কির গল্পও আর প্রায় শেষ হয়ে এল। পিটার্সবার্গ ফিরে যে কাহিনী সে ঘটনাবহুল দীর্ঘ একটা বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্কে প্রত্যাশিত শান্তিময় উপসংহার : সেখানে অনাত্মীয়ের স্থান নেই।

কিন্তু সেকথাও যথাস্থানে।

ডস্টয়ভ্‌স্কি মানুষের দুঃখময় জীবনের দাক্ষ্যদানে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। মানুষের দুঃখময় জীবনকে অনুভব করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে ত বাইরে থেকে হবার নয়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, রেস্টুরেন্টে গরীব মানুষদের সঙ্গে চা খেয়ে বা তাদের সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করে জীবনকে জানা যায় না,—তার জন্য আরো নীচে এবং গভীরে নামা দরকার। কোনোরকম আড়াল বা অভিমান থাকলেও তা হবার নয়। এসব ছাড়তে এবং দিতে হয়ও অনেক। এবং ইচ্ছা করলেই তা আবার হতে পারে না। কারণ ইচ্ছা ত আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। জীবনের ঘটনাবলী আমরা ইচ্ছা করলেই সৃষ্টি বা বদল করতে পারি না। পারিনা অথচ তাইই আমরা সারাজীবন ধরে একান্তমনে চাই। চাই অথচ পারিনা, তা হয়না বলেই আমাদের দুঃখেরও শেষ নেই।

জীবনের ঘটনাচক্রের ফেরে তিনি এবার যেখানে এসে দাঁড়ালেন সেটা সমাজের কোনো অঙ্গ নয়,—এমন কি সেটা সমাজই নয়,—সেটা সমাজের পিছন দিক,—গোপন, অন্ধকার, এরই নাম নরক,—পাপ ও অপরাধের গোপনাগার। যত খুনি গুণ্ডা বদমাস জেলখানার ঘুঘু সব সাঙ্গাতিক রাঘবোয়ালির দাখি আসামী,—ডস্টয়ভ্‌স্কি প্রথম যখন সমাজিত লেখকজীবন থেকে আচম্বিতে ছিটকে একেবারে এদের মধ্যে এসে পড়লেন। এবং কল্পিত জীবনের ঘোর বিলাসী নেশার মত হঠাৎ ছুটে যেতে চোখের সামনে মানুষের এই রূপ, জীবনের এই চেহারা দেখে তিনি শিউরে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

কিন্তু সেও সাময়িক। জীবনে সাময়িক আঘাতের সবই। সবই ক্রমে সয়ে যায়, অভ্যাসে সহজ হয়ে আসে। রোদ থেকে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এলে প্রথম ত সবই ঘুট

অন্ধকার লাগে,—তারপর সেটা সয়ে এলে যেখানে যা আছে সব আস্তে আস্তে চোখে পড়ে। মন সজাগ হয়। তেমনি চমকটা এইভাবে অভ্যাসে সয়ে গেলে নীচেতলার জীবনের প্রকৃত চেহারাটা এবার আস্তে আস্তে তাঁর চোখে পড়ল। এরাই নীচেতলার মানুষ,—যাদের ঘৃণিত অভ্যাস,—পাপী অপরাধী,—অন্ধ অভাব ও কুটিল হিংসে,—এদেরই সমাজজীবনে মানুষ বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড়ের মত সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে। অথচ এখন, মুখোমুখি এদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর চোখে পড়ল যে এরাও মানুষ,—সকলের মধ্যেই বাঁচবার স্পৃহা,—জীবের যা প্রাথমিক ধর্ম,—সকলের মধ্যেই বিচার সমতা বোধ,—সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, আশা ও আকাঙ্খা,—মানুষের যা ধর্ম। সাধারণ সুস্থ সহজ সবল স্বাভাবিক সব মানুষ। তবে এদেরই কেন খারাপ বলে সমাজ। কেন ঘৃণা করে। কেন ফেলে রাখে পিছনে। কেন নির্যাতন করে এমন হীন পশুর মত। ক্রমশ তাঁর এই জ্ঞান হল যে কোনো মানুষই খারাপ নয়। মানুষ যে খারাপ তার অন্য কারণ আছে। মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, বঞ্চনায় ও হতাদরের অভিমানে সে খারাপ হয়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক মানবশরীরের মধ্যে যে বাস করে সে পশু নয়,—না, সে মানুষ,—তাকে সমাজের সামনে অবারিত করাই এখন থেকে তাঁর কাজ হবে,—তাঁর ব্রত।

তিনি আশ্বস্থ হলেন। আত্মবিশ্বাসে নিমগ্ন হলেন। এবং আত্মচিন্তা ও আত্মদর্শনের এর চেয়ে ভাল পরিবেশ আর কী হতে পারে। ডস্টয়েভস্কি যদি প্রতিভাহীন সাধারণ মানুষ হতেন ও জীবনের প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহের চাপে তিনি বেঁকে গিয়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন। কিন্তু আমাদের অরবিন্দের মত, সুভাষের মত, ঈশান এইখানেই এবার সোধন ও শিক্ষা সুরু হল। তারপর তাপদগ্ধ তপ্তির পর, কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনার পর, দুর্গম জ্ঞানসাধনার পর তাঁর ভিতর থেকে যে-মানুষ, যে-মহান সত্তা উত্তীর্ণ হয়ে এল, সেই-ই শিল্পী ও মানবহিতৈষী ডস্টয়েভস্কির প্রকৃত রূপ। শিবের মধ্যে দুধ দিয়ে বিষ যে গলায় নিয়ে হজম করতে পারে সেই ত নীলকণ্ঠ,—বিশ্ববিজয়ী শিব। কারাজীবনের ফলে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু এই কৃচ্ছজীবনের অভিজ্ঞতা না হলে যে-ডস্টয়েভস্কিকে পৃথিবী আজ পূজা করে সেই ডস্টয়েভস্কিকে পাওয়া যেতনা। এই ভয়ানক অভিজ্ঞতার ফলেই সমগ্র মানবসমাজের চিন্তাকে তিনি এমন প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যেতে পেরেছেন। এইখানেই তাঁর ঋণ,—তাঁর সব দুঃখের সার্থকতা।

কিন্তু এ-কাহিনী আর একটু বিবৃত করা দরকার।

[ক্রমশঃ]

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের রজতজয়ন্তী প্রদর্শনী

যতদিন পর্যন্ত না চিত্রশিল্পে ভাস্কর্য প্রভৃতি বহুমাত্র কলার কোন জাতীয় সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কলাশিল্পীদের একক ও যৌথ প্রদর্শনীর উপর নির্ভর না করে উপায় নেই। এদিক থেকে Academy of Fine Arts এর বার্ষিক প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই প্রদর্শনীর মাধ্যমেই কোলকাতাবাসীরা বছরে একবার সমগ্র ভারতের শিল্পীদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

এবার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের যে বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল তা একদিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নির্বাচকেরা এবার ছবি ও ভাস্কর্য নির্বাচনে অধিকতর কল্পনা, সাহস ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। আর সেই জন্যই বোধকরি নানা পত্র পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে, 'গেল গেল' রব।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে আধুনিকতা বলতে কী বোঝায় তা এককথায় বলা শক্ত। কারণ কিউবিজম্ হতে আরম্ভ করে অতি সাম্প্রতিক অ্যাকশন পেন্টিং পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদকে আমরা একত্রে 'আধুনিক' আখ্যা দিয়ে থাকি। তবে মোটামুটি একথা বলা যেতে পারে যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বস্তু বা প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণে পর্যবসিত না হয়ে, তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যা কর্ম, রেখিকা ইত্যাদির বিশিষ্ট সমাবেশে অপ্রাকৃত [এখানে আমি প্রাকৃত জগতের সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত অর্থেই কথাটি ব্যবহার করছি] সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাকেই আধুনিক কলা শিল্প বলা যেতে পারে।

বস্তুতঃ পশ্চিমে 'আধুনিক' কলাশিল্পের এতই উন্নতি হয়েছে যে এদেশে এখনও অধিকাংশ শিল্পীরাই উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন দেখে দুঃখ হয়। অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে বিশেষ করে কলরঙ বিভাগটি এদিক দিয়ে সত্যিই আমাকে হতাশ করেছে। ঘর, বাড়ী, নৌকো, পথ, গাছপালা ইত্যাদির একঘেয়ে সমাবেশ অধিকাংশ ছবিগুলিতে। ফলে অধিকাংশ ছবি পুনরাবৃত্তির জন্য ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। বিশেষ করে লক্ষ্মীচন্দ্র রায়ের পুরস্কার প্রাপ্ত 'হ্যাপী কর্ণার' ছবিটিতে কল্পনা বা আঙ্গিক কোন কিছুরই মৌলিকত্ব দেখতে পেলাম না। এবিভাগে যে সব শিল্পী ছবি দিয়েছেন হয় তো তাঁরা অনেকেই ভুলে গেছেন যে প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণে ফোটোগ্রাফীই এযুগে যথেষ্ট। চিত্রকলার এবিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই।

প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা বিভাগে আলপনাকার ও প্রদ্যুম্ন তানার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কম্পোজিশন, সাবলীল রেখা ও বর্ণিকার ব্যবহারে আলপনাকার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "দি উণ্ডম্যান উইথ এ ফিশ" সত্যিই সুন্দর। প্রদ্যুম্ন তানার সূক্ষ্ম অথচ সাবলীল রেখাঙ্কন, উজ্জ্বল বর্ণের মনোমুগ্ধকর সমাবেশ ও নিখুঁত আঙ্গিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর "গোপাল" ছবিটি সত্যিই সুন্দর। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আলপনাকার ও তানা উভয়েই প্রধানতঃ প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকলেও কর্ম,

কম্পোজিশন, বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ে যে কল্পনা ও বোধশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা আধুনিক চিত্র ধারারই বৈশিষ্ট্য। এবিভাগে গণেশ হালোই-এর অজন্তার গুহাচিত্রের রূপায়ন আঙ্গিকের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। তবে এবিভাগে এমন কয়েকখানা ছবিও আছে যেগুলি নির্বাচনের সার্থকতা কোথায় তা বুঝতে পারলাম না। সুধাংশু বসু রায়চৌধুরীর 'হস্তি-পরিবার' বা "রক্তপুষ্প নয়" কী নির্বাচিত হয়েছে আকৃতির বিশালতার জন্যে? জিতেন রায়ের "কালী" "তারা" প্রভৃতি নির্বাচিত হয়েছে কী একশ্রেণীর দর্শকের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করার জন্যে?

বস্তুতঃ প্রাচীনভারতীয় আঙ্গিক অবলম্বন করলেই যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে শিল্পীদের কয়েক ধাপ পিছিয়ে যেতে হবে এমন কী কোন কথা আছে, এই আঙ্গিকের মাধ্যমে বর্তমান যুগোপযোগী বিষয়বস্তু ও ধ্যানধারণা রূপায়ণ করা যায় কিনা সেবিষয়ে শিল্পীরা একটু চিন্তা করে দেখবেন কী? আর যদি তা না যায় তবে এখনো ঐ আঙ্গিক অবলম্বন করার সার্থকতা কোথায়?

এ বিভাগে নন্দলাল বাবুরও গোটাকয়েক ছবি আছে। তবে ছবিগুলি মনে রাখার মতো বিশিষ্ট মনে হয়নি।

এবারকার প্রদর্শনীতে অয়েল পেন্টিং বিভাগটিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এবারকার ছবি দেখে এ ধারণাই হোল যে এ দেশের শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আর ঐতিহ্যের গজদন্ত মিনারে বাস করছেন না। পরীক্ষা নিরীক্ষা কল্পনার বিস্তৃতি ও যে দুঃসাহস আধুনিক মানসের পরিচায়ক তা অনেক শিল্পীর রচনায়ই দেখা গেছে। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা ভালো। 'আধুনিক' চিত্রধারার বিরোধী পক্ষেরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে ভারতীয় শিল্পীদের 'আধুনিক' পদ্ধতিতে অংকিত চিত্রগুলি পশ্চিমী চিত্রকরদের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে সাদৃশ্যটা এক্ষেত্রে প্রকাশ ভংগীর সাদৃশ্য মাত্র। এবং এই প্রকাশ ভংগীর সাদৃশ্য আসে দৃষ্টিভংগীর সাদৃশ্যের ফলে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। বর্তমান যুগের বহু লেখকই ফ্রয়েডীয় মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের রচনায় বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁরা ফ্রয়েডীয় মত সত্যই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। কাজেই এই মতাবলম্বী দুজন লেখকের মধ্যে প্রকাশ ভংগীর সাদৃশ্য থাকতে বাধ্য, তা তাঁরা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের অধিবাসীই হোন্ না কেন। সেক্ষেত্রে কী আমরা বলবো যে একে অপরের অনুকারক মাত্র?

একথাটি যদি আমরা যথাযথ অনুধাবন করতে পারি তবে বর্তমান প্রদর্শনীর অয়েল পেন্টিং বিভাগ আমাদের প্রীতই করবে। এবিভাগের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির আলোচনায় এবার আসা যাক। প্রথমেই বলতে হয় শান্তি দাসের কথা। চমৎকার কম্পোজিশন, অপূর্ব বর্ণ সমাবেশ, ইংগিতময়তা ও সাবলীল্য তাঁর ছবি আদিমমানবের গুহাচিত্রের সংগে তুলনীয়। তাঁর যেবণালিকের পরিবার ছবিটি সত্যিই চমৎকার। উজ্জ্বল হলদে ও বেগুনী রঙের সমাবেশে "কাশ্মীর" চিত্রটিও চমৎকার। স্বল্প কয়েকটি রেখার সাহায্যে ও একটি মাত্র বর্ণের মাধ্যমে পরিবেশের "মা ও ছেলে" এবং "স্বপ্ন" চমৎকার ভাবসমৃদ্ধ। মোহন সামন্তের ছবিগুলি যেন এক অপ্রাকৃত জগতের প্রতিচ্ছবি। কল্পনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য, নির্জন মনের রূপায়ন ও সক্রিয় মনের নিয়ন্ত্রণের সমাবেশে ছবিটির প্রতিটি রেখা ইংগিতময়। শিল্পীর বীরেন দের ছবি পরিচ্ছন্ন কম্পোজিশন ও যৌক্তিক বর্ণব্যবহারে বিশিষ্ট। নীরোদ মজুমদারের ছবি দুটির প্রকাশ ভংগীর বৈচিত্র্য ও সুসংযত বর্ণব্যবহার উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া জ্যোতির ভট্টাচার্যের ছবিও আমার ভালো লেগেছে। তাঁর 'যোড়সওয়ার' ছবিটিতে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে যে বলিষ্ঠতার প্রকাশ হয়েছে তা অপূর্ব। "কিউরী অ্যাণ্ড ট্র্যাডুইনিটি" ছবিটিতে তিনি মৃদুব্যঞ্জ বর্ণের মাধ্যমে চমৎকার ভাব প্রকাশ করেছেন। "এ

ফিলার কিউবিজ ইন লাইট" ও "কিউপিডিটি" ছবিদুখানিতে তিনি স্বর্গীয় মাধুর্যে হৃদয়কে অভূতভাবে প্লাবিত করেছেন। শুধু রঙের বর্ণবৈচিত্র্যে কতটুকু প্রাণস্পন্দন হতে পারে তা ছবি দুটি দেখলে বোঝা যায়। অবিশ্যি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করছি।

পরিসরের স্বল্পতা হেতু, অধিকাংশ শিল্পীকে নিয়েই আলোচনা করা গেল না। তবু এর মধ্যেই অমর প্যাটেল, বিমল বি প্রভু, আর ভি সাকাদ, রাজাদ, আশিনাথ মুখার্জি, বিমল দাশগুপ্ত, হাজালকাদ, সুপ্রিয় বেশাই, বিনোদ রায় প্যাটেল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে রাঘব কানোরিয়ার 'ফিয়ার' ও উমাপদ-সেনের 'কার্পিভোরস' অপূর্ব ভাবদ্যোতক ও জীবন্ত। ভাস্কর্যের কথা বহুদিন মনে থাকবে। পুরস্কার প্রাপ্ত মূর্তি দেবব্রত চক্রবর্তীর 'এনার্জি'ও হৃদয় হরণের মুখর। এছাড়া রবীন রায়, হারাণ ঘোষ ও শঙ্খ চৌধুরীর নিবিড় মূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য। বিশেষকরে রবীন রায়ের মূর্তি মুদ্রণযোগ্য এবং কম্পোজিশনে প্রথম শ্রেণীর। গতবারের প্রদর্শনীতে এঁর 'স্পুটনিক'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্তঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে শিল্পী যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পেরেছেন।

এই প্রদর্শনীতে একটি "ওল্ড মাস্টার্স" এর গ্রুপ রাখা হয়েছে। এই বিভাগে যামিনী রায় রবীন্দ্রনাথ, অতুল বসু প্রভৃতি কয়েকজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীর চিত্ররচনা রয়েছে। তবে কয়েকটি এমন ছবিও আছে যার ঐতিহাসিক মূল্য যাই থাক না কেন শিল্পগত মূল্য কিছুই নেই। কয়েকটি ছবি তো নেহাৎ ক্যালেণ্ডারের ছবির পর্যায়ে পড়ে। এ ধরণের ছবির অন্তর্ভুক্তির ফলে প্রদর্শনীর মান কী বেড়েছে?

সমগ্র ভাবে প্রদর্শনীটি দেখে আমার একটি কথা মনে হয়েছে। তা এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা। কথাটি হচ্ছে যে স্বাধীন শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন বাদে কারুর ছবিতেই কল্পনার আশানুরূপ বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছিনা। একদা কোলকাতা আধুনিক চিত্রধারার অন্যতম লালনক্ষেত্র ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে এখন যেন কোলকাতার তরুণ শিল্পীরা বিমিয়ে গেছেন। যে দুঃসাহস তারুণ্যের পরিচায়ক কোথায় সে দুঃসাহস? কোথায় সে উদ্দীপনা?

তবে অন্যান্য বারের তুলনায় এবারকার প্রদর্শনী ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ নির্বাচক মণ্ডলী যে খোলা মন নিয়ে আধুনিক চিত্রধারার ছবিগুলির বিচার করেছেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এজন্য তাঁরা প্রশংসার্হ। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে নূতনকে স্বীকৃতি জানাবার এই মনোবল যেন তাঁদের অক্ষুণ্ণ থাকে এই কামনাই করছি।

বিজ্ঞপ্তি

গ্রাহক গ্রাহিকা যাঁরা এখনো তাঁদের বাকী চাঁদা দেননি তাঁদের নিকট সবিনয় অনুরোধ, অবিলম্বে তা পরিশোধ করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

কার্যাধ্যক্ষ

মিশরান্বয়

বিশ্বমুক্ত

বৃটেন-মিশর

সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ কৌত্রীর কাছে জরুরী সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ সেলউইন লয়েড এই মর্মে যে প্রস্তাবিত ইঙ্গ-মিশরীয় আর্থিক চুক্তি সম্পাদন কালে ইঙ্গ-আরব কূটনৈতিক সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন যাহাতে চুক্তির ধারাগুলি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক্রিয়া পূর্ণভাবে কার্যকরী করা যদি একান্তই অসম্ভব হয় তবে আংশিক ভাবেও যাহাতে তাহা করা হয় বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাহার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। ইরাকী-প্রধান কাশেমকে ছাড়িয়া প্রেসিডেন্ট নাসেরকে তোয়াজ করিবার পরও দেখাযাইতেছে ইংরাজের নিজের প্রয়োজনে তাহা বুঝিতে মিশরের বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাই আজ মিঃ সেলউইন লয়েডের প্রস্তাবের জবাবে প্রেসিডেন্ট নাসের সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে অর্থনৈতিক চুক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক কূটসম্পর্কের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন জড়িত করা চলিবে না। দুইটিকে বিচ্ছিন্নভাবেই দেখিতে হইবে। আর্থিক চুক্তির ধারাগুলি চালু করিবার আহিলায় কোনও প্রকারে মিশরের ভূখণ্ডে ইংরাজকে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ করিতে দিতে তাহারা রাজি নয়। মিশর সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছে অর্থনৈতিক চুক্তির কার্য প্রথমে মিটিয়া যাক্। তারপর ইহার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীভাবের আদান প্রদান হওয়া স্বাভাবিক। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা তখন ধীরে সুস্থে ভাবা যাইবে। তৎপূর্বে এ সম্বন্ধে যে কোন প্রস্তাব তাহারা প্রত্যাখ্যান করিবেন। তা ছাড়া, ইহার সহিত আরও গভীর নৈতিক প্রশ্ন বিজড়িত। সুয়েজ আক্রমণের প্রতিবাদে অন্যান্য মিত্র রাষ্ট্র যাহারা বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদন করিয়াছিল এ ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করাও প্রয়োজন। যদিও তাহাদের সঙ্গে এবিষয়ে যোগাযোগ করা হইয়াছে তবুও সমস্ত ব্যাপারটা গুছাইয়া লইয়া একটা বিধিবদ্ধ রূপ দান করিতে খানিকটা সময় লাগিবে। জাগ্রত মধ্য প্রাচ্য পোড়-খাওয়া লক্কর মতন সিঁদুরে মেঘকে স্বভাবতঃই ভয় পায়। নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত মিশর তথা সংযুক্ত আরবগোষ্ঠী বৃটিশ কূটনৈতিক ফাঁদে অসহায়ের মতন পা দিবার মতন নির্বোধ আর নয় পশ্চিমী গোষ্ঠীর এ চৈতন্য উৎপন্ন করিবার মতন দৃঢ়তা আজ তাহারা দেখাইয়াছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ অর্থনৈতিক চুক্তি প্রয়োগ-কার্যে সহায়তা করিবার জন্য একটি 'মিশনকে' কাইরো নগরে অবস্থানের মঞ্জুরী মিলিয়াছে কিন্তু কূটনৈতিক মর্যাদা উহাকে দেওয়া হইবে না এই সর্তে, এবং সংযুক্ত আরব গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মন্ত্রী মিঃ কাইসুনী চুক্তিনামা সহি করিবার কাজে ইতোমধ্যে দামাস্কাস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

ত্রিলঙ্কী রাজনীতির অন্তর্থ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশক অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে পৌরবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের যৌথ স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া আজও বিশ্বত বোধ করিয়া। বিগত ১৯৫৮ সালে পরপর কয়েকটি প্রাক্তন একনায়ক-তন্ত্রের আকস্মিক উদ্ভব অভ্যুত্থান ও অবলোপ কয়েকটি রাষ্ট্রের যৌথ

স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধ করিয়াছে তাহাতে দুঃখ বোধ করিয়াছি কিন্তু আশ্চর্য হই নাই। দুঃখ শুধু নয়, আশ্চর্য বোধ করিবার মতন ঘটনা পর্তুগালের জেনারেল দেলগাদো সংক্রান্ত ব্যাপার। একথা সত্য যে পর্তুগালের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা কোন কালেই খুব উচ্চ স্তরের ছিল না। তবুও খাস ইউরোপ খণ্ডে নৌহ আবেষ্টনীর বহির্ভূত একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ মধ্যযুগীয় বৈরতন্ত্রের উর্ধ্বে উঠিতে পারিল না অথচ জেমোক্রাটিক রাষ্ট্র গোষ্ঠির মধ্যে তাহার একটি আসন রহিয়াছে ইহাই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। গোয়ার ব্যাপারে নিজের সরকারের গোঁয়ার্তুমি প্রত্যক্ষ করিবার দুর্ভাগ্য আমাদের হইয়াছে: তাহা না হয় মানিয়া লইলাম, কারণ দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক উপদ্রব ভোগে অত্যন্ত রাষ্ট্রটির রাষ্ট্রচেতনা মধ্যযুগের স্বার্থবুদ্ধিরায় গভীরভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে কিন্তু নিজের দেশে নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী সালাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মতন দুঃসাহস হইয়াছিল বলিয়া জেনারেল দেলগাদোকে সর্বপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াও সালাজার গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার খবরাখবর ব্ল্যাক-আউট করিয়াছে। ব্রেজিলিয়ান আম্বেসাডে রাজনৈতিক আশ্রয়ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন দেলগাদো, এমনই ভীষণ প্রতিশোধ-প্রবণ পর্তুগীজ গবর্ণমেণ্ট। এই সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট বিবৃতি দিবার জন্য বিরোধীদলের পক্ষ হইতে একটি প্রেস কনফারেন্স ডাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। খবরে প্রকাশ সালাজার সরকারের নির্দেশে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, কল্পিত বিপদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা সমর্থন করিবার আছিলায় বিরোধীপক্ষ জনমতকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিতে পারেন সে সম্ভাবনা নিবারণের জন্যই এই বাক্-স্বাধীনতা হরণ করা হইল। পুরাপুরি জঙ্গী একনায়কত্ব এর চাইতে এক পক্ষে ভাল। সে স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বলিয়া খোলাখুলি স্বীকার করে এবং তদনুসারে তাহার কার্যক্রম নির্ধারণ করে। কিন্তু এই ঘুঘু পর্তুগালী শাসনতন্ত্রের সঙ্গে বৈরতন্ত্রের তফাৎ কোথায়? নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নামে এই ধাপ্পাবাজি আর কতকাল লোককে প্রতারিত করিতে থাকিবে?

একবিংশতি কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস

দীর্ঘ তিন বৎসর অন্তে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির একবিংশতি অধিবেশন মস্কোতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ তিনটি বৎসরের ইতিহাস সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজিকার সোভিয়েত রাষ্ট্রে ষ্টালিনের স্থলবর্তী হিসাবে ক্রুশ্চেভের উত্থান ও শক্তি সংঘটন এবং বলিতে গেলে একনায়কত্ব গ্রহণ এই তিন বৎসরের ইতিহাসের মুখ্য ঘটনা। বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের সেই যুগান্তকারী "গোপন বক্তৃতা" হইতে যে নূতন ঘটনা প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সোভিয়েত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অগ্রগমন-পশ্চাদপসরণের কুটিল বন্ধুর পথ বাহিয়া অগ্রসর হইয়াছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এবং এককথায় বলিতে গেলে আজিকার ক্রুশ্চেভী একনায়কত্ব ষ্টালিনী একনায়কত্বকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ক্ষমতার লড়াইয়ে ষ্টালিনী ধারার উত্তরাধিকারীরা শুধু পরাস্ত হয় নাই, পর্যুদস্ত হইয়াছে—এমনকি রাজনৈতিক ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তির অপরাধ ঘটেনা। তিন বৎসর পূর্বে সেদিন বিংশতি কংগ্রেসের অধিবেশন কালে ক্রুশ্চেভ তাহার গোপন বক্তৃতায় ষ্টালিন-বিরোধী তথ্য উদ্ঘাটন করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার স্বপক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে রেজুলুশন পাশ হয় তাহাতে ভোটসংখ্যার আধিক্য খুব বেশী ছিল না। প্রায় সমসংখ্যক

সহকারী লইয়া মলোটোভ ও কাগানোভিচ্ প্রমুখ ষ্টালিন অনুরাগীরা ইহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, একথা সত্য যে, সেদিন সেই ঘৃণাত্মকারী ষ্টালিন-বিরোধী বক্তৃতায় ষ্টালিনের ব্যক্তিগত সমালোচনার প্রশ্ন পরোক্ষভাবে মাত্র জড়িত ছিল। আসল যে প্রশ্নটি তাহার উপর নির্ভর করিতেছিল তাহা তখনকার সোভিয়েত রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ভবিষ্যত এবং ষ্টালিনের পার্শ্বচর রাষ্ট্রধুরন্ধর-গণের নেতৃত্ব। যতদিন এই নেতৃত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নাই ততদিন ক্রুশ্চেভ প্রবর্তিত নতুন ব্যবস্থা চালু করিবার দুরতম আশাও ছিল না। 'জগৎ-জোড়া' ভার লইয়া ষ্টালিন-পন্থী ও ক্রুশ্চেভ-অনুসারীরা নিজেদের ঘর গুছাইতে সুরু করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে পোলাণ্ড ও হাঙ্গারীতে ১৯৫৬ এর অক্টোবর ও নবেম্বরে নতুন করিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। ষ্টালিনপন্থীরা সুযোগটির সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না—ক্রুশ্চেভকে প্রতিবিপ্লবী এবং এই সব গোলযোগের কারণ বলিয়া প্রচার করিলেন। সাবধানী ক্রুশ্চেভ অতিসন্তর্পণে পদ্ধা-পসরণ করিলেন। এদিকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ষ্টালিনবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ চালাইতে থাকিলেও শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় তখনও ষ্টালিনী বেষ্টনীর মধ্যে অনড়ভাবেই বাস করিতেছিল। মলোটোভ ও কাগানভিচের অনুসারী ষ্টালিনিষ্টরা সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ-সম্মান আংশিকভাবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক। ক্রুশ্চেভীনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। কারখানার শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবী ও কৃষি-কর্মীদের মধ্যেও। বুদ্ধিজীবী মহলে যে ষ্টালিন-বিরোধী মতবাদ বহুপূর্বেই রূপ নিয়াছিল শ্রমিক কৃষকের যোগদানের ফলে তাহার কার্যকারিতা ও শক্তি অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ষ্টালিনবাদের উপযোগিতা অস্বীকৃত হইল এবং উভয়ক্ষেত্রেই নববিধানের দাবী স্বীকৃত হইল। সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়করণ ছিল ষ্টালিনতন্ত্রের মূল কথা। নূতন বিধানে আঞ্চলিক অর্থনীতি কাউন্সিলের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইল। ফ্যাক্টরী কাউন্সিল ও ফ্যাক্টরী কমিটির হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইল। ষ্টালিনবাদীরা দেখিলেন অবিলম্বে এই ব্যবস্থার অবসান না ঘটাইতে পারিলে ষ্টালিনতন্ত্র লোপ পাইয়া যাইবে। মলোটোভ কাগানভিচ মল্লিক অংশ গ্রহণ করিলেন, নিজির সহযোগিতা মিলিল ম্যালেনকভ, শেপিলভ ও বুলগানিনের নিকট হইতে। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিলেন ষ্টালিনবাদীরা এবং অবিলম্বে ক্রুশ্চেভকে পার্টির প্রথম সেক্রেটারীর পদ হইতে অপসারিত করিলেন। ক্রুশ্চেভ অনন্যোপায় হইয়া খোদ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে আপীল করিলেন এবং শুধু যে নিজ পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন তাহাই নয় মোলোটভ, কাগানভিচ ও ম্যালেনকভকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ হইতে বিতাড়িত করিলেন। ষ্টালিনবাদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে নিঃসংশয়িত ভাবে জয়ী হইলেন ক্রুশ্চেভ। মার্শাল জুকভ এ যুদ্ধে ক্রুশ্চেভের সহকারিতা করিয়াছিলেন কিন্তু অত্যল্পকাল পরে কেন্দ্রীয় কমিটির রোষ জুকভের উপর পড়ে এবং ক্রুশ্চেভের অগ্রগমনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। আজ সোভিয়েত রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি ক্রুশ্চেভ একবিংশতি কংগ্রেসের উদ্বোধন করিয়াছেন। লেনিনী আমলের পর এই প্রথম বাহিরের সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার মিলিয়াছে কংগ্রেস অধিবেশনে। যদিও কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য সোভিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বিধিমত ভাবে অনুমোদন করাইয়া লওয়া তাহা হইলেও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ-ভাষণে সোভিয়েত মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন বিশ্বব্যাপী স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটানো আশু প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার কথাও তিনি জোরের সঙ্গে

অস্বীকার করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলাকে যুক্ত করার দাবী তিনি জানান এবং বলেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তব্য তাহার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান পশ্চিমী রাষ্ট্র গোষ্ঠিকে অর্থনীতি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে পেছনে ফেলিয়া অধিকতরবাদী নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সবচেয়ে কম খাটিয়া সবচাইতে বেশী উপার্জন করিবে সোভিয়েত শ্রমিক। সোভিয়েটের প্রতিটি পরিবার একটি পৃথক ফ্লাট পাইবে বাস করিবার জন্য। ভোগপণ্যের উৎপাদন পরিমাণ ও প্রকার বৃদ্ধি ও এই সাত-শালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত শ্রমিকের আয় গত ১৯৪০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে এবং এই সময়ে কৃষকের আয় ও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া তিনি সগর্বে প্রকাশ করেন। কিন্তু বহির্বিশ্বে এই পরিমাণ আবৃদ্ধি এমন একটা বিশেষ কৃতিত্বের সূচক বলিয়া মনে করা হয় না, তবে খাদ্যসমস্যা জর্জরিত ভারতের কাছে সোভিয়েত শস্য-উৎপাদনের হিসাবটা সত্যই উৎসাহব্যঞ্জক। প্রকাশ গত পাঁচ বৎসরে এই খাতে সোভিয়েত উৎপাদন ৩৯ শতক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপসংহার বাণীতে ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন পশ্চিমী ক্যাপিট্যালিষ্ট অর্থনীতির সঙ্গে কম্যুনিষ্ট অর্থনীতির এই প্রতিযোগিতা—শান্তির জন্য প্রতিযোগিতা, পৃথিবীকে সুন্দরতর ও মহত্তর করিবার প্রতিযোগিতা।

২৭।১।৬০

এদের ভবিষ্যত জীবন বীমার দ্বারা সুরক্ষিত ও আনন্দময়

দূরদর্শী ব্যক্তি তাঁর পরিবারের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জীবন বীমার সাহায্য নেন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

বর্তমান প্রসঙ্গ

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের লোকান্তর

মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মনীষী ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লোকান্তরিত হয়েছেন। স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান-বিদ্যার সংগঠনে এই অনন্যসাধারণ বিজ্ঞান-প্রতিভার অকাল ও অপূর্ণ অবসানে পরিকল্পনা-প্রয়াসী ভারতের যে ক্ষতি হল তা' সহজে পূর্ণ হবার নয়। একই বিজ্ঞানীর মধ্যে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-প্রতিভার সঙ্গে সূক্ষ্ম বিজ্ঞান সংগঠকের সমন্বয় খুব বেশি ঘটে না। ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ ছিলেন বিজ্ঞান ক্ষেত্রে উচ্চমানের মননা ও রচনার এক অপূর্ব সমন্বয়। ডাঃ ঘোষের মহত্ত্বাক্ত গভীর স্বদেশ প্রীতির পটভূমিতে এই সমন্বয়ের মূল্য মহত্তর হয়ে উঠেছিল। আজ দেশের একটি গুরুতর অভাব ঘটল।

ডাঃ ঘোষের প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রটি সারা ভারতের মধ্যে বিশেষ এক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ডাঃ ঘোষের পরিচালনায় তড়িৎ বিশ্লেষণ, ফটো-রসায়ন, ফটো সংশ্লেষণ, কৃত্রিম তেল উৎপাদনে সংযোগ অনুঘটক প্রয়োগ এবং অন্যান্য বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উচ্চাঙ্গের গবেষণা হয় তার ফলে ভারত ও বিশ্বের রসায়ন নানাভাবে সমৃদ্ধ হয় এবং বহু ছাত্র ডাঃ ঘোষের সাহচর্যে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হন।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রায় ২০ বৎসর যুক্ত ছিলেন এবং বাস্তব পক্ষে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ, প্রেরণা ও সংগঠনের প্রধান উৎস।

ভারতের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তথা বাঙ্গালোরের সায়েন্স ইন্সটিটিউটকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করে ডাঃ ঘোষ নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন। যাদবপুরে স্থাপিত ভারতের প্রথম টেক্‌নলজিকেল বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনের কৃতিত্বও ডাঃ ঘোষের। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রীত্বকালে ডিরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রিস্ রূপে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। পরবর্তী কালে স্বল্পকালের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি জরাজীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সার্থক ভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন। ছাত্রদের জন্য "হুতেন্স্ হোম" প্রতিষ্ঠায় যে পরিকল্পনা তিনি রচনা করেন তা' বাংলার ছাত্র-জীবনের সমস্যা সমাধানের একটি বিশেষ কার্যকরী পন্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ডাঃ ঘোষের সকল কার্যের প্রেরণা ছিল তাঁর গভীর স্বদেশ প্রেম। এই প্রেরণার জন্যই ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও কারিগরী বিদ্যার প্রসারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এ জন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ডাঃ ঘোষকে জাতীয় কমিটিতে অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ ঘোষ কোন সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেননি, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃবর্গ ও সৈনিকেরা ডাঃ ঘোষের অকৃত্রিম সহায়তা

ও সহানুভূতি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা হলে প্রত্যেক পাকাকালে ঢাকা সহরে বিপ্লববাদী আন্দোলনের সংগঠন অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা হলের বহু ছাত্র এই বিপ্লববাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। স্বর্গীয় বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে সোন্যাল ওয়েল ফেয়ার লীগ, নামে যে সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন তিনি ছিলেন তার প্রথম সভাপতি। গঠনমূলক কর্মীরাও নানাভাবে ডাঃ ঘোষের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করতেন। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাসায়নিক ও বিজ্ঞান-বিদ্যার সংগঠক এবং সেই সঙ্গে অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, অমায়িক আচরণ এবং গভীর মানবতা-বোধের অধিকারী হিসাবে তিনি ছিলেন তুলনাহীন।

একটি ঘটনায় সারা দেশ অত্যন্ত দুঃখ বোধ করবে। এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেস যেদিন সুরু হয় সেই দিনই ডাঃ ঘোষ পরলোক গমন করেন। কিন্তু ডাঃ ঘোষের জন্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ও বিজ্ঞান বিদ্যার উচ্চতম পদাধিকারীর প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই ঔদাসীন্য কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

পরলোকে শ্রীকামিনীকুমার দত্ত

দেশবিভাগের পরেও দেশত্যাগ না করে পূর্ব বাংলায় যেকয়জন নেতা নিজের জন্ম ও কর্মভূমিতে অবিচলিত ছিলেন, পূর্ব-বাংলার কামিনীকুমার দত্তের নাম তাঁদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কামিনীবাবুর স্বাধীনতা-অর্জন সবাই দেশভাগের আগে থেকেই কলকাতায় বসবাস করেন এবং তাঁরা একটা বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিল এসব আকর্ষণ এবং বৃদ্ধ বয়সের শান্তি ও স্বস্তির সকল সুযোগ ও সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে তিনি কুমিল্লাতে নিজের কর্মক্ষেত্রে একাই বসবাস করেছেন এবং পূর্ব বাংলার জন-জীবনে নানা ভাবে অগ্রণী নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কামিনীবাবু পাকিস্তান রাজনীতিতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত সংকট পূর্ণ পরিবেশকে অস্বীকার করে কামিনী বাবু যে ভাবে স্বদেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন তা' এক স্মরণীয় নিদর্শন হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

শ্রীচন্দ্রশেখরকরের দেহান্তর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দানের পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীচন্দ্রশেখরকরের জীবনাবসান ঘটে। বাংলা দেশে এসে স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার আগেই শ্রীচন্দ্রশেখরকরের জীবনাবসান ঘটায় বাংলা দেশের জনসাধারণ বিশেষ ভাবে দুঃখবোধ করবে। বোম্বে কর্পোরেশন, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য রূপে এবং বোম্বে হিন্দু-বালিকা সংঘের সভাপতি ও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত থেকে শ্রীচন্দ্রশেখরকর শিক্ষা ও শিল্প জগতে এক ব্যক্তিমান পুরুষ রূপে সুপরিচিত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রদের শাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার কারণ নির্দেশ করে শিক্ষা ব্যবস্থা ও এই ব্যবস্থার পদাধিকারীদের উপরে যে দায়িত্ব তিনি আরোপ করেছেন তা' শ্রীচন্দ্রশেখরকরের স্বাধীন ও বলিষ্ঠ মনের নিদর্শন হয়ে থাকবে।

বাগনান উপনির্বাচনের ফল

বাগনানের নিয়তম হর সম্বন্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও বাগনানের কৃষি-প্রধান ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছে। কম্যুনিষ্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীর সংযুক্ত ভোটের প্রায় সমান ভোট পেয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী। এই অপ্রত্যাশিত ও বিপুল ভোটে কংগ্রেসের জয়লাভের কারণ ফলে একদিকে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা-বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে তথাকথিত বামপন্থী দলের অনৈক্যের প্রতি নির্দেশ করার চেষ্টা হয়েছে কোন কোন মহলে। নির্বাচনী প্রচারের সময় নির্বাচক-মণ্ডলীর মনোভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী না থাকলে কংগ্রেস প্রার্থী আরও বেশি ভোটে জয়লাভ করতেন।

বিভিন্ন বামপন্থীদল কর্তৃক সমর্থিত হয়ে কম্যুনিষ্ট প্রার্থী অমল গাঙ্গুলী প্রায় ১০,০০০ ভোটাধিক্যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে বাগনান কেন্দ্রে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীন দলাদলি, অমল গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির ফেহার, অমল গাঙ্গুলীকে পদত্যাগে বাধ্য করা, আবার অমল গাঙ্গুলীকে দলে টেনে উপ-নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করা—দলীয় রাজনীতির এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও নীতিহীন আচরণে বাগনানের জন সাধারণের মনে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি এক গভীর বিরূপতা সৃষ্টি হয়। কোন নির্বাচনেই বাংলার কম্যুনিষ্ট দল এত নেতা, কর্মী ও অর্থ-নিয়োগ করেনি যা তারা করেছে এবারের বাগনান উপনির্বাচনে। জন-সাধারণের বিশেষ বিরূপতা সত্ত্বেও নিছক সংগঠনের শক্তিতে তের হাজার ভোট পাওয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

বাগনানের ভোটারদের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব এবারও নির্বাচনের প্রচারে সুস্পষ্ট ছিল কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর অর্থ ও সংগঠন শক্তি এত ক্ষীণ ছিল যে এই শক্তি দ্বারা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থীকে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর পক্ষে পরাজিত করা সম্ভব হবে একথা শেষ পর্যন্ত বাগনানের নির্বাচক মণ্ডলী বিশ্বাস করতে পারেনি। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ এবং কম্যুনিষ্ট-পার্টি-বিরোধী তীব্র মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ কংগ্রেস গ্রহণ করে। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী না থাকলেও এবারে কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে জয়লাভ করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল বলে আমরা মনে করি না।

বামপন্থীদলগুলির বিচ্ছেদের জন্য বাগনানে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে একথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি বামপন্থী ঐক্যের নামে নেতিবাচক রাজনীতির গতি বাংলা দেশে আর কতদিন চলবে সেকথা আজ গভীর ভাবে ভাব বার দিন এসেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। কিন্তু একমাত্র কংগ্রেস শাসনের প্রতি বিরোধিতাকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন দলের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপন্থাহীন রাজনীতিকে চলতে দেওয়া বাংলা দেশের পক্ষে কল্যাণকর কিনা সেকথা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, আজ বিশেষ ভাবে ভেবে দেখতে হবে। রাজনৈতিক আদর্শবাদের অস্পষ্টতা গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চারের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধক একথা স্মরণ করা আজ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

চাল-সংকটের চাল

খোলা বাজার থেকে চাল প্রায়-সর্বত্র উধাও হয়েছে। তার ফলে জনসাধারণ এক চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমানে চালের কোন অভাব নেই। নতুন চাল উঠেছে এবং কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের জন্য দিল্লীথেকে চাল ও গম আমদানী হচ্ছে। তবু চাল দুষ্প্রাপ্য হয়েছে চক্রান্ত ও অসহযোগীতার জন্য। সরকার চালের যে উচ্চতম দর বেঁধে দিয়েছেন সেই দর আরও উচ্চতর করার জন্য বাজার

থেকে চাল অপসারিত করে চালের এক কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি-করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা যে মুনাফার লোভে এরূপ চক্রান্ত সৃষ্টি করবে সেকথা অজানা ছিল না। চাল ব্যবসায়ীদের এরূপ অসামাজিক চক্রান্ত ব্যর্থ করার উপায় :

প্রথমত, মুনাফা ও মজুতবিরোধী আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা এবং মজুত 'চালের সন্ধানের ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগীতা আহ্বান করা.

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক ভাবে চাল সংগ্রহ করে আরও ব্যাপকভাবে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা,

তৃতীয়তঃ, চালের কলগুলি যখন তবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে চালনা করা :

আমরা মনে করি জনসাধারণের সহযোগিতায় রাজনৈতিক দলগুলির অগ্রণী হয়ে চক্রান্তকারী চাল ব্যবসায়ী ও চালের মজুত সন্ধান করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন করা প্রয়োজন।

নাগপুর কংগ্রেস

নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসী মহলে খুব সোরগোল পড়েছে। চাষের জমির উচ্চতম সীমা বেঁধে দিয়ে সমবায় প্রথায় কৃষি পরিচালনার নীতি এবারকার কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটিতে নূতনত্বের কিছু নেই। প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি বহুবার এরূপ প্রস্তাব পাশ করেছে এবং তিন হাজার অধিবাসীর গ্রামে এই নীতি অনেকাংশে কার্যকরী করা হচ্ছে। যথার্থই যদি কংগ্রেস কৃষি উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে থাকে তবে এবার বছরের পরেরবছরের পরে আমরা আশা করি নাগপুরের প্রস্তাবটি নিয়ে বাগাড়ম্বরের পরিবর্তে অবিলম্বে একে কার্যকরী করবার জন্য আশু ও তরান্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রাদেশিক সরকারের প্রতিক্রিয়া

রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য নিয়ে কেরলীর উন্নয়নের চেষ্টা করবেন বলে কেরলার মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ ঘোষণা করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁর কম্যুনিষ্ট পার্টির একদিনের কংগ্রেসে যোগদানের জন্য রাশিয়ায় গিয়েছেন। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের প্রচেষ্টার উপরই হস্তক্ষেপ অধিকার কোন্ সরকারের?—কেন্দ্রীয় না প্রাদেশিক? নাম্বুদ্রীপাদ মহাশয় এমনভাবে তাঁর সাহায্যের বিষয়টি নিয়ে বাগাড়ম্বর সুরু করেছেন যে এর পিছনে শুধু যে রাজনৈতিক অভিসন্ধির সন্ধান পাওয়া যায় তাই নয়, সেই সঙ্গে অর্ন্তরাষ্ট্রীয় সংযোগ ও সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের অধিকারকে সমান্তরালে স্থান দেওয়ারও একটি সুকৌশলী প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি ভারতের পররাষ্ট্র নীতির একতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এ সম্বন্ধে দিল্লীর নীরবতা বিস্ময়কর।

শিক্ষা

জীবন ও জীবিকা যে পরস্পর প্রতীবদ্ধ এই সহজ ও মূলগত কথাটির স্বীকারের অভাব সর্বত্র। শিক্ষা নিয়ে গত এগারো বছরেও সুস্পষ্ট একটী লক্ষ্য ও নীতি স্থির হোলোনা। গত জানুয়ারির মাঝামাঝি মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শ বোর্ডের অধিবেশনে আর একবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে স্বাভাবিক কোনো যোগ নেই, যাতে একটী ব্যক্তি প্রাথমিক থেকে ধাপে ধাপে উচ্চ শিক্ষা লাভ অথবা কিছুদূর মাধ্যমিক শিক্ষা-অন্তে জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। মাদ্রাজের বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালি জানিয়েছেন তৃতীয় পরিকল্পনার পূর্বে ১১ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সম্ভাবনা

নেই। এর ফলে ১২-১৫ বছরের বয়সের বাধ্যতামূলক শিক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে এবং সংবিধানের নির্দেশমতো মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের তারিখকে আরো ছয় বৎসর পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

• মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিবিধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ১৫ বৎসরের পূর্বে সম্ভব নয়। ফলে এই ১৫ বৎসরে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষা একটা অব্যবস্থার মধ্যে কাটাবে এবং তার ফলে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সঙ্কট আসতে বাধ্য। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হ্রাসের উদ্দেশ্য নিয়ে যে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে শিক্ষা সঙ্কোচ ঘটে বহু তরুণের জীবনকে বিড়ম্বিত করবে। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে যারা ডাক্তারি অথবা শিল্প শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করবে তাদের কর্মে নিয়োগের জন্য যে বহু সংখ্যক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজন, যেসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে তার কোনো নিদর্শন নেই। অর্থাৎ শিক্ষা সংস্কারের নামে শিক্ষাসঙ্কোচ ঠিকই ঘটবে আর বহুসংখ্যক তরুণের ভবিষ্যৎ অর্ধ-শিক্ষা ও বেকারিত্বের হতাশার মধ্যে নষ্ট হতে থাকবে। অথচ শিক্ষার এই অবস্থাতেও যে অর্থ, শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তার শতকরা ৬০ ভাগের বেশী নাকি অনেক রাজ্যেই ব্যয় করা সম্ভব হয় না। অদ্ভুত দেশ এই ভারতবর্ষ!

স্বাস্থ্য

গত জানুয়ারীতে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিলের সভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মিঃ ডি. পি. কারমাকার এবং জয়পুরের রাজপ্রমুখের গভর্ণর মিঃ সবুরুখ নিহাল সিং চিকিৎসকদের একটা সংস্থার ও আয়ুর্বেদিক কাউন্সিলের ও নর্থরোলোজিকেল সোসাইটির যুক্ত অধিবেশনে, ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অবস্থার যে চিত্র বিশ্লেষণ করেছেন তাও দুঃখজনক। দারিদ্র্যের জন্য যে দেশে খাদ্যের অর্ধ জোটেনা সেখানে অল্পমূল্যে চিকিৎসার ও ঔষধের অর্থ জুটবে এটা অবিশ্বাস্য। কাজেই জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় শ্রেণীর অনিবার্য ভাবে হ্রাস হওয়া কিন্তু এ অবস্থাতেও ২য় পরিকল্পনার বিভিন্ন রাজ্যে স্বাস্থ্যের খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ সনে তার ৫০ ভাগ মাত্র একটী রাজ্যে এবং ৪টী রাজ্যে ৬০ ভাগ ও অন্যান্য রাজ্যগুলিতে মাত্র ৩০ ভাগ ব্যয়িত হবে। আর পরিবার-পরিকল্পনার খাতে বরাদ্দ অর্থের মাত্র ৭ ভাগের বেশী ব্যয় করা সম্ভব হবে না। অথচ মাতৃকেন্দ্র কলেজের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীন স্বাস্থ্যের অবস্থা চিরাচরিতই থেকে গেছে শুধু তাই নয়, সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবও উল্লেখযোগ্যভাবে দূর হয় নি। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আবশ্যিক ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাতে সকল পাওয়া নিশ্চিত, অথচ তার ব্যবস্থা আজও হয় নি। ম্যাট্রিকেল গ্রেজুয়েটদের অন্তত এক বৎসরের জন্য গ্রামে অবস্থান বাধ্যতামূলক করার যে প্রস্তাব পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিকে তা করা হয় তবে গ্রামের স্বাস্থ্য ও তার পরিবেশে উন্নতি ঘটবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বন্ধকারখানা

বাংলা থেকে প্রায় ২০০ উদ্বাস্তুদের প্রথম দল বন্ধকারখানার উদ্দেশে রওনা হয়েছে কেরালায় প্রথমে। "নূতন বাংলা জিন্দাবাদ" ধ্বনি ছিল তাদের মুখে। যারা সাহস ও দৃঢ়তার সহিত অনিশ্চিতকে বরণ করবার জন্য যাত্রা করেছে, তাদের প্রতি মনোভাব অভিনন্দনযোগ্য। যারা অন্যের কাজের ফলে শত শত বৎসরের ভিটেমাটি ছেড়ে বাংলার ক্যাম্পে অশেষ লাঞ্ছনা, অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে বছরের পর বছর বাস করছে, যারা অন্যত্রে নূতন পরিবেশে, নূতন ভাগ্য তারা

ছিনিয়ে আনতে পারে কিনা তার পরীক্ষা হওয়া নিঃসন্দেহে ভালো। খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে মানুষ নিজের ভাগ্যকে জয় করতে যে ক্ষেত্রেই এগিয়ে আসুক না কেন আমরা তাকে নিঃসন্দেহে সমর্থন করবো। তবে দুটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি সুস্পষ্ট—এক, জোর করে কাউকে বিদেশে পাঠান এবং এর জন্য পরোক্ষ ভাবে কোনো চাপ দেয়া, অথবা কোনো রঙিন মিথ্যা আশ্বাস তাদের দেয়া হবে না। "নূতন বাংলা" অথবা "বাংলার উপনিবেশ" ইত্যাদি বলাকে আমারা মিথ্যা আশ্বাসই মনে করি কারণ তিনটী বিভিন্ন রাজ্যে ছড়ে ছড়ানো এবং এটা অনিবার্য যে ঐ তিনটী বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা, শিক্ষা-পদ্ধতি জমির অবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো বাংলার উদ্বাস্তুদের জীবনে বিচ্ছিন্নতা আনবেই। কিন্তু এখানে বার বার অর্থহীন প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম ঘোষণা ও সংগ্রামের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর অবাস্তব আশ্বাস দানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও পরবর্তী কালে তার প্রত্যাখ্যান, এই চিরাচরিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা আর দেখতে প্রস্তুত নই। পশ্চিমবঙ্গে জমি আছে সুতরাং এখানেই এদের পুনর্বাসন করতে হবে এবং দাবী —যেখানে এই দাবীকে স্বীকৃতি দেবার পরিবেশ ও ক্ষমতা বিরোধীপক্ষের নেই—ভাগ্য-বিড়ম্বিত উদ্বাস্তুদের জীবনকে আরো অনিশ্চয়তার হতাশা ও অবশ্যম্ভাবী নৈতিক অবনতির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাতে প্রস্তুত নই। একটী প্রাথমিক অন্যায় ও হিমালয় প্রমাণ ভুলের মাশুল দিচ্ছে জাতির এক গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী অংশ—সে দুর্ভাগ্যকে গৌতাসো পুলিত করা যাবেনা কিছুতেই। তবে মানুষ যেন আরো অমানুষ না হয়ে যায়, বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব তার চেষ্টা করাই দেশের ও উদ্বাস্তুদের কল্যাণকামী যারা তাঁদের কর্তব্য। তাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিরোধী দলের নেতারা ওপারে গিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখানকার ব্যবস্থা ও সম্ভাবনা দেখে আসবার ও সমস্ত পরিকল্পনাটী প্রকাশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই রচনাত্মক প্রস্তাব গ্রহণ করছেন না কেন আশ্চর্য!

আর, জি, কর হাসপাতালে ধর্মঘট

ধর্মঘট—বিশেষ ভাবে যানবাহন, হাসপাতাল, শিক্ষায়তন প্রভৃতিতে ধর্মঘট হলে সর্বসাধারণ সাধারণতঃ সহানুভূতির সহিত তা দেখতে পারে না কারণ এই সব ধর্মঘটে সর্বসাধারণের অশেষ অসুবিধা হয়। কিন্তু ধর্মঘটীদের সিদ্ধান্তের যথার্থ কোনো কারণ আছে কিনা তার অনুসন্ধানও সমাজ-সচেতন ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার করে দেখা উচিত। সমাজের কোনো একটী অংশ সব রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করেও অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করবেনা আর আমরা তাদের বঞ্চনার উপর নিজেদের সুবিধার চাষ করবো এ গণতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র তো নিশ্চয়ই নয়। কাজেই আর, জি, কর হাসপাতালে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটের ফলে একদিকে রোগীদের, বিশেষ করে, দুরারোগ্য—রোগী প্রকৃত অসুবিধা ঘটছে। অন্যদিকে প্রায় চারশত ছাত্রছাত্রী নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে পরীক্ষা দেবার অধিকার থেকে বাদ পড়বার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। যে সকল প্রতিশ্রুতি হাসপাতাল-কর্মচারিদের সরকারি ভাবে দেয়া হয়েছিল এক বৎসরেও তা চালু করা হয়নি। তারপর যখন কর্মচারিরা বাঁচার প্রয়োজনে ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছে "তখন জন-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট সরকার বরদাস্ত করবেন না" ও "ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করা হবে" বলে হুমকি দিয়েছেন। জন-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার এটাই কি উপযুক্ত পরিবেশ ও পন্থা! আমরা অবিলম্বে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এই ধর্মঘটের সন্তোষজনক অবসান দাবী করি। ৩২।৩

২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এম্‌এ কর্তৃক মুদ্রিত ও ৪৭-৬, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৯) কর্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA
7503
.05 9/14

উত্তরসূরী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। একাদশ সংখ্যা। ফাল্গুন, ১৩৬৫।

বর্তমান প্রসঙ্গ

বেরুবাড়ী হস্তান্তর

বেরুবাড়ী নিয়ে বাংলার মনবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বেরুবাড়ী হাতান্তরিত হলে কয়েক লক্ষ লোক আবার উদ্বাস্তু হবে—এটাই বেরুবাড়ী হস্তান্তরের মূলপ্রশ্ন বা সমস্যা নয়। গোটা বাংলাই তো আজ ছিন্নমূল, না হয় আরও কয়েক হাজার ছিন্নমূলের সংখ্যা বাড়বে; কিন্তু মূল প্রশ্ন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা নিয়ে। আজ জিজ্ঞাস্য ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অধিকার-কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত, সার্বভৌমিকতার অধিকার কেন্দ্রটি কি প্রধানমন্ত্রী নামক ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ, না ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত? ভারতীয় সংবিধান পরিবর্তন না করে কি ভারতীয় রাষ্ট্রের কোন অংশ অন্য রাষ্ট্রকে দান করার অধিকার কোনও প্রধানমন্ত্রীর 'অথবা আর কারো আছে? ভারতীয় জাতীয় সত্তার অবিচ্ছিন্ন সার্বভৌমিকতাকে মুষ্টিমেয় নেতা নামক ব্যক্তিরা পদদলিত করে ভারত ভাগ করে রাষ্ট্র, জাতি ও ইতিহাস-দ্রোহিতার যে কার্যটি করেছেন সেই কার্যের ফলে ক্ষমতাস্ফীতার যে ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হয়েছে সেই ঔদ্ধত্যের জন্যই বেরুবাড়ী হস্তান্তরের চুক্তি করা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

আইনগত প্রশ্নছাড়াও বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিষয়ে জাতীয় মর্যাদার একটি গুরুতর প্রশ্ন নিহিত রয়েছে। ভারতবর্ষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারতবাসীদের একটি নাগরিক গোষ্ঠিকে কোন ব্যক্তির খেয়ালখুশি অনুযায়ী ভিন্নরাষ্ট্রকে দান করা জাতীয় মর্যাদা হানির এক চরম নিদর্শন। শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের পক্ষে এরূপ জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমিকতার হানিকর যে কোনো কাজের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি সমগ্র বাংলা দেশ একযোগে এবং জাতীয় সুরে বেরুবাড়ীর

আন্দোলনকে তীব্রতর করে ভারতীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হবে।

করপোরেশনের নীতি ও উদ্দেশ্য

কলকাতা করপোরেশন পৌর সভার বদলে একটি রাজ-সভায় পরিণত হয়েছে। বাংলার আইন সভারই একটি ছোটখাটো কিন্তু তারচেয়েও বেশি তীব্র প্রতিবিম্বে পরিণত হয়েছে কলকাতার পৌর সভা। দুনিয়ার রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে সর্বভারতীয় এবং সর্বপ্রাদেশীয় রাজনীতি এবং কয়াসী মেয়র ধর্মঘট থেকে আরম্ভ করে কেরলার ধর্মঘট কলকাতা করপোরেশনের সাপ্তাহিক সভায় তার কিছুই বাদ যায় না। এই সব রাজনীতি নিয়ে এমন তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ এবং উক্তি ও কটূক্তির ঝড় বইতে আরম্ভ করে যে, কোনও ক্রমে মাথা ফাটাফাটি না ঘটলেও কথা কাটাকাটির ফলে পৌর সভার পৌর সভ্যের ফাইল গুলি অনেকক্ষেত্রে রক্তাবেদ বহু হয়েই থাকে। বস্তুত, যে উদ্দেশ্যে করপোরেশনের সৃষ্টি ও বর্ধন, কিছুকাল থেকে করপোরেশন সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রধানত রাজনীতি চর্চার, তথা বক্তৃতা রাজনীতি চর্চার, এক বিশেষ আড্ডায় পরিণত হয়েছে। কোন গুরুতর জাতীয় প্রশ্নে করপোরেশন রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করবে না তা নয়। কিন্তু করপোরেশনের মূল ভিত্তি রাজনীতি নয়, পৌর নীতি।

করপোরেশনের উদ্দেশ্য কলকাতার রাস্তা, ঘাট, জল, [illegible], পয়প্রণালী, মাঠ, উদ্যান, বাড়ি-ঘরের পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদির তদারক করা, উন্নতির ব্যবস্থা করা, এক কথায় কলকাতার নাগরিক জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কলকাতার নাগরিকেরা কর দেয় এবং ভোট দিয়ে প্রতিনিধি পাঠায়। স্বার্থনীতি করার জন্য জনসাধারণ ভোট দিয়ে প্রতিনিধি পাঠায় আইন সভায়। কিন্তু পৌর সভাকে আইন সভার 'মক' বা নকল আড্ডায় পরিণত করা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ও ক্ষতিকর। এরূপ রাজনৈতিক বাদবিতণ্ডার ফলে নাগরিক জীবন উন্নয়নের সমস্যা গুলির প্রতি যথার্থ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। বস্তুত, সংবাদপত্রে কলকাতা করপোরেশনের তর্ক-বিতর্ক ও পৌর সভার সভ্যদের আচরণের যে সংবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় তাতে সমগ্রভাবে কলকাতার নাগরিক জীবনের মর্যাদা ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় বলেই দীর্ঘদিন ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত করবেন।

করপোরেশনের নীতি ও কার্যনীতি সম্বন্ধে একটি আচরণবিধি গঠন করার জন্য করপোরেশনের মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেনের উদ্যম প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্য, যদিও ইহা কতটা কার্যকরী করা সম্ভব হবে তা লক্ষণীয়।

মিছিল নগরীই বটে।

সম্প্রতি শ্রীনেহেরু কলকাতাকে মিছিল নগরী আখ্যা দিয়ে উপহাস করেছেন। কিছুদিন আগে তিনি কলকাতার নাম দিয়েছিলেন দুঃস্বপ্নের নগরী। আরো বহুদিন পূর্বে পঞ্চাশের রাজায় বাংলার দুর্ভিক্ষ যখন চরমে তখন বিক্ষুব্ধ সর্দার প্যাটেল বিদ্রূপ করে বলেছিলেন 'বাংলা শুধু কাঁদতেই জানে'। লোক কথায় বলে 'হাতি কাদায় পড়লে চামচিকাও লাথি মারে।'

বাংলা আজ এক চরম দুর্দিনের সম্মুখীন। তার সমাজ জীবন, আর্থিক জীবন, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক জীবন আজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, হতমান। বাংলার স্থান সর্ব-ভারতীয় জীবনে বিশেষ করে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আজ সবার পেছনে। বাংলার কণ্ঠ-আজ দিল্লীর রাজ-দরবারে পৌঁছে না। বাংলা আজ ভাই ভেদ, বিদ্রূপ, পরিহাস, ধিক্কার—নতুবা করুণা উপহাসের পাত্র।

কিন্তু বাংলার এই চরম দুর্গতি, তার এই মর্মভেদী অন্তর্বেদনার জন্য দায়ী কে? যে বাংলা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছে, ত্যাগ ও বীর্যের দীক্ষা দিয়েছে—যে বাংলা ভারতবর্ষকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নব জীবনের আস্বাদ দিয়েছে,—দিয়েছে জাতীয়তা ও আত্ম-মর্যাদাবোধের অবদান, ভারতীয়তাবোধ—যে বাংলার অমর সন্তানেরা অগণিত সংখ্যায় আত্মাহুতি দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামকে করে তুলেছে জাতীয় জীবন-ধর্মের অনপনেয়—যে বাংলার প্রাণবন্যায় ভারতে জাতীয়তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেই বাংলা আজ কার কৃতকর্মে, কার অদূরদর্শিতায় তার জীর্ণ বিকৃত জীবনে অভিশপ্ত হল!

চিত্তের দীনতা, নির্বীর্যতা, ক্লিবতা,—এর একটি অপরাধও বাঙালীর জাতীয়জীবনকে স্পর্শ করেনি। হাঁ, একটি অপরাধ বাঙালী করেছে। বাংলা আত্ম-ভোলা হয়ে সর্বস্ব পণ করে আত্মাহুতি দিয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রামে। বাঙালী পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিল সর্বভারতীয় নেতৃবর্গকে, সেই নেতৃত্বের আদর্শবোধও জাতীয় চরিত্রকে। এই খানেই বাঙালী অপরাধ করেছে, ভুল করেছে—সে আত্ম-সচেতন না হয়ে আত্মভোলা হয়েছিল। আজ ভারতীয় নেতৃত্বারা সর্বচ্যুত হয়ে বাঙালী তার আত্মবিস্মৃতির চরম মূল্য দিচ্ছে। আজ তার জীবন ঘিরে নেমে এসেছে তাই শত বিক্ষোভের শত অভিশাপের, শত উপহাসের কালো ছায়া।

বাংলার এই হীনাবস্থার জন্য সর্ব-দায়িত্ব সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের এবং সেই নেতৃত্বের বন্ধ্যা, স্বার্থপর, অদূরদর্শী, ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতির। সর্বভারতীয় স্বার্থের নামে বাংলাকে বারবার বলি দেওয়া হয়েছে। তারপর আবার তাকেই উপহাস করা হয়েছে। বাংলার বুকে শেষবারের মত পাশব আঘাত হানা হয়েছে তার অবিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবনের ব্যবচ্ছেদে। যে নেতৃত্ব বাঙালীকে চরম বঞ্চনার আঘাতে সর্বস্বান্ত করে পথের ধূলিতে ফেলে দিয়েছে তাদেরই পরম কৃতিত্বের চরম নিদর্শন এই ক্ষত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত, হতাবশিষ্ট পশ্চিমবাঙালীর আশাচ্যুত জীবনের বিকৃত মিছিল!

সর্বভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতির ক্ষমতালিপ্সু কৃপা চক্রান্তে বাংলা আজ ছিন্নমূল, হতমান, আত্মবিস্মৃত, দিশ্‌হারা। কিন্তু বাংলার অন্তরজীবনের প্রাণবত্তার আবেগ এখনও সজীব, সবল ও বেগবান রয়েছে। বাঙালী এখনও জীবনের প্রাণধর্ম হারায়নি। বিক্ষোভের পথ থেকে এই প্রাণের স্রোতকে ফিরিয়ে আনতে হবে সৃষ্টির দিকে, নির্মানের দিকে, আত্মবিশ্বাস, আত্মগর্ব ও আত্ম সচেতনতার দিকে,—নতুন সংকল্পে, নতুন জীবনায়নে দুর্জয় পদবিক্ষেপের দিকে। বাংলা তার আত্মভোলা সর্বত্যাগী অমর সন্তানদের অমর জীবনাদর্শ থেকে এই সংকল্প গ্রহণ করুক,—আবার শব-সাধনা করে বাংলা তার জীবন-সাধনা করবে। বাঙালী তার এই জীবন-সাধনার সংকল্প নিয়েই আবার জবাব দেবে উদ্ধত, অবিশ্বাস্য ও ছলনাহীন দিল্লী নেতৃত্বের!

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

১৯৫৯-৬০ সালের পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে রাজস্ব আয়ের খাতে ৭৯·০৪ কোটি টাকা ও রাজস্ব ব্যয়ের খাতে ৮২·৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমান করা হয়েছে। এই হিসাবে রাজস্ব খাতে ঘাটতি হবে ২·৬৩ কোটি টাকা। কিন্তু রাজস্ব বহির্ভূত খাতে ৪·০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হবার ফলে মোট উদ্বৃত্ত ৪৮ লক্ষ টাকা অনুমিত হয়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালের শুরুতে হিসাবের খাতায় যে ২·২৮ কোটি টাকা জমা পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে এই টাকা যোগ করে বছরের শেষে খাতায় মোট জমা থাকবে ২·৭৬ কোটি টাকা।

১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে আনুমানিক আয় ৬৮·৮৬

কোটি টাকার পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটে ৮১'৫৮ কোটি ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ২'৬১ কোটির পরিবর্তে সংশোধিত বাজেটে ৮০'৭১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। আয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এনেছে বিশেষ করে আন্তঃপ্রাদেশিক বিক্রয়কর ও অন্যান্য বিক্রয় কর। তাছাড়া বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী বা অনুদান। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় খাতি পুনর্গঠন মূলক উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কৃষি খাতে সার বিতরণ বাবদ ব্যয়বরাদ্দ ও জনস্বাস্থ্য খাতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যয়বরাদ্দ।

সরকার পরিচালনার ব্যবসায় পরিকল্পনাগুলিও চৌদ্দটির মধ্যে সাতটিতে এবারও লোকসান দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার ব্যবসা ও সরকারী পরিবহনের একাদিক্রমে লোকসান চলেছে। এই দুইটি ব্যবসায়ে প্রায় নয়টি লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে।

নূতন কর ধার্য করেন নাই বলে অর্থমন্ত্রী আত্মপ্রসাদলাভ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচবছরে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের নূতন কর ধার্য করে ১৪ কোটি টাকা তুলবার কথা ছিল সেখানে আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে। এই খাতে আমাদের রাজস্ব খাত থেকে যদিও ৮'১ কোটি টাকা যোগাবার কথা সেখানে আমরা যোগাবো ১৭'৬ কোটি টাকা।

এই হিসাব থেকেই বোঝা যাবে নূতন ট্যাক্স ধার্য না হলেও চলতি ট্যাক্সের পরিমাণ প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার পরিণতিতে সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হতে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা

এ বছর বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ, এই তিন স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধেই শিক্ষামন্ত্রী ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি দাবি করেছেন। উন্নতির কতটা সত্যই নিশ্চয়ই খুব-নিরোগের পরিমাণ অথবা বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণ নয়। উন্নতির পরিমাণ যাচাই করবার একটিই মাত্র নিক্তি আছে—কোনো বিশেষ শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারকে কতটা উন্নত ও সংগঠিত করতে পেরেছে এবং সে শিক্ষা শিক্ষিতের জীবিকার প্রয়োজনেই বা কতটা কার্যকরী হয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করে পশ্চিম বাংলার শিক্ষার সার্থকতার পরিমাণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবিকার্জন যে ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে উঠছে তার প্রমাণ বেকার সংখ্যার—যার সামান্য পরিচয়ই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের নাম রেজিষ্ট্রেশনের সংখ্যায় পাওয়া যায়—ক্রম বর্দ্ধমান হার। বর্তমানে একমাত্র মহিলা কর্মপ্রার্থীসংখ্যাই ৭৭ হাজারের বেশী এবং গত পাঁচ বছরে এই সংখ্যা দুই শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যতীত দুষ্ট ও অপরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকাতে উচ্চমধ্য-বিদ্যালয় ও নিম্ন মধ্য-বিদ্যালয় এবং তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স এদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান হয়নি ও ফলস্বরূপ একদিকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় ভর্তি হবে, তার কোনো ব্যবস্থা আজও জানা যায়নি। কারণ তিন-বৎসরের ডিগ্রীকোর্স যা ১৯৬০ থেকে প্রবর্তিত হবার কথা তার পাঠ্য-তালিকা অথবা পাঠ্য পুস্তক এখনো তৈরী হয়নি। এবং সামনে যে দু' তিন মাস আছে তার ভেতরে এই কঠিন কাজটা সমাধান হওয়াও অসম্ভবই মনে হয়। অন্যদিকে শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি, নানাভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি হয়নি অথবা তাদের অভাবঅভিযোগও দূর হয়নি, এতে ভাল শ্রেণীর শিক্ষক পাওয়া সহজতর হ'তে পারে

কি? অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ টাকার একটী বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে বড় বড় বহুতাড়ী তৈরী এবং সেই সূত্রে নানা দুর্নীতি ও আশ্রিত লোকদিগকে চাকুরী দান-বাবদে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর পিতামাতার বহু কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষালাভের পর ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কতটা হচ্ছে তার প্রশ্ন? তরুণদের অবিশ্রান্ত উপদেশ, আশ্বিদান ও শাসনের দ্বারা কোনো ফলই যে হচ্ছে না তা তো আমরা প্রতিদিনই দেখছি। এর বড় একটী কারণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের হতাশাময় পরিবেশ এবং যারা উপদেশ দেন বা শাসন করেন তাদের জীবনে কথায় ও কাজে নিদারুণ অসঙ্গতি। এই দুদিক দিয়ে যদি পরিবর্তন না আসে তবে শিক্ষার আমূল পরিবর্তন হবে না এবং উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতিত জাতির বুনিয়াদও গড়ে উঠবে না। কেবলমাত্র অর্থ বরাদ্দ করাতে কিছুই হবার নয়।

পরিবার পরিকল্পনা

গত ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দিল্লীতে আন্তর্জাতিক পরিবার-পরিকল্পনা সম্মেলন হয়ে গেল। যে কোনো জাতীর পরিকল্পনার সাফল্যের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং জাতীর উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা দুরূহ সমস্যাও এই জন-সংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান হার। এই দুটী বিষয়ে সম্মেলনের বিভিন্ন বক্তারা একমত হয়েছিলেন। পরিবার পরিকল্পনার জন্য ভারতের তৃতীয় প্ল্যানে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এর একটি বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় করা হবে। এই সম্পর্কে কয়েকটী প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসে। গণতন্ত্রের সঙ্গে কি জনসংখ্যা হ্রাস অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত? আর এই জনসংখ্যা হ্রাস যদি অনিবার্য্য হয়ে উঠে থাকে তবে নিশ্চয়ই পরিকল্পনা ব্যতীত উপায় নেই। সর্বাপেক্ষা বড় কথা ভারতবর্ষের মত দরিদ্র ও শিক্ষাহীন দেশে দেশের-কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই পরিবার পরিকল্পনা সমর্থন করবে। কারণ যে ভবিষ্যৎ বংশ-ধরদের জন্য আহার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানুষ-জীবনের নিয়তম প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করবার সাধ্য নেই, তাদের পৃথিবীতে আনার অধিকারও কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করবে না, এবং এই বিচারে পরিবার পরিকল্পনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু শিক্ষাহীন দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিচারহীন ভাবে পরিবার পরিকল্পনার পথ উন্মুক্ত করবার নৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ চিন্তা করছেন বলেও পরিচয় আমরা পাইনি।

জনসাধারণের নৈতিক মানের উপর এর কুফল রোধ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কোনো পন্থা অবলম্বন করেছেন বলে কোনো পরিচয় আমরা পাইনি। শিক্ষার প্রসার ও জনমত সংগঠন ব্যতীত আর কোনো উপায় আছে বলেও আমাদের জানা নেই! এদিক দিয়ে সকল সমাজ-সেবীদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করবার জন্য আমরা আহ্বান করছি।

অরবিন্দের দেহাবশেষ

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি চন্দননগর থেকে শ্রীঅরবিন্দের পূত দেহাবশেষ নবদ্বীপের 'বহুধানী' নামীয় প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হবার পথে কলকাতায় আনীত হয়। কলকাতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ সেদিন তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাজীবনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবার জন্য হাওড়ায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বেদনার মধ্যে বলতে হচ্ছে এর আয়োজন, উদ্যোক্তরা যে ভাবে করেছিলেন তাতে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনা অপেক্ষা উঁর প্রচার-ধর্মী মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে বেশী। শ্রীঅরবিন্দের নামে, তাঁর বিশেষ ধর্মীয় আদর্শের নামে এই মনোভাবের আত্মপ্রকাশ আশঙ্কাও করা যায়নি। ভারতে

এই সকল মহান মতাদর্শের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই তাঁদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন এবং তার অধিকার প্রতিটী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরই রয়েছে। সে সম্মান প্রদর্শনে উদ্যোক্তাদের অতিরিক্ত কিছু দাবী আছে বলে আমরা স্বীকার করি না এবং সে দাবী প্রদর্শনও অত্যন্ত অশোভন মনে করি। ভারতের বিপ্লবাদর্শের জনক, ভারতীয় মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ অভিবাদন আমরা জানাচ্ছি।

বাস্তব অন্তকারণ্য

যে কথা আমরা বার বার বলে আসছি যে অন্তকারণ্য অথবা যে কোনো পুনর্বাসন পরিকল্পনাই হোক্ না কেন—তার কল্পনার অংশ বাদ দিয়ে বাস্তব অংশ নিয়েই আমাদের আলোচনা, পরিকল্পনাকারিরা তাঁদের চমকপ্রদ কথা ও রঙিন কল্পনা দ্বারা অভিভূত করতে চান দেশবাসীকে। ১১ বৎসরের স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কর্মধারার কথা ও কাজের মধ্যে লজ্জাজনক অসঙ্গতি একবার নয়, বার বার দেশবাসী দেখেছে, তারপরও যদি শিশুর সরল বিশ্বাসের অভাব জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায় এবং তারা নিজেদেরকে কথা ও কল্পনার শিকারে পরিণত করতে না চায় তবে কি তাদের দোষ দেয়া যায়? এ সম্পর্কে যুগান্তরের ষ্টাফ্ রিপোর্টার ২০শে ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় লিখছেন যে তিনি বাংলার প্রথম উদ্বাস্তুদলের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যও যান্। তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করছি। 'বিস্তারিত ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় উদ্বাস্তুদের এখানে আনা সমীচীন হইবে না। জলের ব্যবস্থা অত্যন্ত কম, বাস করিবার মতো সুষ্ঠু পরিবেশ এখনও গড়িয়া ওঠে নাই।

...তারপর কলকাতায় ও দিল্লীর কর্ম-কর্তাদের কথায় যে দ্রুততা এবং গুরুত্ব এখানে দেওয়া হইতেছে, আসল দণ্ডকারণ্যে পরিকল্পনার কাজ সে তুলনায় তো বটেই, সাধারণ মানদণ্ডে বেধিলেও অত্যন্ত ধীর গতিতে চলিতেছে। কলিকাতায় বসিয়া দণ্ডকারণ্যের যে প্রচার শোনা যায় তাহা কার্যে রূপায়িত হইতে এখনও দেরী আছে। কিন্তু কাজ না হইলেও অফিসার নিয়োগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার যে শ্রেণীর অফিসার নিয়োগ করা হইতেছে—তাঁহাদের অধিকাংশকে পরে নিয়োগ করিলেও চলিত। যাঁহাদের নিয়োগ করা এখনি প্রয়োজন সেই শ্রেণীর অফিসার বা কর্মচারীর সংখ্যা কিন্তু কম।.....কোথায় যেন ভিতরে একটা গলদ রহিয়াছে। দলে দলে অফিসার মূল্যবান গরম কাপড়ের স্যুট, দামী নেকটাই, চকচকে জুতা পরিয়া ঘুরিতেছেন। কেহ কেহ আবার গরমের মধ্যেও আমেরিকান জ্যাকেট পরিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ। পাছে পায়ে মশা লাগে।.....পরিকল্পন রূপায়ণের ভার যাহাদের হাতে তাহারা কিন্তু অফিসার ঘাটাই করিবার সুযোগ পাননাই বলে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার রূপায়ণ এখনও বহুদূরে।"

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমাদের অভিযোগ এবং আশঙ্কাও অনুরূপ। বিরোধী পক্ষের নেতাদের দণ্ডকারণ্য দেখবার সুযোগ না দেবার কারণও খুঁজে পাওয়া যাবে উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে!

কংগ্রেস ছাত্র ও রাজনীতি

স্বাধীনতা অর্জনের পরে ছাত্রদের আর রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়—কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃবর্গ, বিশেষ করে সরকারী পদাধিকারী নেতৃবর্গ, এই নীতি বার বার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ উদ্যম ও নেতৃত্বে ছাত্র পরিষদ নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম কর্মকর্তাদের অনেকে কংগ্রেসের পদাধিকারী এবং কংগ্রেসের

উচ্চতর নেতৃত্ব কর্তৃক এই ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মনোনীত হওয়ার সংবাদও প্রকাশ হয়েছে। সম্প্রতি ছাত্র পরিষদের প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রীসুনীতি চ্যাটার্জি এবং শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জী—কংগ্রেসের এই নেতৃবর ছাত্রদের রাজনীতি পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে একই সম্মেলনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস নেতৃবর্গের এরূপ পরস্পর বিরোধী মতামত বিভ্রান্তি ও বিস্ময়কর। ছাত্রেরা রাজনীতি চর্চা করবে না, রাজনৈতিক দলে যোগ দেবে না—নীতি হিসাবে এই মত সমর্থনযোগ্য নয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের রাজনীতি-সচেতন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছাত্রদের রাজনীতির প্রকৃতি হওয়া উচিত প্রধানত শিক্ষামূলক এবং রচনাত্মক। রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শনের অনুধাবন এবং যুব জীবন গঠনের কার্যক্রমে ছাত্রদের রাজনৈতিক উদ্যম নিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। বিশেষ জাতীয় সমস্যা বা ছাত্রদের নিজস্ব সমস্যায় ছাত্রদের পক্ষে বিক্ষোভাত্মক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা, অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছনীয় নয়।

'হলিউড অন আইস'

'হলিউড অন আইস' নামে ফ্লোরিডা শ্রেণীর মার্কিনী নৃত্য কলা প্রদর্শনের একটি ব্যবস্থা হয়েছে কলকাতায়। শোনা যায় শুধু এই প্রদর্শনীটির দৈনিক খরচ বাবদ ব্যয় হয় পঁচিশ হাজার টাকা। এই নৃত্য প্রদর্শনীটি দেখার জন্য টিকিটে কত ব্যয় হয় তা অনুমেয়। এরূপ নৃত্য প্রদর্শন দ্বারা একটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ লুণ্ঠনের প্রশ্নটিই মূল কথা নয়,—এরচেয়েও একটি গুরুতর, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে 'হলিউড অন আইস' নামক নৃত্য প্রদর্শনীর মধ্যে।

পাশ্চাত্যের নৃত্য প্রদর্শনীর রীতি-নীতি, সাজ-সজ্জা ভারতীয় রুচি ও সংস্কৃতিবোধের পরিপন্থী। বিশেষ করে নৃত্যে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের সাজ সজ্জা ভারতীয় রুচিবোধকে শুধু গভীরভাবে পীড়া দেয় তাই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যমানের উপরে যেন তীব্র ও বিষাক্ত আঘাত হানে। জলের নিম্নগামী স্বভাবের ন্যায় মানুষেরও একটি নিম্নগামী স্বভাব আছে। সেই স্বভাবকে ঊর্ধ্বগামী করেই মানুষ তার সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। আজ বাস্তবতার নামে পাশ্চাত্য জগতে এক শ্রেণীর লোক মানুষের নিম্নগামী স্বভাবকে শিল্প-কলার আসনে বসাবার জন্য অগ্রণী হয়েছে। ভারত এতকাল শিল্প কলার এই পাশ্চাত্য মূল্যমান গ্রহণ করেনি, কিন্তু স্বাধীন ভারত কি এই মূল্যমানকেই বরণ করে নেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছে? সম্প্রতি ইণ্ডিয়া প্রদর্শনীর মঞ্চে দিল্লীতে যে বিকৃত রুচির নিদর্শন মেলা গেছে তা'তে ভারতের জাতীয় জীবনের এক অশুভ ইংগিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। 'হলিউড অন আইস' ধরনের নৃত্য প্রদর্শনী সম্বন্ধে সমালোচনার অভাব, প্রতিবাদের অভাব, বিরূপ মন্তব্যের নীরবতার মধ্যেও যেন ইণ্ডিয়া প্রদর্শনীর মনটিই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে।

'হলিউড অন আইস' নামের পাশ্চাত্য নৃত্য প্রদর্শনী ভারতীয় রুচি, সংস্কৃতি ও রুচিবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভারতের বুকে এরূপ নৃত্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতির মৃত্যু ঘটে বাইরের আঘাতে তত নয়,—যত তার মূল্যমানের বিকৃতিতে। ভারত, বিশেষ করে বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের বাংলা, যেন সেকথাটি না ভোলে।

সীমান্তের সন্ত্রাস

আসাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম এক চরম ও অসহ্য অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

অবিরাম্ পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে গুলিবর্ষণ করা হচ্ছে এবং এর ফলে কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছে এবং সীমান্তের আরো অনেকে আহত হয়েছে। ভারত সীমান্তের কয়েকটি স্থান এখনও পাক সৈন্য বাহিনীর কবলিত হয়েছে। এদিকে দুই রাষ্ট্রের পাসকবর্গের অধিকর্তাদেরও হাই কমিশনারদের বৈঠকও হচ্ছে ঘন ঘন এবং ওদিকে পাক সীমান্ত থেকে গুলি বর্ষণও চলেছে অনবরত। অবস্থা এমন এক দুঃসহ পর্যায়ে এসে পড়েছে যে ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তের সন্ত্রাস বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে যুক্তি পাকিস্তান যোগে পাকিস্তানী সন্ত্রাসের উত্তর একমাত্র সে যুক্তিতেই কার্যকরী হওয়া সম্ভব।

ক্রিকেটের কেলেঙ্কারি

নিউজিলাণ্ডের সঙ্গে খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল এরূপ লজ্জাকর অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে যে তার ফলে খেলার জগতে ভারতের মর্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়েছে। ক্রিকেট খেলায় ভারতীয়দের এরূপ শোচনীয় পরিণামের জন্য কয়েকটী কারণ থাকতে পারে। হয় ক্রিকেট খেলার ভারতীয় খেলোয়াড়দের যান নিয়ন্ত্রণের, অথবা যোগ্য খেলোয়াড়দের যথাযথ ভাবে নির্বাচিত করা হয়নি। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে যোগ্য ক্রিকেট খেলোয়াড় খুঁজে বের করা যায় না, অথবা যোগ্য খেলোয়াড় তৈরী করা যায় না—একথা বিশ্বাস্য নয়। খেলোয়াড় ও ক্রীড়াযোদীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে খেলার জগতে দলাদলি ও চক্রান্তের জন্যই ক্রিকেট খেলার মান এত নীচে নেমে গেছে। আমাদের মতে ক্রিকেট খেলার মান, সংগঠন ও দল নির্বাচন সম্বন্ধে যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা একটী অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হওয়া উচিত এবং যতদিন পর্য্যন্ত ক্রিকেটের মান উন্নত না হবে এবং সুষ্ঠুভাবে দল নির্বাচিত না হবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে কোন আর্ন্তজাতীয় প্রতিযোগীতায় যোগ দেওয়া উচিত নয়।

সহযোগীতার অর্থ কি ?

ভারত সরকারের পরিকল্পনার প্রয়াসকে সফল করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীপণ্ডিত নেহেরুকে বার বার বিরোধী দলের নিকট আবেদন জানাতে দেখা যায়। সম্প্রতি কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত ইন্দিরা গান্ধীও অনুরূপ সহযোগীতার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সহযোগীতার অর্থ কি ? এর অর্থ কি কংগ্রেস সরকারের নীতি বিনা দ্বিধায় অনুসরণ ?—না কংগ্রেস ও গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলি কর্তৃক একযোগে পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচী গ্রহণ এবং যুক্ত কার্যক্রম অনুসরণ ? সহযোগীতার অর্থ কি তাহা অনুধাবন করার জন্য আচার্য কৃপালনী জাতীয় সরকার গঠনের কথা শ্রীনেহেরুকে চিন্তা করে দেখতে বলেছিলেন—শ্রীনেহেরু জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি সহযোগীতার কোন বিকল্প পন্থারও নির্দ্দেশ করেন নি। সুতরাং কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সহযোগীতার অর্থ সরকারী নীতির নির্বিরোধ সমর্থন ও অনুসরণ। এই সহযোগীতায় সহনীতি, সহ-পরিকল্পনা, সহ-কর্ম বা সহ-উদ্যোগের কোন অবকাশ নেই। আচার্য কৃপালনীর প্রস্তাবে তাদের নিকট এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যারা শ্রীনেহেরুর উক্তিতে বার বারই বিভ্রান্ত হন্।

কম্যুনিষ্টপার্টির কৃষি নীতি

কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে এবং কংগ্রেসের কৃষি পুনর্গঠনের কার্যক্রমকে

সফল করার জন্য সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সমবায় প্রথায় কৃষি পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য প্রজা-সোস্যালিষ্ট এবং কোন কোন গান্ধীবাদীরা অনেক বার প্রস্তাব তুলেছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি হয়তো এই প্রস্তাবের মধ্যে 'কলেকটিভ ফার্মের' বীজ নিহিত দেখতে পেয়েছে। এই আশংকায় শ্রীরূপ এবং আরও কয়েকজন নামপুত্রের কৃষি-প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেন নি। সমবায় প্রথায় তিনি যদি স্বেচ্ছামূলক হয় তবে বৈষম্যের অবকাশ খুব কমই থাকে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে সমবায়িতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ পার্টি তার এক বিপরীত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তারা পশ্চিমবঙ্গের বে-আইনী ও বে-নামধারী জমি কৃষকের হাতে আনবার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন বোধে কৃষকের বল প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। প্রস্তাবটি এখনও কার্যকরী করা হয়নি কিন্তু প্রস্তাবের পেছনে কম্যুনিষ্ট পার্টির আসল নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অমৃতসহরে কম্যুনিষ্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ পথায় দীক্ষা গ্রহণের কথা খুব জোর গলায় প্রচার করে ভারতবাসীকে তা বিশ্বাস করতে আহ্বান জানিয়েছিল তার যথার্থতার এ একটি নিদর্শন।

পুলিসের রিপোর্টে চাকুরী খতম

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ রায় বলেন রাজনৈতিক কার্যকলাপ, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ নিয়ে, প্রয়োচিত করবার জন্য গত দুই বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু সরকারি কর্মচারির চাকুরি যথোপযুক্ত কারণেই গেছে বিরোধী-পক্ষের তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় আরও বলেন যে কোনো কর্মচারীর রাজনৈতিক মত-বৃত্তির জন্য কাজ যায় নি, এবং পদচ্যুতির পূর্বে চার্জ সীট সাধারণতঃ দেওয়া হয়—তবে জনস্বার্থে এবং অবাঞ্ছনীয় প্রচার বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুই জানানো হয় না।

এই বক্তব্যের যুক্তির সহিত আমরা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। তবে আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, কোনো কারণ না দেখিয়েই চাকুরী গেছে এবং যে সব ক্ষেত্রে গেছে তার ভুক্তভোগীরা এতই নগণ্য ব্যক্তি যে জন-স্বার্থে বিপন্নতরা অথবা অবাঞ্ছিত প্রচারের সুযোগ দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষতঃ সাধারণভাবে তথাকথিত কোনো বিক্ষোভে যদি অংশগ্রহণ তারা করেও থাকে তবে চাকুরি যাবার পূর্বে তা ঘটেছে এবং সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনে অভিযুক্ত হয়েও প্রায়শঃভাবে তারা মুক্তি পেয়েছে।

গণতন্ত্রের আবহাওয়ার পক্ষে উপরোক্ত ব্যবস্থাই কি স্বাভাবিক? আমাদের মতে এই অবস্থা জন-স্বার্থের ঘোর বিরোধী।

বীরাজ ভট্টাচার্যের লোকান্তর

গত ৯ই মার্চ প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যশিল্পী বীরাজ ভট্টাচার্যের লোকান্তর ঘটেছে। জীবিকার তাগিদে তিনি অভিনয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেননি, করেছেন জীবনের প্রকাশের তাগিদে। এবং অতি তরুণ বয়স থেকেই এর আকর্ষণ তাঁর নিকট অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর অভিনীত ছবি প্রায় ২০০। বহুচিত্রে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কিন্তু এতে তাঁর তৃপ্তি না হওয়াতে থাকে বলে 'টাইপচরিত্র' তাই তিনি বেছে নেন নিজের জন্য। এবং এর মধ্যদিয়ে তাঁর দক্ষতা বাংলাদেশে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ চিত্রজগতের একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান শিল্পীকে হারালো।

৬।৩।৪৯

ডাঃ জিভাগো'র কবিতা।

বরিস পাস্তেরনাক

বসন্ত বন্যা *

অনুবাদ : সুবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

আজ মুমূর্ষু অস্তসূর্যাহতাশন,
গহন গভীর অরণ্য-অন্তরে,
ক্লান্ত অশ্বারোহী চলে এক বিজন উত্তাল খামারশালার পানে,
মধুবসন্ত বন্যার পথ ধরে।

তুরগদংষ্ট্রা ব্যস, বল্গা চরণে,
নির্ঝরিণীর নিঃসরণীর তলে
কলস্রোত মেশে অশ্বখুরের বজ্রনে,
বারিধারা তারে অনুসরণিয়া চলে।

যখন আরোহী বল্গাটি তার ফেলে
ধীর পদক্ষেপে অগ্রসরিল বেগা,
মধুবসন্তবন্যা তখন বজ্রঅশনি ফেলে
মনে হল যেন আবর্তি গেল সেথা।

মনে হল যেন কেহ বা উঠিল কেঁপে
শোনা গেল যেন হাড়ের কলেবর,
চূর্ণিত হয়ে রেণু রেণু হল প্রস্তররাজি সহ,
উত্তাল পাথাল ঘূর্ণির স্রোতে নিষ্পেষি গেল সব,
উৎপাটি গেল অরণ্যমহীরুহ।

* ম্যাক্স হেওয়ার্ড ও মাভা হারারি কৃত Spring floods নামীয় কবিতার ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে

অস্তরবির রশ্মিঅনল মাঝে
দূরে তরুশাখা ম্লান অঙ্গার রেখা,
তীক্ষ্ণ তীব্র প্রতিধ্বনিত ঘণ্টানিনাদ হেন,
রোষিত একটি নাইটিঙ্গেল কূজিতে লাগিল সেথা।

প্রান্তর মাঝে বিস্তারি দিয়া শোকের উত্তরীয়
কাতরে কাঁদিছে বেপথু উইলো তরু,
সেথায় 'রবার নাইটিঙ্গেল' •হেন
সপ্ত ওকের বাঁশীর গান সে শিষ্ দিয়ে করে সুরু।

কান্তারে লক্ষ্য বুলেটের রাশি যত
ঘুরিয়া বেড়ায় ঘন অরণ্য মাঝে—
কোন অভাগ্য, কোন সে পীড়ার কথা
এ মত্ততায় আজিকে উঠিল বেজে?

মনে হল, যেন যে কোন খানেই অপরাধীদের লুকানোর স্থান হতে
উদিত হবে সে বনদেবীটির মত—
হয়তো সে আসি দর্শন দেবে—স্থানীয় বাহিনীদলে
অশ্বারোহী ও পদাতিক আছে যত।

ধরা পড়েছে যে সুখ ও বেদনা, আর্তি ও ব্যাকুলতা।
আকাশ, বসুধা, বনানী ও প্রান্তরে,
এদেরো সবার অংশ কিছুটা ছিল
দুর্লভ স্বরলহরীর অন্তরে।

• রাশিয়ার পুরাতন গাথাকাব্যে 'রবার নাইটিঙ্গেলের' উল্লেখ পাওয়া যায়। রাশিয়ার কিংবদন্তী অনুসারে রবার নাইটিঙ্গল ওকবৃক্ষে গান গাহিত।

অনুবাদ।
সত্যব্রত বসু

: উপন্যাস

ডাঃ ঝিভাগো

বরিস পাস্তেরনাক

বইটি সবচে সচেতনের মনচিত্তে আজ প্রচুর কৌতূহল। সবরোপ যোগী বিবেচনায় বইটির অনুবাদ তাই লক্ষ্যিতে পারাপারিক প্রকাশের আয়োজন করা হল।

অ: স:

প্রস্তাবনা

বই বেশ বড় ইংরেজি কপি যিনি দেখেননি, এ কথা তাঁর জন্য।

বইটির মধ্যে বক্তব্য ও মুহূর্ত বহু। কিন্তু উপন্যাস বলতে যে সবের সঙ্গে আমাদের পরিচয়,—অর্থাৎ কড়া কাহিনী, বিশ্বাসকর চরিত্র, মকতুরন্ত শার্ট কথাবার্তা,—না, সে সব কিছু নেই। একেবারেই না। এ ঠিক জীবনের মতো: ঘটনাবিহীন, ধীরগামী নিস্তরঙ্গ, সাধারণ। কিন্তু সেটা আপাত। পরে আপাতশিথিল মন্থরগামী কোনো নদীর মত জলের টান পরে একসময় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে—নদীর প্রবল বিপুল আলোড়ন তখন কূল ছাপিয়ে পাঠকের মনওজরে যেত,—সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কিন্তু অনুবাদ যদি কার্বন-কপি হয় ও ধারের এবং সত্যরক্ষার একটা শক্তি থাকে ঠিকই কেন্দ্র কিনিষ যা দাঁড়ায়, বর্ণনা দিই বাঙলায় এমন শব্দই আমি না।

অতএব যাঁদের মেধিক দিয়ে কিছু শিখিল করতেই হল।

আবার অনুবাদ মানে, এ বই হাতে নিয়ে মনে হল, কোনো এক সদাশয় মানুষের বদলে তার একখানি ফোটো। তারো অনুবাদ মানে পেনসিলে সেই ফোটোটির স্কেচ। আসল থেকে নকল তাই চলতে চলতে এত দূরে গিয়ে পড়তে পারে যে মূল লেখক পর্যন্ত তখন তা না চিনতে পারেন। ঠিক মেকআপ নেওয়া অভিনেতার মতঃ আয়নায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কপা এবং ছায়া দুজনেই হতবাক।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই বই নিয়ে যে হৈ চৈ হল, সাহিত্যের সঙ্গে তার কিছু কোনো সম্পর্কই নেই। আর বিপ্লবের সময়ে রাশিয়া বা তার পরের দুপের, যা শোনা—, সে-সময়ে সারা দুনিয়ার উৎকণ্ঠা এবং অসহ কৌতূহল—এ বইতে তাই যদি আলোচনা ও আকর্ষণের একমাত্র বিষয় হয়ে থাকে ও লজ্জার কথা। দুঃখেরও।

ঊর্জনাকার

প্রথমপর্ব : প্রথম অঙ্কার

পাঁচটার গাড়ী

যাত্রা চলছিল। আর যে-গান তারা গাইছিল, 'অমর-প্রতি,' তার মাঝে মাঝে থামলেও, সেই গান তাদের পায়ের তালে, ঘোড়ার ঘুরের শব্দে আর দমকা বাতাসের ঢেউয়ে সামনে এগিয়ে চলছিল। এ একটা শবযাত্রা। অনেক লোক নিয়ে একটা প্রকাণ্ড মিছিল।

'কে যায়! এ কার শবাধার! কে যায় গেলেন!'

পথচারীদের মধ্যে বলাবলি উঠল। তারা থামল, স্তব্ধ হল, মাথা থেকে টুপি খুলে একপাশে সরে শবযাত্রীদের পথ ছেড়ে দিল।

'বিভাগো!'

'বিভাগো!'

'না, তিনি না। তাঁর স্ত্রী।'

'স্ত্রী!'

'অবশ্য সে একই কথা। তাঁর আত্মার শান্তি হোক!'

'এমন শবযাত্রা সচরাচর দেখা যায় না।'

'খুব সুন্দর হয়েছে।'

অনুষ্ঠান পর একের পর এক ঘড়ঘড়িতের মতো তারপর সমাধা হয়ে চলল।

'এই মাটি, এই পৃথিবী, যেখানে যা আছে চলাচলে, তারই তার। ঈশ্বরের!' এই বলে পাদ্রী এবার নীচু হয়ে মেরিয়া নিকোলায়েভনার শবের উপর মাটি ছিটিয়ে দিলেন। ভঙ্গিটা ক্রুশের মত হল। সমস্বরে ছোকরার মত তারপর গান উঠল: সত্য এবং সুন্দর যে-আত্মা, তার আত্মার জয় হোক।

দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানটুকু ঘিরে ঘাসল একটা কর্ম-তাড়না জেগে উঠল। ঠকাঠক পেরেক ঠুকে ঠুকে কফিন বন্ধ করা হল। সেটিকে ধীরে ধীরে তারপর নামিয়ে দেওয়া হল মাটির নীচে। কবরের মাটি ফেলে যখন কবর ঢেকে দেওয়া হচ্ছিল, কফিনের চাকার উপর মাটির চাপড়া পড়ে শব্দ উঠছিল ঠিক বৃষ্টি হওয়ার মতো। দেখতে দেখতে চোখের সামনে সব ঢাকা পড়ে গেল। কবরটি সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হলে তাজা মাটির যে-উঁচু ঢিবিটি হল, সেখানে এবার কচি বয়সের একটি ছেলে উঠে এল।

এত বড় একটা শবানুষ্ঠান দেখতে দেখতে লোকের মনে তারপর ক্লান্তি এসে যায়। কেউ কেউ তারপর যে-তার যানের সমাধির উপর দাঁড়িয়ে ছেলেটি এবার হয়ত একটি ভাষণ দিতে চায়।

কিন্তু সে ওসব কিছুই করল না।

সে শুধু মুখটা উপরদিকে উঠিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি দেখতে লাগল তা সেই জানে। ঘুরের পাতাঝরা ঘেরের শূন্য প্রান্তর, ঘণ্টার গম্বুজ, মনে হয় উঁচুতে দাঁড়িয়ে অমলক চোখ মেলিয়ে সে ঐ সবই দেখছে। তারপর তার পুরু ওভারকোট নাক উঠল ফুলে, গলাটাকে সে অস্বাভাবিক লম্বা করে বাড়িয়ে দিল সামনে। ও যদি একটা নেকড়েশিশু হত ও ওর ঐ ভঙ্গী দেখে মনে হতে পারত যে সে এবার চাঁচাবে। এবং প্রায় তাই-ই সে করল। দুই হাতে মুখ ঢেকে এবার সে হু হু করে কেঁদে উঠল।

কনকনে বৃষ্টির কোঁটা উড়িয়ে দমকা হাওয়া বেগে এল। তার ধাক্কি হাতে, মুখে, কনকনে হাওয়া নির্দয়বেগে চাবুক চালিয়ে ঘরে ছেড়ে লাগল।

আঁটসাঁট কালো পোষাকপরা এক ভদ্রলোক এইসময় সমাধির দিকে এগিয়ে এলেন। ইনি নিকোলাই নিকোলায়েভিচ, ডেভেনিয়াপিন,—মৃত মহিলাটির ভাই,—যে ছেলেটি কাঁদছিল, তার মামা।

তিনি এসে তাকে ঢিবি থেকে নামিয়ে সমাধি-প্রাঙ্গনের বাইরে নিয়ে গেলেন।

২

সে রাত্রিটা ওরা মঠে রইল। মামা কোলিয়ার পূর্ব-পরিচয়ের খাতিরে ওখানে একটি ঘর পাওয়া গিয়েছিল। রাত্রিটি এখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে ওরা অনেক দূরের পথে-রওনা হবে: দক্ষিণে, বহু দূরে তরায় তীরে একটি ছোট সহরে। ওখানে তার মামার কাজ এক প্রকাশকের পক্ষে প্রগতিবাদী একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে। তাদের টিকিট কেনা হয়েছে, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদাও সব শেষ, সেগুলি রাত্রির মত তাদের সঙ্গে ঐ ঘরেই রইল।

কিরকম অন্ধকার মেঘলা দিনের একটি দিন। ঠিক কান্না থেমে থাকার মত। কোথায় কাছে একটি রেলওয়ে ইয়ার্ড: সেখানে গাড়ির শান্টিং এর সঙ্গে মাঝে মাঝে এঞ্জিনের শিটি ভেসে আসছিল। সে শব্দটা কেমন,—যেন বাথাতুর অন্ধকারে কারার শিহর জাগিয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় বড় শীত। ঘরের দুটি বড় জানালা দিয়ে দেখা গেল বাইরে পাকঘরের দিকে পরিত্যক্ত আগাছাময় বাগানের একটি কোন,—সামনের কাদাময় রাস্তা আর চার্চপ্রাঙ্গনের কিছু অংশ যেখানে ওবেলায় মেরিয়া নিকোলায়েভ্‌নাকে কবর দেওয়া হয়েছে। বাগানে প্রাচীরের গা ঘেঁষে কয়েকটা কাঁটাঝোপ, একফালি জমি জুড়ে কিছু বাঁধা কপির চাষ। পাতে সেগুলি নীল, পাতা-গুলি শিশির, মনমরা।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া গাছগুলিকে ঝুঁটি ধরে আকুল নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। মনে হল মাটি থেকে উপড়ে ছিঁড়ে বড় সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ঝড়ের বেগে এক একবার সারা শরীরে প্রবল ঝাড়া দিয়ে সেগুলো নেচে ওঠে তারপর মাথা নুইয়ে মাটিতে আবার নত হয়ে শুয়ে যায়।

সারারাত্রি সেদিন ঐ ছেলেটির,—উরা-র—প্রায় না ঘুমিয়েই কাটল। মাঝে মাঝেই জানালায় যেন কার টোকা শুনে তার ঘুম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। অন্ধকার ঘরে ক্যাকাশে রহস্যময় তরল শীতল একটি আভা। তার গায়ে শুধু কামিজ, সে দৌড়ে উঠে এল জানালায়, এসে ঠাণ্ডা কাঁচে মুখটা লাগিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বাইরে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। রাস্তা, কবরখানা, বাগান, সবই অন্ধকারে ঢাকা। কেবল বড় বড় বরফের মৌচা ওড়ানো শাদা বড় তার অনন্ত কুণ্ডলী খুলে খুলে ছেয়ে ফেলল সারা আকাশ। তারপর আবৃত করল মাটি। যেন ভুবন জুড়ে সে-ই তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।

জানালা থেকে নেমে উরার প্রথম ইচ্ছা হল যে কাপড়-জামা পরে সে ছুটে বাইরে যায়, গিয়ে কিছু একটা করে। তার ভয় হল যে কপির চারা, মরির আল, সব মাটিতে ডুবে যাবে, কেউ আর খুঁড়ে বার করতে পারবে না। আর তার বা, ঐ যে খোলা জমিতে মাটির নীচে শুয়ে, আরো নীচে, মাটির আরো গভীর নীচে তার থেকে অনেক দূরে তলিয়ে যাবে।

আবার সে কাঁদল। তারপর তার মামা উঠলেন। স্ত্রীর কথা শুনিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। ঘুমের ক্লান্তি জড়ানো চিন্তাচ্ছিত মুখে তারপর জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু এবার তাদের তৈরী হওয়া দরকার। বাইরে আস্তে আস্তে এখন আলো ফুটছিল।

৩

মা বেঁচে থাকতে উরা জানতনা যে তার বাবা অনেক দিন আগে তাদের ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। গোলেনি

যে সাইবেরিয়ার যা বিদেশে তিনি মেয়ে বয় এবং মৃত্যুর পিছনে পরিবারের নাম নাম টাকার সম্পত্তি দুই হাতে খরচ উড়িয়ে দিয়ে গেছেন। একে বলা হত যে ওর বাবা ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে পিটার্সবার্গে বা ঐরকম কোনো বড় ব্যবসাকেন্দ্রে আছেন।

তার মা'র শরীরও বরাবরই খারাপ, দেখে তাঁকে ক্ষয়রোগে ধরে। অসুখ বাড়লেই চিকিৎসার জন্য তাঁকে দক্ষিণ ক্যালাবী এবং উত্তর ইতালিতে যেতে হচ্ছিল। উনি তাঁর সঙ্গে এ রকম দু'বার গিয়েছিল। কিন্তু তাকে সাধারণত বাড়িতেই রেখে যাওয়া হত। সে থাকত অনাত্মীয়দের কাছে,—প্রায়ই একজন থেকে আর একজনের হাতে। এই অনিশ্চয়তা এবং বাড়িক্রমই তার জীবনে তারপর সহজ হয়ে এসেছিল। সমস্ত শৈশবটাই এই অস্পষ্ট রহস্যময়তার মধ্যে তার কেটেছে, তাই বাবার অনুপস্থিতি যে অস্বাভাবিক কিছু এ তার মনেও হয়নি।

শৈশবের স্মৃতি সে কিছু কিছু এখনো মনে করতে পারে। তখন তার জানার যে পরিধি, সমস্তর সঙ্গেই তাদের পদবী জড়ানো ছিল: ফিত্তাগো ক্যাস্ট্রোনী, ফিত্তাগো ব্যাঙ্ক, ফিত্তাগো ভবন, ফিত্তাগো টাইপিন, এমন কি একটা কুকুর পর্যন্ত তাদের নামে চলত: ফিত্তাগো 'যান'। এমন একটা সময় ছিল যখন মস্কো'র যে-কোনো যে-কোনো ড্রাইভারকে একবার বললেই হত যে 'ফিত্তাগো'—সে তারপর গাড়ি চালিয়ে এসে থামত বিশাল এক প্রাসাদের সামনে। প্রসাদ ঘিরে বিশাল পার্ক, নিরুম,—যেন গ্রাম। শাদা বরফ ছিটিয়ে তাঁকে তাঁকে কাক নিয়ে বসত দেবদারুর শাখায়। তাদের ডাক শুনে হত বনে কাঠ কাটানোর আওয়াজ। বাড়ির বড় বড় কুকুরগুলো ছুটে আসত লম্বা লম্বা পা ফেলে। জানলার ওপার থেকে প্রাসাদে, সেখানে সাদাটের জমানো অন্ধকারে জ্বলে উঠেছে সারি সারি আলো।

এ ছবিটা তারপর মুছে যায়। দেখা যায় তারা গরীব।

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞপ্তি

"ভারত ও গণতন্ত্র" পর্যায়ের লেখা এই সংখ্যায় সময়মত না পাওয়াতে দেয়া গেল না। আমরা আশা করছি আগামী সংখ্যায় এ পর্যায়ের লেখা দেয়া যাবে।

আগামী চৈত্র সংখ্যার সহিত ১৩৬৫-র দেয় চাঁদা শেষ হয়ে গেল। আমরা আশা করি যাঁরা এ বৎসর গ্রাহক ছিলেন আগামী বৎসরও তাঁরা গ্রাহক থাকবেন। এ সম্পর্কে তাঁদের মতামত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ
জয়শ্রী

তোমাকে হারাই

প্রফুল্ল কুমার দত্ত

কেবলই যে মনে হয়, এই বুঝি তোমাকে হারাই ;
হয়তো বা হারিয়েও ফেলেছি, অথচ পোড়া মন
বোঝেনা, মানেনা কোনো সান্ত্বনা। তাই আজীবন
না-পাওয়াকে পাওয়া ভেবে হারানোর ভয়ে মরে যাই।

যেখানে পাওনা সব সুদূরের সীমন্তে বিলীন
সেখানেও নাচে আশা-ময়ূর পেখম মেলে ঘিরে ;
স্থান হতে স্থানান্তরে নিয়ে যায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে—
কল্পনা-বিলাসী প্রাণ ক্রমে ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ।

আমাদের এই ভয়, ভুল মৃত্যুহীন : অহরহ
অতল হৃদয় জুড়ে এর যত সূক্ষ্ম শিকড়
জড়ায় সহস্র পাকে ; এক ইঙ্গি হলে নড়চড়
বিশ্বচরাচর ব্যেপে কেঁপে ওঠে প্রলয় কাঁপন।

মোটানা খবরের মাঝে রাত্রিদিন হাবুডুবু খাই—
পাইনি তবুও ভাবি, এই বুঝি তোমাকে হারাই ॥

আমার দেখা কয়েকজন

যোগেশচন্দ্র বাগল

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সুরেশচন্দ্র দেব

নূতনের প্রতি অনুরক্ত হইয়াও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সুরেশচন্দ্র দেব। দেখিলেই মনে হইত, কোন অজানা অতীতের ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছেন এই নাতিদীর্ঘ ক্ষীণকায় মানুষটি। তাঁহাকে প্রথম কখন দেখি বা প্রথমে কোথায় আলাপ হয় ঠিক স্মরণ হইতেছে না। তবে ইংরেজী দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' প্রকাশের পর হইতেই যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম একথা পরিষ্কার মনে আছে। আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেশ সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় কর্মে নিযুক্ত ছিলাম। দিনের পর দিন অতি নিকট হইতে সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে তিনি আমাদের অতিপ্রিয় সুরেশদা হইয়া উঠিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন আমার মাত্র দুইখানি বই বাহির হয়। সুরেশদা প্রতিটি বইয়ের সম্বন্ধেই নিজ প্রীতিপূর্ণ অভিমত জানাইলেন সম্পাদকীয় স্তম্ভে। তাঁহার এতাদৃশ সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। একবার স্থানীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হইল বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত বিষ্ণুপুরে। অল্প সময়ের মধ্যে নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণুপুরের উপর একটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া দিই 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'এর জন্য। এক এক দিন লিখিতেই, সঙ্গে সঙ্গে চাহিয়া লওয়া হইতেছে; টাইপের পর সুরেশদা দেখিয়া দিতেছেন, অমনি প্রেসে পাঠানো হইতেছে। পর দিন প্রাদেশিক সম্মেলন, প্রবন্ধটি চিত্র-সহযোগে পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। এমনি করিয়া দিনের পর দিন সুরেশদার সান্নিধ্যে আসিতে লাগিলাম।

সুরেশচন্দ্রের পরিচয় ক্রমে পাইতে লাগিলাম। তিনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় যৌবনে পদার্পণ করিতেই। সাংবাদিকতায়ও তাঁহার হাতেখড়ি হয় বিপিনচন্দ্রের নিকট। সুরেশচন্দ্র গুরুর মত তাঁহার অনুসরণ করিতেন। সুরেশদার মুখে বিপিনচন্দ্রের কথা অনেক শুনিয়াছি। অসহযোগের সময়ে সুরেশচন্দ্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর 'সার্ভেণ্ট' দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের খাদি প্রতিষ্ঠানের সহিতও পরে যুক্ত হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি কারাবরণ করেন। কিন্তু সাংবাদিকতা ছিল তাঁহার সকীয় বৃত্তি। তিনি ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। একখানি সর্বতথ্যসম্বলিত বাষ্মাষিক পুস্তকের রাজনৈতিক অংশ তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' রচনাকালে উহা হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছিলাম। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' হইতে বিদায় লইয়া তিনি অন্য কোন্ পত্রিকায় যুক্ত হইয়াছিলেন স্মরণ হইতেছে না।

সুরেশচন্দ্র বিপিনচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম পরিচয়ের বহু বৎসর পরে বিপিনচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁহার এক কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্রের অবারিত দ্বার; আমরা ক্রমে তাঁহার সহধর্মিণীর সঙ্গেও পরিচিত হইলাম। বিপিনচন্দ্র বিলাত যাত্রাকালে এই কন্যাটিকে সিস্টার নিবেদিতার নিকট রাখিয়া যান। তিনি নিবেদিতার মন্ত্রিত্ব সংঘের আশ্রয়ে সেবাব্রতে দীক্ষা লইলেন। নিবেদিতার স্কুলে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কর্মী হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'ইণ্ডিয়া রিভিউ' প্রকাশ করিলে এই কন্যা অন্য কার্যের ফাঁকে ফাঁকে পিতাকে যথাশক্তি সাহায্য করিতেন। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার যখন বিবাহ হয়, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি মেডী অবলা বসুর নারী শিক্ষা সমিতির অধীন শিল্পভবনের কর্মে লিপ্ত হন। সুরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তিনি এখন পর্যন্ত নারী শিক্ষা সমিতির কর্মীরূপে তাহাতেই লিপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্তা অমিয়া দেব।

সুরেশচন্দ্রের সাংবাদিক জীবনের শেষ পনর বৎসর কাল বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, সুরেশচন্দ্র আদর্শ সাংবাদিক ছিলেন। এলাহাবাদের 'লীডার' দৈনিকের প্রখ্যাত সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণি একবার বলিয়াছিলেন সাংবাদিকের সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকা আবশ্যক তাহা হইল 'অনুসন্ধিৎসা'। সুরেশচন্দ্রের ভিতরে এই অনুসন্ধিৎসা দেখিয়াছি পূর্ণমাত্রায়। ছোট-বড় নানা ধরনের বই, সাময়িকী, পুস্তকাবলী সকলের ভিতরেই তিনি জ্ঞাতব্য বস্তু যেন খুঁজিয়া পাইতেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদকীয় লেখক হিসাবে তিনি কিছুকাল যাবৎ কার্য করিয়াছিলেন। কোথায় কোন্ কাগজের টুকরা পড়িয়া আছে, সুরেশচন্দ্র সে সমুদয় খুঁজিয়া বাহির করিতেন এবং তাহাতে কোথায় কি কথা আছে তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতেন। অনেকসময়ই পাইতেন, অনেকসময় পাইতেন না। কিন্তু সময়সময় সংসার-বিরাজিত খোলা মনে সকলই সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে কোথায় কি তথ্য বা যুক্তি পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেখিতেন। অনেক সময় কাগজপত্র খুঁজিতে খুঁজিতে এমন টানা-হেঁচড়া করিতেন যে কাহারও কাহারও তাহা পছন্দ হইত না। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে অদম্য অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাইয়া আমরা কত যে মুগ্ধ হইতাম তাহা বলিবার নয়। এই অনুসন্ধিৎসা জনচিত্ত চর্চা প্রায় প্রত্যেক সাংবাদিকেরই কর্তব্য। শেষ দশ বৎসর সুরেশচন্দ্র রক্তের চাপে ভুগিতে ছিলেন। কোন কোন সময় দীর্ঘদিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইত। তখন পড়াশুনা না করিয়া সময় কাটানো তাঁহার পক্ষে কি কষ্টকরই না হইত। রোগমুক্ত হইয়াই তিনি পুনরায় যেন তাঁহার স্বভাবে ফিরিয়া আসিতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানার্জন-স্পৃহা প্রবল ছিল। অজানাকে জানিয়া লইবার এমন অদম্য আগ্রহ খুব কমই দেখিয়া থাকিব। সাংবাদিকের অত্যন্ত গুরু তিক্ত-কথায় বা অল্পমধুর ক্ষিপ্র রচনা—তাহাও তাঁহাতে দেখিয়াছি যথেষ্ট। যেখানে কঠোরতা আবশ্যক সেখানে তিনি কঠোর হইতেন, যেখানে মৃদু ভর্ৎসনা দরকার সেখানে মৃদু ভর্ৎসনা করিতেন। যেখানে স্বাগত করা প্রয়োজন সেখানে স্বাগত করিতেন। কিন্তু ইহার দ্বারা আসল মানুষটিকে ধরা যাইত না।

সাংবাদিক জীবনের কঠোরতা সুরেশচন্দ্রের চিত্তকে আদৌ ম্লান করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন খুবই স্নেহপ্রবণ এবং প্রীতিপরায়ণ। আমরা কনিষ্ঠেরা তাঁহার নিকট হইতে যে কত স্নেহ-প্রীতি লাভ করিয়াছি, বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। তিনি পরিচিত বন্ধুদের

প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়াই মধ্যে মধ্যে খোঁজখবর লইতেন। সুরেশচন্দ্র বর্তমান লেখকের বাঁশবাটীতেও আসিতেন। তিনি কখনও শুধু হাতে আসিতেন না। কখনও বিস্কুট, কখনও সন্দেশ, কখনও আখের গুড়—যা'হোক কিছু ছেলে মেয়েদের জন্য লইয়া আসিবেনই। কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রয়ত্নে কলিকাতায় কয়েক বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতি চালু হইয়াছিল। আমরা অনেকে তাহার সভ্য হই। সুরেশচন্দ্রও একজন সভ্য ছিলেন। আমরা কলিকাতার উপকণ্ঠে কখনও কিছু দূরে সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে যাইতাম। সুরেশচন্দ্রও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে যাইতেন। কি নিজ গৃহে, কি অন্যত্র সকল স্থলেই সুরেশচন্দ্রের প্রীতিপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়াছি। স্বাভাবিক সারল্য এবং প্রীতিপরায়ণতার নিমিত্ত তিনি ছোট-বড় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। আমরা একবার সোমপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গী হইলাম—শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ ও বর্তমান লেখক। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্তের আহ্বানে আমরা যাই। আমরা সকালের দিকে ওখানে গেলাম, সতীশবাবু তখন ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত আমাদের যাসত্ত করিলেন। সেখানায় সুরেশচন্দ্রকে তাঁহারা কি শ্রদ্ধার চক্ষেই না দেখেন। কিছুক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র আসিলেন। তিনি তখন পঞ্চাশের মন্বন্তর লইয়া একখানি গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। কালীদা'র "Famines in India" বইখানি আগেই বাহির হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গেই বেশীর ভাগ সতীশবাবুর কথাবার্তা হইল আহারের পূর্বে ও পরে। আমরা বিকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

সুরেশচন্দ্র আমাদিগকে বিশেষ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে নিরিবিলিতে থাকিবার নিমিত্ত তিনি কলিকাতা হইতে রেল লাইন উত্তরে 'বয়নগরে' (মধ্যগ্রাম) বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। এই অল্প ক'দিনের মধ্যেই তিনি স্থানীয় অনেককেই প্রীতির বন্ধনে বাঁধিতে সক্ষম হন।

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের সকলের বিদ্বান্ 'কিরণ-দা'। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, হাতে লাঠি, চলনে বলনে কেমন একটা একগুঁয়ে ভাব। তিনি কাহাকেও তোয়াক্কা করেন না। বয়সে, কর্মশিক্ষায় তিনি সকলের উপরে; তাই তাঁহার মুরুব্বিয়ানা প্রত্যেকেই মাথা পাতিয়া লন। যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই তিনি করিতেন। বিবেকের নিকট অন্য সকলই তুচ্ছ। এইরূপই ছিলেন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আমাদের কিরণ-দা।

কিরণ-দাকে প্রথমে দেখি দৌলতপুরে সেই ১৯২১।২২ সনে। তখন আমি বাগেরহাট কলেজের ছাত্র। কিরণ-দা বিদ্বান্, কিন্তু রচনাত্মক কর্মেও তিনি বিশেষ উৎসাহী। তরুণ ও ছাত্রদের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ছেলেরা এবং আশেপাশের যুবকবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার কথায় তাহারা ওঠে বসে। কিরণ-দা দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অনতিদূরে রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে 'সত্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে যুবকবৃন্দের শরীরচর্চার জন্য ব্যায়ামাগার ছিল, জাতীয়তামূলক পুস্তক-সংগ্রহ বা পাঠাগার চরখা, তাঁত ইত্যাদিও বোধ হয় ছিল।

বৎসর পূর্বের কথা, আমরা একবার অল্প সময়ের জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম। সব কথা ঠিক ঠিক মনেও নাই। ঐ সময়কার কিরণচন্দ্রের অনুরক্ত ছাত্র-শিক্ষক দ্বারা আমার কথার যাথার্থ্য যাচাই করা যাইতে পারে।

কিরণচন্দ্র 'সত্যাশ্রম'-এ খুলনা জেলা জাতীয় শিক্ষা

সম্বেদন আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাপতি পদে বৃত হন অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ নাগ। কামাখ্যাবাবু তখন বাঁশেরহাট কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ, আমরা কলেজের ছাত্র। তিনি আমাদের কয়েকজন ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া দৌলতপুরে আসিলেন। আমরা যখাসময়ে সত্যাশ্রমের প্রাঙ্গণে নীত হইলেই একটি খর্বকায় তেজস্বী মানুষ আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট সভাপতি কামাখ্যাবাবুই আমাদের লক্ষ্য, আমরা সঙ্গের ছাত্রেরা উপলক্ষ্য মাত্র। দেখিলাম তাঁহার হাফহাতা একটি কোর্তা গায়ে ঘাড়ের উপর বিন্যস্ত চাদর দুলিতেছে। পরনে মোটা খদ্দরের থান ধুতি, পায়ে নিজের তৈরি চটি। কামাখ্যা বাবুর সঙ্গে তাঁহার কত কথা! কথায় তিনি মজিয়া গেলেন। মনে হইল যেন উভয়েই উভয়ের পূর্বপরিচিত। সভার কার্য মহাসমারোহে সমাধা হইল। কিরণ-দা কিছু বলিলেন, সভাপতি বক্তৃতা করিলেন; সভার অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ যেমন প্রস্তাবাদি ইত্যাদিও নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে। কিন্তু এত দিন পরে স্পষ্ট কিছুই মনে পড়িতেছে না।

ইহার পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আতীর জীবনে বহু চড়াই-উৎরাই অতিক্রান্ত হইয়াছে। অসহযোগের পর বিপ্লবী প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, দুই দুইবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইল, বিপ্লবীরা তাহাতে কারবরণে যোগ দিলেন। এই সময়ক্রমে ব্যক্তিগত সংঘে পুনরায় বিপ্লব-কার্যাবলী সংঘটিত হইতে থাকে। এই বিপ্লব কার্যকে সরকার নাম দিলেন 'টেরোরিজম' বা সন্ত্রাসবাদ। কোন কোন লেখক বিপ্লবের বদলে সন্ত্রাসবাদ কথাটির ব্যবহার করিয়া বর্তমানেও যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহের কয়েক বৎসর পরেই আসিল আসল বিপ্লব। পূর্ব যুগের নির্যাতিত নিষ্পেষিত বিপ্লবীরা এই সকল মুক্তি আন্দোলনেও একান্তভাবে যোগ দিয়াছিলেন। এই বিপ্লবীদের পুরোভাগে ছিলেন বর্ষীয়ান কিরণ-দা। দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হইতে না হইতেই কারাগার হইতে বাহিরে আসিলেন রাজনৈতিক বন্দীরা বিপ্লবীরাও একে একে কারামুক্ত হইলেন। কিরণ-দা সরস্বতী প্রেস ও সরস্বতী লাইব্রেরির সহিত যেমন ভাবে যুক্ত ছিলেন। যুদ্ধের ভিতরে কোন কোন সূত্রে উঁহাদের কর্মকর্তাদের সহিত আমি পরিচিত হই। এই পরিচিতি শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হইল।

কারামুক্ত হইয়া কিরণ-দা সরস্বতী প্রেসের উপরিতলে বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উপরে উঠিলে তিনি প্রথম আলাপেই আমাকে একেবারে আপন করিয়া লন। যেন কত কালের পরিচয়। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন, বিভিন্ন সময়ে কারাগারে তাঁহার উপর যে নিপীড়ন হইয়াছে। শরীরের কোন কোন অঙ্গ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজের কথা খুব কম বলিতেন। জিজ্ঞাসা প্রশ্ন উত্তরের ফাঁকে ফাঁকে যেন ইহার কিছু কিছু বাহির হইয়া যাইত। তখন তাঁহার আহারাদির নিয়মিত, আমি যাইতেই ঔষধস্বরূপ কিছু খাইতে দেখিলাম। কিরণ-দা নিজের কথা মোটেই বলিতে চাহিতেন না। তাঁহার সহকর্মী কর্মীরা এখন প্রায় অনুপস্থিত। কাজেই তাঁহার কর্মময় জীবনের অনেকটাই অজানা থাকিয়া যাইবে। গত তিন-চার বৎসর যাবৎ কিরণ-দার মৃত্যুদিনে মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইতেছে। দেখিয়াছি প্রায় বক্তাই বলেন, কিরণ-দা নিজেকে একান্ত ভাবে গোপনে রাখিতেন, নিজের সম্বন্ধে কথাবার্তা কিছুই বলিতে চাহিতেন না। তথাপি পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে এখনও কিছু কিছু জানা সম্ভব। ইহারই বা বেশিও বা কমই কোথায়?

কিরণ-দা যশোহর জিলার ঝুনিয়াঝাই গ্রামের অধিবাসী। ইহা একটি সওগ্রাম। এখানকার ভট্টাচার্যেরা খুবই প্রসিদ্ধ। ভট্টাচার্য বংশের এক ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি—

তাঁহার বয়স ষাট হইবে—তাঁহারা শৈশবে নূতন নূতন লোকের মুখ দেখিতেন। তাঁহারা নদীপথে নৌকায় আসিতেন, আবার নৌকায় চলিয়াও যাইতেন। পরে শুনিয়াছেন, ইহারা কিরণচন্দ্রের চেলা। একবার কিরণ-দা'র বিরুদ্ধে রাজদাক্ষী হইবার জন্য সরকার পক্ষে কি উদ্যোগই না হইয়াছিল। কিরণচন্দ্র গ্রামবাসীর চিত্ত এতই জয় করিয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে যান নাই। এজন্য সরকারের হাতে গ্রামবাসীদের কম নির্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। কিরণ-দার কর্ম ও জীবন সম্পর্কে এই রকম ছিটেফোঁটা খবর যাহা পাওয়া যায় তাহাই লিখিয়া রাখা ভাল। কিরণ-দা প্রথম যৌবনেই বিপ্লবী দলের সংস্রবে আসেন। তিনি ঘরে ঘরে 'যুগান্তর' বিক্রী করিতেন। ক্রমে বিপ্লবীদলের মধ্যে দুইটি দলের উদ্ভব হয়। একেবারে গোড়াকার অনুশীলন সমিতির নামে অনুশীলন দল এবং যুগান্তর পত্রিকার নামে যুগান্তর দল। কিরণ-দা শেষোক্ত দলের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়েন। ১৯১০-৪৪ এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অন্যূন ত্রিশ বৎসর কাল কিরণ-দা কারাগারে ইংরেজ সরকারের অতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁকে তাঁকে যতটুকু সময় বাহিরে থাকিতেন ততটুকু সময়ই বিভিন্ন সংগঠনমূলক কার্যে ব্যাপৃত হইতেন। তাঁহার সকল কার্যই কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। যখনই যে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইত তখনই কিরণ-দা'র উপরে সরকারের রোষকষায়িত লোচন পতিত, তিনি তাহাদের মনে এমনই ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এত বড় বজ্রার মধ্যেও কিরণ-দা'র মনের সরসতার হানি ঘটে নাই। তাঁহার মন ছিল সাহিত্যধর্মী। সরস্বতী প্রেস ও সরস্বতী লাইব্রেরির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি একাত্ম হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার নিমিত্ত তাঁহার প্রয়াস ও যত্ন সর্বজনবিদিত।

দুবারে কারামুক্তির পর বর্তমান সরস্বতী প্রেস ভবনের উপরিতলে তাঁহার সঙ্গে অল্প আলাপেই বুঝিলাম, কিরণ-দা আমার জাতীয়তামূলক গ্রন্থ ও রচনাদির সহিত পরিচিত। যুদ্ধের সময় এখান হইতে প্রকাশিত 'মন্বিরার' প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া 'জাতি বৈর বা আমাদের দেশাত্ম-বোধ' উন্মেষের রীতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি। তখন 'মন্বিরা'র বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ কারাগারে ছিলেন। কিরণ-দা আমার এই প্রবন্ধগুলিও পাঠ করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম। কতকাল আগে তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি। এবারে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াই একেবারে তাঁহার আত্মীয় বনিয়া গেলাম। ইহার পর হইতে তাঁহার স্নেহপ্রীতি অযাচিত ভাবেই লাভ করিতে লাগিলাম। প্রতি শনিবার তিনি প্রেস বাড়ীর নিম্নতলে বসিয়া আমাদের একটি করিয়া সঙ্গেশ দিতেন। ঐ দিনটি আমাদের বড় প্রিয় ছিল। সঙ্গেশ একটি তো পাইতামই, তাঁহার হাত হইতে দ্বিতীয়বার পাইতেও কম চেষ্টা করি নাই। এই চেষ্টা সফল হইলে কতই না আনন্দ হইত আমাদের।

১৯৪৭ সনে ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল, আমরা স্বাধীন হইলাম। কিন্তু স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে বিবিধ বিষয়ে যে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক কি রূপে তাহা অর্জন করা সম্ভব? কিরণ-দা তরুণ সমাজকে যোগ্য নাগরিক ও কর্মকুশল করিতে চান। ইহার বহুতর উপায় আছে; একটি হইল পাঠাগার। এখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূলক বিবিধ গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে যুবক ছাত্রদের পাঠের নিমিত্ত। তিনি এই উপলক্ষ্য লইয়া কলিকাতা গোলদীঘির উত্তর দিকে একটি ভবনের দ্বিতলে 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' স্থাপন করেন। এই পাঠাগারের জন্য তিনি কত রকম চেষ্টা করিয়াছেন নিকট ও দূর হইতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার তাজা সাহিত্যধর্মী মন সাহিত্যিকগণকে তাঁহার নিকট আকৃষ্ট না করিয়া পারিত না। স্বভাবতঃ সাহিত্যিক-

সমাধান এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকের বক্তৃতা হইতেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার'টিকে কেন্দ্র করিয়া আবার একদল তরুণ কিরণদার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও আমি জানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, অথচ কত বিনয়ী। অধিগত বিষয়ের নির্দিষ্ট কুঠরীর মধ্যে না থাকিয়া তাহা ব্যাপকতর হইবে, আবার সমাজের কল্যাণেও তাহা সরাসরি প্রযুক্ত হইবে—এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই কিরণ-দা পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাঠাগারের পাঠক-সভ্যদের দেখিয়া এই আদর্শসিদ্ধির বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। বর্তমান জগতে স্বাধীনতা মানে ঘরকুনো হইয়া থাকা নয়, দেশ-বিদেশের হালচাল জানিয়া নিজেদেরও তৈরী করিয়া লইতে হইবে যাহাতে আমরা বাহিরের জগতের সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারি। 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' পাখাগুলির শিকার হত নয়। যাযাবরকে যাহারা শিক্ষিত করিয়া স্বপথে চালনা করিবেন তাঁহাদের শিক্ষাদানের নিমিত্তই 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার'। ইংরেজীতে একটি কথা আছে "Educate your leaders"—নেতাদের শিক্ষিত কর; কিরণদা'র উদ্দেশ্য ছিল ঠিক অনুরূপ। তাঁহার মৃত্যুর পর পাঠাগারটির স্থায়িত্ব সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি।

দৃঢ়চিত্ততা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা এই দুইটি মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন আমাদের কিরণদা। তিনি প্রাণপ্রিয় সরযূকে প্রেম ছাড়িয়া অকস্মাৎ অন্তর চলিয়া গেলেন। আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ কয়দিন কাটে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কি অসহ্য যন্ত্রণা! কিন্তু তাহা যেন কিছুমাত্র তাঁহাকে স্পর্শিতেছে না। অনবরত হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। শ্মশানে বন্ধুবান্ধবনির্বিশেষে বহু ব্যক্তি সমবেত হইলেন। কিরণ-দা ছিলেন সকল মত-বিরোধের ঊর্ধ্বে। এমন চিরকুমার ত্যাগব্রতী সাধক সন্ন্যাসীর তিরোধানে আমরা সকলেই মর্মাহত হইলাম। তাঁহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকুক এই প্রার্থনা।

(ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন (গত সংখ্যার)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
৬৫৬	২য়	২১	কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের	কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের
৬৫৭	১ম	৫	নৃতত্ত্ব বিভাগের	ভূতত্ত্ব বিভাগের
৬৫৯	২য়	৬	কালপেড়ে	লাল পেড়ে

নোটিশ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :

যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা	৪৭এ, রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা—২৬
প্রকাশের কাল :	মাসিক
৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি, ঠিকানা :	কিরণ চন্দ্র মিত্র, ভারতীয়, ৪৭এ, রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা—২৬
প্রকাশকের নাম, জাতি, ঠিকানা :	কিরণ চন্দ্র মিত্র, ভারতীয় ৪৭এ, রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা—২৬
সম্পাদকের নাম, জাতি, ঠিকানা :	লীলা রায়, ভারতীয়, ৪৭এ, রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা—২৬
৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	লীলা রায়, ৪৭এ, রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা—২৬

আমি কিরণ চন্দ্র মিত্র ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ
১লা মার্চ, ১৯৫৯

(স্বাঃ) কিরণ চন্দ্র মিত্র
প্রকাশক

শুভ্র-মুকুরের

মধুর দাশগুপ্ত

আমার এ মন যেন কোনো এক শুভ্র মুকুর ;
কাকের চোখের মত স্বচ্ছতার অবাক প্রকাশ।
পড়েছে অসংখ্য ছায়া তার পরে অন্ত ও প্রত্যহ
—আশ্চর্য্য মেটেনি হায় তবু তার প্রচণ্ড-তিয়াস।

কাজল রাত্রির হ্রদ যেমন চেয়েছে চিরতরে
আকাশের চাঁদটিকে রেখে দিতে নিজের হিয়ায়
এ মনমুকুরও ঠিক তারই মত উজ্জ্বল ইশারায়।
তোমার ছবিটি শুধু রাখতে চেয়েছে বুকে ধরে॥

মেটেনি সে আশা তার—কোনোদিন মিটবে না হায়
তবুও হৃদয়ে তার বার বার তোমাকেই চায়॥

দিলীপকুমারের

অনামী—দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে প্রচ্ছদপট—অবনীন্দ্রনাথ, আশীর্ব্বাদ শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ।

মণিমঞ্জুষা—সংস্কৃত, ইংরাজি, ফরাসী, জর্মন ও হিন্দি থেকে বাংলা কবিতা তর্জ্জমা।

কবিতাকুঞ্জ—প্রথম সংস্করণের শ্রেষ্ঠ কবিতা ও আরো অনেক নতুন কবিতা-সংকলন।

গীতিগুঞ্জন—দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ গানের সংকলন।

মীরাভজন—ইন্দিরা দেবীর হিন্দি ভজনাবলী সুধাঞ্জলির অনুবাদ—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের ভূমিকাসহ।

পত্রাবলী—বাংলা পত্র : রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, মোহিতলাল, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি।
ইংরাজি পত্র : শ্রীঅরবিন্দ, জর্জ্জ ব্রালেল, লোয়েস ডিকিনসন, রুথপ্রেম, সার পল ডিউকস্, সজীব রাও।
প্রভৃতি—চারশো পৃষ্ঠার বই। মূল্য—৬৷৷০ গুরুদাস লাইব্রেরী ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

শনিবারের সন্ধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ বসু

৩

সকালে আপিসে যেতে বিজয় সাধারণত বাড়ির সামনেই ট্রাম ধরে। কিন্তু পরদিন একটু আগে বেরিয়ে সে হাঁটতে শুরু করলে। প্রথমটা দ্রুত, তার পর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তার দু পাশে তাকাতে তাকাতে। একটু পরেই পাওয়া গেল এক ঘড়ির দোকান। কাউন্টারে এক ফিয়জায় মুরুব্বি দাঁড়িয়ে—অবাঙালী বলেই মনে হয়। তাকে ঘড়িটা দেখিয়ে বিজয় ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলে তারা কিনতে চায় কি না।

লোকটি ঘড়ির উপর ঝুঁকে পড়লে পর বিজয় সঙ্কোচে তাকে জানালে যে ওটা তার স্ত্রীর সম্পত্তি, বিয়ের উপহার, হাতছাড়া করবার ইচ্ছা ছিল না একেবারেই, কিন্তু দিন-কাল যা পড়েছে, ইত্যাদি। লোকটি হঠাৎ মাথা তুলে নির্বিকার দৃষ্টিতে শুধু এক বার তার দিকে চেয়ে ঘরের ভিতরের অংশে চলে গেল। সেখানে আর একটি লোককে সে দেখালে ঘড়িটা; এই লোকটি বয়স্ক, বোধ হয় দোকানের মালিক। আধ-অন্ধকারে ফিসফিস করে তারা আলাপ করে চলল, মাঝে মাঝে চোখ তুলে গভীর ভাবে বিজয়কে নিরীক্ষণ করতে করতে। ক্রমে অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করলে সে। ওরা কি তাকে চোর সন্দেহ করছে, পুলিশে খবর দেবার মতলব ভাঁজছে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম লোকটি ফিরে এসে তাকে এক শ টাকা দিতে চাইলে।

"এক শ!" বিজয়ের সব অস্বস্তি মুহূর্তে উবে গেল, তার স্থান দখল করলে বিস্ময়পূর্ণ অবিশ্বাস। "কি করে হয়—এ ঘড়ির যে অনেক দাম···এই সে দিন কেনা, চার শ টাকা পড়েছিল সোনার ব্যাণ্ড শুদ্ধু।"

বিন্দু মাত্র ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না দোকানীর মুখে। সরলহীন শান্ত সুরে জবাব দিলে, "এর মধ্যে সোনা খুব সামান্যই আছে। তা ছাড়া পুরনো ঘড়ির বাজার নেই—কেউ কিনতে চায় না। এর বেশী দাম আপনাকে কেউ দেবে না।"

"বটে। কিন্তু সেটা আমি যাচাই করে নিতে চাই," বলতে বলতে সে ঘড়িটা তুলে নিলে। লোকটার নিস্পৃহ তাচ্ছিল্যের সুর তাকে আরও ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। দোকান থেকে বার হবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চোখাচোখি হল, সেখানে ওর নির্বিকার মুখে এবার একটু আমোদের ভাব ফুটে উঠেছে।

আস্পর্ধা! বলে কিনা এক শ টাকা! কি ভেবেছে আমাকে—পাড়াগেঁয়ের ভূত? তাই ভেবেই বুঝি এসেছে পাঞ্জাব কি সিন্ধুপ্রদেশ থেকে বাঙালীকে ঠকাতে? নাকি ভেবেছে চোরাই মাল নিয়ে এসেছি খালস করবার ধান্দা দেখে তাই নিতে নেব। নিশ্চয় ভাবছে আবার ফিরে গিয়ে ওরই শরণাপন্ন হব।···একটু ভুল করেছে বন্ধু যাদু চিনতে। দাম পছন্দ হলেও তোমাকে ঘড়ি দিতাম না—ঘড়ি বেচতে আমি বেরোই নি, শুধু দামটা জানতে চাই মাত্র।

রাস্তায় আর দেরি না করে বিজয় এবার পা চালিয়ে

দিলে। আপিস তার খুব দূরে নয়, এটুকু হেঁটেই যাবে। এক প্রসিদ্ধ প্রকাশকের ঘরে কাজ করে সে। পাঠ্যপুস্তক নিয়েই অধিকাংশ কারবার এদের। বছরের এই সময়টায় কাজ পড়ে বেশী, দেরি করলে চলবে না।

সন্তানবেদনাটা তার কাটল মকস্বল স্কুলের অর্ডারের উত্তরে বই পাঠাবার ব্যবস্থায়। সাড়ে বারোটায় কয়েক মিনিট আগে সে বেরিয়ে পড়ল। আপিসেরই নিচের তলায় এক ঘড়ির দোকান, বাড়ি যাবার আগে সেখানে ঢুকল সে। দোকান বড়, সবাই ব্যস্ত, তবু একজন কাছে এসে খুব ভদ্র সুরে জিজ্ঞাসা করলে কি চাই, চোখে কাঁচ লাগিয়ে ভাল করে দেখলে তার ঘড়িটা, তার পর জানালে ওটাকে খুলে দেখতে হবে, স্প্রিং ইত্যাদি বদলে দিতে হবে—বিজয় কি ঘড়ি রেখে যেতে রাজী আছে? একটা রসিদ নিয়ে বিজয় বাড়ি চলে এল।

খেতে খেতে মাকপথে আপন মনে একটু হেসে সে জিজ্ঞাসা করলে মালতীকে, "হঠাৎ কিছু টাকা হাতে পেলে কেমন হয় বল তো?"

"টাকা? কিসের টাকা? কত টাকা?" মালতীর স্বর একটু সন্দিগ্ধ, যেন ঠিক বুঝতে পারছে না ঠাট্টা কিনা।

বিজয় এবার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল, আলগোছে বললে, "এই ধর তিন শ—দু শ তো বটেই।"

মালতীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "বুঝেছি, বোনাস দিচ্ছে আপিসে।"

"হাই বুঝেছ, এ সময় কেউ বোনাস দেয়—তাও আবার আমাদের আপিস, যারা পুজোতেও এক পয়সা খরচা করে না।" বিজয়ের সুরে তিক্ত খেদ।

"তা হলে কোত্থেকে পাচ্ছি টাকা—কোনও রকম প্রাইজ বা লটারি—"

"আরে আরে, পাচ্ছি কে বললে, আমি বলেছি যদি পাই। দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে—হ্যাঁ, বেশ তফাৎ আছে," বলতে বলতে বিজয় আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

মালতীর প্রশ্ন অনুযান সব ব্যর্থ হল, বিজয়ের দিক থেকে আর বিশেষ কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সে মনে মনে কল্পনার জাল বুনে চলল; বিজয়ের মনও তখন আত্মনিমগ্ন, তবে সম্পূর্ণ অন্য রাজ্যে।···কথাটা বেশী বাড়তে না দিয়ে ভালই করেছে। মালতীর হাতে ঐ টাকা পড়লেই হয়েছে আর কি, কোথা দিয়ে নদীর মত উড়ে যাবে টেরও পাবে না সে, মাকখান থেকে জোচ্চোর বনে থাকবে। সংসারের জন্য সে যা করছে, করে যাবে, তাই যথেষ্ট; এ টাকাটা তারই—অবশ্য যদি সত্যিই সে ঘড়ি বেচে। তার এই পুরনো তারবাহী হাড়গুলোতে একটু হাওয়া লাগা ভাল, মানুষের নিজেরও একটা অস্তিত্ব আছে সংসারের গণ্ডিটার বাইরে।···হ্যাঁ, ঐ কাশ্মীর ঘারভিলির শেষ পর্যন্ত হবে না—একলা হলে যাক কথা ছিল—তার চেয়ে ছুটি নিয়ে এখানে দিন কয়েক ফুর্তি করার স্যানটাই ভাল। Eat, drink and be merry! শহরের কাছাকাছিই কত বেড়াবার জায়গা আছে, গাড়ি ভাড়া করে আরামে যাওয়া যায়। রাণু মালতীকে নিয়েও সে একটা দিন যেতে পারে।

কিটিকে নিয়ে এক দিন সমুদ্র পর্যন্ত ঘুরে এলে কেমন হয়। কিটি কি মেবে না ধরা? ধরা তো দিয়েছিল তাদেরই মধ্যে একজনকে—অবশ্য সে সরকারের কথা যদি সত্যি হয়; সে সরকারের কতটাই অবশ্য সত্যি জানত তারা, কিন্তু এক সন্ধ্যায় এক শ টাকা খরচ করলে (ঐ অঙ্কটাই বলেছিল সে) এটা এমনই কি অসম্ভব ব্যাপার! যে দিন এই গল্পটা তারা শুনলে সে সরকারের কাছে (ফাস্ট ক্যাস-এর আধ-অন্ধকার কোণে বসে—কিটি তখন গাইছে রিটা হেওয়র্থের গান, আধ-বোজা চোখে

হয় বুঝ হেসে) সে দিন থেকে তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা চতুর্গুণ বেড়ে গেল বিজয়ের। কিন্তু এক রাতে এক শ টাকা চালা ঐ যে সরকারেরই সম্ভব, বিজয়ের মত বীমার দালালের নয়···। এখন অবশ্য অন্য কথা। আজ কিটিকে যদি সে খুঁজে নাও পায়, অথবা যদি দেখে তার যৌবন অস্ত-প্রাপ্ত, তো দ্বিতীয় কিটি আবিষ্কার করে ক্ষুধা মেটানো অসম্ভব নয়।

যে আগুন জ্বলেছিল পাঁচ বছর আগে আজও যে তা একেবারে নিভে যায় নি—মালতী, বাবু আসার পরেও—এটা আবিষ্কার করে একটুখানি সংকোচের মধ্যে তার ভালই লাগল। যৌন আকাঙ্ক্ষা তার কি একটু বেশী? কিন্তু যাই বল মালতী আবার বড় বেশী ঠাণ্ডা—বিশেষ করে বাবু হওয়ার পর থেকে আরও জুড়িয়ে গিয়েছে। ভাল গৃহিণী হওয়াই সব নয় মেয়েদের, মাদকতা একটা বড় জিনিস।

কিটিকে যদি প্রথমেই সে ঘড়িটা উপহার দেয় তো কেমন হয়, বেশ ঘষে মেজে নতুনের মত করে। এটা বেচে দেওয়া তার অন্যায় হতে পারে, কিন্তু আর কাউকে যদি দান করে—

"তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না?"

মালতীর প্রশ্নে তার চমক ভাঙল। বারে বারে চটা আসের আঁটিটা পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ল। দুপুরের গনগনে রোদে পিচগলা রাস্তায় এসে ট্রাম ধরলে।

বিকালে আবার সে মিনিট কয়েক আগে বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছে—নিচের দোকানটা পাঁচটায় বন্ধ হয়—এমন সময় দুই প্রহরের মত রোহিণী বাবু এসে উপস্থিত হলেন। লোকটির সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি তার কোনও দিন, এর পরে যে ধরণের বাক্যবিনিময় হল, তাই বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক:

"পনের মিনিট আগে পালাচ্ছ যে, মতলবটা কি?"

বেশ সরস সুরে খেমে খেমে জবাব দিলে বিজয়, "পালাচ্ছি না, যাচ্ছি, রোহিণীবাবু। আর পাঁচটা বাজতে এখন দশ মিনিট বাকি—মাঝে নয়ই বরং বলতে পারেন—পনের নয়।"

রোহিণীবাবুর চোখ সর্ষেই একটু লাল, এক মুহূর্ত কিছু না বলে তিনি চেয়ে রইলেন বিজয়ের দিকে বাই-ফোকাল কাঁচের মধ্য দিয়ে, তার পর প্রশ্ন করলেন, "টেবিলের ওপর যে অর্ডারগুলো জমে উঠছে তার ব্যবস্থা কে করবে? দেখে তো মনে হয় আজ ওগুলো ছোঁয়াই হয় নি। তার ওপর আবার আগে বেরিয়ে যাচ্ছ—দুপুরেও লক্ষ্য করেছি—ঠিক যখন আপিসে এত কাজ।"

"কাজ যদি কিছু নাই করি তো এখানে বসে থাকাও যা বাড়ি যাওয়াও তা," বলতে বলতে বিজয় দরজার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে আলগোছে যোগ করলে, "ভাববেন না, কাল সব ঠিক করে দেব।"

তাড়াতাড়ি দোকানে নেমে গেল সে। এবার এরা যে সংখ্যাটা বলবে তা অনেক বেশী সন্তোষজনক—আড়াই শ টাকা। যদি বিজয় রাজী থাকে তবে ভিতরে ঢুকে এক বিক্রয়পত্র সই করতে হবে তাকে।

"এখন নয়, পরে আসব," বলে ঘড়িটা নিয়ে সে চলে এল।

বাড়ি ফিরে জলখাবার খেয়ে জানলার কাছে তার ক্যাবিনের চেয়ারে সে বসল খবরের কাগজ নিয়ে। সকালে সময় হয় না, এই সময়ে মনোযোগ দিয়ে সে কাগজটা পড়ে ঘণ্টাখানেক; খবর পড়া শেষ হলে চোখ বুলিয়ে যায় খালি চাকরির কলমে, এ তার বহু দিনের বাল্যিক অভ্যাস। সেখানে বিশেষ কিছু না পেয়ে কাগজটা মুড়ে চেয়ার হেলান দিয়ে হাই তুললে। কিছু দিন থেকে এই সময়ে মেয়েকে নিয়ে সে বসতে আরম্ভ করেছে, সবে

পড়া শুরু করেছে রাণু, কিন্তু সেদিন মেয়ে বা মা কারওই নাওয়া খাওয়া যাচ্ছিল না বাড়িতে।

মেয়েটা কি তাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে নাকি? ফালগু তো একবার এল না কাছে। কেন, সে ভেবেছে বলে? ওঃ,খুব ভুল দেখছি বাবাকে। হঠাৎ বিস্ময়ের মুখে একটুখানি কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল নিজের মনে যুক্তির একটা সূত্র আবিষ্কার করে। বলতে গেলে এক রকম রাণুরই জন্য ঘড়িটা তার হাতে এসেছে। ওর জন্য কাপড় কেনা হল, ও অপছন্দ করল বলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হল, সেটা মাটিতে পড়ে গিয়ে সন্তান দিনে ভগ্নদশার। অথচ ঐ মোড়কটার উপর, রাণুর উপর, কি বিরক্তই সে হয়েছিল সে দিন! কিসের থেকে কি হয়, আশ্চর্য! না, এখন দেখা যাচ্ছে ঐ চড়টা রাণুর প্রাপ্য ছিল না।

আরও বার কয়েক হাই তুলে সে আবার খবরের কাগজটার ভাঁজ খুলল অলস ভাবে, অন্যমনস্ক দৃষ্টি পড়ল যেখানে পড়া শেষ করেছিল সেখানে। কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ বুকটা দুরদুর করে উঠল, শরীরময় এক ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে উঠে বসে কাগজটা চোখের সামনে এনে ধরলে, পড়ন্ত আলোয় বার বার করে পড়লে 'চাকরি খালি' অংশ যেখানে শেষ হয়েছে তার ঠিক নিচের প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি। ইংরাজির আক্ষরিক তর্জমা করলে দাঁড়ায়:

'লুপ্ত। বিগত শনিবার বিকালে ইলিশিয়ান উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মহিলাদের কবজি-ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ডযুক্ত। উদ্ধারে পুরস্কার দেওয়া হইবে। মিস মিজ··· নামের পরে শহরের দক্ষিণাঞ্চলের এক ঠিকানা।

এই ক্ষুদ্র বাণীটুকু বার বার পড়ে, ঐ হারানো ঘড়ি আর তার পাওয়া ঘড়ি যে একই এ বিষয়ে যখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না, তখন দেয়ালের দিকে চেয়ে সে স্থির হ'য়ে বসে রইল কয়েক মিনিট; বসে বসে অনুভব করলে ক্রমশ এক কথার বিষাদ বিরক্তি ছেয়ে ফেলছে তার সমস্ত চেতনা।···হ্যাঁ, ঠিক এমনটি না হলে চলবে কি করে! কত শত লোক প্রতি দিন কত শত জিনিস হারাচ্ছে, তাদের মধ্যে ক'জনই বা ফিরে পাবার দুরাশায় পয়সা খরচ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—কিন্তু এই···এই হারা মেয়েটার ঠিক তাই করা দরকার হয়ে পড়ল! তাও আবার শহরের এক জন কাগজের মধ্যে ঠিক যেটা আমি পড়ি সেটাই তার পছন্দ! আর—যে আমি কোনও দিন সাত আট ঘণ্টার বেশি নজর দিই না, ঠিক আজই হঠাৎ তার ওটা পড়া দরকার হয়ে পড়ল!

হঠাৎ হাসি চাপা যায় হয়ে উঠল, অন্তত সেটুকু মুক্তি তার চাই। বিজয় ছেড়ে দিলে নিজেকে, শূন্য ঘরের অন্ধকার গর্ভে তার দেহ কেঁপে কেঁপে চলল কিছুক্ষণ প্রাণ-নিঃশব্দ হাসিতে।

দেহের সমস্ত জোরটুকু দিয়ে কাগজটা সে ছুঁড়ে মারলে দেয়ালের গায়ে, তার পর চেয়ারে এলিয়ে চোখ বন্ধ করলে।

···তা হলে এখন আমার কর্তব্য নির্দিষ্ট, রাস্তা একেবারে সোজা, কিন্তু তার মধ্যেও লেখা আছে, 'কিন্তু' আছে। যেখানে সকলেই অসাধু সেখানে সাধুতাই কি ঠিক, সেখানে তার মূল্য কতটুকু? সততার মূল্য দেবার লোক তো নেই আজ সমাজে বোকামিরই অন্য নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে তা। একটা লোক দেখাতে পার যে পুরোপুরি সৎ, যাকে কেনা যায় না কোনও দামেই হঠাৎ কাগজ গোছানোর কর্কশ শব্দে তার চমক ভাঙল, তার পরেই এক মৃদু চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। পাশের ফ্ল্যাটে আজ্ঞা সেরে মালতী ফিরছে তার মেয়েকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি হাত তুলে চোখ ঢেকে একান্ত বিরক্তির সুরে বিজয় বলে উঠল 'আঃ, আলোটা নেভাও না!'

আলো নিভিয়ে পায়ে জড়ানো খবরের কাগজের

পাতাগুলি তুলে সযত্নে তাঁজ করলে মালতী। তারপর কাছে এসে স্বামীর কপালে হাত রেখে একটু উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করলে, "শরীর খারাপ করেছে নাকি?"

"না না, শরীর খারাপ করেনি, এমনিতে কি কারও একা থাকতে ইচ্ছে করে না।" যেন অতি কষ্টে ধৈর্য রেখে কথাগুলি বলতে বলতে বিজয় মালতীর হাতের থেকে নিজের মাথাটা সরিয়ে নিলে। মালতীর হাতের আকস্মিক ছোঁয়াটা ছিল ঠাণ্ডা, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মত।

"কিন্তু রাহু যে বাড়ি এসে পড়বে বলে। পড়া যাদ দিতে একেবারেই রাজী নয় মেয়ে তোমার।"

চোখ বন্ধ করে আরও কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল বিজয়। তারপর তার মনে পড়ল রাহু ঠিক সময়ে বাড়িতে ছিল না বলেই কাগজটা সে দ্বিতীয় বার খুলে ধরেছিল।

"এতক্ষণ কোথায় ছিল হতচ্ছাড়ী," চীৎকার করে উঠল সে, "মহারাণীর কখন সময় হবে তার জন্য কি আমাকে হা করে বসে থাকতে হবে?"

রাহু এ পর্যন্ত দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, এবার আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে মাকে ধরে তার পিছনে দাঁড়াল।

মুখ নরম করে মালতী বললে, "দেরি একটু হয়েছে, কিন্তু রাহুর দোষ নেই, ওই বরং আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে বাড়িতে। জান তো এই পড়বার সময়টুকু তোমার সঙ্গে বসতে ওর কত ভাল লাগে—আর এই দু দিন তুমি বেচারাকে একবার কাছেও ডাক নি।"

এক মুহূর্ত বিজয় ভুলে গেল নিজের সব ক্ষোভ আর বিরক্তি, হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছা হল রাহুকে বুকে টেনে নিতে। কিন্তু মুহূর্তটি চলে গেল, ভিতর থেকে কে যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল অন্য দিকে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করলে, "নিজের বাড়িতেও যে একদিন একটু শান্তি পাব তার উপায় নেই—সব সময় একটা কর সেটা কর।" বলতে বলতে চেয়ারটা তাঁজ করে সে হাতে উঠে এল, নির্বিষে নিজের ভাবনা ভাবতে।

সেখানে বন্ধিনের মৃদু মন্দ হাওয়া তখন নিজের তাপ বুঝে নিচ্ছে অলস সহরটার গা থেকে। স্বচ্ছ আকাশের কোলে অসংখ্য উজ্জ্বল তারার ঝকমকানি, যেন নীল মখমলের উপর কে ছেলে দিয়েছে মুক্তার স্রোত। ঘরের হাত আর বেরাল নিয়েরে কোন সূত্রে মিলিয়ে গেল। কিন্তু বিজয় চোখ বন্ধ করলে, শান্তিতে তার চিন্তাসূত্রের জট ছাড়িয়ে মনে খানিকটা শান্তি আনবার চেষ্টায়।

—হাঁ, তা হলে এই দুর্নীতিপূর্ণ পচা সংসারটায় একা আমাকেই তুলে ধরে থাকতে হবে সাধুতার মশা—পাপে যদি দেশ ছেয়ে যায় তা হলেও? এই মেয়েটিকেই ধর না, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড—এই মিস মিত্র। শহরের ধনী অঞ্চলে বাস, নিশ্চয় কোনও বেঈমান মুনাফের আহুরে কন্যা, যে সুদের তাঁরই মত হতভাগাদের রক্ত শুষে বানিয়েছে একটার পর একটা প্রাসাদ, কিনেছে একটার পর একটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাড়ি। তার মেয়েও কিনা সামান্য জিনিষটা কিরিয়ে না পেলে চলবে না।

আহা, পয়সাই কি সব, সেন্টিমেনটের বুঝি দাম নেই। ওটা হয়তো তার বয় ফ্রেণ্ডের এক জনের থেকে বিশেষ উপলক্ষে পাওয়া। হাঁ, এই ধনীর দুলালী আধুনিকাদের আমি জানি, যারা আমার মত লোককে চোখেই দেখতে পায় না, যদিও আমার শ্রেণীর তুলনায় তারা অনেক বেশী নির্লজ্জ, দুর্নীতিপূর্ণ। এক মাত্র কাজ যা এরা ভাল জানে তা হল মেরুটাকে নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মজা লুটে বেড়ানো প্রথমে বাপের পয়সায়, তারপর বন্ধুদের, তারপর একের পর এক স্বামীর।

হাঁ, এঁদের আমি জানি। সন্ধ্যা বেলা ঐ নিভৃত কুঞ্জে বসে উনি কি করছিলেন সে বিষয়ে তাও অনুমান করতে পারি। Necking, petting, smooching—আমেরিকান

ফিল্‌ম থেকে তো সে সব দেখা আছে ভাল করেই। যদি হারিয়ে কতটুকুই বা সাদা হয়েছে এই দুর্নীতির!

এই রকম মানুষের খাতিরে নীতির নিন্দা দেখাতে হবে আমাকে! তার বদলে পাব হয়তো একটুখানি কৃতার্থ করা হাসি আর বেশি কিছুনয়। না না, পুরস্কার আছে, যদিও তার পরিমাণটা উনি ভুলে গেছেন আমাতে। সবটা ভুলে গেছেন, কারণ ঘড়ির দামের তুলনায় তা হবে নিতান্তই সামান্য। বিজ্ঞাপনের বাক্যবিলাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শুধু লোভ দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার মতলব।···

এই রকম ভাবতে ভাবতে বিজয়ের মন আবার শান্ত হয়ে আসছিল, তাই ভয় কেটে যাওয়ার ভয়ে চোখ না খুলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলে একেবারে খাবার সময় পর্যন্ত। খেতে নামতে নামতে টের পেলে দিদা সংসার কেটে যাওয়ার ফলে মন তার অনেকখানি হালকা হয়ে গিয়েছে; এই সিদ্ধান্তে এসেছে সে যে সব দিক থেকে ভেবে দেখলে ঘড়িটা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই—এমন কি তা উচিতও নয়।

৪

মন ঠিক করে ফেলা সত্ত্বেও আপিসে পরের দিনটা বিজয়ের কাটল বিশ্রী অস্বস্তিতে। কাজ যেটুকু করল তা আগের চেয়েও কম এবং রোহিণীবাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সে দিন। বিকালে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে চিঠির বাক্সে নজরে পড়ল একখানা খাম। দাদার হাতে লেখা ঠিকানা দেখে বুঝলে মার চিঠি। একটুখানি পরিতাপের সঙ্গে মনে পড়ল গত শনিবার সে ঠিক করেছিল মাকে চিঠি লিখবে বলে, তার পর একেবারেই ভুলে গিয়েছে।

জানলার কাছে তার ক্যাম্বিশের চেয়ারে বসে বিজয় চিঠিখানা খুললে। ভিতরের লেখাও দাদার হাতের লেখা। হঠাৎ দুঃসংবাদের আশঙ্কায় বুকটা একটু কেঁপে উঠল। পত্রে লেখকের নাম ছিল বিজয়। তার কয়েছিল বিজয় তার চেয়েও গুরুতর। হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়ে তাঁর একদিক অসাড় হয়ে গিয়েছে, কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। বেশী বয়সের জন্যে এখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন: গ্রামের ডাক্তার যথাসাধ্য করেছেন, কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায় নি এখনও; জ্ঞান হয়ে নি, প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন; ডাক্তার উঁহতে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার সন্দেহ করেছেন, এক্স-রে করা দরকার, কিন্তু এত দুর্বল অবস্থায় পনের মাইল দূরের হাসপাতালে নেওয়া অসম্ভব; সেখানকার বড় ডাক্তারকে একবার এনে দেখাতে চেষ্টা করছেন দাদা, বেশ নাম করা সিনিয়র লোক তিনি, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁকে ডাকা অনেক টাকার ব্যাপার; সেটা যেমন করেই হক যোগাড় করতে হবে। পরিশেষে দাদা লিখেছেন: 'যদি পার তবে একবার আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইবে, কিন্তু সম্ভব না হইলে অধিক চিন্তা করিয়ো না। তোমার পক্ষে বিশেষ কি আর করিবার আছে, সবই ভগবানের হাতে।'

প্রতিটি কথায় আরও মনোযোগ দিয়ে বিজয় আবার চিঠিটা পড়লে, তার পর আস্তে আস্তে সেটাকে ভাঁজ করে পকেটে রাখলে। করবার নিশ্চয় তার আছে, অন্তত কিছু টাকা যে অবিলম্বে সে পাঠিয়ে দিতে পারে প্রথম দিকে শুধু এই কথাটাই সে পরিষ্কার করে ভাবতে পারলে। এ বোধটুকু ছাড়া মনটা তার একেবারে খালি হয়ে গেল কিছু ক্ষণের জন্য। ক্রমে আচ্ছন্ন চেতনার মধ্যে যে অনুভূতি জেগে উঠল তা এই যে মা তার বাঁচা যাচ্ছেন। সেই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন দাদা। তেষট্টি বছরের দুর্বল দেহ কি করে বাঁচতে পারে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার নিয়ে, যদি অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসা না হয়! ইস, কি ঝঞ্ঝাটই না হচ্ছে হাড় যেখানে ভেঙেছে—ওঃ

দিয়ে কি যন্ত্রণা মারা যায় দিনের পর দিন। হঠাৎ তার ভীষণ রাগ হল মায়ের উপর—কেন সে এখনও বড় ডাক্তারকে নিয়ে আসেনি যে করে হক; মনে মনে বাদি টাকার কথা ভাবলে আর ভগবানের উপর ছেড়ে দিলে কি করে কি হবে? ইস্, মা যদি আজ এখানে থাকতেন তার কাছে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করলে বিমল। আজই, এখুনি রওনা হবে সে। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই টেন্‌শন এলে তা হলে নির্ঘাত চাকরিটা হারাতে হবে। এমনিতেই তাদের আপিসে ছুটির নিয়ম কানুন কড়া, উপরন্তু বছরের এ সময় ছুটি একেবারে নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় আগে না জানিয়ে গেলে সে সুযোগ কখনও ছাড়বেন না রোহিণীবাবু। তা ছাড়া আজ রাতের ট্রেনে গেলেও কাল সন্ধ্যার আগে সে পৌঁছাতে পারছে না আর তখন হয়তো গিয়ে দেখবে সব শেষ হয়ে গিয়েছে; চিঠিটা লেখা রবিবার সন্ধ্যায়—দু দিন আগে। কেন যে দাদা আরও আগে একটা টেলিগ্রাম করেন নি। কে জানে—এখন, এই মুহূর্তেই হয়তো মা আর নেই···

হঠাৎ সে ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল মালতী, দেখলে পোয়াটা ভরা চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে। তৎক্ষণে রাস্তায় নেমে দ্রুত হেঁটে চলেছে বিমল।

লোয়ার ইলিশিয়ান গার্ডেনে ঢুকে প্রথম বেঞ্চিটায় সে বসে পড়ল, পাশের লোকটির দিকে ফিরেও তাকাল না। কিছু সময়ের মধ্যেই ক্রমে অস্থিরতা কেটে গেল তার। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার দেখতে দেখতে ঘনিয়ে আসছে, তার মধ্যে একলা বসে অনেকটা শান্ত মনে ভাবতে পারলে সে, যদিও ভাবনা কেবলই ঘুরে চলল উদ্বেগহীন দিশাহারার খানাচে কানাচে, ভেতো-মিঠে স্মৃতির খনি গলিতে।

সব নিষ্ফল ভাবনা সে কিছুতেই এড়াতে পারছে না, যতই সে চেষ্টা করে কি এখন কর্তব্য, কি করে বাঁচানো যায় মাকে এই সব বাস্তব ও জরুরী ব্যবস্থার কথা ভাবতে। আর থেকে থেকে এই ভয়ংকর, অনিবার্য সত্যটি ফিরে আসে মনে যে মা তা হলে আজ সত্যিই যাচ্ছেন, আর দিন কয়েকের মধ্যেই (এমনই হয়তো বা) বিশ্বের সমস্ত অনুশোচনা ও শোকের বিনিময়েও মার সঙ্গে একটা কথা বলাও তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

এই চিন্তা, এই সম্ভাবনা যে এতখানি দুর্বিষহ বোধ হচ্ছে তা ভেবে সে নিজেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। মায়ের জন্য তো কোনও দিনই বিশেষ করে সে ভাবেনি। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার চোখে যা ছিল এক উৎস; দ্বিধাহীন প্রশ্নহীন অপরিমিত ভালবাসা ও সেবার প্রায় নৈর্ব্যক্তিক এক উৎস, যেখান থেকে যখন খুশি যত খুশি সে নিতে পারে। অন্যান্য অধিকাংশ পুত্রের মত মাকে সে ধরেই নিয়েছে—সৈশবে খাওয়াবে পড়াবে ঘুম পাড়াবে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দেবে, বড় হলে জামা পিছনে ঘরে যাবে বাবার যাবি খাওয়া ওটিয়ে নিয়ে, তাকে ছেড়ে যেবে নিজের স্বাধীন জীবনে। আর ঠিক তাই করেছেন মা, এর এটা যে কত বড় ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহ তা কোনও দিনই ভেবে দেখে নি বিমল এর আগে, আজ সে ভাবছে—ভেবে যখন আর কোনও লাভ নেই। কোনও দিন বুঝতে চেষ্টা করে নি মাকে কতখানি খুশী করতে পারত তাঁর অনুচ্চারিত ইচ্ছার খাতিরে নিজের যেমন খুশির সামান্য একটু ক্ষতি স্বীকার করে: যে ইচ্ছা অনুচ্চারিত কিন্তু সহজবোধ্য, সামান্য ও সহজে পূরণীয়।

বিমল যে মনে মনে নিজেকে খুব অপরাধী বোধ করছিল তা নয়—সংসারের এই ধারাই তো তার চার পাশে সে দেখতে পাচ্ছে। তার শুধু ভেবে অবাক লাগছিল যে মার জন্য দুঃখে আর ভয়ে আজ যার বুক ভরে উঠেছে কি করে এত দিন তার মন সাড়া দেয় নি, কেন সে সেব

জীবনে যাকে একটু সুখী করতে চেষ্টা করে নি। সজ্ঞানে কখনও সে যাকে আঘাত দেয়নি এবং প্রায় অজ্ঞানে, সর্বদা অনুভব করেছে যার প্রতি নিজের ভালবাসা। মনের আরও গভীর তলে ছিল অস্পষ্ট একটা দৃঢ়সঙ্কল্প যে যার জন্য এক দিন কিছু একটা করবে, তাঁকে সুখী করবে শেষ জীবনে। কিন্তু স্কুলের ছেলে যেমন ক্লাসের পড়া ফাঁকি দেবার সময় তাকে পরীক্ষার আগে সব শুদ্ধ নেবে তেমনি তার সিদ্ধান্তও এক সামু সংকল্প যার থেকে গেল শেষ পর্যন্ত। আজ সে বসে আছে খেলিতে পরীক্ষাপত্র হাতে নিয়ে, জবাব খুঁজে পাচ্ছে না কিছু।

কিন্তু সত্যই যার জন্য সে কি করতে পারত, বিজয় জিজ্ঞাসা করলে নিজেকে। প্রতি সপ্তাহে সে তাঁকে চিঠি লিখেছে—দু তিন লাইন অন্তত নিশ্চিন্ত রেখেছে যে সে ভাল আছে; এবং মাসের প্রথমে নিয়মিত পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁর খোরাকি—কখনও ভুল হয় নি বা দেরি হয় নি। এর বেশী কিই বা প্রয়োজন ছিল মার? জীবনে এই প্রথম মার একটা মন থেকে বেড়ে না ফেলে বিজয় স্পষ্ট করে চেষ্টা করে তার জবাব খুঁজে বার করলে। হ্যাঁ, সে জানে মা আরও কিছু চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তাকে আরও ঘন ঘন দেখতে, তাকে আর বেশী দিনের জন্য কাছে পেতে।

দুই ছেলের মধ্যে বড় জন বরাবর বেশের গ্রামেই থেকে গেছেন, সামান্য যা জমিজমা আছে তাই নিয়ে সে বিয়ে করে চলে এসেছিল কলেজে পড়বে বলে, আজ প্রায় বারো বছর আগে। তারপর থেকে মাকে শুধু সে দেখেছে ছুটিতে। কলেজের ছুটি ছিল লম্বা, তাই তখনকার দিনে যাওয়া খুব দূরহ ছিল না। মনে পড়ে সে কালে গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে তাঁর আপত্তি ছিল না, বরং মাঝে মাঝে বলেছেন বিজয় ডাক্তারি পেলে তার পরে সেখানে এসে বাস করবার কথা—খুব সম্ভবত তখন তোলেন নি সে প্রসঙ্গ কিন্তু অনেকখানি স্বপ্ন যেন মাখানো ছিল কথাগুলির মধ্যে। এও মনে পড়ল, আজ অনেক দিন পরে যে পরিকল্পনাটা তার নিজেরও মন্দ লাগত না সেই কলেজ জীবনে।

মায়ের বিয়ের পর মা যেন ক্রমেই আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরতে থাকলেন তাঁর সেই স্বপ্নকে। এক বিয়ের মুহূর্তে দৃষ্টি বিজয় প্রায়ই দেখত তাঁর চোখে। বি, এ, পাশ করলে সে, ভাল চাকরির জন্য দীর্ঘ নিষ্ফল চেষ্টার পর বীমার দালালি আরম্ভ করলে। মাইনে সামান্য, কমিশনের উপরই নির্ভর, মাস গেলে অল্প কয়েকটা টাকা হাতে আসত। ক্ষুদ্র অনিশ্চিত উপার্জনের তলদেশ থেকে পয়সা নিয়ে আসতে সে সাহস করেনি তখন।

ক্রমে কাজ যখন বাড়ল অবস্থা ভাল হল, তখন বোধ করলে আর একটা তাগিদ—একটু নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নেবার, স্বাধীন নির্ভাট পরিবেশে জীবন যৌবন উপভোগ করবার। এত দিনের দীনতা উৎকণ্ঠা আর কষ্টের পর ও টুকুর প্রয়োজন শুধু নয়, অধিকারও নিশ্চয় তার জন্মেছিল।

কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটি ছাটাও তখন অনেক কমে গিয়েছে, বাড়ি গেলেও পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকা চলে না; তার মধ্যে মার সঙ্গে মনে তাঁর আশা আকাঙ্খা সুখ দুঃখের কথা ওঠবার সুযোগ তেমন হত না এবং —আজ এমন বিজয় স্বীকার করলে—তার নিজেরও আর আগ্রহ হত না ও সব শুনতে। আজ ভাবতে ভাবতে এ কথাও মনে পড়ে কেমন করে ক্রমশ মা নিজেই ও সব কথা তোলা একেবারে বন্ধ করে দিলেন—নিশ্চয় টের পেয়ে ছিলেন বিজয়ের গূঢ় অভিসন্ধি, তবু শেষেছিলেন কিছু বললে তার আশা আরও কমে যাবে। যা সে নীরব রয়ে গেলেন এ ছাড়া আর কোনও ফায়সালা থাকতে পারে না তার।

তাই পর পর কি যেন ঘটল হ্যাঁ, তার পর বিজয়। সেটা

ঠিক কি করে ঘটেছিল স্পষ্ট করে মনে করতে চেষ্টা করে সে বিজয়। বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কয়েক জন সংসারী হওয়ার পর বিয়ের সম্ভাবনা মনে আসত প্রায়ই। এক দিন অবশ্য করতে হবে, কিন্তু কবে। আর কিছু দিন চলুক না এই স্বাধীন জীবন। এমনি করে দিন যায়। এমন সময় বিভু কাকা হঠাৎ এলেন তার মেসে, সঙ্গে একটি মেয়ের ফটো। বললেন এবার তার বিয়ে থা করা উচিত, এরা ভাল ঘর ইত্যাদি, যাকে সব জানিয়েছেন, তাঁর পছন্দ হয়েছে। মৃদু আপত্তির মধ্যে যথাসম্ভব আলগোছে সে ছবির দিকে তাকাল, নেহাত মন্দ লাগল না। যাবার সময় বিভু কাকা ছবিখানা রেখে গেলেন, ভুল করে কি ইচ্ছা করে বোঝা গেল না, বিজয়ও তাঁকে মনে করিয়ে দিলে না।

এই সময় এক বন্ধু জানালে এই চাকরিটার খবর, বললে তার দাদার কিছুটা হাত আছে, তিনি চেষ্টা করতে পারেন বিজয়ের হয়ে। হিসাব করে দেখলে বিজয় রোজগার যে খুব বাড়বে তা নয়, কিন্তু মাস গেলে বাঁধা মাইনে, বাৎসরিক বৃদ্ধি, নির্ধারিত গ্রেড। বীমার কাজের মত অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা, ছুটোছুটি, খোশামোদ এ সব নেই। বিজয় ঢুকে পড়ল ঐ বইয়ের কোম্পানিতে।

ভালই লাগছিল নতুন চাকরি। ইতিমধ্যে বার করেক সে ছবিখানা বার করে দেখেছে, বিশেষ করে চাকরি পরিবর্তনের সময়। বিভু কাকা বলে গিয়েছিলেন কিছু দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, ফিরে এসে দেখা করবেন। বিজয় মোটামুটি ঠিক করে রেখেছে একবার এলে ছবিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলবে এখন সে বিয়ে করবে না। কিন্তু বিভু কাকার দেখিতে এই কথাটা বলা হয়ে উঠছে না বলে তার খুব দুঃখও নেই।

এমন সময় হঠাৎ এক দিন অদ্ভুত ভাবে তার মন ঠিক হয়ে গেল। রবিবার বিকেলে বাসে করে চলছে সে বন্ধুর বাড়ি, দুটো সিট আগে বসেছে এক তরুণী কন্যাটি। বারে বারে দু জন দু জনের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছে, আর একটু যাচ্ছে, কথা কিছুই শোনা যাচ্ছে না; চার পাশের লোক সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন, অন্যরাও সচেতন নয় তাদের প্রতি। এক মাত্র বিজয় সময়ে নিরীক্ষণ করে চলল প্রতিটি খুঁটিনাটি, যদিও এ দৃশ্য কিছু নতুন নয় তার কাছে। মেয়েটির আমার পিছন দিকটা, নিচু করে কাটা, সেখান দিয়ে ঘাড়ের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে—চিকণ, সুডৌল।

নিশ্চয় সিনেমার যাত্রী। কোটের থাকতীকে এমনি নিজের পাশে বসিয়ে কল্পনা করলে বিজয়। হঠাৎ নিজের আত্মাসর্বস্ব বন্ধু-বহুল জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠল সে। শুধু কথা আর কল্পনায় ভরা শুষ্ক অবসরযাপন নিতান্তই অবাস্তব, একঘেয়ে মনে হল তার।

ওরা দু জন নেমে গেল এক বাংলা সিনেমার সামনে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বিজয়ও নেমে পড়ল। এক পার্কে ঢুকে চার পয়সার চিনে বাদাম কিনলে, সেটা শেষ হতে হতে তার মন ঠিক হয়ে গিয়েছে।

বিয়ের পর যাকে আনবার কথা দু এক বার যে না ভেবেছিল তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল যে এখন দ্বিতীয় ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাও ধর্তব্য। মাসতীকে নিয়ে মেসের বাড়িতে থেকে এসেছিল এক সপ্তাহ, মা খুব খুশী হয়েছিলেন ওকে কাছে পেয়ে। চলে আসার দিন সকাল থেকে নিশ্চয়ই কাঁদতে আরম্ভ করলেন, ঠিক বিদায়ের কান্না তা নয়—অনেক দিনের চাপা আশাটা বুঝি সে দিন তাঁর ভাঙা বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

বিজয় আর থাকতে পারেনি, আজকের দুঃখের একটু ছোঁয়া সে দিনও লেগেছিল তার বুকে, যাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল তখনই সঙ্গে করে। চুপচাপ ভিজে আঁচলটা দিয়ে নিষ্ফলে বার বার চোখ মুছতে মুছতে মা বললেন রুদ্ধ গলায়, "না রে না, তাতে দুঃখ বাড়বে; তোরা যা, আমি থাকি এখানেই। তুই সুখী হ, তুই সুখী হ।"... তার পর

হঠাৎ বিজয়ের মাথাটা টেনে নিয়ে চুমো খেলেন গালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন মুখ ফিরিয়ে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এমন ঘটনা তার অভিজ্ঞতার অতীত, এক দিন আগে মাও বোধ হয় ভাবতে পারতেন না নিজের এই ব্যবহার। স্নায়ুর ভালবাসা প্রকাশের প্রতি বরাবরই তাঁর কেমন একটা স্বাভাবিক সংকোচ ছিল। সে দিন মুহূর্তের জন্য ভেঙে গিয়েছিল বাঁধ।

হয়তো যা ঠিকই করেছিলেন তার সঙ্গে না এসে—মালতী তা পছন্দ করত না। তার পর থেকে এক দিনের জন্যও মেসের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী হননি তিনি, ঐখানে যদি মরা না হয় এই ভয়ে। এত ক্ষণে সেই ইচ্ছাটার বোধ হয় পূরণ হয়েছে—ঐ একটা ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে অনেক কালের মধ্যে।

বিজয়ের চোখের ভিতরটা জ্বালা করছিল কিছু ক্ষণ ধরে, হঠাৎ পাতা দুটি বুঁজে এল, কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। ভিতর থেকে কি একটা বেগ ঠেলে ঠেলে উঠে গলা পেরিয়ে গলার মধ্যে আটকে রইল, ঘন ঘন ঢোঁক গেলার মধ্যে টের পেলে অসহায় দেহটা কান্নায় হয়ে পড়ছে এক তীব্র, কাঁজালো অনুভূতিতে। কোনও চেষ্টা করলে না সে নিজেকে সামলাতে—জগতে আর কেউ নেই, এক কালো অন্ধকারের গর্ভে সে সম্পূর্ণ একা, সম্পূর্ণ অরক্ষ। কখন যে রাত্রি হয়েছে, আলো জ্বেলেছে, পাশের লোকটি উঠে চলে গিয়েছে তা তার খেয়ালই হয় নি।

কালো অন্ধকারের গর্ভে সম্পূর্ণ বিলিয়ে সে এখন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ঐ আইন-আচারে বাঁধা অবাস্তবিক পৃথিবীটার কাছে লজ্জা পাবার কারণ নেই, শুধু সজল চোখ নয়, হৃদয়ও তার সম্পূর্ণ স্বাধীন এই মুহূর্তে। এখন সে সহজে অনুভব করতে পারলে বার্থকোর অসহ বিষাদ আর করুণা। যে বয়সে মানুষ কনিষ্ঠদের কৃপায় উদার নির্ভর করে বেঁচে থাকে, যে বয়সে সামান্য সঙ্কোচ চাওয়া থেকে যায় অবজ্ঞাত, বিস্মৃত; যখন ধন সম্পত্তি, যশ, উচ্চাশার আগ্রহ ত্যাগ করে মন খোঁজে চরম তৃপ্তি আপন জনের একটুখানি স্নেহের মধ্যে—কিন্তু বঞ্চিত হয় সেইটুকুর থেকেও, নির্মম সংসার তার বদলে সামনে এনে ধরে শুধু আর্থিক সাচ্ছল্য শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা, কর্তব্যের খাতিরে। একটুখানি অনুকম্পা, নিজের বলে চাওয়া, কাছে আসবার, বুঝবার ইচ্ছা—যার জন্য কোনও পয়সা খরচ হয় না—ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠে পাওয়া।

বছরের পর একই লোককে লক্ষ্য করে দেখ, দেখবে কেমন করে তার মুখ থেকে মুছে যায় যৌবনের গর্ব আর ঔদ্ধত্য, তিলে তিলে কিন্তু অনিবার্য ভাবে; চার পাশের জগতের ত্রুটি বিচ্যুতিতে যে রুষ্ট হয়ে উঠত, দেখবে কেমন করে সে ক্রমশ ক্ষুধিত হয়ে যায়: ব্যর্থতার তাপ ও তিক্ততার স্থান একটু একটু করে দখল করে ব্যর্থতার বিষাদ, তার পর এক দিন কোন এক মুহূর্তে হৃদয়ে জাগে বিশ্ব-বিষাদের প্রাথমিক অনুভূতি; পরিশেষে প্রিয়জনের ভালবাসার কার্পণ্য বুকটা সম্পূর্ণ ভেঙে যায়, জীবনের শেষ অধ্যায়ের চিরন্তন সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় নিজের তুচ্ছতা আর প্রয়োজন-হীনতার বোধ, অহোরাত্র অপরের অসন্তোষের কারণ হওয়ার ভয়ে ভয়ে কাটে শেষ বছরগুলি; এরেরই মুখের একটুখানি হাসি তখন দুনিয়ার সেরা পুরস্কার, তখন দৈনন্দিন প্রার্থনায় মরণের উদার শান্তি কামনা করে করেও নিজের পুত্র, প্রপুত্র, সংসারে নানা তুচ্ছ খুঁটিনাটিকে ঘিরে অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা আরও ক্ষুব্ধ আরও অন্ধ হয়ে আসে···

কথাগুলি অবশ্য এত স্পষ্ট করে জানা বা বোঝেনি বিজয়ের মন, ভাবনা তার জাল বুনে চলেছিল আধ-আঁধার অনুভূতির রাজ্যে। কিন্তু যে বিশ্বজোড়া বিষাদের সুর বেজে উঠছিল বুকে তার মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না, কারণ সে বিষাদ এখন অবাধিত ও সম্পূর্ণ ভাবে তার

মার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। বিজয়ের ত্রেত্রিশ বছরের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, কিন্তু সব বিষাদ ও ব্যক্তিগত দুর্ভাবনা সত্ত্বেও এই আত্মনিমগ্ন তীব্র চিন্তাস্রোতের থেকে ক্রমে কেমন এক শান্তির প্রলেপও লাগল তার মনে।

সেটা উপভোগ করতে করতে সেখানে বসেই সে ঠিক করলে পর-দিন মাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবে, আর লিখবে যেন সব চেয়ে ভাল ডাক্তার এনে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, আপ্রাণ চেষ্টা করে মাকে বাঁচাবার। এ দিকে সে নিজেও ছুটির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং যত শিগগির সম্ভব বাড়ি যাবে।

অবশেষে যখন সে উঠল বেঞ্চি ছেড়ে তখন নটা বেজে গিয়েছে। আরও একটু বসলে ভালই লাগত, কিন্তু মনে হল মালতী ভাবতে আরম্ভ করবে—বিশেষত সে দিন সে যেমন হঠাৎ কিছু না বলে বেরিয়ে চলে এসেছে। যদিও এর আগে অন্যান্য সন্ধ্যায় নিজের খুশি মত দেরি করে ফিরতে সে দ্বিধা করেনি, সে দিন উঠে পড়ে বাড়ির দিকে পা চালালে সে।

পার্ক থেকে বার হবার সময় আকাশের কোণ চিরে এক বার বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। স্মৃতির কোন অন্ধকার কামরায় আলোর ঝলকানি লাগল হঠাৎ। মনে পড়ল তিন দিন আগে সে এসেছিল এই পার্কে, মনে পড়ল ঘড়ি, যা এই ঘণ্টা তিনেক আগেও জুড়ে ছিল তার মন। মাত্র তিন ঘণ্টা—এখন যেন তার বিশ্বাসই হল না। আরও আশ্চর্য লাগল ওটাকে নিয়ে তার অতখানি মাতামাতি, আচ্ছন্নতার কথা ভেবে। আগামী কালের জন্য আর একটা সংকল্প সে করলে: সকালে বেরিয়ে প্রথম কাজ হবে ঘড়িটা ফিরিয়ে দেওয়া।

বাড়িতে ঢোকা মাত্র মালতী জিজ্ঞাসা করলে উদ্‌বিগ্ন সুরে, "ব্যাপার কি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"না, কিছু নয়। এক জনের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল, ভুলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ মনে পড়ল। তাড়াহুড়ি তোমাকে বলে যেতে পারি নি।" বলে একটুখানি ম্লান হেসে সে মালতীর গালে ছোঁয়ালে তার হাত।

মিথ্যা বলবার হয়তো কোনও দরকার ছিল না, কিন্তু বোধ হয় দুঃখ এক এক সময় এত গূঢ় এত আত্মগত হয় যে জগতে কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার ভাগ দেওয়া যায় না।

[ক্রমশঃ]

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

পরিক্রমা

সুনীল গুহ

তিনি এই পথ দিয়েই গেছেন।

নদীর তীরে সারি সারি জেলে নৌকা আয়েজী ঘাতাসের মত মৃদু মৃদু দুলছে। জ্যোৎস্নার প্লাবন এনেছে স্নিগ্ধতা। নদীর তীব্র স্রোতসহ ঢেউগুলির মাথা চকচক করছে। ঝিরঝিরে বাতাস চলেছে গান গেয়ে। পৃথিবীর এই এক-খানি শোভা দেখবার সময় নেই ওদের। কেননা খুঁজে বার করতে হবে সেই স্পর্দ্ধিত অহঙ্কারী লোকটাকে। ওরা দু'জনে খুঁজতে বেরিয়েছে তাকে। খুঁজে বা'র করতে পারলে দিনের চেহারাই যাবে বদলে। অভাবনীয় পুরস্কার ঘোষণা করেছেন রাজা। তা' পেলে এ জীবনে দু'জনের আর কোন ভাবনা থাকবে না। রাজা অবশ্য ওদের দু'জনকে নিযুক্ত করেননি। তবে রাজা বলেছেন যে কেউ ধরিয়ে দিতে পারবে তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। দু'জনের মধ্যে একজনের নাম পোভিচ। কাল রাত্রিতে চুরি করতে বেরিয়ে সে-ই খবরটা সংগ্রহ করে এনেছে।

এক গৃহস্থের বাড়ীতে ও ঢুকেছিল চুরি করতে। গিয়ে দেখে গৃহস্থ তখনো সজাগ। সেই স্পর্দ্ধিত অহঙ্কারী লোকটার কথা নিয়ে গৃহস্থ ভদ্রলোক তাঁর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করছিল। আর ততক্ষণ ও ছিল ঘরের পিছনেই একটা কোণের আড়ালে লুকিয়ে। শুধু গর্বিকের রাজা হেরড নয়। ধর্মগুরু কেয়াফাসের মুখ দিয়ে রাজা পাইলেটও পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সে সব কথা শুনে ওর আর চুরি করা হয়নি। লোকটার নামটা মনে রাখবার জন্য চলে এসেছে আস্তানায়, পাহাড়ের গুহায়। কিন্তু ওর মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পুরস্কারের লোভ। সেই লোকটার নাম সেছে তাই ভুলে।

তবু দুজনে পাহাড়ের গুহা থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছে। দু'জনের একজনও বোধ হয় দাঁড়ি কামায়নি কোনদিন। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, বড় বড়ও। দু'জনের লাল চাহনি চোখ, লোভের সাড়া পেয়ে হয়েছে আরো টকটকে লাল। অযত্ন আগাছার মত চুলগুলি বেড়ে উঠে নেমেছে ঘাড় অবধি। কানগুলি গেছে ঢেকে। একজনের গালে বাঘের থাবার চিহ্নের মত কয়েকটা দাগ আছে। যদিও দাঁড়িতে ঢাকা পড়েছে অনেকটা। তার নাম—কার্ভ।

দুটিতে নদীর তীর ধরে চলেছে এগিয়ে। ভিতরে ভিতরে দু'জনেরই কেমন একটা আনন্দ! যদি সম্ভব হয় তবে রাত্রির অন্ধকারে গা' ঢাকা দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি আর চুরি করে ফিরতে হবে না। তাড়া খেয়ে আর হবে না পালাতে। ভালো ভালো খাবার খাবে। আর টাকার চড়ে শুধু সহর বেড়াবে।

—'বুকের ভিতরটা এমন কাঁপে কেনরে?' বলে পোভিচ।

—'পাগল কোথাকার!' তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দেয় কার্ভ।

ঘাতাসের সঙ্গে জেগে আসছে বজ্রনির্ঘোষ আওয়াজ। কিসের যেন অভিশাপ। শহরে সরু সরু গলি। নীচু নীচু বাড়ি। রোগের জীবাণুর মত শহরটার গা' কামড়ে পড়ে আছে হাজার "হাজার" ইহুদী। মেসোপোটেমিয়ার আশায়।

'মেসায়া'—মানে অবতার। রাজা হেরডের অত্যাচার অবিচার উপেক্ষা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সব। শুধু হেরড নয় পাইলেটও। এঁরা মানুষের মৃত্যু রসের থালায় বসিয়ে আনন্দ অনুভব করেন। প্রধান পুরোহিত কেয়াফাস—যে, এইসব অমানুষিকতার সমর্থক এবং উৎসাহদাতা। এই কেয়াফাসই অভিযোগ এনেছে লোকটার বিরুদ্ধে।

—'যদি পারি তবে এর পর থেকে আমরা শহরেই সুখে দিন কাটাতে পারবো নারে?' বলে পোন্তিচ।

—'হুঁ' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় কার্ত্থ। তার চোখে মুখে কিসের যেন দুশ্চিন্তার কালো ছায়া।

ওরা দু'জনে শহরের রাস্তা ধরে হাঁটছে।

খোয়া উঠা রাস্তা। ধুলো উড়ছে বাতাসের সঙ্গে। সহরের জ্যোৎস্না তাই কুয়াশা জড়ানো মনে হয়। আজ কুয়াশাই পড়েনি। রাস্তার ধারে একটা লোক পোড়া শুয়োরের মাংস বেচতে বসেছিল। এখন মাংসগুলিকে ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে রেখে পাশেই সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। গাধায় টানা গাড়িগুলি যাচ্ছে বিকট শব্দ তুলে। ওরা এর আগে সহরের ভিতরে আসত কম। আজ এলো কেন না, রাজাও দিয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। সেই লোভী লোকটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে হবে।

কী আশ্চর্য! যোশেফ আর মেরীর সন্তান, যে কি না ঘোড়ার আস্তাবলে খড়ের গাদার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছে, —সে বলে কিনা—সে ঈশ্বরের সন্তান। তার আস্পর্ধা তো কম নয়। তাই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য।

তাকে ধরতে পারা যাচ্ছে না কিছুতেই। শোনা গেছে লোকটার নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। শুনা নাকি পেয়েছে গিরি লঙ্ঘনের ক্ষমতা। অন্ধ পেয়েছে চোখের জ্যোতি। কালা নাকি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য শুনে অবাক হয়ে গেছে। কুষ্ঠ রোগীর শরীর হয়েছে সুস্থ। এ সবই সেই লোকটার কীর্তি। আর হাজারে হাজারে লোক নাকি তার শিষ্য হয়েছে। রাজা হেরড আর পাইলেট—দুজনেরই কপালের ভাজে ভাজে ঘামের রেখা স্পষ্ট। তাই প্রধান পুরোহিতের পরামর্শ নিচ্ছেন তাঁরা। কেয়াফাস বলেছেন —'রাজ্যের যত ওঝা বদমায়েস আর শয়তান আছে তাদের অবাধ স্বাধীনতা দাও, পুরস্কার ঘোষণা কর, ঠিক ধরা পড়ে যাবে।'

ওরা শহরের ভিতর ঢুকে শুনতে পেল কার যেন কাতর প্রার্থনা,—"হে প্রভু, তোমার এই পবিত্র ইহুদী জাতি তোমার উপর ভরসা করে আছে। তুমি যদি না আসো তবে, এই মহান জাতিটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হে মেসায়া, তুমি এসো।"

থমকে দাঁড়ালো দু'জনে। চীৎকার করে উঠল পোন্তিচ—'কে, কে?'

একটা লোক নাকমুখ ঢেকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো। পোন্তিচের চীৎকার শুনে তাকালো একবার ওদের দিকে। তারপর খু খু ফেলল খানিকটা। আমার আস্তিনে মুখ মুছতে মুছতে ওদের মুখোমুখি এগিয়ে এসে বলল, 'ও কে জানো না, ও হ'ল জুডাস। হুঁ—যত সব।" বলেই লোকটা চলে গেলো।

জুডাস! চমকে উঠল কার্ত্থ। জুডাসকে ও জানে!

আবার দু'জনে খুব গম্ভীর হয়ে হাঁটতে থাকে। আর শুনতে থাকে জুডাসের আবেদন, 'হে প্রভু চারিদিকে অন্যায় আর অবিচার, ক্ষুধা আর নগ্নতা, মৃত্যু এবং অবশেষে অন্ধকার। প্রভু, তোমার পবিত্র ইহুদী জাতিকে বাঁচাও; হে প্রভু মেসায়া,—তুমি এসো।"

ওরা দু'জন শুধু হাঁটতে থাকে। এ পথ আর ও পথ। ধুলো উড়ছে পথে পথে। পথের পাশে পাশে খাবারের

বেরোন। ধুলোয় আর ধারায় একাকার। মাঝে মাঝে মাতালদের তীব্র চীৎকারে পায়ের নীচের মাটি উঠছে কেঁপে।

ওরা দু'জনে শুধু খুঁজছে। পথে কেউ হয়ত বলছে,—'একে দেখা গেছে পাহাড়ের তলায়, পাহাড়ীদের আড্ডায়। চট্ করে এসে দু'জনে মিশে পড়েছে সেখানে। সব শুনে সেখান থেকে ছুটে যায় পাহাড়ের তলায়। কিন্তু না, সেখানে নেই। অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেউ হয়ত একজন বলে,—'এসেছিলেন, কথা বলে চলে গেছেন, শুধু দু'টো গল্প বলেছেন,—আর কিছু নয়।'

—'কোন দিকে গেছে বলতে পারো?'

—'না ত, তা' জানি না।'

কেউ হয়ত বলে,—'ওপারে গিয়েছিলেন, আবার নদীর উপর দিয়ে হেঁটেই তিনি চলে এসেছেন এপারে। দাঁড়িয়ে যায় সেখানে থমকে। সব ভাল করে শুনে, শিকারের সন্ধান পাওয়া লোভী জানোয়ারের মত আবার দু'জনে নদীর তীরের দিকে ছুটে যায় সেখানেও নেই। শুধু দেখা যায় ঘোলা নদী চলেছে ছুটে। ভিড় জমিয়ে আছে সারি সারি ভেসে নৌকা, অগুনতি ঢেউ,—তীব্র স্রোত। আর বাতাসের মনমরানী। আবার ওরা হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

রাজ্যের যত চোর, বাতাল, গুণ্ডা, খুনী—সব বেরিয়ে পড়েছে। যে খুঁজে বার করতে পারবে লোকটাকে সে-ই রাজার করুণার পাত্র হবে। রাজা চায় তার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে।

আর সবাই জানতে পেরেছে বাতাসের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে তীব্র অভিশাপ। খাদের তলা থেকে উচ্চারিত হয়েছে ঈশ্বরের সাধনার বাণী। এক বিকট সর্বনাশা বোধ-হয় সমাগত।

হাজার হাজার ইহুদীর চীৎকারে বেরুবালেম অস্থির। রোমান শাসনকর্তা পাইলেট পিলাত নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছেন।

না, কিছুই হ'ল না। দু'দিন পরে অবসন্ন ক্লান্ত দেহ-দুটো নিয়ে ওরা এসে উঠলো একটা সরাই খানায়। দাঁড়ির গোছায় হাত দিল একবার। অনেক ধুলো জমেছে সেখানে। গলার জিহ্বাটা বার বার শুকিয়ে আসছে।

হঠাৎ একজন লোক হোহো করতে করতে এসে ঢুকলো সেখানে। একজন বললে,—"যাক, অবশেষে ধরা পড়ল লোকটা।"

আরেকজন বললে,—'কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারলে সে নিশ্চয় আর এখন এখানে আসত না।'

কে যেন কী বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। অন্য একজন বলল,—'যাক্, এখন ওর মৃত্যু হ'লে আমরা বাঁচি।'

—'কিন্তু তাকে ধরিয়ে দিলে কে?' সরাইখানার মধ্যে কার্ত্ত চীৎকার করে ওঠে। সমস্ত লোকগুলো মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেলো। কার্ত্ত আবার বলল—'কে সেই ভাগ্যবান?'

কে একজন গম্ভীর গলায় বলল,—'জুডাস!'

জুডাস! চমকে ওঠে কার্ত্ত। এ কী সম্ভব? পথে পথে যে লোকের মুখে শুনেছে জুডাসই তার সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। ছদ্মবেশী শিষ্য হয়েছিল বোধ হয়।

ভাবতে থাকে দুজনে, না হ'ল না কিছুই। পোক্কিচ বলল,—'চল ফিরে যাই।'

ওরা সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়েছে এ দু'দিন। অনেক আশা ছিল মনে।

পাংশু বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এলো দু'জনে সরাইখানা থেকে।

পাইলেটের মনে খারাপ হয়। শুধু প্রধান পুরোহিত

কেরাকাস যখন গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তখন তারই বা বলবার আছে কী? বাইরে হাজার হাজার ইহুদী চীৎকার করছে,—'মৃত্যু চাই! এই ওও° ঈশ্বরবিলাসীর মৃত্যু চাই।'

পাইলেট গম্ভীর কণ্ঠে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। নিশ্চিন্ত হ'লেন কেরাকাস।

ওরা দু'জনে ঘুরতে ঘুরতে এসে আবার উঠলো সেই পুরনো আস্তানায়। সেই পাহাড়ের গুহায়। আত্ম-গোপনের নিশ্চিন্ত আয়গায়।

অবসন্ন ক্লান্ত দু'জন ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ একসময় ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে পোত্তিচ। একি পাহাড়ের গা' ভিজে গেছে কেন? কেমন করে ভিজল? কার্ভ কোথায় কার্ভ। কার্ভ নেই। বাইরে বেরিয়ে আসে পোত্তিচ।

বাইরে এসে দেখে,—আকাশের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ অনড় দেহে দাঁড়িয়ে আছে কার্ভ। চমকে উঠে পোত্তিচ। কার্ভ বোধ হয় ঘুমুতে পারেনি। তার মুখের সেই রাশ-গুলি হয়েছে আরো স্পষ্ট। চোখদুটো পড়েছে ঝুলে। চুলগুলো গেছে জট পাকিয়ে। পোত্তিচ দেখল কার্ভকে। কিন্তু নিজেকে দেখতে পেলো না সে।

—'কিরে, অমন করে দাঁড়িয়ে যে? পোত্তিচের কণ্ঠে কোমলতার আভাস।

সেকথার উত্তর না দিয়ে কার্ভ বলল,—চল নিচে যাই, সে যে রাত্রিতে নেবেছিল সেই রাত্রিতে।'

কার্ভ কি পাগল হ'ল নাকি? অবাক হয় পোত্তিচ। তার ভিতরের জড়তা এখনো কাটেনি। বলল,—'তুই ভুল করছিস, শোন্, এবার থেকে আমরা বড় বড় চুরি করে বড়লোক হ'ব।'

আর কোন কথা না বলে কার্ভ নামতে থাকে নিচের দিকে। তার পিছে পোত্তিচ। আবার দু'জনে লোকালয়ে আসে। দিনের আলোতে। কার্ভ নিঃশব্দে চলতে থাকে শুধু। পোত্তিচের মনেও দেখা দিয়েছে ক্লান্ত। শহরের মুখে এসে কার্ভ হঠাৎ বলে ওঠে,—"এতক্ষণে লোকটাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হয়েছে।' পোত্তিচের মুখে কোন কথা নেই। কেন যেন তার ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইছে একটা কান্নার জোয়ার। মনে হচ্ছে কাঁদতে পেলে যেন তার কি একটা সুখ হ'ত। কিন্তু পারছে না।

সারাটা শহর যেন দরজা বন্ধ করে সন্ত্রাসে মুখ লুকিয়েছে। একটা লোকও নেই শহরের পথে। শুধু ওরা দু'জন যাতালের মত ঘুরছে নিঃশব্দ শহরটায়।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো। বোধ হয় একটা পাগল। লোকটা বলল—, 'শোন, লোকটাকে অবশেষে মোর ফেলা হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য দেখ, লোকটা মরবার সময় পৃথিবীকে ক্ষমা করে গেলো।'

—'জুডাসই তবে তাকে ধরিয়ে দিলে?' বলল কার্ভ।

—'হাঁা, জুডাসই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তার প্রভুকে অমরত্বের রাখবার জন্য সে-ই এ কাজ করেছে।' তারপর নদীর রাস্তার দিকে হাত দেখিয়ে বলল,—'যাও, এইদিকে যাও।' বলেই লোকটা চলে গেলো আরেক দিকে।

দু'জনে চলল নদীর দিকের রাস্তা ধরে। এই প্রথম ওরা অন্য লোকের আজ্ঞা বহন করল এ জীবনে। হাঁটতে থাকে দু'জনে। সারাটা দিন গেলো হাঁটতে হাঁটতে। খাওয়া নেই। ঘুম নেই। সব গেছে ভুলে। সন্ধ্যার অন্ধকারে এক জায়গায় থমকে চীৎকার করে ওঠে কার্ভ—'ঐ!' চমকে ওঠে পোত্তিচও। কার যেন পা' ঠেকেছে কার্ভর মাথায়। একটু পিছন দিকে সরে এসে দেখল ওরা, মরা ডুমুরের একটা গাছের ডালে গলায় দড়ি দেওয়া একটা লোক ঝুলছে। লোকটা মরে গেছে। কিন্তু

বেরিয়ে গেছে তার। আবার কান্না চীৎকার করে ওঠে—'কে, জুডাস! গলায় ছুরি দিয়ে মরেছে সে।'

সোভিচ শান্ত দৃঢ় গলায় বললে, 'আর সেই লোকটার নাম কি রে?'

—'কে, কোন লোকটা?'

—'সেই যে আমাদের ক্ষমা করে গেছে।'

—'তার নাম যীশু।'

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে আবার এলো নদীর ধারে। রাত হয়েছে বেশ। জেলে নৌকোগুলি পালিয়েছে যেন কোথায়। আকাশের তারাগুলি বুঝি মুখ লুকিয়েছে লজ্জায়। চাঁদও নেই। জ্যোৎস্না গেছে মরে। নদীর স্রোত গেছে থেমে। বাতাসের মুখে ভাষা। সে চলেছে উড়ে,—দেশান্তরে।

প্রজাপতি

মীরা সান্যাল

প্রতিদিন সকালের আলোর পরাগ ঝরে
তোমার ডানায়—
ওগো প্রজাপতি, তুমিতো জাননা
ফুলের গন্ধের মতো সুচারু সংবাদ
বয়ে নিয়ে আস তুমি
আমার মনের ঘরে।
তাই রাত্রির দুঃস্বপ্ন আর
কাঙাল মনের মতো কান্নার
শিশির মুছে যায় তোমার
দু'টি ডানার ছোঁয়ায়।
তোমাকে ধরিনা তাই
কঠিন পরিণতির সত্যের খাঁচায়
তুমি থাক অকুণ্ঠিত মুক্তির পাখক
স্বপ্নের কাচের ঘরে বেগনিয়া ফুল।

উত্তরণ

ধারাবাহিক উপন্যাস
পূর্বানুবৃত্তি

॥ নীলিমা দাশগুপ্ত ॥

আনন্দের হাট বসেছে বি-ওয়ান মেসুলোতে। ঘরে এবং বাইরে সর্বত্র। চা খেতে খেতে, ঘরে, আনন্দের হররা, তুলেছে ওরা চারজন।—শ্যামল, তোলা, চামেলি, মল্লিকা. অনাবিল আনন্দটা এমনি যে, বিগত দুঃখের গভীর চিহ্নগুলো যেন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর বাইরে মহা ব্যস্ত কথা। হঠাৎ পাওয়া এত আনন্দে, এত সম্পত্তিতে ও বেচারি একেবারে দিশেহারা। মিন্টুকে ডাকিয়ে এনেছে তখুনি। ওর সম্পত্তির নমুনা একটা একটি ক'রে দেখিয়ে কৌচড়ে তুলে দিচ্ছে মিন্টুর। প্রথমে দিচ্ছিলো হাতে। কিন্তু আঁটলোনা। কৌচড় ভর্তি ক'রে কথার গা ঘেঁসে বসে পড়লো মিন্টু, "তোর মামা-মাসি খুব ভাল নারে কথা?" মুখের মণ্ডবড় নাড়ুটাকে এলাচ থেকে ওগালে ঘায়েল করতে করতে বললে মিন্টু।

"হ্যাঁ, তোর ছোট মামার চেয়েও অনেক বেশি ভাল—" আমসত্ত চুষতে চুষতে কথা উত্তর দিলো।

"হ্যাঁরে, ঠিক বলেছিস। আমার আবার একটাও মাসি-টাসি নেই।" নাড়ুটা কোনমতে গিলে কৌচড় থেকে আমসত্ত তুলে নিলো মিন্টু। "আমার একজনই মাসি,—তবে তোকে ভাই মাসি বলে ডাকতে দেব। মাসিমণি বলে ডাকিস—বুঝলি মিন্টু—" কথার উদারতা আজ সীমাহীন। "এই বাপ্পা, ঘুরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়না এখানে—" ছেলেমানুষী বাপ্পা হকচকিয়ে গেলো।—মিষ্টির হ'ল কি আজ? অতদিন খেলনা টেলনা নিয়ে মিন্টুর সঙ্গে যখন খেলে দিদি, দূর থেকে ওর ছায়া দেখলেই হাক্ পাড়ে—"আয়া, ভুলে সাবকো লে যাও।" মহাখুশি বাপ্পা। একলাফ দিয়ে দিদির কাছে এসে ধপ করে বসে পড়লো। "দিদি তোল কাছে নলিপাক আছে? দিবি একটা?"

"নে না। ক'টা নিবি।" সুন্দর রঙ চঙের-টিনের ট্রেটা, যাতে মল্লিকা কলকাতা থেকে আনা সব জিনিষের কিছু কিছু সাজিয়ে দিয়েছিলো—ভাইয়ের সামনে এগিয়ে ধরলো কথা। বাপ্পা সমানে দুহাত চালিয়ে ট্রের প্রায় সবকিছু পুরে ফেললো পকেটে। কিন্তু তবুও কথা আগের মতো নির্বিকার। হেসে হেসে বললো "নিলে যা সব। ক—ত্ত আছে মাসিমণির কাছে।"

চায়ের টেবিলে ওরা কেবল হাসছেই। হি হি আর হো হো, হো হো আর হি হি। আয়া-মাসি-বাবুর্চি সব অবাক এমন উচ্চ রোলে হাসি ওদের সাধ-মেটেনা কেন, এ হাসি সিমলায় কেউ হাসতেই জানেনা কিম্বা হাসতেই পারে না, যাই হ'ক।

তোলা চামেলি-শ্যামলের পূর্বকথা কিছু কিছু মনন করছিলো। মল্লিকা শ্যামল, আরও হচ্ছিল চামেলি। শুনতে অবশ্য ভালই লাগছিলো তবু। বাধা দিতেই হলো চামেলিকে। "কচ্ছো কী তোলাদা? দিদি সামনে রয়েছে না?"

"দিদি আছে তো হয়েছে কি? ষোড়শ বর্ষ পার হয়নি দিদির? এদিকে আমি বলে সবাইকে ঠেকাতে ঠেকাতে হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছি—। বি-এ পরীক্ষাটা নেহাৎ সামনে

ছিলো ভাই। তা না হলে মিলির স্বয়ম্বর সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করতাম কবে—।"

"কি হ'য়েছে তোলাদা, খুলে বলো—" চামেলির কণ্ঠে তীব্র কৌতূহল। "দাড়া আগে চপ্‌টা খেয়েনি—ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—", তোলা চপে কামড় দিয়ে ধীরে ধীরে চিবুতে লাগলো।

শ্যামল হাসি মুখে বললো, "তরুণ, তোর ছেলে-খেলাকার দুষ্টু স্বভাব এখনও যায়নি দেখছি। মিলি বেচারা লজ্জাও খেতে পারছে না—। ওর কথা এখন বাদ দিয়ে তোর স্বয়ম্বর সভা কবে হচ্ছে সেটার পাকা কথা বল দিকিনি—।"

চামেলি বললো, "না তোলাদা, তুমি মিলির কথা কি বলছিলে বলো। মিলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাকি?"

"তা হলে তো বাঁচতুম—" নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়ে তোলা কলাকান্দ খাওয়ায় মন দিল। "এগুলোকে কলা-কান্দ বলে কেনরে—? এতো দেখছি আমাদের দেশের ক্ষীর সন্দেশ—" কলাকান্দ খেতে খেতে তোলা বললো।

শ্যামল বললো, "না হে, স্বাদের কিছু তফাৎ আছে। এ-হলো এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি—ওলজার সিংহের কলাকান্দ—" বলে সামনের বড় ডিস থেকে আরো কয়েকটা কলাকান্দ—চালক-চালিকার বেকাবে তুলে দিলো শ্যামল, তোলা আপত্তি করলো না। কিন্তু মল্লিকা বাধা দিলো, "না শ্যামলদা আমি আর একটুও খেতে পারবো না।" "আরে খাও খাও। তরুণের কথায় লজ্জা কী। ওটা চিরকাল একই রয়ে গেলো—" বন্ধুর পিঠে সস্নেহে মৃদু চাপড় দিলো শ্যামল। তোলা বন্ধুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে, আড়-চোখে চামেলির অভিমান ক্ষুব্ধ মুখটা দেখে নিলো একবার। একটা গোটা কলাকান্দ, মুখে পুরে চোয়ের পিঠে হেলান দিয়ে ভারি গলায় বললে "শ্যামল! দিনে তোর কবার করে স্নান ভাঙাতে হয় রে চিলির—?" হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো শ্যামল, "অনুমতি দাও ত বিবৃত করি—" চামেলি চুপ করে আর থাকতে পারলো না। স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে বললো, "অনুমতি দাও ত মানে? আমি কবি নাকি মান?" শ্যামল নিতান্ত ভাল মানুষের মত মুখ করে বললো,—"না, আমি তরুণকে সেই কথাই বলতে চাইছিলুম, তোমার মানের মান রক্ষার দরকার হয় না নোতুন করে। উনি পারমানেন্ট মানিনী।"

"বেশ বাপু বেশ। পারমানেন্ট মানিনী চলে যাচ্ছে এখান থেকে, তোমরা দুই বন্ধুতে প্রাণ খুলে গল্প করো। আয়রে মিলি, আমরা ওপরে যাই—" চামেলি উঠে দাঁড়াতেই, তোলা খপ করে হাতটা ধরে ফেলে বললো, "বস্—বস্, আর রাগ দেখায় না। মিলির কথা যদি শুনতে চাস্ তো বসে পড় চট্ করে—।" মুহূর্তে মেঘ কেটে গিয়ে ঝিকমিকিয়ে রোদ দেখা দিলো। "তোলাদা বলো বলো এইবার—" চোখ উজ্জ্বল করে বসে পড়লো চামেলি।

যার কথা নিয়ে ভাই বোনে মান অভিমান করছে সে কিন্তু একেবারে অবাক। কী বলতে চায় তোলাদা ওর কথা? বিস্মিত চোখে মল্লিকা একবার তোলার একবার চামেলির দিকে তাকাতে লাগলো। শ্যামল বন্ধুর দুটুমির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ওদের কাণ্ড উপভোগ করতে লাগলো মজা করে। তোলা চামেলির দিকে তাকিয়ে বললো, "গোপার বিয়ের সময় পিসীমা সবাইকে নিয়ে বর্দ্ধমান গিয়েছিলেন সে খবর তো জানিয়েছি তোদের। জনা দশেক বরযাত্রী এসেছিলেন—সব ব্যাচিলার। ফিরে গিয়ে সকলেই আমাকে চিঠি লেখা শুরু করলেন, তোলাদা! .....তোলাবাবু!.....তরুণবাবু!.....ডিয়ার তোলাদা! আপনাদের ওখানে গিয়ে খুব আনন্দ পেয়ে এসেছি। বড় ভাল লেগেছে আপনাদের সকলকে—ইত্যাদি...। তবে সব চিঠিরই মূল সুর হলো—আমাকে যদি অযোগ্য মনে না করেন, তা হলে আপনার বোন মল্লিকা দেবীকে—ইত্যাদি

ইত্যাদি।" মল্লিকার মুখ লাল। কানের দুপাশ গরম। আর বসে থাকতে পারলোনা কিছুতেই। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "রুমারা কী করছে একটু দেখে আসি দিদি—।" চামেলি হাসছিলো। হাসি থামিয়ে বোনের হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললো, "আরে বস্ তুই। শোন না বসে বসে তোলাদার তৈরী গল্প।"

তোলা বললো, "বিশেষ হচ্ছে না বুঝি? আচ্ছা চিঠিগুলো আছে বোধহয় সুটকেসের পকেটে, দেখাবো'খন তোদের, মুখটিপে হেসে চামেলি বললো, "তারপর তুমি কি করলে তোলাদা?" "আমি আর কি করবো? ব্রেক্ চুপ। একেবারে চুপ। দশ জনের তো আর তিনার তোলাদা হতে পারি না—" তোলা অসহায় একটা ভঙ্গী ফোটাবার চেষ্টা করলো। এবার চামেলি, তারপর এমন কি মল্লিকা পর্য্যন্ত শব্দ করে হেসে উঠলো।

ওদের চা পর্ব্ব শেষ। চামেলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "চ মিলি আমরা ওপরে যাই। তোলাদা। যাবে নাকি?" "নাকি বললে কেউ যায়? এ যে দেখছি আমে দুধে মিশে গেলো, তাগাড়ে গিয়ে পড়লো আঁটি—"তোলা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো। চামেলি সহাস্যে বললো, "চলো তোলাদা চলো—। বাপরে পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি যা অভিমানী কম কী?"

"হ্যাঁ, অভিমানটা শুধু মেয়েদের একচেটিয়া কিনা—" বলে বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলো তোলা, "চলরে তারপর, তোদের বাগানে যাই নোতুন নোতুন ফুলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসি—।"

চামেলি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বোনকে নিয়ে চলে গেলো। সিঁড়ির একধাপ উঠেই চামেলি জিগ্যেস করলো "মিলি তোর কাছে মা—মা'র—মা-অরু-বোসের ফটো আছে?"

"আছে দিদি। বাবা বৌদির একসঙ্গে তোলা একটা ফটো এনেছি, আর মায়ের একটা আলাদা।"

"এনেছিস্—? তবে কেন দেখাস্‌নিরে এতক্ষণ?" চামেলির গলা একেবারে ধরে গেছে। মল্লিকা ভাবছে কৈ দিদিতো পর হয়নি? একেবারে সেই দিদিইতো আছে—ঠিক সেই আগের মতো। তবে কেন ও ভাবতো। বিয়ে হ'লেও মেয়েরা তা হলে পর হয় না?

মল্লিকা প্রসঙ্গ বদলালো, "দিদি জানিস বৌদিটা যে কী ভাল হয়েছে, কী যে ভাল—। তুই দেখলে বুঝবি দিদি, অমন মেয়ে হয় না!" চামেলি খুশির হাসি হাসলো।

"আমাদের অরুর মতো স্বামী পেতে হলে, পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার দরকার রে—।"

"বৌদিও তপস্যা করেই পেয়েছে দিদি, তবে সেটা এ জন্মে।"

"তাই বুঝি? যাবে শুয়ে শুয়ে শুনবো'খন তোর কাছে। ফটোগুলো কোথায় আছে রে মিলি? হাতে নাকি?"

"না সুটকেসেই আছে। একেবারে নীচে, কাগজের তলায়। ও ট্রাঙ্কগুলোতে শুধু তোমাদের জিনিষ—জামা-কাপড়-শাড়ি-খেলনা আরো কি কি সব যেন আছে। চলো খুলে দেখাই—" মল্লিকার কথা শেষ হওয়ার আগেই চামেলি হুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মল্লিকারও চোখের কোণায় জল এসে গেছে, তবুও সামলালো চেষ্টা করে, "তুই কেবলই যদি কাঁদবি দিদি, তবে আমি রুমা-বাবার কাছে যাই—"

"না রে না। কাঁদলাম আবার কোথায়—।" চামেলি আঁচল তুলে ঘসে ঘসে চোখ মুছতে লাগলো। সুটকেস খুলে ফটো বার হলো। প্রথমে, দিদির হাতে ধরা-বৌদির ফটোখানা দিলো মল্লিকা। ফটো দেখে চামেলি ছেলে-মানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলো, "এত সুন্দর হয়েছে অরু? এত সুন্দর বউ।" আনন্দ আর বিস্ময় একই সঙ্গে ফুটে উঠলো চামেলির চোখে। মায়ের ফটোর আবরণ খুলে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো চামেলি। ফটো রেখে খাটের বাজুর মধ্যে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো, "মিলি, মা বড্ড রোগা হয়ে গেছে—নারে?" মল্লিকার মাথাও নেমে এলো চামেলির মাথার পাশে। দুটো মিলিত পবিত্র ধারা বইতে লাগলো নিঃশব্দে।

(ক্রমশঃ)

অন্য নগরে

অবিনাশ রায়

অন্য এক নগর আছে ঐ দূরে নক্ষত্রের দীপে—
প্রাণের উচ্ছ্বাস মাখা স্নিগ্ধ আর নীলাভ উজ্জ্বল
পৃথিবীর চেতনাকে পুড়ে পুড়ে চাঁদের প্রদীপে
যেন সে শান্তির হ্রদ ; আশাগুলি করে ঝলমল।

যখন তমসা এসে ঢেকে দেয় আলো-রজনীকে
কোলাহল স্থির হয় জীবনের বেচা-কেনা শেষে
দিনের কর্মঠ-মনে ক্লান্তির-বেদনা হয় ফিকে
সেই দীপ্ত-নগরের মায়াবিনী অলৌকিক দেশে।

অন্য সেই নগর দেখি,—আকাঙ্ক্ষার তীর এ অন্তরে
ডুব দিলে বোঝা যায় একটি প্রেমিক-পরী তার
আশ্চর্য রাতের কাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে রূপকথা করে'
মায়াবী-তৃষ্ণার দীপে ; সে-ও জানে লীলা অভিসার।

উচ্চাঙ্গের বাংলা গান

জয়দেব রায়

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দুইটি বিশিষ্ট রীতিভঙ্গিমা ঠুংরি এবং টপ্পা ধ্রুপদ খেয়ালে যেমন গম্ভীর ভাবের ভোতনা করে, ঠুংরি-টপ্পা তেমনই চটুল ভাবের প্রকাশক। তাসধত মহিমাগান, রাজার গুণপরিমা প্রচার প্রভৃতি ছিল ধ্রুপদ-খেয়াল গানের বিষয় বস্তু; ঠুংরি-টপ্পায় সাধারণত মানবীয় হৃদয়াবেগই অভিব্যক্ত হয়। ধ্রুপদ-খেয়ালের ন্যায় স্বরচাতুর্য ও সুরাভিজাত্য এগুলির না থাকিলেও ঠুংরি-টপ্পাতেও সূক্ষ্ম কারুকৌশল যথেষ্ট আছে।

ধ্রুপদ খেয়ালের গতানুগতিক জটিলতা এবং নানাবিধ বিধিনিষেধ হইতে সঙ্গীতকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই যেন ঠুংরি-টপ্পার আবির্ভাব। ঈশ্বরের লীলামহিমা কীর্তনের জন্য সুরের সূত্রে গ্রথিত নায়িকা প্রেমিকার কণ্ঠেও তো অর্পণ করা যায় না। ঠুংরি-টপ্পা গানে তাই গায়করা লাভ করিয়াছিলেন স্বাধীনতা।

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রসিকদের মধ্যে চিরকালই ছিল হিন্দী ধ্রুপদ-খেয়ালের সমাদর; বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের গান রচিতই হইত না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা দেশে বাংলা ধ্রুপদাঙ্গের গান অজানাই ছিল। এমন কি, বিষ্ণুপুরের সেনী ঘরোয়ানার খাঙ্গালী ওস্তাদরা পর্যন্ত হিন্দী ভাষাতেই গান রচনা করিতেন।

অনেকের ধারণা ছিল বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর গান রচনা করা রীতি বিরুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ বাংলায় ধ্রুপদ গান রচনা করিতে শুরু করেন, অবশ্য তাঁহাদের ঐ গানগুলি হিন্দী ধ্রুপদের বঙ্গানুবাদের মতো। হিন্দী গানের সুরসূত্রে যেন বাংলা কথা বসানো হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর ধ্রুপদ-খেয়াল গান এবং সেগুলির মূল হিন্দীগানের একটি তালিকা এই সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইল—

খেয়াল—১) মোরে বারে বারে ফিরালে—মোরি নই লগন
লাগিয়ে পিয়া তুম সন মোরা—
(নটমল্লার, একতালা—মধ্যলয়)

নয়ান ভাসিল জলে—পানীয়া বোলে সে রে
সাবনকী ঘটা আই তো রে—
(শ্যাম—একতালা)

২) যাও হে, হৃদয় ছেড়ে যাও—পালা যুঝেউরি
হে পী মতবারি মোরা
(রাম কেলি—তেতালা)

ধ্রুপদ—১) মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয় পুর মাঝে—
যেরে হৃদ্মদল সাজে ঘনরস সুতরাম
(বেহাগ, ঝাঁপতাল মধ্যলয়)

২) জাগ জাগরে সঙ্গীত—
প্রথম পরকর দিশায়হি নাদকো
রচো ওঙ্কারকল ভয়নিরঞ্জন করকর বিস্তার
(তিলক কামোদ, তেওরা)

৩) তিমিরময় নিবিড় নিশা—প্রবল ঘন মেঘ লুক লুকয়া
(তানসেনী মেঘ মল্লার, ঝাঁপতাল)

৪) প্রচণ্ড গর্জনে আসিল—প্রচণ্ডগর্জন সঘন বরষা ঋতু
(কৃপালী—সুরফাক্তা, মধ্যগতি)

ভজন—১) তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ—মোরে গিরিধর গোপাল
(ভৈরবী, একতালা)

২) তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে—
আজ শ্যাম মোহলিয়ে বংশী
(খাম্বাজ, একতালা)

কিন্তু স্বয়ংসৃষ্ট সুরে টপ্পাগান রচনা করিতে শুরু করেন বহু পূর্বেই নিধুবাবু। সুতরাং একরকম বলিতে পারা যায় যে, নিধুবাবুই বাংলা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্মদাতা। তাঁহার পূর্বে বাংলা দেশে বাউল এবং কীর্তন ছাড়া অন্য কোন গানই ছিল না। বাঙ্গালীর সমগ্র সঙ্গীত প্রতিভা ঐ দুই শ্রেণীর গানেই সঞ্চারিত হইয়াছিল। নিধুবাবু উচ্চাঙ্গ প্রথায় নব গীতিরীতির প্রচলন করিয়া তাহাকে নানা পথে সঞ্চালিত করেন।

ঠুংরি গানের প্রচলন হয় অনেক পরে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই লক্ষ্ণৌপ্রবাসী অতুল প্রসাদ সেখানকার ঠুংরিগানের বৈশিষ্ট্যগুলি সঞ্চয় করিয়া খাঁটি বাংলায় ঠুংরি রচনা শুরু করেন।

অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে টপ্পা গানের জন্ম। পাঞ্জাবের এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত টপ্পার উৎস। গোলাম রসুল অথবা গোলাম নবী ছিলেন খেয়াল গানের জন্মদাতা সদারঙ্গের প্রিয়তম ছাত্র; শোরী নামে একজন পাঞ্জাবী সুন্দরী তাঁহার প্রণয়িনী ছিল। তাহারই মনোরঞ্জনের উদ্দেশে গোলাম নবীসাহেব যে সকল প্রেম-গান রচনা করেন টপ্পার আদি নিদর্শন সেগুলিই। শোরীর উদ্দেশে রচিত বলিয়া এসব গানে তাহার নাম আছে আর সেই জন্যই এ গান 'শোরীমিঞার টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।

সঙ্গীতের ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন গোলাম নবীর পুত্র মিঞাজান টপ্পাগানের স্রষ্টা। পিতার কাছে তাঁহার সুরদীক্ষা—পিতৃনামেই তিনি তাঁহার গানগুলিকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

উচ্চাঙ্গের বাংলা গান

উইলার্ড সাহেব টপ্পা গানকে শোরীর রচিত বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছিলেন—"Tuppa brought to perfection by Shoree, generally sung in the language spoken in Punjab or a mixed jargon of that and Hindi."

যাইহোক্, টপ্পাগান অল্পদিনের মধ্যে ধনীদের মজলিসে খ্যাতি অর্জন করিল। যে সকল গায়ক ক্রুপদ খেয়ালের চর্চা করিত, তাহাদের বলা হয় 'কালোয়াত'। এই কালোয়াতরাও ক্রমে ক্রমে আগ্রহে টপ্পাকে গ্রহণ করিল।

নবদ্বীপচন্দ্রের ভগীরথ নিধুবাবু উত্তর ভারত হইতে সেই ধারাকে বহন করিয়া লইয়া আসিলেন এদেশে। এই ভাবে বাংলার বহুদিনের সঙ্গীতরস পিপাসা নিবারিত হইল, বাঙ্গালী পান করিল উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের উৎস ধারা।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কত বিচিত্র সুরই নিধুবাবু প্রথম বাংলাগানে প্রবর্তন করিতে শুরু করেন। সোহরাই বাহার রাগিনীতে এবং পাহাড়ী খিঁচিটে রচিত তাঁহার একাধিক গানের উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা হইতেই বুঝা যাইবে এইসকল অবহুল প্রচারিত সুর কত সহজ স্বাভাবিক ভাবেই না তাঁহার গানে ব্যবহৃত হইত—

সোহরাই বাহার—১। সুধামুখি মুখ বিরস করো না; ২। তোমারে আমার এত সাধিতে হইল; ৩। কুরঙ্গনয়ন কি রঙ্গ করিল; ৪। তোমার গুণের কথা কি কব?

পাহাড়ী খিঁচিট—১। বারে বারে এবারে আর আমি তারে সাধিব না সই; ২। মনেতে বুঝিয়া দেখ, না দেখিলে তব মুখ; ৩। নয়নের বাণকে বলিলে প্রাণ; ৪। ঐ যায় সই, ডাক না উহারে; মোর প্রাণ যায়।

বাংলা দেশের প্রথম সঙ্গীত-বিশ্লেষক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী টপ্পাগানের সৃষ্টি সম্পর্কে বলিয়াছেন—

"কালের কথা কিছুই বলা যায় না, যে গান পূর্বে উট্ট চালকদের মাত্র মনোরঞ্জন করিত সেই সকল গীত এক্ষণে ভারতবর্ষবাসী সর্বলোকের আহ্লাদবর্ধক হইয়া উঠিয়াছে। যাহাই হউক, উষ্ট্রপালকেরা সর্বদা টপ্পাগান করিত বলিয়া, ইহাকে হেয় করা বিধেয় নহে, যেহেতু মুক্তামালা বানরের গলায় থাকিলে কি মুক্তার গৌরব নষ্ট হয়?"

কথিত আছে টপ্পাগান পঞ্জাবের উট্টচালকদের মধ্যে প্রচলিত একপ্রকার লোক সঙ্গীত হইতে জাত।

টপ্পার জন্ম সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী একটি গল্প বলিয়াছেন—"এ সম্বন্ধেও এই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সদারঙ্গের এক শাকরেদ গোলাম রসুল লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে খেয়ালের উৎকর্ষসাধন করেন। তাঁরই ছেলে গোলাম নবী, শোরী নামক এক পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে উদ্দেশ করে যে সব গান রচনা করেন, তারই নাম টপ্পা। শোরীর টপ্পা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত সেটা ঠিক। শোরীর নাম শেষে উল্লিখিত আছে, তাতে অনেকের মনে হয় যে শোরী মিঞাই বুঝি রচয়িতা।"

শোরীর টপ্পার ন্যায় প্রাচীন বাংলার প্রায় সব গানই অতিরিক্ত তানযুক্ত।

শৌরীর টপ্পার বৈশিষ্ট্য ছিল দ্রুত তানকর্তব। এই দ্রুত তানকৌশল প্রকাশ করিলেই গানের সব সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় না। নিধুবাবুর গানের ছোট ছোট কথাগুলি ধীরে ধীরে লীলায়িত ছন্দিত গতিতে অগ্রসর হয়, তাঁহার গানের তান কোথাও দ্রুত নয়, বোলতান, সপাটতান, জমজমার হিন্দী টপ্পার ন্যায় তাঁহার গান কোথাও ভারাক্রান্ত নয়। ছোট ছোট প্রতান ও হিক্কোলিত তাকে তাঁহার গানগুলি সুশোভিত। কাব্যসঙ্গীতের সৌন্দর্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে জন্য কোথাও তিনি কর্তব প্রয়োগ করেন নাই।

শতবর্ষপূর্বের প্রথম বাংলা গীত সংগ্রাহক দুর্গাদাস লাহিড়ী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ওস্তাদদের নিকট হইতে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি বহু সংখ্যক খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল প্রভৃতি সুর আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। এই সকল হিন্দী গানের চর্চা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার মাতৃভাষায় অনেক পরমার্থ ও ধর্ম বিষয়ক গান আছে বটে, কিন্তু হিন্দী খেয়ালের অনুকরণে টপ্পা বা প্রণয় সঙ্গীত অল্পই দেখা যায়। তাহার এই অভাব পূরণের জন্য তিনি সরিমিঞাকৃত টপ্পার অনুকরণে বাঙ্গালায় টপ্পা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নিজে গান রচনা করিয়া, তিনি নিজেই সেই সকল গান সুললিত গাহিয়া অপরকে শুনাইতেন। সে সময়ে প্রণয়সঙ্গীতের মধ্যে এক ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গান এবং প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের রচিত প্রণয় সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। কিন্তু সরল বাংলাভাষায় সরি মিঞার ন্যায় সুন্দর টপ্পা যে রচিত ও গীত হইতে পারে, এ ধারণা তখন অনেকেরই ছিল না। সুতরাং কোনও মজলিসে বিশুদ্ধ সুরলয়ে নিধুবাবু স্বরচিত বাঙ্গালা টপ্পা গাহিতেন, তখন শ্রোতৃবর্গ একেবারে মোহিত হইয়া যাইতেন। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহার যশঃ-সৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।"

নিধুবাবুর গানের সে আমলের প্রচলিত নাম ছিল 'আখড়াই গান'। কবির গান, খেউড়, কীর্তন প্রভৃতি হইতে পৃথক করিবার জন্যই কেবল নহে, ভক্তিতত্ত্ব বর্জনের নির্দেশক বলিয়া এইরূপ নাম প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ, পালোয়ানদের আখড়ার ন্যায় এই সকল আসরে কালোয়াতদের কসরত দেখানো হইত বলিয়া এইরূপ নাম বেশ যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল।

আখড়াই গানের প্রথম প্রবর্তক কুলুই চন্দ্র সেন। সেই সময়ে আখড়াই গান কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ বাংলা দেশের প্রথম সাংবাদিক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইল—

"১২১০ সালের পূর্বে কৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সমাজে বাঙ্গালী মহাশয়দিগের মধ্যে 'আখড়াই' গাহনার অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্য আখড়াই বিষয়ে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্তব্য হয়। তিনি ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুল পুত্র ছিলেন। কিন্তু নিধুবাবু তাঁহার আখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই, ইঁহার কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।"

নিধুবাবুর তুলনায় ঈশ্বরের গানগুলি অধিকতর কাব্যসুষমা মণ্ডিত। তাঁহার গান জনসাধারণ এমন ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিল যে, কবির নাম পর্যন্ত তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যুগের জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন—

"তিনি বঙ্গের দ্বিতীয় সরিমিঞা; তাঁহার রসময় ভাবময় টপ্পা অনেকের মুখে শোনা যায়। কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই সব টপ্পার রচয়িতা কে? যিনি গাহিতে জানেন, তাঁহারও মুখে ঈশ্বরের টপ্পা শুনি। আর যিনি না জানেন, তাঁহারও মুখে শুনি। যিনি গাহিতে জানেন তিনি ভাবে সুরে বিভোর হইয়া গান; যিনি গাহিতে না জানেন, তিনি ভাবে বিভোর, আপন স্বভাব সুরে গাহিয়া কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হন।"

কেবল সে যুগে কেন, আজও তাঁহার গানকে অনুসরণ করিয়া বাংলার কবির আজও গান রচনা করেন। ঈশ্বরের যে বিখ্যাত গানটি সকলেই নিধুবাবুর বলিয়া ভুল করেন—

উচ্চাঙ্গের বাংলা গান

ভালো বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার সে ভালবাসা তোমা বই জানিনে।
বিমুখে মধুর হাসি, দেখিলে হৃদয়েতে ভাসি
তাই—আমি দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম যুগে এই সুরেই গাহিয়া ছিলেন—

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে,
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি, প্রাণে কেন বরষিল।
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন, মুখের পানে চেয়ে গেল।

শ্রীধরের টপ্‌পা নিধুবাবুর টপ্‌পার অপেক্ষা সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্যের দিক্ দিয়া অধিকতর সমৃদ্ধ। শ্রীধরের গীতিরীতিও কষ্যাভর, গানের চালকে অথথা হাল্‌কা না করিয়া তিনি তাঁহার গীতিসৌন্দর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রাচীন বাংলা গানে শ্রীধরের রীতিই অনুসৃত হইয়াছে।

শ্রীধর কথকের টপ্‌পাগুলিরার ভজন গানগুলিও বিশিষ্টতামণ্ডিত। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে গৌরী রাগিনীতে রচিত তাঁহার শব্দালঙ্কার বহুল নিম্নের গানটি—

মন, চিন্তয় ব্রজ মণ্ডল কুঞ্জগতম্।
ব্রজবন্দিত নন্দিত নন্দসুতম্।
নটবেশ মনোরম রূপ ধরম্
মুরলী মধুর ধ্বনি মোহকরম্।
বলিত নব যুবতী মিলিতম্।
বৃষভানু সুতা যুত বামকরম্।
হরিতাম্বর পূরিত প্রেমভরম্।
সখীত মতিমিব মুনিমুদিতম্।

বহুদিন পরে ঠিক এই ধারাতেই আজ আবার দিলীপকুমার তাঁহার সংস্কৃত ভজন গানগুলি রচনা করিতেছেন।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে শোরীর টপ্‌পাকে আবার পুনর্জীবন দান করেন। তাঁহার টপ্‌পাও চিরাচরিত শোরী মিশ্রার অনুসরণে রচিত হইলেও স্বরবিস্তারের অভাব এবং টপ্‌পাঙ্গের বিশিষ্ট তান প্রাচুর্য না থাকায় বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের টপ্‌পা জাতীয় গানের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ—আজি যে রজনী যায়, সকল জনম ভরে, বিনা মাধবে বিষাদে, কে বলিদে আজি ফুলমাসনে, ফুলমাসনা মম পূর্ণ হ'ল, বন্ধু রহো রহো সাথে, এ মোহ আবরণ খুলে যাও, নিশিদিন চাহরে, কোথা যে উধাও হ'ল, এ পরবাসে রবে কে হায় প্রভৃতি।

টপ্‌পা খেয়াল ভঙ্গীরই সংক্ষিপ্ত কাকলি, টপ্‌পার ধ্রুপদের মতো চারটি তুক নাই। খেয়ালের ন্যায় টপ্‌পাতেও মাত্র দুইটি তুক আছে আস্থায়ী এবং অন্তরা। তবে খেয়াল অপেক্ষা টপ্‌পায় অধিক তান ব্যবহৃত হয়। ঝাঁঝি, সিন্ধু, ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, কালাংড়া এবং সিন্ধু টপ্‌পার বিশিষ্ট রাগিনী, খেয়ালে আবার ঐ রাগিনীগুলির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। তালের মধ্যে ১৬ মাত্রার মধ্যমান টপ্‌পার বিশিষ্ট তাল।

ক্রমে টপ্‌পা ও খেয়ালের সংমিশ্রণ করিয়া 'টপ্‌খেয়াল' নামে একটি ভিন্ন শ্রেণীর গানের প্রচলন হইল। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গান এই টপ্‌খেয়াল রীতিতে রচিত—আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে, আজি তোমারি কাছে ভাসিয়া যায়, মলয় আসিয়া কয়ে গেছে প্রভৃতি। এই শ্রেণীর গানে টপ্‌পা ও খেয়াল উভয় ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ করা হইয়াছে। অক্রূর গোপাল উড়ে ও কালী মির্জার টপ্‌পা এবং ঠুংরিগানের সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

নিধুবাবু শোরীর অনুকরণ করিয়াছিলেন কেবল মাত্র সুরে এবং ভঙ্গীতে, গানের বাণীতে তাঁহার নিজস্ব কবিত্ব বর্তমান। প্রত্যেকটি গান যেন এক একটি সুখকরোজ্জ্বল শিশির কণার মতো। শোরীর টপ্‌পা এবং অনুরূপ সুরের কবির অনুকৃত একটি গান পাশাপাশি রেখিলেই পার্থক্য দেখা যাইবে—

খাম্বাজ, মধ্যমানে বিলম্বিত লয়ে রচিত

মিছাবে জাদু জরা, সোঁড়া,
যেন্‌ তু ভেরে বাদি হো-ও-ও রেইয়া।
ভুমে তুয়া নয়না যা গুমা নেড়া
মোর ভুক্তরে বাঁধী হো-ও-ও রেইয়া।

নিধুবাবুর গান—

তোমারই তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
আকাশের পূর্ণ শশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে।
সৌরভে গরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গা জলে।

ডস্টয়েভ্স্কি :

স্ত্রী ও মেয়ের-দৃষ্টিতে

সত্যব্রত বসু [গতবারের পর]

২১

টলস্টয়ের "ওঅর এ্যাণ্ড্ পীস্-এ" একজায়গায় আছে, নেপোলিয়নের ভয়ে যখন শহর খালি পিএর, মস্কোর জনশূন্য বাড়িতে বাড়িতে প্রেতাত্মার মত ঘুরছে, এমন সময় নেপোলিয়নের সৈন্যরা এসে তাকে ধরল। অন্য বন্দীদের সঙ্গে তাকেও তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে এল একটা ফাঁকা জায়গায়: সেখানে দেওয়ালের গায়ে ওদের দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারবে। প্রথম দল দাঁড়ালো, বাতাস চিরে একঝাঁক বুলেট গিয়ে তাদের বুকে বিঁধল, রক্তাক্ত শরীরগুলো কাটা ঘুড়ীর মত লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পিএর কাছেই দলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছিল কিন্তু তার মনে কোনো চিন্তা বা অনুভূতি ছিল না: মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী সব অসাড়। প্রথম দল মরে পড়ে রইল সেখানে, ওদের উপরে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে সে এবার দেওয়ালে গিয়ে দাঁড়াবে। গুলি ছোড়া হবে, এমন সময় হঠাৎ সরার খবর এল। পিএর-এর বাঁধন খোলা হল, বন্দীদের আবার ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে তাড়িয়ে একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে এনে সেরাত্রের মত বন্ধ করে রাখা হল। তারপর কঠিন শীত: বরফঝরা শীতের মধ্যে দেখা যায় বরফঝরা শাদা সীমাহীন প্রান্তরের ভিতর দিয়ে নেপোলিয়নের সৈন্যরা তাদের হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ডস্টয়েভ্স্কির বন্দীজীবনের কাহিনী পড়তে পড়তে 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস্'-এর এই জায়গাটা মনে পড়ে। পিএরকে যাঁকার সময়ে ডস্টয়েভস্কির কথা হয়ত টলস্টয়ের মনে পড়ে থাকবে।

ডস্টয়েভ্স্কির চেয়ে টলস্টয় আট কি ন বছরের ছোট এই সময়ে ছাত্র। আরো দশবছর পর ডস্টয়েভ্স্কি সাইবেরিয়া থেকে ফিরে এলে কয়েকবছরের ব্যবধানে রাশিয়ার পর পর তিনখানি বই বেরিয়েছিল: টুর্গেনিভের 'ফাদার্স এ্যাণ্ড সন্স্' টলস্টয়ের 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস্' ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'। টুর্গেনিভের 'ফাদার্স এ্যাণ্ড সন্স্' হয়ত লোকে আর আর পড়ে না কিন্তু অন্য বই দুখানি দুনিয়ার আজো পূর্ণ মর্যাদায় বেঁচে আছে। কমদিনের কথা নয়,—প্রায় একশ বছর হল।

ডস্টয়েভস্কিকে খুব স্বাভাবিক যে টলস্টয় ভালবাসতেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে এই দুই লেখকের কখনো দেখা হয়নি। দুই পরিবারে যাতায়াত ছিল এমন এক বন্ধুর মারফৎ উভয়ের কথাবার্তা চলত। টলস্টয় বলতেন, 'ডস্টয়েভস্কিকে বোলো তাঁকে খুব ভালবাসি। তাঁর নূতন বইটি পড়েছি, পড়ে অভিভূত হয়েছি।'

'তাই নাকি! ভাল ভাল!' ডস্টয়েভস্কি উৎফুল্ল হয়ে বলতেন, 'টলস্টয়কে বোলো যে তার লেখাও আমার বেশ ভাল লাগে।'

এঁরা পরে লিখেছেন, 'টলস্টয় যে যাবার সঙ্গে কখনো দেখা করেননি তার কারণ আমি বুঝতে পারি। দেখা

হলে নিশ্চয় তাঁরা খুব ঝগড়া করতেন।' তাঁদের আদর্শগত বে-তফাৎ, এখানে ইঙ্গিত সেইদিকে।

কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। তাঁর মৃত্যুর পর টলস্টয় আনাকে প্রশ্ন করেন: 'আচ্ছা, বলুন তো, তিনি কি রকম মানুষ ছিলেন!'

আনার অভিভূত উত্তর: 'জানবেন যে এ রকম সৎ উদার মহৎ ও ভদ্র ব্যক্তি আমি দ্বিতীয় দেখিনি।'

কিন্তু টলস্টয়-দ্বারা যে এবাড়িতে আসতেন এমন শোনা গেছে। আনা পরে ডস্টয়েভ্‌স্কির প্রকাশক হয়ে সংসারে প্রচুর আয় বাড়িয়েছিলেন। তাই দেখে উৎসাহিত টলস্টয়-দ্বারা সস্ত্রী পরামর্শ নেবার জন্য আনার কাছে আসতেন। কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কি সম্ভবত তাঁকে দেখেননি।

ডস্টয়েভ্‌স্কির মৃত্যুর পর টলস্টয়ের যে-চিঠি সে প্রায় চেঁচিয়ে কান্নার মত। কিন্তু সে কথা থাক।

২২

সাহিত্যিক বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডস্টয়েভ্‌স্কি কয়েকদিন প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলেন। লেখা ছেড়ে দিলেন, বাইরে যাওয়া আসা বন্ধ, কারু সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন না, সারাদিন চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন আর রাত্রিতে সিটায়েভ্‌স্কার্ফের নির্জন পথ ধরে একা একা হাঁটতেন। রাস্তা চলতে চলতে নিজের মনে জোরে জোরে কথা বলতেন, লোকজনের দিকে তাকিয়ে অঙ্গভঙ্গী করতেন। সকলে ভাবল তিনি পাগল হয়ে গেছেন। যারা চিনত, সভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগল, যারা চিনতনা, রাস্তার পাগল ভেবে কৌতূহলী হয়ে ফিরে দাঁড়াত।

পেট্রাশেভ্‌স্কি নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আগেই তাঁর পরিচয় ছিল। এবার সেখানে তাঁর যাতায়াত সুরু হল। প্রতি শুক্রবার এখানে একটা ঘরোয়া বৈঠক বসত। ছাত্র, অধ্যাপক, কেরাণী, পদস্থ কর্মচারী, বক্তা, লেখক, আইনজীবী, সমাজতন্ত্রের লোকই এই সভায় ভিড় জমাতেন। উত্তেজনা, বিতর্ক এবং আলোচনা—প্রেরণা, চা এবং সিগারেট। সামাজিক নানা বিষয়ে তাঁদের আলোচনা হত। ভূমিদাসত্ব, দাসমুক্তি, সেন্সরশীপ এবং সরকারী শাসনতন্ত্রের সমালোচনাই ছিল প্রধান। কিন্তু এই সভাকে যে গুপ্ত বিপ্লবীচক্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে তার কোনো মানে নেই। এঁরা সকলেই সৎ আদর্শবাদী যুবক—দেশের উন্নতিকামী একদল ছেলে। কেউই অভিজ্ঞ বা সুশিক্ষিত কর্মী নয়। পরিকল্পনা, সংগঠন, প্ল্যান, প্রোগ্রাম, নক্সা, দীক্ষার, এসবও কিছুই না,—এ নিছক একটা ক্লাব, একটা বিতর্ক সভা,—কিন্তু খবরটা জারের কানে উঠল এবং ভদ্রলোক খুব রেগে এবং ভয় পেয়ে গিয়ে দলের কয়েকটা ছেলেকে ধরে কঠোর সাজা দিয়ে দিলেন। এরা অবশ্যই কিছু নিষিদ্ধ বই রাখত এবং একটা প্রেস তৈরী করে তাদের লেখা ছেপে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। বইগুলি পাওয়া যায় কিন্তু প্রেসের কোনো চিহ্ন কর্তৃপক্ষের হাতে পড়েনি।

জারের নাম নিকোলাস নম্বর এক। ইনি প্রায় পঁচিশ বছর আগে রাশিয়ার আর একটা বিপ্লব,—ডিসেম্ব্রিষ্ট মুভমেন্ট,—দমন করেন,—সেবার বিধ্বস্ত করেছিলেন পুশকিনকে,—এবার ডস্টয়েভ্‌স্কি।

কিন্তু আদর্শ, কল্পনা এবং বীরবাদ ছাড়া এই চক্র সম্বন্ধে ডস্টয়েভ্‌স্কির আর কোনো ধারণা ছিল এমন মনে করার হেতু নেই। নিষিদ্ধ বইয়ে তিনি একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন একথা ঠিক, মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বক্তৃতাও দিয়েছেন কিন্তু সে বন্ধ ঘরে এবং বন্ধুদের সামনে। আর প্রেস করার ব্যাপারে তিনি যে খুব উৎসাহী হবেন এও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য রাজা যে সাজা দিলেন তা অভাবনীয়। রাগে এবং ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান না হারালে মানুষের এমন আচরণ হয় না।

সাধারণ মানুষের নিয়ম ও সবসময় খাটে না। রাজার সেবা করে আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের জীবনযজ্ঞ সার্থক করে যাব এই হল ঈশ্বরের বিধান। সে বিধানকে যে বা যারা উল্টে দিতে চায় তারা নরাধম। তাদের একমাত্র শাস্তিস্থল গুলি।

ডস্টয়েভ্‌স্কির বিরুদ্ধে এই চার্জ আনা হল :

'তুমি নিষিদ্ধ বই পড়েছ। দেশদ্রোহী, যদ, বোলেটে মুলাজাহুদের সঙ্গে মিশেছ। বেলিনিস্কির একখানি মারাত্মক চিঠি গোপনে শুনিয়ে আমার প্রজাদের আমারই বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছ। আর শোনা গেছে তুমি নাকি গোপন প্রেস তৈরীর অন্যতম পাণ্ডা ছিলে। তোমাকে ক্রিমিনাল কেন বলা হবে না বলো।'

ডস্টয়েভ্‌স্কিকে অন্যতম একটা পাথরের সেলে বন্দী রাখা হয়েছিল। স্বীকারোক্তি লেখবার জন্য মৌখিক প্রহরাদের পরে তাঁকে কাগজকলম দেওয়া হয়। ডস্টয়েভ্‌স্কি লিখলেন :

'হ্যাঁ, আমি পেট্রাশেভ্‌স্কির বাড়িতে প্রায় শুক্রবারেই যেতাম কিন্তু তাদের অন্যায়টা কী হয়েছে। আমাকে দেশদ্রোহী বা রাজদ্রোহী প্রভৃতি যে বলা হচ্ছে এগুলি বাজে কথা। আমি দেশের ভাল চাই। তার জন্য তোমাদের নীতি এবং শাসনতন্ত্রের দুর্নীতি এবং অপকীর্তির সমালোচনা আমি করেছি এবং মনে করি যে পূর্ণ নাগরিক হিসাবে সে অধিকার আমার আছে। আর আমাকে যদি আমার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে না দেওয়া হয় তবে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কেন।'

সোশ্যালিজম সম্বন্ধে লিখলেন :

'আমি ইতিহাস এবং অর্থনীতির ছাত্র : এ দুটি বিষয়ে খুঁটিয়ে গভীরভাবে আমি পড়াশুনা করেছি। বলতে পারি যে আমি নিজে একজন সোশ্যালিস্ট নয়, কিন্তু এই নীতির অনেকগুলি দিক আছে যা আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। বিষয়টি গভীর—একথায় তা আমি নাকচ করে দিতে পারি না। তবে একথা ঠিক যে এ্যালকেমি যেমন একটা বিজ্ঞান নয় কিন্তু তার থেকে কেমিষ্ট্রির উদ্ভব, তেমনি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভবিষ্যতের মানুষও সোশ্যালিজম থেকে তেমনি সুষ্ঠু সুন্দর সুস্থ ও শুঙ্খলাযুক্ত কোনো সমাজব্যবস্থা একদিন খুঁজে আনবে।'

নিজের জন্য ডস্টয়েভ্‌স্কি কর্তৃপক্ষের কাছে একটি কথাও লেখেননি। অপরকে জড়িত করা বা অন্যের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে হালকা করা, এও না। সোনা যায় অন্তরা তা করেছিলেন।

সেলে বিচারের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল, প্রায় আটমাস, তাঁকে আটকে রাখা হল। এই আটমাস ধরে সাধারণ সরকারি চালে তাঁর বিচার চলতে লাগল বাইরে। আর সেলে বসে এই সময়টা তিনি একটির পর পর একটি অতি সুন্দর কয়েকটি গল্প লিখে কাটালেন।

৫৩

ডিসেম্বরের এক সকালে দরজা খুলে বন্দীদের বাইরে আনা হল। তীব্র শীত। বরফ। কুয়াশায় চারিদিক। বন্দুকধারী সান্ত্রীর প্রহরায় বন্দীদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আসা হল শহরের বাইরে একটা ঢালা মাঠে। আরো অনেক গাড়ি এল, অনেক বন্দী, তাদের মধ্যে অনেকেই অপরিচিত। ইতিমধ্যেই কাতারে কাতারে লোক জমে গেছে। চাপা কথা, দ্রুত পদক্ষেপ, সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার, সশস্ত্র সৈনিক, পদস্থ সরকারী কর্মচারী—তুষার-ঢাকা কুয়াশাবৃত শীতের একটি সকাল সহসা সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু বন্দীরা এখনো কিছু জানে না। ডস্টয়েভ্‌স্কি তাকিয়ে দেখলেন সকলেরই মুখভর্তি দাড়ি, তাঁর নিজের মুখও সহসা মনে পড়ল,—অসাড়, অবশ অসাড় শরীর, শীতে সাদা, বিশ্রী পোষাক,—যেন এক্সপিয়েশন

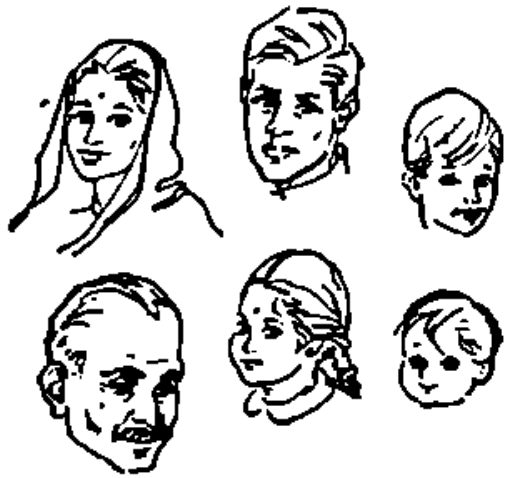

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন "ন্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যুসুখ্যু মানুষ তাই বলে আমি কি এতেই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম, রানীমা একেবারে হতবাক বললেন "আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

B. MAJUMDAR

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

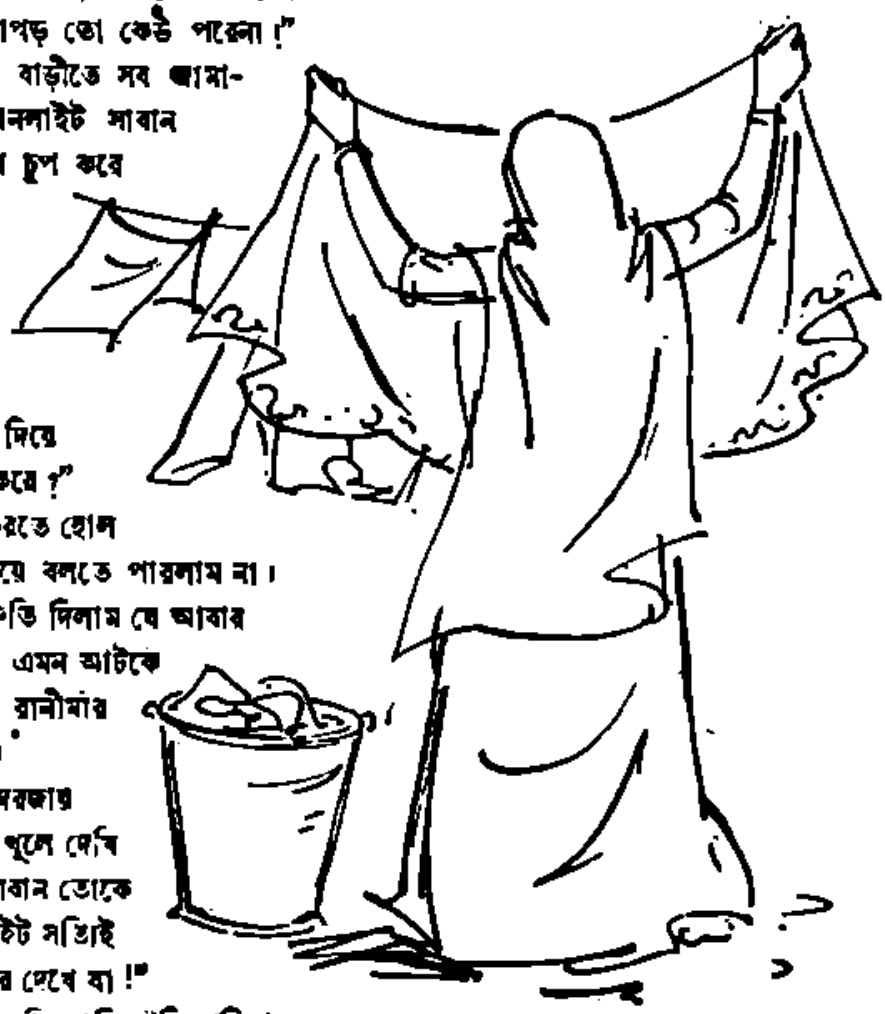

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ঠিক সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজার কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি, তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাটি টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

শানের একটা টীম,—পরস্পরের মধ্যে মিলতে পেরে তবুও সকলেরই মুখের ভাব বেশ খুশি। যাদের চিনতেন, এগিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে করমর্দন করে কথাবার্তা বললেন। সকলেই কিছুক্ষণের জন্য বিপদের কথা ভুলে সহজ ও ঘরোয়া হয়ে উঠলেন।

কিন্তু মৃত্যুর পটভূমিতে যত এমন উজ্জ্বল আনন্দময় হলে তবে কী হয়ে। মৃত্যুর রঙ হবে নিবর্ণ কালো, গাঢ় : সে হবে বোবা, ভীষণ, ভয়ে পাতুর, হতাশার ম্লান, যন্ত্রনায় দীন,—মৃত্যুর চেহারা হবে কদাকার। বীভৎস। সেনাপতির হুকুমে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। কেবল ডনটেভ্‌কি ফিসফিসিয়ে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর যাবে যে গল্পটি শেষ করেছেন তার কাটিনীটা সংক্ষেপে পাশের লোকটিকে বলছিলেন, বলা শেষ হলে তিনিও চুপ করলেন।

সকলে এবার সামনে তাকিয়ে দেখল মস্ত উঁচুমঞ্চ একটা বেদি : সমস্তটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। কী বিশ্রী। মনটা যেন দমে যায় হঠাৎ। সকলকে উঠিয়ে আনা হল মঞ্চে,—মুখোমুখি দুটি সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। এবার আরো একটা দল : বেদির তিনদিক ঘিরে রাইফেল বাগিয়ে উদ্যত সৈনিক।

সবাই চুপ।

একজন কেরানী লম্বা পাকানো ফর্দির মত একখানি কাগজ খুলে রাজার হুকুমটা পড়বার জন্য পাথরের মত ভাবহীন মুখে তৈরী হয়ে গেলো। সকলে শুনতে লাগল কিন্তু কিছুই পরিষ্কার বোঝা গেল না। যে-কারণটা এত জরুরী সেই কারণটাই লোকটি কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে গলা নামিয়ে দ্রুত পড়ে গেল আখো। কাণ্ড। তারপর তার গলা পরিষ্কার হল, উচ্চারণ সুস্পষ্ট,—কয়েকটি নাম পড়ে লোকটি বলল এদের দুষ্কর্মের জন্য রাজাজ্ঞায় এদের চরম শাস্তি : মৃত্যু।

সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত অতীত বর্তমান, অনাগত ভবিষ্যৎ, হঠাৎ ভীষণ চমকে একটি বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে গেল।

তারপাটা ধর্মধর্ম করতে লাগল অতীতের একটা ঘটনার প্রতীক্ষায়।

প্রথমটা কিছু নয় কিন্তু তারপর মুহূর্তগুলো চেতনার উপর নামতে লাগল ভারি হয়ে, অস্বাভাবিক শক্তি নিয়ে, যেন খাস রোধ করে মৃত্যুর আগেই সকলকে মেরে ফেলতে চায়।

এত সন্ত্রাস, এমন প্রখর চেতনার স্বাদ, জীবনে এই প্রথম,— ডনটেভ্‌কি শূন্য মুখে সোজা সামনে তাকিয়ে একেবারে পাথরের মত স্থির। শরীর আর মন এখানে স্বাস্থ কিন্তু চেতনা যেন এই দুর্বৃত্ত কয়েকটি মুহূর্ত ভেদ করে কত দূর কত সূক্ষ্ম পার হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সীমাহীন কালাতীত ইন্দ্রিয়োত্তীর্ণ এক বিচিত্র উপলব্ধির স্তরে। সেখানে ভয় নেই, চিন্তা নেই, কামনা নেই, বাসনা নেই, লোভ নেই, হিংসা নেই,—বাসনা ও সমস্ত প্রলোভনের ঊর্ধ্বে সে একটি অবর্ণনীয় উপলব্ধির স্তর : তারপর চেতনা নিয়ে স্থির মনে শুধু নিশ্চিত মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা : অনন্তকাল ধরে মৃত্যু এগিয়ে আসছে ধীর পায়ে, অনন্তকাল ধরে সান্ত্বনে এগোচ্ছে তার স্থির প্রতীক্ষা।

মৃত্যুপূর্বের অনুষ্ঠান স্বপ্নের মত একের পর এক সমাধা হয়ে চলল, কিন্তু ডনটেভ্‌কি স্থির কিছুই চোখে পড়ল না : চোখ চেয়ে থেকে থেকে তিনি বাহ্যিক জগতের প্রতি সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে রইলেন।

সম্রান্ত বংশজাতিকার তাঁর পরিধানে নাযু, অতএব তাঁর মাথার উপর থেকে একখানা তরবারি ভেঙে টুঁটিজরো করা হল। তাঁর বংশগৌরব, আভিজাত্য, সামাজিক মর্যাদা, সব এই ভাঙা তরবারির সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হল। এর পর এলেন পাদ্রী, তাঁর একহাতে বাইবেল, অন্যহাতে ক্রুশ : যন্ত্রের মত ভারি

গভীর গলায় মৃত্যুযাত্রীদের প্রতি তিনি উপদেশ এবং সান্ত্বনা বর্ষণ করলেন : ঈশ্বরের কথা ভিক্ষা করো, ভ্রাতৃত্বের জন্য বর্ষাহত ও অনুতপ্ত হও। মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের কাছে কাছে নতজানু হয়ে শেষপ্রার্থনা জানাও।

হাঁটু ভেঙে অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। পাগলের মত আঁকড়ে রইল পাদ্রীর হাত, কারার আর চুম্বনে ভিজিয়ে দিল বাইবেল।

এরপর অনুষ্ঠানের সর্বশেষে পর্ব।

পেট্রাশেভস্কি এবং আর দু জনকে খুঁটে বেঁধে নামিয়ে নিয়ে গেল। তিন জনকে তিনটি পোস্টের সঙ্গে বেঁধে তাদের মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ডস্টয়েভ্‌স্কি নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তিনটি বলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এবার তাঁর পালা, পরের তিনজনের সঙ্গে এবার তাঁকে গিয়ে ওখানে দাঁড়াতে হবে। তিনটি বলি লক্ষ্য করে পনের জন সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে স্থির, শেষ সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কাটিয়ে মৃত্যু হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমেষে এতগুলো প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

ধনুকের ছিলার উদ্যত তীক্ষ্ণ একটি তীরের মত সকলের মন নিষ্ঠুর একটা প্রতীক্ষার শেষবিন্দুতে এসে উন্মুখ হয়ে রইল। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত কী দীর্ঘ, নির্মম, কী নিষ্ঠুর, অনন্ত,

হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের গাঢ় অন্ধকার চুম্বনার হয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ল।

ঘোড়া ছুটিয়ে এল মুক্তির দূত, সে এনেছে সম্রাটের বাণী। মহিমময় সম্রাট বন্দীদের ক্ষমা করে প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন।

মুক্তি। আঃ, কত আলো। কী সুন্দর। জীবন। আনন্দ। গান। কী অপার করুণা মহিমময় ঈশ্বরের। কী মহান আমাদের সম্রাট। তাঁর জয় হোক, তিনি শতায়ু হোন। পাগলের মত চীৎকার করে কয়েকজন শূন্যে লাফ দিল। আটহাতে কেটে পড়ল। কেউ গড়াগড়ি দিল ঘাসে। আনন্দে চুল ছিঁড়ে কপাল চাপড়ে অনেকে কেঁদে উঠল। মাঠ ঘুরে কেউ কেউ ছুট দিয়ে বেড়াল। একজন আর একজনকে প্রাণপণে বুকের মধ্যে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চুম্বন করতে লাগল পাগলের মত।

কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কির কাছে কোনো কিছুরই আর অর্থ ছিল না। এমন কয়েকটা সাংঘাতিক মুহূর্তের তিনি স্বাদ নিয়ে এলেন যার পরে কোনো কিছুরই আর অর্থ থাকে না।

কয়েকজন হঠাৎ চীৎকার করে বলল : 'আমাদের যাবে। এর চেয়ে মৃত্যু আমাদের ভাল ছিল। তোমরা আমাদের গুলি করলে না কেন।'

সকলকে আবার গাড়িতে উঠিয়ে ফিরিয়ে আনা হল জেলে। গাড়িতেও ডস্টয়েভ্‌স্কি বোবা হয়ে বসে রইলেন। চেতনায় তাঁর কোনোরকম স্পন্দন ছিল না। সম্রাট প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু তার চেয়ে বহুগুণে ভীষণ, অস্পষ্ট ধূসর আশাহীন শূন্য একটা ভবিষ্যৎ মেলে দিয়েছেন সামনে। এর পর সাইবেরিয়া—দীর্ঘদিনের জন্য সশ্রম কারাবাস, সাধারণ কয়েদীর জীবন.—তথাপি যখন নিষ্ক্রিয় পাথরের সঙ্কীর্ণ সেলে ফিরে এলেন, অস্পষ্ট একটি গানের মত ভিতর থেকে কেন জীবনের স্পর্শ তাঁর চেতনায় ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠতে লাগল।

পরদিন রাত্রে, সারা সহর যখন ক্রীসমাস উৎসবে মুখরিত, আলোক সজ্জায় বাড়িগুলি অপরূপ, তাঁরা নির্জন পীটের রাস্তা দিয়ে বন্দীদল দূর সাইবেরিয়ার পথে রওনা হয়ে গেল। গায় বেঁধে চলল বন্দীরা, সারা শরীরে ভারি লোহার শিকল, পায়ে হেঁটে দূর সাইবেরিয়ার পথ তাদের পাড়ি দিতে হবে।

ডস্টয়েভ্‌স্কি এবং আর কয়েকজনকে এই ভার থেকে মুক্তি দেওয়া হল। একখানা খোলা গাড়িতে পাদ্রীর পাশে বসে সিটাদেলের পথটা তিনি পার হয়ে গেলেন। বাড়িতে বাড়িতে আলো, সব বাড়িই চেনা। পরিচিত পথ।

গির্জার ঘণ্টা। ক্রমে তাঁদের বাড়িও এসে গেল। ভিতরে শহর ছাড়িয়ে তাঁরা। জমির ভিতর দিয়ে গাড়ি ক্রত তাঁর ভাই, ভ্রাতৃবধূ, তাদের ছেলেমেয়েরা— বেগে চলতে লাগল। সামনে পিছনে ঘাঢ় অন্ধকার, অতীত বাইরে থেকে আলোকিত বাড়িটির দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে দেখতে দেখতে নিঃশেষে এইবার ভন্ট্রেভাডি্র বুকের ভিতরটা হাহাকার করে মুছে গেল।

উঠল।

[ক্রমশঃ]

অঞ্জলিছবি

প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

জানলায় চেয়ে দেখি : ও বাড়ির একতলার ছাদে
বিকেল নামলে পরে যে-মেয়েটি বসে চুল বাঁধে
একটু হাসির রেখা ঠোঁটে এঁকে, নরম আঙুলে
বিলি কেটে, বিলি কেটে, চুলের সমুদ্রে ঢেউ তুলে
জটিলতা ভেঙে চলে, চিরুণি চালিয়ে, দৃষ্টি-তীর
আকাশে পাঠিয়ে মুখে গোধূলির আলোর আবির
ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেয়, ধীরে ধীরে বানায় বিনুনি
সে আজ সেখানে নেই, আমিই স্মৃতির জালবুনি।

সেদিন শানাই বাজল : শাঁখ আর অভ্যাগতদের
কলরোল শোনা গেল ; সন্ধ্যাবেলা গাড়ি করে বর
এল বহু প্রত্যাশিত স্বপ্ন নিয়ে, রচল বাসর
সারারাত ; তারপর মা এবং মেয়ের চোখের
ক' ফোঁটা জলের কণা বিদায়ের মুহূর্ত ভরালো,
জানালায় চেয়ে দেখি : অন্ধকারে আকাশ হারালো॥

বিশ্লেষণ

বিশ্বভূত

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী

বার্লিন ও পূর্ব-জার্মানীর সম্পর্কে সোবিয়েত রাজনীতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে স্বভাবতঃই এক মহা সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে। পূর্ব-জার্মানী হইতে সোবিয়েত তাহার সৈন্যাপসরণ করিলেও পূর্ব-জার্মানীতে সোবিয়েত প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইবেনা একথা নিশ্চিত, কিন্তু যেদিন অনুরূপ ঘটনা জার্মান রাষ্ট্রের পশ্চিমভাগে ঘটিবে সেদিন যে তথায় ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ক্ষমতার ধুরপনের অপহ্নব ঘটিবে তাহা পশ্চিমী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা বিশেষভাবেই অবগত আছেন। আজ বার্লিন-বনের নেতৃবর্গ পশ্চিমী ঐক্যতানে সুর মিলাইয়া সমস্ত আস্ফালন করিতেছেন বটে কিন্তু নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জার্মানীর মত অভিমানী জাতিকে পরপদাশ্রয়ী করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে না। সোবিয়েতের আসল উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে সে একটি মোক্ষম শর-সন্ধান করিয়া বসিয়া আছে। ফাটান দিবার অস্ত্র প্রতিপক্ষের তুণে নাই, তাল করিয়াই সে জানে। পশ্চিমী গোষ্ঠীরা মিলিয়া মেলাই খানাপিনা, দেখাশোনা, শলাপরামর্শ করিয়াছে। রাজাবলের বহু-উপহাসিত তীমের মত আস্ফালনও করিয়াছে প্রচুর। কিন্তু যতই দিন আগাইয়া আসিতেছে ততই কথার ফুলঝাল ছাড়িয়া সমস্যার বাস্তবতাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। কুটিল প্রধান মন্ত্রীর মক্কো পরিভ্রমণ তাহার সাক্ষ্য। চিরাভ্যস্ত নীতি অনুসারে রাশার কূটনীতি তাহাদের প্রচার যন্ত্রকে সুপরিকল্পিত ভাবে স্বরগ্রাম ক্রমিক উচ্চতর গ্রামে বাঁধিতে শিখিয়া দিয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর 'টাস্' একেন্সী হইতে প্রচারিত খবরে জানা গিয়াছে মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে এক বক্তৃতায় ক্রুশ্চেভ সাহেব বলিয়াছেন "যাতে যাতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর তরফ হইতে এরূপ হাস্যকর আস্ফালনের খবর বাহির হয় যে, সামরিক শক্তির জোরেই তাহারা বার্লিনের উপর বিংবা নিজেদের চলাচলের রাস্তা অব্যাহত রাখিবে। এরূপ উক্তির উত্তরে ক্রুশ্চেভের জবাব এই যে, সোবিয়েত সৈন্যবাহিনীকে খেলা করিবার জন্য পূর্ব-জার্মানীতে মোতায়েন রাখা হয় নাই। পশ্চিমীগোষ্ঠীর সম্ভাব্য অস্ত্রবলের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবার মতন শক্তি-সম্পন্ন করিয়াই তাহাদিগকে সতত সতর্ক রাখা হইয়াছে। রাশা বা রাশার মিত্রশক্তির উপর বিন্দুমাত্র হামলা করিলে তাহা বিশ্বযুদ্ধের ইংগিত বলিয়া ধরা হইবে এবং ইহার দায়িত্ব বর্তাইবে ইঙ্গ-মার্কিন সমর-পিপাসু নেতৃবর্গের উপর।"

ইরান সম্পর্কেও টুলা বক্তৃতায় ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে একটি মৈত্রী চুক্তির সর্তনামা উভয়পক্ষ হইতে অনুমোদিত হইয়া শুধু স্বাক্ষরের অপেক্ষায় ছিল এমন সময় মার্কিনী চক্রান্তে তাহা বানচাল হইয়াছে। ইরান রাশার মিত্রতা অস্বীকার করিয়াছে, অভিযোগ করিয়াছে অমিত্র-জনোচিত পরিবেষ্টন দ্বারা রাশা তাহার উপর চাপ দিয়াছিল চুক্তিনামা স্বাক্ষর করিতে। ক্রুশ্চেভ গবর্ণমেন্ট ইরানের এই রাতারাতি ভিগবাজি খাওয়ার জন্য সাহী রাজ্যটিকে সতর্কবাণী প্রেরণ করিয়াছেন। রাশার সংগে চুক্তি-ভঙ্গ

করিয়া আমেরিকার দলে ভিড়িয়া তাহার সঙ্গে নূতন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করিলে আখেরে কম ভাল হইবেনা স্পষ্টভাবে তাহা জানাইয়া দিতেও কসুর করে নাই। আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি হিসাবে পাকিস্তানের কোন অংশ ব্যবহৃত হইলে পাকিস্তান রাশ্যার বিরোধী-গোষ্ঠীর মধ্যে পরিগণিত হইবে এ সম্বন্ধেও মস্কো হইতে দৃঢ় সাবধান বাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

রাশ্যা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগতম অতিথি হিসাবে আদর আপ্যায়ন হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে করিয়া থাকবে কিন্তু তাঁহার মস্কো অবস্থান কালেও ক্রুশ্চেভী বক্তৃতার সুর কিন্তিমাত্রও নরম হয় নাই। অকস্মাৎ তিনি প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছেন বৃটেনের সঙ্গে দীর্ঘ-মেয়াদী এমন কি পঞ্চাশ বৎসরের জন্য একটি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করিতে প্রস্তুত আছেন। একথা ভাল করিয়াই তাহার জানা আছে যে ইংলণ্ডের পক্ষে এরূপ একক চুক্তি করা সম্ভব নয়। বৃটিশ পক্ষ হইতে রাজনৈতিক চুক্তির কথা প্রায় এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহাদের প্রস্তাব সাধারণভাবে পারস্পরিক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হইয়াছে; সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের আলোচনাও করা হইয়াছে কোন কোন বৈঠকে। গ্রেটবৃটেন ও পশ্চিম-ইউরোপের সংবাদ পত্রের অভিমত এ পর্যন্ত যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বৃটিশপ্রধান মন্ত্রীর রাশ্যা পরিভ্রমণকে যে নিষ্ফল ও অর্থহীন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

সাইপ্রাস দ্বিপাক্ষিক প্রজাতন্ত্র

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সাইপ্রাস সমস্যার একটা গোঁজামিল গোছের মিটমাট হইল বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এরূপ ধরণের সমাধান সাইপ্রাসবাসীরা মানিয়া নিতে রাজি হইল ভাবিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য মনে হয়। প্রতিপক্ষের মত উৎপীড়ন, অত্যাচার দুঃসহ ব্যবহার সত্ত্বেও সাইপ্রাসের দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তাহার ক্রমবিবৃতি স্বাধীনতাকামী অন্যান্য নিপীড়িত জাতি সমূহের সহৃদয় প্রশংসা অর্জন করিয়া আসিতেছিল। সুরিখ চুক্তিতে গ্রীস ও তুর্কী সরকার নিজেদের মধ্যে একটা রফা করিয়া লইয়াছিল—গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডন কনফারেন্সে গ্রীক্-সাইপ্রাসীনেতা আর্কবিশপ মাকারিয়স্ এবং তুর্কী-সাইপ্রাসীনেতা ডাঃ কুচুক তাঁহাদের সঙ্গে একটা কনসালা করিয়াছেন। আসল পক্ষ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট—সেখানেও ইহার অনুমোদন মিলিয়াছে। আগামী তিনমাসের মধ্যে সাইপ্রাস রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিবে কথাটি আপাতদৃষ্টিতে অতিশয় উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। চুক্তিনামার সর্তগুলির সূক্ষ্ম বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই বোঝা যাইবে কী মেকী এ স্বাধীনতা! শুধু তাই নয়, গ্রীক ও তুর্কী সাইপ্রাসী, স্বাধীন সাইপ্রাসের নাগরিক হিসাবে এ স্বাধীনতার অংশীদার নয়; তাহারা কেবল সর্তদ্বারা আবদ্ধ দুই জাতি একই দেশে পাশাপাশি বাস করিবে মাত্র। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের অধিবাসী আমরা সাম্প্রদায়িক আনুপাতিক হার কণ্টকিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সুতরাং সাইপ্রাসী স্বাধীনতার 'শ্বেতপত্র' আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রপতি থাকিবেন গ্রীক-সাইপ্রাসী, তাহার উপরাষ্ট্রপতি একজন তুর্কী-সাইপ্রাসী। বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে উপরাষ্ট্রপতির 'ভিটো' ক্ষমতা থাকিবে। পার্লামেণ্টে, চাকুরিতে এবং সৈন্যবিভাগে গ্রীক-সাইপ্রাসীর হার থাকিবে ৭০ শতক; বাকী ত্রিশ শতক তুর্কী-সাইপ্রাসী দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। এমনকি পাঁচটি বড় শহরের গ্রীক ও-তুর্কী অঞ্চলে দুইটি করিয়া পৃথক পৌর-প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইংরাজের পক্ষে এরূপ চুক্তি-মূলক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা খুবই স্বাভাবিক। ইংরাজ-স্বার্থ পুরাপুরি বজায় থাকিবে অথচ আনুষঙ্গিক দায়িত্বটুকু থাকিবে না। এইরূপ কূটনীতির ফল ভারতবর্ষ ভালভাবেই আস্বাদ করিয়াছে। এ ব্যবস্থার ভবিষ্যতের জন্য পিঠে তাপ করিবার প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া সুচতুর ইংরেজ নিজেদের দীর্ঘকার কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া নিয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। তাহা ছাড়া, সাইপ্রাসস্থ বৃটিশ নৌ ও বায়ুঘাঁটিগুলিকে নিরঙ্কুশ ভাবে বৃটিশ সরকারের খাস রাজ্য হিসাবে মানিয়া লইতে হইবে একথা তো পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছিল। EOKA এবং VOLKAN-এর বিপ্লবী ঐতিহ্যে এই ধরণের চুক্তি মানিয়া লওয়ার হীনমন্যতা কি করিয়া সম্ভব হইল? তাই সাইপ্রাসের স্বাধীনতার যুদ্ধ থামিয়াছে বলিয়া মনে করি না। তবে পূর্ণ নাগরিকত্বের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থার দাবী গ্রীক-তুর্কী নির্বিশেষে সম্মিলিত সাইপ্রাসীকণ্ঠে ধ্বনিত হইবে, সেই দিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।

পক্ষ-সোমালিয়া বা বৃহত্তর সোমালি রাষ্ট্র আন্দোলন

আফ্রিকার নবজাগরণের বাণী পশ্চিম উপকূল ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। এ অঞ্চলের দোলা পূর্ব উপকূলে দক্ষিণ লোহিত সাগর ও নিকটবর্তী ভারত মহাসাগরীয় অনুন্নত রাজ্যসমূহের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আজ যাহারা ধারণা করিতে পারে, আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৬০ সালেই তাহা যে অনিবার্য বিপ্লবী আকার পরিগ্রহ করিতে পারে, সেখানে সে লিখন ইতোমধ্যেই অংকিত হইয়াছে। যাহারা তাহা পাঠ করিতে সক্ষম পূর্বাহ্ণেই যদি তাহারা হুঁশিয়ার না হন এবং সুযোগোপযোগী ব্যবস্থা না করেন তবে তাহাদিগকে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠির মত আর একটি প্রতিকূল রাজ্য সমবায়ের বৈরিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। মিশর-সুদানের পূর্বাংশে ইথিয়োপিয়ার রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র; তাহার পূর্বে লোহিত সাগরের তীরে এরিত্রিয়া; বাবেলমাণ্ডেব প্রণালীর পূর্ব তীরে ফরাসী রাজ্য জিবুত্তি; ইহার দক্ষিণে ও পূর্বদিকে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড; তাহারও দক্ষিণে ভারতমহাসাগরের তীর অনেকখানি জুড়িয়া ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড এবং ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া কেনিয়া রাজ্য। ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড বর্তমানে রাষ্ট্রপুঞ্জের ট্রাষ্টি রাজ্য এবং নামে মাত্র ইতালীর পরিচালনাধীন রহিয়াছে। ১৯৬০ সালে ইতালীর পরিচালনা অংশটুকুও উঠাইয়া নেওয়া হইবে এবং এই সোমালিল্যাণ্ড রাজ্যটি পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে অবশ্যম্ভাবী যাহা তাহার জন্য ইতালী এই রাষ্ট্রটিকে যথাসাধ্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে এবং নিজেরাও সে ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে। বর্তমানে এ রাজ্যে "সোমালি ইয়ুথ্ লীগ" সংখ্যা পরিষ্ঠ দল, ইতালীয় কূটনীতি তাহাদের সংগে মিত্রতা সম্পর্ক সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়াছে বলিতে হইবে। ১৯৬০ এর পরে যাহাতে ইতালীয় সংগে সোমালিল্যাণ্ডের বৈদেশিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক কোন প্রকারে বিঘ্নিত না হয় তাহার দিকে বিশেষ নজর রাখা হইয়াছে।

ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা অর্জন করিলে এই অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্র গুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি যে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। পক্ষ সোমালিয়া রাষ্ট্র অথবা নিখিল সোমালি ভূমির একীকরণের জন্য আন্দোলন ইতোমধ্যেই রূপ নিয়াছে। ইংরাজের বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড, ফরাসী জিবুত্তি এবং সন্নিহিত রাষ্ট্র ইথিয়োপিয়া এবং কেনিয়ার সংলগ্ন অংশ-দ্বয় এরিত্রিয়া আবিসিনিয়া ও উত্তর প্রদেশ এই চারিটি নূতন ভূখণ্ডের সংযুক্তি দ্বারা বৃহত্তর সোমালি রাষ্ট্রের পত্তন এই

আন্দোলনের লক্ষ্য। ইংরাজ এডেনের বিনিময়ে বিপুল লোহিত সাগরীয় বৃটিশ সোমালি ভূখণ্ড হস্তচ্যুত হইতে দিতে পারেনা। তাহার আরব রাষ্ট্রের তেলের ব্যবসায় পাহারাদারী করিবার জন্য এডেনের মতনই ট্র্যাটেজিক অবস্থান ইহার। নবীন কালানো ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ফরাসীও তাহার জিবুতিকে হাতছাড়া করিতে চাইবেনা। এথিওপিয়াকে পাকে প্রকারে রাজ্যচ্যুত করিয়া সম্রাট হাইলি-সেলাসি খানিকটা সমুদ্রতটের সুবিধা করিয়া নিয়াছেন; তিনিই বা সহজে তাহা ছাড়িতে চাহিবেন কেন? অগাডেন প্রদেশই বা তিনি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিবেন কেন? কোনিয়ার কোনিয়া তাহার উত্তর প্রদেশ বিনা বাধায় সোমালিদের হাতে তুলিয়া দিতেই বা চাইবে কেন? সুতরাং সংঘর্ষ যে অনিবার্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬৲
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৪৷৷০
ভারত-আত্মার বাণী	৫৲
বুদ্ধবাণী	।০
কর্মবাণী	১।০

মণি বাগচির

বিদ্যাসাগর	৭৲
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস	৫৲
নিবেদিতা	৪৲
গৌতম বুদ্ধ	৪৲

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩৲
বাংলার মনীষী	১।০
বাংলার বিদুষী	২৷৷০
বীরত্বে বাঙালী	১৷৷০
ব্যায়ামে বাঙালী	২৲
বিজ্ঞানে বাঙালী	২৷৷০
রাজর্ষি রামমোহন	১।০
রবীন্দ্রনাথ	১।০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১।০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১৷৷০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১৷৷০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী :: ১৫ কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা—১২

২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে শ্রীবিরজাচরণ মিত্র এডভোকেট (৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা ২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়শ্রী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। দ্বাদশ সংখ্যা। চৈত্র, ১৩৬৫।

বর্তমান প্রসঙ্গ

তিব্বতের জাতীয় অভ্যুত্থান

স্বাধীনতাপ্রিয় তিব্বতের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রধান দালাই লামার নেতৃত্বে তিব্বতের জাতীয় পরিষদ, ১৮ জন মন্ত্রী, তিব্বতী সেনাবাহিনী এবং জনগণ একযোগে চীনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং তিব্বত-চীন চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তিব্বতের জাতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আধুনিক সামরিক অস্ত্র ও কৌশলে পশ্চাদপদ তিব্বতী সেনাবাহিনীকে চীনা বাহিনী বিমান ও আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে নির্মমভাবে দমন করতে অগ্রসর হয়েছে। তিব্বতের জাতীয় বিপ্লব দমন করার জন্য চীন বিমান বাহিনীর সাহায্যে বহু মঠ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, অগণিত লামাকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার নিহত তিব্বতীদের ব্যাপক ভাবে লাসার চারিপাশে কবরস্থ করেছে। লাসায় শক্তিশালী চীনা বাহিনীর আক্রমণে বিদ্রোহী তিব্বতী বাহিনী পর্যুদস্ত হলেও পার্বত্য তিব্বতের দুর্গম অঞ্চল এখনও বিদ্রোহীদের কবলে রয়েছে। কিন্তু বিপুল চীনা বাহিনীর বিরুদ্ধে তিব্বতী জাতীয় বিপ্লব সফল করা অসম্ভব মনে করে দালাই লামা দুর্গম গিরিকন্দর পার হয়ে ভারতে এসে সদলবলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

কেন তিব্বত চীনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল? বস্তুত চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতের এই বিদ্রোহ কোন নূতন ঘটনা নয়। দশ শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতীরা ছিল এক দুর্ধর্ষ জাতি। মধ্য এশিয়ার এবং চীনের বহু অংশ তিব্বতের অধিকৃত ছিল। ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বত তুরানীয় বাহিনী, কর্তৃক অধিকৃত হয়। তুরানীদের কবল থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে মাঞ্চুরাজের সেনাবাহিনী ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তিব্বত দখল করে এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিব্বত চীনের অধিকারে থাকে। এই ১৪০ বছরের মধ্যে তিব্বত

প্রায় পাঁচবার চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই ১৪০ বছর 'আম্বান' নামে চীনের দুইজন রাজনৈতিক এজেন্ট লাসায় অবস্থিত থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে লাসাই ছিল তার রাজকীয় অধিকার তথা মুদ্রা সেনা ও রাজকীয় সীল ব্যবহারে তিব্বতের স্বায়ত্বশাসন ছিল নিরঙ্কুশ। ১৯১১ সালের চীন বিপ্লবের সময় মাঞ্চু রাজের পতনের পরে তিব্বত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয় এবং তিব্বতের এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ১৯৪৯ সাল অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৯৫০-এ চীন বাহিনী তিব্বত দখল করে নেয় এবং তিব্বতকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

কম্যুনিষ্ট শাসনের নয় বছরে চীন সরকার ক্রমাগত স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। তিব্বতীয় সেনা বাহিনীকে তিন হাজার সংখ্যার এক ক্ষুদ্র সেনাবলে সীমাবদ্ধ রেখে চীনাবাহিনীর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজারে বর্দ্ধিত করা হয় এবং স্বায়ত্বশাসনের নামে রাস্তা ঘাট ও বিমান বন্দর তৈরী করে চীনের আধিপত্যকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। চীনের দখলদারী সেনাবাহিনীর প্রাথমিক সুব্যবস্থার পরে চীন মঠ ও লামাদের উপরে নিপীড়ন সুরু করে তিব্বতের, জীবনযাত্রা উচ্ছেদ করে কম্যুনিষ্ট সমাজব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গিয়ে বহু মঠ, ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং বহু লামা ও খাম্পা জাতীয় দুর্দ্ধর্ষ তিব্বতী প্রাণ হারায়। চীনের আধিপত্য এবং কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ এই কয় বছর পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তা সাম্প্রতিক ব্যাপক জাতীয় অভ্যুত্থান রূপে আজ প্রকাশ করে।

ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য বাংলা, পাঞ্জাবের ন্যায় তিব্বত ও কী চীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ? তিব্বতীরা কি চীনের জাতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? তাই এর জবাবে শ্রীনেহেরুর কাছে স্বীকার করেছেন যে তিব্বত কোন দিন চীন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না কিন্তু চীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুত, ভাষা, লিপি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং জাতিতত্ত্বে তিব্বতের সঙ্গে চীনের মিল খুবই নগণ্য এদের অনেক বিষয়ে তিব্বতের মিল রয়েছে ভারতের সঙ্গে। তিব্বত ইচ্ছায় কোনদিন চীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সেনাবলে পর্যুদস্ত হয়ে সাময়িক শাসন কবলিত অবস্থায় চীনের আধিপত্যে ছিল। তাই তিব্বতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ককে শ্রীনেহেরু পর্যন্ত 'সার্বভৌমিকতা' বা Sovereignty এর সম্পর্ক বলেন নি এবং 'আধিপত্য' ও Suzerainty এর সম্পর্ক বলে আখ্যা দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ 'আধিপত্যের' আখ্যা দিয়েও শ্রীনেহেরু তিব্বতের উপরে ১৯৫০ সালের চীনা আক্রমণকে আইন সঙ্গত বলে মেনে নিয়ে তিব্বতকে চীনের একটি অঙ্গ রাজ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। যে যুক্তিকে কূটনৈতিক প্রয়োজনে শ্রীনেহেরু আইন সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছেন ঠিক সেই যুক্তি মেনিয়ে চীন যদি নেপাল, ভূটান, সিকিম, লাডক অঞ্চলের উপরে দখলদার কর্তৃত্ব দাবী করে তবে শ্রীনেহেরু বলার কিছু থাকবে না। কারণ, ১৭১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত নেপালও চীনকে সালামী কর দিয়ে এসেছে। ভূটান ও সিকিমও এক সময় চীনকে বার্ষিক কর দিয়েছে। বস্তুত চীনের বর্তমান মানচিত্র এখন পর্যন্ত নেপাল, ভূটান, সিকিম, লাডক এবং কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ চীনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বলে অঙ্কিত রয়েছে। ভারত সরকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও চীন এই মানচিত্র পরিবর্তনে রাজী হয়নি।

নিছক দখলদারী আধিপত্যই যদি কোন অঞ্চলকে অঙ্গরাজ্য রূপে অন্তর্ভুক্ত করার আইনসঙ্গত দাবীরূপে স্বীকৃত হয় তবে ইংরেজ সরকার ২০০ শ, বছরের দখলদারী আধিপত্যের দাবীতে ভারতকে বৃটিশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যদি আবার ভারত আক্রমণ করে তবে সে সময়ে

বিরোধিতা করার কোন কারণ থাকতে পারে না। বর্মা একটানা ৬০ বছর ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সেই বার্মাতে ভারত কি বর্মাকে জোর করে দখল করে নিতে পারে? অ্যাল্‌জেরিয়া, ফরাসী রাষ্ট্র ও সংবিধানে ফরাসী দেহের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কথা জানা সত্ত্বেও ভারত বা চীন অ্যালজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করে কোন যুক্তিতে?

বস্তুত, ইতিহাস ও জাতীয়তার সমস্ত নজীরে তিব্বত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি ও রাষ্ট্র রূপে পরিগণিত হওয়ার অধিকারী। তিব্বতের উপর চীনের শাসন জবরদখলকারী তথা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা মনে করে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন কম্যুনিষ্ট দল যদি পার্শ্ববর্তী কোন প্রতিবেশীকে সেনাবলের জোরে দখল করে নেয় তবে তা' গণমুক্তি এবং প্রগতিশীল বিপ্লবের অভিধান বলে আখ্যা লাভ করে। কূটনৈতিক প্রয়োজনে এবং চীনের বন্ধুত্ব কামনায় শ্রীনেহরু যে ধারাত্মক ভুল করেছেন আজ তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে মাত্র। হিমালয়ের উত্তুঙ্গশিখরও আজ বিজ্ঞানের কাছে নত হয়ে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতাপ হারিয়েছে। তিব্বতের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন শুধু তিব্বতীদের জন্য নয়, ভারতের জন্যও প্রয়োজন। চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী ও সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু তিব্বতের ন্যায় যে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মৈত্রীর প্রগাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ সেই প্রতিবেশীর দুর্বলতা ও সাময়িকদলের প্রবলতার কারণে পদানত ও পরকবলিত করার সুযোগ দিয়ে চীনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহান্বিত হলে সেই মিত্রতার ভিত্তি হবে অত্যন্ত দুর্বল ও অস্বাভাবিক। ভারতের সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বের প্রতি পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতির ভিত্তিতেই চীনের সঙ্গে সত্যিকার মিত্রতা স্থাপিত হতে পারে। এ সম্বন্ধে নেহরু সরকারের সতর্ক, স্পষ্ট ও সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সেই নীতি সম্বন্ধে ভারতের জনগণকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

তিব্বত ও কম্যুনিষ্ট পার্টির স্বরূপ

তিব্বতের বিষয়ে ভারতের জনমত, দলমত নির্বিশেষে তীব্রভাবে বেদনা ও ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়েছে। তিব্বতের উপরে যে অমানুষিক দমন নীতি চলেছে, মঠ, ধ্বংস করে দিয়ে, বিভিন্ন মঠে রক্ষিত অগণিত অমূল্য পাণ্ডুলিপি ও শিল্প-সামগ্রী বিনষ্ট করে, অগণিত ধর্মগুরু লামাকে হত্যা করে, হাজারে হাজারে তিব্বতের জাতীয় বিপ্লবীদের গুলি করে, সর্বত্র জংগী চ্যাংফে ও সাম্রাজ্য বাহিনী দ্বারা পোদাবর্ষণে তিব্বতে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। তিব্বতের এই গণবিপ্লবের উপরে চীনের সামরিক বাহিনীর অসহনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস, প্রজাসোস্যালিষ্ট, সোস্যালিষ্ট, জনসংঘ ও অন্যান্য দল এবং ভারতের বিশাল জনতা তীব্র অভিমত প্রকাশ করেছে। কিন্তু ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি তিব্বতের জাতীয় বিপ্লবের স্বপক্ষে এবং চীনের দমন নীতির বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে নাই। বরং চীন থেকে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তার প্রতিটি বর্ণ সমর্থন করে এবং চীনা দূতাবাস থেকে যে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে তার অনুসরণে দিনের পর দিন তিব্বতের উপরে চীনা আক্রমণের সমর্থনে প্রচার কার্য চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের তীব্র অস্বীকৃতি সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রচার কার্য চালাচ্ছে যে কালিংপং থেকে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে তিব্বতে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদ্রোহ ঘটেছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ভারত সরকার বৈদেশিকদের সঙ্গে কারসাজী করে এই চক্রান্তের ব্যবস্থা করেছেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অধুনা জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও ভারতের প্রতি ঘন ঘন আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু যখনই বৈদেশিক কম্যুনিষ্ট পার্টি বা রুশ-চীন অথবা অন্য কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের জাতীয় ভাবাবেগ বা স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে তখনই কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতের জাতীয় স্বার্থ মুহূর্তের মধ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে বৈদেশিক কম্যুনিষ্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রবল সমর্থক ও অনুগামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে রুশের স্বার্থ রক্ষার জনযুদ্ধের জিগির তুলতে তারা দ্বিধাবোধ করে নি। নেতাজীকে জাপানের দালাল বলতে দ্বিধাবোধ করেনি। এই অতীতের কুকীর্তি ও জাতীয় স্বার্থদ্রোহিতার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি বহু সভায় ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে ভারতীয় জাতীয় স্বার্থসঙ্গত কাজ করার অঙ্গীকার বহুবার ঘোষণা করেছে। কিন্তু ভারতের জাতীয়তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ যে কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি রাজনৈতিক কূটকৌশল মাত্র তার নগ্নস্বরূপ বার বার প্রকাশ হয়ে পড়ছে। হাঙ্গেরীর গণবিপ্লবের সমর্থনে এবং রুশ অত্যাচার ও দমন নীতির বিরুদ্ধে ভারতের জনমত যখন তীব্র হয়ে উঠেছিল তখন একমাত্র ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি নির্লজ্জভাবে হাঙ্গেরীর উপরে রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ চরম প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সমর্থন করেছিল। আবার আজ তিব্বতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দিনে ভারতের জনমত যখন চীনের নির্মম আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তখন একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি তিব্বতের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে এবং চীনা আক্রমণের সমর্থনে দিনের পর দিন প্রচার কার্য চালিয়েছে। শ্রীনেহেরু কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে খুব কমই সমালোচনা করেন। কিন্তু তিব্বতের ঘটনায় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির আচরণে তিনি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে "ভারতের জনসাধারণের অভিমত ও বেতারের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন সংযোগ নেই। ভারতের জনহৃদয় থেকে কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণরূপে একটি ছিন্নমূল দল"। কম্যুনিষ্ট পার্টির আনুগত্য যে ভারতে নয়, বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এবং কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে' ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের অঙ্গীকার যে অন্তঃসারশূন্য কূটনৈতিক প্রচার মাত্র, তিব্বতের ঘটনায় তা' আরেকবার অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

মধুচক্রের পতোদ্ধার

আনন্দবাজার পত্রিকার বিগত ২৪শে মার্চের সংখ্যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনের অভিযুক্ত "মধুচক্র" সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভাগীয় গোপন তদন্তের রিপোর্ট সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে কলকাতার ভূতপূর্ব চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও রাজ্য সরকারের রাজস্ব বিভাগের স্পেশাল অফিসার শ্রীমন্মিনাথ মুখার্জি ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে তদন্ত সুরু করেন এবং সেপ্টেম্বরের অধিককাল—অধুনা সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত-বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটার শ্রীমহীউদ্দীনের বিরুদ্ধে আপত্তি জনক অভিযোগগুলির যথার্থতা সম্পর্কে তদন্ত করেন। নানা শ্রেণীর মোট ৮২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই তদন্তকালে সাক্ষ্য দান করেন এবং তদন্তের ফলে শ্রীমহীউদ্দিনের বিরুদ্ধে জঘন্যতম ধরণ দুষ্কর্ম প্রচুর ভাবে প্রমাণিত হয় বলে প্রকাশ। শ্রীমন্মি নাথ মুখার্জী শ্রীমহিউদ্দীনকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করেছেন বলে শোনা যায়।

১৯৫৮ তদন্তের সূত্রপাত হয় ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অভ্যন্তরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রবল জনমতের চাপের ফলে রাজ্য সরকারের তৎকালীন দুর্নীতিদমন বিভাগের স্পেশাল অফিসার

ডাঃ নবগোপাল দাস আই, সি এস্‌কে বোটানিকাল গার্ডেন সম্পর্কে আনীত নানা অভিযোগের তদন্তের ভার দেওয়া হয়। ডাঃ দাস ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা পুলিসের এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগের তৎকালীন সহকারী পুলিশ-কমিশনার শ্রীপঞ্চানন ঘোষালকে এই তদন্ত করবার জন্য ডাকেন। প্রায় দেড় শত জনের খাকা গ্রহণ করে শ্রীঘোষাল শ্রীমহীউদ্দীন ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী, দুইজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দুই-জন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কলিকাতা পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার, একজন সিভিল সার্জন এবং একজন লোক সভার সদস্য দীর্ঘ ৬বৎসর কাল বোটানিকাল গার্ডেনের অভ্যন্তরের এই সকল অবৈধ কার্যকলাপের সহিত লিপ্ত আছেন বলে প্রমাণ পান। শ্রীমহীউদ্দীন সম্পর্কে কর্মচ্যুতির সুপারিশ করা হয়েছে, অন্যান্যদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বা হয়েছে তা জানা যায়নি। যে সব সরকারি কর্মচারীরা, নারী ও সুরার প্রলোভনে যে সকল নারকীয় কাজ করে এসেছে এই দীর্ঘ বৎসরগুলি ধরে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ আমরা দাবী করি এবং কেবলমাত্র এদের কর্মচ্যুতিই নয় এদের কঠোর শাস্তি বিধানের দাবী করি। যে সকল হোটেল এই ধরণের কার্যকলাপের সুযোগ দান করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাদের লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিল করার দাবীও আমরা করছি। মানবতা ও সমাজের এই সকল শত্রুদের সম্বন্ধে সমাজে কঠোর মনোভাব সৃষ্টি না করলে কখনোই এই ধরণের অপরাধ দূর করা যাবে না। আমরা আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৃথা মানের দোহাই দিয়ে তাঁদের কর্মচারীদের এই সকল ঘৃণ্য দুষ্কৃতি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করবেন না।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর লোকান্তর

বিগত ৩ঠা এপ্রিল তারিখে রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে পড়িয়াহাটস্থিত নিজ গৃহে পরম শ্রদ্ধেয় মহাপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের—বিশেষ করে বাংলার—বিদ্বজ্জন সভা হ'তে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র চিরতরে খসে গেল। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই জ্ঞান-তপস্বী সারাজীবন বাণীর একনিষ্ঠ সাধনায় কাটিয়েছেন। প্রথম জীবনে বারাণসীতে বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভের পর শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদান কার্যে কবিগুরুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তাঁর রচিত বহু অমূল্য গ্রন্থ রয়েছে।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮১ বৎসর হয়েছিল। আমরা এই জ্ঞানতপস্বীর ধর্মপ্রচার সহিত স্বীকার করি ও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সভার শ্রদ্ধা জানাই। জয়শ্রীও তাঁর সেবা কখনো কখনো লাভ করে ধন্য হয়েছে।

স্পীকারের দায়িত্ব

গত ২০শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচিত ও সুমীমাংসিত হয়ে গেছে। প্রস্তাব উঠেছিল যে স্পীকারের এমন কোনো কোম্পানীর ডিরেক্টর থাকা উচিত কি না, যেই কোম্পানীর লেন-দেন ও পরিচালনা বিধানসভার আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে বর্তমান স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি স্পীকার নির্বাচিত হ'বার পূর্ব থেকেই একটি চিনি-কলের প্রারম্ভিক ডিরেক্টরদের অন্যতম ছিলেন এবং স্পীকার হবার পরও সেই পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রমুখ ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করে গেছেন। স্পীকার হবার পূর্বে এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে এই কোম্পানী একত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ পায় এবং রাজ্য সরকার আরও পনের লক্ষ টাকার জামিনদার হন। এই পরিমাণ সরকারী অর্থের দায়ীত্ব নিরাপত্তা, বৈধতা ও যাথার্থকতা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা উঠলে প্রসঙ্গত

স্পীকারের সঙ্গে কোশ্চানীর যোগাযোগ এবং এই অর্থ-প্রয়োগে অথবা অপপ্রয়োগে স্পীকারের ভূমিকার বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। অনাস্থা প্রস্তাবের সূচনাও এইখানে। কোর্টাতে যদি স্পীকার কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার পক্ষে ঘোষণা করতেন, তাহলে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের কোনো অবকাশ থাকতো না। কিন্তু যে সময় স্পীকার এই যোগাযোগের অনৌচিত্য সম্বন্ধে যোলআনা অবহিত হন নাই বলে মনে হয়। যাই হোক, বিলম্বে হলেও এই অনৌচিত্য স্পীকারের স্বীকৃতি পায় এবং অনাস্থা প্রস্তাবও প্রত্যাহৃত হয়। এই বিষয়ে পৌঁছাতে হাউস অফ কমন্সের নজীর সকল পক্ষকেই সাহায্য করেছে।

"ট্রেড ইউনিয়নী ভূতুম"

গত ২১শে মার্চ কেরল বিধান সভায় কেরল সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী টি ভি টমাস শ্রম ও বিবিধ খাতে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবী সম্পর্কে বিতর্কের উপরে গত ৫ই মার্চ থেকে অনুষ্ঠিত ত্রিবান্দ্রম সৌর সভার এলাকার কর্মচারীর ধর্মঘটকে "ট্রেড ইউনিয়নী ভূতুম" বলে চিহ্নিত করেন। শ্রী টমাস একথাও বলেন এই ধর্মঘট দমন করার জন্য সরকার সৌরসভাকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দিয়েছেন। তারতম্যে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে যারা "ট্রেড ইউনিয়নী ভূতুম" করে ছোট ও মাঝারী শিল্পগুলিকে রসাতলে সর্বনাশের মুখে টেনে আনবার পথপ্রদর্শক তাদেরই মুখে আজ "ট্রেড ইউনিয়নী ভূতুমের" অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে যারা এদেরই ধ্বংসকর্মের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ তুলেছে তাদের উদ্দেশ্যে নানারকম কটূক্তি ও বিদ্বেষপ্রসূত রটনা করতেও এরা দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিলম্বে হলেও কেরলের কম্যুনিষ্ট পার্টির এই ঔদ্ধত্যের অন্যান্য রাজ্যের কম্যুনিষ্টদের যদি প্রভাবিত করে তবেও ভাল। কিন্তু তা আশা করা বৃথা। কারণ তাদের দৃষ্টিতে কেরলের রাজনীতি অন্যান্য রাজ্যের চাইতে পৃথক।

পশ্চিম বাংলার ভূমি বণ্টন:

পশ্চিম বাংলার জমিদারী দখল আইন প্রায় পাঁচবছর যাবৎ চালু আছে। এই সময়ের মধ্যে ভাগচাষী, ভূমিহীন চাষী কিম্বা খাজনাভোগের চাষীর অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাকুক ক্রমশ অধোগতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। জমিদারী দখল আইন যখন খসড়া আকারে বিধান সভায় আলোচনার জন্য আনা হয় সরকার পক্ষ থেকে যে সময় দাবী করা হয়েছিল এই আইনের বলে ছয় লক্ষ একর জমি সরকারের দখলে আসবে। আজ পাঁচবছর অতিক্রান্ত হবার পর সরকারের হাতে মোট এক লক্ষ বাইশ হাজার একর জমি বর্তেছে এই সংবাদ রাজস্বমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে বিধান সভায় দিয়েছিলেন। এই হারে যদি জমি দখল হতে থাকে তাহলে মোট জমি সরকারে বর্তাতে ন্যূনপক্ষে পঁচিশ বছর লাগবে।

এই জমি কাদের বণ্টন করা হবে? এই সম্পর্কে এখনও কোনো নীতি নির্ধারিত হয় নাই। শোনা যায় আগামী বছর থেকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভূমি বণ্টন সুরু করবেন এবং যাদের দুই একর বা তার কম জমি আছে আর যারা ভূমিহীন তাদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হবে। বাংলা দেশে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ছয় লক্ষ পরিবার আছেন যারা ভাগচাষের উপর নির্ভরশীল এবং সাত লক্ষ পরিবার আছেন যারা ভূমি হীন এবং যার লক্ষ পরিবার আছেন যাদের তিন একরের কম জমি আছে। সুতরাং বণ্টনের প্রশ্নেও যে জটিলতা আছে তা অস্বীকার করার নয়।

কিন্তু এর হচ্ছে এই বণ্টন আরও আয়ত্ত হল

না কেন? যাদের প্রয়োজন সর্বাধিক চাইতে বেশী সেই ভূমিহীন ও ভাগচাষীদের মধ্যে বিনামূল্যেই বা অল্পমূল্যে কেন বণ্টন করা হবে না? এটা ঠিক, বাংলাদেশে জমির ওপর চাপ অত্যন্ত বেশী ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর জমি চাষে আনার ফলে সেই সব জমিতে চাষ অ-লাভজনক। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় ১২ লক্ষ একর অনাবাদী পতিত জমির একটা অংশই বা পুনরুদ্ধার করে এদের যোগ্য করে কেন তোলা হবে না? এ ছাড়া বহুভোগের জমির—যেমন দুই একর পর্যন্ত—খাজনাই বা কেন মকুব করে দেওয়া হবে না এই প্রশ্নের কোনো তুষ্টু জবাব পাওয়া যায় নাই। দুই একর জমি যারা চাষ করে তাদের জমি থেকে খাজনা দেবার মত কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। সুতরাং এই সকল প্রশ্নেরও আজ সমাধান চাই, যেমন আজ জমি-বণ্টন অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য প্রাক্কাব

এখানে প্রবন্ধক কমিটী কিভাবে গঠিত হবে সে প্রশ্ন নিয়ে পাঞ্জাবে অকালীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই উপলক্ষ্যে মাষ্টার তারা সিং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবে যে আন্দোলন হয়েছিল তার চাইতেও বেশী আন্দোলন হয়েছিল তাকুয়া বাদ দেওয়া নিয়ে। যে সব চাষের জমিতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তাদের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে উন্নয়ন বাবদ ধার্য করের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। এই কর বা লেভির পরিমাণ উন্নয়ন-নিরপেক্ষ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় এরও বিরুদ্ধতা দেখা দেয়। দুঃখের বিষয় লেভির পরিমাণ পূর্ববিবেচনার প্রতিশ্রুতিতে লেভি-বিরোধী আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বহু বহু সেচ পরিকল্পনা নির্মিত হয়েছে। এই সেচ পরিকল্পনাগুলির অসম্পূর্ণতা অনেক ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার ওপরও অপচয়ের সুযোগ করেছে। এই অপচয়ের মূলে বিভিন্ন রাজ্যে বাধ্যতামূলক সেচকর ধার্য করা হয়েছে। সেচের জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা নির্বিশেষে এবং সরবরাহ করা জলের পরিমাণ ঐ অঞ্চলের জমির প্রয়োজন মিটাতে পারছে কিনা সেচ পরিকল্পনার সেই ক্ষমতা নির্বিশেষে এই বাধ্যতামূলক সেচ-করের জন্য কৃষকদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছে। তার উপর আবার উন্নয়ন বাবদ লেভি বোঝার উপরে শাকের আঁটির মত দুর্বহ হয়ে উঠবে তা স্বাভাবিক। পাঞ্জাবে যদি এই লেভি প্রত্যাহৃত না হত, অন্যান্যরাজ্যেও লেভির অভিশাপ কৃষকদের বিপন্ন করে তুলতো।

পরীক্ষার্থীর দৌরাত্ম্য

ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান পরীক্ষার্থী একদল ছাত্রের দৌরাত্ম্যের জন্য এবারে অনেক ছাত্রের পক্ষে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি। কেমিষ্ট্রির দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রের কঠোরতার প্রতিবাদে একদল ছাত্র পরীক্ষা বর্জন করে এবং অন্য ছাত্রদের পরীক্ষা বর্জনে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে উত্তর কলকাতার বহু পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে। যাতায়াত তদন্ত করে দেয় এবং পরীক্ষা বর্জনে অনিচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের উপরে জোরজবরদস্তি চালায়। এরূপ দৌরাত্ম্যের হাত থেকে ছাত্রী পরীক্ষার্থীনীরাও রেহাই পায়নি। যে সমস্ত ছাত্রীদের দুর্বৃত্ত ছাত্র? এরূপ দৌরাত্ম্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মশৃঙ্খলা বিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেউ দ্বিমত প্রকাশ করবেন না।

তবে এ সম্বন্ধে আরেকটি প্রশ্ন আছে। পরীক্ষার্থীদের এরূপ বিক্ষোভের ফলে যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় কি? ছাত্র বিক্ষোভ ও দৌরাত্ম্যের জন্য ছাত্রেরা নিশ্চয়ই দায়ী কিন্তু যে প্রশ্নকর্তা এবং প্রশ্নপত্রের কঠোরতার প্রশ্নপত্রের জন্য দায়ী তাদের অপরাধও কম নয়।

এবারের কেমিষ্ট্রির প্রশ্নপত্র অত্যধিক কঠিন হয়েছে, প্রশ্নগুলি পাঠ্য তালিকার মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়নি। অরগেনিক কেমিষ্ট্রির প্রশ্ন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হয় নি। প্রশ্নপত্র দেখে মনে হয় প্রশ্নকর্তা পাঠ্যতালিকা এবং প্রশ্ন-বণ্টনের নির্দেশটি একবার দেখার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেননি এবং মডারেটর একবারও বোধহয় প্রশ্নপত্রটির উপরে চোখ বুলিয়েও দেখেন নি। অথচ উক্ত কার্যের জন্য যথেষ্ট পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রয়েছে। যাঁরা প্রশ্ন রচনা এবং মডারেশনের কর্তব্যে অবহেলা করে অগণিত ছাত্রের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি করতে দ্বিধাবোধ করেন না তেমন শিক্ষকদের সম্বন্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এবারে প্রশ্নপত্র বিড়ম্বিত পরীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা হবে সে সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট ঘোষণা করা উচিত।

ছাত্রেরা যদি নিশ্চিত জানে যে কোন কারণে কোন প্রশ্ন রচনায় যথার্থ অন্যায় করা হলে পরীক্ষার্থীরা সদয় ব্যবহার পাবে এবং প্রশ্নকর্তা ও মডারেটরও তাঁদের কর্তব্য অবহেলার জন্য রেহাই পাবেন না, তবে ছাত্ররাও অন্যায়ের প্রতিকারে দৌরাত্ম্যের পথকে বর্জন করার জন্য স্বতঃপ্রেরণায় আগ্রহান্বিত হবে।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি

পাক-মার্কিন চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানকে আজ এক অবাঞ্ছিত স্নায়ু-যুদ্ধের তপ্ত ঝুঁকে পরিণত করেছে। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির মার্কিনী উদ্দেশ্য রুশ-চীনের বিরুদ্ধে একটি সামরিক ব্যূহ রচনা করা, পক্ষান্তরে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য নিজেকে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী করে সামরিক দৌরাত্ম্যের ভয়ঙ্কিতে কাশ্মীর ও খালের জল আদায় করা। পাক-মার্কিন চুক্তির ফলে পাক-ভারতের পারস্পরিক সন্দেহ, বিদ্বেষ, অসহযোগিতা ও বৈরীভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উভয় রাষ্ট্র নিজেদের বাজেটের প্রায় অর্ধেকাংশ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করেছে। এরূপ সামরিক বাজেট বৃদ্ধির ফলে ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে আর্থিক উন্নয়নের খাতে অধিক অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। অধিকন্তু পাকিস্তানের সামরিক শক্তি আজ পাক-মার্কিন চুক্তির আশ্রয়ে জনস্বার্থ ও গণ সমর্থন বিরোধী স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়িয়ে মার্কিন সরকার যে নীতি অনুসরণ করছেন তা'তে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার শত্রুকেই শক্তিশালী করা হচ্ছে।

শিলচরে বিমান দুর্ঘটনা

বাংলা বিচ্ছেদের ফলে আগরতলা, শিলচর ও ইম্ফলে যাওয়ার প্রধান উপায় বিমান। এই বিমান পথে তাই প্রতিদিন অগণিত যাত্রী যাতায়াত করে। সম্প্রতি শিলচরের কাছে ইম্ফলগামী বিমানে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা আশা করি এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি ও গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্তের পরে কলকাতা-আগরতলা-শিলচর-ইম্ফল বিমান পথে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের যথার্থ ব্যবস্থা করে এই পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যাত্রীদের নিশ্চিন্ত করার দিকে বিমান কর্পোরেশনের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। কারণ, যাত্রীদের মন থেকে আশঙ্কা দূর করা সম্ভব না হলে ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যান্য যোগাযোগের পথে গুরুতর ক্ষতি ঘটবে।

দণ্ডকারণ্যের বাগাড়ম্বর

দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে সরকারী মহল থেকে এমন ভাবে প্রচার করা হয় যে দণ্ডকারণ্যকে যেন একটি উত্তম বাসস্থানে পরিণত করার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বাকী শুধু উদ্বাস্তুদের সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া। সম্প্রতি সংবাদ

পত্রের প্রতিনিধিরা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রগতি দেখে অত্যন্ত নৈরাশ্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের রিপোর্টে জানা যায় এপর্যন্ত দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সামান্যতম অংশও বাস্তবায়িত করে তোলা সম্ভব হয়নি। যে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বলে সেখানে নেওয়া হয়েছে তাদের এখন জংগলাকীর্ণ স্থানে তাঁবুর নীচে রাখা হয়েছে। প্রায় আট বছর তাঁবুর নিচে থাকার পরে আবার তাঁবুর নিচে থাকার জন্য দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়ার মত অমানবিক নির্বুদ্ধিতা কি করে যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের হল তা' ভেবে বিস্মিত হতে হয়। বাঙালী উদ্বাস্তুদের নিয়ে যদি দণ্ডকারণ্য পুনরুদ্ধারের কাজ করানো কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় হয়ে থাকে তবে সপরিবারে সেখানে না নিয়ে প্রথমে কয়েক উদ্বাস্তুদের সেখানে যাওয়ার কথা বলা উচিত ছিল। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করে জংগলের মধ্যে আবার তাঁবুর তলায় বাস করার জন্য উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাকে উদ্বাস্তু বিভাগের এক জ্ঞানবর্জিত নীতি ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না।

এশিয়া-আফ্রিকা সংহতি সম্মেলন

এশিয়া ও আফ্রিকা গত পাঁচশত বছর ধরে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কবলে নির্যাতীত ও শোষিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত হয়েছে। কিন্তু আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র এখনও সাম্রাজ্য-বন্ধের কবলে নির্যাতিত হচ্ছে। এশিয়ার লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং আফ্রিকার দেশগুলির মুক্তি সাধনের জন্য এবং মুক্ত দেশগুলির আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য আজ এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। কিন্তু এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার সময় একথা স্মরণ রাখতে হবে যে এশিয়ার কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র যেন প্রতিবেশী কোন দুর্বল রাষ্ট্রের উপরে কোন প্রভুত্ব কায়েম করার প্রয়াসী না হয় এবং পাশ্চাত্য জগতের ক্ষয়ভাষ্ণী শক্তিব্লকের প্রভাব যেন এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মূলনীতিকে গ্রহণ করে আফ্রিকা এশিয়া সংহতি গড়ে তোলার কোন প্রয়াস কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দেখা যায়নি। এই সম্মেলনটির উদ্যোগ করেন কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা কিন্তু সম্মেলনটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং আন্তর্জাতীয় কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর একটি প্রচার যন্ত্রে পরিণত হতে দেখা যায়। ইঙ্গ-মার্কিনের নিন্দা করা এবং কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গোষ্ঠীর বৈদেশিক নীতির অন্ধ সমর্থন করার প্রয়াস এই সম্মেলনের একমাত্র কার্যসূচীতে পরিণত হয়।

পশ্চিম এশিয়ায় ইংগ-মার্কিন প্রভাবের পরিবর্তে কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লাসার ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মনোভাবকে সম্মান দেওয়ার কোন প্রয়োজন সম্মেলন বোধ করে নি। পক্ষান্তরে ইরাকের নীতি ও রুশ অনুপ্রবেশ পন্থাকে সম্মেলনে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। ইসরাইলের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্মেলনের দৃষ্টিগোচর করার প্রস্তাবকে সম্মেলন অগ্রাহ্য করে। চীন যে তিব্বতের উপরে বৈরতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির সূচনা করেছে সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করে তিব্বতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নকে স্বীকৃতি দিতেও সম্মেলন অস্বীকার করে। বস্তুত, রুশ-চীনের বৈদেশিক নীতিকে আফ্রিকা-এশিয়ার সম্মেলন সম্পূর্ণরূপে অনুসরণের প্রস্তাবই পাশ করে।

কংগ্রেসী উদ্যোক্তাদের অসতর্কতা, অযোগ্যতা ও ব্যক্তিবাদী বুদ্ধির ফল কমিটির সভা থেকে আরম্ভ করে প্রতিনিধিদের শতকরা ৯০ জন ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির

সত্য ও সমর্থক। এমনকি আফ্রিকা এশিয়া সম্মেলনে আফ্রিকার প্রতিনিধি মোটেই ছিল না। আরব, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ইত্যাদি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রথম দিনের পরে আর যোগ দেননি। বৈদেশিক প্রতিনিধি বলতে রাশিয়ার ছয় জন, বুলগেরিয়ার জন কয়েক। ইরাকের এবং অন্যান্য দেশের মন-অভিসিয়েল কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিরা আফ্রিকা এশিয়ার প্রতিনিধিরূপে আখ্যা লাভ করেছে।

আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলনের গালভরা আখ্যা দিয়ে এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কলকাতা করপোরেশনথেকে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছে। জনসাধারণের কাছ থেকেও বহু অর্থ সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু এই সম্মেলনটি সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতীয় কম্যুনিজমের বৈদেশিক নীতি পরিপোষণের একটি সংকীর্ণ সম্মেলনে পরিণত হয়েছে। কয়েকটি ব্যক্তিবাদী কংগ্রেসী নেতার সাহায্যে এই আফ্রিকা-এশিয়া সংহতি নামের প্রতিষ্ঠানটি আজ আন্তর্জাতীয় কম্যুনিজমের একটি প্রচার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতীন

পৌত্তলিক

নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমাকে দেখাই যেন সমস্ত আত্মার নির্বান।
দৃষ্টির বিস্ময় তুমি—নীলাঞ্জন মেঘেদের মত,
তোমার হৃদয় যেন নক্ষত্রের নীরব সন্ধান।
অ্যাসফল্ট-ইটে ঢাকা প্রত্যহের প্রহর আহত
গৌদ্রের প্রান্তরে আঁকা ঘিন্ন নীল শান্তির ভূমির
বিবর্ণ পথের আলা দিলে সেকে নির্জন গোপুরে।
তোমার ছায়ার ঘরে বার বার আমি ঘুরে ঘুরে
চোখে মুখে মেখে নেই, হৃদয়ের রহস্য গভীর;
তোমাতে উত্তীর্ণ হয়ে আকাঙ্ক্ষার গান গেয়ে ওঠে।
এ যেন বর্ষার মোহে কবেকার পদ্মের হৃদয়
বিকশিত দল মেলে খুঁজে পেল যৌবনের জয়।
গভীর হৃদের জলে ঘুমঘুম ডাওলার ঠোঁটে
রাত্রের নির্জন গান: দিঘির অতল স্বচ্ছ জল
সেখানে সূর্যের মেহে কত আলোর-হারী কল্পনা
তুমি তাই: অসহায় এই সব কান্নার আঁচল,
তোমাতে হারিয়ে দিয়ে কথা কয় সৃষ্টির বেদনা।

তুমি কে আমার বলো! কেউ নও—অথচ তো সব
তোমার উপমা খুঁজে হৃদয় যে রঙের উৎসব।

তোমার দৃষ্টির মোহে জলে যায় হৃদয়ের ধূপ।
তোমার স্বরের কথা ঘুম দেয় খাঁচার পাখীকে।
একটি সহানুভূতি শুধু কোথায় শান্তির স্বরূপ।
নিজেকে নূতন করে দেখি সেই আলোর আদিকে।
পরাজিত সৈনিকের ভূমি যেন আলোর উত্তর
অস্পষ্ট স্বরের স্মৃতি। সব শেষে তবু আজ তুমি
বাঁচার বিশুদ্ধ বোধে তুমি তার স্বদেশের স্বভূমি।

প্রেমহীন পরাজয়ে পাওয়া গেল প্রাণের উত্তর;
রূপে আমি বাঁধব না, অরূপের আশ্চর্য্য গোপুরে
তোমার প্রতিষ্ঠা থাক; আমি এক ভক্ত পৌত্তলিক
তোমাকে দেখব শুধু—সুখ দুঃখ কান্নার অতীত
সেখানে আমার মৃত্যু! গোধূলির নির্জন মুকুরে
রেখে যাব বোধ ভোরে এক মুঠো অশোক-অঞ্জলি।
একক মন্দিরে তুমি—অন্ধকার দূর বনস্থলী—
চারদিকে কান্না-বাস্প—ভীত আমি ভোরে ও দুপুরে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

"একে একে নিবিছে দেউটি"। বিশের থেকে আরম্ভ করে, প্রাচ্যজগতের প্রায় সর্বত্র ধীরে ধীরে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ক্ষীণ দীপশিখাগুলি নির্বাপিত হ'য়েছে। লেবানন্ ইরাক, জর্ডন, ইরাণ, পাকিস্তান ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশীয়ায় গণতন্ত্রের প্রাথমিক সূচনার অবসান ঘটেছে। এই দেশগুলিতে একনায়কত্ব শিশুগণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছে। সিংহলের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ব্যবস্থাও অন্তর্বিরোধে টলটলায়মান। ফিলিপিন্স্, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়াও ল্যাওস্ ও কাম্বোডিয়ার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরণের প্রচলনমাত্র প্রচলিত ক'রে রেখেছে। আফগানিস্তানে গণতন্ত্র কোন দিন ছিল না, এখনও নেই। সোভিয়েট এশিয়া, ভিয়েটনাম, চীন, উত্তর কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এই দেশগুলি মোটামুটিভাবে গ্রমিক তন্ত্রে পরিণত হ'য়েছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই।

কেবলমাত্র জাপান ও ভারতবর্ষেই পাশ্চাত্য পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র আত্মরক্ষা করে চলেছে। কিন্তু জাপানের আংশিক গণতান্ত্রিক সাফল্যের মূলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব যে অনেক পরিমাণে সক্রিয় হয়ে রয়েছে তার সন্দেহ নেই। সুতরাং এশিয়ায় যুদ্ধোত্তর গণতন্ত্রের ইতিহাসে ভারতবর্ষই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে এই জুন তারিখে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান এই বিষয়ে সরকারী মন্তব্য করেছেন: "Parliamentary Institutions have not had a very good time in Asia.…All that is happening in Asia throws a spot-light on the Parliament in Delhi as the one institution of the kind which is working in an exemplary way.… Pericles said that Athens was the school of Hellas. Mr. Nehru without boasting may say that Delhi is the school of Asia."

১৯৪৭ সালে ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান যে মন্তব্য করেছিলেন ভারতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে বোধ করি আজও তা সত্য। সম্ভবতঃ আজ আরও সত্য এই জন্য যে ভারতের একটি রাজ্যে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন মারফত কমিউনিষ্টদল শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন এবং সংবিধানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী সেই রাজ্য-সরকার শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করছেন। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসদল চালিত, বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, কমিউনিজম্ বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যটীর শাসন ক্ষমতায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নি। অর্থাৎ কমিউনিষ্ট দল ও কংগ্রেস উভয়েই গণতন্ত্রসম্মত পথে অগ্রসর হ'য়ে সংবিধানের মর্য্যাদা রক্ষা করে চলেছেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে

এই রাজনৈতিক ঘটনা অতিশয় মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে ভারতবর্ষে এমন একটি গণতান্ত্রিক মানসের সৃষ্টি হয়েছে, যার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

এশিয়ার অধিকাংশদেশে গণতন্ত্রের অকালমৃত্যুর কারণ কী? ভারতবর্ষেই বা গণতন্ত্রসম্মত শাসনব্যবস্থা কি উপায়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হ'য়েছে। একটি কারণ এই, যে সব দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অকাল মৃত্যু ঘটেছে সে সকল দেশে গণতন্ত্রের কোন ইতিহাসই নাই।

এশিয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের ইতিহাস। বর্তমান যুগেও ইউরোপীয় গণতন্ত্রের আদর্শ প্রাচ্যজগতে দানা বাঁধে নি। ইংলণ্ড-আমেরিকার অনুকরণে হয়তো বা মাঝে মাঝে গণতন্ত্রের নকলনবীশির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা ক্ষণস্থায়ী বই কিছু নয়। চিরাচরিত স্বৈরশাসন অল্পকালের মধ্যেই নামমাত্র গণতন্ত্রকে সহজেই গ্রাস করে ফেলেছে। উত্তর ভারতবর্ষে বৈদিক, বৌদ্ধ, মহাকাব্য ও পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে খৃষ্টীয় ৬০০ সাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের ইতিহাস পাওয়া যায়। রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রেও বৈরাজ্য বা Republic এর উল্লেখ আছে। কচিৎ দেখা যায় রাজা নির্বাচিত হলেন, অথবা গণসভা এক রাজার মৃত্যুর পর, পরবর্তী রাজার উত্তরাধিকার স্বীকার করে নিচ্ছেন। কোন কোন রাজ্যে শাসনব্যবস্থানুযায়ী রাজাকে, 'সভা' অর্থাৎ প্রজাসভার সঙ্গে পরামর্শ করতে হতো, কোথাও বা 'সমিতি' বা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন হ'তো। কিন্তু রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে এই আধা-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি বেশি দিন টিঁকে থাকতে পারেনি। ক্ষমতাশালী রাজা বা সম্রাটেরা এই প্রতিষ্ঠান গুলিকে ক্রমে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র (৯০০—১২০০ খৃঃ) খুব ক'রে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে এই আধা-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির আর হদিশ পাওয়া যায় না। তবে 'জনপদ' বা আঞ্চলিক সভা 'পৌরসভা' ও 'গ্রামসভা' প্রভৃতি স্বায়ত্বশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগে নয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ইংরাজ আমলেও সক্রিয় ছিল। ঋক বেদ, মেগাস্থেনীসের 'ভারত বিবরণ', শুক্রাচার্যের নীতিসার, জাতক, রামায়ণ, মহাভারত ও মনুস্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে স্বায়ত্বশাসন প্রণালী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে বিদ্যমান ছিল এবং উত্তরভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীন মণ্ডলে অধিকতর ভাবে সক্রিয় ছিল। মধ্যযুগেও উত্তর ও দক্ষিণভারতের গ্রামীন স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নি। মুসলমান নৃপতি ও সম্রাটেরা এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার কোন প্রয়াস পান নি। যেমন প্রাচীনকালে তেমনি মধ্যযুগেও স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসৃত হ'য়েছে। কিন্তু ইংরাজের কেন্দ্রীভূত শাসন নীতির চাপে এই গ্রামীন স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক গ্রামীন স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। গ্রাম্য মণ্ডল সাধনে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্য ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিদ্বারা জাতির যে বিরাট ক্ষতি হ'য়েছে সে'দিকে তাঁরা লক্ষ্য করেন না। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে ভারতীয়েরা ক্ষুদ্র গ্রামীন স্বার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠেছে। জাতীয় ঐক্য, জাতির বৃহত্তর স্বার্থ, জাতীয় স্বাধীনতার কথা তাদের মনকে নাড়া দিতে পারে নি। গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা জাতি গঠনকে ব্যাহত করেছে। বিদেশী গ্রামীন শাসনে হস্তক্ষেপ করেন নি; গ্রামের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ও সঙ্কীর্ণ প্রশাসনিক স্বাধীনতা তারা রক্ষা

করেছেন। কূপমণ্ডূক গ্রাম-সর্বস্ব ভারতবাসী সেই তুচ্ছ অনুপ্রেরণাটুকু গলাধঃকরণ ক'রে আত্ম-সন্তুষ্ট হ'য়েছে। জাতির স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করেনি। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হয় যে, স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারা জাতির বিবর্তন ও প্রগতির পরিপন্থী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। ইংলণ্ডে কিন্তু এমনতর হয় নি। সেখানে সুপ্রাচীন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বরং মানুষকে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি উদাসীন হ'তে বাধা দিয়েছে। তাই সেখানে গ্রাম্য জীবনেও জাগ্রত ছিল জাতীয় একতার উপলব্ধি ও জাতীয় স্বাধীনতারক্ষার উগ্র অভিলাষ।

রাজ্য শাসনক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আধা-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অথবা স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামীন ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের দেশে মাত্র স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়েছে। তা' থেকে আমরা কোন জীবন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি নি। পুরা-তাত্ত্বিকদের পুস্তকাদির বাইরে তার কোন প্রভাব নেই। গণতন্ত্র গঠনে বা স্বাধীনতার সংগ্রামের যুগে সেই স্মৃতি সত্তা হ'য়ে ওঠে নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের যদি কোন রাজনৈতিক আদর্শ বর্তমান যুগে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তা'হলে সেটি হচ্ছে স্বৈরাচারের (absolutism) আদর্শ। সে ঐতিহ্য হচ্ছে অশোক, সমুদ্র গুপ্ত, আকবর ও ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস-ভিত্তিক। তা' সম্পূর্ণ-ভাবে গণতন্ত্র বিরোধী।

আমাদের গণতন্ত্রের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আমরা লাভ করেছি সম্পূর্ণভাবে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ও প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সাহিত্য, রাজনীতি ও সংবিধানাবলীর মাধ্যমে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে নেহেরু পর্য্যন্ত প্রায় সকল ভারতীয় মনিষীগণই ইংলণ্ডের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পূজারী। বর্তমান সংবিধান প্রণেতৃগণের মধ্যেও সেই ভাবধারাই সক্রিয় ছিল।

১৮৩৩ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় বিধান পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদে ভারতীয়দের স্থান অবশ্য ছিল না। তথাপি বিধান সভা বা পরিষদের বিবর্তনের ইতিহাস এই পরিষদের মূল্য কম নয়। তারপর ১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯ ১৯১৯, ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইনের বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলী বিবর্তিত হ'তে থাকে এবং ১৯৪৭ সালে, ইংরেজ প্রণীত স্বাধীনতারত আইনের বলে এদেশে সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হয়। গণপরিষদ গঠন ও পরবর্তী-কালে পরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন, ইংরেজের আগমনে ভারতীয় শাসনপদ্ধতির বিবর্তনের শেষ ধাপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। প্রায় একশত বছর ধরে ইংরাজ ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। তা' স্বাধীনতাভিত্তিক পার্লামেন্টারী শাসন পদ্ধতি নয়। কিন্তু তথাপি সেই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা ভারতীয়েরা লাভ করেছে তার মূল্য অপরিমেয়। ভারতীয়েরা একদিকে ইংরাজের গণতান্ত্রিক ভাবধারা ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতির মাধ্যমে আত্মস্থ করেছে। আর এক দিকে ইংরাজের কাছে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পরিচালন পদ্ধতির তালিম নিয়েছে। এই সুযোগ এশিয়ার অন্য কোন দেশের জোটেনি। এই কারণেই ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র অন্যান্য এশীয় দেশ অপেক্ষা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হ'য়েছে। তাই মনে হয় যে বর্তমান সংবিধানানুযায়ী যদি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র দেশে বলবৎ রাখতে হয়, তবে ইংরাজের সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির সঙ্গে আমাদের চিন্তাধারার যোগ রক্ষা একান্ত প্রয়োজন। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে ইংরাজীভাষা শিক্ষাও গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের পক্ষে অপরিহার্য।

নিরক্ষরতা, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, অদৃষ্টবাদ, দুর্নীতি, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নীতিতে বিশ্বাস, পরমত-অসহিষ্ণুতা,

প্রয়োজনিকতা, ক্রয় ক্ষমতার স্বল্পতা, ধনিক-শ্রেণীর গণতন্ত্রের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের গণতন্ত্রকে ব্যাহত করেছে। যদিও ভারতের গণতন্ত্র উপরোক্ত দোষে কিছুটা দুষ্ট, তথাপি এই দোষগুলি এখনও এমন আকার ধারণ করে নি, যা দ্বারা গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিফল হতে পারে। সুখের বিষয় ভারতীয় গণতন্ত্রের এই দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে সাধারণ নাগরিক অনেকটা সচেতন। দুঃখের বিষয় প্রভাবশালী মহলে এই সচেতনতা উপযুক্ত পরিমাণে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে নি।

ফরাসী বিপ্লব থেকে গণতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক পুরোধা রুশো বিপ্লবের আটাশ বৎসর পূর্বে গণতন্ত্রের কয়েকটি মূল ভিত্তির উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান যুগে রুশো-উল্লিখিত গণতন্ত্রের বুনিয়াদ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লেখা হ'য়েছে। কিন্তু দার্শনিক রুশো যে সরলতা ও প্রাঞ্জলতার সঙ্গে গণতন্ত্রের সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করেছেন তেমনটি আর কেউ পারেন নি। রুশো লিখেছেন :

"Besides, how many conditions that are difficult to unite does such a government presuppose! First, a very small State, where the people can readily be got together and where each citizen can with ease know all the rest; secondly, great simplicity of manners, to prevent business from multiplying and raising thorny problems; next, a large measure of equality in rank and fortune, without which equality of rights and authority cannot long subsist, lastly, little or no luxury —for luxury either comes of riches or makes them necessary; it corrupts at once rich and poor, the rich by possession and the poor by covetousness;" it sells the country to softness and vanity, and takes away from the state all its citizens, and makes them slaves one to another, and one and all to public opinion.....were there a people of gods, their government would be democratic. So perfect a government is not for men."

অনুচ্ছেদটি দীর্ঘ, কিন্তু এমন সুন্দরভাবে কেউ কখনো গণতন্ত্রের প্রাণবস্তুর সন্ধান দিতে পারেন নি; তাই উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও বোধ করি মার্জনীয়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে অ্যারিষ্টট্‌লও সমাজে আর্থিক বৈষম্যের নিন্দা করেছেন। ধনবৈষম্য একই রাষ্ট্রকে দ্বিধা বিভক্ত করে city of the rich, ও city of the poor বা ধনী ও নির্ধনের রাষ্ট্রে পরিণত করে। এই সমস্যাটি পুঁথিগত বুলি নয়। এইটিই হ'লো বর্তমান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমস্যা। আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে আর্থিক বৈষম্য নিরসনের সংকল্প ঘোষণা করা হ'য়েছে। কিন্তু সে আদর্শের রূপায়ন সুদূর-পরাহত।

আজ সমস্যাসঙ্কুল ভারতবর্ষে বেকার যুবকের কর্মসংস্থান অতিশয় গুরুত্ব লাভ করেছে। সকলেই স্বীকার ক'রছেন যে ভারতীয় গণতন্ত্রে যদি কর্মেচ্ছু যুবকদের কাজ না দেওয়া যায়, তবে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য গণতন্ত্রকে নিষ্পেষিত ক'রবে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মতে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১সালের মধ্যে জনসংখ্যা শতকরা ১২.৫ বৃদ্ধি পাবে এর ফলে কর্মেচ্ছু বেকারের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকবে। তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপায়নের মাধ্যমেও বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করে দেখেছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার সমস্যা উৎখাত করতে হলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেকারীর কর্মসংস্থানের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তিতে মাত্র ৭১ লক্ষ তিন হাজার বেকারীকে কাজে লাগানো সম্ভব হ'বে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই জাতীয় আয়ের মোটা অংশ ধনিক শ্রেণীরই করতলগত হ'বে। যে ছিটে ফোঁটা দেশের দরিদ্র শ্রেণীর হাতে এসে পৌঁছুবে তা' নেহাতই সামান্য। ম্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের রেড কুইনের মত একই জায়গায় থাকবার জন্য জাতিকে সর্বদা ছুট থেকে দ্রুততর দৌড়ে নিযুক্ত থাকতে হ'চ্ছে। অর্থাৎ ধনবৃদ্ধি হলেও দরিদ্র শ্রেণী তেমনি বেকারগ্রস্ত, তেমনি দারিদ্র্যপীড়িত থেকে যাচ্ছে। যদি জাতীয় ধনবণ্টন ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পরিবর্তিত হয় তথাপি অবস্থার বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নেই। কারণ পরিকল্পনা মারফত ধন বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে ধনোৎপাদন পাল্লা দিতে পারছে না, পারবেও না। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার নিয়ন্ত্রণের নীতিতে পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণের খাতে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল; তারমধ্যে ১৯৫১-৫৬ সালের মধ্যে মাত্র ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫ কোটি টাকা এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে সমাজ উন্নয়ন ব্লকে ও সহরাঞ্চলে শ্রমিক এলাকাগুলিতে যদি ব্যাপক প্রচার চালানো যায় তা'হলে কিছুটা ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু গ্রামবাসী ও শ্রমিকেরা অধিকাংশই নিরক্ষর। সুতরাং প্রচারের ফল অল্পকালের মধ্যে কিছুতেই আশাপ্রদ হ'তে পারে না। আশা করা যেতে পারে যে দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর কিছুটা ফল পাওয়া যাবে। শিক্ষিত শ্রেণীর ভিতর এই আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না; কারণ এই শ্রেণী জীবনযাপনের উন্নতির আকাঙ্খায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে পরিবার নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন। ভারতে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান অপরিহার্য। আর বেকার সমস্যার সমাধান করতে হ'লে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস করা অপরিহার্য। এই নীতি কার্যে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এই বিষয়ে সর্বসাধারণের অবিলম্বে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মতে ১৯৫৬-৬১ সালের মধ্যে এই শ্রেণীর শিল্পগুলিতে ৪½ লক্ষ নূতন কর্ম সংস্থান হ'বে। শিল্পায়নের এই বিশেষ ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই দিকে সরকারের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয়নি। তার একটা কারণ এই যে আমাদের দেশের সমবায়-সুলভ মনোভাব এখনও গড়ে ওঠে নি। তা ছাড়া যে আত্মনির্ভরতা ও সংগঠন শক্তি সমবায়ের জন্য প্রয়োজন তার অভাব দেশবাসীদের মধ্যে পদে পদে দেখতে পাওয়া যায়। সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সমবেত প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসদল যদি অন্যান্য দলের সহযোগিতা আহ্বান করেন, তা'হলে বিরোধীদলগুলি সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কংগ্রেস এই বিষয়ে উদাসীন।

চীনে কৃষি ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলন, ১৯৫৮ সালের পূর্বে, যে ফুলাস্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা' কারও অবিদিত নাই। ভারত সরকার কৃষি ব্যবস্থায় সমবায় প্রথা

প্রবর্তনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, চীনের অভিজ্ঞতার উপরই সেই নীতি প্রতিষ্ঠিত। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অপরিহার্য। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে যদি তা' সম্ভব হয় তবে ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তর হবে সন্দেহ নাই। এজন্যও সর্বদলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক।

ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্য যে সকল উপাদানের উপর নির্ভর করে ও এ দেশে গণতন্ত্র যে সব সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তার উল্লেখ করা হলো মাত্র বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। সাধারণ নাগরিকের সদা জাগ্রত সচেতনাই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখে। সেই সচেতনতা, শিক্ষা, বিশেষতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে, জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্তভাবে সঞ্চারিত করতে হ'বে। তা' যদি সম্ভব হয় তবে ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সন্দেহ নেই।

গ্রীষ্ম বসন্তের পত্র

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

কী যেন আজ হারিয়ে গেছে, অবাক হয়ে ভাবি
কী যেন পেয়েছিলেম কাছে, কী যেন ছিল দাবী।
কী যেন তাকে বলেছিলেম, কী যেন সেই কথা,
কী যেন হৃদয় চেয়েছিল, কী যেন এই ব্যথা।

সূর্য, তোমার দুপুরে আর ওঠেনা কেন সুর?
দেখছি আছ' অনেক কাছে, পথ যে তবু দূর।
আকাশে ধূলো, উঠেছে ঝড়, ছুটেছে কুটো খড়;
নূতন প্রাণের ভিত্‌টা এবার বড়ই নড়বড়।

শিশুর করুণ কান্না নিয়ে অবোধ সানাই হাসে,
শীত শিশিরের যুক্তা ঝরে করুণ দুর্বাঘাসে।
সকালে তবু, বিকালে কভু অবাক হয়ে ভাবি
কী যেন হৃদয় চেয়েছিল, কী যেন ছিল দাবী॥

: উপন্যাস

গতবারের পর

ডাঃ জিভাগো

বরিস পাস্তেরনাক

—অনুবাদ :
সত্যব্রত বসু

প্রথম পর্ব প্রথম অধ্যায়

পাঁচটার গাড়ী

৪

মা'র মৃত্যুর প্রায় দু'বছর পর, ১৯০৩-এর এক গ্রীষ্মে একদিন উরা তার মামা কোলিয়ার সঙ্গে দু'ঘোড়ার টানা এক খোলা গাড়িতে চড়ে মাঠের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। আই-ভান আইভানোভিচ ভরুবয়োনিকভ্ একজন শিক্ষক, পাঠ্যবই লেখেন, থাকেন দুগ্রিয়াকায়,—সেখানে ওঁর বাড়িতেই ওরা যাচ্ছে। দুগ্রিয়াকার জমিদার কোলোগ্রিভভ্—ইনি একজন সিল্ক-উৎপাদক,—আলুর একজন বড় পৃষ্ঠপোষকও।

সময়টা একটা উৎসবের মুখে। শস্য কাটার কাল, কিন্তু মাঠে কোথাও একটি জনপ্রাণীও চোখে পড়ল না। হয়ত উৎসব বলে, কিম্বা দুপুরের ছুটি। অর্ধেক কাটা ফসলের ক্ষেত কয়েদীর অর্ধেক কামানো মাথার মত রোদে জ্বলছিল। মাথার উপর চক্রাকারে উড়ত পাখির ঝাঁক। আর পাকা গমের স্বচ্ছ শীষ এক একটি সুন্দর রেখায় একেবারে স্থির, যেন মন্ত্রমুগ্ধ। বহুদূরে ফসলকাটা ক্ষেতের উপর চাষীরা কাটা ফসলের স্তূপ মাঝে মাঝে সাজিয়ে রেখে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে মনে হয় সেগুলি নয়,—যেন আশ্বিন, ঋষি 'অরিপ করে নোট লিখে দূর দিগন্তরেখার গায়ে অস্পষ্টভাবে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

'মাঠ কি সব জমিদারের। না চাষীরও।' নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্—উরার মামা,—প্রশ্ন করছেন পাভেলকে।

পাভেল সেই প্রকাশক ভদ্রলোকের একজন কর্মচারী, ছুটিছাটা কাজে সে বহাল। সে কোচবক্সে এমন একটা ভঙ্গী করে বসেছিল, কাঁধ বেঁকিয়ে পায়ের উপর পা মুড়ে, যেন গাড়ি চালানোটা তার নিয়মিত কাজের মধ্যে পড়ে না।

'সব মালিকের।' সে বলল। বলে তার পাইপটা ধরাল।

চুপচাপ অনেকক্ষণ পাইপ টেনে একসময় হঠাৎ হাতের ছপটিটা একদিকে উঁচিয়ে ধরে বলল, 'আর ঐগুলো আমাদের।—এই, হট্ হট্'—বলে সে তার ঘোড়া দুটিকে তাড়না করল। কিন্তু ঘোড়া হল ঘোড়াই, দুনিয়ার যে-কোনো ঘোড়ার মতই। কিন্তু সে এমন নিখুঁতভাবে ঘোড়ার লেজ এবং পিছনদিকটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল যেন সে এঞ্জিনের ড্রাইভার আর ঘোড়ার পিছনদিক হল এঞ্জিনের সেই জায়গা যেখানে জটিল বহু যন্ত্রপাতি সাজানো।

নিকোলাইর সঙ্গে ছিল প্রুফ। তুষিনস্কোয়ের বিরুদ্ধে

আইভান বই লিখেছেন একখানি, এ প্রুফ তারই। প্রকাশকের নির্দেশ, সেন্সরের অতর্কিত কড়াকড়ির জন্য লেখাটি আর একবার ভালভাবে দেখে দিতে হবে। সেই কাজেই প্রুফ নিয়ে নিকোলাই চলেছেন।

'এদিককার লোকজনের মতিগতি কিন্তু ভাল নয়।' নিকোলাই পাভেলকে আবার বললেন। 'মনে হয় যেন ক্ষেপে আছে। এই সেদিন এক ব্যাবসায়ীকে ওরা কেটে ফেলেছে! একজন অফিসারের কেত থাবার ঘোড়াশাল সব পুড়িয়ে দিয়েছে। তোমার কি মনে হয়। তোমাদের গ্রামের দিকের লোকজনরা কি বলে।'

কিন্তু পাভেলের মতামত এ বিষয়ে সেন্সরের চেয়েও কড়া। যার ভয়ে আইভানের ভূমিসংক্রান্ত জোরালো মতামত প্রকাশক আরো কিকে করে দিতে বলেছেন।

'তারা আর কী বলবে।' পাভেলের জবাব। 'তারা সব স্বাধীন। তোফাসে আছে। কিন্তু যাই বলুন, আমাদের মত লোকের আবার এতটা ভাল নয়। আপনি চাষীদের ডেকে একগাদি করে ঘড়ি দিয়ে দেখুন। দেখবেন তক্ষুনি আমরা এ ওর গলায় ঘড়ি লাগিয়ে বসে আছি।—হুঠ্ হুঠ্ হেই—'

দুদিনের কাজ মাথায় নিয়ে উরার এই দ্বিতীয়বার যাওয়া। তার মনে হল রাস্তাটা তার চেনা। এবং চলতে চলতে সামনে পিছনে যতবার বন এল আর গেল, সে প্রতিবার ভাবল যে রাস্তাটা এইবার 'তানদিকে ঘুরবে,—ঘুরে কোলোগ্রিভভের প্রাসাদ যার বিস্তৃত গ্রামীন ফাঁকা জমির বিস্তৃতি নিয়ে ভেসে উঠবে,—নদীর জল চিকচিকিয়ে উঠবে দূরে, যেটা পার হয়ে তারপর রেললাইন। কিন্তু প্রতিবারই তার ভুল হল। মাঠের পর মাঠ পিছনে বনের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। এবং দিগন্তজোড়া ফাঁকা জমির পর জমি পার হতে হতে এ তারপর কেমন নেশা লাগার মতো। ভাবার। আর ভবিষ্যতের নানা স্বপ্ন এসে যেত।

নিকোলাই পরে যে সব বই লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন, সেগুলি এখনো অলিখিত কিন্তু আইডিয়াগুলি তাঁর মনে এবার প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এবং শীঘ্রই যে তাঁর সমকালীন লেখক ও চিন্তানায়কদের মধ্যে তাঁকে আসন নিতে হবে, আর সেদিন যে এত কাছে এ তাঁর নিজেরও জানা ছিল না।

তাঁর সমকালীন লেখকরা প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অনেকে বিপ্লবী চিন্তাজগতের অধিনায়ক। নামে এঁদের সঙ্গে এক হলেও নিকোলাই কিন্তু সর্বতোভাবে এঁদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। এঁরা সকলেই কোনো না কোনো একটি মতবাদে বিশ্বাসী। সব কিছুর কথাগত অর্থ এবং আকৃতিগত পরিচয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনি, কাজার নিকোলাই, একজন পাত্রী, তিনি ছিলেন তলস্তয়-পন্থী,—একজন আদর্শবাদী বিপ্লবী,—এবং তাঁর অন্বিষ্টা এখনো শেষ হয়নি। তিনি ছিলেন সত্যকাম, মনে মনে সর্বক্ষণ তাঁর সমাধান ও সমন্বয়ের একটি সাধনা চলছিল। তিনি চাইছিলেন যুগোপযোগী একটি পথ, নির্ভুল, যা আলোর মত স্বয়ংপ্রকাশ, যা বিশ্বকে মঙ্গলের পথে চালিত করবে। নূতন একটা কিছুর সন্ধানে তিনি পাগল।

মামার সঙ্গ উরার খুব ভাল লাগত। মামাকে দেখে তার মনে পড়ত মাকে। মা'রই মত এঁরও মন: স্বাধীন স্বচ্ছন্দগামী-সচেতন। সবসময়েই নূতনের ও পরিবর্তনের প্রয়াসী। এঁরও সেই মা'র মতই মনের স্পর্শাতুর আত্মীয়তা, চেতন প্রাণীমাত্রেরই প্রতি সংবেদনশীলতা,—সেই প্রখর ও সজাগ দৃষ্টি যা দৃষ্টিপাত মাত্রই সমস্ত খুঁটিয়ে দেখে নেয়। মার মত এঁরও সেই অনায়াস প্রকাশের শক্তি: মনের মধ্যে কোনো প্রতিফলন জাগলেই, মনের পরিপাকে তা ম্লান হবার আগেই অনুপম ভাষায় তিনি তা গেঁথে নিতে পারতেন

মামা যে তাকে সঙ্গে করে ছাপ্পিয়াড়ায় নিয়ে যাচ্ছেন, এটি জেনে উরার খুব ভাল লাগল। জায়গাটি সুন্দর। এবং সুন্দর বলেই এখানে এলে তাঁর মাকে মনে পড়ে। মা ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক। কতবার তাকে সঙ্গে করে তিনি গ্রামে বেড়াবার জন্ত নিয়ে গেছেন।

কিন্তু এ জায়গাটি যে তার ভালো লাগে তার আরো একটি কারণ আছে : সে হল নিকি ডুদরভ্। নিকি একটি ছেলে, স্কুলে পড়ে, থাকে আইভানের পরিবারে। নিকি তার চেয়ে বছর দুইর বড় এবং উরার ধারণা যে নিকি তাকে পছন্দ করে না। যখন উরার সঙ্গে সে হাত মেলায়, এত জোরে একটা ঝাঁকি দেয়, আর মাথাটা এত নামায় যে তার চুল লাফিয়ে মুখে নেমে আসে, আর তাতে তার আধখানা মুখই প্রায় ঢেকে যায়।

৫

'দারিদ্র্যসমস্যার মূল শিকড়,' সংশোধিত পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ছিলেন নিকোলাই।

'শুধু "মূল" দিন। মনে হচ্ছে তাতেই ঠিক হবে,' বললেন আইভান, ছাপা অক্ষর ধরতে দিতে দিতে।

তাঁরা বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। চওড়া বারান্দা, পাঁচহারা। একদিকে বাগানের কিছু ফলগাছ, কয়েকটা জল দেবার ঝারি, আর ঐ দিকে ভাঙা চেয়ারের পিঠে মেলা একটা বর্ষাতি। জলে ব্যবহারের খাপ তোলা জুতো শুকচ্ছিল এককোণে, সেগুলোর গায়ে কাদা শুকিয়ে কাঠ, আর জুতোর উঁচু খাপের মত মাথার দিকটা মুড়ে লুটিয়ে আছে মাটিতে।

'অন্তদিকে জন্ম এবং মৃত্যুহার দেখে মনে হয়' নিকোলাই পড়ে যেতে লাগলেন।

'ওখানে বসান "আলোচ্য বৎসরের," বললেন আইভান এবং একটু নোট নিলেন। হাওয়ায় উড়ে কয়েকটা মুড়ি কুড়িয়ে কাগজচাপা হিসাবে ওঁরা কাগজগুলির উপর বসিয়ে দিয়েছিলেন।

কাজ শেষ হতেই নিকোলাই ফিরবার জন্ত তক্ষুণি তৈরী।

'একটা ঝড় উঠবে মনে হয়। আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

'ঝড়! না না, চা না খাইয়ে আপনাকে ছাড়া হবে না কিছুতেই।'

'কিন্তু সদরে যে সন্ধ্যার আগে আমাকে ফিরতেই হবে।'

'সে ফিরবেন।'

বাগানে চায়ের আয়োজন হল। চা-দানি থেকে এক ঝলক ধোঁয়া এসে তামাক এবং সূর্যমুখীর গন্ধটিকে একেবারে চাপা দিয়ে গেল। পরিচারিকা আনল ট্রে, তাতে জমানো ক্রিম, ঘাম এবং পনির কেক। শোনা গেল, ঘোড়া দুটিকে স্নান করাবে বলে পাভেল নদীতে গেছে। অতএব অপেক্ষা না করে এখন উপায়ও ছিল না।

'ওরা চা দিক, আমরা ততক্ষণ নদীর দিক থেকে একটু ঘুরে আসি চলুন।' আইভান বললেন।

কোলোগ্রিভভের সঙ্গে আইভানের বন্ধুত্ব ছিল,—সেই বাড়িয়ে এস্টেটের ম্যানেজারের বাংলোয় ব্যবহারের জন্ত ইনি দুখানি ঘর পেয়েছিলেন। কোলোগ্রিভভের প্রাসাদ ঘিরে যে বিশাল পার্ক, তার এক নিভৃত কোনে স্বতন্ত্র বাগান সহ ম্যানেজারের এই বাংলো। এ দিকটায় এখন আর ব্যবহার নেই। আগে সকলের ব্যবহারের জন্ত এখানে যে পথটি ছিল তা এখন আগাছায় ঢাকা। কেবল মরলা বোঝাই গাড়ি ওদিকে মরলার খালে নেওয়ার জন্ত মাঝে মাঝে ঐ পথটির ব্যবহার।

কোলোগ্রিভভ্ কোবলভি ধনী। প্রগতিপন্থী এবং বিপ্লবের সমর্থক, মন্ত্রীক এখন বিদেশে। তাঁর দুই মেয়ে, নাদিয়া এবং লিলা,—তাদের শিক্ষয়িত্রী এবং কয়েকজন

রাজধানী মিলান এখানে যে ফসফার তার অবলোকন এস্টেটের আর থেকে চলে।

প্রাসাদ এবং স্যানেমাইরের বাগানের মাঝখানে ব্ল্যাকথর্নের খুব ঘন লম্বা একটি বেড়া, বেড়ার ওদিকে প্রাসাদ ঘিরে দ্বিতীয় পরিখা, জল, ভরা নদ। আইভান এবং নিকোলাই যখন বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন, ঝোপের ভিতর থেকে একটু একটু পরই চড়ুই পাখির ঝাঁক উড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ওদের সামনে। ঝোপটা চড়ুই পাখিতে ভরা, সমস্ত জায়গাটি ওদের একটানা কলকাকলিতে মুখর।

ওঁরা তাপদগ্ধ পায় হয়ে, বালির মূর্তিটি ছাড়িয়ে এবার তাঁরা খুব পুরনো একটা পাথরের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। এই পাথরের ইতিবৃত্ত লোকে এখন আর জানেনা। দেশের উদীয়মান লেখক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁরা এখন কথা বলছিলেন।

'প্রতিভাবান লোকে ভেবে আছেন' নিকোলাই বললেন, 'কিন্তু সব বিভিন্ন। এখন একটা ফ্যাশন হয়েছে যে গোটা চাই,—সব কিছুর জন্যই একটা পুরুষ সমাজ থাকা দরকার। এ কিন্তু ভাল নয়। বল মানেই সব সাধারণ লোক,—তাদের আদর্শ সোলোভিয়েভ, কাণ্ট বা মার্কস যে-ই হোন। কোনো একটা বড় সত্য, বা জ্ঞান, এ হল ব্যক্তি বিশেষের দান : তাঁর উদ্ভাবন ফল। আত্মপ্রকাশের সঙ্গে তখন তাঁর যেমনা কাজ এদের আর তাঁর উপলব্ধির তার এক নয়। আপনিই বলুন, পৃথিবীতে এমন বড় কি খুব বেশি যা একবাক্যে আমাদের বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ধারা দাবী করতে পারে। না। তার সংখ্যার এত নগণ্য যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমার মনে হয়, যা শাশ্বত তার প্রতিটি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শাশ্বত। যার অপর নাম জীবন। এর চেয়ে বেশী আর কিছু হতে পারে না। আমরা এই শাশ্বত ও সত্যের পূজারী,—যীশুকে বাইরে নয়, অন্তরের সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করব। কিন্তু আপনি নিশ্চয় বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু যা হয়, আমি যা বললুম একবর্ণও আপনার কানে যায় নি।'

'উহুঁহুঁ।' আইভানের গলা দিয়ে বেরুল।

লোকটি রোগা। হুকেশী। বয়স অধিক, ঠিক যান-বাহনের মত। হুঁচলো, কিরকম ছুঁই ছুঁই একটু দাড়ি, সেটির জন্য তাকে নিহিলের সময়ের একজন আমেরিকান বলে মনে হয়। সব সময় দাড়িটি তিনি মুঠো করে ধরে দাড়ির হুঁচলো দিকটা ঠোঁটে ঠোকরে খেলা করছেন।

'অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। এসব বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গী একটু আলাদা, তা আপনিও জানেন। কিন্তু আমাকে একটা কথা বলুন ত, ওরা যখন আপনার কাপড় খুলে নিচ্ছিল আপনার কিরকম লাগল। আমি যদি জেনে বলতে পারি যে আপনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা ওরা আপনাকে অভিসম্পাত দেয়নি?'

'তার মানে আপনি প্রসঙ্গটি বদলাতে চাইছেন, কেমন ত। আচ্ছা বেশ। কিন্তু না, অভিসম্পাত কেন। ওসব আজকাল কেউ করেও না। তবে ব্যাপারটি কিছু অপ্রীতিকর ত বটেই, পরিণামও খারাপ। যেমন বহুদিনের জন্য সিভিলসার্ভিস থেকে আমি বঞ্চিত হলুম, হয়তো বা সিটাডেল্-বার্গ যাওয়াও বারণ। কিন্তু সে সব কিছু না। আমি যে কথা বলছিলুম : যে যীশুর প্রতি মনে প্রাণে আমাদের আস্থাবান হতে হবে।

'কিন্তু আপনাদের আসল ব্যবসাটা কোথায়, আমি বুঝি।' নিকোলাই বলতে লাগলেন। 'দেখা যাচ্ছে যে ঈশ্বরকে না মেনেও বাঁচা যায়, কিন্তু অতি হলনা। ঈশ্বর আছেন কি নেই, বা থাকলেও কেন আছেন, তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। কিন্তু এদিকে মানুষের জীবনকে ইতিহাস বহির্ভূত একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলেও তাকা

যায় না। এখন ইতিহাসকে বাঁচতে হলে আবার ঐ রীতিতেই ফিরে আসতে হয়; কারণ ইতিহাস বলতে যা বুঝি তার সূচনা তাঁর কাল থেকেই, তিনিই তাঁর ধর্মবাণীর ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

'এখন ইতিহাস কী! না শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের চিন্তার যে-ধারা। কী, না মৃত্যু কি, তার জন্য কি উপায়ে তৈরি করা যায়, কি করে মৃত্যুকে জয় করা যায়, এই চিন্তার একটা ধারা। এই জন্যই মানুষের গান, তার কবিতা, জ্ঞান, অনন্তকে জানার সাধনা, বিজ্ঞানীর গবেষণা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঢেউর আবিষ্কার।

'কিন্তু এ সবেরই মূলে হল স্পিরিট,—সেই অতিজ্ঞানীয় শক্তি,—যেটি না হলে কোনোদিকে একটি পা-ও আপনার ফেলার হুকুম নেই। ঐশী শক্তিতে সম্পন্ন না হলে জ্ঞান বলুন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলুন, কোনো কিছুই সম্ভব নয়। কি হলে তা সম্ভব হয়, এ সবেরই নির্দেশ তাঁর ধর্মবাণীতে দেওয়া আছে।

'প্রথমটি প্রেম: পরস্পরের প্রতি মানুষের ভালবাসা।—এ একটি গভীর উপলব্ধি,—এবং জীবনে এর চেয়ে মহত্তর শক্তি আর কিছু নেই। ফুলের গন্ধের মত এ যদি মানুষের অন্তর একবার ভরে দিতে পারে ত তখন ফুল ছাপিয়ে তা প্রবাহিত হয় সারা বিশ্বের কল্যাণে।

'দ্বিতীয়টি হল, এ ফুলের দুটি সর্বোত্তম আবিষ্কার। দুটি আদর্শ,—যা বাদ দিয়ে আজ আর মানুষকে ভাবাই যায় না। এদুটির একটির নাম স্বস্তি,—স্বস্তির স্বাধীনতা,—বাঁচার আনন্দ, অধিকার, আনন্দময় জড়াই যে-বাঁচা। অন্যটি, ত্যাগ।—উৎসর্গ, সমর্পণ। স্ত্রী, না মানুষের কল্যাণে আমি আমার জীবনকে নিয়োগ করলাম। এই হল সর্বোত্তম জীবন।

'কিন্তু মনে রাখবেন, এসব কথা এখনও খুব নূতন। এবং তাই যদি হয় তাহলে সৌরাস্ত্রিক ফুল ফুটিয়েতে ইতিহাস ছিল না,—তাকেই নাম প্রাগৈতিহাসিক কাল। অত্যাচার, ঘৃণা, হিংসা, হত্যা, প্রভুত্ব, গন্ধর, এই প্রাগৈতিহাসিক যুগ পৃথিবীতে চলল বর্বরতার কাল। বেচারা ভার্জিলাস, আমরা দাস বলা এই যুগ মানুষটি কোনোদিন কল্পনাও করেনি যে মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখার মধ্যে কোনো বীরত্বই নেই। এর ফল তাকে যে কোনোদিন কেউ মুক্ত ভাবতে পারে, এমন সন্দেহ তার সারা জীবনে হয়নি। ঐ ব্রুত আর পাথরের স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে দেখুন, চিরদিনের জন্য ওরা ঐ অন্ধ বর্বর অত্যাচারিত যুগের মূক সাক্ষী হয়ে রইল।

'যীশুর আবির্ভাবের আগে সাধারণ মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার কোনো অধিকার ছিল না,—ক্রীতদাস দাসীরা তারা হীন জীবনযাপন করেছে, মরেছে কুকুরের মত। কিন্তু তিনি এসে তাদের মানুষের মর্যাদা দিয়ে গেছেন। সমাজে, ইতিহাসে, কর্মের কীর্তিতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।—কিন্তু উঃ, কী গরম, ঘেমে নেয়ে সেলাম। আর একটু বসলে হয়ত পাখা একটা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে!'

'তাহা, এরই নাম দর্শন। কিন্তু আমার আবার ডাক্তারের বারণ,—কাজ ওসব আমার হজম হয় না।'

'ভাল। আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। কিন্তু কী সুন্দর! বাঃ!' নিকোআই বললেন। 'যদিও জানি, প্রতিদিন এসব দেখে দেখে এখন আর আপনার চোখেই পড়ে না।

সামনেই নদী। সৌরের প্রতিফলনে নদীর জল উঠেছে জ্বলে, চোখে লাগে। আলোমাখা নদীর জল ঝিলমিলিয়ে উঠছে কিনারে একখানি ঘাতব চাদরের মত। হঠাৎ এই চাদর অনেকটা দূরে দূরে ভাঁজে ভাঁজে চৌচির হয়ে গেল: একসারি ঘোড়াতরী দেখা গেল নানা বোঝা নিয়ে ওপারের তীর লক্ষ্য করে পার হয়ে যাচ্ছে,—ওদিকে বোঝাই ঘোড়াটানা গাড়ি, ঘোড়া আর কারবাটি চলেছে পরিষার।

'আশ্চর্য, এখন ঘড়িতে মাত্র পাঁচটা।' আইভান বললেন। 'সিজারান থেকে এইসময় এই ট্রেণখানা আসে। ঠিক পাঁচটা পাঁচে ট্রেণখানা এখান দিয়ে পার হয়ে যায়।'

ট্রেণখানা এইসময় দেখা গেল; সমতল বিস্তৃত মাঠ পার হয়ে বয়ঘুরে, হলুদ-নীল রঙটানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তকতকে একখানা ট্রেণ দক্ষিণ থেকে সর সর করে পার হয়ে আসছে। এখান থেকে দেখাল একটি খেলনার মত। চলতে চলতে হঠাৎ ট্রেণটা কিন্তু থেমে গেল। এখান থেকে দেখা গেল এঞ্জিনের শাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে হু হু বেগে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। তারপর সাঙ্কেতিক সিটি।

'তাই অদ্ভুত ত! আইভান বললেন। 'ট্রেণখানা এখানে থামবার কথা নয়; নিশ্চয়ই একটা গোলমাল হয়েছে। না হলে অলাভদির মাঝখানে ট্রেণটা ওভাবে দাঁড়াবেই বা কেন। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কিন্তু চলুন, আমরা এবার যাই, চা'য়ে বসিগে।

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞপ্তি

চৈত্র সংখ্যার সহিত প্রায় সকল গ্রাহক গ্রাহিকাদের দেয় বার্ষিক চাঁদা শেষ হয়ে গেল। আমরা আশা করি যাঁরা এবৎসর গ্রাহক ছিলেন আগামী বৎসরও তারা গ্রাহক থাকবেন। এসম্পর্কে তাঁদের মতামত এপ্রিলের ১৬ তারিখের মধ্যে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। অন্যথা তাঁদের বৈশাখে ১৩৬৬র পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হবে। আশা করি ভিপি গ্রহণ করে আমাদের সহিত সহযোগিতা করবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ
অগ্রগামী

আমাদের দেখা কয়েকজন

যোগেশচন্দ্র বাগল

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে যখন প্রথম দেখি তখন তিনি প্রৌঢ়ে উপনীত। বেথুন কি প্রেসিডেন্সি কলেজ, ঠিক মনে নাই তিনি অধ্যাপনা কার্যে রত ছিলেন। 'প্রবাসী' ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তিনি পুস্তক সমালোচনা করিতেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক কাজেই দর্শনের বইয়েরই সমালোচনা করিতেন—ইংরেজী ও বাংলা মাসিক দুই খানিতেই। দোঁহারা চেহারা বেশ ফিটফাট, কিন্তু বিলাসিতার নাম গন্ধ তাতে নাই। মেধিতায় খুবই চটপটে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলেন না গল্পগুজবে কাল কাটাইতে অনভ্যস্ত; কাজ শেষ হইলেই চলিয়া যাইতেন; আসন গ্রহণ করিতে বড় একটা দেখি নাই। প্রবাসী আপিস তখন সুধী সমাগমে সরগরম ছিল। তখন যাঁহারা আসিতেন আজ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারত বিখ্যাত, পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া বিশ্ববিখ্যাতও হইয়াছেন কেহ কেহ। বাংলা রসসাহিত্যে গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে যাহারা বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এমন অনেকে এখানে হামেশা আসিতেন, গল্প গুজবে যোগ দিতেন। এখানে সময়ক্ষেপ করিতেন কত। কিন্তু এদিক দিয়া উমেশচন্দ্র ছিলেন অনন্যসাধারণ। তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন সবচেয়ে বেশি।

রাজসাহী কলেজ হইতে বদলী হইয়া উমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। তিনি ঢাকায়ও ছিলেন কিছু দিন, তবে বোধ হয় ইহার পূর্বে। কলিকাতায় স্থিত হইবার পর তিনি আমাদের আপিসে প্রায়ই আসিতেন, কিন্তু আচারআচরণে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ঐ সময়ে আমাদের মিলন ক্ষেত্র ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। এই স্থানে উমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিলাম। যেমন ফণীভূষণ তর্কবাগীশ তেমনি উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। উমেশবাবু দর্শনের অধ্যাপক হইয়াও কত রসিক। আরও দেখিলাম অধ্যাপক বলিয়া তাঁহার কোন অভিমান নাই। আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক তাঁহার ছাত্রমহল; কিন্তু আমাদের সঙ্গেও ব্যবহারে বিশেষ তারতম্য দেখি নাই। পরিষদে প্রবীণ দলের হাত হইতে নবীন দল ক্রমশঃ নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। 'প্রবীণ' বা 'নবীন' বলিলে কথাটা হয়ত ঠিক হইল না। উভয় দলেই প্রবীণ এবং নবীন দুই রকম লোকই ছিলেন। নূতন দল বা কর্মকর্তা এই রকম বলা বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। উমেশচন্দ্র নূতন দলে আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের কেমন যেন একটা আত্মিক যোগ সাধিত হইয়া গিয়াছিল, উভয়ের অলক্ষ্যেই। নিকট হইতে বুঝিলাম উমেশচন্দ্র বেশ সৎ এবং শক্ত প্রকৃতির লোক। যেখানেই গলতি বা অনিয়ম সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত। তিনি সরকারী কলেজের অধ্যাপক, কোথাও কোথাও স্কুল কমিটিতে

তিনি সরকার পক্ষে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া যাইতেন। অনেক নামজাদা লোক দেখিতেছি টাকাকড়ির ব্যাপারে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন্। তিনি নানা গলতি ধরাইয়া দিয়া অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছেন।

উমেশচন্দ্র ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ করেন। সে যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা সরকারী প্রশাসন বিভাগে প্রায়ই গৃহীত হইতেন। ডেপুটিগিরীতো ছিল মূলত কর্ম। উমেশচন্দ্র কোন প্রলোভনেই নিজের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বিসর্জন দেন নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছেন কলেজ হইতে তিনি মেটকাফ লাইব্রেরীতে চলিয়া যাইতেন এবং অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইতেন। দিনের পর দিন এইরূপ চলিত। মেটকাফ লাইব্রেরী বলিতে এ যুগের লোকেরা হয়ত ঠিক বুঝিবেন না। মেটকাফ হলে অবস্থিত কলিকাতা (পাব্লিক লাইব্রেরী), পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—এখন জাতীয় লাইব্রেরী, সাধারণের নিকট মেটকাফ লাইব্রেরী বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বিরাট প্রতিষ্ঠান পরে এল্গিন রোডে এবং বর্তমানে আলিপুর বেলভেডিয়ার প্রাসাদে স্থায়ীভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন উমেশচন্দ্রের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রৌঢ় বয়সে তাঁহাকে যখন দেখি, তখনও পুস্তকাদি পাঠে তাঁহার অবিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছি। দর্শনশাস্ত্রে তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার বাংলা রচনা ছিল সহজ, সরল এবং অনুপম প্রসাদগুণ বিশিষ্ট।

উমেশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যায়। তাঁহার বাংলা রচনার প্রতি আমরা সকলেই আকৃষ্ট হইলাম। 'প্রবাসী' ছাড়িয়া 'দেশ' সাপ্তাহিকে কর্ম লইয়া গেলাম। তখন ভাল ভাল লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ লিখাইয়া 'দেশে' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। মনে হয় উমেশ চন্দ্র তখন রাজসাহীতে, তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তিনি কলিকাতায় আসিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা আপিসে আমার সহিত দেখা করিলেন। তখন আনন্দবাজার রোটারী মেশিন সেখান একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়ায়। উমেশচন্দ্র ওখানে পৌঁছিলে তৎকালীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলাম। পরে তিনি আমার সহিত প্রেসে গিয়া রোটারী মেশিন দেখিলেন এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। উমেশচন্দ্র রাজসাহীতে ফিরিয়া গেলেন। সেখান হইতে আমার অনুরোধক্রমে একটি লেখা পাঠাইলেন দেশ সাপ্তাহিকে প্রকাশের নিমিত্ত। লেখাটির শিরোনামা স্মরণ নাই, তবে বিষয়বস্তু এই মর্মে ছিল যে—মুসলমান সম্প্রদায় গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে নানা অছিলায় অর্থ আদায় করে, হিন্দুরা কেন করিবে না? ধর্ম প্রতিষ্ঠান বা ঐ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদির কথাও ছিল ঐ প্রবন্ধটিতে। লেখাটি কম্পোজ হইল, প্রুফ উঠিল। আমি ওখানে সিরাজি মাস ছয়েকের। হালচাল তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে আমাদের উপর গবর্নমেণ্টের খবরদারি করিবার জন্য একব্যক্তি ছিলেন আলিপুরে। প্রবন্ধটি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইল। আভ্যন্তরীণ দিক হইতে সিডিশন রহিয়াছে এই প্রবন্ধে, অর্থাৎ হিন্দু গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্যগ্রহণের প্রস্তাব মাত্রেই আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা বিরোধী। কর্তৃপক্ষ আমাকে জানাইলেন এরকম লেখা প্রকাশ করা আদর্শ-বিরোধী, ভবিষ্যতে এরূপ অপরাধ ঘটিলে, তখন হইতে মুচলেকা দিবার সম্ভাবনা। এইরূপ 'ঘুষ' ভিরস্কারে আমাকে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ (একজন ভারতীয় এবং তিনি এখনও জীবিত) আমাকে অভিনন্দিত করিলেন। যাহোক করিয়া ওখানে রেহাই পাইলাম। উমেশবাবুকে লেখাটি ফেরত পাঠাইলাম। ফেরত পাঠাইবার কারণ লিখিতে হয় স্বভাবতঃ কিছু

লিখিয়াছিলাম। পরে দেখা হইলে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি যুগপৎ দুঃখ ও লজ্জা বোধ করিলেন। আমাদের ভিতরে ঘনিষ্ঠতা যেন ইহার পর আরও বাড়িয়া গেল। আমি জাতীয়তা লইয়া দীর্ঘকাল চর্চা করিয়াছি। ঐরূপ লেখা ছাপিলে 'জাতীয়তা' বিরোধী কার্য কিরূপে হইত এখনও ভাবিয়া পাইনা।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখেরও লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সে-ও ঐ দেশ সাপ্তাহিক প্রসঙ্গে। অধুনা-বিখ্যাত গল্প লেখক ও উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় আমার পূর্ব পরিচয়ের খাতিরে অনুরোধ পত্র পাইয়া শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশার্থ একটি গল্প পাঠাইলেন। উপরোক্ত খবরদারির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি গল্পটিকে 'অশ্লীল' বলিয়া অমনোনীত করিলেন। আমি পড়িয়া কিন্তু অশ্লীলতার নামগন্ধও পাইলাম না। যা হোক বিভূতিবাবুকে পত্রদ্বারা অমনোনয়নের সংবাদ দিলাম। তিনি পত্রোত্তরে লিখিলেন, আমি যেন ঐ লেখাটি অবিলম্বে 'প্রবাসীর' জন্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করি। প্রবাসী আপিসে গল্পটি যথাসময়ে পাঠাইয়া দিলাম, পরবর্তী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উহা যথারীতি ছাপাও হইয়া গেল। তখনও সম্পাদক রামানন্দ বাবু সুস্থ এবং সকলবিষয়ই নিজে দেখাশুনা করিতেন। আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে ভাবিতেছি, শ্লীলতা অশ্লীলতার মাপকাঠি কোথায় টানা যায়? রামানন্দবাবু সুনীতিপরায়ণ, তাঁহার কাগজ প্রবাসী প্রথম শ্রেণীর পরিচ্ছন্ন পত্রিকা; এই কাগজের পক্ষে যাহা 'অশ্লীল' হইল না, উক্ত খবরদারি ভারপ্রাপ্ত মানুষের নিকট তাহা অশ্লীল বিবেচিত হইল।

এখন আবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্। উমেশচন্দ্র অবসর লইয়া কলিকাতায় স্থিত হইলেন। তিনি প্রবাসীতে যেন কয়েকটি মনোজ্ঞ অথচ মনরোপযোগী প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ হইলেও সবই সরল, হাল্কা ও বিরূপ ভূষণ পরিচ্ছন্ন। তাঁহার বক্তৃতাও একবার শুনিয়াছি। এলবার্ট হলে বোধ হয়—তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা। কি উপলক্ষে ঠিক মনে নাই। ইংরেজীতে অনর্গল বলিয়া গেলেন। দুরূহ বিষয়ের অত চমৎকার ব্যাখ্যা খুব কমই শুনিয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্যের (তখন অবসর প্রাপ্ত) ধর্মভিত্তিক ইংরেজী বাংলা বক্তৃতা শুনিয়াছি। কি চমৎকার ব্যাখ্যান! উমেশচন্দ্রের ব্যাখ্যানও ঠিক এই ধরনের ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি প্রায়ই আসিতেন। তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন কয়েক বৎসর। মধ্যে পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক এবং পুথিশালাধ্যক্ষও হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্মতৎপরতা, কর্তব্যপরায়ণতা আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। কলিকাতায় বাসভবন নির্মিত হইলে তাঁহার আহ্বানে একবার সেখানে যাই এবং নানা রকম কথাবার্তায় কিছুক্ষণ কাটাই। যেমন বাহিরে তেমনি বাড়ীতে উমেশচন্দ্র ছিলেন দিলখোলা মানুষ, মুখে মৃদু হাসি লেগে লাগিয়াই থাকিত।

দীর্ঘকাল অধ্যাপনা কার্যের পর উমেশচন্দ্র কলিকাতায় অবসর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন ইহাই হয়ত তাঁহার মনোগত বাসনা ছিল। বহু বৎসরের অধ্যাপন অনুধ্যানের ফলে তাঁহার চিন্তায় স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর এই সকল ক্রমে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, এই সমুদয় রচনা তাঁহার কোন কোন পুস্তকেও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী তাঁহার দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত রচনাবলীর কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু উমেশচন্দ্রের এই প্রকার সাহিত্য সাধনায় অকস্মাৎ ছেদ পড়িল। তিনি রক্তস্বল্পতার চাপে ভূগিতেছিলেন। ইহার আক্রমণে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। উমেশচন্দ্র এই যে শয্যাগ্রহণ করিলেন তাহা হইতে দশ বৎসরের মধ্যে আর উঠিতে পারেন নাই। অসুখের মধ্যে প্রথমবার তাঁহার সহিত

যখন দেখা করিতে যাই তখন তিনি কতকটা স্থবির হইয়াছিলেন। কত কথাই না তিনি বলিলেন, কথার মধ্যে হাস্যরসও প্রচুর। দ্বিতীয়বার যখন যাই তখন তিনি ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তখন আমি বেথুন কলেজের ইতিহাস সংকলনে ব্যাপৃত আছি। এক তত্ত্বমহিলার অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিকতা সম্বন্ধে কোন পুস্তক রচিত হইয়াছে কিনা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করি। তিনি চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার্‌দির একখানি পুস্তক আমাকে দিলেন। ঐ পুস্তকখানি আনিয়া উক্ত তত্ত্বমহিলাকে দি। ইহার পর উমেশচন্দ্রের সহিত আর একবার সাক্ষাৎ করি। তখন তাঁহার হাত-পা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মাথাটি মনে হয় কত বড়। তিনি কথা বলিতে চাহেন, কিন্তু বলিতে কতই না কষ্ট হয়। এই রকম কষ্ট দেখিয়া পরে আর যাই নাই। তাঁহার এই অসুস্থতার মধ্যেই সহধর্মিণী মারা গেলেন। বুঝিলাম উমেশচন্দ্র আর বেশি দিন ইহজগতে থাকিবেন না। হইলও তাহাই। উমেশচন্দ্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখ এখনও যেন চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ কথা এখনও যেন কানে বাজিতেছে।

রাধাচরণ চক্রবর্তী

গুরুর অনুসন্ধানে পিউনি ফুল ফোটে, বিচক্ষণ বন্ধু ও মাতুলী ধারণাইয়া ওকাইয়া যায়। একাট অকবি, কিন্তু সমঝদার। এইরূপে ছেলেবেলায় প্রবাসীর পাতায় দু' লাইনের কবিতা দেখিতাম অনেক। পড়িতাম, পড়িবার পরও যেন ভাল লাগিত। কিন্তু ঐ পিউনি ফুলের মত যেন কাহারও, অন্য যাহা ছাপা হইত তাহার মধ্যে তো মনে পড়ে না। এই দু' লাইনের কবিতাগুলির রচয়িতা দুজন—রাধাচরণ চক্রবর্তী ও চণ্ডীচরণ মিত্র। মিত্রজা বহু পূর্বে মারা গিয়াছেন। সে যুগে বহু সাহিত্য রচনা করিয়া যেন খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রাধাচরণ চক্রবর্তী গত হইয়াছেন আর পনের বৎসর পূর্বে। তাঁহার কথা বোধহয় এখন লোকে খুবই জানেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন জানিতেন তাঁহারা কি তাঁহাকে ভুলিতে পারেন? কি জানি কেন কবি রাধাচরণ আমার চিত্তে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। একটি কারণে তাঁহার নিকট আমি বড়ই কৃতজ্ঞ। কি কারণ ক্রমে বলা যাইবে।

রাধাচরণ ছোট কবিতা লিখিতেন, বড় কবিতাও লিখিতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু স্বল্প পিউনি ফুলের মত তাঁহার দু'লাইনের মিষ্ট কবিতাগুলিই প্রথমে আমাকে তাঁহার কবি-মানসের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়। তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখি বহু পরে, তখন আমি 'প্রবাসী' 'মডার্ণরিভিউ'এর সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছি। রাধাচরণ মাঝে মাঝে প্রবাসী আপিসে আসিতেন। ঐ সময় তিনি বঙ্গলক্ষ্মী সম্পাদনার লিপ্ত ছিলেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকা। ওজস্বিনী মন্ত্রের অগ্নিবর্ষিণী মহিলা পরিচিতির মুখপত্র। সম্পাদক হিসাবে রাধাচরণ চক্রবর্তীর নাম থাকিত কিনা মনে নাই তবে তিনি আসলে উহা সম্পাদনা করিতেন একথা শুনিতাম। বেটে আদমী, কম কথা কম বলেন, কিন্তু বুদ্ধি তীব্র। চলনে বলনে কি রকম একটা কবিসুলভ চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা। বঙ্গলক্ষ্মী তখন বেশ জাঁকালো হইয়া উঠিয়াছিল। ভাল ভাল লেখকের রচনায় ইহা পুষ্ট হইত। বুঝিতাম রাধাচরণ বাবুই উহা সংগ্রহ করিতেন। প্রথম যুগের লাইনগুলি খুবই মূল্যবান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে অ-নামা পত্রিকার মত স্বীনাভাবের অজুহাতে "weed out" করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে দেখিয়াছি কোন কোন প্রতিষ্ঠান লেখকও বঙ্গলক্ষ্মীর পুরানো ফাইল দেখিবার জন্য চাহু করিতেছেন। রাধাচরণ বাবুর অনুরোধেই বঙ্গলক্ষ্মীর

সহকারী সম্পাদকরূপে আসিল জ্ঞান বেন শ্রীযুক্ত কান্তনী মুখোপাধ্যায়। তিনিও কবি কিন্তু বর্তমানে কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়া নাম করিয়াছেন। তিনি রাধাচরণের সম্পাদনা কার্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারিবেন।

"রাধাচরণ 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবে পরিত্যাগ করিলেন বলিতে পারিব না। সে অনেক দিনের কথা, হয়ত তখন তুমিয়া থাকিব, এখন কিছু সঠিক মনে নাই। কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল রাধাচরণ বাবুকে দেখিবারই অনেক দিন। আমার কর্ম জীবনেই কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রবাসী হইতে দেশ সাপ্তাহিকে চলিয়া যাই। সেখানে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। একদিন বসে বসিয়া আছি, দেখি রাধাচরণ বাবু হঠাৎ আমার নিকট আসিলেন। কুশলবার্তা বিনিময়ের পর তিনি বলিলেন "আমি একটি ছেলেদের কাগজের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছি; আপনাকে এই কাগজে কিছু লিখতে হবে।" আমি তো অবাক। আমি লিখি বটে কিন্তু ছেলেদের জন্য তো কিছু লিখি নাই। তিনি বলিলেন "মোহনলাল বাবু আপনি আমার কাগজে লিখুন, মনে করলেই ছেলেদের মত করে আপনি লিখতে পারবেন।" তাঁহার কথায় বুঝিলাম তিনি আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত। প্রবাসীতে থাকিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত হই। আবার ওখানে থাকিতেই বৈদেশিক রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কিছু লিখতে সুরু করি। তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইটালি সৈন্য পাঠাইয়া নিরস্ত্র আবিসিনিয়া ক্রমে দখল করিয়া লইতেছে। নানা পত্র পত্রিকা এবং পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আবিসিনিয়া দেশ ও হাবসি জাতি সম্পর্কে কত প্রবন্ধ তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। কেহ কেহ প্রধানত এই প্রবন্ধগুলির উপর নির্ভর করিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কেহ কেহ স্বীকার করিতেন, কেহ বা করিতেন না। আন্দাজে বুঝিলাম, রাধাচরণ বাবু তবু আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত বন তিনি এরূপ বিশ্লেষ ভাবে অনুধাবনও করিয়াছেন। আমি ছেলেদের জন্য এ যাবৎ কিছু লিখি নাই তাহা সত্ত্বেও তাঁহার পীড়াপীড়িতে অগত্যা রাজী হইলাম। তাঁহার কাগজে ছেলেদের মত করিয়া প্রথম লিখিলাম, যতদূর মনে হইতেছে সেটি ছিল মেসিনি সম্বন্ধে। হিটলারের জীবনীও বোধ হয় পরে লিখিয়াছিলাম।

কিছুকাল যায়। দেখি রাধাচরণ বাবু পুনরায় আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ঐ কাগজের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে তিনি নানা কারণে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার সম্পাদনায় আর একখানি মাসিক বাহির হইয়াছে নাম "অগ্নি"। এখানি বিশুদ্ধ ছেলেদের কাগজ নয়। বড়দের লেখা ইহাতে চলিবে। আমি সম্মত হইলাম। মুসোলিনীর আত্মজীবনী (ইংরেজী) পড়িয়াছিলাম। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইয়া যাই। মুসোলিনী আদতে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক তাঁহার রচনায় সাহিত্যিক প্রসাদগুণ পরিপূর্ণ। ইংরেজী অনুবাদ এত ভাল, না জানি মূল ইহা অপেক্ষা আরও কত চমৎকার। আর একখানি আত্মজীবনী পূর্বে পড়িয়াছিলাম ট্রটস্কীর "My life" কত ভাল লাগিয়াছিল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। মুসোলিনীর আত্মজীবনীতে প্রথম পড়িলাম—"Music of the Machine" বা যন্ত্রের তানের সমন্বিত সঙ্গীত। মুসোলিনী এখানেও সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। পড়িবার সময় পাঠকও যেন ঐই সঙ্গীত শুনিতে পান। নূতন পরিবেশে আত্মজীবনী লেখা যন্ত্রের ছড়াছড়ি। মুসোলিনী ক্ষুব্ধ করিয়াই রাষ্ট্রনেতা হইয়াছিলেন। আর ইহাই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের অপমৃত্যু ঘটাইল। তিনি রাষ্ট্রনেতা না হইলে নিশ্চয় সাহিত্য কতই না সমৃদ্ধ হইতে পারিত। মুসোলিনীর জীবন-কথা পড়িয়াছি একখানি ইংরেজী বইয়ে এখানি সমসাময়িক যাবতীয় নেতাদের জীবনী-গ্রন্থ। রাধাচরণ বাবুর

'অগ্নি' পত্রিকায় মুসোলিনী শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলাম। তিনি রক্ত-খুশী হইলেন।

ঐ সময়ে শুধু লিখিতাম। পুস্তক প্রকাশিত করিব ইহা কখনও ভাবি নাই। ছেলেদের পাঠোপযোগী কয়েকটি জীবনী প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই লেখা হইয়াছে। বন্ধুবর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন বলিলেন "এগুলি দিয়ে তো বেশ একখানি বই হয়। বই প্রকাশ করুন না।" শিশুসাহিত্য লিখিয়া খগেনবাবু তখনই বেশ নাম করিয়াছেন। বড়দের জন্যও তিনি গল্পাদি লিখিতেন। শিশু মনোহারী গল্প রচনায়ই তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি একদিন তাঁহার জানা প্রকাশকের নিকট আমাকে লইয়া যান। প্রকাশক পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর কথা শুনিয়াই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার একটি মত বড় 'ক্যাচ্,' চলিত ভাষায় সব লিখিতে হইবে। আমি 'বাঙাল' মানুষ, কলকাতা বা রাঢ়ের চলিত ভাষায় লেখা কি আমার কাজ? যা'হোক করিয়া লেখাটি চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করিলাম। পাঠ করিয়া বুঝিলাম বিপদ উৎরাইতে পারিয়াছি। এই প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত আমার কয়েকখানি ছেলেমেয়েদের বই একে একে লিখিলাম। "সাহসীর জয়যাত্রা" নামে এই জীবনী প্রবন্ধগুলি গ্রথিত হইয়া প্রথম বাহির হইল। তখন স্বতঃই মনে হইতেছিল রাধাচরণ বাবুর কথা "আপনি মনে করলেই ছেলেদের উপযোগী করে লিখতে পারবেন।" 'সাহসীর জয় যাত্রা' বইয়ের ভূমিকায় রাধাচরণ বাবুর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিলাম। এই বইখানির এক সময় খুব কাটতি হইয়াছিল। বইখানি এখন আর চালু নাই। এ কারণ রাধাচরণ বাবুর কথা এখানে বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। খগেনবাবু কীর্তিমান, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা এখনও সমভাবে চলিতেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অগ্নি বেশি দিন টিকিল না। ইহার পর রাধাচরণ বাবু কোন পত্রিকার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতাম, খুবই দীন, কাপড়চোপড়ও জীর্ণ। বুঝিতাম তিনি অত্যন্ত বিপদের মধ্য দিয়া চলিতেছেন। কিন্তু মুখের হাসিটি আগেকার মতই লাগিয়াই ছিল। একবার শুনিলাম তিনি কতকগুলি বস্ত্রব্যাসও করিয়া ফেলিয়াছেন। বিপদ কখনও একাকী আসে না। পরে শুনিলাম, রাধাচরণ চক্রবর্তী আর ইহ জগতে নাই। রাধাচরণের জীবনটাও ছিল ঐ শিউলি ফুলের মত। অবস্থা বিপর্যয় না ঘটিলে তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাণীর সেবা করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখ করিয়া আজ আর লাভ নাই। রাধাচরণকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

বটুকদেব মুখোপাধ্যায়

বটুকদেব মুখোপাধ্যায়কে অনেকে হয়ত জানেন না। তাঁহার নাম খুব কম লোকে শুনিয়া থাকিবেন। এই কম-জানা স্বল্প পরিচিত ব্যক্তিটি আমার মনে এক গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিয়া রাখি।

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেন নাই বাংলা দেশে এরূপ লোক বিরল। ভূদেববাবু শেষ জীবনে হুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে বসুধে কাটাইয়াছেন। ঐ সময় এক-বার কিছুকালের নিমিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বাড়ীর অনতি-দূরে বাসাবাটিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। উভয় পরিবারে তখন খুবই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ভূদেব বাবুর দুই পুত্র—গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় ও বটুকদেব মুখোপাধ্যায়। বটুকদেব গোবিন্দদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বটুকদেবের বার তের বৎসর বয়সে পিতামহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, পিতামহ নাট্টি-নাতনীদের লইয়া নানারূপ গল্পগুজব করিতেন। তাঁহার গল্পের মধ্যে কত উপদেশ।

তাঁহাদের শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন পিতামহ ভূদেব।

ভূদেববাবুর একটি সুসমৃদ্ধ পারিবারিক গ্রন্থাগার পৌত্র বটুকদেব সযত্নে আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন চুঁচুড়ার বাসাবাটীতে সপরিবারে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন ভূদেব লাইব্রেরী ও আমাদের যোগসূত্র। দীনেশবাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই গ্রন্থাগার হইতে নিজ দায়িত্বে অনেক বইপত্র আনিয়া দিতেন। ক্রমে তাঁহার মারফত আমিও কিছু কিছু বই আনাইতে থাকি। ১৯৪৪ কি ৪৫ সন হইবে, হিজলমেলার মালমশলা সংগ্রহের জন্য "সাধারণী" সাপ্তাহিক দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' সম্পাদনা করিতেন। আগে দীনেশ বাবুর দ্বারা তাঁহার পুত্র শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের গৃহে 'সাধারণী' দেখিতে যাই। 'সাধারণীর' ফাইল দেখিয়া অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন করি।

এইবার ভূদেব লাইব্রেরী দেখার সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। দ্বিতীয়বারে শুধু ভূদেব লাইব্রেরী দেখিবার উদ্দেশ্যেই চুঁচুড়ায় গেলাম। ইতিমধ্যেই এই গ্রন্থাগারের কিছু কিছু বই দীনেশবাবুর সহায়তায় আনাইয়া লইয়াছিলাম। বটুকদেব একথা জানিতেন। তাঁহার বাটীতে গ্রন্থাগার দেখিতে যাইব, বটুকবাবু একথা দীনেশবাবুর মুখে শুনিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে চুঁচুড়ায় গেলাম। যতদূর মনে হয় তখন চৈত্র মাস। রোদের খুব প্রখরতা। দুপুর বেলা আহারে বসিয়াছি, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পলদ্ঘর্ম হইয়া আসিয়া নিম্নতলে যে ঘরে বসিয়া আমরা আহারে লিপ্ত সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ঢুকিয়াই ঐ ঘরে রক্ষিত তক্তপোষে শুইলেন বিশ্রামের জন্য। দীনেশচন্দ্র স্বাভাবিক মৃদুস্বরে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখন জানিলাম ইনি ভূদেববাবুর পৌত্র বটুকদেব মুখোপাধ্যায়। আমরা তো গ্রন্থাগার দেখিতে যাইবই তবু তিনি কেন অত রৌদ্রে কষ্ট করিয়া আসিলেন বলায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এমন কি কষ্ট হয়েছে, মন বল্‌ল তাই চলে এলাম।" আহারাদি সারিয়া খানিক বিশ্রামান্তে আমরা একযোগে ভূদেব ভবনের দিকে চলিলাম; মনে হইল তীর্থ দর্শনে যাইতেছি।

ভূদেব ভবনের দ্বিতলে গ্রন্থাগারটী সংরক্ষিত। পারিবারিক গ্রন্থাগার ইতিপূর্বে যতগুলি দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এটি শুধু সমৃদ্ধই নয়, সযত্নে রক্ষিত দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। দীনেশবাবু ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রন্থাগারটি আমাকে দেখাইলেন। এখানে এমন কিছু বই ও পত্র পত্রিকা আছে যাহা ভূভারতে কোথায়ও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। দীনেশবাবু বলিলেন হয়ত লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে থাকিতে পারে। কিন্তু এদেশে কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল। প্রথম শিক্ষকার বহু বৎসরের ফাইল ভাল বাঁধাই অবস্থায় এখানে পাইবেন। আরও এমন কতকগুলি পত্রিকার ফাইল এখানে রক্ষিত হইয়াছে যাহা অন্য কোথায়ও পাওয়া আর সম্ভব নয়। হিজলমেলার প্রথম শিক্ষকার ইতিহাস রচনায় এই সকল পত্র পত্রিকার ফাইল হইতে বিস্তর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এ বিষয়ে আরও কিছু পরে বলিব।

নৈহাটির পথে কলিকাতায় ফিরিব। ও-পথে এই নূতন যাইতেছি। গঙ্গা পারাপার হইতে হইত খেয়া-নৌকায়। সেতু চালু হইয়াছে এই সবে ক'বৎসর যাবত। বটুকদেব ও দীনেশচন্দ্র খেয়া ঘাটে আসিলেন। আমি নৌকায় উঠিতে যাইব এমন সময় বটুকদেব বলিলেন "আমিও আসি। নৈহাটীতে পুরিশাস্তুরীকে একবার দেখে আসব।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার খুড় শ্বশুর এইরূপ যেন আমাকে বলিয়াছিলেন। সভা পার হইয়া বটুকদেব আমার সঙ্গে বরাবর আসিলেন। তিনি আমার হইয়া টিকিট কিনিলেন। ওভার ব্রীজ পার হইয়া বিডি ষ্ট্রাটফরমে আমাকে লইয়া গেলেন। গাড়ী তখনই প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া। তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে ঢুকিয়া নিজে আমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; বটুকবাবু যদি আমার সঙ্গে না থাকিতেন তাহা হইলে ঐ সময় তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ী ধরা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব হইত না। সারাপথ বটুকদেবের সৌজন্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া ফিরিলাম। বুড়ি-শাশুড়ীকে দেখা তো উপলক্ষ্য; তাঁহার সঙ্গ ছিলাম আমি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কি প্রবাসী আপিসে ঠিক স্মরণ নাই একদিন দীনেশবাবু আমাকে বলিলেন বটুকদেব বলিয়াছেন এবারে যেদিন চুঁচুড়ায় যাইব তাঁহার সঙ্গে বসিয়া তাঁহারই বাড়ীতে আহারাদি সেব করিতে হইবে। বটুকবাবুর অনুরোধ অপর পক্ষে আসেন। সানন্দে তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। চুঁচুড়া তো আমার একটা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সেখানে রহিয়াছেন সুপণ্ডিত দীনেশচন্দ্র আর সৌজন্যের প্রতীক বটুকদেব। চুঁচুড়ায় গেলে বরাবর দীনেশবাবুর বাড়ীতেই প্রথমে উঠিতাম। এবারেও গেলে দীনেশবাবুর বাড়ী হইতে ভূদেব ভবনে তাঁহার সঙ্গে যাই। নিজের জন্য সমাপনান্তে বটুকদেব, তাঁহার পুত্র ও আমি একসঙ্গে আহার কার্য সমাধা করিলাম। তিনি প্রসঙ্গতঃ তাঁহার প্রথম জীবনের কথা বলিলেন। বটুকদেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। রসায়নে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া তিনি এম, এ পাশ করিয়াছিলেন। বয়স স্মরণ হয় তখন এম-এস-সি হয় নাই। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি কর্মত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আর কোন কাজে লিপ্ত হইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না।

ঐ দিন আহারের পর তাঁহার একটি বিশেষ হবির কথা প্রথম জানিলাম। দেশ বিদেশের ডাক টিকেট সংগ্রহ করা এদেশেরও অনেকের তখন হ'বি বা বাতিক (অবশ্য ভাল অর্থে) হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাহির হইতে দেখিয়াছি। বটুকদেব বিজ্ঞানের ছাত্র। তিনি ডাক টিকিট সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এমন সুন্দর করিয়া সাজান যে দেখিলে চোখ জুড়ায়। তিনি বহু দেশের যতরাজি ডাক টিকেট আমাকে দেখাইলেন। তাঁহার পুত্রও এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ডাক টিকেট সম্পর্কে তিনি অনেক লিটারেচার সংগ্রহ করিয়াছেন। একখানি বড় বই আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, এখানা ডাক টিকিটের অভিধান—ডাক টিকিটের জন্মকথা, ক্রমিক বিবর্তন, উন্নতি, বর্তমান রূপ—কত কি কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। আমার ডাকটিকিটের ছবিও দেখিলাম প্রচুর। এই হবি বা বাতিক্‌কে বটুকদেব নিতান্তই সহজ করিয়া লইয়াছিলেন। আমাকে সব দেখাইতে ও বুঝাইতে তাঁহার কতই না আনন্দ। তাঁহার কথা মনে হইলেই অন্যান্য বিষয়ের মত তাঁহার ডাক টিকেট সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহের কথাও মনে পড়াই উচিত হয়। দীনেশবাবুকে পরে তাঁহার এই ডাক টিকেট হবির কথা বলিয়াছিলাম। তাঁহাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া বুঝিলাম তিনিও এ বিষয়ে জানেন।

বটুকদেবের আগ্রহাতিশয়ে ভূদেব স্মৃতি সভা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম এই সভাটি নিয়মতন্ত্রের একটি প্রশস্ত কক্ষে হইত। একবার সভাপতিত্ব করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। বটুকদেবের

আমন্ত্রণে আমিও সভায় যোগ দিয়াছিলাম। দীনেশবাবু ভূদেব প্রত্নাগার হইতে একখানি বই আনিয়াছিলেন। বইখানির নাম মনে নাই। বোধ হয় সিন্ধু-অভিযান সম্পর্কে কোন গ্রীসের ঐতিহাসিক কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত। ভূদেব বাবু বইখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রতি পৃষ্ঠার মার্জিনে নিজ মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দীনেশবাবু এই মন্তব্যগুলির কিছু কিছু পাঠ করিয়া ভূদেবের অনুসন্ধিৎসু ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলেন। ভূদেববাবু সম্পর্কে আমিও যৎসামান্য বলিয়াছিলাম। সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় নিজ ভাষণে আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শুনাইলেন। তিনি সংস্কৃত অধ্যাপন করেন কাশীতে। ভূদেব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যানাথ-ট্রাষ্ট হইতে বৃত্তি পাওয়ায় কাশীতে তাঁহার পক্ষে অবস্থান এবং অধ্যয়ন সম্ভব হইয়াছিল। বিদ্যানাথ ট্রাষ্টের কল্যাণে কত ছাত্র যে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য অধিগত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সভা অন্তে আমরা স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলাম। এখন ভূদেব স্মৃতি সভা একটু জাঁকাল রকমের হইয়া উঠিয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে পুনরায় ভূদেব স্মৃতি সভায় যোগ দিয়া ধন্য হইয়াছি। বটুকদেব এই স্মৃতিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই সভার সঙ্গে বটুকদেবের নামও জড়িত থাকিবে নিশ্চয়।

বটুকদেবের সাহিত্যিক প্রীতি ছিল অসাধারণ। দীনেশবাবুকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের মত অল্প বয়স্কদেরও তিনি কম প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। ভূদেব প্রত্নাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পত্রপত্রিকা দীনেশবাবুর মাধ্যমে আমরা পাইতাম বটে, কিন্তু এ ব্যাপারেও বটুকদেবের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। বহু মূল্যবান অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম তিন বছরের ফাইল ভূদেব লাইব্রেরি হইতে প্রথম ব্যবহার করিতে পাইলাম দীনেশবাবুর সহায়তায় এবং বটুকদেবের প্রীতিপরায়ণতার দ্বারাই। একথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার না করিলে বিশেষ অন্যায় হইবে। পত্রিকা হইতে কতকগুলি বিষয় সংকলন করিয়া "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" নামক একখানা পুস্তক প্রকাশিত করি। ইহাতে বটুকবাবুর প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করিয়াছি। পুস্তকখানি পাইয়া তিনি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সহকাল কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিতে পারি নাই। একদিন শুনিলাম বটুকবাবু মরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল পরে আরও শুনিলাম ঐ মূল্যবান প্রত্নাগারটি তালা বন্ধ। বিদ্যার এই অমূল্য ভাণ্ডারটিকে কি আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়? আজ যখন তৎকৃত আদেকার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করি তখন হৃদয় কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া উঠে।

সেতু

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

দৃশ্যপটে রাত্রি নামে ছায়াকালো আকাশের সুর।
মেঘেরা সান্ত্বনা হ'য়ে ঘোমটাটানে সলাজ বধূর ;
হঠাৎ চপলমতি ছুটে চলা হাওয়ার পলক,
ছুঁয়ে যায় তনুমন, সাড়া দেয় সিঁথির অলক।

ভাবনা কাঁপানো বুক স্থিরচিত্র রাতের পাড়ায়
দু'চোখে সমুদ্র খোঁজে মুক্তনীলে দু'হাত বাড়ায় ;
প্রত্যহের প্রার্থনায় দৃশ্যপটে রাত্রি নেমে আসে
সর্ষাতারা জেগে ওঠে সুদূরের বুকে কলধ্বনি
দিওনা যন্ত্রণা আর নাগরিক তপ্ত নিঃশ্বাসে—

নিভৃত দুয়ার খুলে দিয়েছিতো হৃদয়ের মণি,
তবুও আসেনি তরী : স্বপ্ন চোখে বিপুল সুদূর
অথচ সমুদ্র চোখে দৃশ্যপটে ভালোলাগা সুর।

উত্তরণ

ঐতিহাসিক উপন্যাস

দুর্বাদুয়ারী

। শীলিতা সেনগুপ্ত ।

"বাপ্‌রে! আজকেই মিসির পাহাড় না দেখলে চলছিলো না। দিদি গল্প জমেছিলো বেশ বুঝি দিয়ে—" ক্লার্কস হোটেল পর্যন্ত উঠেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললো তোলাদা। মিলি চঞ্চলা হরিণীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলো। ঘাড় ফিরিয়ে বললো, "এরই মধ্যে তোমার হাঁপ ধরলো তোলাদা? কৈ আমার তো কিছু হয়নি?" তোলা দাঁড়িয়ে প'ড়ে, ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিলো, লম্বা বাস্‌টেনে বললো, "তোর শরীরে আছে কি যে হাঁফ ধরবে? শুধু বাতাসই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে তোকে।"

শ্যামল উত্তর দিলো তবেই হয়েছে যে, আজকে তোমাদের হনুমান মন্দিরে যাওয়া—সে তো একেবারে খাড়োর মাথায়, চলো চামেলি, আজ আমরা ফিরি তাহলে—"

"না শ্যামলদা, এখুনি ফিরবো না। আস্তে আস্তে যাই চলুন।" মল্লিকার কণ্ঠস্বরে অভিমান ধ্বনিত হলো। চামেলি সভয়ে তাকালো বোনের দিকে। তারপর তোলাদাকে উদ্দেশ করে বললো, "এখন তো আমরা ম্যাল্ দিয়ে হাঁটছি, এখন তোমার কোন কষ্ট হবে না তোলাদা। যদি এরপর চড়াইতে খুব কষ্ট হয় তোমার, তাহলে আমরা না হয় দু পয়সার ঘুগ্‌নি দিয়ে বলবো। ওরা ঘুরে আসবে হনুমান —মন্দির।"

"দু পয়সার ঘুগ্‌নি আবার বলবে কি দিদি? সেটা কি জিনিষ?" মল্লিকা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

"কোন মন্দির নিশ্চয়ই। মন্দিরের বাইরে আছে ঘুগ্‌নিকাঠির ব্যবস্থা। দর্শনী হিসেবে দু পয়সার একটা কাঠি কেনো, কিনে জ্বালাও···তবে বসতে পাবে মন্দিরের চাতালে—" চামেলি উত্তর দেবার আগেই ব্যাখ্যা করলো তোলা। শ্যামল-চামেলি দুজনে হেসে উঠলো একসঙ্গে।

"কী তবে?" তোলার অপ্রতিভ প্রশ্ন।

"একটা ছোটখাটো পার্ক গোছের। ওখানে রোদ থাকে নারাদিন। বহু লোক মেয়ে-পুরুষ-বুড়ো-বাচ্চা সবাই সময় পেলেই ওখানে গিয়ে বসে থাকে। পাঞ্জাবীদের তো খাওয়ার হাঙ্গামা নেই মোটেই। প্রচুর সময় পায় মেয়েরা। ওখানে বসে বসে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেবল উল বোনে। ঐ পার্কের প্রবেশ মূল্য দু পয়সা। রোদ কে ওরা বলে ঘুগ্‌নি। তাই ওই পার্কের চলতি নাম হয়েছে দু পয়সার ঘুগ্‌নি।" শ্যামল উত্তর দিলো হাসতে হাসতে। লালা লাজপত রায়ের ষ্ট্যাচুর সামনে ওরা এতক্ষণে এসে পড়েছে। এ জায়গাটাকে ম্যালের সেনহীল বলা হয়। ম্যালের একপাশে আগাগোড়া বড় বড় দোকানের সারি। চোখ ধাঁধানো মনোহর জিনিষের সমাবেশ সমস্ত দোকানে। আর কী সুন্দর করেই না সাজিয়েছে। খুব সুন্দর। সাজানোর গুণে জিনিষগুলো যেন ছবি হ'য়ে ফুটে উঠেছে। একটু পরে মল্লিকার মনে হলো সমস্ত জিনিষেরই দৃষ্টি গায়ে গায়ে রং। দোকান থেকে চোখ সরাতেই মল্লিকার চোখ আটকে গেলো পঞ্জাবীদের বেশভূষায়। অদ্ভুত বিচিত্র রংএর পোষাক পরেছেন পাঞ্জাবী মেয়েপুরুষ সকলেই। তরুণ, তরুণীদের প্রায় ওঠেই না এখানে, যেখানে

পঞ্চাশের উর্ধ্ব বয়সের মেয়ে পুরুষে পাহাড়িয়ে ভগ্নদেহে রঙীন পুরিচ্ছদ প'রে ম্যালের মতো প্রকাশ্য জায়গায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না তো? ওদের এই সময় প্রসাধন, এই অপরূপ সাজসজ্জা মানিয়ে গেছে যেন এই পরিবেশে। যেন তাঁকে তাঁকে ভটীন প্রজাপতি ঘাসফুলা পাখা মেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কোন রাজ্য? প্রত্যেকেই প্রত্যেকটি কথা শেষ করে মিষ্টি হয়ে হেসে উঠছে, টেনে টেনে হাসছে আর হাসছে। আর হাতখানা মেলা করেই আছে করমর্দনের জন্য। এখানে দুঃখ কষ্ট নেই নাকি? পরে অবশ্য মল্লিকা বুঝে ছিলো ম্যালের অভিজাত লোকের চোখে বিশ্বের কোটানোর জন্য যেমন ওরা সাজে, তেমনি ঈর্ষা জাগানোর জন্য হাসে। দিনের তিন ভাগের দুভাগ বেশী সময় ওরা মেলা প্রসাধনে। কেবল প্রেমিং আর প্রেমিং। আজকের ফোন দুটির পাট ভাঙা আজ যতই বেদনা নিয়ে যাক—যাবখানে খুলে ফাদারে তুলিয়ে রাখলেই কি, আগামী কাল যার হবার সময় আসে কটাখানেক আর প্রেমিং হবেই। ছেলেদের প্যাণ্টের ক্রীজ হবে উজ্জ্বল, মেয়েদের লাভোয়ারের ফুঁচি হবে পাট পাট, তবে না—প্রতিবেশিনী একটী পাঞ্জাবী মেয়ে মল্লিকাকে বলছিলো একদিন, "ওইটি আউট্ প্রেমিং কোন ভদ্রলোক আধা-কাপড় পরে বার হতে পারে, তা আমরা ইমাজিন্ও করতে পারি না।" তাই।

জামল রাস্তাঘাটের নিশানা দিচ্ছিলো, "...এ রাস্তাটা বরাবর চলে গেছে লিলিপ হোটেলে,—টেপলে যাওয়াও এই রাস্তা ধরে দু ভাগ হয়ে গেছে। এটা দিয়ে কালীবাড়ি যাওয়া যায়। ফিল্লার বিখ্যাত কালীবাড়ি, দেখলে খুশী হবে। এটা দিয়ে আর একটু গেলেই ফিল্ল-পাহাড় ঘেরে এতবড় চওড়া রাস্তা হতে পারে না দেখলে যেন বিশ্বাস হয় না। তারি সুন্দর জায়গা। দূরবীণে চোখ লাগালে জেলগুলো এখান থেকেই সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। আর যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেটাকে বলে, "ম্যাওাল পয়েন্ট।"

"বলে কি হে! এমন উৎকট নাম? ম্যাওালাস কিছু ঘটেছে নাকি এখানে" কৌতূহলি কণ্ঠস্বর তোলার।

"ঘটেছে বৈ কি—" জামলকে থামিয়ে মল্লিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আজ দিদি, পাইন, দেওদার তো মেলাই আছে, কিন্তু রডোডেনড্রন তো একটাও দেখলাম না—" মল্লিকার ইঙ্গিত বুঝতে তাদের। হেসে বললো, "রডোডেনড্রন গাছও প্রচুর আছে এখানে। কালকে ফিরেলে দেখাবো তোমায়। ছোট সিমলে আর মউনতলির দিকটাতেই এগাছ খুব বেশি। কাল তাড়াতাড়ি আফিস থেকে এসে তোমাদের নিয়ে যাবো মউনতলিতে।" চায়েলি বললো, "ছুটি নাও না ক'দিন। তোমার ত ছুটি পাওনা আছে অনেক। তোমাকে বার দিয়ে বেড়াতে মন চাইবে না, আবার আফিস থেকে কেরা পর্যন্ত সইবে না—"

"নিশ্চয়ই নেব ছুটি। শুধু কাল অফিস করবো অর্ধেক। তারপর আমাকে পনের দিনের মধ্যে কে আফিসে ধরে মেরি। এতে চাকরী যায় যাক," অবাক্ত উজ্জ্বল ছিলো জামল। তারপর মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বললো, "আজ কিন্তু সত্যি আফ্রোতে যাওয়া হবে না, তোলা হাই তুলছে। তাছাড়ের চলো মিলি, এখন দিন আজ আমরা ঘুরেই ফিরি। কালীবাড়ি থেকে চড়াই উৎরাই কিছু নেই। একেবারে যেন রাস্তা বেড়ানো আর পুণ্য হবে, কাজই একসঙ্গে হবে, অথচ কোন কষ্ট হবে না। সবাইই মুখে হাসি ফুটে উঠলো এতে।

বিকেলে যে যার। উজ্জ্বল বন্ধুকে বেড়াতে দিলগুলো। বেলা দশটা প্রায়। মল্লিকা জামা-কাপড়কে নিয়ে নোতুন নোতুন ফুলের নাম শিখছে। তোলা বেড়াতে গেছে

চারদুইক কল্‌স এ, প্রতিবেশী এ্যাডভোকেট মিঃ তালুকার দলবলের সঙ্গে। মিলিকে বাদ দিয়ে মল্লিকা সেলো না কিছুতেই। এই একটু আগে মিস্ সরলা তালুকা এসে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন আবার,

"মিসেস সান্যিতে, এমন ছেলেমানুষি তে—এমন দিনে ঘরে থাকতে কি করে পারো তাই তোমরা? বাইরে মন টানে না? আমার তো কিছুতেই—।" : মাঃ এরা দেখছি বিলেত করে ছাড়লো একেবারে। এমন উৎকট ওয়েস্টার্নাইজড্ কেন? মনে মনে একথা ভাবলেও, মুখে মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে, অবশ্য শরীরের মিথ্যে অসুখটা দেখিয়ে যাওয়াটা প্রত্যাখ্যান করলো মল্লিকা। অভদ্রতা তো আর করা যায় না। রুমা বললো, "মাসিমণি, কাগজ পেনসিল নিয়ে আসবো? তুমি ফুলের নাম লিখবে বলছিলে—"

"তাই নিয়ে আয় রুমা, আজ তোদের এসে দেখবে, আমি একদিনে সব শিখে ফেলেছি—অথচ তোদের পনের দিনে কিছু শিখতে পারে নি—।" রুমা একছুটে ভেতরে গিয়ে খাতা পেন্‌সিল্ নিয়ে এলো। মাসির হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, "রাঙামাসি কেবল সব ভোলে। রোজ ফুলের নাম বলি, রোজ রোজ ভোলে।" মল্লিকা পেন্‌সিল্ দিয়ে খাতার ওপর লিখতে লিখতে বললো, "আজ দেখ্‌না কী মজা হবে—রাঙামাসিকে হারিয়ে দেব। আচ্ছা এবার শোন কি কি লিখেছি। ওদিকের সব বেড গুলো, যে গুলোতে ফুল হয় নি—ডালিয়া, কসমস্ টসমস ও সবের নাম লিখে দরকার নেই। তারপরের সব বেড হচ্ছে, গ্ল্যাডিওলাস্, সিজন্‌থাস্, নার্সিসাস, রুমা চোখ টেবেটেবে বলে উঠলো "জানো মাসিমণি, এখানকার লোকেরা নার্সিসাস কে বলে নার্সিস্—কী মজা না!"

"নার্সিস বলে বুঝি? বেশ তো! আচ্ছা তারপর হলো ফ্লেক্সিনিয়স, ক্রাসটাসিয়াম, এনটিরাইনস্। কেমন? ঠিক হচ্ছে তো খ্যাঁ রুমা?"

"ঠিক হচ্ছে মাসিমণি। এরপর ওটা হচ্ছে—।" রাঙা এতক্ষণ কোনরকম চালই পাচ্ছিল না। এবার লাফিয়ে উঠে এন্টিরাইনাসের বেডের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললো, "মাসি, ওতা কুকুরমুখি—কুকুরমুখি"

"কুকুরমুখি আবার কোনটার কথা?" রাঙাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলো মল্লিকা।

"ঐ এনটিরাইনামকেই কুকুরমুখি বলে মাসিমণি। ফুলটা ঠিক কুকুরের মতো মুখ কি না।"

"রুমা সত্যিই তো, ঠিক কুকুরেরমুখ। আমি ত লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ।" একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে দেখতে দেখতে বললো মল্লিকা। তারপর হচ্ছে, কারনেশন, লাইলাক, ফক্স্, টক্স্, অস্টার, লার্কস্পার, ভিরিসিয়া, বেগুনিয়া, পিটুনিয়া, লালজিয়া, জিনিয়া, সুইটপী, সুইট উইলিয়াম, হোলি হক্স —"

"এই দাঁড়া দাঁড়া, অত গড়গড় করে বলিস্ না—" দ্রুত পেন্‌সিল্ চালাতে চালাতে বললো মল্লিকা। তারপর রুমা আস্তে আস্তে বললো। মল্লিকা লেখা শেষ করে আর একটা বেড দেখিয়ে বললো, "ওটার নাম বলনি যে রুমা? তাদি সুন্দর দেখতে কিন্তু—"

"মাকে জিগ্যেস করো মাসিমণি। ওটার নাম, মস্ত বড়, ভুলে গেছি আমি।" রুমা, রাঙাকে তাকতে তাকতে আয়া বাগানের দিকে আসছিলো, আয়াকে দেখেই ভাই-বোনে চিৎকার করে উঠলো সমস্বরে, "এখন আমরা চান করবো না, পরে করবো—" রাঙা হাততালি দিয়ে বলতে লাগলো, "এখন না, এখন না, পরে করবো—পরে করবো—" মল্লিকা আয়াকে বলে দিলো, "আচ্ছা তুমি যাও, আমি ওদের চান করিয়ে দেব। সঙ্গে সঙ্গে চাবিটি বেরিয়ে এলো, হাতে একটা ডিম নিয়ে, "রুমা, রাঙা! শিগ্‌গির আয়ার কাছে যাও চান করতে, সেই থেকে মাসিকে বিরক্ত করা হচ্ছে।"

তারপর মল্লিকার হাতে ডিস্‌টা দিয়ে বললো, "দেখ তো মিলি, পুডিং এ মিষ্টি ঠিক হয়েছে কিনা?"

"ঠিক হ'য়েছে দিদি,"—প্রায় না খেয়ে মুখে ঠেকাতে না ঠেকাতেই বললো মল্লিকা "আর কী চমৎকার হ'য়েছে খেতে—এই জন্য-বাজা তোরাও এক চামচ এক চামচ, না, নে হাঁ কর্—" বাজা হাঁ করলো সঙ্গে সঙ্গে, আর ডিস্ খালি না হওয়া পর্যন্ত হাঁ বন্ধই করলো না। মা হাসি ওর কাণ্ড দেখে হেসে খুন।

"দিদি তোর হয়নি এখনও? খামাখা কী সব হাঙ্গামা বাঁধিয়ে বসলি বলতো? কোনকালে আমার জন্মদিন হয়নি একটা না একটা ছুতো করে রোজ উৎসব তোর করাই চাই। আর কিছু করতে হবে না দিদি, বস্ এখন—ডিস্‌টা একপাশে নামিয়ে রেখে মল্লিকা দিদির হাত ধরে টানলো। চামেলি স্নেহভরে মল্লিকার কপালের অবাধ্য চুল গুলো সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে মৃদু হেসে বললো, "দাঁড়া আর একটু বাদে এসে বস্‌ছি। কেক্ বেক্ করতে দিয়ে এসেছি, নামিয়ে রেখে এলাম বলে—" "না দিদি বস্। ওরাই যা পারবে করবে। খুব জরুরী একটা কথা আছে তোর সঙ্গে। চামেলিকে বসতেই হলো, আয়াকে ডেকে কমা বাচ্চাকে পাঠিয়ে দিলো চান করতে আর অমনি বলে দিলো, বাবুর্চি রিলায়েন্স যেন কেক্‌টা একটু দেখে। বেতের চেয়ারে বসতে বসতে আগ্রহের সুরে জিজ্ঞেস করলো চামেলি, "তোর আবার কী জরুরী কথা রে মিলি?" "শুনে রাগ করবি না তো দিদি?" দিদির গা ঘেঁষে বসে মিলি বললো। চামেলি হাসলো, "রাগ করবো কেনরে? কী এমন কথা তোর? মল্লিকা সামান্য একটু ইতস্তত করে বললো, "শ্যামলদা যে শাড়িটা দিয়েছেন, সেটা আমি আজ পরতে পারবো না—"। মল্লিকার কথায় চামেলি বিস্মিত হলো কিছুটা। বললো, "তোর তাহলে পছন্দ হয়নি বল?"

"পছন্দ হয় নি মানে? ভীষণ পছন্দ হয়েছে। এত সুন্দর শাড়ি পরাতো দূরের কথা ধরতে গেলে আমি চোখেই দেখিনি। এত ভাল শাড়ি দিদি পরা যায় না।"

"ভাল শাড়ি পরা যায় না কি রে, তবে কি করা যায়?" বোনের ছেলেমানুষিতে কৌতুক বোধ করলো চামেলি। "বাক্সে সাজিয়ে রাখতে খুব ভাললাগে। পরলে সবাই এমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, সে ভারি লজ্জা করে আমার—" চামেলি জোরে হেসে ফেললো। "এমন-মজার কথাও আমি শুনিনি কখনও। মেয়েরা লোককে হাঁ করার জন্যই কত সময় দিয়ে বস করে সাজে।"

"না দিদি, আমি সারা জীবন ধরে এর প্রতিবাদ করে যাব—"

"আচ্ছা রে পাগলি আচ্ছা" বোনের মাথায় হাত রেখে চামেলি বললো "কিন্তু তোর শ্যামলদা রাগ না করলেও দুঃখ পাবেন মিলি। বিশেষ করে আজকের দিনে পরবার জন্যই তো শাড়িটা কেনা। তোকে সঙ্গে নিয়ে কত খোঁজাখুঁজি করে কিনলেন—" সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গেলো মল্লিকা, "এই না রে দিদি, ঠিক পরবো আমি, শ্যামলদাকে কিছু বলিস না। শ্যামলদাকে কি দুঃখ দিতে পারি?" তারপর মল্লিকার কি মনে হলো দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বললো, "দিদি, শ্যামলদার মতো এত ভালো আর কাউকে দেখলাম না—"

"দেখবি রে দেখবি,, বেশি না হোক অন্ততঃ আর একজনকে দেখবি—" সস্নেহে বোনের মাথায় মৃদু চাপড় দিয়ে বললো চামেলি। মল্লিকার দুটো গাল লাল হলো একটু কিন্তু আরো জোর দিয়ে বললো, "কখনো না—" দিদিকে আর কিছু বলতে না দিয়ে আগের কথার জের টেনে আবার বললো, "দিদি তুই তো কাল আমার পাশে শুয়েছিলি, অথচ শ্যামলদা কত দূরে বসেছিলেন তাও আবার তোলাদার সঙ্গে গল্প করছিল। আমি যার

কয়েক বালিশে মাথা ঘষেছি, মাথাটা ঠিক মতো ব্রেস্ হচ্ছিলোনা আর কি—তামলতা উঠে এসেছেন, বললেন, "মিলি মাথাটা একটু তোলো তো নিশ্চয়ই তোষকের তলায় কিছু আছে। ঠিক বার হলো একখানা বই। অবশ্য দুপুরে আমি নিজেই "সাহেব বিবি গোলাম খানা" পড়ে তোষকের তলায় রেখে দিয়েছি।

এত অসম্ভব এ্যাকেডমনেই যদি না হতে পারে, কিন্তু এত তীক্ষ্ণ নজর কোন পুরুষের হয় না—।" চামেলি হাসতে হাসতে বললো, "তুই আর পুরুষ দেখলি ক'টা? স্নেহ ভালবাসা থেকেই নজর তীক্ষ্ণ হয়; তবে উনি একটু বাতিকগ্রস্ত ঠিকই। তোরা এগেহিস, এখন একটু সামলে-চামলে চলেন, না হলে ওঁর নজরের ঠেলায় পাগল হতে হয় আমাকে।"—.....একটু চুপ করে থাকলে বলবেন—চামেলি নিশ্চয়ই তোমার কিদে পেয়েছে। ভুরু কোঁচকালে বলবেন মাথা ধরেছে বুঝি? চড়াই উৎরাই ভেঙে হেসে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি যদি কোন সময়, তাহলে আর রক্ষে নেই। এমন হৈ চৈ লাগিয়ে দেন চাকর-বাকরের সামনে, লজ্জায় যেন মাথা কাটা যায়। উনি বাড়ি থাকলে ইলেক্‌ট্রিক হীটার ধরাবার আমার উপায় নেই। এ-সি কারেন্ট যদি ফুসে পড়ি—। এই এক রকমের বাতিক আর কি?" মল্লিকা লজ্জা করলো মুখে বাতিক-বাতিক বললেও, দিদি যেন আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে স্বামী প্রসঙ্গ পেশ করলো। মল্লিকা হেসে বললো, "এমন বাতিক যেন সবার হয় দিদি ভালবাসার পরিধিটা তামলতার একটু বেশি মাত্রায় বড়। আমি তো দেখছি, সিমলার সমস্ত বাঙালীকেই অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন তামলতা। দু দিন তো দেখলাম, ফোনে কাদের অসুখের খবরপেয়ে রাত দুটো না তিনটের সময় ছুটলেন। সেই কোথায় কাগুনী আর কোথায় কাইথু। যে সব ধারগা বেড়াতে গিয়ে আমাদের আর বাড়ি ফিরে আসার ক্ষমতা ছিলো না। এত রাত্রে লেপের তলা থেকে উঠে ছুটলেন। কপালে একটা বিরক্তির ভাঁজও পড়লো না। আশ্চর্য্য মানুষ কিন্তু—।"

চামেলি অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিলো। মা'র সেই অভিযোগ চিঠির কথা মনে পড়ে গেছে। এখানেই তারপরই, মনে পড়ে গেল অর্ণবদার শান্তড়িকে। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস পড়লো একটা। দিদির মুখে বিষাদের ছায়া দেখে, মল্লিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো "কি হলো দিদি?" "কৈ কিছু না তো—" সহজ হবার চেষ্টা করে চামেলি! "তোকে কি কোন কষ্ট দিলাম?" চোখ আরও বড় করে জিগেস করলো মল্লিকা। "পাগল নাকিরে তুই। পাওয়া-না-পাওয়ার কথা মনে পড়ে গেলো তাই মনটা একটু...।" মল্লিকা অন্যকথা পাড়লো তাড়াতাড়ি, "দিদি ঐ বেডটা ও ঐ যে, ফুলের নাম কিরে দিদি? মল্লিকার আঙুল অনুসরণ করে চামেলি তাকালো বেড্‌টার দিকে, "ওগুলো ফুল কোথায় রে? ওতো পাতা। ওর নাম হচ্ছে ক্রাইড অব লণ্ডন্।" "ওমা! ভারি মজার নাম তো? আর পাতাগুলোই কি সুন্দর! ঠিক যেন ফুল।" চামেলি হাসলো, "ওর ফুলও ভারি সুন্দর। ঐ গাজানো পাতার মাঝখানে লম্বা—ডাঁটি বার হয়, তাতে ঘরে ফুল।" বোনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে চামেলি বলে ফেললো, "মিলি তুই আমার কাছেই থাক। আর যাস্ নে কলকাতায়। একা একা আর যেন ভাল লাগে নারে—" মল্লিকা হাসিমুখে চুপ করে রইল।

চামেলি আবার বললো, "কিরে থাকবি আমার কাছে? তোর পড়ার সব রকম ব্যবস্থা করে দেব।"

মল্লিকা ধীরে ধীরে একটু দ্বিধা করে বললো, "আমি যে মাকে ছেড়ে থাকতে পারি না দিদি।" চামেলি শব্দ করে হেসে উঠলো, "আর কি খুব বেশিদিন মার কাছে তুই থাকতে পারবি?" মল্লিকার দৃষ্টি গেলো ফুলগাছ-

ওপোর দিকে। বিলাসায় এসে জানিয়ে গেলো কেক্‌টা হয়ে গেছে বোধ হয়; চামেলি উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। মল্লিকাকে চানের তাগাদা দিয়ে ভেতরে চলে গেলো।

মল্লিকা উঠলো না। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে রইল অলস ভাবে। বেশ লাগছিলো সকালটা কিন্তু এখন যেন কেমন লাগছে—ফাঁকা, উদাস উদাস, দিদিকে না করলো তাই বোধ হয় ভাল লাগছে না। দিদিটার যেমন কথা! দিদির আবার একা একা কী? জামাইবাবু আছেন। একাই একশ। কোন দিক দিয়ে একটোঁটা ফাঁক নেই। এমন ভাবে ঘিরে রেখেছেন দিদিকে। যে মানুষ দশটায় অফিসে গিয়ে আবার দু ঘণ্টা বাদেই কুশল জানতে চিঠি লেখে, তার কথা ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। জামাই অফিসে যায় দশটায়। বারোটার সময় অফিস থেকে চাপরাশি এসে লাঞ্চ নিয়ে যায় হরিকাকিমারে। প্রত্যেকদিন চাপরাশির হাতে একটা চিরকুট পাঠায় জামাই। সেটা শুনেছে মল্লিকা দিদির কাছে থেকে। তারপর দেখেছে কয়েকটা চিরকুট কোড়ন থেকে তুলে তুলে,

'চামেলি! আসার সময় মনে হলো তোমার সর্দ্দি লেগেছে। অবশ্যই ফুটবাথ্ নিও'

'...আজ তোমার সেই প্রিয় বইটা এসেছে চামেলি, প্রিসনার অব বিন্দা—তৈরী থেকো, ঠিক পাঁচটায় হাজির হবো।'...'এবার ও বঙ্গীয়-সম্মিলনী বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছেন, কর্ণাময়ের গান শোনানোর ভার নিতে। তোমার কি ইচ্ছে জানিও—।' এই রকম শত শত চিরকুট কোড়নে গেঁথে রেখেছে চামেলি।

: এই ভালবাসা! মানব হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কী প্রচণ্ড শক্তি এর। পৃথিবীর সব আকর্ষণ, সব আসক্তি অতি তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। এর জন্য সম্ভব হয় সব। রাজঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলে হাসতে হাসতে পর্ণ কুটীরে আশ্রয় নেওয়া যায়। এর কাছে চার মানে, মা-বাপ-ভাই-বোন সকলের ভালবাসা। কী আশ্চর্য্য! কী অদ্ভুত! 'চিঠি' ইন্দ্রিকা চমকে গিয়ে সামলে নিলো। হাত বাড়িয়ে চিঠি তিনখানা নিলো পিওনের হাত থেকে। তার একখানা, আর তোলার দুখানা। মলিনা লিখেছে চিঠি। ছুটি পেয়ে গেছে খুকন। আর সাত দিনের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছাবে। "·····মা যেন পাগলের মতো ছটফট করছেন। চাইছেন হাত দিয়ে ঠেলে সময় সরাতে। তোমার সঙ্গে গেলেই অনেক ভাল করতেন যেন যে গেলেন না—আর এক দিনে যে পরিমাণ নাড়ু-বড়ি ও আচার মা করেছেন সব খানি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারলে হয়। আর তোমার দাদার বোধহয় মস্তিষ্কের কিছু বিকৃতি ঘটেছে। কারণে অকারণে কেবল হো-হো করে গলা মাতিয়ে হেসে যাচ্ছেন। আর আমি যেচারা আনন্দ প্রকাশের কোন রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না, শেষ পর্য্যন্ত বেসামাল না হয়ে পড়ি। ভালো ঠাকুরঝি মা বাবাও কিছু দিনের মধ্যে সিমলে যাবেন। ছোড়দা এর মধ্যে বিলেত থেকে এসে একেবারে দিল্লীতে কাজে জয়েন করেছে। ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্ট প্রেসের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়েছে ছোড়দা। ছোড়দার চিঠিতে জানলাম, সিমলার ম্যানেজারের মেয়ের বিয়ে কলকাতায়। তিনি এই মাসেই দুমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসছেন। তাঁর জায়গায় এই দুমাস অফিসিয়েট করতে হবে ছোড়দাকে। ছোড়দা এই সুযোগে সবাইকে সিমলা বেড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সকলেই যেন যাই—গভর্ণমেন্ট প্রেসের ম্যানেজারের বাড়িগুলো নাকি বিরাট—কারুর থাকার অসুবিধা হবে না···ইত্যাদি—। কী বলা ভাই ঠাকুরঝি! মা বাবা তো যাবেনই, দাদা বৌদিরাও যেতে পারেন। তাহলে তো সিমলা একেবারে কলকাতা।·····" এই পর্য্যন্ত পড়ে মল্লিকা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অনেক উঁচুতে নীল আকাশের দিকে।

: কল্যাণ—কল্যাণবাবু এসে গেছেন। এসে গেছেন তাহলে কল্যাণবাবু। কী সুন্দর নীলাকাশ। থও থও সাদা মেঘ ভেসে চলেছে আকাশের গায়ে, ও-ও চলেছে ভেসে ভেসে। 'একেবারে চলে এলো কল্যাণের পাশে মোটর গাড়ির সামনের সিটে। '……আপনি বই পড়তে ভালবাসেন নাকি মল্লিকাদেবী? তাহলে বইগুলো সব রেখে যাবো কাল আপনার বাড়িতে……' তারপর চলে এলো মল্লিকা কল্যাণের সামনে, একেবারে মুখোমুখি। বড় বড় উজ্জ্বল চোখের গভীর দৃষ্টিতে, চেয়ে আছে কল্যাণ ওর দিকে। ওর চোখে চোখ রেখে বলছে, 'আপনার যদি বিলেত যাওয়ার সত্যিকার ইচ্ছে থাকে, তাহলে চলুন না আমার সঙ্গে।' এলো কল্যাণদের বাড়ির সিঁড়িতে। পথ আটকে দাঁড়িয়েছে কল্যাণ হাসিমুখে, '……কী হয়েছে আপনার না বলুন কিছুতেই ছাড়া পাবেন না মল্লিকা দেবী। চলুন বসি।……আমার ভাবীবধূর অনারে দু'শ টাকার টিকিট কাটলাম তার আসল সবার উপরে। তাকে জানলে তাকে চিনলে আপনি আর ও কথা বলতেন না। তার দিব্যজ্যোতির্ময়ী ছোঁয়া পেতে পেতাম বলেইতো জীবনে দুঃখ নামক সকল ছোঁয়া ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেলো…'

"কী হলো! মিমি তুমি চুপ করে বসে বসে কী ভাবছো? তোমার মিলিয়ে আছা লোক, বোনের কোন খবরদারি করো না।—"

"কল্যাণবাবুর গল্প তো একেবারে শেষটে গেছে—প্রায় দু'বছরেই একেবারে অন্ত পাচ্ছ……"

"ধ্যেৎ মিমি কার ধ্যান করছিস? এতক্ষণের মুলি-বড়িরও যে হায় হায়লি—"

আকাশ থেকে চোখ নামলো মিমির। মল্লিকা আবার ফিরে এলো, বেতলার বি-ব্লকে। লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়ালো মিমি। সময় খুব চমৎকার লাগে। যেন চুরি করা পড়ে গেছে।

"ভাইলদা! তোলাদা! তোমরা এসেছো? কখন এলে? আমি একেবারে—। ভাইলদা! আপনার ডুকিস দুটি বাকি আছে? আমি আমি একেবারে টের পাইনি।—"

মল্লিকার ব্যস্ততা দেখে ভাইলদা খেপাতে বাড়িলেন, কিন্তু বড্ড বেশী যেন অপ্রস্তুত হয়েছে, রলদা সংবরণ করে বললো "ওদের কাণ্ড, জোর করে ধরে নিয়ে এলো। কালকেই সবে দুটীর গল্প শুরু করেছি। কাইল পর্যন্ত প্রমাণ সাইজ আছে টেনিসে, তা কে কার কথা শোনে—।" কথা শেষ করে ভাইলদা হাসি মুখে একগুচ্ছ চন্দ্রমল্লিকা মল্লিকার সামনে এগিয়ে ধরলো। তোলাও দিলো এক গোছা রজনী গন্ধা। তারপর ওরা সব ভেতরে চলে গেলো।

সিমলার উজ্জ্বল বৈশাখী সন্ধ্যা। খুব সুন্দর।

এত ভাল যেন আর কখনও লাগেনি মল্লিকার। যারা কয়দিনে নিমন্ত্রিত এসেছিলেন, তাঁরা এই গেলেন। মল্লিকা সেই গরদের জয়পুরী প্রিন্টেড সিল্ক খানাই পরেছে আপত্তি করেনি আর। মাথায় গুঁজেছে ফুল, নিজেই ইচ্ছে করে দিয়েছে মাথায়। সাবলোর বড্ড নেয়েছে ওর পরীরে।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এসেছিলেন, তার মধ্যে অবাঙালী ছিলেন আটজন অর্থাৎ সস্ত্রীক পাঞ্জাবী চারজন। পাঞ্জাবীদেরও মল্লিকার খুব ভাল লেগেছে। আজ মিশে গেলো শুধু মাইকের ঘটাই ওদের স্বভাব নয়—মনের ঐশ্বর্য ওদের প্রচুর। খুব দীপ্ত ওরা, আনন্দ দিতে জানে। বাঙালীদের প্রতি ওদের অপার শ্রদ্ধা। কেন দেখেছে ওদের। বেতলার ঘরে ওরা হাসা গল্প করছিলো। ভোলা ওদের পড়েছে। কখন সেবার কলকাতে পা টাটাছে ভোলার। তারপর জোর করে বন্ধুর পা মালিশ করছে—আপত্তি শোনেনি। ভাবছিল মনে আনন্দের কথা। যা আসছে, আসছে, আরো বাকী আছে, আরো বাকী আছে। দু'টি পরম রাত। আসছে যখনই আসুক, সেই আসা-

ঝলমল সোনালী দিন আবার ফিরে আসবে। আনন্দ দীপ্ত চোখে স্তোনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে সঘেহে চামেলি বললো, "মিলিকে কি অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে বলতো?…চোখ যেন আর সরাতে ইচ্ছে করে না।—" শ্যামল মাথায় থামিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালো "আমাকে বলছো? তোমার একখানা সাদা দিলে তোমার কিন্তু মুখ ভার হবে চামেলি—।" চামেলি মুখ লাল করলো, "কী যে ঠাট্টা কর মেয়ের বয়সী শ্যালির সঙ্গে বুঝি না—।"

"অমনি মেয়ের বয়সী হলো?" শ্যামলের কণ্ঠে কৌতুক "প্রকাশবাবু তো আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবেন বোধ হয়—"

এবার মল্লিকা হলো রাঙা। সামনে ছিলো একটা টাইম্‌টেবল্ সেটাই তুলে তাড়াতাড়ি পাতা ওলটালে।

"চামেলি! এক কাজ কর তোমরা দুজনে বিশ্বরূপ ষ্টুডিয়োতে গিয়ে ফটো তুলে এসো। দুজনে একসঙ্গে একটা, আর দুটো আলাদা—" কথা পালটাতে শ্যামল চিরকালই ওস্তাদ। চামেলি ইজিচেয়ারে হেলান দিলো আর একটু। বললো, "না আজ থাক। কোমরটা যেন ব্যাথা ব্যাথা করছে—কালকে মিলিকে ঠিক এই ভাবে সাজিয়ে ফটো তুলে নিয়ে আসবো।"

শ্যামল হৈ হৈ করে উঠল, "নিশ্চয়ই খুব ব্যাথা হ'য়েছে কোমরে, না হলে তুমি আবার বলো, কেবল সর্দারী করা অভ্যেস। কল্যাণ কেক্ পেষ্ট্রিগুলো পূর্ণিমাতে অর্ডার দিয়ে আসি—না সব করব আমি, দেশি, বিলিতি, মোগলাই সব—যাহবা নেব সকলের কাছে।

দিলারাম!" "হাঁ জী—" সাড়া দিয়ে ছুটে এলো দিলারাম সামনে। "এক গরম ব্যাগ লাও জলদি—" কণ্ঠের উৎকণ্ঠাতেই আর্জেন্সি প্রকাশ করলো শ্যামল। খিল খিল করে হেসে উঠলো মল্লিকা। শ্যামল অপ্রতিভ হলো একটু জন্য যে সামনে ছিলো ভুলে গেছলো যেন। লজ্জা ঢাকার জন্য বলে উঠলো, "তোমার দিদিটিকে তো জানোনা—যেন একটি মোমের পুতুল।" মল্লিকা হাসতে হাসতে বললো "আগে কিন্তু দিদি এমন ছিল না শ্যামল দা—। মোম করে ছেড়েছে কে? সে চোর কার?" শ্যামল উত্তর না দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো।

"শ্যামলদা, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রেস এখান থেকে কতদূর" নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে টাইম টেবিলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে জিগ্যেস করলো মল্লিকা। "অনেক দূর, কেন বলতো?"

"এই বৌদি লিখেছে কিনা চিঠিতে, তার ছোড়দা নাকি দিল্লী থেকে অফিসিয়েটিং প্রেসের ম্যানেজার হয়ে আসছেন সিমলাতে, বৌদির মা, বাবাও নাকি শিগ্‌গির আসবেন এখানে কলকাতা থেকে—তা—ই জিগ্যেস করলুম।" আরো ঔদাসীন্য দেখিয়ে মল্লিকা কথা শেষ করলো।

শ্যামল বললো, "সেদিন প্রসপেক্ট হিল-এ কামনাদেবীর মন্দির দেখতে যাওয়ার সময় সিদিল হোটেল দেখালাম না—সেখান থেকে আর একটু নিচে নামতে হয়। গভর্ণমেণ্ট প্রেস আর ম্যানেজারের বাড়ি একেবারে লাগোয়া—"

চামেলিকে স্বামীর তাড়নার গরম জলের ব্যাগ নিয়ে কম্বলের তলায় শুয়ে পড়তে হয়েছিলো। ব্যাগটা কোমরের এদিক ওদিক লাগাতে লাগাতে বললো "কেরে মিলি? সেই কল্যাণ বাবু নাকি? "তুমি চেনো নাকি ভদ্রলোক কে?" মল্লিকার উত্তরের আগেই আবার জিগ্যেস করলো শ্যামল।

"ওমা! সেদিন রাত্রে খাওয়ার টেবিলে শুনলে না ওঁর গল্প। টি-বি অসুখ বলে বিয়ে ভাঙলেন ভদ্রলোক—তোমার আবার কিছু মনে থাকে না।"

শ্যামল মুখ ঘোরাবার আগেই তোলা বলে উঠলো, "মনে আমার থাকে না। খুব থাকে—তবে কেন?

বিশেষে। এ যদি কল্যাণ না হয়ে কল্যাণী হতো তা হলে দেখতিস্—।

তামল তোলার গায়ের ওপরই এক থাবড়া মেরে বললো, "ইডিয়েট, তুই বাপ্পাতো চিড় খাওয়াতে চাস? ফটা মেয়ে এ সব ড্রিউনায় স্ট্যাণ্ড করতে পারে বলতো?"

"উ-হু-হু" করে উঠলো তোলা, "স্ত্রীর মন আর ভাখতে দিয়ে, তুই আমার পা ভাঙতে চাস্ ডুপিড্—" থাবড়া খাওয়া পা-টা আলগোছে পাশ বালিশের ওপর তুলতে তুলতে বললো তোলা আবার, নিক্‌চি করেছে তোদের চাড়ভুইক কলসের, আমাদের নাপিত ফলও ওর চেয়ে তোড়ে মোটা হয়ে যায়। পাঞ্জাবী টেই আর কাকে বলে—হৈ হৈ করে চললো সেটা দেখতে। ভিয় ভিয় করে জল যাচ্ছে শুতোর মতো লেল লাগে দেখতে।"

শ্যামল সহাস্যে বললো, "অতদূরে দেখলে চলবে কেন হে। বর্ষায় এসো, দেখবে, ফীপাবী পুর্ণিকী হয়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছেন।" তোলা বললে, "আরে যাযো—। ক'দিনের মতো এখন বেড়ানো বন্ধ তা কে জানে—" ফচুড়কে বিরক্তি প্রকাশ করলো তোলা।

চামেলি বললো স্বামীর দিকে চেয়ে, "দিব্যি তো এক তরফা নালিশ জানানো হলো বন্ধুর কাছে—মেয়েরা এসব ড্রিউনায় ষ্ট্যাণ্ড করতে পারে না। কিন্তু ফটা পুরুষ পারে শুনি? সেদিন সিনেমার কোন্ হিরোকে যেন বার কয়েক সুন্দর বলেছিলাম, অমনি তো তোমার মাথা ঘুরে গেলো। ভাল করে আর সিনেমাটাই দেখতে পারলে না—" হো হো করে উচ্চহাস্য করে উঠলো সকলে।

"এখন তো মিলির সামনে খুব আজে বাজে কথা বলা হচ্ছে। এক মুহূর্তেই মিলি বুঝে খুব বড় হয়ে গেলো।" শ্যামলের কথায় বোনের দিকে তাকালো চামেলি। বললো স্নিগ্ধ কণ্ঠে, "মিলি! আজ সকাল থেকেই তোর বেড়ানো টেড়ানো কিছু হলো না। যা-না মোহন সিং এর সঙ্গে ঘুরে আয় একটু—"

শ্যামলও সায় দিলো, "সত্যিই তো মিলি তুমি একটু ঘুরে এসো। এখানে কোনো ভয় নেই। দেখোনা, পাঞ্জাবী মেয়েরা কেমন একলা একলা ঘুরে বেড়ায়।" মল্লিকা কোন প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে। "তাহলে একটু ঘুরেই আসি দিদি—।"

প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর মল্লিকা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। আরে! এযে সিসিল হোটেল। ওতো সিসিল হোটেল মনে করে হাঁটেনি। ভারি আশ্চর্য তো। মল্লিকাকে দাঁড়াতে দেখে মোহন সিং জিজ্ঞেস করলে—এখন বাড়ি ফিরবে নাকি? মল্লিকা চুপ করে ভাবলো একটু। তারপর বিষাদচিত্ত গলায় বললো "হ্যাঁ। এখন ফিরলেই হয়, অনেকটা হাঁটা হয়েছে—" কিন্তু ফিরবার উপক্রম না করে দাঁড়িয়েই রইলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন সিসিল হোটেল দেখতে লাগলো।

"খুব বড় হোটেল না মোহন সিংহ।"

মোহন সিং সবিনয়ে জানালো, হ্যাঁ। খুব বড় হোটেলই বটে, উল্টোদিকের বড় বিল্ডিংটাও সিসিল হোটেলেরই অংশ। মল্লিকার খুব ভাল জানা থাকা সত্ত্বেও, না জানার ভান করে প্রশ্ন করলো, "ওটাও কি সিসিল হোটেল?"

"হ্যাঁ জী।" মোহন সিং আগের সুরেই উত্তর দিলো। এরপর আর কি জিজ্ঞেস করা যায় মল্লিকা ভেবে পেলো না, তবুও খানিকটা আপন মনেই বলতে লাগলো,...এ গেট দিয়ে ঢোকে,...ওটা নিশ্চয়ই যাবার জায়গা...খুব ফুল দিয়ে সাজিয়েছে হোটেলটাকে।

মোহন সিং চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে উসখুস করে বলে উঠলো, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

মল্লিকা এবার বলেই ফেললো, "আচ্ছা মোহন সিং তুমি প্রেমের ম্যানেজার সাবের বাড়ি চেনো?" মোহন

সিং বিনয়ে গলে গিয়ে দাঁত বার করে হেসে উত্তর দিলো খুব স্লো করেই সে চেনে। ম্যানেজার সাহেব খাঁ-সাদা লাল সং ওর বড় চাচা লাগে। এই তো বাঁহাতি যাতা ঘুরে নামলেই দিংবে সে বাড়ি।

'যা হাঁ তা' বাতা ধরলো মল্লিকা। মিনিট সাতেক হাটার পরই ওরা এসে দাঁড়ালো ম্যানেজার সাহেবের গেটের সামনে। বিরাট বাড়ি। তার চেয়েও চোখে পড়ে বাগানখানা।

লালে নীলে-লালায় সবুজে আরও বহু রঙ মিলে সুলায়তন অপরূপ বাহার। দূর থেকে মনে হয় কতগুলি সুদৃশ্য আস্তিরী মালিচা বাড়ির চারিপাশে যেন বিছানো রয়েছে। মল্লিকাকে চুপ করে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, মোহন কিছু আশ্চর্য হলো। এ বাড়িতে যাবে কিনা সবিনয়ে অস্ফুটে জিগ্যেস করলো এবং এটাও জানালো এ বাড়ির ভেতরের পথঘাট ও ভালকরেই জানে।

মল্লিকার চমক ভাঙলো, "না মোহন সিং আজ না, চলো আমরা যাই—" খুব দ্রুত ওপরে উঠতে লাগলো মল্লিকা। মোহন সিং যেন মনমুগ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো পিছু পিছু। এত কাছে এসেও চাচার সঙ্গে দেখা হলো না, মন খারাপ হয় বৈকি।

"ছোটমা!"

কে ডাকে? চমকে ঘাড় ফেরালো মল্লিকা। চরণ, অজয়ঙ্কর বাবুর পুরানো চাকর। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে ছুটতে আসছে। আদর করে মল্লিকাকে ছোটমা ডাকেন অজয়ঙ্কর বাবু, তাই ও বাড়িতে ওর ঐ নামই হয়ে গেছে।

"আপনি যে এখানে ছোটমা? কবে এলেন?"

মল্লিকা উত্তর দেবে কি, ও একেবারে পাথর।

"বৌদির মা-বাবা এসে গেছেন তাহলে। হয়তো ওকে গেটের সামনে ঘোরাঘুরি করতেও দেখে থাকবেন। কিরে যাচ্ছে দেখে ডেকে পাঠিয়েছেন চরণকে দিয়ে—হয়ত দূর থেকে ওকেও হয়েই ওকে দেখেছেন—হয়তো—।"

চরণ আবার বললো, "আমাকে বুঝি চিনলেন না, ছোটমা? মল্লিকা হঠাৎ চরণ হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বললো, "তোমরা কবে এলে চরণ? সব ভালতো? তাওই মশায়, মাইমা সব বেশ ভাল আছেন?" চরণ অনেক দিনের পুরানো লোক। জানে শোনে বেশি। মল্লিকার আচরণে অবাক হলো খুব। বিস্ময় প্রকাশ না করে সহজ ভাবেই বললে, "বাবু, মা ওঁরা তো কেউ আসেন নি এখনও। আমি খোকাবাবুর সঙ্গে দিল্লী গেছলাম—কাল আমরা এসেছি সবে। আপনি দাঁড়িয়ে কেন ছোটমা? আসুন। দুখু চরণ বন্দোবস্ত কেমন সাজিয়েছে নিজ চক্ষে একবার দেখে যান।"

মল্লিকা খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে বললো, "না চরণ আজ না—। বড্ড দেরি হয়ে গেছে আজ। এদিকে এক আত্মীয়ার বেড়াতে গিয়েছিলুম কিনা, তাই—তা আর একদিন আসবো ঠিক, বাড়িটাতো দেখে গেলাম—" মল্লিকা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করতেই, চরণ দ্রুত সামনে এসে হাত জোড় করলো, "ছোটমা বাড়ির সামনে থেকে যদি না যান—খোকাবাবু জানলে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না—।"

"আমার দিদি আমাইবাবু দেখা হলে ভীষণ রাগ হবেন যে চরণ—। কোথায় টুইস্যাডি আর কোথায় বেলঘরিয়া।"

চরণ নাছোড়বান্দা। "খোকাবাবু কোন ঘরে যেতেন ছোটমা। আপনি কিছু ভাববেন না—।"

অগত্যা মল্লিকাকে কিরতেই হলো। সামনে নাছোড় ওর মনে হলো ওর যাওয়ায় এত চরণ এত বেশি রকম পীড়াপীড়ি করছে কেন? মোহন সিং খুশি হয়ে আলাপ করতে করতে চললো চরণের সঙ্গে।

মল্লিকাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে চরণ, মাইমাকে

খোকাবাবুকে খবর দিতে। হঠাৎ কি মনে হলো মল্লিকার, দাঁড়িয়ে বাধা দিলো, "থাক চলন, তোমায় যেতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি। কল্যাণবাবু কোন ঘরে আছেন তাই শুধু বলে যাও।" "সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে ঘর, সেই ঘরে আছেন খোকাবাবু।" সিঁড়ি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলো চলন।

মল্লিকা কোন শব্দ না করে, সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলো। ওর মনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে, না জানিয়ে অন্য কারুর শোবার ঘরে তো দূরের কথা, বসার ঘরেই ঢুকতে পারতো না। কিন্তু, শুধু পর্দার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো মল্লিকা। ইতস্তত: করতে লাগলো। ফিরে আবার নিচে চলে যাবে কিনা সে কথাও ভাবলো। হঠাৎ কানে এলো কল্যাণের কণ্ঠস্বর। নিচে যাওয়া হলো না। দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। বেশ সময় লাগছে। আঁচল তুলে গলা ঘাড় মুছলো একবার।

'কার সঙ্গে কথা বলছেন কল্যাণবাবু? ঘরে আর কেউ আছেন বলে মনে হচ্ছে যেন। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলো। বেশ কিছুক্ষণ পর বুঝলো, ঘরে কেউ নেই, কথা বলছে না কল্যাণ বোধহয় ধীরে ধীরে কবিতা আবৃত্তি করছে।

পর্দার একেবারে কাছে এসে, টোকাটে শব্দ করলো মল্লিকা—ঠক্-ঠক্-ঠক্। থেমে গেলো কণ্ঠস্বর। দ্বার শব্দ হলো, "কে চলন?" মল্লিকার গলা শোনা গেলো। সাড়া না দিয়ে আবার শব্দ করলো তিনবার। "কৌন্?" তীব্র উগ্র প্রকাশ হলো কণ্ঠে। মল্লিকা ধীরে ধীরে আবার শব্দ করলো।

"আরে কৌন্ হায় তুম্ উল্লু? তনতা নেই ক্লিউল?" তুম্বাই ক্রুদ্ধ পদধ্বনি শোনা গেলো। তারপরই ঝটিতে ভারি পর্দা সরিয়ে বার হলো কল্যাণ। একেবারে মুখোমুখি মল্লিকার।

বিস্ময় বস্তুটির মাত্রা থাকে না। কিন্তু তবু মাত্রা না থাকার ও বোধহয় একটা মাত্রা আছে। ছেরোশ' মাইল ঘুরে হঠাৎ মল্লিকা এখানে! এই সন্ধ্যায়! এই পরিবেশে। একেবারে একলা! "মল্লিকা তুমি!" কল্যাণের চোখ বিস্ফারিত অদ্ভুত বিস্ময় কণ্ঠে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কল্যাণ। এমন অপরূপ বেশে মল্লিকাকে ও আর দেখেনি কখনও। অপূর্ব! অপরূপ! বেশ-ভূষা যেন সার্থকতালাভ করেছে ওর শরীর আশ্রয় করে। তারা শ্রীবৃদ্ধি করেনি ওর, ওরই বৃদ্ধিয়েছে তাদের। মল্লিকার অবস্থাও সঙ্গিন।

সন্ধ্যার কেমন যেন একটা বোধ আছে। আলোতে দূর হয় না ওর সব অন্ধকার। আশে পাশে, আনাচে কানাচে, থেকে যায় কিছু। তারা যেন হাতছানি দেয় ইঙ্গিত করে কাছে ডাকে। আলোর দ্বিধাভাও ভুলিয়ে দেয় নিজেকে—কঠোর বাস্তবকে। মল্লিকাও ভুলে গেল সব। মুখ সামান্য উঁচু করে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো বলিষ্ঠ সুঠাম দীর্ঘ দেহ কল্যাণকে। স্বাস্থ্যের দীপ্তি, বর্ণের মাধুর্য আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে বেশ-ভূষা। চোখের দৃষ্টিতে বাসা বেঁধেছে স্নিগ্ধ আত্ম-বিস্মৃতি। চোখের দিকে তাকিয়ে এমন আর কোন অর্থেই যেন বলা যায় না—মেয়েদের আঠারোতে যে বুদ্ধি হয়, ছেলেদের আঠাশেও তা হয় না। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত আবিষ্ট হয়ে রইলো দুজনে। মল্লিকাই প্রথমের চেষ্টায় সফল হলো। হাসলো একটু। মৃদু কণ্ঠে বললো, "কল্যাণবাবু! কত মনে হচ্ছে মল্লিকা চিনতে পারছেন না!" মল্লিকার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের ঘোর কাটলো। আচ্ছন্ন হলো চেতনা। মহা অপ্রস্তুত হয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে কল্যাণ বললো,

"আসুন, আসুন মল্লিকাদেবী আসুন! এত দূর থেকে হঠাৎ দেখে—আমি ঠিক—"

"বিশ্বাস হচ্ছিল না এই তো? আরো সহজ হতে চাইলো মল্লিকা। "আমার দিদির কাছে বেড়াতে এসেছি বেলুলোয় থাকেন আমার জামাইবাবু—।"

"আসুন। আসুন। কী কাণ্ড। সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন।"

কল্যাণের পিছু পিছু মল্লিকা পর্দা ঠেলে ঢুকতেই ঘর দুয়ার চোখে পড়লো এক ঝলক। শান্ত নির্বরন ছিমছাম ঘর। আবছা নীল রঙের ঘর। বন্ধ করা জানালার দিকে আকাশী কাচের পাশে দুর্বা রঙে অপূর্ব সবলপুরী পর্দা দুলছে। বই এর সেল্‌ফটার কাছে ঘোমটাপরা টেবল ল্যাম্প চারদিকে ছোট ছোট ফিকে ফুলের চিনে পাখি উড়ছে। সুন্দর কাজ। ভারি সুন্দর তো! বেলুলোর বি-অফান বাংলোর চেয়েও ভালো।

এ সব ঘোর মল্লিকার মনে ছিলো মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরই খেয়াল হলো মল্লিকার, ও দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবকের শোবার কামরায় এবং তিনি অনিবাহিত। এবং তাকে না জানান দিয়েই চলে এসেছে ও। শিরশির করে উঠলো মল্লিকার সমস্ত শরীর। আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা অচেনা আড়ষ্টতা। আবার গরম লাগছে মল্লিকার, আঁচল তুলে মল্লিকা মুখটা মুছলো, ঘাড় গলা মুছলো। সব মিলিয়েই একটা অস্বস্তি। কিন্তু তৃপ্তিকর অস্বস্তি। মল্লিকার মনে হলো তিন পাহাড়ের চূড়োয় এই ছোট ঘরটায়, যার অস্তিত্ব আবহটা আগেও অজানা ছিলো ওর। যেন ওর জীবনের বোবাপড়ার চরম মুহূর্তগুলো অপেক্ষা করে আছে। একবার কল্যাণের দিকে আর একবার বিচিত্র ছকের আকাশের দিকে তাকিয়ে মল্লিকার খালি মনে হ'তে লাগলো ওর সত্যিকারের জীবন যেন ঠিক একটু আগে আরম্ভ হয়েছে, ঠিক একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে। আগেকার টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যহীন ভিড় যেন তিন পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়োটার পেছনে এই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে: এখন এই শব্দময় চকল মুহূর্তগুলো যেন একটা আস্ত, বৃহৎ, সম্পূর্ণ পৃথিবী।

যেন মল্লিকা দাঁড়িয়ে আছে, আর ঠিক সামনেই ওর সমস্ত চাওয়া পাওয়ার সীমারেখা একটা উজ্জ্বল বিন্দুর চিহ্নের মতো থমকে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই অনুভূতি যেন কিছুতেই স্পষ্ট হবে না। একটু ঝিধা, কিছুটা ভয় আর বাকীটুকু কম্পমান আশার দুলতে লাগলো মল্লিকার পৃথিবীতে।

ঠিক এই সময়—

"বসুন মল্লিকাদেবী, দাঁড়িয়ে থেকে আরও লজ্জা দিতে চান বুঝি—" কল্যাণের কণ্ঠস্বর একটু রুক্ষ, একটু উচ্ছ্বসিত। মল্লিকা সহজ হবার চেষ্টা করতে করতে চেয়ারের দিকে দৃষ্টি এগোলো। দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁসা সিঙ্গল বেড খাটের মাথার দিকে বেতের চেয়ার পাতা। চেয়ার পর্যন্ত আসতেই চোখে পড়লো মাথার বালিশ তাবানো। বালিশের পাশে একখানা মেরুন রঙের সুদৃশ্য এ্যালবাম রাখা রয়েছে। গুরুতর ব্যাপারে কখন যে কী ঘটে। মল্লিকা মনের চোখে দেখতে থাকলো —বালিশে মাথা দিয়ে কল্যাণ শুয়ে শুয়ে এ্যালবামের ফটো দেখছে আর গুণ গুণিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছে। কেমন একটা আত্মবিস্মৃতি আচ্ছন্ন করলো মল্লিকার মনকে। স্তব্ধ হয়ে চেয়ার ধরে দাঁড়ালো।

"বাঃ। বসুন মল্লিকাদেবী—"

"না, আর বসবো না যেমুন বজ্জ দেরী হয়ে গেছে—" বিব্রত মল্লিকা কিছুতেই সহজ হতে পারছেনা।

"নির্ভয়ে বসে পড়ুন। আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো আপনাকে" উজ্জ্বল শোনাচ্ছে কল্যাণের কণ্ঠস্বর।

শরতের লঘু মেঘের মতো বহুদিন আগেকার কল্যাণের সেই মোটরে পৌঁছে দিয়ে আসার ছবিটা চকিতে মল্লিকার মনের মধ্যে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো। মল্লিকা বসলো

পারলো না, চোখের বাঁধনটা শক্ত করে ওর সঙ্কোচ কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

"আজ আপনাকে আমি ফিরে কবি বানিয়ে যাওয়াব মল্লিকাদেবী—দেখুন তো পেরে তাদাক তাদাক গন্ধ কিনা।" পুরাণো স্মৃতি স্মরণ করে দুজনেই হাসলো। তবু মল্লিকা সহজ হতে পারছেনা। বলতে পারছেনা। আড়ষ্টতা কাটাবার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এ্যাল্‌বামটা হাতে তুলে নিলে। এ আচরণও মল্লিকার স্বভাব ধর্মের একেবারে বাইরে, ওর পক্ষে এটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে আত্মবিস্মৃত মল্লিকা। বিনা অনুমতিতেই পাতা ওলটালো তাবপর। এ্যাল্‌বামের একেবারে প্রথম পাতায় মল্লিকার সেই দাঁড়ানো ফটোখানা লাগানো রয়েছে। ঠিক সেই ফটোখানা নয় অবশ্য। বিলেতে নাম করা ফটোগ্রাফারের হাতে পড়ে আরও অনেক নিপুণ হয়েছে ফটো, আরো অনেক বড়। সদ্য স্নান করে ভিজে চুলে আয়না করলো যেন মল্লিকায়। আয়না মুখে ফটোখানা না দেখার ভান করে তাড়াতাড়ি প্রথম পাতা ওলটালো। দ্বিতীয় পাতার ওপর দিকে ওর বসা ফটোখানা আরো নিপুণ হয়ে বসে আছে। মল্লিকা নিবিষ্ট হয়ে বই পড়ছিলো, দূর থেকে অল্প তুলেছিল ফটোখানা। চোখের দৃষ্টি আনত এবং স্নিগ্ধ। দ্বিতীয় পাতার নিচের দিকে ঠিক একই আকারের কল্যাণের হাসি মুখের ফটো একখানা। কল্যাণের চোখের দৃষ্টি ওপরের দিকে। ছবি দুখানা লাগানো হয়েছে এমনভাবে যেন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করছে।

মল্লিকার হাঁটুতে জোর নেই। ঠক্ ঠক্ করে পা দুটো কাঁপছে।

আর কল্যাণের অবস্থা অবর্ণনীয়। ভুল যখন করেছে তখন টু-শব্দটি নেই। এখন আর সামলাবার কোনো পথ নেই। অত স্থিতধী যোগেও কপালে ঘাম দেখা দিলো বিন্দু বিন্দু। এরপর কিছুক্ষণ আবোল তাবোল বকে গেল কল্যাণ। কিছু কিছু কানে ঢুকলো মল্লিকার।

"……বিলেতে আমার বন্ধু হুবার্টসন তর্ক করেছিলো কিনা—বাঙালী মেয়ের কিসার বলে কিছু নেই। তাই তাকে দেখাবার জন্য আপনার ফটো এনলার্জ করা—মানে—এনলার্জ করলে আরও ভাল বোঝা যাবে বলে—মানে—" ঠিক অবস্থা বিচলিত না হলে কল্যাণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে সে যা বলে চলেছে তা একেবারেই অর্থহীন। বিলেতে গিয়ে তবে আলাপ হয়েছে হুবার্টসনের সঙ্গে আর ও ফটো নিয়ে গেছে তার বহু আগে এদেশ থেকে।

"……আপনার অনুমতি নিয়ে তারপর ফটো এনলার্জ করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু কেমন যেন ভুল হয়ে গেলো। …আমাকে মাপ করুন। আমি মার্জনা চাইছি মল্লিকা দেবী।…" কল্যাণের কণ্ঠস্বর এত করুণ শুনলো মল্লিকা, ও কিছু বলতে চাইলো কল্যাণকে—কিন্তু কম্পমান ঠোঁট অন্তরায় হচ্ছে। পায়ের মাটি যাচ্ছে সরে—তবে কি ভূমিকম্প? ভেঙে চুরে খান্ খান্ করে দিয়ে গেলো যে সব। মল্লিকা চেয়ারের হাতল ছেড়ে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হাঁটবে কি করে? পায়ের তলায় মাটি কৈ?

লম্বা ট্রিপয় ছিলো দরজার পাশে—তাকে আশ্রয় করলো মল্লিকা। হাতা ট্রিপয় দিলোনা আশ্রয়। কাত হয়ে পড়লো। নিশ্চলের পাখনা মেলা ময়ূর ছিলো ট্রিপয়ের ওপর, ঝন্ ঝন্ করে গেলো পড়ে। মল্লিকাও পড়ে গেলো। কিন্তু ভূমি শয্যা গ্রহণ করার আগেই কল্যাণ লাফ দিয়ে এসে ওর বলিষ্ঠ দুহাত দিয়ে মল্লিকার দু কাঁধ শক্ত করে ধরে তুলে বসলো। কল্যাণের প্রসস্ত

বুকে আশ্রয় নিলো মল্লিকা। সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়েছে ওর বুকে। কল্যাণের মনে হলো—টাল্ বুঝি সামলাতে পারেন নি মল্লিকাদেবী। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই কল্যাণের বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শে বোধ করলো মল্লিকাকে, মাথা নেমে এলো ধীরে ধীরে মাথার ওপর। পরমুহূর্তে ঘরে ডাক দিলো কল্যাণ,—"মল্লিকা! মিলি—!"

(সমাপ্ত)

ফেব্রুয়ারী সময়

সৈয়দ মোসেম হালিম, সাহিত্য-রত্ন

সময়টা ফেব্রুয়ারী আসামী।
জীবনের পণ্য চুরি ক'রে
ঘড়ির কাঁটায় পা টিপে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে।
পাছে ধরা পড়ে
তাই তার বুক চিপ্-চিপ্।

আমরা গোয়েন্দা নই—
লাঠি হাতে সাজানো পুলিশ।
আলস্য-আফিমে বুঁদ,
চোখ দুটো খোলা থেকে বোজা।
তাই তো সামনে দিয়ে
সময় ফেরারী হাঁটে
জীবনের পণ্য চুরি ক'রে।
আমরা দেখে-ও দেখি না,
অথচ তারে-ই খুঁজে ফিরি।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

–আর কারণ এর অতিরিক্ত ফেণা

বিরাট সমস্যা! বিছানার চাদর, তোয়ালে আরও কত কি। শেষ পর্য্যন্ত মা ডাকলেন উমা আর রুমাকে ইস্ত্রী করায় সাহায্য করার জন্য। হাঁ, অনেক জামাকাপড়। কিন্তু কতটুকু সাবানই বা মা ব্যবহার করেছেন? মা সানলাইট সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচেন। এর অতিরিক্ত ফেণা বিনা আছাড়েই জামাকাপড় থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।

আপনার জামাকাপড় কাচার জন্যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন।

সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বম্বে এজেন্ট।

শনিবারের সন্ধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ বসু

শহরের এক নিরিবিলি পাড়ায় অল্প একটুখানি নাতি-প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাস্তা, খালি জমির ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় নতুন বাড়ির সারি। নম্বর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যেতে বেশ লাগছিল বিজয়ের। এখানে আসতে হবে বলে সকাল সকাল সে বেরিয়েছে, এখনও রোদের তাপ বাড়ে নি. কোথাও সাড়া শব্দ বিশেষ নেই।

যে বাড়িটা একটু দূর থেকে সে আন্দাজ করেছিল তারই সঙ্গে নম্বর মিলল। বাদামী রঙের ছোট দোতালা বাড়ি, গা বেয়ে উঠেছে কি একটা লতা ছোট ছোট ফুলে ছাওয়া। সামনে নাম লেখা বি, এম, মিত্র। লোহার খুলে সযত্নে লালিত ছোট একটুখানি বাগানের মধ্যে লাল কাঁকরের পথ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে সে ঘন্টির বোতাম টিপলে। দরজা খুলে একটি মেয়ে তাকে সেই ঘরেই বসতে বললে। ঘরটি ছোট, কিন্তু সুন্দর করে সাজানো। সোফায়-গদি ও কুশানে কোথাও এতটুকু ধুলো নেই, চলতে মায়া হয়। যেমন প্রোগ্রাম সে কল্পনা করেছিল মোটেই তা নয়, মনে মনে এই ভেবে একটা ছবির দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে এমন সময় একটি তরুণী ঘরে ঢুকল। বিজয় ঘুরে দাঁড়াল।

"মিস মিত্র ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এটা বোধ হয় আপনার," বলতে বলতে বিজয় পকেট থেকে চিঠিটা বার করলে।

মেয়েটি কিছু ক্ষণ ধরে মেয়েটি নিষ্পলক চেয়ে রইল তার হারানো সম্পত্তির দিকে, ক্রমে জিজ্ঞাসায় দৃষ্টি কেটে গিয়ে বিস্ময়ে ভরে উঠল চোখ। তার পর খামটা হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে চলল, "দ্যাখ দ্যাখ আমার বই।ক, আমারই বটে—যাদুটুকের পথ দাদা দিয়েছিলেন।··· শেষ পর্যন্ত লিখিয়ে পেলুম তা হলে—ও, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে —দাঁড়ান, মানে বসুন, দাদাকে ডাকি, উনি এখানেই আছেন।" দরজার কাছে গিয়ে সে অস্ফুট স্বরে ডাকলে দাদাকে, তার পর ফিরে এসে বললে,

"বসুন না।"

বিজয় বসল চেয়ারে। মেয়েটি তখনও চিঠিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, সে দিকে চেয়ে বিজয় বললে, "আপনার ব্যাগটা ভাল করে না, ওটা বরং দাক্তিয়ে নেবেন।"

"হ্যাঁ, এর আগেও দু একবার হাত থেকে খুলে পড়েছে।"

দাদা এলেন, বোনের চেয়ে বছর দশেক বড় মনে হয়। মিস মিত্র তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, "দেখ দাদা, কিনিয়ে পেয়েছি, এই ভদ্রলোকটির দয়ায়।"

দাদাও বিজয়কে অনেক করে ধন্যবাদ জানিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে।

মিস মিত্র বিজয়ের দিকে চেয়ে বললে, "জানেন মিনটার গুপ্ত, দাদা ভেবে ছিলেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কোনও ফল হবে না, আমি কিন্তু বলেছিলুম এখনও জগতে অন্তত

কয়েকটি ভাল লোক আছেন।" তার পর একটু থেমে সহাস্যে যোগ করলে, "অবশ্য জানতেই যবে যে আমারও আশা প্রায় ফুরিয়ে আসছিল।"

"আমার অবশ্য আরও আগে আসা উচিত ছিল, বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে দু দিন হয়ে গেল, কিন্তু…" হঠাৎ বিজয় বলে ফেললে, "কিন্তু আমার মার খুব অসুখ, তাই সময় করতে পারি নি।"

ভাই বোনের চেহারা থেকে সব প্রসন্নতা মিলিয়ে গেল, আন্তরিক সহানুভূতি জানালে দু জনেই। তার পর বিজয় যখন ভদ্রলোকের কাছে বর্ণনা করছে কি করে নেহাত জাগাক্রমে ঘড়িটা তার হাতে ঠেকেছিল, মেয়েটি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরে ফিরে এল তার হাতটি মুঠো করে। চোখের কোণ দিয়ে বিজয় লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভাঁজ করা নোট সে গুঁজে দিলে দাদার হাতে। ভদ্রলোক টাকাটা এগিয়ে ধরলেন বিজয়ের দিকে, সামান্য একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, "যদি দয়া করে এটা নেন… আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে—"

"না না, পুরস্কারের কিছু প্রয়োজন নেই," বিজয় তাড়াতাড়ি প্রত্যাখ্যান জানালে।

প্রসারিত হাতটা শুধু গুটিয়ে গেল না, কিন্তু দাদা কিছু বলবার আগেই বোন বললে অনেকখানি সংকোচ জড়ানো সুরে, "পুরস্কার নয়—আপনার কাছে আমাদের ঋণ তো এমন করে শোধ হবার নয়—তবে আপনি নিলে আমাদের ভাল লাগবে এই আর কি।"

বিজয় তাকাল তার ঈষৎ লজ্জিত মুখের দিকে (যে মুখ, এর পরে জীবনে যত বার তার মনে পড়েছে), বললে, "কোনও ঋণ নেই। আপনাদের মত লোকের উপকারে আসাটাই আমার পুরস্কার।" তার পর সে উঠে দাঁড়াল, বিদায় নেবার ভঙ্গিতে।

"অন্তত একটু কিছু খেয়ে যান।" মিস মিত্রের কণ্ঠে এবার বাজল উৎকণ্ঠিত অনুনয়।

বিজয়ের খুব ইচ্ছা হল বসে পড়ে, কিন্তু বললে সে "আমাকে মাপ করবেন, আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে; তা ছাড়া এই একটু আগে খেয়ে বেরিয়েছি।"

দু জনে তার সঙ্গে এল গেট পর্যন্ত। দাদা বললে, "অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার গুপ্ত। আশা করি আপনার মা শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবেন। কখনও কোনও রকমে যদি আপনার কাজে লাগতে পারি দয়া করে জানাবেন।"

"নিশ্চয়।"

হালকা পায়ে পথটুকু পার হতে হতে সমস্ত মন ভরে এক অভিনব আনন্দ অনুভব করলে বিজয়; ব্যক্তিগত দুর্ভাবনা সব মুছে গেল তখন।…সত্যি কি চমৎকার লোক এরা, কি সজ্জন আর ভদ্র! কেমন সরল, সহজ, স্বাভাবিক ভাবে জানালে কৃতজ্ঞতা, জানালে সহানুভূতি মার অসুখের কথা শুনে—একটুখানি বাহ্যিকতা নেই—ঘড়ি ফিরে পাওয়ার আনন্দের মতই তা আন্তরিক। পুরস্কার দিতে চাইবার ভঙ্গিটুকু কি সুন্দর! ভাল ঘর, ভাল শিক্ষার থেকেই সম্ভব এমন শিষ্টতা ও সৌজন্য—বড়লোকদের এই গুণ যাই বল স্বীকার করতেই হবে। কত অন্য রকম আমি ভেবেছিলাম মিস মিত্রকে…ছি ছি, কত কিই না ভেবে নিয়েছিলাম! না না, ঘড়ি ফিরিয়ে দিয়ে ভালই করেছি…

নিজের ঘড়ির দিকে এক বার তাকিয়ে বিজয় বাসের রাস্তার দিকে পা চালিয়ে দিলে।

প্রথমে ব্যাংকে গিয়ে সে কিছু টাকা তুললে—তার নাতিবৃহৎ পুঁজির একটা বড় অংশ। তার পর চিএমও করে টাকাটা পাঠিয়ে দিলে দাদাকে, লিখে দিতে ভুললো না মার চিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব করতে। আপিসে গিয়ে পৌঁছাল [illegible] কাটায়।

বেলা এগারোটায় চা দিয়ে যাওয়া হয় টেবিলে টেবিলে, সেটা শেষ করে বিজয় সেন রোহিণী বাবুর কাছে, যার অসুখের কথা জানিয়ে ছুটি চাইবে কয়েক দিনের। রোহিণী বাবু অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন, বললেন, "এ কি ঠাট্টা পেয়েছ নাকি! এখন এত কাজ যে কারও নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই, সবাই ছিলে পেয়ে ওঠা যাচ্ছে না—এ সময় কেউ ছুটি পায়! তাও যদি পত্র ক দিন ধরে ফাঁকি না দিতে।"

"জানি স্যার, কিন্তু কথা দিচ্ছি যাবার আগে সব কাজ শেষ করে দিয়ে যাব। আজ রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করে এখান থেকে সোজা স্টেশনে চলে যাব। সোমবারই ফিরে আসব—রবিবার বাদ দিয়ে মোটে তো তিন দিন।"

কলমটি নামিয়ে রেখে রোহিণী বাবু এবার চেয়ারে হেলান দিলেন, নীচুমুখে চেয়ে রইলেন বিজয়ের দিকে। ঠোঁটের কোণে হাসির ক্ষীণতম রেশ মাত্র, কিন্তু ঘাইকোকালের ফাঁকে চোখ গভীর, চিন্তান্বিত। কোনও কিছু ঠিক মনের মত হলে এই তার ভঙ্গি। কিন্তু এত কাজের তাড়ার মধ্যে ব্যক্তিগত সুখের খাতিরে নষ্ট করবার সময় নেই, তাই অন্তরের সুখ গুলল তার। "আরে এখন তোমার কথা বার্তা কি মোটেই একেবারে ছিপে নেওয়াটি! Sorry, ছুটি কুটি এখন হবে না।" বলে কলম তুলে নিয়ে আবার তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

"কিন্তু আমার মা মারা যাচ্ছেন, এখন না গেলে হয়তো তাঁকে দেখতেই পাব না।"

হাতের কলম না থামিয়েই নিতান্ত অবহেলাভরে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সব মা বাবা আছে আমাদের। বছরে অনেক হয়।"

এতখানি বিষ উদ্গারের অভিপ্রায় তিনি পান নি আগে। আজ কিন্তু বিজয়ের রক্তের আগুন পরিবর্তে বার্ধক্যের বেদনায় ভরে উঠল। এক বার ভাবলে বাবার চিঠিটা বার করে দেখায়, কিন্তু তখনই বুঝলে কোনও লাভ হবে না। রোহিণী বাবু আজ ক্ষেপে আগুন হয়ে নিজেকে, মনে বিশ্বাস করলেও ছেড়ে দেবেন না তাকে।

টেবিলে ফিরে এসে সে জোর করে নিজেকে বাঁধা করলে কাজে মন বসাতে, আর সব কিছু ভুলে যেতে। এবং সর্বদা মনের তলে এক তারাক্রান্ত অনুভূতি সত্ত্বেও সারা দিনে সে যা কাজ শেষ করলে সাধারণত তিন দিনেও তা করে না। ইতিমধ্যে এও স্থির করে ফেললে যে শনিবার দুপুরের গাড়িতে সে বাড়ি যাবে। তার মধ্যে যদি বিপদ কেটে যায়, যদি বাবার চিঠি আসে যে মা ভাল হয়ে উঠছেন, তবু সে যাবে—কত দিন মাকে সে দেখে নি···কত বার করে মা তাকে লিখেছেন যেতে। চেষ্টা করবে সোমবার সকালে ফিরে আসতে, কিন্তু যদি সম্ভব না হয় তা হলে··· তা হলে চাকরি যদি যায় তো যাবে। কিন্তু কে জানে, গভীর জল্পনা কল্পনাই নির্ভর করছে ভাগ্যের দয়ার উপর—হয়তো এরই মধ্যে বাড়িতে অপেক্ষা করে আছে চিঠি, ভয়ংকর চিঠি—

বুক দুরু দুরু বুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠল বিজয়। চিঠি কিছু আসে নি। মনের মধ্যে আশঙ্কাও উঁকি দিতে থাকল কমে। বারে বারে বললে নিজেকে কিছু একটা হবে নিশ্চয় নিশ্চয়ই দাদা।

[illegible] নিয়ে বসল [illegible] দিয়ে দেখা যায় পশ্চিমের আকাশে ঘন হয়ে [illegible] মেঘ, বাতাসে ভয়োট ভাব। শুরু অন্ধকার [illegible] কালবৈশাখী, কালবৈশাখীও ভাল মন বলছে [illegible] কয়েক দিন ধরে মায়ের সঙ্গে [illegible] নি। তাকে কাছে ডেকে বললে,

"দুই ছেলেই আমার পড়াশুনো একেবারেই বন্ধ করেছে দেখছি।"

রাহু সাম্বনার তাকাল বাবার দিকে, যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, তারপর চোখ নিচু করে আস্তে আস্তে আরম্ভ করলে, "তুমি রাগ করেছিলে, ভাই—"

কিন্তু কথা শেষ হল না, বিজয় হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, "কে রাগ করেছে তোমার ওপর, তুমি আমার ছোট মা, যার ওপর কেউ রাগ করতে পারে?"

রাহু কোনও জবাব দিলে না, শুধু ঠেলে ঠেলে ওঁকে এল বাবার কাছে, নিঃশব্দে ফেললে দু ফোঁটা চোখের জল বাবার ঘাড়ে মাথা রেখে। অনেকটা আপন মনে বিজয় আবার বললে, "মার ওপর কেউ রাগ করতে পারে—তুমি যে আমার মা।" তারপর রাহুর চোখ মুছে দিলে, গালে চুমো খেয়ে বললে, "যাও বই নিয়ে এস। পড়া শেষ হলে গল্প শুনব—রবিবারের পাওনা গল্পটা।"

রাহু এক ছুটে বই নিয়ে এল, আলো জেলে বসতে না বসতেই হঠাৎ ঘুলো-ওড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে সব উলটো পালটা করে দিলে। দু জনে মিলে তাড়াতাড়ি বন্ধ করলে কাঁচের জানালা। বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে।

পড়তে পড়তে আজ এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা কেটে গেল। যাবখানে শুধু একটুখানি সময় নষ্ট হল বাজে কথায়।, বৃষ্টি তখন প্রায় থেমে গিয়েছে, ঘরের হাওয়া জমজমে ঠাণ্ডা। রাহু বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে থেমে থেমে রিডিং পড়ে চলেছে। বিজয় মাঝে মাঝে তার উচ্চারণ শুদ্ধ করে দিচ্ছে অথবা দিচ্ছে প্রশ্নের জবাব। রাহুর চোখের কোণে জলের দাগ, সেদিকে তাকিয়ে বিজয়ের একে একে মনে পড়ল অনেকগুলি কথা: ওকে যে সে চড় মেরেছিল, পর দিন সামান্য একটা প্রশ্নের জবাবে চীৎকার করে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল, তারপর দুর পড়া নিয়ে বিরক্ত হয়ে কি কটু কথাগুলি বলেছিল মালতীর সামনে। সেই সেইক্ষণের রাহুর চেহারা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল চোখের সামনে। এখন আবার ওর ঐ ভেজা চোখের দিকে চেয়ে মনে হল গত কয়েক দিনের দুঃখ বেদনা যেন এখনও জড়িয়ে আছে ওকে—যদিও এ সন্ধ্যার পরে সব ভুলে যেতে নিশ্চয় দেরি করবে না ওর শিশু-মন।

"রাহু অনেক ছবিওলা নতুন গল্পের বই বেরিয়েছে, একখানা চাও তুমি?" আপিসে সে দিন এক নতুন প্রকাশিত মোটা বই দেখেছে বিজয়, সেটার কথাই ভাবছিল সে।

বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখ তুলে তাকাল রাহু। বিজয়ের মনে হল ওর চেহারার শেষ ছায়াটুকু যেন এই বার কেটে গেল।

"সত্যি, বাবা; সত্যি?"

"হ্যাঁ, অবশ্য তুমি যদি ভাল হও।"

"হ্যাঁ, আমি খুব ভাল হব। কখন দেবে বাবা?"

"দেখি, শনিবারে হয়তো।" সে দিন সে মাইনে পাবে।

"আজ কি বার বাবা?"

"বুধবার।"

বাকি দিনগুলি রাহু খুব মনোযোগ দিয়ে গুনলে তার আঙুলে।

"অনেক ছবি বাবা? রঙীন ছবি?"

"হ্যাঁ।"

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমের আগে অন্ধকার ঘরে বিজয় আর মালতীর সামান্যক্ষণ কিছুক্ষণ কাটে ঘরোয়া আলোচনায়। সে দিন সামান্য দু একটা কথা ছাড়া আলাপ আর এগোল না। কিছুক্ষণ পর মালতী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে বল তো? কাল রাত্তির থেকে তোমাকে যেন খুব চিন্তিত দেখছি।"

"কই কিছু নয় তো," একটুখানি খন্ন হাসির সঙ্গে বিজয় বললে। তারপর কি ভেবে যোগ করলে, "আপিসে খুব কাজ পড়েছে, তাই একটু ক্লান্ত।"

মালতী আর কিছু বললে না। অন্ধকারের আড়ালে অলস মনে নিজেকে প্রশ্ন করলে বিজয়, কেন সে এড়িয়ে গেল, কেন সে স্ত্রীর কাছে মন খুলে তার ভার লাঘব করলো না। ···বিশেষ কোনোও কারণ নেই। শুধু কি এক সূক্ষ্ম সংকোচ তার মুখ বন্ধ করে দিলে—কেমন এক আশঙ্কা যে ও ঠিক তার নিজের মত করে বোধ করবে না, করতে পারে না। স্ত্রীকে সে ভালবাসে তাতে সন্দেহ নেই—দুজনের মধ্যে লুকোচুরি প্রায় নেইই। তাদের, দুরূপ দুর্ভাবনায় কত দিন শুধু পরস্পরের উপলব্ধি থেকেই তারা পেয়েছে গভীর সান্ত্বনা। কিন্তু মালতী কি ঠিক বুঝবে (বিজয় কি আশা করতে পারে তা) যার সম্বন্ধে তার আজকের এই আবেগ, তার এই অতি ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম আবেগ! তার গোপন অপরাধের জ্বালা, সেই অপরাধ ক্ষালনের প্রাণান্তকর ইচ্ছা, তার প্রার্থনা যে মা যেন বেঁচে যান যাতে সে আর একটা সুযোগ পায় তাঁকে সুখী করবার—শুধু ভালবেসে আর অনুভব করতে দিয়ে সে ভালবাসা···না না, এ সব এত গভীর, এত ব্যক্তিগত যে ঠিক এই অবস্থায় না পড়লে কেউ কখনও তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না, সমবায়ী হতে পারে না। তা ছাড়া, মালতীর আচরণে ও কথায় তার মার প্রতি যে একটুখানি শৈত্যের প্রকাশ পায় তার থেকেও যার সম্বন্ধে দুজনের মধ্যে কেমন একটা সংকোচ গড়ে উঠেছে, যার ফলে তাঁকে নিয়ে বেশী কথা তাদের হয় না।

যদি কোনও সংকটের ভিতরে পড়ে মা আর তার স্ত্রীর মধ্যে এক জনকে বেছে নিতে হয় আমাকে, বিজয়ের আত্মবিশ্লেষণ চলতে লাগল, তা হলে কি করব আমি না—হয়তো স্ত্রীকেই বেছে নেব। কিন্তু এর যদি শুধু এই হয় যে কোন ভালবাসা বড়, কোন ভালবাসা বেশী, আমার মার না স্ত্রীর—তা হলে, তা হলে সত্যিই কি সন্দেহ থাকতে পারে এর মধ্যে? এমন মুহূর্ত অনেক বার এসেছে যখন মালতীর প্রতি আমার প্রেম হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে উঠেছে, আবার কখনও ঝগড়া করেছি, প্রায় ঘৃণা করেছি দু জনকে। কিন্তু মা চিরদিন ভাল বেসেছেন বিনা সর্তে, বিনা অভিযোগে দুঃখ, ব্যর্থতা হতাশা হয়তো ছিলো তাতে, কিন্তু ছিল না রাগ, বিরক্তি বা তিক্ততা এক বিন্দু, যাই কেন না আমি করে থাকি ও বলে থাকি। রোগের দিনে আমার স্ত্রী যখন এত যত্নে আমার সেবা করে, তখন তার নিঃসংশয় ভালবাসা আর অনুরাগের মধ্যেও কি একটুখানি—অন্তত এক কণা—মেশানো থাকে না বৈধব্য আর ব্যক্তিগত সহায়হীনতার আশঙ্কা? কিন্তু মা ছেলেকে যত্ন করবে, সেবা করবে, প্রাণ দেবে, শুধু তারই জন্য, শুধু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে অনেকে—তাদের মধ্যে ক'জন মা আর ক'জন স্ত্রী!

"আচ্ছা মালতী", শুদ্ধ অন্ধকারে প্রখর তীব্র আবেগের ভিতর দিয়ে হঠাৎ শুনলে মালতী, "বল তো সংসারে মায়ের ভালবাসা ছাড়া সত্যিকারের ভালবাসা আর কিছু আছে কি?"

"কি যে অদ্ভুত তোমার প্রশ্ন!" শুধু মন্তব্য করলে মালতী, ঈষৎ বিরক্তির ভাঁজ মাখানো [illegible] ঘটে তখনই মনে হল বিজয়ের। অন্তত [illegible] ভালবাসার মত নয়, বিশেষ করে মালতীর [illegible] স্ত্রীকে। মালতীকে আর কারও [illegible] নয় সে, হঠাৎ বলে, উঠল মন। [illegible] কিটিকে—আর ওকে ঘিরে যা [illegible] সে দিন···লজ্জা হল ভীষণ। মালতীর

একটা হাত তুলে নিয়ে বললে সে তাড়াতাড়ি, "একটু রসিকতা করছিলুম তোমার সঙ্গে। নাও এবার ঘুমিয়ে পড়, রাত হয়েছে।"

"একবার দেখে আসি রাণুকে," বলে উঠে গেল বাসন্তী। ফিরে এসে বললে, "ঘুমোয়ে ঘুমাচ্ছে মেয়ে। এ ক'দিন বড় ছটফট করেছে মেয়েটা।"

"আজ ঠাণ্ডা পড়েছে তো," চোখ বন্ধ রেখেই বললে বিজয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ঘটক গড়ে দিতে পারো

গৌরীশঙ্কর দে

যা কিছু অমর শুধু মানুষের মনে।
এ আকাশ, রাঙ্গামেঘ, সোনালিদিনের স্নিগ্ধমাটি—
কিছুই থাকেনা স্রোতে, ক'রে যায় কখন গোপনে ;
মাটিতে পাবে কি খুঁজে বিগত ফসুর সে দোপাটি।

তবু যদি কিছু শুধু মৌমাছির সাথে ভাগ করে
নিতে পারো আকাশের বিশাল নীলাভ পুষ্প থেকে,
মৌচাকের পাশাপাশি তোমার সংসার দিয়ো গড়ে ;
আশ্বস্ত মৌমাছি-মন মানুষেরই মনে কিছু রেখে।

মনো অভিসার

দেবব্রত বিশ্বাস

মধুর মৃদঙ্গ তানে নাচ তো বঁধুয়া
রতন মঞ্জীর পরি চরণ কমলে
তব নৃত্য তালে তালে আমি ধরি ধুয়া
সাথে সাথে কর তালি দিই কুতূহলে।
তব নৃত্যে দোলা দিক উতলা পবন—
দোলা দিক বন উপবন,
নাচুক আপন মনে মনের মধুরী,
তোমার নৃত্যের ছন্দ ঘেরি।
সুললিত ভঙ্গিমায় ছন্দে ও তালে
বাজাক প্রেমের বাঁশী মনের রাখালে।
আসুক উজান আজ মন যমুনায়
তোমার অলিন্দ কূলে নৃত্য ভঙ্গিমায়
যেমন করিয়া রাধা কালীদার সনে
নেচেছিল রাস নৃত্য মধু বৃন্দাবনে—
চন্দ্রিমার চন্দ্রকলা পূর্ণ পূর্ণিমায়
নব নটবর সনে রাসের মেলায়
তেমনি করিয়া আজ ও চন্দ্রবদনী
গুঞ্জরিয়া তোল তব নূপুরের ধ্বনি।
সে ধ্বনি ভাসিয়া যাক আকাশে বাতাসে,
সে ধ্বনি মিশিয়া যাক মধুর আবেশে
সে ধ্বনি জাগাক প্রাণে মধু বৃন্দাবন
রাধা রূপে তুমি আজ হর মোর মন
চলুক প্রেমের খেলা গোপনে গোপনে
বাজুক প্রেমের বাঁশী মন বৃন্দাবনে
মনেরে সাজাই কানু মনের অজ্ঞাতে।
মনো অভিসার করি তোমার সঙ্গেতে॥

বিশ্বভারতী

বিবৃতি

তিব্বত-চীন-ভারত

লাসা হইতে গত দুই সপ্তাহ যাবত যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা উদ্বেগহীন অশোভাস্তির সৃষ্টি হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। সন্নিহিত রাষ্ট্র হিসাবে ভারতীয় সরকারের শঙ্কা ও উদ্বেগ খুবই স্বাভাবিক। ভারতের সুদীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব এতকাল পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিব্বতের সাম্প্রতিক ঘটনায় ইহা বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছে যে, দুর্ভেদ্য রক্ষ-প্রাচীর হিমালয়, যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে উত্তর সীমান্ত রক্ষার কার্য করিয়া আসিতেছিল তাহার উপর আর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিবে না। ভারতবর্ষের একটি উত্তর সীমান্ত আছে এবং তাহা রক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনও আছে এবিষয় অপ্রিয় হইলেও স্বীকার না করিয়া আর নিস্তার নাই। অবিলম্বে অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। দুর্গম দেশ তিব্বত—সেখান হইতে সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মারফত খবর পরিবেশনের নানাবিধ অন্তরায় রহিয়াছে। আর স্থানে স্থানে চীনা সৈন্য ও রসদবাহিনী এবং সেনার দ্বারা রচিত দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন সঠিক ধারাবাহিক খবর যুদ্ধিবিগ্রহে আসিবার উপায় নাই। লোকপরম্পরায় ও লাসা সহরে অবস্থান নানাদেশীয় কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠান মারফত যতটুকু খবর পাওয়া যায় তাহাই গুরুত্বিত হইয়া খবর-পিপাসু জনসাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে। খাম্পাদের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে চীনাবাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে, চীনারা দূর পাল্লার কামান ব্যবহার করিতেছে। দালাই লামার প্রাসাদ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, পূর্ব তিব্বত ও মধ্য তিব্বতের অংশ বিশেষ হইতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া রাজধানী লাসা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, স্থানে স্থানে তীব্র সংঘর্ষ হইয়াছে। ভারতের কনসাল জেনারেলের আফিসেও গোলাগুলি পড়িয়াছে, চীন সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় কন্‌সাল চীনা সামরিক এলাকায় নিরাপত্তার গ্যারান্টি গ্রহণ করে নাই, বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে উত্তর ও পশ্চিম তিব্বতে। দালাই লামার কোন খোঁজ আজ পর্যন্ত মিলে নাই তবে আশা করা যায় তিনি নিরাপদে তিব্বতীয় নিজ পরিবেশেই কোথাও রহিয়াছেন—এখন পর্যন্ত তিব্বত সম্বন্ধে এটুকুমাত্র খবর মিলিয়াছে এবং ইহার আনুষঙ্গিক সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবার কোন উপায়ও নাই।

তিব্বতের বর্তমান ঘটনার পশ্চাদপটে রহিয়াছে চীন—তিব্বতের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিদ্বেষ। যখনই সুবিধা মিলিয়াছে, চীন তিব্বত আক্রমণ করিয়াছে এবং অংশবিশেষ অধিকার করিয়া নিয়াছে। আবার আক্রমণকারীর অস্ত্রবলের অভাব ঘটিলেই তিব্বতীয়েরা চীনাদের অধিকার হইতে নিজেদেরকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপ ঘটিয়া আসিয়াছে এবং ইহারই নজীর দিয়া চীন তিব্বতের ওপর নিজের আধিপত্য দাবী করিয়াছে এবং ১৯৫১ সালের তিব্বত-চীন চুক্তিতে তিব্বতকে প্রকারান্তরে মহাচীনের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। দীর্ঘকালের লামা-শাসন তিব্বতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়া আসিতেছিল। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় রাতারাতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রবর্তন একপ্রকার দুঃসাধ্য মনে করিয়া চীন সরকার তিব্বতকে অনেকটা স্বাং-শাসিতের মর্যাদা দিতে বাধ্য হইয়াছিল। আশা ছিল, ক্রমে তিব্বতকে পরিশোধিত করিয়া মহাচীনের সামিক রাজনৈতিক মতবাদের অংশীদার করিয়া নেওয়া যাইবে। পূর্বাঞ্চলের খাম্পাদের সঙ্গে মূল চীনের অনেককালের বিরোধ। ১৯১৮ সালে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের দেশাংশ মূলচীনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হয় এবং সেই অবধি তাহারা উদ্বাস্তু যাযাবরের মতন স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে এবং আজিকার খাম্পা অভ্যুত্থানের মূল হয়তো পূর্ব-তিব্বতের গৃহহারা খাম্পাদের অসন্তোষের মধ্যেই নিহিত ছিল। বর্তমান চীন কর্তৃক তিব্বতের চীন-ভুক্তি তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ অনড় সংস্কার-সম্বল ঐতিহ্যসর্বী তিব্বতীয় সমাজে নব্য ও সংস্কার-বিমুক্ত চৈনিক সভ্যতা পূর্বাপরই একটা ভীতির বিষয় বলিয়া গণ্য হইতেছিল। শুধু যে চীন রাষ্ট্রের অধীনতা মানিয়া লইতে অসম্মত বলিয়া তিব্বতী খাম্পাদের এ আন্দোলন, তাহা নহে। ধর্মে এবং সামাজিক ব্যবহারেও চৈনিক আধুনিকতার অনুপ্রবেশকেও তাহারা আটকাইবার জন্য বদ্ধপরিকর।

যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াও চীন সরকার তিব্বতী অভ্যুত্থানকে রুখিতে সমর্থ হয় নাই। অবশ্য একথা সবাই জানে এই অভ্যুত্থানকে অস্ত্রবারা বন্ধ করিতে চীন সরকারের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না। স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে চীনা সরকারের নতুন আইন প্রবর্তন লইয়া কিছুদিন যাবৎ ছোট খাটো আপত্তি সভা বা এমন কি বিরোধিতা দেখা দিয়াছিল। প্রকাশ যে, মার্চমাসের প্রথম ভাগে চীন সরকার দলাই লামাকে পিকিং-এ সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। দাপেংয়ের বৃদ্ধি অকস্মাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে এখনও স্পষ্ট। তবুও চীনের আমন্ত্রণে হয়তো দলাই লামা সাড়া দিতেন কিন্তু মন্ত্রীসভা (কাশাগ) তাহা অনুমোদন করিল না। ইতিমধ্যে উত্তর ও পূর্ব হইতে বিদ্রোহীরা লাসার উপকণ্ঠে এবং ক্রমে লাসার অভ্যন্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। এরপর অবধি নানাপ্রকার সত্য, অর্ধসত্য মিথ্যা ও নিছক গুজব ইত্যাদি মিশাইয়া যে সব খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দলাই লামা সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। শোনা যায়, নেহেরুজীকে মধ্যবর্তী রাখিয়া চীন-তিব্বতের এই বিরোধ মিটাইবার জন্য বলা হইয়াছিল, বা হইবে। কিন্তু বিগত '৫০ সালে অনুরূপ ঘটনায় কোপর দালালি করিতে গিয়া যে ধমক খাইয়াছিলেন তাহাতে এই নিয়া তিনি মুখ খুলিতে সাহস পাইতেছেন না, পার্লামেন্টের বক্তৃতায় সে আভাসই দিয়াছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলেও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রকাশের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ—আন্তর্জাতীয় শিষ্টাচার লঙ্ঘন না করিয়া ভয় রাষ্ট্র সাজিবার তাগিদ আমাদের রহিতেই হইবে। কারণ সত্যসত্যই যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের কার্যকরী শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ, বস্তুতাবেই না আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক মানের প্রচার করিয়া বেড়াই।

মালদ্বীপে বিক্ষোভ

সিংহল দ্বীপের চারিশত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ মালদ্বীপে ছোটখাটো রকম বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। আয়তনে ১১৫ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা লক্ষেরও কম। সর্বশুদ্ধ ১২টি দ্বীপের মধ্যে তিনটি দ্বীপে বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশে মালদ্বীপ সরকারের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—সরকারী মহলের মতে হইতে এরূপ খবর

আসিয়াছে। তা ছাড়া, তইখন উচ্চপদস্থ মালে সরকারের প্রতিনিধি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের বক্তব্য পেশ করিয়া গিয়াছেন। সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা এতই খারাপ যে, তথায় বর্তমানে কি ঘটিতেছে সঠিক জানিবার উপায় নাই।

মালদ্বীপ একটি বৃটিশ রক্ষিত অঞ্চল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে বৃটিশের হাত নাই। দক্ষিণের আড়ু এটলে (প্রবাল দ্বীপকে এটল বলে) বৃটিশ নৌ বিমানের একটি অবতরণ ক্ষেত্র নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। এবং তাহা নিয়া মালে সরকারের সহিত আলোচনাও চলিতেছে। পূর্ব সঞ্চিত বিমান ঘাঁটি না করিয়া অষ্ট্রেলিয়া স্থায়ী বৃটিশ বিমান বহর যাহাতে মাল দ্বীপে প্রয়োজন বোধে নামিতে পারে সেই জন্যই এই বিমান অবতরণ ক্ষেত্র তৈরী হইবে। এইরূপ প্রচার করা হইয়াছে। আড়ু এটল—বাসী অতি ধনিক অনসাধারণ বিমান ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া কিছু রোজগার পাতি করিতে পাইবে। অথচ কেন্দ্রীয় মালে সরকার যদি বিমান ক্ষেত্র প্রস্তুতের হুকুম দিতে বিলম্ব করে বা না দেয় তবে রোজগারের পথ বন্ধ হইতে পারে এই আশংকায় আড়ু ও নিকটবর্তী আরও তিনটি দ্বীপের অধিবাসীরা মালে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দুর্বল নিরীহ ও গরীব দক্ষিণ মালদ্বীপের লোকেরা যে ঐভাবে নিজের ইচ্ছায় এ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের স্বার্থ এ চক্রান্তের উৎসানি দিতেছে মালে সরকারের ঘোষণা হইতে এরূপই মনে হয়। আড়, মাত্র একখানি মামুলি অবতরণ ক্ষেত্র তৈরী করিবার অছিলায় সেখানে যে সত্যিই একটি সুসজ্জিত সামরিক বিমান ঘাটি নির্মিত হইতেছে না তাহাই বা কে বলিবে? সিংহল ও ভারতের নাকের ডগায় সাম্রাজ্যবাদীর বিমান ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে এই উভয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতেছে। তাহা বলাই বাহুল্য। সিংহলে এই নিয়া তীব্র আলোচনা হইয়াছে কিন্তু পার্শ্বাত্যের মোহে মুগ্ধ ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে একটি ক্ষুদ্র প্রতিবাদও উচিত হওয়া উচিত ছিলনা কি? পাকিস্তান আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট হইয়া একটি অমিত্র বেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে। পর্তুগাল তাহার গোয়াকে সামরিক সরঞ্জামের সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করিতে সক্ষম। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র হইলেও মালদ্বীপের বিমান ক্ষেত্রকে ওজনের দিক দিয়া ছোট ভাবা সংগত হইবে না।

ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিতে পুনরায় অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছে। ইরাকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে পূর্বাপরই একটা আকস্মিকতার ছোঁয়াচ ছিল। কাশেম সরকারের রাজ্যভার গ্রহণ ও তৎপরবর্তী ঘটনা সমূহের বিচার করিলে একটা পারম্পর্যের অভাব বরাবরই লক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বাগদাদ প্যাক্ট ইরাক পুরাপুরি বর্জন করিয়াছে বলিয়া সুনির্দিষ্ট ঘোষণা হইয়াছে ২৪শে মার্চের পূর্বে তাহা জানা যায় নাই। অথচ এতকাল বাগদাদ প্যাক্টের অন্য অন্য অংশীদারগণ ইরাককে এই প্যাক্ট-গোষ্ঠীর বাহিরে রাখিবার কার্য করিয়া যাইতেছিল। পক্ষান্তরে ইরাক সম্মিলিত আরব রাষ্ট্র গোষ্ঠীর সভ্যপদও প্রত্যাখান করিয়াছে শুধু নয়—নাসেরের বিরুদ্ধে অতি রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা দিয়াছে। আভ্যন্তরীণ একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব যে ইরাক রাজনীতিতে চলিতেছিল অবশ্য সুস্পষ্ট না হইলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তাহা অজ্ঞাত ছিল না। অকস্মাৎ উক্ত ইরাকের মসুল অঞ্চলে যে রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ দেখা দিল তাহা এই প্রচ্ছন্ন অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ। কর্ণেল আরেফের নেতৃত্বে কাশেম-বিরোধী এই অভ্যুত্থান ইতঃমধ্যে কার্যকরী ভাবে দমিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই আন্দোলনকারীদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, স্বৈরাচারী হুবী-এস-সৈয়দের তাইগ্রেস অববাহিকা এই

কাশেম। কাশেম সরকারের পক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে যে আরেক—পল্লী আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নয়। বর্ষ বিদেশী কম্যুনিষ্ট পল্লীরা বাহির হইতে এই অভ্যুত্থানের প্রেরণা যোগাইয়াছে. ইরাকের মাটি হইতে এরূপ ধরণের মনোবৃত্তির মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিবার জন্যই কাশেম সরকার নির্মম দমন-নীতির আশ্রয় নিয়াছেন। বিভিন্ন দিক হইতে যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাহাতেই মনে হয়, ইস্লামের নব আন্দোলনের ভিত্তিতে উত্তর ইরাকে বিশেষ করিয়া মসুল অঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটিয়াছে এবং কাশেম সরকার প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করিয়া থাকিলেও ইরাকের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এই কম্যুনিষ্ট—অভিহিত আরেক পল্লীদেরকে অস্বীকার করার উপায় আর নাই। রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে পুনরায় একদিন ইরাক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করিতে হইবে—সেদিন খুব দূর ভবিষ্যৎ নয়।

যে কোন বিরোধী আন্দোলনকে কম্যুনিষ্ট প্ররোচিত আখ্যা দিয়া বিশ্বরাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচার করা একটা সস্তা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। আদর্শবিহীন জঙ্গী অভ্যুত্থান মুসলিম জাহানের ইতিহাসে নতুন নয়। ক্ষমতার লড়াইয়ে যে পক্ষ জয়লাভ করে রাজত্ব তাহার বা তাহার বংশীয় জনকয়েকের করায়ত্ত থাকে, যত দিন না অন্য পক্ষ তাহাকে পদচ্যুত করিতে সক্ষম হয়। রাশিয়ার অনুগ্রহকে উপলক্ষ্য করিয়া ইরাক গবর্ণমেণ্ট ভুয়া যোগসাজস প্রচার করিয়াছে এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার আমদানী করিয়াছে রাজনীতি ক্ষেত্রে। ইরাক সম্মিলিত আরব গোষ্ঠীভুক্ত হইতে অস্বীকার করিলেও মিশর এই সাম্প্রদায়িক দিগীরে কণ্ঠ মিলাইয়াছে। নাসারের সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা ইরাকের প্রতি সাধারণভাবে বৈরীভাব সত্ত্বেও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে উভয় রাষ্ট্রের ঐক্য রহিয়াছে। এমন কি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য সাহেব বিশ্বমুসলিমের উদ্দেশ্যে এই মর্মে এক ফতোয়াও জারি করিয়াছেন। যথার্থই ধর্মীয় আবর্তে মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি আজ সন্ধ্যারই হইতে চলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যদিও এখন পর্যন্ত ইরাক রাজনীতিতে এরূপ তীব্র রাজা বিদ্বেষের হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না তবু ও একটা সন্দেহ কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলা যায় না। কি জানি পশ্চিমী রাষ্ট্র সমূহের তৈল ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহাদের অদৃশ্য হস্তের খেলা কিছুটা হ্রাস পাইতেও পারে।

মিশর-ইরাক সম্পর্ক এবং আনুষঙ্গিক সংযুক্ত আরব গোষ্ঠীর সঙ্গে কাশেমী ইরাকের সম্বন্ধ সন্তোষজনক নয় এবং ফলশ্রুতির জন্য ইরাক নাসারের একাধিক অনুরোধ প্রত্যাখান করিয়াছে। ২৪শে মার্চের খবরে প্রকাশ, আরব লীগ—কুয়েত-সমস্যার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করিতে সম্মত হইয়াছে এবং তদনুসারে মার্চের শেষাশেষি এই সম্বন্ধে একটা বৈঠকে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মিলিত হইবার একটা ব্যবস্থা হইতেও পারে।

নীরব সম্মেলন

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকমিলান সাহেব রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও বন্ধু প্যারী, আটোয়া এবং আইসেন হাওয়ারের নিকট নিবাস ক্যাম্পডেভিড্ ঘুরিয়া পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, কানাডা ও আমেরিকান যুক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বার্লিন সমস্যার আলোচনা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ক্রুশ্চেভের সাম্প্রতিক ঘোষণা কথঞ্চিৎ সহজ এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে নীরব সম্মেলনের পক্ষে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টায় তিনি অনেকটা সফল হইয়াছেন, বলা যায়। উপরিলিখিত চতুঃশক্তি এবং বৃটিশ সরকার অবশ্যই রাজার মোটের উপর বিশ্বাস করিয়াছেন। তাহাতে নীরব সম্মেলনের সম্ভাবনা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নীরব সম্মেলনের

প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন ডাকার প্রয়োজন বলিয়া তাহারা জানাইয়াছেন, বৃটিশ সরকার রাজার অন্যান্য দাবী সম্বন্ধেও নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। চেক ও পোলাণ্ড রাষ্ট্রের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার দাবীও তাহাদের আংশিক অনুমোদন লাভ করিয়াছে। সম্মিলিয়া একটা মিটমাটের আবহাওয়া সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা রহিয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব বার্লিন সমস্যার অচিরেই সমাধান হইবে এরূপ আশা করা না গেলেও এবিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্র রচিত হইতেছে, খুবই সুখের কথা।

২৮।৩।৪৯

পুস্তক পরিচয়

একালের চোখে : অচিন্ত্যেশ ঘোষ
দাম : তিন টাকা
বিক্রয়ের : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের অনেক মূল্য ও ঘটনাকে সেকালের দৃষ্টিতে না দেখে একালের পরিবেশ ও বিশ্লেষণে মূল্য নির্ণয় করার সুনিপুণ প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—'একালের চোখে'র আকর্ষণীয় বিষয়ে। লঘু ও গুরুতর সকল বিষয়ই লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিকে সুতীক্ষ্ণ ভাবে আকর্ষণ করেছে। সমাজ ও সংস্কৃতির মূলে ব্যক্তির মৌলিক সম্পর্ক, সনাতনী সমাজ-ব্যবস্থার মূল্যমান একান্নবর্তী পরিবার, প্রাদেশিকতা, শক্তি-পূজার রূপান্তর, ধর্ম—এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক বিষয় স্থান পেয়েছে বইটিতে। আবার সেই সঙ্গে আছে মাইক সংস্কৃতি, ফরমিক প্রসঙ্গ, বাঙালীর পরিচ্ছদ ইত্যাদি দৈনন্দিন ও অনেকাংশে লঘু বিষয়ের অবতারণা।

আমাদের সমাজজীবনে যে প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে পদে পদে সংযোগ ও সংঘাত সৃষ্টি করে, অতীত এবং আধুনিক দৃষ্টিতে সেগুলিকে বিচার করার এবং সেই বিচারের যুক্তি ও পটভূমিকাকে অনায়াসে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণার রসায়নে বেশ পাকা গাঁথুনীতে মজবুত করে গড়ে তুলবার একটি রসাত্মক অথচ মননশীল শৈলীতে রচিত হয়েছে এই বইটির প্রবন্ধগুলি। রম্য রচনার ছলে তত্ত্ব ও তথ্যের নিরস কথাগুলিকে নানা কৌতুকের কোড়ন দিয়ে লেখক যেভাবে অনেক গুরু-গম্ভীর বিষয়কে রসাপ্লুত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তা এই বইটির একটি প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট। কিন্তু বড় ভোজের নিমন্ত্রণ পেয়ে চা খেয়ে বিদায় নিলে যেমন একটি আপসোস থেকে যায় বইটির বক্তব্য বিষয়ের বহু বিস্তৃতির জন্য সেরূপ একটি অতৃপ্তিবোধ নিয়ে বইটি শেষ করতে হয়

মহাভারতে বিদুর ও গান্ধারী :
অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং দাম : পাঁচ সিকা
২, কলেজ স্কোয়ার, কলি—১২

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতের আধুনিক রূপকাররূপে বাংলার জনসমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ

করেছেন। ত্রিপুরারি বাবুর কণ্ঠে, তাঁর মুদ্রিত ভাবগভীর ভাষায় মহাভারতের পুরাণ কথা যেন এক নূতন অনুভবে মনকে ভাবাপ্লুত করে তোলে। মহাভারতের মহান চিত্র ও চরিত্রগুলি তিনি এমন এক ভক্তিস্নিগ্ধ ভাব-ব্যঞ্জনায় এবং আধুনিক যুক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণী প্রতিভায় বর্ণনা করেন যে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ভারত-কথা শ্রবণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মহাভারতের এই অপূর্ব, কথাকে ভারতকথার যুগোপযোগী এই ভাস্যকে কালির আক্ষরে এক স্থায়ী সম্পদে রূপায়িত করে বর্তমান ও ভাবীকালের বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরবার প্রয়াসে অধ্যাপক চক্রবর্তী এখনও অনগ্রাহী হয়ে রয়েছেন। এ পর্যন্ত তিনি শুধু একটি ক্ষুদ্র পুস্তকে বিদুর ও গান্ধারীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু বাংলা দেশের পাঠক সমাজ আশা করে ত্রিপুরারি বাবু মহাভারতের মহান চরিত্র-গুলি স্থায়ী রচনার ভিতর দিয়ে স্থায়ীভাবে তুলে ধরে বাংলার সাহিত্য এবং সংস্কৃতিবোধকে সম্পদশালী করে তুলতে অগ্রণী হবেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি ক্ষুদ্র কিন্তু তবু মহাভারতের শ্রেষ্ঠতম দুইটি নর—বিদুর ও গান্ধারীর অপূর্ব চরিত্র অতি সহজ সরল ও প্রাণবান ভাষায় এই বইটিতে লেখক এমন করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন যে ভারত-কথার অনুরাগী পাঠকের পক্ষে বইটি শেষ না করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বইটির মুখবন্ধে বইটি সম্বন্ধে যথার্থভাবেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। বিদুর ও গান্ধারীর চরিত্রকথা পড়ার সঙ্গে বারবার মনে এই কথাই আসে যে মহাভারতের মহৎ-জীবন এবং মহাকাব্যের জীবন-কথা —কবিকল্পনার স্বপ্নলোক থেকে কবে মেঘার বন্ধনে স্বাধীন লাভ করবে?

সমর গুহ

দেশান্তরী : ইন্দ্রনাথ। ভ্রমণ কাহিনী
ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯০, কারিসন রোড, কলিকাতা—৭
মূল্য আড়াই টাকা

ভূগোলের বই আর ভ্রমণ-কাহিনী এদের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে সেটি আকাশ পাতালের না হলেও আকাশ-মাটির ব্যবধান। এই ব্যবধান পরিমাণগত নয়, চরিত্রগত। সন্দেহ নেই, দুয়েরই বিষয় ভূমণ্ডল। কিন্তু ভূগোল-লেখকের দৃষ্টিক্ষেত্র ভূমি আর ভ্রমণ-কথকের দৃক্‌পাত হ'লো অন্তর্ভূমি। প্রথমজনের কাজ শুধু দেখা, দ্বিতীয়জনের দেখাটা দেখা না দেখার মেলা। একজনের লক্ষ্য মানচিত্র অন্যজনের মানবচিত্র। বিশেষ ক'রে ভ্রমণ-কথক যদি বাঙালি হন্ তবে তো নতুন দেশ যখনই তাঁকে বেদনা করবে তখনই স্বদেশ তাঁকে বিক্ষিপ্ত করবে। আসলে ঐ 'বেষ্টিত বিক্ষিপ্তটাই' ভ্রমণ-কাহিনীর প্রাণ এবং এ কথাটা তাই প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করা যায় যে বাঙালির পক্ষেই শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী লেখা সম্ভব।

ইন্দ্রনাথের বইটি যথার্থ ভ্রমণ-কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু তার মধ্যেও একটু কথা আছে। মন কেমন-করা তাঁর যে একেবারেই নেই, তা নয়। তবে তাঁর মনে সর্বদাই বাষ্পবিহ্বল নয়। এ দিক থেকে এবং রচনার মেজাজী প্রকৃতির দিক থেকেও, তিনি অন্তর্মুখী-ধর্মী। বিদেশে তিনি স্বজন অথচ দেশকে এড়াতে পারছেন না। তাঁরো দেশ দেশে-দেশে, কিন্তু বাড়িটি দেশে। এই দিকটি তাঁর রচনায় একটি বড়ো সম্ভাবনার মতো ফুটেছে। খোলা মনের মানুষ ইন্দ্রনাথের কাছে সমস্ত পৃথিবীতেই উপকরণ ছড়িয়ে আছে, সংগৃহীত হবার অপেক্ষায়।

কিন্তু 'ইন্দ্রনাথ' কি সত্যিই ইন্দ্রনাথ? দুর্ঘটনাপিপাসু ইন্দ্রনাথ, রোমাঞ্চচকিতা ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তফাৎ

সর্বস্ব। বরং সেই তুলনায় রোমান্টিক শ্রীকান্তকেই তাঁর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে: 'মনে হত কোন রূপকথার দেশের হস্তিন প্রাণীদের বেলা পৃথিবীর অন্ধকারের ওপারে মিটমিট করে জ্বলছে। তারপর বিছানায় চুকতাম বই নিয়ে, ঐ অঞ্চলটা শান্তির মধ্যে ঘুম আর জাগরণ যে কখন মিশে যেত টের পেতাম না।' (ইটালি ও গ্রীস, দেশান্তরী) সেই রূপচেতন শ্রীকান্ত, স্বপ্নাবিষ্ট শ্রীকান্ত।

লেখকের লেখনীর চোখ স্বপ্নের আবেশে মাঝে-মাঝে ঝুঁজে এলেও তিনি আমাদের বিশ্বিত ও আকুল দৃষ্টিতে অনেক জায়গা দেখিয়েছেন 'Guide' হিসেবে নয়, 'Friend' হিসেবে। সেই সখ্যের বন্ধুত্বই 'দেশান্তরী' গ্রন্থে পুরস্কার পাওয়া গেল।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কথা দাও : শ্রীঅমিয় জীবন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : মেঘদূত পরিবেশক প্রয়োজনং
৬৯বি, বিধান চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
দাম : [illegible] টাকা

'কথা দাও' বইটির অনেকগুলি গান ইতিমধ্যেই রেকর্ড হইয়াছে বা বেতারে স্থান পাইয়াছে। সুবিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এই বইয়ের ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'আধুনিক গীতিকার হিসাবে অমিয়জীবন বাবু শিল্পীদের পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন···আমার কাছে এই বইখানির মূল্য আরও বেশী গীতিকাব্য হিসাবে।' প্রেমেন্দ্র মিত্র বই-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন তাঁর গানের বইএর নাম 'কথা দাও'। সত্যই তিনি কথা দিয়াছেন, এমন কথা দিয়াছেন যার মাধুর্য সুরে, আরো বাড়িবে বলিয়াই আশা করি।"

তাঁর "আকাশ ছুঁয়ে থেকো", "আমার এ গান তুমি পাবে", "আমার পাশে ফুল ফোটে না" প্রভৃতি গানগুলির মধ্যে একটি অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গানগুলি যে কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার পর্যায়ভুক্ত। "সোনার তোরণ হতে রাঙা রবি", অথবা 'সেই আঁখিজল গান হয়ে ভাসে·····মালা হতে চায় তোমার গলায়" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে একটি বাচ্যাতিরিক্ত ভাব রহিয়াছে যাহা সত্যই অপূর্ব। "এই জীবনের কান্না হাসির পারে", "এই আসা আর যাওয়া", "ঘুম যদি নাহি ভাঙে" প্রভৃতি গানগুলির মধ্যে মরমিয়া সরলী কবির মন জাগিয়া উঠিয়াছে।

"তুমি গান রচ কবি" একটি অপূর্ব সুন্দর গান। 'পথের শুধায়েছি বার বার", "পথিক মেঘ—" প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হয় আমরা যেন আয়ারল্যাণ্ডের মাটিতে দাঁড়াইয়া Thomas More এর কাব্য পড়িতেছি। "তুমি গান রচ কবি"র লাইনগুলি এইখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"তুমি গান রচ কবি
আমি তারে গাই
তোমার মনের ছোঁয়া
কিছু আমি পাই।"

• •

তুমি আমি দুই তীর
মাঝখানে এ গানের খেয়া।
তোমার আমার মন
জমা গাঙে করে মেয়া নেয়া।

• • • •

ব্যথার কবিতাও তাঁর কম নাই। এই জন্যই তাঁকে মরমিয়া সরলী কবি বলিতে হয়। "বন্ধু যে দুঃখ দিলে",

"মন যেখানে আসবে তুমি", "মন যারে শুধু চায়" প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়িয়া পাঠক তৃপ্তিলাভ করিবেন। "স্বপ্ন-বলাকা পাখা মেলে আসে", "তারাভোলা ফুলের স্বপন" প্রভৃতি কবিতাগুলি ভাব, ভাষা-সম্পদ ও নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনাতে চমৎকার। ওঁর বহু কবিতা মাসিক পত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে, তবে গ্রন্থাকারে ওঁর কাব্য এই প্রথম প্রকাশিত হইল। কবির নিকটে আমার অনেক আশা রহিল।

গৌরী চন্দ

কাব্য-কাহিনী : শ্রীঅমোনাশ মুখোপাধ্যায়
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরুলাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
দাম : এক টাকা

সৈনিকের প্রাণবীণা (দ্বিতীয় পর্ব)
চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক—৬ বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা—১৪
দাম : পঞ্চাশ নয়া পয়সা

আলোচ্যমান গ্রন্থ দু'খানিই কাব্য গ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানিতে কুড়ানিশ পৃষ্ঠার মধ্যে বৃহদায়তন ছয়টি কবিতা স্থান পেয়েছে। সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যেই আধেকেলী ঢঙে অভিপ্রায়কে ছন্দ ব্যবহারের প্রয়াস স্পষ্ট। কিন্তু কবি অভিপ্রায়ের ছন্দের প্রাণস্পন্দন ঠিক ধরতে পারেন নি। তাই বিষয়বস্তুর গৌরব ও কল্পনার বিস্তার সত্ত্বেও কবিতাগুলি পড়তে গেলে হোঁচট খেতে হয়, পাঠকের মনকে আবিষ্ট করতে পারে না। ছন্দ-ব্যবহারের ত্রুটিবর্জিত রচনার আড়ষ্টতা-দোষ বাদ দিলে 'মহাকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত' ও 'বীণাকীর মনোবেদনা' শীর্ষক কবিতা দুইটি কাব্যরস পিপাসুদের ভালো লাগবে।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও ভাব-বৈচিত্র্য ও ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য এর কবিতাগুলি উপভোগ্য হয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে একটি আশাবাদী কবি-মনের, বলিষ্ঠ প্রকাশ সুস্পষ্ট। 'চৌঠা নভেম্বর' কবিতাটির রচনারীতির মধ্যে বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রভাব থাকলেও এটি একটি সুন্দর কবিতা।

কিসের লাগিয়া বাঙালী আজিকে ফেলিছ দীর্ঘশ্বাস
প্রাণের পূজারী তুমি কেন হবে ভাগ্যের ক্রীতদাস।
নব জীবন রচিতে
শুভ সমাজ গড়িতে।
নয়নানন্দ জীবনানন্দ আনন্দময় আজি।
প্রাণবিগ্রহ আজি দুর্দিনে মানবজন্ম মাগে।
নয়নের জলে মুছনারায়ণে আহ্বান করে যাই,
আমি কাহারে মহাজীবনের জয়গান আজি গাই।

শিবনাথ চক্রবর্তী

জাতক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ানা। দাম—এক টাকা।

শিশির বিন্দু : সমীরকুমার দত্ত
সাধারণ পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
দাম—এক টাকা

দুইজন কবির একজন বিখ্যাত, অন্যজন খ্যাতনামা নন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের কথা পাঠের

অধিক এবং 'শিশিরবিন্দু' মণীন্দ্রকুমার গুপ্তের প্রথম কবিতার বই। একটিতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তরালের আলো-অন্ধকার স্বর্গপ্রদেশের আবিষ্কার; অপরটিতে তরুণ-হৃদয়ের কখনো প্রেমের দ্বিধাকম্পিত আবেগ, কখনো সময়ের নির্মম অধিকারের আর্তি,—সবমিলিয়ে প্রথম জাগরণের, প্রথম সমুদ্রদর্শনের বিস্মিত ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে-সমস্ত তরুণ কবিরা কবিতা লেখার প্রেরণা অনুভব করেন তাঁদের কিরণ শ্রীগোপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরো সক্রিয় এবং সপ্রতিভ পরিণতির পথে অগ্রসরমান। মহৎ কবিরা পরিবর্তিত হন না, পরিবর্ধিত হন; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এ-সত্যের সমর্থন করবে। 'আতঙ্ক' অভিনবত্বের প্রয়াসী নয়, তার পূর্ববর্তী গ্রন্থের রক্তের মৌল চরিত্রের পরিশীলিত দ্বিতীয় আবিষ্কার। শ্রীগোপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের কবিতায় একদিকে প্রেমের অভিনবত্ব, অনেক সময়ে শরীরী যন্ত্রণা, অন্যদিকে বিবিধ রূপ এবং অলৌকিক অভিজ্ঞতার বৃত্তপ্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত। 'আতঙ্কে' প্রেম এবং অভিজ্ঞতার নিরপেক্ষ সমন্বয়; আরো গভীরতর শান্তি, নদীর মতো প্রাবিত, অকপট, বিস্তৃত, অতলস্পর্শ প্রাজ্ঞ শান্তির সন্ধান:

এখন আমি দ্বিতীয় শৈশবে
তোমার কোলে তোমার তলে যা
অমল হ'তে এসেছি, অনুভবে
জাগাবো বলে তোরের চেতনা।

আমাকে তুমি গভীরে নিয়ে চলো
মিশিয়ে দাও তোমার ভাবনা।
(প্রার্থনা: নদীর কাছে)

অবশ্য তার সময়ের অন্যথা জীবনের অনুভবও, অনুভবের যন্ত্রণাকে তিনি আয়ত্তে সম্পূর্ণ-বশবর্তী করে তাকে উত্তীর্ণ হবার, চেতনার অন্তরালে পার হয়ে দ্বিতীয় আলোর যে প্রবিষ্ট মুকুরের প্রস্তুতি, মনে হয়, সেই আনন্দই তাঁর অন্বিষ্ট।

চারদিকে কুয়াশা, আমি হৃদয়ের কারায় ছিটিয়ে
আর যেতে পারি না। আমি চেতনার ঘ্রাণিমা দিয়ে
সুখের স্বপ্নের সুখ আনতে পারলাম না, প্রেমিক
তুমি মুখ তোল। অবচেতনার প্রেমে চতুর্দিক
আলো হোক। তোমার মুখই থেকে যেতে দেবো
আনন্দ আমার।
(মুখ তোল, আমার প্রেমিক)

আতঙ্কে তিনটি কাব্য নাটক, কাব্যনাটক না-বলে কথোপকথন-নির্ভর কবিতা আছে—মায়ের মুখ, তীর্থ বিপণির ভিতরে, ভাইয়ের মুখ। 'ভাইয়ের মুখ' উজ্জ্বলতম। হেমিংওয়ের "The old man and the Sea" এই কবিতার রচনার প্রাথমিক প্রেরণা সে-টা অস্বীকার করা দুরূহ নয়। তবু যথার্থ আত্মীকরণে এবং উপলব্ধির সংরাগে 'ভাইয়ের মুখ' অনন্য। হেমিংওয়ের দীপ্ত এবং প্রাজ্ঞ এই কবিতায় উপস্থিত কিন্তু সিন্ধু, সিন্ধুর অপ্রেমের যন্ত্রণা প্রতীকায় লক্ষ কোটি বৎসরের মৃত্যু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বস্তুত আমার মনে হয়, সিন্ধুর বিস্তারের পটভূমিতেই 'ভাইয়ের মুখ' অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

সুন্দর শিল্পীর অনিষ্ট, দার্শনিকের কাছে সত্যের ব্যবচ্ছেদ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় গভীরতর জিজ্ঞাসা আছে কিন্তু তা কখনোই দার্শনিকের বর্ণহীন যুক্তবাদিতার পথে অগ্রসর হয় না। শিল্পীর যুক্তি, অর্থাৎ বিষয়ের বিন্যাস অথবা আবেগের সমন্বিতসাধন, তা তিনি আয়ত্ত করেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রকুমার গুপ্ত ভূমিকায় লিখেছেন 'আনকোরা

নতুন কবিতাগুলোকে বসন্তের লাবণ্য-চমকানো সকাল
মেখিয়ে তুলিয়ে রেখে, আগের রাতের পাখীদের
এখানে ডাক দিলাম।' তার প্রথম কাব্যগ্রন্থে যে অকপট
কবিত্বের পরিচয় আছে, তার ইঙ্গিতে আমরা তার নতুন
কবিতাগুলির প্রতি বিশেষ আগ্রহ অনুভব করছি। তাঁর
কবিতায় যদি ও রাজনীতি-বিষয়ে দক্ষতা আছে, বিশ্বশান্তির
জন্য প্রার্থনা আছে, বাংলার মেয়ের বেদনার কথা
আছে তবু সকলের উপরে প্রেম-ই তাঁর কবিতার
প্রধান উপজীব্য। সেই প্রেম এখনো সবল উচ্ছ্বাসী, রইলাম।
আবেগী :

ও-হাসি তুমি কোথায় পেলে, অন্তরা ?
এমন টুকরো-টুকরো হ'য়ে ঝরে পড়া
হৃদয়-পাগল করী হাসি ?
যে বোকা, বোবা ছেলেটি
লজ্জায় কখনো আকাশের দিকে মুখ তোলেনি,
সে-অস্থির হ'য়ে বলবে তোমায় ভালোবাসি।"

(হাসি)

সমীরকুমার গুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রতীক্ষায়

আলোক সরকার

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে
ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ক্যালকাটা, শিলিগুড়ি, মাদ্রাজ, আসানসোল

২০৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিশলচন্দ্র মিত্র এডভোকেট (৪৭-৫, রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা-২৬) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।